



সচিত্র মাসিক পত্র

(প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড)

(বৈশাখ - আশ্বিন)।

(১৩৪০)।

7563
027

পরিচালক ও সম্পাদক—

শ্রীঅনিলকুমার দে

বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা আট আনা

23307.



বৈশাখ - আশ্বিন

প্রথম খণ্ড, প্রথম বর্ষ—১৩৪০

নিম্নলিখিত—সূচী

পিতৃ-তর্পণ—(উৎসর্গ-পত্র, বৈশাখ সংখ্যা)

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অতি আধুনিক 'অটো-গাইটো' (প্রসঙ্গ)		৪৭৫	আশী রাম—ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		০
অতীত (কবিতা)—ঐকদম্বারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		৭৫২	আশী রাম—সেতী অবলা বহু		১২০
অদ্বুত (কবিতা)—ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		৬৬২	"আমাদের প্রথমদিবসে" (কবিতা)—ঐপ্রভাতকিরণ		৩১০
অনাগতা প্রিয়া (কবিতা)—ঐরামেন্দু সত		১৮২		বহু, বি-এ	৩১০
অগ্রেমিক (কবিতা)—ঐকুহরেন্দ্র মল্লিক, বি-এ		৩৬০			
অতিমান (গল্প)—ঐআশালতা দেবী		১৫			
অরুণোদয় (উপভাস)—ঐশৈলজানক মুখোপাধ্যায়					
	১১২, ১৪৫, ৩০২, ৪১৫, ৫১৭, ৭০০				
অশাধারণ (গল্প)—ঐপ্রবোধকুমার সান্যাল		৪৬০			
অসময়ে (কবিতা)—ঐহাসিনীরাশি দেবী		১৫২			
অশুভ্রতা-সমতা—ঐসত্যেন্দ্রনাথ সেন, এম্-এ,					
বিজ্ঞানবিশ্ব, এম্-এল-এ		৮২			
আ।					
আকাল্পা (কবিতা)—ঐকুহরেন্দ্র মল্লিক, বি-এ		৬২১			
আকাশে ও ধরা (কবিতা)—ঐপ্যারীমোহন					
	সেনগুপ্ত	১২৬			
আদর্শ-স্বাস্থ্য—ডাঃ ঐমুখেন্দ্রনাথ মৈত্র		১৪১			
আধারে আসো (গল্প)—ঐপ্রভাবতী দেবী					
	সরস্বতী	১৪৪			
আধুনিক কথাসাহিত্য—ঐসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ		৪১			
আবরণ (গল্প)—ঐরাধন মুখোপাধ্যায়		৪২৪			
আমে ডিটারিন (প্রসঙ্গ)		৪৭৬			
আলোকজিহ্বা-প্রতিবাসিতা		৪৬৬			

বিষয়

লেখক

পৃষ্ঠা

বিষয়

লেখক

পৃষ্ঠা

কথা-সাহিত্যের কথা—ডক্টর ঐনুলেজ্জনাথ রায়

চৌধুরী, এম্-এ, ডি-লিট

কনকলেখা (গল্প)—ঐনুলীমাধব চৌধুরী

কল্মীপতা (কবিতা)—বকে আলী মিয়া

কবি (কবিতা)—ঐশ্বরকুমার মুখোপাধ্যায়

কুলকুণ্ডলিনী রহস্য (গল্প)—

ঐবিধগতি চৌধুরী, এম্-এ

কিশোর নরৎ (কবিতা)—ঐরাধারাম দেবী

কতিবাসের গদ্যবতরণ—

ঐনলিনীকান্ত ভট্টাচার্য, এম্-এ

ক

কমতার জয় (গল্প)—ঐশলবালা ঘোষাচার্য

খ

খেলাধুলা

১২৮

খেলাধুলায় বাঙ্গালী

২০৪

খুঁটিনাট

২০১

গ

গান—ঐশাতি পাল

১০২

গীত ও রূপ—কথা ও সুর—কাছী নজরুল ইসলাম

বরলিপি—ঐজগৎ ঘটক

৪১২

গীত ও রূপ—ঐনির্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল, বাসীকর্ত ৬০০

গীত ও রূপ—কথা—ঐমতী অন্নদেবী

সুর—ঐগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বরলিপি—ঐরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,

বি-এ

১২০

ঘ

ঘর-বাইরে—১২৪, ২৪১, ৩৬১, ৪১৭, ৬০৩, ৭৪৮

চ

চক্রমেমি (গল্প)—ঐনতীপতি বিজ্ঞানচন্দ্র

চক্ৰ আদন বোনা (শিল্প-বাণিজ্য)—

ঐকুমারমালা দেবী

চক্ৰবাসের প্রেমসাধনা—

ঐশত্যকুমার বসু, বি-এ

চাপা (গল্প)—ঐরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

বি-এ

“চোক গেল” (কবিতা)—

ঐকুমারচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল

৪৪১

২৩০ চিরদিনের সাধী (কবিতা)—ঐহেমেন্দ্রলাল রায়

১৩৭

৬১৬

ছ

ছোটগল্প—ঐপ্রমথ চৌধুরী, বার-এটল

১০২

জ

জড়, জীব ও ধাতুপুস্তক—

ডক্টর ঐমুরেজ্জনাথ দাশগুপ্ত, এম্-এ,

পি-এইচ-ডি ৪০১

জন্মের গল্প (গল্প)—ঐহেমেন্দ্রলাল রায়

৪৪২

জগদী (কবিতা)—ঐহেমচন্দ্র বাগচী

১৬৬

জাতির পাতি—বহুবন্ধ

৮৮

জিজ্ঞাসু — ৬৪, ৩৪১, ৪১৭, ৪৮৬

জৈবের কাহিনী (বহুপরিচয়)—

ঐস্বর্ধকুমার মিত্র

ত

তৃত্যাক পঞ্চক (কবিতা)—কপিল

৪৩২

দ

দরদী (কবিতা)—ঐদীপকুমার রায়

৩৩১

দুর্গামুণ্ডি পরিচয়—কুমারী দ্বারা দেবী

৬১৭

দ্বিধেন্দ্রলালের বহুবন্ধ দ্বন্দ্ব—

অধ্যাপক ঐপ্রবোধচন্দ্র সেন, এম্-এ

দেশপ্রিয় বতীপ্রবোধন (কবিতা)—

ঐবতীপ্রবোধন বাগচী, বি-এ,

দেশীয় বিশ্বের ভবিষ্যৎ (শিল্প-বাণিজ্য)—

ঐবিদ্যালয়

মেহের দাবি (গল্প)—ঐঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

এম্-এ, বি-এল

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
নতুন প্রবন্ধ—	ন		বর্ধতি (গল্প)—ঐন্দ্রজিৎমোহন মুখোপাধ্যায়		৩৪৪
ডক্টর ঐন্দ্রবদীপ্রনাথ ঠাকুর, সি-আই-ই		২৪৩	বাঙ্গালার তিনটি প্রাচীন দক্ষিণ (বঙ্গ-পরিচয়)—		
নবকিশোরের পরিচয় (গল্প)—ঐন্দ্রসেব বসু,			ঐন্দ্রজিৎমোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এসসি		৪২৭
এম্-এ	৭২৪		বাঙ্গালার কাগজের কল (শিল্প-বাণিজ্য)—		
নব্য-সাহিত্যের নীতি—বহুবল্লভ		৪০	ঐন্দ্রজিৎমোহন মুখোপাধ্যায়		১২০
নৃত্য ধরনের নিব্ (প্রগতি)		৪৭৬	বাঙ্গালীর বিশেষ—ডক্টর ঐন্দ্রজিৎমোহন মুখোপাধ্যায়		
নৃত্য বই	১১৬, ২৪৬, ৩৪৬, ৪৭২, ৪৮৩, ৭৪৪		এম্-এ, পি-এচ্-ডি		৪৬৭
নৃত্য বাহ্য-তত্ত্ব—ডাঃ ঐন্দ্রজিৎমোহন মুখোপাধ্যায়		৩৮৮	বাংলা ও বাংলায় নৃত্যের অভিব্যক্তি—		
প			ঐন্দ্রজিৎমোহন মুখোপাধ্যায়		
পঞ্চরঙ্গ—পণ্ডিত ঐন্দ্রজিৎমোহন মুখোপাধ্যায়			বাংলায় আধ্যাত্মিক-বিস্তার—		
পঞ্চরঙ্গ ভারতবর্ষ—ঐন্দ্রজিৎমোহন মুখোপাধ্যায়			মধ্যযুগ ঐন্দ্রজিৎমোহন মুখোপাধ্যায়		
১২৮, ২২৪, ৪৩৪			বাঙ্গালার সেব দক্ষিণ (বঙ্গ-পরিচয়)—		
প্রকৃতি (গল্প)—ঐন্দ্রজিৎমোহন মুখোপাধ্যায়		২৪৭, ৩৮৭	ঐন্দ্রজিৎমোহন মুখোপাধ্যায়		
প্রথম বৌদ্ধ (কবিতা)—ঐন্দ্রজিৎমোহন মুখোপাধ্যায়			বিদ্যাভিক্ষণ (কবিতা)—		
চতুর্থোপাধ্যায়	৭৪৭		ঐন্দ্রজিৎমোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এ		৭৪৭
প্রবাস-মাতা (কবিতা)—ঐন্দ্রজিৎমোহন মুখোপাধ্যায়		৩২	বিমানপথে চলার ভবিষ্যৎ (প্রগতি)—		
প্রবাসে বাঙ্গালী ছাত্র	৪৮৪, ৭৮৮		ঐন্দ্রজিৎমোহন মুখোপাধ্যায়		
প্রগতি—আচার্য্য ঐন্দ্রজিৎমোহন মুখোপাধ্যায়		২৪৮৮	বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় ও বীণেশ্বর ঐন্দ্রজিৎমোহন মুখোপাধ্যায়		
প্রগতি—মোহন ঐন্দ্রজিৎমোহন মুখোপাধ্যায়			ঐন্দ্রজিৎমোহন মুখোপাধ্যায়		
এম্-এ, বি-এস	৩৪৪৮		বিদ্যামাতা (কবিতা)—ঐন্দ্রজিৎমোহন মুখোপাধ্যায়		
প্রাচীন কলিকাতা—কবিদ্বন্দ্ব ঐন্দ্রজিৎমোহন মুখোপাধ্যায়			বেকারের ব্যবস্থা (শিল্প-বাণিজ্য)—বেকার-বাহুবল্লভ		১৭৮
উচ্চসামগ্র, বি-এ	২৪৪, ৩২৭, ৩৮৪,		বৈজ্ঞানিক মনো বিজ্ঞান (গল্প)—		
প্রিয়া (কবিতা)—ঐন্দ্রজিৎমোহন মুখোপাধ্যায়			ঐন্দ্রজিৎমোহন মুখোপাধ্যায়		
এম্-এ, বি-এস			বৈদ্য-গুরু (কবিতা)—ঐন্দ্রজিৎমোহন মুখোপাধ্যায়		
ক			ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিজ্ঞান—		
করালী জাতির বহুগ—ডক্টর ঐন্দ্রজিৎমোহন মুখোপাধ্যায়			আচার্য্য ঐন্দ্রজিৎমোহন মুখোপাধ্যায়		৪৮৭
এম্-এ, ডি-লিট	৩৭০		ব্যবসা-বাণিজ্য ও অসমসত্তার বাঙ্গালীর পরামর্শ—		
ব			আচার্য্য ঐন্দ্রজিৎমোহন মুখোপাধ্যায়		
বহুগ-তর্পণ			বৌদ্ধধর্ম—ডক্টর ঐন্দ্রজিৎমোহন মুখোপাধ্যায়		
বঙ্গ-পরিচয়—ঐন্দ্রজিৎমোহন মুখোপাধ্যায়			এম্-এ, পি-এচ্-ডি, ডি-লিট (লণ্ডন)		২৮
বঙ্গ-বহুগ ব্যবসা (প্রগতি)—			ড		
ঐন্দ্রজিৎমোহন মুখোপাধ্যায়			ভালোবাসা—মহা সেও (কবিতা)—		
			ঐন্দ্রজিৎমোহন মুখোপাধ্যায়		

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ক					
হাজার-বুঝা বাঙালী জাতি—			"দিয়াগ্রি বর্ণকৃতী" পত্রিকা—		
শ্রীবিনয়কুমার সরকার, এম্-এ			শ্রীমদীনাকার সেন		
হাসি—শ্রীবিনয় রায়চৌধুরী			হিন্দু সভাপতির পতন—ডক্টর শ্রীমদীনাকার		
		৩২২	চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ, ডি-লিট		
		৩৫	হুক ওরাহ্ম (পত্র)—শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্তী		

চিত্র-সুভী

বহু-বর্ণ ও ত্রি-বর্ণ চিত্র—	পৃষ্ঠা	এক-বর্ণ চিত্র—	পৃষ্ঠা
কলিকাতার নৈশ-শোভা—শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫০০	অ	
দ্বীপ — শ্রীঅমিনীকুমার রায়	৬১৬	'অটো-গাইরো' হইতে পার্কেল যমল	৪১৫
দিনের শেষে—শ্রীঅমিনীকুমার রায়	৩৬০	অটো সিগিফ্রেয়া	৩২
মায়-কানন—শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮২	অমাবস্তার অন্ধকারে কটো তোলা	৩৫
রূপকথার বেশ—শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২১	অশোকের সময়ের গুহামন্দিরের অল্পকরণে অল্পপূর্ণার	
সাবী—শ্রীহাসিরাশি দেবী (ভাত্র, বিজ্ঞাপন-পু.)	২৮	প্রাচীন মন্দির	৪০৮
সেবাধর্ম—শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩২০		
দ্বি-বর্ণ চিত্র—		আ	
বন্য অতিক্রমণ	বৈশাখ সংখ্যা	...আজকের গল্প হ'বে আমার রূপক...	৫০০
আচার্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়	২৪৮ক	আধুনিক "অটো-গাইরো"	৩০
আলো ও ছায়া—শ্রীশিব বহু (আফিন, বিজ্ঞাপন-পু.)	৪৫	আবরা কিসে কম ? (ব্যঙ্গচিত্র)	৪৫২
উন্নয়ন-কার্যালয়	১২৫	আশার সকার (ব্যঙ্গচিত্র)	১৪০
কৃষ্ণ-চন্দন—শ্রীবীরেন্দ্র বহু (আফিন, বিজ্ঞাপন-পু.)	২৮		
দেশপ্রিয় বতীজবোহন সেনগুপ্ত	৪৮৫ক	ই	
৮-বর্ষিচ্ছ চট্টোপাধ্যায়	১	ইহাই শোভের ফেটল	
বিত্রাস—শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ	৬৬৫	উ	
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩	উইলিয়ম ফেরী	৪০১
মাননীয়া দেবী অবলা বহু	১২২	উইলিয়ম ওয়ার্ড	৪০২
শ্রীশিব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬০৮ক	'উন্নয়ন' প্রাচীর-চিত্র—শ্রীশচীন্দ্রনারায়ণ দাস	১০৬
শ্রীকমলকুমার বহু, এম্-এ, বি-এল (যেহর)	৩৬৫ক		

পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
এ	জ	
'...এই 'ভার'বান। গিরন ভুলে আমার দিগে দিতেছিল...'	১০০	জগদীশপুরের মন্দির ছইটী
এইবার মেয়ে দাও ! (ব্যঙ্গচিত্র)	৪১৬	জন্ মার্ম্যান
এঃ].....neck to neck !...এ	৪১৬	অিন-বৃষ্টি-চতুর্দৈ-বুল প্রতাপকার শিলা
একটি প্রস্তরমূর্তির নিয়াম	৪১০	কোরা গুলিকে সজ বহিয়া চালান করা হইতেছে
একপাদ ভৈরবমূর্তি এবং হামরের মূৰ্ব্বশিষ্ট একটি		জৈনজ্ঞানব বৃত্ত (খণ্ডশিবি)
পরঃপ্রাণীর কলোবশেষ	৪০২	ট
'এ কি মামীমা—বহ্নন !'	৬২৪	টুপিবেল মধ্যমানে কুচকাওয়াজ
'এবার কিন্তু আমার এক সেই জড়োয়া গমনা সেওয়া চাই'	৬২৭	ড
এবার সফল (ব্যঙ্গচিত্র)	৭৪	ডানার সাহায্যে শূত্র উড়া
এরোপ্লেন হইতে কটো ভূগিভেছে	৩৭	ডানাহীন "অটো-গাইড্রো"
এরোপ্লেন সাহায্যে জমির নজা প্রদত্ত	৩৭	ড
এরোপ্লেন সাহায্যে বীজ ছড়ান হইতেছে	৩৭	ডারকেশ্বরের মন্দির
ক		'তুমি কে ? এ চোখ, তুমি কোথায় পেলো ?'
কনকলেখা ও প্রায়োডের মিলন	১১৪	দ
কবিরাজ রায়বাহাদুরের নাকী পরীক্ষা কয়েছেন	২৩২	দুর্গাপুর ভট্টাচার্য্য
কাঠমাণ্ডুতে রথযাত্রা—কাঠমাণ্ডুর জনতা	৬৪৬	দ্বিবেশনাথ মৈত্র
কি উৎসাহে ! (ব্যঙ্গচিত্র)	৩৩৭	দেশপ্রিয় স্বতীজমোহনের পবাহনমন-বৃত্ত
কি উদ্ভাসে ! (ব্যঙ্গচিত্র)	৩৩৭	ন
কুমারী চিত্রমী তোড়পাঠ করিতেছেন	৪২৭	'নরসিং বাহা'
কোরী হস্তশিল্পিত গুয়ার্ডবুক	৪০৪	প
কেশবের মঠ	৭২১	পথরথায় প্রাপ্ত কৃষাণ (বা প্রাক-কৃষাণ)
কেশবের ঘোষ	৪৮৪	পুণের মুররী মূর্তি
কেশবের মন্দির	৪২২	পথরথায় প্রাপ্ত গুপ্ত-কৃষকের সিংহ-বাহিনী
কেশবের বানমিকে পুরোহিত ও উভয়দিকে সেবাইত		সেবী মূর্তি
কেশবের মন্দিরের পায়ে উৎকীর্ণ লিপি		পথরথায় প্রাপ্ত পরস্বতী-মূর্তি
প		পথরথায় মন্দির-মন্দিরী
পাশপাশে ও অস্ত্রাঙ্গ মূর্তির মধ্যে	২০২	পশুপতিনাথের মন্দিরের পথে
পশুপতীর মূর্তি	৪০৬	পাশপাশে ভারে বনমালী বাড়ী হ'তে পারে না
		পাহারাগুহালা নাসিকা গর্জন ক'রে নিজে বাজে
		পেশানের আনন্দ মন্দির

	পৃষ্ঠা		পৃষ্ঠা
পেঙ্গানের খিটখাবাদা মন্দির	১১৭	মামবীমণ্ডপে কনকসেখার দর্শিত	
পেঙ্গানের হুসেনাবানী মন্দির	১১৮	কুমারের সাক্ষ্য	১০৩
পেটে জুখা থাকা সন্ধ্যা বন্ধী সর্গীর অভাবই		মাটির হাঁড়ি ; গ্রাম এক হাজার বৎসরের পুরাতন	৪১১
বেশী বোধ করিতেছে	২৭৩	নিহিরকুমার চৌধুরী	৭৬৮
প্রাচীন বিহুহুঁটি	৪০২	র	
প্রভাব (দিনো-কাট)—শ্রীহৃদাঙ্কুমার রায়	৪০৪	"রসি"	
ব		রাইট-ব্রাহ্মণের এরোগেন	
বনমালী পঞ্চ পক্ষীর মত হাত ছোড় ক'রে		রাজাবিরাজের প্রাসাদ (আধুনিক)	
দণ্ডায়মান	২৩৪	রাজাবাড়ীর মঠ	
বন্ধী বানবেরা অজ্ঞাত দেশের পানে		রাজা শম্ভুরের সূত্রা	
অবাক হইয়া চাহিতেছে		রাত্রিবাহুর সেক-ওয়ে প্রদত্ত	
বাজার-গরের নতুন (বড়-ছোট)		তপস্বী ব'লে রাজপুত্রের উত্তরীরে পায়	
বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের সমন্বয় হুসে হত-পার্শ্বতীর		পরাজিত স্বরীর অ'ছিল	
এর নুঁটি		শ	
বৌদ্ধ প্রভাব অবসানের সময়		শিকারী—শ্রীযাত্র, কে, পাল	৪৪৪
দৌরীপটের অর্ধাংশ		শিবিরকুমার বোধ (বহাঙ্গ)	৩৬৬
ড		স	
তবিত্তদের অতিকার এরোগেনের পরিকল্পনা	৩৬	সন্ন্যাসী আকবরের স্বপ্ন-সূত্র	
ভারতীয় মাহাতের দ্বিতীয় বন্ধী হাতী		সারদারঞ্জন রায় (এন্ড রায়)	
ইউরোপে চালান হইতেছে	২৭০	সাইভার প্রজিবাগিতার মত বিশেষভাবে	
ভুবনেশ্বরের মন্দির	১১৬	ডৈর্যবী এরোগেন	৩৪
ভূপতির চিত্র-বর্ণন	১১২	সিহনুঁটি ও অস্ত্রা নুঁটির ভাষণ	২১০
ম		'সে কথা বলা কইতে পারেন আপনারা ঠিক'	৪২২
মহীন্দ্রনাথ বোষ		সোনারখের মঠ	৭২০
মদন হওল ছাত্র বলি সমস্ত ছন্দী		হ	
মাইয়া পড়িয়া সেলেন		হাসে কাহারা ?	৩৬, ৬৭
মহাকালী গ্রামে প্রাণ বৃদ্ধিতে অক্ষিত		হারি প্রিয়ভার অসত এরোগেন হইতে	
মন্দিরের প্রতিষ্ঠিত	১১৭	লাকাইয়া পড়িতেছে	৩৪
মহাবুদ্ধ-মন্দির—পাটন	৬৪৪	"হিমালয় বর্ষভূমি"—নেপাল-উপত্যকা	৬০৬
মহাসেব বন	৪৮৪		

উদয়ন — টেবিশাখ, ১৩৪০



স্বামী বহুনিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



স্বর্গীয় অতীন্দ্রনাথ দে



বন্ধিন-তর্পণ

হে বাংলার সাহিত্যগুরু, আজ বৎসরের প্রথম দিনে সাহিত্য-পাথে আমাদের এই প্রথম যাত্রায় আমাদের হর্ব-আশঙ্কা-উদ্বেল জনয়ে তোমার চিরজয়া শক্তিময় মূর্তি কুটিয়া উঠুক। বঙ্গভারতীর পবিত্র পূজাকার্গের গুরুভারে শ্রদ্ধাবনত আমাদের মস্তকে তোমার আলোকদ পুষ্পের মত ঝরিয়া পড়ুক।

হে নিভাঁক জাতিগায়ক, যে অপার শক্তি ও মনীষার বলে তুমি বাঙ্গালীর পূর্ণ অভ্যাসের সকল পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলে, সেই শক্তি ও মনীষার আবেগে আমাদের চিত্তকে উৎসাহিত করুক।

হে প্রবল কালবৈশাগীর প্রতিভূ, তুমি সঙ্গে আনিয়াছিলে প্রভঞ্জন এবং প্লাবন,— প্রভঞ্জনের দ্বারা তুমি বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রের বহু গুম্বাদল ও কলুসজঞ্জাল উড়াইয়া দিয়াছ, এবং প্লাবনের দ্বারা সেই ক্ষেত্রকে নবীন জীবনে নবশস্যসম্ভারে সুষামল করিয়া তুলিয়াছ। তোমার সেই সংহার ও সৃষ্ণনের লীলা আজ আমাদের গায়ে গাধা পানের সন্ধান দিক।

হে সত্যদ্রষ্টা গবি, তোমারই নয়নে প্রথম অপরূপ গৌরবে সেই দেশজননী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, বিনি একই কালে “স্বহাসিনী” এবং “বহুবলধারিণী”। তাঁহারই হাতে ও বলে আজ অদম্য বঙ্গরবি জগতের আকাশে সমুজ্জ্বল। তোমাকে প্রণাম।

হে মহান, তুমি আমাদের সেই সাহস দাও যাহাতে আমরা অন্যায়কে অন্যায় বলিতে পারি; সেই শক্তি দাও যাহাতে আমরা কলুসকে অতিক্রম করিতে পারি; সেই প্রেরণা দাও যাহাতে আমরা আনন্দ-উৎসারিত সৌন্দর্য্য ও কল্যাণকে জীবনের সাধনা করিয়া তুলিতে পারি।

આન્શીર્વાન

૭
૩

જામનું વિચિત્ર

પર પ્રકાશિત ઉપનિષદોનાં
ચિંતનને મારા દિગ્ગજાલ ।

જનિત કલ્પે જાણા મેલે રત મર
માણસને પર ના હોય મરણ;
જીવંત પર માર નાહિ રાંડા ॥

ચિંતન

૪ ડિસે ૨૦૧૦

সাহিত্য

ডাক্তার শ্রীহরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, এম্-এ, পি-এচ-ডি

কোনও শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দ্বারা সেই শব্দের ভাষায় প্রচলিত তাৎপর্যের নির্ণয় করা যায়, একথা বলা চলে না। পদ্ম ব্যতী হইতে সো শব্দের উৎপত্তি: তাই বসিয়া বাহা চলে তাহাই সো এই ব্যুৎপত্তির অমূল্যমান করিয়া গুরু অর্থে ব্যবহৃত সো শব্দের তাৎপর্য বাহির করিতে গেলে হাতাক্সপ হইতে হয়। বাহা চলে বা গমন করে তাহাকেই গুরু বলা চলে না এবং ব্যুৎপত্তির অহরোহে অর্থ করিতে গেলে, 'সৌভাগ্য' বা গুরু বসিয়া আছে, এতদ্বা বলা চলে না, কারণ সচল বস্তুকেই যদি 'সো' বলিতে হয় তবে বসিয়া থাকিলে তাহার সে নাম সম্ভব হয় না। কিন্তু অবিকার্য্য হলে ব্যুৎপত্তিগত অর্থের অমূল্যমান করিলে তাৎপর্যের যে বীমচী পাণ্ডা দ্বার কালক্রমে চিত্তা ও ভাবের আদান-প্রদানের সাহায্যে সামাজিক ও ব্যবহারিক পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার ক্রম-পরিণতির ধারারী লক্ষ্য করিয়া চলিলে তাহার ভাষায় প্রচলিত তাৎপর্য্যটির হার্ষকতা হ্রাস হইয়া উঠে। ভাষার একটি শব্দের নানা অর্থে ব্যবহার দেখা যায়। তাহাদের সম্বন্ধে কথিত হইয়া অনেক সময়ই ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সাহায্য লইতে হয়। মানুষের চিত্ত ক্রম-পরিবর্তমান ভাবধারা হইতে বস্তুসংগ্ৰহ করিয়া একটি আদর্শ অর্থ আপনাকে নানা ভাষা-প্রণাধার ব্যাপ্ত করিয়া বিভিন্ন অর্থরূপে প্রকাশ করে; আবার অনেক সময় ইহাও দেখা যায় যে, ভাবধারার পরিবর্তনে বস্তু অর্থচী ভাষা হইতে বিলুপ্ত ও বিবর্ত হইয়া যায় এবং পুরাতন শব্দকে আশ্রয় করিয়া একেবারে নূতন অর্থের উৎপত্তি হয়, অথচ তাহার সহিত সম্পর্ক একেবারে বিলুপ্ত হয় না। এই অর্থ-পরিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, মানুষের চিত্ত কোনও একটি বীজ-ভাবকে (concept) অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ থাকিতে পারে না।

সে তাহার মধ্যে নূতন নূতন অর্থ নূতন নূতন তাৎপর্যের অমূল্যমান ও সৃষ্টি করিয়া আপনাকে সমুদ্রের গর্ভে ঢালিত করিতে থাকে এবং এইমত একটী শব্দের বৃত্তে নানা বেশে নানা কালে বিভিন্ন অর্থ বিভিন্ন তাৎপর্য্য ফুটিয়া উঠে। সেইমত কোনও একটি বিশিষ্ট শব্দের কি তাৎপর্য্য তাহার কোনও একটি নিখিট উত্তর দেওয়া যায় না। অর্থ ও তাৎপর্য্য দ্বিভাষা হইলেই প্রশ্ন উঠে এ অর্থ কোন কালের, কোন দেশের, কোন সমাজের? কোন ভাবুর চিত্তবৃত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল? ক্রমপরিবর্তমান অর্থলব্ধের মধ্য দিয়া কিসের অমূল্যমান চলিয়াছে তাহার খোঁজ না করিলে সেই শব্দের তাৎপর্য্য নির্ণয় মুশাধ্য হয়। এইমত দ্বারের দ্বারে বা দলার দ্বারে মত স্থাপনের যে-রীতি দেখা যায়, তাহাতে বস্তু বাড়িয়া উঠে, কিন্তু মীমাংসা হয় না।

সাহিত্য শব্দটা সঙ্কট হইতে বাংলায় আসিয়াছে। ইহার সম্বন্ধে অল্প কিছু আলোচনা করিবার পূর্বে সঙ্কট ভাষার এই শব্দের কি অর্থ ও তাৎপর্য্য চলিয়া আসিয়াছে, তাহাই প্রথানতঃ এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব। 'সহ' বা 'সহিত' শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দ নিম্পন্ন হইয়াছে। শব্দটা সঙ্কট ভাষার অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কারণ, অতি প্রাচীন গ্রন্থে এই শব্দটির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার মূল অর্থ, "একসঙ্গে বা একত্র থাক।" হীরা মিনিস একত্র আছে, এই তাৎপর্য্য বুঝাইতে একথা বলা চলে যে, তাহাদের 'সাহিত্য' আছে। আবার কোনও লোকের সহিত সঙ্গ করাকে তাহার সাহিত্য করা বলা চলে। কামদক্ষীর নীতি-শাস্ত্রে ব্রীহস্পতি কথিতে দিবেদ্যে কথিতে শিখা দেখা হইয়াছে—“একাধীর্ঘ্যাস সাহিত্যঃ সঙ্গসর্গ বিবর্তকঃ”। আমরা বাংলায় 'সাহিত্য' শব্দ যে-অর্থে ব্যবহার করি সেই অর্থে অতি প্রাচীন কালে কাব্য শব্দই ব্যবহৃত

হইত। মধ্যযুগ হইতে ‘সাহিত্য’ এই শব্দের প্রচলন দেখা যায়। কবিসার্কভৌম স্বাভাবিক, সহিত শব্দ হইতে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিয়া সাহিত্য শব্দের তাৎপৰ্য্য নির্ণয় করিতে দিয়া “বাংলার অতীত সাহিত্য” এই গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “সহিত শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটা মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে যে কেবল ভাবে-ভাবে, ভাষায়-ভাষায়, গ্রন্থে-গ্রন্থে মিলন তাহা নহে,—মাতৃশব্দের সহিত মাতৃশব্দের, অতীতের সহিত বর্তমানের, ঘুরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে। যে-দেশে সাহিত্যের অভাব সে-দেশের লোক পরস্পর সমীচীন বন্ধন সংস্কৃত নহে—তাহারা বিচ্ছিন্ন। পূৰ্ণসুখস্বদের সহিতও তাহাদের সমীচীন যোগ নাই। কেবল পূৰ্ণাঙ্গের প্রচলিত জড় প্রথাবন্ধনের দ্বারা যে যোগ-সাধন হয় তাহা যোগ নহে, তাহা বন্ধন মাত্র। সাহিত্যের দ্বারাবাহিকতা ব্যতীত পূৰ্ণসুখস্বদের সহিত সচেতন মানসিক যোগ কখনই রক্ষিত হইতে পারে না।” অর্থটার মধ্যে একটা হুসভীর অন্তর্ভুক্তি ও হুসভি আছে। কিন্তু এই অর্থে সাহিত্য শব্দ সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয় নাই।

অতি প্রাচীনকাল হইতে শব্দের সহিত অর্থের যে একটা গভীর সম্পর্ক আছে এই সভ্যতা ভারতবর্ষীয় মনীষীদের মনকে নাড়া দিয়াছিল। কালিদাস বুঝিয়াছিলেন যে, বাক্য ও অর্থের তাৎপৰ্য্য দ্বয়ে প্রতিভাত না হইলে কাব্য লেখা চলে না। তাই তিনি রত্নাবলী কাব্যের প্রথমে হর-পার্কতীকে নমস্কার করিতে দিয়া বলিয়াছেন যে, বাক্য ও অর্থের তাৎপৰ্য্য বুঝিবার জন্য তিনি হর-পার্কতীকে নমস্কার করেন। কারণ, বাক্য ও অর্থের সম্বন্ধ বেতন নিত্য, অর্থনারীষের হর-পার্কতীর সম্বন্ধও সেইরূপ নিত্য। কালিদাসের সম-কালীন ভট্টহরি তাঁহার বাক্যপন্থী লিখিয়াছেন যে, ব্রহ্ম যেমন নিম্নে কুটম্ব থাকিয়াও আপনাকে জগৎরূপে প্রকাশ করেন, শব্দও সেইরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান কুটম্ব

থাকিয়া নানা অর্থের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করে।

“অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং স্বাক্ষরম্।
বিবর্ত্তেৎপত্ত্যভাবেন প্রকিয়া জপতো বতঃ ৪”

জ্ঞান যেমন নানা জ্ঞেয় বস্তুর মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করে, শব্দও সেইরূপ আপনাকে নানা অর্থের মধ্য দিয়া প্রকাশ করে।

“আত্মতত্ত্বং বধা জ্ঞানে জ্ঞেয়তত্ত্বং চ বৃত্ততে
অর্থতত্ত্বং তথা শব্দে স্বরূপং চ প্রকাশতে।”

এই সমস্ত দার্শনিক মতবাদের প্রভাবে শব্দ ও অর্থের মনোহারা সংস্পর্শ-বিশেষকে সাহিত্য বলা হইত। বক্তব্যবিশেষীকৃতকার রামানন্ডকৃত সাহিত্যের লক্ষণ করিতে দিয়া বলিয়াছেন—

“পঞ্চার্থো সহিতৌ বক্তব্যবিষয়পারমার্থিনি
বদ্ধে ব্যবহিতৌ কাব্যঃ তদ্বিধাঙ্গামকারিণি।”

কবিকৌশলকল্পিত রচনাবৈচিত্র্যচমৎকারকারী শব্দ ও অর্থের হুমধুর বিভাসকে সাহিত্য বা কাব্য বলা হয়। কেবল শব্দকে কাব্য বলা যায় না, কিংবা কেবল অর্থকে কাব্য বলা যায় না। সেইজন্য শুধু যেখানে শব্দের কন্ডার আছে সেখানে কাব্য হয় নাই, যেমন—

“ত্রিশূরা ত্রিগুণা ত্রিলোচনী ত্রিশূলিনী
তপিত তনয়ে তব ভারহ তরিণী।
ধকারে পাথর তুমি ধকারের মেঘে
খির কর খর খর কাঁপি ভর পেয়ে।
দাক্ষায়ণী দয়াময়ী দানব-দমনী
হুঃখ দূর কর হুর্ণা হুর্ণাভিলসনী।”

শুধু অর্থের পাণ্ডিত্য বা মহৎ থাকিলেও সাহিত্য বা কাব্য হয় না—

“তুমি মূল প্রকৃতি সকল বিশ্বমূল,
সেই বস্তু তুমি যারে হও অহমূল।

তুমি সকলের দার অঙ্গার সকল,
বেথানে তোমার দয়া দেখানে মলল।
বস্তু অর্থ কাষ মোক্ষ তোমার তখনে,
সেই ধর তুমি দয়া কর বেই জনে।
সব রক্ত তম তপে প্রবেশিয়া তুমি,
কলি কৈলা মূল্যলোক রসাতল তুমি।”

আবার অর্থ, গাষ্ট্রীয়া ও শব্দ-কল্পার একত হইলেও
সাহিত্য হয় না, যেমন —

“আমার মন কাণী কাণী বল বহনে।
তোক মরণ বেথানে দেখানে।
বালা সুব। বৃদ্ধকাল কাটাইলে তিন কাল
পরকাল কিলে রর বল না।
আগত আগত কাল সমুখে নেখ কাল
কালানুখ হবে কালকাত্য বিহনে।”

কোনও দার্শনিক তব যদি কবিতায় প্রকাশ করা যায়,
তবে সেই শুভ উর্ধ্ব-বাক্যের মধ্যে অর্থের গাষ্ট্রীয়া
ধাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে কাব্য হয় না। এই-
কল্প সাংখ্যকারিক। কবিতায় দেখা হইলেও তাহা কাব্য
নয়। একই অর্থ কোনও রচনা-বিভাগে কাব্য হয়,
কোনও রচনা-বিভাগে নিত্য সাধারণ কথা মাত্র হয়।
অনেক সময় প্রায় একই রকম বিষয়-বস্তু কবির বিভ্রাস-
তরীতে কোনও হুগে অতি সাধারণ হুগোবদ্ধ পদ
বলিয়া প্রতীত হয়, কোনখানে বা ছন্দকে চমৎকারিণে
রসপ্রসূর করিয়া তুলে। চাঁদ উঠিলে বিরহিণীরা
পতিবিরহে আত হইয়া উঠেন। সেইরূপ চাঁদ সূর্য
তাহাদের দৃষ্টির সমুখে পড়িতে চায় না, এই কথাটি
ত্রিখিতে দিয়া কোনও কবি লিখিয়াছেন —

“মানিনীজনবিলোচন পাতা-
দুঃখব্যাংকনুদানভিগূহন
মন্মথমন্মথিতঃ প্রবেদো ধং
ভীত ভীত ইব নীতমধুঃ।”

উচ্চ-বাহু-প্রচুর মানিনীদের দৃষ্টিপাতের ভয়ে চন্দ্র বীরে
বীরে উদ্ভিত হইয়া আকাশমার্গে গমন করিলেন।

“ক্রমাসেক্ষিত্তিপ্রভৃতিগণিগাটীঃ প্রকটয়ন্
কলাঃ শৈবঃ শৈবঃ নবকমলকল্যাহুঃকটঃ।
পূরভীণাঃ প্রেতবিরহসহনোদীপিতভূশাঃ
কটাক্ষেভ্যোবিভ্রিত ইব চন্দ্রোদয়সরতে।”

পদ্যকারকেও জ্ঞান হুগোমল কলাগুলি বীরে বীরে
একটা একটা করিয়া একাশ করিয়া প্রেক-বিরহিণী
পূরনারীদিগের গোবন্ধায়িত কটাক্ষের ভয়ে চন্দ্র যেন
অতি সঙ্গোপনে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। এই
দ্বিতীয় কবিতাটির উৎকর্ষ সহজেই বুঝা যায়। কাহ্নেই
দেখা যাউতেছে যে, কেবল রমণীয় পদ প্রয়োগে বা
কেবল অর্থের শুকনো কাব্য হয় না। কিন্তু শব্দার্থের
একটা বিশেষ চাক্ষুস্মিত্তি বা সাহিত্যে ‘সাহিত্যের’
সঙ্গী হয়। শব্দার্থের দার্শনিক শব্দের বিচার উল্লেখ
করিতে গিয়া বলা হইয়াছে যে, শব্দের সহিত অর্থের
নিত্য সাহিত্য বা শব্দ বর্তমান রহিয়াছে। এই হিসাবে
শব্দ ও অর্থ সর্বদাই সম্মিলিত রহিয়াছে। সাহিত্য
বলিতে আমরা সেই বিশেষ সম্মিলনকেই বুঝি বাহা
ছন্দকে আচ্ছাদ্যে ও চমৎকারিণে পূর্ণ করিয়া তুলে।
এই চমৎকারিণের মূলে একদিকে যেমন অর্থের চাক্ষুস্মিত্তি
অপরদিকে তেমনি ব্যাক্য-বিভ্রাস ও ছন্দই প্রধান।

একই মিলন বুকাইতে হয়ত অনেকগুলি শব্দ থাকিতে
পারে; কিন্তু তাহাদের সকলগুলি কাব্যে ব্যবহৃত হইতে
পারে না। আবার একআতীর দশটি ফুল থাকিতে পারে,
দশটি ফল থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের সকলকে কাব্যে
ব্যবহার করা যায় না। ‘হুত-বুহুত’ বলা চলে, কিন্তু
‘আমের ফুল’ বলা চলে না; আর শব্দের কাব্যে বহু
ব্যবহার আছে, কীঠাল শব্দের কাব্যে ব্যবহার চলে না।
অথচ উভয়েই ভক্য বটে। রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন
যে, ভক্য বলিয়া ও প্রয়োজন সিদ্ধ করে বলিয়া বিদ্যা বা
বেত্তনের ফুল লইয়া কাব্য চলে না, কিন্তু মল্লিকা বা
টগর না হইলে কাব্য অসম, তাহার প্রধান কারণ এই

যে, তাহারা কোনও বাবহারিক প্রয়োজনে লাগে না, সে-কথা নিঃসন্দেহ বলিয়া মানা চলে না। শব্দের মধ্যেই এমন একটা বিশেষণ আছে যে, সেই শব্দ সাহিত্যে বাবহারের উপযোগী, কিন্তু তচ্ছাটীয়া অন্তর্ভুক্ত নহে। শব্দের একটা বিশেষ ধর্ম বা লক্ষণ আছে বাহা। অল্পদূরত্ব করিয়া কবি তাহার প্রতিভার বলে তাকাকে চরন করিয়া সাহিত্যের মালা সৃষ্টি করেন। সেই ধর্ম বা লক্ষণ কেমন করিয়া উৎপন্ন হয় সে-মালাচনা এখানে করিব না। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বলা যায় যে, তাহার মধ্য অতি নিগূঢ় এবং বাগবৎ, এবং সেইজন্য প্রয়োজন বা অপ্রয়োজনীয় হেতু নির্দেশ করিয়া সেখানে কণ্ঠ হওয়া যায় না।

সম্বোধে বিষয়-বস্তুর অভাব নাই এবং মালাচনা ও বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রায় অসীম ও অনন্ত, তথ্যাদি সকল প্রকারের মালাচনা সাহিত্যে স্থান পায় না, এবং লভ্যের বোঝার ক্ষমতা আনন্দলব্ধে মুগ্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। আত্মকাল প্রায়ই চুই বলের মধ্যে তুলন আন্দোলন দেখা যায়। একদল বলেন, সাহিত্যে প্রধানতঃ সেই জিনিসেরই স্থান, বাহা বেশের ও সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে। কিন্তু আমি ভোর করিয়া বলিতে পারি যে, বড় বড় কবিই হউন না কেন তিনি ‘হুইনাইন’র তোত্র লিখিয়া বশবী হইতে পারিবেন না। কেহ কেহ আবার বলেন যে, বাহা কিছু আছে তাহারই উপর কাব্য লেখা চলে। ওনিরাহি, কোনও কবি কিশা, পটল, আল, লতার উপর কবিতা লিখিতে শুরু করিয়াছেন। আবার একদল তরুণ কবি মাহুয়ের মধ্যে ষা-কিছু মরলা, ষা-কিছু মানি আছে তাহাই কাব্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। মাহুয়ের মানি, মাহুয়ের মনিনতা মাহুয়ে দূর করিতে না পারিলেও মাহুয়কে চাপিয়া রাখিতে হয়, অথচ তাহার আশ্বাসের মধ্যে একটা দস্তকা আছে। সেইজন্য কাব্যে সেই মনিনতার প্রতিচ্ছবি দেখিলে মাহুয় তাহার সেই দস্তকার একটা আশ্বাস পাইয়া নাচিয়া উঠে। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত বলা যায় যে, এ জাতীয় রচনা মাহুয়ের অন্তরকে

চমৎকারিণের ও আশ্বাসের পুশিত করিয়া তুলিতে পারে না।

যে-কোনও বিষয় অবলম্বন করিয়া এবং যে-কোনও তরুণ লব্দ বিস্তার করিয়াই সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়, এ কথা পলার ঘোরে প্রচার করিবার চেষ্টা করা যায়, কিন্তু নিঃশেষে চিরন্তন কালের সাহিত্য ইহার বিরুদ্ধে লক্ষ্য দেয় এবং ক্রমশঃ কাল আপন কৃষ্টি কটাক্ষে এই মনন-সাহিত্যকে ভগ্ন করিয়া দেয়। বিশিষ্ট লব্দ-বিজ্ঞানের ও বিশিষ্ট অর্ণের সূত্রক তরুণের কবি তাহার প্রতিভার বলে অক্ষর সাহিত্য সৃষ্টি করেন; Moralists, Realists বা Idealists তাহাদের নিজেদের আবহিত বর্ণিত বর্ণের দ্বারা তদাহিহা বান। যে-কোনও ঘটনা ঘটে তাহারই স্বাভাবিক বর্ণনা যদি সাহিত্য হইত, তাহা হইলে পুশিত-কোঠের মকদ্দমার বিবরণে সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া হইত। অথচ সেই সমস্ত মকদ্দমার ঘটনার কোনও বিশেষ অংগকে অবলম্বন করিয়া যদি কোনও প্রতিভাবান কবি যথোপযুক্ত লব্দ-বিজ্ঞান ও রচনা-বৈচিত্র্যে চমৎকারিণ প্রকাশ করিতে পারেন তাহা হইলে সে-সাহিত্য হইত যুগান্তকাল পর্য্যন্ত সোকেসে চিত্র হরণ করিবে। সাহিত্যে কৃষ্টিদের কোন স্থান নাই, পলার কোন স্থান নাই—একথা আমি বলি না, কিন্তু তাহাদের স্থান দিতে হইলে চমৎকারিণের গুণমামর পক্ষকে তাহাদিগকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। সমাজের ক্রমপরিবর্তনে ও ক্রমপরিণতিতে ভাষা, ক্রিতি, ভাষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান প্রভৃতির পরিবর্তন ও পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে মাহুয়ের চিত্তকর্মির পরিবর্তন হয়, একথা সত্য এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে চমৎকারিণের নূতন নূতন পদ্ধতি ও পর্য্যায়েরও সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু এই পরিবর্তন কালের স্বাভাবিক গতিতে নিশ্চয় হইয়া থাকে। বড়ই সাহসিক হউন না কেন কোনও তরুণ কবির দল পলার ঘোরে বা পলার ঘোরে সাহিত্যের নূতন লক্ষ্যায় সৃষ্টি করিতে পারেন না। কোনও শব্দ যদি অশাস্ত্রের বা অশুচি হইয়া থাকে, তাহাকে সাহিত্যের মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিবার অধিকার রাখার নিয়ম-শাসনেরও আরম্ভ নহে। ঘোর

করিয়া তাহা চালাইলে সে-মন্দিরে সাহিত্যের চিরন্তন
পূজারী প্রবেশ করিবেন না। সেইজন্যই কৃত্রিম
বলিয়াছেন —

“সাহিত্যমনজো শোভাশালিতাঃ প্রতিকাপাসৌ
অন্যানান্তিরিক্তবমনোহরিণ্যবাসিতিঃ।”

দশ ও মর্ষের বে অনির্বচনীয় শোভার সন্নিধান হয়,
তাহাকে সাহিত্য বলে। শব্দার্থের এই বিচিত্র বহু বা
বিভিন্ন তখনই সম্ভব হয় যখন কবি তাঁহার প্রতিভাবলে
বেশ্যে যে ভাবটী বা শব্দটী ঠিক উপযুক্ত হয় তাহাই
আহরণ করিয়া এবং সমস্ত বাস্তব ও অস্পৃহতা
বর্জন করিয়া তাঁহার রচনাকে মনোহরিত্ব করিয়া
ভুলেন। সেই শব্দার্থের সন্নিধানকেই সাহিত্য
বলে যখন তাহাদের বিভ্রান্তির ফলে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয়
এবং চিত্তের মধ্যে একটা চমৎকারিত্ব উদ্ভূত
হইয়া তাহাকে আনন্দে বিভোর করিয়া দেয়। এই
আনন্দ বিষয়বস্তু-সম্প্রাপ্তের আনন্দ নয় বা শব্দ-সম্বন্ধের
আনন্দ নয় বা অর্থ-সাহায্যের গভীর অনুভব নয়,
কিন্তু এই সমস্ত একত্র হইয়া তাহাদের সাহিত্যে,
সন্নিহিত ফলে, যে চমৎকারিত্ব ও আত্মজ্ঞানের কিরণরাশি
উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাহা একটা বিশিষ্ট পর্য্যায়ের
লক্ষণ। গ্রাম্য শোকের ভোগস্বভাব হর্ষ বা শম-
কছারের কর্ণপরিবৃত্ততায় তাহার প্রমাণ নহে,
তাঁহার প্রমাণ সমস্তই সমস্তের জগতের স্রবীভাবে।
অতএব কেবলমাত্র ভাল-লাগা সাহিত্য সৃষ্টির প্রমাণ
নহে। কাহার ভাল লাগিল এবং কেন ভাল লাগিল,
অর্থাৎ সমস্ত বিচারক সমস্তের ভাল লাগিল কি না
এবং সেই ভাল-লাগাটী শব্দার্থের বিভিন্ন ভাবের সন্নিবেশ-
প্রযুক্ত কি না তাহাই বিচার করিতে হইবে।

অর্থ শব্দের নানা অর্থে ব্যবহার হয়। অর্থ বলিতে
ব্যাক্যার্থ বুঝায়, লক্ষ্যার্থ বুঝায় ও ব্যঙ্গ্যার্থ বুঝায়। নানা
অর্থের সন্নিবেশ ও মিলনে যে তাৎপর্য্যটী প্রকাশ পায়
জগতের তরীতে তরীতে স্রবণ ও স্রজ্বরের বীণা-ধ্বনে
যে লহরের পর লহর খেলিয়া যায় তাহা কোনও

কাব্যার্থের একান্ত বহির্ভূত হইলেও তাহারই মধ্যে
অন্তর্ভুক্ত। সাধারণতঃ শব্দার্থ বলিলে শুধু সেই
অর্থটীকেই বুঝায় বাহ্য সকলের স্রবিসিত। কিন্তু সেই
স্রবিসিত শব্দার্থ-পরম্পরাকে কবি এমন শব্দ করিয়া
এমন বিচিত্র ভাবে সাধায়া ভুলেন যে, তাহাতে
তাঁহার জগতের অভ্যন্তরের অস্পষ্ট গভীর অস্পৃহাটী
অকুলনীয় বর্ণিত্যর ও রূপ-লক্ষণে স্ফুট হইয়া উঠে।
যখন কবি বলেন —

“মমল ধবল পাশে দেপেছে মন্ম মধুর হাওয়া;

যেখি নাই কন্তু যেখি নাই আমি
এমন তবু-বাওয়া।”

আর যখন ইহাই রূপান্তরে বদা বাত, শাদা পাশে বাতাস
লাগছে, এরকম নোকা-বাওয়া যেখি নাই— এই
ছন্দী ব্যাক্যের ব্যাক্যার্থ একরূপ হইলেও কবির ব্যাক্যটী
পড়িলেই জগত বেন আনন্দে ঘোলা দিয়া উঠে। যেন
মনে হয়, জগতের মধ্যে কোথায় কোন্ ঐতলপর্শে
আমাদের জীবন-ভরীটী বহিয়া চলিয়াছে— তাহার
প্রতি স্পন্দনটী বেন ছন্দের তালে তালে কুকের মধ্যে
নাচিয়া উঠে, অদৃষ্ট কাঙারীর মোহন স্পর্শ বেন
জীবনের গতির মধ্যে ল্পট হইয়া উঠে। অনেক ফলে
এমনও ঘটে যেখানে কোনও ব্যঙ্গ্যার্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায়
না, অথচ বেন একটা অস্পষ্ট বেসনা একটা অস্পৃহতার
ছায়াবহল মেঘ বৃষ্টি স্পন্দনে চিত্তকে একটা অনির্বচনীয়
স্পর্শে বেসনাবিস্তার করিয়া দেয়।

“গগনে গরবে মেঘ ঘন বরষা,

ফুলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।

রাশি রাশি তারা তারা ঘান কাটা হ’ল সারা,

ভরা নদী দুরবারা থর-থরবা;

কাটিতে কাটিতে ঘান এল বরষা।”

অথবা যেমন Swinburne—

“Their glowing ghosts of flowers
Draw dawn, draw nigh;

And wings of swift spent hours
Take flight and fly;
She sees by formless glimpse
She hears across cold streams
Dead mouths of many dreams
That sing and sigh."

কবিতাজ্ঞান কোনও জ্ঞানই নয়। অথচ
 শব্দের বিষ-প্রতিবিম্বের দ্বারা যেন একটি জ্ঞানই
 ছায়া চিত্রে ভাসিছে উঠে।

অর্থের মধ্যে বাচ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ দ্বারা আর-একটা স্তোভনাম্বক বা বাক্যনাম্বক অর্থের কথা (যাকে ইংরেজিতে Suggestion বলে) অধিকাংশ সমালোচকই স্বীকার করিয়াছেন এবং এই স্তোভনাম্বক ব্যাপারের ফলে একদিকে যেমন মন আনন্দের বিজ্বল হয়, উক্ত অপরদিকে তেমনি দ্রুত একটা কোনও বিশেষ তাৎপৰ্য্য কোনও গভীর সত্য বা কোনও গভীর অশুভব জাগিয়া উঠে। অনেকেই এই স্তোভনের মধ্যে যে-রসটি স্ফুট পায় তাহাকে কাব্যের প্রাণ বলিয়াছেন। কিন্তু এই রসের পক্ষেই চিত্তভূমিতে ব্যাপ্ত করিয়া দিল্লভূষণের জায় যে একটা ভাবভূমি বা attitude আত্মপ্রকাশ করে, সাহিত্য-শাস্তিতে তাহার স্থান বড় কম নহে। এই ভাবভূমিই যেন স্থানে স্থানে আপনাকে বিস্তৃত করিয়া রসনিম্নবর্ণে পরিণত হয়। উক্ত। অনেক সময় এমন ঘটে যে, কোনও রস বা বস্তু শব্দই হয়। তাহিয়া উক্ত না, শুধু চিত্তের কড়কটা স্থান যেন কবিতার ছায়ায় বিদ্য, হ্রস্বের হয়। উক্ত। সেই যেমনকে রস বলা যায় কিনা জানি না, তাহা অশব্দ অথচ অশব্দভিত্তিক সঙ্গীতগত।

তরুণতাপ্তম শশবাহি নদী সমুদ্র দুধের
 ত্রপাছবিতে মনশবনের মুহু ল্পর্শে পুষ্পদলে কিংবা
 আপন মনের নিভৃত আলোড়নে কবির জ্ঞানধর্মী চিত্ত-
 বৃত্তি যখন তলাইয়া যায় তখন প্রাইটত্বাক স্বজি
 অশ্লষ্ট প্রতিভাসে অজ্ঞাতন্যাক স্রব্বের নিবিড়
 অরঙ্গের পর্যায়ে যে একটী ল্পদনযাত্রা কবিবৃক্ষের

সমগ্র সত্যকে বিকল্পিত করিয়া ভুলে তাহারই মনে কবির চিত্রে সে একটা বিচিত্র ও বিশিষ্ট ভাবভূমি প্রতিফলিত হইয়া উঠে কবিপ্রতিভার বলে এই ভাবভূমি বিচিত্র স্বার্থের বিভ্রান্তে সাক্ষ্যেতঃ রূপকলার দৃষ্টি করে। প্রমুখ শব্দের অর্থ অশ্লীল বা লুপ্ত। তত্তা শব্দের অর্থ সেই সেই বস্তু। প্রমুখতত্তাক স্বতি বলিতে সেই স্বতিকে দৃষ্টি বোঝানে অরূপ আছে অথচ কি অরূপ হইল তাহার বোধ নাই। কবি স্বনন তাহার ব্যাভ্যন্তর নিগা উদার বিরাট মাত্রের দিকে তাকাইয়া থাকেন তখন যদি আরও যে-সকল মাঠ তিনি পূর্বে দেখিয়াছেন তাহা তাহার মনে পড়ে, তবে তাহাকে অরূপ বলা যায়। কিন্তু স্বনন কোনও পরিচিত মাত্রের কথা মনে পড়ে না অথচ পূর্ণাঙ্গভূত একটা অব্যক্ত প্রশস্ততা মনের মধ্যে তাসিয়া উঠে তখন তাহাকে বলা যায় প্রমুখ-তত্তাকস্বতি। এই প্রমুখ-তত্তাকস্বতির পক্ষেই থাকে সন্দ্বাহ। সন্দ্বাহ চিত্রের উপরে তাসিয়া উঠে না, সে থাকে এক পরমা নীচে। এই সন্দ্বাহের মধ্যে ঐ রকম মাঠ দেখিয়া নানা বিচিত্র ব্যবহার নানা বিচিত্র ব্যবহার ভ্রমর-সঙ্গে কোমলালোকে নদীর তীরে নানা ভাবে পূর্ণের বা কিছু আনন্দ অল্পতর হইয়াছিল, তাহা সঞ্চিত হইয়া একত্র শিথীভূত হইয়া স্বতির হৃদিকে অব্যক্তভাবে রসভরিত করিয়া ভুলে। এই প্রমুখ-তত্তাকস্বতি ও সন্দ্বাহের বোধ নাম 'বাদনা'। অর্থ বলিতে শুধু বাচ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ দ্বারা না, তাহাতে একদিকে দৃষ্টির তাৎপর্য্য অপরদিকে দৃষ্টির স্রোতিত বা ইন্দিবোধো বস্তু এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রমুখ-তত্তাক-স্বতি ও সন্দ্বাহের সহযোগে যে বাদনা-ক্ষেত্রটা দৃষ্ট হইয়া উঠে ও তাহার আত্মপ্রকাশে যে রসবিম্ব সঞ্চিত হইতে থাকে তাহাকেও দৃষ্টি। কবির মনের ছবি স্বনন তাহার ভাবভূমির স্পন্দনের সাহায্যে নানা শব্দের ও অর্থের বিচিত্র বিভ্রান্তে সঞ্চিত হইয়া প্রোভার ইঞ্জিরদ্বারা দিয়া তাহার বুদ্ধিমূহিকে সঞ্চিত করিয়া তাহার অন্তর্নিবিষ্ট ভাবভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার ভ্রমরকে ছোতনাশ ও রসে বিচিত্র ও মনোহর করিয়া ভুলে তখনই

তাহার সৃষ্টির অহুত্ব হয় এবং তাহার মন-প্রাণ রসে দিল্প হইয়া উঠে। এই যে কবির মনোভাব, মনের ল্পন, জ্ঞানের গভীর অহুত্ব, প্রসঙ্গ, ছবি বাহ্য তাহার একান্ত আপন্য। একান্ত ব্যক্তিগত, বাহ্য ভাবার বাক্যার্থের দ্বারা একান্ত অপ্রকাশ্য ও অনির্গতীয়, তাহাকে যে তিনি চিরজ্ঞান কালের সঙ্গম-সংবেদ করিয়া তুলিতে পারেন। এই যে একান্ত ব্যক্তিবস্তুকে সঙ্গম সাধারণের গোচরীকৃত করার ব্যাপার ইহাকেই বলে সাধারণীকৃতি বা Universalisation of Art। যে বিশিষ্ট শব্দ ও অর্থবিভাসের কোম্পদে এইটী সম্পন্ন করা যায় তাহার সূচীকৃত কারণকে বলা যায় প্রতিভা।

বিখ্যাত রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলিয়াছেন। মানকবর্ধন ও অভিনব গুণ হইতে আরম্ভ করিয়া রসই কাব্যের প্রাণ এই মত বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইংরাজীতে রসকে অনেক সময় emotion বলা হয়। রস কাতাকে বলে তাহার বিশেষ পর্যালোচনা ও প্রবেশ করিব না। কিন্তু ইহা সহজেই বুঝা যাইবে যে, আনন্দ বা সুখ মাত্রই রস নহে, কিংবা ভয় প্রভৃতি কারণে উৎপন্ন emotion মাত্রই রস নয়। কেহ পূজ্যশোকে কাদিতেছে সেখিয়া যদি কেহ বলে যে, তাহার কল্প রসের উদ্বেগ হইয়াছে, বা কেহ ভীত হইলে যদি কেহ বলে উহার ভয়ানক রসের উদ্বেগ হইয়াছে তাহা হইলে হাস্যাত্মক হইতে হয়। ভৈব প্রয়োজনের বশবর্তী হইয়া যে emotion উদ্ভিত হয়, অর্থাৎ self-preservation বা race-preservation প্রভৃতি জৈব ব্যাপারের ইষ্টানিষ্ট সংঘটনে বা সন্তাবনার যে ভাব বা emotion উদ্ভিত হয় তাহাকে রস বলা যায় না। যদি একজনকে বলা যায় যে, আপন্যের পূর সর্বাঘাতে মরিয়াছে তাহা হইলে তাহার মনে যে শোক উপস্থিত হয় তাহা শব্দার্থের দ্বারা আপাততঃ উৎপন্ন হইলেও তাহাকে কল্প রস বলা যায় না। ইহার প্রথম কারণ এই যে, পূজ্যশোকে যে ভৈব উৎপন্ন হয় তাহা একান্ত ভাবে জৈব প্রয়োজনের সহিত জড়িত। দ্বিতীয়তঃ, ‘আপন্যের পূর মরিয়াছে’ এই বাক্যটির কল্পার ক্রমের কোনও গভীর অনির্গতীয়

অহুত্বকে প্রকাশ করে না। মনের Logical faculty বা উদ্ভাষণোবুদ্ধির দ্বারা যেটাকে পাওয়া যায়, তাহা আমরা সকল সময় ভাবার প্রকাশ করি এবং সেই প্রকাশের দ্বারা চিন্তার আলো-প্রধান হয় কিন্তু সাহিত্যের অতিব্যক্তি হয় না। কবি বলিয়াছেন, ‘জল পড়ে, পাতা নড়ে’—এইখানে হইতেই সাহিত্যের আরম্ভ, কিন্তু সৃষ্টি পড়িতেছে বা এই কৃষকের পাতা নড়িতেছে ইত্যাদি সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে ইহা বলা যায় না। ইহার কারণ কেবলমাত্র একটাতে স্থল আছে অপরটাতে নাই, তাহাই নহে। ‘জল পড়ে, পাতা নড়ে’ এই বাক্যটি, শব্দের বিভাসে ও ছন্দে, সৃষ্টির সময়ের প্রাকৃতিক ব্যাপারের একটা অহুত্বকে বিস্তৃত করিয়া প্রকাশ করিয়াছে। সে অহুত্বটীয়া জল পড়া ও পাতা নড়া অপেক্ষা অনেক অধিক। শুধু প্রাকৃতিক ব্যাপারের বর্ণনাকে সাহিত্য সৃষ্টি এইকল্পই বলা যায় না যে, সেখানে কোনও অপ্রকাশ্য গভীর অহুত্বকে প্রকাশ করা হয় না। ‘জল পড়ে, পাতা নড়ে’ এখানে যে অহুত্বটী প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কোনও ভাবের গভীরতা নাই, কোনও দূর ব্যঙ্গনা নাই। সেজন্য ইহা কোনও মহত্ব লাভ করিতে পারে নাই। শুধু ছন্দে সাহায্যে, শব্দের বিভাসে, প্রাকৃতিক ব্যাপারের একটি অতি ক্ষুদ্র অহুত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু সেটী যদি কেবলমাত্র পাতা নড়া এবং জল পড়া হইত তাহা হইলে এখানে সাহিত্যের যুগ্মও পাওয়া হইত না। শব্দের বিভাসে, রচনার বিভাসে, ছন্দে, কল্পারে, ছবিত্তে, ভাবগর্ভে, ইন্দ্রিতে, সাধারণীকরণে, অহুত্বিত্তে, রসের উচ্ছ্বাসে, বাহ্য বস্তু প্রচুর সন্তোষ-ভূক্তি হইয়া উঠে তাহাকে সেই পরিমাণেই সাহিত্যের উৎকর্ষ সৃষ্টি হইল বলিয়া বলা যায়। সাহিত্যের মধ্যে যদি প্রকাশের কোনও বিশেষ কৌশল বা সৃষ্ট-নৈপুণ্য থাকে তবে তাহা কেবলমাত্র Logical judgment বা প্রতিজ্ঞার মধ্যে পাওয়া যায় না। এই ফুলটী দাল, কি এই ফুলটী দাল নয়, কি সকল মাছই মরে, রাম মাছই, অতএব রাম মরিবে—এখানে Logical judgment-এর

যারা একটা অর্থ বা অর্থ-পরম্পরা প্রকাশিত হইয়াছে, অথচ সাহিত্য হয় নাই। ভাষা প্রয়োগের দ্বারা মনের ভাব প্রকাশের কৌশল আছে, কিন্তু সেটা Logical art বা উত্তাপোচের কৌশল, সাহিত্যের কৌশল নহে। একটু না একটু পরিমাণে যদি চিত্তপ্রকাশ্য অন্তরের দরদ বা অহুত্বভিত্তি প্রকাশ না করা যায় তবে সেটা সাহিত্য হয় না।

অন্তরের ভাবভূমির অহুত্বভিত্তিক সাধারণ বাক্যের বিস্তার প্রকাশ করা যায় না। সেই প্রকাশে স্বভাব কৌশলের প্রয়োজন। সেই কৌশলটি কাব্যের কৌশল। ক্রৌঞ্চীর বিরোধে ক্রৌঞ্চের শোক সেখিয়া কবিচিত্তের দরদটুকু রামায়ণের স্নোক হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই দরদের ভাবভূমিটা যদি স্বাভাবিক না হইত তবে কেবলমাত্র রামায়ণের গম্ভীর কাব্য হইত না। লক্ষ্যার্থের বিস্তারিত কোনও ঘটনার বর্ণনা করা যায়, এবং সেই ঘটনা গুলিয়া যের প্রয়োজনের ভূমি অহুত্বের হর্ষ বা হৃৎস্বের উৎপত্তি হইতে পারে, কিন্তু সেই হর্ষ ও হৃৎস্বের উৎপত্তির ক্ষুদ্র সেই ঘটনার বর্ণনাটিকে কাব্য বলা চলে না। সেইজন্য যদি কোনও কুৎসিত বর্ণনা গুলিয়া কাহারও মনে কুৎসিত ভাবের উদয় হইয়া তাহার মনে ইন্দ্রিয়স্বপ্নের আশ্বাদ আসিয়া উঠে তবে তাহাকে সাহিত্য বলা যায় না। কেবলমাত্র লক্ষ্যার্থের বিভিন্ন বিস্তারিত কৌশলে যেখানে কোনও non-logical অহুত্বভিত্তি বা দরদ ফুটিয়া উঠে লক্ষ্যার্থ-সম্বন্ধনের সেই জাতীয় কৌশলকেই সাহিত্য বলে।

রস না হইলে সাহিত্য হয় না, এবং রসই সাহিত্য-স্বস্তির একমাত্র মাগকাটি এই মতটি শোক-সমাধে একজন নির্জীবোথে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। রস অর্থে যদি কেবলমাত্র আনন্দ বা আশ্বাদ বুঝায় এবং তাহা ছাড়া যদি সাহিত্যের অন্য কোনও মাগকাটি না থাকে তবে রসের বৈশিষ্ট্যের উপরেই বা রসবোধের প্রতীতির বিলম্ব বা অস্পষ্টতা নিবন্ধনেই কাব্যের ভাল-মন্দের পরিচয়। কারণ, রস যদি কেবল emotion বা ভাবমাত্র হয় তবে তাহার মধ্যে অন্য

কোনরূপ ব্যতিরেক কারণ আসিতে পারে না। একটা স্রবের সঙ্গে অন্য স্রবের ভারতম্য কেবলমাত্র বাতলা বা মনভার উপরেই নির্ভর করে। কারণ, স্রবের মধ্যে কোনও প্রতীকবিভাগ চলে না। প্রতীকবিভাগ করিতে গেলেই সেই উচ্চনীচ বিভাগের কোনও স্বতন্ত্র কারণ নির্দেশ করিতে হয়। একটা স্রবের গতিতে অন্য স্রবের কেবলমাত্র কম বেশির বা স্বপ্নহাসিধ দীর্ঘতায়নের পার্থক্য মাত্রই স্বীকার করা যায়, একটা স্রবের গতিতে অন্য স্রবের কোন প্রতীকিত উচ্চনীচতা নাই। অতএব স্রবের মধ্যে এই প্রতীকিত উচ্চনীচতার পার্থক্য এতই অহুত্ববসিদ্ধ যে, দুইটা বিভিন্ন প্রতীকিত স্রবের মধ্যে অনেক দূরত্বই বৈশিষ্ট্য কবির ভারতম্য নির্ণয় করা যায় না। দার্শনিক চিন্তার আনন্দ এবং তালবোলের আনন্দ এতই বিভিন্ন জাতীয় যে, ইঙ্গানের মধ্যে বৈশিষ্ট্যকর্মের তুলনা করা চলে না। ইচ্ছা সত্য যে, এই দুই জাতীয় আনন্দই আমাদের চিত্তের বিভিন্ন ভাষাকে বিভিন্নরূপে আকর্ষণ করে এবং যে দিকটা যখন অহুত্ব হয় আমরা সেই দিকেই আমাদের ছাড়িয়া দিই। কিন্তু তথাপি একথা স্বীকার করিতে হয় যে, দার্শনিক চিন্তার আনন্দ বা সম্ভব-স্বপ্নের আনন্দ তালবোলা বা নিমন্ত্রণ খাওয়ার আনন্দ অপেক্ষা উঁচুতর।

ইথরিক ethica & hedonism (স্ববাস) এর আলোচনার গ্রীক Cyrenaics হইতে আরম্ভ করিয়া Mill-এর হিতবাদ পর্যন্ত স্ববাসের বৈশিষ্ট্যগতি বোঝা যায় তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কেবল স্রবের অহুত্বের দ্বারা স্ববাসেও পাওয়া যায় না। স্রবের মধ্যে স্রবের প্রতীকিত বিভাগ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই, এবং এই প্রতীকবিভাগ নির্ণয় তাহাদের উত্তরবিধি স্রবেরই জ্ঞান আছে তাহাদের বাক্যই প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। প্রত্যেক ভাল-লাগার সঙ্গে-সঙ্গে মনে প্রশ্ন হয় যে, সেই ভাল-লাগাটা ভাল কি না সকল স্ববাসের সঙ্গে-সঙ্গেই সেই স্ববাস কি উঁচুতর না নীচুতর তার একটা অস্পষ্ট বোধ থাকে, তুলনা করিতে গেলেই তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে। সাহিত্য

রসের মধ্যেও আনন্দ-রসের একটা উৎকর্ষাপকর্ষের
 বোধ আছে। একটা হাসির কবিতা পড়ি। আমরা
 যখন হাসি পড়ায় পড়ি, আর রবীন্দ্রনাথের
 'শীতালসি' বা 'মহা' পড়ি। যখন অল্পরক মিষ্ট
 করিয়া তুলি, রসের পরিণতির দিক্ দিয়া প্রচুরতার
 বিচার করিতে গেলে হাসির কবিতাতেই রসের
 আধিক্যের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু অল্পরকের মিষ্টতা
 ও পরিব্রজ্যতার দিক্ দিয়া সেখানে 'শীতালসি' বা
 'মহা'র কবিতার সহিত তাহার কোনও তুলনা হয় না।
 বাক্যবিজ্ঞানে, ছবি, ছন্দ, অঙ্কন, অর্থের তাৎপর্য
 সোভনার দিক্ দিয়া একটা কবিতার কাব্যরসের
 সহিত অল্প একটা কবিতার কাব্যরসের অনেক বৈষম্য
 থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা ছাড়াও কোন কবিতার
 রসটি ক্ষম্যের কোন স্তরের নির্ভর হইতে করিয়া পড়িল,
 তাহার উপরে সেই রসের উচ্চতা বা নীচতা অন্ততঃ
 খানিকটা নির্ভর করে; অর্থাৎ যে জাতীয় ভাবকে
 আমরা বড় বলি, উঁচু বলি, সেগুলিকে আমরা সমস্ত
 প্রাপের সহিত ভ্রষ্টা ও সম্মান করি, যখন সেই
 ভাবগুলি রসপূর্ণ হইয়া শব্দার্থের সাহিত্যে অল্পরপনে,
 অনিভে, ভোক্তব্য আমায়ের চিত্রকে ব্যাণ্ড করিয়া
 তুলে, তখন তাহাকে আমরা শ্রেষ্ঠ না বলিয়া
 থাকিতে পারি না। নিহত্ কারিক আকর্ষণ সঙ্গারে
 আছে এবং তাহার বর্ণনাতেও হ্রত কোন জাতীয়
 রস কোনও কোনসী দীর্ঘী সৃষ্টি করিতে পারেন,
 কিন্তু সে জাতীয় স্রিয় কবিতার সহিত 'মহা'র
 "পথবর্তী" কবিতার আত্মহারা প্রেমের কোনও তুলনা
 হয় না—

‘দূর যথিবে সিদ্ধকিনারে

পথে চলিয়াছ তুমি,

আমি তব মোর হারা গিয়ে তারে

বৃত্তিকা তার চুমি’।

হে তীর্থগামী, তব সাধনার

অংশ কিছু বা রহিল আমার,

পপশাশে আমি তব দাড়ারে

রতিব সাক্ষীকণে।

ভোলাও পুত্রাও মোর কিছু দায়

ফুলের পদ-ধ্বজে।

তব আশ্বাসনে বরণ করিয়া

নির্ভেদে ভগ্নমেয়ে।

জাতি কিছু বা নিলাম হরিণা

মোর অকল ঘিরে।

যা ছিল কতোর, বাচা নিতর

তার মধ্যে কিছু মিলাই মধুর,

যা ছিল অজানা, বাচা ছিল দূর

আমি তারি মাঝে থেকে।

দিশু পথ তারে ভ্রাম অন্ধরে

ভানার চিল এঁকে।

বেশ। চলে বাবে, একলা যখন

ফুরাবে বাতাস তব

শেষ হবে হবে মোর প্রয়োজন

খেঁচাই গাঁড়ারে রব।

এই পথখানি হবে মোর প্রিয়,

এই হবে মোর চির ববনীয়,

তোমারি অরণে ব’ব অরণীয়,

না মানিব পরাভব।

তব উদ্দেশে অর্পিব হেলে

যা-কিছু আমার সব ন’

রস-বিচারের সহিত, ভাল-লাগার বিচারের সহিত

এই যে আর-একটি অব্যক্তের ভাল-অর্থ ইঙ্গিত আদি।

ভাল-লাগা বদ-লাগার মধ্যে একটা জাতি-বিভাগ

আনিয়া দেব ইহার কারণ কি, সে বিচার এ-প্রবন্ধে

আমি করিব না; কিন্তু ইহা যে অস্বীকার করা যায় না

সেইকুর দিকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

এই যে ‘অর্থবোধ’ (Value-sense) ইহা একবারে

চিরন্তন জায়ে অবিকারী না। ওইলেও মোটামুটিভাবে ইহার বাণী একত্রণ অবিকৃতই থাকে। মনোবঙ্গদের ও মানব-বৃত্তাবের পটীর পরিবর্তন না। ওইলে এট অমৃত্যুতির বড় একটা পরিবর্তন হয় না। সকল রসাদ্বাদের লিখনে সর্বদা সাক্ষীরূপে থাকিত। সেই রসের চরিত্রলব্ধকে 'Thus far and no further' এই মর্বাদার কবি টানিতা নেয়।

মাছুষের মধ্যে উচ্চনীচের এট যে একটা পাণ্ড বোধ (Value-sense) বহিষ্ঠাছে, ইতা কেনমন করিতা উৎপন্ন হয়, কি মাছুষের অজ্ঞাত বৃত্তির সত্তিত ইতার সম্পর্ক কি, রাষ্ট্র, সমাজ প্রভৃতির বা দেশ, কালের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে ইতার পরিবর্তন হয় কি না এ সমস্ত আলোচনা করিবার এ স্থান নহে। পূর্বেই বসিতাছি, সাহিত্যের উদ্দেশ্য কোনও বস্তু বা নীতি প্রচার নহ, সেইজন্য রসের এই অর্হবানর্হব (Value-sense) বোধের কথাই কেহ সেন এ কথা মনে না করেন যে নীতি প্রচারে বা সেই প্রচেষ্টার মধ্যে সাহিত্য-রসের উচ্চনীচের পরিচয়।

রূপরসাদির বোধ হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞান, বুদ্ধি, ইচ্ছা, রাগ, ঘে, শ্রীতি, অশ্রীতি, মত, প্রবৃত্তি, স্বতি, সঙ্কর প্রভৃতি লইয়া যে অথও অমৃত্যুতিপুরুষটী পড়িয়া উঠেন তাহারই রসবস্তুর আশ-প্রকাশে সাহিত্যের দৃষ্টি। সাহিত্য-দৃষ্টির উপকরণে যেমন দৃশ্য ও অর্ধের সাহিত্য প্রয়োজন তেমনি তাহার উপাদান কাহণ হইতেছে মাছুষের আভ্যন্তরীণ জীবনে জৈব মজৈব সর্ববিধ উপলব্ধির (Experience) অথও সাহিত্য বা সন্নিদানে নিশ্চিত অমৃত্যুতিপুরুষটী (Personality)। বখন কোনও একটী বস্তু উপলব্ধি এই সমগ্র অমৃত্যুতি-পুরুষকে আলোড়িত করিয়া। তুমিরা সেই সমগ্রের রূপলক্ষ্যারে রূপাধিত হইয়া ভাষার আশ-প্রকাশ করে তখনই তাহা সাহিত্য হয়। এই অমৃত্যুতিপুরুষটী কেবলমাত্র বুদ্ধি-পুরুষের (Conscious-person) নাপালের বাহিরে। সেইজন্য ওখু বুদ্ধির দ্বারা আলোচনা করিয়া অর্ধের দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা কোনও

জিনিস বৃদ্ধাইলে তাহাকে সাহিত্য বলে না। অমৃত্যুতি-পুরুষটির যে দ্বারা, বেদনা, বেগ বুদ্ধি-পুরুষটির মধ্যে প্রতিকলিত হয় তাহাই প্রধানতঃ সেই অমৃত্যুতি-পুরুষটির অজ্ঞাত স্বত্তিতে বখন লসার্কের মধ্যে বিদ্যুত হয় তখনই সেই হয় সাহিত্য। এখানে বুদ্ধি-পুরুষটী বহুমাত্র, অমৃত্যুতি-পুরুষটী বহী —

“একি কৌতুক নিভা নূতন,
ওগো কৌতুকময়ী,
মামি বাচা কিছু বলিবারে চাই
বলিতে দিতেছ কই ?
অন্তরমাঝে বসি' অন্তরঃ
তুখ চ'তে তুমি ভাষা কাড়ি' লত,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কর
মিশারে আপন করে।
কি বলিতে চাই সব ভুলে বাই,
তুমি যা বলাও মামি বলি তাই।
সকীত-স্নোতে কুন নাতি পাই—
কোথা ভেসে বাই ঘুরে।

এবে সকীত কোথা চ'তে উঠে,
এবে লাবণ্য কোথা হ'তে ছুটে,
এথে ক্রন্দন কোথা হ'তে টুটে
অন্তর-বিদ্যারণ !
নূতন ছন্দ অন্ধের প্রাণ
ভরা আনন্দে ছুটে চ'লে যায়,
নূতন বেদনা কেমে উঠে যায়
নূতন রাসিধি-ভরে।”

এই অমৃত্যুতি-পুরুষের স্বরূপ ভাষার বর্ণনা করা যা না। কিন্তু কবি যদি অন্তরের অন্তঃপুরের মধ্যে যা বাড়ান তবে এই অন্তঃপুরের লক্ষ্য অমৃত্যুতি-পুরুষের পারেন। স্বপ্ন-দৃশ্য, ইচ্ছা, ঘে, প্রবৃত্তি এবং নানাবি ভাবনিচয় যেমন ইতার উপাদান তেমনি একটী পাণ্ড অর্হবানর্হব বোধও (Value-sense) ইহার উপাদান

সেইমত এই অমূল্য-পুস্তকটির প্রত্যেক অভিযন্তার সঙ্গে-সঙ্গে এই বোধটা ছাড়া সত্যকে আপনাকে প্রকাশ করে। 'স্বাস্থ্য-উপাদানের সাহিত্যে' পরিভূত একটি অমূল্য-পুস্তক যখন কোনও উপলব্ধিকে প্রকাশ করিবার হলে সেই উপলব্ধিটির মধ্য দিয়া আপনাকে প্রতিবিম্বিত করিয়া অপর একটি অমূল্য-পুস্তকের নিকট আপনাকে প্রকাশ করে, তখন এই উত্তরের পরিচয়ে যে মানবরস উদ্ভল হইয়া উঠে তাহাই সাহিত্যরস। সেজন্য কবির কাব্যে তাহার অমূল্য-পুস্তকটির নানা উপাদান 'যে বিভিন্ন ভাবে মিশ্রিত হইয়া থাকে পাঠকের অমূল্য-পুস্তকটির মধ্যেও সেই স্বাভাবিক তাৎপর্য সঞ্চারিত হইয়া উঠে। এই হিসাবে সাহিত্য একদিকে যেমন শব্দ ও অর্থের জালপথা অপর দিকে তেমনি স্বাস্থ্য-উপাদানের সাহিত্য স্বরূপ অমূল্য-পুস্তকের আশ্ব-প্রকাশ ও মজা অমূল্য-পুস্তকের সহিত আশ্ব-পরিচয়। সাহিত্যের দ্বারা চাইট অমূল্য-পুস্তকের পরিচয়ে মানব-রসের উৎপত্তি হয়, কিন্তু তাই বলিয়া মানব-রসকেই সাহিত্যের স্বরূপ বলা যায় না; ইহা কেবল মাত্র সাহিত্যের 'স্বাভাবিকতা'র উদ্ভবস্থান মর্মে

সাহিত্যের দৃষ্টি মারাই রসের দৃষ্টি হয়, 'কিন্তু সাহিত্যের স্বরূপ তাহা নহে। সাহিত্যের স্বরূপ অমূল্য-পুস্তকের আশ্ব-প্রকাশ ও আশ্ব-পরিচয়। সেইমত এই আশ্ব-প্রকাশের বৈচিত্র্যে রসের জাতিগত বৈচিত্র্য ও আবাসগত বৈচিত্র্যের উৎপত্তি হয় ও তন্মুখিত রসের নানাবিধ তারতম্য অমূল্য হয়। রসের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সাহিত্যের প্রভেদ তেমন দেখা যায় না যেমন দেখা যায় রসের বৈচিত্র্যে। বিভিন্ন কাব্য-রসের সহিত অমূল্য-পুস্তকের বিভিন্ন স্বভাব বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হইয়া অমূল্য-পুস্তকের বিভিন্ন রকম আশ্ব-প্রকাশ ও পরিচয় সম্পাদন করে। বাহিরের দিক দিয়া স্বার্থের সাহিত্যকে সাহিত্য বলিয়াছি, অর্থের দিক দিয়া তেমনি সাহিত্য বলিতে কবি ও লেখকের সম্মিলনকেই সাহিত্য বলিতে হয়।

“অমূল্য বদ্বন্দ্ব প্রযুক্তি বিনা কারণ-কলাং
অনুভবপ্রথাং নিম্নসত্ত্বাং সারগতি চ।
ক্রমাৎ প্রয়োণাখ্যাং-প্রসন্ন-সুত্বাং ভাসগতি ত্বং
সরস্বতাত্ত্বক কবিসত্ত্বাখ্যাং বিম্বত্যাং।”

(অভিনব গুপ্ত)

“কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে। কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যের সেই উদ্দেশ্য; কাব্যের পৌন উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিন্তাৎকর্ষণে, চিত্তচর্চা-মনন। কবিতা মননের শিক্ষাধাতা, কিন্তু নীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাহার শিক্ষা যেন না। কথাম্বলেও শিক্ষা যেন না। তাহার মৌল্যের চরমোৎকর্ষ মননের দ্বারা মননের চিত্তচর্চা-বিধান করেন। এই মৌল্যের চরমোৎকর্ষের দৃষ্টিই কাব্যের দৃষ্টি উদ্দেশ্য।”

— বঙ্কিমচন্দ্র

অভিমান

শ্রীআশালতা দেবী

“সতীশ, তোমার মত বড় আর কিরণের কে আছে বলে! তুমি কি ওর তারের মত চ’রে এই কাণ্টটুকু ক’রে থেবে না?”

ভবানীপুর অঞ্চলের একটি ছোট চুল্লির বাড়ীর একতলার ব’সে নীরদাহুঙ্করী একটা হাস ফেলেন প্রশংসার পর পর ক’রে সেলেন।

চৈত্রমাসের বিকেলবেলা। সামনে ফলের বুড়ি রয়েছে, পাথরের বাটিতে ক’রে তিনি বেদের সরবং তৈরী করছেন। আগেলের শুদ্ধ-ডিম্বাইন-করা বড় কাচের প্লেটে সুগন্ধি বরফ সংযুক্ত দলিত বর্ণজ্বা। এ তাঁর ছেলের বৈকালী। এখনো সে কলেক থেকে লেকচার দিয়ে ফেরেন। ইতিমধ্যে আপন অস্ত্রের একটা ঘোশন অভিলাষ সতীশের কাছে তাকে এতগুলি প্রশ্ন করিয়ে ছাড়ল। ফলের খোসা ছাড়তে ব্যস্ত ওর আঙুলগুলির দিকে তাকিয়ে সতীশ বলল, “বেশ তো, মাসীমা! আপনাকে এত ক’রে বলতে হবে কেন? আমার যা সাধা নিশ্চয়ই করব।”

আগেকার কথাটা চরিত্র শোন। দরকার। কিন্তু পূর্ব সাধারণ কথা। বা নিরানকই পার্সেন্ট স্কোরে আত্মকাল ষ্টে থাকে। আত্মকালকার ছেলেরা যে কলামাত্রই বিয়ে করতে চায় না, তা কে না জানে? কিরণের বেদান্তেও তাই হয়েছিল। কিরণের কোনো অভাব নেই। তার শৈল্পিক বাড়ী এবং ব্যাচ হয়েই টাকা রয়েছে। তার উপরে সে একটা ভাল কলেজে লেকচারার হ’রে চুকেছে। মনে একটা উচ্চ আশা ছিল, বিলেত থেকে একটা ভালমত ডিগ্রী আনবে। কিন্তু বাড়ীতে বিধবা মা সে খবর শুনে একান্ত ক্রোধ রসের বৈকল্য ছোটালেন তাকে বিপর্যস্ত করতে সেই

গণ্ডে, তবুও তার তাঁর একেবারে খুচল না। তারটা একেবারে নিশ্চিত ক’রে বোচাতে এখন তিনি যা নিয়ে লেগেছেন, সেটা কিরণের বিয়ে। অবশ্য বিয়ে করতে কিরণের তেমন যোরালা আপত্তি কিছুই ছিল না। তবু বিয়ে না-করাটা, আগন্তের আমেজের মত, ষ্টিকালে লেপের তাঁজের মত এমন আরামের সঙ্গে ওর মজাপত চ’রে গাড়িয়েছে যে, এই অভ্যাসটাকে ভাঙতে তার ইচ্ছে হচ্ছে না। ওর সকলের চেয়ে বড় খেয়াল এই যে, বিয়ে করার উপায় রয়েছে, এখন পুতী করতে পারি অথচ এখনো চুকিয়ে দিয়ে ক’রে ফেলিনি—এটার ভিতরে একটা ষ্টেং উত্তেজক আনন্দ রয়েছে। যেমন ড্রয়ারে একটা পুত খামের চিঠি রয়েছে, তা এখন পুতী বের ক’রে পড়তে পারি অথচ করব-করব ক’রে, বার করা হ’তে উঠছে না, কৌতুহলটা উত্তরোত্তর বদমা হ’তে থাকল। এ আপত্তি তত যোরালা আপত্তি না। ও যদি বলত, আমি রামকৃষ্ণ মিশনে ভর্তি হ’ব, বা বদর প’রে সিভিলিয়ান স্পীচ দিয়ে ছেলে দাব— তাহ’লে অবিশিষ্ট ওর মায়ের অজবাব্য করার সার্বভূতা ছিল। কিন্তু বাঙ্গালী মেয়েরা কখনও বক্তা। তারা প্রকৃত হ’রেই আছে, একই যোগ্য পেলেই অথোরে ক’রে পড়বে। অতএব কিরণের এই সৌখিন আপত্তিও ওর মায়ের কাছে পাহাড়ের মত ঠেকল এবং তাতে ঠেকে ওর মনের অনেকখানি কলপ মেঘ এখন-তখন এক পম্পা বর্ণন করতে লুক করল। এখন সতীশকে নিভতে পেয়ে তিনি যা বললেন তার মোট কথাটা এই যে — আপাততঃ একটি মূল্যবান মেয়ের সন্ধান তাঁর হাতে আছে। আত্ম তাকে দেখতে যাবার কথা, কিন্তু কিরণ যেতে চাইছে না কিছুতেই। সতীশ যদি কিরণকে কোনো মতে রাবী করিয়ে দেখাতে নিয়ে যেতে পারে—কতাপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে, না

যেলে কি লজ্জার কথা! মেয়েটির রূপ আছে, একবার চারি চকুর মিলন হ'লেই বোধ হয় সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

সতীশ এসেছিল কিরণের কাছে একখানা বই ধার নিতে। কিরণ বাংলা বই কিনে থাকে এবং তার চেয়েও যা বেশি কথা, বাংলা বই পড়ে। সতীশ একটু আসে এসে পড়েছে, কিরণের কলমে থেকে আসার সময় প্রায় ত'রে এসেছে, কিন্তু এখনো আসেনি। মাকখানে নীতলাহুতীর এলাকার আটক প'ড়ে এই সময় বিশপ। বা'রোক ঠেকে খুব ভরসা সেওটা পোছের একটা কথা বলে সতীশ চট ক'রে স'রে পড়ল। কিরণের ঘরে ঢুকে পাখাটা খুলে দিল।

আম খন্টা যানেক পরে, কিরণের সঙ্গে ব'লে সববতে চুক নিতে নিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সতীশের মনে পড়ল; ব'ল্‌ল, 'চলই না দেখে আসা যাক। বাংলা-দেশে ক'নে দেখতে যাওয়া তো একটা সোজা কাজ, যা কিনা একটা পান খেয়ে স্কোয়ার চাইতেও সোজা।' কিরণের কুঁড়েমি আদর্শ ছিল। তবুও উঠে লাঙ্গলোয় ক'রে বেল্লা। একজন যদি ওকে কিছু বলে, পারত পক্ষে সেটা না-পোন। ওর পক্ষে অসম্ভব—চলুসজ্জা নামে একটি ছোট উপসর্গ যার মূলে রয়েছে।

কিরণ সারাটা পথ একটা নতুন পড়া বইএর কথা উত্তেজিত হ'রে আলোচনা করতে করতে এসেছে। সে যে ক'নে দেখতে যাবে, এমন কথা তার মরণেও ছিল না; যেন দায়ে প'ড়ে একটা বাঘে কিছ দেখতে যাবে। রাজিতে বড় মশা সেপেছিল ব'লে ভালো দেখে একটা মশারি কিনতে বেরিয়েছে। কোনো অশ্লিষ্টতাকে হ'চোখ মেলে দেখে, এবং চরম তাকে সজ্জাবিতা পরিচিত্যার পদের চেয়েও বেশি পদমর্যাদা একদিন সেবে এটা মনে হওয়ার যে-উত্তেজনা, যে-বঙ্গদেশবাসীর হৃদ-হৃদ্য ভাব, তা কিরণের মনের অঙ্গি-পঙ্গি পু'জলেও পাওয়া যেত না। সব সোফটাই বা কিরণের আলসে যতাবের বা ওর শিখিল অমনোযোগিতার উপরে কি ক'রে দ্বিই? বাংলা দেশের ক'নে দেখা কথাটাই এখন থাক, মাহ, আলু কেনার মত হয়ে পড়েছে। বেন

এই কথাটা মনে হওয়া মাত্রই কারও মনে ভোয়ার উঠবে না।

একবারে প্রামভাকারে, বাড়ীটার দোর-পোড়ায় এসে প'ড়ে কিরণের চমক ভাঙ্গল, তাইত কি বিস্তী ব্যাপারের মধ্যে দিয়েই না তাকে এখন যেতে হবে। যাক, পালা-ক্রমে সমস্ত বস্তু ঠিকঠাক হ'ল এবং পক্ষমাতের শেষ বৃহত্তে পানের ভপোর ডিবে চাতে ক'রে আবির্ভাব হ'লেন মাহাশেবী। কিরণ ভাবল, কি সঙ্গতিজ্ঞানের অভাব! আচ্ছা ধরা যাক মেয়েটা কিছু একটা উপলক্ষের আড়ালে আসবেই। আমাকে দেখবে, ভাল ক'রে হ'চোখ দিয়ে তাকিয়ে দেখবে, এত বড় শাসা সজ্জাটা মনে মনে বড় বেশি ক'রে জানলেও মুখে স্বীকার করতে বাধে। তাই আমি এগুন তোমাকে দেখতে নয়, না হয় পান-ই নিতে। কিন্তু একটা ভাল সিগ্রেটের কেসে ক'রে পানের বসলে, পূর্ব দায়ী সিগ্রেটও তো সোটাফকত আনতে পারত। এটা কি এরা জানে না যে, এ মুখে পান খেতে ক'টা ফেলোই বা পছন্দ করে?

মেয়েটি সভ্যই মূলদ্বী। কিন্তু কিরণের তা মনে হ'ল না, ওর কচি পুঁত খুঁত করতে লাগল এ আর এমন কি! ওর মনে অবিস্মিত নদীর স্রোতের মত নারী-রূপের যে একটি অংশ অংশ পরিবর্তনশীল প্রবাহমান আদর্শ ছিল তাকে একেবারে খামিরে দিয়ে, একটা ভাড়া পাথরের মত স্রোতের মুখে বেশ ক'রে ধাঁধা ধাঁধে,—এত রূপ কি এ মেয়েটির আছে? পানের পানে আর-একটা ভিল হ'লে বেন ভাল হ'ত। ট্রোটটা বড় বেশি পাতলা। পানের রঙ সোলাপী বটে, কিন্তু মাহাশেবী নয়, হুত আরও কিছু আনুর এবং বেদানার রস খাওয়ালে হ'তেও পারে, কিন্তু, উপস্থিত তো নয়। কিরণ খুব হাসল, দিগারেট খেল হ'চোরটে, কাসোপদোপী আসর-সাজান সোজের কথা-বাণী বলল, মোট কথা ও যে বর একথা ওর ব্যবহারে প্রকাশ পেল না। কারও মেয়েটি তার মনে ধল না। কিন্তু সতীশের আচরণ এর বিপরীত। সে এই মেয়েকে

নিজের ক'নে ব'লে দেখতে আসেনি; এসেছে বড় চ'রে। সে একে নৃতন দৃষ্টিতে দেখছিল। মেয়েটির সলজ্জ মুখের কোমারো; ওর চোখে যোর লাগল। গোপলির আলোয় কিরণ বহন ছিবে বুলে একটা পাণ খাওয়া যায় কিনা। তাম্বল, তখন সতীশ আপন অভিভূত চোখের অপলক দৃষ্টি দিয়ে এই মেয়েটির বাদিকের সিঁদিতে যে আরক্ত আভা এসে পড়েছে ওদিকের খোলা জানালাটা দিয়ে, তাকে যেন বড় সরসে ছুঁয়ে গেল।

পলে আসতে আসতে কিরণ বহন অম্ল প্রকার আদকের সন্ধ্যাপানের হাতকর ব্যাপারগুলো রঙ চড়িয়ে বলাবলি ক'রে হৃদির স্রোতে ভেসে যেতে চাইল, সতীশ তাকে আমল দিল না। সে গভীর হ'য়ে কতদূর আকাশের—গতি, চৌরঙ্গীর বড় বড় বাতীগুলোর খেঁশাখেনির মাঝে আকাশকে কত দূরেই না মনে হয়—তারার দিকে চেয়ে বইল। যেন ওয়ালফার্ডের এমন পুস্তক পড়ছিল বাসের বোতলার চ'ড়ে ঝাঁকুনি খাওয়াটা, বা চারিদিকের বেকে ব'লে কত রকমই না মানুষের বিবিধ বাজে সব শোনাটা একটা নেহায়েই অব্যক্ত ভিনিস। কিরণ ভেবে গেল না, সতীশের আশ হ'ল কি! খেবে সতীশ বাতী ফিরে যাওয়ার আগে, বেজ্ঞ সে এসেছিল, সেই বইখানা নিতে ফুলে গেল।

ছুটতে কিরণ মাকে নিয়ে বরাবরই কোথাও যায়। এবারেও তারা কলকাতার থাকল না, বেগমর গেল। ইতিমধ্যে মায়াদেবীর অভিভাবকবর্ণ কিরণের আশা ছেড়েছেন, অথচ অভাবিত্রলে আর একটা প্রত্যাশা এসে জুটেছে। সতীশ সন্ধ্যাপার নয়। কিরণের চেয়ে হ'চার নবর কম গেলও সেও প্রথম প্রেমীর পাস মার্ক রাখে। সে অনেকটা অবাচিত হ'য়েই এঁদেরকে আপন অভিপ্রায় জানিয়েছে। সতীশের আবার সাধারণ পদ্ধতির

পরেও কিছু পারিবারিক পাতির মতুশালন ছিল, যেমন বৈশাখ মাসে এঁদের পরিবারে কোনো বিবাহের ফল অমঙ্গল হওয়ায় বৈশাখ মাসে বিয়ে হয় না, জ্যৈষ্ঠ মাসে বড় ছেলের বিয়ের বাধা। হাঙ্ক যত বাধাই আত্মক, সতীশ মনে জানে ওর আশার আগে। একদিন স্ত্রীতরিক লয়ের দৃশ দেখবেই। সেই মেয়েটির সাথেই বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেল। এমন কি সতীশ এমনও মনে করল যে, ওর পাঠের মাপ গেসে পছন্দমত জুতো কিনে রাখে। কেমন রঙের শাড়ী সে পছন্দ করে জানতে পারলে সোকান যেটে আলনা তঠি ক'রে রাখে। বদ-বদ পছন্দ করে না চম্পক করে, রক্তের ইঙ্গিত পেলে সেই সাবান কিনে বাথরুমের সোপকেস রাখার প্র্যাকটিকালো পুড়িয়ে রাখে। এক কথায় মায়াদেবীর ওর ঘরে আসাই হ'য়ে গেছে। কেবল একদিন বাধনা বাড়িয়ে শুন ক'রে লোককে জানানো চাই। যেন পরীক্ষা শেষ ক'রে সেওয়া হ'য়ে গেছে, কেবল যা সেজেটেড্ হ'তে বাকী। এমন ধরণের একটা নিশ্চিত বিধায়ী প্রতীক্ষার দিন কাটবে সতীশের কাছে মায়াদেবী নামে সেই সোপলি-বোমার-সেখা মেয়েটি নেহাৎ ঘরের ঘরে হ'য়ে উঠল। যাকে সেবে একদিন তার চোখে রঙ দেগেছিল, মনের আবেশ এসেছিল, যাকে সেবে একদিন চৌরঙ্গীর প্রকাণ্ড বাতীগুলোর ওপরের আকাশে যে-তারার আলো ঝাঁপে সেই তারার দিকে চেয়ে চূপ ক'রে ব'লে থাকতে ইচ্ছে ক'রেছিল, সেই দলভন্ডা মেয়েটি নিত্যন্ত শাধা ও সাধারণ হ'য়ে এল। এখন তাকে এমন কল্পনা করা যায় যে, সতীশ যে-শাড়িটি ভাল-বাসে সেই শাড়িটি প'রে তোলা-উল্লনের ঝাঁচে ব'লে ব'লে সে জিমের কচুরি ভাচ্ছে। ওর খালি সিগারেট-কেসটা পাঞ্জাবীর গকেট থেকে বার ক'রে নিয়ে চুকত ভ'রে রাখছে।

ইতিমধ্যে সতীশ একদিন ভ্রামবাজারে গিয়ে ওন্ডে গেল—যানে, মাঝার সঙ্গে রোজ

একবার ক'রে দেখা না হ'লেও, সে বোঝাই একবার ক'রে সে-বাড়ী যেত—মায়ার কাকাবাবুর বেরিবেরির মত হ'য়েছে। কলকাতার শাদা চাঁল এবং শাদা ময়দা তাঁর বরদাত্ত হচ্ছে না। কি করা যাবে? এসময়ে তিনি সতীশের পরামর্শ চাইলেন। কি আর করা যাবে? এর সবচেয়ে সোজা উত্তর যা সকলেই জানা থাকে এবং সতীশেরও ছিল, তাই সে পুনরাবৃত্তি করল, “একবার কল-হাওড়াটা বর্ণিগিরে আনুন।” নীরদ্রাহ্মণরী সঙ্গে এপরিবারের বহুকাল থেকে ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁর দেওঘরের প্রকাণ্ড বাড়ী কি-একটা কুঠীর হবে, নামটা ধরে নেওয়া যাক “সর্দেশ্বর-কুঠীর”, তাহাই একতলাটা তিনি ছেড়ে দিতে চাইলেন আগ্রহ ক'রে। চিঠিপত্রে কথাবার্তা ঠিক হ'ল। তারপর একদিন এঁরা চলে পেলেন। ওর কাকীমা ছেলোমাহু এবং নিঃসঙ্গতীক ব'লে মায়াকও সঙ্গে নিয়ে গাওয়া হ'য়েছিল। সতীশের ইচ্ছে ছিল যেত। কিন্তু এই সময়েই ঠিক কলকাতায় তার হাজার রকম কাজ পড়ে গেল, এখন যে কলকাতা তাকে ছুটি সেবে তা মনে হ'ল না।

নীরদ্রাহ্মণরী এসের পেয়ে হাতে বর্ণ পেলেন। সমস্ত বাড়ীতে তিনি এক। আত্মকালকার ছেলের সঙ্গে মায়'র প্রশান্ত মহাসাগরের বাবধান। তার ওপরে বেসব নবীন-নগুনী ছুরছুরে সামসজ্জা ক'রে সকালবিকেল বেড়াতে বেরোয় তাদেরও সাথে নতুন ক'রে ভাব ভ্রমতে এবং সব তিনি আর পেরে ওঠেন না। মায়ার সুখের, প্রণাত্ত প্রভা দেখে তাঁর ঘন ঘন উতলা বিশ্রাস পড়ল। মনে করলেন—“হেসে, বিয়ে তো সেই করুন-ই, কিন্তু এমন জিনিসটি হাতছাড়া হ'য়ে অগরের হাতে পড়ল!”

এখানে মায়ার কথা একটু বলা বরকার। মায়! আত্মকালকার মেয়ে হ'লেও তার চেয়েও বেশী আর-একটু কিছু। তার শান্ত, আত্মসন্তুষ্ট গাভীরের মতো তারি একটি উজ্জল লাবণ্য ছিল। প্রেমের মাঝে কান্তনন্দ্যায় অম্লপ্র উজ্জলতার মত বৈদ্যবক্তা আছে তার চেয়েও অধিক ক'রে তাকে স্পর্শ কর্তৃক ভাল-

বাসার একটি অচঞ্চল মহিমা, যা প্রেমোপাসকে সকল অবস্থাতেই সন্মের সঙ্গে রক্ষা করে। তাই কিরণ সেদিন ওকে সেখুঁতে দিয়ে যা তা বাজে ব'কে, চামার রকম কাজলামি এবং লম্বুচট্টল গল্প ক'রে এসে ওকে প্রত্যাখ্যান করল সেদিন ওর মনে খুব লেগেছিল। এবং তার ওপরে সেই প্রত্যাখ্যানকে সতীশ এখন কুড়িয়ে নিতে এল তখন তার মনে কষ্ট পাওয়ার চেয়েও বেশী ক্রিষ্ট হয়েছিল। কিন্তু বাঙালীর মেয়ে এই সামান্য কারণে প্রধা-পন থেকে সরে গাড়াবে কি ক'রে? এতে কি আর আসে? একজন পছন্দ না করে মায় একজন এসে করবে। এ তো নিত্য নৈমিত্তিক ঘটছে, এবং বৈদ্যবক্তা শতকরা নিরানব্বই জন মেয়ে পরিণাক করছে, তা নিয়ে বাইরে একটা সহনাতীত মূর্ত্ত দেখাতে ওর বিতৃষ্ণার অবধি ছিল না। তাই মায়ার অন্তর্লোকে যে একটা বিশ্ণবীর খুঁটে গেল, সেখানে রগা, প্রত্যাখ্যান এবং ভিত্তিকার যে একটা মিশ্রিত ছায়ালোক ওর মনের সতীত ঐক্যের মাঝে লীলায়িত হ'য়ে উঠল সে-কথা কেউ টের পেল না। পাবেই বা কি ক'রে? মনের ভিতরে বাই হ'ক, সকল ক্ষোভ ও অশান্তির উপরে বহনিক-পতন ক'রে দ্বির চ'তে থাক। মেয়েদের একটা বড় ক্ষমতা।

কিরণের এখানে একঘেয়ে লাগছে না। কলকাতায় মায় বাই হ'ক, সমস্ত যে কাটছে না এমন কথা কখনো মনে পড়বার অবকাশ হয় না। মনটা একটু নিরিবিদি হ'বে, তবে তো সে হৃদয়ও ব'লে ভাস্কর্য পাবে, তার কি হচ্ছে বা কি চাই। কিন্তু যুদ্ধের ছাত্রসার ভ্রাতৃবন্ধ আত্মত্ব অঙ্গ নিয়েও সৈনিক যেমন মরীয়া হ'তে চুপ ক'রে যায়, পতির উত্তেজনায়, কৃত্যার বাদকতার তার মনেও পড়ে না কোন অঙ্গে তার রক্তক্ষরণ হচ্ছে, কলকাতায় কিরণের অনেকটা তাই হ'য়েছিল। কলকাতায়, সে যে ভিতরে ভিতরে পিপাসার্ত হ'য়ে উঠেছে, তার মনের গহনবাগী নিঃশব্দ উপবাসে রোষ জীর্ণ হ'তে জীর্ণতর হ'তে চলেছে, কলকাতায়

তার মনের বে-মাস্তব তারার আদ্যের চূপ ক'রে বলতে চায়, দিনরাত্রির অবগতান সঙ্গীতক এই কান দিয়ে শুনে চায়, সে এমন অবসরও কোনদিন পেল না যে, বৃষ্টি পাবে, ডিড়ের টেলার দাড়া খেয়ে আপন অনিচ্ছানুযায়ী, চলে চলে, তার জীবনের বিনপুলে। একটা অদর্শক শূন্যতার ক্রমশঃ মিলিয়ে যাচ্ছে। একপাটা তার ওখানে মনে পড়বার সময় ছিল না। এবং সময় না থাকলে অনেক বড় বড় উপলব্ধিও মনের অন্ধকার কোণটার কোণঠেসে হ'লে পাড়ায়, অনেক ভাল ভাল বইও পেলকের ওপর উত্তরোত্তর জন্মে থাকে। দেওঘরের ওই দিকের পাড়াড়পুলের পাদদেশে, সে তার মোটর নিয়ে রোজ বিকেলে যেত। একটা বটগাছের ঘন ছায়ার মোটরটা বেধে পাছাড়ের ওপর একটু উঠে একটা পাথরের উপর বসত। এতদিনে তার হুঁচোখ দর্শনীয়কে প্রাণ ভরে দেখবার সময় পেল। হুগুরের রোদ শাদা প্রথর আলো থেকে ক্রমশঃ একটু একটু ক'রে তিমিভাত হ'য়ে রঙীন হ'য়ে আসছে। পাছাড়ের চারিপাশের লতাশুষ্ণ এবং বড় বড় গাছের ভাষাভাষা ক্রমাগত রূপ ও রেখা বদলাচ্ছে। হুগুর থেকে বিকেল হ'ল এবং তারপর সন্ধ্যার বনানীমান ধূসরতার মাঝে ঐ পাছাড়ের ওপরে প্রথম একটা তারা দেখা দিল, জনশ্রুতদের এইসব ছোটখাট তুম্বা ঘটনা, যা প্রতি দিনই অবশীলা-ক্রমে খ'টে থাকে। তারই মাঝে কিরণের মন জুবে গেল। দ্বন্দ্ব বিস্তারের পার পেল না।

একদিন অভ্যাসমত সে গাড়ীখানা নীচে রেখে পাছাড়ের ওপরে উঠেছে। আঝ তার আস্তে কিছু দেয়ী হ'য়ে গেছে, আর লাড়ে পাঁচটা বাজে। চারিপাশের ঘন সবুজের ওপর একটা গাঢ় লাল আভা এসে পড়ছে। ছটো রঙই সমান উজ্জ্বল, তারা পরস্পরে

মিলল, কিন্তু মিশল না। তাই এ হুঁটো কণ্টন দ্বন্দ্ব রঙের মিশন-চেষ্টার মধ্যে তারি একটা সন্তোষ ভাব রয়েছে। যদিও এখনই তা আরও আরও মিলিয়ে যাবে, সন্ধ্যার দরম-কুণ্ডিত ধূসর অবশেষে তারার আলোর দীপ জ্বলে তার একটু আগের উজ্জ্বল অভিমানের ভক্ত কমা। চাইবে এবং বনপ্রীর গাঢ় সবুজের প্রাচুর্য সন্ধ্যার শান্তি এবং শুভতার মাঝে, মোহন্য স্থবের নত একটু একটু ক'রে আবিষ্ট হ'তে হ'তে পেলকালে একেবারে জুবে যাবে। তা' হাক, কিন্তু এই মিনিটের এট অপর্যাপ্ত সত্য এবং অজ্ঞান দান আলো। কিরণের বড় ভাল লাগছিল। ও, কিন্তু আঝ যে সে একনা হ'ল না। লামনেই মাথার কাকাবানু তাঁর ছড়িটা পালে বেধে একটা পাথরের ওপর ব'সে হাঁপাচ্ছেন। কিরণের মন মূর্ত্তে বিমিত্রে গেল। উ, একটা ছোট মাছুরের কি ক্ষমতা! ওই বেরিবেরি-আক্কাহ, মোতা এবং ডার্লিং-সুপেরা ভ্রমলোকটি এক নিমিষে এতবড় বিশাল পাছাড় এবং এতবড় সীমানীন আকাশকে একেবারে লুপ্তিত ক'রে দিল। দাক, হতবিধিকে অভিসম্পাত দিয়ে সে ছোটখাট একটা ভ্রমতার নমহার করল। মোকামের ভ্রমলোক যেন অস্তিত্বিত মাফলার একেবারে খ'ণিয়ে পড়লেন। ভাদিস্ কিরণের সঙ্গে দেখা, তা' না হ'লে এই কাঠখোটা পাছাড়ে ব'সে ব'সে তিনি কি করতেন? মাথার ওপরের দিক-বিলীন আকাশের দিকে চেয়ে কি মাছুরের সময় কাটে? তা কি ঘরের কড়িকাঠ যে ব'সে ব'সে একটা একটা ক'রে শুনেও কিছু সময় কাটে পাবে। না, সে আশাসও নেই। কাছেই কিরণ এখন ঠিক কাছে অব্যুহা হ'য়ে দেখা দিল। সবকিছু একটা নিঃশব্দ ফেসে বদলেন, "আরে মশাই, বেরিবেরির জালাতে সেলাম। কি না করেছি? চাঁদের কুন্ডা থেকেই, তরকারির খোসা ঢিবিতেই, কাঁচা টমেটো আর কাঁচা ডিমের হ'বেদা ক'রে ত্রাড করছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু না। বৃগলেন না, বেরিবেরি থাকে একবার হয়েছে তার আর নিকৃতি নেই। এই দেখুন

না, হ'ল। উঠেই হাঁপাচ্ছি। ভূঁ বাড়ীর ঘেরেদের সখ—
‘মাদুডেই হ'ল।’

কিরণ তাঁর পাশে বসল। কিছুক্ষণ একথা
সে-কথার পর—হানে, কলকাতার আলুর চেয়ে এখান-
কার আলুর বাজার দর কত সুবিধে, এবং পরম সুবেও
বেহি-বেহির দলন তাঁর পাতের পোড়নীর অবস্থার জন্ত
কেনই বা তাঁকে যোঝা পরতে হয়েছে—এই ধরনের
আলোচনা কিছুকাল চলার পরে হঠাৎ তিনি বদলেন,
‘কিন্তু ক'রে একটা কাজ বহি করেন, তখনই কিছুট
পাহাড়ের সঙ্গীত।’ আত্মনা। নিজে কোথাও কোথাও
কুটার বেঁধেছেন এবং তাঁদের গৃহপালিত সোফাগুলি
বিশেষ ঔষধীভূত। সন্ধ্যার মেয়েরা একলাই ওপরে
উঠছেন, কারণ আমার ক্ষমতার সুলোম না—যদি তাঁদের
অধ্বসরণ করেন। অবশ্য যোগ্যে তাড়া করলে তাঁরা
বেন হিল-উচ্চ জুতো মুক্ত পাহাড় থেকে প'ড়ে না যান।’

কিরণ মনে মনে হেসে তাল—‘মুখ তার নয়’।
মুখে বসল, ‘কিন্তু তাঁরা আমাকে কেনেন না, তাঁদের
অধ্বসরণ করলে হয়ত তাঁদের বেকানোটাই মাটি হবে।’

‘সে সবেহ করছেন না কি? হাঃ হাঃ, কিন্তু
অপরিচিতই বা কিসের? আপনাদের বিশেষ বন্ধ
সঙ্গীতের সঙ্গে মায়ার বন্দন ওমাসে বিয়ে হবে, তখন
কি আপনি বন্ধুর হুঁকে অপরিচিতা মনে করবেন?’
যাক্, কিরণ এঁর ব্যগ্রতা দেখে পাহাড়ের উঁচুতে মুক
কল। কিছু দূরে অস্পষ্টপ্রায় হুঁট নারীসৃষ্টি দেখা
যেল। কিরণ প্রথমটা হাঁহর কন্ঠে পারেনি। আরও
কিছু দূর চ'ড়ে দেখে, তাঁদের সঙ্গে তার ঘূরঘটা ক'মে
বাক্যে, তবে কি ওরা চলছেন না? সোক্তর উপগ্রন
আরম্ভ হয়েছে নাকি? না প্রাণি? কাছে
দিয়ে সে দেখে—এ গুটার একটাও না, শুধু এর চেয়েও
সুন্দর আর-একটা কুটার কারণ। একটি মেয়ের
পায়ে পাখরের কুঁচি ফুটে বেশ গভীর ক্ষত হয়েছে এবং
আর-একজন ব্যাবুল হ'লে, আর কিছু না করলে পরে
কেবল আত্মল দিয়ে তার ক্ষত মুখের প্রবল রক্ত
উৎসারনের দুখটা চেপে রয়েছে। মেয়েটি কে?—যার

মাথার কাপড় সেই আর পাখের নিরতিশ্রয় দাতন।
সবেও মুখে একটি অটল শান্তি—কেবল অত্যন্ত বাধা।
সহ করার ফলে মুখে একটা প্রবল শোণিতাভা গাঢ়
হওয়া কেনে দুখখানা দাল টুকটেকে ক'রে ফুলছে। এ তো
সেই মায়ী, যাকে একদিন সে বিকেলবেলায় দেখতে
দিয়ে পছন্দ করেনি। হ্যা করেনি বটে। কিন্তু সে
মোহ কি তার? অত বিশিষ্ট অস্বাভাবিক ‘ব্যাঙ্ক-
ক্রাউন্ড’ রেখে থাকলে অনেক বড় বড় চিত্রকরের
ছবিও তো আমল পেত না। যদি এই মেয়েটিকে এই
নির্জন পার্শ্বভা প্রকৃতির একক আবেগনের মাঝে রেখে
সেখা যেত; যদি তাকে ভাল ক'রে পরব্ধ করতাই
হবে এই ভাবটা মনকে নিরন্তর বোঁচা দিয়ে দিয়ে
তার বেহের রূপকে টুকুরো টুকুরো ক'রে তার মুখের
দাবণাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ক'রে বিশ্লেষণ করার প্রকৃত্তিক
অত্যাশ্র ক'রে না ফুলত, তা' হ'লে কি সে এই মেয়েটিকে
কেবল এই মেয়েটি ব'লেই নিত না? তা' হ'লে কি তার
মনে হ'ত না যে, এই মেয়েটি সমস্ত জগৎ এবং জগতকে
ছাড়িয়েও তারারতরা কোটি কোটি জনতার মাঝে
একাকী এবং অস্বিভীত? তার গালের পাশে একটি
ছোট সিলের অভাব থাকলেও সে-অভাবটা তখন মনে
পড়ার অবসর পাবে না অপার বিশ্বাস, আমি যাকে
সেখলুম তাকে ঠিক ভেমনি ক'রে দেখতে দ্বিতীয়বার
কেউ পাল্বে না সেই বিশ্বাসে। কিন্তু এ সব কথা মনে
ওঠা এবং সে-রাসে মনকে সিন্ধু ক'রে নেওয়ার চেয়েও
জরুরী, মেয়েটির রক্তক্ষরণ কোন উপায়ে বন্ধ করতাই হবে।

মায়ার কাকীমা বদলেন, ‘হিল-উচ্চ জুতোর
অধ্বসিধে হওয়ার সেইটে গুলে খালি পায়ে হাঁটতে
বেতাই এই ব্যাপার ঘটেছে।’

মায়ার কাকীমা বুঝা সত্যোচ না ক'রে বদলেন,
‘ভাগ্যিস আপনি এসেছেন! আপনি এর পাতের
কাটাটা হাত দিয়ে সেপ থেকে ততক্ষণ বন্ধ ক'রে
রাখুন। আমি একটা সহজ ওষুধ জানি, তার উপায়
দেখি।’

কিরণ হাঁটু গেড়ে বসল, এবং ওর দৃঢ় বিন্ধি আত্মল

দিয়ে মাঝার পায়ের 'অতঃকানটা' ধ'রে রইল। মাজা চোখ তুলে তাকা'ল। কিরণের ওপর অভিমান তার আভাও যায়নি। বার ওপর এত অভিমান, তাকে দিয়ে পারে হাত সেঁওয়াতে হ'ল—এ লক্ষ্যার পার কোণার? কিন্তু সে কিছু বলল না, বা অনর্থক ত্রীড়াসকুচিটা হ'য়ে পা দিয়ে চানটানি করল না। 'অভিমানকে যদি ঠিক জাকগায় শৌছে দিতে ওহ, নিঃশেষ উপেক্ষা দিয়েই সে তা দেবে, এর চেয়ে গভিরাশা দীর্ঘ আর নেই। মাঝার কাকীমা জমল থেকে গাঁদাঘাছের কিছু কচি পাতা নিয়ে এসে একটা পাথর দিয়ে তা ছেঁতে ওর পায়ের ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। 'খানিকটা বিগ্রাম ক'রে ওরের দু'জনের লাভাঘো মাঝা নীচে নেমে এল।

ওরা চ'লে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ অবধি কিরণ নীচে নেমে ঘাসের ওপর ব'লে রইল। মাঝাকে আভ তার ভাল লেগেছে এবং তার চেয়েও বেশি গুকে সেবে তার হুঁচোখে বিশ্বরের ঘোর লেগেছে। 'বাকে হুঁচোখে মাহুৎবিশ্বর নিয়ে দেখে তাকে যে কত গভীর ক'রে সেবে তা ব'লে শেষ করা যায় না। কিরণ আভ মাহাকে আপন ভারী ব'ল' দেবেনি, আভ লেগেছে সেই মাঝাকে যে-মাঝা একটি মুহূর্ত ওর জীবনকে একটা বিস্মৃতে ছুঁয়ে অগাধ শূভে মিশিয়ে যাবে; যে আবার তারই হ'তে পান্ডু, কিন্তু যে এখন একটি নিমিষ আপন বেদনার্ত্ত দৃষ্টি নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে ছাড়া আর কোনো ভারেই কোনো দিন তার এক চুলও আপন হ'তে পান্দবে না। এই সুহুৎতা এবং অপ্রাপ্যতার মাদকতা গুকে কি রকম বেন ক'রে তুলল। মনে মনে তাবল, আমরা নব বন্ধুকে সেপ্তে বাঙার নাম ক'রে তাকে খুঁজে বেড়াই, কিন্তু যেমন ক'রে সেপ্তে তাকে পাব সে-বেধা দৃষ্টিতে সন্কার ক'রে নিতে পারে কে? তা কি করমাহে' দিয়ে করা যায়? এর পর বাড়ীতে এসে তার দিন রাজিগুণে। অজ্ঞতারে কাটল। পূব বে একটা হুতাপার কোভ, তা' নহ। তু' একটা নতুন হু'র মাঝে মাঝে গোনো যায়। ব'লে ভাবতে ইচ্ছে করে, একটু বেয়ে কেমন আছে এখন? তার শোমার ঘরের গাঁড়ান আদনার্ণার সামনে ব'লে

রাজিত শোবার আসে সে বীর্ষ চুলগুলি কি ক'রে ফিত দিয়ে আটকে রাখে। ওহত ফিতটা একভাতে এবং চুলগুলি অজ্ঞ হাতে ধ'রে ঠিকমত আঁতর কহতে পারে না, তাই টোটে'র 'মাজালে বন্ধুকে পাঁতগুলির একই বলক দেধা যায়, ওহত পাঁত দিয়ে কালো ফিতটা সে চেপে ধরেছে। ওহত বিকলবেলার বেড়াতে যাবে ব'লে 'আদ-মারীর পান্টাটা পূলে রেখে পাড়ীর পাড় বাহুতে বাহুতে বাইরের রোমে-ভরা নীল আকাশের দিকে চেয়ে শুন-শুন ক'রে একটা পানের একটা লাইন গেয়ে গুত, ওহত চাবির রিংএর সোছাটা তুলে কোনো কাপড়ের উলার রেখে দেহ, তারপর খোলা হ'লে পান খেয়ে যায়। উৎসুক, প্রত্যাশিত দৃষ্টি নিয়ে চারিদিকে খুঁজে দেখে।

মাঝা কেমন আছে, সে-খবরটা 'অবিশি মাঝের কাছে অনায়াসেই নেওয়া যায়। কিন্তু তা নিতে ওর পরজ নেই। কহনায় সে যে-যেয়েসি 'অমূলকণ করে, মা কি তাকে সেখেছে? এবং নীরদাও এ সব কিছু খবর গুকে দিতে উৎসুক ন'ম। ছেলের ওপর একটা পূব-গাভা-নয় কোভ এখন তাঁর মনে রয়েছে। তা ছাড়া মাঝাকে বত সেখুঁছেন, বত কাছে পান্দেন, তাঁর এই কোভ ততই বেড়ে চলেছে। মাঝা বেশি কথা বলে না। প্রেরের সাক্ষিগু জবাব দেওয়া ছাড়া সে প্রায়ই চুপ ক'রে থাকে। এখানে আসাটা ওর পক্ষে কষ্টকর হয়েছে। বিদেব ক'রে সেই ব্যাপারের পর, আবার এসে কিরণ ও তার মার সঙ্গে একবাড়ীতে থাকটা। যেন ওর আহুত হানে আবার আঘাত দিচ্ছে। সতীশকে সে মনে মনে প্রভা কহতে পারে না—বার ওপর প্রেল অভিমান রয়েছে তাকে একসময়ে অভিমানকে তাসিয়ে দিয়ে বোধ করি গভীর ভালবাসা যায়। কারণ, অভিমানটা ভালবাসারই গুপিট। কিন্তু এক-জন বাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আর-একজন সেই মুহূর্তে যদি সেই পরিত্যক্ত নারীর প্রসাদপ্রাণী হ'লে আসে তবে তাকে সেই মেয়ে কি ক'রে নেবে? তাকে আপন আহুত ছবরের আচ্ছাদন ক'রে নেবে,

তাকে নিজের অভিমানের ইচ্ছা ব'লে বেবে, কিন্তু তাকে লজাই তারই মূল্যে দেওয়া—মানে তাকে প্রচাৰী আত্মবক্তব্য না দিয়ে প্রচার আসনে নেওয়া। —এ কি সে পারবে? বোধ করি পারবে না। অতঃ মায়া তা পারেনি। তার ওপর সেদিন পাহাড়ে ওর অলহায়, আহত অঙ্গে কিরণ বধন হাত হোঁয়াল, নতনেয়ে ওর রক্তাক্ত পায়ের তলায় জাহ্নু পেতে ব'লে আশান বন্দি বাহু দিয়ে ওর রক্ত ধামাধার চেষ্টা করল, তখন নারী ভেবে পেল না অভিমান কি ক'রে এত মিষ্টি হয়? যে অপমানিতা নারী নানা উপায়ে নানা ইচ্ছা দিয়ে আপন অভিমানকে প্রবলতর করতে দাঁড় সাধনা করেছে, কেন তার সকল শুভা ছাপিয়ে, এমনি মধুর অভিমান মাধুর্যের বসে সবত মনকে কানায় কানায় ভ'রে তুলে। এ অভিমান থেকে মুক্তি চায় কে? মায়া কি চায়? সে যে-অভিমানকে চূর্ণপ্রাচীরের মত কেবলই জুর্জর করতে চেয়েছে, সে এই? তাই যদি হয় তবে এ অভিমানের অবশেষ মধুরতা থেকে তাকে বাঁচাবে কে? এতদিন ব'রে সে কি এরই ভক্ত সাধনা করেছে? বাক্সিবেলায় নিজের বিদ্যাবার জুয়ে সে বাগিনে মুখ রেখে দিলে ক'রে ছোট ক'রে মাতে মাতে বলে, “তুমি তো আমাকে নিলে না, তুমি তো আমাকে চাওনি। আমি তোমার মনের মতন নই। কিন্তু তু তুমি আমার কষ্ট সহ করতে পারলে না কেন? কেন সেদিন আমার পাদপর্শ ক'রে আমার ক্রেশ কমাতে গিছলে?” তার ভিতরকার তীক্ষ্ণবী মেয়েটি বলে, “এ আর কষ্টে পার না? এ'ত ভয়ভার একটা অল। কেউ অলহায় অবহায় অখানে বিপদে পড়লে শিক্তি ভয়লোক পেছনা? হবে কেন?” কিন্তু অভিমানিনী মেয়েটি তীক্ষ্ণ-মুড়িকে লম্বান দেয় না। তার কেমন ক'রে কি আমি কেবলই বনে হ'তে থাকে, “তুমি আমাকে নিলে না, কিন্তু তু তুমি আমার ক্রেশও সহ করতে পার না।”

সতীশ একটা-না-একটা কাজের ফেরে প'ড়ে কলকাতার খুঁপীপাক খাঙ্কিল। তার একটা চাকরি চ'বার কথা ছিল। মানে সে পত্র বন্ধুর ডাক্তারী পাশ ক'রে এবার-ওবার ছোট ছোট কাক নিলেও, একটা ভাল মত চাকরীর চেষ্টায় লেগে ছিল। কলকাতার ডাক্তারী কলার তার ইচ্ছাও ছিল না, বৈধাও ছিল না। ইতিমধ্যে ডাক্তারী বিভাগে পোটাক্তক পদ খালি হওয়ায় সুপারিশের জোরে সে চাকরী পেল। চাকরী পেয়ে অর্ধের সঙ্গে-সঙ্গে তার মনের দু'একটা ব্যাও বদলাতে শুরু করল। মনটা খালি শোভা ছেলের মত পু'তু'ত করে। কেনই বা সে ডাক্তারি ক'রে মায়ার সঙ্গে বিয়েটা পাকা ক'রে কেনল? কিরণের চেয়ে সে কোন্ অংশে কম? কিরণ যে-মেয়েকে ‘কিছু না’ ব'লে ছেড়ে দিয়েছে, তাকে সেয়ে ব'রে ব'য়ে আনতে তার এত কি পরম ছিল? সতীশের আত্মসম্মানে একটা হল কুঁতে লাগল। যেন কিরণের পুরানো, পরিত্যক্ত চিঠিকে অর্ধেক দানে পুরানো স্ত্রীর মোকান থেকে কিন্তে পেছে। মাঝকে কিরণ নিজের স্ত্রী বলে পছন্দ করতে গিয়ে যদি কিরে না আসত, তা'হ'লে হয়ত সতীশের মনের এই খোঁচাটা গুঁ'বারই অবকাশ পেত না। কিন্তু এখন সে মাঝকে মায়া ব'লে ভাবতে পারছে না। কিরণের না-পছন্দ-হওয়া একটি মেয়ে ব'লে মনের কাছে মায়া এসে লাড়াল। তা'হাড়া এক চৈতন্যদায় যে-মেয়েকে সে আরক্ত অপবন লজ্জার, বন্ধুর অহু তবিত্তের স্ত্রী ব'লে দেখেছিল, বার চারিদিকে হবভিক্রমণীয় আলোকমণ্ডল ছিল, যে-আলোর বাঁধায় তার চোখে রঙ লেগেছিল, সে তো এখন মিলিয়ে গেছে রান হ'য়ে, কবে কোন্ কালে। মায়া তো এখন তার পাকাপাকি কথা-দেওয়া বিয়ের বহু। তার কল্পনা-মণ্ডলের জ্যোতিষ্মদুবে

তারার দল সব এক এক ক'রে নিবে গেছে, এখন আছে কেবল তোর হ'রে আমার নিসঙ্গ পাখুইতা। সে যে একমুনের অনাদৃতা নাতী, তারই নিম্মত আভা। হ্যাঁ, সত্যশের মনটা খুঁৎখুঁৎ করছিল। তা'ছাড়া কাশ বাগবাঝারে দিদিমার বাড়ী গিয়েছিল; তিনি হাসি-তামাসা ক'রে একটি মেরেকে সেই চিরস্থন পাণ আনার ছল ক'রে কাছে ডেকে নিয়ে এলেন তার নামুনেই। মেয়েটি অবিস্তি মাথার চেয়ে ভাল বেশতে কি খায়াপ বেশতে অত তুলনা-মূলক সমালোচনা সে কব্বার অবকাশ পায়নি। কিন্তু দিদিমার কাছে কথাপ্রসঙ্গে শোনা গিয়েছিল, মেয়েটির বাবা কলকাতার পশারওয়ালা খুব বড় একজন ডাক্তার, মেয়ের বিয়েতে টাকা চাসুতে কার্পণ্য করবেন না। মায়াব যেমন বাপ নেই, কাকা-মোচোর 'পরে তার, তেমন নয়। এই কথাটা ক'দিন ধ'রেই তার মনে খোঁচা দিচ্ছিল। শেষে আর থাকতে না পেরে মনে করল, কাছে যোগ দেবার আগে একবার বেগুনের ঘুরে আসা থাক। একা একা থেকে তার মনের খেঁচটা উত্তরোত্তর যেন বেড়েই চলেছে।

তাই এক সকালে সতীশ কিরণের বাড়ীতে এসে হাছির। এবারে নীরদাশুস্বরীর সঙ্গে তার জড়ল না। নীরদার ব্যবহারে এবারে একটা প্রহস্ব কাঠির। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছে, যদি তিনি সেদিন সতীশকে অত ক'রে কিরণের ক'নে বেশতে বাগদার অহুরোধ না করতেন তা' হ'লে বোধ করি তাঁকে মায়াকে হারাতে হ'ত না; যদি তিনি অত ব্যস্ত না হ'তেন, যদি আরও অপেক্ষা করতেন; কিরণকে তাড়া দিয়ে, ভ্রামবাঝারের বৈঠকখানা ঘরে পাণের জিব হাতে মোতি-মুলা আর বেনারসী দিয়ে মাঝানো মায়াকে বেশতে না পাঠাতেন। সেওখরের সেই অগ্রহুর্ঘোর আভামর পাহাড়ে নারীর বেদনাহত, শান্ত, অটল স্বের্ঘোর মাঝে রক্তসিক্ত পামল্পর্শ ক'রে মায়াকে বেশতে দিতেন তাকে, প্রথমেই—তা হ'লে কিরণ কি বলত বলা যায় না।

কিন্তু সতীশ কথাটা কুন্তে গেলে এবং নীরদার

নীরব উপেক্ষার আহত হ'রে মনে মনে আরও বেশে পেল; এবং নিজের নির্মুক্তিতার 'পরে চোটপাটে হুক করল। মাথার এমন কি দাম আছে যে, তার ভক্ত বন্ধু-বন্ধন! বন্ধুর এমন না, বলতে গেলে তার অপেন মায়ের মত, তাঁর সঙ্গে মনান্তর! ব্যাপারটা কোনো ক্রমেই কি সোজা করা যায় না?

পরের দিন বিকেলে সতীশ ও কিরণ পাগাড়ে বেড়াতে গেল। সতীশের ডাবটা কিছু উল্লনা, কি একটা কথা বেন বলি-বলি ক'রেও বলতে বাধ্য হ'ল। শেষে জিজ্ঞাসু করল, "তারপর, কেমন লাগছে জাতিগাটা? নীচের তলার ওঁদের সঙ্গে কেমন ভাব হ'ল?"

কিরণ মনে করল সতীশের কি ঠাণ্ডা হয়েছে নাকি? তাই তাড়াতাড়ি নেওখরে ছুটে এল এবং তাই এমন মাতামর আকাশ, এমন বনের দৃশ্য, এখানে এসেই ঐ প্রহর।

সে বলল, "আলাপ তো ভাল ক'রে একদিন হবেই, এবং সেদিন বোধ করি প্রতিদিন এদিয়েই আসছে। কাজেই আগে থেকে আর বেশি চেষ্টা করিনি।"

সতীশ আমল পেল না। মায়া যে এই সামনের মাসেই তার স্ত্রী হ'বে কিরণের বন্ধুপত্নী হবে, এবং তখন ভাল ক'রেই আলাপ করবে, এই কথাটার আত্মিক ক'রে সে যে-কথা কুসে থাকতে চায়, কিরণ সেই কথাটার ওপরই বেশি ঝোর দিল। কেন কিরণ বারবার এই কথা মনে করিয়ে দেয়? গুর মনের অস্থির চাকলা গুরু চুপ ক'রে থাকতে দিল না, আবার জিজ্ঞাসু করল, "আচ্ছা কিরণ, মায়া কি বেশতে বিশেষ সুন্দরী নয়? তোমার পছন্দ হ'ল না কেন?"

এবারে কিরণের হাসি পেল। বলল, "মায়া সুন্দরী নয় একথা কে বলেছে? ভয় নেই যে, তোমার বানর-হাজিতে আমন্ত্রিত হ'বে তোমার স্ত্রীর রূপের প্রহসার আমি এমনি সুখ হ'বে উঠবে যে, বলবে, না জানি সুখ এমনি বটাতে আরো কি ছড়ির কথা?"

সতীশ অসবরসীর হ'বে উঠল। কিরণের আদ

হয়েছে কি? সে কি বিষ্টি করার জাকে অশ্রুমান লুক
করল? যে-মেরেকে সে নিজে নিতে পারল না, জাকে
আমার হাতে চাপিয়ে এখন জড়িত করি আউছে। মরীয়া
হ'রে ব'লে কেল্ল, "আমি সে মনে ক'রে বলিনি; যে-
নেজেকে তুমি বিয়ে করতে পারলে না, হাকে নিজের স্ত্রী
মনে করতে তোমার শেল হাসি, এখন বন্ধুর স্ত্রী মনে
ক'রে তার সম্বন্ধে বত কুলী বুঝে চ'তে পার। কি
আন্দা তুমি! আর কি অল্পত ব্যবহার তোমার?"

কিরণ এবার গভীর হ'রে বলল, "কি বলছ তুমি?
মায়াকে আমি পছন্দ করেছি বা অশ্রুমান করেছি তা'তে
এখন কি ব্যর্থ-আসে?"

"বিশেষ ব্যর্থ-আসে। আমি যে মায়াকে বিয়ে
করবই, এই কথাটা কি আমার পারে লেখা আছে?
পাকা কথা হয়েছে তো কি হয়েছে? তাতে আমার
কি ব্যর্থ-আসে? তখন একজন ভদ্রব্যবহার মেরেকে
এবং তার অতিভাবকদের তোমার মত নিষ্ঠুরের
নিমাক্ষ প্রজ্ঞাধ্যান থেকে বাচাতে আমি যদি
একটা কথা ব'লেই থাকি, তাতেই কি ব'রে নিতে
হবে যে, আমি যে-মেরেকে বিয়ে করতে দেশে
উঠেছি? আমি মায়াকে বিয়ে করব না, করব না,
করব না,—সোজা কথা ব'লে দিলুম।"

তারের অনতিদূরে একটা গাড়ী এসে দাঁড়াল এবং
তার ভিতর থেকে কাকাবাবু ও কাকীমার সঙ্গে মায়ী
নাম্ন। তার পারের ক্ষতটা সেত্রেছে বটে, কিন্তু পাছে
কোনক্রমে সেন্ধিক হবার ভয় থাকে ব'লে ডাক্তারের
পরামর্শ মত এখনো ব্যাওজ-বাঁধা। এই ক'দিন
অভিমানিনী মায়ী আপন অভিমানের সঙ্গে দুখ ক'রে
হাল ছেড়ে গিয়েছে; এই বিষ্টি অভিমানের সঙ্গে তার
বোকাপড়া হ'রে গেছে। বাইরের জীবনকে তার
হান ছেড়ে দিয়েও মনের নিরুত একটি প্রদর কোণে
সে এই অভিমানকে আশ্রয় দিয়েছে। তার ধ্যানের
জীবন এই ক'দিনেই প্রদার নিবীলিত একটি ছায়া
তার বুখে কেলছে। সে আভার তার অভিমানী বুখ
একটি আপন রূপ পেয়েছে। তা'হাড়া পারের

আশাতের পর ওর একটু সেন্ধিক জরের মত
হয়েছিল। মর্যাতাদের পর ও আরও একটু বোখা হ'রে
গেছে। হুসল নারীসেহ যেন নারীর কোন কোন
রূপকে আরও সুঠমে তোলো—বিশেষ ক'রে অভিমানের
রূপ। তাই গাড়ী থেকে মায়াকে বখন নামতে দেখল,
তখন ওর রূপ, রান, এক অশ্রুপ আভার দীপ্ত বুখের
দিকে চেয়ে কিরণ আত্ন হ'রে উঠল। জাড়াতি চোখ
জিরিয়ে নিয়ে বলল, "সতীশ, এ কথাটার মানে কি
জান? একবার ঠেকে আমি প্রজ্ঞাধ্যান করেছি।
তারপর আমার যদি তুমি ঠেকে প্রজ্ঞাধ্যান কর, সেটা
কজুর অমানুষিক বর্করতা বলতে পার কি?"

সতীশ কঠিন স্বরে বলল, "এখন তা বলতে বই
কি। জেবে দেখ তো তুমি নিজে বখন ঠেকে দেখে
বুখ জিরিয়ে চ'লে এসেছিলে তখন তোমার নিজের
বিবেককে কি বলেছিলে! আমার মত ক'রে জিরবার
করেছিলে কি?"

"বহুত তখন কিছুই করিনি। করা মরকার ব'লে
মনে করিনি। কারণ, তখন ওর জীবন সম্বন্ধে আমার
কোন অজুষ্টি ছিল না, কিন্তু আম করব, কারণ—"
হঠাৎ ওর বুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "কারণ ঠেকে
এখন আমি ভালবাসি।" সতীশ অবাক হ'রে চেয়ে
রইল, বলল, "ও! তবে তো আর কথাই নেই। জেবে
একখাটা এতদিন চেপে রেখেছিলে কেন? কাল
চোরের ট্রেনে আমি চ'লে যাব কলকাতা। বাবার
আপে মায়ার কাকাকে জানিয়ে দিয়ে যাব কথাটা—
যে এ বিয়ের বর বলল হ'রে গেছে।"

৫

পরের দিন সতীশ পাঞ্জাব বেদের কামরায় ব'লে
ব'লে জাবুছিল কান্ডা কি বোকার মত হ'ল? কিন্তু
কিরণকে কি বলতে হয়! লোকটা বন্ধুত্বের আবেশে কি
ভদ্রকর সব ভিনিস চাপা দিয়ে রেখেছে। বন্ধু
কলকাতার কাছে ব্যত; আর ইনি দিবা ব'লে জাবী
বন্ধুগতীর সঙ্গে প্রের অদাচ্ছেন। হাক্ আর কিরণকে

আমল দেবো না। এমন কি গুর সঙ্গে আর মেশামেশিও করা চলেবে না। গুরত কোনদিন আমার ক'রে বসবে যে, 'সতীশ, তোমার দ্বীপ সঙ্গে আসাপ করিয়ে নাও, আমারটির সঙ্গে তো তোমার জানা-খানা আছেই।' আর মায়াকেই বা কি বলতে হয়! মেয়েমানুষের এত অধঃপতন আমার! হিন্দুবাদীর ছেলে আমাদের মনে বাজে—হাঙ্ পে। এসব বাজে কথা। বা হয়েছ ভালই হয়েছে। কিন্তু হ'ল কি ভাল? একটা খোঁচা থেকে আশ্বরজ্ঞা করতে দিয়ে সতীশ আর-একটার মধ্যেই বা পড়ে। বোধ করি গুটা গুর খুৎখুৎে অভাবের সোহ।

কিরণ প্রথমে খুৎুতই পারেনি, এত দহসা সতীশ এসে কি ক'রে সেল। ও যে ক্ষেত্র থেকে স'রে সেল তা কাল রায়ে গ'র টাইমটেবিল নিয়ে অতি-স্বাভাৱতা দেখেই বোকা পেছে। কিন্তু তখনো সমস্ত ঘিনিঘটার চেহারা। তার চোখের স্রুক্ষে ভেসে ওঠেনি। অনেক রাত্রিতে, দামনের খোলা মাঠটা থেকে পাইচাৰী ক'রে ক'রে প্রান্ত হ'য়ে সে বাড়ী ফিচ্ছে এমন সময় নীচের তলা থেকে বেরি-বেরি-আক্রান্ত ভয়লোকটি ডাকলেন, "একবার গুহন"। দিয়ে বলতে তিনি বড় রকম উদ্ভূত একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস দমন ক'রে বললেন, "আপনারা আমকালকার ছেলে তাও মানি এবং আপনারা সভ্যতার উন্নততর যুগের তরুণ একথাও অস্বীকার করব না। কিন্তু এইগুলো কি খুব ভাল কাজ?"

এত বড় দীর্ঘ ভূমিকাটা যে কেন, তা আশঙ্ক করতে গেলে কিরণ 'নার্তাস' হ'য়ে উঠে। কাকামশাই ব'লে চললেন, "মায়াকে একবার আপনি ষটা ক'রে দেখতে দিয়ে পছন্দ করলেন না। তারপর আপনার বন্ধুর সঙ্গে পাকাপাকি কথা হ'য়ে বাবার পরে, আমরা যখন কেবল ব'লে আছি কবে ভাঙ্রা। পরনা দিয়ে বাবে ব'লে, তখন তিনি লস্ট ক'রে জানিয়ে মিলেন যে, তিনি বিয়ে করতে পারছেন না।"

কিরণ বলল, "আপনি কিছু ভাববেন না, বা হওয়া

উচিত তা ভগবান ঘটাবেন-ই। আমি মা'কে জানিয়ে সব ঠিক ক'রে দেবো।" ব'লেই কোনো ক্রমে সে পালিয়ে এল।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে খুৎে পারল সতীশ বিস্তর বর বসল হওয়ায় কথাটা জানারনি। বোধ করি ক্রোধবশতঃ জানিয়েছে কেবল, যে সে এ-বিষয়ে করবে না। সতীশটা যে কি, তা সে বিন্দু-বিসর্গ খুৎে পারল না আমাকে এই মিনিট অবধি। কাকামশাই মনে করলেন তাঁকে একটা মোটা রকম ভববানের আশান দিয়ে কিরণ বোকা বুঝিয়ে চ'লে গেল। রাসের চোটে তাঁর বেরি-বেরিকণেও হৃষ্টি বা নিমিষের ক্ষণ ভুলে গেলেন।

রাত্রিতে নানা ভাবনার কিরণের ভাল ক'রে ঘুম হ'ল না। ভাবনার ঘুম হুসনি কি? না, তার সমস্ত মন ছাপিয়ে এমন একটা মধুরতার স্রোত বইছিল যে, এত ভাল মনের অবস্থায় মানুষের ঘুম আসে না। কেবলই গুর মনে পড়ে, মায়ার আশ রায়ে কি কষ্ট পেয়েছে, কারণ, কাকামশাই যখন কিরণকে ডেকে কথা কইছিলেন তখন সে ঘরের আড়ালে শাড়ীর খসল গুনেছিল এবং চ'লে গেতে যেতে নিমিষের ক্ষণ ব্যাঙেতে আবদ্ধ মায়ার পদপ্রান্ত দেখতে পেতেছিল। কাছেই, ও কথাটা গুনেছে বই কি : এবং গুর মত তেজস্বী মেয়ের পক্ষে একথাটা কত কেশকর তা'ও সে খুৎে পারে। তাই বডবার গুর ঘুম ভেঙে যায়, ব্যথার বেঘনায় অঘট একটা পতীর আনন্দের উফেলতায় গুর সমস্ত মন ভ'রে অধীর হ'য়ে ওঠে। যেন গুর বা কিছু মনের কথা তা আর একজনের মাঝে বিদীর্ণ হ'য়ে যেতে চাইছে, কিন্তু পারছে না কেন? আর একটা সম্ভেও থেকে থেকে গুর মনে উঁকি মাচ্ছে। সতীশকে কি মায়ার চায়? তা যদি চায় তা'হলে এ চাওয়া যেটাবার কোনো সমল তার হাতে নেই। রাত্রি-বেলায় কিছুতেই ঘুম এল না ব'লে ভোয়ের দিকে বিছানার প'ড়ে থাকতেও আর তার ভাল লাগল না। তখনো অন্ধকার রয়েছে। বিছানা থেকে উঠে ও গুয়ের

শিখনের দিক্কার বাপানে ঝাণানো চাপাগাছের ডগার বসতে গেল। কিন্তু এত ভোরেও সেখানে মায়ার বসে রয়েছে। গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে ভোরের আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে অস্তমনস্বয়ং হ'য়ে। তার পীড়িত নারী-প্রকৃতির সমস্ত পুণীভূত বৈরাগ্য তার মুখে। এখনটার সে কিরণের আলো টেরও গেল না। এখন গেল তখন খুব একটা আড়ম্বর করে উঠে বাওয়া বা সজোচে হ'রে যাচ্ছে এমন ভাব কিছুই দেখান না। নিঃশব্দে উঠে চ'লে যাচ্ছিল। তার দিকে চেয়ে কিরণের কিছু বসতে ইচ্ছে হ'ল না। এর দিকে চেয়ে কেউ কি কিছু বসতে পারে? মনে পড়ল তার দ্রামবাছারে বাওয়ার কথা। তার লীলাচপল হাতচট্টলতা মনে পড়ল। তারপর বেংল সেইমাত্র বিনিত্র শব্দা থেকে উঠে আসা, বহু ক্রেশের পর শান্ত বৈরাগ্যে বেসনামাত্র নারীর গুটি। মায়ার ভিতরে চ'লে যাচ্ছিল। কিরণ মনেকটা আপন অজ্ঞাতেই অসুটস্বরে বলল, "তুমি কি আমাকে ক্ষমা করছে?" বসতে বসতে তার কি বে হ'ল, কাছে গিয়ে মায়ার হাতছাঁটি

আপন হাতে নিয়ে ছেলেমানুষের মত আশ্বাসের স্বরে বলল, "মায়ার, তোমাকে এখন যেদিন দেখতে সেলুম আমাকে দেখা দিলে না কেন?" মায়ার লম্বা বুমভাঙ্গা চোখের বিশ্বাস নিয়ে গুর দিকে চাইল।

"হা জানি, তুমি আমার সামনে বেরিয়েছিলে, এখন তোমার কাকা বললেন, 'মা লক্ষী পাণ নিয়ে এস তো।' তখন তুমি সত্যিকারের লক্ষী মেয়ের মত তক্তাকে পাণের ডিবে হাতে করে আমার সামনে বেরুলে। কিন্তু সে তো আদেশ পালন। সে কি আমাকে দেখা দেওয়া? বলতো? তখনই যদি দেখা দিতো তা হ'লে কি আমি তোমাকে এত কষ্ট পেতে দিতুম? তোমার কষ্ট যে আমারও কষ্ট তা কি এখনো জান না? তোমার আদেশ পালনে বাস্তব লক্ষী মেয়েটির বশে, তোমার মথোর অভিমানিনী মেয়েটিকে তখন কেন আমাকে হ'চোখ ভ'রে দেখতে দিলে না?"

মায়ার চোখে জলের আভাস। বরফের মত, গাঢ় অস্তমনস্বয়ং বৈরাগ্যের ছায়। সে-রূপে আর নেই।

আমাদের দেশের সত্য পরিচয় দেশবাসীকে জানাইবার জন্য

বাঙ্গালা দেশের দেব-দেবীর যে-সব শ্রেষ্ঠ মন্দিরের পরিচয় পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই, সমস্তর বাঙ্গালীর নিকট হইতে উহাদের বিপুল ঐতিহাসিক বিবরণ ও ফটোচিত্রের জন্য আমরা আবেদন করিতেছি। মূল মন্দিরাদির ও উহাদের বিভিন্ন অঙ্গের কটো পাঠাইলেই বিশেষ সুবিধা হয়।

(মনোনীত হইলে ফটো-চিত্র গ্রহণের ব্যয় ও সম্বলনের যথোপযুক্ত পারিভ্রমিক দেওয়া হইবে)



রাজস্থান দেশ

[চিত্রকর জ্যোতি বাবললাখ রাইস মহাশয়ের গোহাতি]

রূপকথার দেশ

(গান)

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হট্টেশ্বার হট্টেশ্বরের শেষে
হাট পথ সে হারিয়ে সেছে রূপকথার দেশে ।
সেখা মন-মুহুরা মিটি বুলি
মনের পাচার চুরার পুলি
কথা কও, কও না, বলি' ডাক্তরেছে এসে । (ধূম)

অকোটা কুসের সেশটা, — ছুঁ'রে নীল আকাশের বেড়টা ।
নিরুদ্দেশ নাসী-শিদি চ'লেন বনগাবাসী সেই দেশে ।

দিন-রূপের বিকসি পুতুর—

কল-রূপে রূপ-ছায়া-পুতুর,—

মাছরাঙা তার বঁড়ি ফেলায় ;

(ঘোরে) কাঁচপাকা টিপ খুঁজতে এসে ।

মাঠ সেখানে ময়ূর-কক্কি রাং,

বাট সেখানে ইন্দ্রধনুর জং,

গাছ সেখানে পারিজাত—

কাক ব'লে তার কাকডিমেরে হুং দিতেছে ।

সকালে বৈকালে শুধু শুধু

উলটরা গড়ে কলসী-মধু ;

উড়িরা চলে মধুমক্ষিকা,

আটকা বেতেছে মধুলোভে শেষে ।

(আছে) ঝাবুক বনে ভাবুক পাখী,

সোনালি পাখা, হুনীল আঁখি,

আছি তুমি আমি, বেঙ্গমা বেঙ্গমী,—

যাই চিনি' চিনি' ঘুমি' ঘুমি',—

চলো সেই দেশে ।

(কোরাস) সেই দেশে তে ভাই, নিমের শেষে

পথদারা পথ একতারা তার ব্যভার এসে ।

জলে চান আখর চানে

ছলছল ছলে-গানে ;

সন্ধ্যাকালে কথা ভালে

“বউ কথা কও” পাখীর বেশে ॥

বঙ্গালীকে বঙ্গালী না রাখিলে কে রাখিবে?

জাতির নব উদ্বোধনের দিনে, জাতির পরিচয় ভাগ্যে করিয়া জানিতে হইকে। জাতির ইতিহাস গড়িতে হইবে—তার ঐতিহ্যের মধ্যমুসন্ধান করিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্যে আমরা প্রার্থনা করিতেছি—বঙ্গালার সাধনার যে ধারা বড় বড় সাধক ও গুরুদ্বিগের মনো আভ্রণ প্রবহমান রহিয়াছে, তাহার সকল তথা বঙ্গালী জাতিকে সকলে জানাইয়া দি। বঙ্গালার গ্রামে গ্রামে যে-সব সাধক মহাপুরুষ স্বাভাবিক বিদ্বান আছেন বা পূর্বে ছিলেন, তাহাদের সকল বিবরণ আগাদিসকলে জানাইলে সাগ্রহে পত্রস্থ করিব।

(এ বিষয়ে উত্তম প্রবন্ধের জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে)

বৌদ্ধধর্ম

অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীমলিনাক মত, পি-এচ্-ডি, ডি-লিট্

ব্রহ্মচর্য ও চিত্ত-সংযম বৌদ্ধধর্মের প্রথম ও দ্বিতীয় সোপান। বৌদ্ধধর্মের ভাষায় এই দুইটিকে 'ঈশ্বরকা' এবং 'সমাধিতাবনা' বলে। বুদ্ধদেবের 'অষ্টাঙ্গিক-মার্গের' সাতটিই ঐ 'ঈশ' ও 'সমাধি'র অন্তর্ভুক্ত। কথ্যাবাসী, দৈনিক কর্ম্মাদি এবং জীবিকা অর্জন সম্বন্ধে রূপে নির্বাহ করাকে ঈশ্বরকা বলে। কঠোর বৈতনিক জীবন পালনে সমর্থ ব্যক্তিকে সংসারত্যাগী হইয়া ভিক্ষুবশে ধারণ করিয়া সাধনাদির যে উপদেশ দেওয়া হয় তাহাকে 'সমাধি-তাবনা' বলে। চিত্ত-সংযমের জন্য ধ্যান-ধারণাদির যে বিধি-ব্যবস্থা তাহা দ্বিতীয় সোপান 'সমাধি'র অন্তর্ভুক্ত। এই ধ্যান-ধারণা বৌদ্ধধর্মের কিছু নূতন উদ্ভাবিত নয়। যাহা বৈদিক বা বৈদিক-পূর্ব যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে, ইহা তাহাই বা তাহারই রূপান্তর মাত্র। ঈশ ও সমাধির পর আর একটি সোপান আছে, তাহার নাম 'প্রজ্ঞা' বা 'জ্ঞান' অথবা অষ্টাঙ্গিক-মার্গের অষ্টম মার্গ—'সমস্কৃষ্টি'। ইহাতেই বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। ঈশ্বরকার ও সমাধির নিয়মাদি প্রতিপালনে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে বিবেক কোন প্রভেদ দেখা যায় না। প্রজ্ঞা বা জ্ঞানলাভের উপায়,—বৌদ্ধশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন, বৌদ্ধধর্মের উপলব্ধি এবং অবশেষে বুদ্ধদেব যাহা 'পরমার্থ' সত্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন তাহা প্রত্যক্ষীভূত-করণ। এই পরমার্থ সত্যটি কি তাহা এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের শাস্ত্র বিভিন্ন হইলেও সকলের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সার কথা করটি পাওয়া যায়, যথা—

- ১। সর্ব প্রতীত্যসমুৎপাদ
- ২। সর্ব অনিত্য
- ৩। সর্ব কলিক
- ৪। সর্ব দুঃখ

- ৫। সর্ব অনাত্ম বা শূন্য
- ৬। সর্ব শান্ত বা নির্বাপ শান্ত

নানা বৌদ্ধধর্মের চর্চা করিয়া দেখিতে পাই যে, উপরোক্ত ছয়টি বাক্যকে সকলেই বুদ্ধবচন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু উক্ত বচনগুলির ব্যাখ্যা ও বুদ্ধদেবের সম্ভাব্য বচনগুলির সহিত উহার সামঞ্জস্য রক্ষায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যোরজর মতভেদ দেখা যায়।

প্রথমে 'স্ববিহ্ব-বাদী বৌদ্ধধর্মের' পাণ্ডি সাহিত্যকেই প্রত্যক্ষ করা যাক।

'সর্ব প্রতীত্যসমুৎপাদ' এই বাক্যটির অর্থ সকল সমস্যায়ই একই মর্মে গ্রহণ করিয়াছে এবং ইহা এত বেশী প্রচলিত যে, প্রায় সব বৌদ্ধ গ্রন্থের শেষে এই বচনটি পঙ্ক্তাকারে দেওয়া থাকে। যেখানেই কিছু বৌদ্ধ বৃন্দ বা বিচারাদি পাওয়া দিয়াছে সেখানেই এই বাক্যের বহু প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বুদ্ধের উদ্ভাবিত যদি কোন দার্শনিক মত থাকে, তাহা হইলে ইহাকেই সেই মত বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

'সর্ব প্রতীত্যসমুৎপাদ' এই কথাটির অর্থ এই যে, জগতের বস্তু কিছু বস্তু আছে, এতদ্বা স্বেচ্ছ ও প্রত্যাহ-বিশিষ্ট। প্রত্যেক জীবের বা প্রত্যেক বস্তুর উৎপত্তির সম্বন্ধি ও নিমিত্ত কারণ থাকে। সম্বন্ধি কারণকে বৌদ্ধরা 'হেতু' বলে এবং নিমিত্ত কারণকে 'প্রত্যাহ' বলে, যেমন অম্লের হেতু বীজ, এবং উহার প্রভাব জল, মাটি ইত্যাদি। 'সাধারণের' প্রতি বুদ্ধের উপদেশ এই যে, প্রথমতঃ প্রত্যেক বস্তু বা বীজ স্বেচ্ছপ্রত্যাহসম্পন্ন কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিবে; যদি দেখে উহা স্বেচ্ছ-প্রত্যাহসম্পন্ন তাহা হইলে জানিবে যে উহা নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী অতএব ত্যাগ্য। সেই ক্ষণে ইহাও বলিয়া বিদ্যাহেন যে, নির্বাপই একমাত্র অপ্রতীত্যসমুৎপাদ, কালেক-কালেই উহাই একমাত্র অপ্রতীত্যসমুৎপাদ।

‘সর্বং অনিত্যং’ এবং ‘সর্বং দুঃখং’ এই বিতীর্ণ ও চতুর্থ বাক্যের অর্থের ব্যাখ্যা নিম্নোক্তরূপ। যোজ্য উপর, বুদ্ধদেবের এই তিন বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, জগৎ প্রতীত্যাসমুৎপন্ন, সেজন্য উত্তা অনিত্য। তাহা অনিত্য, নবর তাহা দুঃখময়। নির্গাণট একমাত্র পরমার্থ সত্য : উত্তা অপ্রতীত্যাসমুৎপন্ন অতএব নিত্য এবং শান্ত। /

‘সর্বং অনিত্যং’—এই উপদেশট বৌদ্ধদিগের দাশদ্বৈতবাদিক মতভেদের একটি প্রধান কারণ। দ্বিবিবাহী ও সর্বাতিবাহীরা এই প্রশ্ন উপস্থাপিত করিল যে, বুদ্ধদেব ‘সর্বং অনিত্যং’ বাক্যটি কি ‘ঐকান্তিক’ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন? সকল বস্তুর বিশেষণ করিতে করিতে যে অণু-পরমাণুতে উপস্থিত শুদ্ধা যাহ, সেট অণু-পরমাণুকেও কি তিনি অনিত্য বলিয়াছেন? না, তিনি অণু-পরমাণুর নিত্যতা স্বীকার করিয়াছেন ও তাহাদের সমষ্টিরূপে যে পদার্থ হয়, তাহাকে অনিত্য, নবর বলিয়া গিয়াছেন? দ্বিবিবাহীরা বলেন যে, তিনি ‘সর্বং অনিত্যং’ ঐকান্তিক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি অণু-পরমাণুরও নিত্যতা স্বীকার করেন নাই। অপর সম্প্রদায় অর্থ করিলেন যে, বুদ্ধদেব অণু-পরমাণুর সমষ্টিভূত পদার্থের অনিত্য বলিয়াছেন; কিন্তু অণু-পরমাণুর নিত্যতা মানিয়া লইয়াছেন। যেহেতু সম্প্রদায় এই বিষয়ে জীব ও পদার্থাদি বিশেষণ করিয়া ৭৫টি ভূত (element) ধার্য্য করে এবং এই ৭৫টি element-এর নিত্যতা মানিয়া লয়। ইহার ফলে তাহারদের মত গাঁড়াইল—‘সর্বং অস্তি’, এবং তাহাদের নাম হইল ‘সর্বাতিবাহী’। ইহাদের পিটক সংকট ভাষায় লেখা। সর্বাতিবাহীদের এই মতবাদ বহুবল্য তাহার অভিধর্মকোষে বিশেষভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহারা একপ্রকার দ্বিবিবাহী। কিন্তু ‘সর্বং অস্তি’ ইহাও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। দ্বিবিবাহী ইহার ব্যাখ্যা করিলে যে, অণু-পরমাণুর একভাবে অস্তিত্ব কবিক। সর্বাতিবাহী সেই ভুলে বলে যে, অণু-পরমাণু হাতী কিন্তু তাহাদের

সমষ্টিভূত অবস্থা কবিক। তাহা চাইলে গাঁড়াইতেই যে, সর্বাতিবাহীরা আমাদের বৈশেষিক দর্শন মতটিই গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু এটুকু বলিয়া তাহা প্রত্যোজন যে, বৈশেষিক দর্শনের মতে বুদ্ধদেব যে অসত্য নির্ভীর্ণ পদার্থ তাহা এই বৌদ্ধসম্প্রদায় গ্রহণ করে নাই।

মহাসানী বৌদ্ধরা ‘সর্বং অনিত্যং’ লইয়া এক বিপণ্ডিত বটাইয়াছে। তাহারও উত্তা চরম ‘ঐকান্তিক’ অর্থে গ্রহণ করিয়াছে। তাহার বক্তব্য—জগতের বস্তুসমূহকে হাতী ও অশ্বারী—এই দুই ভাবে বিভক্ত করা বাস্তবে পারে : এবং সেট সত্য বক্তব্য যে, হাতী হাতী, তাহা নিত্য, পরিবর্তনশীল, চিরকাল তাহা একভাবে অবস্থান করে। সাধারণ মানব চক্ষু-শ্রবণকে যেমন হাতী মনে করে, সেটরূপ। বাস্তবিক পক্ষে মহাসানীরা চক্ষু-শ্রবণকেও নিত্য বলিয়া মনে না।। তাহা একভাবে স্থায়ী নহে, তাহা অনিত্য, পরিবর্তনশীল। অবস্থাবিশেষে তাহাবিশেষে বিস্ময় বলিয়া নির্দেশ করা হয়। এই ক্ষণ ইহার বক্তব্য যে, যে-বস্তু অস্থায়ী, অনিত্য, তাহা কোনো কালেই হাতী চাইতে পারে না, তাহাদের ‘পারমাণবিক’ সত্য থাকিতে পারে না। জগতের জীব ও বস্তু আমাদের নিকট হাতী প্রতীয়মান হইলেও পারমাণবিক অর্থে সেগুলি নিঃসন্ত বা নাস্তি। বাহ্য নিঃসন্ত বা নাস্তি, তাহা যখন মোচনীভূত বস্তুর দ্বারা কল্পনা মাত্র। এইরূপ চর্কের দ্বারা তাহারা বুদ্ধ-বুদ্ধ-নিঃসন্ত ‘সর্বং অনিত্যং’ বক্তব্যের অর্থ এই দ্বি করিল যে, জগতের জীব ও বস্তু সমগ্রই অনিত্য অর্থাৎ অবিদ্যমান এবং তাহাদের অস্তিত্ব কল্পনা-প্রসূত মাত্র। এই সত্য ‘সর্বং প্রতীত্যাসমুৎপন্ন’-এর ব্যাখ্যা করিল যে, জগতের বস্তু বহন কল্পনা-প্রসূত তখন তাহাদের ভেদাত্মক পারস্পরিক (relative)। যেমন হস্ত ও পীঠ, ঘেট ও কুড় পারস্পরিক পদ সেইরূপ জীব ও বস্তু, মাতৃ ও পুত্র পারস্পরিক পদ মাত্র। ইহাদের বাস্তব সত্য নাই, শুধুতঃ ‘পারমাণবিক’ ভাবে ইহারা অবিদ্যমান। বাহ্য

‘পারমাখিক’ সভ্য তাহার পরিবর্তন বা বিনাশ ব্যক্তিগত পারে না। ইচ্ছার মতে নির্মাণই একমাত্র পারমাখিক সভ্য এবং এই নির্মাণকে সমাধৃতাবে বৃত্তিতে না পারিয়া অবিসৃত পুরুষ নানা কল্পনা করে এবং সেই কল্পনাজালে স্বয়ং জড়িত হইয়া পড়ে।

পঞ্চম ব্যাক্য ‘পর্ক’ অর্থাৎ বা পূজা’। ইহা বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান বিশেষণ। ব্রাহ্মণ্য ধর্মনাম্যে অহং-জ্ঞান দূর করিতে উপদেশ দিয়াও এক বা অসংখ্য চিরস্থায়ী অবিনশ্বর আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদিত করা হইয়াছে। বুদ্ধের দেখিবারে যে, এই অবিনশ্বর আত্মার অস্তিত্ব কল্পনাই অহং-জ্ঞানের মূল এবং মানবের চতুর্থের কারণ, সেজন্য তিনি অবিনশ্বর, পরিবর্তনরহিত আত্মার সত্তা মোটেই স্বীকার করেন নাই। বৌদ্ধের প্রায় সকল সমুদায়ই অর্থাৎ সন্নিভার বা বাসীপুত্রেরা ব্যতীত সকলেই স্বীকার করে যে, জীব পঞ্চকন্ডের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছু নহে। জীবকে সাধারণ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বৌদ্ধরা দেখাইয়াছে যে, উহাতে দুই বস্তু পদার্থ সেবা যায়, এক ‘বস্তু’ বাহ্যকে বলে ‘রূপ’, অপরটি ‘মনোবস্তু’ বাহ্যকে উহাদের তাহার বলে ‘নাম’ ‘নাম’কে ইহার চার ভাগে বিভক্ত করে, যথা—বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান।

এই পাঁচটি উপাদানে জীব গঠিত এবং এই পাঁচটি ছাড়া অত কোন পদার্থ বা শক্তি তাহারা খুঁজিয়া পায় না। সেইজন্য তাহার বলে যে, আত্মবাহী দার্শনিকগণ অহং-জ্ঞানের ভিত্তি নির্ধারণ করিতে দিয়া এই চিরস্থায়ী, অবিনশ্বর, পরিবর্তনরহিত আত্মার কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ‘অহং-জ্ঞান’ যেমন কল্পনা, সেইরূপ ইহের ভিত্তি ‘আত্মা’ও কল্পনামাত্র।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, পুনর্জন্মে কর্মের ফলাফল ভোগ করে কে?—আত্মা না থাকিলে দুই জন্মের মধ্যে সম্বন্ধ কে করাইয়া দেয়? ইহার উত্তরে বৌদ্ধরা বলে যে, এ পঞ্চ-উপাদান-সমষ্টিগত

জীব কণিক অর্থাৎ প্রতি-মুহুর্তে জীবের পরিবর্তন হয়। উদাহরণ স্বরূপ তাহার। দেখায় যে, মানুষের শরীরে প্রতিদিনই পরিবর্তন হইতেছে। দৈনিক পরিভ্রমে কিছু অংশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে এবং দৈনিক আহার-গ্রহণে নূতন রক্ত-মাংসের সঞ্চার হইতেছে। মনোবস্তুগত বৃদ্ধি পরিবর্তনের ভোগ করাই নাই। অল্প কথায়, পূর্ণোক্ত পাঁচটি উপাদানে প্রতিমুহুর্তেই নব নব অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। কাল-কালেক্টে উহাদের প্রতিফলই ভ্রম ও ভ্রূতা হইতেছে, কিন্তু তাহা এত ক্ষুদ্র ও সামান্য যে, আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না; মাত্র যখন ঐ পরিবর্তন নানা কারণবশতঃ বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত হয় এবং মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তখনই বলে তাহা পুষ্টি হইল বা রূপ হইল, ভ্রূতা হইল বা ভ্রম হইল।

ইহাতে না-হয় পুনর্জন্ম সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উঠে তাহার সমাধান হইল। এখন প্রশ্নকল লইয়া বাইবার কথা কে? পাশ করিলে কষ্ট ভোগ করিতে হয় এক পূণ্য করিলে সুখ ভোগ হয়—ইহা আত্মাকে স্বীকার না করিয়া কিভাবে ব্যাখ্যা করা বাইতে পারে? বৌদ্ধরা ইহার উত্তরে পঞ্চ-উপাদানের মধ্যে সংস্কার-উপাদানটিকে এই কার্যের জন্ত দেখাইয়া দেয়। তাহার বলে যে, পিতৃ ভূমি হইবা মাতৃ আহার চাহ, কে তাহাকে আহার করাইতে পিষাইল? তাহার মাতৃজন হইতে আহার সঞ্চারিত হইবে ইহাও সে জানে। তাহাই বা কে পিষাইল? এই প্রশ্নের সমাধানে বৌদ্ধরা বলে যে, পঞ্চ-উপাদান কণিক পরিবর্তনশীল হইলেও আবহমান চলিয়াছে। এই কণ-পরিবর্তনশীল ‘সংস্কার’ই যেমন জীবের মধ্যে সদাই বিজ্ঞানমান, সেইরূপ ভ্রূত পদ উহা। তৎকালেই অল্প অবস্থা গ্রহণ করে। এই সংস্কার মানবশক্তিকে মাতৃজন পান করায়, এবং হৃৎসের পিতৃ মাতৃজনের অবেশন না করিয়া অল্পসংস্কারের সন্ধান করে। কর্ম-অনুযায়ী জীবের সংস্কার এবং জীব সংস্কারভিত্তিক।

মহাত্মা বৌদ্ধরা জাগতিক জীব ও বস্তুকে যখন কল্পনা-প্রসূত বলে, তখন তাহার চিরস্থায়ী ও

পরিবর্তনরহিত আশ্বার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই পারে না। এমন-কি উহার পক্ষ-উপাসনের সত্তাও স্বীকার করে না অর্থাৎ উহাদের 'পারমাখিক' ভাবে নিত্য বা স্থায়ী মানে না। বৌদ্ধ দার্শনিক-সিদের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, হীনবানী বৌদ্ধরা 'পুঙ্গলপুত্তা' মানে, অর্থাৎ আশ্বার অস্তিত্ব স্বীকার করে না, কিন্তু 'ধম্মের' অর্থাৎ বস্তুর অর্থাৎ পক্ষ-উপাসনের সত্তা স্বীকার করে এবং মহাবানী বৌদ্ধরা পুঙ্গল ও ধর্ম, ঈশ্বরাতী কথার subject ও object—দুইয়েরই সত্তা প্রতিপাদন করে। ইহাদের মতে জগতের সত্তা কল্পনামাত্র, পক্ষ বাহাকে মাত্র বলিয়াছেন। সেইজন্য তাহারা 'সংঘ অনাস্কা' এবং 'সংঘ পুত্ত' এই দুই-ই প্রতিপাদন করিয়াছে। হীনবানীরা কেবল জগতের 'সংঘ আশ্বনা বা আশ্বানীরেন পুনা' অর্থাৎ সত্তার ব্যক্তির অভাব প্রতিপাদন করে।

এইবার আমরা শেষ ব্যক্তিটির অর্থ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। 'সংঘ' শব্দ বা নির্মাণ শব্দ ইহার তাৎপর্য কি? হীনবানী বৌদ্ধগণ নির্মাণকে শাস্ত্রিময় অবস্থা প্রাপ্তির বিষয় ইত্যাদি বিশেষ দিগ্ধাছে। তাহার বল, এই জগৎ হুঃখময়, আমরা লায়ন-জন্মের দ্বারা শাস্ত্রিময় নির্মাণ অবস্থা পাইতে পারি। আকাশ যেমন চিরস্থায়ী, অবিনশ্বর, শাস্ত্র অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশরহিত সেইরূপ নির্মাণও চিরস্থায়ী, শাস্ত্র এবং অশঙ্কিত অর্থাৎ সমাপ্ত নহ। ঐ নির্মাণে ব্যক্তি থাকে না, সর্বত্রই একীভূত হয়। কিন্তু মহাবানী বৌদ্ধরা এইরূপ নির্মাণকে পারমাখিক নির্মাণ বলে না। তাহারা এই নির্মাণকে উচ্চ শাস্ত্র অবস্থা বলিয়া স্বীকার করে, কিন্তু উহা স্বর্গের মত বা স্বর্গাশ্রমী উচ্চতর অবস্থা হইলেও, তাহারা বলে, উহা পরমার্থ সত্তা নয় সুতরাং চিরস্থায়ী হইতে পারে না। উহাদের নির্মাণ 'পরমার্থ' সত্তাকেই বুঝায়, যে 'পরমার্থ' সত্তা বা নির্মাণ সদাই বিদ্যমান, নিগুণ ও অনির্কটনীয়। জীব অবিভাজ্য হইয়া নির্মাণের স্বভাব কি প্রকার

তাহা বুঝিতে পারে না। না বুদ্ধি তাহার নির্মাণের উপর সঙ্গারের আরোপ করিয়া থাকে। সঠিক দৃষ্টি-শক্তি সত্তাবে সাধারণ মানব যেমন বস্তুতে সঙ্গের আরোপ করে, এবং গুণ আরোপ করে না—ঐ আরোপ বা ভ্রম-প্রযুক্ত কার্যাদি (যেমন পলায়ন ইত্যাদি) করিয়া থাকে, সেইরূপ অবিভাজ্য জীব নির্মাণকে সঙ্গাররূপে দেখে। যে নির্মাণ শাস্ত্র, উৎপত্তি ও বিনাশ-রহিত তাহাতে জীবও বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ প্রভৃতি দেখে। যখন তাহাদের অবিভাজ্য দৃষ্টীভূত হয়, তখন তাহারা নির্মাণ মাত্র দেখিতে পায়, উহার উপর আরোপিত জগৎ স্বরূপলভ্য বিজয়ের জ্ঞান আর দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহার এইরূপ জ্ঞানলাভ হয়, মহাবানীরা তাহাকেই নির্মাণপ্রাপ্ত বলে।

এইরূপ নামার্হন নির্মাণকে প্রণয়ের উপনয় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি নির্মাণের স্বভাব এই বিখ্যাত শ্লোক দ্বারা জানাইয়াছেন,—

“সংগ্রহীণমগ্রাণমহুচ্ছিন্নমশাশুভঃ।

অনিরুদ্ধমহুংগমনেতরিক্কামপুচ্চাতে।”

যাহা ত্যাগের বা প্রাপ্তির বিষয় নহে, বাহার সংরক্ষণ শাস্ত্র বা অশাস্ত্র বলা যায় না, বাহার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, তাহাই নির্মাণ। এই মতকে অনেক পক্ষের ত্রুটিবাদের বলিতে চান; কিন্তু শাস্ত্র ও মহাবানী মতের মধ্যে প্রভেদ এই যে, শাস্ত্র ত্রুটিকে নিগুণ বলিয়া বিশেষিত করিলেও উহাকে শুণ-বিশিষ্ট করিয়াছেন, যথা—ত্রুট্য সঙ্কটানন্দ অর্থাৎ তিনি সং, চিত্ত এবং আনন্দময়। পক্ষান্তরে মহাবানীরা ইচ্ছিতে 'সং' বলিলেও স্পষ্টরূপে 'সং'ও বলিতে চায় না, উচ্চ অবাচ্য বা অনির্কটনীয় এই ছাড়া আর কিছু বিশেষণ প্রয়োগ করিতে চায় না। তাহারা নির্মাণের অপর নাম দিয়াছে “তথতা” বা “পুত্ততা”। “পুত্ততা” অর্থে নির্মাণ যে গুণপুত্র এবং “তথতা” অর্থে নির্মাণ যে একতাবস্তু বা তথাভাবস্তু—ইহাই তাহার প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট হইয়াছে।

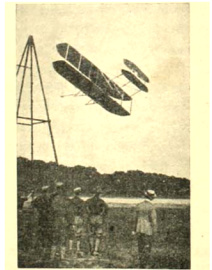


বিমানপথে চলার ভবিষ্যৎ

শ্রীমুখিনন্দন রায় চৌধুরী

"পাখী যদি ডানার সাহায্যে আকাশে উড়িতে পারে, মানুষই বা কেন কল্পিত ডানার সাহায্যে আকাশে উড়িবে না?"—এ কথা মানুষের মনে বহুকাল পূর্বেই জাগিয়াছে এবং মানুষ ডানার সাহায্যে উড়িবার চেষ্টাও করিতেছে বহুকাল হইতেই। সেকেন্ডা বস্ত্রবার বিকল হওয়ার পর ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে অটো লিলিয়েন্ডাল নামে এক জার্মান ভ্রমলোক প্রথমে ঐকপ ডানার সাহায্যে উড়িয়া দর্শকদিগকে চমৎকৃত করেন। বাণ্টিক লন্ডনের

১২০০ ফুটকে, আমেরিকার রাইট-ভ্রাতৃদ্বয় একটা এরোপ্লেন তৈরী করিয়া আকাশপথে প্রথম এরোপ্লেন চালান। তখন খ্রিষ্টাব্দ ১৮৩৩ উড়িতে পারিলেই যথেষ্ট



রাইট-ভ্রাতৃদ্বয়ের এরোপ্লেন আকাশপথে
প্রথম চেষ্টা দিলে

মনে হইত। সেধিতে সেধিতে এরোপ্লেনের ব্যবহারিত হইয়া ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে করানী এরোপ্লেন-চালক ব্রেবিরো সাহেব এরোপ্লেনে ইংলিশ প্রণালী পার হ'ন। এরোপ্লেনে



অটো ডানার সাহায্যে খুঁজে উক:
লিলিয়েন্ডাল

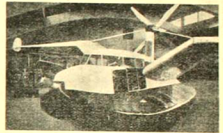
পারে একটা পাহাড়ের উপরে উঠিয়া, ডানার সাহায্যে খুন্সে লাফ দিয়া, আঙুলে আঙুলে বাতাসে ভাসিয়া পাখীর ভায় পুঙ্খপথে বহুদূর চলিয়া তিনি নীচে নাসেন। চতুর্থের বিদ্য, পাচ বৎসর এরূপ পরীক্ষা করার পর একদিন তিনি উড়িতে দিয়া বাড়িতে পড়িয়া যান এবং সেই আঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া নানা পরীকার ফলে এরোপ্লেন আবিষ্কৃত হয়।

৫০ মাইল বাওয়া তখনকার দিনে অগাবনীর ব্যাপার মনে হইয়াছিল এবং তিনি তৎক্ষণ ১০০০ পাউণ্ড পুরস্কারও পান। তখনকার দিনের এরোপ্লেনও ছিল এখনকার এরোপ্লেনের তুলনার নিতান্ত ছেলেবেলা। বেশদী কাপড়ে ঢাকা ডানা নিতান্ত হাডা, পদ্মকা ছিনিব; সুড়ী, কড়, কুয়াসা সহজেই তাহাকে কাবু করিত। তাহার এঞ্জিন ছিল খাম-খোলা; কখন যে চট করিয়া বড় হইয়া যাইবে, বলা হুছিল। একপ এরোপ্লেনে চড়িয়াই তখনকার দিনের চালকপণ প্রাণ হাতে করিয়া আকাশপথে চলাফেরা করিতেন, এবং তাঁহাদের সাহসের কসেই এরোপ্লেন এত উন্নত হইয়া আক আকাশ জয় করিতে চলিয়াছে।

বিমানযাত্রার ইতিহাসের কথা লিখিবার স্থান এখানে নাই; বিমানযাত্রার ও বিমানপোতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দু'চারটি কথা লিখিতে ইচ্ছা করি। এখনকার এরোপ্লেন মনুষ্য ধাতুর জৈয়ারী, হল-কড়ে তাহাকে সহজে কাবু করিতে পারে না; তাহার এঞ্জিন শত শত মাইল চলিয়াও ঠিক থাকে; এরোপ্লেনে বসিবার আরগাটি পরিপাটি, বেশ আরামে বসা যায়; ভিতরে বয়সপাতি আছে, তাহার সাহায্যে দিক্, গতি প্রকৃতি সহজেই নির্ণয় করা যায়; চালাইবার বয়সপাতিও সহজ এবং মনুষ্যত্ব। ইহার বেগও কিছু কম নয়; বর্টায় ১০ হইতে ১৫০ মাইল নিরাপদে বাওয়া চলে। পথে চলাফেরার সময়ও পথে পথে সাহায্য পাওয়া যায়—জল-হাওয়ার খবর (Weather-report), স্থানে স্থানে নামিবার ব্যবস্থা (Landing ground), পেট্রলের ব্যবস্থা, কুয়াসার সময় সঙ্কেতিক চিহ্নের, আলোর বা শব্দের (Fog-signal), ভূমির সহিত টেলিফোন ও রেডিও-সাহায্যে কথা বলিবার সুবিধা প্রভৃতি চালককে সাহায্য করে।

এ সকল সুবিধা সম্বন্ধে বিমানপথে যাত্রার দৃষ্টে অনুবিধা এবং বিপদ বলিবার সম্ভাবনা এখনও রহিয়াছে; ভবিষ্যতে কি করিয়া তাহা দূর করা যায় তৎক্ষণ এখন বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে।

এরোপ্লেনের একটি প্রধান অনুবিধা, হঠাৎ নামিবার এরোপ্লেন হইলে বড় মরহান ছাড়া নামিতে পারে না। কোন কোন এরোপ্লেন জলের উপর ছাড়া নামিতেই পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে, এমন কি ব্যবস্থা করা



আধুনিক “অটো-পাইরো”। ইহা জলে নামে। ডানার আকারে সাধারণ এরোপ্লেনের সঙ্গে অনেক প্রভেদ।

চলে সাহায্যেরা এরোপ্লেন সহজেই অন্য পরিসরের মধ্যে নামিতে নামিতে পারে? অটো-পাইরো নামক এরোপ্লেন এই সমস্যার সমাধান করিবার উপায় বলিয়া দিয়াছে। এই এরোপ্লেনের উপরে একটি

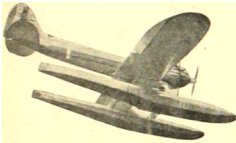


ডানারী “অটো-পাইরো”। ইহাকে “উড্‌হু মোটর” বলা চলে। ভবিষ্যতে এই ধরনের এরোপ্লেনের বেশ হওয়ার সম্ভাবনা।

বিরট পাখা থাকে, উহা ছেলেদের খেলার “উড্‌হু-পাখী”র পাখার মত বন্-বন্ করিয়া ঘুরিয়া এরোপ্লেনকে প্রায় সোজা আকাশপথে উঠতে টানিয়া তুলিয়া লয়; তাহার পর এরোপ্লেন বেদিকে ইচ্ছা চলিতে পারে। নামিবার সময় এই পাখা আর পরিসরের মধ্যে নামিতে সাহায্য করে।

ক্রতবেগে চলার সময় এরোপ্লেন বাতাসে বাধা পায়, সেজন্য বিশেষভাবে এমিনিয়ারসন এরোপ্লেনের নতনের নানাতরপ পরিবর্তন করিতেছেন, বাহাঘোরা খণ্ডায় তিন-চারি শত মাইল বেগে বেলেও বাতাসের বাধা ঘূর কইই হইবে। ১৯৩১ সালে ইউরোপের বিখ্যাত হাইডার কাম্প্‌ প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে যে এরোপ্লেন পাঠান হইয়াছিল তাহা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়। উহা একবার খণ্ডায় ৩১২ মাইল বেগে

এরোপ্লেনের চালকসমূহকে প্রতিদিনই বা প্রতিরায়েই একশ কাছ করিতে হয়। উড়িতে উড়িতে কড়, কুটী, কুমাগা প্রভৃতি তো বাধা দিতে পারেই; আশ্বনের ভয়, এতিন বড় হজমার ভয়ও যথেষ্ট আছে। আশ্বকাল প্যারাণ্ডটের ব্যবহার প্রচলিত হজমার দুর্ঘটনার প্রাণ-নাশের ভয় কমিয়াছে বটে, কিন্তু একেবারে 'ভায় নাই। আশ্বন লাগিলে হঠাৎ নামিবার প্রয়োজন হয়; —সে সময় যদি সেখা দায়, প্যারাণ্ডটে আশ্বন লাগিয়াছে, তাহা হইলে চক্ষুরি! হারি ট্রিডেলার নামে এক যুবক যুক্তরাষ্ট্রের (U. S. A.) ডাক লাইয়া আকাশ-পথে রায়ে উড়িয়া বাইতেছিল; হঠাৎ এরোপ্লেনে



হাইডার প্রতিযোগিতায় জয় বিশেষভাবে তৈলারী এই এরোপ্লেনটি খণ্ডায় ৪১২ মাইল বেগে উড়িয়াছিল। বাতাসের বাধা অতিক্রম করিবার নানা প্রকার ব্যবস্থা এই এরোপ্লেনে করা হইয়াছে।

চলিয়াছিল। একপ ক্রতবেগে উড়িলে কলিকাতা হইতে বর্জমান বাইতে মাত্র ৮ মিনিট সময় লাগিবে। অবশ্য একপ দারুণ বেগ অতি অল্প সময়ের জন্যই রক্ষা করা সম্ভব। ভবিষ্যতে যে-সকল ক্রতগামী এরোপ্লেন দৈনিক কাজের জন্য ব্যবহার করা হইবে, তাহার গতি গড়ে খণ্ডায় ২৫০০০ মাইল হইবে একপ আশা করা যায়। বাতাসের বাধা কমাইবার জন্য উহা অতি উচ্চে উড়িবে; নিঃখাসের কষ্ট এবং হিমের উপদ্রব দূর করার জন্য ঐ সকল এরোপ্লেনে অক্সিজেনের ব্যবস্থা থাকিবে; চালকের বসিবার ঘরে বাহিরের বাতাস বাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে একপ ব্যবস্থাও থাকিবে।

অজ্ঞাত গবে, পাহাড়-পর্বতের উপর বিদ্যা সছায় বা রায়ে একা এরোপ্লেনে উড়িয়া যাওয়া যে কত বিপজ্জনক, সংজ্ঞাই দৃষ্টিতে পারেন। ডাক-বাচী



হারি ট্রিডেলার বলত এরোপ্লেন হইতে ডাকের বক্তা লটখা লাফাটখা পড়িতেন। শিশুর বলত প্যারাণ্ডট সেখা বাইতেছে।

আগুন লাগে। তখনই ডাকের চিঠির বস্তা বগল-
দাড়া করিয়া প্যারাভুট লইয়া সে লাফ দিল।
প্যারাভুটে আগুন লাগার শূভ্রপথেই প্যারাভুট ছাড়িয়া
দিয়া সে প্রাণ হাতে করিয়া অস্ত্রাভ শূভ্র লাফ দিল।
তাহার পরে সে কি ঘটিল সে জানে না। পরদিন
প্যাচফের উপর তাহাকে অচেতন অবস্থায় পাওয়া
গেল;—কিন্তু, ডাকের বস্তাটি তখনও তাহার বগলে !
হাসপাতালে কিছুকাল চিকিৎসার পর তাহার চেতনা
হয়। সুস্থ হওয়ার পর সে তাহার কাহিনী বর্ণনা
করায় একজন বিশেষের প্রতি সরকারী বিভাগের
বিশেষ নজর পড়িল। এই দুর্ঘটনা এবং একজন আরও
কয়েকটি দুর্ঘটনার ফলে, অদায়া পোষাক, প্যারাভুট ও
এরোপ্লেন লইয়া বিশেষ পরীক্ষা চলিতেছে এবং আশা
করা যায় ঈশ্বরই আগুনের ভয় আর থাকিবে না।

মালার উচ্চল থাকে ; কিন্তু, বখা-তখা নামিতে হইলে
বুড়িল। একজন অবস্থায় “শূভ্র-খোলা মশাল” ভিত
উপায় নাই। একজন মশাল আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং
পরীক্ষা করিয়া দেখাও হইয়াছে। একবার মশাল
আলিয়া ছাড়িয়া দিলে শূভ্রপথে ইহা বহুক্ষণ জ্বলিতে
থাকিবে এবং চারিদিকের জ্বলিকে উচ্চল আলোকে
ভাসাইয়া দিবে।

কুয়ালা এরোপ্লেন-চালকের শত্রু। কুয়ালায় মধ্যে
একবার প্রবেশ করিলে সম্পূর্ণ আশ্রয় পথ চলিতে
হইবে। কিন্তু, এই কুয়ালায় মধ্যেও আশ্রয় নানাভঙ্গ
বস্ত্র ও আলোকের সাহায্যে এরোপ্লেন-চালক পথের
সন্ধান পাইতে পারেন। নীচের জমি হইতে শব্দের
প্রতিধ্বনি কিরিয়া আসিতে যে সময় লাগে তাহার
সাহায্যে চালক মাটির দূরত্ব বাহ্যতে নির্ণয় করিতে



অব্যবস্থার অবস্থার মধ্যে এই কটে। তোলা হইয়াছে। ৪। ক্রিস্টের এরোপ্লেনটি “শূভ্র-খোলা মশাল” সাহায্যে এই মাঝ
মাটিতে নাকিল। সেই মশালের আলোতেই জ্বলি তোলা হইয়াছে।

এজিনে শেট্টলের পরিবর্তে লালতেল (Crude
Oil) ব্যবহার করিলে আগুন ধরার ভয় থাকিবে না।
জাৰ্জের হুডার (Junkers) কোম্পানী একজন এজিন
নিৰ্মাণ করিয়াছেন। আশা করা যায় ইহার চল
ঈশ্বরই হইতে পারিবে।

অবস্থার মধ্যে মাটিতে নামিবার এরোপ্লেন হইলে
এরোপ্লেনকে বড়ই বিশদ্রষ্ট হইতে হয়। নীচে নামিবার
জমি (Landing-ground) থাকিলে তাহা আলোক-

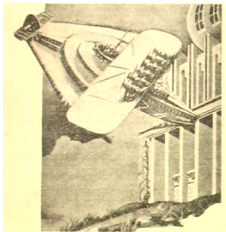
পারেন, একজন যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। লাল আলোর
সাহায্যে কুয়ালা ভেদ করারও চেষ্টা হইতেছে। “অতি-
লাল” (Infra-red) আলো চোখে দেখা যায় না,
কিন্তু, এই আলোর কুয়ালা-ভেদী ক্ষমতা অসাধারণ।
একজন আলোর সঞ্চয়ের সাহায্যে কুয়ালা ভেদ করার
চেষ্টা হইতেছে। কুয়ালাকে আবহকমত জমাইয়া দিয়া
অল্প জায়গা জুড়িয়া আকাশ পরিষ্কার করিয়া ফেলার
উপায় উদ্ভাবনেরও চেষ্টা হইতেছে।

ভবিষ্যতে আরোহী লইয়া বাহির করাই অতিকার
এরোপ্লেন চলাচল করিবে। একদল এরোপ্লেন
লইয়া পরীক্ষাও হইয়া গিয়াছে। আমেরিকার “Do N”
নামক এরোপ্লেন প্রায় ১৪০ জন আরোহী লইয়া
মুহুর্তে পঁচ পঁচ মাইল উড়িয়া প্রমাণ করিয়া গিয়াছে
যে, অতিকার এরোপ্লেনের চল হওয়া সম্ভব নহে।
এই এরোপ্লেনটির নির্মাণের সময়ও নাকি অত্যন্ত মেগের
বিশেষজ্ঞরা বলিয়াছিলেন, “উড়া কোনদিন উড়িবে

বাড়ীঘর এত কাছাকাছি যে, দুইটনার ভর অত্যন্ত
বেশি থাকিবে। “মানাডি” চালক চিরকালে থাকিবে,
কাজেই, দুইটনার ভরও থাকিবে।

আকাশ-জাহাজের (Airship) ভবিষ্যৎ কিরূপ
হইবে এখনও ভাগ করিয়া বলা যায় না; উহা,
এখনকার প্রধান বিপদটি তখন থাকিবে না। এতকালে
হাইড্রোজেন গ্যাস দ্বারা আকাশ-জাহাজের খোল ভর্তি
করা হইত। হাইড্রোজেন আগুন লাগিলে দাগুণ
পক্ষে কাজিয়া জাহাজের নক্ষা শেষ হইয়া যায়। এখন
হিলিয়াম (Helium) গ্যাস দ্বারা খোল ভর্তির ব্যবস্থা
হইতেছে। ইহা হাইড্রোজেন অপেক্ষা হালকা এবং
অদাহ্য। আকাশ-জাহাজের খোল বিরাট আকারের
হয় বলিয়া ইহার ব্যবহার পূর্ব বেশী হইবে আশা করা
যায় না। এরোপ্লেন অপেক্ষা আকাশ-জাহাজে বেশী
আরামে চলাকেরা করা যায় এবং দূরদেশে যাতায়াত
পক্ষে আকাশ-জাহাজ সুবিধাজনক।

এরোপ্লেনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার কার্যকারী
পদ্ধতিও বাড়িয়া চলিয়াছে। ডাক ও আরোহী লইয়া
যাতায়াত, মালপত্র বহন করা, মুহুর্তে উড়িয়া জঙ্গল
পাহারা দেওয়া ইত্যাদি কাজ তো বহুদিন হইতে
এরোপ্লেনের সাহায্যে করাই হইতেছে। বর্তমানে
এরোপ্লেনের সাহায্যে আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে
লইয়া যাতায়াত হইতেছে, দূরস্থ রোগীর ঔষধ এরোপ্লেনের
সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছাইয়া দিয়া
রোগীর প্রাণ রক্ষা করা হইতেছে, দুর্গম স্থানে এরোপ্লেন
হইতে মাটিতে খাবার ফেলিয়া দিয়া অনাহারগ্রস্ত
ব্যক্তিকে রক্ষা করা হইতেছে, সমুদ্রে নিমজ্জনমান
জাহাজের আরোহীদিগকে এরোপ্লেনের সাহায্যে বাঁচান
হইতেছে, এরোপ্লেন হইতে বিস-বায়ু প্রয়োগ করিয়া
অনিষ্টকারী পক্ষের হাত হইতে ক্ষেতের ফসল রক্ষা
করা হইতেছে। ইহা ছাড়া, এরোপ্লেন হইতে অসীম
ঘাসিকাদার বায়ু (Solid Carbon Dioxide) হাওয়া
মেঘের উপর নিক্ষেপ করিয়া কৃত্রিম বৃষ্টি সৃষ্টি করার
চেষ্টা হইতেছে।

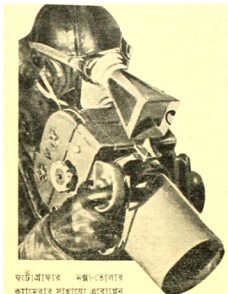


ভবিষ্যতের অতিকার এরোপ্লেনের পরিচয়ন।
পঁচ পঁচ বাড়ী লইয়া ঘণ্টার ২০০ মাইলেরও
আবিকবেগ চলিতে থাকিবে। ইহাতে বেড়াইবার
ও বেগিবার স্থান থাকিবে—অসীম স্থান।
তো থাকিবে।

না।” ভবিষ্যতের অতিকার এরোপ্লেনে নাকি বেড়াই-
বার স্থান, বলিবার ঘর, খেলার জায়গা, সবই থাকিবে।

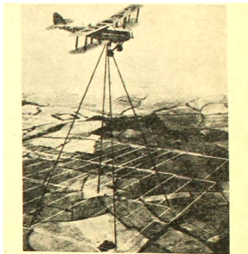
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা ভ্রমনা-কল্পনা চলিতেছে।
অনেকে বলেন, ভবিষ্যতে, শরের ছায়ে এরোপ্লেনের
নামিবার ব্যবস্থা থাকিবে এবং মোটরের পরিবর্তে
এরোপ্লেনেই এ-বাড়ী ও-বাড়ী যাতায়াত চলিবে। ছোট
শহরে বা গ্রামে একদল ব্যবস্থা থাকিতে পারে, কিন্তু
বড় শহরে একদল হওয়া সুসুপ্রসারিত। কারণ, শহরের

এরোপ্লেনের সাহায্যে দেশের নক্সা (Map) প্রস্তুত করা একটি অতি আবশ্যক কাজ। এই কাজ করিতে সময়ও অল্প লাগে, কাজটিও পরিপাটি ও নিখুঁত।



ফটোগ্রাফার নক্সা-তোলায়
ক্যামেরার সাহায্যে এরোপ্লেন
হইতে ফটো তুলিতেছেন।

হয়। এ কাজের বয়স্কারের ক্রমোন্নতি হইয়া আশ্চর্যজনক। এত শুল্কের এবং সঠিক হইয়াছে যে, এই সকল আকাশ-ফটোর নক্সা দেশ-বিদেশে ব্যবহার করা হইতেছে। এই কাজের ক্ষেত্র এরোপ্লেনটিকে উড়িবার সময় জমি হইতে



ভিন্ন ভিন্ন ফটো তুলিয়া, সেগুলি কাটিয়া ছোড়া।
লাগাইয়া কি ভাবে আকাশ হইতে জমির নক্সা
তৈয়ারী করা হয় তাহাই দেখান হইয়াছে।

একটি বিশেষ উচ্চতার রাখিতে হয়। ফটোগ্রাফার পর পর শত শত ছবি তুলিয়া বাইতে থাকেন; পরে সেগুলিকে ছোড়া দিয়া একটি বড় নক্সা প্রস্তুত করা হয়। আবশ্যকমত নক্সাটি ছোট করিয়া লওয়া চলে। জলপ্রাবনের সময় এরোপ্লেন হইতে প্রাপ্ত মেথের ফটো লইয়া অনেক আবশ্যক তথ্য সংগ্রহ করা যায়; প্রাপ্ত মেথের নক্সাও করা যায়। ভবিষ্যতে



সোলিডেট কুশিয়ার বিরাট ক্ষেত্রে এরোপ্লেনের সাহায্যে বীজ ছড়ান হইতেছে।

এই বিষয়ে আরও উল্লেখ হইয়া শেষে হয়তো সব নক্ষত্রই এরোগ্রেনে হইতে ক্ষুদ্রা তুলিয়া তৈয়ারী করিতে হইবে।

বীজ বপনের কাজেও এরোগ্রেনের সাহায্য লওয়া হইতেছে। কৃষিকার “জাইগ্যান্ট” (Gigant) নামে বিরাট পত্রকের প্রস্তুত করা হইয়াছে। আকারে তাহা বেলজিয়ামের মতন বড়। একশ আরও ক্ষেত্র-স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে। এই সকল বিরাট ক্ষেত্রে এরোগ্রেন হইতে বীজ ছড়াইবার চেষ্টা পূর্বই লক্ষ্য

হইয়াছে। এক মিনিটে প্রায় তিন একর (Acre) ক্ষেত্রে এই উপায়ে বীজ ছড়ান চলে। ভবিষ্যতে কৃষির উন্নতির সঙ্গে বৃহত্তম ক্ষেত্র স্থাপিত হওয়া এবং এরোগ্রেনের সাহায্যে সেখানে বীজ ছড়াইবার আয়োজন হওয়ার সম্ভাবনা পূর্বই বোধ্য।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এরোগ্রেনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেশী কিছু লেখা সম্ভব হইল না। যাহা লেখা হইল তাহা হইতেই অনুমান করা যাব যে, ভবিষ্যতে এরোগ্রেনের কার্যকারিতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে।

“সৌন্দর্যের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, মননের দ্বারা পাশ একেবারে ভিতর হইতে বিলুপ্ত, বিলীন হইয়া বাইবে, ইহাই আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষা। সন্সারে তাহার সহন বাধা ব্যতিক্রম থাকিলেও ইহার প্রতি মানবের অন্তরতর লক্ষ্য একটি আছে। সাহিত্য সেই লক্ষ্য সাধনের নিপুণ প্রয়াসকে ব্যক্ত করিয়া থাকে। সে ভালকে সুন্দর, সে প্রেমকে প্রিয়, সে পুণ্যকে ছন্দের ধন করিয়া তোলে। কলাকল নির্ণয় ও বিভীষিকা দ্বারা আমাদের কল্যাণের পথে প্রবৃত্ত রাখা বাহিরের কাজ—তাহা নগনীতি ও ধর্ম-নীতির আলোচনা হইতে পারে—কিন্তু উচ্চ সাহিত্য অন্তরাত্ম্যের ভিতরের পথটি অবলম্বন করিতে চায়;—তাহা বভাব-নিপুণত মনোমলের দ্বারা বলস্ব কালন করে, আন্তরিক স্ফূর্তির দ্বারা পাশকে দখল করে এবং সহজ আনন্দের দ্বারা পুণ্যকে অভ্যর্থনা করে।”

—রবীন্দ্রনাথ

প্রবাস-মাতা

শ্রীকালিদাস রায়

বিষবিভ্যাপ্তি হ'তে বাহিরিয়া সেদিন বখন
সদোর-পাশের আমি নববারী উন্মোক্ত-নরন
সহায়-সফল-হীন, তুমি মোরে করিলে আহ্বান ;
যেহভরে তব প্রাণ অত 'পরে দিলে মোরে স্থান ।
তার পর হ'তে তুমি অন্ন দিয়া, দিয়া বিদ্যাকায়া,
দিয়া কল, বস্তু জল পোষণ করিলে এই কায়া
কত না যাতনা-যত্নে । তুমি মোর নব বধুটির
সজিনা-ফুলের লাক্ষ হড়াইয়া, দর্শিতাও-শিরে
করিলে বরণ, মাসো ! বনমল্লী করিয়া চরন
নিম্ন হাতে রচেসিলে এর্বাসের বাসর-শয়ন ।
নিরুদ্বেশ শান্তিময় শ্রীতিময় প্রকুল বিভ্রাম ;
জীবনের রসধন অংশটুকু লুখে যাপিলাম
তোমারি অফলহায়ে ।

এল আজি বিনারের দিন ;
উষেলি' উঠিছে গ্রাণ হেরি' তব সুখশ্রী মলিন,
এ পাষণ্ড-বন্ধ কাটি' স্বর্ণলস স্বরে তপ্ত জল,
ভিষায় তোমার প্রাণ সেবদার-ভগ্নের অফল ।

তোমার ভাণ্ডার ভরা, নহ হীনা, নহ মা রূপা ;
তবু বিদ্যারের দিনে আমি মোর ব্যাকুল প্রার্থনা—
অচলা থাকুন লক্ষী তব গৃহে । তোমার সন্তান
তেমবী হনবী হোক আরো স্ববী আরো স্বচ্ছন্দান্ ;

তব বিভ্যাপ্তিবানি রীক্ষা দিয়া তোমার সন্তানে
পাঠাক মা সেবে দেশে নব নব জ্ঞান-অভিবানে
অন্ধিতে বিজয়-মাল্য ।

সোবিশেষে মন্দিরে তোমার
সম্ভারতি কক্ক, মা, পাড়তর ভক্তির সকার
তোমার সন্তান-বন্ধে । রসদর্শ তোমার প্রাণেরে
বেথানে রক্ত ফলে সেধা বেন ফলে ধরে ধরে
কবিত কাকন, হৃদি ।

বেড়ে বাক্ চন্দার সৌরভ,
শেকালি-বকুলে বেন স্তম্ভতর চয়, মা, সৌরভ
পবনে করিতে গন্ধ । আরো মিষ্ট হোক তব ছায়া ;
লতা বেন হ'রে আরো শীনতরা ঘনপর্ণকায়া
লবল তরুরে তব বাধে আরো নিবিড় বন্ধনে ।
তোমার অঙ্গন বেন ত'রে বাধ তুলসীর বনে ।
কেন তা তো জ্ঞান তুমি । জানি যেহু তব পরমিনী,
সোকুলের স্বচ্ছ তোমা দিক্ তারা হইয়া 'মন্দিরী' ।

তব সন্ধ্যাধীপাণ্ডোক চিরদিন তোমার কুটীরে
পঙ্কুক মমতা-ভরে আশ্রয়াধী পথিকের শিরে ।
বনের হরিণীসমা হৃদিতারা তোমার সরলা,
সী'বির সিন্দূর-লোখা তাহাদের হউক অচলা ।
দূরে বায় আজি, মাসো, তব চিত্তপন্থের ভ্রমর,
ভুলিবে না, শুষ্করণে করিবে সে তোমায়ে অমর

নব্য-সাহিত্যের নীতি

বসু বঙ্কু

আমাদের সাহিত্য-প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠেছে—আমাদের উৎপত্তি সাহিত্যের সমীচীনতার প্রমাণ দেয়, বিবেচনা করি—সাহিত্য-সম্পর্কে “স্বরণ কর শেখের শেখিন কি ভয়ঙ্কর” এমন কোন-কিছু নিদাঘত শব্দায় বৃদ্ধমান হই না।

আমাদের সমগ্র বুদ্ধির বিচারই প্রার্থনা করি। আমাদের কাছে গোটা কয়েক কথা মুখো-মুখী সহজ-সোচ্ছা ভাবে নিবেদন করতে চাই।

কোন কোন পণ্ডিত, মনে হয়, সাহিত্যের কোন কঠিন অনড় আদর্শ ধরে নিয়েছেন। বৌদ্ধ-ধর্মে

তথা-কথিত নব্য-সাহিত্যের মোটামুটি এই ক’টি

এই কথাটি নিয়ে খুব জোর দেওয়া হয়েছে—আইন্-

স্ট্রাক্চার নিয়ে বিতর্ক।

হচ্ছে, যথা, (১) এ

সাহিত্য কল্পিত

অর্থাত্ এ নীতির হানি

ঘটায়, আর এই মূল

মন্ত্রেরই একটি

শাখা আছে যে এর

বিষয়বস্তু (Themes)

অভ্যুত্থান, এ

জাতীয় সাহিত্য নয়,

বৈদেশিক এমন কোন

কিছু আনন্দের

করা হচ্ছে বা

কিছুতেই এখানকার

জলহাওয়ার উপ-

যোগ্য নয় (un-

acclimatisable).

(২) সাহিত্যের যে

সমাজ নিয়ন্ত্রণের দাবি

আছে, সে-কথা নব্য-সাহিত্যে

বোধোন্মুক্ত গুরুত্ব পায়

না—বরং অস্বীকৃতিই হচ্ছে—

এ কথাটিও ১নং এর অন্তর্ভুক্ত

কিছু নয়।

প্রসিদ্ধ নাম ও বচন উদ্ধৃত করার উপকারিতা

নিশ্চয় করা একই মত, কেননা তেমনি বচনোক্তের

বিদ্যমান

কর্তব্য

মস্তিষ্কে

হৃদয়

ধারাসারে

ভক্ত প্রাণে

পাশে প্রাণে

কৃষ্ণা মালা

কলমে

খচিত

গুরুত্ব

ভর

তবনি

নিখর

নিখিল

দমক

অথ

কল্প

লোল

বস্ত্র

কর্কর

পাতিমা

কল্পি

পীতি

মনস্

অপরা

সদু

সদু

সমা

সমা

করা

করা

বিশ্বমাতা

(মহাকাজা হলে)

শ্রীদীপকুমার রায়

টাইনের ‘বিগারী অক্-

সিমেট্রি’র দার্শনিক

ব্যাখ্যা হওয়ার চেয়ে

আমাদের মুখে—জাগ-

তিক সকল ব্যাপারই

‘সম্পর্ক’ (Relative

আংশিক) মত;

যে-কোন আদর্শেরই

তা’হলে প্রকৃতি ও

মানবতার পরিবর্তন

যটা শুধু সম্ভব নয়,

ব্যতীত—সাহিত্য-

ধর্মণে সে কোঠায়

পড়ে।

কথাটা ঐতিহাসিক

মত। কয়েকটি সর্ব-

জন-পরিচিত ঘটনার

উদাহরণ দিচ্ছি

কথাটা পরিচায় হয়। বিজ্ঞানসম্মত, কবি-পাঁচালী,

হাফ-আবদায়েরও হৃৎ ছিল—ঐরক্ত্র গুপ্তেরও

কাল ছিল, মধু-হেম-নবীনচন্দ্রেরও সময় এসেছে

নিম্নে—বীরেন্দ্রনাথের হৃৎ ও গৃহীত হয়েছে।

বিক্রমচন্দ্রের হৃৎ-বিগল ও শরৎচন্দ্রের নবহৃৎ সবই মনে

[ইহার বাকী অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়]

আধুনিক কথাসাহিত্য

খ্রিসরোজনাথ ঘোষ

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেও কথা-সাহিত্য—ছোটগল্প, উপন্যাস—সাহিত্যের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মানুষের মন পল্ল ভালবাসে, কল্পনার চিত্র মনকে অভিভূত, পুলকিত করে, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম।

কথাসাহিত্যের প্রভাবও অসামান্য। নরনারীর চিত্রে কথাসাহিত্য ঐক্সময়িক প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। মহত উপদেশ, কঠোর শাসন দেখানে ব্যর্থ হয়, কথা-সাহিত্য দেখানে মতি চমৎকার কার্য করিয়া থাকে; ইহার দৃষ্টান্ত মানব-সমাজে বিরল নহে। কথা-সাহিত্যের প্রেরণের ইহাও একটা প্রধান কারণ, অনেক পণ্ডিত ও সমালোচক এই প্রকার অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

পল্ল ও কাহিনী আদিম যুগ হইতে মানব-সমাজে প্রচলিত। প্রাচীন সাহিত্যসমূহে পল্ল ও কাহিনীর প্রচুর সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতরঃ কথা-সাহিত্য যুগে যুগে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া, প্রকাশ-ভঙ্গীর বিচিহ্নতায়, সত্য মানব-সমাজে চলিয়া আসিয়াছে। প্রাচীন যুগে যে-ভাবে কথা-সাহিত্য মানব-মনোরঞ্জে আশ্রয়প্রকাশ করিত, পরবর্তী আধুনিক যুগে তাহার যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছিল।

বর্তমান যুগে আবারো বাদালা দেশে কথা-সাহিত্য বে-আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা প্রতীচ দেশের পরিবর্তিত ভঙ্গীর অঙ্গুলারী, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সাহিত্যসম্রাট বক্তবক্তে তাহার অতুলনীয় প্রতিভার প্রভাবে কথা-সাহিত্যকে নূতন আকার প্রদান করেন। বাদালাগার কথা-সাহিত্য সময়ে আলোচনা করিবার পূর্বে, প্রতীচ দেশের কথা-সাহিত্যের গতি-পরিণতির কথা আলোচনার প্রয়োজন ঘটে।

প্রতীচ দেশের কথা-সাহিত্য বিরাট। তাহার সজিত সম্যক ও সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ করণের ভাবনে কলাইচা উঠে তাড়া জানি না। রত্ন এমন লোক বাদালা দেশে থাকিতে পারেন, কিন্তু প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া শুধু কথা-সাহিত্যের চচ্চা করিয়াও মানুষ ক্ষুদ্রব্যক্তি সে অধ্যায সমুদ্রের উপকূল-ভাগেই শুধু বিচরণ করিতেছে।

সামান্য বাহা কিছু ইংরাজি অন্তর্ভাব সাহিত্যের সচরাচর আচরণের সৌভাগ্য লাভ করা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, যুরোপ মহাদেশ কথা-সাহিত্যে সক্ষ-মতা স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ফ্রান্স, রুসিয়া, হাঙ্গেরীতে বহু প্রতিভাশালী লেখক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাগাদের রচিত কথা-সাহিত্য সাহিত্যের ভাণ্ডারে যে অমূল্য এবং প্রাণীপু রত্ন সজিত রাখিয়াছে, তাগার তুলনা হয় না।

কথা-সাহিত্যের মধ্যে ছোটগল্প এবং বড়গল্প বা উপন্যাস এই দুইটির কথাই এ ক্ষেত্রে বলা হইতেছে। নাটক, প্রহসনকে প্রকৃত প্রস্তাবে কথা-সাহিত্যের অন্তীকৃত ধরিলেও বর্তমান প্রবন্ধে আমি শুধু ছোট গল্প এবং উপন্যাস এই দুইটির কথাই বলিতে চাহিয়াছি।

ছোটগল্প রচনার ফরাসীদিগের সমকক্ষ কেহ নাই, একথা যুক্তকণ্ঠে বহু সমালোচকই স্বীকার করিয়া থাকেন। মোপাসাঁ, ব্যাল্‌ম্যাক, জোজে প্রভৃতি ফরাসী ছোটগল্প-রচয়িতৃগণ সাহিত্য-ক্ষেত্রে অনস্বকরণীয় প্রতিভার ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। রুসীর ছোটগল্প-লেখকগণ—কাউট টলষ্টয়, ম্যাক্সিম গোর্কী প্রভৃতির রচিত ছোটগল্পও অস্বাধারণ প্রতিভার স্ফোটক। যুরোপ মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত—হাঙ্গেরী, অস্ট্রিয়া, ইটালী, জার্মানী, রুমেनिया প্রভৃতি স্থানে প্রতিভাশালী ছোট-

পন্ন লেখক যথেষ্ট নৈশুণ্যের পরিচয় দিচ্ছিলেন সত্য, কিন্তু করাসী বা কসীর ছোটগল্প-লেখকদের তুলনার ঠাহারা সমালোচকদের নিকট ভেদন অকুঠ প্রকাশ্য লাভ করিতে পারেন নাই। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ছোটগল্প-লেখক টমাস হার্ডি প্রবুধ মন্ব করেকজন এবং আমেরিকার গ্রেট হার্ট প্রভৃতি অনুল্লির পক্ষে পননীর করেকজন ছোটগল্প-লেখকের নাম বাছারে স্থপরিচিত হইলেও ছোটগল্প সম্বন্ধে বিশিষ্ট সমালোচকগণ ঠাহাদিসকে ক্রাশ বা কসিয়ার ছোটগল্প-লেখকগণের তুল্যাসন প্রদান করিতে চাহেন না।

উপক্ভাস-রচনার ক্রাশ, কসিয়া, ইংলণ্ড, হাঙ্গেরী সমগ্র সন্ডা দেশের ঈর্ষহান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কসিয়ার কাউন্ট টলষ্টয়, ন্যার্সিম শোকাঁ, ক্রাপের ভিষ্টর হুগো, আলেক্সান্ডার ডুমা, হাঙ্গেরীর সাগান্‌কিবেশ, ইংলণ্ডের ডিকেন্স, থ্যাচারে, গট, ফল্‌কন প্রভৃতি উপক্ভাস-কল্পতে যে রহস্যবি ছড়াইয়া গিয়াছেন, তাহার বীতিতে সমগ্র কল্প উদ্ভাসিত।

অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে-সকল কথা-সাহিত্যিক কল্পগ্রহণ করিয়াছিলেন, ঠাহাদের প্রতিভার দিব্যদ্যুতি সাহিত্যকে বেভাবে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, তাহার পরবর্তী যুগে যুরোপ ও আমেরিকার যে-সকল কথা-সাহিত্যিক অবিরূত হইয়া কথা-সাহিত্যের রচনা করিতেছেন, ঠাহাদের অনেকের প্রতিভার বিশেষ বীতি থাকিলেও সকলের নিকট হইতে ঠাহাদের পূর্নকল্পের অকুন্নীর রচনা-সম্পদের অল্পতল সম্পদ সাহিত্যের ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ ও বীতিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে নাই, অনেক সমালোচকের ইহাই অভিমত।

শেকস্প, বার্নার্ড শ, আনাতোল ফ্রাশ, রোমা রৌল্যা, ভল্‌ ভল্‌ চেখোব প্রভৃতির অসামান্য প্রতিভার মাহুৎ বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ; কিন্তু যান্ত্রিককল্পের সভ্যতা, বহু-তান্ত্রিক অনৈক্যের পরিচয় বিশ শতাব্দীর অধিকাংশ লেখকের রচনার প্রেই হান অধিকার করিতেছে বলিয়া মনে করিলে তাহা অস্বীকার করা চলে কি?

ঠাহাদের পরবর্তী যে-সকল প্রতিভাবান্ কথা-

সাহিত্যিক অনূনা যুরোপ ও আমেরিকার লেখনী সঞ্চালন করিতেছেন, ঠাহাদের রচনার জীবনের নানা রহস্যের নানা দিক্‌ গুণ্‌ বহুতান্ত্রিক মণ্ডাযান্ত্রিক সভ্যতার মাণকাটিতে যে লেখা দিতেছে, ইহা কোনও মতেই অস্বীকার করা চলে না।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে যুরোপ ও আমেরিকা বীণপুষ্ঠকে বিন্ত হইয়া নাই—তখন ধর্মবিশ্বাস ও নীতিবাদ বিজ্ঞানের মাণকাটিতে পরিমাণের চেষ্টা হইয়া নাই। কিন্তু মহাযান্ত্রিক সভ্যতার জীম স্বর্গরোশন বতই প্রবল হইয়া উঠিতেছে, বহুতন্ত্রের উপাসনার নরনারী বতই উৎসাহভরে আশ্ববিক্রম করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ততই যুরোপ ও আমেরিকা ঠাহাদের জ্ঞানকর্তা বীণপুষ্ঠকে বিন্ত হইতেছে, ধর্মবিশ্বাস ততই একটা কুসংসার বলিয়া পরিত্যক্ত হইতে চলিয়াছে। সমগ্র যুরোপ ও আমেরিকার মিকে চাহিয়া দেখিলে এই অমোঘ সত্যকে কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। ইহার ফলে সাহিত্যেও গুণ্‌ বহুতন্ত্রের রসলেশহীন বুদ্ধি, মহাযন্ত্রের দানব-স্বপ্ন প্রতিকলিত হইতেছে। কথা-সাহিত্যও অজ্ঞাতসারে সেই কল্পের বেসাতি করিতেছে, ইহার প্রতিবাদ করা চলে না।

হয়ত মাদৃশ ক্ষুদ্র মানবের ইহা ভ্রান্ত ধারণা। কিন্তু উপলব্ধ সত্যকে প্রকাশ করিবার অধিকার সকলেরই আছে—যদি না তাহাতে মানব-সমাজের অকল্যাণ ঘটে।

যুরোপীয় কথা-সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া এখন বাঙ্গালার কথা-সাহিত্যের বিকল আলোচনা করা হউক। বাঙ্গালার দেশে বর্তিম-যুগই কথা-সাহিত্যের যুগ। বর্তিমচক্র ছোটগল্প বড় লেখেন নাই। ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরী, বাজসিংহ, রাধারানী এই চারিটি ছোট আকারে যে পন্ন রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ইন্দিরা ও বাজসিংহ পরে বড় উপক্ভাসে পরিণত হইয়াছিল। আমি বর্তিমচক্রের রচনার বিদ্যুৎ ভক্ত, যুগলাঙ্গুরী বর্তিমচক্রের পর অনেকগুলি প্রথম প্রেণীর উপাস্য উপক্ভাস বহু-সাহিত্যকে পরিপূর্ণ করিলেও

ভাষার মত কথা-সাহিত্যিক (৩ উপজাতিক) বাঙ্গালা সেলে এখনও কেত জন্মগ্রহণ করেন নাই; উপজাতলে ভাষার অধিকার-সীমার কাছাকাছি কেত সাইতে পারেন নাই, একথা দুঃস্বপ্নে পাঠক বা সমালোচক হিসাবে প্রকাশ করিলে নিশ্চয় অপরোধী হইব না। তবে একথা বলিব যে, ঘোষালা, ডোডে, ব্যাল্ফাক প্রভৃতির ছোট-গল্পের রসাস্বাদন করিয়া রসপিপাসু পাঠকগণ যে পরম আনন্দ উপভোগ করেন, বিভিন্নচরিত্র সে-শ্রেণীর ছোটগল্প রচনার সাহায্যে রস পরিবেষণ করেন নাই। সে-শ্রেণীর ছোটগল্প রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার প্রভৃতি কয়েক জন উচ্চশ্রেণীর কথা-সাহিত্যিকই রচনা করিয়াছেন।

ইুরোপীয় সভ্যতার প্রবাহ এদেশের ভূতলশে অনেক দিন হইতেই প্রবৃত্ত হইতেছে। বাঙ্গালার ভূ-ভূমি অতিক্রম করিয়া বস্তার প্রবাহ-ধারা একদিন ভীমবেগে বহিয়া গিয়াছিল, এখনও তাহার বেগ মন্দীভূত হয় নাই। প্রভীচা পদ্ধতিতে শিক্ষা-বিস্তার আরম্ভ হইলেও অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী নিম্নের জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে ইুরোপীয় সভ্যতার বৃণকায়ে উৎসর্গ করে নাই। ধর্মবিশ্বাস, নীতিজ্ঞান তখনও বাঙ্গালী সাহিত্যসেবীদিগকে পরিভ্রাণ করে নাই। বরং সে-সুদের শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের মধ্যে বিভিন্নচরিত্র, ভূসেব, দীনবন্ধু মিত্র, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়কুমার সরকার প্রভৃতি ইুরোপীয় সভ্যতার আক্রমণ হইতে বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরমহংসদেবের সংস্রবে আসিয়া বহু বাঙ্গালী আপনার জাতীয় ধর্মভাবকে ফিরাইয়া পাইতেছিল। পুরুষসিংহ বিবেকানন্দের গভীর গর্জন সাগর-পার হইতে নৃতন প্রেরণায় বাঙ্গালীকে আরও শক্তিশাল করিল।

কিন্তু মহাবল্লভ দানব বধন সমগ্র ইুরোপ ও আমেরিকায় তাহার ইচ্ছাভালের সন্মার কুহক রচনা করিতে লাগিল, বহুতরুর উপাসনার ষ্টুপ্ত ইুরোপ ও আমেরিকাবাসীরা মাতিয়া উঠিল, তখন ভারতবর্ষে—বাঙ্গালার তাহার প্রভাব অস্বত্ব হইবে না?

বাঙ্গালার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্মের কোনও সন্মব নাই। শৌনে হই শত বৎসর ধরিয়া ধীরে ধীরে ধর্মশিক্ষা অমরিত হইয়া গিয়াছে। স্তত্রায় ধর্মমান যুগে মহাবল্লভ এবং বহুতরু যুগুচরণক্ষেপে মানবমনকে জর করিবে, ইহাতে বিশ্বস্তের অবকাশ কোথায়? মহাবল্লভ বিজ্ঞানের সন্তান, বহুতরু মহাবল্লভের সহোদর। উভারা যুগ ও উপযুগের মত ধর্ম ও মর্মে রাসা বিস্তার করিয়া সুরগণকে পাতালে প্রেরণ করিয়াছে। তাহাদের প্রবল প্রভাশে সমগ্র মেদিনী একশ্মিত। বাঙ্গালাসেলও অধুনা যুগ-উপযুগের পদতরে টলমল করিতেছে।

অধুনা বাঙ্গালা সাহিত্যে যে কথা-সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটতেছে, তরুণ দলের একশ্রেণীর লেখক তাগাতে রসবল্লী করিতে গিয়া বীভৎস রসের আমদানী করিতেছেন, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা ভাষার ভাষার যে চরিত্রবল্লী ও ঘটনা-সংস্থাপনের প্রয়াস পাইতেছেন, তাহা বাঙ্গালার নরনারীর মধ্যে জনিত, বাঙ্গালার আবহাওয়ার সেক্স ভাবের ঘটনা-সংস্থান পক্ষাইয়া উঠিতে পারে না। ইুরোপের একশ্রেণীর লেখক তাহাদের মহাধাষিক সভ্যতা-উদ্বৃত্ত, বহু-তাত্ত্বিকতার মাদকতার মত বেসকল নর-নারীর চরিত্রে প্রথম রিসুর উমাননা ফুটাইয়া তুলিয়া ‘মার্ট’ বা রস স্ত্রীর প্রয়াস পাইতেছেন, তাহাকেই প্রকৃত আদর্শ বলিয়া এদেশের উল্লিখিত শ্রেণীর তরুণ সাহিত্যিকগণ মানিয়া লইতেছেন; মানসিক ব্যাধিগ্রহৃত সেই সকল সাহিত্য-স্বষ্ট মরনারীর বেশ-পরিবর্তন করাইয়া তাহারা ঐগুলিকে বাঙ্গালী বলিয়া চালাইয়া সহজলভ্য বস: ও কিঞ্চিৎ অর্থ পাইবার প্রভাশা করেন, এইরূপ অনেকেরই অভিমত।

কিন্তু আমি ঠিক তাহা মনে করি না। আমার ধারণা, শুধু সহজলভ্য বস: ও অর্থের জন্যই উল্লিখিত তরুণ সাহিত্যিকগণ এই শ্রেণীর ইুরোপীয় অগুরুত্ব কথা-সাহিত্যের অমুকরণ করিতেছেন না। সবেম ও ধর্ম-শিক্ষা বর্জিত এদেশে যে শিক্ষাপ্রাণী চলিতেছে, তাহার প্রভাবে মন ক্রমশ: বহুতাত্ত্বিকতাপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

তাহার ফলে মানবের সেহ ও মনে আদিম হুগের যে পাপের প্রকৃতি স্বপ্ন-সামান্য মূগ হইয়াছিল, ধর্ম ও সংঘের অভাবে তাহা কাহারও কাহারও মনে ব্যাধির আকারে প্রবল হইয়া উঠিতেছে—ইউরোপেও বটে, এদেশেও বটে।

আধাশীর মূগপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক এবং মন-প্রবন্ধি ডাঃ আর, ডি, ক্রাফ্ট-এবিং “গাইকোপ্যাথিয়া সেক্সুয়ালিস” নামক যে বিরাট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাতে যৌনসম্ভার অতি চমৎকার আলোচনা ও দৃষ্টান্ত আছে। ডাঃ ক্রাফ্ট-এবিং প্রায় ২৬২টি ব্যাধিগ্রস্ত নর-নারীর দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছেন। প্রত্যেক ও পরোক্ষ ভাবে এই সকল নর-নারীর সেহ বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা করিয়া ডাঃ ক্রাফ্ট-এবিং অথবা অন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যে-সকল উৎ প্রচার করিয়াছেন, তাহা যেমন বিশ্বব্যাপী, তেমনই বীভৎস।

আমাদের বাঙ্গালদেশে করেকজন ভরূপ সাহিত্যিক করেকখানি উপন্যাসে ও কতকগুলি গল্পে যে-সকল নরনারীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার সহিত ডাক্তার ক্রাফ্ট-এবিং প্রস্তুত ব্যাধিগ্রস্ত নরনারীর চরিত্রের বনিত সাদৃশ্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান প্রবন্ধের ক্ষুদ্র কলেবরে তুলনা-মূলক আলোচনা করিয়া দেখাইবার যবকাশ নাই। যে কেহ ইচ্ছা করিলে এই গ্রন্থপাঠে তাহার সঙ্গ ঘূচাইতে পারেন।

ডাক্তার ক্রাফ্ট-এবিং মার্কু'ইস সেড্ নামক একজন যৌন-রাক্ষসের পরিচয় দিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মার্কু'ইস সেড্ অনেকগুলি কুংসিত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত লেখক বহু যেমন প্রথম রিপূর প্রচণ্ড উপাসক ছিলেন, তাহার রচিত গ্রন্থে তাহারই উৎকট পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার অশুভ কৃতি ও আচরণের জন্য তাহারে পাপুলা বারসে বন্ড করিয়া রাখা হয়। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে তিনি পলায়ন করেন।

কন্সল্ বোনাপার্টকে তিনি তাহার রচিত উপন্যাস-জালি ভাঙ্গ করিয়া বাধাইয়া উপহার প্রদান করেন।

বোনাপার্ট উহা পাঠ করিয়া, তাহার বীভৎসতার ক্রূর হন এবং গ্রন্থগুলি ভগ্নদাত করেন। সেড্কে পুনরায় পাপুলা বারসে পাঠান হয়। ৬৪ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু ঘটে। তাহার রচিত কোনও গ্রন্থ এখন হস্তাপা। মার্কু'ইস সেডের ব্যাধিগ্রস্ত মনোবৃত্তিকে এখন “ভ্রান্তি” বলিয়া বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকগণ অভিহিত করিয়া থাকেন। এই ব্যাধি চিকিৎসকগণ বহু মানবে আবিষ্কার করিয়াছেন। ভ্রমণো সাহিত্যিক, শিল্পী, কবি, সকল শ্রেণীর লোকই আছেন।

সুতরাং নর-নারীর সম্ভার বাঁহারা যৌনতত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়া ইহা নীরে লেখনীচালনা করিতেছেন, প্রথম রিপূর ক্রিয়াকে নানাভাবে উদ্ভব করিয়া দেখাইয়া পাঠক মগ্নাইতেছেন, তাহাদের সেহ ও মন যে ব্যাধিগ্রস্ত, বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিকিৎসকগণ তাহা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন।

এ কথাও সত্য, অনেক আচরণে সংঘত হইলেও তাহারা মানসিক ব্যতিকারে অভ্যস্ত। ডাক্তার ক্রাফ্ট-এবিং “ভ্রান্তি” “ম্যাসোসিস” রোগগ্রস্ত প্রথম বহু লোকের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। কাজেই শারীরিক ব্যতিকারে সাহস না থাকিলে, রচনার সাহায্যে তাহারা মানসিক ব্যতিকারকে মোতদী করিয়া চিত্রিত করিয়া থাকেন। ইহাও ব্যাধি।

আমেরিকা ও ইউরোপে এই ব্যাধি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই অল্পতর দৃষ্টান্ত সেখানে দিন-দিনই বাড়িতেছে। ধর্মবিশ্বাসহীন, অসংযত নাস্ত্র লেখক সেই শ্রেণীর রচনা প্রকাশ করিতেছেন। বাঙ্গালদেশেও এই ব্যাধি ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকগণ অস্বচ্ছ-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন লেখকগণের সেহ বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

সুতরাং বর্তমানে যৌনতত্ত্ব-মূলক যে-সকল ছোটগল্প বা উপন্যাস বাঙ্গালীর বাহির হইতেছে, তাহা বাঙ্গালীর নরনারীর চিত্র নহে, তাহাতে বাঙ্গালী জীবনের পরিচয় নাই, রিডেন্স-উদ্দীপক যে-সকল চিত্র অঙ্কিত হইতেছে.

তাহার ফলে অপরিশ্রবণ্য তরুণ-তরুণীর চিত্র উহা পাঠে কণ্ঠস্থিত হইয়া উঠে। উহাতে আর্ট বা রসের একান্ত অভাব।

যাকু ইন্সেজেক সেদেশের শাসক শাপলা দরবে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার রচিত গ্রন্থাবলিকে অগ্রিসং করা হইয়াছিল; কিন্তু এমুসে ডেমন শাসন-ব্যবস্থা কোথায়? কুৎসিত-ভাণ্ড-পূর্ণ গ্রন্থগুলিকে পুড়াইয়া দেলিবার চেষ্টা যে প্রদেশদ্বীপ তাহাতে সম্ভব নাই; কিন্তু সর্বাংশে প্রয়োজন, বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই প্রদেশের লোকগণকে পরীক্ষা করিয়া দেখা। যদি ভাষ্যের ক্রাক্-ট-এবিং-এর কবিত কোন-না-কোন ব্যাধি ইহাদের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে ভিকিংস ব্যাধি সে-ব্যাধি দূর করা বাঞ্ছনীয়। তাহাতে ঐ প্রদেশের লোক-গণের ও উপকার এবং বাদ্যাদার অঙ্গাঙ্গ্য নবনীর ও প্রভূত কল্যাণ হইবে।

আধুনিক কথাসাহিত্যের বে-অংশ দুর্নীতি-পূর্ণ তাহার সম্বন্ধে উক্তি কল্পিত হইলেও উপায় নাই। কারণ, বাদ্যাদী ভাষিকের দেহ ও মনে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতে হইলে, কুৎসিত সাহিত্যের প্রভাব হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন। সঙ্গে ধর্মশিক্ষার প্রবর্তন আবশ্যক। বাহ্যতা বলেন, কথাসাহিত্যিক কুলম্বার্টার বা বর্ষোপদেশে হইবে না, তাহাদের কথা সর্বাংশে সত্য নহে। কথাসাহিত্যিক ধর্মোপদেশ বা নীতি-শিক্ষা দিবে না; কিন্তু দুর্নীতির শিক্ষাও দিবে না। এমন চরিত্র সৃষ্টি করিতে হইবে, বাহ্যতে মন প্রসাদগুণে পূর্ণ হইয়া উঠে। যে-রচনা পাঠ করিয়া শরীর ও মন দুয়াদলিয়া জাহ্নবী-ধারার অবগাহনের দ্বারা নিভৃত্য পূর্ণ হইয়া না উঠে, উপরন্তু প্রথম রিপূর ভাঙনার অধীর হইয়া পড়ে, সে-রচনা মন্ত-যে-সেই শোভা পাউক না কেন, বাদ্যাদা দেশে তাহা বন্ধ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

বলিবার কথা অনেক থাকিলেও লোকের বৈজ্ঞানিক আনন্দ এইখানেই বন্ধব্য শেষ করাই সঙ্গত। তাহার পূর্বে এই কথটি কথা বিশেষ প্রাধান্যযোগ্য। ‘সাহিত্য’-সম্পাদক পরলোকগত ছুরেশচন্দ্র সমাধপতি বলিয়া-ছিলেন—

(১) “বিলাতী শিক্ষা ও বিলাতী সাহিত্য বাদ্যাদা অক্ষরের শোব্যাক পরিচা অদেই হইতে পারে না, পারিবে না।”

“জাতীয় প্রকৃতির, জাতীয় সংস্কারের ও জাতীয় ভাবের বিরোধী বিশেষের আমদানী ‘বিশেষ’ কোন সাহিত্যেরই সৃষ্টি করিতে পারে না।”

(২) “জাতীয় সাহিত্যের সম্পূর্ণ বিকাশ ও স্বাভাবিক হইলে তাহাতে মানবজাতির আত্মা ভাব-সম্পদের উদ্বহ হইতে পারে, তাহাতে বিশ্ব-সাহিত্যের উদ্বহ হইতে পারে। বাদ্যাদীর প্রাণ হইতে যদি বিশ্ববরণ্য ভাবসম্পদের উদ্বহ হয়, তাহা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে নিশ্চয় আশনার স্থান করিয়া লইবে।”

আমার পরম-প্রভাষ্যদ বন্ধু শ্রীযুক্ত দ্বিতীয়াশঙ্কর রায়-চৌধুরী তাহার রচিত “বাদ্যাদার জ্ঞান” নামক গ্রন্থে “বাদ্যাদার প্রাণ ও আধুনিক বাদ্যাদা সাহিত্য” ইত্বক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, “আধুনিক বাদ্যাদা সাহিত্যে বাদ্যাদার প্রাণকে খুঁজিয়া পাই না।” কথাটি বিশেষ-ভাবে সঙ্গত। কবীজ রবীন্দ্রনাথও একদিন লিখিয়া-ছিলেন, “আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বাংলা দেশের বা বাদ্যাদীর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। অজ্ঞান কেবল ম্যানেই বাংলা দেশ আছে। যদি কখনও বাংলা দেশের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়, তাহা হইলে তখন বাংলা সাহিত্য পড়িয়া এজন্য প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বাংলা এমন একটা দেশের সাহিত্য, যে-দেশ কোনও কালে বিদ্যমান ছিল না।”

নব্য-সাহিত্যের নীতি

[৪০ পৃষ্ঠার অন্তর্ভুক্ত]

নেওরা চলেছে। টেনিসন্ হ'তে ইয়েটন্, ওয়ার্ডসওয়ার্থ হ'তে ডি, এইচ. লরেন্স, ফুল-ফুন্ডার যটোছে। টেনিসন্ ফুলফুন্ড, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ফুলফুন্ড—বিষয়বিশালত্বের পাঠ্য-তালিকার বাইরে তাঁরা ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছেন, একথা আমরা জানি। শেক্সপীয়ার-বিদ্যুৎ-সাহিত্য নিয়েও একটা লাইব্রেরী করা যায় এবং সেই সাহিত্য আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি-স্বীকৃতি সাহিত্যিকের দ্বারাও পুষ্ট হচ্ছে।

সুতরাং অত্যন্ত সত্য এ কথাটা ধীমান ব্যক্তিরাত্মও মানতে পারেন—কিছু শুধু বিভিন্নই নয়, কতি বহুলায়ও। এবং—বিপুল ৫ শতাব্দী কাল; ৫ নিরবধি:—শেষে এই ব'লে ছেড়ে না দিলেও কোনো সত্যিকার জীবন দেওয়া সম্ভব কি? অসম্ভব: সত্যিই কি সে অতিমান সম্ভব যে মানুষের ইতিহাসের শেষ কথাটি আজই আমরা ব'লে চিহ্নি! আর তা যদি সত্যি হয়, মনে হয় না কি, যে, বিস্তৃত জনেরও অবিলম্বে জৈনমতে প্রায়োপবেশনে কৈবল্যলাভ করা তির নাক্ত: পথ্য: আমাদের জীবনের সত্যীতম অলঙ্কার সম্ভাবনা বিকসিত হবে—এই motive-power—এই, মানুষের ভাত-কাপড়ের জীবনের উপরের অংশটি বেঁচে আছে—তারই বিভিন্ন উজ্জ্বলতার রূপান্তর—সাহিত্য!

আর্টের এক রকম বাংলা হয়ত হয়, হুন্ডর। সে-বেশে ফুল-ফুলে ও একই ফুল হুন্ডরের কল্পনার বিভিন্নতা দেখা গেছে, আপোই সেকথা হয়েছে। এই হুন্ডর বা চলিত কথায় হুন্ডরী বা আর্টের একটা ভগ্ন—সাহিত্য। সাহিত্যের বেলায় যেমন ক'রে আপা করা যায়, সৌন্দর্য্যাদর্শের রূপান্তর ঘট। অসম্ভব? হাজার বছর আসেকার—বে-হাজার বছরে আসেকার ফুলনার লক্ষ-লক্ষ বছরের পরিবর্তন ঘটোছে—দেবভাষার সাহিত্যের ক্ষমতা রচিত অলঙ্কার-নায়ে সাহিত্যাদর্শের স্বত পূত্র লেখা হ'য়েছে, আদ্যের দিনের বাংলা সাহিত্য কি তারই মূখ চেয়ে লেখা সম্ভব? কথাটা

আরও পরিষ্কার হয় যদি শ্রবণ করি যে, সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা 'অম্লীল' কথাটা জানতেন না—অর্থাৎ অম্লীলতা সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা ও আমাদের ধারণা অনেকটা আলাদা, অম্লীলতার দ্বারা তাঁরা বিশেষ ক'রে বুদ্ধতন—গ্রাম্যতা-সোষ (Vulgarity)—কোনো বিশ্র ব্যক্তি একথাটা তুলতে পারেন—প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের ভাষা শুই বা অম্লীল হ'তে পারে, কিন্তু ভাবের বেলায় সেকথা চলে না। এসেবার মূল চ'তাই বলছি—অর্থের খাজির তর্ক করতে চাই না—তাই এ কথাটা ভেবে দেখবার ক্ষমতা নিবেদন করতে চাই—সত্যি কি সেই ভাবই সর্বক্ষেত্রে নির্দোষ? আদিরসের যে সচরাচর অভি-বাড়াবাড়ি দেখি, ফুল মাগেলতা-ই কি অনেক সময় দেখি না—তা' কি নিতান্তই চোখের দোষ! তবে একথাও শ্রবণ রাখা উচিত যে, এসব প্রায়ই সে-বে-সী-সজ্ঞাত এবং অনেক সময় এর ওপর একটা আধ্যাত্মিকতার গাঢ় বা স্বচ্ছ আবরণ আছে। ঐকি মানুষ-মানুষীর ঘরের কথা এ নয়।

যেমন ভাষা ও সাহিত্যের ফুল-পরিবর্তন অস্বীকার করার মানে নেই, সমাজেরও তেমনি নানা পরিবর্তন ঘটোছে। নিত্যন্ত চোখের সামনের হ'একটা ব্যাপার উল্লেখ করি। মেয়েদের বিয়ের বয়স প্রায় ভলন হ'য়ে গেছে, ডিন বছরের মধ্যে কলেজে মেয়ে-ছাত্রের সংখ্যা তেরঙপের কাছাকাছি বেড়ে গেছে, হু'বছরে ট্রান্স-বাসে বিশগুণ মেয়ে দেখা যাচ্ছে (কার্য-পবেশকার স্থান এ নয়)। বহু-পর্ষী উঠে যেতে একপুরুষেরও বেশী সময় লাগেনি; বিধবা-বিবাহ, অদর্শ-বিবাহ হওয়া অনৈতিক ব্যাপার বিবেচনা করা অসম্ভব হ'তোও তার চেয়ে বেশী সময় নেইনি। আর বস্তুত সেলে এসবের রাজব ফুল-ফুন্ডার ছিল।

এসবের বহুবিধ কলঙ্কিত নীতি, এমন বিবেচনা কোনো কোনো প্রাজ্ঞজন কিছু পূর্বে আমাদের যুগেই প্রকাশ করেছেন—কিন্তু ইসলামী আর তেমন বেশী প্রাচুর্য দেখি না, যদিই বা করেন বেশী লোকে সেরব কথা Serious ব'লে ঠিক গ্রহণ করবেন না। ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় নয়, একদৃষ্টেই তা হ'লে দেখি সামাজিক নীতির standard, Median law তো নই—পার্শ্বক্ষেত্রের আইনের চেয়েও তরলমতি, যদি কেউ বলেন, চুই ক'রে তাঁকে নির্দ্বাক ক'রে দেওয়াও সম্ভব নয়। সখা, বিধবা, কুমারী, অন্ন-মধ্য-বেশী বঙ্গের মেয়েদের শোভনীর পরিচ্ছদের পরিবর্তন চোখে পড়ে। বড়ছোট কোনো কিছুকেই সনাতন ব'লে পূব সমীহ করা একটু ক্রম হ'লে উঠে না কি ?

এ কথা অনেকবার শুনেছি, “এঁদের লেখার style আছে, force আছে ইত্যাদি, কিন্তু——”, নতুন ঢঙ আনার বেশী সত্যিই কিছু আছে কি ? সাহিত্যে একটি পূব বড় দল আছে, বাসের সুখ-পাড়া হ'রে অমিটু-বাসে বসেছিল, রীতিটাই বড় কথা, নীতিটা নয়।

“কিন্তু——” মানে, বলতে বলতে বরদসিদ্ধ ক'রে নেবার যোগাড় হচ্ছে—‘আধুনিক’ সাহিত্যের themes unhappy ; কথাটা বলা নিভাতই সোজা, উদাহরণ সঙ্গ্রহ ভঁতখিঁক। কিন্তু এসবকে একটু ভেবে দেখবার আবশ্যক করি। ‘সাহিত্য-সম্রাটের’ প্লটগুলি চোখের সামনে আছেন—লেখবার গুণে তাই সত্যি হয়েছে, তাই না তিনি সাহিত্য-শুভ—কিন্তু ঘটনা-সংস্থাপন বড় queer কি না, ভেবে দেখলে তেমন কোন কিছু কি মনে হয় না ? নবকুমারে নবর নাই কিন্তু সবও তাই কপালে কপাল-কুণ্ডলাঘাত নিভাতই নির্গল Romance। ব্রহ্মস্রাব নিভাতই আমাদের ঘরের লোক ; নরীতে চলেত কড়-বুড়ি কে না তোপ করে, কিন্তু কুশনখিনীকে সজিনী করা বড় বহিমাত্র বিনা কার সাধ্য ? তারপর

তাঁকেও চুইতে চ'ল Historical Romance-এ। কিন্তু এবার এটা Romance কি Somnambulance ভাঁচৎ একথা কানে গুঁটানো অসম্ভব কি ? ‘ভূগর্ভস্থজিনী’র চর্চাদি আর সাপুতার নকিনী কল্পনার আকাশে উড়ান কল্পনা। শরৎচন্দ্রের অল্পশব্দ styleএর কথা বলার কিছু বাকী নেই। কিন্তু সাবিত্রী-ভাঙ্গলখীর পদ্যঃ পুস্তকের গোঁজামিলের স্মিলন স্বীকার না-করতে মন নাও চাটতে পারে। তাই, বহিমাত্র দেখেন তাঁর অর্থচীর গল্প “বুচিরাম গুড়”, তাই ব্রহ্মস্রাবেরও theme চর “নষ্টনীড়ের”, তাই তারই লেখা হয় “ঘরে-বাইরে” ; শরৎচন্দ্রের রচনা চর “গুহ-বাহ” আর সেইটাই হচ্ছে শরৎ-সাহিত্যের একটি পূব বড় সত্যি কথা। (আমি যাকে Romantic নীতি বলছি, তাই যদি বড় বড় কয়েকজনে মেনেই থাকেন, তাকে এভাবেও অর্থ করা সম্ভব যে, বাংলা-সাহিত্যের সব লেখক বহিমাত্র-ব্রহ্মস্রাবের মত বিধাতার বৃহত্তম দাক্ষিণ্যের ভরতীকা নিয়ে প্রতিভার বরশুর হ'রে অমাননি।) উদাহ্র “নব্য-সাহিত্যিকদের” এ নিবেদনও গ্রাহ্য হ'তে পারে যে, তাঁরা লিখবেন গল্প—তা আর-কিছু না হ'লে উঠলেও যেন সত্যি গল্প হ'তে পারে। লক্ষ্যের কথা নয়, সকলের বিচারের ক্ষম নিবেদন করছি—‘নব্য-সাহিত্যিকদের’ গল্পের themes আছে, এবং বিরুদ্ধবাদীদের এক বৃহৎ সমষ্টির গল্প তাইই অচাৰ। বিশ্বের শুক্লবের ক্ষম পুনরুজ্জ্বল হ'চ্ছে—সকলে সাহিত্য-রসিক মন নিয়ে একটু ভেবে দেখবেন কি, অসম্ভব বিষয়-বস্তুকে “happy themes” ক'রে কোন মতে উদ্ভেদেও সাহিত্য-কলাকে রূপ-খিলের পর্যায় হ'তে নামান সাহিত্যের সত্যিকার নীতি হ'তে পারে কি ?

আবার এটাও মনে রাখতে হবে ‘আধুনিক’ কথাটি নিয়ে বজসিদ্ধ ভাবে ভালোমনে কিছুই হুঁচি চর না ; ‘আধুনিক’ কথাটির স্বাক্ষর বলা হয়—সুখখণ্ডের stamp আছে, কিন্তু Realism বা Romanticism—সে-সব কথা কিছু বিশেষ ক'রে বলা হয় না। এসবকে চিরন্তন মানবজন্মের যে প্রকৃতি বা নীতি আছে—তাই পূব বড় ক'রে চরম ও পরম। ইব্রহিম, ইল্ডনবার্গ, প,

কিশি সকলকেই সেই নিয়মের কঠিনাধরে প্রথমে ক'বে দেখতে হবে।

অতি-আধুনিক সাহিত্যের বিবন-বস্তুতে চর্যাক্তির যে কল্পনা আরোপিত করা হ'য়েছে, তার 'মূল উৎস' মনে ক'রা হ'য়েছে প্রতীক্ষার সাহিত্য। আর এই হ'য়েই বলা হ'য়েছে, এই সাহিত্য বিমাতীয়—ইজাৰী।

এখানে একটি কঠিন সত্য বিবৃত ক'রতে হয়—আমাদের বাংলা সাহিত্য বলতে বা বৃষ্টি, তা তো নিঃসন্দেহে বিমাতীয় inspirationএ সৃষ্ট। সাহিত্য-সম্রাট, সাহিত্য-দিক্‌পাল সবাইয়ের বেলায়ই এ প্রশ্ন গুণ্ড এক আকস্মিকতার বতাই আঘাত লাভক্, এটা স্বীকার না করা কি সম্ভব—হী, এ আমাদের জগের কারবার, সৃষ্টির কারবার। তবে Degree of assimilationও লক্ষিতব্য। নব্য-সাহিত্য সম্পর্কে তা হ'লে এই মাত্র বলা চলে, এখানে degreeর কিছু কার্যক্ থাকতে পারে। তা তো হ'বেই—না-ইত্তাটাই অত্যন্ত অস্বাভাবিক হ'ত। বাংলার একুই ইউরোপের গুরুত্বের সঙ্গে identified ইত্তা কেননা ক'রে সম্ভব হবে? জু' বক্তব্যকে যদি বলি Scott, অতি-আধুনিক সাহিত্যিক প্রয়াস পাবেন D. H. Lawrence হ'বার—এ ভিন্ন আর কি হ'তে পারে? Scottএর মূল পত, বক্তব্যের মূলও বিকট, তা না হ'লে পৃথিবীকে হ'তে হয় হ'ত। Scottএর পরেও মাহুয়ের মন অমীর আকুলতার চিত্র-অনাথত্ব দিনে নিখের মনে মাত্রা রচনা ক'রবে এবং D. H. Lawrenceও আসবেন।

এই কথা-মুখে সাহিত্যের সমাজ-নিরপেক্ষের দায়িত্বের কথা আশোচনা এড়িয়ে বাতরা অসম্ভব ছিল না, কিন্তু এড়িয়ে বাতরাটা মাক্টির বাতরার মতই বা-বত-তাই ব'লে আশ-সমোহন মাত্র। তথা-কথিত নব্য-সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে পুরোঁই সাহিত্য-গুরু নিরঙ্কুশ নির্দেশ দিয়েছেন—সাহিত্য নীতি-পুস্তক নয়,

সাহিত্যিক জুল-মারার মন। কথাটির অর্থ মনে হয় যে—জীবনের মাসীর কর্ণ-কল্পন-কীর্তনই সাহিত্য-নীতি হ'লে সাহিত্যের tragedy বিবেচিত হবে। কুশল-খবীর আশ-হতা, তথা কিরণরীর উত্তরতা রসহানি ঘটাবার লক্ষণ ব'লে লক্ষিত হ'য়েছে—পুনর্কতির প্রয়োজন নেই।

বড় বড় বইয়ের বড় বড় উচ্চাচিন, সে-কথা আসেই বলেছি। অকুলান অপকল্প বৈজ্ঞান-সাহিত্যকে ঐ বিচারে কে বিচার ক'রতে চান! যে-মান সে পেয়েছে—তা তো বিশেষ ক'রে রসের বিচারেই। অতি সাবধানে চরন-করা গুটিকয়েক পদ, বি-এ, এম-এ, রূপে পড়াতে দিয়ে অধ্যাপক মহাশয়ের (বিশেষ রূপে যদি মেয়ে ও পুরুষ দু'রকমের প্রোতা থাকে) কর্ন রক্তিম হ'য়ে ওঠে, সংকুত কোনো-কোনো কাব্য নাটক অধ্যাপনাতেও ঐ একই অবস্থা ঘটে। তখন তো indignationএর বড় গুণ্ড না—গঠিতব্য কাব্যাদি ছাড়া-ছাড়া ভিন্নের পঠন-পাঠন সম্ভব নয়! Slave-mentality ব'লে একটি বাজারে কথার প্রকারান্তর ভাবের হুনা যদি এর মধ্যে কেউ মেখে তো তাকে নিরঙ্কর করা একই শক্ত চর না কি? যে বিশিষ্ট মাদলি বাজারের শোনা। যাক্কে যে, তাই-বোনে ব'লে, বা-বেয়েতে ব'লে, বাপে-ছেলেতে ব'লে কাকর কাকর বই পড়া যায় না—সেটা যে সত্যই সাহিত্য-বিচারের একটা বড় নীতি, একথা 'বড় বড়' বইয়ের সম্পর্কে তো কেউ বলতে লাহস পান না। কতবিধ রূপ আছে তার প্রাচীন ও আধুনিক নাম বা মতের পরিচয় না দিয়েও এ সত্য বোধ হয় আর অবিসংবাদী যে, সবার বড় রূপ আদরন—সে-কল্পিত সাহিত্য আমাদের আশ-কর সমাজ-সঙ্কটিতে বাপে-ছেলেতে একসঙ্গে ব'লে পড়া যদি অসম্ভব হয়—'সনাতন' নীতিবিদ্যের পক্ষ হ'তে এই তথ্যকে কি রকমে গুলট-পালট ক'রে তাঁদের স্বপক্ষে সাফাই-মুক্তি পাড় করাণ বেতে পারে, ঠিক বোধদয়া হয় কি?

যে-কথা আসেই বলা হ'য়েছে' যে, সাগর-পার

হ'তে আমাদের সৃষ্টিভাব inspiration এসেছে। তার থেকে এটা সহজেই মনে নিতে হবে যে, এলাস্টিভিটি অধিকারীভেদ হবে। শৈশব সৃষ্টিতে, সৃষ্টিবাদের রাসায়নের মত এ বধন স্ফায়নি—একে দুর্দার সোকারে, রাখাল-বালকের বুকে পোনা যাবে না। নানা কারণে আমাদের স্নেহ, শিক্ষা বহুত সাধারণতঃ যা মনে হয় তার বিকৃতির বিরাট অতাব, তাই শিক্ষিত জনের এই যে সৃষ্টিভা—মোটামুটি ঐ শ্রেণীর সৃষ্টিই রচিত। শৈশব সাময়িক অবস্থার সত্ত্ব কিছু হওয়া অসম্ভব। কথাটা সহজ হবে যদি স্বরাস-আলোপনের

কথা মনে করি : এও বিশেষ আমলানী, তার সত্ত্ব কেউ পূব লক্ষিত নয় : আলোপনটিও মোটামুটি ঐ শিক্ষার শিক্ষিতজনের মধ্যেই বিশেষ স্থান পেয়েছে এবং এসবকে বর্তমান অবস্থায় উপায়স্বর নেই, বোকা চক্কর নয়। সৃষ্টিভা-ক্ষেত্রেও ঠিক সেই দশা। আর, তাই এটাও বলা চলে, এই সৃষ্টিভাব পাঠক দ্বারা, মনে করবার বৈধ কারণ নেই যে, ও'বানা মডেল প'ড়ে তাদের মাথা সজি-সজিই ঘুরে যাবে—তবে অধিকার চক্কো তো। সর্বক্ষেত্রেই খ'টে থাকে, যেমন মততম আবিষ্কারেরও গুণতম ব্যবহার খটা বিরল নয়।

আলোকচিত্র-প্রতিযোগিতা

নিয়মাবলী

১। প্রাকৃতিক দৃশ্য নামে অষ্ট বে-কোন

প্রকার ভাল ছবি, কথা— আকৃতি (Portrait, Subject study), খেলা, কোন বিশিষ্ট ঘটনা, ভাল কারুকার্য বা ভাস্কর্য-শিল্প প্রকৃতি সকল প্রকার চিত্রই প্রতিযোগিতার সত্ত্ব দেওয়া চলিবে।

২। ছবি কোয়ার্টার স্টেটের ছোট বা ফুল স্টেটের বড় হইলে চলিবে না।

৩। ফিচারের সময় ছবি তুলিবার কৌশল, 'ফ্রিষ্টে'র উৎকর্ষ এবং সাধারণ সৌন্দর্যের দিকে লক্ষ রাখা হইবে।

৪। 'মডিউল' করিয়া অথবা মোটা বোর্ডের মধ্যে ভরিয়া ছবি পাঠাইতে হইবে।

৫। এই প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত ভাল ছবি জাপিবার সম্পূর্ণ অধিকার 'উদয়ন'-সম্পাদকের থাকিবে।

৬। সঙ্গে যথোচিত ডাকটিকিট পাঠাইলে অমনোনীত ছবি ফেরত দেওয়া হইবে।

৭। ডাকে ছবি পাঠাইবার সময় ভাল করিয়া মোটা লোর্ড দিয়া প্যাক করিয়া পাঠাইবেন। কভারের উপরে "আলোক-চিত্র প্রতিযোগিতা" লিখিয়া দিবেন।

৮। প্রেরিত চিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ফুপন পাঠাইতে তুলিবেন না। ফুপনের উপরে নিজের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

৯। প্রেরিত ফোটো অন্তত পুরস্কার পাইয়া থাকিলে সে-কথার উল্লেখ করা আবশ্যিক।

১০। পুরস্কার বিষয়ে সম্পাদকের বিচারই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে।

১১। আগামী ১৫ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে ছবি উদয়ন-কার্যালয়ে পৌছান দরকার।

১ম পুরস্কার	৩৭ টাকা
২য় "	২৭ "
৩য় "	১৫ "

ইহা ভিন্ন আরও ৫ খানি ভাল ছবির জন্য Consolation পুরস্কার দেওয়া হইবে।

মানসী ও প্রেরসী

ঐশ্বর্যমোহন সেনগুপ্ত

এত দিন যারে সোপানে বসেন

খুঁজেছিলাম আমি বারে বার,

সে আমি আপনি আসিতা সহসা

ঠেলা দিল মম হৃদি-হার।

সে আমি এসেছে সোমা নয়নে,

শাস্ত বহানে হরবে;

সে আমি এসেছে নম্বর হাসনে,

বহু ভাবণে, রতনে।

সে আমি এসেছে কনক-বরণে

ল'য়ে লুকোমল হুঁটি কর;

সে আমি এসেছে ধীর-গভীর,

ঐবাসোপে বসে ফুলপর।

সে আমি এসেছে গণ্ডে মাথাত্তে

প্রেমের স্বপন-মহিমা;

সে আমি এসেছে দ্বিধা দিগন্তে

ভরিয়া কল্পণ পরিমা।

*

এল এল মোর চিত্ত-বাহিতা,

স্বপন-লবধা প্রেরসী!

এল এল মোর বাসনার-গড়া

ধ্যানে চিত্তনে মানসী!

বালক বহুসে, কিশোরে তোমার

নব বোঁবনে কত দিন

এঁকেছি ছদয়ে, ছদয়ে রেখেছি,

মেখেছি সোপানে চলে লীন।

বার বার শুই উছারিঁ উঠেছে

তোমারে লভিতে কামনা;

বার বার কত ছুটে ছুটে হুঁচি,—

কবে পাব তোমা', পাব না?

সে মোহিনী আমি সন্মুখে ঠাকারে

আশা-বাসনার স্মৃতি;

আভাসে বা' ছিল কহকহতে

আমি তারি এ বে স্মৃতি!

কনক-কহারে ঠাকারে না আর,

এল ব'লো লগ্নি-আসনে;

তে দেবী, তোমার ঈতল চরণে

ছুড়াব জীবনে মরণে।

কনক-মাঝারে রাখি তব জল,

তব কর ধরি এ করে :—

মানসেতে রহ মানসী সমান,

প্রেরসী সমান এ যারে।

তুমি হও মম অন্তর-স্বধা,

কল্প-কুলা তুমি নাশো গো;

বাছিরে ভিতরে সব ছুড়ে তুমি

হাসো আর মুদ্র ভাবো গো;

আঁখি 'পারে রতে স্মৃতি তোমার,

ছবি তব ভাগো কখনে;

লুটিলো আমারে লহ সব লহ,

মন প্রাণ লভ বিজয়ে।

অরি বিম্বহিনী, অরি অহাসিনী,

বিন্দু-অঘনা, মোহিনী,

আজ এলে তুমি নব বোঁবন

মাগারে কহক-সেহিনী।

পেরেছি তোমার, পেরেছি তোমার—

এই মুখে যেহ কাঁপিয়ে।

এই মুখে মোর শোণিত-ধারা

প্রাণে নষ্টন আনিছে।

জ্বরে উল্লাসে আসো আমি মন,

ভাগো রে গভীর হরবে :—

এসেছে প্রেরসী, এসেছে মানসী

মানস হইতে বরণে।

দেহের দাবি

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

চাকরি! চাকরি! দেহের পিলস্বেজের উপরে
এরণের সঙ্গততা কোনো রকমে ধাঁচিয়ে রাখা। ব্যক্তি
অন্তরে চাইলে ব্যক্তাসের একটা বৈজ্ঞানিক বাধা চাই
সে তো আছে এই কার্যিক কলন্দ-ক্লেশ, এই সাম্যারিক
অশান্তি, সামাজিক হুঙ্কারীনতা—কিন্তু আশ্বাসের
দাহিকা শক্তিই যদি না থাকে তো ব্যক্তি অল্পে কী
ক'রে? উগরে খাওয়াই যদি না থাকে তবে দেহ
ক'কে বচন করবে, মন রচনা করবে কোন্ ভাবী
দিনের স্বপ্ন, কী ক'রে করবে দেহের চূড়ান্ত বিলানিহতা!

হাঁ, সামান্য, দুষ্টিমের স্বাভাবিক চাই। কৃথা: ক্লম,
চাঞ্চল্যমান, প্রবর্তীভূত সত্য—হিংস্র, পাশব বক্তৃতা।
আগে প্রাণী, পরে মানুষ। আগে প্রাণ, পরে জীবন।
যদি ভাষা না থাকে তুমি চিন্তা করবে কাকে
জিবে? কভালের কাঠামো না থাকলে তুমি কার
ওপর ভরের ইন্দ্রজাল বেলেবে, পাকস্থলী সক্রিয় না
থাকলে কী ক'রে চামড়ার আস্বে ঔজ্জ্বল্য—আর
রূপ বসো, গায়ত্রী বসো—সব এই চামড়ারই
আপাতশোভনতা। ব্যাধি—ব্যাধি হচ্ছে স্বাস্থ্যের অভাব;
চিন্তা—চিন্তা হচ্ছে মনের নিরপেক্ষতার অবসান;
দারিত্র্য—দারিত্র্য হচ্ছে মাজ একটা সামাজিক
সামঞ্জস্যের স্বার্থপর ব্যতিক্রম। বিরহের পুঙ্খতা বসো—
তা হচ্ছে প্রেমের বিকৃত জিরোধান, পাণের অপবিত্রতা
বসো,—তা হচ্ছে সবল আত্মবিশ্বাসের অপসারণ। বে
কোনো হৃৎকের কথাই তুমি ভাবো, সব হৃৎকই হচ্ছে
বিশেষ কোনো অবস্থার সাময়িক অস্থায়ীস্থিতি: সব
হৃৎকই নেতিবাচক। কিন্তু কৃথা কৃথা হচ্ছে বর্জ্য,
ভরতর সত্য ঘটনা—নিশ্চিত, প্রত্যক্ষ, নিরাকরণ। সে
আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, কালর নৈমিত্তিকতার
অপেক্ষা সে রাখে না। সে কৃষ্টির অভাব নয়,
স্বাস্থ্যের অভাব নয়, খাদ্যের অভাব নয়—কোনো

কিছুই সে অন্তরিরের প্রমাণ করে না সে একটা
সহজ সরল প্রাণের উপলব্ধি। সে সকল আকাজকের
মধ্যে আমিষ, সকল বস্তুর মধ্যে অবিনয়র।

আগে কৃথা, তারপর তোমার মনুষ্যত্ব। আগে
ভ'বতা আর, তারপর তোমার অন্ত চিন্তা খোজ
তোমারে প্রেম, মেলাও তোমার কবিতা, মনো তুমি
বসেন-বাহীনতার। আত্মীরের মুহুর্তে শোক করছ,
কৃথা মিটিয়ে নাও, করো সেই শোকের কোমল
বিলানিহতা, তোমার উদার কল্পনার আকাশ থেকে
প্রেম বিদায় নিয়েছে, কৃথা মিটিয়ে নাও, ফাঁকো সেই
বিশাল পৃষ্ঠতার বিরহের নদীরতর স্বপ্ন! বৈরাগী,
তোমার কৃথার অস্ত্রাঙ্গকে তুলো না ঘুঘু,
তোমার তৃষ্ণার গুণ্ডারের নাও এই এক কোঁটা
পদাঙ্গল। কৃথা: কৃথা! জলের চেয়েও প্রাণল,
একটি রেখার চেয়েও সরল, মুক্তার চেয়েও
অনিবার্য।

আজ সমানে তিন দিন ধ'রে জ্বলে এই কৃথার
বস্ত্রা তোপ করছে। আর-সব বস্ত্রাকে একেবারে
বিশেষণ দিয়ে 'খণ্ডিত, সীমাবদ্ধ করা যায়,—এ বস্ত্রার
বেশন সংজ্ঞা নেই, তেমনি নেই কোনো সীমা। ব্যক্তাসের
প্রকাশ বেশন কম্পনে, তেমনি এর ক্ষয়, সীমাহ-
মানতার, নিঃশব্দ বেচ-দাহনে। ভবেশের কভালসার
চেহারা—বেন হৃৎমান 'হ্যানারটি' প্রত্যেকটি অঙ্গ বেন
তাদের বিভিন্ন স্থানে ও সংস্থানে গৃহক ও শব্দ, মিহি
ও নির্যাবরণ। চুলে জটিল ককতা, কাপড় না তো
দুলোর পর্দা, পায়ে জুতো না কতকগুলি টুকরো-টুকরো
চামড়ার তালি—এসব অস্ত্রের মাদুলী কাঠিনী তার
অভিনব পরিচর হচ্ছে সে কৃষ্টিত, কোনো মহত্তর অর্থে
নয়, শব্দগত, আমিষ, বিশদীভূত অর্থে। কারো বেশন
প্রেম, কারো বেশন সন্তান, কারো বেশন পৌরব—

সেই অধিকারের অর্থে নয়। কারো যেমন ব্যাধি, কারো যেমন লজ্জা, কারো যেমন কলঙ্ক সেই অপচয়ের অর্থে। এই ক্ষুধাই তার ব্যাধি, এই ক্ষুধাই তার লজ্জা, এই ক্ষুধাই তার কলঙ্ক।

পুরো এক বছর ধরে ভবেশ যে-কোনো একটা চাকরির কষ্টে আকাশ-পাতাল করছে। কোথার না গেছে তার খোঁজে—টাম-কণ্ডাক্টর, গ্রেস-কম্পোজিটার, দর্জি, দপ্তরি, এমন কি কনষ্টেবল। ওসব ভ্রত কাজে চাত লাগাতে না পেরে পরে খুঁজেছে কলে-কারখানার, এখানে-ওখানে, গাটে-বাজারে—কোথার যারনি ও? মোট বইতে পারত, কিন্তু শরীরে দিত না। লগ্নানের স্ফোর হাই থাক, শিকার অভ্যাচারে শরীরই হ'রেছিল অলটু—কারিক পরিভ্রমের কাজ তাকে দিয়ে অসম্ভব। সারা বছরে একটা কাজও সে জোটাতে পারলে না—যা দিয়ে চলতে পারে গ্রাসাচ্ছাদনের অন্তঃশরীর প্রক্রিয়াটা, যা দিয়ে অন্তঃসে এই শরীরের দুর্বল বোকাটা পাহত হালকা করছে। তবু এতদিন এখানে-ওখানে চেয়ে-চিড়ে তার ছুঁইছিল খাও ও আশ্রয়, আর কিন্তু তিন দিন ধরে সমানে সে উপোস করে আছে।

চব্বিশ-পঁচিশ বছরের ছেলে—খারখোর করে অনেক কষ্টে বছর আড়াই কলেক্টও সে পড়েছিল—চাকরি করে মারের চুখ ঘোচাবে এই প্রবোধ নিয়ে কলকাতার সে টো-টো করছে এই এক বছর। প্রথম বেখানে সে ছিল আর তার সে অনেক নীচে এসে পড়েছে: দর্জীকে তার ক্ষুধার কুপা ব্যাধি, দারিদ্র্যের বীড়ন পঙ্কিলতা—আকাশের সেই অব্যবহিত আশা গেছে কবে খোঁজার মিলিয়ে—চারদিকে কেবল এখন চাপ-চাপ মাটি, খুঁটীত্ব রানি আর কলঙ্ক। এতদিনেও সে একটা চাকরি পেল না, সমর্পে পাহুল না নিজের বাঁচবার অধিকারকে প্রবল প্রতিজ্ঞা দিতে—সেই বিজ্ঞার জবাবকে টুকরো টুকরো করে ফেলছে। আকাশের

নীচে উজ্জলিত জীবনের এই অমন্ত্র প্রস্তর—তার' নাথক ভবেশেরই স্থান নেই, পরিসর নেই সেই একমাত্র এতবড় পৃথিবীতে একটুখানি ভাঙনা করে নিতে পারল না।

আর সকল দুঃখের মধ্যেই একটা সৌখীন আভিভাড়া আছে, কেবল এই ক্ষুধাই হচ্ছে অসত্য, এই ক্ষুধাই হচ্ছে কুংসিত। আর-সব দুঃখে ভূমি সমবেদনা পাবে, এখানে পাবে কল্পনা—বিশ্বের একটা ভ্রত ভঙ্গী—এই দুঃখের বেলায়ই ভূমি আর-আর সকলের অসমান। ভূমি পাশ লুকোতে পার, কিন্তু ক্ষুধা লুকোতে পার না; আর, সকল পাপের মধ্যে দারিদ্র্যই হচ্ছে জঘন্য, এর ক্ষমা নেই, এর প্রতি কৃপা দেখানও লজ্জাকর। ভূমি খেতে পাকো না, তো ভূমি মরো। পরের কাছে সাহায্য চেয়ে পরকে আবার কতকটা দরিদ্র করার কোনো অর্থ নেই। ভবেশের একটা গম মনে পড়ল: কেন সেপে চুঁচুং এক দরিদ্রবদ্ধ বিদ্য-প্রেমিকের আবির্ভাব হ'ল। তার যেমন অগাধ বিস্ত-বেলাত, তেমনি দরাস তাঁর হাত। পরিবের ক্ষত দু'হাতে সম্পত্তি বিলোমোই ছিল তাঁর বিলাসিতা। বেবে-বেবে নাম পড়ে সেল, খবরের কাগজের পুঁজার পুঁজার উঠলো। ঝাঁকালো পিরোনাম। ভ্রতলোক ভিত্তিত হ'রে দেখলেন—অকৌমিলী-বাহিনীর আর শেখ নেই, কাতারে-কাতারে পদপালের মতো ছুটে আসছে। কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর সেই অগাধ সম্পত্তি ঝাঁজরা হ'রে সেল—রইল শুধু দুইং একটা নিঃশব্দ। লাভের মধ্যে হ'ল এই, সেই পরিবর্ষের দুঃখ তো খুঁচলই না, মাংসখান থেকে পৃথিবীতে আরেকটি নতুন দরিদ্রের সৃষ্টি হ'ল বাড়। ভ্রতলোক তখন নিজেই আবার হাত পাততে শুরু করলেন।

না, পরের কাছে সাহায্য চাওয়া মানে পরকে এই পাপের প্রতি প্রজ্ঞানশীল করে তোলা। আর, কত সাহায্যই বা ভূমি পাবে? দুহুঁতে দুহুঁতে তোমার সাহায্য আসবে না। এ পাপ তোমার

ব্যোপার্জিত শাপ, এর কালনও চ'বে তোমারই চাপে।
 জীবন-যুদ্ধে হেরে গিয়ে থাক তো পালানোর
 কোনো লক্ষ্য নেই, বরং লক্ষ্য। এই চর্মলতার সন্তে,
 এই অক্ষমতার প্রহরে। ক্ষুধা যদি সহ করার সীমা
 ছাড়িয়ে গিয়ে থাকে তো স্বাক্ষরে তুমি মরো। সেই
 মৃত্যু সঙ্গারের পক্ষে একটা মঙ্গলকর মৃত্যু।

ভবেশ আজ রুপরে মরবে ব'লেই রাত্তার
 বেরিয়েছে। বহু কষ্টে, অনেক চেষ্টা ক'রে এক বছর
 কাছ থেকে একটা টাকা সে ধার করতে পেরেছিল।
 ইদানীং কেউই আর তাকে ধার দিত না, কেননা
 কোনো ধারেরই সে মর্যাদা রাখেনি, কিন্তু এবার
 সে সন্তোষের কাছে গিয়ে সটান, খানিকটা ছোর
 পলার, বেন হুজুম করছে এমনি ভরীতে বললে
 শিঙ্গির একটা টাকা দাও, এগুনি।

সন্তোষ আয়নার সামনে গাড়িয়ে দাড়ি কামাবার
 আগে গালে ত্রাশ ঘুঁছিল, বললে: ক'টা টাকা
 তোমার কাছে রয়েছে তা'র কিছু হিসেব রাখ?

— সে-হিসেব পরে করা বাবে, এগুনি দাও সেপি
 একটা টাকা।

ত্রাশটা উল্টে-পাল্টে গালময় সাবানের ফেনা
 তুলতে তুলতে সন্তোষ বললে: টাকা কি এই সাবানের
 ফেনা?

— তোমার সঙ্গে আমার বসিকতা করবার সময়
 নেই। যদি দাও তো দাও, নইলে তোমার সামনে
 এই এগুনি মরলাম। ব'লে ভবেশ কিপ্রহাতে টেবলের
 ওপর থেকে বোলা লঙ্কাকে ছুঁটো তুলে নিল।

বে-টাকা না পেলে সে তখুনি আত্মহত্যা করত,
 সেই টাকা দিয়েই সে বিব কিনতে বেরিয়েছে। পলার
 ছুর চালিয়ে দেয়াটাও আত্মহত্যার একটা অন্তিম রীতি
 ব'লে তার জানা ছিল—কিন্তু সে বড় ভয়ানক
 মৃত্যু। তার মধ্যে কোনো ঐ নেই, কোনো আট
 নেই—নিভাতই প্রীতিবান। যাই বলো, গরিবদের
 বিলাসিতার মধ্যে আছে কেবল এই মৃত্যু: অন্ততঃ শশানে
 এক ধূলিপথ্যার স্বাভাবিক সমকক্ষতা করার মহান অহঙ্কার

—সেই মৃত্যুকে সে কখনো অমন করণ্য, লুপ্তকৃত ক'রে
 তুলতে পারত না। রক্ত—লক্ষ্য রক্তপাতের মধ্যেই
 একটা বীভৎস নিষ্ঠুরতা আছে তেমন মৃত্যুর কথা
 মনে ক'রে এখন ভবেশ নিউরে উঠছে।

এনিও সে মরত, মরবার এই প্রবল উদ্বেগনারই
 সে কোনো রকমে এখনো টিকে আছে, নইলে
 উপবাসের তীব্রতার এগুনি সে ছুঁইপাতের ওপর ভেঙে
 পড়ত চরত। সে কী লক্ষ্যাকর মৃত্যু, শেখালে
 কি না খেতে না-পারার কষ্টে তাকে মরতে চ'বে—সে-
 খায় সামান্য একটা পিঁপড়ে পর্য্যন্ত ক্ষত্র করে। না,
 তার মৃত্যুকে সে সেই কুৎসিত কলহের গাত থেকে
 রক্ষা করবে, জীবনকে না পারক, অন্ততঃ মৃত্যুকে সে
 একটা লাভ্য দিয়ে যাবে। এনি মরলে তার মৃত্যু
 হ'বে নিভাতই একটা শারীরিক ঘটনা, কিন্তু আত্মহত্যা
 ক'রে মরলে তাতে অনেক কল্পনার অনেক সম্ভাবনা
 থাকবে। তবু তার মৃত্যু তখন সকলের চোখে পড়বে,
 সে হ'বে সবায়ের কথোপকথনের বিষয়ীভূত—যোগ্যবে
 অনেকের অনেক রকম অঙ্গুতব কল্পনার খোঁজাক।
 নিয়রে থাকবে বিবের শিশি, টেবলের ওপর থাকবে
 একছুর দেখা: I am bloody fed up with life.
 Good-bye. অর্থাৎ, জীবনটা আমার কাছে একেবারে
 বিষাদ, একেবারে ভেঁতা হয়ে গেছে। বিদায়। বেশ কিছু
 হযবরল সে লিখবে না,—মাত্র ঐ একটা লাইন
 I am bloody fed up with life. তার মৃত্যুকে
 সে রহস্তমণ্ডিত ক'রে তুলবে: কেউ ভাববে প্রেম,
 কেউ ভাববে জীবনবিক্রম, কেউ-বা অভ্যক্তি।
 এই নির্ভর স্থল গয়ের স্রষ্টা থেকে মুক্তি দিয়ে মিথিষ্
 একটা কবিতার সে তাকে রূপান্তরিত করবে। জীবন
 না পারলেও সে তা'র আপন ইচ্ছা-মতো মৃত্যু ঘটনা
 করুক—সবারে কেবল এইটুকু তা'র স্বাধীনতা।

ট্রামের অস্ত গাড়িয়ে-গাড়িয়ে ভবেশ এই কথাই
 অনবরত ভাবছিল। অন্তঃসব আত্মহত্যা-একট
 হাতাপাশে মৃত্যুর মতো দেখার, যে-যে অবস্থায় সে
 সব আত্মহত্যা প্ররোচিত হয়, সবগুলিরই সাময়িক

প্রতিকারের সম্ভাবনা আছে—সে-সব চাখের কোনো-টারই এমন একটা স্থল, কঠিন ও গুল্মশূণ্য মস্তিষ্ক নেই—তাঁদের সব চাখেই একটা কল্যাণকল্পিত সুখের দৈনিক অল্পশ্রুতি মাত্র। মনে-মনে যে El Dorado-র তারা। স্বপ্ন দেখেছে, জীবনে তাঁর প্রতিজ্ঞাটা দেখতে না পেয়েই তারা হ'রে উঠেছে মৃত্যুর চক্রে লালসিতঃ। অশ্রুচক্ষুর ইচ্ছাটা তাদের কাছে একটা মস্তিষ্কের ব্যাধির লক্ষণ, উদ্ভাস-রোগের কঠিন একটা উপসর্গ। ভবেশ জীবনকে নিয়ে কোনোরকম স্বপ্ন দেখেনি, তার কোনো বাস্তব প্রতিবিম্ব দেখতে না পাওয়ার জন্যে তার এই মৃত্যু-চাক্ষুঃ নয়, সে হচ্ছে জীবনের প্রতি সৌন্দর্য বিরক্তিবোধ নয়, অন্য অপ্রয়োজন্যের চেতনায়। অশ্রুচক্ষুর ইচ্ছা তার আবেগ-অশ্রুচক্ষুর জটীকৃত বুদ্ধি থেকে ভ্রম পাচ্ছে না সে তার মৃত্যুকামনা করছে সজ্ঞানে, সচক স্বাভাবিক সৈমন্ধিন অভ্যাসবশে—এতটুকু তাঁতে ভাবের কুসাল নেই, কোনো অবর্তমান সাধারণের প্রতি সম্বন্ধ নেই—নিজাই তা মৃত্যুর কাছে একটা অপ্রতিরোধ্য আত্মসমর্পণ। বেন এমনি ক'রেই তার মৃত্যু দেখা ছিল—বরষটা তাঁর কাছে ক'দিন আগে এসে পৌঁছেছে মাত্র। কেউ অল্পশ্রু ভুলে যাবে, সে হচ্ছে অশ্রুচক্ষুর—এর জন্যে বিবেকের বহুনি পুনঃ পুনঃ গেলে সকল মৃত্যুর বেলায়ই তাঁর আগতি করা উচিত। এমন সজ্ঞানে সন্দেহেরে মহাবাতো একটা উল্লীপনা আছে—অল্পশ্রু ভুলে যাবে সে-ভাগ্য তার হ'ত না। সে নিজাই কৃথার তড়নায় অল্পশ্রু পড়ে-বরা মৃত্যুর সেই টান অবমাননা সহ করবে না। যখন এমনি সে মৃত্যুই, তখন তাকে একটা জঙ্ককাসো ছোরা দিয়ে স্মৃতি কী? অন্ততঃ মহাবার সময় এই সামান্য বাত্যানা তার সইবে।

চাক্ষুঃ দিয়ে সে আঁকি: কিন্তে বেরিয়েছে। আর কোনো বিকী তার হাতের কাছে নেই—অল্প কোনো বিষ কিন্তে বা ভোগ্যাদ্ কর্তে সেসেই অকারণে সে সম্বন্ধ উচ্ছেদ কর্তে, এবং সে-সম্বন্ধে নিরাকরণে তাকে তখন এতটা আবার সচেত হ'তে

হ'ত যে, অশ্রুচক্ষুর ইচ্ছাটাই যেত ক্রমশঃ ভোঁতা হ'রে। আঁকি:ে মৃত্যুটা চক্রে ক্রমশঃ নয়, না হ'ল, কিন্তু মস্তিষ্ক এসেছে নিরুণ হ'রে। মস্তিষ্কে তখন একমাত্র মৃত্যুর অল্পশ্রুতের আনন্দময় চেতনা। কিন্তু আঁকি: কর্তা। খেলে তা: নেশা ছেড়ে বিষের পর্ধ্যায়ে গুঠে, এক সোফানে একসঙ্গে কর্তাই বা কেনা যায় কিছুই তার জানা নেই। সোফানটাও প্রায় মাইলটাকে ঘুরে—কী: ক'ছে রোদ, অতটা পথ পারে হাঁটবার তার শক্তি নেই। হ্যাঁ, বতকশ পর্ধ্যায়ে সেটা আছে তার দাবি মেটাতে হ'বে বৈ কি—বসিও এখনো তাঁর কৃথ্য একমুঠা খাড়ের অল্প, হাঁর বদলে তাকে সে এখন বিষ উপহার দিচ্ছে।

চলতি ট্রামে উঠতে গিয়ে চর্লসতার তার পা খেল গড়কে, আরেকটু হ'লে সে চাকার নীচেই হ'লে যেত চক্রে, কিন্তু প্রাণপাণে সে শক্ত মৃত্যুর পেডলের গাভলটা ধ'রে চেপেছিল ব'লেই এমাতা। সে নিজের শেল:। ভায়দার-ভায়দার ছিঁড়ে-ছড়ে' সেছে মাত্র, হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে বেচারা সেহকে সে শাখ্যা দিতে লাগল। এততেও তার বাঁচবার চুনিবার আকাঙ্ক্ষা, কিছুতেই সে চাকার তলায় নিশ্চেষ্ট হ'বে না—উপবালে জীর্ণ হ'লে সেলেও এপ্রতিজ্ঞার সে অটল—এত ছুবেও ভবেশের করুণা হ'ল। মেহের অগুণ্ডে পরমাত্মত প্রতিক্ষণে এই প্রাণধারণের চুনিবার লক্ষন, নিবেকে প্রতিক্ষণে রক্ষা করবার এই প্রবল প্রবৃত্তি, মৃত্যুর কাছে বশতা মানবার প্রতিক্ষণে এই তার আত্মকমর অস্বীকৃতি—সেই মেহের ওপর ভবেশের মাত্রা কর্তে লাগল। সেটা ছিল ব'লেই মাত্ৰ বাহোব্ করেক-দিন মৃত্যুকে সজ্ঞাপনে এড়িয়ে চলতে পারছে; কিন্তু আর যেহি নেই—ভবেশ মুঠপাতের দিকে চেয়ে-চেয়ে সোফান খুঁজতে লাগল—সময় এবার এই হ'লে এল আর-কি!

কণ্ঠাক্টার এল টিকিট চাইতে। চাক্ষুঃ তার হাতে দিয়ে ভবেশ অল্পশ্রুতের মতো বলল: এই চার পয়সা—ব'লে পাকির জানা দিতে বাইরে সে বানিক

চেয়ে রইল। শরৎ দেখতে এখন তার ভারি ভালো লাগছে। এমন চোখে এত সব তুচ্ছ জিনিস এর আগে কখনো সে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখেনি কেন ?

কণ্ঠাক্টার ঢাকাটা তার গায়ে কিরিয়ে দিতে বললে—বল্লে দিন এটা।

— বল্লে বেবো ? কেন ? কী গুণেছে ?— ভবেশের মুখ বেলে শুকিয়ে।

— সেধুন না কী গুণেছে।

বাড়িরে, হস্ত চোখে অস্বীকৃণ করে করে কোনোদোষই এর বার করা গেল না। ভবেশ ধরা-গলার বল্লে—কেন, বেশ ভালো ঢাকা। কী খুঁ পেলে তুমি ?

বাপু থেকে আরেকটা ঢাকা বার করে কণ্ঠাক্টার সেটার থেকে চ' মাড়লে একটা মাগুরাও বের কয়লে, বল্লে তখন এটা কেমন বোল ছাড়ে, আর আপনারটাই বাড়িরে সেধুন না একবার। আপনারটা বোবা, চাব-চাব কয়ছে—এর মতো বেশ কই ওটার ? কণ্ঠাক্টার গাত পেতে রইল।

সামনের ভল্লোলক-মারোহীর দিকে ঢাকাটা বাড়িরে দিতে ভবেশ বল্লে সেধুন তো মশাই এটার কী গুণেছে ? ঢাকাটা অনেকক্ষণ নেড়ে চেড়ে, ভবেশের গায়ে কিরিয়ে দিতে দিতে, কণ্ঠাক্টারের মুখের দিকে চেয়ে ভল্লোলক বল্লে: চুম্বকার ঢাকা। একটু কম বাজে ব'লে কী গুণেছে ? ঢাকা তো আর আমর। নিজেরা চালাই করি না।

কণ্ঠাক্টার বল্লে: কোম্পানী ও ঢাকা আমার কাছে নেবে না, মশাই। দিন, পুত্রো চারটে পরলা পেয়েই হ'ল। ভবেশ পাগু-মুখে বল্লে আমার কাছে আর পরলা নেই।

ভল্লোলক হঠাৎ কণ্ঠাক্টারের উপর নিম্নাঙ্গ প'ড়ে উঠলেন আলবৎ জোমার এই ঢাকা নিতে হ'বে। জোমার কথাতেই তো আর পতর্নমেষ্টের ঢাকা অচল হ'বে বাবে না। জোমার কথায় ওঁকে এখন এতটা পথ ছেটে যেতে হ'বে নাকি ? এই কড়া রোফে ?

ধপটার গড়িতে সন্ধ্যার একটা তান দিয়ে কণ্ঠাক্টার

বল্লে আর আপনাদের মুখের কথাতেই তো নিজের ট্যাক থেকে একটা ঢাকা পুত্রা নিতে পারি না, মশাই।

ট্রাম পাড়িরে পড়ল।

ঢাকাটা গায়ে নিতে ভবেশ নাম্বার উত্তাপ করছিল ভল্লোলক তাকে বাধা দিতে বল্লে: কী নাম্বার, মশাই ? পাড়ান, কোথায় বাবন আপনি ? তাড়ান। না-ওর আমি নিতে দিছি। বেশ লাগে, কণ্ঠাক্টার।

ভবেশ যান মুখে একটু হাসল। সেখানে মিসিরে এখন পৌঁছানোর চেয়ে ঢাকাটা ভাঙানোর তার বেশি বরকার। কেননা ঢাকাটা হাতাশ ব'লে সেই সোফান থেকেই যদি তার কিরে আসতে হয়, তবে আর সেখানে গিয়ে লাভ কী ? না, যে করেই হোক ঢাকাটা তার চালাতেই হ'বে।

গাড়ি আসার তখন চলত শুরু করেছিল।

— না, আমি এখানেই নামি। মিহিমিচি আপনাকে,—অনেক, অনেক ধন্যবাদ। ভবেশ মাটির নাম্বার চল প্রায় একটা লাফ দিলে—সেন কোন একটা হাসরোষী সর্দীর্ণ অন্ধকূপের ছুরার চেত বাইরের কাঁকার সে লাফিয়ে পড়ছে। চুর্কল পা দেহের সেই চুর্কাত উত্তেজনা বইতে পাহল না—

ভবেশ রাস্তার ওপর প্রায় চমড়ি থেকে পড়ল।

পাড়ির তেতর থেকে সমকর্ডোষিত সম্মিলিত সমবেদনার একটা চাপ। তখন ঢাকার শব্দের মধ্যে মিসিরে গেল।

পারের পলো খেড়ে ভবেশ উঠে পাড়াল, সামনের পান্ডালার দোকান থেকে এক টুকরো বরফ চোরে নিরে কাটা-ছেঁড়া ভাঙ্গার তা বল্লে মূর কল্ল। কেউ-কেউ তার আঘাতের পরিমাণ দেখতে সামনে হুঁকে প'ড়ে মানুষি সহায়হুতি দেখাচ্ছে, কিন্তু বল্লে কি, ভবেশের পরীরে তখন হুজির আনন্দের ল্পর্শ লাগছে।

না, এইবার ঢাকাটা তার ভাঙতে হয়। মাসিকের চেয়েও সুখিবারে বাহুতর খাড আছে—সারা পরীরে

বেন এখন কেবল এই স্তব্ধ। কৃথা—আত্ম-হত্যারও
আগে এই কৃথা। টাকাটা যখন গাতে এসেই পড়েছে
তখন আসে থেকে চারটি খেতে নিলে ক্ষতি কী—
আত্মহত্যার ক্ষত্রে তের সমর, তের সুযোগ পড়ে আছে।
টাকাটা হো আসেই ভাঙিয়ে নেওয়া সরকার।

হু'পা একাত্তেই ব্যস্তার উপরে একটা খাবারের
দোকান। চোখের ক'রে হু'মানার খাবার নিয়ে
ভবেশ দোকানীও গাতে টাকাটা ফেলে দিলে। দোকানী
টাকাটা একবার ঝুঁকলে, ধারগুলিতে একবার পেল
ক'রে আঙুল বুলালে, তারপর তার পরশার ডাবরের
মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে বিরতি পল্লভগুলি ভুক্ত বঙ্গ।

তারপর খাবার যখন একবার পেটে পড়েছে তখন
ভবেশের সে বঙ্গ একবারে বেকে—মুহুর্তে তাকে
কিছুতেই আর স্মৃতি করানো পেল না। আর
জলজয়ার এই চৌক আনা পরমা—অস্ত্রের অপব্যয় থেকে
ভবেশ তাকে রক্ষা করবে।

তখন শরীরের আবার রক্তখারায় নতুন ছোয়ার
এসেছে: মুখের রক্তভার উপর এসেছে তৃপ্তির লাভা।
সামান্য কৃথা মিটেছে তাই না পৃথিবীকে আবার সাময়িক
ভালো লাগছে, সামান্য অভাব মিটেছে তাই চার-
দিকের মরুভূমির উপর এসেছে আকাশের সম্মল
বহুতা—ভাঙা পায়েই ভবেশ হাঁটতে লাগল। আত্ম
আর এই ভাঙানো পরশার আঁকি: না কিনলেও কোনো
ক্ষতি নেই, কেননা কৃথার তীত্ৰভাব্যের সঙ্গে-সঙ্গে
মৃত্যুর দক্ষিণাও অনেক ক'মে এসেছে—আবার এপরমা
যখন ফুরিয়ে যাবে তখন ফের নতুন চেষ্টা ক'রে দেখা
বাবেখন।

কিন্তু পকেটে পরমা রাখার মধ্যে দুসহ একটা
অশান্তি আছে বোধ হয়—এর উপর ভর ক'রে কোনো
একটা বিঘম সাহসিক কাজের ক্ষত্রে ভবেশের সারা
শরীর উত্ত্ব হ'য়ে উঠল। কিন্তু কী ক'রে একে
ব্যয় করা যায় প্রথমটা। ভবেশ সাত-পাচ কিছু স্থির
করতে পারলে না—কিন্তু ওমিকে তাকিয়েই দেখা
পেল চোখের সামনে একাও একটা শোষ্টাঙ্গ।

ভবেশ কী ভাবলে তা সেই জানে—সেই পরশার সটান
সে চোদ্দখানা খাম কিনে বঙ্গ। খাম কিনে লোহা
সে মেসে কিবল—বহিও সেখানে তার আর ভাঙল।
নেই। সস্ত্রাঘের ঘর—সেই ঘরেই কালি পাবে, কাগজ
পাবে। গত সপ্তাহের সৈনিক কাগজগুলি তারই ঘরে
জমা হ'য়ে আছে। শরীরে তখন আবার বেন আশার
শিখা জলছে, সেই আলোর সে এই চিঠিগুলির উত্তর
পাবার মুহুর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাছি। তারপর
আবার না-হয় সে সেই বঙ্গ, সন্টার অক্ষুণ্ণ দিয়ে
চুকবে: তাকে বাঁচবার অধিকার না দিলেও তার
মৃত্যুর অধিকার সবার কাছতে পারেনি। সে তার
আদিম, অস্ত্রিম অধিকার—এই অধিকারেই সে সকলের
সমকক্ষ সকলের সম্মুখীন। তার জীবনের সেই
একটিমাত্র মূলধন—এত সন্তোষ তাকে উড়িয়ে দিতে
তার এখন মাত্রা করতে লাগল।

ঘরের কাগজের বিজ্ঞাপন বেছে-বেছে একসঙ্গে
সে চোদ্দখানা সন্তোষ পাঠালে।

এক দিন, দু' দিন, তিন দিন—রোজ ভবেশ
শিগুনের অপেক্ষা করে। বহুবার ডাক আসবার
কথা ততবার সে বাইরে এসে সস্ত্রাঘ হামিরা দেয়।
মহাব যে কিছু এখনো আসছে না এবং কখনো যে
আসবে না সে-সম্বন্ধে ভবেশ আবার সে-মনে নিশ্চিত
হ'তে পারল।

মুহুর্তে-মুহুর্তে আবার সে সেই বিরাট গল্পের
কাছে এসে পৌঁছেছে—বার পূজতার অল্ল গ্রাস আবার
তাকে ডাক দিল, তাকে তার কৃথার উপকরণ
ব'লে করল চিহ্নিত। ভবেশ মনকে কোনোরকমে
প্রায় স্মৃতি করিয়েছে, কিন্তু শরীরের প্রতিভুক্ত
এখনো তার নিঃশব্দ কাঙ্ক্ষিত, প্রতি পা-ফেলার এখনো
তার করণ প্রতিবাদ। দু' তারার আলোর মন
আর পৃথিবীর পথ পুঁছতে চায় না, কিন্তু আত্মব

—শরীরে আছে এই পণ্যক্রিয়াক্রমের সম্ভাব্যতা। তাই ব'লে শরীরকে আর প্রভু দেওয়া চলে না—এই শরীরের ক্ষেত্রেই তার দত্ত মানি আর দত্ত পরল। এবার তাকে কঠিন হ'য়ে শাসন করতে হ'বে, তুলতে হ'বে তার সকল নির্গন্ধ প্রসোতন, এবার আর তাকে আকিঙে নিষ্কম ক'রে নয়, অহুত্বিহীন গাঢ় তন্ত্রার ঘুম পাড়িয়ে নয়—এবার সে তাকে চলন্ত ট্রামের তলায় কেসে দেবে, ছাত থেকে মাটির উপর তাকে ছুড়ে মারবে, কিংবা কোনো পুতুরের ধারে গিয়ে তুলে দেবে তাকে পতীর মলের মধ্যে। আত্মকে শরীর কেঁপে উঠছে বটে, কিন্তু তার আব্দার সে আর কানে তুলছে না। তার অভ্যাচারের শোধ এবার না নিলেই আর নয়।

মুখ-চোখ কঠিন ক'রে ভবন দুপুর-বেলাতেই বেরিয়ে

পড়ছিল, কিন্তু ভাগ্য তার সঙ্গ সন্ধান একটা মোটা, খেলো রসিকতা করতে বসেনি। তার কৃষ্ণের সব হস্ত অস্ত কক্কাক্ক ক'রে। সবজার চৌকটে পেরতেই ভবনের সঙ্গে পিওনের বেধা হয়ে গেল। তার চাতে লম্বা একটা খাম—এবং উপরে একেবারে তাইই নাম লেখা। সতি-সতি, তারই নাম লেখা। সতি-সতি। ভেটপ ঢাকার সেই কেরানির কান্ডি তার গরুয়ে। এবং ভাগ্য বখন সময়, তখন সেই কেরানির কাছে সে সামান্ত একটা জামিনেরও সরকার হ'বে না তা বলাই বাহুল্য! ভাগ্য সময় হ'লে বরাদ্দ মাইনের থেকে কিছু আগাম টাকা পাওগাতে কিছু দোষ নেই।

তারপরে আর পর কী! তারপর সাদা, সহজ, সরল সভা কথা।

মানুষের আত্ম

মুজরাই মানুষের গড়ে আর	৫৬ বৎসর
ইংলও	৫১
জাপানে	৪৪
ভারতবর্ষে	২৩

এ'দেশে শিশু-মৃত্যু

শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা
১ বৎসরের কম বয়স
হাজার-করা পুরুষ-শিশুর মৃত্যু
হাজার-করা স্ত্রী-শিশুর মৃত্যু

ভারতীয় কলাশিল্প-কথা

শ্রীমৎস্যনাথ রায়, এম্-এ

মাহুয়ের হৃদয় জীবনযাত্রা আর যে-পর্বাণ আসিয়া পৌঁছিয়াছে সেটাকে তৃতীয় পাদ বা ত্তর বলিতে চাই। বহু দিন আগে বিবর্তনযাত্রার কোন বিশেষ পাদে সে আল্পভিষিক্ত জীবের গায়ে মাহুয় বসিয়া প্রথম ‘সেবেল’ মারা হয়, তাহার জীবনের মূল্যের ছিল কেবল টিকিয়া থাকা। সে-কৃপে মাহুয় অস্ত্রের মোটা ও লম্বা বয়সটির কারিকর : তার পরিচয় পাই হুল রকনের করেকটি নিরতিশয় শাস্য-দিগা হয়ে বা যয়ে। কিন্তু সেদিনও লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই—প্রাণিজনপটে মাহুয়ই একবার জীব যে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার নিকট মহাচতুর্ভুতি ভিক্ষা করে নাই, উদ্বাবনী বা প্রাণপন্থিককে একাক করিয়া সে মহিমাবিত্ত প্রকৃতিক নিষেধ কামে বাটাইয়াছে। সে প্রকৃতির বশে না চলিয়া প্রকৃতিকে তার বশে আনিতে চাহিয়াছে। তার অস্ত্রদিনের ইতিহাসেই দেখি—বিদ্রোহের পক্ষা উড়িয়াছে বীর্ণ্যবলে পৃথিবীকে মর করিয়া একান্ত অস্থগত করিবার চেষ্টায়। মাহুয়ই একমাত্র বয়স্কা।

সুসজ্জাত কাটিল, পাখরের ও হাড়ের বয় ধাতুর হইল,—তুলনা চলে না এতই হৃদয়তর হইল। ইহাতে আমরা দিনে দিনে আশ্চর্য্য প্রতিভার অপূর্ণ রচনার পরিচয় পাইতে থাকি। সেই দ্বিতীয় ত্তরে শাস্য-দিগা ভাবে টিকিয়া-থাকার প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া মাহুয়ের মনে এক নব ভাব আসিয়া উঠিল। তাহাকে ‘মানব’ বা এক আলো-ছায়ার আধ্যাত্মিক রূপ বলা যায়। মাটির মাহুয়ের সেদিন কল্পনার পাখা মিলিল। তার রচনার কোনো অপূর্ণ রস-সংকার হইল; নবায়ত এক প্রতিভার দীপ্তি লাগিল। মায়-অজন্-চিহ্নিত চক্ষু, তপ-রস-গন্ধ-ভরা পৃথিবী মায়-বগ্নের মত দেখা দিল—এই পৃথিবীতেই এক নবপৃথিবীর আবির্ভাব দেখা গেল, এবং তাহা তার নবলভ দৃষ্টিতে

এক অপরূপ রেখার প্রতিভাত হইল। সেদিন হইতে এই রেখাকে রূপ দেওয়াই মাহুয়ের কাজ হইল। মাহুয় এতদিন ছিল কণ্ঠকার—এবার হইল রূপকার। আপন চোখে সে গড়িল দেবতা, রচনা করিল তাহার অপরূপ স্তুতি; নৃত্য-গীত-চিত্র-ভাস্কর্য্যে সে তাহার নবায়ত তাবের হৃদয়ে নাচিয়া চলিল। সেদিন শুরু হইল কলালক্ষীর আশ্চ-বিস্মৃত পূজা। আশ্চও বিশেষ করিয়া আমিম জাতিদের মধ্যে তাহারই অবিকল প্রতিরূপ দেখি।

আবার মনুষ্যতাকে অতিক্রম করিবার দিন আসিল। মাহুয় বজ্র প্রকৃতির মহিমাবিত্ত দেবীর পক্ষে আশ্চ-সমর্পণ করিতে পারে নাই। নিষেধের বিরাট মরুর কঠোর ভায়ে সে শীতল হইল; নিরতিশয় চরম আশ্চ-স্তরের পক্ষে মতি স্মৃকটিন আশ্চ-ময়ের দীক্ষা লইল। সে আর হৃদয়ের শাস্যকে চিন্তাশ্রাসে অস্থির-বিস্মল হয় না। সে হৃদয়ের অস্তরের সমাহিত রূপের সন্ধান চাটিল, সে নিম্ন অস্তরস্তরের দর্শন-ব্যাকুলতার কঠোর তপসা আরম্ভ করিল। সেই তৃতীয় ত্তরে ‘দর্শনে’র আবির্ভাব। সেদিন বিচার শুরু হয় আশ্চ-শাস্ত্রের, আর তারই নাম দর্শনতত্ত্ব। সেদিন কলা শিল্পের নবজন্ম হইল। সে কথা পরে বলিতেছি।

প্রথম ত্তরের কথাটা বোকা একটুও শক্ত নয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ত্তরের স্বরূপ আর-একটু পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছি। এই দুই কৃপের বহি চোটে মূল্যের দিতে পারি, তাহা হইলে তুল বুঝিবার পথ কিছু বন্ধ হইতে পারে। দ্বিতীয় কৃপের হয়ে বিতেছি—অথাতো প্রকৃতি-জিজ্ঞাসা। মন প্রকৃতিস্বীন; বাহ্য প্রকৃতিতেই মাহুয়ের মন আবদ্ধ ছিল, আর বেদ্য অগ্রসর হইতে পারে নাই। তৃতীয়ের প্রথম ও শেষ প্রের এই হয়ে মিলে—অথাতো ত্রাণ-জিজ্ঞাসা। উভয়

কেটেই অথাতো সখাটি পূর্ণবস্ত্রী মুন্সের ঘের টানিতেছে।
আবার দুগন্ধিকণ আছে, তাহাও স্বরণ রাখিতে হইবে।

পশ্চিমে যে অপূর্ণ সভ্যতা পত হই এক সভ্যতা
ধরিয়া পড়িয়া উঠিয়াছে, এই দুগ্ধ নবাগন্তের একালের
রূপ, তাহার শিত্ত-বিজ্ঞান-সাহিত্যের একালের ধারা,
আমাদের উন্মিষিত মানব-সংস্কৃতির বিবর্তন-ধারার
সহিত মিলে কি না, ঠিক বলিতে পারি না; মনে
একটা সন্দেহ জাগে—সে-সেই তৃতীয়ে মাক্ষ্যানে
ষিত্তের পুনরাগমন ঘটাইছে কি না। বিষয়ের মধ্য
মিত্র দেখিলে সহজ বস্তু সহজভাবে প্রতিজ্ঞাত হই না—
এ সম্বন্ধে জনপ্রচলিত একটি প্রবাদে সেকথা পরিষ্কার
করিয়া বলা হয়। পূর্ণ ও পশ্চিমের মধ্যে যে বৈরানল
ফলিয়াছে, তাহাতে পড়িত পড়িতে কাহার কতক
পড়িবে, কেমন করিয়া তাহা নিষ্কর করা যায়? আঙনের
হৃদয়ের বে-ধ্মে আঘ বিচ্ছ আঘ, তাহার মধ্য মিত্র
উঠেবার সহজ স্তম্ভের দেখা পাওয়া কঠিন। পশ্চিম
আমাদিককে দেখিতে পাইতেছে না—বিষে ভিন্ন ও
ঘরের, নৃত্যের, রূপার, অবজ্ঞার আর স্বার্থের কঠিন
বেশাতে, প্রাচীর স্বরূপ আঘ তাহার চক্ষে পড়িতেছে
না। আবার অপমানে, কোভে, স্বার্থ ঐতিহাসিক
সভ্যতার দৌরবাস্তিমান, রূপার ও ফ্রোমে, প্রতীকী
অতি অপূর্ণ সভ্যতা, প্রাচীর চক্ষে আবর্তিত
হইতেছে। বিচারের পক্ষে যে সংঘ Impersonal
মনোভাবের প্রয়োজন তাহার অভাব ঘটিতেছে।
পশ্চিমের কোনো নগণ্য ভাগ্যাবধৌও যদি আমাদের
সমক্ষে হুঁকথা বলেন, আমরা তাহার মন্ত বাহবার
কোয়ারা ছুটাইয়া দিতেছি এবং বিচ্ছ পক্ষকে অস্তিত্ব
করিয়া তুলিতেছি। এই সাময়িক স্তম্ভ মনোভাবের
একপ্রকারের স্বরূপ পরিচয় মিলে এখন ইংরেজদের
পালগামি দিবার রাজ্য বার্ণাড্ শ'র ইংলওয়াপী
খাতিরের সহিত এসেছে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের তুলনা
করি।

এই পশ্চিমের সভ্যতার পোড়ার ও মাকের কথার
অন্য আকারের স্তম্ভ থাকে। তাহা তৃতীয় ওয়ের

অনুভবন। মাক গত হই এক সভ্যতা উঠে ইহার সে
রূপ রূপের পরিচয় আমরা পাই, মাকের উঠে তাহারই
বিষয় সম্বন্ধে। বর্তমান কোনো সভ্যতা বাঁচিয়া থাকে,
ততক্ষণ তাহা যে প্রাণবন্ত তাহা শুধু স্বীকার নহ, বিশেষ
করিয়া মনে ধরিয়া রাখিতে হইবে। ইউরোপের
জগৎপিণ্ডে যে বিরাট প্রাণ-স্পন্দন আছে তাহা অনুভব
করিতে সেন কোনো কারণেই আবার বিস্মৃত না হই
—তন্ম এই কালবিশেষের নাম যদি বার্ষিক সভ্যতার
কাল দিই, যোগ হয় নিত্য অনন্ত হইবে না।

স্বল্পপ্তি ব্যাপারটা তত কার্যকরী নহ—তাই যাত্রিক
সভ্যতা ইউরোপ ডিমাইয়া, মাকের পাড়ি মিত্র সে নবরূপে
দেখা দিতেছে, তাহার নাম সেগা হইয়াছে 'ইয়োলো
পেরিল'। 'ইয়োলো পেরিলের ধর্মশিতা তো 'হোরাইট
পেরিল'। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই 'হোরাইট পেরিলের'
স্বপ্নটি ইউরোপীয় সভ্যতার প্রেত দিন কি না। এক্ষণে
তাহার মানিও প্রচুর। গত মধ্যাহ্নকে সমর্থন করিবার
মত নীতি নিদিষ্টেছে না। কিন্তু মাক ইহাতেই সে-
সভ্যতার প্রাণশক্তির পরিচয় মিলে না। ইউরোপের
সভ্যতার যদি মূলের সন্ধান করিতে চাই, তবে তাহার
মহতী প্রাণশক্তির হৃদয়পরিচয় লইতে হয়। সভ্যতার
কোনো এক অংশের যদি ঈশং গভীরভাবেও আলোচনা
করি, তো যুক্তিতে একটুও বিলম্ব হইবে না, কত বড়
এক পরিপূর্ণ আত্মিক-শক্তির ইহা বিকৃতি, কত বড়
তপস্বীর ধন ইহা। আবার বিরাট ধনের যে কঠিন পাপ
ইহাও ঐতিহাসিক সভ্যতা; ধনের মাহাত্ম্য-শাস্ত্র এখন দেখা
হয়, পাপের মাহাত্ম্য-শাস্ত্রও তখন রচিত হইতে থাকে।
ধন আর পোত পরস্পর পরিপূরক কথা, আর তাহাদের
হইতেই সৃষ্টি স্বার্থ, সেই স্বার্থেরই মাত্র নামান্তর
সমাজশ্রমিকতা। বাহিরের ধনের মোহায়ে অভ্যন্তরের ধনের
ভাঁটা পড়ে, ইহা মাত্র শাস্ত্রবচন বলিয়াই অবজ্ঞের নহে।
প্রতি-সভ্যতার ইতিহাসেই তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

সংক্ষেপ হইতেও সংক্ষেপে, ইঙ্গিতে বলিলেও এসকল
কথার প্রয়োজন আছে। কারণ, সাধারণতঃ শিল্পকলার
বিবর্তন সভ্যতার বিবর্তনের 'অনুসঙ্গ', তাই পিছের

ইউরোপের মাগোচনা করিতে গেলে, সভ্যতার ইউরোপের কথা ভুলিতেই হয়।

বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা যদিও তৃতীয় শতাব্দীর, তৎসমাজের ধারায় যে দ্বিতীয় পাদের একটি বিশেষ প্রকাশ আছে, এই কথা ব্যতীত মনে আঘাত করিতে থাকে। তাহার সভ্যতার সহিত জড়িত আছে—অথাতো প্রকৃতি-সিদ্ধান্ত।

বার্ণার বলিতেছেন, মানুষের মধ্যে দুইটি ধাতা বসিতেছে, মনের মধ্যে বুদ্ধি বা জ্ঞানের, প্রাণের ভিতর অহুত্ব বা রসের। এই কথা মানিলে সমুদয় শিল্প-কল্পনা পড়ে দ্বিতীয়ের কোঠায়। আর ধর্ম্মনাদি, বিশেষ করিয়া বুদ্ধিগত যাহা-কিছু, সব পড়ে প্রথমের কোঠায়। ইউরোপের মন এই দুইটির মিলন-রচনার ক্ষমতা ব্যতীত নয়, ব্যাকুলও নয়। মানুষের কষ্টপাথর সে-দেশে অহুত্ব। এই দেশে যে তাহা নয়,—এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু ঐ দেশ সম্বন্ধে এইটুকু সোপ করিতে হয়, সেখানে কল্যাণ একান্তভাবে মানুষের পরিপূরক বা স্ফোটক নয়। শিব ও জ্ঞানরস এই দুইয়ের নিষ্ফল তাহা হইলে পষ্ট-কল্পনা হয় না। এইখানেই ভারতীয় শিল্প-কলার সহিত ইউরোপীয় শিল্পের আভিষেক পার্থক্য। জ্ঞানরসকে ইউরোপ কি ভাবে স্বত্ব সেবানকার দুই একজন বড় ধার্ম্মিকের কথায় তাহা পরিষ্কার হইতে পারে। Kant বলিতেছেন—“Beauty in its subjective meaning is that which, in general and necessarily, without reasonings and without practical advantage, pleases. In its objective meaning it is the form of a suitable object in so far as the object is perceived without any conception of its utility.” তিনি আবার বলিয়াছেন, “The capacity of forming judgments without desire is the basis of aesthetic feeling.” সৌন্দর্য্য বস্তুভাববিরোধের অর্থে, সাধারণতঃ শু বিশেষ করিয়াই, মক্কারগেই ও বিনা বিচারেই এক কোনো বাহ্যিক পার্থক্য ভিন্নই মনোজ্ঞান করে। আর সৌন্দর্য্য বস্তুদাপেক্ষ অর্থে কোন বস্তুর রূপান্তর—

কিছু সৌন্দর্য্যকরণে বাহ্যিক প্রয়োজনের কোনো প্রকৃতি উঠিতে পারে না। তিনি আরও বলিয়াছেন, সৌন্দর্য্যের অহুত্বের মূলতত্ত্ব হইতেছে—কোন প্রকার বাসনার বা প্রয়োজনের উপর বিনা নির্ভরে বিচারের শক্তি। এমন কথা হইতেই রূপ শাস্ত্র, প্রচলিত অর্থে গ্রাহ্য হয়—আর্ট কন্স সেক্স—যদিও প্রায় উঠা মর্মেই ইহার শ্রুতি কর্তৃক ইহা ব্যবহৃত হইয়াছিল।

Hegel বাণীনিষ্ঠাধ্বনে যে-রসে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা ভারতীয় নীতির বড় পরিপন্থী “Beauty is the shining of the Idea through matter. Only the soul and what pertains it is only beautiful... But the spiritual must appear in the sensuous form, only appearance and this appearance is the reality of the beautiful. Art is thus the production of this appearance of an idea and is a means together with religion and philosophy, of bringing to consciousness and of expressing the deepest problems of humanity and the highest truth of the spirit. Truth and beauty are one and the same thing, the difference being only that truth is the idea itself as it exists itself and is thinkable. The idea manifests itself and is thinkable. The idea manifested externally becomes to the apprehension not only true but beautiful. The beautiful is the manifestation of the idea.” বস্তুর রূপ-সৌন্দর্য্য মাত্র পরম পদার্থের (Idea) ইচ্ছাভ্যাস। মাত্র মায়া ও তদবলম্বী বাহ্য কিছু তাহাই সত্যতাই জ্ঞানরস কিম্বা বাহ্য হয় তাহা প্রকাশ পাইবে মূল বস্তুতে—মাত্র এই প্রকাশ বা প্রকাশ হওয়ারই জ্ঞানরসের বাধ্যত। তাই ‘আর্ট’ হইতেছে, আইডিয়ায় প্রকাশিত-সাধন, আর তাই ধর্ম ও ধর্ম্মনের সহিত ‘আর্ট’ মানুষের পত্তীর্ণতম সমস্রোত এবং চরম আধ্যাত্মিক সত্যকে মানুষের চেতনাবলম্বী করে; তাহাকে স্বরূপে প্রকাশ করে। সত্য এবং জ্ঞানরস একই; পার্থক্য মাত্র এই যে, সত্য-হইতেছে মাত্র আইডিয়া, আর সেই আইডিয়াকে ধ্বন রূপে সেওয়া হয়, তখনই সে হয় জ্ঞানরস। আইডিয়া ধ্বন বাহুধন

পাথর আর তখন মাথ সত্য বলিয়াই গৃহীত হয় না, শিল্পরচনার বড় লক্ষণ চাইতেছে—অজ্ঞাতও অসীমের সৌন্দর্য হ্রস্ব। হ্রস্ব হইতেছে—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের নিকট সত্যের মূর্তি আবির্ভাব। একথা আর কিছুতেই বলা চলে না, সৌন্দর্য একান্ত সারিবহীন অহুত্বের বৃত্ত-কল্পনা, বাবসারিক জগতের সহিত তাহার কোনোই সংঘর্ষ নাই। সত্য হইল, বাহ্য ভ্রম, বাহ্য কল্যাণ তাহাই হ্রস্ব, বাহ্য হ্রস্ব তাহাই ভ্রম, তাহাই কল্যাণ। কল্যাণের বন্ধন ত্যাগ করিয়া অহুত্বের প্রাবল্যে সৌন্দর্য-রচনা এসপেও অজ্ঞাত নয়। সাহিত্যে ইহার উদাহরণ ও বাখ্যা ভাল মিলিবে। অতি প্রাচীন সাহিত্যে ঠিক এমন কিছু বড় দেখি না। কিছু পরের যুগে, তখনও দেখিতে থাকি, রামচন্দ্র যেন কোনো ভাবের প্রতীক। অহুত্বের স্থান যে সেখানে নাই তাহা নয়, ভীষ্ম কোন-কিছু দেখাইতে চাইলে তে। অহুত্বের প্রার্থ্যা চাই; কিন্তু অহুত্বের একচ্ছত্রতাই যে শুধু নাই তাহা নয়, অহুত্বের অপ্রাবল্যও বৃষ্টি আকর্ষণ না করে, এক্সপ নয়। আত্মিকার সাহিত্যে অহুত্বের সেই প্রাবল্য আদিত্যে বলিয়া গীতার নির্বাসনে মনে অভিমান মাঝে।

অন্ত একজন ইউরোপীয় মনোবীর কথা এই সম্পর্কে উদ্ধৃত করিতে পারি। Schelling বলিতেছেন—Art is the production or result of that conception of things by which the subject becomes its own object or the object becomes its own subject. Beauty is the perception of the infinite in the finite. And the chief characteristics of works of art is unconscious infinity. Art is the uniting of the subjective with the objective of nature with reason, the unconscious with the conscious and therefore art is the highest form of knowledge. Beauty is the contemplation of things in themselves as they exist in the prototype. It is not the artist who by his knowledge or skill produces the beautiful but the idea of beauty in him itself produces it. শেলিং বলিতেছেন—সৌন্দর্য হইতেছে দীর্ঘার মধ্যে অসীমের উপলব্ধি। তাই

শিল্পরচনার বড় লক্ষণ চাইতেছে—অজ্ঞাতও অসীমের সম্পাদিত।

শেলিংয়ের কথার তে। ভারতীয় ভাবের আশ্রয় প্রতিলিপি তিনি। ভারতীয় কলা-শিল্পের যে-যুগের কথা পরে বলিব সেই যুগ—ব্রহ্মের মধ্যে অজ্ঞানের মাহাত্ম্যব্রত কলা-কল্পনা—শেলিংই তে। তাহার নির্দেশ দিলেন। তিনি বলিতে চান, আমরা চক্ষু চাহিয়া বাগ্যে হ্রস্ব বলিয়া দেখি না, শিল্পীর প্রাণের স্পর্শে তাহাই হইয়া উঠে পরম হ্রস্ব—কিন্তু শিল্পীর হাতে তে। এই নবরূপমাহাত্ম্য নাই—তাহার অস্তরে তাহা আছে; শিল্পীর অস্তরের স্পর্শেই বাহ্য মাহাত্ম্য, বাহ্য বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার মত বলিয়া কখনও মনে হয় নাই—তাহাই হইয়া উঠে অনবদ্য হ্রস্ব।

ভারতীয় ও ইউরোপীয় শিল্পকলার ভাবের একতার চাই একটা উদাহরণ দে-দেখের শিল্পরচনা হইতে দিতেছি। De Vinciর হাবিতে মানুষের যুগের ভাব একটু পড়ার ভাবে লক্ষ্য করিলে, ভারতীয় চিত্রের মাহাত্ম্যের সহিত তাহার বিভিন্ন শাস্ত্র দেখিয়া অবাক হইয়া বাইতে হয়। দাঁড়িপির যুগের মানুষ তাহাকে বৃক্ষা উঠিতে পারে নাই—ব্রহ্মের বড় তাঁহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল; এবং তাহার অক্ষিত চিত্র দেখিলে এই কথা মনে উঠে যে, তাঁহার ধরণটা ঠিক ইউরোপীয় ছিল না। সারা ইউরোপ ধরিয়া যে Gothic Architecture-এর প্রভাব অসামান্য, সে-ভাবধর্মের সহিত ভারতীয় ভাবধর্মের মনের ধানিকটা একধর্মতা লক্ষ্য করা শক্ত নয়। মুসলিম রচনার সহিত তুলনা করিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে। পশ্চিম Saint-এ আর ভারতীয় বৌদ্ধ-মূর্তিতে যে আধ্যাত্মিক বা আত্মিক রূপপ্রকাশের প্রয়াস দেখি, তাহাতে সম্ভাব্য ধর্মের পরিচয় পাই বলিয়া মনে হয়। ম্যাজেনা মূর্তিতেও তাহারই প্রভাব দেখি। Renaissance-এর শেষের দিকের ইউরোপের শিল্পকলা এক অপূর্ণ আধ্যাত্মিক রসে রঞ্জিত দেখি। এমনটা ইউরোপে আর কখনও ঘটনাছে বলিয়া মনে হয় না। এখানে

ভারতীয় ভাবের খোঁজ লক্ষিত না। ইহাই যেন পারে না।। পুঁজির সত্ত্বাশ্রয় রচনার কল্পনা সের বোদ্ধরা। আর Church-সংক্রান্ত বিশেষ ভারতীয় শিল্প-নিদর্শনের স্বরূপ প্রতিরূপ বিয়ন নয়। বৌদ্ধধর্মের প্রথম দুই বুদ্ধসেবের প্রতিমূর্তি দেখি না; বুদ্ধধর্মের আদিতেও খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তি লক্ষিত হয় নাই। নানা প্রতীকে সেই মহাপুরুষকে কৃষ্ণাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। এখানে মায় ভাবের একাই লক্ষ্য করি না, অনেকটা প্রতীকের একাই চোখে পড়ে। অপর পক্ষে, মহেশ্বরীর ধর্ম মগাপুরুষের প্রতিরূপ-কল্পনার কঠিন মানা বিশেষ কার্যকর হইয়াছে। অক্ষয়-চিত্রাবলীর বহু চিত্রের সহিত ইটালীর এসিস্ট চিত্রাবলীর নিকট-এক; পণ্ডিতেরা লক্ষ্য না করিয়া পারেন নাই। এমন-কি, ভারতীয় শিল্পকলার স্বাধীন সত্তার হৃদয় প্রতিবাহী ফার্ডিনান্দ, জিন্সেট্ বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ব ও ঐ ভাবগত এক; লক্ষ্য করিয়াছেন, আর, কোন মতেই বলিতে পারেন নাই, ভারত এই ক্ষেত্রে ণ্ডী। National Galleryর চতুর্থ পর্জের Ambrogio Lorenzettiর অঙ্কিত প্রাচীর-চিত্রের সহিত অক্ষয় প্রাচীর-চিত্রের মিল আশ্চর্য। ঐ সময়কার Giovanui Belliniর Madonnaও আমাদের দৃষ্টি বড় আকর্ষণ করে।

শিল্পের কথাগুলোই আবার বলিতেছি, বিবরণও স্বাধীন নয়, নির্মিত স্বাধীন নয়। প্রকৃতির অস্তর যখন নির্মিত অস্তর স্পর্শ করে, সেই বিলম্বের অপরূপ পায় তাঁহার শিল্প-কলার। ঠিক এমন কথাই আর-একজন দার্শনিক বলিয়াছেন, Fichte'র কথা—That perception of the beautiful proceeds from this: the world, i.e., nature—has two sides: it is the sum of our limitation and it is the sum of our idealistic activity. In the first aspect every object is limited, in the second aspect, it is free. In the first aspect every object is limited, distorted, compressed, confined—and we see deformity, in the second we perceive its inner completeness, vitality, regeneration—and we see beauty. So that the deformity or

beauty of an object depends on the point of view of the observer, beauty therefore exists not in the world but in the beautiful soul.” স্বন্দরের বোধ এমন করিয়া ঘটে; পৃথিবী স্বর্গাৎ প্রকৃতির দৃষ্টি দিক আছে; সে আমাদের সীমাবদ্ধ কর্মতার লম্ভি এবং আমাদের মারাত্মকের বিচিত্র করন। প্রথম দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে প্রত্যেক বস্তুই সীমাবদ্ধ এবং বিস্তারিত দিক্ দিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই মুক্ত। এক দিক্ হইতে দৃষ্টিপাতে প্রত্যেক বস্তুই সীমাবদ্ধ, বিকৃত, ণ্ডিত, সঙ্কচিত—চোখে পড়ে ঐহীনতা, বিকলাঙ্গতা—অপরদিকে দৃষ্টিপাতে আমরা দেখি প্রত্যেকের অন্তর্ধান পরিপূর্ণতা, সীমাবদ্ধতা, অপরূপ স্বাধীন—আমরা স্পর্শ পাই সৌন্দর্যের। স্মৃতিতে বস্তু ঐহীনতা বা ঐ নির্ভর করে দর্শকের দর্শনবিশিষ্টতার। সৌন্দর্যের বাসস্থান পৃথিবীতে নয়, তাহার বাস স্থল স্বর্গে। স্মৃতিপথের যে-কথা বলিয়া আসিতেছি এখানে তাহারই একটি বিশিষ্ট ধারার মত-বাণের পরিচয় পাই।

এই যে মনুষ্যের উক্তি উল্লেখ করিতে হইল, মায় ইহাই প্রতিপন্ন করিতে যে, যে শিল্প-নীতি বিশেষ করিয়া ভারতীয় বলিয়া পরিচিত, ইউরোপের উচ্চতম ভাবুক শ্রেণীর অনেকেও স্বাধীনভাবে বিশ্লেষণ করিয়া ঐ একই তত্ত্ব উপনীত হইয়াছেন— শিল্প-শক্তি যে একটা খোঁজ নয়, তার দায়িত্ব যে স্মৃতিত্ব, ব্যবহারিক লগৎ সফল যে নির্মিত পরম উদাসীন হইতে পারেন না—এমন কথা তাঁহারাও বলিয়াছেন।

ইহার উপরও একথা বানিয়া গইতে হইবে যেন ইউরোপের মনের অভিব্যক্তি বিশেষ করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে ক্যান্টেই। আশ্চর্য বন্ধনের বাহিরে ভাবের রূপে ময়, এই কথাটাই ইউরোপের শিল্পত্ব মানিয়া লইয়াছে। অপর উচ্চ সত্য, প্রকাশের রূপের সত্যকার স্মৃতি কান্টকেও নষ্ট করিতে দিবে না। Realism, Impressionism সবসঙ্গেই আর্টের কোঠার উঠিতে হইলে এই স্মৃতির প্রাথমিক পরীক্ষার পাশ করিতে হইবে। স্মৃতি, রূপবিকৃতি, মননতা লোপ পাইবেই। শব্দগুলি

আপেক্ষিক, তাহাতে সন্দেহ নাই, তবুও দিনটি যত্নে
ধরুন, ইহার আর্টের লক্ষণ এমন কথা কি কেউ
বলিবে না? আবার ইউরোপীয় বলিয়া বিশেষ পরিচিত
ঐ কথাটি এসেলেও কিছু অপরিচিত তাহা নহে। অপরূপ
বৈশ্বাস সাহিত্য হইতে বিচিত্র ববীজ-শরৎ-সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ
সকল সাহিত্যই ভাবের বস্তুর ভাসিরা চলিয়াছে।
বাংলার অল-বাং-মাত্রেই সর্বপ্রকারের বস্তুর আমরণ-
নয় আছে। তবুও ববীজনাথ স্বয়ং প্রচার করেন,
সত্যকার শির-স্বর্গেই কল্যাণের মন্দির কতই
আয়োজন, তাহাতে স্বস্তি-বাচনের কি একান্ত প্রয়োজন,

তিনিই অপরূপ সমালোচকরূপে লক্ষ্যমাত্রায় সেই
কল্যাণমন্দিরের অপরূপ বাখা করিয়াছেন।

ভারতীয়, তথা সর্বকলানিগ্রহ-সম্বন্ধে এই কথাটি অপরূপ
সাহিত্য হইবে, তাহা মনের ভাব-প্রকাশের সাধারণ
বাহন নয় — ইহা প্রকাশ করিতে চাতিয়াছে
অনির্দিষ্টমাত্রকে, ইহা নিজে চাতিয়াছে বাণী। কল্যাণ-মন্দিরের
প্রতি হইতেছে — বিশ্বের বিশ্বকর রক্তস্রোত-বাটন,
Revelation 1* (ক্রমঃ)

* ইহা রক্তস্রোত-বাটন পত্রাণের প্রকাশিত অপরূপ
অপরূপ কল্যাণ হইল। —লেখক।

গল্প-প্রতিযোগিতা

নিয়মাবলী

১। গল্প কৃষ্ণকর্ণ কাগজের ২০১০ পৃষ্ঠার
মধ্যে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায়
লিখিতে হইবে। বাঁয়ে এক ইঞ্চি পরিমাণ
'মার্জিন' (margin) রাখিতে হইবে।

২। গল্পের আখ্যানভাগ, লিখন-প্রণালী এবং
ভাষা—সকল দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া উহার
বিচার করা হইবে।

৩। গল্পের সঙ্গে ভাল ছবি নিতে পারিলে
তাহার জন্য বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হইবে। ছবি
Drawing Paperএ বা Bristol Boardএ
আঁকা যাইতে পারে। ভুলি বা কলম ব্যবহার
করা যাইতে পারে। কলমে আঁকিতে হইলে
লাইনগুলি গাঢ় কালো রঙের এবং পরিষ্কার
হওয়া দরকার।

৪। প্রেরিত গল্পের আবরণের (cover)
উপরে "গল্প-প্রতিযোগিতা" লিখিয়া দিবেন।

৫। মনোনীত গল্প প্রকাশিত করিবার সম্পূর্ণ
অধিকার "উদয়ন"-সম্পাদকের থাকিবে।

৬। অমনোনীত গল্প কেবল পাঠিতে হইলে
উপর্যুক্ত মূল্যের ডাকটিকিট পাঠাইতে হইবে।

৭। গল্প পাঠাইবার সময় "গল্প-প্রতি-
যোগিতা"র কূপন পাঠাইতে ভুলিবেন না।
নিজের নাম ও ঠিকানা কূপনের উপর স্পষ্ট
করিয়া লিখিবেন।

৮। এ সম্পর্কে অস্বস্তি জ্ঞাতব্য বিষয়
সাধারণ নিয়মাবলীতে দেখিবেন।

৯। গল্প পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল।

১০। প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে সম্পাদকের
বিচারই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে।

প্রথম পুরস্কার	৫০০ টাকা
দ্বিতীয়	২৫০ "
তৃতীয়	১৫০ "
চতুর্থ	১০০ "



(১)

এক বেঁধের বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রণালী স্বতন্ত্র কি ?

শ্রীযুগ্ম দেবী

হিন্দু শব্দের অর্থ কি ? হিন্দু বলতে যদি Indian বা ভারতবাসী বোঝায় তাহ'লে ভারতবর্ষ বাসের মাত্রই হিন্দু তাদের সকলকেই হিন্দু বলা যায় না কি ? যদি তাই হয়, তবে ভারতীয় মুসলমান, খৃষ্টান ও পার্সিয়াও হিন্দু নয় কি ? পক্ষান্তরে, হিন্দু বলতে যদি শুধু ভারতীয় ধর্মাবলম্বী বোঝায় (হিন্দু মহাসভার সংজ্ঞা তাই), তাহ'লে চীন, জাপান, ফ্রান্স ও এন্ডের বোম্বের হিন্দু বলতে পারি কি ? বালিস্টারের অধিবাসীরা হিন্দু কি অর্থে ?

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

(২)

উত্তর

(২)

৷ এই চিহ্নে তত্ত্বমতে নাদ ও বিন্দু জ্ঞাপন করে ;—
নাদ ও বিন্দুতে মিলিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বা পরম ব্রহ্ম
বৃত্তায়। সেই পরম-ব্রহ্মে ব্রহ্মার পর নোকে মিলিত
হয় বলিয়া তাহার নামের আশে ৷ চিহ্ন দেওয়া হয়।

শ্রীমুগ্ধনাথ রায়

(৩)

মৃত ব্যক্তির নামের পূর্বে ৷ চিহ্ন দেওয়া হয় কেন ?

শ্রীবাণী দেবী

(৩)

সংস্কৃত-সাহিত্যে “স্বপাল” শব্দটির “নাল” অর্থে প্রয়োগ
আছে কি-না। থাকিলে কোথায় কোথায় আছে ?

শ্রীনীহাররঞ্জন মিত্র

(৪)

ভারতীয় হিন্দু সমাজে অবরোধ ও অবশ্রুতন
প্রণালী উৎপত্তি হইল কখন ও কিভাবে ? অত্যাশ্রিত।
কথারি অর্থ কি এবং এই শব্দটি কত প্রাচীন ?
কিন্তু ভারতীয় হিন্দু মহাসভার মধ্যে অবরোধ ও
অবশ্রুতন প্রথা নাই কেন ?

শ্রীচন্দ্রা দেবী

বাণিজ্য স্থান-গীর স্বপন বিচ্ছেদ হয় অয়ের মতো
—তখন তারা ছ'টো ঠিক একত্রকরের মোহবাতি
কিনে আনে। ছ'টো বাতি ছ'জননের সামনে ঠিক
এক সময়ে জালিয়ে স্থান-গীর স্থপে-স্থি চূর্ণ ক'রে
ব'লে থাকে। একটা ওর একটা তার। যার বাতি
আগে নিবে যাবে, তাকে সেই বেশেই তখনই বেড়িয়ে
বেতে হবে। কোনো দাবী কোনো। বিবাহ চলবে না।
সময়ের কোনো মিলিসের উপর তার অধিকার
থাকবে না। যার বাতি মলবে বেশি—এক নিমেষের
অন্তে হ'লেও—তারই থাকবে বা-কিছু সব।

বিবরণটি অনেকটা উপজাতির মতো ; ধানি না এর
কতখানি সত্য। অপরে হরত বেই বর মিতে পালবেন।

শ্রীমুগ্ধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হাসি

শ্রীহরিনয় রায়চৌধুরী

আমাদের লব্ধে অপবাদ আছে, আমরা হাসিতে ও হাসাতেই জিনি না। প্রাণ-খোলা হাসি আমাদের মধ্যে নাকি পূর্ব কখনই দেখা যায়। আমাদের লব্ধ-পত্র ও মাসিক পত্রিকাগুলির মধ্যেও হাস্যরসের বিশেষ অভাব। বর্ধমানের বাংলা ভাষার হাস্যরসের কাগজ বোধ হয় একখানিও নাই—খাকিলেও তাহা সুপরিচালিত নহে। “কেন আমরা হাসি না?”—এ কথার উত্তরে কেহ বলিবেন, “আমাদের স্বভাব”; কেহ বলিবেন, “সংসারের চাপে ও নানা গুণ্ঠিত্বাৎ হাসি চাপা পড়ে।” প্রথম উত্তরটিকে চাইলেও, সম্পূর্ণ ঠিক নহে। “অভাবে স্বভাব বদলায়” সত্য বটে, কিন্তু অভাব এবং হাসি কি পলাপাশি থাকিতে পারে না? “অভাবে হইলেই গুণ্ঠিত্বাৎ আসিবে; গুণ্ঠিত্বাৎ আসিলেই হাসি দূর হইবে,”—কিন্তু গুণ্ঠিত্বাৎ কি আমাদের জীবনকে এমনই ক্ষুদ্রিয়া বলিবে যে, দিব্যরাত্রি কেবলই তাহার শেষে আমরা বিমর্ষ ও নিম্নীয় হইয়া থাকিব? এক্ষণ গুণ্ঠিত্বাৎ শরীর ও মনের পক্ষে যে কি পরিমাণ ক্ষতিকর তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। হাসি—প্রাণ-খোলা হাসি—গুণ্ঠিত্বাৎ পরম পক্ষ, শরীর এবং মনের অন্তরঙ্গ বন্ধ। হাস্যরসিক ব্যক্তি বিমর্ষতা ও গুণ্ঠিত্বাৎ-মরাগত ব্যক্তির ডাঙার; হাসি গুণ্ঠিত্বারোপের প্রধান ঔষধ।

“বহু হাসি তত কায়া, বঁলে গেছে রামশৰ্ভা”—এই মিথ্যা প্রবাদটি আমাদের কাছে যেন ভূতপ্রত্যয়ের ভাণ অবিকার করিয়া বলিয়াছে। কায়ায় ভয়ে আমরা যেন হাসিতেও নারাজ।

কথায় বলে—“Laugh, and the world laughs with you. Weep, and you weep alone.”

“হাসি যদি, দুনিয়াও সাথে সাথে হাসে ;

কাঁদিলে, কাঁদিতে কেহ ঠাড়াবে না পাশে।”

কথাটি খুবই সত্য। ছোট ছেলেমেয়েরা খেলাফলে পরস্পরের দুখের দিকে চাহিয়া বলে, “দেখি, কে আসে হাসে।” হাসি চাপিয়া অল্পক্ষণ চাহিয়া থাকিবার ফলে একজনের দুখে আপনা হইতেই হাসি আসিয়া পড়ে। কিন্তু, এক্ষণ কায়ায় খেলা কোন দিনই দেখি নাই। “ওম্ম অকারণ পুলকে” হালা চলে, “ওম্ম অকারণ জুখে” কাঁদা কখনই চলে না।

বথার্ণ রসিক তিনিই, বাহ্যার রসিকতা কখনও বার্ণ হই না, বা অন্তরনে, অপাত্রে ও অনমনে কদাচ প্রসূক্ত হয় না। রসিকের হাসির কথা অন্তের বিরক্তি বা কষ্টের কারণ হইলেই তাহা বার্ণ হইল বলা হইতে পারে। কেনো। কামনিক মূলকায় ব্যক্তির সম্বন্ধে হাসির ছবি আঁকিয়া বা গল্প রচনা করিয়া হাসির উদ্দেশ্য করিলে তাহা বাস্তবিক রসিকতা হইতে পারে ; কিন্তু, আমাদের পতিচিত্ত রামবাবু বা গ্রামবাবু বা অন্ত কোনো। ভক্তলোকের ছবি আঁকিয়া বা গল্প লিখিয়া হাস্যরসের চোঁটাকে বার্ণ রসিকতা বলিতে হইবে।

অনেকের ধারণা, হাসি বা রসিকতা আমাদের গুরু-শুণ্ঠ ভেদজ্ঞান দূর বা হ্রাস করিয়া দেয়। বাস্তবিক পক্ষে, বথার্ণ রসিক ব্যক্তির গুরু-শুণ্ঠ ভেদজ্ঞানও যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। তিনি গুরু বিষয়ে লঘুভাবের বা লঘু বিষয়ে গুরুভাবের অবতারণা করিবার চোঁট করেন না। পার্শ্বীয় মানে “হাঁড়িমুখ” নহে ; রসিকতা মানে “ছাব্লামি” নহে ;—এ কথা সন্দেহহীন মনে রাখিতে হইবে।

রসিকের মনে আনন্দ, উদারতা, সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা থাকিলে তাহার রসিকতার পূর্ণ বিকাশ হয়।

জীবনসংগ্রামে হাসির বিশেষ প্রয়োজন ;—সংগ্রামকে দুসিবার ভক্ত নহে, সংগ্রাম করিবার শক্তি মনে দাদাইবার ভক্ত। হাসি জীবনের ‘ভার’ লাঘব করিয়া আরো ভার বহিবার শক্তি দেয়।

হাস্যে কাহানা P



বেড়-ভয়ংকর —
সহানুভূতি হাসি

সিংহ-শব্দক —
আপেক্ষা হাসি

বড়ো-হাস —
স্বাভাবিক হাসি

গুরু-ভাষা —
শব্দ-ভয় হাসি



কুকুর-ভয় —
চোখ-ভয় হৃৎক হাসি

—
ভয় হাসি

গুরু —
ভয় হৃৎক নিঃশব্দ হাসি



বন-মহা —
চোখ-ভয় হৃৎক হাসি

শেফাল-হাস —
আকাঙ্ক্ষা হাসি

কোলা-হাস —
হৃৎক ভয় হৃৎক হাসি

হাসে কান্না ?



মীল—

পাল-স্তরী হাসি

বন-বেড়াল—

হাসিলে হাসে না কেন ?

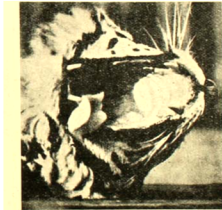
কাঁঠোখুঁক—

হুড়ুক হাসি

হাসি কি মানুষেরই একচেটিয়া সম্পত্তি ? জীব-জন্তু ইতর প্রাণী কি হাসিতে জানে না ? এবিদ্যে হাসির বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে পাক্ষিক, জীবজন্তুর মুখে যে হাসির ভাব অতি স্পষ্টভাবে দেখা যায়, এই ছবিগুলি দেখিলে সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

বনমাছুষ যে ব্যতর্কিকই হাসে, তাহার প্রমাণ কিছু কিছু পাওয়া যায়। হাসি কান্না একত্রিত মনের ভাব তাহাদের মুখে বেশ স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পায়। যে বনমাছুষটির ছবি এখানে দেওয়া হইয়াছে তাহার মুখে যে বিজ্ঞপের হাসি দেখা দিয়াছে, বৃদ্ধিমান্ জীব ছাড়া সে-হাসি হাসিতে কেহই পারে না।

কিছু, অস্ত্রেরা যে-হাসি হাসিতেছে, তাহা নাকি হাসিই নহে ! পশুদের নানানরূপ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, সিংহ, বাঘ, বিড়াল, কুকুর, মৃগাল, কুমোর, গজ, পাখী, বাঘ ইহারা হাসিতে জানে না। যে বাহাই বলুক, ছবিতে দাত। উঠিয়াছে তাহাকে 'হাসি' ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।



বেঙ্গল টাইগার—একবারে যেন গড়াগড়ি

ছবিতে বাহা উঠিয়াছে, তাহা বতই হাসির মত হউক, আসলে নাকি বেচারাদের 'ব্যতর্কিক' মুখ-ভঙ্গিরই প্রতিকৃতি। কেহ অবাক হইয়াছে, কেহ দুঃখ পাইয়াছে বলিয়া হাই তুলিতেছে, কাহারও বা বিরক্তি (!) বোধ হইতেছে। দন্তোগ্রাকারের কেবলমুখিতে সবগুলিই হাসির মতন দেখাইতেছে।

সর্বাণী

(উপভাস)

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

(১)

বাড়ীখানি হেলসাইন হইতে দেখা যায়। খুব
অমকালো পল-কাটা ধামওয়ালা একরকম বাড়ী
জিটোরিয়ার কিছু পূর্ববর্তী দিনে খুব বেশী রকমেই
প্রচলিত ছিল,—অবশ্য ধনী ব্যক্তিদের মধ্যেই ;
এখনও সখ করিয়া কেত কেহ করাচিং এর
অনুকরণ করে ; কিন্তু সেটা খুবই কম লোকেই করে ;
এ সেই গড়নের একখানি বড় বাড়ী। এবাড়ীর চন্দ্র-
তারিখ বাড়ীর গারে লেখা নাই ; লেখা থাকার
কোন প্রত্যাশাও করা যায় না, কিন্তু তার ওখু পল-
কাটা মোটা মোটা ধামজলাই নয়, বাহিরের আকার-
প্রকারের অবস্থা হইতেও তার না-লেখা চন্দ্রতারিখের
আন্দাজ পাওয়া যায় ; সে-তারিখ অবশ্য : নতালী
পূর্ণেরই, এমিক্স-ওমিক্স প্রদশ বছর আগেরও হইতে
পারে, পরের কিন্তু নয়।

বাড়ীটার গারে তার কৈশবে কৈশোরে কোন্
কোন্ রংয়ের ছোপ রঙ্গিয়া উঠিয়াছিল, তাহার কোন
নিশানা পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু প্রেরজাতিকের
এবিধের গবেষণার যদিই কোন প্রয়োজন থাকে তাহাতে
বাধ্যও পড়ে না। এর গারে এখন যদিও অনেক
দিনের পুরাতন কুট্টি-জলের কালো কালো জোরা-
টানা আদ-পায়ে রং-কলা হাল্ধে রঙে মঠীত বোবনের
বসন্তোৎসবের সাক্ষ্যদান করিতেছিল, কিন্তু এর এখানে-
জখানে নানা স্থানে যে চূণবাণি বসিয়া পড়িতেছে, তার
ভিত্তর দিয়া সুরে সুরে সাদা লাগ প্রভৃতি মূল সপ্ত বর্ণের
কয়েকটা বর্ণই উক্তিমুখি মারিয়া বসিতেছিল, “আমরাও
একদিন ছিলাম”। বাড়ীর বরঙলি মনে চর লম্বাটোড়ায়
বেশ বড়ই, ওম্ভিতে তা’ নেহাৎ কম নয় ; উপর

নীচের আক্যা বা সান্নের মিক্ হইতে দেখা যায়,
তার সংখ্যা,—এটা অবশ্য আদ্যাতীতেই বলা দেল,
অন্ততঃ বক্রি-ব্রিষ্টার কম নহে। দুরঝা-আনালাগুলি
বেশ বড় বড়, সমস্তই খড়খড়িওয়ালা, রং তাদের
এক সময়ে গাঢ় সবুজ ছিল, এখন কিন্তু তা নাই ;
সবুজের আশেখ সেওয়া যে রংকে কলাপাতা রং
বলা হয়, এখন এসের সেই ধরণেরই একটা রং।
কোথাও কোথাও একটু তা’ কিচাও হইয়া গিয়াছে,
কাঁকে কাঁকে কোনখান দিয়া একটা ছোটো লাইন
গাঢ় রংয়েরও দেখা যায় ; কিন্তু সেটা যে আর
আদল রং নয়, তা’ বৃত্তিতে ঘেরি লাগে না।
উপরে সেই ছোড়া ছোড়া মোটা বাসের উপর
দিয়া যে চার-চৌকি বারান্দাটি দেখা যায় তার
ডিন দিকের লোহার রেলিং একদিন নীল কিংবা
সাদা রং মাখান ছিল, আদ্য তার রং বেথানেও
কিছু বা বাকি আছে, খুশা-মরণার সঙ্গে তা এক
হইয়াই মিশিয়া গিয়াছে : লোহার গারে লাগতে
হুঙের মরিচা ধর।। কুটির জলে জলে ছানের সেক্টোয়
একপুঙ্খ শেওয়া পড়িয়া রহিয়াছে ; রোসের তাতে
খানিক খানিক উঠিয়া আসেকার কুটির একটুখানি
আদল দেখা দাইতেছে, আদল চোরা আর নাই।

এই এখনি সেই বাড়ীখানিতে একদিন বেথানে
এই বাড়ীর মালের অস্থাপাতেই বেশ একটা বড় রকম
পরিবার তাদের জীবনের অদখা ছোট বড় ছুৎ,
সুখ এবং কান্নাহাসির ডালি সাঝাইয়া লইয়া বাস
করিত ; তাদের নখা দিয়া এই বাড়ীতেই বেথানে
কত গল্পস্বহ্যার গীলা, কত উৎসবের বাণি, কত বিয়োগের

হাজার, কতই না মিলন-বিরহের আনন্দ-বিধানের
 ডেউ উঠিত-পড়িত, স্রোতের মতই প্রবাহিত হইত, বস্ত্রের
 মতই দ্রাবিত করিত। পিতা আবার বর্ষাশেষের
 স্রাব্তবেগে জলরাশির মতই প্রবাহে বহিত। চলিতা বাইত;
 মাঝ সেখানে কছত্রোত পলিল জলের সামান্ত একটুখানি
 জলার মতই ক্ষুদ্র একটি পরিবার বাস করিতেছিল।
 বাড়ীর সামনের অপর-সরস্কিতে একদিনকার সমস্ত
 স্মরণিত উদ্ভানটির এমিক্ ওমিক্ যেমন দু'চারিটা নাম-
 জাদা ফুলের গাছ সেদিনে হস্ত তাবের কৈশোরও আরম্ভ
 হয় নাই; আবার কাহারও বা অস্বস্তিক্তা এইখানেই;
 চারিদিকের মরণোৎসব এবং জ্বলের মাঞ্চখান হইতেও
 নিজেদের অধিকৃত পূর্ণাঙ্গবোধের ফলে বাচিতা-বস্তিতা
 থাকিত। নিষেধ নিষেধ পুষ্প-বন্ধুতে অজস্র পুষ্প-লগ্নারে
 ভরিত। উঠে, সেই মতই কাগজোতের সঙ্গে হুঙ্ করিত।
 বার। ক্রান্ত হইয়া বিদায় লইয়াছে, বিদায় লভিয়াছে,
 তাদের ভিতরকার একজন মাত্র লোক তার সমস্ত
 বয়সটাকেই অতিক্রম করিত। আসিয়া আশুও এই
 অতিক্রান্ত-প্রায় বাড়িকোঁর শেষ সীমানার পৌঁছিয়াও
 যেন এই বাড়ীর বাগানের বাম পাশেতে ঐ পরম্পূর্ণ
 পাখা-বিরল পরিপূর্ণবস্ত্র সজিনা পাছটার মতই
 শেষ দিনটির অপেক্ষায় প্রতীক্ষা করিত। রহিয়াছিল।
 দিন তিনি ঠিক একটির পর একটি করিত।
 গণিতেরিহলেন কিনা জানি না, জলের মালায় তার
 ইষ্টময়ের নিখিষ্ট অক্ষর কয়টি কিন্তু অনেক সংখ্যাতেই
 নিত্য গোণা-গোণা হইতেরিহল, সে খবরইহু আমরাও
 পাই।

ইনিই এই পুরাতন বড় বাড়ীটির বর্তমান কালের
 মালিক, নাম তার সুরজন চট্টোপাধ্যায়, এঁর পিতার
 নাম ছিল দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য, পিতামহ ছিলেন
 চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয়; এই বাড়ীটি তার ইচ্ছাতেই
 গড়িত। উঠে। অজ কোন এক পদ্মাগারের বেশ
 ছাড়িয়া কোন কিছুই ব্যবসা অথবা বৈবাহিক
 সম্পর্কের দারিদ্র্যে, জানা যায় না, এই অকলে
 আসিয়া পছন্দ করিয়া এই বাড়ী ও বাগান ভৈরবী

করাইয়াছিলেন। শুধু বাড়ী বাগানই নয়; বাগানের
 ভিতর বাড়ীর ঠিক সামনেই একটি সৌধিকা; অবশ্য
 সেটি 'গোবিন্দলাল'দের বাড়ীর বাগানের সেই সাহিত্য-
 জগৎ-বিখ্যাত 'বাকটী' পুস্তকের সঙ্গে সমতুলিত হয়
 না; কিন্তু একদিন এরও কাচবন্দে সঞ্জিল-সমুদ্র
 বন্ধের উপরে চন্দ্র-তারকার সমস্ত বস্তিকা তৈরী
 করিয়াই নভিত হইত, এর স্বর্ষয়-মণ্ডিত সোপান-
 শ্রেণীর উপর 'ব্রহ্মের' মত অলঙ্করণ-মাথা কোমল
 চরণের এবং 'রোহিণী'র মত শেতলশ্রুত লামাপারের
 গলিগাত্র চিহ্ন অঁকিত। দিবারও সোকেব কোন
 অভাব হইত না। এখন কিন্তু এই তাড়া কাটখরা
 এবং বসিয়া সতিয়া যাওয়া সুবিধিত সোপান-শ্রেণীর
 উপর দু'খানি পারেরই চিহ্ন অঁকিত হয়; সে
 দু'খানি পারের দ্বায়ে সে লালিতা, যে সৌকুমার্য্য
 ফুটিয়া উঠে তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া মনে পড়িত।
 যায় সকল চিন্তা-গুহেরে গাহুরবের লতীপুহার
 দিনে শিতালি দিয়া অঁকা মা-লক্ষীর চরণ-কল্পনাটী!
 যে-চরণের আঘাত-দৌরব-লাভ-লালসায় পুরাকালের
 রামোজ্যানের অশোকবীধিকার লুপ্ত অশোকডক তার
 কাল-সম্মানিত পুষ্পোদগমকে সমস্ত-নিরুদ্ধ রাখিত, এ
 যেন 'বাসবদত্তা'-'রত্নাবলী'র সেই রক্তোৎপল-রাশিরক্ত
 নুপুর-মঞ্জীরব-সজীবিত সেই দু'খানি চরণপদ।

ঘাটের উপর চাঁদনি-বেগু। সিঁড়ির মতই লামা-
 কানো পাথরের মিলান করা বসিয়া যাওয়া ঝাইবার
 ছায়া। আগনের দু'দিকে কাঁট-করা পাথরের ছোট
 বিলানের মত, হেলান নিবার কাছে বোধ করি এক
 সমস্ত লস্কিত, এখন কোনই কাছে লাসে না। মধ্যে
 মধ্যে পড়ল বাড়ীর কমবয়সী মেয়ের। দান করিবে
 আসিয়া বাহু বা হৃৎকলসে ভরা দল এইই উপর
 নামাইয়া সোপান-মারোহদের শ্রান্তিটুকু দূর করে
 তারপর বিশ্রান্ত হয়। ঘরের দিকে চলিতা যায়।

বাড়ীটার দক্ষিণদিকে বাগানের শেষভাগে পাঁচিলের
 পা শেঁষিয়া কতকগুলি পাকা ঘর; ছাদ তাদের পাক
 নয়, করোপেটের। দরজা এখন সবগুলার নাই, হয়

কথা বলিয়া তাহিয়া পড়িয়াছিল, তারপর আর
 শিথি জাকিয়া বসান হয় নাই ; হস্ত মাণী প্রভৃতিরাই
 তাহের চাউরিখা; উনানের ইচ্ছন ক্রমেই তার
 সম্ভাবনার করিয়াছে। না হস্ত কোন সুযোগ-প্রাপ্ত
 প্রতিবেশী সেগুলোকে অলক্ষিতে সরাইয়া লইয়া নিম্নের
 বাড়ীর একটা পালাতাকা দরজার পরিবর্তে বসাইয়া
 দিয়া অকাঙ্ক্ষ হইতে কাছে লাগাইয়াছে,—কথায়
 বলে ‘বড়লোকের আত্মকুড়েও সোনা ফলে’! তা’
 সব ঘরগুলারই যে দরজা ছিল না, তা’ও নয়,
 ওরই মধ্যে হ’লোনা ঘরের অথবা বেশ ভালই,
 শিকল দিয়া তাতে ভাল লাগানোও থাকে।
 ভিতরে বাহ্যে বাধান তৈরী করার ক্ষমতা
 কালের উপযোগী সামান্য-সরঞ্জাম, কোদাল, কুঙ্কল
 নিকানী বহু, গাছ-কাটা কাঁচি, কুটা-কাটা কল-করানোর
 কারি এবং আরও সব কি কি, খোড়ার সাম,
 গাড়ির সরঞ্জাম, তাকাতোরা অনেক দিনের
 অনেক কিছু, এমন কি মধুর দিনের বাড়ী না করার
 শেষ নিরর্থন চুপেভাঙার মতবড় বোকাই ছালাটা।
 আর একটা ঘরের মালিক একজন খোটাই
 ধরোয়ান। সে তার মেয়ের গোয়া-বাহির-করা
 ঘরের একপাশে চুলায় চাপাইয়া রহুঁর দান আর
 মোটা মোটা পুক পুক চাপাটী বনায়, এদিক্
 সেদিক্ কাছে-কেন্দ্রে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং আলত-
 অলপিত ধবাহে সন্ধ্যার সন্ধিছাওয়া চাক-পাইয়ার
 উপর হাত-পা ছুঁড়িয়া দিয়া কখন বৃহৎ ওড়নে কখন
 গলা ছাড়িয়া কুলসীমাসের অথবা কবীরবীর গেছে।
 গাহিয়া নিসল কীবনের বিস্তার এবং ভিত্ততার পরিহার
 করিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে সে মূর বেশ মধুর ও
 করণ হইয়া অধুরবর্তী জন-বিরল গৃহ-বাতায়নে আনমনা
 কেন নিসলী তরুণীর কানের চারে কখন মূর্ছনার
 বাজিয়া উঠে, গভীর অস্তমনস্কতা হইতে সহসা
 তাহাকে সচকিত করিয়া ইকং উৎকর্ণও হস্ত
 বা একটু করায়, পানের গুটী-একটা কলি স্পষ্ট
 শোনা গিয়াছে তারপর হস্ত বা আর শোনা যায়

নাই, হস্ত বা হস্তমধ্যেই গান আননা-আপনি
 ধামিয়া গিয়াছে। কোন্ সময় বা পাবক অন্তরের
 বিবেক-বুদ্ধির গভীরতর প্রেরোচনার গভীর তাহে
 বিভোর হইয়া গাহিয়া উঠিয়াছে —

‘খাখা শোটা রসি অউর কুয়া নাচি,
 উই! শিয়ান সোয়াপন করকে চাচি।’

সুপ্রচী কানের মধ্যে হস্ত না হ’ক, ভাষাটাই চমক বা
 প্রোজীর মনের মধ্যে মিঠা লাগিয়াছে, যেন এর পরের
 কথাগুলি শোনার ক্ষমতা মনে তার আগ্রহের অস্ত্র নাই ;
 কিন্তু নিঃশব্দ এই উদ্ভূততার নীরব আবেদন বোধ
 করি বা বধ্যস্থানে পৌছাইয়া দিতে সে পারে
 নাই। গান হস্ত পামিয়া গিয়াছে, মনের তার গৃহ
 বৃহৎ রপনে কিছুকণ ধরিয়াই যেন আননা-আপনি
 ব্যাছাইতে থাকে —

‘খাখা শোটা রসি অউর কুয়া নাচি,
 উই! শিয়ান সোয়াপন করকে চাচি।’

টিক কথা, টিক টিক ! বেধানে শিপাসা মিটাইবার কিছু
 যাত্র উপায় বা উপকরণ নাই, সেখানে শিপাসাকেই
 পরিভ্রাম্য না করিয়া আর উপায় কি ? করাই ভাল,
 গা করাই ভাল। হকের ভিতর একটা মূপতীর
 দীর্ঘবাস বহুঃপ্রবৃত্তরূপেই যেন জমিয়া উঠে এবং
 বৃকটকে গভীর তাহেই তারাক্রান্ত করে ; ধানিক ক্ষণের
 ক্ষমতাটাকেও সেইসঙ্গে ইংবৎ বাগাতিষ্ট করিয়া রাখে।
 কেন ? জানি না।

বড় বড় ছায়াচ্ছন্ন বড় ঘরগুলার ঢুকিলে যেন হস্ত
 যেন সেগুলো গা করিয়া দিগন্তে আসে। এই সব
 ঘরের মধ্যে কয়েকটাই ছিল পূর্বজন্ম অধিবাসীদের
 শ্রমমাগার। এখনও সে-সব ঘরে ভাল ভাল কাঠের
 বড় বড় ষাট পাতা আছে। দাল ঘেরোর গভীর উপর
 বিছানার স্থান অধিকার করিয়া আছে বাগানের মধ্য
 হইতে উড়িয়া আসা সাতপুখ দ্বা। প্রায় সকল ঘরেই
 একটা করিয়া মেঘনি কাঠের বড় আলমারি, চুল

বিশিবার টেবিল, আয়নাগুলি যদিও বিভেল করা নয় ; মাগে বেশ বড়ই,—একটা করিয়া আন্দা, তলার দিকে ছুতা রাখার বাস, জলটোঁকি—কোনটা মার্বেল-বসান, কোনটা শুধু কাঠের, আর এছাড়া খানকতক করিয়া ছবি। তা ছবিগুলির মধ্যে অনেক দিনের অনেক চুচি-বিশুদ্ধের খবর পাওয়া যায়। যে-সময়ে বাজারের ছাপা ছবি মূলতঃ হয় নাই, ধনী লোকেরা পটোদের পূরণোদ্যোগ করিয়া ভাল ভাল তৈলচিত্র অঙ্কিত করাইতেন, সেদিনের অতি সুন্দররূপে চিত্রিত বৃদ্ধদ্বয়জনের চূর্ণা, মহিষমর্দিনী, কালী, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতির সঙ্গে প্রশস্ত ফ্রেম-আঁটা সজীববৎ পরিম্পৃষ্টমূর্তি এবাড়ীর মরনারীদেরও কতকগুলি চিত্র, আবার আট ফুলের কল্যানে সজ্জা ছাপা শশবাজার, শশমণ্ডাবিছা, কৃষ্ণ-কালী, কালীশ্রমদমন ; আবার উৎকট সভা পরিচ্ছদে এবং পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপেই অনভিজ্ঞতা বা বিরাগ সংযুক্তা হুনরী যেমন্দের ছবিরও কোথাও কিছু অপ্রতুলতা দেখা বাইত না। ঘরে দালানে এমনকি উপরে উঠার সিঁড়িতেও ইতার প্রাচুর্য্য আভ্যুতরিত। দিয়াছে, নাই শুধু এসব দেখিয়া দৃষ্টি সার্বক করার লোক ! কিন্তু তাই বলিয়াই দেখা-শোনা করার লোকও যে নাই এমন নচে। কালের ধম্মে কিছু পোকার কাটে, ক্ষেত্রে গিল্টি ময়লা হইয়া যায়, প্লাষ্টার খসিয়া পড়ে তথাপি ছাড়াবোঁড়া তলারক করা একেবারেই যে বন্ধ থাকে তা'ও নয়, বড়টা পারে আদেশকার ঐ সব ধনজনের অধিকার-করা বরঙলার তবির এখনও এই একজনেই করে। কাছে তার স্নানি নাই, কর্তব্যে অবগাদ আসে না, ভাল গুস্ত

কোনদিন লাগে, কোন সময় গুস্ত অপছন্দ ঘরে কিন্তু কাজ সে ছাড়ে না, একই ভাবে করিয়া যায়।

ধ'খানি বর দক্ষিণঘাতী, বেশ বড় বড় জানালা প্রশ্র খোলাই থাকে, বাতাস অনেক দূর হইতে যেখানে যেটা ভাল ভাড়া ফুলের গছটুকু, প্রথম বর্ষেরের আঁঠু সুবাসী, দীর্ঘতলের সুমিষ্ট মিষ্টতাঃ এর ভিতর দিয়া বহন করিয়া আসে, সন্ধ্যা-তারার টিপ জানালার ওপারে আকাশের কপালে তিকি-তিকি করিয়া কুটিয়া ওঠে ; ঘরের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা এবং পারিপাট্য যেন নিত্য প্রত্যক্ষ হইয়া দেখা দেয়। বর ধ'খানির মধ্যে অতীতের প্রত্নত্ব গভীররূপেই আত্মগোপন করিয়া ফেলিয়াছে। ইতার সর্বত্র ব্যাপিগা কুটিয়া উঠিয়াছে কুটী মাধুণ্য-মাখা পরম রমণীর বর্তমানতা।

খাট এঘরেও পাতা আছে, টাইল পুরাতন কিন্তু অতীতের সঙ্গে ধ'ড়াইয়া সে নুনের দিকে তার বাহু প্রসারিত রাখিয়াছে। নুতন ঠিকনের গদী, শুষ্ক-ধবল সর্বত্র-বিস্তৃত নয়, আন্দার আধুনিক যুগের কাপড় জামা, সেওয়ালে অয়েল পেট্রি-এর বসলে ওয়াটার-কলারের প্রতিকৃতি, তাতে পুরুষের গায়ে শালের ছোকা আর মাপার পাপ নাই, মেয়েদের গায়ে আছে নুতন যুগের পরিমিত অলঙ্কার-বস্ত্র, আর আট-ফুলের গছ-সরস্বতীর ছবির পরিবর্তে কাপড়ের উপর রেশমী পশমী নৃত্যর তোলা জুয়েলের যেয়েলী হাতের চিত্রাবলী। ছবিগুলির তলার তলার এগুলির রচয়িতার নামটীও নানা রকমের হতা দিয়া লজাপাঞ্জর ভিতর হইতে মুক্ত করিয়া দেখা আছে— সেই নামটী সর্বাপী দেবী। (ক্রমশঃ)

“যে গৃহিণী সর্বগা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন বলিয়া বস্ত্র পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জ থাকিতে চাহেন না, অজ্ঞের একটী গুণ অভিমান আছে—সেট ভাল নয়।—(যে গৃহিণী) স্বামী এবং বিধি উভয়ই হইতে পারেন, তিনিই গম্ভী—তিনিই সম্পত্তি এবং শোভা উভয়েরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।”

—ভূমেন



ইতিহাস —

উড়িষ্যা বণীর ঐতিহ্য—ঐপ্রবোধচন্দ্র সেন

(প্রবাসী—চৈত্র, ১৩৩২)

নারের আগে ঐ দিদিবার নিয়ম—

ঐপ্রবোধচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(প্রবাসী—চৈত্র, ১৩৩২)

প্রাচীন ও অপর্যায়ক—ঐবিমলাচরণ লাহা

(ভারতবর্ষ—চৈত্র, ১৩৩২)

বাংলার ইতিহাসের কয়েকটি গোড়ার কথা—

ঐপ্রবোধচন্দ্র সেন

(বিচিত্রা—চৈত্র, ১৩৩২)

মুছলমানের বর্ণবিচার—মোহাম্মদ আকরম খাঁ

(মাসিক মোহাম্মদী—চৈত্র, ১৩৩২)

'চাক্কা'র দমন—আবদুল কায়ের

(মাসিক মোহাম্মদী—চৈত্র, ১৩৩২)

মারাঠা সৌভাগ্য-হর্বের অবদান—ঐবল্লভনাথ

সরকার (বঙ্গী—চৈত্র, ১৩৩২)

বুদ্ধবধা—ঐঅনুলাচন্দ্র সেন

(বঙ্গী—চৈত্র, ১৩৩২)

ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বিন-সুজিরার তিক্তত-

অভিনান—ঐনিলিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য

(বঙ্গী—চৈত্র, ১৩৩২)

ছাপাখানা —

বাংলা টাইপ ও কেস—ঐঅমরচন্দ্র সরকার

(প্রবাসী—চৈত্র, ১৩৩২)

কলাশিল্প —

বহু প্রকারের কয়েকটি পুরাতন ভিত্তি—

ঐকালিদাস দত্ত (প্রবাসী—চৈত্র, ১৩৩২)

ভারতীয় চিত্রের বৈশিষ্ট্য—ঐগুরুদাস রায়

(প্রবর্তক—চৈত্র, ১৩৩২)

বৌদ্ধ শিল্পকলার আদর্শ ও অলঙ্কার ওয়া—

ঐঅমিত্য বোস

(শঙ্কর—চৈত্র, ১৩৩২)

বেকার-সমস্যা —

Qualified Indians and Unemployment

—S. K. Sircar

(Modern Review—April, 1933)

ধর্মতত্ত্ব —

ঈশা—ঐদ্বিরীকেশবের বহু

(প্রবাসী—চৈত্র, ১৩৩২)

অমৃত্য ও আধ্যাত্মিক সাধনা—

ঐবল্লভনাথ চট্টোপাধ্যায়

(ভারতবর্ষ—চৈত্র, ১৩৩২)

জাতিগঠনে বৈকল্য-বর্ষ

(প্রবর্তক—চৈত্র, ১৩৩২)

বর্তমান জগৎ —

রাজসেন ও ভারতবর্ষ—ঐরুক্মিণী রায়

(প্রবাসী—চৈত্র, ১৩৩২)

তরুণ জাপান—ঐপাণ্ডুরোপাশা যুগোপাধ্যায়

(ভারতবর্ষ—চৈত্র, ১৩৩২)

এটোনিয়া—ঐলক্ষীধর সিং

(বিচিত্রা—চৈত্র, ১৩৩২)

অর্থনীতি —

ব্যক্তিগত কয়েকটি মূলতত্ত্ব—

ঐব্রজেনচন্দ্র সেন

(প্রবাসী—চৈত্র, ১৩৩২)

Economic Aspects of Gold Exodus
—U. N. Ghosal
(Modern Review—April, 1933)
Gold or Sterling—
Sir John Wardlaw Milne
(Nineteenth Century and After
—March, 1933)

কৃষি—

জমণ—

পারক-ভ্রমণ—ঈরবীজনাথ চট্টোপাধ্যায়
(প্রবাসী—চৈত্র, ১৩৩২)
মহাপ্রস্থানের পথে—ঈপ্রবোধকুমার সাক্সাল
(ভারতবর্ষ—চৈত্র, ১৩৩২)
পারক-ভ্রমণ—ঈরবীজনাথ চট্টোপাধ্যায়
(বিচিত্রা—চৈত্র, ১৩৩২)
Impressions of Peru—Rosita Forbes
(Nineteenth Century and After
—March, 1933)

সাহিত্য—

উৎকলের প্রাচীন সাহিত্য-সম্পদ—
ঈশ্বরগুপ্তমোহন সেন
(ভারতবর্ষ—চৈত্র, ১৩৩২)
মূল্যমানের বাঙালা চর্কা—
মহম্মদ মন্সুরউদ্দীন
(মাসিক মোহাম্মদী—চৈত্র, ১৩৩২)
বাঙালা সাহিত্য ও মূল্যমান সমাজের কঠি-
বিপর্যয়—মোহাম্মদ আবুলকাদের কাকি
(মাসিক মোহাম্মদী—চৈত্র, ১৩৩২)
সাহিত্যে অসীলতা—ঈলতাল্লাবের হাল
(বঙ্গী—চৈত্র, ১৩৩২)
গোত্রবিষয় বা বীনচেতন ও বোধপ্রভাব—
ঈদেমতকুমার চক্রবর্তী
(পঞ্চপুষ্প—চৈত্র, ১৩৩২)
বৃত্তন ধরনের পয়র—ঈরমেশ বসু
(পঞ্চপুষ্প—চৈত্র, ১৩৩২)

মহামোদ-কৃত বুদ্ধচরিতের বঙ্গানুবাদ—
ঈশ্বরনাথচরণ বিজ্ঞানপুণ্ড
(পঞ্চপুষ্প—চৈত্র, ১৩৩২)

ব্যারাম—

মুহুৎক-কোশল—ঈবীরেন্দ্রনাথ বসু
(ভারতবর্ষ—চৈত্র, ১৩৩২)

দর্শন—

লজিক ও সত্ত্বাহুসকান—ঈরবীজনাথ চট্টোপাধ্যায়
(বিচিত্রা—চৈত্র, ১৩৩২)
ঈওবার্গ ভারতীয় চিন্তার প্রভাব—
হামী মগদীষবানল
(বিচিত্রা—চৈত্র, ১৩৩২)

সমাজতত্ত্ব—

বিবাহ-অবস্থান—ঈবীরেন্দ্রনাথ মজুমদার
(বিচিত্রা—চৈত্র, ১৩৩২)
মন্দির প্রবেশ সমস্যা 'সনাতন সিন্ধু' পত্রিকার
আলোচনা—ঈজিজীবী ভাষ্যভূষণ
(প্রবর্তক—চৈত্র, ১৩৩২)
The Woman's Movement in India
—Raj Kumari Amrit Kaur Sahiba
(Modern Review—April, 1933)

বিজ্ঞান—

কৃষি ও শিল্পে বিজ্ঞানের স্থান—এ. নাসীর
(মাসিক মোহাম্মদী—চৈত্র, ১৩৩২)

জীবনচরিত—

Radhanath Sikdar—Jogesh C. Bagal
(Modern Review—April, 1933)
Karl Marx Fifty Years After—
John Hallett
(Fortnightly Review—
March, 1933)

রঙ্গালয়—

বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গালয়—
ঈরেন্দ্রনাথ বসুআপাধ্যায়
(বঙ্গী—চৈত্র, ১৩৩২)

ব্যবসা-বাণিজ্য—

The Trade Depression—Its Causes
and Remedies—J. C. Sinha
(Modern Review—April, 1933)

বেকারের ব্যবস্থা



১। আশান্ন সপকান্ন

হাজার ভাটিয়ার চাই! 'ভোট দাও'
বলতে পারলেই চাকরি-ভুরিভোগন তো
উপরি আছেই!



হঃ এবান্ন সক্ষমঃ!

বছরে এককমের পোটাকরেক "ইলেক্সসন" হ'লে বেকার-সমতা একদম খুঁচে যাবে



হিন্দু সভ্যতার পত্তন

শ্রীমদ্রাধিকার চন্দ্রোপাধ্যায়

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

আমাদের সভ্যতার অতি-প্রাচীনত্ব সন্দেহে আমার। সকলেই অতিমাত্রায় সচেতন। প্রাচীন ইতিহাস বিশেষ ভাবে চর্চা করেন নি কিন্তু সাধারণ শিক্ষা পেয়েছেন এমন হিন্দুসন্তান আর সকলেই এই কথাটাকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে যেনে নিতে অভ্যস্ত, যে পৃথিবীতে সভ্যতার প্রথম উদয় হয় আমাদের এই ভারতবর্ষে, আর এই প্রাচীনতম সভ্যতার পত্তন ঘটছিল আমাদের আর্ধ্য পূর্ব-পুরুষদেরই মধ্যে। অগ্রে সভ্যতার উদয় আর্ধ্যদেরই মনীষার দল; এর ক্ষুদ্র কৃত্রিম ভাস্কর্যই, আর ভাস্কর্য বংশধর বলে আমরাও এই কৃত্রিমের উত্তরাধিকারী। আমাদের হিন্দুজাতির অতি-প্রাচীনত্ব সন্দেহে একটা সংস্কার ছেলেবেলা থেকেই আমাদের মস্তিষ্ক ভিতরে গর্ভাবস্থায় গিয়ে পৌঁছায়। পুরাণ-কাহিনীতে সভ্যতা, মেতা, যাপন, কলি—এই চার যুগের কথা আমরা পড়ি, সে কত লক্ষ বছরের কথা! “লক্ষ”-টাকে না হয় একটু অতিরঞ্জন বলেই মানদণ্ড, কিন্তু অনেক গ্রাঙ্কার বছরের কথা, এটা তো বটে।

আমাদের মধ্যে ধারা আধুনিক শিক্ষা একটু-আধটু পেয়েছেন তাঁরা, ভারতবর্ষের বাইরের কোন এক দেশ থেকে বহু সহস্র বৎসর পূর্বে আর্ধ্যেরা যে এসে এসে হিন্দু সভ্যতার পত্তন করেন, এ কথাটা সাধারণতঃ এক দৃকম মনেই নিয়েছেন। ধারা প্রাচীন শিক্ষা পেয়েছেন, কেবল সংস্কৃতই পড়েছেন, তাঁরা এ কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার আবশ্যকতাই উপলব্ধি করেন না, বা স্বীকার করেন না,—ভাস্কর্য কালে ভারতবর্ষই আর্ধ্যজাতির আদি পিতৃহৃদয়, ভারতের বাইরের কোনও দেশ থেকে কোনও কালে আর্ধ্যেরা যে এসে থাকতে পারে, এ কথা মনে করাই ভাস্কর্য কালে একটা অসম্ভব কল্পনা। ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আর্ধ্যেরা

এসেছিল কিনা, একথা নিয়ে আলোচনা এখন ক’রবে না; তবে ভারতবর্ষের বাইরে থেকেই যে আর্ধ্যেরা এসেছিল, এই মতবাদই আমি গ্রহণ করি,—খালি এইটুকুই উপরিত ক্ষেত্রে বলে রাখছি। বাইরে থেকে আর্ধ্যদের ভারতে আসমন হয়,—এই মত বিপত উনিশের শতকের মাঝামাঝি থেকে ইউরোপে কতক-গুলি ভাষাতাত্ত্বিকের মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে, এবং পণ্ডিত মান্ন-ব্লন্স এই মতটা বিশেষ ভাবে তার প্রবন্ধাদিতে প্রচার করেন। তিনি ও তার মতন আরও কতকগুলি পণ্ডিত অগ্ৰমান ক’রেছিলেন যে মধ্য-এশিয়ায় এখন থেকে চার হাজার বৎসর পূর্বে আদি-আর্ধ্যজাতি বাস ক’রত, সেখানে প্রাকৃতিক বিপর্দায় বা অগ্নি কারণে আর্ধ্যদের বাস অসম্ভব হ’লে পড়ায়, তারা পশ্চিমে আর দক্ষিণে নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ভাস্কর্য কল দল ইউরোপে যায়, সেখানে রূপ, গ্রীস, ইটালী, ভারতমালী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে উপনিবিষ্ট হয়; এই সব দেশের সুাত, গ্রীক, ইটালীয়, টিউটন, কেল্ট জাতির সোকেরা এই প্রাচীন আর্ধ্যদেরই বংশধর। একদল মধ্য-এশিয়া থেকে দক্ষিণে আসে, তারা পারতমণ্ডলে উপনিবিষ্ট হয়; আবার পারত থেকেই তাদের একদল আসে ভারতবর্ষে, এরাই হ’চ্ছে বেদ-বচক ভারতীয় আর্ধ্য, এরাই ভারতীয় সভ্যতার মূল। বিজ্ঞান আর ইতিহাসের অস্ত্র অস্ত্র বিচার আর মতের সঙ্গে এই মতবাদটাও বখাফাল ভারতবর্ষে এসে পৌঁছল, আর ইংরেজী-শিক্ষা-প্রাপ্ত ভারতীয়গণ বিশেষ প্রতিবাদ না ক’রে এই মতটা গ্রহণ ক’রলে। ইউরোপে ইংরেজ আর অস্ত্র ইউরোপীয় জাতির দেখা-পড়া-জানা সোকেদের মধ্যে এই মতের প্রতিষ্ঠা সহজেই হ’য়েছিল। সংস্কৃত, প্রাচীন পারসীক, আত্মানী—এশিয়া-মণ্ডলের জিনিস হুদজ জাতির এই

তিনটা প্রাচীন ভাষা; আর ইউরোপের প্রায় তাৎ
 জাতির ভাষা—গ্রীক, লাতিন, প্রাচীন শুল্ল, আদ্যবানীষ,
 কেল্টীয়, ডিউটনীয়—এ সব ভাষা এক অধুনা-মূলক
 বা আদি আধাতাষা থেকে উৎপন্ন;—তুলনামূলক
 ভাষাতত্ত্ববিদ্য। এই তথ্যটা নিষ্কারণ করে দেয়, বিগত
 উনিশের শতকের প্রথমার্ধে। “আদি আধাতাষা” যদি
 মেনে নেওয়া গেল, তা হ’লে এই আদি আধাতাষা
 বংশে এমন এক “আদি আধাতাষা”কেও মানতে হয়,
 আর বংশে হয় যে প্রাচীনকালে কোথাও না কোথাও
 এই জাতি বাস করত। বার্ষা এখন বিভিন্ন আধাতাষা
 বলে, সেই আদি আধাতাষার বংশধরেরা আদ্যকাল
 পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে সভ্য জাতি বলে পরিগণিত;
 আর তিব্ব, পারস্যক, গ্রীক প্রভৃতি কতকগুলি প্রাচীন
 আধাতাষা জাতিও সভ্যতার খুব উন্নত ছিল। হুতরা:
 আদি আধাতাষার লোকেরাও যে হুতরা ছিল, একদম
 অসম্ভব ক’রতে আধুনিক আধাতাষার বা আধাতাষার
 আটকান না। এই “আধাতাষা” ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাই
 পড়ে তুলছেন। তারা দেখলেন, ইউরোপের আধুনিক
 আধাতাষা জাতির লোকেরা পৃথিবীর ছড়িয়ে পড়েছে
 —পোর্চুগীস, স্পেনীয়, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসী,
 জাভান প্রভৃতি জাতির লোকেরা আফ্রিকা, এশিয়া,
 আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, সর্বত্র ইউরোপের সভ্যতা নিয়ে
 দিচ্ছে; সংজ্ঞেই তারা ঐ সব দেশে নিজস্বের প্রতিভা
 ক’রে নিয়ে স্থানীয় “নেটিভ”-জাতিদের উপর আধিপত্য
 করছে, তাদের হুতরা ক’রে তুলছে (এটা অবশ্য
 ইউরোপীয় উদ্ভবের কথা), এবং নিজস্বের অধুনা
 হ’লে বা সরকার বোধ করলে তাদের সম্মুখে উচ্চের
 ক’রেছে আর করছে। History repeats itself—
 একই ইতিহাস বিভিন্নকালে পুনরাবৃত্ত হয়,—এই অর্থসত্য
 বচন কারো লেগে গেল; এখন আধাতাষীদের
 দ্বারা যা হ’চ্ছে, প্রাচীনকালে আধাতাষার পূর্বপুরুষদের
 হাতে তাই হ’য়েছিল, একদম অসম্ভব কথা হ’ল।
 আদ্যকালকার আধাতাষারই বহু হুতরা বৈষ্ণব হুতরা-
 জাতি প্রাচীন আধাতাষার পিতৃহৃদি থেকে ছড়িয়ে

পড়ে, নানা অসত্য বা অর্থসত্য জাতির বেশে দিয়ে
 অবলীলাক্রমে তাদের ভয় করে, সভ্যতার আলোক
 দিয়ে তাদের মাহুত করে তোলে,—আর প্রাকৃতিক
 আর মন্য কারণে গ্রীস, ইটালী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে
 এরা নব নব সভ্যতার সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষে এই
 বাণেশ্য বিশেষভাবে ঘটেছিল। এসেছে কতকটা অসত্য
 জল্পনা অনার্থ্য বাস করত; আর্যেরা এল, তারা এসে
 ছেলে ছেলে বেশী উন্নত জাতি, তারা যে অনাধাতাষার ভয়
 করে তাদের উপরে রাজ্য হ’য়ে বসে এ তো স্বতঃসিদ্ধ
 বাণেশ্য, একদমটা ভো হওয়াই উচিত; কতকগুলি
 অনার্থ্য আধাতাষার বশত স্বীকার করলে, তারা
 আধাতাষার দাস হ’ল, আধাতাষার সম্মুখে তাদের স্থান
 দেওয়া হ’ল, তাদের নাম দেওয়া হ’ল “দ্রাবিড়”। বাকী
 সব হয় আধাতাষার হাতে ম’ল, নব পাগড়ের ভঙ্গি
 পালিয়ে গেল—এদেরই বংশধর আদ্যকালকার কোল-
 তীল-নাওতাল-মুণ্ডা, কোড়াল-গুয়া-বালেশ, গারো-
 বোডো-কুকি-নাগ। ভারতবর্ষে বহু শত বৎসর পূর্বে
 যে-সব আধাতাষা এসেছিল, তারা ইউরোপীয় আধাতাষার
 পূর্বপুরুষদেরই জাতি; হুতরা: ভারতের উচ্চবর্ণের
 হিন্দু, তারা নিজস্বের বিস্তৃত আধাতাষার বংশ মনে একটু
 গর্ভ করে থাকে, তারা হ’ল ইংরেজ আর অন্য
 ইউরোপীয়দেরই অধাতাষা—যুর সম্পর্কের জাতি। কথাটা
 ভারতীয় উচ্চবর্ণের লোকের কাছে মন লাগল না;
 (আর এই উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই তো প্রথমটা ইংরেজী
 পড়তে আরম্ভ করেছিল)—তাহার জাতি ইংরেজ,
 তাদের সঙ্গে এক গোত্রীয়, একধা মনের নিরন্তর কোলে
 উচ্চবর্ণের হিন্দুর মনে একটু পুরুষের বিলিক এনে
 দিয়েছিল বলেই মনে হয়,—তবে এ মনোভাবটা বাইরে
 পল্ট করে স্বীকার করে জাতীয় আত্মসম্মানবোধে
 আঘাত দিতে কেউ রাজী ছিলেন না। ইংরেজও এই
 সম্পর্ক এক রকম মেনে নিয়েই, ভারতের ব্রাহ্মণ আর
 উচ্চবর্ণের হিন্দুকে (আর তাদের অধুনা স্বীকৃত
 হিন্দুকে) our Aryan brother, the mild Hindu
 বলে শিঠি চাপড়াত লাগল; ইংরেজের তুলন্যবোধমিশ্র

এই উদারতার আমাদের অনেক আঙ্গানে আটকানো হ'য়ে গেল।

নানা জাতির সাম্রিপ্রের কণে আমাদের হিন্দু জাতি; এই সাম্রিপ্র প্রাচীনকালে অতি সহজেই অহুসোম-প্রতিগোম বিবাহ দ্বারা ব'টেছিল। তারপরে, তুর্কী-বিজয়ের পর থেকেই জাতিভেদের কড়াকড়ি এসে গেল, পুরাপুরি নিশান আর হ'য়ে উঠল না। এর ফলে, বিভিন্ন সমাজের মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য-বোধ র'য়ে গেল, কোথাও বা আবার নোতুন ক'রে এই স্বাতন্ত্র্য-বোধ প'ড়ে উঠল; বিভিন্ন প্রেণীর মধ্যে একটা অবাধ অহুকম্পার অভাব নোতুন ক'রে ব'টিল—এই অবাধ অহুকম্পার অভাবটুকুই আধুনিক হিন্দু-সমাজের সব চেয়ে বড়ো অভাব। এই স্বাতন্ত্র্য বা পার্থক্য-বোধের ফলে, নিজেদের 'আর্য্য-সম্মান ব'লে দাবী করেন এমন উচ্চপ্রাণীর হিন্দুর মনে একটা আভিভাভ্য-বোধও স্রুত হয়; তাতে ইউরোপ থেকে আমদানী-করা অনার্য্য-মন্ত্রী আর্থে'র করুনা 'আরও মহাভা করে।

হিন্দু সভ্যতার পতনের ইতিহাসটা এইরূপে বেশ মনোমত ক'রে তৈরী হ'ল। কৃষ্ণকায় কুসমিত-বর্ণন অসত্য বর্ণের অনার্য্য জাতি যরণাভীত যুগ থেকে এসেছে বাস ক'রত; তাদের ধর্ম ছিল অতি নিম্ন স্তরের, বীভি-নীতি ছিল ক্রুর। পৌরবর্ষ হলভা আর্থে'রা এসে তাদের জয় ক'রলেন। আর্থে'দের হাতেই হিন্দু সভ্যতার পতন হ'ল; প্রথম যুগের আর্থে'দের দেবতাদের আরধনা নিয়ে বেদমহিভা, পরের যুগে রচিত ভাঁদেরই দেবতাদের কথা নিয়ে পুরাণ; আর্থে'দের রামধরণের ইতিকথা নিয়ে রামাষণ, মহাভারত, পুরাণ। অনার্য্যদের ধর্ম আর বীভি-নীতি একটা-আখটা গ্রাম্য অহুতান বা আধ্যানের মধ্যে হয়তো কোথাও একটু খানি ট'কে রইল, কিন্তু ঘোড়ের উপরে তার সমস্ত নিশানা আর্থে' সভ্যতার প্রাধনের যুগে ধুধে' ধুধে' গেল।

অনার্য্যদের সম্বন্ধে এখন 'ভারতবর্ষে—বিশেষতঃ আর্থে'-ভাবী উত্তর ভারতে যে একটা ছুপ্পাসার ভাব এসে

দিয়েছে, 'অনার্য্য' পদটাই তার জন্ম কতকটা দারী। 'অনার্য্য' পদ যদি খানি 'অন্-আর্থে' অর্থাৎ 'বা আর্থে' নয়, বা আর্থে'জাতি-সম্পৃক্ত নয়' এই অর্থেই প্রস্তুত হ'ত, তা হ'লে কথা ছিল না; কিন্তু 'অনার্য্য' অর্থে 'বৃণা, নীচ' এই অর্থ সংস্কৃত-যুগ থেকেই এসে দাড়ায়, পদটো জাতি-বাচক বা সভ্যতা-বাচক আর না থেকে, মানসিক ও নৈতিক অপর্য্য-বাচক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এখন প্রেমধর সব জাতিই আর্থে'দের দাবী উপবিত ক'রছেন—তারি বিধ-ওর গ্রাধণ, নয় কত্রিহ, নয় বৈভ্র, তারি অনার্য্য পূর নয়। এটা আর কিছুই নয়, 'আধুনিক জাতিভেদের বিক্রেত একটা প্রতিক্রিয়া মাত্র। সকলেই যিম হোন্, 'আর্থে' হোন্ অর্থাৎ noble হোন্, নিজেকে উচ্চ মনে ক'রে দখার উচ্চ হ'য়ে থা'কবার পক্তি ঘাত করুন—আর্থে'নার্য্য সকলেরই জন্ম আনি এ কামনা করি।

আর্থে'দের প্রেইতার বিপক্ষে প্রন্ন উত্থাপন করাই আরকাল heresy বা পাগভোচিত মনোভাবপ্রস্থত ব'লে অনেক পণ্য ক'রবেন। আর্থে'রা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যজাতি ছিলেন না—এ কথা বলা, বা এ কথার ইঙ্গিত করা যেন পিতৃপুত্রের নিম্না করার মতন অথবা বজাতিব্রাহ্মজ্ঞান মহাপাতক, এই প্রকরের একটা আবছা-আবছা ধারণা অনেক ভারতীয়ের মনের মধ্যে আছে। তবে হিন্দুর মনে সভ্যতাসঙ্কিৎসা সদা-আগ্রত। তিনটা মনোভাবকে আমি আমাদের হিন্দু সংস্কৃতির মূল মনোভাব ব'লে মনে করি—সমধর, সভ্যতাসঙ্কিৎসা, আর অহিংসা; সভ্যতাসঙ্কিৎসাই আমাদের জাতির অতীত ইতিহাসে বা কিছু আধ্যাতিক আর আধিমানসিক উৎকর্ষ এনে দিয়েছে, এখনও এই সভ্যতাসঙ্কিৎসা আমাদের একেবারে দার নি। স্তরতঃ এ সব কথা শিক্ষিত হিন্দুর কাছে ব'ললে, প্রথমটা প্রচলিত সংসারে একটা আঘাত লাগলেও, সাধারণ হিন্দু তিনিসটাকে জন্মের যুগে চায়—নোতুন আর সম্পূর্ণ অনপেক্ষিত নয় ব'লে শেষ পর্য্যন্ত যুগ ফিরিয়ে ব'লে থাকতে পারে' বা।

ভারতবর্ষে আমাদের একাদিপত্রের সপক্ষে প্রবল-
তম বুদ্ধি হ'চ্ছে আশাভাষা সংস্কৃতের স্থান,—সমগ্র হিন্দু
পাত্র এই আশা-ভাষা সংস্কৃত ভাষাতেই নিবদ্ধ হ'য়ে থাকে।
কপ-বাপারটী; আর তার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভারতে
আর্য্য-ভাষার প্রসার। সংস্কৃত পাত্রেব—বৈশেষের না
হোক, পুরাণের—মত মতসারে আবার আমাদের
ইতিহাসে অনানুষ্ঠানিক থেকে পারাবাহিক রূপে চ'লে
এসেছে—অন্ততঃ, অতি প্রাচীনকাল থেকে। এই
ভাষাপত্র ও সাহিত্যপত্র বুদ্ধি ভট্টী সবচেয়ে বেশ ক'রে
আমাদের “আব্য-বাদ”—গ্রন্থ ক'রে রেখেছে।

এর প্রতিপক্ষে কয়টা বুদ্ধি আছে, সে কয়টা এই —
দক্ষিণভাষা আর দক্ষিণ ভারতে হুসভা অনাথ্য ভাষার
অস্তিত্ব : সংস্কৃত-সমত উত্তর-ভারতের আর্য্য ভাষাগুলির
নথ্যে ওভ্যপ্রোত ভাবে বিদ্যমান অনাথ্য ভাষার প্রভাব ;
ঐতি-পূর্ণ চতুর্দশ শতকের পূর্বেকার হুগের আশাভাষী হিন্দু
সভ্যতার নিদর্শনের একান্ত অভাব ; ভারতের বাইরে
আর্য্যজাতির ইতিহাস ; হুগের ইতিহাসের সঙ্গে
ভারতের ইতিহাসের সংযোগ।

তামিল ভাষা তার বিরাট সাহিত্য নিয়ে দক্ষিণ
ভারতে বিদ্যমান,—এই ভাষা প্রাচীনতম বহু সভ্যতার
এক অনপন্ন নিদর্শন, যে সভ্যতা পুরাতন আর্য্যসভ্যতার
কাছে আশ্চর্যজনক সের নি। বৈদিক ভাষা ভারতের
আর্য্যজাতির প্রাচীনতম নিদর্শন—এই ভাষাতে প্রাচীন
আর্য্য-ভাষা অনেকটা বিদ্যমান ; কিন্তু এই বৈদিক
ভাষাতেও অনাথ্য ভাষার ছাপ কিছু পরিমাণে আছে ;
আর তা ছাড়া বহুই এদিকে আসি, ততই অনাথ্য ভাষার
প্রভাব আর্য্য ভাষার (অর্থাৎ অর্ধাচীন সংস্কৃত আর
প্রাকৃত) বাড়ছে দেখতে পাই; আর্য্য ভাষাকে যে
ক্রমে ক্রমে অনাথ্য ভাষার, কোল-প্রাচীরের দ্বীপে তেলে
নেওয়া হ'য়েছে, আর্য্য ভাষা ক্রমে যে অনাথ্যেরই খণ্ডে
ভা'ত বিচ্ছিন্ন,—তা বৃত্তে দেখা হয় না। এ ছাড়া,
বামায়েণ, মহাত্মারতের আর পুরাণের মধ্যে বড়ো বড়ো
ভাষা-বাহুড়ার নাম আমরা পাই, কিন্তু আমাদের
অস্বীকৃত বামায়েণ, মহাত্মারত আর পুরাণের হুগের অর্ধা

তিন চার হাজার বছর পূর্বেকার হিন্দু হুগের পুরাতন
খর-বাড়ী, হাডের কাম, শিলের নিদর্শন—এসব কিছুই
তো পাই না ; মাত্র হাজার দুই বছরের প্রাচীন এই
“ইতিহাস” আর পুরাণ গ্রন্থগুলিই আমাদের প্রাচীন হিন্দু
সভ্যতার ইতিহাসের একমাত্র অবলম্বন—এই সাহিত্যিক
অবলম্বন জির “শাখু'র প্রমাণ” কিছুই নেই। যোগ্য
হুগের আসেকার হিন্দুসভ্যতার নিদর্শন তা হ'লে কিছুই
কি নেই ? মিসর, বাবিলোন, আসিরিয়া, এশিয়া-মাইনর,
ক্রীত-বীপ—এসব জায়গার তো এখন থেকে ওগার হাজার
বছরেরও মিনিস পাওয়া গিয়েছে ; ভারতবর্ষে মোহেন-
জো-দড়ো আর হরপ্পার যে সব নগরের ক্ষয়সাধন
আর অস্ত্র মিনিস মিলেছে, সেগুলি অবশ্য ওগার হাজার
বছর পূর্বেকার, কিন্তু সেগুলি তো আর্য্য জাতির
লোকদের হাডের কাম নয়—অন্ততঃ ঐ বিবরণ নিয়ে
যাঁরা আলোচনা ক'রেছেন এমন পণ্ডিতেরা এই কথাই
ব'লছেন। এর উপর আছে ভারতের বাইরে আর্য্য
জাতির ইতিহাসের কথা। আর্য্যেরা তাদের আদি
বাস-ভূমি থেকে ইতিহাসের ক্ষেত্রে (অর্থাৎ অস্ত্র পাচ
জাতির সঙ্গে সংঘর্ষে বা মিলনে) কখন প্রথম দেখা দিলে,
তারও একটা মিনিস পাওয়া যা'চ্ছে,—সেটা এখন থেকে
মাত্র চার হাজার বছর পূর্বে ; তখন গ্রীস ও উত্তর-
পূর্ব এশিয়া-মাইনরে তাদের প্রথম দর্শন পাওয়া যায় ;
এর ঠের পরে তারা ভারতবর্ষে আসে—ভারতবর্ষ থেকে
যে তারা বাইরে গিয়েছিল, একদল মহম্মানের সপক্ষে
বড়ো একটা বুদ্ধি নেই। দেব কথা—ভারতবর্ষের
ইতিহাসকে অস্ত্র শেখের ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে
দেখলে চ'লবে না। প্রাচীনকালে পারস্ত-বাবিলোন-
এশিয়া-মাইনর অঞ্চলের সহিত ভারত বণিত ভাবে সংযুক্ত
ছিল, সে বোপহুগে আমাদের ভারতের প্রাচীন ইতিহাস-
নিদর্শনের একটা প্রধান অবলম্বন। সেটাকে বাদ দেওয়া
কিছুতেই হ'তে পারে না। গ্রীস প্রভৃতি অস্ত্রান্ত নানা
দেশে বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি আর বিভিন্ন জাতির লোকের
মিশ্রণ কি ভাবে নবীন এক একটা জাতি ও সংস্কৃতির
সৃষ্টি হ'য়েছিল,—আমাদের হিন্দুজাতি ও সংস্কৃতির সৃষ্টি

আলোচনা কালে সেদিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে।

কি ভাবে হিন্দু সভ্যতার পতন ঘটেছিল, আর পূর্ণরূপ-প্রাপ্ত হিন্দুসভ্যতার বয়সট বা কত, এ সম্বন্ধে যে মতবাদ আমার মনে চমক একটু একটু করে সাধারণ্যে গৃহীত হ'চ্ছে এবং হবে, উপস্থিত ক্ষেত্রে সেই মতবাদের কিছু দিগ্‌বর্ধন করবার চেষ্টা ক'রবো। বিষয়টা a posteriori হিসাবে অর্থাৎ জ্ঞাত তথ্যের আধারের উপর অস্থান ক'রতে না ব'লে, a priori অর্থাৎ ইতিহাসাত্মক ক'রে, পৌরাণিক অস্থানের পুনর্গঠিত রূপের বর্ণনা ক'রে ব'লে যাবো। পরে ভবিষ্যতে এক একটা বিষয় অবলম্বন ক'রে আলোচনা করা যেতে পারে।

এখন থেকে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে, খ্রীষ্ট-পূর্ব আনুমানিক ৩০০০-এর দিকে মধ্য- বা পূর্ব-ইউরোপের কোনও অংশে আদি আর্গান্ডিতির উৎপত্তি হয়। নিজেদের দেশে সভ্যতার এরা খুব উচ্চ স্তরে উঠতে পারে নি—বাস্তব সভ্যতার এরা অনেকটা পেছিয়েই ছিল। তবে এদের মধ্যে অনেক মানসিক আর নৈতিক ক্ষণের উদ্বহ হয়; এরা একাধারে কর্মী ও চিন্তাবীল, কল্পনাবীল ও দৃঢ়রত জাতি ছিল, নিজেদের মধ্যে একটা সংঘবদ্ধতার ভাবও ঘটেই ছিল; আর, অস্থান হয়, এদের মধ্যে ব্রীহাদ্ভিত্তি সত্ত্ব যে কতগুলি ধারণা ছিল, সেগুলির আধারের উপরই ব্রীহাদ্ভিত্তি সত্ত্ব আধুনিক সভ্য মান্যতাব প্রকীর্ণিত। আর্গান্ডিতির মধ্যে বহু সোয় ছিল, আর এই সব সোয়ের মধ্যে এদের মূল ভাষারও কিছু কিছু পার্শ্ববর্তী এসে যায়। এই আদি আর্গা জাতি কোনও কারণে তাদের পিতৃভূমি থেকে পূবে, দক্ষিণে আর পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। দেশে ঈতর হঠাৎ আভিষ্য এর একটা কারণ হ'তে পারে; আবার পূর্ব আর উত্তর থেকে অনাথা উরাল-মাল্গাই জাতীয় লোকদের আক্রমণও একটা কারণ হ'তে পারে।

আর্গোরা এখন ৩০০০ খ্রী-পূ-তে তাদের নিজেদের দেশে আধিম অবস্থার আছে,—কিছু চাষবাদ, কিছু

গোমেষ-চারণ এই তাদের প্রধান বৃত্তি—তখন কিছু অস্ত্রের অস্ত্র কতকগুলি বড় বড় সভ্যতা প'ড়ে উঠেছে; প্রথম—মিসরের সভ্যতা; খ্রী: পূ: ৪০০০ থেকে যার ক্ষেত্র টানতে চয়, আর যার মূল পতন আরও প্রাচীন; বাবিলোন আর আসিরিয়ায় সভ্যতা,—এরা মিসরের মতই প্রাচীন; আর এ ছাড়া এশিয়া-মাইনর আর গ্রীসের প্রাচীন সভ্যতা। নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান, বড় বড় ইমারত, সেবামন্দির, লুহবিগ্রহ, বিজ্ঞবাস্তা, ভাস্কর্য, বৃত্তিশিল্প, দিলালেশ, মৃৎশিল্পে প্রভৃতি অবলম্বন ক'রে এট সব সভ্যতা; আদি আর্গাদের এসব কিছুই ছিল না। আর্গোরা নিজেদের দেশে থাকতে থাকতে একটা বড় অগ্ন সংগ্রহ করে—জালা ধোড়াকে শেষ মানায়। ধোড়ার গিটে লগ্নার হ'লে বা ছই ধোড়ায় টানা চ'চাকার রপে চ'ড়ে তারা দূরশল অস্ত্রমানে অস্ত্রক্রম করার একটা উপায় আবিষ্কার ক'রলে। এই আবিষ্কারের ফলে এখন তারা ইতিহাসের রত্নমণ্ডে প্রথম এসে অবতীর্ণ হ'ল, তখন মূলসংঘ, মাংসবোধ্যন্ত, কর্ণশক্তি ও ভাবনাশক্তিসম্পন্ন এট আর্গাদের—এরা পার্শ্বি সভ্যতার অধ্ব-বর্ধক হ'লেও—এদের স্রোথ করা স্থলতা আসিরিয়া-বাবিল, এশিয়া-মাইনর আর গ্রীসের অধিবাসীদের পক্ষে কঠিন ব্যাপার হ'লে গাড়'ল।

খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০-এর দিকে এই আর্গান্ডিতি ইতিহাসের ক্ষেত্রে অর্থাৎ নিজেদের পিতৃভূমির বাইরে অস্ত্র ভাঙির দেশে প্রথম দেখা দিলে। এদের আগমনের সংবাদ আমরা প্রাচীন গ্রীসে, প্রাচীন এশিয়া-মাইনরে ও আসিরিয়া-বাবিলোনিয়ায় পাই। তখন ভারতবর্ষের অবস্থা কি ছিল জানি না; পূর্ব সম্ভব তখন দ্রাবিড় জাতীয় আর কোল বা অস্ট্রিক (Austrie) জাতীয় লোকেরা, উত্তর-ভারতে গঙ্গা আর সিন্ধু-অধ্বাসিত দেশে, আর দক্ষিণ-ভারতে, তাদের সূচ্যতা কার্যে ক'রে শাস্ত্রভাবে জীবন যাপন ক'রছে। আর্গোরা ইতিমধ্যেই কতকগুলি শাখার বিতরণ হ'লে প'ড়েছে, এদের ভাষার সামান্য সামান্য পার্শ্ববর্তী এসে

সিমেছে। গ্রীসে যে আর্গোরা বায়, আর গ্রীসের আর্গো-পূর্ণ হুগের জলজা জাতির সঙ্গে সংঘর্ষে দ্বারা আসে, সেই পশ্চিম। আর্গোসের ভাষা,—আর যে আর্গোরা ইট-পূর্ণ ২০০০-এর দিকে উত্তর-পূর্ণ এশিয়া-মাইনরে আর মেসোপোটামিয়ার আসে, সেই পূর্ব আর্গোসের ভাষার কতকগুলি লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা যায়।

নানা কারণে আর্গোসের প্রাচীন কথার ইতিহাস-সম্পর্কে মধ্য-এশিয়ায় আমাদের ছেড়ে দিতে চাই। ভারতবর্ষে আসবার পথে আর্গোরা উত্তর-মেসোপোটামিয়া হ'য়ে আসে, এই ব্রহ্ম আভাস আমরা পাই; মধ্য-এশিয়ার কথা একটা নিছক কল্পনা মাত্র। সুতরাং মেসোপোটামিয়া-সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়ার, এই কল্পনা একেবারে বর্জনীয়। উত্তর-মেসোপোটামিয়ার আর্গোরা প্রথম দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ঐ স্থানের অধিবাসীরা তাদের সম্বন্ধে লিখে বিবরণে। এই সব লেখা পাওয়া গিয়েছে, যাচ্ছে। আর্গোসের সম্বন্ধে বাবিলোনিয় আর এশিয়া-মাইনরের প্রাচীন ভাষায় লেখা এই সব কথা হ'চ্ছে আর্গোসের বিষয়ে সব চাইতে প্রাচীন সাময়িক উল্লেখ। এই সব লেখা দেখে এই অসুখান হয় যে, হুগের আদিবাসী, বাবিলোনিয় আর এশিয়া-মাইনরের জাতিগুলির মধ্যে, হয় উত্তর থেকে ককেশাস-পর্বত পেরিয়ে, নয় উত্তর-গ্রীসে মাদিভন ও বেলু এসে হ'য়ে, ককেশাসের দক্ষিণে উত্তর এশিয়া-মাইনরের পথ ধরে এশিয়া-মাইনর আর মেসোপোটামিয়া অঞ্চলে এসে আসন। এই নবাস্ত আর্গোরা দলে দলে আসে; এসে কতকগুলি দোহ ঐ সব অঞ্চলে বসবাস করত থাকে, স্থানীয় জাতিগুলির মাঝে নিজেদের একটা পৌরবসন স্থান করে নিতে সমর্থ হয়, কোথাও কোথাও বা স্থানীয় লোকদের জয় করে তাদের ভাষা হ'য়ে কলে—এমন কি এদের একমুখ বাবিলোন বলা করে সেখানে কয়েক শতাব্দী ধরে রাজ্য বা প্রভু করে। তারা জয়শে হ'য়ে সেল, তারা ক্রমে ঐ দেশের লোকদের সঙ্গে মিশে নিয়ে তাদের ভাষা নিয়ে নিজেদের স্বভাব অভিন্ন হারিয়ে

ফেল। কিন্তু তাদের ভাষাদের বা প্রধানদের নাম, তাদের দেবতাদের নাম, তাদের ভাষার ছোট চারটে শব্দ রক্ষিত হ'য়ে আছে; তা থেকে ইট-পূর্ণ ১৮০০ থেকে ১২০০ পর্যন্ত মেসোপোটামিয়া-অঞ্চলে উপনিবিষ্ট এই সকল আর্গোসের কথা কিছু কিছু জানতে পারা যায়। এই আর্গোরা এই অঞ্চলে প্রথম যোড়া আসে। এরা যে ভাষা বলত, সে ভাষা হ'চ্ছে বৈদিক সংস্কৃত আর প্রাচীন ইরাণীয়, এই দু'য়ের মিশ্রণ; আর এদের যে ধর্ম ছিল আর যে সব দেবতা এরা পূজা করত, তা থেকে বুঝতে পারা যায় যে এদের ধর্ম আর দেবতাসকলই ভারতে মিশে বৈদিক ধর্ম আর বৈদিক দেবতাসকল পরিণত হয়। এরা বেদ-পূর্ণ আর্গো; ভারতীয় বৈদিক ধর্মের পত্তন এদের মধ্যে, আর এদের অস্ত্র অস্ত্র যে সব দোহ পূর্ণ পাত্রের দিকে এল তাদের মধ্যে ব'সে থাকে। আর এটাও খুব সম্ভব যে মেসোপোটামিয়ার আর পারস্ত দেশে এই আর্গোসের মধ্যে, নিজেদের দেবতাদের সম্বন্ধে যে সব তত্ত্ব এরা রচনা করত থাকে সেই সব তত্ত্বের কিছু কিছু ভারতবর্ষ পর্যন্ত পৌছে—ইট-পূর্ণ ১৮০০ কি ১৫০০-তে রচিত এই সব তত্ত্ব ভারতবর্ষে ইট-পূর্ণ ১০০০ কি ১০০০-এর দিকে প্রথম লিখিত হ'য়ে, "স্যাস" নামক ঋষি দ্বারা বেদ-সংহিতার গৃহীত হয়। বেদ-পূর্ণ হুগের এই সমস্ত আর্গোসের কতকগুলি নাম আর শব্দের নিবর্ণন নীচে দেওয়া যাচ্ছে। নামগুলি বাবিলোনিয় ও এশিয়া-মাইনরের ভাষায় গৃহীত, এগুলির উচ্চারণ মধ্যযুগ বিদেশীয় বাবিল ও কানীসী ভাষায় ঠিকমত রক্ষিত হ'তে পারে নি—এগুলির কিছু ইরাণীয় হুগের আর্গো-ভাষার তথা বৈদিক ভাষার অসুযোগিত রূপ বা পাঠ অনেকটা বিচার আর অসুখান করে ঠিক করত হ'য়েছে। দেবতাদের নাম, মধ্য—

[১] Shurishash = বেদ-পূর্ণীয় আর্গো ভাষায় Surias, বৈদিক "সূর্য্য"; [২] Marutashash = বেদ-পূর্ণীয় Marutas, বৈদিক "মরুত"; [৩] Shimalia, "উচ্চল" অর্থাৎ

হুনার-ধন) পর্যাখিয়ারী নেবী = বেন-পূরী
 *Z'himala = বৈদিক "হিম + আল"; (৪) Shugamuna
 "মহামতির সেবতা, ছোড়ির সেবতা" = বেন-পূরী
 *S'auka-manas = বৈদিক "শোক + মন" (৩) ও (৪)
 সংখ্যক সেবতায় তারতম্য বৈদিক জগতে আর
 প্রতিষ্ঠিত রইলেন না; (৫) Dakash "নক্ষত্রের পিতা"
 = ভারতীয় Daksha "দক্ষ", ২৭ নক্ষত্রের পিতা;
 (৬) Indara = বৈদিক "ইন্দ্র" ("ইন্দ্র" = স্বরত্ন-মূল
 রূপ); (৭) Mitra = বৈদিক "মিত্র"; (৮) Nashattiya
 = বৈদিক "নাসতা"; (৯) Uruwna বা Aruna =
 বৈদিক "বরুণ"; রাধা বা প্রধানদের নাম, যথা—(১)
 Abirattash = বৈদিক রূপ "অভিরথ"; (২) Shuzigash
 = বৈদিক রূপ "জুজিগ"; (৩) Artamanya =
 বেন-পূর্ণ *Rta-manyas, বৈদিক "ঋতমজ";
 (৪) Arzawiya = বৈদিক "আর্জাবা"; (৫) Biria
 maza = বৈদিক "বীর্ণাবা"; (৬) Biridaswa = বৈদিক
 "বৃদ্ধা"; (৭) Dashru = সম্ভাব্য বৈদিক "দক্ষ" অথবা
 "দ্বজ"; (৮) Aitagama = বেন-পূর্ণ *Aitagama,
 বৈদিক "এতগাম" (৯) Indaruta = বেন-পূর্ণ
 *Indaruta, Indrta, বৈদিক "ইন্দ্রোত";
 (১০) Namyawaza = সম্ভাব্য বৈদিক "নামাবা";
 (১১) Rushmánya = সম্ভাব্য বৈদিক "রুজিমনা";
 (১২) Shatiya = বৈদিক "শতা"; (১৩) Shubandu =
 বৈদিক "শুবধ"; (১৪) Shumitta, Shumittarash =
 বৈদিক "শুমিত্র"; (১৫) Shutarna = সম্ভাব্য
 বৈদিক "শুতর্না" বা "শুতর্নি"; (১৬) Shutatna =
 বৈদিক "শুত (বা শুত) তন"; (১৭) Shuwardata =
 বৈদিক (সম্ভাব্য) "শুব্বদাত, স্বর্ষত"; (১৮)
 Teuwatti = সম্ভাব্য বৈদিক "তুবাত" (১৯)
 Turbazu = সম্ভাব্য "তুর্ভজ", বৈদিক "তুর্ভজ"; (২০)
 Tushiratta = বেন-পূর্ণ *Duzhratha, বৈদিক "তুর্ভজ";
 (২১) Artashumara = বৈদিক "ঋতমর"; (২২)
 Artatama = বৈদিক "ঋতাম"; (২৩) Dasharti =
 সম্ভাব্য বৈদিক "দাশার্টি"; (২৪) Mattiawaza = সম্ভাব্য

বৈদিক "মণিবাজ"; (২৫) Saushshatar = "সৌশ্ঠার";
 ইত্যাদি। আর্য শব্দ যথা—(১) Maria = বৈদিক
 "মণি" = যোদ্ধা; (২) Aika = প্রাগ-বৈদিক *Aika,
 বৈদিক "এক"; (৩) Tera = "ত্রি, ত্রয়"; Panza
 = "পক"; (৪) Satta = "সত্তা"; (৫) Nava = "নব";
 Tapashshash = "তপশ"; (৬) Wartanna =
 "বর্ষন" (৭) Vasanna = "বসন" (যবহান-অর্থে);
 ইত্যাদি। (এই নাম ও শব্দগুলি Acta Orientalia
 XI, i, ii, iii খণ্ডে প্রকাশিত N.D. Mironov কর্তৃক
 লিখিত Aryan Vestiges in the Near East of the
 2nd Millenary B. C. নামক হুলাবান্ প্রবন্ধ থেকে
 নেওয়া; Mironov-সংগৃহীত যে সকল নাম বা শব্দের
 ব্যুৎপত্তি নিয়ে সন্দেহ আছে, সেগুলি এখানে দেওয়া
 হ'ল না।) এই রূপ বৈদিক ভাষার লক্ষ্যে জননী-
 হানীর ভাষা ব্যবহার কর্তৃক এমন আধারের আমরা
 আনুমানিক ২০০০ থেকে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব বৎসরে ও
 তার পরেও মেসোপোটামিয়া ও এশিয়া-মাইনরে
 দেখতে পাই।

আরোহা এই দেশে অবস্থান কালে হুলাবান্ Ashur
 যত্তর বা অশুর অর্থাৎ আসিরীয় এবং বাবিলোনীয়
 জাতির প্রভাবে পড়ে। আসিরীয়-বাবিলোনীয় জাতির
 বিরাট বিরাট ইমারত, এসের (বিশেষত: আসিরীয়-গণের)
 পৌর্য ও নিষ্ঠুরতা আর্যাদের অতিক্রম করে।
 আর্যাদের মধ্যে আসিরীয় রীতি-নীতিও বিশেষ
 প্রভাবে বিস্তার করে। বহু ও গৃহ-নির্মাণে দক্ষ,
 সেবতা-কিরোবী অশ্ব বা গানবের কখনো, ভারতে
 আ'স্বার পরে আর্যা জাতির মনের মধ্যে নিহিত অশ্ব-
 জাতির ক্ষতির পরিণতি ঘটে।

যে সকল আর্যা সোত্র মেসোপোটামিয়ার বাল
 কর্ণে না, পূর্বের দিকে এল, তাবাই হ'ল পারসীক
 ও ভারতীয় আর্যা-গণের পূর্বকণ্ঠ। প'র্ষ বা পার্শ্ব বা
 পার্স, মর, পক, পার্শ্ব প্রভৃতি আর্যা সোত্রগণ
 পারস্ত দেশেই র'য়ে গেল; ভারত, হুজ, মজ, শিবি,
 ফ্রা, শিহ্ন, পু, তও প্রভৃতি নানা সোত্র ভারতে

প্রবেশ করিলে। মনে হয়, ভারত আর পারস্যে তখন একই অনাথা জাতির লোকেরা বাস করিত; আর্যেরা এসে "দাস" বা "দহা" ব'লে উল্লেখ করে গিরেছে।

"দাস" বা "দহা"দের সঙ্গে ভারতের বাইরেই আর্ঘ্যদের সংঘর্ষ ঘটে। এই সংঘর্ষের কথা কিছুকিছু বৈদিক সাহিত্যে—যজুর্বেদ—পাওয়া যায়। তার পরে ক্রমে এই অনাথাদের সঙ্গে বহুব্রহ্মণ মিলনও ঘটে থাকে। অহুমান হয়, ভারতবর্ষে আর্ঘ্যদের আসবার সময়ে তিনটা জাতির অনাথা বাস করিত। [১] Nektario নেস্ট্রিও বা নিস্ট্রোবট্ট শ্রেণীর অনাথা—খাটো চেতারা, ৪৬ খোর কালো, কাকুরির মত নাক আর ঠোঁট, চুল কৌকড়া—এরা বেষ্টের তাগ সামুদ্রিক উপকূল অঞ্চলে বাস করিত, সভ্যতা ব'লিত এসে বিনে কিছুই ছিল না, নাহি ধরে বা শিকার করে খেত—এই জাতি এখন প্রায় সব ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'য়ে গিরেছে, দক্ষিণ-বেঙ্গলিয়ানে, দক্ষিণ-ভারতে, আতাম-অকলে কোথাও কোথাও এসে একটু আধটু অবশেষ বা চিহ্ন বিদ্যমান; পূর্ব সত্তর এরাই ছিল ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী। [২] Austrie অস্ট্রিক জাতি—এরা উত্তর-পূর্ব পল দিয়ে—মাসাম-অকল দিয়ে—বর্ষ। আর ইম্বোচীনে থেকে ভারতে প্রবেশ করে; এসে চোরা কচকম ছিল তা ঠিক জানা যায় না—মনে হয়, আকারে এরা খাটো ছিল, নাক এসে চোঁটা হ'ত—আর এরা যে তাবা ব'লিত, সেই তাবা থেকে এখনকার কোল চামা আর খালিয়া তাবা হ'য়েছে, আর এসে অস্ত্র পাণা ইম্বোচীনে, মালয় দেশে, বীপময় ভারতের বীপপুঞ্জে আর প্রশান্ত মহাসাগরের নানা বীপে ছড়িয়ে পড়ে। পহার উপত্যকার, মধ্য-আর দক্ষিণ-ভারতে এরা বেশী করে ছড়িয়ে পড়েছিল, হিমালয়-অকলেও যে এরা ছিল তার প্রমাণ আছে। ধানের চাষ, কচকগুলি কলের চাষ, পান-স্থপারীর ব্যবহার,—ভারতীয় সভ্যতার এগুলি অস্ট্রিক জাতির দান বলে মনে হয়; আর তা ছাড়া, এসে

মধ্যে প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান, আমাদের হিন্দু পূজাপদ্ধতিতেও বিবাদের আর প্রাচুর্য মান। অহুমান, আর হিন্দুর পুনর্জন্ম-বাদের অন্তরালে অবস্থান করছে বলে অহুমান হয়। অস্ট্রিক-জাতির অনগণ উত্তর-ভারতের সমস্ত অংশে এখন হিন্দু জনসাধারণে কণাশ্রিত হ'য়ে গিরে, তাদের পূণক অস্ট্রিক অস্ত্র বর্জন করেছে। [৩] ট্রাবিড জাতি: এই ট্রাবিড জাতি দীর্ঘকায়, সরল-দাসিক ও দীর্ঘ-করোট ছিল বলে অহুমান হয়। ভারতের পশ্চিমের দেশের লোকের সঙ্গে এদের সর্বোস বা লব্ধ ছিল। আর্যেরা ভারতে আসবার কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে, পশ্চিম থেকে এসে ভারতে প্রবেশ হ'য়েছিল, বলে অহুমান হয়। পশ্চিম ভারতে আর দাক্ষিণাত্যে এসে প্রচুর বাস ছিল; তবে অহুমান হয়, এরা উত্তর-ভারতে আর পূর্ব-ভারতেও প্রচার লাভ করেছিল, অস্ট্রিক জাতির সঙ্গে মিলে একত্র বাস করিত। অস্ট্রিক (কোল) আর ট্রাবিড, এই দুই জাতির পূর্ব মিলন আর মিশ্রণও হ'য়েছিল বলে বোধ হয়। ট্রাবিডের অস্ট্রিকদের চেয়ে বেশী সভ্য ছিল; বড়ো বড়ো বাড়ী ঘর নগর প্রতিষ্ঠা বানাত,—হিন্দু সভ্যতার বাহু অনেক উপকরণ এই ট্রাবিডদেরই কাছ থেকে আনত; শিব, উমা ও বিষ্ণুর কল্পনা ভারতে ট্রাবিড জাতির মধ্যে প্রথমটা প্রচলিত ছিল, যোগ-সাধনার কল-তত্ত্বও ট্রাবিডদের মধ্যেই উদ্ভূত হয় বলে মনে হয়। মোহেন-জো-দাড়ো আর হরপ্পার বিরাট সভ্যতা ট্রাবিড জাতিরই কৃতিত্বের পরিচায়ক বলে বোধ হয়। ট্রাবিডেরা আর্ঘ্যদের মত সে-পালন করিত—কোল (অস্ট্রিক) জাতি তা করিত না; আর ট্রাবিডেরাই হাতীকে প্রথম পোষ মানিয়েছিল বলে মনে হয়।

আর্যেরা ভারতে যখন প্রথম এল, দেশে হুদভা (বা মোটামুটি সভ্যতা-প্রাপ্ত) এই দুইটা বড় অনাথা জাতি বাস করিত। সামুদ্রিক সভ্যতার উদ্বেগ ট্রাবিডদের মধ্যেই হয়; অস্ট্রিক জাতির সভ্যতা ছিল দুখাত: প্রাচীন সভ্যতা; আর নবায়ত আর্ঘ্যদের সভ্যতা

ছিল বাণাবর ও গ্রামীণ সভ্যতা। অর্থাৎ আগমনে দেশের আদিম অনাথা অধিবাসীদের একবারে সুলে উচ্ছেদ হ'ল না। নবগত অর্থাৎ আর পুরাতন অনাথা পাশাপাশি বাস করিতে লাগল। অর্থাৎ প্রবিড় কোল (অস্ট্রিক)—এই তিন জাতির মধ্যে তাদের আদান-প্রদান আর রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিতে লাগল। অর্থাৎ ছিল বিচ্ছেদ—অস্বস্ত: পাঞ্জাব-অঞ্চলে বিচ্ছেদরূপেই তার প্রবেশ হ'য়েছিল: তার ভাষা ছিল পুরাতনের ভাষা, আর তার সংস্কৃতিও ছিল অসাধারণ। অর্থাৎ তার ভাষা তাই সচক্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে; হয়তো তখনকার দিনের প্রবিড় আর কোল পোড়ীর পরস্পর-বিরোধী অনাথা ভাষা আর উপভাষার পোলমাণের মধ্যে, অর্থাৎ ভাষা একটা সর্বজনগ্রাহ্য ভাষা হিসাবে উত্তর ভারতে প্রসার লাভ করে। অর্থাৎ ধর্মের কতকগুলি অঙ্গান, আর অর্থাৎ কতকগুলি সেবতা অনাথ্যেরা মেনে নেয়। আবার ধীরে ধীরে অনাথ্যের সেবতা, অনাথ্যের বধ্যভূতান, অনাথ্যের দর্শন ও তত্ত্বজ্ঞান, অনাথ্যের তত্ত্ববাদের অর্থাৎ মনে ছাপ দিতে থাকে। অনাথা রাজা বা পুরোহিতেরা অর্থাৎ ভাষা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ-সমাজে গৃহীত হ'তে থাকে; একটা ক্রমবর্ধমানইল অর্থাৎ-ভাষা গোষ্ঠী বা সমাজ গড়ে উঠতে থাকে। এইরূপে, সংস্কৃত-ভাষা আর বাহন এমন মিশ্র অর্থাৎ-সভ্যতা, বা হিন্দু সভ্যতা, অর্থাৎ তারতে আগমনের পর থেকে ধীরে ধীরে তৈরী হ'তে থাকে।

এই ভাবে হিন্দু বা প্রাচীন ভারতীয় ভাষার সভ্যতার বিশিষ্ট রূপ ফুটে উঠতে প্রায় হাজার বছর লাগে। অর্থাৎ তারতে আগমন তাদের মেসোপোটামিয়ার একট হওয়ার কিছু পরে ঘটে, এটা অস্বাভাবিক নয়। অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০-র পরে, কি খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০-র দিকে এই ঘটনা হ'য়েছিল। বুদ্ধদেবের কালে—খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০-র দিকে, হিন্দু সভ্যতার কাঠামো তৈরী হ'য়ে গড়া'ল। অনাথ্যের অস্ট্রিক আর প্রবিড় সেবতাদের লীলা-কথা, তাদের

রাজা-রাজত্বের প্রাচীন কাহিনী, এসব ক্রমে সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ হ'য়ে, অর্থাৎ সেব-কাহিনী আর রাজ-কাহিনীর সঙ্গে অচ্ছেদ্য গড়ে সংযুক্ত হ'য়ে, রামায়ণ-মহাভারত আর পুরাণের মধ্যে স্থান পেলে। এইরূপে বাণাবর গ্রীসেও ঘটেছিল। সম্মতি এই ধরনের একটা মতবাদ প্রকাশিত হ'য়েছে যে, কতিবেরা যুগান্ত: অনাথা রাজত্ব-সম্প্রদায়ের লোক; দেশে অবতমান কাল থেকে যে অনাথা রাজারা রাজত্ব করতেন, নব-গঠিত মিশ্র হিন্দু-সমাজে তারাই তাদের পূর্ব পৌরব অঙ্গুর রেখে কতিব-রূপে গৃহীত হ'লেন। আবার এমতও প্রকাশিত হ'য়েছে যে ভারতবর্ষে ধলে ধলে অর্থাৎ প্রবেশই ঘটে নি—কেবলমাত্র অর্থাৎ ভাষা আর অর্থাৎ কতকগুলি ধর্ম আর অঙ্গান পারত থেকে ভারতবর্ষে প্রসৃত হয়।

অর্থাৎ বিশেষ উপাসনা-রীতি হ'চ্ছে “তোম”। সেবতারা আকাশে থাকেন, অর্থাৎ তাদের হুত বা যুগপাত, বেদি তৈরী করে তাতে কতের আগুন মেলে সেই আগুনে ইষ্ট, বরুণ, যম, পুণ্ড্র, অর্থাৎ, অশ্বিন, উষা, মরুৎ প্রভৃতি সেবতাদের উদ্দেশ্যে হুত, বা, মাংস, হবের পুরোডাস তৈরী, সোমরস এই সব খাটবস্ত্র আর্জিত দেওয়া হ'ত, সেবতারা আগুনের মারফৎ সেই সব জিনিস পেতে যুক্ত হ'য়ে তোমকারীকে যম, অশ্ব, পুত্র-সন্তান, প্রভৃতি পণ্ড্র প্রভৃতি দান করতেন। “পুণ্ড্র” রীতি অর্থাৎ মধ্য প্রাচ্যের মধ্যে প্রচলিত ছিল না—প্রতিমা বা অঙ্কুর সেব-প্রতীকের মাংস ফুল, পাতা, চকন, পিঁড় প্রভৃতি দেওয়া, চাল-ফল-মূলের নৈবেদ্য অথবা বলিদানের পণ্ড্র যুগ বা পাত্রে করে রক্ত নিবেদন করা, এসমস্ত বৈদিক অর্থাৎ অর্থাৎ রীতি নয়। “পুণ্ড্র”-সম্প্রদায় মূল প্রবিড় ভাষার পণ্ড্র ব'লে অস্বাভাবিক নয়। এই অনাথা অঙ্গান অনাথা সেবতাদের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত হ'য়ে হিন্দু অঙ্গানে পরিণত হ'ল।

অর্থাৎ প্রথম আগমনের সময়ে দেশের প্রাচীন অধিবাসীরা যে প্রবিড়, কোল প্রভৃতি অনাথা ভাষা

ব'লুত তাকে কোনও সন্দেহ নেই। আর্গোদের আদ্যবাস বচনত বৎসর পর পর্যায়গু এই সব অনার্য্য ভাষা ধীরে ধীরে ছিল,—বুদ্ধদেবের সময়ে, এমন কি তার ৫০০-১০০ বৎসর পরেও উত্তর-ভারতবর্ষেরও অনেকখানি ভূভাগে জনসাধারণ অনার্য্য ভাষা ব'লুত, একশ অশ্বমানেব বর্ষেই কারণ আছে। এইসব অনার্য্যভাষীদের ভাষা আর্গ্যভাষা গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গে এদের ধর্ম, দেবতা, আচার-অনুষ্ঠানও আর্গ্যায়িত হ'য়ে পেল, সেগুলি সর্বজনগৃহীত হ'য়ে প'ড়ল—পৌরাণিক দেবতাবাস, ভক্তিবাদ ইত্যাদি এল—বৈদিক ধর্মের চেয়ে গভীরতর উন্নততর ধর্মজীবন ভারতীয় সমাজে এল। অনার্য্যদের বড়ো বড়ো দেবতা—শিব, উমা, বিষ্ণু—অনুরূপ আর্গ্যদের দেবতাদের সঙ্গে মিশে এক হ'য়ে গেলেন, তাঁদের আরও মনোহর ক'রে তুললেন; অনার্য্যদের বৃক্ষ-দেবতা, ঘন, রক্ষা, নার, সৈবী শক্তির বিকাশরূপে দেবতারূপে করিত নানা পতনকারী পূজা—এসবও এসে গেল।

ঐতি-পূর্ষ প্রথম সহস্রকের প্রথমার্ধে আর্গ্যদের বৈদিক সাহিত্য, মিশ্র আর্গ্যানাথা বা হিন্দুজাতির প্রাচীন সাহিত্য ও ধর্মশাসন ব'লে প্রচার সহিত গৃহীত হয়। আর্গ্যদের পুরোহিত-শ্রেণী ব্রাহ্মণ জাতিরও প্রজ্ঞা। এই সময়েই ঘটে। প্রথম যুগের নিষেধা আর্গ্যদের প্রভাব এতদূরী হওয়ার একটি কারণ। বেশ গৃহীত হ'য়ে নাওয়ার ও সমাজে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকৃত হওয়ার, অনার্য্য ভাষার আর প্রজ্ঞা হওয়া সম্ভব হ'ল না। কিছু অনার্য্য ভাষা সঙ্গল ম'ললও না। অনার্য্য শব্দ কিছু কিছু প্রাকৃতের আর সঙ্কটে ঢুকল, অনার্য্য চিন্তা-পদ্ধতিও সঙ্কটে এসে পেল। ঐতি-যুগের ১৫০ বৎসর পূর্বে কলিদের জৈন ধর্মাবলম্বী রাজা ধারবেল মত এক অশ্বশাসন প্রাকৃত ভাষার দ্বারা অক্ষরে উৎকর্ষ ক'রে নান—ভাষার এই অশ্বশাসন প'ড়ে কে বুঝে যে তাঁর নাম আর্গ্যভাষার নয়, ত্রাবিড় ভাষার। ত্রাবিড় “কার” অর্থে ‘কাল, ক্রক’ এবং ‘বেল’ অর্থে ‘বল্লভ,’

—“কারবেল” বা “ধারবেল” শব্দের সঙ্কট অশ্বশাসন হ'বে “ক্রকটী” (অর্থাৎ ‘ক্রক জটী বা বল্লভ দার’)। দাক্ষিণাত্যের অধঃস্থের রাজারা ধারা ঐতিগ প্রথম-দ্বিতীয় শতকে রাজ্য করেন—এঁদের বড় বড় প্রাকৃত অশ্বশাসন আছে, এঁদের পোষ-নাম হ'চ্ছে “বানিজীপুত্র, গৌতমীপুত্র” প্রভৃতি, কিছু এঁদের নিষেধের “শাত-বাহন” নামটী আর্গ্য ভাষার নয়, —এ নামটী অনার্য্য কোলভাষার, এই নামের অর্থ ‘অশ্ব-পুত্র’। এই সব থেকে, হ'লান্নার মাড়াই গাছার বছর আগে ভারতীয় জীবনে অনার্য্য উপাদান কত প্রবল ছিল তার একটা আভাস পাওয়া যায়; আর্গ্য প্রভাব কতটুকু উপর-উপর ছিল, তাও বোঝা যায়।

ভারতীয় হিন্দু সভ্যতার বয়স পূর্বে নির্দিষ্ট ইতিহাস অশ্বশাসনে খুব বেশি হ'বে না; একবার আমাদের মনেকের আশ্বশাসনে যা লাগবে। আর্গ্যদের আ'স'বার পূর্বে অনার্য্য ত্রাবিড় আর কোলদের ইতিহাস অবত ছিল, তার অনেক কিছু রূপান্তরিত আকারে সঙ্কট পুরাণে রক্ষিত হ'য়েছে। আর্গ্যেরা আসাচেই হিন্দু জাতির রূপ-প্রথমে সাহায্য হ'ল; আর্গ্য অনার্য্যের পূর্ণ সামঞ্জস্য হ'ল ঐতি-পূর্ব প্রথম সহস্রকের দ্বিতীয়ার্ধে। হিন্দু জাতি আর সভ্যতার ইতিহাসে মোটামুটি দু'টা যুগ ধর। বেতে পারে: বজ্রের আধাত্তের যুগ, আর পৌরাণিক দেবতার আধাত্তের যুগ। ঐতি-পূর্ব ১০০০ থেকে এই সভ্যতার আরম্ভ; ঐতি-যুগের পরে ১০০০-১০০ বৎসর ধ'রে এই সভ্যতার সর্বাপেক্ষা পৌরবসর কাল। পৃথিবীর অত প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে তুলনা ক'রলে, বয়স হিসাবে আমাদের হিন্দুসভ্যতা মিসর, বাবিলোন, ঐজিয়ান সভ্যতার চেয়ে চেয়ে আধুনিক, আর কতকটা প্রাচীন গ্রীক আর প্রাচীন পারসীক তথা প্রাচীন চীনা সভ্যতার সমকালীন গ্রীক সভ্যতা কিছু নিজ বিশিষ্ট বৃত্তি ঐতি-পূর্ব প্রথম সহস্রকের প্রথমার্ধেই প্রাপ্ত হয়; আর চীনা সভ্যতা অব্যাহত পতিতে ঐতি-পূর্ব ২০০০ থেকে শুরু ক'রে ঐতি-পূর্ব প্রথম সহস্রকের প্রথমার্ধেই নিজ পরিণত রূপ ধারণ করে। আমাদের প্রাচীন

হিন্দু সভ্যতাকে বরং রোমান বা গ্রীকো-রোমান যুগের সভ্যতার, আর চীনের চ'ং ও পাও যুগের সভ্যতার হুঁচি বলা যায়।

হিন্দু সভ্যতার অতি-প্রাচীনত্ব খারা আত্মবান্ধু তাঁরা ভোক্তাদের প্রমাণ উপস্থিত করে এই প্রাচীনত্ব প্রমাণ কর্তে চান। এ সম্বন্ধে খাদি দুটো কথা ব'লুত চাই : এক—হিন্দু ভোক্তা গ্রীকদের সঙ্গে হিন্দুর পরিচয়ের পক্ষেই পুষ্ট লাভ করে, বেদসাহিত্য ও গ্রন্থাদি প্রাচীন সাহিত্যের ভোক্তাভিত্তিক উপস্থাপিত কি ভাবে নেওয়া হবে সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে ; আর দুই—যারা এই ভোক্তাদের "প্রমাণ" প্রসঙ্গ করেন, তাঁদের মধ্যে ঐকমত্য নেই ; তা'থেকে বোঝা যায়, যুক্তিতর্কানুসারিত বিচারের যে এক পন্থা, যে scientific বা logical discussion আমাদের একই বিনিস প্রমাণ-ক'রে দেবে, সঙ্গবাদিসম্মত সেই যুক্তিতর্কানুসারিত বিচার-পদ্ধতি, সেই logical discussion এই ভোক্তাভিত্তিক আলোচনায় যেন ঠাই পাচ্ছে না। ভোক্তাভিত্তিক বাধ্যবাধী বা সিদ্ধান্তে যে অতি-প্রাচীন তারিখের কথা শোনা যায়, অত দিক দিয়ে তার প্রতিফুলে এত বিষয় আছে, যে এই সব বিভিন্ন বাধ্যবাধী বা সিদ্ধান্তের কোনটাই গ্রহণযোগ্য ব'লে মনে হয় না।

রামায়ণ, মহাভারত, পৌরাণিক যুগ ও চন্দ্র যুগের রাজাদের তালিকা, এ সবের ঐতিহাসিকত্ব নিয়ে অনেক গবেষণা হ'য়েছে। খারা প্রাচীন ঐতিহাস যথার্থীত্ব আলোচনা করেন, তাঁদের কেউই রামায়ণের কোনও ঐতিহাসিকত্ব স্বীকার করেন না ; মহাভারতের মধ্যে, মহাভারত আর পুরাণের অনেক উপাখ্যানের মধ্যে কিছু ঐতিহাসিকত্ব থাকতে পারে, এইটুকু স্বীকার করেন মাত্র। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ খ্রীষ্ট-পূর্ব দশম শতকে হ'য়েছিল, এইজন্য মত হ'লেও বিশিষ্ট ঐতিহাসিক—ইংরেজ শাস্ত্রিদের সাহেব আর ভারতীয় হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী—এঁরা প্রকাশ করেছেন ; এঁদের 'আলোচনা-পদ্ধতি উচ্ছিন্ন' দেবার নয়। মহাভারতের পাত্র-পাত্রী সম্বন্ধে একথাও বলা যেতে পারে, যে তাঁরা আর্ধ্য-পুঙ্খ যুগের মাত্র—মহাভারতের মূল আখ্যান অনাধ্য রাজাদের নিয়ে, পরে অনাধ্য ভাষ্কর নবানুত আর্ধ্যভাষ্কর সঙ্গে মিশ্রণের আর ভাবার তাঁদের অর্থোক্তরণের সঙ্গে সঙ্গে এই উপাখ্যানও পরিবর্তিত হ'ল, পরিবর্তিত হ'ল, সেবে আমাদের মস্ত মহাভারতে পাড়িয়ে গেল, খ্রীষ্ট-যুগের কাছাকাছি কোনও সময়ে—আর আর্ধ্যানার্য-মিশ্র হিন্দুভাষ্কর ভাষ্কর সম্পত্তি হ'য়ে গেল।

“মহাভাষ্কর। অম্বা তোর কি শিখিব যশ ?
যত চুপি তত খুসী, হাড়ে হাড়ে রস।
দিলে দিলে কোল খার আত্মদানহত।
তাদের জীবন বৃথা পাঁতপড়া যত।

এমন পাটার নাম বে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয় ঝড়-বল বোকা।

—ঈশ্বর গুপ্ত



মাগ্‌, ছাড়াও আমাদের দেশ আছে, শুধু মাগ্‌ আছে না, মুসলিম ধর্ম আছে, সপৌরবে আছে, —সেপৌরবের সেই কথা কেবল মাগ্‌ উল্লেখ নয়, বারংবার বরণ করাইয়া সেই কথা চিত্র-কোঠায় খোঁসাই করাইয়া নিবার প্রয়োজন ঘটয়াকে ।

আমাদের দেশের ইতিহাস আছে, ভূগোল আছে, প্রাকৃতিক বিবৃতি আছে; আশ্চর্য্য সূচ-পরিবর্তনের সন্ধিক্ষেপে, বাংলার ইতিহাসের নব পর্যায়ে, সে-সব কথা মনে করিবার বড় প্রয়োজন । বাংলার ধর্মের, সমাজের, কুটির প্রেক্ষাবরে নব পতন আর হইবে না । বিরাট সূচ-প্রসারিত তার পোড়া-পতন আছে, তার সংবাদ গ্রহণ করিতে হইবে ।

সে-ইতিহাসের নব অধ্যায়, আত্মই প্রথম বার রচনা চণ্ডার কারণ ঘটে নাই । পৃথিবীর অন্ত সব দেশের নতই এখানেও নব নব সূচ আসিয়াছে, কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে, তাতা পুণ্ডিত বনিয়াদের উপরই পড়িয়া উঠিয়াছে । এক দিন বাহাকে বলা হয় বিদ্রব, তাতারও পোড়ার স্বর বধুর ব্যাপিতা ; দীর্ঘ ঘটনাপর্ব্বারের স্বাভাবিক পরিণতিই নামই বিদ্রব, তাতা । আকস্মিক ঘটনা নয় । প্রত্যেক পুষ্টি যখন মধুরিত হইতে দেখি, ভূমি না যেন তাতার পশ্চাতে প্রসারের সূচ ইতিহাস আছে ।

বাংলার ধর্মের, সমাজের, বাংলার কুটির সেই প্রাচীন ভিত্তির বিবরণ, তথা-কথিত শিক্ষিত মনের প্রথম মত্ততার দিনে যদি অবস্থার চক্রে দেখিবা থাকেন, আশ্চর্য্যের দিনে আর তাতা সস্তব নয় । লক্ষ্য একদিন বাঙালী তার বাঙালী সম্পূর্ণ বিশ্বত হইয়া এক নব জাতির 'খোলা' ধারণ করিবে, ইহা

অসম্ভব, অশোভনীয় ও অগৌরবেরই কথা । 'বাঙালী'র কথা বাঙালীকে জানিতে হইবে ।

বাংলার ধর্মের একটি বিশিষ্ট রূপ আছে ; অন-আখ্য নিবাসের দিন হইতে বহুদলনের, বিপের করিয়া বেদান্তের, ঐত ও অঐত উভয় বিভাগেরই, সাধা-আগ্নিত বৌদ্ধ ধর্ম, নাগার্জুন হইতে বহুদলনী মতাবল বৌদ্ধ-ধর্ম, বৈজয়-শৈব-শাক্ত-বৌদ্ধ তাতিক-ধর্ম ও তন্ত্র-কোষ সহজিয়া, মেড়া-মেড়া, আউল-বাউল পিতৃ-পয়গম্বরের ধর্ম ইত্যাদি এমন কত কিছু মিলিত-মিলিত বাঙালীর ধর্ম রচিত হইয়াছে—ঐক্‌ তেমনি কোন-কিছুর সন্ধান ভারতবর্ষে আরও কোথাও মিলে না । 'বাঙালী' বাংলার ইহার বিরাট বেদ রচনা করিয়াছে । অনন্দের 'অশিক্ষিত' লাধুতা চকের আড়ালে লক্ষ পাণ্ডার ইহার ভাষা রচনা করিয়াছেন । বাংলার নিজের অষ্টাদশ-শত পুরাণ উপ-পুরাণ আছে ; ঐ'চারখানি বড় বড় পুঁথির সন্ধান পাওয়া পিয়াছে—'মঙ্গল'-লাহিতা, ধর্ম-মঙ্গল, চণ্ডী-মঙ্গল, সারদা-মঙ্গল, ঐতলা-মঙ্গল, শিবায়ন ইত্যাদি । কবি-গান, সেহত-শব্দ-গান, তাসান-গান, বিরা-গান, ধূতা, বারোমাসী, জাহী, শান্তি, ক্ষুণ্ণ-গান, রসের ধূতা, চাপান-ধূতা, বিবাহের সময় মেয়েরা গান, পাড়ীর গান ইত্যাদি তালো করিয়া সংগ্ৰহ করিয়া ব্যবহার করিতে পারিলে বাংলার মনের সত্যকার পরিচয় পাইব । উহা গ্রামে গ্রামে, কুটারে কুটারে ছিন্ন করার অন্তরালে, দীন-ভঃবীর ধর্ম বন্ধোমাঝে ধরনী মল্লশক্তি-মল্ল অন্ত নিঃশব্দে প্রতীক্য করিতেছে—শিক্ষিত বাঙালীকে আশ্চর্য্য তাতার সন্ধান লইতে হইবে । গৃহীত ১ম হইতে ১২ম শতক পর্য্যন্ত শৈবধর্ম কেমন করিয়া বৌদ্ধধর্মকে হক্ষম করিয়া কেলিল,

শৈব বাঙালী জাতি কেমন করিয়া বৈষ্ণব হইয়া উঠিল, তাহার সব পরিচয় পাওয়া যায় নাই। বৈষ্ণব ধর্ম কেমন করিয়া 'বোঠম'ধর্ম হইল, তাহার অনেক দিনের অনেক কথা আজও অজানা রহিয়াছে।

বনে-কাহ্নারে বাঙালীর ঠাকুরের স্টেট গোলদেব রহস্তে লীন হইয়া ঘাইতেছে; কিন্তু বাংলার পাপত্য সতাই অবশেষের বন্ধনয়। বাংলার চিত্র-শিল্পের সম্পূর্ণ বিশিষ্ট ধারা ও পদ্ধতি আছে, বাংলায় এমন 'ম্যাজানা' আছে, তাব-গোঁড়বে তাহা অতুলনীয়, একথা বলিলে বড় অত্যাশ্চর্য্য হয় না। তারতীয় শিল্প-ইতিহাসের কোন পুস্তকেই এ সকলের উল্লেখ পাই না।

বাংলার বাসিন্দা-সম্পদ দিয়াছে, তাহার আন্দাজ্য বঙ্গ-শিল্পে প্রায় সমস্ত-কথা; তবুও আজও মদলিন তৈয়ারী হয়। সহস্র মুদ্রা মূল্যের বাংলাপোষ ও পাটী আজও বাংলায় পাওয়া যায়। প্রস্তর-ভাস্কর্য্য, কাঠ-তক্ষণ ও মৃত্তিকা-শিল্পের এমন পরিচয় আজও পাই—বাহা বিশ্বের দরবারে সর্ব্বদা প্রদর্শন করা চলে। বাঙালী জাতিকে ঐচ্ছিতে হইলে এদের পরিচয় লইতে হইবে।

বাঙালীর দয়বাহী ধর্ম ভিন্নও যেমন তার 'আটপৌরে' ঘরের ধর্ম আছে, তার ব্রত-পূজা-পার্বণ আছে, তেমনি তার কুটীর-লক্ষ্য, শোভন গৃহশিল্প আছে। সে গৃহশিল্প যে কৃত্ত বিভিন্ন, আটপৌরে নিকটে কবিলে মণিকোঠায় সে স্থান পায়, কয়তনে তাহার সন্ধান রাখেন! 'প্রদত্ত'র সমাধে 'কাথা'র স্থান নাই, কিন্তু সহস্রব্রহ্মাণ্ডিক মূল্যে কাথা বিক্রয় হয় এবং

ঐতিহাসিক কারণ বিনা সম-পরিমাণ 'টোপ্পী' বিপ তাগের একভাগ পরিমাণ মূল্যেও বিক্রয় না।

ইতিহাসের উপাদান-উপকরণে বাংলায় মৃত্তিকা কল্পিণালিনী। উদ্ভব ও পশ্চিম বাংলার অগ্ন্য 'পড়'র ইতিহাস যদি কোন দিন লেখা হয়, সেই হইবে 'বাংলার রাজপুত্র'দের ইতিহাস। বাঙালী সমাজের অনেক দামো মাল-মসলা ভোগান হইবে, যদি বিভিন্ন জেলার লোকের পনবী-বৈশিষ্ট্যের আলোচনা হয়। বিভিন্ন জেলার ব্রত-পূজা-পার্বণ, গাথা-গান-পালা, প্রবাদ-জনশ্রুতি সংগ্রহ করিতে পারিলে, তবেই জাতির ইতিহাস রচিত হইতে পারে। তাহার মধ্যে ঘটক-কুলাচার্য্যদেরও স্থান আছে। নৃত্য-বিদ্য পণ্ডিতেরা তাহাদের বিজ্ঞানমতে 'মহামানবের সাগরতীরে' জাতি-নির্দেশের 'খেই' গারাইয়া ফেলিয়াছেন—শাড়াইতেছেন বিশেষ করিয়া ভাষাতত্ত্বের উপরে। বিভিন্ন জেলার ভাষার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলে এসম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য সংগৃহীত হইবে। প্রত্যন্ত দেশের জেলাগুলির ভাষার কথাটা অবিলম্বে একটু হইবে। রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, পূজা-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সে-সকল কথা আরও স্পষ্ট হয়।

বাঙালীর জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন পরিচয় এমনি করিয়া লইতে হইবে। বাঙালী হইয়া বাচা নয়, শুধু বাচিয়া থাকিতে হইলেই, 'কোণ-ঠোকা' হইয়া বিলুপ্তি হইতে রক্ষা পাউতে হইলেই এমনি করিয়া জীবনের বিভিন্ন বিভাগে পুনরুত্থান ঘটাইতে হইবে।

শ্রীমুখেন্দ্রনাথ রায়

জাতির পাঁতি

বজ্রবজ্জ

মাহুব যে মাহুব—এই ভারী চক্ৰই সত্য মানবার
দৃশ্যবোধ নাকি আর এসেছে। এই সভাকে পরিপূর্ণ
ভাবে স্বীকার করাবার ক্ষমতাই হুগে হুগে মহাপুরুষের।
প্রাণ নিঃসেছেন—এর অবীকারে পৃথিবীর পাশের ভগ্না
নিষ্কেষ। মাথার তুলে নিয়ে, মাহুবকে মুক্তি দেবার
প্রয়াস শেয়েছেন। মাহুবের ইতিহাসের প্রথম
মহাপুরুষ 'নাস্তিক' শাক্য-বুদ্ধের বা তাঁর জেনারেলের
কথা শুনি (১)—ব্রাহ্মণদের দ্বন্দ্ব তো অস্ত্র-সব্যাকারই
নত—তবে ব্রাহ্মণেরা সেবাংগতির অস্বাকার করেন
কেন? যদি কোন বিশেষ একটি ব্রাহ্মণের সেই
দাবী থাকে—হুগে-হুগে হ'লে পৃথিবীতে ব্রাহ্মণের
বেশ্যর সেনাবাহিনী গ্রাহ্য হয় কেন? আবার হাজার
বছর আগেই আমাদের বৃত্তিশাসিত এই দেশেই
অমরবর গুর প্রতিনিধি করছেন (২)। বড় রাগ
ক'রে তিনি বলেছিলেন—ব্রাহ্মণ নাকি প্রকার হুগে
পেকে হ'য়েছে, হয়েছিল তো হয়েছিল—এখন তার কি,
এখন তো অস্ত্রও বেমন হয়, ব্রাহ্মণও তেমনি হয়—
তবে? এই 'নাস্তিক'দের জুগোষ্ঠান কাল হ'তে দীর্ঘদিন
ধ'রে এখানে পূর্ব ভয়ভরকার হ'য়েছে। তাই মনে
করতে পারি প্রায়টা শুধু তা'দের নয়—আমাদের
দেশের।

পৃথিবীতে হুগে-হুগে নানা রূপে এ প্রায় উঠেছে।
আমাদের দেশের বাইরে এর একটা রূপের কঠিন
পরিচয় পা'বার দিন আগত বলে মনে হওয়া অসম্ভব
নয়—তাকে কিছুকাল পূর্বে বলা হয়েছিল white peril
আর তা'রই প্রভাবিত পরিপূর্ণকে এখন বলা হচ্ছে
yellow peril। এখানে সমস্তর রূপ গভীর—পায়ের
চামড়া, আকার-প্রকারের তেজ তো চোখ বুজতে

চোখে পড়ে—আর শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-সভ্যতার এ-
নবও কিছু পরিমাণে লাঠা-মাঠি না লাগায় তাও
নয়। হাক্ ওলব কথা। আমাদের স্থানীয় সমস্ত
caste peril বাইরের লোকের চোখে ঠিক
রূপ পেতে পারে না। আমাদের দীর্ঘ ইতিহাসে এমন
shake the bottle process হ'য়ে গেছে যে, নৃত্য-
বিন্দুসেরও এ নয়-তবে এসে তা'রা-তবের গবেষণায়ই
বেশী ক'রে মন দিতে হচ্ছে (৩)। আমরা ছত্রিশ
আজকে কোঙ্কি-পত্র দেখে খবর করার চেষ্টা করি।
মাকে ঘটকেরা এ কাণ্ড করতেন। এখন সে বৃত্তি
লোপ শেয়েছে। ইতিহাসের কথা নয়—সাত পুরুষের,
১০০১৫০ বছরের খবর মেলাই দুঃস্থ। আমাদের
সভা আ'তের খবর গাঢ় অন্ধকার গুহায় নিহিত।

কৃষকের শেখ ও নবীনতম অংশের পুরুষ-হস্তে
বর্ণোৎপত্তির স্রোত নিয়ে ব্রাহ্মণেরা নিজেদের মত-
ভরকার করেন। বেঙ্গোত্তর ব্রাহ্মণ-মারেরই বর্ণোৎপত্তির
আরও তদনুযায়ী বিভিন্ন বিবরণ মেলে (৪)। বেঙ্গের
কাল হ'তে পুরাণের হুগে পর্যন্ত বারংবার জাতি-
উৎপত্তির নব নব মত রচনা হ'ল, তা থেকে বৃষ্টি একান্ত
ব্রাহ্মণ-শাসিত মনতেও পুরুষ-হস্তের একচ্ছত্র আধিপত্য
ছিল না। নতুন নতুন হুগে-হুগে বর্ণোৎপত্তির
প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, নিজেদের পুরাতন বর্ণোৎপত্তির
সম্পূর্ণ নব নব মত রচনা ক'রেছেন—আর তা'তে এ
কথাটা বুঝতে ভুল হয় না, যে, কোন মতই তদানীন্তন
[ইহার বাকী অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়]

৩। ডি. আর. ভাণ্ডারকরের—Foreign Elements in
Hindu Population-এ বিবরণীর একাংশ হুগে ভাবে বলা
হয়েছে।

৪। তৈজস্বীর ব্রাহ্মণ—১১২১১২; শতপথ—২১১৪১৫;
শাখসমের ১৪৩০; ব্রহ্মসুত্র—৮১৫৬—১৬০; হরিবংশ—
২১ ও ৩২ অধ্যায়; বিষ্ণুপুরাণ ৪৮/১১ উদাহার।

১। অধ্যায় ৩ পত্র—বৌদ্ধ দর্শনমূল্য

২। বৌদ্ধসংসারকোষ—পৃ: ৮১—৮২; বাগ্যর্থন (?) একপাশ
জাতিবাহ-বিভাগী শীঘ্র পত্রিকা রচনা করেন—২৪০৪৫।

অম্পৃশ্যতা-সমস্যা

অধ্যাপক শ্রীমত্যেন্দ্রনাথ সেন, এম্-এ, বিজ্ঞাবাগীশ, এম্-এল্-এ

বর্তমান 'অম্পৃশ্যতা-নিবারণ' ও 'মন্দির-প্রবেশ'-মত্যাগমন সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি। বাবদ্য পরিবর্তন এই দুই বিষয়ে দুইটী বিলের আলোচনার চেষ্টা চলিতেছে। দুইটী বিলেরই বিষয় এক বলিয়া মনে করি। কারণ 'অম্পৃশ্যতা-নিবারণ' বিলটা ব্যাপক, 'মন্দির-প্রবেশ' বিল উহার একটী প্রকারভেদ মাত্র। অতএব বস্তুতঃ উহা প্রথম বিলেরই অন্তর্ভুক্ত। একমত আমি দুইটী প্রসঙ্গে এক প্রশ্ন ধরিয়া আলোচনা করিতেছি। এই প্রশ্নের ডিমট দিক্—(১) ধর্ম-সম্বন্ধীয়, (২) আইন-সম্বন্ধীয় এবং (৩) রাজনীতি-সম্বন্ধীয়। তিন দিকেই কিছু আলোচনা করিব।

(১) ধর্ম-সম্বন্ধীয় আলোচনা—

মন্দির-সম্বন্ধীয় ব্যাপার অর্থাৎ দেবকাণ্ডা, পূজা প্রভৃতি—অলৌকিক (super-natural) ও অদৃষ্টাধিক অর্থাৎ ইহার উদ্দেশ্য (পূর্ণার্থন) সাধারণ চক্ষুরা দৃষ্ট হয় না। মন্তোচ্চারণাদি কার্যাবিশেষদ্বারা সৃষ্টিত দেবতার সকার ক্রিয়ায় হয় তাহা সাধারণ বুদ্ধির (common sense-এর) অগোচর। তাহারা এইরূপ দেবতায় বিশ্বাস করেন তাহারা নারকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। এই সম্বন্ধে শাস্ত্রে বৈদ্য উপদেশ আছে, তাহাই প্রমাণ, অল্প কোন কথা প্রমাণ নহে। এখানে common sense এর পূর্ণ অধিকার নাই। বিশেষতঃ common sense ব্যক্তিবিশেষে বিভিন্ন, এবং একই ব্যক্তিতে কালবিশেষে ও অবস্থাবিশেষে বিভিন্ন। কেহ বলেন, সৃষ্টিপূজা পাপ; কেহ বলেন, পাপ নহে, অপ্রযত্ন; কেহ বলেন, উহা আবৃত্তক; ইত্যাদি। সকলেরই মত common sense-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। কোনটী হির ধরিব? বিষয় সমস্ত ও পোলাবোনের কথা। অতএব কেহ কেহ বলেন, votingই একমাত্র চূড়ান্ত উপায়। কিন্তু বলা বাহুল্য voting-এর কল্যাণ

অবস্থাবিশেষে ও সময়বিশেষে বিভিন্ন হইয়া থাকে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে vote লইলে আমরা এক এক সময়ে এক এক প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া পড়িব। অথচ একই বিষয়ে দুইটী বিকল্প মতই তো সত্য হইতে পারে না, একটী নিশ্চয়ই ভ্রান্ত। অতএব এ সকল ক্ষেত্রে voting-এর দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। এমত মণ্ডি নহু বলিয়াছেন—

‘একেছপি বেদবিদ্বর্ষঃ যঃ বাবস্তেং বিজ্ঞোত্তমঃ।

স এব বর্ষো বিজ্ঞেয়ো নাত্তান্যম্ অণ্ডোজিটৈঃঃ’

ধর্ম সম্বন্ধে বেদবিৎ পণ্ডিত একজন বাহা বলিবেন, তাহাই ধর্ম হইবে। অতঃ অল্প লোকের কথায় কোন মূল্য নাই। অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও technical বিষয়েও এই একই কথা।

এই মত যদি ঠিক হয় তবে জিজ্ঞাস্য হইবে যে, মন্দির-প্রবেশাদি সম্বন্ধে শাস্ত্রে কি মত? শাস্ত্র কি এই সম্বন্ধে সকল জাতিকই তুল্যাধিকার দিয়াছেন? না। পৃথক্ পৃথক্ জাতির পৃথক্ পৃথক্ অধিকার। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের অধিকার বিভিন্ন। ইহাতে এ বাবৎ কেহ কোনও আপত্তি করেন নাই। সনাতনীরা তো করেনই না, কারণ, তাহারা বিশ্বাস করেন যে, শূদ্র শূদ্রের ধর্ম ও কর্তব্য পালন করিয়াই ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে পারেন। বৈদ্যাদি জাতির পক্ষেও এইরূপ। মনে রাখিতে হইবে, উন্নতির ক্ষেত্রে অস্তিত্ব হইয়া আমরা এই জীবনেই সকল উন্নতি আদায় করিতে ব্যস্ত হইব না। কারণ, আমাদের মতে এই জীবনেই শেষ নহে। জাত্যধিকারকে যে উন্নতি তাহা পাইতে হইলে এই মলকাল-স্থায়ী জীবন-নিষ্কার পরেই উহা আমাদের প্রাপ্য হইবে, পূর্বে নহে। এইরূপ শিক্ষাতেই এবাবৎ আমরা হির থাকি। অসিদ্ধাছি। এই কর্মদ্বায়ী

জন্মান্তরবাদ বিশ্বত চটলেই গোলামাল। “য ইং
রমনীচরণাঃ তে রমনীয়াঃ ধোনিম্ আপত্তেরন—
প্রাচ্যধোনিঃ বা কত্রিধোনিঃ বা বৈশ্বধোনিঃ বা ; য
ইং কপুতচরণাঃ তে কপুতঃ ধোনিম্ আপত্তেরন—
কধোনিঃ বা পুতরধোনিঃ বা চাণ্ডালধোনিঃ বা” —
ছাণ্ডোগ্য উপনিষৎ।—অর্থাৎ রমনীয়া (উৎকৃষ্ট) আচরণ
করিলে প্রাচ্যধোনি উৎকৃষ্ট ধোনিতে জন্ম হয়। এবং
নিকৃষ্ট আচরণ করিলে চাণ্ডালাদি নিকৃষ্ট ধোনিতে জন্ম
হয়। বিদ্যাসিঁ পিঙ্কর প্রভাব্ এই Law of
Karma কুলিরা বাগ্যাতাই সমাজে বিপুলমা আদিরা
পতিষ্ঠাছে। অতীত বহুপ্রকারের উন্নতি এই দশেই
হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু জাতি-পরিবর্তন এই জন্মে
সম্ভবপত্র নহে। কারণ জাতিটা জন্মের সহিত অভিন্ন।
জন্মের পরিবর্তন না হইলে জাতির পরিবর্তন হয় না।
উক্ত শব্দটির মূল এক—জন্ম থাকু (‘to be born’)—
বিজ্ঞানমতের জাতি-পরিবর্তন চাইতাহিন—সে বহু সঙ্গ
বন্দর কঠোর তপস্কার ফলে। যাহা হউক এইরূপ
একটা exception খাটু general rule নষ্ট না চাইয়া
বরং সমর্থিতই চাইয়া থাকে।

প্রাচ্য, কত্রি, বৈশ্ব ও পুতরিত্র অত্র এক প্রেী আছে
যাহারা ‘অজ্ঞান’। প্রথমোক্ত চারি বর্ণ ধর্ম বিবাদের
সম্মান। আত্মজগৎ বিবাদের সম্মান নহে, তাহারা প্রতি-
শোম-সম্মত নিকৃষ্ট বর্ণসত্তর। নিকৃষ্ট জাতীর পুরুষ ও
উৎকৃষ্ট জাতীরা স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ হইতে পারে না।
এইরূপ কথোপেক্ষের নাম ‘প্রতিশোম’। এইরূপ কথোপেক্ষ
উৎপন্ন সম্মানকে ‘প্রতিশোমজ’ বলে। উৎপাদের মধ্যে
যাহারা নিকৃষ্টতম (যথা পুত্রের ওরসে প্রাচ্যস্ত্রীর গর্ভজাত)
তাহারা ‘অজ্ঞান’। সমাজে তাহাদের বৃত্তিও নিকৃষ্ট।
ভগবানের সম্মান হইলেও তাহারা অধর্ম-প্রমত্ত। জন্ম-
স্ত্রীপ পাপের ফলেই এরূপ দূষিত জন্ম হইয়া থাকে।
পূর্বোক্ত ছাণ্ডোগ্য-প্রতি হইতেই ইহা স্পষ্ট প্রতীত
হইবে। নীচাতে (১:২) ভগবান্ ইহাসিনকে ‘পাপ-
ধোনি’ বলিয়াছেন, মহু (১:১৬৩) ইহাসিনকে ‘কলুষধোনি’
বলিয়াছেন। স্পষ্ট কীবা হাইতেছে, এ বিষয়ে পীতার

ও মনুষ্যচিত্তের একমত। যদি কোনও ব্যক্তি এরূপ
অজ্ঞান অজ্ঞানতার ধরিয়া বলেন যে, চিত্তাতে যাহা না
থাকিবে তাহা মানিব না, উচ্চারণ এখানে নিরুপ
হইতে চাইবে। অশুভ্রগণের দ্বারা পাপ বলিয়াছেন যে,
ইহারা গ্রামের বাহিরে বাস করিবে। ধার্মিকগণ
ইহাদের সহিত কোনও বনিষ্ট ব্যবহার করিবেন না।
যথা—‘চণ্ডালপতনানাং তু বতিগ্গায়াং প্রতিগ্রহঃ’ মহু,
১:১৬১, ‘ন তৈঃ সমগ্রমবিশ্বেৎ পুঙ্খা ধর্মমাত্রন’ মহু,
১:১৬৩ ইত্যাদি। আমরা খাটীর আদেশের কারণ
অগ্রদূতান সাধারণতঃ করিত হাই না। তবে বর্তমান
বিষয়ে কাবণ বধেত কল্পনা করা হাইতে পারে। যথা—
জগৎ নীচতাঃ সাধারণতঃ মনের নীচতা হয়, অতীত-
বিচারের অসংঘম বস্তুতঃ পীর ও মন উভয়ই দূষিত
হয়। এই সকল দোষের সহিত সঙ্গত রচিত করিবার
চেষ্টাই অশুভ্রতার কারণ। কোনও ব্যক্তিবিশেষে
এইরূপ নীচতা বা দোষের অভাব থাকু অসম্ভব নহে।
কিন্তু majority দ্বারা এই সকল বিষয়ে বিধান চাইয়া
থাকে। এ বিষয়ে অত্র উপার চাইতে পারে না। মনে
রাখিতে হইবে এই অশুভ্রতার তথা অপেক্ষা সঙ্গহুতিই
অধিক। দূষিত হোণির সম্মানের সহিত আমরা যে
কারণে মেলাষণা করি না, ইহাও অনেকটা তজল।
এই সকল কারণে চণ্ডালাদির স্পর্শ নিষিদ্ধ, এবং দেব-
গৃহাদিতে তাহাদের প্রবেশাধিকার নাই।

চাণ্ডাল পতিতঃ সূই। নবম্ অজ্ঞানদের চ।

উদয়নঃ সূতিকার নারীঃ সবাসাঃ দানমাচরেৎ ॥

—সংহত, ১৭৮

—চণ্ডাল, পতিত, দূষিত, অজ্ঞান, রক্ষণা ও নব-
প্রহতা নারী স্পর্শ করিলে সবদ্র দান করিতে হয়।

চাণ্ডালৈরহ্মাচৈবৈতৈঃ তথাৎ-প্রতিশোমমতৈঃ।

প্রোক্ষণ নীচ-চাণ্ডালে শুকনিব্যাধি-দূষিতঃ।

এবমাসিত্তিঃ কস্মৃষ্টে দেবান্নারে বিপদতঃ।

স্মৃষ্টে প্রবেশনে বাধা পূজাকালে চ পদনে ॥

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ইচ্ছাতে আশ্রয়িত বা আশ্রিত কিছুই নাই। রাজ্যের অপেক্ষা কহিতের অধিকার অল্প, ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষা বৈশ্যের অধিকার অল্প, বৈশ্যের অপেক্ষা শূত্রের অধিকার অল্প, শূত্রের অপেক্ষা অন্যান্যের অধিকার অল্প। বস্তুতঃ অধিকার শূত্রেরও আছে, অন্যান্যেরও আছে। এই অধিকারটুকু ঠিক কতখানি তাগা শাস্ত্রে রাজ্য উল্লিখিত থাকিবে তাহাই মানিয়া লইতে হইবে, ইচ্ছা আমি বা অন্য কেহ আন্দোলন করিয়া উত্থাকে ভোটের দ্বারা বাড়াইয়া লইতে বাওয়া চলিবে না। শাস্ত্র একটি standard যথেষ্ট। উত্তা ত্যাগ করিলেই বিপদ। ব্যক্তিগত মতভেদ লইয়া বিবাদ ও কলহের সৃষ্টিই তাহার ফল।

সেবপূজার, ঈশ্বরচিন্তার ও মোক্ষবিষয়ের অস্পৃশ্যের অধিকার নাই, একপ নহে। বরং রাজধানির পক্ষে ঐ চত্রে যে সকল ক্রমের নিয়ম পালন বিধিত আছে, অস্পৃশ্যদের পক্ষে ঐ সকল নিয়ম অতীব দরল।

যেহেতু রাজধানির বিধি উল্লিখিত আছে, সমাজাবের বিধি বৃত্তিতেই বেশি। অস্পৃশ্যতার বিষয় বেদেও পাওয়া যায়—ইঙ্গিত। যজ্ঞে উৎসব, সূচন, পূজ ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। ঐগুলি তক্ষা (পরধর) কাটা কাটিয়া প্রেরিত করে। যজুর্বেদে (বাজসনেয়, ১১২৩) একটা বস আছে, তাহাতে এই উৎসবালিকে আয়োজন করিয়া বলা হইতেছে, যথা—

“ওক্ষধঃ সেবযজ্ঞায়াঃ স্বধঃ অগ্ন্যঃ পরাজঃ”
অর্থাৎ তক্ষপ্রভৃতি অগ্ন্য ব্যক্তিগণ কাটিয়া তোষামণিকে প্রেরিত করিয়াছে, তোষা যজ্ঞের চত্রে এখন ওক্ষ ইও (‘অগ্ন্যঃ তক্ষপ্রভৃতাঃ’—উকট ও মহাধর)। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অস্পৃশ্যতা বেদেরও অন্তর্ভুক্ত। বরং, শ্রুতিওনি স্মৃতিঃ বেদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা যজ্ঞে বর্জন্যে অনেক অস্ত্ররূপ প্রচার করিতেছেন। তাহা কতক অস্ত্রতা-সম্বৃত্ত ও কতক অস্ত্রতা-সম্বৃত্ত। সংক্ষেপে কয়েকটা বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।

(১) কেহ কেহ বলিতেছেন যে, জাতিভেদ সম্বন্ধে

আধুনিক অর্থাৎ পৌরাণিক যুগের জিনিস, বেদে ইহার উল্লেখ নাই। কিন্তু একথা সত্য নহে। যজুর্বেদে বিধাতা পুরুষযজ্ঞে চারি বর্ষের উৎপত্তি সম্বন্ধে স্মৃতিই উল্লেখ আছে। “ব্রাহ্মণোহন্ত বুধামাসীনঃ বাহুঃ রাজতঃ কৃতঃ। উকঃ তদন্ত বহু বৈতঃ পথ্যাঃ শূত্রোহুদ্যতঃ।” যজুর্বেদে ১০ অধ্যায়ে অমিশ্র ও মিশ্র মোট ৩৪টা জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

(২) ঈশ্বর ভগবান্ বলিয়াছেন—

“চাক্ষুর্দর্শনঃ সন্ধ্যা সন্ধ্যাঃ স্তবকশ্চবিভাগঃ”।

অতএব গুণ ও কর্ম অনুসারেই তো জাতি চত্রে উচিত, অর্থাৎ তাগা আমরাই নির্দেশ করিব, এই মত অতি অসমীচীন। তাহার হিসাবে এবং সামাজিক

হিসাবে—কোন হিসাবেই এইরূপ ব্যাখ্যার সমর্থন করা যায় না। এই ব্যাক্যের বক্তা কে? ভগবান। ‘সন্ধ্যা’ শব্দটা ‘স্তব’ প্রত্যয়-নিশ্চয়, ঐ ‘স্তব’ প্রত্যয় অস্তিত্বকাল বুঝায়। অতএব অর্গ এইরূপ হইল—ভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছেন। ভগবান্ও অনাদি, তৎকৃত এই যে প্রাকণ ইত্যাদি চতুর্দশের সৃষ্টি তাহাও অনাদি। ভগবান্ সৃষ্ট অর্থাৎ আদিমান পদার্থ নহেন। তিনি অনাদি, তাগাও সন্ত ধর্ম (কর্ম), তাগাও সকলই অনাদি। বর্ণ-বিভাগ যদি ভগবানের স্রষ্ট হইতে কাঁড়িয়া আমাদের স্রোতে আনি তাগা হইলে সমাজে যোর বিশৃঙ্খলার উদয় হইবে। এক ব্যক্তি অস্ত্র যে কার্য করিল তাগাতে সে ব্রাহ্মণ হইবার উপবৃত্ত। হরত আশানী, কলা একপ একটা কার্য করিয়া বসিবে তাগাতে সে চণ্ডালেরও অধম। অনবরত এই ভিত্তি ভিত্তি করিবে কে?

ভগবান্ ঈশ্বর বলিয়াছেন, “বিশ্বাবিনয়-সম্পদে ব্রাহ্মণে পবি ইত্তি। গুনি চৈব যপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমধমিনঃ।” অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মণ, গোষ্ঠ, ইন্দ্রী, কুহুর ও চণ্ডালে সমধনী। অতএব ইহাদের মধ্যে কোনও ভেদ নাই! ইহা অস্বত্ব ব্যাখ্যা। কারণ—প্রথমতঃ, ইহা কেবল তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতের পক্ষে, সাধারণের পক্ষে নহে। দ্বিতীয়তঃ, ‘সমধর্মিনঃ’ কোন বিষয়? না, ‘প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানীরা সকলে পরস্পর

হইতে অভিন্ন এই বিষয়ে। অজ্ঞাত বিদ্যে অর্থাৎ ব্যবহারতঃ তাহারা ভিন্নই বটে। তত্ত্বজ্ঞানীও একশ মনে করেন না যে, কুকুর বেতশ চতুষ্পদ প্রাণপণ্ডিত। একশ চতুষ্পদ, অথবা সোহৃদ বেতশ পানযোগ্য, কুকুরহৃৎও ইতর। আহারের সহিত পান করা বাইতে পারে, ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে সংস্কারকল্পের তর্ক এতই দৃঢ় যে, ইহা কেবল সমাজসম্মত বলিয়া মনে হয় না।

(৪) “নারদ ঋষি দ্বীপীশূর ছিলেন,” একথা বিখ্যাত। তিনি দ্বীপীশূর ছিলেন পুণ্যকর্ত্তে, এখানে নহে। (জ্ঞানবত, ১১৬)

“বসিৎ বেতাপুত্র”। বিখ্যাত কথা। বসিৎ ঋষি প্রকার (মহাত্ম্যের মন্তর) মানস পুত্র। বিসি ও বসিৎ পরস্পর বিবাস করিয়া পরস্পরকে অভিলাষ প্রদান করেন; ঐ অভিলাষবশতঃ বসিটের একবার বেতাপুত্রের গ্রহণ করিয়া আসিতে হয়। প্রকার উপদেশানুসারে নিম্ন ও বৃক্ষের বীৰ্য্যলব্ধতঃ কিছু “মমোনিম” অম্মগ্রহণ করিয়া পাণদুগ্ধ হইয়া তিনি পুনরায় পূর্বসংগ্রহণ করেন। উল্লসী অম্মস্বরূপে দেখিয়া ‘বহুভূমিতে’ মিত্র ও বন্ধনের যে রেতঃশলন হয় তাহা হইতে বসিটের দ্বিতীয় জন্ম। ইহা স্মৃতিই অলৌকিক ব্যাপার। ইহা হইতে বসিটকে বেতাপুত্র পুত্র বলা যায় না।

(৬) “বাস পুত্রাপুত্র” ইহাও ঠিক নহে। তাহার মাতা মতাবতী কৈবর্তপ্রাণ ককুশ পালিতা, কিন্তু তিনি তাহার প্রকৃত কক্কা নহেন। (মহাভারত, আদিপর্ক, ১০১১২)। বাস চুম্বিত হইবার পরক্ষণেই তপতর্ক প্রদান করিলেন, অতএব তাহার জন্মও অলৌকিক, একথাও মনে রাখিতে হইবে।

(৭) “ভগবান্ চৈতন্য দকল জাতির অর গ্রহণ করিয়াছেন,” ইহাও বিখ্যাত কথা। ঐক্যেতে প্রাণপণ্ডিত তাহাকে পাক করিয়া নিবরণ বাগাইতেছেন, কিন্তু অপ্রাণপণ্ডিত তাহাকে নিবরণ করিয়া জগন্নাথের প্রদান ভোজন করাইতেছেন। (চৈতন্য-চরিতামৃত, অষ্টালীলা, ১০)।

হবন চরিগাণ এবং ববনরাজের বন্দী রূপ ও সমাজে নিক্ষেপে মন্দিরে প্রবেশের অযোগ্য মনে করিয়া মন্দিরে

প্রবেশ করেন নাই জানিয়া চৈতন্যদেব অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা কেবল মীনভার প্রদানই নহে। রূপ ও সমাজের পক্ষে আহার দৃষ্টান্তের সদাচার ক্ষুদ্র হওয়াতেই তাহার। মন্দির প্রবেশে বিরত হইয়াছিলেন ইহাই দৃষ্টান্ত করিবার বিষয়।

(৮) ভগবান্ রামচন্দ্র নিগাণ জাতীয় বহু ভক্তের অর ভোজন করিয়াছিলেন, ইহাও বিখ্যাত। লক্ষণ-কর্তৃক আনীত কলমায় পান করিয়া তিনি ঐ রাজি ধাপন করিয়াছিলেন। (রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৮৭)।

সংস্কারকল্প এতদিন যাবৎ বহু তর্কবিভক্তের পর বীকার করিয়াছেন যে, দ্বিপুণ্ড্রের অশুভতার উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহারা অত্র এক নূতন তর্ক খরিয়াছেন যে, আমরা বাহাদিসংকে অশুভ বলি তাহারাই যে শাস্তোক্ত সেই সেই অশুভজাতি তাহার প্রমাণ কি? এইরূপ তর্ককে আমরা সাধারণ ভাষায় বলি ‘চাঠামি’। প্রতিষ্ঠিত সোকেব সুখে এইরূপ তর্ক শোভা পায় না। রাম প্রাণপণ্ডিত, জাম কক্কা, বহু বৈজ্ঞ, দীর্ঘ পুত্র, চেনু চামার, ভগবান্ বেথর—এই সর্বত্রই একই প্রমাণ—চিরন্তন ঐতিহ্য (tradition)। রামের পূর্বপুরুষ প্রাণপণ্ডিত একথা বেতশে সঙ্গ্রাম্য হত, ভগবান্ পূর্বপুরুষ বেথর একথাও সেইভাবেই সঙ্গ্রাম্য হইবে। এইরূপ দৃষ্টান্তে সমগ্র ও শক্তি ক্ষয় করা শাস্ত্রে পাপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সাধারণ বুদ্ধিতেও আমরা ঐরূপই মনে করি। এই অজ্ঞাত তর্ক, জেদ বা prestige জ্ঞাপ করিবার প্রবৃত্তি বা সাহসের অভাব হইলেই সমাজে গ্রন্থপাতির অভাব হয়। দ্বীপীশূর সাধারণ সোকেব তুলনায় কোনও কোনও বিষয়ে মহাপুংগব হইতে পারেন, কিন্তু তিনি দকল বিদ্যে অজ্ঞাত একগা আশা বা কল্পনা করা অজ্ঞান। প্রাচীন দ্বিপুণ্ড্রের তুলনায় তাহার দ্বীপীশূর বিজ্ঞানবুদ্ধি অতি দাম্যত, সেক্ষত দ্বীপীশূর আশোচনা, অতিজ্ঞাত ও দুরবিশিষ্টও অতি অজ্ঞ। নবুদ, Himalayan blunder করিয়া তাহার পক্ষে পুনঃ পুনঃ মত পরিবর্তনের প্রয়োজন হইত না। অজ্ঞতাবেই যদি কাহারও মতের অস্থবর্তন করিতে হয় তাহা হইলে বর্তমান কাঙ্গারচিত রক্তচক্ষুপ্রদান যে

কোনও ব্যক্তি অপেক্ষা নতুনপ্রধান নিয়মবৃদ্ধি প্রাচীন বংশি বহু, অতি, বাস্তব্য প্রভৃতির অধ্বস্তন করা হইত সর্বদা প্রেরণ।

২। আইন-সম্বন্ধীয় আলোচনা—

অস্পৃশ্যের এক মন্দিরপ্রবেশ-সম্বন্ধীয় আইন পেশ করিয়া সংসদকণ্ঠ আইনের বিকৃতি পরিহার করিয়া দিয়াছেন। এতদিন তাহার বলিতেছিলেন, মন্দিরের ইঙ্গিতপূর্ণ ইচ্ছা করিলেই অন্যায়সে মন্দির অস্পৃশ্যের এক উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারেন, তাহাতে কোনও বাধা নাই। এইরূপ করনা করিয়াই পত্ৰ বংশর Zamorinকে তাহার পুনঃ পুনঃ অধ্বস্তন দানাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা যে মণ্ডে মন্দিরের পরিচালনা অভিপ্রায় করিয়া দিয়াছেন তাহার ব্যতিক্রম করিবার ক্ষমতা Trustee'র নাই, করিলে তাহার breach of trust অপরাধে অপরাধী হইবেন। বহুদিন পরে এই যুক্তির সার অধ্বস্তন করিয়া সংসদকণ্ঠ এখন নূতন আইনের দ্বারা পূর্ণ নিয়ম পরিবর্তন করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু নূন প্রতিষ্ঠাতার অভিপ্রায় সন্মোচন করিবার ক্ষমতা কোনও নূতন আইনেরও হইতে পারে, এইরূপ করনাও অমূলক। প্রতিষ্ঠাতার অভিপ্রায়ের অবিরোধে নিয়মাবলীর পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা Trustee'র আছে, কিন্তু ঐ অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কিছু পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা তাহার নাই—ইহা অতি স্পষ্ট কথা। এই সম্বন্ধে বহু মন্তব্য আছে, আমি এখানে মাত্র ২৪৪টা উদ্ধৃত করিয়া আমার এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

"A Hindu Temple is *not* a public place in the sense in which a public road is a public place. It is open only to the persons belonging to the religious community for whose use and benefit it was dedicated."—1. L. R., 13, Madras, 293.

"Any extension or limitation of the scope of a trust so as to exclude those who were intended to be included, or to include

those who were intended to be excluded, is really a breach—and a very serious breach—of trust."—Justice Heaman, 33 Bombay 509.

3. "No amount of consent on the part of the public will justify a breach of trust by the Manager."—1. L. R., 20, Madras 398.

4. "In cases relating to Charity, a majority cannot control the minority."—Tudor on "Charitable Trust."

5. "A minority, however small, holding fast by the tenet would be entitled to prevail against the majority, however numerically large, which could be shown to have receded from or renounced them. Justice Arnold, 12 Il. Il. C., 323.

রাজনীতি-সম্বন্ধীয় আলোচনা—

৭ম ও আইন ভিন্ন বর্তমান প্রণেব আর একটা দিক আছে, সেটা রাজনীতি (politics)। কেহ কেহ বলেন যে, অস্পৃশ্যপক্ষ মন্দিরে প্রবেশ করিতে না দিলে তাহার বিমুখপূর্ণ ভাগ করিয়া অতঃপর আশ্রয় করিবে, তাহাতে হিন্দুসমাজ ওরুল হইয়া পড়িবে। অতঃপর দেশ-কালপাত্র বিবেচনা করিয়া গাভীজির এই আশ্বাসনে বাধা না দেওয়াই উচিত। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে এ হস্তের সমর্থন করা যায় না। অস্পৃশ্য-নেতা আবেদনকার প্রভৃতি এবং তথাকথিত হিন্দুদের মধ্যে একমুখ লোক আছেন বাহ্যিক সমগ্র বর্ণাশ্রমই উদ্ধারিত দিতে চাহেন। গাভীজি বর্তমানে তাহাতে যৌনিক বাধা দিয়া বলিয়াছেন যে, আবশ্যক হইলে তাহা পরে করা যাইবে। "If, Varnasram even then looks an ugly thing the whole Hindu society will fight it."—"Harijan," Feb. 11, 1933. Inter-dining ও Inter-marriage বর্তমান আন্দোলনের অঙ্গ নহে, কিন্তু সাধারণতঃ উহাতে আপত্তিজনক কিছুই নাই বরং উহা উৎসাহের সহিত আচরণীয় একমুখ গাভীজি বলিয়াছেন। অতঃপর দেশকালপাত্রের দোহাই দিয়া 'হ'কার খোল ও ন'লুচ হুইই বদলাইতে' প্রস্তাব হওয়া উচিত কি না তাহা চিন্তা

করা আবশ্যক। দেশকালপাত্র হিসাবে অবান্তর বিষয়ের পরিবর্তন হইতে পারে, মূলনীতির (basic principle) পরিবর্তন হইতে পারে না। মূলনীতির পরিবর্তন হইলে তাহাকে 'পরিবর্তন' বলে না, 'বিপ্লব' বলে। কোনও ধৃদ্ধিমান্ ব্যক্তিই তাহা করিতে প্রস্তুত হইবেন না। তাহাতে যদি কেহ ('নিজের নাক কাটা অপরের ঘাতাতক' করিবার জন্য) অস্ত্র ধন ব্যগ্র করেন সেজন্য আমরা গুণিত কিন্তু নিকপায়। সংখ্যাবাহুল্যের বলাবল প্রায়শঃ অকিঞ্চিৎকর, তাহা জানি। চীন, জাপান, ইংলও, এবং হিন্দু মূলতঃমান কতক অধুঃখিত ভারতবর্ষের নিকৈ দৃষ্টপাত করিলেই তাহা স্পষ্ট বৃত্তা যায়। তথানি নিজে অকতানি কাগারও অভিজ্ঞত নতে। অশ্বপুত্রগণের পুরুপুরুষণ যে শিক্ষার গুণে এতদিন বিনা অপরিঃিত বহুঃকচিত্তে হিন্দুঃমাজ্জুত ছিলেন ঔতানিগকেও সেই শিক্ষার অধুঃবর্তন করিতে অধুঃরোধ করি। এ বিষয়ে ঔতানদের হুবিবেচনার পরিচয় পাইবাহি। Indian Franchise Committee's বিশেষ্টে অধুঃরত সমাজের প্রতিনিধি বলিয়াছেন—We are Hindus and we desire to remain as Hindus. As a matter of fact it will be interesting to know that persons who become

converts to Christianity come back to the Hindu fold seeing that there is no solace and comfort and equality in that Christian religion. Did not my friend Dr. Solonki, M. L. C., of Bombay come back to Hinduism after having once been converted to Christianity? বস্তুতঃ বর্তমান আলোকনে অশ্বাঃগণের ঔতংকার অশেফ। তথাকথিত হিন্দুঃগণের ঔতংকারই বৈধি।

গাঃগার। অশ্বপুত্রগণের মন্দির প্রবেশ সমর্থন করেন ঔতংগদের মধ্যে অদিকাংগই স্বাক্ষ, অর্গাদমাজী বা হিন্দু নামধারী ঔক্লপ মজাবলী। ঔতংগা নিজেরা মন্দিরের মথাবতী কোনও পদার্থে বিশ্বাস করেন না। "আপনি না করে পূজা তপঃ করে মানা।" মন্দিরের পরিঃততা রক্ষা করা দূঃত্রে থাকুক, ঔঃগার বিনাশ সাধনই ঔতংগদের বিজয়কতন। মুঃলৈ কোনও দুরভিলক্তি বর্তমান আছে কিংবা জানি না, তবে পাকঃতা রীতিনীতির প্রতি সজ্জ প্রচাই যে ঔঃগার একটা প্রধান কারণ তথিঃয়ে বিস্ময়ঃও সজ্জৈঃ নাই।

প্রবন্ধটী সজ্জঃপে লিখিতে হইল। প্রয়োজন হইলে কোনও বিষয় হুবিঃখিত করিয়া পরিঃকার করিতে আনি সজ্জদাই প্রস্তুত আছি।



জাতির পাঁতি

(৮৮ পৃষ্ঠার অঙ্কুশিত)

ভারতীয় সমাজকে কঠিন শাসনের নিগড় পরাবার মত শক্তি সংগ্রহ করতে পারে নি। তা না হ'লে বেদের দুপন্থেই নানা গ্রাম্যগাণি সাহিত্যে কেমন ক'রে বর্ণোৎপত্তির নতুন নতুন চিত্রের মেওয়া হ'ল? আর এই সব নানা বিবরণের মধ্যে অনেক জিনিষ খুবই আশ্চর্যজনক বোধ হ'তে পারে; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ যখন বর্ণোৎপত্তির কথা বলে, বর্ণগণের নামের জন্মোৎসবে প্রথমে পাট বৈশ্বদেব নাম, আর সর্বশেষে আসে রাশ্মদেবের কথা (৫)। বাজলদেব আবার বলেন, বৈশ্বদেবের পুত্রের ব্রহ্মহটা একই (৬)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭) বলা হয়েছে—বজ্রের নানা কার্ণ ও বজ্রের তার নানা বর্ণকে দেওয়া হ'ত; যদি এক বর্ণের লোক, নিজ-বর্ণের কর্তব্য না ক'রে অন্য বর্ণের কর্তব্য করে, তবে সে নতুন বর্ণে ভিড়ে যেত। বর্ণের সনাতনত্ব নিয়ে যে একেবারে ছিন্মিনি খেলা হ'তে সেল! আবার একবার পরিষ্কার প্রমাণ বোঝেই (৮) মেলে—গুহু ঋত্বিরেরা নর, বৈশ্বদেব পূর্ণায় বজ্রের পুরো-হিতের পথে ততী। আর পুরাণও তাই যে'নে নিয়েছে (৯)—বৈশ্বদেব পূর্ণায় ময়রুতী গৃহি ছিলেন। কেনে ও বৈদিক সাহিত্যে বড় বড় ঋত্বির গৃহির পরিচয় তো হুড়ি হুড়ি পাই—মৈবালি, অজাতকম্ব, মীলক, মূলত, জনক (১০) প্রভৃতি; এঁদের আবার সবাইয়ের

ব্রাহ্মণ শিল্প ছিল। উপনিষৎ-শাস্ত্র—যার চেয়ে বড় পুঁর্ন কব্ধার জিনিষ আর আমাদের নেই—তা তো নিত্যসিই ঐ ঋত্বিরবিশিষ্ট বলা হ'য়েছে। এই যে ঋত্বিরের নাম কব্ধম, এঁদের কুটীবারাই পরিচয়—উপনিষদ।

বৈদিক সাহিত্যে যারা পণ্ডিত তাঁরা বলেছেন, মোটামুটি বেলে বর্ণেরই উল্লেখ পাই, তা হ'তে জাতি-বাসের পরিচয় পাই না, তাও পাই বিভিন্ন শ্রেণীর উল্লেখ মাত্র (classes not castes), আর সেই শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের এক শ্রেণী হ'তে অন্য শ্রেণীতে গমন করা নিত্যসিই সম্ভব। তাই পানে, আচারে, ক্ষেপে, আবার-বিবাহে, জাতিবাদের জাতিবাদের কাঠিকের পরিচয় পাই না। বিবাহ হ'ত বৃত্তীভনের (৮৬, ৮৭, ১১২), আর তাঁরা প্রাণীভনের মধ্য হ'তে পছন্দ ক'রে স্বামীভরণ করতেন (৮৬, ১১২, ১১৩)। নবীনতম কথা-সাহিত্যের অনেক নাট্যকার প্রাচীনতম বেদেতে লক্ষ্য পাই। ঋত্বির এমন কি পুত্র কুল-বিশেষে পৌরুষিত্য লাভ কর্তে সমর্থ হ'ত (Indo-Aryan Races—Chanda)। সে কথা পরে আবার উঠবে। বৈদিক যুগে স্বামীর মৃত্যুর পর অগ্রবরণ 'ব্রাহ্মণ' বা ঋত্বিরদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, কিন্তু আর্থা-গৃহিরা তা অগ্রহাশ্রয়ন করতেন না। কপাটা গুহুত একটু আশ্চর্য লাগতে পারে, রাজকালকার হিন্দুধর্মের তিনটিতে ভ্রাতৃত্ববাদের খুব বড় একটা জিনিষ, আবার বৈদিক ধর্ম-ক্রিয়ার পদার-প্রতিপত্তি তাতেই অনেকটা লোপ পায়।

ব্রাহ্মণ শব্দের 'ব্রাহ্ম' হিসেবে ক'বে'বে ব্যবহার হ'য়েছে, কিছুতেই মনে হয় না। ম্যাক্সমুলার দেখিয়েছেন যে, মাত্র ৮ বার প্রথম বর্ণ হিসেবে ঐ শব্দটি ব্যবহৃত হ'য়েছে, আর ৪৬ বার ব্যবহৃত হ'য়েছে পুরোহিত অর্থে। পুত্র শব্দটি মাত্র একবারে ঐ পুঙ্খ-হুস্তেই ব্যবহৃত হ'য়েছে। ব্রাহ্মণদের সংধারণ নাম ছিল—ঋত্বির, আর জনসাধারণকে বলা হ'ত বিপ।

৪। সর্ব-দেব: ত্রাশ্বাং যৈব পুত্রে: তথ্যোগ জাত: বৈদ্য: সর্বাধ্ব:। যুধির্দেব: ঋত্বিরদ্যাঃ:গোবি: দ্যাকব্যাঃ। ব্রাহ্মণায়া: প্রণতি:।—তৈত্তিরীয়, ৩:১২:১২

৬। বহুবর্ণভিরম্বয়ত পূর্ণাধ্যায়:জাতায়য়োরাতে অধিপতী আশ্রম।—বাজলদেব, ১:৪০

৭। ৮৬—১০:১৮:৪। বাত (২:১০) কথ্যটা একটুই

৮। ৮৬—১০:১৮:৭। পরিষ্কার করে দিলাম।

৯। তে ময়রুতৌ জোতা: বৈশ্বদেবা: প্রবরা: সম:। ইত:ক-নদ্যাঃ জোতা: ময়া: বৈশ্ব বহিষ্কৃত:।—বজ্র, ১২৫ অধ্যায়

১০। সনাতন (১১:৬৬:১০) বলা হ'য়েছে—জনক ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বিশেষের অনেকবার বৃদ্ধ কর্ত্তে দেখি। এরা সবাই বৈদিক বাস-বস্ত্র কর্ত্ত। আর হারা তা কর্ত্ত না, হানত না, তাদেরই বলা হ'ত লুপ্ত ইত্যাদি—সৈনিক সব পুষা-আচ্ছাদ্য পুরোচিতের সব কাছ প্রত্যেক গুহ্য নিজেই কর্ত্তেন—আর বড় বড় ক্রিয়াকার্য্যে। Experts হিসেবে পণ্ডিতদের, ব্রাহ্মণদের, গৃহিণীদের ডাক। হ'ত। বড় বড় কবির বাপ চরিত বৈদ্য বা ছুতোয়—এখন পরিচয় পাই। কর্ত্তাকারের কর্ত্ত কখনও ছোট চ'খে দেখা হয়নি। গৃহিণী প্রার্থনা কর্ত্তেন—বীর্থাবান পুরুষের জন্য—হারা শত্রুতরী হবে।

বৃদ্ধের আবির্ভাবের আগে হ'তেই দেখি বিদ্রোহের লক্ষ্য উজ্জ্বল। এ বিদ্রোহ স্বাধীন চিন্তার বিদ্রোহ। একে বারংবার ব্রাহ্মণপ্রাণী ক্রিয়-বিদ্রোহ বলা হ'য়েছে। কথাটা ঠিক গুণ্য ভাবে সত্য নয়। কথাটা বড়ত হ'লে মোটামুটি বলা যেতে পারে—ইহা চিন্তা-ভগ্নত ক্রিয়ের বিশিষ্ট আন্দোলন। নিহক ক্ষত্র-শক্তির একান্ত বা অবিচ্ছিন্ন প্রয়োজন বৈদিকযুগেই অনেকটা ক'মে এসেছিল। সৈনিক বেঁচে থাকবার জন্যে অনন্তভাবে অস্ত্রোপাসনা কর্ত্তে হ'ত, নইলে অঙ্গা অঙ্গাণ্ড তাকে প্রাস কর্ত্ত। অনাঙ্গী-সমতা বধন কর্ত্ত তখন তার মন অল্পকে অতিক্রম ক'রে গেল। অস্ত্র-চালনাতেই শ্রেষ্ঠতা ক্রিয়ের একমাত্র পটীতা নয়; শত্রু তার মনকে ছেপে রাখতে পারেনি—তার মন তখন উঠেছে ছেপে—আর তারই বিশেষ পরিচয় উপনিষৎ-দ্বারা। বীর্থাভবে পৃথিবী যিনি ভয় করেন, সকলের স্বাক্ষর তার ধার—তিনি নিত্যন্ত অক্ষুণ্ণপ্রদিকার মত নিজের পরম পরিব্রাজ্যের তার একান্ত-ভাবে পরের চোখে ছেড়ে নিতে চাইলেন না। ব্রাহ্মণেরাও লক্ষ্যে লাগলেন। তারই পরিচয় বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণের সান্নিধ্যে পাই। ৭৭-সান্নিধ্যে একটা একেবারে নতুন জিনিস চোখে পড়ে—সমাজে বড় বর্ধ্যাঙ্গা ব্রাহ্মণের নয়, সে দাবী ক্রিয়ের। বৃদ্ধ তখন স্বর্গবাদী যেহেতা, তিনি যখন মাহুদ-বৃদ্ধ হ'য়ে-অস্বাভাবন তো

মাত্র নর্য্যবর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠবর্ণ তো ক্রিয়বর্ণ আর তার শ্রেষ্ঠ বর্ণ তো ইক্ষাকুযুগেই লুপ্ত নিতে পারেন। একটি প্রচলিত মতের পরিচয় পাই—শ্রেষ্ঠবর্ণ বলতে সেদিনে বোঝাত ক্রিয়বর্ণ। মহাবীরের জন্ম-কাহিনীতে একথা আরও পরিচয় হয়। তিনি দেবতাবাহ। থেকে ব্রাহ্মণ ধবতলন্তের বী দেবানন্দার গর্ভে উদ্ভূত হ'লেন। স্বর্গাধিপ শত্রু এ কথা জানতে পেরে খিঁটরে উঠলেন; নীচবংশে জন্মগুণ জন্মগুণ করবেন! ব্রাহ্মণী দেবানন্দার গর্ভ থেকে জন্ম, ক্রিয় সিন্ধারের বী হিন্দুয়ার গর্ভে স্থাপিত হ'ল। ক্রিয়ের তুলনায় ব্রাহ্মণকে পরিচয় নিরবর্ণ বলা হ'ল। পালি ভাষ্যগুলিতে গু:পু: ৭০০—৪০০ বৎসরের সামাজিক জীবনের সব-চেয়ে ভাল ধরার পাই—পণ্ডিতজনেরা এমন কথা বলেন। সেখানে ব্রাহ্মণকে পরিচয় বলা হ'য়েছে—হীনমতি (১১)। সে-সময়কার আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য না ক'রে পারা যায় না—কত সহজেই এক বর্ণের লোক অল্প বর্ণের বৃত্তি আশ্রয় কর্ত্ত আর তাতে কোন চৈ চৈ পড়ে যেত না, সমাজের ঠাণ্ডা চূর্ণাতি ও শত্রু সহ্যার চক্ষু ব'লে কেউ শোকার্ত্ত হ'তেন না। ব্রাহ্মণ চক্ষেন (১২) বশিক, ব্যাধ-ব্যবসারী (১৩), কৃত্তকার (১৪)। আগার-লুতার প্রচলিত নাই, তাও দেখি (১৫)। আচ্ছকের দিনের পক্ষে তারী আচ্ছা একটি কাহিনী আছে—একটি প্রাচীন বৌদ্ধ গুরে (১৬); সেখানে কথা-প্রসঙ্গে বলা হ'য়েছে—ক্রিয় উত্তরবর্ধ ব'লে, সে নিরবর্ণে (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-কর্ত্তা)। বিয়ে ইত্যাদি সব করবে, যদি কোন কারণে সে নিজ সমাজভূক্ত হয়, ব্রাহ্মণ-সমাজে তার কখনও স্থানাতাব ঘটবে না, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা নিরবর্ণ ব'লে এসব বিধের কোন স্বাধীনতা নেই, নিজ সমাজভূক্ত ব্রাহ্মণের ক্রিয়-

১১।	মাহুদ, ৪২৫৭
১২।	৪ ১৫ : ৪২২
১৩।	২২০০ : ৪১১০
১৪।	৪২৫৬
১৫।	২৩২৫
১৬।	অষ্ট-১-৭৪—বীথবিচার

সমাজে কোন দান নেই। এ সকল কথাই কিছু উন্নতির প্রয়োজন হ'ল এ জন্তে—যে, যে 'সনাতন' কপালিক (অর্থাৎ ভাব নিয়ে) বীজময় ক'রে কেউ কেউ জপ করছেন এবং অন্তকে সেই পথে বীক্ষা দিচ্ছেন তাঁরা। এ ভাবকে নানা কারণে বজায় রাখবার চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু এ ভাবকে যেন সনাতন ব'লে ম'নে না ক'রে ন।

আমার বিদ্যাল তাঁরা।
সত্যাহুতিংহ—সত্যকেই
তাঁরা প্রজ্ঞা করেন, তাই
কয়েকটি তপাও তাঁদের
কাছে নিবেদন করছি।

* * *

শৌর্যগিক হুগ থেকে
আমরা বিশেষ ক'রে
আমাদের আশ্রয় লাভ
করি। তার পেছনের
কাণ্ড। বড় রহস্যের
কুহেলিতে ঢাকা।
শৌর্যগিক হুগের আশ্রিতে
—য হা কা বা। মহা-
ভারতকে তো বলাই
হয়েছে পক্ষম বেদ।
সেখানে গোমা-স্বমি বলা
হ'য়েছে—গ্রাম্যজ্ঞান
সবাই সহ হ'তে জ্ঞাত,
আর তাই তারা সবাই

হচ্ছে মানব (১৭)। থাকে বলা হয়েছে ধর্মগ্রাম সেই
বুধিষ্ঠিরকে প্রায় করায়, তিনি সবাইকে বুঝিয়ে
দিচ্ছেন, গ্রাম্য কাকে বলে—সত্য, দান, ঈশানি
থার আছে, 'বুডি' তাঁকেই গ্রাম্য ব'লে (১৮)।
নিজে কিছু বলবার আদেই তিনি বুড়ির ব্যবস্থা সেনে

মহাভারত—আদিশক্তি, ৭৫ অধ্যায়।

সত্য: ধর্ম: ঈশানানুগ: প্রজ্ঞা: সত্য।

নিতে চান। তাঁর দিনে 'বুডি' গ্রাম্য-সনাতন মাঝকেই
গ্রাম্য ব'লে নির্দেশ দিচ্ছে না—গুণাবিত ব্যক্তিকেই
গ্রাম্য ব'লে স্বীকার ও প্রচার করছে। পরম শাস্ত্র
ধর্মগ্রাম আবার নির্দেশ দিচ্ছেন:

শ্রী কৃষ্ণবল্লভঃ বিতে তত ন বিস্তৃত।

ন বৈ শ্রীঃ ভবন্তু প্রো ন চ গ্রাম্যো গ্রাম্যঃ।

বৈষ্ণবগ্রন্থে সর্ব গুণঃ

স গ্রাম্যঃ শ্রুতঃ।

বৈষ্ণব ভবন্তু সর্ব

তঃ পুণ্যমিতি নির্দেশে (১৯)

এখানে দ্বিধাশ্রুতাবে

রাখা দ্বিধা ধর্মগ্রাম

বুধিষ্ঠির বুড়ির মতই

ব্যবস্থা দিগেন—বর্ণ

অগ্রগত নয়, বর্ণ ব্যবহার

বা চরিত্রগত; সে-কারণে

গুণে নির্দেশ করবে জাতি,

গুণ-বর্তমানে শ্রী হ'বে

গ্রাম্য আবার গুণভাবে

গ্রাম্যই হুগ শ্রী।

পরমেশ্বরের কথা, এ

নির্দেশ তিনি সেন নাই—

প্রতিদিন বাস্তব সামাজিক

জীবনের অন্তর্ভুক্ত এই

নির্দেশ। আরও হুগ

নির্দেশ তিনি দিগেন—

বৈদ্যে অধিকার না

রঙীলা নায়ের মাঝি

(ভাটায়াল গান)

জর্জাম-উদ্দান

ও রঙীলা নায়ের মাঝি,

এই যাতে লাগায় নাও

লিগুম কথা কহা যাও গুনি।

ভাটায়াল হুগের মাথে মাথে কান্ধে গাড়ে পানি,
ও তার ডেউ লাগিয়া বায় ভাদিয়া কান্ধের কলস-পানি;

রঙীলা নায়ের মাঝি।

পুলালি বাতাসে তোমার নায়ের বাদাম গুঁড়,

আমার শাকীর অকল থৈব না ধরে,

রঙীলা নায়ের মাঝি।

তোমারনি পরাগের মাঝি ইরিয়াছে কেউ

কলী ভাসারে জলে প'থেকনি ডেউ;

রঙীলা নায়ের মাঝি।

[এই গানের ধরণবাট কোন্সে গ্রাম্য পান থেকে নেওয়া]

পাকলে কেউ কখনও গ্রাম্য ব'লে গৃহীত হ'বে
না, আর এই হুগে ব'লে দিগেন সেট প্রাচীন

বুকের নামেই স গ্রাম্য: টিটি কুটি।

(বনপক—১০ অধ্যায়)।

১১। মহাভারত—বনপক ১০ অধ্যায়ে ঐ কথার সব প্রকারের
একবারে শেষ ক'রে নেওয়া হয়েছে এই বস—

শ্রী কৃষ্ণবল্লভঃ বিতে তত ন বিস্তৃত।

ন বৈ শ্রীঃ ভবন্তু প্রো গ্রাম্যো গ্রাম্যঃ চ।

মুসলমান সন্যাসীদের পোকেরাই সন্যাসীদের নীতি গ্রহণ করতেন (২০)। সেবাদাসের মহাশয়ের নামে মহাভারতে এই নীতি বর্ণিতভাবে দেওয়া হয়েছে; ধর্মহীন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে থেকে ছাড়া ও, আবার পুত্রও ব্রাহ্মণ হয় (২১)। শতাব্দীর মহাভারতে এই কথা পুনরুক্ত হয়েছে।

মহাভারতের চরিত্রগুলির কথা উল্লেখ করা বাহুল্য; প্রায় প্রতি-ব্যক্তির পারিবারিক ইতিহাস আলোচনা করলে দেখি, আমরা ভ্রাতৃ বন্ধু বা বৃদ্ধি তার কোনই খোঁজ পাবে না। অগত্যা তাঁরাই ছিলেন সমাজের, দেশের গ্রেট পোকে, তাঁরা শুধু ব্যক্তিগত নতুন পৃথিবীতে ধর্মতত্ত্ব তাঁরাই। বুদ্ধের হ'বে তাঁদের আচারই শিল্পী আচার। আর তা যদি মানি, আজকের জাতি-প্রথার সমাজতন্ত্রের সম্বন্ধে সন্দেহ হয় না কি?

হুজি-শায়র নিত্যন্তই ব্রাহ্মণদের নিকটের কোটের কথা; তাও বার-বারে বুধে-বুধে এতবার সঙ্কট হয়েছে যে তার মধ্যে বিকৃত বচন সঙ্গ্রহ দ্রষ্টব্য, শুধু ভারতীয় সমাজের সত্যকার যে নীতি তার অবস্থিতির চিহ্ন সেখানেও মেলে; মহুর ছোড়া চর্চক ব্রাহ্মণ-বাদী মেলা নর, কিন্তু তিনিও বলেন:—

হুধবাহিতপঞ্চাননঃ বা লোকে দ্যাতব্যোবহিঃ

মেদ্যাব্যাত্যাত্যার্থাঃ সর্ব্বং তেষাং হুতাঃ।—১-১৪৪

চতুর্বর্গের সর্ব্বকর্মের সম্বন্ধে এই নীতি পালিতব্য; যদি কেউ এই স্বধর্ম-পালন না করে সে দহ্য। তাই মহুর ব্রাহ্মণকে বিধি দিয়েছেন যে এমন কি নির্ধারিত বয়সে যদি সন্তান করা না যায়, ব্রাহ্মণও ত্রাতা হন (২২)। কথাটা সরল বাস্তবতাই হ'বে যে, মহুর

ব্রাহ্মণ সমাজ মাঝেরই ব্রাহ্মণদের দাবী গ্রহণ করেন নাই। ব্রাহ্মণ বলতে মহুর কি বোঝেন—সে-সম্বন্ধে কারও মনে বিধা বাধ্যতার স্থান নেই—আর তখন ব্রাহ্মণেরই মহুর ব্রাহ্মণদের দাবী স্বীকার করেন (২৩)।

পুরাণের কথা বলছিলাম; পুরাণে তো মনে হয় যোচনাশীল পুরুষস্বত্বকে উড়িয়েই দিয়েছে। সেখানে দ্বৈতত্বের আলিই নতুন নতুন গর তন্তুত থাকি। সেখানে থেকে আসেকার কথাটি হুধুরভাবে পরিষ্কৃত হয়—বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা সমাজ হ'তে গুণবিভাসের ভিত্তি বিশেষ একটি সামাজিক ব্যবস্থা। পুরাণে আরও একটি বিষয় পূর্ণ লক্ষ্য হয়—কজির হ'তেই সর্ব্ব জাতির উৎপত্তি। পরে বৃত্তি ও গুণ অনুসারে শ্রেণীবিভাগ হ'য়েছে। মহুর হ'তে অষ্টম পুরুষ, রাজা পুরুষা ৪তে স্তম পুরুষ, শৌনক হ'তে চতুর্বর্গের দ্বৈত (২৪)। ভার্য্যের বংশ হ'তেই চতুর্বর্গের প্রারম্ভ—এমন সব অনেক কথা প্রাচীন ও আধুনিক প্রায় পুরাণেই মেলে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেই (১-১৮) পাই—বিধামিত্রের হেলেদের অনেকে হ'লেন নীচজাতি।

ভাসবত-পুরাণে ইলার ইতিহাসে পাই দ্বাষ্ট, পার্গ, তর্ধ্যাকনি, কবি, পুত্ররাসি কজিরেরা ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন; কজির রাজা ভরত ব্রাহ্মণ ভরথাককে পোতপুত্র গ্রহণ করেছিলেন, কজির রাজা নরক বৈজয় প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১০০০) পাই, দ্বাষ্টীপুত্র কবাকে গ্রেটতম কবিরা বড় কবি হ'লে নমস্কার ক'রে তাঁর শ্রেষ্ঠ স্বীকার করেছিলেন।

করাণেত-ব্রাহ্মণদের নিয়েই বা কি কথা। বায়ু পার্গের সম্বন্ধেও কেউ হ'লেন কজির, কেউ হ'লেন

২০। সর্ব্ব সর্ব্বশেষতানি জননয়ি সবা পত্যা।

বাজিহুমেযো। জন বয়সক সবা দুপায়।

ভাক্কস্রবসো দেব দ্যাক্তরঃ ন জাত্যে।

ধর্ম্মপ্রভাত্যো দিম্বহতঃ সুধর্ম্মবাহুতঃ।

সুত্রো ব্রাহ্মণত্যাঃ ব্যক্তি-অন্যদাসনপর্গ-১৪ অন্য।

২২। অত উক্কঃ ত্রয়োখণ্ডোতঃ ধ্বাক্কাসনপুত্যাঃ।

সাবিত্তীপতিত্রাত্যা। জন্মার্থবিধিত্যাঃ।

২৩। অহু—১ অধ্যায়ে ৮-১১ প্রোক্ত ভাটলকণ্যে প্রতিবর্গের কর্তব্য নির্দেশ ক'রে দিয়েছেন আর সেই কর্তব্যপালনকারী ব্রাহ্মণেরই প্রমাণ দেখি ১২—১২২ প্রোক্ত।

২৪। ভরতে আশ্রম নাম, স্তম—ব্রাহ্মণ-বিভাগী 'পাতিত' পৌতম-বুদ্ধে মহুর বাসুধের কর্তব্যের নাম দিয়েছেন—ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ একবিধ ভারতবর্ষের বহুতম কর্তব্য ভাগ পেয়েছিল। তাই ভারতীয় বৃত্তিই ভার্য্য অর্থে বৃত্তকণ্ড তাঁর বহুতম বাসুধের কর্তব্যের নাম দিতে হয়েছিল—ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণবংশ)।

গাংখ, রতনের সম্মানের হ'লেন অশ্বজিত্র, কাব্যায়নের (২৪) পূর্ণপুরুষ হ'লেন মহারাজ অগ্রজিত্র, অজানীড়ের বংশে হ'লেন প্রিয়মেধ ত্রাশ্বপেরা, অজানীড়ের সপ্তম পুরুষে মুদগল হ'তে এসেন মৌলপলা ত্রাশ্বপেরা—মাত্র স্মৃতিবহুর ত্রাশ্বপের কথাই শুনি না—বলা হ'য়েছে বৈশ্ব নাভ্যপের সম্মানের হ'লেন ত্রাশ্বপ। বহু ত্রাশ্বপ প্রেমী—আদিত্য, হারীত, বাহুত ইত্যাদির ইতিহাসের আরম্ভে দেখি ত্রাশ্বপের প্রেমীর কোন ব্যক্তি।

প্রাচীনতম বেদের দিন হ'তে আধুনিকতম পুরাণের দিন পর্যন্ত দেখা গেল বর্ণবা জাতি বলুত আজ আমরা যা' বৃষ্টি তেমন কোন Median Law এম্বেচেলে নি। সনাতন কণাতিবে-অর্থে সাধারণতঃ ব্যবহার হয়, সে-অর্থে জাতি-প্রাণা সম্বন্ধে ব্যবহার হওয়া তাহ'লে সম্ভব কি?

জাতিবাদের একদিন হয়ত কোন প্রয়োজন ছিল, কিন্তু ত্রাশ্ব তির অস্ত্র সব কিছুই সম্বন্ধেই যদি আপেক্ষিক (Relative) এই বিশেষণ প্রয়োগ চলে, তা' হ'লে তার দ্বারা কোন কোন বিষয়ে কখনও কখনও জ্ঞাপন হয় অপ্রয়োজনীয়তা। এমন কি পরীক্ষার কোন অঙ্গ, একদিন যা পূর্ব বড় সম্পদ ছিল, তাও যদি হুই হয়, সর্বোত্তম কার্য্য হয় তা বাদ দেওয়া।

হয়ত ভগবানের বাক্য ব'লে যে "চাকুর্ণাং মহা কষ্টঃ" ব'লে বিশেষ সোহাই পাড়া হয়, তার সেখানে বাদ না দিলেই সম্পূর্ণ কথাটা পরিষ্কার হয়। তাহ'লেই প্রথমার্শে পাড়িতে পারে সেখানেই গুণের—গুণকণ্ঠবিভাগঃ। গুণকণ্ঠের standardএর নামই চাকুর্ণাং—চকুর্ণ নহ। মনে চকুর্ণের উল্লেখ করা হয় নি, সঙ্গে গুণ-নির্দেশক বঙ্ প্রত্যয় যোগ করা হ'য়েছে। গুণের এই মাপকাঠি (standard) একটি মহৎ কল্পনা। কিন্তু, একথা ভুলে চলবে না—যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা মাত্র এই গুণের এবং ঐ পৰ্য্যন্তই শেষ। ভগবান সৃষ্টি করেছেন চাকুর্ণাং, কিন্তু চকুর্ণ বলুত আজ

২৪। অষ্টট হুইয়ে কথা আগে উল্লেখ করছি। তাতে কাব্যায়নের সম্বন্ধে অনেক জটিল ওজন হটাতো হয়েছে—বলা হয়েছে দারীপুত্র হ'লেন ত্রাশ্বপ। বিবরণে থেকে কয়েক পাঠ্যব্য বেরা হয়েছে।

যা বৃষ্টি তা তাঁর অভিজ্ঞত না হ'তেও পারে। যুগে যুগে দুই সমাজের নীতি ও নীতির যে কি বিপর্যাস ঘটেছে, বাংলায় শিবোমনি রত্ননাথ শিবোমনির 'তথ্যচিত্রাশ্বপ'তে তারি পরিষ্কার ক'রে সে কথা বলা হয়েছে—

"বিদ্বাঃ নিকটহরিৎকনডানে বহুদ্রষ্টে নিরটাক বজ্র হুই। মরি জঘতি কল্পনাখিনাথে রত্ননাথে মহাজাননধেব ঐ"

বিধানপণ পূর্বে একমত হ'য়ে থাকিছু হুই বা না কিছু অষ্ট হির করেছেন, রত্ননাথের কালে তার সম্পূর্ণ বৈপরীতা ঘটেছে—অর্থাৎ পূর্বে বাকে বলা হয়েছে হুই, আজ তা'ই অষ্ট, বা শিষ্ট, আর বাকে বলা হয়েছিল অষ্ট তা'ই হ'য়ে পাড়িয়েছে হুই বা নষ্ট।

আমাদের আর্থাগের অভিমানে, নৃত্যবিন্ নির্জীবানে না-নহুর ক'রে, আমাদের খবরের জন্ত, আমাদের সেহ নয়, আমাদের মনের, আমাদের ভাবার মধ্যে সন্ধান কচ্ছন, পূর্বেই উল্লেখ করেছি। 'মহা-মানবের সাগরতীরে'—অনু-আর্থাঃ ও আর্থাঃ এমন মিলন ঘটেছে, যে আজ আর এখানে আর্থাঃ অনু-আর্থাঃ ব'লে কাউকে ঢাকা যায় না। সুমের-অষ্টাং-প্রাণিড়-আর্থাঃ-মঙ্গল-শক-হু-তা তার আরও কত কি—সবাই মিলে যে তার তবর্ষ—তার পথে বাটে কমান-সেমিকোলন, বেড়া-নালা দিয়ে, কোন হুইপ্রদারে, কোন আদর্শে আমরা নশ-পরিষ্কার যত্নের হুই কাটব? কে ত্রাশ্বপ—কেন ত্রাশ্বপ—এ কথার সত্যিকার জবাব কে দিতে পারে?

আজ, একাত্ত হুইনে, নিরন্তির দুর্গমপথে, অতি গল্পটের যুগেরে—সপ্তসত্যিক বৎসরের সকল মানি, অপরায়, পাপ, দুঃখ, অভিমানে, শোক মথিত হ'তে হ'তে চরম যুগের সঠিকট হ'য়েছে; ছোট ছোট কৃত্রিম পতী, ছোট ছোট কৃত্রিম নিবেশ—সেই পরম দৌরবের যুগের আবাধনের মল্লকে দীর্ঘ যুগ পীড়িত ও নিশ্বেষিত করেছে। যে সেনে প্রতি জীব ভগবানের ঐশ্বর্য্য ব'লে, প্রতি আশ্বা তাঁ'রই বিহুতি ব'লে গুহীত, সেখানে পশ-দগিত বোহাত ত্রাশ্বপ, তার সমবাধার স্বাধী-হুই-বাধা পূত্র তাইকে—কতদিন, আর কতদিন ছবেরে ক্ষেত্রে অপরাজেয় ক'রে রাখবে?

কনকলেখা

শ্রীমদ্রামায়ণ চৌধুরী

অনেক দিনের কথা। রামরাম পক্ষের পাশে আসে অবস্থিত চন্দন, অম্বকর্ণ, সরল ও পাটলকর্ণ, নমী, অসি ও পানলতা এবং নানাবিধ ক্ষুদ্রের নিবিড় অরণ্যঃ তেজ করিয়া যে পথরেখা উত্তরানন্ত ভূমির উপর দিয়া। শক্তিমানবিশেষে গিয়াছে সেই পথ অতিক্রম করিয়া নবাবত বাল্লি পদাঙ্ক বিনা পদনির্দেশে বেগামদীর তীরে উপস্থিত হইতে পারিবে। অপ্রাপ্তবোধনা কিশোরীর মত ক্ষীণাঙ্গী, বহুসলিলা বেণার তটদেশে নগরোপকণ্ঠিত স্থিতিশাল উপবনঃ; তাহার মাত্ৰ এক দেশের প্রভিস্তি বেণা নিম্নের নিম্ন বক্ষে অর্জিত করিয়া গইতে গম্য হইয়াছে। বেণার ক্ষয়রক্তন স্থিতিশাল উপবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আর চক্ ক্রিয়াহীতে ইচ্ছা হয় না, ক্ষয়রক্ত অতিশয় যেন মৃতি পরিগ্রহ করিয়া পদদ্বয়কে তাহার দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে, পথিক নিম্নের অজ্ঞাতসারেই বীরশনক্ষেপে অগ্রসর হইতে হইতে উপবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন।

বনজলদী আত্ম উজ্জানের সর্বত্র আবির্ভূত হইয়াছেন। প্রকৃতির সহকার-মজ্জার বৃহ সৌরভ, পরমিত অশোক তরু আশ্রয়-বিহীন প্রবাদের ক্রাধ রক্তিম পুষ্প ও শুক পক্ষীর চক্ৰ ক্রাধ বক্ৰ কিংকর বর্ণবিশাল এবং মলয়ানিলে বৃহ আশ্বোদিত শুভ্র শুভ্র দ্বন্দ্ব-বদন পুষ্পভারে অবনত। মাথবীলতা আত্ম ভগবান পুষ্পাধ্বের অক্ষয়-কালের হৃদয় করিতেছে। প্রবেশ-দ্বারের অনতিদূরে উপবনের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবনসেবার পটপল্লবীপিত্তহরিতী অতিশয় বহু দৃষ্টির মতই একটি দীপিকা, তাহার উত্তর তট হইতে ফটকবিশদ জল পথায় মধ্য বেতকক্ষপ্রস্তরমণ্ডিত সোপান-শ্রেণী,—যদিগাত বসন্তোৎসবের সময়ে তুষ্করী তুষ্করীপদের শাক্যরামরচিত, নুস্বালত চরণের স্পর্শ পাইয়া উগা উৎসব-সময়ে উপস্থিত নাগরিকপদের ঐধাতাজন হইবে।

দীপিকার উত্তর দিকে অবস্থিত সোপান-শ্রেণী হইতে যে চম্পকবীথি নগ্নপোচর হয়, বিসর্জিত হইয়া সেটি ভগবান পুষ্পাধ্বের মন্দির-প্রাঙ্গণ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সেই স্থান যেখানে নানাবিধ প্রসাধনবহিঃশোভা উপভোগ্যবোধনা শৌর্যকল্পাণ স্ব স্ব প্রণয়-বিষয়ক অতীষ্টসিদ্ধির কামনার সর্বত্র আগমন করিয়া থাকেন। এই সেই স্থান যেখানে বিরহক্লিষ্টা, একবেশীধরা, বৈধনিষ্প্রাণিক। জনপদবধূষণ প্রবাসী প্রিয়ের সহিত আত্মসমাগম-কামনার সর্বত্র আগমন করিয়া থাকেন। এই সেই স্থান যেখানে বসন্তোৎসবকালে কথাকোটিগণ হরিত চাক্ষুস, হৃদয়, উদ্ভট ও নলের প্রণয়কাহিনী বিবৃতির ও বিরহী বক্ষকর্কট সঙ্গর, বহুবৎসল জলধরের যৌতাবরণ বিধক সঙ্গীতের দ্বারা প্রেমী জনের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন। মন্দিরের তিন দিক্ বেঠন করিয়া রক্তশোকে বন, কুম্ভাদ্বয়ের প্রভাববশতঃ সোহমের অস্ত্রান ব্যতিরেকেই পর্ণাপুষ্পসুতরকে বিকসিত। রক্তশোক-বনের অদূরে প্রমলিত অমিবৎ পুষ্পভাববাহী পলাশকৃষ্ণের বিস্তৃত বন, দৃষ্টিমাত্র মনে হয় সমগ্র উপবনভূমি নববধূর জায় রক্তগণের বিকৃতি। হইয়াছে। মন্দির-পট্টমানে একটি নবীন চূড়াম্ব চূড়প্রসব সম্পূর্ণ প্রস্তুতি ন। হইতেই হৃদয়বিভারদ্বারা প্রিয় অতিথি মধুকরকে নিমন্ত্রণ করিতেছে। চূড়াম্বকে নিবিড় ভাবে বেঠন করিয়া একটি নববোধনা মাধবী। চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কেহ না বলিয়া দিলেও মনে হয় যে, মধুমা উপস্থিত ও বসন্তোৎসবের সময় অজ্ঞাত নিকটবর্তী হইয়াছে।

আত্ম তিথি-পুণ্য উপলক্ষে মন্দির সঙ্গার করিবার ক্ষম মন্দির পরিচাযিকা পদবিধ। অতি প্রভাব্যেই বেগামদীরে দানার্থ গমন করিয়াছিল। প্রভাসগমন-কালে উপবন-প্রান্তে প্রেমী কুবেরবস্ত্রের প্রাণবহুণ কল্পা কনকলেখার প্রিয়সখী নাগবরীর সঙ্গে তাহার নিত্য

অপ্রত্যাশিত ভাবেই সাফাং হইল। নাগবন্দীকে এইরূপ প্রত্যবেই উপবনে সমাপতা দেখিয়া পরবিধা মনে মনে বিতর্ক করিল,—

—ইনি এখনও প্রিয়সমাপনমরহিতা বটেন, কিন্তু শৌরবর্ণও অবগত আছেন যে, প্রিয়সবী কনকলেখার পরিণয় না হইলে ইনি বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন না। এমিকে কনকলেখার অসৌক্যিক রূপরাশিই তাঁহার প্রিয়সমাপন বিষয়ে প্রতিবন্ধক হইয়াছে। তাঁহার যোগ্যপাত্র পাওয়া অকষ্টিন জানিয়া শ্রেষ্ঠ কুবেরনন্ড চোঁটার ক্রটি করিতেছেন না। কিন্তু কনকলেখার বিষয় পণ যে, রূপে তাঁহার যোগ্য পতি না পাইলে তিনি চিরকুমারী থাকিবেন। ভগবান্ প্রত্যাশিত এরূপ রূপবতী কস্তার প্রতি এখনও অগ্রসর কেন তাহা তিনিই জানেন। সে বাহাই শুভক নাগবন্দী প্রিয়সবী-বিধীনা হইয়া একাকিনী উপবনে উপস্থিত কেন জানিতে কোকুৎস হই।

প্রকৃষ্টে যথোপযুক্ত তুল্য-প্রশ্নের পর পরবিধা জিজ্ঞাসা করিল,—পৃথনীয়া কনকলেখার প্রিয়সবী কি বসন্ত-বিত্তব দর্শনার উপবনে পর্যাপ্ত করিয়াছেন?

নাগবন্দী দর্শনমাত্র তরুণীজনের আশ্রয়ল ভগবান্ পুষ্পাযুধের মন্দিরে প্রথম-কথাবিত্ত পরিচারিকা পরবিধাককে তুল্য সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এখন পরবিধার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,—

—বসন্ত-বিত্তব দর্শন করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে বটে। এমিকে উৎসব-দিবসও আগত-প্রায়। কিন্তু ভগবান্ অংগমালী প্রসন্ন হাতের দ্বারা নিম্নাঙ্গ উদ্ভাসিত করিবার পূর্বেই আত্ম আমি নিত্য স্বার্থপ্রণোদিত হইয়াই উপবনে উপস্থিত হইয়াছি। প্রিয়সবী কনকলেখা ‘ব্রহ্ম-পতি-লাভ’ তত্তের নিয়ম গ্রহণের ক্ষম আর কিংকাল মধ্যেই ভগবান্ কুম্বাযুধের মন্দিরে আসিবেন। মন্দিরাধ্যক্ষকে এবিষয়ে অবগত করিবার ক্ষম আমি প্রিয়সবীর আগমনের পূর্বেই উপস্থিত হইয়াছি।

নাগবন্দী উপবনে আগমনের কারণ অবগত

হইয়া পরবিধা বলিল,—এমিকে আহ্বান, আগনাকে মন্দিরাধ্যক্ষের সমীপে সম্মানের পণ প্রদর্শন করি।

নাগবন্দী পরবিধার প্রদর্শিত পণে তাহার পক্ষাৎ পক্ষাৎ অগ্রসর হইলেন। মন্দির-সমিধানের দ্বারা ভগবান্ পুষ্পাযুধকে সান্ত্বকে প্রণিপাত করিলেন। তারপর মন্দিরাধ্যক্ষের নিকটে বীথ আগমনের হেতু ব্যক্ত করিয়া কনকলেখার আগমনের অপেক্ষায় দীক্ষিত প্রতরসোপানমূলে অবস্থান করিবার বাসনা চম্পকবাঁধিণীকে ধীরে ধীরে সেইদিকে অগ্রসর হইলেন।

ইত্যবসরে ভগবান্ সহস্ররশ্মির সহস্রখাতার গ্রান করিয়া উপবনভূমি অপূর্ণ শ্রী ধারণ করিয়াছে। শীতাপননে বীথ কণ্ঠের পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া উপযুক্ত সময় বৃষ্টিয়াই যেন পিকরাজও দেবদাক-বৃক্ষের নিবিড় পত্রমণ্ডপ মধ্যে আগনাকে লুকাতিত রাখিয়া উচ্চ কুম্বাযুধি দ্বারা বসন্তোৎসবের পূজনা করিতেছে। কিংকাল অপেক্ষা করিতে না করিতেই নাগবন্দী দেখিলেন, পরিচারিকা মনোহারিকার দ্বারা অতুল্য হইয়া মুহুর্মুহী বসন্ত-লক্ষ্যের দ্বারা প্রিয়সবী কনকলেখা মন্দিরাভিমুখে আগমন করিতেছেন। কনকলেখা মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতেই বসন্তসবী সন্ধ্যারে উপবনভূমিতে আবির্ভূত হইয়াছেন মনে করিয়াই যেন পিকরাজ সসদয়ে মৌনাবলম্বন করিল। এমিকে মনয়ানিলের সহায়তায় প্রথমলক্ষীও অসংখ্য মাধবীপুষ্পের উপঢৌকন প্রদান করিয়া তাঁহার প্রতি বহুমান প্রদর্শন করিলেন। তখন তরুণীজনের মীল-পটু-বসন্ত-পরিহিতা কনকলেখা চরণে মরকত-মুগুর, নিতম্বে পত্ররামণি, প্রকোষ্ঠে মদির বলয়, কণ্ঠে পরিপুষ্ট মুক্তার হার, প্রত্যয়ে রত্নকুণ্ডল ধারণ ও তুলি অলকমালা মুক্তাভালে প্রধিত করিয়া দক্ষিণ হস্তে অচিরোদগত মঙ্গলচূড়মুখী গ্রহণ করিয়া মন্দির-দ্বারে উপস্থিত হইলে পৃথনীয়া মন্দিরাধ্যক্ষ কল্যাণীয়া কনকলেখার ‘ব্রহ্মে আগমন হইয়াছে ত’ ইত্যাদি তুল্য-প্রশ্ন করিলেন। কনকলেখা তত্তিপূর্বক ভগবান্ পুষ্পাযুধের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া মন্দিরাধ্যক্ষকে প্রণাম করিলেন।

তৎপর চিত্রিত কল্পের অক্ষমার্থ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

ভক্তসেহে, ভক্তবাসে ও ভক্তিসুভিভে বক্তাপোক-
গুহ, কুতুম, চন্দন, দীপ, অস্তর ও কোম বস্ত্রের
ধারা চিত্রিত কল্পের বিধিমত অঙ্কনা করিয়া
চূতমস্তার অঙ্গলি প্রদানপুঙ্ক কণোত্তম হইয়া
“নমো ভগবতে মকরশঙ্করে” বলিয়া প্রণাম করিলেন
ও মনে মনে বলিলেন,

—জগবান্ সত্মমোনে ! দাদীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া
শঙ্কর তাহার বাসনামুতপ জনবান্ পামকে তোমার
পাচট কুম্ববাণের বে-কোন একটির ধার। আহত
করিয়া সমুখে আনিয়া দাও।

তারপর রতের উপবাস-পালন সত্বে যথাবিধি
উপবেশ গ্রহণ করিয়া লম্বলম্বিকেশে মকরকেতুর
জগদ্বিজয়িনী সকারিণী পতাকার মতই মন্দির হইতে
বহির্গত হইয়া সর্বদা সহিত মিলিত হইলেন।

এদিকে মধ্যাহ্নকাল সমাগতপ্রায়। স্বর্গাসেবের
প্রথর ক্রিয়বর্ণণ হেতু চরাচর উত্তপ্ত হওয়ায়
আতপতাপিত পক্ষিফল, পতঙ্গকল, ও পবিকল্পন
বৃক্ষস্বাভাৱ আশ্রয় গ্রহণ করিবার দ্রষ্ট ইতস্ততঃ ধাবমান।
এই সময় দৃঢ়কার, কষ্টসহিষ্ণু পুরুষের লক্ষেই পথে
গমন করা রূপকর; কোমলাঙ্গী, সর্গদ্রুৎসেবিতা,
রূপমাত্রে মনভাৱা তরুণীমনের তো। কথাই নাই।
মন্দির হইতে কিম্বদে গমন করিবার পর কনক-
লেখার সুখকান্তি দ্বিগুণত নবমল্লিকার স্তায় স্মিয়মাণ
অবলোকন করিয়া মনোহারিকা নিবেদন করিল,

—ঠাকুরাদি, মন্দিরে পূজার্কনার কামে অনেক
সময় অতিবাহিত হওয়াতে এদিকে মধ্যাহ্নকাল
উপস্থিত হইয়াছে, পথে চলিতে আপনায় অত্যন্ত
রুপ হইতেছে। আমার নিবেদন, আপনি ও মাঝা
নাগবন্দী উপবন হইতে বহির্গমনের ধারের সন্নিবিষ্টিত
মাধবীমণ্ডপমধ্যে বিশ্রামসুখ উপভোগ করুন। ইত্যবসরে
আমি গৃহে গমন করিয়া হস্তিপককে সংঘদা দিতেছি,
সে বরাহিত হইয়া ঠাকুরাদির প্রিয়হস্তী বিভ্রাটককে

অনয়ন করিলে ভাণ্ডার পুত্র সুখাসীন হইয়া
বিনামূল্যে গৃহে গমন করিবেন।

কনকলেখা শিঃসকালনের ধারা মনোহারিকাকে
এইরূপ করিতে আদেশ করিয়া নাগবন্দীর পতিত
লতাগুহের অভিনুখে প্রস্থান করিলেন।

অতি রমণীয় এই মাধবীমণ্ডপ। লতামণ্ডপের
চতুর্পার্শ্বে বহুসংখ্যক শোভাজন তরু দৃষ্টান্তঃ পুষ্প
বিসর্জন করিয়া কুমিতল আচ্ছন্ন করিতেছে ও অলংকা
মধুমল্লিক। অবিরাম শুভ্রন করিয়া মধুপান করিবার
দ্রষ্ট চেলভাবে একবার কুমিত্রে ও একবার তরুশিরে
উড়িতেছে। দুইটি প্রিয়মূলতা লতামণ্ডপের ধার-
সন্নিবিষ্ট দুইটি তরুণ তরাল বৃক্ষকে শিথিল ভাবে বেঠেন
করিয়া তাহাদের শিরোদেশ পর্যন্ত উষ্ণিরাছে, তারপর
য য পুশিত অগ্রভাগকে শাখাপ্রাণাধার মধ্য দিয়া
বিদ্য। অবলম্বনে অধোমুখে প্রোদারিত করিয়া যেন মূখ
বন্ধ করিয়া প্রণয়বস্তী খণ্ডিত। নাট্যিকার মতই তরুকে
বসিতেছে,—“তোমার মত দাক্ষিণ্যহীন নষ্ট নাটকের
মুখ আর দেখিব না।”

লতামণ্ডপের উপরিভাগ রক্ত ও হৃদয়বর্ণ অলংকা
মাধবীপুষ্পভঞ্জে আবৃত হওয়ায় প্রাণালি বিচিত্র
মণিখচিত বলিয়া বোধ হয়। অভ্যন্তরে অতি প্রশস্ত
এক দিলাপট। মরকত শিলাসদৃশ ঐ মনোহর
শিলাপটে উপবিষ্ট হইয়া আতপ-শান্তির অভিজ্ঞায়ে
কনকলেখা প্রিয়মূলীর সমভিবাহারে মাধবীমণ্ডপ মধ্যে
প্রবেশ করিলেন।

লতাগুহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই কনকলেখা শিলাপটের
দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। রানি দূরীভূত হইয়াছিল
বলিয়াই হউক, মহত্ত-সমাগম বস্তাই হউক বা
মণিফল ও মরকত-বৃক্ষের মধুর শিক্তনের দ্রষ্টাই
হউক তাহার লতামণ্ডপে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে
শিলাপটে শারিঙ্গ এক অতি সুন্দর আকৃতির
কুমার নিম্নোদ্বিষ্টবাক্তির স্তায় শিলাপট ত্যাগ করিয়া
উভিত হইলেন। নাগবন্দী প্রিয়মূলীর ব্রতস্রব্ধের
অবকাল মধ্যেই লতামণ্ডপ মধ্যে এক অদৃষ্টপূর্ণ, কন্দর্পের

কুলা রূপবান্ পুরুষকে অত্যন্ত অপ্রিয়ানিত্যাবে হয়। ইনি কি স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণমাত্মক বলশ্রোত্বসব
 এইরূপে উপস্থিত দেখিয়া মনে মনে বিতর্ক করিলেন, সমাগত দেখিতা মানবসেহ ধারণ করিয়া কৃত্রণে
 —এই রূপবান্ কুমারকে নবাগত বলিয়াই মনে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অথবা কোন ছদ্মবেশী রাজপুত্র বদৃচ্ছ।



গ্রন্থ করিতে করিতে স্তম্ভ হইয়া। এই গভাবিভানে
আম্র গ্রন্থ করিয়াছেন? অথবা ইহাও কি সম্ভব
যে, প্রিয়সখীর কাতরতা সন্দর্ভে ব্যক্তিচিত্ত হনোভব
কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই এই নবীন পুস্তক ইচ্ছা এখানে
উপস্থিত হইয়াছেন? কিংবা এত বিতর্কেই বা কাত
কি? ইহার পরিচয় বিজ্ঞান্য করিলেই তো সন্দেহ
রহিত অবসর হওয়া হইবে।

নাগবন্দী মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিচ্ছেন
এমন সময়ে—“অনিচ্ছাপূর্ব্বক আপনাদের নিকট
অপরাধী হইয়াছি, অপরাধী জন অপসৃত হওয়াই
বাঞ্ছনীয়”—এই প্রকার বলিয়া পরিচয়-প্রদানের অপেক্ষা
না করিয়া নিত্যক অনিচ্ছুক ভাবেই যেন অপরিত্ত
পুস্তক গভাবিভান হইতে অপসৃত হইলেন, পরিচয়
গ্রন্থ ক্ষণ উন্নয়-প্রসূত। নাগবন্দী ভ্রাম্যপিতার স্তম্ভ
হওয়ায়ান্না বহিলেন।

গভাব্য এইভাবে কৃত্য-ব্যক্তি-সূত্র হইলে নাগবন্দী
প্রিয়সখীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, কনকলোখা
প্রসঙ্গবিভার স্তম্ভ হওয়ায়ান্না বহিলেন। কিরংকাল
পরে একটি সৈবিন্যাস মোচন করিয়া বহিলেন,—

—সখি, আমি কি অত্র দেখিতেছিলাম অথবা
এখানে সত্যই কোন কৃত্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন?
আমার মনে হইল, স্তম্ভনিবন্ধন যেন তন্ত্রাঙ্করা হইয়া
অত্র আমি এক কন্দর্পকান্তি নবীন পুস্তকের সাক্ষাৎ
লাভ করিলাম। তাঁহার সন্দর্ভমাত্র আমার সন্দর্ভ
অন্যায়ান্ধিতপূর্ব্ব এক মধুর রসে সিক্ত হইল। মনে
হইল, ইনিই সখি আমার কন্যাস্তম্ভের স্তম্ভ। এইরূপ
চিন্তা করিয়া আমি একেবারে জানহারা হইয়া পেলাম।
জানোন্মত্তের সখেই দেখি তিনি অস্তিত্ত হইয়াছেন।
সখি, আমার পদব্রজ এখনও কলিত, সের পাখ্যপুস্তকের
স্তম্ভ ভক্তভার বলিয়া মনে হইতেছে। সখি, আমি
সত্যই কোন সেহারা স্তম্ভকে দেখিয়াছি, না এটি
ভগবান্ কুস্তম্ভাধ্বের স্তম্ভামা? এ ব্যাপার ভগবান্
কুস্তম্ভাধ্বের স্তম্ভ হইলে তাঁহাকে অতি নিকর
বলিতে হইবে, কারণ—

এই পদ্য বলিয়াই বিচিত্তিত্ত। কনকলোখার
আর ব্যক্তি:স্তম্ভ হইল না, তাঁহার নয়নমূল্য হইতে
অবিরলধারে অত্র বিলিত হইতে লাগিল। নাগবন্দী
প্রিয়সখীর এইরূপ বিবদ ভাবাহবৎ সন্দর্ভে অতিমাত্র
চিন্তিত্ত ও ব্যাকুল হইলেন। অপরিত্ত পুস্তকের
পরিচয় বিজ্ঞান্য সমধিক উন্নয় কেন প্রকাশ করেন
নাই, এই ভাবিয়া এখন আপনাকে বিচার দিতে
লাগিলেন। প্রকৃত্তে তাঁহার স্তম্ভনার্থ বহিলেন,

—প্রিয়সখি, অপরিত্তপূর্ব্বক যে ভগবান্ পুস্তক এই
গভাবিভান হইতে অপসৃত হইলেন তিনি ভগবান্
কুস্তম্ভাধ্বের স্তম্ভী স্তম্ভ। নতুন স্তম্ভে স্তম্ভ নাই।
আমার বিবৃত্তাপ্রবৃত্তি তাঁহার পরিচয় বিজ্ঞান্য কর।
যটে নাই। প্রিয়সখি, আমার স্তম্ভ স্তম্ভ তোমার
“স্তম্ভ-পতিস্বত স্তম্ভ” স্তম্ভই কলপ্রদ করবে। কারণ,
সেই ভগবান্ অপরিত্ত নবীন পুস্তকের বাবহার স্তম্ভ
মনে হইল স্তম্ভনশ-প্রসূত অতিমাত্র কাতর হইয়া
নিত্যক অনিচ্ছাতেই তিনি এখানে হইতে প্রস্থান
করিলেন। তিনি অস্তম্ভ বীরে পদক্ষেপ করিয়াছিলেন।
তাঁহার স্তম্ভমূল্য মলিন, চক্ৰবর্ত্ত ও স্তম্ভক-সূত্র ও
পদমল্লী বিখ্যাত্ত ব্যক্তির স্তম্ভ হইয়াছিল। স্তম্ভবিত্ত
ব্যক্তি ব্যক্তি এইরূপ বাবহার আর কাহাতে
স্তম্ভ? আর কেনই বা না হইবে? একে স্তম্ভাতিশয়া,
স্তম্ভাতিশয়ের স্তম্ভ মোবন, মোবনের স্তম্ভ মকরকেন্দ্র,
মকরকেন্দ্রের স্তম্ভ স্তম্ভ, স্তম্ভাসের স্তম্ভ নিবৃত্ত
স্বাধীনস্তম্ভ। স্তম্ভি যে ভগবান্ ব্যক্তির নয়নপুস্তকের
অতিমাত্র হইয়াছে, তিনি পদব্রজের স্তম্ভীকৃত্ত বিবদ
হইয়াছেন স্তম্ভে আর স্তম্ভ নাই।

নাগবন্দীর আশ্রয়বাক্যই হইত বা স্তম্ভ চিত্তের
চাক্ষু্য কিরংপরিমাণে প্রসূত হইয়াছিল বলিয়াই
হইত কনকলোখা কিংবদন্তি স্তম্ভের স্তম্ভ করিয়া
নাগবন্দীকে বহিলেন,

—প্রিয়সখি, স্তম্ভি আমাকে তোমার প্রাণস্বত্ম
জ্ঞান কর, তাবৎ স্তম্ভেও স্তম্ভই জানে। যদি
একদমে তোমার ও আমার প্রাণরক্ষা করিতে চাও

তবে শীঘ্র সে অপরিচিত বৃথাপুঙ্খ বর্ণনামাত্র আমার লবণ বলাপুঙ্খক অপহরণ করিয়া প্রেমান করিয়াছেন ভীতাকৈ পুত করিবার বাবস্থা কর।

নাগবন্দী মনে মনে চিন্তা করিলেন,

—অগো, মকরপুঙ্খের কি অদ্ভুত প্রেমান! কোণার ঐশ্বর্য ও রূপের পৌরবে অহঙ্কতা, প্রেমিকুলপতি কুবেরসন্তের নবনানন্দরূপিণী প্রণয়-ব্যাপারে উপাসিনী কনকলেখা, আর কোণার সর্পনমাত্র এক অদৃষ্টপুঙ্খ, অজ্ঞাত-কুলপতি বৃথাপুঙ্খকে সামান্য রমণীর জ্ঞান প্রের্য নিবেদন করিতে সন্মুখক প্রিয়লবী!

একান্তে তিনি বলিলেন,

—প্রিয়লবী, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহে অবহিত হইব, কারণ, আশ্বপ্রাণ রক্ষার কে না প্রেষয় করে? কিন্তু কিরূপে এই দৃঢ়ত কার্য উদ্ধার করা যায়, তাহাই চিন্তা করিতেছি। পিতামাতার অজ্ঞাতসারে আমাদের পক্ষে একজন অপরিচিত পুরুষের অহঙ্কতানৈর জ্ঞত প্রেষয় করা দুসোখা ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। মনোহারিকা এতদ্রপ শুকতর ও গোপনীয় কার্যের ভার বহন করিতে সমর্থ কি না সন্দেহের বিষয়। মনোহারিকার হস্তিপকের সহিত প্রেতাপনমের সম্বন্ধ হইয়াছে, সে প্রেতাপত হইলে এ বিষয় নিশ্চিৎরূপে অবগতির হইবে। কিন্তু আমি বিবেচনা করি, মনোহারিকাকে এ কার্যের জ্ঞত নিহৃত না করিয়া আমাদের উভয়ের বিশেষ প্রেরণাধী বিভ্রমসেনার উপরে এই কার্যের ভার অর্পণ করা সমধিক উচিত।

রূপে ও ঐশ্বর্যে বিভ্রমসেনা এ নগরীর প্রেত দারবিলাসিনী। কতক বা অলৌকিক রূপের জ্ঞত, কতক বা চকুশষ্টিকলায় অসাধারণ পারদর্শিতার জ্ঞত, কতক বা অকুল ঐশ্বর্যের জ্ঞত, কতক বা মূলহন্তমান-ঈলতার জ্ঞত বিভ্রমসেনার খ্যাতি বরবিস্তৃত। এ কারণে একদিকে ধনী, বিলাসী ন্যাসিকগণ ও অপরদিকে বহু উচ্চপদারূঢ় রামপুঙ্খ তাঁহার অহঙ্কপ্রাণী, এবং রাজা দয়্য তাঁহাকে স্নেহ করেন। শুণ্ডমোড়ামক বজ্রসংখ্যক স্ত্রী ও পুংস্ব তাঁহার অহঙ্কপ্রাণী দীঘনবাসী।

নির্কাহ করিয়া থাকে। এতদ্রপ ব্যক্তি সত্য হইলে সেই অপরিচিত পুঙ্খ পাণ্ডাল-পটে দৃষ্টিয়াই হইলেও তাঁহার দৃষ্টিকে অভিক্রম করিতে সমর্থ হইবেন না।

প্রিয়লবীর এইরূপ দৃষ্টিপূর্ণ বাক্যবলী শ্রবণ করিয়া কনকলেখা নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে লতাগৃহের অনতিদূরে মহৎ-কষ্টপনি প্রত হইল। উভয় সখীই উৎকর্ষ হইয়া শ্রবণ করিলেন—
“এই দিকে, এই দিকে, ঠাকুরাণী এই লতাগৃহের মধ্যে প্রিয়লবীর সঙ্গে অবস্থিত রহিয়াছেন।” কিম্বৎকাল মধ্যেই মনোহারিকার অহঙ্করণ করিয়া হস্তিপক লতাগৃহঘারে উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে কনকলেখা ও নাগবন্দীকে অভিবাদন করিয়া “ভদ্রাহিকার প্রিয় হস্তী তাঁহাকে বহন করিবার জ্ঞত প্রস্তুত হইয়া অদূরে লতাগৃহস্থান রহিয়াছে” এইরূপ বিজ্ঞাপিত করিল। মনোহারিকা নিবেদন করিল,

—ঠাকুরাণী, আপনাদ ও আমাদের পুণ্ডরীক মাজ ঠাকুরাণী বজ্রস্ব আপনাদ অর্পণে চিহ্নিত হইয়া আপনাকে বিজ্ঞাপিত করিবার জ্ঞত আদেশ করিয়াছেন। যতি শীঘ্র গৃহে গমন করিয়া আপনি তাঁহার দৃষ্টিভার নিবৃত্তি করুন।

ইহা শ্রবণ করিয়া কনকলেখা প্রিয়লবীর প্রতি মিচ্ছায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। নাগবন্দী মুদ্র যত বলিলেন,—গৃহে প্রেতাপত হইয়া মাতার দৃষ্টিভার নিবৃত্তি করা আমাদের আত কঠব্য।

তখন মনোহারিকা ও হস্তিপকে পশ্চাত্বর্তী করিয়া উভয় সখী মাধবীমণ্ডল হইতে বহির্গত হইলেন। লতাগৃহের শ্রীল হায়া হইতে বাহিরে পরাণক করা মাত্র মনে হইল, মাধবীপুণ্ড ও চুত-মজ্ঞতার প্রতি শ্রদ্ধা করিয়াই যেন পূর্বাসেব প্রেতও কিরণমাল বর্ণন করিয়া চরাচরকে দৃঢ় করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অদূরে কনকলেখার প্রিয় হস্তী বিটাতাড়ক ষ্টক পাত্মানোলন করিতে করিতে শোভাভান কুন্দের মাধ্যম উপস্থিত একটি দৃষ্ট মকটকে শুণ্ডের দ্বারা তাকনা করিতেছে। গাজাশোলনের সঙ্গে তাহার দেহের চুই

পার্শ্বে বন্ধুর সহিত আর্থিক স্বাধীন হইতে প্রতিরুদ্ধকামিনি উৎপাদিত হইতেছে। পুরোবর্তিনী কনকলোকে বেশিয়া সামান্য কৃষিকর্মের দ্বারা বিটজাড়ক আমিনীকে সমর্থন করিল, সোকে-সমর্থন দর্শনে ঐ চই পাখাবুটট একলক্ষে পাখাবুট প্রদান করিল। হস্তিপকের ইচ্ছিতমাত্র বিটজাড়ক সমর্থন চই পদ লক্ষ্যিত ও পক্ষান্তরে চই পদ প্রদান করিয়া উপবিষ্ট হইল, মনোহারিকার সাহায্যে কনকলো ও নাগবন্দী ভাগ্য পূর্ণ আয়োজন করিয়া কনকলো আসন গ্রহণ করিলেন। তারপর হস্তিপক দ্বাৰা আসন গ্রহণ করিয়া ইচ্ছিত করা মাত্র বিটজাড়ক সাহায্যে গণ্যমান হইয়া মুদ্রাঙ্কিত উপবনভূমি অতিক্রম করিয়া হস্তিপকের নিম্নে পদে নগরভূমিতে পদন করিতে গেল।

নগরীর উপকণ্ঠস্থিত উপবনভূমি হইতে যে প্রেশর বাতাস তীব্রতা দ্বাৰা কেশবের মস্তিষ্কভূমিতে পদন করিয়াছে সেই পক্ষে মস্তিষ্কপার্শ্বে মস্তিষ্ক পদন করিয়া পূর্ণেই একটি প্রাসাদ দৃষ্টিগোচর হয়। প্রাসাদের সম্মুখে বৃহৎ দ্বার ও তদুপরি হস্তিপকনির্মিত উন্নত ভোরণ, ভোরণের উপরে বায়ুবেগে পতন পক্ষে উচ্চীরমান একটি সৌভাগ্য-পতাকা। একটি মস্তিকার মালা ভোরণের শিরোদেশ হইতে বিলম্বিত। নগরীর অলঙ্কার-স্বত্বা অতিপ্রসিদ্ধা দ্বাৰা বিলাসিনী বিভ্রমসেনার আবাস-ভবন এইটি। তীব্রতা সহস্রাব্দীর কিত্তকাল দ্বাৰা পরিচাল্য করিয়া ক্রমে ক্রমে কমদান, অট্টালিকা-সমূহের দ্বাৰা, তদুপরি ও অবশেষে পূর্ণত-পূর্ণ আয়োজন করিয়া কিত্তকাল অবস্থিত হইয়াই স্বত্বাভ্যন্তরে স্তম্ভাভ্যন্তরে অবস্থিত হইলে নগরবন্দী প্রেশর সৈকল মশালসহিত বাতাসে বর্ষিত হইবার পূর্ণেই মনোহারিকাকে পার্শ্ববর্তিনী করিয়া নাগবন্দী হস্তিপক-নির্মিত ভোরণ-বর্ষিত দ্বার অতিক্রম করিয়া প্রেশরবন্দীর কার্যব্যাপসেণে বিভ্রমসেনার ভবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশমাত্র একটা পরিচালিকা পদ প্রদর্শন করিয়া নাগবন্দীকে আমিনীর সমীপে লইয়া

গেল। বিভ্রমসেনা তৎকালে সঙ্গীতশালায় অবস্থান করিতেছিলেন, পরিচালিকার প্রদর্শিত পদে নাগবন্দী তদ্বারা প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কয়েকটি দ্বতী কতা বেণু, বীণা, মুরম ইত্যাদি নানাবিধ বাতাস লইয়া চতুর্দিকে বেতন করিয়া বহিয়াছেন, মধ্যস্থলে মদ্যময় মহাধ আসনে বিভ্রমসেনা উপবিষ্ট। তাঁহার ও সহচরীবর্গের উচ্চ অলঙ্কারে ও নানা অলঙ্কারের দ্বাৰা ককট অশূন্য শোভা দ্বাৰা করিয়াছে। স্বতঃপ্রবাহিত মন্যনিলকে বৈজ্ঞান্য-প্রদান্য সঙ্গীতশালায় কটক-নির্মিত দ্বাৰা-দ্বাৰা কলপূর্ণ দ্বাৰা-দ্বাৰা দ্বাৰা বহিয়াছে ও একপার্শ্বে বক্তিত দ্বাৰা-দ্বাৰা হইতে উদ্ভূত দ্বাৰা ও কালান্তর দ্বাৰা কলপূর্ণ পরিচাল্য। ককটের ভিত্তিমায়ে বিভ্রমসেনার স্বত্বাভ্যন্তরে কলকথানি চির।

নাগবন্দী কলকথায় প্রবেশ করামাত্র তাঁহারকে সপ্রেশর আলিঙ্গনের দ্বাৰা অভ্যর্থনা করিয়া দ্বাৰা পদদেশস্থিত কলক-মালা তাঁহার পদদেশে দ্বাৰা করিয়া দ্বাৰা পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া বিভ্রমসেনা দ্বাৰা-দ্বাৰা কলপ-প্রদান্য করিলেন। তখন নাগবন্দীর নির্দেশ-ক্রমে মনোহারিকা দ্বাৰা স্বত্বাভ্যন্তরে হইতে একটি দ্বাৰা-দ্বাৰা প্রদান করিয়া নাগবন্দীর দ্বাৰা অর্পণ করিল। কনকলোকে অশূন্য-দ্বাৰা দ্বাৰা ঐ পটিকাটি নাগবন্দী, "প্রেশরবন্দী যে স্যাম্য প্রদান্যগার প্রেশর করিয়াছেন সেটি প্রদান কর" এই বলিয়া বিভ্রমসেনার প্রদান্য হইতে দ্বাৰা করিলেন। কনকলোকে প্রেশর প্রদান্যগারের বক্তবন্দীর করিয়া বিভ্রমসেনা পটিকা উদ্ভাচিত করিয়া তদ্বাৰা-দ্বাৰা বক্তবন্দী প্রদান্য ও পদদেশে প্রদান্য কলকবন্দী, তদ্বাৰা-বীটিকা, চন্দন, কলক, অলঙ্কার ইত্যাদি বিবিধ অলঙ্কার-দ্বাৰা প্রদান্য করিয়া দ্বাৰা-দ্বাৰা সহচরীবর্গকে প্রদর্শন করিলেন। কিত্তকাল নানা বিবিধ বিবিধ আলোচনের পর দ্বাৰা আসন-প্রদান্য দ্বাৰা করিতে অলঙ্কারী হইয়া নাগবন্দী ইন্দ্রের দ্বাৰা বিভ্রমসেনাকে দ্বাৰা করিলেন যে,

সহচরীবর্গের সেই কক্ষ ত্যাগ করা আবশ্যক।
বিত্রমসেনা। তাঁহার অভিজ্ঞায়াত্ম্যবাহে সহচরীগণকে
বিশ্রাম গ্রহণের জ্ঞতা আসে করিলেন; সহচরীগণ ও
মনোহারিকাও কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল। এইরূপে
সদীতশালা তৃতীয় ব্যক্তি-বর্জিত হইলে নাগবল্লী
প্রিয়সবী কর্তৃক “হৃদয়-পতিলাত ত্রুট” গ্রহণ করা
হইতে বিশ্রামার্থ লজাবিতানে গমন, তথায় অপরিচিত
পুরুষের সহিত লাক্ষ্য ও তাঁহাকে দর্শন করিয়া
প্রিয়সবীর ভাবান্তর, অপরিচিত পুরুষের অত্মদান ও
প্রিয়সবীর কাতরতা ও ভাবাহুবন্ধ ও স্বস্তা তাঁহাকে
আবশ্যকরণ পর্য্যন্ত ভাবং সুভাষিত বিত্রমসেনার প্রবণ-
পোচের করিলেন। তারপর বলিলেন,

—প্রিয়সবীর কনকলেশের আরম্ভ হইতেই বেদ্রপ
প্রকাশ দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয় অবিলম্বে যোগ-
নাশির বাবস্থা না করিলে তাঁহার জীবিতাশা থাকিবে
না। তাঁহার জীবন গত হইলে এক সঙ্গে তাঁহার
যেহময় শিতামাতা ও এই ব্যক্তির জীবনও গত হইবে।
এতগুলি প্রাণীকে অকাল-মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা
করিবার উপায় একমাত্র তোমার হস্তে, এই বিবেচনায়
এখানে উপস্থিত হইয়াছি। এখন আমাদের প্রতি
তোমার ক্ষমতাবিশিষ্ট প্রণয় বৈশিষ্ট্য তোমাকে চালনা করে
সেই পথ অবলম্বন কর।

নাগবল্লীর এই বিবরণ প্রবণ ও কাতর ভাব
মবলোকন করিয়া বিত্রমসেনা, “অসীম প্রভাবশালী
মকরকেতুর জয় হউক” এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া
ভগবান্ পুষ্পাঙ্ঘ্রের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন ও তৎপরে
মুহূর্ত্ত করিয়া বলিলেন,

—সবি, প্রণয়-ব্যাপারে বৈধায়া হওয়া হৌননের
ধর্ম, স্তম্ভতা প্রিয়সবী কনকলেশা সহজেই ব্যাকুল
হইয়াছেন। যেহ অস্তিত্বই প্রথমে চিন্তা করে, একমাত্র
তোমরাও অহিত আশঙ্কা করিয়া কাতর হইয়াছ।
সে বাহা হউক কনকলেশা আমার দর্শনের প্রণয়ভাষন,
তাঁহার প্রয়োজন সামর্থ্য আমি অবশ্য আত্মনিয়োগ
করিব, ভগবান্ মকরকেতু আমার সহায় হউন।

কিয়ৎকাল এবিধে কি কতবা জ্ঞাতা সাপোচনার
পর বিত্রমসেনা নাগবল্লীকে এই মধ্যে উপদেশ দিলেন,
কনকলেশা চিত্রকণ্ঠে অসাধারণ পারদর্শিনী, এবিধে
তাঁহার ব্যাতি বহুবুর পর্য্যাপ্ত প্রচারিত হইয়াছে। তিনি,
যে অপরিচিত পুরুষ বিনামুখ্যভিত্তে তাঁহার জগৎ অপরূপ
করিয়াছেন, তাঁহার একটি প্রতিভুতি অস্তিত্ত করিয়া
আমার হস্তে প্রদান করিলে আমি আমার ধাতীকতা,
অস্তিত্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী চতুরিকার নিকট উঠা
দিব। চতুরিকা মনসাধকের অধীন সোণ ও
হাসিকগণের নিকট নগরস্থ ভাবং শাসনিন্যাসে ঐক্য
কোন নবাগত আছেন কি না ও ব্রহ্মধাক্ষের নিকট
মগরে ঐক্য-আত্মত্বিবিধি কেহ আগমন করিয়াছেন
কি না অত্মদান করিয়া সে-বাস্তব পরিচয় ও বাসস্থান
আবিষ্কারের জ্ঞতা সচেত হইবে। কনকলেশা আমার
উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া আশাশিত হউন, আমার
হইয়া এই কথা তাঁহাকে বলিবে।

নাগবল্লীকে এইরূপ পরামর্শ প্রদানান্তর বিত্রমসেনা
একটি রত্নভিত্তি জ্বর্ণ-মহুয়া মগধ বহুগুণ, তাদৃশ-
বীটিকা ও চন্দ্রমাসি অঙ্গলেশন-হ্রদ রক্ষা করিয়া বীর
অমৃতী-মুদ্রার জ্বর্ণ-মহুয়া মুদ্রিত করিয়া কনকলেশাকে
প্রণয়োপহার স্বরূপ দিবার জ্ঞতা ধাতীকতা চতুরিকার
হস্তে তাহা অর্পণ করিলেন; চতুরিকাও নাগবল্লী ও
মনোহারিকার সমভিঘায়াহে বিত্রমসেনার ভবন হইতে
বহির্গত হইয়া প্রেঙ্কী কুবেরণন্তের গৃহাভিমুখে প্রস্থান
করিল।

উপস্থিত শুকর নিকট কনকলেশা বিশিষ্ট বংশের
কস্তাধারের প্রয়োজনীয় মুতা, মীত, বাঘ ও চিত্রকলা
দিকা করিয়াছিলেন; কিন্তু এই সকলের মধ্যে চিত্রকলায়
তিনি অনন্তসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করায় তাঁহার
শুকর ঘণ্টোরাগি বিশেষরূপে বহিত্ত হইয়াছিল।
কারণ, যেখের সলিল যেমন সাগরস্থিত তক্তিতে পতিত
হইলে মুক্তারূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ দিককের শিল্প
সংগঠনে অর্শিত হইলে গুণাত্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি, অপরিচিত নবীন পুরুষ

যে একবার মাত্র স্নানকালের ক্ষুদ্র তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া তাহার মনে কুমারীজন-বিক্ষুব্ধ ভাব সঞ্চারিত হইবার কারণ হইয়াছিলেন, তাহার প্রতিষ্ঠিত অধিত্য করিয়া অগ্নি বিনমসেনার হস্তে প্রণাম করিলেন। কিন্তু কনকলেখার এই আশঙ্কা বস্ত্রিকা-লেখন-নৈপুণ্যই বর্তমানে অভাববীর্য রূপে তাহার অতিমাত্র বেশের কারণ হইল; ঐহাকে একবারমাত্র দেখিয়াছিলেন চিরমৃত হইয়া সেই ব্যক্তি বহু পরিমিতের জ্ঞান অহুজাবিত হইলেন, একত্র চিরপট্টী ছন্দরের আশাসকর ন। হইয়া অগ্রসরিত বিরহ-বাথাকে অধিকতর সঙ্গীত করিয়া তুলিল।

২

উপনয়ন, প্রত্নসুগন্ধি। মুক্তকী বেনা ও তাহার তটমণ্ডিত উপনয়ন আশ বসন্তোৎসব উপলক্ষে অপরূপ সৌন্দর্য্য করিয়াছে।

ভগবান্ কুম্ভমাছুধের আরাধনার নিমিত্ত কুম্ভমূর্ত্তবর্ষে রচিত বহু পরিধান করিয়া, কর্ণে কর্ণিকার ও অলকে অলোকশোভন অশোক ও নবমরিকা, গামিধরে নৃপাল-বলয়, কণ্ঠে দুতামালা ও অলঙ্কার-রচিত চরণে কিংকরক নুপুর ধারণ করিয়া সহকার-মন্ত্রীর সহিত মৃত্তিমতী বৌদন-জীর জায় কুমারীসকল; কুম্ভমাছুধরিত বসে বসে আচ্ছাদন করিয়া অশ্বমেধে কাশীদাম, বসে শেতচন্দন-লিগুহার, বাজতে মণিময় অম্বদ, প্রবণে তালপত্র আভরণ, কেশকলাপে কুবক ধারণ এবং নৃমণ্ডলে শোভেরেণু বিলেপন ও তিলক রচনা করিয়া রক্তাশোকের শুদ্ধ হস্তে ললিতবনিতাঙ্গ; দুতামালাবধ কবরী, নন্দন অম্বদে, অম্বদ লাফা ও মণ্ডে রচিত করিয়া মধুপানে মত্তা সুবর্ণ-মুগ্ধক-হস্তে বিলাসিনীসকল এবং মত্তপানে অলসনয়ন, নৃত্যপরাঙ্গ, প্রবণে কুণ্ডল, বাহ ও কটিলেপে স্বর্ণলঙ্কার ও বসে মণিময় হার ধারণ করিয়া, উদ্যম হস্ততাল শব্দের দ্বারা চতুর্দিক্ প্রতিক্রমিত করিয়া তরুণ নাগরিকজন উপবনে আশ্রয় করিয়াছেন।

ভগবান্ পুশ্যাহুধের মন্দিরসমীপে মধুর উদক-বাথ হইছে। প্রথমে প্রাক্ত-কবিরচিত মধুর বিশলীখণ্ডে পাহিতে পাহিতে বিলাসিনীদগ্ধ মন্দিরভাঙরে প্রবেশ করিয়া আবার ও কুম্ভমাছুধের দ্বারা ভগবান্ কুম্ভমাছুধের অর্চনা করিলেন। জগদ নগর-কবি-প্রথিত মধুর ললিতপদাবলীবদ্ধ পাহিতে পাহিতে বনিতাঙ্গ মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পীঠদেশে করত রক্তাশোকের শুদ্ধের দ্বারা ভগবান্ কুম্ভমাছুধের অর্চনা করিলেন। তখনকার কল্পাঙ্গ রাঘবকবি-প্রথিত কামমেঘের সুললিত স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও স্তোত্র পাঠান্তে করত সহকার-মন্ত্রীর দ্বারা ভগবান্ কুম্ভমাছুধের অর্চনা করিলেন। এইরূপে অর্চনা সমাপনান্তে, তলুলকুম্ভবলিবিহারকল্পা কল্পাঙ্গ পূর্ণে দ্বাং নানাবিধ আলিঙ্গনে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন সেই মন্দিরপ্রাঙ্গণে তাবৎ স্ত্রী ও নাগরিকদগ্ধ সমবেত হইলেন। তখন রাজ্যঃপুত্রিকাঙ্গ-প্রেরিত অধ্যাপি বহন করিয়া উচ্ছ্বসেধারিণী চৌসগ মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল এবং মন্দির-পরিচারিকা পদ্মবিহার নির্দেশক্রমে মালাগ্রন্থ ও শেখরকাপীড়-বোজন-বিভাঘ্য পারদধনী বেশবধগণ পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে ধূপের ও আভরণাদি আনয়ন করিলে স্ত্রী ও পুরুষগণ সকলেই তাহা গ্রহণ করিলেন। তখন, “সেব, এই দিকে, এই দিকে” — এইরূপ বাক্য সকলের কর্ণপাত্রে হওয়াতে উপব-সমাজ উৎকর্ষ হইলেন। অকস্মাৎ বেজারী প্রতিহারি-গণের সতর্কবাণী নিমজ্জিত করিয়া দুরম, বেণু, বীণা ও করতাল-স্বনিতে চরাচর মুগ্ধিত হইল ও বৈতালিকদগ্ধ তাবদ্বয়ে ভূপতিয় স্ততিপাঠ করিতে লাগিল। সপারিধ্য ভূপতি ক্রমশঃ অগ্নির হইয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া সততি অর্চনার দ্বারা ভগবান্ কুম্ভমাছুধকে কুট করিয়া উৎসব-সমাধে আসন গ্রহণ করিলেন। তখন প্রতীকমান অশ্বমেধী ভূপতি ও বৈবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া পুশ্যহুস্তে পর সন্ধান করতঃ সুললিত প্রহারে তাহাদের সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। নৃত্যপরাঙ্গ

জনমগণী তখন পরস্পরের প্রতি নিকিপ্ত আদির ও কুচুমের খারা এবং বিলাসিনীসকলের চম্পকিত পঙ্ক-কোম্পারিত কুচুম ও চন্দনসেবিত সুগন্ধি জলসেকের খারা এককালে শীত ও শোহিতবর্ণ ধারণ করিলেন।

গৃহীত-বসন্তোৎসব-বেশা নাগবল্লী উৎসব-গোষ্ঠিতে যোগদান না করিয়া চিন্তাকুলচিত্তে একাকিনী উপবনস্থিত জনমমারোহ মথো ইত্যন্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন; বিশিষ্ট অঙ্গরাগ-মল্লের সুবাসিক নাগরিক-গণ কর্তৃক অভ্যর্ষিত হইলেও তাঁহার বদন-মণ্ডল প্রোক্ষিতা প্রাপ্ত না হইয়া অধিকতর গম্ভীর ভাব ধারণ করায় মনে হইল ছাত্ররস তাঁহাকে এককালে পরিত্যাগ করিয়াছে। দিগ্ভ্রাতার জায় তিনি নিশূন্যভাবে ঘরতর ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে “প্রিয়সবী নাগবল্লীর কৃপণ ত,” এইরূপে সম্বোধিতা হইয়া চমকিতের জায় ধূমিকেশপ করিয়া চতুর্বিদ্য। কর্তৃক অল্পশূন্যতঃ বিভ্রমসনাকে অবলোকন করিলেন। প্রেত অঙ্গরাগ ও উচ্ছল রূপের প্রভায় স্ফারিণী আলোকনিধার জার প্রতীয়মান। বিভ্রমসেনা। উৎসব-সমাজভিত্তিবে অগ্রগত হইতেছিলেন, নাগবল্লীর সাক্ষাৎ হওয়াতে কনকলেখার মনোব জিজ্ঞাসা করিলেন। বিভ্রমসেনা কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া নাগবল্লী মনে মনে বিতর্ক করিলেন,—“গত কয়েক দিবসের মথো এ ব্যক্তিও প্রিয়সবীর রোগপাত্তির বিধয়ে কোনরূপ উপায় বিধান করিতে সমর্থ হয় নাই। অন্তও কোনরূপ প্রতিকার সম্ভব হয় নাই, তাহা এই সন্দেহ-জিজ্ঞাসা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। বিভ্রমসেনার উপর অতিশয় নির্ভর করিয়াই আমি প্রিয়সবীকে এ কয়দিবস যৈষ্যাবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছি, আশ কি আশাস দিয়া তাঁহার প্রাপককার ব্যবস্থা করিব? একান্তে বিভ্রমসেনাকে বলিলেন,

—সখি, কনকলেখার কথা আর তোমাকে কি বলিব? নিতান্ত প্রাণের দ্বায়েই তাঁহাকে পরিত্যাগ

করিয়া আমি উৎসব-সমাজে উপস্থিত হইয়াছি। চিত্রপট্টে স্বগত্রে তোমাকে প্রধান করিয়া গুচে প্রভোগমন করিয়াই প্রিয়সবী অধীরা হইয়া পড়িলেন; পরদিবস সন্ধ্যা অতিবাহিত হইলে চতুর্বিদ্য। কস্তাক্তঃপূরে প্রবেশ করিয়া বদন বিজ্ঞাপন করিল যে, নগরে কোন আশ্রম, মঠ বা পাহলিবাসেই চিত্রপটে অঙ্কিত ব্যক্তির সহিত কিকিছাত্ত লাপ্ত আছে এরূপ কোন পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ হয় নাই, তখন হইতে প্রিয়সবী শব্দাগ্রহণ করিয়াছেন। বিস্তারিত গুহতর সম্ভাপে প্রিয়সবীর সেহ ওত কেতকী পুষ্পের মত দূর হইয়াছে, তাঁহার প্রভাত-কালীন কনলের জার সুন্দর ও সহায় বদনমণ্ডল ম্যান হইয়া নিয়াছে। দিবসের অবিকালে সময়েই তিনি কস্তাক্তঃপূরস্থিত চন্দনলতা-কূলে অতিবাহিত করেন। পরিচারিকাগণ কস্তাক্তঃপূরে চন্দনগণিলাতলটিতে বে নবকলীপাত্তের শব্দ। রচনা করে, প্রিয়সবীর পাত্তসম্ভাপে অন্তকাল মথোই উহা শুদ্ধ হইয়া বিবর্তিতা প্রাপ্ত হয়। বিদিত ও ভীত হইয়া তাহার শব্দবাতে কর্পূর, চন্দনরস ও কয়লীর দল আনয়ন করে, পত্রপত্রের খারা ব্যঞ্জন করে, কখন বা জুহুরের কষ্টপাথেরে মত আশ্রনলিনীবল তাঁহার বক্ষোপরি রক্ষা করে। কলতঃ অতিকষ্টেই তাঁহার ও কস্তাক্তঃপূরস্থিত পরিজনকর্ণের কালযোগন হইতেছে।

নাগবল্লীর প্রদুখ্যৎ কনকলেখার এই প্রকার বিবম অবস্থার বিবরণ অবগত হইয়া বিভ্রমসেনা—“হায়, বিরহাবস্থা কি কষ্টজনক!”—এইরূপ বলিলেন। তারপর নাগবল্লীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

—সখি, এই বসন্তোৎসবের সনাতন রীতাহুদারে আমি উৎসব-সমাজাধিষ্ঠিত হুপতিক অভিবাদনার্থ গমন করিতেছি, কিংকাল মথো প্রভোগমন করিয়া তোমার সহিত পরামর্শ করতঃ এ বিধয়ে ভারী কর্তব্য অবধারণ করিব, তুমি দীর্ঘিকার সন্নিকটে বা মাধবী-মণ্ডল মথো অবস্থান কর।

নাগবল্লীকে এইরূপে আশ্বাসিত করিয়া বিভ্রমসেনা

ভগবান্ শূন্যাত্মের মন্দিরাভিযুখে অগ্রসর হইলেন, তাখুল-খৌটকা, পুশমালা, আবির ও কুচুমতাও বহন করিয়া ধাত্মীকত্তা তাঁহার অঙ্গুলগ্রন্থ করিল।

মন্দির-প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত গমন করিবার পূর্বেই উদ্যমে চক্করীঘণনি, মস্তশ্যানে মস্ত নৃত্যপরাশর দ্বী ও পুস্তকগণের ধরাবক্ষে নির্দয় পাদপ্রহার-পঙ্ক, হুমধুর সঙ্গাত ও বাজ্যফনি এবং অবিরাম নিকিণ্ড আবির ও কুচুম-চূর্ণের দ্বারা শূন্যমণ্ডলের রক্তিমাতা এই সকলের দ্বারা উৎসব-সমাজ উত্তমরূপেই হৃদিত হইল। বিভ্রমসেনা উৎসব-সমাজে উপস্থিত হইয়া প্রথমে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া মকরকেশভনের উদ্দেশে আবির ও কুচুমচূর্ণ নিক্ষেপ করিলেন, তারপর “গেবের বিজয় লাভ হউক” এই বলিয়া ভূপতিকে প্রণাম করিয়া নবমল্লিকার মালা, কুকবক ও রক্তাশোকের শেখরক ও মাণ্ডিক, আবির ও কুচুম-চূর্ণের দ্বারা তাঁহার ও বেদীর অর্চনা করিলেন। ভূপতি সঙ্গাত বসনে শূন্যনির্মিত পিরোভূষণ, কঙ্কণ, হার, কাঞ্চীদাম ও নুপুর উপহার প্রদান ও তাখুল দান করিয়া তাঁহার প্রতি বহুমান প্রদর্শন করিলেন।

তখন সেব-প্রতির হইয়াই হউক বা যে-কারণেই হউক তাঁহার দৃষ্টি ভূপতির দক্ষিণপার্শ্বে গুণ্ডীতালন সামাজিকগণের মধ্যে এক অপরিচিত পুরুষের উপর পতিত হইয়া সেই দ্বানেই এককালে নিবল হইল। ক্রমে তাঁহার ক্ষয় বিষয় ও সম্বন্ধের দ্বারা অতিভূত হইল। প্রয়োজন-হলে ভূপতির সন্নিধান হইতে কিয়দূরে গমন করিয়া চতুর্দিককে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন,

—চতুর্দিকে, ভূপতির দক্ষিণ পার্শ্বে বিশিষ্ট সামাজিকগণের মধ্যে উপবিষ্ট এক মনোহর আকৃতির ব্যাপুস্কব রহিয়াছেন, তাহাকে দেখিয়া আমার চিত্ত বিবদ সংশয়সাগরে নিপতিত হইয়াছে। এই ব্যক্তিকে পূর্বদৃষ্টের জ্ঞান মনে হয়, কিন্তু নিঃসন্দেহে ইনি অদৃষ্টপূর্ব। ইনি উত্তমদয় পুরুষগণের মধ্যে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু অপরিচিত হস্তরূপে এই নগরীতে নবাপত্য বটেন। আমার মনে হইতেছে,

ইনিই বেধ হই কনকসেখের চিত্রপটে দৃঢ় ব্যক্তি। তোমাদের কয়েকদিবসব্যাপী অতিপন্ন পরিভ্রমের দ্বারা দ্বাধা সত্ত্ব হই নাই, মকরকেশভনের সত্ত্বস্ব নির্দেশ-ক্রমে আজ কি অনায়াসেই তাহা সত্ত্ব হইবে? তুমি কোন ছলে নিকটে গমন করিয়া উত্তমরূপে নিরীক্ষণ কর, অথবা সেই চিত্রপটটি যদি তোমার নিকটে থাকে তবে লক্ষ্যেই সকল সম্বন্ধের নিরাস চইতে পারে।

দ্বামিনী এইরূপ নির্দেশ করিলে চতুর্দিক। কাণ্য-বাণশ্রেণে সামাজিকগণের মধ্যে গমন করিল ও সেই অপরিচিত পুরুষের সন্নিধান উপস্থিত হইয়া একবার মকলে আশ্চর্য্যিত প্রতিদৃষ্টির ও একবার অপরিচিত পুরুষের প্রতি দৃষ্টিনিরীক্ষণ করিয়া অতিপন্ন প্রকৃষ্টচিত্তে প্রজ্ঞাপত্য হইয়া নিবেদন করিল যে, অপরিচিত পুরুষ ও পুণ্ডরীক কনকসেখা কর্তৃক চিত্রপটে বিস্তৃত পুণ্ডরীক অস্তিত্ব ব্যক্তি, ইহা এতদ্বন্দ্ব নিঃসংশয়িতরূপেই প্রমাণ হইল। ধাত্মীকত্তার দ্বখে এই কথা প্রবণ করিয়া বিভ্রমসেনার চিত্ত বিমল আনন্দে পূর্ণ হইল, তাঁহার দ্বখ-কাণ্ডি অনির্জনিতীয় জী দ্বাধন করিল, চতুর্দিক।ও দ্বামিনীর সেই হৃদিত মুখরূপি দৃষ্টে দ্বাধন জীবন সার্থক মনে করিল।

তারপর কথঞ্চিৎ আশ্ব-সংবরণ করিয়া বিভ্রমসেনা ধাত্মীকত্তাকে বলিলেন,

—চতুর্দিকে, তুমি সর্বা নাগকল্পীর নিকট গমন কর, তাহাকে আমার বিশেষ নির্জন বিজ্ঞাপন করিয়া বলিও যে তিনি বুদ্ধত্বমাত্র কালক্ষেপ না করিয়া কুবেরগন্তের ভবনে গমন করেন ও সর্বা কনকসেখাকে উৎসব-বেশে সন্মিত করিয়া এই সমাজে আনয়ন করেন। তাহাকে আরও বলিও—মকরকেশভু দৃষ্টি পরিগ্রহ করিয়া অস্ত উৎসব-দ্বানে সন্মাপান কর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছেন।

দ্বামিনীর আদেশক্রমে চতুর্দিক। নাগকল্পীর অঙ্গলজ্ঞানার্থ প্রদান করিলে বিভ্রমসেনা পুনরায় ভূপতি-সকাশে গমন করিলেন। মন্দিরপ্রাঙ্গণ তখন

বিলাসিতাপ্রণেয় করতঃ পূজ্যকোম্পানিত্ত বারিহিত আশ্র
ও নৃত্যপরাশ্রয় নাগরিকগণের নিরতর পরমর্দনে
কর্মাক্ত এবং মনোহরুপ নৃত্যকারী বী ও পুন্ডরগণের
পরম্পরের প্রতি নিশ্চিন্ত আবিব ও কুসুম-চূর্ণ একেবারে
আচ্ছন্ন। কতক বা মরতা-নিবন্ধন কতক বা
অবিবান নৃত্য বণ্ডতঃ কোন জনের পুণ্যকাকীদাম অলিত
হইয়াছে, কোন জনের সখ্যরচিত্তি ডিলক ও
পরাবলিহনে। অবিবগণ্যারে নিম্বতঃ স্বেধখারাত্ত নিশ্চিন্ত
হইয়াছে, কোন নারীর বিলিগবন্ধন কবরী হইতে
পুণ্ডরুজ তুমিতে আপতিত হইয়াছে, কোন সুরদিকার
আবার বরে বিরচিত্তি কেনকলাপ একেবারে বন্ধননুজ
হওয়াতে চূর্ণ কুসুমরাশি তাঁহার কৃম্বের ভায় সোভনী
নুখমতলকে অতিশয় সাহসী জনের দৃষ্টির অস্তরণ
করিয়াছে।

বিভ্রমসেনা। পুনরায় তুপতি-সকালে উপস্থিত হইলে
তুপতি আনবপূর্ণক তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে
আজ্ঞা করিলেন। তুপতির আজ্ঞাক্রমে নিশ্চিষ্ট আসনে
উপবেশন করিয়া বিভ্রমসেনা। কিয়ংকাল পরে
মণ্ডায়মান হইলেন ও বজ্রাঙ্গলি হইয়া তুপতি-ক
নিবেদন করিলেন,

—দেব, আপনার এই অহরন্ত্র প্রজার একটি
আবেদন আছে, উৎসব-সমায় ধর্ম্মাধিষ্ঠান নয়, এমন
অপরায়ী হইব চিত্ত্য করিয়া মনে মনে ভীত হই।

তুপতি সহাত্ত বধনে উত্তর করিলেন যে, বিভ্রমসেনার
আবেদন সর্জন। আদ্য-যোগ্য। তখন বিভ্রমসেনা।
নিবেদন করিলেন,

—দেব, আপনার প্রবল প্রজাপে প্রজাপণ
তরুর, মন্ডা ও দ্বর্গুতগণের শীড়ন হইতে সম্পূর্ণ
রূপে মুক্তিলাভ করিয়াছে। নিঃসন্দেহে আমার
পূর্ণপ্রজাঙ্কিত্ত পাশরাশির ফলেই কয়েকবিসপ পূর্ণে এক
হুত বৈবেশিক তরুর আমার একটি প্রাপ্ততুণ্য প্রিয়বধ
অপহরণ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে। দেব, এই হুতকে
সমুচিত্তি পাতি প্রাননপূর্ণক অপহৃত বজ্রট পুনরুদ্ধার
করিয়া আপনার এই অহরন্ত্র প্রজাকে পালন ককন।

বিভ্রমসেনার এই বজ্রোপস্থান প্রবণ করিয়া উপবিষ্ট
পারিবর্ষণ বিষয়সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। নরপতি
কিয়ংকাল নিকাক্ত তাহে অবগান করিয়া বলিলেন,

—বিভ্রমসেনা, আমার শাসনে বৈবেশিক তরুর
নির্জিয়ে নগরে প্রবেশ করিয়া তোমার ভবনে এইরূপ
দুষ্টর্ষ সম্প্রদানান্তর দুষ্টর্ষের দ্বারা সংগ্রহীত বস্ত্র আচ্ছাদ্য
করিয়া নিগ্রাপনে প্রস্থান করিয়াছে ইহা আমার
শাসনের ধোরতর কলঙ্ক সন্দেহ নাই। আমার রাজ্য
নিজ্জিতশত্রু, ও যোগ্যসচিব সমস্ত তার ভ্রত হইয়াছে—
এইরূপ অবগত হইয়াই আমি বিবর্যাক্তরে চিত্তনিবেশ
করিয়াছি। বাতা হউক, এই গুরুতর অপকারের বাহাতে
উপযুক্ত প্রতিবিধান হয় তদ্বিধেই আমি অবচিত্ত
হইব। তোমার কোন প্রিয়বস্ত্র অপহৃত হইয়াছে
আমাদিগকে বল।

বীর শাসনের কলঙ্ক অপনোদন করিতে নুতপ্রতিজ্ঞ
হইয়া নরপতি এইরূপ বলিলে বিভ্রমসেনা। কৃতান্তলিপুটে
নিবেদন করিলেন,

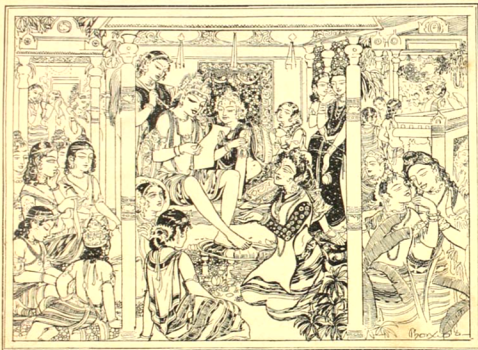
—দেব, আপনার এই বাক্যের দ্বারাই আমি
অতিশয় আশ্বাস প্রাপ্ত হইলাম। অপহৃত বস্ত্র
বিবরণ আমি বধাকালে নিবেদন করিব; এক্ষণে আমার
এক স্বেভাষন ব্যক্তি, যিনি তরুরকে উত্তমরূপে
নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, তিনি উহার একটি উত্তম
প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন—

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বিভ্রমসেনা। বর্যাস্ত্রাল হইতে
চতুরিকার নিকটে প্রাপ্ত চিত্রপটট তুপতির হস্তে
প্রদান করিলেন।

তখন বিভ্রমসেনার কথিত বৃত্তান্ত প্রবণে সকলের
কৌতুহল অতিমাত্র উদ্বীণিত হওয়াতে সমস্ত উৎসব-
সমায় সেই চিত্রপটটি পর্য্যবেক্ষণার্থ অত্যন্ত উৎসুক
হইলেন। নরপতি চিত্রপটটি দর্শনমাত্র বীর দক্ষিণ-
পার্শ্বে উপবিষ্ট সেই অপরিচিত পুরুষের প্রতি
বিদ্যাম্বুরণবৎ চকিত কটাক্ষ নিষ্ক্ষেপ করিয়া দাক্ষ
বিষয়ে অভিভূতপ্রায় হইলেন; কিয়ংকাল পরে
কিঞ্চিৎ শাস্তভাব অবলম্বন করিয়া বলিলেন,

—ভদ্রে, এটি বসন্তোৎসব উপলক্ষ্যে করিত
প্রহেলিকামাত্র কিংবা মত্ব ঘটনা? ঐহাকে অবলম্বন
করিয়া এই রহস্য কবিত্ত হইয়াছে, তিনি সাক্ষাৎ
স্বক্ষে নাগরিকসমূহের অপরিস্ফুট হইলেও বিদগ্ধসৌন্দর্যে
স্থপিতিত ব্যক্তি। ভদ্রে, এই চিত্রপটে ঐহার
অভিসৃষ্টি তত্ত্ব হইয়াছে তিনি কৌশলীর প্রতিভা
কবি প্রত্যয়। এককালে অলৌকিক রূপ ও কবিত্ব

বরণতির এইরূপ উজ্জ্বলপূর্ণ বাক্য প্রবণসোচন
করিয়া বিব্রমসেনার মুখমণ্ডল অস্তিত্ব প্রদর্শন
ধারণ করিল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন,—
সবী কনকসেবার “স্বকর্ণপতিলাভ তত” অতিবিশ্বকর্ম
রূপে সার্থকতা লাভ করিবার সম্ভাবনা হইয়াছে।
পূর্ণরূপের বরণপাণির কলেই এতদ ঘটনা সম্ভব হয়।
কবি প্রয়োজের আকর্ষণনক রূপ ও প্রতিভার



সুপতির চিত্র-বর্ণন

শক্তির অধিকারী, এবং আমার প্রাণতুল্য প্রিয়-
স্বজন। আমার প্রতি স্নেহবশতঃ বসন্তোৎসব
উপলক্ষ্যে তিনি এই নগরীতে আসনন করিয়াছেন
ও আমার হৃদয়পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। প্রদলভতা
বা বাতুলতা এই দুইয়ের কোনটি এই অসিদ্ধ ও প্রেম-
ভাষন ব্যক্তির বিক্ষে সৌখ্যপবাস প্রদানের মূল
তত্ত্ব নির্ণয় করা প্রয়োজন।

দ্বারা কৌশলীর ব্যাতি বহুগুণে উজ্জলতা প্রাপ্ত
হইয়াছে। বাসন্তীর বরণত্ব ও দ্বিতীয় কনকর্ণবরণ
এই দুবাশূল্য বীর বৈভা-প্রভাবে বিদগ্ধসমাজের
প্রকলা ও রূপাতিশয়া হেতু ব্রীমণের চিত্তের উপর
আধিপত্য লাভ করিয়াছেন।

এইরূপ চিন্তা করিয়া বদ্ধাঙ্গি হইয়া বিব্রমসেনা
নিবেদন করিলেন,—

—সেব, প্রজ্ঞাপনের প্রতি আপনার অভিনয় অসুগ্রহ অসুন্নতি গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে অধরে হর্ষধ্বনি ও ধ্বংসলী বিচারকরণে আপনার খ্যাতি পবিত্র ও উচ্চঃস্বরে উচ্চারিত “হীং” “হীং” শব্দে মাড়ুটে আলাতুমির সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

সে ব্যক্তি স্বপকাল পূর্বে আপনার যেহেতাজন ছিল প্রেলভতাবশে বা অকস্মাৎ বাতুলতা প্রাপ্ত হইয়া সে যে এইরূপ গুরুতর অভিব্যোগ উপস্থিত করিবে, তাহা সম্ভবে না। বিশেষতঃ এই চিরপট তৃতীয়-ব্যক্তির কাব্য, এবং সে ব্যক্তির প্রতিমূর্তি এই চিত্রপটে স্তম্ভ হইয়াছে, তাহার পরিচয় আমাদের নিকট অপার্থক্য অপ্রকাশ ছিল। এক্ষেত্রে অভিব্যোগের মূল নিঃসন্দেহে দত্তো নিহিত। সেব, কবি প্রত্যেকের কবিত্বের খ্যাতি আমাদের জ্ঞান গ্রামাচ্ছনেরও অজ্ঞাত নয়। আপনার অসুন্নতি প্রাপ্ত হইলে আমি এই বিখ্যাত ব্যক্তিকে কয়েকটি প্রশ্ন করিব।

নরপতি একটি লীর্ষধ্বাস মোচন করিয়া কবির প্রতি নৈরুপাত করিয়া বলিলেন,—
—সখে! আমি উপায়-হীন, নিমিত্তের ভাঙ্গী, আমার বুদ্ধিশক্তিও যেন এই আকস্মিক ঘটনার ক্ষুভতা-প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ব্রহ্মী তোমাকে ইচ্ছাস্বরূপ করিলেন। নরপতি বহু আদর পূর্বক কনকলেখা প্রশ্ন করিলেন।

কবি প্রত্যোত্তর দীর্ঘ হাতের দ্বারা যেন এবিধের প্রকারে উভয়কে উপহৃত করিলেন। তখন

শুভাগমনে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মন্দির

আমার এ তাড়া বাড়ীর উঠানে
আনন্দের বস্তা এল—

কাগার কুণার কে জানে ?

অদ্বৈতে উছান বাড়ি’

এল আবার পদ্মা-মারি ;

নৈতে বরং-লক্ষী এল

পিউলি-কলি-কুটানে।

এল আবার কানাই-বলাই,

এল আবার পিনাকী ;

এল লক্ষী-সরস্বতী

আর রহিল কে বাকি ?

এল দূরের ভগ্নী, ভ্রাতা,

এল আবার কল্যা, মাতা,

সব রে এমন মধুর মিলন

হরির কুণা বিনা কি ?

অজর আমার তাড়ে বাড়ী,

ঘরের দেওয়াল পড়ছে রে ;

নদী আমার চতুর্থে বাচা,

বিধি বেতা পড়ছে রে ;

অরখালি দ্বার রে ভাসি,’

অরপূর্ণা আসছে হাসি,’

দুস্ত আমার মঙ্গল-ঘট

স্বধা দিয়েই ভুছে রে।

চইরা। উৎসব-সন্ধ্যা সমুদ্রে
দুষ্টি প্রসারিত করিয়া
দেখিলেন হৃৎকণ্ডে ব
প্রাণস্বরূপা নন্দিনী দিগ্ধ-
বিজ্ঞানের জ্ঞান দীপ্তিমতী
কনকলেখা প্রিয়দমী নাপ-
বস্তীর সহিত আগমন
করিতেছেন। বিভ্রমলেন।
নিবেদন করিলেন,

—সেব, এই অবিনীতা

হঃসাত্ত প্রকাশ করিয়াছে,
কিন্তু আপনি তাহার প্রতি
অগ্রসর চাইলে তাহার
মহাপাখি স্পেন হইবে। সেব,
এই সাগরমেখলা তারকজুমির
সর্বত্র আপনার প্রদারকনের
ও উদ্যোক্তার কাহিনী বিবিত।
আর অল্পকাল মধ্যেই এই
ব্যাপারের রক্ত উদ্ঘাটিত
হইবে, আপনি দাসীর প্রতি
প্রসন্ন হউন।

ইত্যবসরে প্রিয়দমী-

সহায়িনী কনকলেখা ভগবান
কুম্ভমাধুয়ের মন্দির প্রাঙ্গণ
পূর্বক করুণিত মঙ্গল বঙ্গ-
মঞ্জরীর দ্বারা কুম্ভমাধুয়ের
অক্ষনা করিয়া বধাবিহিত
উপচার প্রবোধ দ্বারা
নরপতি ও দেবীর পূজা

ও নাপবস্তীর কুশল প্রশ্নাদি করিয়া নানা

বিভ্রমসেনা বৈশিষ্ট্যে কনকলেশা ও নাসবল্লীকে বলিলেন,

—সখি, তুণ্ডিত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে একজন বৈদেশিক সামাজিক উপবিষ্ট; তাঁহাকে কি ইতিপূর্বে কখনও নয়নগোচর করিয়াছ ?

কনকলেশা বিভ্রমসেনার নির্দিষ্ট অভিপ্রেতে দৃষ্টিপাত করিলেন, কবি প্রোক্তোৎসাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে চারিচক্ষু মিলিত হইল। অকস্মাৎ নাসবল্লী উচ্চৈঃস্বরে 'হায়! হায়!' একতর বলিয়া দুই বাহু প্রসারণ পূর্বক চতুর্ভুজা, পঙ্কজাভূষী কনকলেশাকে ধারণ করিলেন। এই অপ্রত্যাশিত বিপৎপাতে তাবৎ উৎসব-সমাজ চক্ষণ ও কোলাহল-মুখর হইল। 'কি হুর্দৈর্ঘ্য!' এইরূপ বলিয়া নরপতি আসন ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইলেন। বিভ্রমসেনা বলিলেন,

—সেব, কোনরূপ গুরুতর বিপৎপাতের আশঙ্কা করিবেন না। এদিকে কবি প্রোক্তোৎসাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

বিস্মিত নরপতি কবি প্রোক্তোৎসাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, উত্তেজনা ও আশঙ্কাজে পূর্ণ হইয়া স্থান ও কালের সম্যক জ্ঞান বিসর্জন পূর্বক তিনি আসন ত্যাগ করিয়া বগ্নায়মান, আকর্ষণিকাকারিত্য লোচনচক্রে দৃষ্টি সমুৎপ্রেসারিত; বাহুবোলে প্রেক্ষিত অত্মপদ্যের জ্ঞান তাহার সর্বদ্য বশিত এবং বহুজ্ঞানি অপ্রকৃত প্রার্থনাস্বর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে উচ্চৈঃস্বরে, এইরূপ অবস্থায় চিত্রে আরোপিত পুরুষের জ্ঞান তিনি অবস্থান করিতেছেন। প্রিয়সখাকে এইরূপ বৈরাগ্যপ্রাপ্ত অবলোকন করিয়া নরপতির প্রসন্ন গম্ভীরহাস্য-বিস্মিত আনন্দ চিত্তাকুল তাব ধারণ করিল। তখন অগ্নিবৎ হইয়া বিভ্রমসেনা নিবেদন করিল,

—সেব, এই ব্যাপারে আপনি কোনরূপ অত্যাধিক আশঙ্কা করিবেন না। কিয়ৎকাল পূর্বে এই ব্যক্তি কবি প্রোক্তোৎসাহিত্যের সম্পর্কে চৌধ্যাপ্যায় উপস্থিত করিয়াছিল, এই অপবাদ যে অসীক কল্পনাপ্রসূত নহে, তাহার প্রমাণ প্রোক্তোৎসাহিত্যের কাল উপস্থিত। কিয়দিক

পূর্বে সখী কনকলেশা প্রিয়সখী নাসবল্লী ও পরিচায়িকা মনোহারিকার সহিত কাব্যামুদ্রায় উপবাস কল্পনামুদ্রায় মনিয়ে আসন্ন করিয়াছিলেন। মনিয়ে হইতে প্রত্যাগমনকালে বিগ্রামার্শ্ব তিনি উপবনস্থিত মাধবীমণ্ডলে প্রবেশ করেন, কার্তিকের প্রিয়শিখ কবি প্রোক্তোৎসাহিত্যের চৌধ্য-কর্ম সম্পাদনের প্রবেশের প্রতীক্ষাতেই তথায় পূর্ণ হইতে অবস্থান করিতেছিলেন সে-বিগতে সন্দেহ নাই। অসহায়্য তিনি অবশ্যেই কল্পাতিশয়ের দ্বারা বিমুচ্য হইয়া, আশঙ্কচিত্ত প্রদান না করিয়াই তিনি বলপূর্বক সখী কনকলেশার দ্বার অপরূপ করিয়া সে-স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। সেব, অভিস্রুত উপস্থিত, কনকলেশাও প্রিয়সখী-সমভিযাহারে উপস্থিত, রাহোর প্রেত ব্যক্তিগণও উপস্থিত। এক্ষণে তৎক্ষণে উপস্থিত শান্তিপ্রদান করিয়া সখী কনকলেশার অপরূপ সামগ্রী বা তথ্যনিমিত্তে তুল্য সুসার ত্রব্য প্রত্যগর্শের দ্বারা সম্যক বৈধ করণের ব্যবস্থা কর্তব্য।

বিভ্রমসেনা এইরূপ বলিলে নরপতি তাহার ইতিপূর্বে কণ্ঠপ্রবন্ধের সম্যক মনোমুগ্ধাবন করিয়া হাত করিলেন; পরজন্মের আশঙ্কাকারী লক্ষ্যবস্তুও অপরূপ হৃৎপ্রায় নিম্নমণ্ডল বেন পুনরায় তাহার গুহ্র বিমলপ্রীতে উদ্ভাসিত হইল। নরপতি হাত করিয়া হৃৎপ্রায়-মুখর উৎসব-সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক বলিলেন,

—অহো, ভগবান্ মকরকেশবনের আশ্রয় প্রাপ্ত! তাহার পক্ষের অচ্যুত লক্ষ্যবৈশিষ্ট্য! ঐ যে অশেষ কবিরশ্মি-আধার কৌশলীভূষণ কল্পকাকি কবি প্রোক্তোৎসাহিত্য উপবাস কৈলাসপতির কৃৎ দৃষ্টিপাতে তীব্র হইবার পূর্বে সমুৎসাহিত্য রত্নপতির জ্ঞান অবস্থান করিতেছেন, আর ঐ যে কলাপী কনকলেশা, তাহাকে দর্শন করিয়া আমাদের নেত্রোৎসব সম্পন্ন হয়, তিনিও প্রণামনিষ্ঠ কুলবৎ জ্ঞান নিষ্ঠ হইয়া রহিয়াছেন। যোগের সহিত যোগের যোগনাই ভগবান্ ত্র্যম্বকেশ্বরের অতিপ্রায়। বিভ্রমসেনার কল্পমার প্রার্থনায় মকরকেশ্ব অহং কর্ণপাত করিয়াছেন। এ

বিক্রে আমাদের কোনরূপ হস্তক্ষেপ কর। বাতলা।
তথাপি দূরদূরোধিত তৃপ্তি-সকাশে প্রতিকার-প্রার্থী
প্রাণ। আবেদন করিয়াও বিকল হইয়াছেন, এইরূপ
জনজন্মিত সন্তানবান্না মাত্রেয় দুঃখোদ্ভব কর। করবা।

নরপতি এইরূপ বলিয়া উৎসাহিত করিয়া কিস্তবান-
বিশ্বের জ্ঞান অবস্থিত কবি প্রত্যেককে বলিলেন,

—সখে, তোমার এক্ষণ বৈরাগ্যের কারণ কি ?
কয়েকদিবস পূর্বে হইতে তোমার চিত্তবিকৃতি প্রকাশ
পাইয়াছে ; সহস্র ভেদ। করিয়াও উহা শোষণ করিতে
পার নাই। এতাদৃশ চিত্তবিকৃতির হেতু অস্বাভাবিক
করিতে না পারিয়া আমাদের যেহেতু মনে
অনিষ্টানুভূতি প্রবল হইয়াছিল। এ বিক্রে আপনাকে প্রকাশ
করিলে তুমি হস্ত
করিয়া বিব্রতভাবের
অবতারণা করিয়াছ।
কিন্তু একবার সন্দেহের
বাণপাতের সম্ভবতা
হইলে আর ভয়তা
থাকে না। তোমার
কৃত অপরাধ সম্পর্কে
আর কোনরূপ প্রমাণ
প্রয়োণের আবশ্যকতা

নাই। বিব্রতভাব তোমার চৌক্যপবাদের উদ্দেশ্য
করিয়াছেন ; আমাদেরও অস্থান, এই অপবাদের স্রব
হেতু বর্তমান। কল্যাণীয়া কনকলেখা তোমার
ব্যবহারে তোমাকে অবিনীত দুর্জন হির করিয়াছেন।
আমাদের আদেশ—এই উৎসব-সমায় মধ্যে পাদপঙ্কজের
দ্বারা স্বীয় অবিনয়ের ভক্ত কমা প্রার্থনা করিয়া
ঐহাকে প্রসন্ন ও আশ্বাসিত কর, এবং বিনামূল্যে
ঐহার দ্বয় হরণ করিয়াছ, সুতরাং স্বয়ং প্রদান
করিয়া ঐহার বিশ্বাসভাজন হও। তৎপর কমাপ্রার্থ
হইলে এই বিচিত্র “ইন্দ্রজেন” হারের দ্বারা ঐহার
অর্জনা কর।

তৃপ্তির এই আদেশ প্রবণ করিয়া ‘আর্গাশ্রমের
প্রাণা আচ্ছাদিত। বিদ্যায় হোক’ দ্বৈত এইরূপ বর্ণনা
উৎসবসময়ী সর্গচিত্রে “দন্ত”, “দন্ত” এই কথা পুনঃ পুনঃ
উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। মাপবন্দী ও বিব্রতভাব
নিরন্তর আনন্দলাভ করিলেন।

কনকলেখা স্বামী ও পরিচারিকার গুণ্ডাচার
পূর্বেই স্থগ হইয়াছিলেন এবং লোচনময়ী হইয়া
তৎপত্বে প্রিতমকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এখন
তৃপ্তির আদেশ বর্ণনাচার হওয়ারে মজ্জার মুকুলিতাকী
হইয়া স্নেহ-ধারায় সিক্ত হইলেন। কবি প্রত্যেক
একাল পথ্য উদ্ভাস্ত পুরুষের জ্ঞান নির্মাকৃতাতে অবস্থান
করিতেছিলেন। রাণাঙ্গণ প্রবণ কনকলেখার জাভান্তর



কনকলেখা ও প্রত্যেকের মিলন

নগ্নসোচর করিয়া
তিনি মুহূর্তকালকার
প্রিয়সখার প্রতি দৃষ্টি
নিষ্কণ পূর্বেই হস্ত-
দ্বয় হার এবং করিয়া
কনকলেখার সন্নিধানে
গমন করিলেন। তৎপর
প্রবণ-বিদ্যে দৃষ্টিদ্বারা
প্রিয়তমকে অভিমিল
করিয়া বলিলেন,

—প্রিয়সখা বলিয়াছেন, আমি বিনামূল্যে
তোমার দ্বয় হরণ করিয়া অবিনয় প্রকাশ করিয়াছি।
ভদ্রে! তবে আমিও দ্বিজানা করি, তুমি কাহার
অস্থমন্তিতে আমার দ্বয়টি হরণ করিয়াছ ?

প্রিয়তমের এই কৌতুক-প্রশ্ন প্রবণ করিয়া দ্বৈত
কনকলেখার প্রত্যেককালীন কমনের জ্ঞান স্থখ
বদনমণ্ডল ত্রীভাষণে পথ্যাত পুণ্ডরিকভার-অবনত
গভীর জ্ঞান ভূমির দিকে অবনত হইলে কবি প্রত্যেক
ঐক্যকল্পিত হস্তে দ্বৈত অত্যাচ্ছন্ন প্রত্যেক ইন্দ্রজেন হার
উত্তর হস্তে ধারণপূর্বক সাদরে ঐহার প্রীবাগণে ভক্ত
করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিলেন।



['ঈশ্বর' সমালোচনার ৩য় প্রকাশের অন্তর্গত কবিতা ওভারসিট প্রকাশিত]

শতনরী—ঐক্যনিধান বঙ্গোপাখ্যায় প্রকাশক
ঐশ্বর্য বাগ্‌টী। প্রাপ্তিস্থান—চক্রবর্তী চট্টোপাধ্যায়
এও লক্ষ, ২০১১, কলিকাতা।
দাম আড়াই টাকা।

কাব্যগ্রন্থ। বর্তমান কালের কাব্যপরিচয় দিতে
বসিলেই রবীন্দ্রনাথের সত্যসঙ্গেই মনে পড়িয়া যায়
বিশ্বেন্দ্রলাল রায়, দেবেন্দ্রনাথ সেন আর অক্ষয়কুমার
বড়ালকে। এই ত্রয়ীর কাব্যসাধনার বিশেষত্বগুলির
বৈশিষ্ট্যই উদ্ভূত। ছন্দে, বিষয়-বস্তুতে, প্রকাশ-ভঙ্গিতে,
ও ভাববিস্তারে বিশ্বেন্দ্রলালের যে স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে তাহা
একদিকে যেমনি কৌশলময় অপর দিকে যেমনি বিহীন-
কর। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজালা সারলা পাঠকের মস্ত স্পর্শ
করে। অক্ষয়কুমারের রচনা অস্বাভাবিক, সূক্ষ্ম ও গৌরবপূর্ণ।

এই প্রথম প্রকাশের পরেই বিভিন্ন গ্রন্থে আসিলেন
—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ঐক্যনিধান বঙ্গোপাখ্যায় ও
ঐশ্বর্য বাগ্‌টী। রবীন্দ্রনাথ ছন্দে, ভাষায় ও
ভাবে যে অভিন্ন পথ গুলিয়া গিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ তাহার
প্রথম চাইকেই অধিকতর নিষ্ঠার সহিত অহুসরণ
করিয়া আপনাতঃ কলাচাতুর্যের পত্রিচয় গিলেন।
সত্যেন্দ্রনাথের মতই ছন্দ-গিল্মে এবং তাহার সচিত্র
ভাবমায়ুগলের সমাবেশ কল্পানিধানের রচনার বিশেষত্ব।
হঠাৎমোহনের রচনা প্রসারিত ও গাঢ়তা অপরূপ।

কল্পানিধানের 'শতনরী' তাহার 'প্রসাদী', 'অস্বাভাবিক',
'শরীরিক' ইত্যাদি কাব্য-পুস্তকের প্রেরণ কবিতার সাহচর্য।
এই চরম-গ্রন্থ পাঠ তাগে বিভক্ত—কানে কানে,
বন্দনা, মৃদু, মধুপ্রসঙ্গি ও পথে। "প্রায় প্রতি-বিভাগেই
কবির কয়েকটি নূতন কবিতা" দেওয়া চাইছে।

গ্রন্থনিধান কবিতার পর কবিতা পড়িয়া

মন যেমন ছন্দমুগ্ধ নাচিতে থাকে, তেমনি আবার
নিবিড় স্বপ্নাবেশে বিভোর চইয়া উঠে। "কাকন-কল্যাণ",
'ঐশ্বর্য', 'মধুর-মধুর', 'শ্রেণীর' প্রভৃতি কবিতায়
কবির তৃপ্তি যে অপরূপ চিত্র অঙ্কিয়া চলিয়াছে
তাৎসত্যে কবিরই তাহার কবিকে বলিতে ইচ্ছা করে—

"মৌল আকাশে হুলিরে তুলি

ভুবার-দান্দা শেখরগুলি

কে অঙ্কিল নেশ-মাগরের পারে ?

বালাক-ভাঙুর আলোর কণা,

রঙ-কলান' কি আত্মনা।

নিশ্চ-বধুরে সাজায় মোতির হারে।"

শেষ ছত্রটির সামান্য পরিবর্তন করিয়া কবির যেমন
সবকে বোধ হয় বলা চলে যে, তাহা—

"বাঙ্ক-বধুরে সাজায় মোতির হারে।"

কবিতাগুলির মধ্যে যে মিথতা, যে স্বপ্ন-বিশ্বাস ও
যে পরিমার্জিত কতি পাওয়া যায় তাহা পাঠক নজরেই
চিত্র স্পর্শ করে। চণ্ডীদাস, অম্বাব, বিশ্বেন্দ্রলাল
রায়—নামক কবিতাগুলি অপরূপ ছন্দ। কল্পনা-
নিধানের আত্মজালা ভাবাবেশ পাঠক-দৃষ্টিতে অপরূপ
আনন্দময় অহুতুটি কাগাইয়া তোলে, এবং এইখানেই
তাহার কবি-প্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান—

প্রিথ্বীচন্দ্র সেন, এম-এ। প্রাপ্তিস্থান—চক্রবর্তী
গোষ্ঠীকি এও কোং, ১৪নং কলেজ রোড, কলিকাতা।
দাম বার আনা।

আলোচ্য পুস্তকটি রবীন্দ্র-ভরতী উপলক্ষে "দ্বিতীয়-

উৎসর্গ নামক প্রথমে প্রকাশিত লেখকের প্রবেশের পুনর্মুদ্রণ। রূপসক রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশুদ্ধ কাব্যসাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করতে গিয়ে বাংলা ছন্দের কোন্ কোন্ মৌলিক নীতির সৃষ্টি ও ব্যবহার করেছেন, লেখক এই পুস্তিকার দক্ষতার সহিত তার আলোচনা করেছেন।

বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ণ শিল্পপ্রতিভা কি বিশ্বব্যবস্থার সৃষ্টার এনেছে, রবীন্দ্র-প্রতিভার সোনার কাঠির পাশে বাংলা কাব্যসাহিত্য কত বিচিত্র রূপে অলঙ্কৃত হয়েছে তাই দেখিয়ে প্রবেশের লেখকেন—“বাংলা কাব্য-মগতে তিনি যে কত নোতুন নোতুন ছন্দ সৃষ্টি করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এই বৈচিত্র্যবহুলতাই তাঁর ছন্দের আসল কথা নয় : আসল কথা এই যে, তিনিই বাংলা ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির সঙ্গপ্রথম ও বসার্থ আবিষ্কারক। * * * * * তাঁর এ আবিষ্কার পৃথিবীর ভাষাগত কোন আবিষ্কারের চেয়ে কম নয়। বাংলা ভাষার আপাতপূর্ণমান ছিল আবরণের অন্তরালে অবস্থিত যে ছন্দব্রাহ্মা তিনি আবিষ্কার করেছেন তা আট্টশাটিকের পরপরও তরঙ্গপ্রবাহে নোতুন মহাপ্রাণ আবিষ্কারের চেয়ে কিছুমাত্র কম বিশ্বব্যবস্থার নয়।”

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ আলোচনা প্রসঙ্গে মাত্রোক্ত, স্বরবৃত্ত ও যৌগিক (অক্ষরবৃত্ত) বাংলা ছন্দের এই তিনটি প্রধান ধারার প্রকৃতি নির্দেশ করে এবং এই তিন প্রকার ছন্দকে আশ্রয় করে রবীন্দ্রনাথ কত বিচিত্র পূর্ণবিত্তাসে ভাবপ্রকাশ করেছেন তা দেখিয়ে লেখক তাঁর হৃদয় প্রতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে প্রবেশচন্দ্রের মৌলিক গবেষণাপূর্ণ বহু প্রবন্ধ বাঙালী পাঠক মাত্রেরই অপরিসীম। তাঁর বর্তমান পুস্তিকায় ছন্দের নিপুণ বিশ্লেষণ রবীন্দ্রকব্য-পাঠকদের হৃদয় সেবে এবং উদীয়মান কবিদের সাহায্য করবে। বাংলা ছন্দ-সরবত্তী রবীন্দ্রনাথের হাতে কোন্ ধ্বনিতত্ত্বের আবিষ্কারের ফলে চরম সার্থকতা লাভ করেছেন তাই

দেখিয়ে লেখক বলেছেন—“রবীন্দ্রনাথের পূর্ণবত্তী বাঙালী কবিতা বহুশত বৎসর ধাবৎ নানা প্রয়াস ও সাধনার ভিতর দিয়ে অতি মধুর সঙ্গীতে বাংলা ছন্দের স্বরূপ সন্ধানের পথে অগ্রগতির ইচ্ছাশক্তি, কিন্তু সে তত্ত্বের আবরণ কেউ উন্মোচন করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন অন্তর্দৃষ্টির দৃষ্টিতে যেদিন সে তত্ত্ব উন্মোচিত হ’ল, সেদিন দেখা গেল, বাংলা ছন্দের গতি ও ক্রীণা নয় এবং তার সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রও স্বরূপবিশারদ নয় ; সেদিন থেকে বাংলা ছন্দ তাঁর পৃথকধর্মের অঙ্গসংগ ক’রে ত্রিগুণগা ভাগীরথীর মতো তিনটি স্বর ও প্রবল ধারায় চলেছে।”

এই পুস্তিকায় একদিকে দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথের ছন্দের বিচারে লেখকের হৃদয় প্রতিবোধের পরিচয়, অন্যদিকে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে আশ্রয় করে বাংলার একটি ছন্দশাস্ত্র গড়ে তুলবার নিপুণ প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথের ছন্দপ্রতিভার পরিণতি অঙ্গসংগ ক’রে বাংলা ছন্দের বিভাগ ও তার ক্রমবিকাশের ধারাটিও চমৎকাররূপে নির্দিষ্ট হয়েছে। বাংলার কবি, বাঙালীর কবি আজ বিশ্বের কবি। বাংলা কাব্যসাহিত্য আজ “মণ্ডককবিতা” বিশিষ্ট আসন গ্রহণ করেছে। বাংলাকাব্যের ছন্দস-আলোচনার ক্ষেত্রে আজ সুবিস্তৃত * ও তার উপকরণ প্রচুর। বাংলা ছন্দ-শাস্ত্র গড়ে তোলার এই শুভলক্ষে রবীন্দ্রনাথের ছন্দের এই নিপুণ বৈজ্ঞানিক আলোচনা লেখকের স্বীয় প্রতিভারই অন্ততম নিদর্শন।

শ্রীবিকাশচন্দ্র নন্দী, এম-এ

রক্তেন্দ্র টান — উপভাস — শ্রীঅরবিন্দ দত্ত।
মূল্য এক টাকা বারো আনা। শ্রীমজুমদার দাস
কল্লুক ৩২৪১২, বিভিন্ন টীট শনিরঞ্জন প্রেস হইতে মুদ্রিত
ও প্রকাশিত।

বইখানি “ভারতবর্ষে” দাড়াবাহিক ভাবে প্রকাশিত
হ’য়েছিল। বইখানির প্রট একত্বেরে প্রেমকাহিনী নয়।
বাঙালীর সহস্র সাধারণ গৃহস্থালীর আবেগে নানা

চরিত্রের বিকাশ দেখানো হয়েছে। বাঙ্গালীর মনের দৃঢ়তা, উচ্চতা, উদারতা, আবার চম্পকতা, হৃদয়তা—সহোদর ভাইদের মধ্যে পরস্পরের চরিত্রে ছুটিয়ে তোলা হয়েছে। আবার বাঙ্গালীর ঘেরে যে সব সময় সর্দারদ্বারা লম্বান ভাবে লংগারের ছোট, বড়, সরল, কুটিল সকলকে প্রেম ও ক্রমার দ্বারা ধর করতে পারে, রাজরাণী থেকে ভিখারিণী হ'লেও তারা মনের পক্ষি সংক্ষে হারায় না, তা 'কমলা' ও 'হরহৃদয়'র চরিত্রে বেশ স্পষ্ট ক'রে দেখানো হয়েছে। চকলাকেও বেশ লাগল। তার স্বভাবের ছুটি দিক—ভালো এবং মন্দ—র সঙ্গে তার মনের অনবরত খাত-প্রতিখাত এবং শেষে ভালোরই জয়। কল্যাণ খুব ভালো যেহেতু হ'য়ে গেল। তবে তাকে কেমন একটু অস্বাভাবিক লাগে। সরল-মনা 'হলধর' মনে'কে দেখক বোঝে হয় সব-চেয়ে বড় ক'রেই আকৃষ্টে চেয়েছেন। হ'তে পারে, হলধরের প্রাণটা অত বড়ই ছিল, কিন্তু তার মুখে মাঝে মাঝে এত বেশি আর্জিত ও সারবাণ্ড কথা শুনেছি বা কেবল উচ্চশিক্ষিত জ্ঞানী ব্যক্তিও মুখ থেকেই শোনবার অপা করা যায়। হলধর-বাসীর মুখে সরল কথা গুণোপা বটে, তবে এতটা জ্ঞানের কথা পাওয়া যায় কি ?

তা' ছাড়া কতগুলো অস্বাভাবিক ঘটনার জারসার জারসার বইট। নিত্যনুই উপভাস ব'লেই মনে করিয়ে দেয়,—যেমন হু'বহর ওকালতী ক'রে এই বাছারে দ্বিগুণের অপাধ ঐক্যবীর পরিচয়, কলকাতার বাড়ী, ঘর, 'চাকর, দরওয়ান, গাড়ী, মোটর ইত্যাদি ভগবান্বার মত লাগে।

তা হ'লেও বইটি আমাদের ভালো লেগেছে। কিন্তু নামটা একটু বেশি ব'লেই মনে হচ্ছে; আরো কিছু কম করা যেতে পারত।

ঐউমা দেবী

নূতন হিন্দু পঞ্জিকা (১৩৪০ সাল)—
কলিকাতা ট্রেডিং কোম্পানী কর্তৃক ১৯১৯, ল্যায়ার লাহু'লার রোড, কলিকাতা, হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং বিনামূল্যে বিতরিত।

পঞ্জিকা স্বপ্নপ্রাণ হিন্দুজাতির দলকারণ-সাধনের প্রধান উপায়। এই পঞ্জিকাখানি সেই কাব্য সাধনের বিশেষ সহায় হইবে। জিত্তা-কাণ্ড প্রভৃতি সকল ধারমিক জ্ঞাতব্য তথ্য ইহাতে বিশদভাবে দেওয়া আছে। জ্যোতিষ-বচনাবলি ইত্যাদি জনসাধারণ সহজেই বুঝিতে পারে, সেমন্ত ইত্যাদি সরল বাংলা ভাষায় ঐগুলির ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। খ্যাতনামা জ্যোতিষ পণ্ডিতগণ কর্তৃক ইহা পণ্ডিত ও জনোচিত হওয়ার ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমশূন্য হইয়াছে। অস্বাভাবিক শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই পঞ্জিকার সাহায্যে ভাষার নিত্যনৈমিত্তিক স্বার্থকাণ্ড নির্ভয়ে ও নিঃসংশয়ে পাঠন করিতে পারিবেন।

কিন্তু এসকল ছাড়াও যে বিশিষ্ট গুণে ইহা বাঙ্গাল-প্রচলিত অজ্ঞাত পঞ্জিকা অপেক্ষা প্রেরণের স্থান অধিকার করিয়াছে, সে ইহার বহিঃসৌন্দর্য। এমন সুন্দর মলাট আর কোন পঞ্জিকায় দেখি নাই। বেশ গুরু কাগজ, ভাল ছবি ও ছাপা—এই তিনের সমন্বয়ে ইহার মলাট হইয়াছে অপরূপ সুন্দর। সুন্দর মুদ্রণ-কার্যের অল্প সর্বিশেষ বিখ্যাত কলিকাতা ট্রেডিং কোম্পানী কর্তৃক ইহা মুদ্রিত হওয়ার ইহার মুদ্রণ-কাণ্ড যে অতিশয় মনোহর হইয়াছে, একথা বলাই বাহুল্য। একটু লক্ষ্য করিলেই ইহার মুদ্রণ-কার্যের পারিপাট্য ও সৌন্দর্য চোখে পড়িবেই। ছবিগুলি পর্যন্ত অতি সুন্দর ছাপা হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্যাও বেশ সুন্দর হইয়াছে। উপরন্তু, বাঙ্গালীর অজ্ঞাত পঞ্জিকার মত ইহাতে বিজ্ঞাপনের বাহুল্য না থাকাতো ইহার কলেবর অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পায় নাই। ইহা এই পঞ্জিকার একটি বৈশিষ্ট্য।

মোট কথা, নির্ভুল গণনা, মুদ্রণ-সৌন্দর্য, অনাবদ্যক বিষয় বর্জন এবং পঠনসৌন্দর্য প্রভৃতির দ্বারা ইহা অজ্ঞাত পঞ্জিকা অপেক্ষা অনেক উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

ঐনীহাররঞ্জন মিত্র

অরুণোদয়

(উপভাস)

শ্রীশৈলভানন্দ মুখোপাধ্যায়

বুড়ীর না আছে ছেলেনেত্র, না আছে আত্মীয়-
স্বজন ; কালের স্রোতে কে যে কোণায় কেমন করিয়া
ভাসিয়া গিয়াছে সে-ইতিহাস বড় বিচিত্র। বাই গোক,
এমন অনেকেরই বায়, তাহার জন্ত চুখ নাই। বুড়ীও
তাহার স্বজনহীনতার গুণের কাহিনী আত্মকাল আর
কাহাকেও বলে না। বর্তমানে যে অসামান্য পরিবার
তাহার নীচের তলার ঘরকরখানি ভাড়া লইয়া বসবাস
করিতেছে, তাহাদের লইয়াই বুড়ীর কাববার।

বুড়ী অবশ্য ঠিক বুড়ী নয়। কত যে বয়স চেষ্টা
দেখিয়া অসুমান করা কঠিন। গাতও তাড়ো নাই,
চুলও পাকে নাই, পাকা আমের মত গায়ের রং,
অল্পখ-বিম্ব করিতে বড় একটা দেখা যায় না ; লোকে
বলে, সকলেই নাকি চিরকাল তাহাকে ঠিক এমনই
দেখিতেছে।

পাড়ার লোকে তাহাকে মালি বলিয়া ডাকে।
আমরাও না হয় মাসিই বলিলাম।

কলিকাতা শহরে ওই বাড়ীখানি মালির নিষের।
নগর টাকাড়ি কিছু আছে কি না সে কথা আমরা
জানি না। হুত থাকিতেও পারে। এতদিন সে একাই
ছিল। নীচের তলাটা সম্রতি ভাড়া দিয়াছে।

ভাড়া দ্বারা লইয়াছে তাহারা ছই স্বামী-স্ত্রী।
ছ'মাসেই ছেলেমাসুখ। ছেলেমাসুখ হইলেও কমবয়সেই
তাহাদের একটি ছেলে হইয়াছে। বছর-পাঁচেকের
ছেলে। নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলে, 'আমার নাম—
ভেবেন্দ্র নাথ গাংগুলি।'

পাড়াটি ঠিক বড়ারত্নার উপরে নয়। সতীর্থ
গদি,—বড়ারত্না হইতে বাহির হইয়া বুড়ীর বাড়ীতে
আসিয়াই শেষ হইয়াছে। পাড়ী-বোকা ত' চলই না,
লোকজনের ঢাঢ়লও একরকম নাই বলিলেই হয়।

হেলোট তাই সে নির্জন গদির মধ্যে নির্জিবাসে ইহার
বাড়ী উঠার বাড়ী বুরিয়া বেড়ায়। দিবা তখন
ছুটছুটে ছেলে, সবাই তাহাকে আদর করে, খাইতে
দেয়, কাছে ডাকিয়া বলয়, জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার
বাবার নাম কি, দেবু?'

দেবু বলে, 'ভেবেন্দ্র নাথ বাবা গাংগুলি।'

'আর মায়ের নাম?'

'ভেবেন্দ্রেরা নাথ গাংগুলি মা।'

লোকে শোনে আর হো হো করিয়া হাসে।

বয়ে-বাইরে দেবুর আদর-কষ্টের আর অস্ত নাই।

কিন্তু আমাদের বুড়ী-মালির বোধহয় গুণের ভাল
লাগে না, তাই সেদিন মলিনীসের বাড়ী হইতে দেবুকে
তাহার নিষের বাড়ীতে ডুলিয়া আনিল। বলিল,
'মা গো মা, কি ছাংলা ছেলে গো! চারট খেতে দিলে
ছেলেকে যা পুঁই তাই বলান্ধে, আর ছেলেও তেরমি
দিবা কেমন ব'লে ব'লে গান গাইছে! মলিনীকে
আজ আমি আচ্ছাট ক'রে গুলিয়ে দিলে এসেছি।'

ছেলের মা নারায়ণী ঘরের ভিতর বোধকরি
কোন কাছ করিতেছিল, কথটা তাহার গুলিতে
পাইলেও ভাল বৃত্তিতে পারে নাই; বাহিরে আসিয়া
জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে, মা?'

মালি তাহার কোল হইতে দেবুকে নামাইয়া
দিয়া বলিল, 'কি আর হবে বাছা, যা আমি দেখতে
পারি না তাই। ছেলে আবার পরের বাড়ীতে খেতে
বেড়াবে কি গা! লোকে ভাব'বে, ছেলে বৃত্তি বাড়ীতে
খেতে পার না—তা জানো?'

নারায়ণী বলিল, 'তা আমি কি করব, মা, হুটু ছেলে
—এত ব্যস্ত করি, এত মরি, তু'তো শোনে না।'

সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া মালি ততক্ষণ তাহার ঘোড়ার

ঘরে চলিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ হেবুর কামার পকেট সন্ধানিত হইয়া সে তাহার ব্যতান্ধার তেলি-এর কাছে আসিয়া ঠাড়াইতেই ভলিল, নারায়ণী তাহাকে শ্রহাব করিতেছে আর বলিতেছে, 'বল্ আমার কোথাও বাহিনে। বল্ বলছি নইলে আম তোকে আমি মেয়ে খুন ক'রে কেন্দ'।

মাসি আর চুপ করিয়া ঠাড়াইয়া থাকিতে পারিল না, তব্ তব্ করিয়া তৎক্ষণাৎ সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া। সন্ধ্যার ঘরে ঢুকিয়া দেখে তাহার কাছে চাইতে একরকম ছিনাইয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, 'ছেলে মাঝে কর্তে তোমরা জানে না, মা, কেন বে ভগবান এমন রাজপুত্রের মতন ছেলে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন জানি না। এমন ক'রে মারে ? ছি !'

বলিয়া ছেলেকে গইয়া সে আবার উপরে উঠিয়া গেল।

তেলি-এর কাছে ব্যতান্ধার ঠাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'মা তোমার মেয়েকে, দেখ্ ?'

হেবুর কাটা তখন থামিয়াছিল। তব্ সে কুণ্ডিতে কুণ্ডিতে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হঁ'।

'ঠাড়াও, আমি তোমার মাকে আজ মারব'।

সেব্ বলিয়া উঠিল, 'বুঝে ছুতো মারব'।

মাসি হাসিতে দািল।—'ছুতো মারব' কোথার মিথলি রে ? ওই কতই তো পরের বাড়ী যেতে ব্যরণ করি। ওসো ও ওনেছিন নারায়ণী, ছেলে কোথায় 'ছুতো মারব' শিখে এসেছে।'

নারায়ণী বলিল, 'কোথাও শিখে আসেনি, মা, বাড়ীতেই শিখেছে। ওর বাপের কাছে শিখেছে।'

মাসি গভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'হঁ'। ঠাড়াও আজ মাদক্ বীরেন আপিস থেকে, আমি তাকে পাসন ক'রে দিছি।'

নারায়ণী ভয়ে অধির হইয়া উঠিল। কথাটা বলিয়া ফেলিয়া বেধকরি সে ভাল করে নাই। তৎক্ষণাৎ সে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া মাসির কাছে গিয়া ঠাড়াইল। বলিল, 'কিন্তু আমি বলছি একথা

জুনি বোলো না, মা, তাহ'লে ও মার আমার বাকি কিছু রাখবে না।'

মাসি ঈশৎ হাসিল। বলিল, 'কেন রে, এত ভয় কেন ? খুব বাক বুঝি ?'

নারায়ণী তাহার আরত চক্ষু দুইটি তুলিয়া মাসির মুখের পানে চাহিতেই দেখা গেল, মনে তাহা ভরিয়া আসিয়াছে।

মাসি একটুখানি অবাক হইয়া তাহার সেই মুখের মুখখানির দিকে কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া বহিল, তার পর তাহাকে তাগার ঘরের ভিতর ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিল, 'বোল্'।

ঘরের মেঝের উপরেই নারায়ণী তাহার পা দুইটি পিছনের দিকে ছড়াইয়া একখানি হাত মেঝের উপর সোজা করিয়া রাখিয়া সে এক অপরূপ ভঙ্গিতে বলিয়া পড়িল।

দেখুক কোল হইতে নামাইয়া মাসি আসন পাতিয়া দিতে গেল, নারায়ণী হাত নাড়িয়া নিষেধ করিয়া বলিল, 'না, মা, এই আমি বেশ বসেছি।'

মাসিও তাগার কাছে গিয়া বসিল। ইহাদের দুই স্বামী-স্ত্রীর স্বগড়া-কাটি সে অনেক গুনিয়াছে, কিন্তু উহা যে এত গুরুতর তাহা সে কোনো দিনই বুঝিতে পারে নাই। ভাবিয়াছে স্বামী-স্ত্রীর স্বগড়া, সকলের যেমন হয়, ইহাদেরও তেমনি। হয়, আবার তৎক্ষণাৎ মিথিয়া যায়। কিন্তু স্বামীর ভিতরকার ভয়ে চোখে বাহার মল আসিয়া পড়ে, মুখখানি শুকাইয়া এতটুকু হইয়া যায়, তাহাদের ভিতরের ব্যাপার যে তেমন মুখের নয়, তাহা সে কতকটা অনুমান করিয়া গেল। আচ্ছা, এমন সুন্দরী মেয়ে, মনে মনে মনে নাই বলিয়া হয়ত এমন জান হইয়া গিয়াছে।...মাসি তাহার কপালের চুলগুলি হাত দিয়া সরাইয়া দমেহে তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া ছোট মেয়ের মত আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বীরেন কি তোকে ভালবাসে না, মা ?'

নারায়ণী একটুখানি সলজ হাসি হাসিয়া বলিল, 'হাসে।'

‘তবে এত ভয় করিস কেন?’

নারায়ণী বলিল, ‘সারাদিন খেটেপুটে আসে, মেজাজটা সব সময় ভাল থাকে না।’

মাসি জাহাৎ মাথার চুলে হাত নুলাইতে নুলাইতে ভিজ্জাসা করিল, ‘তোরা বাপের বাড়ীতে কে কে আছে, নারায়ণী?’

নারায়ণীর মুখখানি আবার কেমন বেন হইয়া গেল। বলিল, ‘মা, বাবা, তাই, বোন্ কেউ কোথাও নেই মা; আমার এক পিলি আমার মাঝে করেছিল।’

মাসি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ‘মায়া, বাছা আমার!’

সেদিন পল্লভান করিতে সিঁধা দেবুর জন্ত মাসি একটা দম-দেওয়া জিনের মোটরগাড়ী আনিয়া দিয়াছে। বরের মধ্যে আপন মনে দেবু সেই গাড়ীটা ঢালাইতেছিল। মাসি ও নারায়ণী দু’জনেই কিছুক্ষণ সেইমুকপানে তাকাইয়া রহিল। তার পর মাসিই প্রথমে ভিজ্জাসা করিল, ‘তোরা গুরবাড়ী কোথায়, মা? - বীরেনের নিষের বাড়ী?’

নারায়ণী বলিল, ‘সে একটা বাড়ী মাস্তর ছিল, মা, কলকাতার কাছাকাছি কোন্ একটা গায়ে। ম্যালেরিয়ার সব ম’রে ঝ’রে গেছে, আমার গুরবাড়ীরও কেউ কোথাও নেই, মা। সেদিক দিবে আমাদের মিলেছে ভাল।’

এই বলিয়া মাসির মুখের পানে একবার তাকাইয়া সে আবার বলিল, ‘এখানে-ওখানে এমনি বাসা ক’রে ক’রেই গুরে বেড়াচ্ছি, মা, এতদিন ছেলেপুলে হয়নি, বেশ ছিলাম, কোনও ভয়-ভাবনা ছিল না। উনি মাইনে বা পান তাতে কোনো রকমে চলে যায়, কিন্তু এমনি ক’রে... কি যে হবে ভাবান জানেন।’

নারায়ণী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল। মাসি বলিল, ‘তাবিলুনি, মা, যিনি দীর্ঘ দিয়েছেন

তিনিই আমার জোগাওন। তবে এইখানেই থাক, মা, আর কোথাও যাসনে বেন।’

নারায়ণী বলিল, ‘না, মা, আপনাকে পেলে আমার মনে হয় বেন আমি আমার মা পেয়েছি।’

মাসি বলিল, ‘মামিও ঠিক এমনি ভাড়াটেই চেয়েছিলাম, বাছা।’

তা উৎসবের একরকম ভালই হইয়াছে। মাসিও এতদিন একা ছিল। ইহার-উহার বাড়ী খুঁটিয়া খুঁটিয়া দিন বেন তাহার আর কাটিতে চাহিত না। আশ্চর্যকাল দেবু হইয়াছে তাহার দিব্যাত্মির সঙ্গী। দেবুকে লইয়া সে সকালে উঠিয়াই পল্লভান করিতে যায়, ফিরিয়া আসিয়া দেবু ইস্তিমারের গল্প করে আর মাসি আমাদের রাগা করিতে বসে।

বাপ-মার সঙ্গে ছেলেটার সখ্য আশ্চর্যকাল একরকম ঘুঁটিয়া দিয়াছে। সে মাসিকে ‘মা’, আর নারায়ণীকে বলে, ‘বোমা’।

এই লইয়া মাসি হালাহালি করে। বলে, ‘কই, কেউ তো ওকে শিখিয়ে শেখনি, মা, ও আপনাই বলেছে।’

নারায়ণী বলে, ‘আপনি আমার বোমা বলেন কিনা, তাই শুও শিখেছে। — বলি ওরে চাখা ছেলে, ও সে আমার মা হয় রে, তোরা মা কেন হবে?’

দেবু বলে, ‘বাবা!’

মাসির আনন্দ বেন আর ধরে না। বলে, ‘কেমন বন্ধ! ছেলেকে তোরা আমি নিয়ে নিলাম, নারায়ণী!’ নারায়ণী বলে, ‘ভালই হ’ল। ছেলের ভাবনা আমাদের আর ভাবতে হবে না।’

মাসি বলে, ‘কিন্তু পরের ছেলে, বাছা, সন্দেহই আমার ভয় করে। এক গাছের ছাল কখনও খজ পাচ্ছে লাগে না, মা।’

নারায়ণী বলে, ‘না, মা, সে ভাবনা আপনি কখনো না। আমার ছেলে আর বাই হোক, নেমক-হারাম কখনও হবে না।’

‘তা বেশ, মা, পরে দেখা যাবে। তবে সেই একটা কথা আছে না—যাব সববে তার ভেল, কণামণ্ডি পর। শেষে আবার তা’ই না হয়।’

এই বলিয়া লোককে কোয়ে ভুলিয়া লইয়া মাটি বসে, ‘কিবে চট্টু’ চেয়ে, শেষে আমায় তুলে দাবি না জো?’

লোক খাত নাড়িয়া

কি বীরেন ছোকরাটি কেমন যেন অস্ত-বকম। বাজিতে তাড়াকে বড় একটা দেখাই যায় না। অতি প্রত্যাসে শয্যাভাগ করিয়া নারায়ণী প্রভাত বাগ্না চড়াই, বেলা আটটার মধ্যে স্বামীএ আপিসের ভাত তাড়াকে তৈরি করিয়া দিতে হয়। বেলা সাড়ে আটটা বাজিতে না বাজিত অচোরাদি শেষ করিয়া সেই যে বীরেন বাজী বাতির চট্টয়া যায়, কিরিয়া আসে কোনোদিন রাতি আটটার পর, কোনোদিন বা আসেই না।

মায়ারশীর্ষ এই করটি বসন্তের বিবাহিত জীবনের মধ্যে এমন দিনও গিয়াছে যে, তিন-চারদিন খরিসা অন্যায়ের অনিষ্টায় একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া গিয়া জানালায় ধারে বসিয়া বসিয়া কান পাতিয়া সে প্রত্যেকটি পদস্বরী পথিকের পায়ের শব্দ ভনিয়াছে, স্বামী তাহার চারদিন আসে সেই যে আপিস চলিয়া গিয়াছে তাহার পর আর কিরে নাই! কোথায় গিয়াছে, কি হইয়াছে, মরিয়াছে কি বাতির আছে,

কিছুই জানে না, যেরে কি নাও সে তাড়াকে গিয়া কিছু খাবার আনাটয়া খাইবে, তাতে পয়সা নাও যে জানালায় পাখে কিবি-ভয়ংকর কাছে কিছু কিনিবে—প্রথম চট্টটা দিন এরা রাতি চক্ চক্ করিয়া শুধু জল খাইয়া অসহ উষ্মেগে এবং মরণায় ছটফট করিয়াছে, তাহার পর তাহার স্ত্রী গিয়াছে, ভুজা গিয়াছে, নিভা গিয়াছে, কাঁদিবার শক্তিটুকু পয়সার লোপে পাটয়াছে, বাকী বশ শুধু জানালায় পাশটিকে নিঃশব্দে বসিয়া বসিয়া পরিচিত পল্লভমির প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠ হইয়া যন্টার পর যন্টা কাটাইয়াছে, দিনের পর দিন, রাতির পর রাতি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাইয়াছে,—‘তাদুহ, হয় তাড়াকে কিবাটয়া নাও, নয় আমার মৃত্যু নাও।’

ভগবান মৃত্যুই হয়ত দিচ্ছেন, কিন্তু তাহার পূর্বাশী তাহার দয়া করিয়া কিরিয়া আসিয়াছে।

সেই জন্মাইবার পর, আত্মকাল একাদিক্রমে তিন-চারদিন অল্পপণ্ডিত আর লে হয় না। যদি হয় ত’ বড় জোর একদিন। শনিবার সকালে বাজী চটেতে বাতির হঠ, কিরিয়া আসে রবিবার রাতে।

ভালবাসিয়া, ভাল করিয়া বলিয়া বলিয়া নারায়ণী ভায়রাণ চট্টয়া গিয়াছে। জোর করিয়া বলিতে সে পারে না। বলিবার চেষ্টাও যে সে করে নাই তাহা নয়, কিন্তু, তাহাতে ফল কিছুই হয় নাই। কথাটাকে বীরেন হয়ত হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছে কিংবা ‘হয়ত’ সে মার খাইয়া কিরিয়া আসিয়াছে। (ক্রমশঃ)





বাঙ্গালার কাপড়ের কল

জীনীহাররঞ্জন মিত্র

কিন্তু দিন হইতে বাঙ্গালা দেশে কাপড়ের কল স্থাপনের একটা সড়ি পড়িয়া গিয়াছে। সারা ভারতে এ ব্যবস প্রায় ৪০০ কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে এক মগায়া। পাঞ্জীর অল্প-প্রেরণায় হাজার হাজার ঘরে লক্ষ লক্ষ চরকা ও তকলী চলিতেছে; তথাপি ভারত-বর্ষের চাঙ্গি। মিটাইতে প্রতিবৎসর প্রায় ৩৭ কোটি টাকার বিদেশি বস্ত্র আমদানী হয়। একমাত্র বাঙ্গালা দেশেই ১৫-৬২ কোটি টাকা মূল্যের বস্ত্র বিক্রয় হয়, কিন্তু বাঙ্গালা দেশে প্রস্তুত হয় মাত্র ৫০ লক্ষ টাকা। মূল্যের কাপড় অর্থাৎ বাঙ্গালদেশের চাঙ্গি। মিটাইতে যে-পরিমাণ কাপড়ের দরকার বাঙ্গালা দেশ তাহার চাঙ্গের এক ভাগও প্রস্তুত করিতে পারে না। ইহাতেই মনে হয় ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাঙ্গালা-দেশে, কাপড়ের কল স্থাপনের আরও বড় প্রয়োজন আছে; তাহার এই বিরাট চাঙ্গি। মিটাইতে কেবল মাত্র চরকা ও তকলীর উপর নির্ভর করিলে চলিবে না।

আজ প্রায় ২৮ বৎসর হইতে দেশে যে স্বদেশি আন্দোলন চলিতেছে, তাহার ফলে স্বদেশি ব্রহ্ম ব্যবহার করিবার দ্রুত দেশবাসীর আগ্রহ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশেষতঃ, বিদেশি বস্ত্রের সহিত অসম-প্রতিযোগিতা

হইতে স্বদেশি বস্ত্রকে রক্ষা করিবার দ্রুত বিদেশি বস্ত্রের উপর আমদানী-ভর্য ধাৰ্য্য হওয়ায় এবং বস্ত্র-ভর্য উঠিয়া যাওয়ার বর্তমান সময়ে বাঙ্গালা দেশে কাপড়ের কল স্থাপনের সুবর্ণ-সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এই আমদানী-ভর্য আমদানী ৩১এ অক্টোবর পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছে; এবং তার পরেও বাহাতে ভারতীয় বহুশিল্পকে রক্ষা করিবার দ্রুত এই 'বিল'টা অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে সেজন্য ভারত পৰ্বর্ষমেণ্টের বাণিজ্য-সচিব দ্রুত মোসেক চোর বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। এ বিষয়ে টেরিক্ বোর্ডের রিপোর্টও পৰ্বর্ষমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে; এবং যদিও পৰ্বর্ষমেণ্ট শেষোক্ত বিষয়ে কোন বিবৃতি দিচ্চেন উপনীত হইতে পারেন নাই তথাপি বাণিজ্য-সচিবের চেষ্টা যে ফলবতী হইবে, এরূপ সম্ভাবনা আছে।

এই সকল নানা কারণে মুক্তিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালা দেশে এই সময় বহুশিল্পের বাবসায় অত্যন্ত লাভজনক এবং কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করাই তাহার প্রধান উপায়। বাঙ্গালী যে একথা একেবারে না বুঝিয়াছে তাহা নয়। তাই আজ বাঙ্গালা দেশে তিন-চারিটা কাপড়ের কল বিশেষভাবে কাজ করিতেছে

এবং আরও গ্রার লাভ-খাটো রেজেষ্টারী করা হইয়াছে।

স্বল্পরূপে কাম করিতে হইলে আয়মানিক ২০ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া একটা কাপড়ের কল স্থাপন করিতে হয়। ঐ মূলধন কিরূপভাবে ব্যয়িত হইলে কিরূপ লাভ হইবার সম্ভাবন। নিম্নে তাহার একটা মোটামুটি হিসাব দেওয়া হইল।—

অমিক্রয় ও গৃহনিৰ্মাণ	৩০০০০০
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি স্থাপন	২০০০০০
কলকল্লা স্থাপনের ব্যয়	১৫০০০০
২০০০০ Spindle ও অন্যান্য যন্ত্রাদি	৫০০০০০
Eng. mg, Boiler, Chimney ইত্যাদি	১৫০০০০
Painting, Geating ইত্যাদি	৫০০০০০
৩০০ টাভ, বস্ত্রপাতি	১৫০০০০
তুলা, রঙ, প্রকৃতি কিনিবার ক্ষম মূলধন	৫১০০০০০
মোট	১২০০০০০০

এই তো খেল মূলধন ব্যয়ের হিসাব। এইবার দৈনিক আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখা যাক।

নিঃস্মিত ভাবে মাল প্রস্তুত করিতে দৈনিক ব্যয়—	
২০০ মন তুলার আয়মানিক মূল্য	৩৫০০০
স্বত্ব প্রস্তুত করিবার ব্যয়	২৫০০০
বস্ত্রন করিবার ব্যয়	
Establishment	২০০
স্বত্ব রঙ করিবার ব্যয়	৩০০
অন্যান্য ব্যয়	১৫০০
মোট	১২৫৫০০

আর দৈনিক প্রস্তুত মালের মূল্য—

৩০০ টাভে-ও ১৮০০০ শিঙিলে ২০০০	
পাউণ্ড কাপড় হইতে পারে ; প্রতি	
পাউণ্ড ১৫০/০ হিসাবে ঐ ২০০০ পাউণ্ড	
কাপড়ের মূল্য	
১০০০ শিঙিলে ১২০০০ পাউণ্ড মোট	
স্বত্ব হইতে পারে ;	

উহার আয়মানিক মূল্য	২০০০
১০০০ শিঙিলে ৪০০ পাউণ্ড রঙীন স্বত্ব	
হইতে পারে ; প্রতি-পাউণ্ড ১৫০	
মান। হিসাবে উহার মূল্য	১০০০

মোট ১৬৭৮৭১০

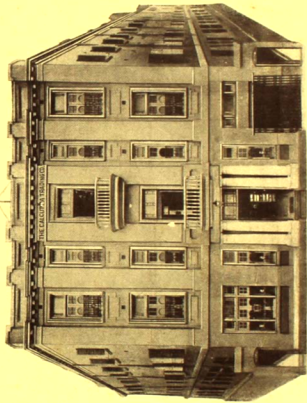
তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ২০ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া একটা কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিলে তাহাতে দৈনিক আয় হইতে পারে ১৬৭৮৭১০ টাকা। আর, ব্যয় হইতে পারে ১২৫৫০০

দৈনিক লাভ মোট ৪১৩৩৭০ টাকা

সুতরাং বৎসরের যদি ২৭৫ দিনও (রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন বাত দিয়া) কাম হয় তাহাশি বার্ষিক লাভ হইতে পারে ১১৩৭৮১২৪০ টাকা। অর্থাৎ গড়ে শতকরা ৫৫ টাকা লাভ।

যতদূর সম্ভব কাম করিয়া লাভ দেখান হইল ; কারণ বাজার উঠা-নামা এবং প্রস্তুত মালের কাটুতি করার উপর লাভ নির্ভর করে। প্রস্তুত মাল কাটুতি হওয়া সত্ত্বে অনেকটা নিঃসন্দেহ হওয়া যায় ; কারণ বাজার শেষের এত বড় চাহিদা থাকিতে মাল কখনই আটকা থাকিতে পারে না। ইহার উপর বাজার যদি সমান ভাবে থাকে তবে লাভ যে আরও অধিক হইতে পারে সন্দেহা বলাই বাহুল্য।

কাপড়ের কল স্থাপন করিতে হইলে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া স্থান নির্বাচন করিতে হয়। নির্বাচিত স্থানের আবহাওয়ায় জলীয় বাষ্প অধিক পরিমাণে থাক। প্রকার ; রেল, নদী, বাষ্পপথ প্রকৃতি থাক। নিত্য প্রয়োজন। তাহাতে তুলা ও অন্যান্য বস্ত্রাদি আমদানী করা এবং উৎপন্ন ব্রব্য দেশ-বিদেশে রপ্তানী করিবার বিশেষ সুবিধা হয়। অধিকন্তু, বাহাতে নির্বাচিত স্থানে প্রমিকের অভাবে বেগ পাইতে না হয়, সেদিকেও লক্ষ্য থাকা প্রকার।



উদ্ভিদ-কল্যাণ-কল্যাণ-কল্যাণ

৭৯-৯, লোয়ার মার্ভার রোড, কলিকাতা

কল্যাণ-কল্যাণ-কল্যাণ



বঙ্কিমচন্দ্রের “বঙ্গবর্নন” বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে নবমুগেরে অবতরক। সেই পত্র সর্বত্র রবীন্দ্রনাথ বলিষ্ঠাছেন —

“বঙ্গবর্ননের পূর্ববর্তী এবং তাহার পরবর্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা তাহা অপরিস্রুত। দাঙ্কিলিং হইতে ঐহাওয়া কাকনমজ্জার শিখরমালা দেখিয়াছেন তাহারা আমেন সেই অতন্তেবী শৈলপদমাটের উনধরবিবশিসুচ্ছল কুয়াস্ত-কিতীট চুচ্ছিকের নিরুজ গিরিপারিধনবর্ণের কত উচ্চে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী বঙ্গসাহিত্য দেখিরা আকস্মিক অতুরিত লাভ করিয়াছে; একবার সেইটা নিরীক্ষণ এবং পরিমাণ করিয়া দেখিলেই বঙ্কিমের ঐতিজার প্রতৃত বল সহজে অহমান করা হাইবে।”

এহেন “বঙ্গবর্ননের” প্রকাশদুখে পত্র-সূচনাধ মাসিক পত্র বাহির করার কৈকিরং স্বরণ বঙ্কিমচন্দ্র ১২৭১ সালে যে-সব কথা বলিয়াছিলেন তাহার কিরংশ এই —

“বাসালা ভাবার ঐতি বাঙ্গালীর অনাবরেই, বাঙ্গালীর অনাসর বাড়িতেছে।.....স্থপিক্তি বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা পাঠে বিদ্বৎ বলিয়া, স্থপিক্তি বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনাও বিদ্বৎ।

“আমরা এই পক্ষকে স্থপিক্তি বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী করিতে বহু করিব। বহু করিব, এই মাত্র বলিতে পারি। বহুরে সফলতা ক্ষমতাদীন। এই আমাদিগের প্রথম উদ্দেশ্য।

“খিতায়, এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হরে, আরও এই কাননাধ সমর্থন করিলাম যে, তাহারা ইহাকে আপনাদিগের বাস্তবই স্বরূপ বাবতার করুন।.....এই পত্র, কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জ্ঞত বা কোন সম্প্রদায় বিশেষের মঙ্গল সাধনার্থ সৃষ্ট হয় নাই।

.....বাহাতে এই পত্র সর্গজনপাত্য হয়, তাহা আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য।

“.....তৃতীয়, বাহাতে নবা সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সন্ধনভা সন্ধিত হয়, আমরা তাহার সাধাঙ্গসাধে অহুমান করিব।.....

এই “বঙ্গবর্নন” আবার ১৮৭৮ সালে যখন নব পত্রাধে রবীন্দ্রনাথের সম্প্রদানে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে তখন রবীন্দ্রনাথ তাহার সম্প্রদায়ী উদ্দেশ্য সর্বত্র বলিয়াছিলেন —

“এখনকার সম্প্রদায়ের একমাত্র চেষ্টা চাইবে, বর্তমান বস্তুচিত্তের প্রেত আদর্শকে উপদ্রুত ভাবে এই পত্রে প্রতিফলিত করা।.....আমরা একান্ত মনে আশা করি, বঙ্গবর্নন সকল সাময়িক কোলাহল হইতে নিজেকে মুক্তে রাখা করিয়া সাহিত্যের আদর্শকে নিত্যকালের অচল শিখরের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

“.....ভীকতা, কচিৎপ, সত্যের অপলাপ এবং সর্গপ্রকার সাহিত্যানীতির শৈথিল্য, আমাদের পক্ষে অস্বাচ্ছন্দ্য। আশা করি, সর্গ পাঠকগণ আমাদিগকে সেই ঐক্যপথে স্থির রাখিবেন এবং সর্গ লেখকগণ সেই ঐক্য পথে আমাদিগকে চালনা করিবেন।”

বহিঃসম্পর্ক ও রবীন্দ্রনাথ—এই দুই মহানবীর মাসিক পত্র পরিচালন বঙ্গসাহিত্য চিহ্নিনের জন্য পত্র-সম্পাদনের আদর্শ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। যুগ-ধর্মের কোন কোন সমস্ত ছাড়া তাঁহাদের সম্পাদকীয় উদ্দেশ্যের অভিযান্ত্রিক উপর নতুন প্রকল্পের কিছু অতিবাস্তি আমাদের নাই। “উদয়নের” মূল্য আমাদের আশ্রয়। এই দুই মনীষীর প্রতি মহতী বাণীর অমূল্যবর্তনের অভিপ্রায় লইয়াই সাহিত্যপথে যাত্রা করিবাম। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় আমাদেরও উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় হউক—ইগাই আমাদের বিনীত কামনা।

আমাদের কাগজের বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পর্ক এখানে একটি বিবরণের উল্লেখ করা হইতে পারে। একধার পুনরুজ্জীবিত নিম্নরোমন ঘে, আমাদের দেশ পল্লীপ্রাণ ও পল্লীপ্রধান। যে কয়টি বৃহৎ নগর নব্য-সভ্যতার যুগে গড়িয়া উঠিয়াছে, কোন বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক, এই দেশ পর্যটন করিয়া নগরগুলির পরিচয়ের কালে বলিয়াছিলেন—“mongrel cities”: কথাটি আর নির্ভল্য সত্য। আমাদের সংস্কৃতির ভালো মন্ড বাহাই থাকুক—দেশের সভ্যতার পরিচয় লইতে হইলে পল্লীতে পল্লীতে তাহার বিশেষ অধ্যয়ন করিতে হইবে। দেশের জন্য সত্যই যদি কোন কার্য করিবার প্রচেষ্টা করি, দেশের মাস্তিতে সে প্রচেষ্টা যেমন শিকড় গড়িতে পারে। নৃত্যোদ্ভাবন-সৃষ্টির বিলাসিতার আশাভরমাতা হইতে মুক্ত হইতে চাইবে। আমরা বাঙ্গালা দেশের পল্লীগুলির বিবিধ তথ্যের বিবরণের জন্য আবেদন পত্র করিলাম। ভরসা করি, বেশ-প্রেমিক বাঙ্গালী আমাদের প্রচেষ্টাকে সার্থক করিয়া তুলিবেন। এইসব বিবরণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা, বিভিন্ন স্থানের সুশ্রবণ স্বরূপ বিবিধ পত্রিক। হইতে পল্লীগুলির অভ্যর্থনা-অভিযোগ ও উন্নতিমূলক তথ্যাদির বিবরণও সাগ্রহে প্রকাশিত করিব। বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী জাতির সর্বাঙ্গীন পরিচয় দান ও উন্নতি-কার্যে নিজেদের নিয়োজিত করা আমাদের বিশেষ লক্ষ্য।

ঐচ্ছিক জ্ঞানপ্রমোহন দাস মহাশয়ের “বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী” নামক গ্রন্থের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় বাঙ্গালী জাতির অধাবাস্য ও কর্ম-পন্থির অসুখ পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান কালে ইহার সবচেয়ে বড় পরিচয় পাওয়া যায়—বিমান-পথ-যাত্রার বাঙ্গালীর উদ্দেশ্যে। রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে Bengal World Flight Club নামে যে-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে তাহার কার্যে স্নিগ্ধমে চলিতে থাকিলে বাঙ্গালী “কুণো” এই দুর্নাম লোপ পাইবে, এবং অসম্ভব কার্যের দ্বারা এই একটি অসমসাহসিক কার্যেও ভাবভীতিগুলির মধ্যে তাহার পল্লি প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমরা বাঙ্গালীর এই উদ্দেশ্যের সাফল্য সবক্ষে বিশেষ আশা পোষণ করি।

বাঙ্গালা দেশের দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলিতে প্রায়ই দুই চারিটি নারী-বর্ষণ বা নারী-বহুসংখ্যক সংবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। দুই-তিন শুভসংসার হাত হইতে নারীদের রক্ষা সবক্ষে অনেক আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। বাঙ্গালী নারীরা দুর্দল, স্তম্ভরাং তাগাদিগকে পশ্চিমতী করিতে পারিলে, তাহারা নিজেরাই মাধবিকা করিতে পারিবেন, এরূপ অল্পমান অনেক করিয়াছেন। এ সবক্ষে আমাদের কিছু বলিবার আছে। নারীদের পশ্চিমতী হওয়া প্রয়োজন বটে, কিন্তু যে-দেশের পুরুষের পশ্চিমতী হইয়া আপনাদের স্বতন্ত্র-পুত্রিকাদিগকে রক্ষা করিতে অসমর্থ, সে-দেশে কেবল নারীদের পশ্চিমতী হইতে বলাট। কি একটা হস্তকর ব্যাপার নহে? আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালী পুরুষের যে-মাত্রা সাহসী, নীতীক ও পশ্চিমতী হইয়া উঠিবে, সেই মাত্রার নারী-বর্ষণ বা বহু ব্যাপারটিও কমিয়া যাইবে। হিন্দু সমাজের লোকে পরস্পরের বিপদ-আপদে পরস্পরের প্রতি সহায়তাহীন হওয়ায়ও নারী-বহু হইয়া ইত্যাদি ব্যাপারের সুযোগ ঘটয়াছে। স্তম্ভরাং বর্তমানে সম্মত হওয়া হিন্দুর বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

আদিমকালে যে-মানুষ একদিন রিক্সা, অসহায় ও শক্তিশীল ছিল সে আপনায় বৃদ্ধি-প্রভাবে ধীরে ধীরে বল ও ভল জয় করিয়া ‘পৃথিবীরাজ’ হইয়া উঠিয়াছে। আজ আবার সে “আকাশরাজ” হইবার আকাঙ্ক্ষায় উদ্ভত হইয়াছে। বিমানপথে আজ তাহার গতি অব্যাহত; পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ অতিক্রম করিবার ক্ষমতা সে ব্যাকুল। কয়েক বৎসর পূর্ণে নটন নাচের নেকড়ে যে বীরের দল পায়ে হাঁটিয়া এভারেট পর্বত প্রায় অতিক্রম করিয়াছিল, তাহাদের সাহস ও শক্তি-প্রভাবে অল্পপ্রাণিত হইয়া লর্ড লাইটফুটের নেকড়ে আর একটি বীরের দল উজোকাহাছের সাহায্যে এভারেট অতিক্রম করিতে লুপনবৃত্ত হইয়াছেন। রাষ্ট্রসেখ শাহের পেরিচালিত অশ্বার একটি দলও পায়ে-হাঁটিয়া এভারেট জয়ের আয়োজন করিতেছেন। তাহার সাফল্য লাভ করিতে পারিলে সমগ্র মানব-সমাজেরই মুখ উজ্জল হইয়া উঠিবে।

বৃহত্তম মহাক্ত-সমষ্টির সমতা বলিয়াও চীন-সমতার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। নানা কারণে আন্তর্জাতিক সমাজের দাবির ও গুরুত্ব এই সভ্যতাকে বিশেষ করিয়া বাড়িয়া পিয়াছে এবং বহু স্থানীয় সমতাও যে আন্তর্জাতিক সমতা হইয়া উঠে, গত মহাযুদ্ধই তাহার বিশিষ্ট উদাহরণ। আমাদের বর্তমান স্বাধীনতা-অবস্থার আমাদের মনের বাতাবিক সহায়ত্বের গতি আমাদের মতই প্রাচীন সত্য-বিশ্বস্ত চীনের দিকে ঘাইবে, পশ্চিমের ‘গুরু-মাতা চেনা’ জাপান, বাবলা-ক্ষেত্রে নিত্যমুগ্ধ জাপান, আজ চীন-সম্পর্কে আমাদের সহায়ত্ব পাইবে না। কিন্তু আরও প্রশ্ন আছে। জাপান মহাক্তত্বের দাবী করিতে পারে কি না? জাপান মহাচীনের যে-প্রশ্নে নিজ অধিকারের প্রশ্ন তুলিয়াছে—সে-স্থান স্থায়ী দিন হইতে মহাচীন হইতে বিচ্ছিন্ন; মহাচীনের ইতিহাসের পৃষ্ঠিত সে-অংশের যে বোম্ব, মহাচীনের সে হইল বড়

মানির কথা। সে-স্থানের অধিবাসীদের সঠিত বাস চীনের স্বাধীনতা ও রক্ষিত বিশেষ পার্থক্য আছে। ই স্থান জাপানের নব-ভাগরণের দিন হইতে জাপানের কয়েকটি ‘প্রভাবাধিত’ বা ‘রক্ষিতাংশ’ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। জাপান তাহাকে নিজ অংশ বিবেচনা করিয়া নিজ অর্থ-সামগ্রী দিয়া তাহার উন্নতি বিধান করিয়াছে। নব-ভাগ্রত চীন আজ সে সকলের প্রতিবাদ করিতে পারে তাহা নিঃসন্দেহ, করাও নিশ্চয় উচিত, তথাপি কর্পণতা করার মত বক্তব্য জাপানও কিছু নিবেদন করিতে পারে। বাট্‌লার্স বাসেলের বই—‘The Problem of China’ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২২ খৃঃ, এবং অগস্ত: ১৯২৬ খৃঃ পৰ্য্যন্ত সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। চীনে বাস করিয়া, সে-দেশকে কল্যাণকর করিয়া, জগতের সন্ততম প্রেরণকারী এই পুস্তকখানি রচনা করেন। ইহাতে চীন সম্বন্ধে স্থপতির ভাবে অত্যন্ত দরদ দিয়া চীনের কথা বলা হইয়াছে। বাসেল প্রতীক-সভায় আস্তাতীন, তিনি প্রাচ্যের এই সভ্যতাকে মনোনিবেশ করিয়াই গঠন করিয়াছেন এবং সেইজন্যই পুস্তকখানি একটু চিন্তা করিয়া পাঠ করা আবশ্যিক। এত সংক্ষেপে চীন-ভাতি ও চীন-সভ্যতার অর্থ-পৃষ্ঠিত সঠিত আলোচনা বিরল।

“উদ্বোধন” মলাটের পৃষ্ঠার পরেই স্বর্গীয় অতীন্দ্রনাথ যে মহাপ্রেরণে যে একখানি ছবি ও ‘পিতৃ-গুরু’ নামে যে একটি নিবন্ধ ছাপা হইল সে-সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। “উদ্বোধন” স্বাধিকারী ঐন্দ্রজিৎ অনিলকুমার সে সভ্যতার অতীন্দ্রবাবুর পুত্র। সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশের গুরুত্ব প্রদর্শন করিবার সময় অনিলবাবু তাহার পিতাকে প্রণতি জানাইয়া কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন। তাহার পিতা অতীন্দ্রবাবু একজন কৃতী বঙ্গদত্তান ছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ‘লাহা হলারশিপ’ লইয়া প্রবেশ করেন এবং সেখান হইতে বি-এ

পাণ করেন। শেক্সপীয়ার-সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজের সুবিখ্যাত অধ্যাপকবর "রো" এবং "টনি"র তিনি প্রেম ছাত্র ছিলেন। "সুপ্রভাত" নামে বাংলা বৈনিক পত্রের এক কয়েকখানি ইংরেজী পত্রেরও সম্পাদকীয় কার্যে অতীতবাবু কিছুকাল লিপ্ত ছিলেন। এমন সময়ে

অকালে ২৮ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তিনি বিশেষ সাহিত্যাত্মরাশী ব্যক্তি ছিলেন, এবং তাঁহার স্বভাব-দীর্ঘকালের মধ্যেই তিনি বহু কণ্ঠে নিযুক্ত ছিলেন। এই সাহিত্যসেবী কৃতী ব্যক্তির পুত্রই আম তাঁহাকে প্রণতি জানাইয়া "উদয়ন" সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হইলেন।

খেলাধুলা

পরলোকে "রজি"

সুবিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়, দামনপুরের ডাংহাং বাট ধরার, গাড়াইবার এক মারের দামনগাহের বর্ণিতসিদ্ধী বিগত ২২। এপ্রিল নিউসোনিয়া রোশে আক্রান্ত হইয়া হঠাৎ মারা গিয়াছেন। রাজা ধরার (Fielding) হওয়ার পূর্বে এক দিল্লিতে অবস্থান কালে, তিনি সাধারণের নিকট "রজি" নামে পরিচিত ছিলেন। ক্রিকেট খেলার মাঠে "রজি"কে যেখানে চারি-দিকে উৎসাহের সড়কা পড়িয়া বাইত। তিনি ক্রিকেট খেলায় যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, এ সুসংকেই সংক্ষেপে পাবে নাই। ইংল্যান্ডের হইয়া। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিনিধিত্বকারী খেলায় (Test Match) তিনি বহুবার নিজের খেলার ক্ষমতা ইংল্যান্ডকে প্রদর্শিত।

Sussex County ক্রিকেট

দলের ক্যাপ্টেন হিসাবে বহু বৎসর তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া ক্রিকেট জগৎকে চমকিত করিয়াছেন।

ডাংহাং বাট ধরার, গাড়াইবার এক মারের সহজ ও সুন্দর ভঙ্গি, ধরার (Fielding)



রজি

অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী ও বিশ্বজয়ের কারণ ছিল। তাঁহার খেলা দেখিয়া সমস্তদারশন বসিয়াছেন, তিনি উৎসাহের ক্রিকেট খেলার "মার্টিট" ছিলেন। তাঁহাকে "Idol of Cricket Crowds" অর্থাৎ "ক্রিকেট দর্শকের পূজিতদমন" বলা হইত,—বাস্তবিক তিনি ছিলেনও তাহাই। "রজি"র ক্ষমতা তারতম্য অর্থাৎ তারতম্য-প্রতিনিধিত্ব ক্রিকেট জগতে স্বীয়দান অধিকার করিয়া ছিল। "রজি" অবিবাহিত ছিলেন; তাঁহার স্ত্রী-পুত্র প্রিন্স দলিশসিদ্ধীও ক্রিকেট

খেলার অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া গুরুত্বের পদাঙ্ক করিয়াছেন।

উদ্বোধন-চৈত্র, ১৩৪০



শ্রী অরুণা দেবী

জ্যৈষ্ঠ

উদয়ন

প্রথম বর্ষ

দ্বিতীয় সংখ্যা



সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

...সংস্কৃত কাব্যে অমৃতবার সধকে আমার মত এই
নে, কাব্যধর্মনিমিত্ত গড়ে ছাড়া বাংলা পদ্যধ্বনে তার
গায়ত্রী ও রস রক্ষা করা সহজ নয়। দুটি চারটি
শ্লোক কোনো। মতে বানানো যেতে পারে, কিন্তু ধীর্ঘ
কাব্যের অনুবাদকে স্বপণাটো ও সহজবোধ্য করা
জুসাম্য। নিত্যন্ত সরল পদ্ধতিতে তার অর্থটিকে প্রোক্ত
করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে ধ্বনিসঙ্গীত মারা
যায়—অথচ সংস্কৃত কাব্যে এই ধ্বনিসঙ্গীত অর্থসম্পদের
চেয়ে বেশি বই কম নয়।

...বাঙালীর কান ব'লে কোনো বিশেষ পদার্থ আছে
ব'লে আমি মানিনে। মানুষের স্বাভাবিক কানের
দাবী অহুসরণ করলে দেখা যায়, মনোক্রান্তা ছন্দের
চার পক্ষ, যথা—

মেঘালোকে। ভবতি স্মৃণিনো। পাত্তব্যাত্ম্য। তিচেতঃ—

মাত্রা হিসাবে ৮-১-১-৪। শেষের চারকে ঠিক
চার বলা চলে না। কারণ, লাইনের শেষে একমাত্রা
আলোড়ের ধতি বিরামের পক্ষে অনিবার্য। এই
ছন্দকে বাংলার অন্তর্ভুক্ত গেলে এই রকম পাঠ্য :—

দূরে কেলি গেছ তানি,
শুভির বীণাখানি
বাঞ্ছ্যে তব বাণী
অধুরতম।
অহুশমা, তেনো অচি,
বিবচ চিরভটী
করেছে মধুনতী
বেদনা মম।

সংস্কৃতের অমিতাক্ষর-রীতি অহুবল্লব করা যেতে
পারে, যথা—

অভাখা সক্ষ কবে করিল কামে হেলা কুণের তাই গারে
হিলেন শাপ,
নির্কাসনে সে রহি' প্রেরসী-বিচ্ছেদে বর্ধ ভরি' স'রে
দারুণ আলা।

গেল চলি' রামগিরি পিথর-আশ্রমে গারাবে লজ্জাত
মহিমা তার,
সেখানে পাদপরাতি শিথ ছাত্রাত্ত সীতার মানে পুত
সলিল-ধাবা

ছোটগল্প

প্রথম চৌধুরী

(১)

ছোটগল্প, ভাষাতত্ত্ব উপকথা, ইচ্ছে পৃথিবীর আদি নয়। এই উপকথাই বাঙালীর মুখে রূপকথা আকার ধারণ করেছে। আর রূপকথাই যে আদি ছোটগল্প, তা' কে না জানে? এবং সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে ইচ্ছে উপকথার জন্মভূমি; অন্ততঃ এ কথা অবিসংবাদী যে, স্ক্রুত ও প্রাকৃত সাহিত্যে ষড় উপকথা আছে, পৃথিবীর অপর কোন সাহিত্যে তার শতাংশের এক অংশও নেই।

বৌদ্ধ-জাতক অসংখ্য। মহাভারত আর পুরাণেও অসংখ্য উপকথা আছে। সেগুলি যদি সব একত্র সংগ্রহ করা যায়, তাহ'লে বৌদ্ধ-জাতকের চাইতেও পরিমাণে বেশি হবে। আর এই উপকথার ভিত্তির উপরেই স্ক্রুত কাব্য-সাহিত্য গড়ে উঠেছে। তারপর 'কথাসরিৎসাগরে'র নামেই পরিচর্য যে, তাতে কত কথা সংগৃহীত হয়েছে। আর পুণ্যপঙ্কীর চরিত্র ও ব্যবহার অবলম্বন করে যে কত উপকথার সৃষ্টি হয়েছে, তার পরিচর্য পাওয়া যায় 'পঞ্চতন্ত্র'।

এই অসংখ্য উপকথার সৃষ্টি করেছে নিরঙ্কর লোক-সমাজ, শিক্ষিত সাহিত্য-সমাজ নয়। দণ্ডী বলেছেন যে, "কথা হি সর্বভাষাভিঃ সঙ্কল্পেন চ বধ্যতে।" এর থেকে অস্বহন করা যায় যে, দণ্ডীর কালে বেশির ভাগ উপকথাই রাজাদের মুখে শুনে সেকালের কবিরা তা' লোক-ভাষায়, আর কোন কোন গল্প স্ক্রুত ভাষায় লিপিবদ্ধ করতেন। এই বিপুল সাহিত্যের জন্ম লেখনী দেয়নি, দিয়েছে রসনা।

বৌদ্ধ-জাতক স্ক্রুতঃ পালি ভাষাতেই লিখিত, পরে

তা' স্ক্রুত ভাষাতেও প্রমোদান পেয়েছে। 'বৃহৎ-কথা' পৈশাচী নামক কোনও অনির্দিষ্ট-প্রাকৃত নাকি প্রথমে রচিত হয়েছিল, তারপর তা' 'কথাসরিৎসাগরে' রূপান্তরিত হয়েছে। এর থেকে মনে হয় ভারতবর্ষে ইচ্ছে স্বার্থ ছোটগল্পের স্রোত।

(২)

সেকালের সাহিত্যিকগণ এসব উপকথা নিয়েই মাথা থেকে বার করেননি, কেবলমাত্র লোক-কথা সংগ্রহ করেছিলেন, এবং অল্পবিত্তের রূপান্তরিত করেছিলেন। মহাভারত-পুরাণের উপাখ্যানাবলী, 'বৃহৎ-কথা' উপকথাসমূহ, জাতকের ও 'পঞ্চতন্ত্র'র গল্পগুলি, সবই লোক-কথার সাহিত্যিক সংস্করণ মাত্র।

এই জনসমাজের সৃষ্ট উপকথাগুলি মানব-সমাজের যে চির আনন্দের লামণী, সেকালের সাহিত্যিকগণ তা' বৃহৎ পেয়েছিলেন; আর ঐ সব উপকথা অবলম্বনে যে লোক-সমাজকে শিক্ষাদান করা যেতে পারে, তা' তাঁদের চোখ এড়িয়ে যায়নি। তাই জাতকের গল্পগুলি বৌদ্ধমতের লোকায়ত text-book; 'পঞ্চতন্ত্র'র গল্পগুলি রাজমতের text-book; এবং মহাভারত ও পুরাণের গল্পগুলি হিন্দু ধর্ম ও আচারের প্রচারের কার্যে ব্যবহৃত হয়েছিল।

কিছু এসব ধর্ম সম্বন্ধে ঝার। উদাসীন, আত্ম পরিত্যক্ত এর অবিক্রাণে গল্প তাঁদেরও আনন্দের লামণী—কারণ "কথায়ই অবিক্রাণে" এ শিক্ষা দান করা হয়েছে।

এর পর আরও ভাষায় একটি অপূর্ণ গল্পসংগ্রহ

প্রকাশিত হয়। এবং এ আরব্য-উপক্কার যে বিখ্যমানবের অতি প্রিয় বস্তু, তা' কে না জানে? অনেক পরিচয়ের বিবাস যে, আরব্য-উপক্কারের গল্পসমূহ ভারতীয় উপক্কার ভাণ্ডার হ'তে সংগৃহীত। এ অমূল্য আনি সহজেই গ্রাহ্য করি। কেননা, 'কথাসরিংগাসরে' এমন গুটিকতক গল্প আছে, যা' আরব্য-উপক্কারে বেসামান্য পূরে বেওয়া যায়। আর 'পঞ্চতন্ত্রের' গল্প যে ইউরোপে অমূল্যবোধের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, তার প্রমাণ আছে। সুতরাং আমাদের জাতিই যে ছোটগল্পের প্রধান কণ্ঠী ও ভোক্তা—সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

(৩)

এখন ইউরোপের দিকে তাকানো যাক। গ্রীসের বিখ্যাত সাহিত্য এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। গ্রীক ভাষা আনি জানিনে, কিন্তু গ্রীক সাহিত্য যদি উপক্কার সমৃদ্ধ হ'ত, তবে সে সংবাদ আমাদের কাছেও পৌঁছত। গ্রীসেও সেবসেবীর বহু উপাখ্যান আছে, কিন্তু সেগুলি ছোটগল্পের পর্যায়ভুক্ত নয়। ও ভাষার 'পঞ্চতন্ত্রের' সমুদ্র 'Esop's Fables' আছে, যা' 'কথামালা'র প্রমাণে আমরা সকলেই জানি। এ 'কথামালা'র রূপ অতি চমৎকার। এত অল্প কথার এমন সুগঠিত এ-মাত্রীর গল্প আর কেউ বস্তুতে পেরেছেন ব'লে জানিনে। এবং এই artistic স্তপেই এ গল্পগুলি বিখ্যমানবের কাছে এত প্রিয় হয়েছে। এ গল্পগুলির প্রভা' গোক-সমারাই হ'ক আর যিনিই হ'ন, তিনি সাহিত্য-জগতের একটি প্রধান স্তম্ভ।

ইউরোপের প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে আনি বিশেষজ্ঞ নই, সুতরাং যে-সব গল্প-লেখকের নাম আমরা সকলেই শুনেছি, তাঁদেরই নাম করব।

গ্রীকো-রোমান সভ্যতার অধঃপতনের পর ইউরোপে কোনও অমর কথাসাহিত্য জন্মলাভ করেনি, সম্ভবতঃ এক রূপকথা বাতীত—যে-সব রূপকথা Grimm অধ্যাপন শতাব্দীতে সংগ্রহ ক'রে, সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

এর পূর্বে Renaissance-এর যুগে ইতালিতে আবার নব্য-উপক্কার-সাহিত্য জন্মলাভ করে। এই যুগে ইতালির কথাসাহিত্যের মধ্যে Boccaccio সর্বশ্রেষ্ঠ। Boccaccio-র রচিত গল্পের ভিতর সুখচিত্রও নেই, দুঃখচিত্রও নেই—এবং তিনি কোনরূপ ধর্মপ্রচারের উপকরণরূপ এ-সব গল্প লেখেননি। কিন্তু এ-সব গল্পের ভিতর পঞ্চ ও নীতি না থাক, আট আছে। সর্ব-প্রকার idealty-র দিকে পিঠ কিরিয়েও যে রক্তমাংসে-গড়া মানুষ নিয়ে চমৎকার গল্প লেখা যায়—এ সত্যের আবিষ্কার বোধহয় Boccaccio প্রথম করেন। এর ফলে ইউরোপের সকল ভাষার এ'র গল্পগুলি অনুদিত হয়েছে, আর সেগুলি বহুলোকের নিকট পরিচিত। মানুষের হাসি-কান্নার মূল যে তার অন্তর্নিহিত, এবং কোনও সৈবশক্তির অগ্রদূত বা নিগ্রহের উপর নির্ভর করে না—এই হচ্ছে বকাচিওর কিলকি। আর এই কিলকিই ইউরোপের নব্য-উপক্কারের অন্তরে রয়েছে।

(৪)

এর পর ইউরোপে নানা ভাষার অবশ্য Boccaccio-র অন্তরঙ্গ্যে নানা গল্প লিখিত হয়েছে, কিন্তু সে-সব লেখকরা প্রতিভার বঞ্চিত ছিলেন ব'লে তারা কেউই সাহিত্য-সমাজে Boccaccio-র স্তায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেননি; সুতরাং তারা সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত নন।

তারপর ইউরোপে নভেল নামক নব্য-কথাসাহিত্য জন্মলাভ করলে—এবং দিন দিন এই নব্য সাহিত্য এমন বৃদ্ধি পেতে লাগল যে, আমকের দিনে এ-মাত্রীর সাহিত্যের তুল্য বিপুল সাহিত্য আর দ্বিতীয় নেই। সাহিত্য-ক্ষেত্রেও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ফসলের চাষ মানুষী হ'য়ে উঠে।

এর ফলে উপকথা আওতার ন'ড়ে গেল। লেখক ও পাঠক এ-মাত্রীর সাহিত্যকে উপকথা কহতে লাগলেন। ফলে ছোটগল্প ছোট-সাহিত্য ব'লে পণ্য হ'তে লাগল।

উনিবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে প্রধান গল্প-লেখকেরা

প্রায় সকলেই নভেল-লেখক। Scott, Dickens, Thackeray, George Eliot, Balzac, Tolstoy-এর নাম কে না জানেন?

উপরোক্ত বড় ইংরাজ নভেলিস্টরা কেউ ভাল ছোট-গল্প লেখেননি; কিংবা লিখতে পারেননি। অথবা নভেলের ভিতরও একটি গল্প থাকে; কিন্তু সে-গল্প নভেলের প্রাণ নয়। অপরদিকে গল্পই হচ্ছে ছোটগল্প ওরফে উপকথার প্রাণ। সুতরাং ঐরাং নভেল-লেখক, তাঁরা ছোটগল্প লেখার মনোনিবেশ কর্তে পারেন না।

অথবা এমন লেখকও আছেন, যারা এ উভয় জাতীয় সাহিত্যে সিদ্ধান্ত—বাধা করায় সে- Balzac এক কণিয়র Tolstoy। কিন্তু সচরাচর এ দুই পক্ষি একই লেখকের মেহে থাকে না।

(৫)

আমি পূর্বে বলেছি যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে হচ্ছে উপকথার দেশ, আর বর্তমান ইউরোপ হচ্ছে উপকথাসের দেশ। সুতরাং তাই নয়, উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে উপকথা একরকম উপ-সাহিত্য হ'য়ে পড়েছিল।

হঠাৎ Maupassant নামক জনৈক ফরাসী সাহিত্যিক ছোটগল্পকে আবার সাহিত্য-রাশ্যে উন্নতগত্রে প্রতিষ্ঠিত করেন। এর কারণ, Maupassant-র গল্পের নৃতনব ও বৈচিত্র্য, তাঁর ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য, ইউরোপের পাঠক-সমাজকে হুগলং হুগ ও চমকিত করে। ইউরোপের সাধারণ পাঠক-সমাজ এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা একবারে Maupassant-কে একজন অমিষ্ট সাহিত্যিক ব'লে অবিলম্বে স্বীকার করেন। বসন্ত Tolstoy ত' তাকে উনবিংশ শতাব্দীর একমাত্র প্রতিভাসম্পন্ন কথানিষ্ঠা বলেন। এর ফলে তাঁর গল্পসমূহ নানা ভাষায় অনূদিত হ'য়ে পৃথিবীবর্ষ ছড়িয়ে পড়ে।

আমি এখন কল্যাণে পড়ি, তখন গল্প-সাহিত্যে Maupassant রাখা। এবং আমরা যাঁরা সেকালে ইউরোপীয় সাহিত্যের চর্চা করতুম, অনেকেই তাঁর

গল্প-সাহিত্যের সঙ্গে অপ্রতিরূপিত পরিচিত ছিলাম। ফলে, এ-মুহুরে বাঙালার ছোটগল্প Maupassant-র ছোটগল্পের দ্বারা অল্পপ্রাণিত হয়েছে। কি হিসেবে, তা' পরে বলছি। এখানে শুধু একটি কথা বলতে চাই। ইংলণ্ডের এ-মুহুরে প্রের ছোটগল্পলেখক Kipling-এর কোনরূপ প্রভাব বঙ্গ-সাহিত্যের উপর নেই। এর কারণ, Kipling-এর কথা-সাহিত্য আমাদের কাছে প্রিয়ও নয়, অতএব পরিচিতও নয়। এক্ষেত্রে আমরা ইংরাজী সাহিত্যের কাছে কণী নই।

(৬)

তখনকার অনেক লেখক যে Maupassant-র কথাবলীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, আর সে সাহিত্য যে তাদের প্রিয় ছিল—তাঁরা প্রমাণ Maupassant-র কতকগুলি গল্প বাঙালী ভাষায় বহুবায় অনূদিত হয়েছে। কিন্তু কেউ তাঁর গল্পের অঙ্কুরণ করেছেন কিংবা তাঁর গল্প চুরি করেছেন ব'লে ত' জানিনে। কারণ তাঁর গল্পের বিষয় চুরি করা যায়, কিন্তু তাঁর ভঙ্গ চুরি করা যায় না। আর Maupassant-র অনেক কথার ভঙ্গ বাদ দিলে—তাঁর বিষয় নিত্যম অকিঞ্চিৎকর এবং অপ্রিয় হ'য়ে পড়ে।

তবে তাঁর গল্প-সাহিত্যের দ্বারা আমাদের গল্প-সাহিত্য যে অল্পপ্রাণিত, এ কথা ব'লে জানে কি?

Maupassant-র উপকথা প্রাচীন উপকথার মতো নয়। তাঁর কথা ভগ্নকথাও নয়, 'একাধিক লক্ষ রতনী'র কথাও নয়, 'পঞ্চভয়ের' কথাও নয়। এসব কথা, লোক-কথার সাহিত্যিক ক্ষয়রূপও নয়, অঙ্কুরণও নয়। তাঁর সকল কথার ত্রুটিই তিনি নিষে। তিনি নিষে অতিজ্ঞতা ও নিষে প্রকৃতি থেকেই এসব গল্পের মাল-মসৃণা সংগ্রহ করেছেন।

এর থেকে এই ভরসা পাওয়া যায় যে, এ-মুহুরে আমরা নিষে অতিজ্ঞতা ও নিষে প্রকৃতির সাহায্যেই নব-কথা সৃষ্টি করতে পারি। উপরন্তু তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ছোটগল্পও উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে পড়ে। গল্পের মধ্যমা, তার পরিমাণ নয়, তাঁর জগৎ

উপর নির্ভর করে। আমরা যদি স্বার্থই ভীই হয়
ত' আমাদের গুণগন্য পরিচর ছোটগল্প রচনা ক'রেও
মিতে পারি। আর ছোটগল্পেরও কোন নির্দিষ্ট বিষয়
নেই; যে-কোন বিষয় হ'ক না কেন, ভীইর হাতের
সোনার কাটির স্পর্শে তা' জীবন্ত হ'য়ে ওঠে। 'মার্চে'
Content-এর স্লোর চাইতে Form-এর স্লো ডের
বেশি।

(৭)

বাঙালার এ-বুগের গল্প-লেখকরা কেউই রূপকথা
সেমন না, আরব্য-উপক্সাগও সেমন না; সকলেই
গল্প লেখবার নব পদ্ধি অবলম্বন করেছেন। কারণ
কারণ বিশ্বাস, এ-পথ প্রথমে আমিই দেখাই।
কিন্তু তাঁদের সে ধারণা ভুল।

আমি প্রথমে কলম ধ'রেই, "কুন্দানী" নামক একটি
গল্প রচনা থেকে অল্পবাদ করি। সে গল্প যে পুনর্মুদ্রিত
করিনি, তার কারণ, গল্পটি একটি প্রসিদ্ধ গল্প হ'লেও,
আমার কাঁচা হাতের স্পর্শে তার স্বার্থ রূপ নষ্ট
হ'য়ে গিয়েছিল। গল্পটির লেখক Maupassant নন—
Merimée নামক তাঁর পূর্ববর্তী জনৈক খ্যাতনামা
সাহিত্যিক।

এর পর বাঙালী লেখকরা Maupassant-র বহু
গল্প বাঙালার অল্পবাদ করেন। আমি যদি এক্ষেত্রে
কোনও পথ দেখিয়ে থাকি, তবে তা' অল্পবাদের
পথ। কিন্তু এই অনুদিত বিশেষিত গল্পগুলি বঙ্গসাহিত্যের
অল্প ব'লে গ্রাহ্য হয়নি।

বঙ্গসাহিত্যের অপর নানা ক্ষেত্রেও যেমন, এ
ক্ষেত্রেও তেমনি রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন আমি লেখক। আমার
বিশ্বাস, তিনি সর্বপ্রথম "হিতবাসী" পত্রিকার ছোট ছোট
গল্প লিখতে শুরু করেন; তারপর "সাধনায়" তাঁর বহু
গল্প প্রকাশিত হয়। তিনিই হচ্ছেন বঙ্গসাহিত্যে ছোট-
গল্পের আবিষ্কারী; এবং এক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টি অদ্বিতীয়।
অন্য রবীন্দ্রনাথের গল্প Maupassant-র প্রভাব হ'তে
লক্ষ্য হুত। আর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বাঙালার

অধিকাংশ লেখকের মধ্যে স্পষ্ট লক্ষিত হয়। এর
কারণ, কি ভাবে, কি ভাষায়, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব
থেকে মুক্ত হওয়া এ-বুগের বাঙালী লেখকদের পক্ষে
একরকম অসম্ভব।

(৮)

আমি পূর্বে বা' লিখেছি, তা' ছোটগল্পের
ইতিহাসের সন্নিহিত ইতিহাস নয়; কারণ সে
ইতিহাস লেখা আমার বহু বিষয় স্লোর না।
সেকালে ও একালে অনেক গল্পের সঙ্গে আমার
পরিচর আছে একমাত্র পাঠক হিসেবে—ইতিহাসিক
হিসেবে নয়। এই পূর্বে আমার এই জ্ঞান ভয়েছে যে,
তারতর্ক্য হচ্ছে ছোটগল্পের আদি রম্মত্ব। এবং
সেকালে এ-রূপে গল্প লেখা ছে ডের—অন্য লে-সব
গল্প সকালে ল'য়ে বিকালে মরেনি। প্রাচীন
তারতর্ক্যের অনেক গল্প অসম্ভব। তারতর্ক্যের কোনও
ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। এ ইতিহাসের পরিবর্তন
ইতিহাসিকের কোঠার কলা ঘর না; কারণ, তারত-
র্ক্যের সভ্যতার ইতিহাস স্ল থেকে স্লো পর্যন্ত
ক্রমবিকাশের ইতিহাস নয়,—স্লো স্লো উত্থান-পতনের
ইতিহাস।

আমরা আজও বৈতে আছি, এবং মন নামক
জিনিষটি আজও আমাদের সেরে আছে। আর মাছের
বা'কে সাহিত্য বলে,—তা এই মনেরই সৃষ্টি অথবা
সীমা। আমার বিশ্বাস যে, এ-বুগে এই সাহিত্যিক
মনের স্পষ্ট প্রকাশ বাঙালারই বিশেষ ক'রে দেখা
যায়।

ছোটগল্প বহন সাহিত্যের একটি সনাতন ও
প্রধান অঙ্গ—তখন বর্তমান বাঙালার যে তা' স্লো
উইবে, এতে আর আশ্চর্য্য কি ?

আর একটি কথা ব'লেই ছোটগল্পের এই
পরিচর-পত্র শেষ করি। ছোটগল্প বহনবারও একটা
আই আছে, এবং আমার বিশ্বাস এ আই নভেল
লেখার আর্টের চাইতেও কঠিন। কারণ এ-আই

গল্পের উপাদানকে আগে মনে সাকার করে নিতে হয়, পরে ভাষায় বর্ণ করাতে হয়। মজেলের নত এতে নানা কথা বলবার অবসর নেই।

সব এ আট কেউ কাটকেও পেঁচাতে পারে না। নিজের কল্পনাকে কি উপায়ে সাকার করা যায়, তা' লেখক সয়ংই আবিষ্কার করবেন। ছোটগল্পের বিষয়ও যেন বিচিত্র, তার আর্টও ভেদনি বিভিন্ন।

ছোটগল্প যে গানও হ'তে পারে, ছবিও হ'তে পারে, তার পরিচয় আমাদের গল্প-সংগ্রহেই পাবেন; এবং বলা বাহুল্য যে, গান গাইবার আর্ট ও ছবি আঁকার আর্ট সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উপকথা সযত্নে প্রথম কথাও যা, শেষ কথাও তাই। উপকথা মায়েরই উপকথা—ওপরের সংকুলত অর্থে।

৩০-৪-৩০

‘উদয়ন’ ‘পোষ্টার’ (Poster) প্রতিযোগিতা

রাতার ধারের রেওয়ালে ‘উদয়ন’-এর বিজ্ঞাপন দিবার উপযুক্ত একটি ভাল রঙীন চিত্রের (চার রঙে আঁকা) ক্ষুদ্র উপরোক্ত প্রতিযোগিতার ১৫০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল। প্রতিযোগিতার ছবি পাঠাইবার শেষ দিন ছিল ৩০শে এপ্রিল।

প্রতিযোগিতার বিচারকসং (চিত্রকর ঐন্সুল বতীজকুমার সেন মহাপত্রের নেতৃত্বে) ঐন্সুল শটীন্দ্রনারায়ণ দাস মহাপত্রের অধিত্রি চিত্রটি পুরস্কারের ঘোষণা দিবার করিয়াছেন।

পুরস্কার সম্বন্ধে বিচারের সময় চিত্রের বৌলিকতা, আঁকার উৎকর্ষ এবং রঙের সমাবেশের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

ছবিটির একটি ছোট এক-রঙা প্রকৃৎ এবার ছাপা হইল। বলা বাহুল্য, মূল রঙীন চিত্রটির সৌন্দর্য্য এই ছবিতে পাওয়া সম্ভবপর নহে। মূল চিত্রটি ২০×৩০ ইঞ্চি আকারে চার রঙে অঙ্কিত। ঐন্সুল ইহার পূর্ণাংকার ছাপা ‘পোষ্টার’ কলিকাতা এবং মঞ্চ-মন্ডলের রাতার বেওয়ালে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

প্রতিযোগিতার আরও কয়েকটি ভাল ছবি আসিয়াছিল; পুরস্কৃত না হইলেও সেগুলি উদ্বেগ-ঘোষণা। সম্ভব হইলে তাহাদেরও ছোট প্রকৃৎ আশ্রয় ভবিষ্যতে ছাপিব।



উদয়ন

শিল্পী — শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ দাস

[এই চিত্রখানি উদয়নের প্রাচীর-চিত্র প্রতিযোগিতায় সৰ্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয় ও শিল্পীকে দেড়শত

সর্বাণী

(উপভাস)

শ্রীমতী অশূরুপা দেবী

[পূর্বাহ্নভাতি]

(২)

স্বয়ংক্রমের বয়স কত তা' আমাদের ঠিক জানা নাই ; হঠাৎ বেশ হরিভাল-কলানো, চুলগুলি লম্বা ধবধবে, এক সময় হঠাৎ চুলে কলপ পড়িত, এখন আর পড়ে না ; হাড়ি-গোক কামানো, মোহাটা গড়ন, উঁচু নাক, চোখেরও টান আছে, বয়সেও তার জ্যোতি হারায় নাই, ঠাণ্ডাগুলি-বেশ সাজানো ও অকৃত্রকে, বসিও সেগুলি এখন আর নিজের নয়—ধাধানো। পরশে পরিষ্কার লম্বা ধুতি-শিরাণ, পায়ে বোধকরি মেয়েরই হাতে বোনা রেশমী কামকরা স্লিপার ; সকাবলো বহন বাসানে বেড়াইতে যান, হাতে একমাহি রূপার সুখ-বাধানো সৌখীন ছড়ি থাকে, জুতাটাও বদলাইয়া, পরেন, আর সবই ঠিক থাকে। পাকা চুলগুলি সকল সময়েই পরিশাটী করিয়া আঁচ ডানো। ক্ষমকাল হইতেই যে ভোপে, সুখে, লজ্জাসে কাল কাটাওয়া দিয়াছেন, তাহার সকল-কিছু চিক্কাই এই মাহুসটির সমস্ত দেহে-মনে ব্যাপ্ত হইয়া থাকিতে দেখা যায় ; চলিত ভাষায় থাকে বলে সৌখীন।

কিন্তু হঠাৎ কিছুদিন হইতে তাহার একটা পরিবর্তন আসিয়াছে। সাক্ষ্যপোষক অবস্তা ঠিকই আছে, চেহারাও কিছুমাত্র বদলায় নাই ; কিন্তু পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে যেন এই জ্বলন্ত এবং মূলক বৃদ্ধ ব্যক্তির মন। অথচ চিরদিনকার অভ্যাসে অত্যন্ত পাকা বিষয়ী মন সহজে যে বাপ মানিতে চাহে, তা নয় ; কিন্তু সে যে আজ তার চিত্রাত্ম্য পথে আর শান্তি পায় না, সাধনা পুঁজিয়া ফেরে, এ সত্য কথা। অভ্যাসমত তিনি করিয়া যান সবই,

এমনকি যানের জলে টয়লেট তিনিগার শেওয়া আছে জানিয়াও তা'তে আশ্রিত করেন না, রানের পর নিভা-কার মতই ঘরে-তোলা মাখন মাখিয়া পেশোয়ারি চাঁলের ভাত সমান পরিমাণেই মুখে তোলেন ; ভাণা দই, আদুরের পায়ের, বাস্পাতোপ বা রাকতোপ যেমন বরাবর ঘরেই তৈরি হইত, আজও হয় ; রূপার ঢাকাই কাম-করা হেঁকাবে তা' লাম্বে আসে, বেধেও চয়, কিন্তু স্বাক-গ্রহণ হয়ত বা আর ঠিক তেমনটি করিয়া হয় না। মন যেন উদাস উড়ন্ত হইয়া থাকে : সর-বলান ঘন ছুখের বাটতে চিনির মুড়কি ফেলা আছে, ভাত যে তা'তে পড়ে নাই অথচ আতুল দিয়া ভাত মাখার একটা মিখা অভিনব গভীর মস্ত-মনস্ততার চলিছেছে, একখাটা আবার আর-একজনকে ঈষৎ একটুখানি হুখের রান হালি হালিয়া স্বপ্ন করাইয়া দিতে হয় ; দিতে দিয়া যে সের তার দময় মখিত করিয়া একটা সময়ে ঢালিয়া রাখা দীর্ঘবাসের একটুখানি গলার কাছে ভাসিয়া আসে ; সেটাকে লাম্বেলাইতে তাহাকে ঈষৎ নত হইয়া পাখার হাওয়ার একটা কথিত মাছিকে তাড়াইবার ক্ষম ব্যতিব্যাপ্ত হইতে হয়। আবার নিজের অস্বনিবৃত্ত গভীর বিখাদ্যের উত্তনতা স্ত্রীর নিকট উহু রাখার ব্যর্থ চেষ্টায় কোনমতে একটুখানি থেঁতো হালি হালিয়া তিন আতুলে চারটি ভাতের লানা জুলিয়া গইয়া উঠাকেও দ্বাবর দিতে হয়, “ক্ষিমে নেই ব'লেই নিইনি রে ; আম্মা হুটি বেগুলাই যাক্।”

গুলিয়া পাখার ব্যতাস দিতে দিতে যে শোনে তার

হুৎ একটুখানি ভারি হইয়া উঠে, দীর্ঘশ্বাস চাপিতে আরও একবার চোঁড়া করিতে হয়। এমন করিয়াই তারের দু'ধনকার মধ্যে লুকাচুরির প্রয়াস চলিতে থাকে, ফলে কে কতখানি বে সফল হইতে পারে বলা যায় না, কিন্তু একটু বলা যায়, সফল বিবয়ের মতই এক্ষেত্রেও সেই উত্তমীর বিষয়লাভ হয়ত বা কথঞ্চিৎ ঘটে; প্রবীণটির আত্মলক্ষ্যান তক্ষা বৃষ্টি আর হয় না, এমনই তাঁর অবস্থাটা হইয়া পাড়াইতেছিল। যে-কোন দীর্ঘকাল-দ্বারী বাপা তোদেরই মত, বতই দিন যায় অবনতির দিকে ততই নানিয়া আসে; উত্তির লক্ষণ কিছুমাত্র দেখা যায় না, লক্ষ্যও থাকে না। যে একজনই শুধু লক্ষ্য করে, এবং কে যে ইহার উপলক্ষ্য ভাঙে, তারই প্রাণের ভিতর শুধু পুঞ্জীকৃত হইয়া দীর্ঘশ্বাসের পর দীর্ঘশ্বাসগুলি ভরিয়া উঠে, বৃকখানা পাথরের মত ভারি হয়, চোখে জল পড়ে না, সমস্ত মনটা শুধু ভ্রমটে-ভরা ব্যাপ্তমেষ বিরহিত-বর্ধণ দিবসের মতই ধনবনে হইয়া থাকে, যে অবস্থার আকাশকে বর্ধনমূলের জলধারে অবনত সনাক্ষয় করিয়া দেয়, অথচ তার বিমূর্তি পর্য্যন্ত যায় করিতে দেয় না,—সে সর্গাণী—সে এই ব্রহ্মজনেরই মেয়ে।

বাগে-মেয়েতে বয়সের যে রকম তফাৎ, তাতে পিতামহ-পৌত্রীর সম্পর্ক মনে করাও বিচিত্র ছিল না, অনেকের হয়ত করেনও। সর্গাণী এঁর অনেক বয়সের মেয়ে; তার মা বোঝ করি তার বাপের দ্বিতীয় কি তৃতীয় বারের বিবাহ-করা গী, সেইজন্যই হয়ত পিতা-পুত্রীতে বয়সের এতটা প্রভেদ। তার মা কোথায়? জীবিত কি মৃত—সে-কথা আমাদের জানা নাই; বাড়ীর বাড়িরের লোকে এ-লম্বে কি বলে না বলে সে-সব কথা আমরা শ্রুতি গুনিতে পাই না, তবে কি যেন সব বলে। ভ্রম্মণের মেয়েদের সম্বন্ধে কোন অতঃ কথা আমরা সম্বন্ধে বিবাস করি না, নিশ্চয়কর সম্বাও এসেলে একটু বেশী, তাই এ সম্পর্কে কোন কথা আমাদের না তোলাই ভাল; আমরা জানি সর্গাণীর মা নাই। কবে গিয়াছেন, কিসে গিয়াছেন—এই সব কুট প্রব্রের উত্তর দিতে পারি না, নাই—এই

পর্থাৎ জানিলেই হইল; তবে এইটুকুই বলিতে পারি—সে-বটনা খটিয়াছিল অনেক কাল আগেই, এই সর্গাণী—বোড়ানী সর্গাণী তখন প্রায় শিশু, আর সে-বটনা এসেলে থাকিয়াও ঘটে নাই। সে-বটনা খটিয়াছিল স্বরজনের কর্তৃত্বমিতে হুঁদ্র উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের একটা ব্রহ্মপতি সহরে; যে-সহরে এই নিরুত বহুপল্লী-নিবাসী আধিকার দিনের এই দিন-শেষের সীমানা-বেখার সূক্ষ্মহিতপ্রায় বৃদ্ধ স্বরজন একদিন তাঁর দিবিদল জন্মের কর্ণোপলক্ষ্যে কিছু দিনের জন্তও বসবাস করিয়াছিলেন, যেখানকার ব্রহ্মপতি জাহ্নবীতীরে তাঁর একটি উজান-বেষ্টিত স্থলর বাংলা-বাড়ী ছিল, যে-বাড়ীখানি তিনি নিজের হাতে মনের মত করিয়া দাখাইয়া নাম দিয়াছিলেন “প্যারাডাইস”; বলা উচিত, তখন ইংরেজীজানার দিকেই তাঁর মনটা কিছু বেশী রকম হুকিয়াছিল, এবং সেই বাড়ীতে থাকিতে থাকিতেই তিনি “প্যারাডাইস-গার্ড” হন। তারপর তিনি আরও পাঠাইয়া সে-দেশ ছাড়িয়া দেশান্তরে যান, তারপর আরও কত দেশ-দেশান্তর ঘোরাচুরি। আশ পাচ বৎসর হইল পেন্সন গিয়াই নিজের শৈল্পিক রাসকৃষ্ণ—নিজের পিতৃ-পিতামহের প্রতিষ্ঠিত গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁদের আরও কয়েকজন সঙ্গিক ছিল। স্বরজনের জ্যোতামহাশয়ের পাচ ছেলে, পাচ বউ, বৃহৎ সোঙ্গী; এই বাড়ীতেই থাকিত; বাড়ীর জংশ এখন তারা সবাই মিলিয়া স্বরজনের কাছে বেচিয়া দিয়াছে। পিতামহের উইলেই নাকি একথা বলা আছে যে, বাড়ী কোন দিন পাটিল ভুলিয়া ভাগ করা চলিবে না, একজনকে কিনিয়া গইতে হইবে, বরাবর এ নিয়ম না চলে তো বরং অপর লোককেও বেচায় আপত্তি নাই; কিন্তু এক বাড়ীতে বসিয়া খাওয়া-বাওই করিতে-করিতে এখানে-সেখানে পাটিল দিয়া বাড়ীর হাওড়া-বাতাস বন্ধ করা অসম্ভব। যিনি এই বাড়ী পাঠাইয়াছিলেন, মরণের পরেকারও এ-মুত তাঁর সম হয় নাই।

তাই হুৰুহুই আশ এই মন্তবড় বাড়ীটির একমাত্র উত্তরাধিকারী, আর তা' হওয়ার তাইই পক্ষে হুবিধা ছিল। এম তো উহারা পাচ জনে অর্ধেক, আর তিনি একাই অপর অর্ধেকের মালিক ছিলেনই, তার উপর মোটা মাহিনার চাকুরী তিনিই করিয়া আসিয়াছেন ;

এদিকে আবার পোস্তও কম, হাতে যথেষ্ট নগদ টাকাও ছিল, এঁদের কারও টাকা দিয়া এ-বাড়ী রাখা সম্ভব নয় ; বরক নগদ টাকা হাতে পাইয়া ছোট-বাট বাড়ী কেনা, অথবা মেয়ের বিয়ের ধার শোধ দিয়া ভাড়া-বাড়ীতে বাস করা—এই রকম যার বেদিক হইতে হুবিধা সেই মতন ব্যবস্থা করিয়া লওয়া—সে ভালই হইয়াছিল। হুৰুহু অল্প কাহাকেও উঠিয়া বাইতে বলেন নাই, এত বড় বাড়ীটিতে তাঁরা থাকিয়া অনায়াসেই আরও অনেকেই এর মধ্যে বসবাস করিতে পারিতেন, তবে যার যেমন মৰ্শি : দোকে তো নিম্নের দিকের হুবিধা-অহুবিধা বতাইয়া বেধিবে ! কারও হেলের পড়ার ক্ষত সহরে থাকা সেহাৎ নরকার, কারও চাকুরীর খাতির ঐতবর্ধা-নির্নিমেষে 'ভেলি পেসেজারী' করিতে করিতে গ্রাণ যাত্র, বরের লোকেরও ভোর সকালে উঠিয়া নিতাই ভাত ঞ্জোপানোর হড়াকড়ি,—তার চাইতে সহরে দিয়া বসাই ভাল, বেয়ে হুটীও তো ডাগর হইয়া উঠিতেছে, বরের বাজারও কিছু সত্তা হয় নাই, খোঁজ-জ্ঞান তো এখন হইতেই করিতে হইবে, এত দূরে বসিয়া সে-সব করে কে ? একজন পাঠে বসিলেন, "নিম্নের ঘরেই আর পরবাসী হ'তে পারব না, হালা ! তার চাইতে ভাড়া দিবে থাকব, সে তু' আপন ভাব'তে পারব। ভাড়া যদি নাও তো থাকি।"

হুৰুহু এ-প্রস্তাবে রাশি ধন নাই, হইলোই হইত—তা' হইলে সারা বাড়ীটা ভুতের বাড়ীর মত অমন করিয়া ব'। ব'। করিত না ; কিন্তু হাজার হটক, হাকিনী বেলাশ, ছোট ভায়ের প্রস্তাবে ক'। করিয়া রক্ত গরম হইয়া গেল। তার আশ্বলমান-বোঝে তুই না হইয়া

"রাগ-শিত্তামোর বাড়ীতে ব'লে তাঁদের বক্তৃ বাসের ঘরে বসেছে তাদের কাছ থেকে সেই বাড়ীই ভাড়া লুণ্ণো, এতটা ছোটলোক বোধ হয় এখনও হ'তে পারিনি। তার চাইতে তুমি না থাক, সেও বক্তৃ সবই।"

ছোট চাইও সমান বুধে জবাব দিল, "বেশ।" তারপর একদিন ওতদিন বেধিয়া সে সপরিবারে চলিয়া গেল। তার ষ্টাটি কিন্তু তার চাইতে হিসাবী, বলিল, "তাহরহাওয়ার তো ছেলে নেই, কাছ থেকে সেবা-ধর করলে হয়ত এর পর এ বাড়ী-ঘর সবই আমাদের নেপালের হ'লেও হ'তে পারত ; থাকতে বলছেন, থেকে গেসেই হ'ত না ?"

কিন্তু কলিকাতার নিম্নের মেজ চাই-এর সঙ্গে এক বাড়ীতে বাসা লইলে তাদের নাকি যথেষ্ট হুবিধা হইবে : সেইজন্য সৈনিক হইতে বিত্তর প্রয়োজনা আসিতেছিল। বুদ্ধি একটু মোটা যানের তারা দূর তবিষাচের পানে তাকাইতে চার না, চোখে তাদের 'স্টে সাইট', কবে কি হইবে বা হইতে পারে, তার ক্ষত বর্তমানের নুতনঘের দোভ এবং লাভ সে জাগ করিতে প্রস্তুত নয়। কলিকাতার বাসা ছোট, ঘর সর্দার, তা হইলই বা ! সেখানে রোম বায়োতোপ সেখান না ? হুপ্তা তিনটি দিন খিঞ্চার হয় যে ! চেষ্টা-চরিত্র করিলে স্ত্রিরস্তার অথবা অভিনেতাদের সম্পর্ক বা নামচেনা সম্পর্ক ধরিয়াও পাণ বোণাড় তো হয়ই, আবার একলা গেসে পয়সাই বা কত লাগে ? বরক, সেমেনেড, আইনুক্রিম সোভা, কেক, চপ্ কাটিলেট কত কি তার হিলাব আছে ? দূরতেরি বড় বাড়ী আর তার হাওয়া-খেলা বড় ঘর ! ওর ইট কাম্‌ডাইয়া কি চকোলেটের খাদ মিগিবে ? যার খুদী হয় সে থাকে বেন, তাহার যাত্রা হইবে না। তা ছাড়া কথায় বলে, 'পরভাতি হ'য়ো তু' পরবরি হ'য়ো না।' এবাড়ী তো সেই পরের ছাড়া কিছুই নয় ; এখান হইতে 'দূর' বসিলে তো তখনই দূর হইয়া বাইতে হইবে, না ? তা' না গেসেই পুলিশ দিয়া বাহির করিবার ওঁত 'রাইট' নাই নাকি ? মনে ভাবে ?

জুজিখলি অবশ্য ভালই। বউট বাস্তু শুধাইয়া, বিদ্যানা বাঁধিয়া, ছেলেদের পথে বাহির হওয়ার মত করিয়া। কাপড় পরাইল; তারপর নিজের সাধ-পোছ করিয়া লইয়া সর্গাণীকে বলিল, “সে, তোমার বাবাকে প্রণাম ক’রে আসি।”

সর্গাণী সমস্তকণ স্নানকুখে ছোট-পুড়ির কাছে-কাছে থাকিয়া তার হাওয়ার সাহায্য করিতেছিল, অথচ তার হৃৎকেন্দ্রে জানে, এ চলির-বাওয়ার তাদের হৃৎকেন্দ্রই মত নাই। মধ্যে-মধ্যে বধন ছুটাইয়া সর্গাণীরা বাজী আসিত, তা’ ছাড়া বৈশাখের ম্যালেরিয়ায় স্থান-পরিবর্তনের জন্য মাসকতক একবার সর্গাণীদের পশ্চিমের বাসার কাটাইয়া আসতে এই পুড়িমাটির সঙ্গে তার বেশ একটুখানি মডতা জড়িয়াছিল। বয়সে হৃৎকেন্দ্রের তলায় ছিল, কিন্তু সে প্রবণ বেশী নয়।

সুরজনকে প্রণাম করিলে তিনি আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, “ধাক্, ধাক্ মা, বধনই কিছু বরকার মনে করবে, সূকে পত্র লিখে আমার জানিও।”

বউট কিস্কিন্ করিয়া সর্গাণীকে উপলক্ষ্য রাখিয়া কহিল, “সে তো জানাত্তেই হবে; আমার বড়র নেই, খাঙকী নেই; আপনাকেই তো জানি, আপনি ছাড়া আমাদের আর কে আছে?”

বউট চলিয়া গেলে সুরজন একটি লীর্থনিঃশ্বাস কেলিয়া বানিকবন্দ সেন বড়ই অন্তমনস্ক হইয়া এক সিঁ পানে চাহিয়া রহিলেন; তারপর বধন পড়িতে পড়িতে নামাইয়া রাখা বইখানা তুলিয়া লইয়া আবার তাহাতে মনঃসংযোগ করিলেন, তখন আরও একটা লীর্থনিঃশ্বাস তাঁর নসারক হইতে বীরে বীরে বাহির হইয়া বাহিরের মুক্ত বায়ু-তরঙ্গে মিশ্রিত হইয়া গেল। এ-লোকটির দ্যাবাই বেন এল্লি। উজ্জ্বল বড় একটা কোন বিষয়েই নাই, অথচ মনের মধ্যে যে বড়-বকনেরই একটা স্থাপা লাসে তা’ ঐ উচ্চ বাস্পাক্ত লীর্থবায়ু হইতেই ধরা পড়ে। সবাই অবশ্য এ’ও জানিতে পারে না, জানে শুধু সর্গাণী। আর তা’ জানে বলিয়াই ঐটুকু খাচাইয়া চলিবার লজ্জা ছেঁটাই বুঝি সে বড় কম

করে না; অথচ বিমিলিপি কি যে বলবে? সেই তাকে উপলক্ষ্য করিয়াই কি না। চিরকোতুক-প্রিয় নিখম বিখাতা তাঁর মত এমনই এক কঠিন অবস্থার সৃষ্টি করিয়া তুলিলেন যে, সেই দুর্ভেদ্য ব্যাধির মধ্যে পড়িয়া হৃৎকেন্দ্রকারই প্রাণাত হওয়ার উপক্রম তইলেও তার জটিলতার অস্ত হইল না, বুঝি কোনদিনেই তা’ হইবেও না। এমনই করিয়া হৃৎকেন্দ্রকার সঙ্গে হৃৎকেন্দ্রকে দূরকোচুরি-বেলা করিয়াই বুঝি জীবনান্ত করিতে হইবে, অথবা—না; এর কোন কুল-কিনারা পুঁজিয়া মেলে না। পতীর মেঘাচ্ছায়ে দিগ্ভ্রাত নাবিকের মতই তাদের হৃৎখনি জীবন-ভরণী মাঝ মেঘের মধ্যে ডালিয়া। চলিয়াছে, কোন্ হৃৎকেন্দ্রের পথে—কোন্ অনির্ভেদের উদ্দেশ্যে যে তা’ বহিয়া চলিয়াছে, তার কি কোন হিসাব আছে? না, না, নাই, নাই—মনে হয় বেন-অসীম কালক্রান্তে এমনই করিয়া। তাদের চিরদূন-দুগ্ভাতরাবধিই ভাসিতে হইবে, কুল হারায়ে কুলকে আর তার। বেন এই অকূলের মধ্যে কোথাও পুঁজিয়া পাইবে না।

কাছন-সন্ধ্যার আশ্রয়স্থল চারিদিকে পঙ্ক বিদ্যার, কত মধুক মধুককে সে তার যোজনবিদ্যারী হবির মধুক্রে আয়োজিত করিয়া নিজের কাছে টানিয়া আনে; কাল-বৈশাখীর এবল কড়ে উর্ডির তমাল-গিড়ালের উচ্চ শাখা বসিয়া পড়ে, ভ্রষ্টবীড় বিহবের মরণার্থ উচ্চ রব কর্জিকার তৈরব গর্জনে ছুবিয়া যায়; বর্ষার জলধারে গুলু কুল পুনত্ববুরিত হয়; কিন্তু ছন্দোভ্রষ্ট জীবনের দ্বারানো হুরটুকু করিয়া আসে না। ছিন্নভ্রষ্ট বীণার মত তাহা কি চির-বেহুয়াই রহিয়া গেল? এমনই করিয়া জীবনের দিন কম হইতেছিল ঐ শিতা এবং শূন্য, অর্থাৎ সুরজন এবং সর্গাণীর।

কিসের লজ্জা! তার অনেক অনেক বকস অজ্ঞান করে, কোনটাকেই কিছু সর্গাণীনে থেকে না। কেহ বলে কপণ, কেহ বলে অহুদারী, আবার বৈদ্য-তাপ লোকেই বলে শেখালী। মনে হয় বেন এর একটাও না।

আদর্শ-স্বাস্থ্য

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রনাথ মৈত্র



[ডাঃ ডি. এন্ড. বৈদ্য মহাপণ্ডের নাম ভারতের বহুস্থানে ও ব্রহ্মদেশের বহুলোকের মধ্যে সুপরিচিত। তিনি ওষুধে একজন অসিদ্ধ চিকিৎসক ও পশু-বাহুরের অধ্যাপক তাহা সন্দেহ; 'বঙ্গীয় সমাজ সেবক সমিতি'র (Bengal Social Service League) প্রতিষ্ঠাতা ও কর্তব্যরূপে দায়িত্ব যোগে বক্তৃতা ও বাহ্য-প্রদর্শনের দ্বারা জনসাধারণ মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করিয়া তিনি সমাজের যথেষ্ট হিতসাধন করিতেছেন। সমাজি দানিরা একুটি ব্রহ্মদেশের বহুস্থানে অধ্যাপনা করিয়া তিনি যে প্রচুর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া আনিয়াছেন, আলোক-চিত্র ও লেখিত যোগে বক্তৃতা এমং প্রযুক্তিগত দ্বারা তিনি সন্দেহহীন তাহা প্রচার করিতেছেন।

বাহ্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে ডাঃ মৈত্র মহাপণ্ড একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি আমাদের এই পত্রিকায় বাস্তবায়িত তাহা বাহ্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে প্রীত হইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। —ডঃ স:]

প্রথম অধ্যায়

নূতন স্বাস্থ্য-তত্ত্ব

কোনও তথ্য বা তত্ত্বকে একাধীন বা আংশিক ভাবে দেখিলে তাহার পূর্ণ বা অংশও সত্যত্বপূর্ণী আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হয় না। আর কোনও বিষয়কে বহুদিক্তব সন্দর্ভাধীন ভাবে দেখি না বলিয়াই আমাদের মতে-মতে হয় বিরোধ; আর প্রকটোন্মুখ হয় না তেমন সার্থক! "অচ্ছের হস্তীদর্শন"এর গল্প এদেশে কাহারও নিকট প্রায় অবিস্মৃত নাই। যে 'সেঁখিয়াছে' কাণ, সে বলিয়াছে হাতী কুলোর মতন; যে ছুঁইয়াছে পা, তার কাছে হাতী খামের মতন, আর হাতী যে এক-পাখি হুড়ির মতন সে-বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না তার কাছে, তার হাতে পড়িয়াছে কেবল তাঁর লেজ। আমরাও সেইরূপ দৃষ্টি-নিষ্কানিকা

ও লক্ষ্যের 'নল' বা প্রণালীর ভিত্তর দিয়া যেইটু দেখি বা দেখিতে পাই, সেইটুই আমাদের কাছে সত্য বোধ হয়, তাহার বাহিরে বেন আর কিছু নাই। ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে যে, কোনও বিষয়ের সাধনার সময় আমরা অজ বা ক্ষেত্র বিশেষের উপর দৃষ্টি ও মনোযোগ অসংলোভিত বৈধ পরিমাণেই প্রয়োগ করি; করিলেও সেই অংশের সহিত পূর্ণের যে যোগ বা সম্বন্ধ, তাহা যদি বিস্মৃত হই, তাহা হইলে আমাদের দৃষ্টি তেমন সম্যক ও সমগ্র হয় না, সাধনাও তেমন সিদ্ধ হইতে পারে না।

আদর্শ জীবন

জ্ঞানসারেই হোক, আর অভ্যাসসারেই হোক,

আমরা সকলেই বোধগত চাই যে আমাদের জীবন
জ্বর হোক, নিম্ন হোক বা সফল বিক নিম্ন পূর্ণ
হোক। এইরূপ **সর্বস্বাস্থ্যের জীবন** কাঙ্ক্ষা
করি না, যে জীবন—

সুস্থ—শরীর ও মনে সমভাবে সুস্থ, পরিষ্কার ও
চরিত্রবান্ :

সুখী—জ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন ও প্রেমের দ্বারা
ত্যাগের দ্বারা মুক্তকণ্ঠে পরিচালিত ;

কর্মশীল (ও কর্মঠ)—সেবার ও দানের—যে
সেবা মানুষ ও সমাজকে পড়িয়া তুলিতে চায় ; সে দান
কেবল অর্থের নয়—জ্ঞানের, জীবনের এবং চিন্তারও

ও দীর্ঘায়ু—জীবনমুখ্য ভাবে নয়—সজীব ও
সক্রিয় অবস্থায়।

আদর্শ জীবনের ইহাই যদি সম্ভব হয়, তাহা চাইলে
সেখানে পাই যে, এই সকল সংজ্ঞার মূলেই স্বাস্থ্য।
শরীর ও মনে সুস্থ না হইলে মানুষ সুখী হইতে
পারে না, কর্মশীল হইতে পারে না, দীর্ঘজীবীও
হয় না।

শরীরের স্বাস্থ্যের সহিত মানসিক স্বাস্থ্যের কথা
ব্যতীত বলিতেছি এই ভিত্তি যে, মৈত্রিক স্বাস্থ্যের
সহিত মনের স্বাস্থ্যের বোধ না হইলে স্বাস্থ্য পূর্ণতা
হইতে পারে না। এই মানসিক স্বাস্থ্যের কথা
পরে আলোচনা করিব।

স্বাস্থ্য ও জাতীয় প্রগতি

বহুলোকে বহুসংখ্যে বহুকালে বহুবার এই কথাই
বহুপ্রকারে বলিয়া আসিয়াছেন যে, স্বাস্থ্য
ব্যক্তিরকে কোনও জাতির প্রকৃত উন্নতি
সম্ভবপর নহে। আত্ম-আমরা জাতীয় প্রগতির
বিরাট অভিযানের পক্ষে সকলে জাগ্রত ও প্রস্তুত
হইতেছি। কিন্তু এই দীর্ঘ ও দুর্দম যাত্রা-পথে
জ্ঞত কি পথের লক্ষ্য করিয়া সফল হইতেছি ?

একটা ছোট পদ মনে পড়িল। মাথের ঈত :
ভোর বেলা ; ঠাণ্ডা কনকনে ছাওয়ায় বরীরা গা

শিহরিত ; একখানি মোকা ডাসিয়া চলিয়াছে। পথের
ধারে এক ভিনতলা বড়ীর বাগানায় বসিয়া বাহু
বালাপোষ মুড়ি দিয়া হুঁ দিয়া-দিয়া পরম-পরম চা
পান করিতেছেন। গালের মাঝি বসিয়া-বসিয়া
দীতে কাপিতে-কাপিতে গাড়ীকে বলিতেছে, “বড়
সখ হয়, অমনি ক’রে ব’লে কোনও একদিন পরম-
পরম চা হুঁ দিতে-দিতে খাই।” গাড়ী জিজ্ঞাসা
করিল, “তোমার কী সখা আছে যে অমন কখন
মুড়ি দিতে আরামে পরম ব’লে চা খাবে?” উত্তরে
মাঝি বলিল, “কেন ভাই, আছে সখ আর হুঁ।”

এই দীর্ঘ সঙ্গ্রামের পক্ষে আমাদের পথের হইবে
কি কেবল মাঝ ইচ্ছা ও উচ্ছ্বাস ? না, স্বাস্থ্যকেই
প্রধান পথের করিতে হইবে। পুরুষ ও নারী
সকলকেই সমভাবে এই পথের সঙ্গ্রামে সচেষ্ট ও
উৎসাহিত হইবে ; এই স্বাস্থ্য-ধর্ম সাধনে একাত্ত
ভাবে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

আদর্শ-স্বাস্থ্যের লক্ষণ

(ক) শারীরিক

এখন, স্বাস্থ্য বলিতে কি বুঝি ? স্বাস্থ্যের আদর্শ
কি ? স্বাস্থ্যবান্ বা সুস্থ মানুষের লক্ষণ কি ?
আদর্শের দিক দিয়া শারীরিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ চরিত।

১। **রোগহীনতা**। যেখানে এমনি কোনও
রোগ নাই, শুধু তাগা নহে ; উপযুক্ত পরীক্ষা দ্বারা যদি
সেখানে পাই যে, শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ, ইঞ্জিন
টিক আছে ও টিক চলিতেছে, তবেই শরীরকে
রোগহীন বলা হইতে পারে।

২। শুধু রোগহীনতাও নয়, রোগপ্রতিবেদক
ক্ষমতা থাক। চাই। স্বাস্থ্যের ইহাই এক প্রধান
লক্ষণ। একই স্থানে, একই আবহাওয়ার ও
আবেষ্টনের মধ্যে একজন সহজেই রোগের বীজ দ্বারা
আক্রান্ত হয়, আর একজন হয় না ; কাহারও
সহজেই ‘ঠাণ্ডা লাগে’, কাহারও লাগে না।—এই
সকলের মূলে সেহের জমির কথা। যেমন জি

ভিন্ন দাছের বিভিন্ন বীজ আছে, সেইরূপ বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন ও ভিন্ন বীজাণু বা জীবাণু আছে। যুদ্ধের বীজ যেমন সকল ক্ষমিতে সনভাবে অধিকৃত ও বর্ধিত হয় না, সেইরূপ রোগবীজাণুসমূহ, যাহারা অস্বাভিক পরিমাণে প্রায় সর্বত্রই পরিণাম্য, তাহারা সকল শরীরেই সহজে “দাঁত বসাইতে” বা “শিকড় লাগিতে” পারে না। যাহার রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতা কম, তাহারই শরীর মধ্যে রোগবীজাণু সহজে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় : রোগ ছুটিয়া উঠে।

৩। স্বাস্থ্যের তৃতীয় লক্ষণ, শক্তি। পেশীসমূহের শক্তি। শুষ্ক হৃৎপদ প্রভৃতি অঙ্গাদির নয়, সকল ভিতরের ও বহিরিস্থিরেরও। শক্তি বলিতে সাধারণতঃ কোনও পেশী বা পেশীসমূহের এককালীন বল-প্রয়োগেরই ক্ষমতা বুঝায়। একজন কত মণ ভারী বোঝা তুলিতে পারে, বা, আর একজনকে কি পরিমাণে টানিয়া বা ঠেলিয়া পরাস্ত করিতে পারে, প্রত্যঙ্গ-ক্রিয়াসম্পন্ন পেশীসমূহের বা ‘মু’-এর বা মূলমূলের জোর কত বেশী, ইত্যাদি ক্রিয়ায় শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

৪। কিন্তু আবার ইহাও দেখিতে পাই, যে ব্যক্তির পেশীসমূহ পূর্ব মাংসল ও বল, বা যে তাহাদের পূর্ব নাচাইতে-খেলাইতে পারে, সে ব্যক্তি উল্লিখিত প্রথম দুই লক্ষণে হীন হইতে তো পারেই, এমন কি বহুক্ষণ ধরিয়া পরিভ্রম করিতেও হরত বা অসমর্থ। অতএব স্বাস্থ্যের আর একটা লক্ষণ হইতেছে—সামর্থ্য অর্থাৎ বহুক্ষণব্যাপী অস্বাভিকভাবে পেশীসমূহের কৰ্ম-ক্ষমতা (পরিভ্রম)। যথা, একজন কত মাইল একটানায় হাঁটিতে বা দৌড়াইতে বা কতক্ষণ পান্ডার দিতে পারে; কত উঁচু পাহাড়ে উঠিতে বা কতক্ষণ গাড় টানিতে পারে, ইত্যাদি।

৫। যে মানুষ বা জাতি যাহা আদর্শ হইবে, তাহার এই সকল লক্ষণত্রয়ে হওয়ার সঙ্গেই আরও হওয়া চাই—শুষ্ক, দীর্ঘায়তন, অঙ্গাদির গঠনে সুপরিমিত ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন। আমরা বেন

গৌরব করিয়া বলিতে পারি যে, যাকাদী কাঠি, দেহের আয়তন ও গঠনের সৌন্দর্য ও সৌচ্যে, শুধু ভারতবর্ষের মধ্যে কেন, পৃথিবীর মধ্যে উচ্চস্থান লাভ করিবার অধিকারী।

৬। আদর্শ স্বাস্থ্যের আর একটা লক্ষণ :—**স্বাস্থ্যক্ষুর্তিবোধ**। ইংরাজীতে বাহাকে বলা যায় Vital surplus। যে ব্যক্তির ‘ঘর আর হাত বাড়’, সমগ্র-অঙ্গময়ের ক্ষমতা হাতে ছ’পরগাও পাকে না, তাহাকে যেমন ঠিক সম্বতিসম্পন্ন বা স্বস্থানাবস্থাপন্ন ব্যক্তি বলা যায় না, সেইরূপ প্রকৃত সুস্থ ও সামর্থ্য-সম্পন্ন ব্যক্তির স্বাস্থ্যের কিছু মূলধন খাকা আবশ্যক। যেরে আসিলে বা সাক্ষ্য হইলে বেন দেখিতে পাই, সে ব্যক্তি হইতে স্বাস্থ্যের ও শক্তির একটা আভা বা প্রভাব পুঞ্জিত ও বিকীর্ণ হইতেছে। সে-সম্পন্ন অস্ত্রকেও সূত্রজ ও সক্রিয় করিয়া তোলে।

(খ) মানসিক স্বাস্থ্য

আদর্শ পারীক্ষিক স্বাস্থ্যের এই যে বহুবিধ ভগ্নলক্ষণ, যথা, রোগহীনতা, বলি, সামর্থ্য, রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতা, সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্যক্ষুর্তিবোধ—ঐচ্ছিক এইগুলিকেই আবার মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া বরা বাইতে পারে।

শরীর ও মন এতই ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত, একের প্রভাব অস্ত্রের উপরে এতই বেশী যে, বর্তমান জটিল, চকল, কণ্ঠবহল, রাজনৈতিক ও জামসিক বৃত্তিপ্রবণ জীবনযাত্রার দিনে, ভাববাক্যাসক্রে সমস্ত, বুদ্ধিকে হির, বিচারকে ভ্রাসমস্ত ও মনকে অশ্রের দিকটাও বৃত্তিবার ক্ষমতাপন্ন করিতে হইলে মানসিক স্বাস্থ্যের একান্ত আবশ্যক; নিজে হুণী হইতে হইলে এবং পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে সুখ ও শান্তি লাভের ক্ষমতা মানসিক বাহ্যরক্ষা পারীক্ষিক স্বাস্থ্যরক্ষা অপেক্ষা কোনও অংশে কম প্রয়োজনীয় নহে।

এখন ঐ বহুবিধ লক্ষণ মিলাইয়া দেখা যাক। যিনি আদর্শ সুস্থ ব্যক্তি হইবেন—(১) তাহার মধ্যে কাম,

ক্লেশ, মোহ, হিংসার আধিক্য থাকিবে না; তিনি বীচতা, সর্গীয়তা, মিথ্যাপরাধতা প্রভৃতি মানসিক রোগ বর্জিত হইবেন।

(২) তুমি তাহা নহে, (বস্তু) সাধনা দ্বারা তাহার মনকে এতদপ সর্গীয় ও দৃঢ় করিয়া রাখিতে হইবে যে, নানা প্রকার রিপূর বীজ তাহার মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়া রুদ্ধপ্রাপ্ত না হয় অর্থাৎ তাহার রিপু-প্রতিবেদক ক্ষমতা থাকিবে।

(৩) শোকে, বিপদে, মোহে, উত্তেজনায় ও প্রলোভনে তাহার মনের শক্তি তাহাকে স্থির ও সংযত রাখিবে।

আবার সেই সঙ্গে কোনও একটা কাজে চাত দিলে তাহা ধরিয়া থাক। তাহাকে সার্থক করিবার মত সচেতন হওয়া, বহুক্ষণ ধরিয়া মনঃসংযোগ করিবার ক্ষমতা, বা ধৈর্য ও সারিহা, অপবায়, অবশেষে অসহ্যহৃতি, বিরুদ্ধাচরণ প্রভৃতি প্রতিফল অবস্থার সহিত লগ্রহ করিবার বৈধা বা সামর্থ্য থাকা চাই।

(৪) দয়া-দাক্ষিণ্য, সৌজন্য-ভক্ততা, সহানুভূতি ও বাবহারের নিষ্ঠার ও সময়ে চরিত্র সুন্দর ও মধুর হইবে।

(৫) বস্তু: তাহার চিত্তের প্রফুল্লতা ও উৎসাহক্ষুঃখির বৃদ্ধি তাহাকে অসময়ে রক্ষা করিবে ও তাহার চারিদিকে ব্যাপ্ত ও উজ্জ্বলিত হইয়া সকলের মনকে উজ্জ্বল ও প্রীণ করিবে।

এই হইল ব্যক্তিগত পূর্ণতা বাহ্যের রূপ।

স্বাস্থ্যের ব্যাপক রূপ

এই বাহ্য দেখিতে চাই প্রতি ধরে ও পরিবারে—

শ্রদ্ধা ও প্রীতির যোগের নিষ্ঠার ও নিঃস্বার্থতা; সম্মত ও নিয়মের অমুখতিতার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার

ও ধর্মের জিনিষপত্রের সাক্ষ্য-গোছানস আনন্দের মধ্যে ও পরস্পরকে সঙ্গম। বৃদ্ধিবার চেষ্টায়।

এই বাহ্য দেখিতে চাই সমাজে,—একতা ও সম্মততার, বিশ্বাসযোগ্যতার, চরিত্রে—অর্থাৎ বাটা হওয়ার, বা মনে, কথা ও কাজে এক হওয়ার, সত্য ব্যবহারে ও বাক্য-বক্ষায়; ধর্মীত সকলের সংহার-চেষ্টায় অপরের দিক্‌টা বৃদ্ধিবার ক্ষমতার ও অপরের কুসংস্কারটোমের কু-প্রভৃতি হইতে আত্মসংযমে; ও দেহস্থিত ও গোচরিতগত তত্তা হওয়ার।

রাষ্ট্রেও এই বাহ্যের প্রকাশ,—নিষ্ঠা-প্রশংসা-নিরলোচন হইয়া বন্ধন দাড়া। সত্য বলিয়া বৃদ্ধি, তখন তাহাই ধরিয়া থাকার, সুবিধা ও প্রলোভনের পাকে ও প্রভাবে আত্মবিকৃত্য বা মতপরিবর্তনে নয়; নিঃস্বার্থতার, ধর্মবুদ্ধিতে ও বিপদে অপরের দিক্‌টাও বৃদ্ধিবার চেষ্টায় এবং দেশ ও লোকস্থিত ব্রতে।

এক কথা

যিনি আদর্শ স্রষ্টা ব্যক্তি হইবেন, তিনি আদর্শ জীবনের রূপ লক্ষ্যে রাখিয়া নিজ বেৎ ও মনে সম্পূর্ণ ও সর্গীয়ভাবে স্রষ্ট হইতে সচেতন ও সক্রিয় হইবেন তা বটেই; তৎপরি ও তৎসঙ্গে, তাহার এই সাধনা ও প্রভাব পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে ব্যাপ্ত করিয়া দেশকে সুখ, সমর্থ, সুন্দর ও শক্তিশালী করিয়া তুলিবেন।

ইহা যেন কি নাহী, কি পুরুষ আমাদের প্রত্যেকের সাধনার বস্তু হয়।

“নাগ্ন্যমাত্মা বগহীনেন লভ্য:।”

[কি করিলে এই বাহ্য লাভ ও রক্ষা হয় পথের প্রবেশদ্বারে তাহার সচিত্র আলোচনা করিবার উচ্ছা বহিল।]

অরুণোদয়

(উপভাস)

শ্রীশৈলজানন্দ সুখোপাধ্যায়

[পূর্ণাঙ্গভক্তি]

সেদিন রবিবার।

বেলা তখন প্রায় পাঁচটা বাজিয়াছে। কলে জল ধরিয়া সন্সারের ছোট-খাটো কাষকর্ণ সারিয়া সেওরালে-টাঙ্গানো আশীটির সুবুধে গাড়াইয়া নারায়ণী তাহার চুল অঁচড়াইতেছিল। কালো কৌকড়ানো একপিঠ চুল। বেহের সৌন্দর্য্য তাহার রান হইয়াছে সত্য, কিন্তু চুলের সৌন্দর্য্য যেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে। ঘুরিয়া ফিরিয়া একাকিনী ঘরের মধ্যে নারায়ণী তাহার নিজের চুল নিষেই দেখিতেছে, আর বহুকাল পূর্বে কবে একদিন সন্ধ্যাবেলায় স্বামী তাহার এই চুলেরই প্রশংসা করিয়াছিল সেই কথা তাহার মনে পড়িতেছে।

কাল হইতে বীরেন বাড়ী ফিরে নাই, আশ্ব রাত্রে সে নিশ্চয়ই ফিরিবে। নারায়ণী তাই চুল বাধিয়া লজ্জিতে বসিল।

এমন সময় মাসি ডাকিল, 'বোমা !'

চিরুণী হাতে লইয়াই নারায়ণী দরবার কাছে আসিয়া গাড়াইল। বলিল, 'মামার ডাকছেন, মা ?'

'হ্যাঁ, মা, ডাকছি।' বীরেন কি এখনও আসেনি, বোমা ?'

নারায়ণী একটা ঢোক দিলিয়া বলিল, 'না।'

মাসি বলিল, 'প্রায়ই ত' দেখি সে শনিবার রাত্তিরে আসে না, রবিবার আসে না, কোথায় থুকে সে ?'

নারায়ণী মহাবিপদে পড়িল। কোথায় থাকে সে জানে না। এত জোঁটা করিয়াও তাহা সে আশও জানিতে পারে নাই। কিন্তু যা হোক কিছু একটা তাহাকে বলিতেই হইবে। না বলিলে মাসি বাহা

ডাবিবে তাহা বিশেষ দৌরবেদ নয়, অথচ মিথ্যা কথা বানাইয়া বলিতে গেলেই কণ্ঠ তাহার কঁচ হইয়া আসে। শেষ পর্য্যন্ত কি আর করে, মমার তাহাকে দিতেই হয়।

নারায়ণী বলে, 'হুগার মধ্যে গুই এক রবিবারটি ছাড়া ত' আর ছুটি পায় না, মা, তাই ওরা সব বহুবাহুব মিলে শনিবার রাত্তিরটা বাহু-দাহ আমোদ-আজাদ করে, রবিবার দিনের বেলাটা সেইখানেই পুথিরে কাটায়। টাকা টাকা ক'রে...আপিসের খাটুনি খেটে খেটে...আমি বলি...'

কথাটা তাহাকে শেব করিতে না দিয়াই মাসি মাগাইয়া আসে। বলে, 'না বাছা, তুমি ভুল বুঝে। বীরেনের ভাব-পটিক দেখে আমার ত' ভাল ব'লে মনে হয় না।'

নারায়ণী হাত নাকিয়া প্রতিবাদ করে। বলে, 'না, মা, সে-সব কিছু নয় আমি জানি। স্বভাব-চরিত্র খুব ভাল।'

মাসি বলে, 'ভাল হ'লে তোমারই ভাল, মা, আমি তোমার ক্ষত্রেই বশুছি।'

এই বলিয়া সেবুকে সেইখানে নামাইয়া দিয়া মাসি চলিয়া বাইতেছিল, নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি ওকে কি ক্ষত্রে বুঝছিলেন, মা ?'

'কি ক্ষত্রে ?' বলিয়া ঈকং হাসিয়া মাসি আবার ফিরিয়া গাড়াইল। বলিল, 'এখনও বুঝতে পারিঙ্গনি, বোকা মেয়ে ? ত'মাত হ'য়ে সেল, তাড়ার নকন একটা পয়সাও আমি এখনও পাইনি। এইবার ছেলের কাছে কিছু চাইব, বাছা, আর আমি পাহুছিনি, বড় টানটানি পড়েছে।'

নারায়ণী একটুখানি লজ্জিত হইয়া উঠিল। ‘হু’মাণ কি তাহারও বেশি তাহার। এখানে আসিয়াছে, অথচ ভাড়ার দক্ষ মালিকে কিছুই এখনও দেওয়া হয় নাই। লজ্জিত হইবারই কথা। বলিল, ‘আজ এসেই আমি ওর কাছে চেয়ে রাখব, যা।’

মাসি বলিল, ‘আমার হু’মে তুই কেন চাইবি, বাছা? বীরেন এলে আমার জানান, আমি নিজেই চেয়ে নেবো।’

‘হু’মাসে আপনার কত টাকা হয়েছে, যা?’

মাসি বলিল, ‘আমি কি আর বাড়ীত্যাড়া কখনও দিযেছি, বাছা, যে আনব কত হয়েছে! ছেলে আমার যা দেবে তাই আমি হাত পেতে নেবো।’

কলিকাতা শহরে একটির পর একটি অনেক বাড়ীতেই তাহার। ত্যাড়া দিয়া বাস করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু বাড়ীর মালিকের মুখে এমন কথা সে কখনও শোনে নাই। ত্যাড়াতে যাহা দিবে হাত পাতিয়া তাহাই লগ্না দূরে থাক, পুরা ত্যাড়ার একটি পাই-পরসা কম হইলে কিংবা ত্যাড়া দিতে ছ’চারদিন ঘেরি হইয়া গেলে অনেক বাড়ীওয়ালার অনেক অপমান স্বামীকে তাহার নীরবে সহ করিতে হইয়াছে। হাই হোক, নারায়ণী ভাবিল, এতদিন পরে উপবাস বোধকরি তাহারের দিকে একটুখানি মূখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। সেদিন তাহার আর ভাল করিয়া চুল বাঁধা হইল না। চুলগুলো কোনো রকমে এলো বোঁপা করিয়া শিন দিয়া আটকাইয়া, সিঁদুরে সিঁদুর নইয়া সে কলতলার গা ধুইতে বেল। ‘তাড়াতাড়ি করিয়া আসিয়া’ ভাল একখানি কাপড় পরিয়া জামা গায়ে দিয়া আশীর স্নেহে গাড়াইয়া মনের আনন্দে ভুন্ ভুন্ করিয়া কি যেন একটা পান বাহিতে রাহিতে সে তাহার কপালে সিঁদুর-কোটা লইতেছে, এমন সময় বাহিরে সদর দরজার কাছে বারী কঁধের গুনিতে পাইল। বাবু, আজ সে ঠিক সময়েই আসিয়াছে! সিঁদুরভটি ছোট হোমিওপ্যাথী ঔষধের খিচিটি সে তাকের উপর তুলিয়া রাখিয়া

দরজার কাছে আপাইয়া বেল। তুলিল, স্বামী তাহার পান রাহিতে রাহিতে ঘরে ঢুকিতেছে—

‘আজ কাণ্ডের প্রথম দিনে—’

সেইখান হইতেই হাতের ইসাত্তার নারায়ণী তাহাকে চুপ করিবার ইঙ্গিত করিল।

কাছে আসিয়াই বীরেন তাহাকে একহাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, ‘কেন? চুপ করব কেন তুমি?’

না টগিভেছে, কথা জড়াইয়া বাইতেছে, সর্বনাশ! মম থাইয়া আসিয়াছে।

ঘরে একটা মৃত্যু টিনের চেয়ার ছিল, তাহারই উপর নারায়ণী তাহাকে বসাইয়া দিয়া বলিল, ‘ওগো চুপ করো, তোমার ছুটি পায়ে পড়ি। যা একটুনি ত্যাড়া চাইতে আসবে।’

‘ত্যাড়া! অলু রাইট! মাইনে গেলে বীরেন পান্দুলী লাট সারেরকে খাতির করে না, তা জানো?’ বলিয়া তৎক্ষণাৎ সে তাহার পকেট হইতে লগ্নটাকার একখানি নোট বাহির করিয়া নারায়ণীর হাতে দিয়া বলিল, ‘আজ এই দশ টাকা গাও, বাকিটা এর পর যেনো। মাসে কত করে দিতে হবে? পনেরো টাকা—না।’

নারায়ণী তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া দিয়া চুপিচুপি বলিল, ‘না যো না, লগ্নটাকা করে’ দিলেই হবে। তোমার জিজ্ঞেস করলে বলো—এর বেশি আমি আর দিতে পারব না, হা, কোথায় পাব বসুন!—কেমন? উনি বড় ভাল মানুষ, এমন মানুষ আর হয় না।’

এই বলিয়াই সে সোজা হইয়া গাড়াইয়া বলিল, ‘তুমি একটু চুপ করে’ বোসো, আমি এই টাকাটা দিযে আসি আর থোকাকে নিয়ে আসি।—আর ভাখো, তুমি এই যে মদ-উষ খাও, একথা উনি যেন না জানতে পারেন। বৃক্ষে।’

টাকা দিবার ক্ষণ নারায়ণী বাহির হইয়া বাইতেছিল, এমন সময় সেখিল, মাসি নিজেই দরজার আসিয়া গাড়াইয়াছে।—‘কই বাবা বীরেন, আমার—’

নারায়ণী কথাটা তাহাকে শেখ করিতে দিল না, ছুটিয়া একেবারে দরজার কাছে আসিয়া দশটাকার নোটখানি মাসির হাতে একরকম 'ভঁজিয়া' দিয়া বলিল, 'এই যে, মা, উনি ঠিক ক'রেই বেবেছিলেন।'

বীরেনের কিছু ওদিকে আর চুপ করিয়া বসিয়া থাক। চলিল না। টলিতে টলিতে সে চোয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া ঝড়োইল এবং বোধকরি মাসির কাছেই আসাইয়া ঘাইতে ঘাইতে বলিল, 'মাসির চারটি পাতের পুসা আচ্ছ আমি নেবোই।'

কিন্তু মাসির কাছ পর্য্যন্ত তাহাকে আর পৌছিতে হইল না। নারায়ণী তাহার পুকেই ভয়ে লক্ষ্য করিয়া একেবারে স্তিরমান হইয়া দিয়া কি বে করিবে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া একেবারে ঠিক ছেলেরাধুকের মত ঘরের দরজাটা মাসির সুখের উপরেই হুড়াম্ করিয়া হু'হাত দিয়া বন্ধ করিয়া চাপিয়া ধরিল।

যাপারটা মাসিও প্রথম ঠিক বুঝিতে পারে নাই। জিজ্ঞাসা করিল, 'ওকি না! দরজা বন্ধ ক'লি কেন?'

কিন্তু প্রশ্ন করিয়াই সে বুলিল, কেন বন্ধ করিয়াছে : এবং বুঝিলামাত্র মাসি আর সেখানে এক মুহূর্তে বিলম্ব না করিয়া বলিয়া উঠিল, 'বাই, বাবা, বাই!'

বলিয়াই সে ভাড়াভাড়ি উপরে উঠিয়া গেল। এমন ভাগ করিল কেন সেবু তাহাকে ডাকিতেছে।

এদিকে ঘরের মধ্যে নারায়ণী তখন দরজার গায়ে পিঠ রাখিয়া লক্ষ্য রাখিয়া উঠিয়া রাসে চমকে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, 'তুমি মদ খাও, রাসে বাড়ী ফেরো না একথা কি তোমার না জানালেই চলছিল না? তোমার-না আমি চুপ করে' বসে' থাকতে বললাম।'

বীরেন বলিল, 'তাতে হয়েছে কি?'

নারায়ণীর চোখ দুইটা হুলহুল করিয়া আসিল।—'তোমার কিছু হরনি, কিন্তু আমার—' বলিতে দিয়া নোটেকার ঠোঁটটা তাহার ঘর ঘর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কথাটা সে আর শেখ করিতে পারিল না।

বীরেন হাসিতে লাগিল।—'ও কি তোমার কিছু

সেবে ভেবেছ, না কী? ও কেউ কিছু শেখ না, বাবা, আমার জানতে কিছু থাকী নেই। এই রকমে অনেক দেখলাম।'

স্বামীকে হাসিতে দেখিয়া নারায়ণী হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'হাসছ কোন্ লক্ষ্য! হাসতে তোমার লক্ষ্য করে না?'

'ওরে বাবা! এ বে এখানে এসে কথা হুইল দেখছি।'

নারায়ণী বলিল, 'তা মাহুদ আর কতদিন চুপ করে' থাকবে তুমি!'

পতীর কণ্ঠে বীরেন কহিল, 'ভাই বলে' তুমি কি আমার শাসন ক'রবে নাকি?'

নারায়ণী বাহা কখনও বলে নাট তাহাই সে আচ্ছ বলিয়া কেলিল। বলিল, 'ঠা ক'ব এবার থেকে।' চাপু করিয়া বীরেন জাচার পালের উপর সম্মোরে এক চড় মারিয়া বলিল। বলিল, 'চোপু রও!'

বরণ্যর স্বস্তির চইয়া গানে হাত দিয়া নারায়ণী সরিয়া ঠাড়াইতেই দরজাটা পূর্ণিবার ভক্ত বীরেন হাত বাড়াইল। রূপ করিয়া বোধকরি সে পুনরায় বাহির চইয়া বাইবার ব্যবস্থাই করিতেছিল, কিন্তু পিছনে টান পড়িতেই কিরিয়া সেবিল, নারায়ণী তাহার জামার একপ্রান্ত চাপিয়া ধরিয়াছে। সুখে কথা নাই, চোখ দিয়া শুধু টপ্ টপ্ করিয়া জল করিতেছে।

সেই একটা পদ আছে—কোনও এক ভ্রমলোকের অবস্থা ধারণা হইয়া ঘাইতেই একদিন সে তাহার এক বন্ধুর বাড়ী চুরি করিতেছিল। বন্ধুর হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সেবিল, ভ্রমলোক তাহার আলমারি খুলিয়া বনিব্যান বাহির করিয়াছে। চোর-বন্দু পাছে লক্ষিত হয় তাবিয়া নিরস্তির লক্ষ্যায় গৃহস্থ বন্ধ তৎক্ষণাৎ চোখ বুন্ধিয়া ঘুমাইবার ভাগ করিয়া পড়িয়া রহিল।

বে চুরি করিতেছে তাহার লক্ষ্য হইল না, বাহার চুরি করিতেছে লক্ষ্য হইল তাহার।

মাসির অথবা হইয়াছে ঠিক সেই রকম।

পরদিন হইতে মাসি আর লক্ষ্মায় নারায়ণীর সঙ্গে দেখা করিতে পারে না, কথা করিতে পারে না, এমন ভাবে দেখুক নাই। চোরেব মত পাশ কাটিয়া কাটিয়া গুরিয়া বেড়ায়—সেখিয়া মনে হয় যেন সে নারায়ণীর কাছে কতই না অপরাধ করিয়া কেসিয়াছে।

কিন্তু এক ঘরে ঘর করিতে গেলে এমন চুরি করিয়া বেশিক্ষণ লুকাইয়া থাক। চলে না। একদমর তাহাকে ধরা পড়িতেই হয়।

হইলও তাই।

ছেলেটা অনেকক্ষণ হইতে ব্যর্থ। ধরিয়াছিল—
বোমার কাছে দাটবে।

মাসি বলিতেছিল, ‘হা না, বাপু, কচি ছেলে ত’
নোসে, হা না!’

কিন্তু সেবু মিস ধরিয়া বলিয়াছে,—‘না তুমি মিসে
আন্দবে চলে।’

মাসি তাহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক রকম
করিয়া বুঝাইল, বলিল, ‘এই ত’ বাপু তোকে আমার
নাগ্ৰহ করার লাভ! আমার কাছে থাকতে ভাল
লাগছে না, মা’র কাছে বাবার ভক্তে খোঁচা ধরেছিল, তা
বেশ ত’ হা না, মাসি ত’ আর ধরে’ রাখিনি তোকে।’

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। শেষ পর্যন্ত
সেবুকে নিয়া আসিবার জন্য মাসিকে নীচে নামিতে
হইল। তাবিয়াছিল, সিঁড়ির নীচে তাহাকে ছাড়িয়া
নিয়া আসিবে, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই নারায়ণী
হাইতেছিল কলধরে বোধকরি জল আনিবার জন্য,
মাসির সঙ্গে তাহার চোখোচোখি দেখা হইতেই
সে থমকিয়া পাড়াইয়া গড়িল।

মাসিও একটুখানি অপ্রস্তুত হইয়া পিয়া একটা
চোক সিলিয়া একবার ইতস্তত করিয়া সেবুকে দেখাইয়া
দিয়া বলিল, ‘এই নে, মা, তোর ছেলে নে। মা’র
কাছে আসবার ভক্তে কোঁচা ধরেছে সেই কখন থেকে
তার ঠিক নেই। তাই ত’ বলি বাবা পরের বেলে
ভালদাসলোই কি আর আপন হয় কখনও?’

সেবু ছুটিয়া মা’র কাছে নিয়া পাড়াইল। নারায়ণী
বলিল, ‘কেন রে, থাক না মিসে মা’র কাছে। আমি
ততক্ষণ আমার কাজগুলো সেয়ে নিই।’

কিন্তু ছেলে তাহার আঁচলের কাপড়টা টানিয়া
ধরিয়া পাড়াইয়া রহিল, মাসির কাছে কিছুতেই হাইতে
চাহিল না। নারায়ণী লক্ষিত হইয়া উঠিল। এ বেন
তাহার মত অপরাধ। তাই সে ছেলের হইয়া কৈফিয়ৎ
দিবার জন্য মাসির সুপের পানে ডাকাইয়া বলিল,
‘ও! বুঝছি ও কেন এমন করছে, মা। আজ সকালে
ওর বাবার সঙ্গে কথা ক’রছিলাম, সেই সময় কোথেকে
ও ছুটেছে ছুটেছে এসে আমার গানের ওপর ঝাঁপিয়ে
পড়ল। ঝাঁপিয়ে পড়ে’ এমন বিরক্ত করতে লাগল
যে, পু’র ছোরে একটা চড় মেরে দিলাম তাকে কীমিসে
বিসের করে’। বললাম এমন যদি ক’রবি ত’ আমার
আর দেখতে পাবি না, বাব কোন দিক দিয়ে পালিয়ে।
সেই থেকে ও আপনায় কাছেরে ছিল। তারপর
এতক্ষণ পরে হঠাৎ হুত আমার কথা ওর মনে পড়েছে।
তা নইলে কেন থাকবে না, মা, আপনায় কাছে ত’ ও
বেশ থাকে।’

যাক, সেবু কল্যাণে লক্ষ্মাটা তাহাদের কাটিয়া
গেল। নারায়ণী তাহিল তাহার দ্বারীর মত খাওয়ার
ব্যাপারটা মাসি বোধ হয় বুঝিতে পারে নাই, পারিলে
নিশ্চয়ই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত। কিন্তু এমন করিয়া
কতদিন তাহাকে আড়াল করিয়া রাখিবে কে জানে।

দিনকয়েক পরে, আপিস হইতে বীরেন সেদিন
বাড়ী কিরিয়াই বলিল, ‘জসো, ওনুহ?’
নারায়ণী কিরিয়া পাড়াইল।

বীরেন জিজ্ঞাসা করিল, ‘সেবু কোথায়?’
নারায়ণী ইংৎ হাসিয়া বলিল, ‘তাও ভাল। আজ
এসেই যে ছেলের পোষা পড়ল, কেন?’
‘বাড়ীভনী বুড়ীর কাছে আছে বুঝি?’
‘হ্যাঁ, সেইখানেই ত’ থাকে।’

বীরেন বলিল, 'থাকে ত' বুঝলাম। কিন্তু বুড়ীর মতলবটা কিরকম বুঝ বল দেখি? বাড়ীটা ত' বুড়ীর নিষেধ, এছাড়া টাকাকড়ি কিছু আছে বলতে পার?'

নারায়ণী বলিল, 'তা আমি কেমন করে জানব?'

বীরেন বলিল, 'একেবারে নীরবে বোকা মেয়ে কিনা! ঢালাক মেয়ে হ'লে বুড়ীর বাড়ী-নক্ষত্র এতদিন সে ঘেঁষে নিতে পারত।'

নারায়ণী বলিল, 'তা বাপু আমি পারি না। তাতে তুমি আমাকে বোকাই বল আর ঘাই বল।'

'হাঁ' বলিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বীরেন কি যেন ভাবিতে লাগিল।

নারায়ণী বলিল, 'কিন্তু বড় ভাল নারায়ণ উনি। শোতাকে আমাদের সজাই ভালবাসেন।'

বীরেন বলিল, 'জানো ওরকম শুকনো ভালবাসার কোন নাম নেই। সেবু নামে এই বাড়ীখানা লিখে দিতে পারে যদি ত' বুঝি—হ্যাঁ ভালবাসে।—গীতাও, খুব চুটে একদিন ব'লেই ফেলব।'

নারায়ণী হাতঝোড় করিয়া বলিল, 'যোছাই তোমার, তা যেন কোনদিন বোলো না। হি!'

'বা-রে! কলীন বায়ুনের ছেলে, বুড়ীর ঘর হবে কত!'

নারায়ণী বলিল, 'তার ঘর তোমার দেখতে হ'বে না। থাক, সেবুকে ডাকব? খুঁজছিলে যে? আচ্ছা বাস হয়েছ কিনা। ছেলেকে একবার আসরও কর না! অথচ তোমার অমন ছেলে—সেখনিয়ার লোক কত আদর করে' মার।'

এই বলিয়া বোধকরি সে সেবুকে ডাকিবার জন্তই বাহির হইয়া গাইতেছিল, বীরেন বলিল, 'গীতাও, তোমার আশ একটা শ্রবণের সেবা।'

শ্রবণের নামে নারায়ণী খুঁশী হইয়া তাহার কাছে আসিয়া গীতাইল। বলিল, 'কি খবর গো?'

বীরেন বলিল, 'সেবুকে জতে কিছু কমলে না কমলে না বল, তাই আশ একটা 'লাইফ ইন্সিওর' করে' এলাম।'

লাইফ ইন্সিওর ব্যাশারটা। কি নারায়ণী তাহা জানে না। বলিল, 'সে আবার কি?'

'তাও জানো না?'' বলিয়া বীরেন তাহাকে লাইফ ইন্সিওরের মানে বুঝাইতে বলিল। বলিল, 'এখন মাসে মাসে কিছু কিছু করে' টাকা আমি কোম্পানীকে দিয়ে দাব, তারপর আমি মারা গেলে সেবু এক লাখের টাকা পাবে। এই মাসের মধ্যে যদি মারা যায় তাহ'লেও পাবে।'

বীরেন তাবির্যছিল খবরটা। তবিতা নারায়ণী উল্লসিত হইয়া উঠিবে, কিন্তু তাহাকে চুপ করিয়া গীতাইয়া থাকিতে দেখিয়া বীরেন তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'খুঁশী হ'লে না?'

নারায়ণী বলিল, 'না বাপু, ওসব কেন তুমি কবতে খেলে বলত? তোমার ওই মন চেয়ে বসে' থাকতে হবে? না না না না, তুমিও যদি না থাকলে ত' টাকা পেতে কি হবে?'

বীরেন বলিল, 'আরে তখনই ত' টাকার দরকার এখন ত' আমি ঘটদিন বেঁচে আছি ততদিন যেমন করে' হোক—'

কথাটা নারায়ণী তাহাকে শেব করিতে দিল না। বলিল, 'গানো বাপু, চুপ কর। ওসব কথা আমার ভাল লাগে না। হেঁ মাকালী, হেঁ ভগবান!'

বলিয়া সে তাহার হাত দুইট কপালে ঠেকাইয়া বলিল, 'তার আগেই যেন আমি তোমার পায়ে মাখা রেখে চলে' যেতে পারি।—বোসো, ডাকি সেবুকে।'

'শোনো, শোনো।'

নারায়ণী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'আজ আমি কার খুব মেখে উঠছি কে জানে। এত ভাল করে' কথা ত' তুমি কোনদিনই বল না।'

বীরেন বলিল, 'শোনো, আরও ভাল কথা আছে। আজ আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—যদি আমি আর থাক না।'

এতকণ পরে নারায়ণীর মুখখানি উজ্জল হইয়া উঠিল। বলিল, 'সজা বল হ'।'

যাক নাড়িয়া বীয়েন বলিল, 'হ্যাঁ, সত্যি বস্‌ছি।'

'আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না। এমন তুমি

ও-বাড়ীতে থাকতে আর-একবার বলেছিলেন।'

'এবার কিন্তু এই তোমার না ছুঁয়ে শপথ করছি।'

বলিয়া হাত বাড়াইয়া বীয়েন নারায়ণীর হাতখানা স্পর্শ করিল।

নারায়ণী বলিল, 'সেবু পা ছুঁয়ে বলতে পার ?'

'কেন পারব না ? আনো তাকে।'

সেবুকে আনিবার ক্ষত নারায়ণী অনেকক্ষণ হইতে প্রস্তুত হইয়াই ছিল, এইবার বীয়েনও তাহাকে আর বাধা দিল না।

কিন্তু উপরে উঠিবার ক্ষমতা সিঁড়ির প্রথম ধাপে পানিয়াই নারায়ণীর মনে হইল, না, কাজ নাই তাহার ছেলের গারে হাত দিয়া শপথ করিয়া। কোঁকের মাথার হরত আজ সে তাহাই করিবে, কিন্তু চ'দিন ঘাইতে না ঘাইতেই আবার হরত সে তাহার শপথের কথা বেমাসুব ছুঁিয়া দিয়া খুব খানিকটা মস পিলিয়া টলিতে টলিতে বাড়ী ঢুকিবে। তাহার চেত্নে মূখে বলিতেছে সেই ভাল, তাহার গারে হাত দিয়া শপথ করিয়াছে সেই ভাল, ইহার মধ্যে ছেলেকে আর টানিয়া আনিয়া লাভ নাই। গারে হাত দিয়া শপথ করিয়া সে-শপথ রাখিতে না পারিলে না আনি ছেলের হরত অক্ষম বলিতেও পারে।

স্বামী আজ তাহার অনেকদিন পরে এমন ভাল করিয়া কথা বলিতেছে, ছেলের ক্ষত কি-সব এক হাজার টাকার করিয়া আসিয়াছে, মস খাইবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছে—ব্যাপার কি !

ব্যাপার বাই হোক, নারায়ণীর মূখে আজ হাসি ফুটিয়াছে। সে-হাসির মধ্যে অনিচ্ছতার আশঙ্কাও যে নাই তাহা নয়, তবে হাসিতে যাহাকে বড় একটা দেখা যায় না, দুঃখ-দুর্ভাবনা সইয়াই যাহার জীবন কাটে, ওই একটুখানি হাসিতেও তাহাকে বড় স্মরণ দেখায়।

হাসি তাই তাহাকে মেধিবামায় বিভ্রাঙ্গা করিয়া বলিল, 'কিবে, আজ যে বড় তোর হাসি-হাসি খুব।'

নারায়ণী বলিল, 'কেন, যা, আমার কি হাসতে নেই ?'

হাসি বলিল, 'ছি বাছা, ও কি কথা ! কেন হাসিবি, যা, এই ত' ভোদের হাসবার বয়েস। বেলে খেলে আনন্দ করে' ছুঁতে স্পৃহা করে' থাক্‌নি,—আমাদের দেখে কত স্মরণ হবে।'

নারায়ণী বিভ্রাঙ্গা করিল, 'সেবু কোথায় যা, কই তাকে ত' দেখ্‌ছিনি।'

হাসি একবার চোখ ঝিনিয়া ইসারায় খাটের নীচেরে দেখাইয়া দিয়া গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, 'কই, যা, অনেকক্ষণ তাকে দেখতে ত' পাচ্‌নি। আমার পছন্দের কাপড় ছিঁড়ে গেছে, বললে, মাও চ'খানা পছন্দা, বাজার থেকে নিয়ে আসি। তাই বোধ হয় বাজার থেকে সে কাপড় আনতে গেছে।'

রহস্তা নারায়ণী বুলিল। বুঝিয়াও তাহা কীল না করিয়া সেও তেমনি গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিল, 'আমারও ত' কাপড় ছিঁড়েছে, যা, আমারও পছন্দের কাপড় নেই। কি যে করি তাই ভাবছি।'

সেবু আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। খাটের তলা হইতে বাড়ির হইয়া আসিয়া বলিল, 'আমি এনে দেবো।'

'এই যে আমার সেবু সো ! কোথায় গিয়েছিলে, বাবা ? কাপড় আনতে ?'

'না, বাইনি এখনও, বাবা।' বলিয়া সে তাহার হাতের মুঠা খুলিয়া সত্য-সত্যই একটি হ'খানি দেখাইল। বলিল, 'তুমিও মাও। তোমারও এনে দেবো।'

নারায়ণী সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া সেবুকে তাহার কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, 'আমি পছন্দা কোথায় পাব, বাবা, আমার ত' পছন্দা নেই। আমার কাপড়ের দাম তোমাকেই দিতে হবে।'

সেবু যাক নাড়িয়া বলিল, 'সেবো।'

ঐ অমুঠুই ছেলে তাহার কাপড় আনিয়া দিবে—পছন্দা না মিলেও আনিয়া দিবে ওনিয়া আনবে নারায়ণীর হ'জোব তরিয়া জল আসিয়া পড়িল।

তাকাভাঙি চোখ দুছিয়া মাসির দিকে তাকাইয়া বলিল,
'ওলেন, মা! সেবু নিজের পয়সা নিয়ে আমার কাপড়
এনে দেবে।'

মাসি বলিল, 'আর আমার বেলা বুত্তি নিজের
পয়সা দিবিনি, হাঁ রে নিমক্কারাম!'

সেবু বলিল, 'বোমার পয়সা ত' নেই। আর
তোমার অনেক পয়সা—সেই যে আমি দেখেছি।'

'শোন, নারায়ণী, ছেলের কথা শোন।' বলিয়া
মাসি হাসিতে লাগিল।

সেবু তখনও নারায়ণীর দশা জড়াইয়া ধরিয়া
গাড়াইয়া ছিল; নারায়ণী তাহার কানে-কানে চুপি চুপি
বলিল, 'বাবা যে তোমার ডাকছে রে, যা ওনে আর কি
বলছে।'

সেবু তাহার চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া জিজ্ঞাসা
করিল, 'বাবারও কাপড় আনৃত হবে?'

নারায়ণী বলিল, 'হ্যাঁ বাবা, তোমার বাবারও
কাপড় ছিঁড়ে গেছে।'

সেবু তাকাভাঙি বীচে নামিয়া বোধকরি তাহার
বাবার কাছেই চলিয়া গেল। নারায়ণী একবার ভাবিল
সেও যায়, কিন্তু সেগেই হয়ত এখনই সেবুর মাথার হাত
দিয়া সে তাহার মন খাওয়ার অভ্যাস ছাড়িবে বলিয়া
নিখ্যা একটা শপথ করিয়া বসিবে, এই ভয়ে সে উঠি-
উঠি করিয়াও আর উঠিল না, মাসির কাছেই বসিয়া
বহিল।

মাসি জিজ্ঞাসা করিল, 'বীরেন এসেছে বুত্তি?
গাড়াশব্দ না করে 'ত' সে আসে না; আজ এমন চুপি-
চুপি এল যে?'

গাড়াশব্দ করিয়া আসিবার অর্থটা যে কি, নারায়ণী
তাহা বেশ ভালই বুঝে। মাসিও ঠিক তাহারই ইঙ্গিত
করিজেছেন কিনা তাই বা কে জানে! তাই সে
অশ্রীতিকর প্রশ্নটাকে তাকাভাঙি গাণা দিবার মতই
বোধকরি নারায়ণী অল্প কথা পাড়িয়া বলিল।
বলিল,—

'রবের জন্তে ওর বাবা আজ সেই কি-একটা করে'

এসেছে, মা, মাসে মাসে কোম্পানীর খরে কত টাকা
বেন মিতে হবে, তারপর—'

বলিয়া একটা চোক দিলিয়া নারায়ণী বলিল,
'তারপর আমি মরে' পেলে সেবু একদমে অনেকগুলো
টাকা পেয়ে যাবে। কত হাজার টাকা বললে, মা,
গাড়াও আমার ঠিক মনে হচ্ছে না।'

নারায়ণী মিছামিছি চোখ দুছিয়া টাকার অঙ্কটা
ভাবিতে লাগিল।

মাসি জিজ্ঞাসা করিল, 'জীবন বীমা করেছে বুত্তি?
তা' তুই ম'লে কেন পাবে?'

স্বামীর মৃত্যুর কথাটা সে খুব দিয়া উজ্জরণ করিতে
পারে নাই, তাই সে নিজের মৃত্যুর কথাটা বলিয়াছে।

নারায়ণী বলিল, 'ঐ একই কথা, মা, মা-বাপ
ম'লে পাবে আর-কি! আমি কিছ মা আসেই ম'বে।'

মাসি বোধকরি তাহার নিজের কথাটা ভাবিয়াই
একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। বলিল, 'সে কথা কি আর
বলবার আ আছে, মা! মরা-বাঁচা ভঙ্গবানের হাত।
উনি এখন বেঁচে ছিলেন, আমি নিরাশ্রিত্তির ঠাকুরদের
কাছে জানাতাম, 'হে ঠাকুর, আমার বেন ওর পায়ে
মাথা রেখে মরতে দিও।' কিন্তু কি হ'ল? পাহল্যাম
ম'তে? বিনি চ'লে বাবার তিনি চ'লে গেলেন, আর
এই অর্থভোগ ক'ব্বার জন্তে আমি রইলাম প'ড়ে।'

কথাটা নারায়ণীর ভাল লাগিল না। বাঁচা-মরা
মালুকের হাত নয়, তাহা সে জানে, তবু ভঙ্গবানের বিচার
বলিয়া কিছু একটা 'ত' আছে! স্বামীর অবর্তমানে
একেবারে নিঃসহায় নিরবলম্ব অধস্থার নাবালক
ছেলেটার হাত ধরিয়া পথের ভিখারিণী হইয়া ঐতিহ্য
খাকিবার কল্লাও সে করিতে পারে না। ভাবিতে
দিয়া নারায়ণী শিরহরিয়া উঠিল। —না না, জীবনে
এমন কিছু পাপ সে করে নাই বাহার জন্য এ শাস্তি
তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। হে ভগবান, তাহার
মৃত্যুই বেন আসে হু।

নারায়ণী উঠিয়া গাড়াইল।—'বাই আবার বায়া
জকা'তে হবে।'

এই বলিয়া সে নীচে নামিয়া আসিল। পা টিশিয়া-
টিশিয়া জানালার পাশটিতে দিয়া চূপ করিয়া গাড়াইল
এবং জানালার একটি কপাট হাত দিয়া টেলিয়া উকং
উমুক্ত করিয়া দেখিল, ঘরের মধ্যে পিতাপুত্রের আলাপ
চলিতেছে।

হু হু হইতে লুকাইয়া লুকাইয়া প্রাণ ভরিয়া সে-দুঃ
সেখিবার লজ্জা নারায়ণী তাহার রম্যর কথা শুনিয়া
দিশা সহজে আর সেখান হইতে নড়িতে চাহিল
না।

(ক্রমকঃ)

অসময়ে

খ্রীঃসিরাশি দেবী

অতিথি আমার !

সাক্ষাইয়া পত উপচার

বেদিন বসিয়াছিহু খুঁচি' ঘাট, তিহা,

আরতি-প্রদীপ লব নতন তুলিয়া,

মধুরিত কুঞ্জে মোর বেশি' বাহ্যশাখা,—

তুলিয়া পতাকা

শেদিন আসনি তুমি রাজ-অধিরাজ,

আসিয়াছ আম।

দিগন্তের দ্বন্দ্বাক্ষেপে রাগরেখা। ধীরে মুঠি' উঠি'

ধরার ভ্রামল বকে ছড়াইছে কাগ মুঠি মুঠি ;

তারি সাথে তন্ত্রাবেশে বিতোর নয়ন !

সে কোন্ স্বপন,

তাহা নাহি জানি ;

ওখু মেসি' শীর্ণ বাহুখানি

তোমারে বাধিতে চাই বাহু-কায়া মাঝে ;

কর্ণকান্ত দিবসের অবসর লীলা

মবহুরে বাধিতে আবার

চাহি আম লীলনের তার।

দেবতা আমার !

সাক্ষাইতে চাহি আরবার

আরতির বীণ-নানি,—বরণের ডালা

নব উপচারে ; গাঁথিবারে চাহি ফুলমালা

কাননে কুহব খুঁজি' গতিকা-বিজান।

তব লজ্জা গান

গাহিবারে চাহি পুন' তব কণ্ঠে আম,

মনে মানি' লাজ।

পত বেদনার মর্গে হৃদয়ের এ বার্থ মন্দিরে,

তোমারে রেগেছি কেনে, ডাকিয়াছি কত কিরে কিরে,

কত লজ্জা ঘারে ঘারে ; কত লজ্জা তোরণে তোরণে

তব অশেষ

তুলিয়াছি সব।

কর্ণের অন্তর কলরব

পাত ঐ ; নিভ্রাতুর আমার হৃদয়

তারি' তার অবলাদতার নিশেধ নির্ভর

দাদরণ চাহিছে আবার ;

দেবতা আমার !

বাংলার আর্যসভ্যতা-বিস্তার

অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, এম.এ

বৈদিক সাহিত্য, মহাভারত ও অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ইতিহাসের আদিরূপে বাংলা দেশে কয়েকটি আদিম জাতি বা 'জন' অর্থাৎ tribe বাস করিত এবং সমগ্র দেশটী কয়েকটি জনপদে বিভক্ত ছিল। জনপদগুলি অধিবাসীদের নামেই অভিহিত হইত। বাংলার ঐ সমস্ত প্রাচীন জনপদগুলির মধ্যে সাত আটটির নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। যথা—যব (ভাগলপুর ও মুন্সের জেলা), বস (আধুনিক বাংলার দক্ষিণাংশ, তাম্রবর্তী হ্রদও), কলিঙ্গ (আধুনিক উড়িষ্যার বঙ্গি ভাগ), উরু (উড়িষ্যার উত্তর-পশ্চিমাংশ), পুণ্ড্র (বারদাহী বিভাগ, মহাভারতে আধুনিক ছোটনাগপুর বিভাগ), সুব্র (রাঢ় বা বর্তমান বিভাগের দক্ষিণাংশ), ব্রহ্ম (উত্তর-রাঢ়) এবং কর্কট (বর্তমান বিভাগেরই কোন অংশ ইহাদের বাস ছিল; ইহার চেয়ে নিশ্চিততর নির্দেশ করিবার উপায় নাই)। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, এই জনগুলির সমস্তই পশ্চিম, দক্ষিণ এবং হ্রদ উত্তর বঙ্গে বাস করিত। সেই আদিরূপে পূর্ববঙ্গে কাহারো বাস করিত বলা যায় না। তবে আমরা এইটুকু জানি যে, অপেক্ষাকৃত পরবর্তী রূপে পূর্ববঙ্গেই (বর্তমান ঢাকা-বিভাগ) বস নামে অভিহিত হইত এবং ব্রহ্মপুত্রের পূর্ববর্তী হ্রদওের নাম ছিল সমস্ত। তা'ছাড়া, আধুনিক চট্টগ্রাম অঞ্চলের নাম ছিল হরিকেল, একথা মনে করিবার কারণ আছে।

যাহা হোক, এখন দেখা যাক যব-বস-কলিঙ্গ প্রভৃতি বাংলার এই প্রাচীন অধিবাসীদের সঙ্গে উত্তরভারতের বৈদিক আর্যদের কি সম্বন্ধ ছিল। বৈদিক-সাহিত্যে ইহাদের উল্লেখ আছে অতি সামান্যই। কিন্তু যে কয়েকবার ইহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই কবারই

ইহাদের প্রতি বৈদিক আর্যদের অপরিসীম দুগাই প্রকাশ পাইয়াছে। অথর্ববেদে (৪।২২।১৪) অশ্বিনিকে আর্যাবাসস্থির বহির্ভুক্ত পুণ্ড্র জাতিরূপেই গণ্য করা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭।১৮) পুণ্ড্রদিগকে বলা হইয়াছে দম্বা অর্থাৎ অনার্য। আর বঙ্গদিগকে ঐতরেয় আরণ্যকে (২।১১।১৫) পাণ্ডী (বরাণসী) বলিয়া নির্দেশ করা আছে। বৌধায়নের ধর্মসূত্রে (১।২।১৪) বিধান আছে, পুণ্ড্র এবং বস-কলিঙ্গদের সঙ্গে গেলে আর্যদের পক্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় বা সর্গপূতা নামক প্রাণ্ডিত করা কর্তব্য। তা'ছাড়া, উক্ত ধর্মসূত্রে (১।২।১৫) কলিঙ্গ দেশে যাওয়া-স্বপ্ন গাপের অন্ত বৈদ্যনর নামক একটী অতিরিক্ত প্রাণ্ডিতের ব্যবস্থা আছে। ঋগ্বেদগণ্ডে (২।৪।১৮) বিরাট, হুশ, অজ, পুশিঙ্গ প্রভৃতি জাতির স্তায় অশ্বদিগকেও 'পাণ্ড'-জাতি বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অজ ও পুশিঙ্গদিগকে বলা হইয়াছে দম্বা। সুতরাং দেখিতেছি, যব, বস, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুব্র প্রভৃতি বাংলার প্রাচীন অধিবাসীরা বৈদিক আর্যদের নিকট স্থানিত অনার্য বা দম্বা বলিয়াই গণ্য হইত।

এখন স্বভাবতই এই প্রশ্ন মনে আসে, বাংলার এই প্রাচীনতম অধিবাসীরা কোন্ অনার্য মহাজাতি বা race-এর অন্তর্গত ছিল। বাংলা ও বিহারের প্রাচীন জন বা tribeগুলিকে উত্তরভারতের বৈদিক আর্যরা সমষ্টিগতভাবে 'প্রাচ্য' বলিয়া অভিহিত করিত। আমরা শতপথ ব্রাহ্মণে (১।১৮।১৫) দেখিতে পাই, প্রাচ্যদিগকে বলা হইয়াছে 'অস্ব' (আর্য্যাস্থ্যঃ প্রাচ্যাস্থ্যঃ) এবং তাহাদের প্রধান-নিবাসপদ্ধতি ছিল আর্যদের পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র। আর্যদের প্রধান ছিল চরুকোণ, আর প্রাচ্য অস্বদের প্রধান গোলাকৃতি (পরিমণ্ডল)। শতপথ ব্রাহ্মণে আর্য ও অস্বদের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী

সংগ্রামের আভাস পাওয়া যায়। মহাত্মারতে (১৯০৪) অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও দ্রাক্ষক পশ্চাত্তীর্ণবস্ত্রী দেশের অধিগতি 'অঙ্গ'-রাক বলীর সহিতী দ্রুদেকার গর্ভজাত ক্ষেত্র সম্ভব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, এই পাঁচ ভ্রাতার নাম অঙ্গশায়েই উক্ত পাঁচটি জন ও জনপদের উৎপত্তি হইয়াছে। বাহা হোক, মহাত্মারভের এই উপাখ্যানটি হইতেও মনে হয়, বাংলার প্রাচীন জনগণি, অঙ্গ-বঙ্গভ্রাতা বলিয়াই গণ্য হইত। মজ্জীমুলকর নামক প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে (প্রথমভাগ, পৃষ্ঠা ২০২) দেখিতে পাই পৌণ্ড্র, পৌণ্ড্র, বঙ্গ, সমভট প্রভৃতি জনপদের ভাষাকে আঙ্গুরী ভাষা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা—“অঙ্গুরাণাং ভবন্ বাচা পৌণ্ড্র-পৌণ্ড্রাভ্যবা সদা • • • সর্বেষামঙ্গুরপঞ্চাণাং বঙ্গ-সামভটাপ্রভাং”। আধুনিক কালেও হোটেনাপপুরে মুণ্ডা বা কোল জাতীর অধিবাসীদের কথিত ভাষা-সমূহের মধ্যে “আঙ্গুরী” নামে একটি উপভাষা বর্তমান আছে (Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India, Introduction, p. vi. by P. C. Bagchi)। সম্ভবতঃ প্রাচীনকালের সমগ্র প্রাচ্যদেশের কথিত ভাষাগুলির সাধারণ “আঙ্গুরী” নামটি এখন একটি ছোট উপভাষার নামে মাত্র পর্যাবসিত হইয়াছে।

অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত প্রাচ্য জনগণিকে সাধারণভাবে অঙ্গ বলিয়া অভিহিত করার বর্ণার্থ ভাষ্যপার্থ্য কি, তাহা এখনও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কিন্তু ইহা যে প্রাচীন ভারতের শুষ্কভূমির ঐতিহাসিক সমস্তা-সমূহের অন্ততম স্বেক্সের কোনো লক্ষ্য নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মহাত্মারতে (আদি, ৩৭।১০-১৪) অশোককেও মহান্নর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৮৮।৪) মৌর্যাদিককেই অঙ্গুর বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। বাহা হোক, এখন দেখা যাক, আধুনিক ঐতিহাসিক বিচারে অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি প্রাচীন জনগণিকে কোন race বা মহাজাতির অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আমরা জানি, আর্ধ্যদের ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষে দুইটি প্রধান অর্ধ্য-আর্ধ্য বা আর্ধ্য-আর্ধ্য

জাতি বাস করিত। তাহাদের মধ্যে একটিকে ড্রাবিড় ও অন্তর্ভুক্ত মুণ্ডা বা কোল নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোনটি প্রাচীনতম এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল, তাহা এখন নিঃসন্দেহরূপে বলা যায় না। সম্ভবতঃ মুণ্ডা বা কোলরাই প্রাচীনতম। ইন্দো-সিন্ধুদেশের অন্তর্গত মোহেন্দো-সপ্পো এবং দক্ষিণ পঞ্জাবের অন্তর্গত হরপ্পা নামক স্থানে একটি অতি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বিদ্যমানের নিদর্শন-সমূহ ‘আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সভ্যতার সহিত আর্ধ্য-আর্ধ্য-ড্রাবিড় এবং কোল বা মুণ্ডাদের কি সম্বন্ধ, তাহা এখনও নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। তাই আপাততঃ এই সভ্যতাকে সিন্ধু-সভ্যতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, এই সভ্যতা ড্রাবিড়দেরই কীর্তি। আবার কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, ঐ নিদর্শনগুলি আর্ধ্যদেরই সৃষ্টি। অপর স্তরে এই সভ্যতার সঙ্গে কোল-মুণ্ডাদের সম্পর্ক থাকারও বিচিৎ নয়। বাহা হোক, ড্রাবিড়, কোল-মুণ্ডা এবং সিন্ধু-সভ্যতার স্রষ্টা ভারতের এই প্রাচীনতম তিন জাতির সহিত প্রাচীন বাংলার অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি জাতিগুলির কোনো সম্পর্ক ছিল কি না এবং থাকিলে কাহার সহিত ছিল তাহা নির্ণয় করা বাংলার ইতিহাসের একটি প্রধানতম সমস্তা। আমরা এক্ষণে সে-সমস্তার আলোচনার প্রবৃত্ত হইব না। আমাদের পক্ষে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অনেক পণ্ডিত আশঙ্কায় মনে করেন, সৈনিক গঠন-বৈশিষ্ট্য দেখিয়া জাতি (race) নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কারণ, বহুকালব্যাপী রক্তসংশ্লিষ্টনের ফলে জাতিগত সৈনিক বৈশিষ্ট্য একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এমন-কি, আধুনিক ভারতীয় ড্রাবিড় ও কোল-মুণ্ডাদের সেইগঠনগত কোনো প্রকার পার্থক্য বৃত্তাধিক পণ্ডিতরা নির্ণয় করিতে পারেন না। তাই সৈনিক বৈশিষ্ট্যের চেয়ে ভাষাগত বৈশিষ্ট্যই জাতিনির্ণয়-কার্যে পণ্ডিতদের প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। ভাষাগত দৃষ্ট বিশ্লেষণ করিয়া আধুনিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বাংলার

আদি ভাষাগুলি ছিল Austrie বা Austro-Asiatic ভাষাভাষীদের অস্তিত্ব। এই অষ্ট্রিক্ ভাষাভাষীদের অস্তিত্ব অজ্ঞাত ভাষার মধ্যে আধুনিক কোল, বুড়া, গাঁওভাল, খাসিয়া প্রভৃতি ভাষাগুলির কথিত ভাষা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, মালয় উপদ্বীপ, ইন্দোচীনের কোনো কোনো স্থান এবং ভারত-মগদাগরের দ্বীপপুঞ্জের অনেক ভাষার কথিত ভাষাও এই অষ্ট্রিক্ ভাষার অন্তর্গত। এই সব নানা বিষয় বিবেচনা করিয়া বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অক্ষ-বঙ্গ প্রভৃতি বাংলায় প্রাচীন অধিবাসীরা ভারত-মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ হইতে জলপথে এদেশে আগমন করিয়াছিল। অক্ষ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র প্রভৃতি প্রাচীন নামগুলিও অষ্ট্রিক্ ভাষারই শব্দ। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি—বঙ্গ প্রভৃতি দেশের ভাষাকে মছ্রীমূলক নামক গ্রন্থে আছুরী ভাষা নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং আধুনিক ছোটনাগপুরের বুড়াভাটীর অধিবাসীদের মধ্যে এখনও আছুরী নামে একটি উপভাষা বিদ্যমান আছে। প্রাচ্যদেশীয় অক্ষুরদের ভাষা যে আৰ্য্যভাষা হইতে বিভিন্ন ছিল তাহা নতপথ গ্রাঙ্ঘণ এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্য হইতেও জানা যায়। ইহা হইতেও অনুমান হয় যে, অক্ষ-বঙ্গ প্রভৃতি বাংলায় প্রাচীন জনগুলির কথিত আছুরী ভাষা বুড়াদের ভাষা অর্থাৎ অষ্ট্রিক্-ভাষীর ভাষার গোষ্ঠীভুক্তই ছিল।

বাহা হোক, আমরা দেখিলাম যে, অক্ষ-বঙ্গ প্রভৃতি বাংলায় অধিবাসীরা খুব সম্ভবতঃ অষ্ট্রিক্-ভাষী অনাৰ্য্য ছিল। তাহাদের ধর্ম এবং সামাজিক ক্রীতি-নীতিও যে বৈদিক আৰ্য্যদের থেকে বিভিন্ন ছিল, সে-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্তমান কালে বাংলাদেশে আৰ্য্য-ভাষা, আৰ্য্য-ধর্ম, আৰ্য্য সামাজিক বিধান, এক কথায় আৰ্য্যসভ্যতা, পূর্ণরূপেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে; তাহা আমরা নিতাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। দক্ষিণ ভারতের ত্রাবিড়রা আৰ্য্যসভ্যতা রচনায় গ্রহণ করিয়াছে বাংলা-দেশ তাহার চেয়েও বেশী গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অক্ষ-আৰ্য্য বাংলাদেশে আৰ্য্যসভ্যতা কোন্

সময় এবং কিরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিল, তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

আৰ্য্য-সভ্যতা বাংলাদেশে প্রথম কোন সময়ে প্রবেশ করিল তাহাই প্রথমে বিচার করা যাক। নতপথ গ্রাঙ্ঘণ এবং কালিদাসের রঘুবংশকে বাংলায় আৰ্য্য-সভ্যতা বিস্তারের চাই সীমা বলিয়া গ্রহণ করা যায়। নতপথ গ্রাঙ্ঘণে বিশেষ মাধব সন্থকে যে-উপাখ্যানটি আছে তাহা হইতে নিঃসন্দেহরূপেই প্রমাণিত হয় যে, ঐ গ্রাঙ্ঘণ একটি রচিত হইবার পূর্বে বিশেষ বা দ্বিধিলায় আৰ্য্য-সভ্যতা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ঐ নতপথ গ্রাঙ্ঘণেই প্রাচ্য অক্ষুরভাষাভিগুণকে প্রশান-নিখাণ-পুচ্ছিত এবং তাহা সম্বন্ধে আৰ্য্য হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আৰ্য্য ও অক্ষুরদের মধ্যে চিরন্তন বিরোধের কথাও এই গ্রন্থেই দেখা যায়। সুতরাং বিশেষ আৰ্য্য-আগমনের সময় এবং সম্ভবতঃ নতপথ গ্রাঙ্ঘণ রচিত হইবার সময়েও মগধ, বঙ্গ প্রভৃতি প্রাচ্য অক্ষুরভূমিতে আৰ্য্যপ্রভাব প্রসারিত হয় নাই। নতপথ গ্রাঙ্ঘণ রচনার সময় নিঃসংশয়রূপে নির্দেশ করা সম্ভব নয়। মোটামুটি ভাবে খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম বা সপ্তম শতাব্দীতে এই গ্রন্থ রচনার কাল বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

পক্ষ্যাকর, কালিদাসের রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে রঘুর দ্বিধিধর-প্রসঙ্গে বাংলা দেশের যে বর্ণনা দেখিতে পাই তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, কালিদাসের সময়ে বাংলা দেশে এবং এমন কি কামরূপেও আৰ্য্য-সভ্যতা পরিপূর্ণরূপেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কালিদাস গুপ্তসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (খ্রীঃ ৩৮০-৪১৫) সময়ে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া মনে করিবার হেতু আছে। কা-হিয়ানের (৪০৫-৪১৫) বিবরণ হইতেও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। কা-হিয়ান খুব সম্ভবতঃ কালিদাসের সমসাময়িক। এই চৈনিক পরিগ্ৰাহক প্রধান বন্ধর ছিল তাম্রলিপ্তি; তাম্রলিপ্তি হইতে বানিজ্যপোতা লক্ষ্যপথে সিংহল, যবদ্বীপ প্রভৃতি হাতে

রাজ্যের কবিত্ব এবং সে সময়ে বব্বীশেও গ্রাফাথার্স পূর্ণপ্রভাবে বিদ্যমান ছিল (Legge's Falien. p. 100, 113)। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রারম্ভেই বখন হুন্স বব্বীশেও ভারতীয় আর্থা-সভ্যতার এতটা প্রসার ছিল তখন বাংলা দেশ যে তার বহুপুর্বেই আর্থা-সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না। খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকেও বাংলার আর্থা-সভ্যতা বিদ্যমান ছিল, তার প্রমাণ পাই মরনাগ বাংলায়নের কামদুত্তে এবং মগকবি তাদের 'প্রতিজ্ঞাবোধকরায়ণ' নামক নাটকে। উক্ত নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে উজ্জয়িনী-রাজ প্রমোদের একটি উক্তি হইতে স্পষ্টই বোকা যায়, তাস কবির সময়ে বঙ্গের গ্রামবংশ মধ্যায়র কান্ধি, সুরাট, মিথিলা, নব্বা এবং অবন্তীর গ্রামবংশদুহের সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হইত। চন্দ্রসামীর উপাসক পুন্ডরগারাম চন্দ্রবর্মার তত্ত্বনিয়া (বীকুড়া) পিরিসিপি হইতে এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বাংলার শের প্রান্ত পথ্য আর্থা-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, তার নিশ্চেষ্ট প্রমাণ পাই গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের প্রয়াগ-তত্ত্বনিপিতে। ঐ সিপি হইতে জানা যায়, সমতট (বর্তমান জিপুরা ও ঐহট জিলা), ডবাক (আসামের অপরগত নগর, জিলা) এবং কামরূপের প্রভাব নৃপতিরা কর এবং উপঢৌকনাদি দান করিয়া সমুদ্রগুপ্তের সম্বোধন করিয়াছিলেন। তাহা হইতে সন্দেহই অল্পমান হয়, সমগ্র বাংলা দেশই তৎকালে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল।

মহাস্থিতির দেখিতে পাই—হিমালয়, বিদ্যাপর্কত এবং পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্তী সমগ্র উত্তর ভারতকেই 'আর্থাবর্ত' সম্ভা দেওয়া হইয়াছে। আর্থাবর্তের এই সম্ভা হইতে স্পষ্টই বোকা যায়, মহাস্থিতির সময়ে বাংলাদেশকেও আর্থাবর্তের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা হইত। কিন্তু দুশের বিষয়, নিঃসন্দেহরূপে মহাস্থিতির কালনির্ণয় করা সম্ভব নয়। কিন্তু খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে যে

আর্থা-প্রভাব বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া হুন্স বব্বীশ পথ্য প্রসারিত হইয়াছিল তার প্রমাণ পাই গীক্ ভৌগোলিক টলেমির গ্রন্থে। টলেমি হুন্স মিশর দেশে বসিয়া তাহার ভৌগোলিক অবস্থান রচনা করিয়াছিলেন। অপর তাহার বাংলাদেশ সম্বন্ধেও বিবরণ জানের পরিচয় পাই। তিনি গঙ্গানদীর পাটো বিভিন্ন মোহনার নাম এবং ঐগুলির তীরে অবস্থিত শহরগুলির নামও উল্লেখ করিয়াছেন। এই মোহনাগুলি যে-রূপে অবস্থিত ছিল সেই রূপেই তিনি Gangaridai নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং এই দেশের রাজা যে-নদীতে বাস করিতেন তাহার নাম Gange বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতীয় সাহিত্যে 'গঙ্গরিডাই' নামে কোনো রাজা বা দেশের উল্লেখ পাওয়া যায় না, 'গঙ্গে' নামে কোনো নদীরও পরিচয় জানা যায় না। খুব সম্ভবত ইহারা সংস্কৃত সাহিত্যে অস্ত্র নামে পরিচিত ছিল। রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে 'নৌসামানোস্ত' বসমিনকে 'গঙ্গাপ্রোভোক্তবধু' অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। হুতরাং টলেমির গঙ্গরিডাই রাজ্য প্রাচীন বঙ্গরাজ্য হইতে অভিন্ন বলিয়াই মনে করিতে হয়। আমরা সিংহলের মহাবংশ নামক গ্রন্থে বঙ্গ-দেশে বঙ্গ-নগরে এক বঙ্গ-রাজার উল্লেখ পাই। অল্পমান হয়, মহাবংশের বঙ্গ-রাজ্য টলেমির গঙ্গরিডাই রাজ্য হইতে অভিন্ন এবং টলেমির 'গঙ্গে-নগর' মহাবংশের বঙ্গ-নগরেরই নামান্তর মাত্র। যদি তাই হয়, তবে বসিতে হইবে, মহাবংশের বঙ্গরাজ্য পূর্ণোক্ত গঙ্গরিডাই রাজ্যেরই রাজ্য এবং তাস কবির উক্ত 'বঙ্গ' রাজবংশও এই গঙ্গরিডাই রাজ্যেরই রাজবংশ। দিল্লীর দৌহতত্ত্বনিপিতে (তৃতীয় শতাব্দী) উল্লিখিত আছে, চন্দ্রনামে কোনো নৃপতি এই বঙ্গের অধিবাসীদের সঙ্গে প্রবল সংগ্রাম করিয়াছিলেন। বাহা হোক, টলেমির গ্রন্থ হইতে নিঃসন্দেহরূপেই প্রমাণিত হয় যে, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে বঙ্গরাজ্য এবং বঙ্গনগরের নাম মিশর দেশ পথ্য প্রসার

শাত করিয়াছিল। সুতরাং ঐ সময়ে যে এই মসলিনের নাম Gangetic অর্থাৎ বাংলায় বাংলাদেশের সঙ্গে উত্তর ভারতের অজ্ঞাত দেশের সভ্যতার আদান-প্রদান চলিতেছিল তাহা বঝাই বাহুল্য। শুধু তাই নয়, টলেমির সময়ে ভারতীয় সভ্যতা বর্বর্যাপেক্ষে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া মনে করা যায়। কারণ উাহার, গ্রহে এই বীপটিকে Labadio নামে অভিহিত করা হইয়াছে। শুধু তাই নয়, তিনি "Island of barley" বলিয়া এই নামটির ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। সুতরাং Labadio যে সংস্কৃত বর্বর্যাপেক্ষেই জনমানবের সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে ঐ বীপটি শুধু যে ভারতীয় সভ্যতা লাভ করিয়াছিল তা' নয়, উহার নাম পর্যন্ত সংস্কৃত রূপ ধারণ করিয়াছিল এবং সেই সংস্কৃত নাম 'মিশরের গ্রীক ভৌগোলিকের নিকটও অবিস্মৃত ছিল না।

এবার দেখা যাক, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে বাংলা দেশে সন্দেহ কি কি তথ্য জানা যায়। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে একজন গ্রীক নাবিক সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া ভ্রমণ করিয়া নানাদেশের বাণিজ্য বিষয়ক এবং প্রদেশ-ক্রমে অজ্ঞাত বিবরণও লিখিয়া গিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে উাহার নাম জানা যায় নাই। এই অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিক জনপথে বাংলা দেশেও আসিয়াছিলেন এবং উাহার বিবরণ হইতেই খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বাংলা দেশের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য জানা যায়; ভৌগোলিক টলেমির ভ্রায় এই গ্রীক নাবিকও বন্দকে 'গঙ্গা'-দেশ এবং ইহার প্রধান নগরীকে 'গঙ্গা'-নগরী নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমরা পুর্বেই দেখিয়াছি, এই গঙ্গা-নামা বঙ্গদেশ হইতে অভিন্ন এবং গঙ্গা-নগরী মহাবঙ্গের বঙ্গ-নগরেরই নামান্তর। এতলে গঙ্গাদেশ ও বঙ্গদেশের অভিন্নতা সম্বন্ধে আরেকটি প্রমাণ সেওয়া যাইতে পারে। উক্ত গ্রীক নাবিক বলিয়াছেন, তৎকালে গঙ্গা-নগরী হইতে সর্বোৎকৃষ্ট মসলিন-বস্ত্র (muslins of the finest sort) বিদেশে রপ্তানী হইত এবং

(Periplus, p. 47), কোটিলীয় অর্ধাঙ্গদেশেও (২১১) আমরা দেখিতে পাউ, বস্ত্রের গুণ এবং কার্পাস-বস্ত্র রচনা শৃংখলানু প্রভা বলিয়া গণ্য হইত। এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে "বাস্ককং বেতাং দ্বিগুং হকুলশ্চ"। অজ্ঞাত আছে "নাথুরমপরাত্তকং কলিঙ্গকং কাদিকং বাস্ককং বাৎসকং মহিবকং চ কার্পাসিকং প্রেতশ্চ"। এই বাস্কক হকুল ও কার্পাস-বস্ত্র Periplus-এর Gangetic muslin হইতে অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ, কোটিলীয় অর্ধাঙ্গদেশকে বহন খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী বা তৎসমীপবর্তী কালের গ্রন্থ বলিয়া মনে করিবার হেতু আছে (Roy Chaudhuri's Political History, pp. 7-8), তখন Periplus-এর Gangetic এবং অর্ধাঙ্গদেশের বাস্কক-কে অভিন্ন মনে করাই সম্ভব বোধ হয়। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে গ্রীক লেখকদের গঙ্গারাজ্য ও গঙ্গানগরী যে বঙ্গরাজ্য ও বঙ্গনগর হইতে অভিন্ন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। বাংলা হোক, উক্ত গ্রীক নাবিকের বর্ণনা হইতেই আমরা জানিতে পারি, তৎকালে উৎকৃষ্ট মসলিন ছাড়া বাংলা দেশ হইতে প্রচুর দুগ্ধ, তেজপাতা (malabathrum) এবং গুটামাংসি (Gangetic spikenard) রপ্তানী হইত। এই সমগ্র প্রভা সাধারণতঃ, বাংলাদেশ হইতে জনপথে দক্ষিণ ভারতে যাইত এবং সেখান হইতে রোম-শাস্ত্রাঘো বহুলো বিক্রীত হইত। যে-সময় বৃহৎ বাণিজ্যপোত দক্ষিণ ভারত ও বাংলা দেশের মধ্যে যাতায়াত করিত সেগুলিকে উক্ত নাবিক Colandia নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, তৎকালে বাংলাদেশে Calis নামে এক প্রকার সুবর্ণ-দ্রব্যও প্রচলিত ছিল এবং বাংলাদেশে করেকটী সোনার খনিও অবস্থিত ছিল। এই সমগ্র বর্ণনা হইতে সহজেই মনে হয়, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকেও বঙ্গের অধিবাসীরা নৌসামান্যই ছিল। আর, এমন সমৃদ্ধি সম্পন্ন ও বেশেশোভনের সহিত বাণিজ্যপরায়ণ হইত যে

তখনও আর্থা-সভ্যতার বহির্ভূতই ছিল, একথা কিছুতেই মনে করা যায় না।

গ্রীসীয় প্রথম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের ইতিহাসের আরও ভ্রমকটি তথ্য আলোচনা করিলে আমাদের উক্ত সিদ্ধান্তেরই সমর্থন পাই। আমরা জানি, এই শতাব্দীতেই কান্তপ মাতঙ্গ (খ্রী: ৬২) চীনদেশে গিয়া তথ্য বোধগম্য প্রচার করিয়াছিলেন। আর, ভৌগোলিক টলেমি যখন দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগেই দখৌপের সংকৃত নাম অবগত ছিলেন তখন ‘অম্বত’ প্রথম শতাব্দী কিংবা তাহারও পূর্বেই ঐ দ্বীপে ভারতীয় সভ্যতা প্রবেশ করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। সেন-সময়ে ভারতীয় সভ্যতা একদিকে চীন ও অপর দিকে দখৌপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিল সেন-সময় ভারতবর্ষেরই অম্বর্ত্ত বাঙা দেশ ঐ সভ্যতার বাহিরে থাকিতে পারে না, ইহা অতি সহজেই বোঝা যায়।

ভারপর দেখিতে পাই, এই শতাব্দীতেই কলিঙ্গ দেশের জৈন সম্রাট ধারবেল উত্তর ময়ূর। হইতে লক্ষ্মণ পাণ্ডেশ পর্ণাঙ্গ সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং পূর্ণভারতে মগদের অম্বর্ত্ত রাজ্যপুংগেও সমরাজিধান করিয়াছিলেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, মহাভারতের উপাখ্যানে ‘অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ’সিগকে অম্বর-রাজ বলি বংশজাত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার যে পরম্পর জাতিবৃত্তি আবদ্ধ ছিল, ইহা মনে করিবার অনেক কারণ আছে। শুধু তাই নয়। ইহাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধও খুব ঘনিষ্ঠ ছিল বলিয়া অনুমান করিবার পক্ষে যথেষ্ট হেতু আছে। এখানে ঐক্য ছ’য়েকটি প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি। মহাভারতের সভাপর্বে (৪৪।৭) অঙ্গ ও বঙ্গকে একই ‘বিষয়’ বা রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং মহাবীর কর্তৃক ঐ রাজ্যের অধিপতি (বঙ্গাবিধাধ্যাক্ষ) বলা হইয়াছে। আবার, বৌদ্ধযানের ধর্মগ্রন্থে (১২।১৪) বঙ্গ ও কলিঙ্গসিগকে (বঙ্গকলিঙ্গান্) এমন ভাবে একসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহাতে মনে

হয় তাহার। তৎকালে একই রাজ্যভুক্ত ছিল। ল্যাটিন লেখক লুভিয়াত প্লিনি (Pliny the Elder, খ্রী: ২৩-৭২) তাহার Historia Naturalis নামক গ্রন্থে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বর্ণনা-প্রসঙ্গে একস্থলে বলিয়াছেন, গঙ্গানদীর পশ্চিম অংশ (Gangarides-Calingae) দের রাজ্যের ভিতর গিয়া প্রবাহিত হইয়াছে; ঐ দেশের রাজধানী Parthalis এবং সে দেশের অধিপতির সেনাদলে ষাট হাজার পদাতিক, এক হাজার অশ্ব এবং সাত শত হস্তা ছিল (Monahan's Early History, pp. 4—5)। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, পূর্ণভারত হইতে মলপথে তাম্রপর্ণী (Taprobane) অর্থাৎ সিংহলদ্বীপে ঘাইতে সাত দিন লাগিত। এই বর্ণনা হইতে ঐ দেশের সামরিক শক্তি ও বাণিজ্য সহজে কিঞ্চিৎ ধারণা করা যায়। কিন্তু আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথা এই যে, প্লিনিও Gangarides ও Calingae-সিগকে একই রাজ্যভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, পাণ্ডিত্য লেখকদের দ্বারাও এবং সংকৃত সাহিত্যের বঙ্গভাষা একই। সুতরাং প্লিনীর Gangarides-Calingae এবং বোধায়নের “বঙ্গ-কলিঙ্গা”-কে অস্তির বলিয়া মনে করাই সমস্ত বোধ হইতেছে। বঙ্গ ও কলিঙ্গের মধ্যে ঘনিষ্ঠ রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ থাকার কৃত্তীয় প্রমাণ পাই সিংহলের মহাবংশ নামক গ্রন্থে (৪ষ্ঠ অধ্যায়)। এই গ্রন্থ হইতে জানা যায়, কলিঙ্গ রাজবংশ এবং বঙ্গ রাজবংশের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদানও হইত। বিজয়সিংহের পিতা সিংহবাহুর মাতামহী ছিলেন কলিঙ্গ-রাজকন্যা এবং সিংহবাহুর পিতার (বঙ্গরাজের) রাজকন্যাকে কলিঙ্গ-রাজপুত্র (বঙ্গরাজের শালক-পুত্র) ছিলেন বঙ্গীয় সেনাদলের সেনাপতি। শুধু তাই নয়, সিংহবাহুর পিতার মৃত্যুর পর উক্ত কলিঙ্গ-রাজপুত্রই বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই উপাখ্যানটির ঐতিহাসিক মূল্য বাহাই হোক না কেন, ইহা হইতেও বোধায়নের বঙ্গকলিঙ্গা এবং প্লিনীর Gangarides-Calingae-দের

হুল্লভাঙ্গের অস্ত্রবৈদ্যের সমর্থক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সুতরাং সে-সময়ে কলিকতায় জৈন সম্রাট খারবেলের সাম্রাজ্য আখ্যাব্যক্তি বিকৃতি লাভ করিয়াছিল সে-সময়ে বঙ্গভাষাও যে আর্ধ্যসভ্যতা প্রাপ্তি হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। কলিক-সম্রাট খারবেল ছিলেন জৈনধর্মাবলম্বী। বাংলাদেশেও যে জৈন ধর্মের বখেট প্রভাব ছিল তাহার বখেট প্রমাণ আছে।

ঐটপূর্ণ প্রথম পটভূমিতে বাংলাদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, সে-সময়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। টুগাওয়ার একটি উক্তি হইতে মনে হয়, এই সময়েই গ্রীক নাবিকরা বাণিজ্য উপলক্ষ্যে শিখর হইতে বাংলাদেশ পর্য্যন্ত আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মহাস্থিতি প্রমাণিত ও যে এই সময়েই বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছিল এরূপ মনে করিবার কিছু হেতু আছে। এই গ্রন্থে (২১২) আখ্যাব্যক্তি পূর্ণ সম্রাট পর্য্যন্ত বিবৃত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহাতে বাংলাদেশও আখ্যাব্যক্তির মধ্যেই পড়ে। অর্থাৎ এই গ্রন্থেই অজয় (১৮৩-৪৪) বলা হইয়াছে—পৌণ্ড্র, উদ্র, প্রাবিড়, কাশ্মীর, ধন, শক, পারদ, পল্লব, চীন, কিরাত প্রভৃতি ক্ষত্রিয় জাতিরা “ব্রাহ্মণাধীন”-হেতু অর্থাৎ আখ্যাব্যক্তির মধ্যেই উপনয়ন প্রাপ্তি সামাজিক ক্রিয়ালোপ হেতু হুল্লভ্য অর্থাৎ পূর্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, পৌণ্ড্র এবং উদ্ররা প্রাচীন বাংলার অধিবাসী জন-সমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। মহাস্থিতির এই দুইটি উক্তি হইতে মনে হয়, পৌণ্ড্র ও উদ্ররা ধন, শক, পল্লব, চীন, কিরাত প্রভৃতির দ্বারা আখ্যাব্যক্তি-বহির্ভূতই ছিল। কিন্তু তাহারা ক্রমে ক্রমে অর্থাৎ প্রভাব লাভ করিতেছিল। তাই তাহারা মহাস্থিতি গ্রন্থে পতিত ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, মহাস্থিতির পৌণ্ড্র, উদ্র প্রভৃতি পতিত ক্ষত্রিয়ের তালিকায় অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ প্রভৃতি জনপদের উল্লেখ নাই। সুতরাং মহাস্থিতির সময়ে অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি জনপদ আখ্যাব্যক্তি এক আখ্যাব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়া নিম্নাঙ্গ বলিয়াই মনে হয়।

ঐটপূর্ণ দ্বিতীয় পটভূমিতে পুণ্ড্রমহাস্থিতির রাজক-কালে (খ্রিঃ পূঃ ১৮৪-১৪২) বিখ্যাত বৈদ্যাক্ষরিক পটভূমি তাঁহার ‘মহাভাষ্য’ রচনা করেন। এই গ্রন্থে আখ্যাব্যক্তি-বহু-ভুক্ত ‘কালকবন’ নামক অরণ্যের পশ্চিমে (প্রাচ্য কালকবন) অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই কালকবনের অবস্থিতি সম্বন্ধে সংশয় আছে। তবে সিংহলের মহাবংশ গ্রন্থে রাঢ় অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গের নিকটে সম্ভবতঃ ‘অড়বৎ’ পটভূমি-ব্যাখ্যা একটা পটীর অরণ্যের উল্লেখ দেখিতে পাই। ‘স্ব সম্ভবতঃ’ এই অরণ্য ও মহাভাষ্যের কালকবন অভিন্ন। বাহা হোক, বঙ্গদেশ যে এই কালকবনের পূর্বে অবস্থিত ছিল সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। সুতরাং পটভূমির মত বাংলাদেশ আখ্যাব্যক্তির বাহিরেই ছিল। কিন্তু তিনি অজয় অঙ্গের রাজা অঙ্গ, বঙ্গের রাজা বাঙ্গ প্রভৃতি শব্দের বৈদ্যাক্ষরিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি জনপদের রাজারা তৎকালে, ক্ষত্রিয় বলিয়াই গণ্য হইতেন।

ঐটপূর্ণ তৃতীয় পটভূমি প্রায় সমগ্র ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন মোঘলবংশের সম্রাট অশোক (২৭২-২৩২)। তাঁহার রাজত্বকালে বঙ্গদেশ মোঘল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা সে-বিষয়ে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু বঙ্গদেশ যে তাঁহার সাম্রাজ্য-ভুক্ত ছিল এরূপ অনুমানের অসুস্থল বখেট পরোক্ষ প্রমাণ হিউ-এ-নোর ভারতবিবরণ ও মহাবংশ, দিব্যাবদান ও প্রিন্সের Historia Naturalis প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। তা’ছাড়া যে-সাম্রাজ্য দক্ষিণ চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি দেশ এবং পশ্চিমে পারস্ত-রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল, বঙ্গদেশ মগধের অধিবাসিত সীমান্তবর্তী হইয়াও যে সে-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। ‘তৃতীয়তঃ’, যে কলিঙ্গদেশের সঙ্গে বঙ্গদেশ অনেক সময়েই হুল্লভ্য থাকিত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়, সেই কলিঙ্গদেশ ধন-বোহরতর ল-প্রায়ে

পর মৌর্য সাম্রাজ্যকাল হইয়া গেল তখনও বাংলাদেশের পক্ষে স্বাভাৱ্য রক্ষা করা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। চতুর্থত, আমরা জানি—অশোক চোল, চের, পাণ্ডা, তাম্রপানী (সিংগ) পশ্চাত্তম সমগ্র অধুনাশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাহিরে ইউরোপে গ্রীস ও আফ্রিকার মিশর পর্যন্ত ভারতীয় ধর্মপ্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার ধর্মপ্রচারকগণ বাংলাদেশেও ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ করা চলে না। অতএব তাঁহার রাজত্বকালে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকেও বাংলাদেশে উত্তর ভারতীয় সভ্যতা যথেষ্ট প্রাচীর্য অর্জন করিয়াছিল, একথা অনায়াসেই মনে করা হইতে পারে। এই অহমান অশোকও দুতর প্রমাণ রহিয়াছে অশোকের প্রচারিত ও প্রস্তরপাথে খোদিত ধর্মগ্রন্থাদি। তাঁহার একটি ধর্মগ্রন্থাদি (Rock Edict. XIII) হইতে স্পষ্টই জানা যায়, ঐ সময়ে কলিঙ্গ রাজ্যে বহু রাজ্যের বসতি ছিল। অতএব অশোকের রাজত্বের বেশ কিছুকাল পূর্বেই যে কলিঙ্গ অর্থাৎ-সভ্যতা প্রবেশ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। লক্ষ্য করার বিষয়, খারবেলের হাতিক্ষুদ্রা-লিপিতে সঙ্কত সাহিত্যের পূর্ণ প্রভাব বিস্তারিত, অথচ 'খারবেল' নামটি যে অর্থাৎ শব্দ তাহাতে সন্দেহ নাই। আর যে-সময়ে কলিঙ্গ জনপদ অর্থাৎ-সভ্যতার প্ৰাচীর্য মধ্যে আসিয়াছিল বঙ্গ-জনপদও প্রায় সেই সময়েই ঐ সভ্যতা লাভ করিয়াছিল, এ কথা নিঃসন্দেহই মনে করা হইতে পারে। ইহার চের ও স্পষ্টতর প্রমাণ আছে। পূর্বোক্ত ধর্মগ্রন্থাদিই অশোক বসতিভেদে, একমাত্র বনবনের (অর্থাৎ ক্রীক্সের) জনপদ ছাড়া ভারতবর্ষে এমন কোনো জনপদ নাই যেখানে ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মণ (বৌদ্ধ বা জৈন ভিক্ষু) নাই। অশোকের এই উক্তি হইতেই প্রমাণিত হয় যে, তৎকালে সমগ্র ভারতবর্ষেই অর্থাৎ-সভ্যতা প্রসার লাভ করিয়াছিল। সুতরাং কলিঙ্গের জায় বঙ্গ জনপদেও ব্রাহ্মণ এবং ব্রহ্মণের বসতি ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই। পূর্বে দেখিয়াছি,

মহাসাহিত্যের সমস্তও বন, শব্দ, শব্দ, পৌত্ত, উক্ত প্রচলিত কতকগুলি জনপদ ছাড়া আর সর্বত্রই ব্রাহ্মণের এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সমাজের প্রভাব বিস্তারিত ছিল। সুতরাং দেখিতেছি, অশোকের অহ্মশালন (Rock Edict, XIII) এবং মহাসাহিত্যের উক্তি (১০৪২-৪৪) অর্থাৎ-সভ্যতার প্রসার সম্বন্ধে একই অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষভাগে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালেও (৩২২-২৯৮) বঙ্গদেশ মগধের অধীন ছিল মনে করিবার হেতু আছে। যে বীরের প্রভাপ মগধ হইতে গুজরাট এবং গুজরাট হইতে পারস্য দেশের সীমান্ত পর্যন্ত অক্ষর ছিল, যাহার শক্তির নিকট আলেক্সান্ডারের পরাক্রান্ত সেনাপতি সেনিউকস্কেও পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তিনি যে মগধের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই, তাহা মনে হয় না। গ্রিনির একটি উক্তি হইতে মনে হয়, পশ্চিম শেষ অংশ পর্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগেই (the whole tract along the Ganges) মগধের আধিপত্য স্বীকৃত হইত। মহাবংশের একটি উপাখ্যান হইতে মনে হয়, অশোকের সময়ে মগধের রাজশক্তি সমুদ্রতীরবর্তী ভাঙ্গলিখিতও অব্যাহত ছিল। তিব্বতের লামা তারনাথ লিখিয়াছেন, চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার "ভঙ্গল" (অর্থাৎ বাংলা) দেশের অন্তর্গত গৌড়দেশে অধিবেশন করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, চন্দ্রগুপ্ত যে বঙ্গের সহিত খনিষ্ঠত্বের আবদ্ধ কলিঙ্গ-রাজ্য ভয় করিতে পারেন নাই সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই তথ্যটি হইতেই চন্দ্রগুপ্ত বাংলাদেশেও রাজত্ব করিয়াছিলেন কিনা এ বিষয়ে একটু সন্দেহ হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের মধ্যভাগে মগধের নন্দ-রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা 'সর্বকাম্যাক', 'একরাত' মহাপদ নন্দ (আনুমানিক ৩৬২—৩৩৬) একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি উত্তর ভারতের অনেকগুলি বড় রাজ্যকেই মগধ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া গইয়া-ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনিই ভারতের ইতিহাসে

সর্গপ্রথম সদ্যটু এবং তাঁহার স্থাপিত মগধ সাম্রাজ্যই ভারতবর্ষের প্রথম সাম্রাজ্য। এইসমূহই পুরাণগুলিতে তাঁহাকে 'সর্গকর্ত্তব্যক' ও 'একরাটু' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বাহ্য হোঙ্ক, তাঁহার বিস্তৃত সাম্রাজ্যের মধ্যে কলিঙ্গ অঙ্গভর। কলিঙ্গাধিপতি 'খারবেলে'র হাতিশুদ্ধ-লিপিতেও নন্দরাজ কর্ত্তক কলিঙ্গ-বিজয়ের উল্লেখ আছে। কিন্তু মহাপদ কর্ত্তক বঙ্গদেশ-বিজয়ের কোনো প্রত্যক্ষ বা সংস্রাভীত প্রমাণ নাই। নন্দরাজ-বংশের শেষ সময়ে দ্বিধিতরী আলেক্সান্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন (৩২৭—৩২৫)। তিনি যখন বিপাশা (Hyphasis) নদীর তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন তখন তিনি 'ভগল' (Phegela or Phegeus) নামক জনৈক স্থানীয় ক্ষত্রিয় রাজার নিকট Prasii এবং Gangaridaeদের সামরিক শক্তির বিষয় অবগত হইলেন। হুইনটান্স কাটিয়াসের লিখিত বিবরণ হইতে বোঝা যায়, Prasii ও Gangaridae দুইটি স্বতন্ত্র জাতির নাম, কিন্তু তাহারা একই (নন্দবংশীয়) রাজার অধীন ছিল। Prasii সম্ভূত 'প্রাচ্য' শব্দের রূপান্তর হার এবং এগুলে প্রাচ্য শব্দের দ্বারা মগধকেই বুঝায়; কারণ, পাক্কাতা লেখকরা Palibothra অর্থাৎ পাটলিপুত্রকে এই রাজ্যের রাজধানী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আর, স্ট্রাবো ও টলেমির বর্ণনা হইতে দেখা যায়, গঙ্গার শাখাসমূহের দ্বারা নিখোঁত বর্ত্তমান বাংলায় দক্ষিণ অংশকেই গঙ্গারাজ্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু 'গঙ্গারিডি' কথার সম্ভূত প্রতিরূপ কি তাহা এখনও পণ্ডিতরা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। অথচ গ্রীকরাই যে সর্গ-প্রথমে এই নাম ব্যবহার করিয়াছিলেন তাও বলা যায় না। কারণ, ভারতীয় ক্ষত্রিয় রাজা ভগলই আলেক্সান্ডারের নিকট ঐ নামে গঙ্গাবিশোভ রাজ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। সুতরাং আমার মনে হয়, আরও অধ্যয়ন করিলে সম্ভূত সাহিত্যেও ঐ নামের আসল প্রতিরূপের সন্ধান পাওয়া যাইবে। 'বোহিসদ্বাবদানকল্পলতা' নামক বৌদ্ধ সম্ভূত গ্রন্থে

'গঙ্গাধিপত্যের' রাজা। মেকর নাম পাওয়া যায় (Buddhist Literature of Nepal—by H. L. Miura, p. 76)। এই গঙ্গাধিপত্য বা গঙ্গারাজ্য যে গ্রীক ঐতিহাসিকদের 'গঙ্গারিডি' হইতে অতিরিক্ত একথা মনে করা হইতে পারে। আমরা পূর্ণে বসুধা, মহাবংশ, টলেমির ভূগোল, Ptolemy এবং অর্গনারের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, 'গঙ্গারিডি' বলিতে বঙ্গদেশকেই বুঝায়। আর, এখন সেখানকার গঙ্গাধিপত্য বা গঙ্গা-রাজ্য নাম সম্ভূত সাহিত্যেও পাওয়া যায়। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, বঙ্গ ও গঙ্গারাজ্য একই দেশের দুইটি নাম মাত্র। এক দেশের দুই নামে পরিচয় থাকা বিচিরা নয়। একই পূর্বের আমরা সেখিয়াহি, গ্রীকরা মগধকেই 'প্রাচ্য' নামে জানিতেন; গ্রীকরা যেমন মগধকে সর্গদাই Prasii বলিয়াছেন, মগধ নাম কখনও ব্যবহার করেন নাই, তেমনি বঙ্গকেও তাহারা সর্গদাই গু 'গঙ্গারিডি' নামেই অভিহিত করিয়াছেন। সুদূর বিপাশাতীরবর্তী ক্ষত্রিয় রাজা ভগল মগধ এবং বঙ্গকেই আলেক্সান্ডারের নিকট প্রাচ্য ও গঙ্গারাজ্য নামে পরিচয় দিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

বাহ্য হোঙ্ক, আমরা সেখিয়াহি বঙ্গ বা গঙ্গারাজ্যকে কাটিয়াস মগধ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু অস্ত্রান্ত পাক্কাতা লেখকদের রচনার ভিন্ন রকমের উক্তিও দেখা যায়। যথা, ডিওডোরাসের উক্তি হইতে মনে হয় মগধই গঙ্গারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; আবার, প্লুটাক্স গঙ্গারাজ্য ও মগধকে দুই জন স্বতন্ত্র রাজার অধীন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদের পক্ষে এগুলে এই সমস্তরী মীমাংসার প্রবৃত্তি ন। হইয়া গু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আলেক্সান্ডারের ভারত-আক্রমণের সময় অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ ভাগে বঙ্গদেশ উত্তর-ভারতবাসী স্রবিত্ত মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া মনে করিবার পক্ষে অনেক হেতু আছে।

সুতরাং ঐ সময় কিংবা তাহারও পূর্বে বাংলার
আর্য্য প্রভাব প্রবেশ করিয়াছিল।

শতপথ গ্রন্থে বিবেক বা মিতিলার আর্ধ্য-সভ্যতা
বিভারের দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছে। আর ঐতরেয়
গ্রন্থেও (৮২২) অঙ্গদেশে অতি প্রাচীন কালেই
আর্য্যবর্ষ প্রবেশের প্রমাণ আছে। এই দুইট গ্রন্থ
এবং ঐটপূর্ব অষ্টম শতক রচিত হইয়াছিল বলিয়া
মোচামুটি ভাবে ধরা হইতে পারে। সুতরাং শতপথ
এবং ঐতরেয় গ্রন্থ রচনার সময় হইতে মহাপন্থ নামের
সাম্রাজ্য-কালের (৩৬২-১৪) মধ্যবর্তী সময়ে বাংলাদেশে
আর্য্য-সভ্যতা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত
করিতে হয়।

বৌদ্ধধর্মের ধর্মপুত্র হইতেও এই সিদ্ধান্তেরই
সমর্থন পাওয়া যায়। এই গ্রন্থখানি ঐটপূর্ব চতুর্থ বা
পঞ্চম শতক রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হইতে
পারে। এই গ্রন্থে অঙ্গ ও মগধের অধিবাসীদিগকে
'সকৌ' অর্থাৎ মিশ্র জাতি বলিয়া বর্ণনা করা
হইয়াছে (১২১৩)। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়,
ঐ সময়ে এই দুইটি জনপদে বৈদিক সভ্যতা কতকটা
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু প্রাথমিক লাভ করিতে
পারে নাই। কিন্তু অঙ্গ ও কলিঙ্গ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,
ঐ দুই জনপদে সেলে আর্য্যাবর্তে প্রভাববর্তন করিয়া
পুনঃপ্রত্যাবর্তন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ওহু হইতে
হইবে এবং কলিঙ্গে বাণ্ড্যার ক্ষত্র বৈশ্যবান নামক
জনের একটি বংশে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া
হইয়াছে। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায়, ঐ সময়েও
বঙ্গ এবং কলিঙ্গ আর্য্যভূমির বহির্ভুক্ত বলিয়া গণ্য
হইত, অথচ বৈদিক আর্য্যরা ঐ দুই জনপদে ঘাটয়াত
করিত। নতুবা প্রায়শ্চিত্তের বিধানই দেওয়া হইত
না। আর-একটি দৃষ্টান্ত বিদ্যানে বলা হইয়াছে—

অঙ্গবরকলিঙ্গেশু হুয়াই মগধে চ

তীর্থ-যাত্রা বিনা গচ্ছন পুনঃ সফারমর্মতি।

এই শ্লোকটিতে বৌদ্ধধর্মের দৃশ্যের পরবর্তী অবস্থা

দৃষ্টি হইতেছে। কারণ, ইহাতেও প্রায়শ্চিত্তের
বিধান আছে বটে, কিন্তু ঐ সময়ে বৈদিক আর্য্যরা
অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি জনপদে অধিক সংখ্যায় হইতে স্কন্ধ
করিয়াছিল এবং ঐদব জনপদে বৈদিক আর্য্যদের
তীর্থযাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। মহাত্ম্যভক্তের
জনপদে পূর্ব-ভারতের কয়েকটি তীর্থের উল্লেখ আছে।
তার মধ্যে এ তুলে কামাখ্যা, লৌহিত্য, করতোয়া,
বৈতরণী এবং গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম তীর্থের নাম করিলেই
যথেষ্ট। গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, এই
তীর্থে হান করিলে অঙ্গদেশে যজ্ঞের মণ্ডল ফল পাওয়া
যায়। আরও আছে ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া সমস্ত
পশ্চিমপারে গিয়া হান করিলে সর্গ প্রকার পাপ হইতে
বিনুক্ত হওয়া যায়। এই দুটি হান বঙ্গদেশে অবস্থিত।
আর বৈতরণী-তীর্থ কলিঙ্গ দেশে অবস্থিত। মহাত্ম্যভক্ত
তীর্থযাত্রা ছাড়াও পূর্বভারতে গমনের পুণ্য আছে।
যথা, পাতুয় সিংহন-বর্ণনায় আছে, তিনি পুণ্ড্র, হুঙ্গ
প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন (আদি, ১১৩ অধ্যায়)।
পাতুয় পুত্র ভীমও সিংহন-কালে পুণ্ড্র, হুঙ্গ, বঙ্গ,
তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়াছিলেন (সত্য, ২০ অধ্যায়)।
বৌদ্ধধর্মের বিধান অনুসারে পাতু বা ভীমকে কোনো
প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়
না। শুধু তাই নয়, মহাত্ম্যভক্তের বহু স্থানে আর্য্য
ও অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতির পারম্পরিক সম্বন্ধের উল্লেখ আছে;
কিন্তু কোথাও প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ নাই। তারপর
হরিকণ্ঠে দেখিতে পাই, তীর্থযাত্রা কিংবা সিংহন
ছাড়া আর-একটি তৃতীয় এবং প্রবলতর কারণেও
আর্য্যরা অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি দেশে জনপদে গুপ্ত আশ্রয়
নয়, স্থায়ী ভাবে বাস করিতেও আরম্ভ করিয়াছিল।
সে কারণটি হইতেছে—ক্ষুধা ও ভয়ের তাড়না। এই
গ্রন্থে আছে, আর্য্যরা ক্ষুধার তাড়নায় বিবেকের পূর্ব
সীমাহিত্তি কোমল নদী অতিক্রম করিয়া অঙ্গ-বঙ্গ-
কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে আগ্রহ প্রদান করিবে এবং
শ্রদ্ধাঙ্গের সহিত বাস করিবে।—কৌশিকী প্রভৃতি
নদী: ক্ষুধাংগীভিঃ। অহান্ বহান্ কলিঙ্গাং

• • • সংপ্রতিষ্ঠা মানবাঃ • • • নিবংস্তসি
নরাঃ শ্রেষ্ঠমণিঃ সহ । সুতরাং মৌর্য সম্রাট অশোকের
রাজত্বকালে কলিঙ্গ এবং অজ্ঞাত জনপদেও যে বহু
ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মণ দ্বারী ভাবে বাস করিতেছিল, তাহা
কিছুমাত্র বিচিত্র নহে । আমরা এই প্রবন্ধে বঙ্গ
প্রভৃতি জনপদে শুধু ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বৈদিক সমাজভূক্ত
আর্য্যদের প্রবেশ ও প্রভাব বিস্তারের বিষয়ই আলোচনা
করিতেছি । সুতরাং এখানে ঐ সব জনপদে বৌদ্ধ ও
জৈন ধর্মের বিস্তারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব না ।

বৈদিক আর্থ্যতা যে বঙ্গ প্রভৃতি জনপদে আগমন
করিয়া অনাথ্য, অস্থির বা শ্রেষ্ঠমণির সহিত বাস
করিতে লাগিলেন শুধু তাহাই নহে, পরন্তু কালক্রমে
ঐ সব শ্রেষ্ঠমণিকেও আর্থ্যতাভাবপর করিয়া তুলিলেন ।
এই প্রক্রিয়াটিও শতপথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ গ্রন্থের সময়
হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল । শতপথ ব্রাহ্মণে প্রোচাদিগকে
আতুর্গা বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু সন্ম-সন্ম এমন
কথাও বলা হইয়াছে যে, তাহারা আর্থ্যপদের দ্বারা
একই প্রতাপতি হইতে উৎপন্ন । তাহাদের ভাষা
আর্থ্যতাভা হইতে বিভিন্ন হইলেও তাহারা বিকৃতভাবে
আর্থ্যতাভা উচ্চারণ করিতে পারিত । ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও
নহা পুণ্ড্রদিগকে পতিত আর্থ্য বলিয়া গণ্য করা
হইয়াছে । মহাভারতের মতে অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি অস্থির-
রাজ বলির বংশধর বটে, কিন্তু তাহাদিগকে বেদ-
বেদাঙ্গ-পারগ মহর্ষি দীর্ঘতমার স্পর্শভাত সন্তান এবং
অস্থিররাজ বঙ্গিকেও গঙ্গারানপরায়ণ পরম ধার্মিক
বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । পরবর্তী কালে

অস্থিররাজ বলির বংশধরদিগকে 'বালের ক্ষত্রিয়' এবং
'বালের ব্রাহ্মণ' বলিয়া গণ্য করা হইয়াছিল । যথা—

মহাবোধী স তু বলি বঁদু বনুপতিঃ পুরা ।

পুত্রোহুৎপাদয়ামাস শক বংশকতান্ তুবি ।

অনঃ প্রথমতো ক্ষত্রে বনঃ সূক্ষ্মতথৈব চ ।

পুণ্ড্রঃ কলিঙ্গস্ত তথা বালেশঃ ক্ষত্রহুচ্যতে ।

বালেশ্য ব্রাহ্মণ্যক্টেব তত্র বংশকরা তুবি ।

(হরিবংশ, ৩১ অধ্যায়)

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, বে-পুণ্ড্রদিগকে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে
নহা বা অনাথ্য বলা হইয়াছে সেই পুণ্ড্রদিগকেই
মহাসংহিতায় ব্রাহ্মণাধর্মণ হেতু পতিত ক্ষত্রিয় বা বৃদ্ধ
বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে এবং মহাসংহিতার সময়
অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি অঙ্গ জনরা সম্ভবতঃ পূর্ণ ক্ষত্রিয় বলিয়াই
গণ্য হইত ।

এইভাবে শতপথ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সময় হইতে
তিন চার শত বৎসর ব্যাপ্ত সময়ের মধ্যে বঙ্গ প্রভৃতি
প্রোচা-ভারতীয় জনপদে একদিকে ক্রমে ক্রমে আর্থ্য-
সমাপন হইতেছিল, অপরদিকে প্রোচা-ভারতীয় অনাথ্যরা
কালক্রমে আর্থ্যতাভাবপর ও আর্থ্যসমাজভূক্ত হইয়া পেল
এবং অনেকে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল ।
অবশেষে আত্মমানিক মহারাজ অশোকের দময়ে
বাংলার জন-সমুদ্রায় প্রায় সম্পূর্ণরূপেই আর্থ্য-সভ্যতা
লাভ করিল ও কালক্রমে সমগ্র বাংলা দেশটিই
আর্থ্য্যবর্তের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পেল ।



চাঁপা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ

এক সেশের এক রাজা—রূপে-গুণে সত্যি কান্তিক।
রাজা এখনো বিয়ে করেননি।

তারি রাহো এক বনে পাতার ধরে থাক্ত মা
আর মেয়ে চাঁপা। কে তার নাম রেখেছিল চাঁপা
জানিনে। চাঁপার গারে রূপ আর ধরে না।

বুড়ী-মা ম'হবার আগে কেঁদে খুন—“আমি খ'লে
আমার চাঁপাকে কে দেখবে?”

চন্দনের দিকে চাইতেই চন্দন বুক জুলিয়ে বস্লে—
“আমি দেখব”। বুড়ী পুঁী হ'রে চোখ বুল্।
বহুর কাটিল। চন্দন বস্লে, “চাঁপা, এবার আমার
বিয়ে কর।”

চন্দন কাঠুরে; পরীষ, কিন্তু গারে মহুরের ধোর।
চাঁপাকে এক চাতে উঠতে তুলে পুতুলের সভো
নাচার; গাছের মত মোটা। ভাল একটানে মড় মড়
ক'রে ভেঙে কেলে। বহুর পিচি বরস চন্দনের।

চন্দনের কথা শুনে চাঁপা বস্লে—“গাড়াও, বলন্ত
আম্বক—”

চাঁপার সঙ্গারে অনটন নেই কিছু। মালা গাঁথে,
মহুরের পাখার মুকুট তৈরী করে, রত্নীন্ কাপড়
বোনে। চন্দন এসে বনের ফল, করণার জল তুলে
দিয়ে যায়। সকলেই জানে চাঁপা-চন্দনের বিয়ে হ'বে।

চাঁপার দাঁটি বন্ধ ছিল, মিনি আর চন্দন। মিনি
খালি মি'রাও কহ্ত। আর চন্দন তাকে ভালবাস্ত।

দিন যায়—

ঈত-মরা গাছে আবার নতুন পাতা গম্ব'তে
স্বক ক'রেছে। চন্দনের আর তৃ'স ন।

চাঁপা বলে,—“সব্ব-সব্ব; গাছে-গাছে ফুল ফুটক—
তবে তো?”

সে-দিন চাঁপা বেশ সরোবরে নাইতে। রাজা
বেরিয়েছেন কুণ্ডায়। চাঁপার সঙ্গে দেখা। রাজার

চোখে আর পলক পড়ে না। তিনি মিস্লেস্ করলেন—
“তুমি কে?”

চাঁপা বস্লে—“আমি চাঁপা।”

রাজা ব'ললেন, “তুমি রাণী হ'বে?”

“কেমন ক'রে?”

রাজা হেসে বস্লে, “আমার বিয়ে ক'রে।”

চাঁপা খু'ব লাল ক'রে পালিতে গেল। রাক্তিরে
খড়ের বিছানায় শুয়ে চাঁপা স্বপ্ন দেখ্লে, সে সোনার
পালকে শুয়ে আছে; কাছে গাড়িয়ে রাজপুতুর—
লাল-শোমাক-পরা, মাখার হীরার মুকুট, পলায় নুতলার
মালা। চাঁপা উঠে বস্।

ভোর হ'ল। লাল শাড়ীখানা প'রে—মাখার
মহুরের পালকের মুকুট প'রে চাঁপা জল আন্ডে-চন্দল
সরোবরে। রাজার সঙ্গে দেখা—

ঘোড়ার চঁড়ে চাঁপা রাণী হ'তে চন্দ।

চন্দন এসে মেখে মিনি বেড়াল বাঁধা; ধরের ক'প
বন্ধ; চাঁপা ধরে নেই, বকুল-তলার নেই, সরোবরে
নেই—কোথার তবে চাঁপা!

এদিকে চাঁপা হ'ল রাণী। কত দান-দাসী লোক-
গড়র হীরা-মহরৎ মাণিক-নুত! চাঁপার গরব আর
ধরে না। রাক্তিরে সোনার পালকে চাঁপা ঘুমিয়ে
আছে; ঘুমের ঘোরে শুন্লে, রাজার বাগানে কে
“চাঁপা” “চাঁপা” ক'রে কাঁদে। চাঁপা ঘুম ভেঙে উঠে
বস্। জান্‌লার গাড়িরে শুন্লে, কে কেঁদে কেঁদে
জাক্ছে—“চাঁপা-চাঁপা-চাঁপা”—চাঁপা চিন্ চন্দনের
গলা। পরদিন চাঁপা রাজাকে বস্লে—“সারারাত একটা
লোকের কান্নার আনার চোখে ঘুম আসেনি;
লোকটাকে তোমার রাজ্য থেকে দূর ক'রে দাও।”
চন্দনকে দূর ক'রে দেওয়া হ'ল। দিন গেল।

রাক্তিরে চাঁপার চোখ জ্বল ভারী হ'রে

উঠেছে—এখন সময় শুকলে রাজার বাগানে যিনি বেড়াণ ডাকছে—“টাণা-টাণা-টাণা”! টাপা ঘুমে আঁচল জড়িয়ে ঘুমে চাইল, কিন্তু ঘুম কিছুতেই আসে না। পরদিন রাজার কাছে বললে,—“একটা বেড়ালের আবার আমি ঘুমুতে পারিনে; ওটাকে জলে ডুবিয়ে মারো।”

বিনিকে জলে ডুবিয়ে মারা হ’ল। কিন্তু তবু রাত্তিরে টাপা ঘুমুতে পারল না। বকুল-কুল এসে বললে, “আমি এসেছি, মালা গাঁপো।” ময়ূরের পালক এসে বললে, “কই মুকুট?” কল্লী এসে বললে, “কই নাইতে বাবে না?” টাপা উঠে বলল। কেউ কোথাও জেগে নেই। অন্ধকারে চুপি-চুপি দিয়ে টাপা পাতার ঘরে আঙন ধরিয়ে দিল।

পাতার ঘর পুড়ে গেল; আর গেল চড়াই পাখীর ঘাবী ছেলে-পুলে নিয়ে। চড়ায়ের বৌ পুড়ল না, পালিয়ে গেল।

আর পুড়ল টাপার কপাল।

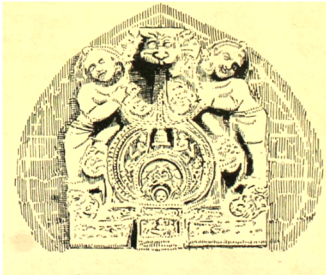
পরের রাত্তিরে টাপা ঘুমুবে—কানের কাছে চড়াই-মা ছেক উঠল—“টাণা-টাণা-টাণা”—টাণা চমকে উঠে সোনার পালকে বসে রইল।

রাষ্ট্র হ’রেও টাপার হুং নেই। না ঘুমিয়ে টাপার অমন সোনার বরণ কালি হ’রে গেল। পরদিন চড়াই-মাকে মারতে সৈন্য ছুটল, সেনাপতি ছুটল, বহু রাক্ষা ছুটলেন। টাপা তার সর্ব্ব পণ করলে—বে মারবে চড়াইকে—

কিন্তু কেউ পারল না। চড়াই পাখী পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। আর রাত্তিরে টাপা চোখ বুজলেই বলে, “টাণা-টাণা-টাণা—আমার ছেলে কই, মেয়ে কই?”

চড়াই-মাও মরে না—টাণার চোখে ঘুণ আর আসে না।

‘প্রাণে রক্ষা’র বেশভিগ্ন পদ অবলম্বনে



জলাঙ্গী

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

সেখিলাম জামা মেঘে প্রান্তরের বটতলুলে
শিখিল কবরী-বন্ধ; শুদ্ধ হুই ওত্র তাঁট ফুলে
তচিয়া সীমন্ত-শোভা, তরলিত হুবার্ষ অকল
প্রসারিয়া চৈত্র-রোস্ত্রে একাকিনী শান্ত অচল
চেয়ে আছে দূর পুত্রপানে। মেঘ সম নীল শাড়ী
আলিঙ্গিয়া সর্পতলু চ'লে গেছে দেহসীমা ছাড়ি'
দিশন্তে স্বপ্নের মত—পত্নীহীন স্মৃতিভূর সেশ,
জ্ঞানবর্ধে ডাকে গুণ, নেত্রের নামে উদ্ধার আবেশ'
তলুজ্বারাভলে 'আসি' মনে হ'ল তিনি যেন তা'রে,
তাহার নুনের রেখা জন্ত-জন্তাবের অককারে
অর্ধ-বিবৃতির দীপে উজ্জলিয়া উঠিল জনরে—
বেহবরে সস্তাখিয়া কহিলাম, 'অধি অধিহয়ে,
তুলেছি তোমার নাম—বহুব্র 'আদিরাছি চলি'।'
'জলাঙ্গী—গঙ্গার সখী'—সিদ্ধহাস্তে কহিল জামলী।

সহসা পড়িল মনে, পুরাতন পরিচর-পথে
একটি মালার মত দিনগুলি পাঁথা এর প্রোতে।
এর জল-কলধ্বনি, দ্রাবণের ঘন-সমারোহ,
উদয়-অস্তের লীলা, দিনান্তের সন্ধ্যায়াগমোহ,
আমার কাব্যের মাঝে এর লগ্ন গোপন সঙ্গার
প্রথম করিহু অম্লভব। জন্মের গুরুভার
দূরে সেল, কহিলাম, 'চিনিরাছি, হে জামলী মেঘে,
কিশোর-শব্দের সাথী, কতদিন সুস্থপান পেয়ে
কিরেছি তোমার পাশে। তুমি ছিলে অদ্রবর্ণিনী
তটপ্রান্তলীনসেহা বহুব্র-বিন্দু-সখিনী—
ভরুর বিদ্রম্ভেরা দূর্ধ্ব পদসম ছায়াসখী;
আজ সেখি নবী নহ, নারী তুমি কবি-চিত্র মোহি'
ব'লে আছ একাকিনী প্রান্তরের পঞ্চতলুলে।
তনিহু কি সেই বাঈ বাজিত বা' তব কুলে কুলে।'

'বঙ্গের বহুনা তুমি মেঘকলা অধি অপকল,—
বৈষ্ণবী রসের ধারা সুরভিত অহরাগ-গুণে।
তব ঘন কাশো বলে বলে পলে পলে লহরে লহরে
আত্মবিসর্জনী পান বাজিতছে তরলিত স্বরে
উমার বঙ্গের মাঠে। গুনি গৌড়-সারঙের হুরে
অশূর্ষ সন্ন্যাস-কথা—সে কাহিনী আসে দূরে দূরে
স্বপ্নশেষ শতাব্দীর তলু রোস্ত্রে, অগ্নি উদাসিনি!
তুমি ত' জানো না নিম্নে উঠিছে কি বিবৃত রাশিণী
অবিভ্রাম গতির ভরীতে!' জলাঙ্গী উঠিল হাসি—
মমিকা-বহুল-কুল ওত্র কুল যেন রাশি রাশি
নিঃপথে করিয়া গেল—'সে কাহিনী পড়ে না ত' মনে,
আমার নৃতন জন্ম, নব বোত, নৃতন প্রাবলে
সে বৃত্তি ফেলেছি দূরে; নারী নহি:—নিভাগভিঙ্গীলা
কালপ্রোতে ছুটে চলি—তুলে বাই—এই মোর লীলা।'

'যে নদি, গেবেছি আমি মানবীর হৃৎক-বিলসে;
সে-ও ত' তোমারি মত ভুলে যায় সিধ অবকাশ!
কত কাবা, কত পান বুঝা হচে চরণ-শৃঙ্খল!
গতির গভীর বেগে বিচ্ছেদের ধ্বনি অধিরল
বাজিছে গভীর মস্ত্রে। একত্বপ—নবী আর নারী
নিশিদিন চেয়ে আছি—সে রহস্ত বৃত্তিতে না পারি;
বেগবির জলসেহ, তলহীন পরিণামহীন—
অজ্ঞাত ইদিকে ছুটে, চেয়ে আছি বুড় নিশিদিন!'
দিন শেষ হ'য়ে এস; বৈশালের ঘন পঙ্ক সনে
আসে গোপ্দি-ছায়া;—মোহমর পলিল প্রবণে!
কম্পমান পল্লবের প্রান্তরক্ষেপে দেখিলাম চেয়ে
অ'দুট ছায়ায় মত নেমে গেল জামলী সে ঘোরে,—
মিশে গেল নীল জলে; প্রোতাবেশ উঠিল উজ্জলি—
'আপনারে ভালোবাসি—নবী আমি।'—কহিল জামলী।

মতী

শ্রীসীতা দেবী

সমস্ত বাড়ীটা কেমন বেন তন্ত্রিত হইয়া আছে। বেন ঞ্জল-বড়ের আগের আকাশ, বেন অন্নুংপাতের পূর্বের আঘে পিরি। মাছুষ কষটী পা টিপিয়া টিপিয়া ঠাঁটতেছে, কথা পায়তগক্ষে কেহই বলিতেছে না। এমন কি ছেলে-মেয়ে তিনটাও সোদমালা করিতে বা কামিতে ভরসা পাইতেছে না। পাড়ার মাছুষ হুই চারি জন সারাক্ষণই রহিয়াছে, কেহ চাকারের বাড়ী বাইতেছে, কেহ পাশের বাড়ী গিয়া টেলিকোন্ করিতেছে, কেহ বা বোকদ্যামানা ছোট খুকীকে সন্দেহাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।

বাইবার মত অবস্থা বা উৎসাহ কাহারো নাই, তু গৃহস্থের বাড়ী ঠাঁড়ি না-চড়া অদক্ষ, বাসুন ঠাকুরপ অতি বিবস্ত্রভাবে নিজের কাজ করিয়া বাইতেছে। সে এ বাড়ীতে আছে মশ বংসর, পরিবারের একজনেরই মত, ইহাদের বিশদ-আপন বেন তাহার নিজের বিপদের মতই বোধ করে।

বহুর বারের একটি মেয়ে অতি রান মুখে রান্না-ঘরের দরজায় আসিয়া ঠাঁড়াইল। বাসুন ঠাকুরপ জিজ্ঞাসা করিল, “কি গো, বেলা দিদি? ডাক্তারবাবু এলেন?”

বেলা বলিল, “না, তাঁর এখনও আসতে বন্টী-খানেক সেবি হবে। ‘কলে’ বেরিয়ে গেছেন, তাঁকে বাড়ীতে মোটে পাঞ্জাই বেগ না। দুখ জাল হয়েছ?”

“হয়েছে”, বলিয়া নিজলের কড়া হইতে বন্ধুকে একটা কীসার বাটতে বানিকটা দুখ সে চালিয়া দিল। বেলা আঁচলের খুঁটটা হাতের উপর পাতিয়া তাহার উপর বাটি বসাইয়া দুখ দইয়া চলিয়া গেল। বাসুন ঠাকুরপ, মাছের কড়াটা আবার উল্লনের উপর চাপাইয়া দিয়া আপন মনেই বেন বলিল, “কি গতি হবে, না ছুঁপাই জানেন। ‘আহা’ কচি-কাজ নিরে বর করছিল, তাও পোড়া দেবতার সইল না।”

বাড়ীতে মাছুষ নিতান্ত কম নয়। বৃদ্ধা বা আছেন, বিববা দিদিও শক্তরবাড়ীর উৎপাত বেশী সহ করিতে পারেন না, নাবাগল পুত্রটিকে লইয়া তাইয়ের লসারেই বহুরের দমটা মাল কাটাইয়া বেন। তাহার পর ভবতোষ নিজে, পত্নী কল্যাণী, ছেলে-মেয়ে তিনটি; আরও একটর আগমনের সস্তাবনা জানা গিয়াছে। বড় মেয়ে বেলা, বহুর বারো বয়স, তাহার পর একটি সন্তান মারা গিয়াছে, থোকা কল্যাণের বয়স আট বংসর হইবে, তাহার পরও শোকের ব্যবধান, ছোট খুকি রত্নমালা তিন বংসরের।

দুখে দুখে দিন একবকম কাটিয়া বাইতেছিল। ভবতোষ চাকুরি মশ করে না—সওয়া দুশ্র। টাকা মারিনা। আমকালকার বাম্বারে কতটা মাছুষ আনিতে পারে? তাহার উপর বাড়ীখানা তাহার নিজের। ছোট হইলে কি হয়, মাথা গুঁঁজিয়া থাক্য ত’ চলিতেছে? একমাস ভাড়া শুনিতে না পারিলেই পথে গিয়া ঠাঁড়াইতে হইবে না।

দিন মশ বারো আগে হঠাৎ আকিল হইতে ফিরিয়া ভবতোষ কিছু বাইতে চাহিল না। কল্যাণীকে বলিল, “বেশ কড়া ক’রে এক পেয়ালা চা ক’রে দাও ত’; আর কিছু খাব না।”

কল্যাণী উত্তির হইয়া বলিল, “কেন পা, কি হ’ল? কিছু খাবে না কেন?”

ভবতোষ বলিল, “গা-টা কেমন বেন গুলচ্ছে, এখন অন্ন-মারি না হ’লেই বাঁচি। এই সেল-মালে খোকার অল্পখে তিন দিন কামাই করতে হ’ল। রোম রোম এমন হ’লে মাত্রেবই বা মনে ক’বে কি?”

কল্যাণী চা করিয়া আনিল। কিন্তু চা ভবতোষের সহ হইল না। খাওয়া মাত্ৰ সমতটা বমি করিয়া সে গুইয়া পড়িল। সত্তরা কল্যাণী গারে হাত দিয়া সেখিল, পা একেবারে পুড়িয়া বাইতেছে।

সেই মর এখন অবধি সমানে চলিয়াছে; বরষা বাড়িয়াছে বই কয়ে নাই। ডাক্তার দেখিতেছেন, তিনি নিজেই পরক্ষ করিয়া একজন বড় ডাক্তার গুচ্ছ আনিয়া দেখাইয়াছেন, সকলেরই এক অভিমত—টাইফয়েড। চৌদ্দ দিনের দিন মর ত' ছাড়িল না, একশ দিনের দিন যদি ছাড়ত। সেই আশার সকলে পথ চাহিয়াছিল; ইতিমধ্যে কাল হইতে রোগের আর-এক উপসর্গ ছুটিয়াছে। ডাক্তার বলিতেছেন, নিউমোনিয়াতে পাকানও বিচ্ছিন্ন নয়।

যা ত' আহার-নিশ্রা ত্যাগ করিয়া মাটিতে পড়িয়া আছেন। তিনি সকল কাজের বাহির, তাঁহার কাছে কেহ কিছু কাৰ্য অবশ্য প্রত্যাশাও করিতেছে না। সবাই আড়ালে বলাবলি করিতেছে, “বুড়ী কি কপাল গা! এই দেখবার জন্যে এককাল বসেছিল? বুড়ো মাল্লার রোগ হ'লে সার্বভূতে বেই, সেবার পুরীতে অমন কঠিন রোগ হ'ল, সেসেই পাড়? ত' না এখন কাণ্ড দেখ! বম্বুত কখনও এমনি ফিরবে না, কাউকে না কাউকে নিয়েই যাবে।”

দিনি সন্সার দেখিতেছেন, ছেসেয়েয়েদের খানিক খানিক সাক্ষাৎকেন, আবার প্রতিবিশিনীসের মুখে ছুটিয়া হা-হঠাৎ করিতেছেন। কল্যাণীকে ডাক্তার অস্ত্রসম্মা অবস্থার রোগীর ঘরে খাওয়া-খালা করিতে বারণ করিয়াছিল, সে কথা শোনে নাই। বানীর সেবা সে দিনরাত্ত অবিশ্রান্ত করিতেছে, ছোট মেয়েটাকে ননদের হাতে সঁপিয়া দিয়াছে, পাছে হোঁচট লাগে বলিয়া তাহাকে আর স্পর্শও করে না। দানাদারের মত কেহ এখন তাহাকে রোগীর ঘর হইতে বাহিরে টানিয়া আনে, তখন নাগড়া-খাওয়ার বদলে সে ঠাকুর-ঘরে গিয়া মাথা কোটে। কপালের যা চেহারা হইয়াছে, মাল্লখটীর মুখের দিকে আর চাওয়া যায় না।

আজ সকাল হইতেই ভবভোষের অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছে। পাক্তার লোক আসি ছুটিয়াছে, বাড়ীতে পুঙ্খ অভিজ্ঞাবক হইয়া

মত কেহই নাই, তাই টেলিগ্রাম করিয়া কল্যাণীর বুদ্ধবুদ্ধতা ভাইকে আনান হইয়াছে। বিপদের উপর বিপদ, যে ডাক্তারবাবু এতদিন দেখিতেছিলেন, তাঁহাকে সকাল হইতে পাওয়াই বাইতেছে না, আর এক কোন্ মরণাণর রোগীর বাড়ী গিয়া বলিয়া আছেন। অথচ এমন সময় হুট করিয়া ডাক্তার বসল করাও চলে না। টেলিফোন করিয়া, লোক পাঠাইয়া বিশেষ কোনই ফল হইতেছে না।

ভবভোষের কাছে এখন দিদি বলিয়া আছেন। খুকিকে কখনও বেলা আশ্বেইতেছে, কখনও পাশের বাড়ীর একটি বউ আসিয়া কোলে করিয়া লইয়া বাইতেছে। কল্যাণী ঠাকুর-ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া কি যে করিতেছে, তাহা সেই জানে। ছেসেয়েয়েদের খাওয়া একরকম করিয়া হইয়া গিয়াছে, বড়রা কেহই খায় নাই। বাসুন ঠাকুর বেলা ছুইটা অবধি টেবিলে আশ্বেইয়া বসিয়া ছিল, তাহার পর সেও ছাড়ি তুলিয়া দিয়া, দুইটা মুখে গুঁজিয়া আঁচল পাতিয়া রান্নাঘরে গিয়া পড়িয়াছে।

এমন সময় সময় দরজার কাছে ডাক্তারের দাড়ী খানিবার লক্ষ শোনা গেল। কল্যাণী আর খুকি বাসে সবাই প্রায় সোঁড়িয়া রোগীর ঘরের দরজা হাজির হইল। ডাক্তার ভবভোষের অবস্থার কথা জানিয়াই আসিয়াছিলেন, কোনদিকে না তাকাইয়া গুঁট গুঁট করিয়া সোঁখা ভবভোষের ঘরে ঢুকিয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করা, রোগীর মবস্থার বর্ণনা শোনা, ঘরের ‘জট’ দেখা চক্ষিতে লাগিল। তাহার পর ডাক্তার তেমনি গভীর মুখে বাহির হইয়া আসিলেন।

ভবভোষের না একবারে তাঁহার সামনে আসিয়া আহাড় খাইয়া পড়িলেন, “ও বাবা, একটা কিছু তরঙ্গা দিয়ে যাও। কেমন দেখলে আমার বাহাকে?”

ডাক্তার খুকিয়া ঠাণ্ডাইয়া গেলেন। তাহার পর

বলিলেন, “বেশ, এটা মাহুকের ত’ গাভ নর, মধাসাদা চোঁটা মার আমরা করতে পারি। তা’ আপনারা এখনই এত ব্যস্ত কেন হচ্ছেন? এর চেয়ে কত ব্যাপার ‘কেস্’ ভাল হয়েছে। ভগবানের ইচ্ছা হ’লে কি না হ’তে পারে?”

‘কিন্তু’ আকুল হইয়া কানিতে হাসিলেন। তাঁহার কণ্ঠা একরকম জোর করিয়াই তাঁহাকে সরাইয়া লইয়া গেল। বেলা বেচারীও কানিতে কানিতে ঠাকুরমার পিছন পিছন চলিয়া গেল।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে কল্যাণীর তাই সরোজ জিজ্ঞাসা করিল, “কি রকম হচ্ছেন? ‘কেস্’ কি খুব ‘সিরিয়াস্’?”

ডাক্তার বলিলেন, “সিরিয়াস্ বৈ কি? টাইফয়েডের উপর নিউমোনিয়া গাঁড়ান, সামাজিক ব্যাপার।”

সরোজের মুখ শুকাইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, “একবারে সাধারণ chance নেই?”

ডাক্তার জোর করিয়া হাসিয়া বলিলেন, “এই বেশ, অত ভয় পেলে চলে কখনও? Chance থাকবে না কেন? তবে আপনারা ইচ্ছা করেন ত’ আবার কাউকে consultationএর জন্তে ডাকা যেতে পারে।”

তাঁহারা বেথানে গাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিলেন সেটা দোডলা ও একজন্মার ঠিক মাঝামাঝি স্থান। এইখানে একটি ছোট নীচ ঘর, বাড়ীর পোকে বলে সেড়জলা। ইহাই ঠাকুরঘর।

ডাক্তারের কথা শেষ হইতে না হইতে ঠাকুর-ঘরের দরজাটা খুলিয়া গেল। দেখা গেল, কল্যাণী দেখানে গাঁড়াইয়া আছে। পরগে মরলা লাগলেডে শাড়ী, চুল কক, অবিজ্ঞত, চোখ দুইটা বন্ধ-মবার মত লাগ, তাহা হইতে ন্ ন্ করিয়া জল করিতেছে। কপালটা ছুঁগিয়া উঠিয়াছে, বক্ত মনিয়া আধখান। কপাল ছুঁকিয়া কালদিয়া।

ডাক্তার তাহার দিকে চাহিয়া শিরিষিয়া উঠিলেন। কল্যাণীকে লম্বাখন করিয়া বলিলেন, “আপনি এ

কচ্ছেন কি? বেশ কি একটা প্রাণীওতা। কখন, না নিজে মারা যাবেন? ছেলেকেমেরের কথা একবার ভাবুন। সমস্তে থাকতে গেলে শোক-চুব ত’ আছেই, তাই ব’লে একবারে চাল ছেড়ে দিতে হবে?”

কল্যাণী তাঃ। মলার বলিল, “ঠাকুর মরা ক’রে তাঁকে রাখেন ত’ লবাই থাকুন, নরত ভিন জনেই ধাব।”

ডাক্তার সরোজকে বলিলেন, “আপনারা এঁকে neglect করবেন না। এঁর অবস্থাও খুব আশঙ্কা-জনক। আমি আপনাদের সাহায্য ক’রে দিতে যাবি, এই ভাবে চলুন ‘সিরিয়াস্’ ব্যাপার ঘটবে।”

সরোজ বলিল, “কি বে কণ্ডা মার, আমরা যেন বেড়া-মাগনের মতো পড়েছি। একে কে-ই বা দেখে, আর কে-ই বা বোকাব? উঠে ও দিন নেই, রাত নেই, রোগীর সেবা হচ্ছে।”

ডাক্তার পাড়ীতে উঠিতে উঠিতে বলিলেন, “আপনারা বরং নাম’ রেখে দিন, এই অবস্থায় ঠিক ও রকম ক’রে খাউতে দেওয়া criminal folly.”

ডাক্তারের পাড়ী চলিয়া গেল। সরোজ উপরে উঠিতে দিয়া দেখিল, কল্যাণী তখনও ঠাকুরঘরের জোকাঠের উপর চুল করিয়া বসিয়া আছে। সরোজ জিজ্ঞাসা করিল, “তুই খেয়েছিন্ কিছু?”

কল্যাণী বলিল, “সকালে দুখ খেয়েছিলাম।” সরোজ রাগ করিয়া বলিল, “কাজখান কি বল দেখি? একে ত’ এই বিপদ, তা’র উপর তুই একটা অমর্থ বাধাতে চালা? ছেলেকেমেরের কোথায় গাঁড়াবে?”

কল্যাণী পাগলের মত চীৎকার করিয়া কানিয়া উঠিল। বলিল, “ও দাদা, তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমরা আমাকে আর মালিও না। আমার বেঁচে কি হবে? শোড়। কপাল নিয়ে আমি বাঁচতে চাইনে। তার আগে এ কপাল আমি পাখর দিয়ে ছেঁচে ফেলব। ছেলেকেমেরকে যে পারে সে দেখবে।”

সরোজ উঠিয়া চলিয়া গেল। এই অর্ধ-উন্মাদিনীকে

কি সে লুকাইবে? আমি ভিন্ন ভগৎ-সংসার ইহার কাছে অর্থহীন। স্বামীকে হারাইবার আশঙ্কায় পৃথিবী ইহার কাছে বিভীষিকাময় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার বৃত্তি বিবেচনা, কাণ্ডজ্ঞান কিছুই আর অর্থশূন্য নাই। এমন কি সন্তান-স্নেহও এই মগত্বের কাছে পরাভব মানিয়াছে।

কল্যাণী নিজে বৈশেষে মাঠহীন, তবু মাঠহীন শিশুর হৃদয়গোচর কথা আম সে ভাবিতে পারিতেছে না। দারুণ আশঙ্কা তাহাকে গ্রাস করিতেছে, পায়ে তলার সমস্ত আগ্র তাহার হঠাৎ খসিয়া পাইবার উপক্রম করিয়াছে। অশিক্ষিতা, অস্বাস্থ্যবাসিনী, বাংলার মেয়ে সে। তাহার স্বভাব কোনো অধিক নাই, সে আর-এক জীবন-ভর পরসাদা মাত্র। সেই কক্ষমূলেই যদি আম নবনের কুঁটারাখ্যাত বাকিয়া উঠে, তবে কল্যাণী বাঁচিয়া থাকিবার সাহস কোথা হইতে সংগ্রহ করিবে?

সমস্ত দিনটা একই ভাবে কাটিয়া গেল। কল্যাণী আবার স্বামীর ঘরে আসিয়া বসিয়াছে। তাহার শাওড়ী দরজার কাছে ঝাঁচল পাতিয়া গুইয়া আছেন। সন্ধ্যা নাস' মানার কথা বলিতে দিয়াছিল; কল্যাণী, তাহার নন্দ এবং শাওড়ী একসঙ্গে কথার দিয়া উঠিলেন,—তাঁহার বাঁচিয়া থাকিতে কোনো ঈষ্টানীকে আসিয়া ভবভোগের সেবা করিতে হইবে না।

নীচের তলার বেলা রাত্রাঘরে বসিয়া চিড়ি। তিমান পাইতেছে। কল্যাণীর গুণে বাজে জিনিস পছন্দ না, সে নিজেই বোড়ের পোকান হইতে গিড়ের কচুরি কিনিয়া আনিয়াছে, দরজার আড়ালে লুকাইয়া তাহাই খাইতেছে। সন্ধানের প্রয়োজন এইজন্য যে, বেগিতে পাইলে সামান্য তবু যে বকিবে তাহা নয়, কচুরি কাড়িয়া গুইয়া কেলিয়া দিবে। ছোট পুতী সম্ভ্রুতি একলাই খুঁটিতেছে, পিঁপড়া। কাণ্ড কাটিতে চুকিয়াছেন, বেলাকে বসিয়া দিয়াছেন পুতীকে সেধিতে। বেলা খাইতে বাত, কখাটা বিশেষ কানে নেয় নাই। পুতী দাওয়া হইতে কয়েকটা মুক্তির দানা ফুটাইয়া পরম কৃষ্ণির সহিত আহার করিতেছে।

বামুন ঠাকুর উপরে দিয়াছিল বালির চল শৌছাইয়া দিতে। কল্যাণীকে ডাকিয়া বলিল, “অ বোমা, এখানে একটু তেল দাও, বাছা।”

কল্যাণী বাহির হইয়া আসিয়া দিল্লাস। কবিল, “কি?”

বামুন ঠাকুর বলিল, “কাঠী বলছিল কি যে, বলির মোড়ে খেঁচেরে বাড়ী ভরি একজন সাধু মহাত্মা এসেছেন; এপাড়-ওপাড়। খেঁচেরে সব তাঁর দর্শনে আসছে। আমি বলি তুমি একবার যাও না, মা? তাঁদের দয়া হ'লে কি না হ'তে পারে?”

কল্যাণী অস্বস্তি চূপ করিয়া কি ভাবিল, তাহার পর বলিল, “আম্বা, সন্ধ্যার সময় যাব।”

ডাক্তারবাবু সন্ধ্যার সময় আর একজন ডাক্তার লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তারবাবুকে বেগিলেই কল্যাণী পলায়ন করিত। তাঁহার উপদেশ-গুলি তাহার গারে বেন তপ্তবলের ছড়ার মত লাগিত। পুরুষের ভাত, কি করিয়া বৃত্তিবে কল্যাণীর কুক কি চিত্তার আগুন দগিভেছে? স্ত্রীর ডাক্তারের লাড়া পাইয়াই সে কলের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিল।

ডাক্তারেরা আধখটা থাকিয়া, ঔষধ-পথ্যাদির বানিক বানিক বদল করিয়া প্রস্থান করিলেন। কল্যাণী তখন বাহির হইল। গা ধুইয়াছে বটে, তবে লুলের অবস্থা আগেরই মত, একখানা ময়লা শাড়ী বলাইয়া আর একখানা পরিয়াছে।

কাঠী-জিকে ডাকিয়া বলিল, “তুই হারিকেনটা নিয়ে আমাকে একটু পেঁচেরে বাড়ী পৌঁছে দিবি চল।”

কাঠী হারিকেন আনিতে ভাঁড়ার-ঘরে গিয়া চুকিল। কল্যাণী বামুন ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিল, “মা কি ঠাকুরঝি যদি খেঁচেরে ব'লে দিও কোথা সেছি। দাদা এখন ওপরের ঘরে আছে, সেই সেধে।” কাঠী লঠন লইয়া আসিল, দুই মনে বলির পথে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু ভগতে আম কল্যাণীর মত কোথাও সাধনা নাই। প্রেমামল স্বামীর কাছেও সে কোনো আশ্রয়

পাইল না। শোকার্কে, দুঃখকে পথ দেখাইবার কাজই তাঁহার। গ্রহণ করিয়াছেন, বনের সঙ্গে লুক্করিতবার কোনো পরোয়ান। তাঁহার। লাভ করেন নাই। কল্যাণী অল্পক্ষণ পরেই কানিতে কানিতে ফিরিয়া আসিল। সরোজ তাহাকে বকিতে আসিয়াছিল, কাগা দেখিয়া ফিরিয়া চলিয়া গেল।

ভোর হইতে না হইতে কল্যাণী নীচে নানিয়া আসিয়াছে। রাত্রে দুই এক ঘন্টার বেশী সে ঘুমায় না, যদিও সরোজ এবং পাড়ার একটি ছেলে পালা করিয়া বেনীর ভাগ রাতি আগিয়া থাকে। বামুন ঠাকুরপা সব তখন রাগাধর কঁাট দিচ্ছে। কল্যাণীকে দেখিয়া মিথ্যালা করিল, “কি খোঁরা, এত সকালে নেমে এসে যে? দাদাবাবু কেমন?”

কল্যাণী বলিল, “ভেমনিই। আমি একবার কালীঘাটে বাব, বামুন-মা, আমার সঙ্গে যাবে কে?”

বামুন-মা বলিল, “তাই ত’ কে যায় এখন? সকাল-বেলাটা সবাই কাজে ব্যস্ত থাকে। তা’ তুমি না হয় শাহুর পিসীর সঙ্গে যাও, চল তাদের দরজা অবধি আমি পৌঁছে দিয়ে আসি।”

কল্যাণী ভেমনি মলিন হয়ে, মুখ-হাতে জল পর্য্যন্ত না দিয়া বামুন ঠাকুরপার সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

ধানিক বাসে রোশ্নির গোড়ানীতে সরোজের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে ধড়মড় করিয়া ক্যাম্প খাটের উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল, “বাসু! কলি সেল কোথায়? এই না আমাকে ধোর ক’রে ওইয়ে দিল, যে এর পর সে দেখবে, বাতাল করবে। ওষুটটাও খাওয়াগনি দেখছি। এসে সেবা করতে আসা যানে খালি নিষেদের বিষ্টিবির্য্যকে চরিতার্থ করা।” বিব্রলমুখে উঠিয়া-বসিয়া সে কল্যাণীর ঝটুঙা গারিতে প্রবৃত্ত হইল।

কল্যাণী যখন ফিরিল, তখন প্রায় বেলা দশটা। ভবভোষের অবস্থা ভাল ত’ কিছু নাই, বরং হরত বা আরও একটু খারাপ। কিন্তু কল্যাণীর মুখের জ্ঞান ফলাইয়া গিয়াছে। কোথায় কি যেন অবদমন

সে পাইয়াছে। এই মহাবিভীষিকার অন্ধকারে ভিতর কে তাহাকে পথ দেখাইয়া দিল?

স্বাধীর বরে আর সে বলিতে চায় না। পঞ্চাশ বার খালি ঠাকুরঘরে দিয়াই দরজা বন্ধ করে। মাটিতে উগুড় হইয়া পড়িয়া অশুটকণ্ঠে কি সব বলিতে থাকে, পাখানের সেবতা হরত বা শোনে, রাহুঘের কর্ণপাচর কিছুই হয় না। কল্যাণী রোশ্নির খর ছাড়াতে সরোজ বরং খুসিই হইয়াছে, সে কল্যাণীকে আর একবারও ডাকে নাই। পাড়ার দুই একটি ছেলে-ছোকরা আসিয়া ছুটিয়াছে, তাহাদের সাহায্যে সে কাজ চালাইয়া গইতেছে। কাজ ভালই চলিতেছে, কাগপ ইনোং কল্যাণীর অবস্থা হইয়া উঠিয়াছিল তন্ত্রাবিষ্টের মত, সে কি যে করিত, আর কি যে না করিত, তাহার টিকানা ছিল না।

সরোজ একবার বাহিরে দিয়া কল্যাণীর ঘোঁষ করিল, সে ঠাকুরঘরেই আছে। কল্যাণীর ননদকে সামনে বেশিয়া সরোজ বলিল, “কলিকে একটু খুমিয়ে মিচে বগুন না, এখন যখন এদিকে আলুছেই না, একটু বিপ্রান করুক।”

ভবভোষের দিনি বিরক্তভাবে বলিলেন, “হ্যাঁ, ঘুমবারই তার এখন সময় বটে! তার বা হচ্ছে সে-ই জানে। আর আমি ডাকলেই সে তত আসবে কিনা; সে ত’ এখন ঠাকুরঘরে।”

সরোজ চলিয়া আসিল। কল্যাণীরই বা যোব কি? বাংলাদেশের মেয়ের ধীবনের মূল্য অত কাহারও কাছে যখন নাই, তখন তাহার নিষেধ কাছেরই বা থাকিবে কেন?

কল্যাণী সেই যে দশটা ঠাকুরঘরে দরজা বন্ধ করিল, আর সে বাহির হইল না। এদিকে ভবভোষের অবস্থা ক্রমেই যন্মের দিকে গড়াইয়া চলিল। বিকালে ডাক্তার আসিয়া মুখ একেবারে গভীর করিয়া ফেলিলেন। ধানিককল এটা-ওটা নাড়া-চাড়া করিয়া বলিলেন, “আপনারা আর যদি কাউকে দেখাতে চান, দেখাতে পারেন। আত্মীয়-স্বজন কেউ যদি বিশেষে থাকেন ত’ wire ক’রে দিন।”

মা আর দিদি চাকার আসিলেই দরবার কাছে আসিয়া ঠাড়াইডেন, আমও ঠাড়াইয়া ছিলেন। দরবারটা ছাড়িয়া ইচ্ছা-হুই পাশে সরিয়া আসিয়া তাঁহারা এমন বুক-কাটা আত্মনাস করিয়া উঠিলেন যে, ঘোহাখিট রোণী পর্গাথ বাটের উপর নড়িয়া উঠিল। ডাক্তার এক সরোষ মিলিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহাদিগকে টানিয়া স্বস্তি ধরে লইয়া গেল। ডাক্তার বলিলেন, “আপনাদের একটু বৈশ্য ধরে থাক। উচিত। ঐ এমনও জ্ঞান হয়েছে, আপনাদের এরকম কান্নাকাটি শুনে মনে কষ্ট পাবেন যে?”

মা ও দিদি সমানে কান্দিতে লাগিলেন, নীচের থেকে বেলা এবং কল্যাণ উপরে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিল। সরোষ রোণীর ঘরে ছুটিয়া গিয়া দরবারটা ভাল করিয়া তেজাইয়া দিল। তাহার সহকারী ছেলেকে বিখ্যাত এক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসককে ডাকিবার জন্য টান্নি করিয়া পাঠাইয়া দিল।

কান্নাকাটির মধ্যে ঠাকুরঘরের দরজা খুলিয়া কল্যাণী বাহির হইয়া আসিল। একজন প্রতিবেশিনী বসিয়া মাঝে মাঝে দিবার কৃপা চোঁটা করিতেছিল, তাহাকে বিকৃতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “কি হ’ল মা? আমার কপাল পুড়েছে?”

প্রতিবেশিনী হাতে দ্বিধা কাটিয়া বলিল, “এমনই ওকি কথা, বেলা-মা? বড়ক্ষণ ঘাস, ততক্ষণ আশ। কত মানুষ মৃত্তে মৃত্তে টাল সামলে যায়।”

কল্যাণী ক্রতপদে স্বামীর ঘরের কাছে গিয়া ঠাড়াইল। দরজা তেজান, ঢেলিয়া খুলিয়া ফেলিল। সরোষ উঠিয়া আসিয়া বলিল, “হুই বা মেথি এখান থেকে। এখানে থেকে কোনো দরকার নেই। ছেলে মেয়েদের কাছে বা।”

কল্যাণী নীচে নামিয়া চলিল। ছেলেনেয়েরা কোথায়? বেলা ঠাকুরমার মাথার কাছে বসিয়া কান্দিতেছে, কল্যাণ গলিতে ঠাড়াইয়া আছে। ছোট খুকিটা বলভদ্রার বসিয়া মল-কাখা খাটিতেছে। কল্যাণী

চাহিয়া দেখিল মাত্র, তাহার পর ঠাকুরঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিল।

যাদুন্ ঠাকুরঘরের চীৎকারে বাড়ীর লোক, পাড়ার লোক একসঙ্গে আসিয়া ঠাকুরঘরের দরবারে জড় হইল। দরজা ভিতর হইতে বন্ধ, কিন্তু বিকট গোড়া গর্জে সিঁড়িতে পর্গাথ ঠাড়াইয়া যায় না।

ঠোমেচি হাঁকাহাঁকিতে কোনো দল হইল না, শেষে কুড়াল দিয়া দরজা ভাঙিয়া ফেলা হইল। সরোষ হুই হাতে খুব চাকিয়া পলায়ন করিল। পাড়া-প্রতিবেশী ছেলেনেয়েদের সরাইয়া লইল। বাক্যল্যাণীর ভয়ের অবলান হইল, তাহার শাখা সিঁধের মধ্য হইয়া রছিল।

তাহার পর কতক ঘণ্টার ইতিহাস উই থাকাই ভাল। কল্যাণীর পান-বাজার পুয়ের লোক ডানিয়া পড়িল। বাটের উপর আপাদ-মস্তক চাধর ঢাকা দিয়া কল্যাণী গইয়া আছে। দেখা হাইডেছে, আলতা-পর। ছোট হুইটা পা, আর চামরের উপর রাশি রাশি সিঁধর। কলি-মুগের ধন্য সত্য! যমের মুখে বেন লাখি যারিয়া নিম্নের এয়েতি বদায় রাখিয়া চলিয়া গেল। সরকার বাহাদুর সতীয়াই উঠাইয়া দিলে হইবে কি? বালায় মেয়ের মন হইতে ত’ ইয়া উঠে নাই? সেই সিঁধের এক কণার মত অশানবাটে বেন কাড়াকাড়ি বাখিয়া গেল। কল্যাণীর ধবর বাহিরের গোকে এই প্রথম বড় বেঁধ করিয়া গুলিল এবং এই শেষ।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভবভোগে বাঁচিয়াই রছিল! কল্যাণীর অশম্ভবতার পরদিন হইতেই তাহার অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল, এবং ক্রমে ক্রমে সে সারিয়াই উঠিল। কল্যাণীর দুখ্যাত প্রতিবেশিনী বহলে মক্কর হইয়া রছিল। ভবভোগের বাঁচিবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না, বাঁচিল কেবল কল্যাণীর আত্মপাইয়া। নিম্নের জীবন বিশদর্শন দিয়া, আর-একটা অশুভ জীবনকলিকাকে ধ্বংস করিয়া কল্যাণী যমের খোরাক হুটাইয়া গিয়া গিয়াছে—ভবভোগের আর দুক্ক-সেবতার প্রয়োজন নাই।

মাল খাট পরের কথা। ছোট পুঁকীটা নেকড়ে
তুইয়া আছে ছোঁড়া কাঁধের উপর। তাহার হাত-পা
কাটির মত, বুকের রং ছাইএর মত, পেটটা খালি মত
বড়। বড় ঘন দুর্গল, হাত-পা নাড়িবারও ক্ষমতা নাই।

ভবভোষ বিকালে অফিস হইতে কিরিয়া আসিল।
ঘর-দোর বিকৃত, বিপদায়, ঐহীন। ঠিক সময় চা
পাওয়া যায় না, মলখাবার পাওয়া যায় না, খরের ঐ
দেখিলে বেগাল-হুঁহুর কানিয়া যায়।

নিম্নের ছুটা-দান। পুঁকীয়া রাখিয়া, চাণের পুরাইয়া
ভবভোষ বাতাল খাইতে লাগিল। বাতালও সবই বেন
মরিয়াছে, কাহারও আর লাড়া-মল নাই। বাহুখটা
সারাদিন সে তাতিয়া-গুড়িয়া কিরিয়া আসিল, তাহাকে
এক বেলায় মল পৰ্য্যন্ত দিবার লোক নাই। একখানা
হাত-পাখাও কি রাখা যায় না? ডাকাডাকি ইকাইকির
পর বেলা আসিয়া হামির হইল। বলিল, “বামুন
ঠাকুরণ চা আনছে, চা ছিল না কিনা, কাজী বাছারে
গিরে আনল তব—”

ভবভোষ বিরক্ত হইয়া বলিল, “আরে যত্নটা
তুই পরে আনুলই হ’ত! চা নেই ত’ হু’দিন থেকে
ওনছি, আনান হয় নি কেন?”

বেলা উত্তর দিবার আগেই বৃদ্ধা মা খোঁড়াইতে
খোঁড়াইতে আসিয়া বলিলেন, “বুড়া মাহুত, মত কথা
কি মনে থাকে? তা’ রাস কহলে চলবে কেন? এক
ত’ তোমার মেয়ের মালার সারারাত ঘুম নেই
চোখে, ট্যা ট্যা মেয়েই আছে। এমন মেয়েও
আর কারো ঘরে নেই।”

খুবী দিকে ভবভোষের চোখ পড়িল, বলিল,
“ওটা আছে কেন?”

মা বলিলেন, “একই রকম। একটা লোকজন
না রাখলে আর ত’ চলে না, বাছ।। আমিই
বা কত রাত জাগি, আর গছই বা কত লাগে?
আর নাইতে নাইতে ত’ এগা দেল, সর্দি আর
ছাড়ে না। তোমার মেয়ের নোংরা কাচবার আর
বাঁটবার ক্ষমতা কি এ বুড়া ছাড়ে আছে?”

বেলা খুঁকার কাছে গিয়া কুঁকিয়া দেখিয়া
বলিল, “আবার জিহ্মেছে।”

ঠাকুর-মা ছোট উন্টাইয়া বলিলেন, “কেতাপ
করেছেন। আমি সব কাপড় কেটে এসছি,
এখনই নরক প’ড়তে বসতে পারব না।”—বলিয়া
খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে নিম্নের ঘরে চলিয়া
গেলেন।

ভবভোষ রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিল।
সারাদিন খাটিয়া সে এই কুঁড়ের পালের অন্ন
ছুটাইবে, আর তাহার। তাহাকে বাধিত করিবেন
গিলিয়া? বেলাকে জিজ্ঞাসা করিল, “কতক্ষণ ও
জিহ্ম প’ড়ে আছে তনি? তোরা পিসীও কি ওকে
একটু দেখতে পারে না?”

বেলা বলিল, “পিসী ত’ ঘপে বসেছে, এক
যত্ন আর উপে নাই।”

ভবভোষ নিম্নেই পুঁকীর কাঁপা বদলাইতে
মগ্ন হইল। বেলাকে বলিল, “এক এই মাহুত
মেয়ে, তাকে মেঝেতে ফেল রেখেছে কেন?
তক্তপোষে ওর জায়গা হয় না?”

বেলা বলিল, “পিসী বলে, যোম কি তক্তপোষ
ধোব নাকি? তার চেয়ে মাটিতেই থাক্।”

ভবভোষ বলিল, “তা বেশ, একেবারে সাতার
ফেলে দিলেই হয়, আর পরিষ্কার করার হাঙ্গাম
থাকে না। সে একখানা গুমনো কাঁথা; আর
আমার পারে দেবার কলসটা নিয়ে আর।”

বেলা বলিল, “কাঁথাগুলো অবলায় কাটা হয়েছে,
এখনও গুকার নি।”

ভবভোষ এক লাফে উঠিয়া গিয়া নিম্নের একটা
পাতিপুতুর হুতি টানিয়া আনি। পাতে দিবার
কলসটা তুই ভাঁক করিয়া পাতিয়া, তাহার উপর
হুতি পাট করিয়া পাতিয়া খুবীকে শোয়াইল, বলিল,
“এটাও বাবে, বা মবর হচ্ছে।”

ভবভোষের বিদি সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে
বলিলেন, “একটা মাহুত আর ক’দিক্ সামলাব ওনি?

ভদ্রা ওকি, ভাল কথলখানা দিলি কেন? এখনি হুপুপাত হবে।”

ভবভোষ বলিল, “তা হোক, বা’ ক’রে প’ড়ে আছে, এ আর চোখে দেখা যায় না।”

দ্বিদি বলিলেন, “বা’ খুনি কর, বাপু। একটা লোক-টোক দেখ। আমিও ত’ আর চিরকাল তোমার সঙ্গের আসলে ব’সে থাকব না, আমার নিজের ঘর-সঙ্গার আছে ত’?”

অজ্ঞাত কঠিন উত্তর একটা ভবভোষের মুখে আসিল; সেটা কোনোরকমে চাপিয়া সে বলিল, “তাই দেখা যাবে। বেলা বোন্ ত’ খুঁকীর কাছে, আমি চা-টা খেয়ে আসি।”

দিন কতক কাটিল। খুঁকী ঘেন মায়ের অভাব সহিতে পারে না। মায়ের কাছেই সে বাইতে চায়। তাহার নথর কচি সেহের সব লাভা করিয়া দিয়াছে, তাহাকে এখন চক্কে কাঠের গুল্লের মত দেখায়।

ভবভোষ একদিন রবিবার সারাটা রুপূর কোথায় কাটাইয়া আসিল। যা মিডাসা করিলেন, “কোথায় ছিলি সারাটা দিন? ছেলটা প’ড়ে গিয়ে মাথা ফাট্টিরে এক কাণ্ডই করল! আমি তুচ্ছা মানুষ এত ভাল মান্দ্যাতে পারি?”

ভবভোষ বলিল, “ভাল মান্দ্যাবার লোকের ব্যবস্থাই করতে গিয়েছিলাম। থোকা কোথায়?”

মা বলিলেন, “সহর ঘরে গুয়ে আছে। কি লোকের ব্যবস্থা করলি?”

ভবভোষ বলিল, “লোক আর কি? তোমায় আর একটা বৌ এনে দেবো, শিখিয়ে পড়িয়ে চালিয়ে নিও, বাপু। বা’ মবরা হয়েছে সঙ্গারের, এ আর চোখে দেখা যায় না”—বলিয়া সে নীচে চলিয়া গেল।

আবার বৌ আসিল। পাড়া-প্রতিবেশী ভীড় করিয়া বৌ দেখিতে পাড়াইল। কল্যাণীর সোহা-গাছি নুতন বোয়ের হাতে পরান ছিল। এক প্রোড়া প্রতিবেশিনী বলিলেন, “এ সোহার মান রেখ, নতুন বোনা। সতী-সাবিত্রীর সোহা এ। নিজের গ্রাম দিয়ে ঘরের মুখ থেকে স্বামীকে ছিনিয়ে এনেছে।”

আর সকলে সম্বরে বলিল, “মাহা সতী-সতী ছিল গো! এমনটা এ পাণ কলিকালে দেখা যায় না।” সোমটার ভিতর নুতন বধূ মুখ ত্রুটি-হুটি হইয়া উঠিল।

ঠাকুর-মা নাতি-নাতিবীরের কাছে বৌকে লইয়া দিয়া বলিলেন, “ওরে, তোদের নতুন মা দেখ; ভাব ক’রে নে।”

কিছু ছোট খুঁকী ভাব করিল না। কয়েক দিন বাবে সে রোগজীর্ণ স্বরণ-কাতর কুপ সেহ ফেলিয়া দিয়া নিজের মায়ের কাছে চলিয়া গেল।

“মূল আপনার জন্ত ফুটে না। পরের জন্ত তোমার হৃদয়-কুম্ভকে প্রফুটিত করিও।”

—বঙ্কিমচন্দ্র



দেশীয়া সিনেমার ভবিষ্যৎ

শ্রীবিলাস

দেশীয়া সিনেমা-বিশ্বের শৈশব অবস্থা এখনও পার হয়নি, তবে হস্তিকাগার থেকে বাঁচা হয়েছে। কিন্তু এই অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য সিনেমাগুলি এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, সেখানে আলোচনা করা চলে। একথা সত্য যে, এগুলি জনসাধারণের প্রীতি অর্জন করেছে। কেবল এই প্রীতির কতখানি স্ব স্ব কৃতিত্বের জোরে অর্জন করা, আর কতখানি জনসাধারণের কাছে থেকে স্বঃই উৎসাহিত হ'লে এসেছে তাই নিয়ে সন্দেহ করা চলে।

প্রথম রোল্ট ছবি যখন দেখি তখন সূর্য ও হুঁতে পারিনি, তার মধ্যে কোন আশার আলোও দেখতে পাইনি। তখন শুধু এই দেখে বিম্বিত হয়েছিলাম যে, এমন অশক্ত ছবি দেখবার ভক্তও পক্ষের ভাঁড়ের আর শেষ নেই। তার পরে ক্রমে ক্রমে আরও অনেকগুলি ছবি বেরল। তাতে কিছু উন্নতির আভাস দেখা গেলেও সে এমন বিশেষ কিছু নয়। তবু যতবারই দেখি, দেখছি দর্শকের ভীড় ক্রমে বেড়েই যাচ্ছে। সুতরাং ছবি যেমনই হোক ছবি থাৱা তুলসেহন

উৎসব লাভের মত বেড়ে যেতে লাগল। দেখা গেল সিনেমা-শির লাভজনক তখন ধর্মিকদের দৃষ্টি এতিকে পড়ল, এবং একটর পর একটি ক'রে সিনেমা-গৃহের সংখ্যা বাড়াতে লাগল। কিন্তু গতিকে সিনেমা-গৃহের সংখ্যা বেড়েছে একটা হিসাব মিলেই বোঝা যায় — ১৯২১ সালে সিনেমা-গৃহের সংখ্যা ছিল ১৯২২-এ ৩৭১ ১৯২৩-এ ১৮৮ ১৯২৪-এ ১৮৬ ১৯২৫-এ ১৮৬

আর ১৯২৬-এ প্রায় ৪০০। যে সংখ্যা দিলাম তা' সমস্ত ভারতবর্ষ ও সম্মিলিত মিলিয়ে। এবং এর পরে আরও বেড়েছে।

এই জনপ্রীতির কারণ কি? প্রথম প্রথম যে-সব ছবি তোলা হয়েছে সেগুলোর কথা ছেড়েই নিলাম। এখন যে-সমস্ত ছবি দেখান হচ্ছে, বিদেশী ছবির তুলনায় সেগুলোও কিছুই নয়। আমাদের দেশে বিদেশী ছবি কম দেখান হয় না, এবং ভাল ভাল ছবিই দেখান হয়। এগুলো দেখলে দেশী ছবির সামনে বাঁসে

খাকাও কষ্টকর মনে হয়। তবু দেশী ছবির দর বে তীড় হচ্ছে, তেমন তীড় বিদেশী এখন দেশীর ছবি দেখতেও হচ্ছে না। এক-একটা দেশী ছবি একাদিক্রমে হুতদিন দেখান হয় কোন বিদেশী ছবিই ততদিন দেখান সম্ভব হয় না। কতকগুলি সিনেমা-গৃহে নিম্নক দেশী ছবি দেখান হয়। যখন দেশী ছবি পাওয়া যায় না, যাত্রা তখনই তারা বিদেশী ছবি দেখাতে বাধ্য হয়। ১৯২৭-২৮ সালে সিনেমাটোগ্রাফ কমিটির রিপোর্টে আছে—

"There are some cinemas which show Indian films almost exclusively, and only resort to Western films when they cannot obtain Indian. The fact is that the supply of Indian films is not equal to the demand."

এবং "Exhibitors cannot always obtain Indian films, as the demand is greater than the supply. In particular, there is some difficulty in obtaining the better products, which command relatively high prices as compared with the ordinary Western film."

এর থেকে এই কথাই বোকা যায় যে, দেশী ছবির তুল্য বে চাহিদা আছে তাই নয়, যে পরিমাণ চাহিদা সে পরিমাণ তৈরী হয় না। এবং "As regards the relative popularity of Indian and Western films, there is no doubt that the great majority of the Indian audience prefer Indian films. Generally, an Indian film draws much larger audience than a Western film."—Report of The Indian Cinematograph Committee, 1927-28.

যদিও দেশী ফিল্মকোম্পানীর কল্যাণে বেকার-সমস্যা সমাধানের একটা পথ মনে হচ্ছে, এই শিল্পের বিভিন্ন বিভাগে দেশের হাজার হাজার লোক অঙ্গ-সংস্থানের উপায় খুঁজে পেয়েছে, এক দেশের অর্থ দেশেই থাকছে, তবু এই জনপ্রীতির ফলে যে একমাত্র দেশাধিবোধ তাও সত্য নয়; বিদেশী শিল্পের সঙ্গে দেশী শিল্পের প্রতিযোগিতায় সাধারণতঃ

অনসাধারণের বেশপ্রীতিই কাজ করে। এবং দেশী ছবির লক্ষ্যসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাধারণের দেশাধিবোধ জাগ্রত করার প্রয়োজনও হয়নি। তীড় এমনি ছুটেছে। দেশীর গুরুত্বা দেশীর ভাষার সহজেই লোকের ভাল লাগে।

এর কারণ এই যে, আমাদের দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা এমনিতেই অতি সামান্য। ইংরেজী-জানা লোকের সংখ্যা আরও কম, এবং ইংরেজীতে সবাক্ ছবি বোঝবার লোকের সংখ্যা তার চেয়েও কম। সুতরাং ছবি দেখার আনন্দ পেতে হ'লে দেশী ছবি-প্রদর্শনীতে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ, ইংরেজী জানা থাকে না, অথবা ইংরেজী জানলেও সবাক্ ছবির কথা বুঝতে যাবার কষ্ট হয় তারা সর্বোচ্চষ্ট বিদেশী ছবির চেয়ে বেকোন দেশী ছবি দেখে আনন্দ পাবে বেশী। দেশী সবাক্ ছবির একটা মত বড় সুবিধা এই যে, সম্পূর্ণ নিরক্ষর লোকের পক্ষেও তা বুঝতে কোন কষ্ট হয় না। এর একটি সুবিধা এই যে, তবু অনসাধারণের দেশাধিবোধের উপর নির্ভর ক'রে কোন ব্যবসা দীর্ঘ দিন চলে না। 'দেশী শিল্পের উন্নতির ক্ষেত্রে মাস্তুল কিছুদিন ডায়ালীকার করতে পারে। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। মাস্তুল বেশদিন ক্ষতি বীকার করতে পারে না, এবং ভাঙপ্রবণতাও কখন চিরস্থায়ী হয় না। সেই-ক্ষেত্রে যে-সময় শিল্প তবু মাস্তুলের ব্যবসায়িকতাকে অবলম্বন ক'রে ধাঁড়ায়, ভাঙপ্রবণতা ক'রে এলে বিদেশী প্রতিযোগিতার সংঘাতে সেগুলি হুমিলা হ'তে যেতী হয় না। কিন্তু-শিল্পের সেই ভয় নেই।

সেদিকে ভয় নেই বটে, কিন্তু অভাবকে রয়েছে। পুকেই সেগিরেছি, দেশী ছবিবরের সংখ্যা বেশ ক্ষতিগ্রস্তই বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু অভাবের তুলনায় সে বৃদ্ধি কিছুই নয়। মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রে প্রতি ৫৭৬০ লোকের মধ্যে একটি ক'রে ছবিবর আছে। গ্রেট ব্রিটেনেও প্রতি ১২৫০০ জন লোকের মধ্যে একটি ক'রে ছবিবর আছে। আর ভারতবর্ষে আছে

প্রতি মণলক্ষ লোকের দৃষ্টি একটি। হুতরাং এখনও অনেক ছবিঘরই এদেশে বাড়বে। এবং নিকোলের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হবে। দেশী ছবির প্রযোজক-গণকে এখন থেকেই দেখতে সতর্ক হ'তে হবে।

এখন পর্য্যন্ত যে সমস্ত দেশী ছবি দেখান হয়েছে তার মধ্যে অবিকারেরই উপাখ্যান পৌরাণিক ঘটনা থেকে নেওয়া। আর কতকগুলি, প্রথিত-যথা: সাহিত্যিকের সর্বজনপরিচিত উপস্থাপন অরণমন ক'রে। আধুনিক কালের রস-রচনা ছবিতে পূর্ব কমই স্থান পেয়েছে। এই ব্যাপারে প্রযোজকদের অস্বপ্নটির আমরা প্রয়াস করি। আমাদের দেশের ফোটাগ্রাফি এখনও অপরিশুদ্ধ। বিদেশী অভিনেতৃ-গণের অর্ধেক দক্ষতাও এখানে হ্রাস। সেই কথা উপলব্ধি ক'রে তাঁরা সহ্য পথে প। বাড়িয়েছেন। পৌরাণিক ঘটনার প্রতি আমাদের সহ্যাত প্রভা আছে। অভিনয় বৃত্ত করখাই হ'ক, ছবি বৃত্তই বিশিষ্ট উঠুক, পৌরাণিক ছবি আমরা দিনের পর দিন সম্রাভ ভাবে দেখে যেতে পারি—একদিনও স্নানি আসবে না। এই অভাব আমরা দৃষ্টির থেকে অর্জন করেছি। দেশীয় ফিল্ম-ব্যবসায়ীগণ সাধারণের এই ধর্ম্মনিষ্ঠাকে মূলধন ক'রে ব্যবসা চালাচ্ছেন। ফোটাগ্রাফির ক্রটি তাঁরা গান দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা ক'রেছেন। বিদেশী ছবির বৃত্ত শুধই থাক বিদেশী গান দেশী গানের মত মিটি নয়, মানে আমাদের কাছে নয়। হুতরাং এইমিক দিয়ে দেশী কোম্পানীর ছবিখা আছে। এই মত প্রথম ধারা উপলব্ধি কবলেন তাঁদের ছবি হৈ-হৈ ক'রে লোক টাকুত লাগল। কিন্তু তাঁদের দেখামেধি আরও ধারা সবাক চিরে গান ছুড়ে নিলেন, বিপদ ঘটলেন তাঁরাই। গান ভাল মিনিয়, এবং ছবির সঙ্গে হু-চারটে গান মশও লাগে না। কিন্তু যদি রাজ্য থেকে আরম্ভ ক'রে রাজাল বাদক পর্য্যন্ত সকলেই ছবিতে সঙ্গীত-চর্চা আরম্ভ করে, অত্র সম্রাণ করা কঠিন হয়।

ফোটাগ্রাফির ক্রটি দেখে আমরা স্মর হই, কিন্তু

লক্ষিত হই না। আধুনিকতম ফোটা-পথ ব্যবহার সামর্থ্য দেশীয় ব্যবসায়ীদের যদি না থাকে তা সে অর্ধের অভাবে। বহুতঃপক্ষে ওদেশে একখানি ছবি তুলতে যে অর্পব্যয় করা হয় এদেশে তা কোনদিন ব্যয় করা সম্ভব হবে ব'লে কল্পনাও কর্তে পারি না। এই দারিদ্র্য আমাদের পক্ষে কোন্ডের বিবত, লক্ষ্যার নয়। লক্ষিত হই তখনই, যখন প্রযোজকদের প্রযোজনা আমাদের কৃতি-বোধে আঘাত করে। অর্ধের অভাব আমাদের আছে। অদূর ভবিষ্যতে এই অভাব যে দূর কর্তে পারা যাবে, এমন সম্ভাবনাও আপাততঃ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। এসকল কথা জানার পর কেউই বহুব্যয়-সাপেক্ষ দেশী ছবি দেখার প্রত্যাশা করি না। কিন্তু অর্ধের অভাব আছে ব'লে রূপবোধের দারিদ্র্য থাকবে কেন? তাই প্রযোজকদের রূপবোধের অভাব এবং কটির বৈত দেখে আমরা গম্ভিত হই। এখন পর্য্যন্ত ভাল ছবি তোলার চেয়ে সাধারণ দর্শকের মন ভোলাবার চেষ্টাই হচ্ছে বেশী। এবং এই ঠাকি যদি আরও কিছুকাল চলে তা হ'লে দেশীয় ফিল্ম-শিল্প যেমন তাকাতাড়ি উঠেছে অদূর ভবিষ্যতে তেমনি তাকাতাড়ি নিম্নে পড়বে, এ আশঙ্কা করা অমূলক হবে না।

শিল্পকের বৃদ্ধাবন-লীলা, বৈকুণ্ঠ কবিরের উপাখ্যান অথবা পৌরাণিক কাহিনীগুণি যে আমাদের মনকে ল্পর্শ করে তার কারণ, এই সমস্ত কাহিনীর মূলে আছে একটি অপরূপ রস-মাধুর্য্য। বিশেষ ক'রে প্রথমতঃ গুটি কাহিনীর মধ্যে এমন একটি মাধুর্য্য আছে বা গুটি-কবিতার মত স্থম্বর। তাই বহুবার শুনেও এগুলি কিছুতে যেন পুরোনো হ'তে চায় না—নব রে নব নিতুই নব, যখনই গুণি তখনই নব। দেশী ছবিতে এই মাধুর্য্যের চিহ্নমাাত্রও আমরা পেলাম না—না কথায়, না অভিনয়ে। শুধু কতকগুলি ঘটনার কতালক অভ্যাস বিশৃঙ্খল ভাবে একত্র করা হয়েছে। এর চেয়ে ডের নিম্নশ্রেণীর গুটি, বিদেশী প্রযোজকদের হাতে বহুতঃপক্ষে স্থম্বর হ'য়ে ছুটে ওঠে। এই রস-স্বপ্নের

জন্তে অর্থের প্রয়োজন নেই, এমন কথা বলি না। কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন কবি-মনের। আমাদের প্রবোধকদের অভাব ঘটেছে বোধ করি সেই কবি-মনের।

তুর্বে এই সব ছবি বেখার ভক্তে সর্পকের তীক্ষ্ণ হর কেন, সে প্রশ্নের উত্তর আসেই দিয়েছি। বিশেষী ছবি দৃষ্টে বাদের কষ্ট হয়, ছবি দেখতে গেলে তাদের পক্ষে সৌন্দর্য ছবি দেখা ছাড়া আর উপায় নেই। কিন্তু এইটাই তুমি একমাত্র কারণ নয়। এই সমস্ত ছবি দেখতে গিয়ে প্রত্যক্ষ করেছি মাঝে মাঝে সর্পকদের চোখ অশ্রুতে ভাষাকান্ত হয়ে ওঠে। তার কারণ এই যে, ছবি সর্পকদের মনকে স্পর্শ করেছে, তার ভাবকে উদ্ভিল্ল করেছে। কিন্তু সে গুণ ছবির নয়। আখ্যান-বস্তুর এমন একটি নিম্নত্ব রস আছে, যা বহুদিন আসে থেকেই আমাদের অন্তরে মতো মাথুর্বা বিস্তার করেছে। আমাদের চোখ যা দেখে, মন তার চেয়ে অনেক বেশী দেখে। আমাদের কল্পনা ছুটে চলে স্বপ্ন-লোকে।

এতে কিম্বদন্তীবাদীদের আপাততঃ কাজ চলতে পারে বটে, কিন্তু বেশীদিন চলবে না। কিম্বদন্তির তুমি একটা ব্যবসা নয়, এতে আভিত্তি রস-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এই রস-বোধের অভাব ঘটেছে সর্বত্র—প্রবোধকদের মধ্যেও বটে, অভিনেতাদের মধ্যেও বটে। সকলের কথা বলছি না; আমাদের সেনের অধিকাংশ অভিনেতাই চোচান খুব, লাকান আরও বেশী, এবং অধ-প্রত্যক্ষ সকলদনেও ক্রটি করেন না। সবই করেন, কেবল অভিনয় করতে পারেন না। চোখের চাওয়ায়, সুখের ভবিষ্যৎ কি করে বিনাবাক্য-ব্যয়ে কথা বলা যেতে পারে, সে কোবল এখনও তাঁরা অতিক্রম করতে পারেন নি। এঁদের দিগে বেশীর দিকের কতখানি উন্নতি হ'তে পারে সে-বিষয়ে আজ অনেকের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

সৌন্দর্য কিম্বদন্তির এই হ'ল সম্ভাব্য অবস্থা। এর চাহিদা আছে যথেষ্ট। বহু ছবি বহুস্তর তোলা হয়

তার চেয়ে আরও অনেক বেশী ছবি তুললে তবে এই চাহিদা মেটে। ব্যবসা হিসাবে এর চেয়ে বড় আশার কথা আর কিছুই হ'তে পারে না। বিশেষী ছবির সঙ্গেও এর কোন প্রতিযোগিতা নেই,—এমন নিরত্ব এখন এর গতি। কিম্বদন্তির যদি বহু-শির কিংবা অল্প কোন শিরের মত তুমি একটা ব্যবসা হ'ত, যদি অত্যন্ত ব্যবসার মত Demand and Supply এবং Competition নীতির গুণের এর ভাগ্য এবং তবিস্থতা নির্ভর করত তা হ'লে নিঃসন্দেহে বলা যেত, এই ব্যবসার মার নেই। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, এটা তুমি একটা ব্যবসা নয়। রস-স্বস্তির দিক দিয়ে এই শির আজ এতই শিথিলে পড়ে রয়েছে যে, আশা করবার হুমুই হুও পাওয়া কঠিন বোধ হচ্ছে।

বেকার-বান্ধব

বেকার-বান্ধব

পৃথিবীর প্রায় সকল সভা দেশেই আদিকাল বেকার-সমস্যা বিরাট আকারে দেখা দিচ্ছে। আমাদের দেশেও বেকার-সমস্যা বহুকাল হইতেই আছে; কিন্তু, অত্যন্ত বেশির সমস্যা ও আমাদের সমস্যার মধ্যে প্রভেদ এই যে, বহুকাল ধরিয়া সমস্যা চক্ষের সম্মুখে দেখিয়াও আমরা তাহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার ভাবধারণ চেষ্টা করি নাই। চাহুরি ছুটিবার আশার বি-এ, এম্-এ পাশ করিয়া সহস্র সহস্র খুবক বেকার বসিয়া থাক। সঙ্গেও এতকাল আমাদের চক্ষু মুটে নাই। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বহুকাল হইতে বাঙালী জাতিকে সাবধান করিয়া আসিতেছেন। বহুকাল হইতে তিনি আমাদের চাহুরির বোহ হইতে বাঁচাইবার জন্য নানাবিধ সংশ্রমার্গ দিয়াছেন, একান্ত সত্য বস্তু দিয়াছেন, পত্রিকার লিখিয়াছেন, এবিধে কত আলোচনা করিয়াছেন। এতকাল আমরা সে-সংস্কার তুলিয়াও তুলি নাই।

আম বেকার-সমতা। যে ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা দেখিবা আর হির থাক। চলে না। চাকুরির বাহার যত্নে খাৰাপ হইতে পারে এখন তাহাই হইয়াছে। ব্যবসায়ের অবস্থা খারাপ, কাজেই আফিসের চাকুরির অবস্থাও শোচনীয়। ব্যবসায়ের অবস্থা খারাপ হইলে সরকারী আয়েরও অবস্থা খারাপ হয়; কাজেই, সরকারী চাকুরির অবস্থাও খারাপ। চাকুরী-প্রিয় বান্দাশী দায় কোথায়? উকিলের বোজগার মন্য;—তিনি কোম্পানীর সেক্রেটারীদিগি করিয়া, দালালী করিয়া, প্রাইভেট টিউনিং করিয়া। কার্জেক্সে দস্যর চালান; বি-এ, এম-এ পাশ বেকার যুবক ২৫, ১০, ১০ টাকা। মাছিনার চাকুরির মত আম দালালিত;—‘অগ্রে পরে কা কথা’? এই সময়ে বাহাদের চাকুরি গিয়াছে, তাহাদের কথা একবার ভাবিয়া দেখুন। যে সকল নবীন যুবক চাকুরি খুঁজিচ্ছে তাহাদের অধিকাংশের কথা একবার ভাবিয়া দেখুন। বাহার। বিবিভাগস্বরের পরীক্ষা দিয়া চাকুরির ভীষণ অবস্থার কথা ভাবিয়া ভয়েভয় হইচ্ছে, তাহাদের কথাই একবার ভাবিয়া দেখুন। সকলেরই ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।

কিন্তু, এই সমস্ত। এখন এত গুরুতর হইয়া গড়াইয়াছে যে, এখন আর হ্রঃপ করিয়া ক্ষান্ত হইলে চলে না। বেকার যুবক কি করিতে পারে এবং কি ভাবে তাহা করিতে পারে সে-বিষয়ে এখন হির ভাবে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। ‘বেকার বান্ধব সমিতি’, ‘Unemployed Youths’ Association’ প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে—একপ আৰও অনেক সমিতি হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এই সকল সমিতি কি ভাবে কাজ করিতে পারে, তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত।

বেকারের টাকা কোথায়? সমিতির কাজ চালাইতে হইলে কিছু টাকার প্রয়োজন। সদস্য ব্যক্তির দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকা অত্যন্ত অনিচ্ছিত ব্যাপার। উদ্যাহী বেকারগণ ইচ্ছা করিলে নানাতরপ আবেদন-প্রদানের (Charity Entertainment বা Performance) আয়োজন করিয়া সাধারণের

নিকট কিছু টাকা পাইতে পারেন। বড় বড় গৃহ-একটা ফুটবল বা হকি মাঠের ‘দরদারী’র টাকা (Gate-money) পাইলে তাে বিস্তর টাকা সংগ্রহ হইয়া যায়। এ প্রণালীতে টাকা পাওয়াও সহজ। আরো অনেক প্রকারে—ভিক্ষার কুলি না ঘরিয়ণ—টাকা পাওয়া বাইতে পারে।

কিছু টাকা সংগ্রহ হইলে সমিতির কাজ রীতিমত চলিতে পারে। সমিতি একটি পুস্তকাগার স্থাপন করিয়া নানাতরপ শিল্পদ্রব্য ও আবশ্যক জিনিস প্রভৃতির প্রণালী বাহাতে আছে এতরপ পুস্তক বা পত্রিকাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারেন। যে বিধয়ে যিনি বিশেষজ্ঞ তাহার দ্বারা মাঝে মাঝে উপদেশ দেওয়াইতেও পারেন। সমিতির একটি খবর থাকা আবশ্যক এবং সেখানে বেকারের কাছে দাণিতে পারে এতরপ খবর সংগ্রহ করিয়া রাখা বাইতে পারে; যেমন—

(১) গুরু ভারপার গুরু জিনিস পাওয়া যায়; তাহা কলিকাতায় বা অর কোন ভারপার আনিয়া বেচিতে পারিলে যথেষ্ট লাভে বেচা যায় (যেমন কল, তরকারী, মসলা, বেত, ডিম ইত্যাদি)।

(২) গুরু ভারপার গুরু জিনিস পাওয়া যায়, তাহা নিয়া সংগ্রহই গুরু জিনিস প্রস্তুত করিয়া বাজারে যথেষ্ট লাভে বিক্রয় করা যায়।

(৩) কলিকাতার বাজারে গুরু গুরু জিনিস যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় হয়। তাহার সবই বিশেষ হইতে আমদানী। ইহার কোন কোনটি এখানে অর মূলধনে বানান বাইতে পারে (যেমন বোর্ডের, কাঠের ও কাপড়ের বেগলা, বেতের ছোট ছোট জিনিস; মোজার Suspender, রবার-ষ্ট্যাম্পের Self-inking pad, কিতা ও Twine, Safety-razor blades, ইত্যাদি)।

(৪) গুরু ভারপার গুরু কল যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত। ভাল করিয়া প্যাক করিয়া চালান দেওয়া হয় না বলিয়া অনেক কল পাঠাইবার সময় রাস্তাতেই পড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। এই সকল কল ভাল করিয়া

আধুনিক প্রণালী অনুসারে পাক্ষ্য করিয়া পাঠাইতে পারিলে, পাক্ষ্য বরচ উঠিয়াও কল বিক্রয় যথেষ্ট লাভ থাকিতে পারে (বখা, কমলা পেলু, আনারস প্রভৃতি)।

(৫) শুকু ভারদার শুকু কলের কল প্রভৃতি বৎসর পোকার অভ্যাচারে নষ্ট হইয়া যায়। ইহার একটা বিহিত করিতে পারিলে কল রক্ষা পায় এবং সেই কল বেচিয়া যথেষ্ট লাভ করা যায় (বখা, পূর্ববঙ্গের ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলার আম)।

(৬) বৌখ-কুমিল্লেজ, হাঁস-দুগ্ধী পালনের ব্যবসায়, ডোরি-কাপ, কলের ও কুলের চাষ, তরকারীর চাষ, এ সকল উন্নত প্রণালীতে ও অল্প মূলধনে করিতে হইলে কি ভাবে, কত মূলধনে, কিরূপ স্থানে আরম্ভ করা যায়, সে-বিষয়ের সুবিধা-অসুবিধা কি ইত্যাদি বিবরণ সংগ্রহ করা হইতে পারে। কো-অপারেটিভ বৌখ-কারবার সম্বন্ধে সকল প্রকার খবরও সংগ্রহ করিয়া রাখা হইতে পারে।

এই সকল খবর সংগ্রহ করিয়া বাহাতে কাজে লাগান হইতে পারে তাহারও ব্যবস্থা সমিতি করিতে পারেন। খবর সংগ্রহের জন্য ঋণগ্রহণে তাঁহাদের ক্ষমতা কিছু কিছু পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা আবশ্যিক। খবরগুলি এমনভাবে রাখিতে হইবে, বাহাতে আবশ্যিক-মত বাহির করা যায়। একজন সম্পাদকের হাতে ইহার ভার দেওয়া হইতে পারে।

কে কোন কামটি করিতে ইচ্ছুক জানিতে পারিলে সমিতি তাহাকে সে বিষয়ে পরামর্শ দিয়া, বা বিশেষজ্ঞের মত আনাইয়া সাহায্য করিতে পারেন। একজনে বাহা করা সম্ভব নয়, তাহার জন্য ছোট কো-অপারেটিভ বৌখ কারবার স্থাপনের ব্যবস্থা সমিতি করিতে বা করাইতে পারেন। ছোট ছোট জিনিস (বেলন প্রভৃতি) প্রকৃতির প্রথম পরীক্ষা সমিতির পক্ষেই হইতে পারে এবং এই 'পরীক্ষা'র খরচ সমিতি বহন করিতে পারেন। সমিতির টাকার তুল্যইলে একটা ছোটখাট পরীক্ষাগার (Experimental Laboratory) স্থাপন করিতেও পারেন।

সমিতির লভ্যেরা সামান্য কিছু টাকা দিতে পারিলে সমিতির মাসিক খরচ চালান কিছু কঠিন হয় না। মাসিক ৮০ আনা দিবেন এতদ ৫০০ সভ্য হইলেও মাসিক ৬০০ টাকা টাকা আদায় হয়। অনেকে বলিবেন, "বেকার টাকা দিবে কেমন করিয়া?" উগ্রদের মধ্যে অনেকেই হয়ত মাসিক ৮০ আনা দিতে পারিবেন; ঋণগ্রহণ না পারিবেন তাঁহাদের নিকট টাকা লওয়া হইবে না। সমিতি এতদ নিয়ম করিতে পারেন যে, "শতকরা ১০, বা ১৫, বা ২০ মনের নিকট টাকা লওয়া হইবে না।" বেকার ছাড়। অল্পেও সভ্য হইতে পারেন, তাহাতে বেকারেরই উপকার।

মকঃকলের সভ্যদের জন্য সমিতি হইতে মাসিক বা মৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া আওশ্রয় খবর সকল জানান হইতে পারে। সম্পাদকের নিকট তাঁহারা অল্পত সকল খবরও জানিতে পারেন।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সকল বিষয় বিবরণভাবে আলোচনা করা সম্ভব নহে। বেকারেরা একত্র হইলে কাজ করার সুবিধা কিরূপে হইতে পারে তাহার সামান্য আভাস মাত্র দিলাম। আশা করি, ভবিষ্যতে এবিষয়ে নানারূপ আবশ্যিক খবর প্রকাশ করা হইতে পারিবে। বেকারের বহুলাং কিছু কিছু প্রকাশ করিতে পারিলে ভাল হয়। সর্বদাই যেন আমরা মনে রাখি —

"অজ্ঞানামপি বহুনাং সহতিঃ কার্যসাধিকা।

তৃণৈশ্চ গব্বমাণৈঃ বধায়ে মন্তশস্তিনঃ।"

চতুর্থ অঙ্গন বোনা

শ্রীভূষণমালা দেবী

ভৈরবী চট্টের আসন ও কার্পেটের আসন সেখিতে প্রায় একরকম। এমন ভাল ভাল চট্টের আসন সেখিতে পাওয়া যায়, বাহা কার্পেটের আসন হইতেও সুন্দর। বাহারে আসনের চট বা ভাল কাচিৎ কাপড় পাওয়া

যায়। এই কাপড় খুব বেঁদু বেঁদু বোনা ও পুরু অথচ মিহি হওয়া চাই। পাড়গা লামতি চট্টের আসন ভাল হয় না। প্রথমে একখানি আসনের উপবৃত্ত

চারিকোণ করিয়া চট কাটিয়া লইবে। পরে খড়ি অথবা পেন্সিল দিয়া তাহার উপর যথাস্থানের সোজা ও বাঁকা লাইন এবং ফুল অথবা চৌগুপি ঘর আঁকিয়া লইবে। এ সাবধানতা খালি প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য। দুই একবার করিয়া হাত অভ্যস্ত হইলে পরে দাগ দিয়া না করিলেও চলে। কার্পেটের আসনে যেমন বাঁকা ভাবে একটার পর একটা করিয়া ফাঁড় তুলিয়া ঘর ভর্তি করিয়া যাইতে হয় (যাহাকে কার্পেট-স্টিচ বলে) চট্টের তেমন নহে। চট্টের আসনে প্রথমে বাঁ দিকের একটা ঘরে হ'চ ডুবাইয়া তাহার দুই ঘর দু'রে (সেই লাইনেই) হ'চ উঠাইবে। পরে ঐ হ'চ বাঁদিকের লাইনের গোড়াতে ডুবাইয়া মধ্য দিয়া উঠাইবে। এইরূপে বাঁদিকে দুই ঘর ও ডানদিকে দুই ঘর তুলিতে তুলিতে বাঁদিক হইতে ডানদিকে আসিবে। ফুল বা অক্ষর, লতা-পাতা প্রভৃতি বাহাই তোল না কেন, ফাঁড় এই একরূপই তুলিতে হইবে। তবে পূর্বে কাপড়ের উপর যে ড্রয়িং করিয়াছ, সেই অঙ্গুসারে ফাঁড় তুলিতে হইবে। সূতা বা নানা রঙের পশম বাহা ইচ্ছা ব্যবহার করা যাইতে পারে, তবে চট্টের আসনের সূতা খুব মোটা অর্থাৎ তিন চার 'থি' সূতা একসঙ্গে লইবে। পশম হইলে, তাহা না

চিরিয়া মোটা লইলেই ভাল হয়। অনেক আবার কাপড়ের লাল বা কাল পাড়ের সূতা ব্যবহার করেন। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে pattern দেখিয়া করাই উচিত।

আসনে বা কার্পেটে ইংরেজীতে নাম বা অক্ষর তোলাই সহজ। তবে বাংলা অক্ষর তুলিতে chain stitch দিলেই দেখিতে সুন্দর হয়। অক্ষর-তোলা উল বা পশম দিয়া কার্পেটের হ'চে কার্পেটের উপর করিলেই ভাল হইবে। পূর্বে যেমন বলিয়াছি, বাঁকাভাবে একটির পর একটি ফাঁড় দিয়া সেলাই করিতে হইবে। বড় বড় করিয়া অক্ষর তুলিতে হইলে গাট সূতা লইয়া এক একটা ঘরের মাঝখান হইতে একবার লম্বা ভাবে, একবার এড়াভাবে আবার একবার স্টিচ দিবে; তাহা হইলেই দেখিতে সুন্দর হইবে। কাপড়ে নাম তুলিতে গেলে নামের অক্ষর খুব ছোট করিয়া লিখিবে। চট্টের আসন বুনিতে বা অক্ষর তুলিতে কার্পেটের হ'চই ব্যবহার করা উচিত।

আসনের ভিতর অর্থাৎ জমিটা তৈয়ার হইয়া গেলে চট্টের ধারগুলি সাদা বা রঙ্গিন ফিতা দ্বারা মুড়িয়া দিবে এবং তলাটা একখানা সাদা কাপড়ের উপর লাগাইয়া দিবে। পূর্বে আসন সম্বন্ধে একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি; চট্টের আসনের ভিতরের ফুল, লতা, পাতা ভিন্ন স্থানটা পশম বা সূতা দ্বারা ভরাট করিয়া দিবে, যেন কোন স্থান বাহির হইয়া না থাকে।



অনাগতা প্রিয়া

শ্রীরামেন্দু দত্ত

কার ডরে ওঠে বুক
ওঠে নিঃশ্বাস,
কোথা গো বে প্রিয়া মোর
বাতারনে বসিছা !

কোন্ আসো-কলমখ
উজ্জল কলমে
আছে প্রিয়া চল চল
জল-ভরা চক্ষে !

রেশমের পেছে রাঙা
মাড়রাখা বুগিয়া—
উদাস নয়নে ব'লে
স্নিহবন ভুগিয়া !

বুড়িয়ার বেনারসী
নামিহাছে কোমরে,
কোটা ফুল ব'লে তুল
ক'রে কেলে ভোমরে ।

এগানো চুলের হাওয়া
অতুলন গড়ে,
মধুমর গান গায়
বাছুর ছবে !

তারি মাকে ছুটে আছে
রাঙা ঠোঁট বসিছা,
হিরা ওঠে তারি ডরে
ওঠে নিঃশ্বাস !

গোনার বরণ তার,
নিটোল সে অঙ্গে
কাকন করিছে খেলা
কণ কণ রঙ্গে ।

দোলে তার বুক দোলে
মেঘ মেঘে গগনে,
উদাস করিল আঁহা
কে ডারে এ লগনে !

বাতারনে ব'লে প্রিয়া
কার কথা ভাবে গো,
অখ্যের ভালি নিয়া
ক'র কাছে যাবে গো ।

এল এস এইখানে,
এল হেথা প্রিয়া হে,
বিরহের মলীমর
দীপশিখা নিভারে !

কেন মিছা আশ্রমে
বাতারনে বসিছা,
আমিও বে রহি' রহি'
উঠি নিঃশ্বাস !



মাসা-কীনন

[দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গৃহস্থের দোকানে]

চণ্ডীদাসের প্রেমসাধনা

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

চণ্ডীদাস বাঙ্গালার খাঁটী বাঙ্গালী কবি—তিনি বাঙ্গালার গারখড়কুন্ডের কোকিল—তাঁহার মত মধুর কণ্ঠে আর কোনও কবি বাঙ্গালীর প্রেমের গান—বাঙ্গালীর প্রাণের গান গাহিয়াছেন কিনা, জানি না। চণ্ডীদাস প্রেমের কবি—প্রেমের গানে তাঁহার সমতুল জগতের আর কোনও ব্যক্তির আর কোনও কবি আছেন কিনা, জানি না। যে প্রেম পার্থিব প্রেমের বহু উর্দ্ধে—বাহা আপনাকে রিক্ত করিয়া, সর্বস্বগত্যা করিয়া প্রেমের সিদ্ধিতে বিন্দুকে মিলাইয়া দেয়, যে প্রেমে এক ব্যতীত দুই—এর সম্ভা থাকে না,—চণ্ডীদাস সেই প্রেমের কবি।

“গা পরাতুর্জিতরীশ্বরে”—এই পরাতুর্জিতের স্বরূপ যদি কোনও কবির কাব্য-সাধনার মধ্যে সূত্র হইয়া উঠিয়া থাকে, তবে তিনি চণ্ডীদাস। ইংরাজীতে একটা কথা আছে, The Sublime and the Beautiful. গল্পের বা কল্পকথার স্বাক্ষরী প্রাণ যেমন দল্টকেই অভ্যক্তরে ভ্রমরের মধ্যে নিহিত, ঐতিহ্য-কবিতার প্রাণ তেমনই এই Sublime and the Beautifulএর ভিতরে লক্ষ্যে লগ্নোপনে সন্নিবিষ্ট। চিত্রকলা-কৌশলী চিত্রশিল্পীর দুই একটি Brushes বা আঁচড়ের মত মহাকবি দুই একটি পঞ্চমোচ্চনার বা পদম্যাবেশে আপনার কাব্যে ঐ Sublime and the Beautifulকে রূপ দিয়া থাকেন। চণ্ডীদাস এবিধের সিদ্ধহস্ত। তাঁহার কাব্যরচয়িতার অপর অপরিমিত অনন্ত ভাণ্ডারে সেই অমূল্য রত্নরাশি ধরে ধরে সঞ্চিত আছে। কাব্যরস-পিপাসুর অঙ্করে আগ্রহ থাকিলে—সাধনা ও ভক্তি থাকিলে তাহা আদৃত হইতে পারে। কাব্যরস-বসিক ভক্ত সাধকের অন্তরের অন্তরালে তিনি সেই গাড় রস কি অল্পত রচনাকৌশলে ঢালিয়া দিয়া দিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে গুলকে আচ্ছাদ্য।

হইতে হয়। সেই কোশল অমূল্যরূপে আদৃত হয় না, উহা সাধনাসাপেক্ষ। বাহা স্তম্ভর, বাহা মহান,—কাব্যরস-সমাবেশে তাহা একই আধারে মিশ্রিত কবিতা চণ্ডীদাস তাঁহার মানস পুত্রকন্ডার অপূর্ণ পূর্বরূপ, অভিজার, মান, বিরহ, মাধুর্য ও মিলনের গান গাহিয়া দিয়াছেন। সেই অপূর্ণ রসদম্যাবেশে পাঠকের মনে অহুতপূর্ণ, অনাব্যাহিতপূর্ণ, অবহুতপূর্ণ বন আনন্দের স্ফার হয়, প্রগাঢ় হর্ষবিষ্ময়ে ও ভক্তিপ্রজ্জ্বল দময় তরিতা উঠে, রসস্রষ্টার সন্তিত মন কোন্ এক অমান্য অটোনা উল্লসের কলনা-মোকে চলিয়া যায়।

চণ্ডীদাসের “ভক্তিভবরী হরিদনরী” নাটিকা স্বপন আদ্যিনা মাঝে দেখা দেন, তখন রসগ্রাহী ভাবুক “চাহিতে চাহিতে পশিলেক চিত্ত” অবস্থায় আপনাতঃ আর আপনি থাকেন না, সেই রূপ-সারের হুবিয়া তাহার লহিত এক হইয়া যান। তাঁহার নাটিকা “চাহে বাহা পানে, বধয়ে পরাণে, দাক্ষণ চাহনি তার”। সে চাহনি “বিহার ভিতরে পাণ্ডর কাটিয়া” বসে, সে চাহনি শুধু চোখের নেখা নহে! তাঁহার নাটিকা স্বপন “বদনা-দিনান” অস্ত্রে ধরে কিরিয়া যান, তখন তাঁহার “লেসে নীল শাকী, নিষাড়ি নিষাড়ি, পরাণ লহিত ঘোর।” সে কি বে-সে রূপ, সে কি বে-সে প্রেম? তাহার তুলনা কোথায় বৃষ্টিয়া পাওরা হাইবে?

চণ্ডীদাসের প্রেম—সে অতি অল্পত—সে যেন এ জগতের নয়—সে প্রেম,—

“কাছুর শীরিতি, চলনের রীতি,
বহিত সৌরভময়।
বহিয়া আনিয়া, হিয়ার লহিতে,
দহন বিগুণ হয়।”

আচর্য এই প্রেম! চলন বহিত সৌরভময়,—নীতল,

দগদগ ছুড়াইয়া দেয়। কিন্তু এই প্রেম যদিও আনন্দ।
 কদমে ধারণ করিলে নহনের আলো বিজ্ঞ ব্যাধিমা যায়।
 সে এমন প্রেম যে, নারিকা কাদিয়া বলেন—

“নাতি কুল ঈল,
 নকলি হুণিগ,
 ছাড়িলে না ছাড়ি কাশা।”

এ প্রেমে যেমন হুঃ, তেমনই হুঃ। এ প্রেমে,—

“হুঃ কোরে হুঃ কাদে
 বিচ্ছেদ ভাবিরা।”

প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন হইতাহে, উভয়ে উভয়কে
 পাইয়াছেন, তথাপি পূর্ণ শান্তি, পূর্ণ হুঃ নাই, তখনও
 উভয়ে ভাবিতেছেন, যদি বিচ্ছেদ হয়।

তাই চণ্ডীদাস বলিতেছেন,—

“তন বিনোদিনী, হুঃ হুঃ হুঃ তাই,
 হুঃের লাগিয়া যে করে পীরিতি
 হুঃ যায় তার ঠাকি।”

এত হুঃ, তথাপি এই পীরিতির এমনই হাঁতি যে,—

“পরায় ছাড়িলে, পীরিতি না ছাড়ি
 পীরিতি পড়ল কে?”

এত জ্বালা, এত হুঃ, তবুও চণ্ডীদাস বলিতেছেন,—

“পীরিতি রসের রসিক নহিলে
 কি ছারে পরায় তার।”

কারণ, চণ্ডীদাস জানেন,—

“পীরিতি লাগিয়া, পরায় ছাড়িলে,
 পীরিতি বিলসে তথা।”

এ পীরিতি এমন সর্গবাশ্য যে,—

“হারে নই গুনি হবে বাঁধের নিগান
 গৃহকাম কুণি গ্রাণ করে আনচান।
 নগী কুলে নিম পতি, যুনি কুলে যৌন
 গুনি পুষ্কিত হয় তরুণতাপণ।”

এমনই সেই বাঁধের ডাকের আকর্ষণ! হাবর
 কলম বিচ্ছিন্নতারের কাহারও নিস্তার নাই সেই
 আকর্ষণ হইতে! ইহাই এই পীরিতির চরম। এই
 প্রেমে হুঃের মাঝেও হুঃের আশঙ্কা, মিলনের মাঝেও
 বিরহের ভয়। অথচ এই পীরিতির হাঁতিও অদ্বুত—

“নিতিই নৃতন, পীরিতি তখন,
 জিলে জিলে বাড়ি যায়।”

ইহা,—

“ঠাকি নাহি পায়, তথাপি বাড়য়,
 পরিণামে নাহি যায়।
 নধি! অদ্বুত হুঃ প্রেম!”

অদ্বুতই বটে! কেবল অদ্বুত কেন, অতুলনীয়,
 অনির্গতনীয়। সে প্রেমের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও মহত্ব
 যে ভাগ্যবান কদমে ধারণ করিতে পারে, সে ভক্ত হয়।
 সে তত্ত্বসাধক কবিকুলপ্রভে চণ্ডীদাসের চরণে মাথা
 লুটাইয়া বলে,—প্রভু! হুমি বাহা দিয়া দিরাছ, তাহা
 বাঙ্গালীর নিম্নব প্রাণের জ্বিল,—তাহার তর্জমা
 কোন ভাষার হয় না, কোন বিশেষী তাহার রসাস্বাদ
 করিতে পারে না, তাহা মনে অহুঃবৎ করিতে
 পারে না।

চণ্ডীদাসের নারিকা সেই প্রেমের আশ্বাস কি
 ভাবে পাইয়াছেন, তাহা বুঝাইতেছেন,—

“আমার বঁধু আন বাড়ী যায়
 আমার আশিনা দিয়া।
 সে বঁধু কাদিয়া, না চায় কিরিয়া,
 এমত করিল কে?”

এ হুঃ, এ জ্বালা বুঝিবে কে? কিন্তু নারিকা
 ইহার শান্তি বিধান করিতে চাহেন, কিন্তু কি হুলস, কি
 দগদগাচী ভাষার,—

“আমার অন্তর যেমন করিছে,
 তেমতি হউক সে।”

কত মহান! কত গভীর! বসন্ত পাঠক ইত্য
 চাইতেই বৃষ্টি। সেপন, বাধার অন্তরে কি চাইছে।
 ইতার অধিক দগনের শান্তি ইত্যাদি দিতে
 জানেন না।

ঈশ্বরী তাহার নাদকেও এই শান্তি চাইতে
 অবাধিতি সেন নাই,—

“বধু! কি আর বলিব তোরে!

অলপ বয়সে, পীরিত করিয়া

বহিতে না দিলি ঘরে ॥

কামনা করিয়া, সাগরে মরিব

সাধিব মনের সাধ।

মরিয়া চাইব, ঈশ্বরের নন্দন

তোমারে করিব রাখা ॥

পীরিত করিয়া, ছাড়িয়া যাইব,

রহিব কদম্বডলে।

দ্রিষ্ট হইয়া, দূরলী বাতাব,

বধন ঘাইবে তলে ॥

দূরলী গনিয়া, মোহিত হইয়া,

সহজ কুলের বাসা।

চণ্ডীদাস কর, তখন জানিবে,

পীরিত কেমন আলা ॥”

কত বড় অভিমান, কত বড় অভিলাষ! আমি
 ঈশ্বরের নন্দন হইয়া নবের বাধা বহিব, আর
 তোমারে করিব রাখা। শতীর হুলাল দোহা-কণে
 পরজন্মে তুমি রাখাভাবে আমার মন্ত ‘হা কৃষ্ণ!’
 ‘হা কৃষ্ণ!’ করিয়া কাদিবে, তখন বৃষ্টিবে পীরিত
 কেমন আলা!

এই যে আপনার অন্তর দিবা পরের স্বপ্নের
 সমান অচ্ছত্তি, ইহাই মহান, ইহাই প্রেমের
 পরাকাষ্ঠা। রাখার প্রেম সেই সর্বোচ্চ করের, বাহ্যে
 হৃৎ, আলা, অভিমান, অভিলাষ অন্তরে গুমরিয়া উঠে
 অখণ্ড নান্দিকা বলিতে পারেন,—

“প্রাণপতি তুমি, কি বলিব আমি,
 মানের অনেক আছে।
 আমার কেবল, তুমি সে নন্দন,
 দাঁড়াব কাহার কাছে ॥”

যে প্রেমিক হৃৎ-আলা সহিয়াও অন্তরে দুঃখানন্দ
 লাভ করেন, আর সেই পরম রসাবাস করিয়া
 বলিতে পারেন,—

“সই! পীরিত না জানে বাতা।

এ তিন দুবনে, জনমে জনমে,

কি হৃৎ জানবে তাহা ॥”

তাই রাখার—

“খাইতে পীরিত, চাইতে পীরিত,

পীরিত স্বপনে ঘেঁষি ॥”

পীরিতের আলা কি সামান্য? রাখার বুখেই
 তাহার বহুপ একাশ পাইতেছে—

“কেবা নিরমিল, প্রেম-সর্বোবয়,

নিরমল তার জল।

তব মকর, কিরে নিরন্তর

প্রাণ করে টলমল ॥

গুরুজন আলা, জলের শিহালা,

পঙ্কজী জীল মাছে।

কৃণ পানিকল, কাঁটা যে সকল,

মলিল বেড়িয়া আছে ॥

কলর পানার, সদা লাগে দার,

ছাঁকিয়া খাইল যদি।

অন্তরে বাহিরে, হুটু হুটু করে,

হৃৎ হৃৎ বিল বিলি ॥”

কিন্তু তথাপি রাখা এই হৃৎকেই ভালবাসেন।
 কেন? যদি এতই হৃৎ, এতই আলা, তবে গুনাম
 ত’ বুখে না আনিলেই হয়, গুরুণ ত’ নহনে না
 মেথিলেই হয়। রাখা কি সে চেষ্টা করেন নাই?
 বিলম্ব করিয়াছেন,—

"কালিন্দীর জল, নরানে না ঢেবি,
বরানে না বলি কালা ।
তথাপি যে কালা, অস্তরে ভাগ্যে,
কালা হইল ভগ্নমালা ।
বঁধুর লাগিয়া, যোগিনী চাইব,
কুণ্ডল পরিব কাশে ।
সবার আসে, বিদায় চাইয়া
বাইব গমন বনে ।
গুহু পরিজন, বসে কুবচন
না বাব লোকের পাড়া ।
চণ্ডীদাস কহে, কাহুর পীরিত,
ছাতি কুলা ঈল ছাড়া ।"

এ সবই সত্য । রাখা সবই কুন্ডল, সবই জানেন,
গহন বনে বাইতেও প্রস্তুত হন, লোকের পাড়ায়
বাইতেও সম্মত নহেন, তথাপি তিনি ক্রামহুন্দরকে
বলেন,—

"তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম,
গুন বিনোদ রাস ।

তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না তার ।
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি ।
ভরনে তোমার রূপ ধরিতে দেখি ॥
গুহুজন মাঝে যদি থাকি যে বলিয়া ।
পরস্পরে নাম গুনি ঘরবার হিয়া ।
গুহুকে পুরসে অঙ্গ কাঁধে করে জল ।
তাছা নেহারিয়ে আমি হই বে বিকল ।
নিশি দিশি ঈ! তোমার পাসরিতে নারি ।
চণ্ডীদাস কহে হিয়ার রাব বির করি ।"

রাখা নিশিদিন ক্রামহুন্দরকে পাসরিতে পারিতেছেন
না । চণ্ডীদাসও উপদেশ দিতেছেন,—"মনের দন্ধিরে
তাঁহাকে বির করিয়া রাখ ।" এ প্রেমেব স্বরূপ কি,
স্বর্গের মানব আমরা, ইহার রসাদ্বাদন করিবার দক্তি
কোথায় ? "বির করিয়া" রাখিতে পারিলে ত' আর
ভেদাত্মক বৈতাত্মক নাই, তখন স্বপ্নও, অবিশ্বাস, পূর্ণ

আনন্দ, কুমানন্দ ! অব্যাদনসোদোচর সতিদানন্দতপ
নিবোধং সোধং ! সে পরমানন্দের অল্পহৃদিত মন ও
জাহাতেই গৌন ভক্ত সাধক বৈষ্ণব কবি ভিন্ন কে
হইতে পারে ?

সেই সাধনার পথ বড় কঠিন, বড় কষ্টসাধ্য ।
সেই সাধনার বলিয়া রাখাব,—

"হাসিতে হাসিতে পীরিত করিয়া
কাসিতে জনম পেল !"

তথাপি রাখা বলেন,—

"পীরিত নগরে বসতি করিব,
পীরিতে বাঁধিব ঘর ।
পীরিত দেখিয়া পড়ি করিব,
তা বিদ্য সকলি পর ।
পীরিত ঘরের কবাট করিব,
পীরিতে বাঁধিব চাল ।
পীরিত আলকে সদাই থাকিব,
পীরিতে গোচাব কাল ।
পীরিত পাশে শয়ন করিব,
পীরিত শিখান মাথে ।
পীরিত বালিসে আলিদ তাম্বি,
থাকিব পীরিত মাথে ।
পীরিত সন্নে সিনান করিব,
পীরিত অঙ্গন লব ।
পীরিত ধরম, পীরিত করম,
পীরিতে পরাণ দিব ।"

পীরিত ধর্ম কর্ম সবই,—পীরিতর মধ্যেই
ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই চুবিয়া বাইবে, পীরিত অস্তরে,
পীরিত মস্তে, সকল অবস্থাতেই ধ্যান ধারণা ভগ্নমালা
হইবে,—এমন পীরিতের যে কি বীড়ি, তাছা
চণ্ডীদাসও ধারণা করিতে সাহস করিতেছেন না ।
কি মহান, কি সুন্দর, কি দীর্ঘ সেই প্রেম !
সে প্রেমস্রবের রসিকই বলিতে পারেন,—

“সাপের পশিব,
নাহি হুখ হুখ প্রেম।”

সেই প্রেম সমাধির অবস্থায় সাধক হুখ হুখ
কেন, সকলের অর্জিত,—তিনি তখন বদিতার
অধিকারী,—

“একত্র থাকিব,
ভাবিনী ভাবের দেখা।”

ধৃত আমরা, ধৃত বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী ভাতি
যে, আমাদেব্রই বাঙ্গালী সাধক কবির অমর সেধনী
হইতে এই চরম আদর্শ প্রেমের অভিযান্ত্রিক
হইয়াছে। এই প্রেমসাধনার বশেই চণ্ডীদাস বলিতে
পারিয়াছেন,—

“ওন রজকিনী রামি!

ও হুট চরণ, শূন্য আনিয়া
পরশ লইছ আমি।

তুমি বেদবাণিনী, হরের পরশ
তুমি সে নরনের তারা।

তোমার তখনে, যিসন্ধ্যা থাকনে,
তুমি সে পলার হারা।

রজকিনী রূপ, কিশোরী বরুণ
কাম-পঙ্ক নাহি তার।

রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম
বহু চণ্ডীদাস গায়।”

এ প্রেম কোথায় নিয়া কাহার চরণে পৌঁছিছে?।
প্রেমিকার এই সর্ব্ব বিলাইয়া দেওয়া চরম প্রেমের
প্রতিদানে প্রেমিক লক্ষ্যস্বামী বলিতেছেন,—

“উঠিতে কিশোরী, বলিতে কিশোরী,
কিশোরী নহন তারা।

কিশোরী তখন, কিশোরী পুঙ্কন,
কিশোরী পলার হারা।

রাবে! ভিন না ভাবিছ তুমি।

সব ত্রয়াদিয়া, ও রাখা চরণে
পরশ লইছ আমি।

নয়নে বশনে, জ্বল জ্বলরূপে,
কত না পারিগি তোমা।

হুঃ! পলায়িত, করিয়ে মিনতি,
সকলি করিবে কমা।”

বিশ্ব সিদ্ধিতে, জীবাত্মা পরমাশ্রমে এমনই
মিশামিশি বটে! ইহার রসাস্বাদ করিয়া মহাকবি
চণ্ডীদাস ঐরাবতকে বলিতেছেন,—

“পুত্র-পরিশ্রম, সবার আপন,
সকলি তালিয়া লেব।

পীরিত করিলে, তাহারে পাইবে,
মনেতে তাবিয়া বেধ।”

চণ্ডীদাস এই মহাপ্রেমের কবি, তাহার সাধনা
সার্থক। এমন প্রেম-পাশল কবি আর কোন দেশে
আছে? তাহার প্রেম কি সে-সে প্রেম? সে প্রেম
কিরণ।—

“পীরিত পীরিত, সব জন কতে,
পীরিত সহস্র কথা?

বিরিষের কল, নহে ত পীরিত,
নাহি মিলে কথা তথা।

পীরিত অস্তরে, পীরিত মস্তুরে,
পীরিত মাখিল যে।

পীরিত রতন, লভিল যে জন,
বড় ভাগবান সে।”

বাঙ্গালীর কত বড় সৌভাগ্যে, কত মহাপুণ্যে
এই পীরিত-পাশল মহাকবিকে সে বন্ধে ধারণ
করিতে পারিয়াছে? সেই কবির চরণেবিশ্বপূর্ণ
কি আর একবার বাঙ্গালার মাটি, বাঙ্গালার জল
পরিষ্কৃত হইবে না?

কত বড় আনন্দের ও গর্ব্বের কথা যে,
বাঙ্গালীর প্রাপের এই প্রেম-পাশল সাধক কবির
হুখেই বাঙ্গালার আকাশ-বাতাস স্নানিত হইয়াছিল,—

“পৈরিতি লাগিয়া,
পরেতে মিশিতে পারে ।
পরকে আপন,
করিতে পারিলে
পৈরিতি মিলয়ে তারে ॥”

কে বলে, বাঙ্গালী হুজুরে অর্থনৈতিক জাতি? বাঙ্গালীর আর কিছুও যদি না থাকে, তাহা হইলেও বাঙ্গালীর চতুর্দশ আছে। সে চতুর্দশের তুলনা চতুর্দশ, তাহার তুলনা করতে নাই। গভীর অন্ধত্ব, উন্মাদ বিকলোড়া অন্ধত্ব, মহান্ আদর্শ,—এসকল ত’ চতুর্দশের রচনার ছায়ে ছায়ে মুগ্ধকাম, কিন্তু তাহারও উপরে তাহার বহু পলাবলীর অর্থনৈতিক গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ আমাদের মত সাধারণ মানুষের বৃত্তিবার লাগে নাই, নজির নাই, অবিকারও বৃত্তি নাই। যে করজবন জাগাবান

বাঙ্গালী সাধনা করিয়া সাধনামার্গে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই, তাহারাই সে রসাধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

মাটির মাছ চতুর্দশ-ভক্ত বাঙ্গালী আমরা কেবল এই প্রার্থনা করি, যেন বাঙ্গালী তাহার জাতীয় মহাকবি চতুর্দশের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিতে পারে,—

“এছন পৈরিতি জগতে আর কি হয় ?

এমত পৈরিতি না সেখি কখন, কখন হবার নয় ॥”

আর সেই পান তাহার কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণ আকুল করে, যেন সেই অমর সঙ্গীত শুনিয়া যুগে যুগে তাহার মরমে ধরা নাশিয়া আসে !

“যিনি (বহিঃক্ষেত্র) আমাদের মাতৃভাষাকে সর্গপ্রকার ভাবপ্রকাশের অহুত্ব করিয়া দিয়াছেন তিনি এই হতভাগা দরিদ্র দেশকে একটি অস্ফুট চিত্রসংশ্লিষ্ট মান করিয়াছেন। তিনি দ্বারী জাতীয় উন্নতির একমাত্র মূল উপায় স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। তিনিই আমাদের নিকট বর্ষাধিকার পোকেব মধ্যে সাধনা, অবনতির মধ্যে আশা, শ্রান্তির মধ্যে উৎসাহ এবং দারিদ্র্যের দুঃস্বাদ মধ্যে চিরসৌন্দর্যের অক্ষর আকার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের মধ্যে দ্বারা কিছু অমর এবং আমাদের মধ্যে দ্বারা কিছু অমর করিবে সেই সকল মহাপুঙ্জকে ধারণ করিবার, পোষণ করিবার, প্রকাশ করিবার এবং সর্বত্র প্রচার করিবার একমাত্র উপায় যে মাতৃভাষা তাহাকেই তিনি বলবতী এবং মহীয়সী করিয়াছেন।”

—রবীন্দ্রনাথ

বাংলা ও বাংলানী শক্তির অভিব্যক্তি

ঐহরিদাস পালিত

উপক্রম

বৈদিক-সাহিত্য পাঠে 'অবগত হওয়া' মাত্র, তারতম্যে কেবলমাত্র দুইপ্রকার জাতি বিদ্যমান ছিল বা আছে। তথাকথিত জাতির মধ্যে,—একটি অ-আর্য্য (অনার্য্য) এবং অল্পট আর্য্য-জাতি। আর্য্যপুত্র, অ-আর্য্য-দিককে—নিম্না এবং পুণ্য করিতেন এবং বর্তমানেও সত্য জাতিরা, অসত্য, বর্বর বলেন যে গণ-জাতিকে, তাহারাই নীচজাতি—ছোটলোক।

বৈদিক-সাহিত্যে, জাতিগত বিভেদ ধরা যায় না। কেননা উৎপত্তির মূল একই। এক আদি পিতামাতা হইতে,—অজ্ঞাতীয় মানব-বংশের বিকাশ হইয়াছে। একই বংশ,—একই পিতামাতার সন্তান। একই বংশের বিস্তার বা প্রবাহ। আর্য্য-অনার্য্যে জাতির হিসাবে—জাতি-ভেদ নীচ বিদ্যমান।

সর্বাদি পিতা-মাতা

সম্বন্ধে বৈদিক-সাহিত্যে যে উপাখ্যান রহিয়াছে, ইহাতে দৃষ্ট হয় যে,—আদিপুরুষ-সেই প্রকৃতি নীনা ছিলেন। একই-বিধা বিভক্ত হইয়া, দুটি পুত্রক হইলেন। বিধা বিভক্তের পূর্বে, তথাকথিত পুরুষটি, শ্রেষ্ঠ এক আদিপুরুষ হইতে,—অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন,—আত্মজ, অযোনিজ রূপে,—তাহার মাতা ছিলেন না। ভারতের ভগবান ব্রহ্মা—তথাকথিত পুরুষ। সেই পুরুষের শরীর হইতে,—এক নারীসৃষ্টির বিকাশ হইল, তিনি—শতরূপা, তাহারকেই বাঈ, সরস্বতী, পার্বতী, ওম প্রকৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে; ইহার সেবতা বলিয়া খ্যাত। ব্রহ্মা সেবতা কিন্তু ব্রহ্ম নহেন।

বেদান্তমতে

ব্রহ্ম তিনিই,—বাঁধা হইতে ভগতের উৎপত্তি, বিত্তি এবং ভঙ্গ হয়। "ভদ্রাত্ত বতঃ" হুত (১।১।২) হইতে

ইহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহাই প্রকৃত উৎপত্তি। পণ্ডিতেরা বলেন—বেদান্তের কোন কোন স্থলে, বৌদ্ধধর্মের প্রসঙ্গ পরিলক্ষিত হয় (২য়। ২এর ২৮, ২৯, ৩০ প্রভৃতি)। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, বেদান্তের হুত বিশেষ,—ঐষ্টপূর্ব বত শতকের মধ্যভাগের পরবর্তী কালের রচিত হওয়া অসম্ভব নয়।

সাংখ্য—অবস্তু হইতে বস্তুর উৎপত্তি হয় না ৫।৭।

বিষ-মানবের আদি পিতা-মাতা

সম্পর্কে, পরবর্তীকালে অহুসন্ধান যখন আরম্ভ হয়, তখন দর্শনচর্চা সবেমাত্র প্রবর্তিত হইয়া থাকিবে। শৌকিক বাস্তব বিষয় চর্চা হইতে, ক্রমশঃ কল্পনাবল, অবাস্তব ভগতের দ্বার উন্মোচিত হইয়া, ব্রহ্মা-সাবিত্রীর উপাখ্যান সরোচিত হয়। ইহা ইতিহাসের হিসাবে বলা চলে। এই প্রকার বৈদিক-সাহিত্যের দেব-ভববাদ—বাস্তব, প্রকৃত শরীরবিশিষ্ট কিছুই কল্পনা নয়। মীমাংসা দর্শনে—এই মত ব্যক্ত হইয়াছে সেবা দ্বারা।

শরীর স্বাধীন ভায়ে, কুমারিলের ব্যতিক্রমে, এবং অজ্ঞাত দার্শনিকগণের মতে,—বাস্তব সেবতা, অস্বপ্ন, —শরীরী নহেন। দার্শনিক ব্যাপার,—এই প্রকারে অদৃষ্ট শক্তি বা শক্তিমাত্র কিছু হইতে—বরজাতির অত্যাচার কল্পনা ব্যতীত, অন্য উপায় নাই। অনিশ্চিত বিষয়ের, একটা কুল-কিনারা করাকেই—সিদ্ধান্ত বলা হয়। মানবের আদি পিতা-মাতা ছিলেনই, কিন্তু অজ্ঞাত বিষয়ের 'মীমাংসা', তথাকথিত উপায়ে করা হইয়া থাকিবে। ইহাকে 'সাহিত্যিক-নৃত্য' বলা হইতে পারে।

অত্যাচার—

পৃথিবীর বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্ম-শাস্ত্রে, নৃত্য

সঙ্গে আগেচনা আছে। পবিত্র বাইবেল শাস্ত্রে—
আদি নরসিধুনের প্রকটের বিবরণ বা উপাখ্যান মধ্যে,
নরসেই হইতই নারীর আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে।
ভারতীয় ‘ভাব-সামা’ বিস্তারিত আছে। গ্রীক-পৌরাণিক
ব্যাপারগত—‘দি ফিল্টরি অব্ এমরীণ্’ নামক
গ্রন্থের ইতিহাসে দেখা যায়—পুন্সকালে নর-নারী
এক-সেই ছিল, তখন অসীম-পক্তি সেই দেখে বিস্তারিত
ছিল। বহুকালে—হুইট পৃথক হইয়া পড়ে এবং
পক্তিও কমিয়া যায়। নারী—নু-গ্রন্থের মত রূপায়ন।
গ্রন্থ—মৃত রূপায়ন গাত করিয়া, প্রেমময়ী-নারী
হইয়াছেন।

মহু-রূপী দেবতার রূপগত

মাগুয়েরই করনা; অরূপকে রূপায়িত করিয়াছে
মাজুবে। ‘অতিমানী-দেবতা’ হইতেছেন, ওয়াসি
সাধারণ দেবতাপন। ‘অতিমানী-দেবতা’ বলিতে বুঝায়,
—মহু-রূপী বাহুর দেবতার বাহুর রূপে অর্থাৎ বাস্তবের
রূপের আরোপ মাত্র। করনা করা হইল,—নিরাকার
দেবতার সাকার রূপ। এই সাকার ওয়াসি (অতিমানী
দেবতার) স্বরূপ প্রেম—মূর্তরূপে একট লাভ করিয়া,
ব্যক্তিতে আরোপিত হইয়া, হইলেন—সাকার। পতরূপা
সেই সাবিত্রী।

অবশ্য হইতে বস্তুর উৎপত্তি হয় না

এই দার্শনিক মতটি,—সাংখ্যদর্শনের। নর-নারী
বাত্তব রূপায়ন। সত্ত্ববজ সাংখ্যমতাবলম্বী সম্ভারগণের
মতবাদ বহন আদৃত এবং প্রচারিত হইয়াছিল, তখন
অবাত্তব কিছু হইতে পদার্থ বিষয়ক প্রকটন করার
কথা, উপাশন করা সম্ভব হয় নাই। তথাকথিত
আত্মদার্শনিক কালে মহু-রূপী দেবতামিগকে, ‘অতিমানী-
দেবতা’রূপে করনা করিয়া, সাকার রূপে প্রেরিত করা
হইয়া থাকিবে। এইরূপে দ্বি বাহুর দেবতার পূর্বক
আনয়ন করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, শরীরবিশিষ্ট
তত্ত্ব-সাবিত্রী হইতে—বাত্তব নর-নারীর অভিব্যক্তিতে
কোনই বাধা হয় না। মানবীয় চিন্তা-প্রবাহ, এই

পদার্থ অংশের হইয়া, দার্শনিক প্রণালীতে বিশ্ব-মানবের
আদি নর-সিধুনের প্রকট বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাও
অমুমান বাস্তব অত কিছু নয়। গ্রীক দার্শনিক
পিথাগোরাস, এরিস্টটল্ প্রভৃতির মতও প্রায় সাংখ্যের
অনুরূপ।

আরও—

যে প্রকারেই হউক, আদি নর-সিধুনের উৎপ
পৃথিবীতে হইয়াছিল,—এসকল দার্শনিক মতবাদের
কাল গত হইলে, প্রত্যক্ষসোচর মানবের অভিব্যক্তি
বিষয়ক বর্ণনার আরম্ভ হয়। বৈদিক-সাহিত্য বলেন,
ভারতে আদি নর-সিধুনের সুপ্রকট হইয়া—এই বিশ্ব-
মানবের প্রকট হইয়াছে। বিশ্ব-মানব মূলে একই
বংশধারাক্রমে পরিবাপ্ত হইয়াছে। এ মতবাদটি
‘একজানি’ (মোনোজেনেটিক) মতবাদ। সাম্প্রদায়িক
ধর্ম-শাস্ত্র মতে,—ইহাই সর্বত্র পরিবাপ্ত হইয়াছে।
নু-তর বিভ্রান্তি পণ্ডিতগণের ধারণা—‘বহুজানি’ (পলি-
জেনেটিক) মতবাদের অভিমুখে। এই হেতু—সাম্প্রদায়িক
ধর্ম-মতবাদীদের সহিত এবং বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের
মধ্যে বিভ্রান্তি চক্ষিভেদ। বহুজানি মতবাদটি—
সাম্প্রদায়িক ধর্মোত্তা স্বীকার করিতে পারেন না, কেননা
তাহা হইলে তাঁহাদের শাস্ত্রীয় মতের অনশন হইয়া যায়।
নু-তরবিশেষে, প্রমাণ-গ্রাহ বিষয় অবলম্বনে, সমস্ত ব্যক্ত
করেন, তাঁহারা শাস্ত্রীয় মতবাদ গ্রাহ করেন না।

সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিক মতবাদ

অবলম্বনে, বৈদিক-সাহিত্য-পুরাণ অবলম্বনে, একজানি
মতই, আদি নর-নারী অভিব্যক্তি ব্যক্ত হইয়া
থাকে। পবিত্র বাইবেল শাস্ত্রের মত, ভারতীয়
পৌরাণিক মত হইতে বিভিন্ন নহে। তদ্রূপ পৌরাণিক
মত, বর্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করিতেছেন না।
বাইবেল মতে পদ—বিশৃঙ্খল করিয়াছিলেন, ঐতিহাসিকগণ
চারি হাজার (১) বৎসরের কিছু পূর্বে, ঐতিহাসিকগণ

১। আমেরিকান্স বাইবেল সোসাইটি প্রকাশিত পবিত্র
বাইবেল ভাষা।

সেপ্টেম্বরে, ঐটপূর্ণ (বিশ্বস্তি পূর্ণ) ইন্দি পূর্ণ, মৌসুম নাম। অনেক রাজা প্রজাবর্ষণ রাজ্য করিতেন। ভারতে সম্রাট মহেন্দ্রগুপ্ত, চরমাদি সিদ্ধন উপত্যকা সেনে যে প্রত্যাশিক আবিষ্কার হইয়াছে, উহার আদি বিকাশ-কাল, বিশেষজ্ঞদের মতে ঐটপূর্ণ পাঁচ হাজার বর্ষের কম নয়। সুতরাং বাইবেলের বিশ্বস্তিকালের সত্যতার সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়াছে।

সেমেটিক জাতিতত্ত্ব মতবাদ

প্রাচীন ঐটপূর্ণ ঐতিহাসিকগণ, তাঁহাদের ইতিহাসে,—‘সেমেটিক জাতি’ বলিয়া ক্রমবর্ধিত জাতির উদ্দেশ্য করিয়া থাকেন। তথাকথিত ‘সেমেটিক জাতি’-গণের উৎপত্তির বিবরণ তাঁহাদের বাইবেলে আছে। নোয়া (হু) জন্মের সময়ে, মহামূল্যবান হইয়া, পৃথিবীর সমস্ত স্থলচর জীব ধ্বংস হইয়া যায়। কেবল কবি নোয়ার পরিবারবর্গ রক্ষা পাইয়াছিলেন। জলপ্রাবনের কিছুকাল পরে, তাঁহার সেন, হেমাদি নামে পুত্র জন্মলাভ করেন। সেই সেনবংশই—‘সেমেটিক জাতি’ বলিয়া খ্যাত হয়। তথাকথিত বাইবেল মতে,—মহামূল্যবান সংঘটিত হইয়াছিল, ঐটপূর্ণ ২০৪২ খ্রিঃ, সুতরাং তথাকথিত কালের পরে, সেমেটিক জাতির প্রকাশ-আম্ভকাল। সুতরাং ভারত, ইজিপ্ট, চালদীয়, ব্যাবিলনাদি দেশে—তৎপূর্ববর্তী যে সকল জাতি বিদ্যমান ছিল, তাহারা সেমেটিক জাতি কখনই নয়। অতঃপর ঐটপূর্ণ চারি হাজার বৎসর পূর্ণ হইতে, জলপ্রাবনের সময় ও পরবর্তী কালেও, তথাকথিত জনগণ,—প্রজা এবং ব্রাহ্মণ অভাব আদৌ হয় নাই। সুতরাং তথাকথিত দেশ, যথা-উক্ত কালে জলপ্রাবন হয় নাই—প্রমাণিত হইতেছে।

বাইবেলের মেনিসিদ্-নাম পৌরাণিক

বিবরণ,—সত্য কিনা, সম্বন্ধের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের খনন ব্যাপারে, প্রাচীন চালদীয় নগরের ভূ-মধ্য হইতে, যে সকল লিপি-মালা আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার মধ্যে একখণ্ড লিপি

আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেখানিতে জলপ্রাবনের বিবরণ অক্ষর-মালায় খোদিত আছে; পণ্ডিতেরা সেই লিপি-কলার নাম রাখিয়াছেন—‘ডেলিউজ্-ট্যাবলেট’। উহারে উৎকীর্ণ আছে, চালদীয়র রাজা উবরগুত ও তাঁহার পুত্র সিনপুসর সময়ে জলপ্রাবন হইয়াছিল। তাহাদের প্রধান দেবতার ক্ষেপে,—মানবের অবাধ্যতা হেতু, জলপ্রাবন ঘটয়াছিল। এবং সেই প্রাবনে—রাজপরিবারবর্গ এবং বহু-বান্ধবেরা, নৌকার সাহায্যে, দেবতার কৃপায় রক্ষা পাইয়াছিলেন। এই ঘটনা ঐটপূর্ণ পাঁচ হাজার বৎসরের বহুপূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল। এই ‘ডেলিউজ্-ট্যাবলেট’র আক্ষরিক অর্থবাদ, বাইবেলের মেনিসিদ্ অধ্যায়ে হিব্রু-ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। কেবল রাজার নাম এক দেবতার নামের পরিবর্তন করা হইয়াছে। দেবতার স্থলে—সেবদুত (এঞ্জেল) লিখিত হইয়াছে। বসোজিন্ চালদীয়া পাঠে একথা অবশ্য হওয়া যায়, ‘ডেলিউজ্-ট্যাবলেট’র চিত্রও ইহাতে দেখা হইয়াছে। কোনট আসল এক কোনট নকল, এ বিচারের প্রয়োজন লেখক করিতে ইচ্ছুক নহেন।

বৈদেশিক ঐটপূর্ণীরা ভারতের ইতিহাস

লিখিয়াছেন, সেই ইতিহাস পঠন-পাঠন দ্বারা লিখিয়াছি; সর্গাদি প্রাচীন ভারতবর্ষে, মানব বলিয়া কোন জীব বিদ্যমান ছিল না। তাহারা কল্পনামেজে স্বপ্ন-ভাবে ভাবিত হইয়া, ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, ‘কোলারিগন’ নামে এক গদ্য-জাতি, ভারতের বহির্ভাগ হইতে, সর্গাগ্রে ভারতে প্রবেশ করে, এবং বিস্তারিত হয়, ইহারা অবশ্য সেমেটিক জাতি। এই ক্রমবর্ধিত সেমেটিক কোলারিগনদের ভারত-প্রবেশের পূর্বে, ভারত মানব-মৃত্ত অরণ্য-মীবে পরিব্যাপ্ত ছিল। এই ঐতিহাসিক উক্তি কোন প্রমাণ তাহারা কোথাও দেন নাই। কেবল প্রাগৈতিহাসিক কল্পনা (ফিগরি)-বলেই, ভারতকে অক্ষাণীন প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন মাত্র। তাহারা বাইবেলের ‘একজানি’ মতবাদী, ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

বাইবেল খণ্ড গ্রন্থ বলিয়া মাত্র হইতে পারে, প্রকৃত ইতিহাসরূপে নয়।

তার বহুকাল পরে, তথাকথিত ঐতিহাসিকেরা, কল্পনাবশে বলিয়াছেন, ভারতের বহির্ভাগ হইতে, যত্র এক উন্নত ধর্মের জাতি, ভারতে প্রবেশ করে—তাহারা 'ড্রাকিডিয়ান' ধর্ম-জাতি। কিন্তু—এই ব্যাপারের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রদান করেন নাই। ইহারা ভারতে বিস্তারিত হয়।

তারপরে, তাহারা লিখিলেন, এক ষেতকার অর্ধসভ্য বা অসভ্য বর্ষরপ্রায় জাতি, ভারতে প্রবেশ করে, তাহারা—'এরিয়ান' জাতি নামে খ্যাত। এ সম্বন্ধে ষেতকার বৈদেশিক জাতির ভারত-প্রবেশ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তবাদের উল্লেখ তাহারা করেন নাই। অথচ আন্দর্ভের বিদ্য এই যে, ভারতকে যখনও মনকে, তথাকথিত উপাখ্যান স্বীকার করিয়া গঠিত হইয়াছে। শিক্ষার্থীদেরকে প্রেরণ উদ্ভূত, তথাকথিত ঐতিহাসিক উপাখ্যানই—উত্তর যত্রণ দিতে হইবে! সুতরাং শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়কেই, তথাকথিত 'এরিয়ান উপাখ্যান'—পড়াইতে ও পড়িতে বাধ্য হইতে হয়। ভারতকে হীন প্রতিপন্ন করা, এবং এই ধারণা বহুল করিয়া ভারতীয় জাতিদের বিরুদ্ধে সাধন করা, সম্ভবতঃ মৌলিক উদ্দেশ্য হইতে পারে। এ সম্বন্ধে একটি প্রমাণ প্রদর্শিত হইল।—ঐক্য নবীনীমোহন সাক্সাল ভাষ্যতন্ত্রায়, এম-এ, মহাশয় তাহার 'বৈদিক ও পৌরাণিক আলোচনা' নামক পুস্তকের ১৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "এখন তাহাদের কেবল এই চোঁটা—ভারতীয় প্রাচীন ঘটনাগুলিকে স্বাভাবিক আধুনিক বলিয়া প্রতিপন্ন করা, এবং সাহিত্যে যে সকল উক্তি পাওয়া যায়, তাহাদের প্রতি অধিগ্রহণ জাগ্রত করা। এ কথা উইন্টারজি সাহেব ১৯২৩ সালের আগষ্ট মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টই বলিয়াছেন (ক্যালকুটা রিভিউ, নভেম্বর ১৯২৩—এন্ড অ' দি বেদ বাই

ডাঃ এম, উইন্টারজি', প্রতীচোরা বলেন যে, ভারতবাসী কেহই ভারতীয় সাহিত্য-লব্ধকে প্রকৃত তথ্যের আবিষ্কার করিতে সমর্থ নহে। যদি একাধা কংগ্রেস যারা সম্ভব হয়, তাহা হইলে সে ভারতের যেনবাসী। তাহার চাহেন যে, বিশেষভাবে ভারতীয় সাহিত্য বেক্রপ ভাবে পঠিত করিয়া যিবেন, আমাদিগকে তাহাই শিরোধারা করিয়া গঠিত হইবে।" ইহার উপর মাত্র কথা নাই। আমাদের নিকিত দুবঙ্গপণকে ইহার উত্তর দিতে হইবে। বৈদেশিক 'এরিয়ান'-আগমন উপাখ্যানটি, তাহারা ভারতে প্রচার করিয়াছেন। আমরা তাহাই শিরোধারা করিয়া গঠিয়াছি। ইহা যে একটা দ্বন্দ্ব কল্পনা, তাহা ভারতীয় প্রাচীন-সাহিত্যেই অবগত হই। ভারতীয় সাহিত্য এ কথা স্বীকার করে নাই। অথচ আমরা মোহনশে, ভারতীয় সাহিত্য হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া, দ্বন্দ্ব প্রতীচা মতবাদের সমর্থন করিয়া থাকি।

ভারত সর্গাদি সভ্য-জনপদ, এই ভারতবাসী অতীত কালে—ইরোপাশি জনপদে বিদ্রুত-বাহ্য করিয়া, তথাকথিত যেনকে সভ্যতা শিক্ষা প্রদান করিয়াছিল, লেখা-পড়া শিক্ষা দিয়াছিল, একথা এখন আর ঈষ্টান ষেতকার পণ্ডিতগণের অধিসিত নাই। ঐতিহাসিক এইচ, আর, হল তাহার—'এন্ড্রিয়েট হিলটরি অ' দি নিয়ার ইষ্ট' পুস্তকের ১৭২—১৭৪ পৃষ্ঠায় বাহা লিখিয়াছেন যেই অংশ পাঠ করা আবশ্যক। তিনিও ষেতকার পণ্ডিত। তিনি লিখিয়াছেন—"ভারত আদিমতম মানব-সভ্যতার কেন্দ্র মনো অস্তম, এবং স্বাভাবিক ভাবেই বিবেচিত হয়—আক্ষর্য এই যে,—অ-সেমোটিক, অ-আর্য্য লোকগণা, বাহায়া পূর্বদেশ হইতে পশ্চিম জনপদকে সভ্যতা দান করিয়াছিল—তাহারা দ্বন্দ্ব: ভারতীয়। স্বাভাবিক জাতি ভারতের।"

এই সুভার জাতির পরিচয়, ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে বিদ্রুতমান রহিয়াছে। ভারতের এই জাতিও সুভার (সম্ভেত—সৌম্য), বাহায়াশি পৌরাণিক কাব্যাদি সাহিত্যে, এই জাতির বিবরণ আছে, পূর্ব

বিবরণ—সোভিনী ভয়ে উচ্ছলরূপে চিহ্নিত রক্তিয়াছে।
 “বেশের গোপী ভিক্ পায়ে না।” বর্তমানে (সোভিনী-
 তর ২৪৪ পাঠ করুন।) দেখিতে পাই—আদাম অফলে
 এখন—হুমার ও আকা (আকাম্) নামে দুইটি প্রাচীন
 জনপদ বিস্তারিত রহিয়াছে,—এই বেশের সম্বন্ধে,
 ‘পেইটস্-আদাম’—নামক ইতিহাসে কিছু আছে (ই,এ,
 পেইটস্ হিলটরি অব্ আদাম, ১২০১) এবং কিছু তথ্য
 আছে—‘ডলটনস্ এথ্-নলজি অব্ বেংগল্’ নামক
 পুস্তকে, এবং জার্ণাল অব্ দি এশিয়াটিক্ সোসাইটি
 অব্ বেংগল, সংখ্যা ১, ১৮৫৫ অব্দ। হল সাহেবের
 মতে, হুমার-আকাদীয়াগণ অবশ্য ভারত হইতে দিয়া,—
 মেলোপটেমিয়ার উত্তর ও দক্ষিণ, মাক্‌তুবিয়
 নামেই, হুমার ও আকাড্ রাজ্য প্রভিষ্ঠা
 করিয়াছিল। চালদীয়াগণের প্রাচীন ইতিহাস-
 লেখক—রসোজিন, তাঁহার ইতিহাসে,—ভারতীয়
 সিদ্ধান্তবাসী কৃষ্ণকার গণ-ভাতিদিককে—হিন্দুগণের
 উপর দিয়া লইয়া গিয়া—চালদিয়ার পোড়া পতন করিয়া-
 ছেন। ব্যাবিলনের, ইজিপ্টের ইতিহাসে—ভারতীয়
 কালা ভাতিদের সম্বন্ধে কিছু আছে। এককল নব-
 আবিষ্কৃত মতবাদ, এখনও বেতকায ইতিহাসিকগণ
 স্বীকার করিতে পারেন নাই। ঐতিহাসিক হল, স্বীকার
 করিয়াছেন, হুমার-আকাবীরা, ‘ম-সেমোটিক্,’ স্মৃত্যায়
 বাইবেল-উক্ত সেমোটিক ভাতি নয়। বর্তমান কালের
 নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞার বিশেষ আলোচনা এবং আবিষ্কার যেহু
 বলা বাইতে পারে যে, হিমালয়ের দক্ষিণ—বর্তমান
 ভারত-সীমায় আদি নব-মিথুনেরও অকৃত্যদয়
 হইয়াছে।

কোল-ভাতি সম্বন্ধে প্রাথমিক অহুলদান

কার্ণো এতী হইবার কারণ এখানে কিছু বলা
 আবশ্যক,—ইতিহাস (প্রাচীণতর) এবং ভারতীয়
 প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে যেন একটি তথ্য লুপ্তাশ্রিত

রহিয়াছে দেখা যায়। বর্তমান যুগে-বিশ্বের
 ঐতিহাসিকগণ, যখন ‘কোলোয়ান’ নামক গণ-ভাতি-
 ভারতে আনয়ন করিয়া, অভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন,
 তখন বুদ্ধিতে পারা বাইতেছে যে, ভারতীয় গণ-ভাতি
 ‘কোল’দিসের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া তাহার।
 ইংলিসকে, আত্ম-ভাতি বলিয়া অহুলদান করিয়াছেন,
 এবং বাইবেলের মত সমর্থন করিয়া ভারতের বহির্ভাগ
 (পশ্চিম) হইতে ভারত-প্রবেশের পথ আরম্ভ
 করিয়াছেন। স্মৃত্যায় কোল-ভাতি সম্বন্ধে অহুলদান
 প্রথমেই আরম্ভ করা আবশ্যক। সম্ভবতঃ, ইহাদের
 ব্যং-পরাশ্রয়গত প্রতিমধ্যে ইহাদের প্রাথমিক
 অবস্থার কিছু পরিচয় পাওয়া বাইতে পারে—এই
 আশা করিয়া অহুলদান আরম্ভ করি। প্রথম বাধা
 ইহাদের কথিত-ভাষা, বর্তমান-প্রচলিত কোন প্রকারের
 বাংলা ভাষা নহে। এই বাধা দূর করিতে প্রথম
 অবলম্বন হইল—‘গ্রামার অব্ দি কোল ল্যাংগুয়েজ,’
 কিন্তু ইহাতে বিশেষ কিছু ফল কলি না। দুই এক
 বৎসরের মধ্যে এ বাধা অতিক্রম করিয়া, ছোটনাগপুরের
 কোল-ভাতির তথ্য সংগ্রহ কালে, আসানসোল অফলে
 করণা খাদের মহিমায় কোলগণের পরিচয়-প্রাপ্তির
 সুযোগ উপস্থিত হইল। ইংরাজ নিরক্ষর ভাতি (খুটান
 কোল বাদে), তন্মাত্র ইহাদের মধ্যে বয়োবৃদ্ধগণের ভাতি-
 প্রতিজ্ঞান বিলম্বিত রহিয়াছে। বুক্‌লিাম, কোলভাতি
 পাণ্ডালা ভাতির অল্পতম শাখা-বিশেষ। স্মৃত্যায়
 কোল সম্বন্ধে অহুলদান দ্রুত রাখিয়া, পাণ্ডালা (সংমতাল
 বা হুড় ভাতি) ভাতির তথ্য সংগ্রহে ব্যাপৃত হইলাম।
 প্রথম বাধা—হুড় ভাষার অনতিজ্ঞতা। এক বৎসরে
 এ বাধা দূর হইল। সুযোগ-ক্রমে বুদ্ধিমান জনৈক
 সমেতাল মাকির (মণ্ডলবৎ) সহিত বন্ধু হইল।
 সেই ব্যক্তির নাম ‘মাতাল-মাকি’, দেখিতে ভীমাকৃতি।
 তিনিই হইলেন আমার সখা—গুরু। তাঁহার সহযোগে,
 পাণ্ডালা (হুড়) ভাতির প্রতি সম্বন্ধে পরিচয়-প্রাপ্তি
 ঘটিল। তন্মাত্র এক ব্যক্তির কথিত প্রতি উপর
 পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া ভাতি-তথ্য সংগ্রহ করা উচিত

নচে বিবেচনায়, উদায়নই সাহায্যে, বিভিন্ন পরীবারী
কয়েকজন হু-জাতীয় মওলের (মাকির) সহিত অগাধ
পরিচয় করিলাম। আমার বন্ধ যে সকল প্রতি
বলিয়াছেন, সেগুলির সত্যতার পরিচয় বিভিন্ন ব্যক্তির
কথিত বিবরণের সহিত মিলাইয়া দেখি, সকল
প্রতিই এক।

শাওতাল বা সাতাল—

এ জাতির প্রকৃত নাম নয়, ইহাদের জাতীয় উপাধি
'হু'। হু অর্থে যেহী-মানব—অর্থাৎ 'আদি-মানব'।
ইহারা সমেত-পেশবরাণী আদি-জাতি। সমেত ক্ষেত্রের
বর্তমান নাম,—পরেণনাব পাছাফ শ্রেণী। হু অর্থে
মানুষ। মনুষ্য জাতিকে ইহারা বলে—মাহুতী। হু
জাতিরা, হিন্দুধর্মকে বলে—সেকে। নিয় শ্রেণীর হিন্দু-
ধর্মকে বলে—ডেকে। মুসলমানকে বলে—তুহুৎ।
ইরাককে বলে—কেটে। গ্রাম্যকে বলে—বাব্‌ফে'।

হু-হাফুতোর

বসিয়া ইহাদের প্রতিশ্রুতি আছে, প্রতির ভাষাকে
ইহারা বলে,—'পারলী' (হু-পারলী); যে-ভাষার
ইহারা পরস্পর কথা-বার্তা চালায়, ইহার নাম—হু-বু-
(বু-ভাষা), বোটের উপর শাওতালী ভাষার নাম—
'হু-বু-ভাষা'।

প্রথম-প্রতিভে

উক্ত হইয়াছে, কি একবারে কুনি (ধাতু)
প্রকটিত হইল। আদি মন-মিথুনের অভিযান্ত্রিক কথা,
এই প্রতিভাই পাওয়া যায়। পৃথিবী-সৃষ্টির কথা
ইহারা বলে না। ইহারা বলে—প্রথমে যে ভূখণ্ডে
তাহাদের সর্গাদি পিতা-মাতা কল্পনাত করিয়াছিলেন,
স্বাধা তাহারা বাস করিত বা করে, সেই ভূখণ্ডকেই
ইহারা 'ধাতু' (ধর্মী) বলিয়া থাকে।

প্রথম মূল-প্রতি (হু-প্রতি)

"সোদার সানাম্‌ এখেৎ‌ ঘাঃ পি তাঁহেকান।। সেরনা
বন্‌ 'মারান-বু' চোফে হুতান্‌তে চিলট আঃ,—
খাঁড়গো সোদার। আঃ ঘাঃ চেতান্‌রে, সেনেবু-মাটি
বেলু কাতে এ হুতান্‌ এদার। উনি আ বারেআ

মাইগাখন, ঠান-ঠানিস্‌ চ্যাফে—কিন্‌ জানাম্‌ এনা।
মারান-বু'চা হুতান্‌তে, ওনা সেনেবু-মাটি, পয়রাপি-
বাধা ধারে এনা। ওনা পয়রাপি-বাধা-তাকাম্‌ চেতান্‌রে,
উনকিন্‌ বারেআ-চ্যাফে কিন্‌ বেলে কেশ। উন-
ধাতু বোনাও মাটিং মারান-বু', আডি আডি
রান্‌কত, নেতাং কো আ। তান্‌রান্‌ রান্‌,
কাটুকোম রান্‌, ইচাঃ রান্‌, গোংগা রান্‌, এদান্‌
বাকো দাফে আঃ। বেন্‌খান্‌ হুতান্‌ আঃ কেঁচু
রান্‌, কিন্‌ দাফে আঃ। কেঁচু রান্‌ পয়রাপি-বাধা-
তান্‌ তিৎরি তিৎরিতে বন্থ কাতে হাস। এ হুতান্‌
রান্‌কত কেশ। আঃ হুতান্‌ বেধা চেতান্‌রে ওনা
হাসাকর আতাং কেশ। নোংকাতে ধাতু বোনাও
এনা। ওনা বারেআ বেলে বন্‌—'পিলু-হাফা'—
আঃ—'পিলু বুধি' কিন্‌ জানাম্‌ এনা। হকিন্‌গি
সানাম্‌ হুতান্‌ আদি এখা-আখা। চাবা এনা।

প্রথম প্রতিভ (হুতান্‌) ব্যাখ্যান—

সৃষ্টির প্রথমে—আদিতে (সোদার) সদস্য কেবল
কল্পনায় ছিল। স্বর্গ হইতে (সেরমা বন্‌) সেন্ট-প্রভু—
(ধর্ম-গুরু) বা আদি-সেব, রেপনী হুতা অবলম্বিত
সোদার সিংহাসনে বসিয়া নামিয়া আসেন, এবং
কলের উপর সিংহাসন স্থাপন করেন। তাহার সেহের
ছইটি বয়লা (মশা) হইতে, রান্‌হংস এবং রান্‌হংসী
পক্ষী একট লাভ করে। মারান বুকর (আদি-প্রভু)
অহুজার, স্বর্গ-সিংহাসন পদ-কলের কাফে (পায়ে)
পরিবর্তিত হইয়াছিল। ঐ পদ-পাতার উপরে
পানী—ছইটি ডিম পাড়ে। এই কালে, আখার—হান
(ধর্মী) নির্মাণের জন্য, অনেক অনেক (আডি
আডি) রাজাকে বলিয়াছিলেন। হুমীর (তান্‌রান্‌)
-রান্‌, কাকড়া-রান্‌, গাবু-রান্‌, চিংগী-রান্‌ (ইচাঃ)
ইত্যাদি কেহ পারে নাই; কিন্তু কল্প-রান্‌ (হু)
এবং কেঁচো (কেঁচু, গা—কিন্‌লু) রান্‌, এই দুইজন
পারিয়াছিল। কেঁচু-রান্‌ পদের নাম (মশা) যথা
দিয়া, মাটি (হাস) তুলিয়াছিল, এবং কাছিন-রান্‌,
তাব সেহে—পিত্তের উপরে (সোতা চেতান্‌) মাটি

ধারণ করিয়াছিল। এইরূপে কৃত্যাপ নিষিদ্ধ হয়।
 এই ছুটি ডিম হইতে,—পিলু হাড়ায় ও পিলু দুই
 জন্মলাভ করেন। ইগারাই সকল মানুষের (হুজুরন)
 আদি (আদিম) শিতা-মাতা। সমাপ্ত।

হুজুরিতে পাওয়া গেল, কি প্রকারে আদি-প্রভু
 পরিভ্রমী স্বজন করিয়াছিলেন। এই কল্পনা কেবল
 সম্ভাব্য পরিকল্পনা নহে,—সমগ্র বংশের বাঙালী
 জাতিরও ধারণা। মালদহে গভীরা উৎসবে, ‘দিব-গড়া’
 বন্দনাতে দেখা যায়—

(১)

“না ছিল জগতল মেবের মণ্ডল।
 কোনরূপে ছিল ধন্য হয়ে শূভাকার।
 কাকড়াতে পাঠানেন সুরিকার তরে।

* * *

কুংঘের পৃষ্ঠে পৃথিবী করিল স্বজন।
 কহন ত শুকসোঁসাই সরস্বতীর বরে।
 পৃথিবীর জন্ম-কথা কহি সভার ভিতরে।”

—আশ্রের গভীরা, ১২ পৃঃ।

২৪-বন্দনা।

সৃষ্টি

বাংলালীর আদি সৃষ্টি-কল্পনা—

“জলময় সংসার চিহ্নিত ভগবান।
 কি মতে ছিলে তে প্রভু হইয়া শূভাকার।

* * *

সেই ভিন্ন হইম হুইখান।
 কি মতে পৃথিবী স্বজন করিল ভগবান।”
 —গভীরা, ২৪ পৃঃ।

“মাটি মাটি মাটি স্বজন করিল কে।
 ত্রুকা বিহু মহেশ্বর তিনে মাটি স্বজন করিল বে।”
 —ঐ।

প্রাচীন বাঙালীর নিরঞ্জন—

“ধবল খাটে ধবল পাটে ধবল সিংহাসন।
 ধবল খাটে বসে আছেন ধর্ম-নিরঞ্জন।”
 —ঐ, ২৪ পৃঃ।

“জলেতে আসন সোঁসাই জলেতে বৈসন।

জন ভর করিলা ভাসেন নিরঞ্জন।”

—ঐ, ১৪ পৃঃ।

আদি-প্রভুর সেহ-মলা সযকে, বাঙালীর শূভপূরণে

দেখা যায়—

“ভিলেক পরমাণ মলা-নিশ নাগায়ণ।”

—হুঃ পৃঃ, ১০৭।

“ছিন্নির সাজন পরতু কৈল হেনমতে।”

—ঐ, ১০৮।

ধর্মের আসন পদ্মপুষ্পের সৃষ্টি—

“সদুখে রচিল সোঁসাই পদ্মফুল।

তাহাতে বসিলা সোঁসাই জপে আত্ম মূল।”

—গভীরা, ৩৬ পৃঃ।

“আপনে ধর্ম সোঁসাই কুশ ভপ ফৈল।

কুংঘের উপরে প্রিথিবি রাখিল।”

—গভীরা, ১৭ পৃঃ।

শূভ-পূরণে—

“পদ্মহস্ত বিম্বা পরতু বোলে থির থির।

পদ্মহস্তে জনমিল কে কুংঘের সতীর।”

—৭২।

হুজুরিতে পাওয়া দিরাহে, ধর্ম-গুরু (মারাত বুক)

সেহ হইতে মলা দারা হংস-হংসীর জন্ম হয় এবং
 আদি-প্রভু, তাহাদের অবস্থান জড়ই বৈশ, হুজুরিতে
 সিংহাসনটি—এককাকড় পদ্মমাছে পরিবস্তিত করেন।
 এই ব্যাপারটি,—বাংলার গভীরা পূজা-উৎসবেও বীত
 হইয়া থাকে।—“আমি থাকে জন্ম দিব তাকে দিই
 চাই।”—গভীরা, ১৮ পৃঃ। এ পর্যন্ত বাহা কিছু লিখিত
 হইল,—এ সকল ব্যাপার প্রাচীন বাংলার। হুজুরিতে
 আদি-প্রভু হংস-হংসী সৃষ্টি করিয়া, তাহাদের
 আশ্রয়ের জন্ত পরিভ্রমী নিম্মাণ করিয়াছিলেন।

“বহা-প্রভু—আপনি সিরজিল পরতু আপনার কাখা,—
 “তৎপরে গায়ের মলা হইতে বহুধরীর কল বিকাশ হইল। এই
 প্রকার উপাখ্যান—যাবিক মতের চণ্ডী, বিম্বহরীর গান, ও গভীরা
 বন্দনা মধ্যে বীত হয়।”—আশ্রের গভীরা, ২৪৬ পৃঃ।

আকাশে ও ধরায়

ত্রিপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

চিত্ত ধায়, নিভা ছুটে যায় আকাশের মৌন নীপসিমা,
দূর দূরান্তের ঐ স্বপ্নতরা দিক্‌চক্র পানে,
সারি সারি তরুশ্রেণী বেধা বিশেষে যায়

বীলে আর ধূসর কালোয়,
সেইখানে এ ভ্রমর করে আনানোনা।

গাঁতের আঁধারে হবে বিশাল প্রান্তর

খোঁয়ার চারদিক দিয়ে ঢেঁক

ধূসরায় করে আয়োজন,

মুসুর পানীর মুকে ভসে স্বপ্ন আলো।

তরুশাখা-ছায়া ভেদি', ভেদি' ধূসরতা—

প্রান্তর-বদ্বর ভালে বেন এক চন্দন-ভিলক—

সে আঁধারে, সেই দীপ্ত ভিলকের মোহে

চলে চলে নেড়ে যায় এ চিত্ত আহ্বার।

মধ্যাহ্নের রৌদ্রদীপ্ত রক্ত-শোভার

চিত্ত ধায় অনিবার।

বরষার আকাশের ছিটখীন জঘাট সে মেঘ-আবরণ,

তাও ভেদি' ব্যস্তবার চিত্ত চাহে হেরিবারে

এই বিশ্বজীবনের কল্পোলিত উৎস সে উদ্ভাস।

পশ্চিম আকাশে পুন' সূর্য্যোত্তর স্বর্ণ-পারাবারে

হান করে চিত্ত ব্যস্তবার।

পানী হ'য়ে মাঝি' লয় প্রভাত-স্বর্গের কাণ জানায় জানায়।

এমনি যে নিশিদিন অবিরাম গমন আহার

অসীমের অন্তর আসোড়ি'।

তু তু কুণ্ডি নাই,

মন প্রাণ তু বুদ্ধিত

জানি না কি ভগ্ন পিপাসার!

মর্ত্যে পুন' ফিরে আসি।

বিছাইয়া দিই এ হিঙ্গারে

হস্তামল সুকোমল কৃৎ-শব্দ'পরে।

স্বপন-সব্বল পাতা-ভরা তরুণের শাখায় শাখায়

চিত্ত ওঠে জড়ারে জড়ারে।

শৈবালে ও হেলা নাথে আহত যে স্বপ্না কুত্র

ভিনীত জল,

তারি স্বপ্ন স্বপ্ন ধারায় প্রাণ যোর যার

অতি দীর্ঘ এঁকে বেঁকে শিশুর সন্ধান।

কৃৎ-পানী-অননীত আভিনায় আভিনায় যোরে এই হিৎসা;

ফেরে বেধা নত নেড়ে চুম্বা বেন জননী শিশুরে;

ফেরে বেধা লাজনয়া মরাল-গমনা,

কপালে সিন্দুর-বিন্দু

রক্তবাসে সৌর রক্ত স্রষ্টারে ঢেকে

আবেক স্তম্ভনে আর লাল পাড়ে মুখপত্র ঘিরে,

বাঙ্গালীর অতি রিদ্ধা বধু

প্রিয় নাথে স্বপ্ন ভাষে করে আদান।

চিত্ত ফেরে শিশু বেধা করিছে নতুন

আপনার অহেতুক প্রাণের উল্লাসে,

অবোধা ভাষায় তার প্রকারি' উল্লাস।

চিত্ত ফেরে বদ্ধ বেধা রোগণ্যা-পারিত বন্ধুরে

নিভ্রাহীন হয়ে ক্রমে সেবিছে কটোর।

চিত্ত ফেরে অবোধা শিশুটি বেধা পিতার হাসনে

ভীত-ভ্রম ছুটে এসে লুকাইছে অননীর অকলের কোণে।

হে ধরনী, এই যোর স্থান—

এই যোর প্রিয় প্রিয়তর প্রিয়তম স্নেহের আবাস।

হে মাটি, হে হৃৎ-স্নেহে নিভা ঘোলায়িতা

ক্রন্দনে ধ্বংস কন্তু, আনন্ডে কন্তু উদ্ভাসিতা,

ভূমি যোর ভূমি যোর পরম আশ্রয়

চিরদিনকার আর চিরকামনার।

দূত্রে দূত্রে প্রান্তরের উদ্যতে, আকাশে

যোরে বটে চিত্ত-পানী,

তবু তার আভাসের নীড় আর পরম ধরণ

এই মাটি, এই ধরা, এই কৃৎ-দ্বি-ভরা বেন।

হে জননী পৃথিবী মৃগয়ী,
আমারে তুল না তুমি।
আমি নাহি তুলিব তোমার।
সীমানে তোমার বক্ষে করি বিচরণ,
মরণে তোমারি গর্ভে অনন্ত পরম
বিও দিও হৃৎ হৃৎ কোটা হৃৎ ধরি'।
অসীমের লগ্নান মাহুৎ—
জানি তাহা।
কিন্তু তব সীমার আগার,
মধুর মধুর অতি বেদনে ওরলে।
তুংব বাক্যে বৃষ্টি হেথা। হৃৎের বহন,
থোক লতি চিত্ত-বল,
প্রথমে পাই স্বপ্নের অমৃত-আনন্দ।

হৃৎময়ী, হৃৎময়ী, হে ধরা জননী,
তোমারে ছাড়িত নাহি চাই
মৃত্তে নহ, মৃত্তে নহ,
আকাশের নীলিমায় নহে—
আমার আবাস নহে নীল নভঃগল।
আমার আবাস এই মাটির ধরতি।
রে কবি, রে কিশু-চিত্ত,
রে উদ্ভাস আকাশ-বিশালী,
কিরে আর, কিরে আর, মাটির তবনে।
মাটাই জননী জোর,
মাটি জোর লতা বেগ, পরম আশ্রয়।

আলোকচিত্র-প্রতিযোগিতা নিয়মাবলী

প্রাকৃতিক দৃশ্য বাসে অঙ্ক ঘে-কোন
প্রকার ভাল ছবি যথা— আকৃতি (Portrait,
Subject study), খেলা, কোন বিশিষ্ট ঘটনা,
ভাল কারুকার্য বা ভাস্কর্য-শিল্প প্রকৃতি সকল
প্রকার চিত্রই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দেওয়া চলিবে।

২। ছবি কোয়ার্টার স্টেটের ছোট বা ফুল
স্টেটের বড় হইলে চলিবে না।

৩। বিচারের সময় ছবি তুলিবার কৌশল,
'প্রিন্ট'র উৎকর্ষ এবং সাধারণ সৌন্দর্যের দিকে
লক্ষ্য রাখা হইবে।

৪। 'মাউন্ট' করিয়া অথবা মোটা বোর্ডের
মধ্যে ভরিয়া ছবি পাঠাইতে হইবে।

৫। এই প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত ভাল ছবি
ছাপিবার সম্পূর্ণ অধিকার "উদয়ন"-সম্পাদকের
থাকিবে।

৬। সঙ্গে যথোচিত ডাকটিকিট পাঠাইলে
অমনোনীত ছবি ফেরত দেওয়া হইবে।

৭। ডাকে ছবি পাঠাইবার সময় ভাল
করিয়া মোটা বোর্ড দিয়া প্যাক করিয়া
পাঠাইবেন। কভারের উপরে "আলোক-চিত্র
প্রতিযোগিতা" লিখিয়া দিবেন।

৮। প্রেরিত চিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতার
কুপন পাঠাইতে তুলিবেন না। কুপনের উপরে
নিজের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

৯। প্রেরিত কোনো অঙ্ক পুরস্কার পাইয়া
থাকিলে সে-কথার উল্লেখ করা আবশ্যিক।

পুরস্কার বিষয়ে সম্পাদকের বিচারই
চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে।

১১। আগামী ১৫ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে ছবি
উদয়ন-কাঞ্চালয়ে পৌছান দরকার।

১ম	পুরস্কার	৩০ টাকা
২য়	"	২০ "
৩য়	"	১৫ "
ইহা ভিন্ন আরও ৫ খানি ভাল ছবির		
জন্য Consolation পুরস্কার দেওয়া হইবে।		

পদব্রজে ভারতবর্ষ

ঐহুর্গাপদ ভট্টাচার্য্য

প্রথম দায়

মাগুয়ের পায়ে-চলা এই যে অনন্ত পথ, এর ওপর দিয়েই কত পবিত্র সময়কাল হ'রে উদ্ভাসের পথচিহ্ন রেখে গেছেন। এই সব পথচিহ্ন অমূল্যের ক'রে ভাটপাড়া "হিরিট-ক্লাব" থেকে বছর চ'য়েক আগে কনকনে এক শীতের ভোরে দু'টা মাত্র সন্ধ্যার সময় চোখ, মগ্নিত মূখ ও উদ্বেগ-মৌন বিদ্য-বাণী ভাষাক্রান্ত হৃদয়ে বহন ক'রে যে-দিন অনিশ্চিত যাত্রার যাত্রী হয়েছিলেন—সে-দিন এ আশা অল্পই ছিল যে, সঙ্ঘটিত পর্যটন শেষ ক'রে সন্ধ্যার আবার ক্ষণ-পর্যায়িত কিয়তে পার্শ্ব, বা অন্যাকীর্ণ অভ্যর্থনা-সভার উদ্দেশ্য-পূর্ত আশীর্ষকনে মাত হ'য়ে সেই ভ্রমণের দিন-লিপি সাধারণতঃ উপহার দেবার সুযোগ পাবে।

"হিরিট-ক্লাব" নামে কোনো বনেদী ভবনবৃত্তের আচ্ছাদনা থাকলেও স্থানীয় অধিবাসী ঐকান্তিক অল্পপ্রকাশ হালধার মহাপথকে কেন্দ্র ক'রে অনবচ্ছিন্ন ভ্রমণ-বন-শিপায়ুতে মিলে আমর। একটা দলের সৃষ্টি করেছিলেন; আর, সেকল থেকে সভ্যত্বের লক্ষ-বাক্য। এই প্রথম নয়। আরও কয়েকবার বর্ডমান, কাশী, কিম্বল হ'তে কুমারিকা ও পঞ্জাবের জলধর কূরে আসা এই দলের মধ্যে সত্তর হয়েছিল—কুর্বে সে বাগানভ্যন্ত ছিল ফিচক্কাবান-বোম্বে, সন্ধ্যাবেলা এবং পক্ষেটে পাথের রেখে। এবারকার প্রত্যাবের নৃত্যন্ব ছিল এই যে, বান-বাহনের পরমাপন্ন না হ'য়ে, সকল মাটি মর্দিত্রে ঢোল বাজ প্রবেশের সঙ্গে-সঙ্গে পাথের বোরাক পথেই সংগ্রহ ক'রে চলিত হবে। স্রব জাবের সেক্রেটারী "হুঁচাকার হুঁচাকার মাইল"ের অল্পতম পবিত্র ঐকান্তিক ব্রহ্মনাথ ভট্টাচার্য্য একটা "রিজার্ভ কাও" "প্রিজার্ভ" করার জ্যেষ্ঠ থাকবেন।

এবারও কথা ছিল ভ্রমণকালে একসঙ্গে বেকবার, এবং আয়োজনও হয়েছিল উদ্ভবোণী; কিন্তু যাত্রার পূর্বে অপর সন্ধ্যারের সামনে "বাড়ীর অনন্ত" বাধা হ'য়ে বাড়াল। এ ঘটনার মন মূড়ে পড়লেও নিজে পেছনে পার্শ্বম না,—কারণ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির কাছে দলের অগ্রণী হ'য়ে সন্ধ্যার ক'রে বলাবোধ্য অল্পমতি-পত্রাদি সংগ্রহের পর মত বদলাবার স্বেচ্ছাচ অতিক্রম করা আমার পক্ষে সম্ভব হ'ল না।



ঐহুর্গাপদ ভট্টাচার্য্য

"ভারত-ভ্রমণ" প্রত্যাবের প্রাথমিক সাহায্য-কল্পে গ্রামের অধিকারকের আশ্রয়-সংবলিত এক নিবেদন-পত্র প্রচারিত হয়; ফলে ৪২টা টাকা টাঙ্গা সংগৃহীত হয়েছিল। ঐ পুঁজিতেই তিনি জনের উপযোগী পোষাক ও আত্মবিক উপকরণ আহুত হয়, কিন্তু কাছে লাগে শুধু নিমেষকালিই। তারাপদ ও গিরিশ

তাদের সঙ্গ বন্ধার বাণ্ডে পারছিল না, তা আগেই বলেছি।

১৯১০ সালের ৩রা ডিসেম্বর। পেশবারি।
ভাটপাড়া চট্টকলেব্র প্রথম বাঁশী নিলাকাতর প্রমিকদের
উদ্দেশে জানাচ্ছে—

“উঠে পড় সব, জাগা কমনব
আম শুট গুট কাজে;
আর ঘুম নয়, চরণে সমর—
হাঝিরার বাঁশী বাজে।”

ঐ কলের বাঁশীর নিমন্ত্রণ এতকাল আমাকেও নিয়মিত
ক’রে এসেছে—আম কিছু কালে বাজছিল কবি-বীণার
আমন্ত্রণ-বাণী—

“চের—উষার আলোক জাগে তুস্তাঝ।

উদয়-অচল-পথে,

কনক-কিরীট তরুণ তপন উঠিছে অরণ-রথে;—”

তু কবির বিধিই নয়, “খনা”র বিধানও নাকি
ঐ সময়ে হাজা করার কথা আছে। কেননা,
“মঙ্গলের উষা”ও সেই মূল্যের “বৃথ” চরণ-তাপনার
উপক্রম ক’রেছিলেন। তখন খোয়াণ করিনি, কিছু
পরে পণ্ডিতদের মুখে শুনেছি—উত্তরকালে বাঘের
পেটে যেতে যেতেও যে ঘাইনি, বা অরণ্য-পথে
বস্ত্র হস্তীর গুঁড় থেকেও যে পরিত্রাণ পেয়েছি, তা’ তু
অজ্ঞাতদারেও “খনা”কে মস্ত করার ক্ষেত্রে। “অজ্ঞাত-
দারে” বশিষ্ট এই কারণে যে, প্রথমে হাজার দিন স্থির
হয়েছিল ৩০শে নভেম্বর; কিন্তু এক নতুন “লাইট-পোস্টার”
আলোহীন ধানের “কাটা-ডারে” গানের আশ্রয় বিধম
অধম হওয়ার দিনটিকে কিছু পেছিয়েই বিতে হয়।
হাত্মাদিনেও যে সেক্ষত নিরামর হয়েছিল তা নয়;
তু কোন এক পরম শুভার্থীর “নিবেধ”ই যে সেদিন
চরণে আঘাত হ’য়ে বেছে, আর “খনা”র বিবিতে মুক্তি
দিয়ে দেল, এমন একটা ধারণা করাও অসম্ভব নয়।

একটু পরেই নিম্পক্ষে ঘরে এসে গাড়া’ল দুটী
বালক—রোহপ্রাণ হালদার ও সীতারাম পাণ্ডে—পূর্ণ
সজ্জার বায়োলজিস্টী আবারে বিদায় দিতে। এসেই

হাতে ঘরের চাবিটা ‘মেক-না’কে দেবার তার চাপিতে
রাজপথে এসে যখন গাড়া’লুম, তখন কলের অভিব্যে
গোক-লোচল অয়ে অয়ে হুক হুকে।

১৯১৫ পাউণ্ড ওজনের দেহের ওপর ১০ পাউণ্ড
ওজনের বোকা চাপিয়ে রওনা হ’লুম কলকাতার
দিকে। অঘোর মথো রইল, লাইসেন্স-করা ছোরা ও
বর্শা; আর বোকার আধার “হোল্ড-অলোর” মখে;
হাক্-প্যাণ্ট, হাক্-শাট, টর্জ-লাইট, ছুরি, কবল, চামর,
জামা-কাপড়, ছোট ব্যাগ-বন্দী রোড-ম্যান, স্ট্রিকিকট-
গুলো, টানোর খাড়া, খারমোজাব, এসাধনের
প্রবাদি এবং প্রাথমিক চিকিৎসার কিছু কিছু উপকরণ।

কলকাতা পর্যন্ত চেনা-পথ, বাতাসাত অনেক বারই
হয়েছে—তু আশ্রয়-কাটা খানি-পারে অনভ্যাসের বোকা
ঘড়ে ক’রে চলতে চলতে ক্রমেই অবসরতা অস্বস্ত
হ’তে লাগল। নিরিবিধি দেখে বড়মহে কিছু মেয়ে
নেওয়া দেল, এবং আগড়া’লার সাগর দত্তের বাসানে
আধ-বন্দীটাকু বিশ্রাম করারও দরকার হ’ল।

বিশ্রামের কলে পা বন্দ বেকে—তু সমস্ত নজি
দিয়ে তাদের বাড়ী ক’রে লজ্জার খাতিরের আবার
বোকাটাকে ঘড়ে তুললুম এবং পুরো মনে চলতে আরম্ভ
কল্লুম।

বেলা একটার টালার পুল পার হ’য়ে বাগবাগানের
ডাক্তার ঐকান্তিক কল্লোপাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে
যখন উপস্থিত হ’লুম, তখন তাঁর মান হ’য়ে দিয়েছে।
বাইরের ঘরে বোকা নামিয়ে হাক্ ছেড়ে ঝেঁগলুম।

ডাক্তার-বাবু আমাদের গ্রামের লোক, আশ্চর্য,
সর্বজনপ্রিয়,—তু স্ত্রী-কৃত্যার প্রাণনা দত্তও এই
অদম্যে মনের অভিজ্ঞতার প্রকাশ করতে দারুণ লজ্জা
বোধ হ’তে লাগল। আরও মনে হ’তে লাগল—প্রথম
মিনেই যখন এত কষ্ট হচ্ছে, তখন ভারত-পরিভ্রমণ
আমার দ্বারা অসম্ভব।

ডাক্তার-বাবুর ছেলে দুরারির মতো কথোপকথনের
ছলে কলকাল স্রাতি দূর করার পর, এক অবকাশে,
তার অজ্ঞাতে পাড়ি নিলুম—অতিকটে—হরিচকী

বাসান। এখানে আমার ভগিনীপতি ঐচ্ছিক নারায়ণ-
চন্দ্র ভট্টাচার্যের বাসায় এসে মান ও জলযোগ হ'ল;
ভগিনী তখন কাশিতে রোগশয্যায়। মাও ছিলেন
ভীরু কাছে। লক্ষ্যায় ভগিনীপতি ও ভীরু মাঝারা
এলেন। ব'ল্‌লুম, হেঁটে এসে একটু স্নান; বিশেষ
কোন কথা তখন ভাবলুম না। বা' কিছু কথা হ'ল
পরে শুধু ভগিনীপতির সঙ্গে। রাতে আহার সেরে একটা
ঘুম; বাসু, পরদিন বেলা ৮টা! ভাটপাড়ার থেকে
কলকাতা এই ২০ মাইলই প্রথম দিনের যুবক।

ভগিনীপতি ডাক্তার-মাহুৎ—কাছেই পরীরের
বাধা ধাবার গুহু দিনের হোমিওপ্যাথি। কতকটা
উপকার হ'ল; কিন্তু পায়ের তপাল বা অবস্থা, তাকে
খালি পায়ে মাটি মাজান দায় হ'য়ে উঠল।

বিকালে সেদুখ ঠনুঠনে। এক মোড়া খড়পা
কিনে, পানের এক নুতাকে দিয়ে বেশ ক'রে পেরেক
লাগিয়ে নিলুম। পায়ে দিয়ে চলতে একটু আরামই
হ'ল।

মাঘ শুক্লাবর এই তিসের। সকলেই কাছে সেল
বেলা ১০টার মধ্যে; আমিও আহারাণি সেরে
হুসোদের প্রতীক্ষায় রইলুম। যখন দেখা পেল বাধা
দিতে আর কেউ নেই, তখন বোকা কমাবার কাদে মন
দিলুম। পরলুম কাপড়, জামা; বোখার মধ্যে রইল—
কমল, চানর, ছুরি, টুফ-সাইট, পট্ট, পরনের মোজা,
পান্‌ছা, নোট-বই, ছোট ব্যাগ, হুপি ও ব্যারমোজা।
বোঝাও হ'ল অনেক হালকা। বাকী অস্ত্রাধরগুলো
বাসায় রেখে ও একখানা চিঠিতে গুলো বাকীতে
পাঠাবার অঙ্গুরোধ জানিয়ে বোঝাটা কাখে জুলিয়ে
বেরিয়ে পড়া সেল মেটেবুক্‌য়ের দিকে। পথে
একজন মিজাপা করলেন, “হকির ম্যাচ বুঝি?”

কলকাতার অন্যকীর্ণ পথে কেন্দ্র একটা লক্ষ্য
বোধ হ'তে লাগল—যেন কত অপরোধী; কোন প্রকারে
নহর পার হ'তে পাবলি বাঁচি! এই ভাবে, চৌরঙ্গী
থেকে ভবানীপুর হ'য়ে মেটেবুক্‌য়ের পথ ধরলুম।
নবাবের বাড়ীর দার দিয়ে, কিং-জর্জের ভবন পার

দিয়ে পঞ্চাজীরে পৌঁছে প্রাণটা যেন হাল ছেড়ে বাঁচল।
এক জানা ভাড়ার নৌকার উঠলুম রাঙ্গাশের খাট
লক্ষ্য ক'রে। বাতীও ছিল অনেক। ভীরে পৌঁছে
বি-এন রেলের পথ ধরলুম। পাড়ার ভিতর দিয়ে যেতে
দেখা হ'ল একজন পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে, ভীর
বাড়ীর দরজায়; নাম ঐচ্ছিক বটীন্দ্রনাথ বসু, কাছ
করতেন ভাটপাড়ার চট্টকলে। ভীর বাড়ীতে
বৈকালিক চা পান করা সেল; আর জানা সেল যে,
বালেশ্বরের সাব-ডিসপেন্সাল ম্যাজিষ্ট্রেট ঐচ্ছিক জ্ঞানচন্দ্র
এক মহাপুর ভীর ভগিনীপতি। উল্লেখের পথ কেনে
নিচে এখন থেকে বিদায় নিলুম, এবং শাকরেলের
শ্রেনের কাছে রেল-লাইন পেরিয়ে লাইনের পাশে-
পাশেই যেতে পথ পাওয়া সেল। দ্বিগুণে পেরেছিল খুব,
পথে ভাদ্রার তাবনার জাল খাওয়া হয়নি; পরীরটাও
অবশ্য, তার আবার বড়পার কোথা। এক “চা ও
খাবারের দোকানে” হুটে রসোয়্যা ও চা খেয়ে পথ
চলতে চলতে কতকটা আরাম বোধ হ'তে লাগল।
রাহি আটটার প্রায় ১৮ মাইল পথ চলার পরে এগুন
বাউড়িয়া শ্রেনে। অজানা পথ, তার বিদেহ;
অন্ধকার মেটো রাজ্যে জর্জেল বাঙ্গালী একলা; মনটায়
কেমন যেন একটু ভয় হ'তে লাগল। শ্রেনে আসতেই
সে তাবটা কেটেছিল বটে, কিন্তু পরীর প্রথম দিনের
অবস্থায় হাড়াল। সাহা মেহ পাকা কোড়ার মত;
পায়ের তপা হ'তে মাখার চুল পর্যন্ত ব্যথা। কাছেই
ছিল মোকান; খেগুন কিছু কিনে; পরলুম বাকী রইল
মাত্র দশটা।

শ্রেনে এসে কোথায় পোব তাই ভাবছি। একে
শ্রুতি, তার শ্রেনে কত রঙ-বেরঙের লোক; ভয়, পাছে
হারায় পথের সবল—সরকারী কাপড়গুলো।
বিনা সরকারী অহমোদনে এই ভাবে পথ চলা
যে কত বিপজ্জনক, তা বোধ হয় ভারতবাসী সকলেরই
বিশেষ ভাবে জানা আছে। শ্রেন-মাটারকে আবেদন
করায় তিনি তৃতীয় শ্রেণীর খোলা বারোকা
সেখালেন। গুণ হ'ল মনে; প্রথম দিনেই এই, না

জানি আরও কত লাহন। ভাগ্যে আছে। জাব্বার সময় কম, শরীর ভেঙ্গে পড়ছে, কাছেই কবল ও চামর বের করে, খড়পাটাকে বোঝায় রেখে মাথায় দিয়ে একটা বেঁকে কাৎ হ'লুম। মাস্ত রাতে একজন এসে জেকে বললেন, "জটো।" ভারী রাগ হ'ল; বললুম, "কারণ?"—উত্তর হ'ল, "আমি এখানে রোজ শুই।" সেধুদুম বেগের বাবু, রাতের কাম শেষ করে এইখানেই থাকেন; রাগ হ'লেও তা মনন করে বেক ছেড়ে দিয়ে শু'লুম মাটিতে মেয়ের গুপ্ত। জাব্বলুম, আমি তো কষ্ট করতেই বেরিয়েছি, তখন আর কেন এই একশো-আটপাখা-মরা কোরাণীর অন্টে বাস লাগি!

রাতের দুম কঁাকা জারমার যেমন হু, তেমনি হ'ল। পরদিন শনিবার ফর্সা হ'তেই উঠে, দুখ দুখে, বোঝা-বাঁধা শেষ করে বাজার বোনাড় করলুম। শরীরটা দুর্বল মনে হ'তে লাগল। পাশেই চায়ের মোকান, কিন্তু খরিদার কম; ঈডের ভোর, কাছেই তখনও মোকান খোলেনি। একটু অপেক্ষা করলুম, তা না খেয়ে আর পথ চলতে যেন মন সরছিল না। জেকে মোকানদারকে কুলে পানতুয়া ও চায়ের ব্যবস্থা করা গেল।

বেলা প্রায় ৮টার যেটো পথ-খ'রে উগুবুড়ের দিকে রওনা হ'লুম আশাবরীর হুয়ের সাথে। ছ'মাইল যেতে হবে; ঈডের শিশিরে তেজা অল্প অল্প ঘাসের গুপ্ত দিয়ে খড়পা-পাত্রে ঢলা দায় হ'রেই পড়তে লাগল; হুয়ের ও চলার ভাল কেটে বেতে লাগল। আশ্রায় ২০-৩০টা উগুবুড়ের পাকা রাস্তার প'ড়ে বাজারের একজন ডাক্তারকে খিজাসা করতে তিনি কালীবাড়ীর নাম করলেন ও জানালেন যে, থাকবার ও খাবার ব্যবস্থা হবে, যদি ঈদুল পরবন্ত হাড়া মহাপত্নের কাছে বাই। এ নাম পূর্ক-পরিচিত, কেননা স্বনামধন্য কনট্রাক্টর (contractor) জে, সি, বানানামীর অধীনে ঢাকুরী নিয়ে ছ'মাস এই উগুবুড়তে এক সময়ে থাকৃত হয়েছিল। সে

পরিচর গোশন ক'রে উপস্থিত পরিচরই আগ্র-প্রাণী হ'লুম। একবেলা খাবার ব্যবস্থা হওয়ায়, কালীবাড়ীর একটা ঘরে ত্রিনিনপত্র রেখে এবং গদ্যগ্রন্থ লেখে, বাকী দুটি পরদায় তা পান ক'রে লল শেষ করলুম।

মধ্যাহ্নে সাহারের পর একটু বিগ্রাম-বাসনা কখন তেতর থেকে মনটা অধিকার ক'রেছিল ঠিক বোঝা না গেলেও,—পথ চলতে পা পিছলে প'ড়ে খাবার ভরে, যখন চেতনা হ'ল, তখন চিন্তা হ'ল পরদায়। কার কাছে বাই? কি বলি? মাস্ত এই-টুকু পথ এসে, কেমন ক'রেই বা সাহায্য চাই? পান কি না জানি না, তবে কি ক'রে বলি যে, হেঁটে ভারত ভুঁতে বেরিয়েছি? নানা চিন্তায় মনের মৌরীয়া ছুটে উঠতে লাগল। অবশেষে ব্যাগ-বকী কামল সমেত, চকুলজ্জার মাথা খেয়ে প্র'এক জনের কাছে দিয়ে প্রার্থনা করলুম। এভাবে চাওয়া যে কী ভীষণ ও মর্মান্তিক—তা ভুক্তভোগী ছাড়া অশরে আর কি বুঝে!

কিছু বে-কামটা হ'বার, সেখা সেল তার উপায় ঠিক আপনা হ'তে কলের মতই হ'রে যায়। আমারও ছুটে গেল এক দরবী; বেশা আছে জুর বেভাবার; পুরী পর্যন্ত সাইকেলেও গেছেন; নাম ঈদুল নীলরতন চাটাম্বী, পরং-বাবুর অধীনস্থ ঢাকুরে। প্রমণ-পথে প্রথম বাইবের সাহায্য পাই এ'র কাছে, একটা টাকা; মনীগুলি পাত্র হ'বার ও সামান্য চা-পানের মত খরচ। পরে যিনি বা দিয়েছেন তার হিসাব ও দাতার নাম, হান, তারিখ টাদার খাতায় বখান্যানে লিপিবদ্ধ হয়ে গিয়েছে ভারতবর্ষ যে বিনা-পরদায় যোরা দায় তার সাক্ষ্য দিয়ে।

পছায় নীলরতন-বাবুর নৌকোত আর এক অজানা অপরিচিতের সাক্ষাৎ মিলল, ইনি উগুবুড়ে থানার সাব-ইন্সপেক্টর এবং ২০ পরদায় সেয়েখা বিতাসের ঈদুল শশিহরণ ডট্টাচার্য

মহাপরের পুর। রাতের বাগা বাগের হোটেলসেই একসঙ্গে শেব ক'রে, নিলস বাজার কথা উঠতে তিনি বললেন, "কেন একটা আশ্রয়স্থান ব্যবস্থা করেননি, যখন সবই পরিচিত রয়েছেন? যদি বেকসেন-ই, তবে ভাল ব্যবস্থা ক'রে বেকসেন উচিত ছিল।" কিন্তু তিনি জানতেন না যে, সে-স্টো লালবাঘার পুলিশ অফিসে আমার বন্ধু কবিরাজ হরকুমার গুপ্তের হাতুশের কাছে গিয়ে, সেখা ক'রে, সরকারী অস্বাভাবিক পত্রাধি দেখিয়েও সময়ের অভাববশতঃ কৃতকার্য হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তা'হাড়া সম্ভব-সিদ্ধি সম্বন্ধেও মনের সৌকর্য্য থাকায় স্টোর দোর পৌছাননি। আর ঐ একই কারণে, কতকটা অগ্রদর না হওয়া পর্য্যন্ত কাসকেও খবর দিতে মানা করেছিলুম। মনে হরেছিল যে, ঢাক বাজিরে ফেরার চেয়ে মুক্তা ভাল।

বিদায় নিয়ে পল্লভীতে কালীবাড়ীর সেই ঘরের মধ্যেই কখনোনা বিছিয়ে রাত কাটানুম।

১ই তারিখের সকাল-বেলায় খুৎ-হাত খুৎে বাসের পূল পার হ'য়ে এসে থলুম উড়িষ্যা ট্রাক রোড। মেট্রোবুস দিয়ে না এসে বজ্জ দিয়ে আসাই ছিল সুবিধামতক; কিন্তু পথের শেষ বেখানে হুস— সেখানে এরকমের একটু-আধটু ভুলে কিছু ঘা-আসে না। উল্লেখ্য থেকে পথটা কতকটা বাসের দ্বার দিয়ে গেছে; সেখানে মনে হয়—অনেক দিন সন্ধ্যার হয়নি। এই পথে ৮ মাইল এসে দামোদর নদ ঘেঁষার পার হ'লুম। পারের এসে দ্বির করা সেল, একদিন পথ চলল, আর একদিন বিশ্রাম। সারা ভারত যোরা এ ত' আর বা-তা নয়; শরীর ঠিক রেখে চলতে হবে; আর থাকতে হবে এমন দায়দায় বেখানে বিপদ না' হতে পারে, খাই আর না খাই। তারপর অকুট। যখন বেরিয়েছি, তখন হয় সঙ্কলতা, না হয় মনঃ; মাকামাতি কিছু চাই না। হিলাব ক'রে দেখা সেল ১০ মাইল পথ চলে তবে ভাল আদ্যা "পাচকুকা" উপস্থিত হ'তে পাব। সেখানে থাকবার

টিকানা পেরেছিলুম আমার বন্ধু ঠাকুরদাসের কাছে; তার বাবা এ ডরাত্তে বহুদিন ছিলেন। নীলরতন-বাবু সেওয়া টিকানা ছিল ১২ মাইল পথের পারে "সেউলটা" গ্রামের জমিদার ঐকুত মোহিনীমোহন ঘোষাল মহাপরের বাড়ীর। সেখা পথ থেকে সে গ্রাম মাইলখানেক দূরে। সেউলটা আসতে পথ ভুলে আর একটা গ্রামের মধ্যে গিয়ে পড়ি—পরে আবার বড় রাওর এসে মোহিনী-বাবু বাড়ী খাই। পথটা মাঝে মাঝে নির্জন। মাথার টুপি থাকার গ্রামা বেসরকারী পাহারাদার সুহুরগুণার অবাচিত পাহারা গ্রামবাসীদের সতর্ক করার চেয়ে আমাদেরই বেশী নড়িত ক'রে তুলছিল; কারণ, তাদের শুকুনো সেহের দারবহু ঠাতগুলোকে নিতান্ত অবহেলার বোণা মনে করা চলেনি।

পাঁচের লোকদের জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে গ্রাম খাবার সময় হাজির হ'লুম মোহিনী-বাবুর গৃহে, গ্রামের পায়ে-চলা পথের দাপ খ'রে। নিজের ছুপের কাহিনীর উল্লেখ ও উল্লেখের নাম করায় তিনি ভরসা দিলেন এক আনালেন যে, ভাটপাড়ার তাঁর শুকসেবের বাড়ী।

বাড়ীর কাছেই পুহুর থাকা সম্বন্ধে জান করলুম না; কারণ এক-কাপড়ে ঐতে কষ্ট পাবার সম্ভাবনা ছিল,—তা'হাড়া বেয়ে উঠেই পথ চলার এবং "একা নদী বিশ কোণ" পার হওয়ারও তাগিদ ছিল। আহার সমাপ্ত হ'ল; এডটা পথ দ্রুত ক'রে আসার কলে ক্ষুদ্রাও অব ছিল না। বেলা গ্রাম ২টার সেউলটা হ'তে রওনা হ'লুম। অল্প পথ চলার পরেই সেখা দিলেন "কপনারায়ণ" ঐ। দিকে চাইতেই সেখা সেল যে, সেলগুয়ে-সেলুর তত্ত্ব কুণ্ডর চরণের মত ঐর শুক ও নেমে এসেছে—তু' মৈথ্যচাতি খটাতে পারেনি। সেউলটার আগে ঐক্যার দামোদর পার হ'তে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। কপনারায়ণের তীরে এসে সেখি নৌকা দূরের কথা, জন-গ্রামীর সাক্ষা পর্য্যন্ত নেই।

নৌকার অভাবে ঐ সেতুপথে নদী পার হ'বার অভিপ্রায়ে প্রায় আশ মাইল চ'লে এগুম, কিন্তু বাধা পেয়ুম পুলিনের হাতে—যেতেন্দু খবরর আসছিলেম। কিন্তু বাধা হ'গুম আবার সেই নৌকার চিহ্নহীন খোয়াঘাটে। ইতিমধ্যে হু'একজন পারের বাড়ী এসে বাড়ির অপেক্ষা করছিলেন। ওপারে হচ্ছে সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সদরক্কের "কোলাঘাট," তবে আচ্ছ এ নাম ও রূপনারায়ণ নহে ছাড়া হু'এর অস্ত চিহ্ন কিছুই নেই। দূরের বাড়ী নিয়ে বেগে ধাবমান হু'একখানি বাপীর পোত খোয়াঘাটে ব'লে ব'সেই সেখ'তে পাওয়া গেল।

ওনুম, মাটির দেবী হচ্ছে, তার কারণ এই যে, মাঝে-মাঝে একটু-আটটু "রসহ" হওয়া বেচারার অভ্যাস। অনেক ডাকাডাকি ও ছাতি-কাপড়-নাড়ার পর ওপার থেকে বাড়ী-ওঁটার আত্মা পাওয়া গেল; এবং প্রায় ষষ্ঠী। দুইয়ক আমাদের প্রতীক্ষার স্বাধার পর, নাবিকপ্রবর তাঁর নৌকা নিয়ে ঘাটে ভিজলেন। উঠলুম সকলে নৌকার একই কাদা ভেঙ্গে; কারণ মেটে ঘাট, তার মল দিগ্নেছিল নেমে। বেলা প্রায় চারটেখ কোলাঘাটে কোলাহল করুত করুত নাম। সেল; পানানি দিতে হ'ল দুটা পরলা। ওপরেই ছিল হু'একখানা সোকাণ, খড়ের গাদা, ব্যবসায়ার জনকয়েকের বাসা আর হু'একটা চাঁল-কল; এখানে কালবিলম্ব না ক'রে "পাচকুড়া" পৌছাবার অভিপ্রায়ে পথ চলুত লাগলুম।

পথেই সন্ধ্যা এসে উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল, ক্রমে পরী-পথের তরুজ্ঞান-মণী-বন অন্ধকার বেন গ্রাস করুত ছুটে এল; টর্ড-লাইটের সাহায্যে বাকী পথ চ'লে, আদাম ৭৪০টার এলাম পাচকুড়ার বাজারে। দেখি ঈতের প্রকোপে সোকাণ-বাজার প্রায়ই বন্ধ হ'য়ে গেছে,—ওরি মথো একটা সোকাণ খোলা পাওয়ার জিলাপী ও বেগুনী জাতীয় কিছু খেতে নিয়ে কাছেই অবস্থিত খালের পুলের পারে ডাক-বাংলার উপস্থিত হ'লুম।

এই এলাম সেট উল্লববটেরই খাল। বেবিনীপুর পর্যন্ত

সেছে। রেল হ'বার পূর্বে নৌকাসোপে ঘাইগণ হাওয়া-আসা করুতেন। শানিকম্প ডাকা-ডাকির পর, চৌকীদার মোর পুলেই আমার সেধে সহাতে বসল, "আরে বাবু সে, নমস্কার! আহুন আহুন"। আমি জো অবাচ্! জিজ্ঞাসা করলুম—"তুমি আমার চেন হ' সে কিছুমাত্র বিধা না ক'রে উত্তর দিলে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, চিনি বই কি; আপনি যে আমার বাবু।" তার কথার জড়তা লক্ষ্য ক'রে বৃষ্ণুম, তার ভুলের দ্বার্প হেতুট কি। প্রকোপে বসলুম, "সেখ হে, আমি জোনার বাবু নই, পবিক মাত্র, রাতটা থাকুতে চাই। হাতে পথলা নেই যে সুবিধাজনক জায়গা ষোপাড় করি; অথচ এই অচেনা জায়গায়, অন্ধকারে, আশ্রয়ও আর খুঁজুতে পারা যায় না।" কি ভেবে সঙ্গে একটা আলো নিয়ে কাছেই তার মনির ওভারসিয়ারের বাড়ী আমাকে নিয়ে গেল। তাঁকে ঢেকে সব কথা ব'লে রাত কাটাবার অস্থিতি পেয়ুম। তবে কথা রইল যে, সকালেই বেন অস্ত আশ্রয় দেখি; অক্ষিয়ার কেউ এসে তাঁর চাকরীর বিপদ অনিবার্য। খবরবার ও নমস্কার জানিয়ে ডাক-বাংলার ফিরে এয়ুম।

আরাম-জোরে কল ও চারের অস্থরালে "লম্বা" হ'লেও, সারা মেহের বেথনা, পারের ফোকা ও অতিবিক্ত পরিপ্রসের অস্ত ঘুমের ব্যাঘাত ঘটুতে লাগল। ঈতের প্রাবল্য ও জায়দার নুতনত্ব হুত তার কতকটা কারণ।

সকালে উঠে চৌকীদারের জিন্সায় জিনিসপত্র রেখে চা-পানান্তে কাপড়-বন্দী ব্যাপটা সঙ্গে ক'রে ৫ মাইল পথের অস্তে অবস্থিত বনুনাথ-বাড়ীর উদ্দেশে রওনা হ'লুম। শরীরের অবস্থা ভাল ছিল না এবং সুনিজ্ঞার অভাবে নোওঁলাও অস্থকুত হছিল। পাচকুড়া ট্রেননের পাশ দিয়ে বেতে দেখি, পাডার্নায়ের পুলিন, ষোলার কাপড়-চোপড় নিয়ে ষাড়িয়ে আছে রেল-লাইনের ধারে। মনে পড়ল বর্গবরের আসার কথা। তাঁর স্পেডাল ট্রেন, শনিবার থেকে পাহারা দিলে, রবিবার দ্বাধার কথা; আচ্ছ সোমবার ভুও দেখা নেই। পাহারা-জাদাসের হু-চোখ রাত ভেসে ভেসে ওকিরে দিগ্নেছে;

সময়ে না নেয়ে-খেয়ে মোজাজ ও হ'রে গেছে কড়া ; তার ওপর ম্যাসেরিয়া-ভোগ। সেইগুলিকে এচও পৈতোর সঙ্গেও যুক্ত হ'চ্ছে। পশে-পাওয়া অল্প লোককে পথ ছিড়াসা করায়, যখন পাহারাদার পুলিশের বিরক্তিকর। "জানি না, বাবু" উত্তর কানে বাজল।

তখনাথ-বাড়ীর মোহান্ত ঐচ্ছাত্তাহক দাস মহাপ্রের গৃহে এসে নিষেধ ও বন্ধুর নাম ক'রে পরিচয় দেবার পর ম্যানেজারের সহিত আলাপ হ'ল; ইনি বেশ ভদ্রলোক। এ সব অফিসে তখন নাকি পণ্ডোল চলছিল ব'লে প্রথমে কে, কোথা হ'তে আসছে, এসব না জেনে ভাল ক'রে কথা বলতে ভয় পান্নিলেন। পরে শুনুম, দলন-ভৈরী-করা স্বদেশী ছেলেরের জ্ঞানায় গ্রামবাসী পণ্ডিত অতিথ হ'রে উঠেছে। তখন মনে পড়ল,—পথে আসতে তিয়ার্ড বোটর-বাসে, বোট-বাট দলেত, অনেক বিশেষ্টিক আসতে দেখেছি গ্রামের মধ্যে সরকার পক্ষের হ'একটা ছোট ছাউনিতে।

মধ্যাহ্নে ঐরুতনাথ কীউর প্রসাদ পাওয়ার পর চারিধার ছুঁতে গিয়ে দেখা গেল। একাত্তা বাড়ী, বাসান, পুত্ব, মন্দির, কুল, লাইরেটী, জমিদারী। মোহান্ত মহারাজকেও দেখলুম হুশী, হুকচিল্পার,

এক নবীন লাধুবেশধারী রাজকুমার। বেশ ভাল লাগল তাঁর এই "সব-পাওয়া" "সব-ছাড়া" বেশ, ও রাত কাটল আরামে শোনের মধ্যে।

এই শান্তিময় স্থানে থেকে দেহের ও মনের গায় ফিরে এল এবং বেশ ছাড়ার বিরহও বেন কতকটা ভুলে গেলুম।

সকালে উঠে মোহান্ত মহারাজ সকলের তত্বাহসকানে রত; আমিও তাত্তাত্তি সকালের কাজ ও চাপের পালা শেষ ক'রে ৫ টাক। পাথের খাতার লিখিয়ে নিয়ে তত্বজ্ঞতা জানিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। নদীটাত্তা ভাল বোধ হ'ছিল—বেদন। বা একটু ছিল তা পারে।

বেলা প্রায় ১০টার পাঁচকুড়োর বাজার থেকে আরও কিছু খেয়ে বেরিয়ে পড়লুম বোকা পিঠে। বাজার, দোকান সবই খোলা এবং খরিদার ও লোকের বেশ ভরাট ভাব চলেছে। পেছু থেকে একটা কৌতুহলী কোলাহলের আওয়াজ এল অশ্পট স্বর নিয়ে; আমার অল্পত পোষাকই বোধ হয় তার কারণ। বড় রাত্তার এসে, একই পথ বেতেই এক নদী পড়ল—নাম "কাসাই" বা "কলোবতী"। নদীটা বালের মত হ'লেও পারাপারের ব্যবস্থা নৌকাযোগেই ঘটল। পারানি লাগল এক পরদা।

(ক্রমশঃ)

British Medical Journal চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কারের সন্ধান দিয়েছেন—
বহুবল্যের গবেষণার পর চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে নিরঃশীড়া সৃষ্টি করিবার
উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে; Histamine acid Phosphate নামক পরিমাণে ভক্ষণ করিলে
২০ সেকেন্ডে মুখে জীৱ কষার স্বাদ লাগিবে এবং ক্রিয়া আরম্ভ হইবে। অধিকতর বিজ্ঞাপিত
হইয়াছে যে, গবেষণার কার্যে দর্পীৱ মনঃসংযোগের সহিত অঙ্গের হইতেছে।

খেলাধুলায় বাঙ্গালী

বাঙ্গালী জাতি খেলাধুলায় উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। মানসিক উন্নতিতে বাঙ্গালী আশ্চর্য-স্থান অধিকার করিয়াছে, শারীরিক উন্নতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে ঠিক তার বিপরীত অবস্থা দেখি। শারীরিক উন্নতি না হইলে খেলাধুলায় উন্নতি করা সম্ভবপর হয় না।

আমরা ‘ভাত’ বেচারার ঘাড়ের স্কল গোব চাপাইয়া বলি, “ভেঙে। বাঙ্গালীর আর কত উন্নতি হবে?” সভ্য বটে, আমাদের খাদ্য শারীরিক অবনতির দ্রুত কতক পরিমাণে দায়ী; কিন্তু, আমাদের আরাম প্রিয়তা ও স্টেয়ার অভাবও এই অবস্থার দ্রুত উত্তেজক দায়ী।

স্থলের বিঘ্ন, বাঘা, ব্যায়াম ও খেলাধুলায় প্রতি বাঙ্গালীর আশ্চর্য নব্বর পড়িয়াছে। তাই আশ্চর্য বাঙ্গালীরও খাণ্ডে ও ব্যায়ামে গুণী বন্দি হেয়ার। দেখিতে পাওয়া যায় এবং খেলাধুলায় অস্ত্র ভারতীয় ও বিদেশীয় জাতির সহিত বাঙ্গালী প্রতিযোগিতার

উচ্চস্থান অধিকার করিবার প্রয়াসী হইয়াছে। “প্রয়াসী হইয়াছে” বলিলাম, কারণ অনেকস্থলে বাঙ্গালী জরাজীর্ণ কাছাকাছি দিয়াও স্কল হইতে পারে নাই। বিদ্য

“ওলিম্পিক প্রতিযোগিতা” তাহার একটি দৃষ্টান্ত। এই প্রতিযোগিতার দ্রুত একজনও বাঙ্গালী নির্বাচিত হয় নাই। গত বৎসর যে ভারতীয় খেলোয়াড়ের দল বিলাতে ক্রিকেট খেলিতে গিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও একজনও বাঙ্গালীর স্থান হয় নাই। নির্বাচনের

প্রতিযোগিতা — খেলার জিনজনে বাঙ্গালীকে খেলিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাবিশেষে দলভুক্ত করা হয় নাই। আন্তর্জাতিক টেনিস-প্রতিযোগিতা Davis Cup খেলার ভারতীয় দলে বাঙ্গালীর স্থান আশ্চর্য হয় নাই। একমাত্র ফুটবল খেলায় বাঙ্গালী বেশ উচ্চ স্থান পাইয়াছে। সজ্ঞতি এক দল বাঙ্গালী ফুটবল খেলোয়াড় সিংহলে গিয়া তথাকার সমিলিত (ইউরোপীয় ও দেশীয়) ফুটবল দলকে পরাস্ত করিয়া উচ্চ-প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে একদল বাঙ্গালী খেলোয়াড় দ্বাবীশে গিয়া তথাকার স্কল দলকে



সায়বায়জান মার (এম্. মার)

পরাজিত করেন।

ডাল খেলোয়াড়ের আশ্চর্য সর্বত্র;—এমন কি, চাঁকুদীর বাঘারও খেলোয়াড় হইলে সুবিধা হয়।

রেন, টেলিগ্রাফ, কাস্টলম্, পোর্ট কমিসনাস' প্রভৃতিতে খেলোয়াড়দের চাকুরির সুবিধা ত' আছেই ; এমন কি, বড় বড় আপিসেও খেলোয়াড়ের চাকুরির সুবিধা হয়। তাই, চাকুরির এই প্রদর্শনে আশ খেলাধুলার প্রতি বাঙ্গালীর আগ্রহ অধিক নম্বর পড়িয়াছে।

বাঙ্গালীর খেলাধুলার কথা মনে করিলেই, এ বিষয়ে বাঁহারা অগ্রগামী এবং উদাহরণ-স্বরূপ তাঁহাদের কথা সর্বাপেক্ষে মনে পড়ে। সকলের আগে মনে পড়ে, পরলোকগত প্রিন্সিপ্যাল সারদ্বারজান রায়ের কথা। বেসবয়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে বেশীর কোন অধ্যাপকের ক্রিকেট বা অন্য কিছু খেলা 'ছেলেমানুষী'—এমন-কি, হাস্যকর ব্যাপারও মনে হইত। তিনিই এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিয়া, বহু বসন্তব্যাপী চেষ্টা ও যত্নের ফলে, ক্রিকেট খেলা বাঙ্গালীর মধ্যে—বিশেষতঃ, কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। নিজে তিনি ভাল খেলোয়াড় হইয়াই সন্তুষ্ট হন নাই ; ছাত্রদের সহিত খেলায় যোগ দিয়া এবং খেলার কায়দা-কানুন শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে সর্বদাই

শ্রীতিমত যোগ দিয়াছেন,—এমন কি, মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বেও তিনি নিয়ম-মত খেলিয়াছেন। বিভাদাসের কলেও তাঁহারই চেষ্টার ও যত্নে ক্রিকেট খেলায় অত্যন্ত সকল কলেজকে—এমন কি, বড় বড় ইউরোপীয় ক্রিকেট-কলেজ,—পরাজিত করিয়া কলেজ-সমূহের মধ্যে ক্রিকেট খেলায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল।

তাঁহাকে "Father of Bengali Cricket" বলা হইত ; বাস্তবিকই তিনি তাহাই ছিলেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত ক্রিকেট-খেলোয়াড়, পরলোকগত ডাক্তার ডব্লিউ, জি, গ্রেসের সহিত তাঁহার চেহারার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য থাকায় তাঁহাকে অনেক সাদৃশ্য "W. G. of Bengal" নাম দিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, অত্যন্ত কাম যেমন মন দিয়া সাধনা করিতে হয়, খেলাও সেইরূপ মন দিয়া সাধনা করা আবশ্যক। অন্য কাজে যখন না দিয়া বা অন্য কাজ কেলিয়া না রাখিয়া খেলা আবশ্যক এবং খেলাকেও বাদ না দিয়া কাজ করা আবশ্যক। "Mens sana in corpore sano," অর্থাৎ—"স্থূল পরীয়ে স্থূল মন"—তাঁহার মধ্যে মুক্তিমান ছিল। বাঙ্গালী যদি তাঁহার দৃষ্টান্ত অহসরণ করিয়া খেলাধুলার যোগ দিতে পারে, তাহা হইলে তাহার ভবিষ্যৎ আশাশ্রিত হইবে বলা যায়।

উৎসাহিত করিয়াছেন। কলেজের ছাত্রদের জন্য Harrison Shield ও Lansdowne Shield নামে যে ক্রিকেট-প্রতিযোগিতা হয়, তাহা ইঁহারই চেষ্টার। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি যুবকের ন্যায় উৎসাহে ক্রিকেট খেলায়





খুঁটিনাটি

দাগ উঠান—

[অভাবের দিনে ব্যবহারের জিনিষের দহ ও বাড়ে। কাপড়-চোপড় বা কাপের জিনিষ দাগ পড়ে নষ্ট হ'লে মুহূর্তে তা'র ক্ষত আশ্রয় হয়ও বেশী। তাই এ বিঘের কিছু ফিকির থানা থাকলে এ সময়ে তা' লক্ষ্যকে বলা দরকার। দাগ উঠাবার কয়েকটি উপায় এবার লিখছি। বলা বাহুল্য, দাগ দাগলে বত শীতের সম্বন্ধ সে দাগ উঠাবার ভেটী করতে হয়। সেবি কহলে অনেক সময় কৃতকার্য হ'তে পারা যায় না;—অর্থাৎ, দাগটা তখন পাকা হ'লেও মত স্থায়ী হয়ে যায়। দাগ উঠাবার ক্ষত খে-দব জিনিষের আবস্তক, সব সময় খে-জিনিষ হয়ে থাকে না। কাপড়ে দাগ পড়লে, ডাক্ষাৎ কাপড়টির উপর জল ঢেলে ধুয়ে ফেলা দরকার। দাগ তখনই অনেকটা হাফা হ'য়ে যায়। তাইপরে সে দাগ ছুটাবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।]

(১) কালীর দাগ—হুতার কাপড়ে পড়লে Oxalic Acid (অক্স্যালিক এসিড) জলে জলে লাগাতে হবে। আসে Acetic Acid (এসিটিক এসিড) দিয়ে, পরে Oxalic Acid দিলে আরও ভাল হয়। রেশমী ও পশমী কাপড় থেকেও এই উপায়েই দাগ উঠান যায়।

(২) চা, কফি বা ফলের রস—হুতার কাপড়ে পড়লে, তখনই সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে পারলে উঠে যায়; না হ'লে একটু সাধারণ 'গ্রিচি পাউডার' দিয়ে ধুলেও উঠে যায়। রেশমী বা পশমী কাপড়ে হাইড্রোজেন পারক্সাইড দিলে কাজ হয়। ফলের রসের দাগ মিসারিনে ডিচ্চিয়ে সাবান দিয়ে ধুলেও ওঠে।

(৩) রবর ক্যাম্পের বেগুণী কালী—হুতার কাপড়ে পড়লে কঠিন সোডার জল দিয়ে ধুলে উঠে যায়। দাবী কাপড় হ'লে স্পিরিট আর

এ্যামোনিয়া দিয়ে ধুয়ে ফেলা যায়। রেশমী বা পশমী কাপড়েও স্পিরিট আর এ্যামোনিয়া যেওয়া যায়।

(৪) চিনির রস, সিরিস ইত্যাদি—জল দিয়ে ধুলেই যায়। সিরিষের দাগ প্রথম জলে সহজেই উঠে যায়।

(৫) গালায় দাগ—স্পিরিট দিয়ে ডিচ্চিয়ে রাখলে উঠে যায়। বেশী বড় দাগ হ'লে ২৪ ঘণ্টা স্পিরিট বদলিয়ে দিলে আত্রে আত্রে সবটা দাগ স্পিরিটে ওলে যাবে।

(৬) বার্গিশের দাগ—উপরের লেখা উপায়ে বার্গিশের দাগও উঠাতে হয়। বার্গিশ স্পিরিটে-সোলা দাগা বৈ আর কিছু নয়।

(৭) রক্তের দাগ—জল দিয়ে ধুয়ে একটু গ্রিচি পাউডারের জলে ধুলে একটুও দাগ থাকবে না। রেশমী কাপড়ে জল আর সাবান দিলেই হবে।

(৮) আলকাত্তার দাগ—বেজিন বা পেট্রোল দিয়ে ধুলে উঠে যাবে। এ কাজটি খুব সাবধানে করতে হবে, কাছে যেন কোন আগুন না থাকে; কারণ এই দুটাই দাহ জিনিষ, অতি সহজে জ'লে ওঠে।

(৯) রং বা এনামেলের দাগ—এ্যাসেটোন, নাইট্রোবেজিন বা কার্বন টেট্রাক্লোরাইড দিয়ে ধুলে উঠে যাবে। এই জিনিষগুলি বড় বড় ডাক্তার থানায় পাওয়া যেতে পারে। বেশী পুরানো হয়ে গেলে রং-এর দাগ ছুটান যায়।

(১০) কচি ঘাসের দাগ—সাবান আর স্পিরিট মিষ্টিয়ে জল দিয়ে ধুলে উঠে যাবে।

(১১) পোড়া দাগ—বেশী পুড়ে গেলে দাগ যায় না। অগ্ন-বর হ'লে হাইড্রোজেন পারক্সাইড বা গ্রিচি পাউডারে উঠে যায়।

(১২) তেল, ঘি, মোমের দাগ—পেট্রোল বা বেজিনে গুঁঠ। লাদা কাপড়ে ঘি বা চর্কি জাতীয় জিনিষের দাগ অনেক সময়, কাপড়ের নীচে রুটি কাপড় বেধে ইতিরি কস্লে উঠে যায়। ইতিরি টানে আর পরমে ঘি বা চর্কি প'লে যায় আর রুটি কাপড়ে সেটা চুবে নেয়।

(১৩) ঘামের দাগ—দাগের উপর স্লিয়ারিন

দাগিবে খটখটানেক বেধে, পরম কসে দাবান জলে ধুসেই উঠে যায়।

(১৪) ছ্যাংলা-ধরা দাগ—হুতার কাপড়ে ছ্যাংলা-ধরা দাগ পড়লে কাপড়টিকে মেলে ধ'রে হুতার গুঁড়ো দাগের উপর ছিটাত্তে হবে। তারপর, সেদু দিবে ঘস্তে হবে। কিছুকণ বাধে ধুবে কেন্দুতে হবে। আবশ্যক হ'লে ২।৩ বার এরকম করতে হবে।

বৈশাখ-চুপুর *

জীবিতিকা দে

আকাশ চিরে বহুছে আশুন,
 কিনিবে আসে বনের আঁধি।
 শূক-কল মাঠের মুক
 ● দুহুছে কুবা-কাতর পাখী।
 দূর বনের ঐ প্রামল পাতা
 বৌস্নে ভপার চুম্বকি-পরা,
 নদীকা হাওরায় আসছে বেধে
 অমি-খারা মহনভরা।
 আকাশ-গারের টুকরা মেখে
 পখিক-চোখে লাদায় ধাঁধা;

কোপের মাঝে কোন্ গোপনে
 দুহুর প্রিয়ার কাতর কীনা।
 কুঁড়ের পাশে অশখ-ছায়ে
 ছাগল-শিশু বুঝার সুখে;
 রাগল-শিশু বড়ই খুশী
 কচি আমের গন্ধ গুঁকে।
 রৌদ্র-বেশায় মাজল ব'শেখ
 রক্ত-আঁধির দৃষ্টি হানে;
 তপ্ত চুপুর নিভুম নীলব,
 দুহুছে আছে অবিবানে।

পঞ্চরণা

ঐতিহ্যের ক্ষুদ্র মুখোপাখ্যায়

বাঁকুড়া জেলার সদর (বাঁকুড়া) হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে “গুণনিয়া” পাহাড়। সমুদ্রতীর হইতে এই পাহাড়ের উচ্চতা প্রায় সাড়ে চৌদ্দ শত ফুট। এই পাহাড়ে বিভিন্ন অক্ষরের কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিপি উৎকীর্ণ আছে। তদাধো সর্গপ্রাচীন বলিয়া পরিচিত যে লিপিটার পাঠোদ্ধার হইয়াছে, তাহা এই—

- (১) চন্দ্র স্বামিনো দাসাগ্রেণাতিষ্ঠতঃ
- (২) পুন্ডরপাদিপতিমহারাজঐশিঙ্কবর্ষণঃ পুন্ড্র
- (৩) মহারাজ ঐশ্চন্দ্রবর্ষণঃ কুতিঃ

পাহাড়ের উত্তরাংশে

কুমি হইতে কিয়দূর উচ্চে পাহাড়ের গায়ে বহু অরক্ষিত একটা চন্দ্র কোষিত আছে; (দুর্গারমান) চন্দ্রের কেন্দ্রস্থলে (পতিবেশে উদ্ধৃত) মলত অমিশিখা নির্পত হইতেছে। প্রথম পংক্তি লিপি-চন্দ্রের দক্ষিণ-তাপে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তি চন্দ্রের নীচে উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

এই লিপির “পুন্ডরপা” এবং তাহার অধিপতি “মহারাজ চন্দ্রবর্ষণ”কে লইয়া ঐতিহাসিকগণ নানাতরপ গবেষণা করিয়াছেন। সেই গবেষণা লব্ধে কিছু বলিবার ভর্তুই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রাচ্যবিজ্ঞানমহর্ষি ঐন্দ্রজ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, তিনিই সর্গপ্রথম সাধারণের নিকট এই লিপির কথা প্রকাশ করেন। বোধহয় ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের এশিয়াটিক-সোসাইটির কার্য-বিবরণীতে তাহার লেখা এই বিবরণ একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

বঙ্গব্রত মগন দাস, ১৯০০ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার “মহারাজ চন্দ্রবর্ষণ” শির্ষক তাহার লেখা প্রবন্ধও দেখিয়াছি। বঙ্গ মহাশয়ের মতে “গুণনিয়ার চন্দ্রবর্ষণ এবং দিল্লী শৌহজদ্দের চন্দ্র ও এলাহাবাদের অশোকস্তম্ভে উৎকীর্ণ সমুদ্র-স্তম্ভের প্রতিলিখিত চন্দ্রবর্ষণ একই ব্যক্তি।”

অতঃপর ভারতবিখ্যাত ঐতিহাসিক স্বর্ণদত্ত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং রাধাশ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয়ে আলোচনা করেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুমতি লইয়া রাধাশ্যামল ১৯২০ সালের ফাল্গুন-মাসখ্যা “প্রবাসী” পত্রে “গুণনিয়ার পুন্ড্র-লিপি” নামে একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, “মালবের অন্তর্গত মণপুর—বর্তমান মাঝা-সোরে প্রাপ্ত লিপির সিংহবর্ষণ, গুণনিয়া পাহাড়ের চন্দ্রবর্ষণের পিতা।



বাগেশ্বরী ও অজ্ঞাত মূর্তির অংশ

সিঙ্কবর্ষণ হইতে অভিন্ন। গুণনিয়ার চন্দ্রবর্ষণই দিল্লীর শৌহজদ্দের চন্দ্র, এলাহাবাদের সমুদ্র-স্তম্ভের প্রণতি যথো এই চন্দ্রবর্ষণের নামই উৎকীর্ণ আছে।” মাঝাসোরে লিপির সিংহবর্ষণের পিতার নাম জয়বর্ষণ, পুন্ড্রের নাম নরবর্ষণ। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতের প্রতিবাদ করিয়া পত্নী শ্রীমতী ১৯১৯ সালের “ইন্ডিয়ান এ্যাণ্ডিকোয়ারী”তে অধ্যাপক ঐন্দ্রজ্ঞানেন্দ্রনাথ রাধাসোবিন্দ বসাক একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহার কোন উত্তর প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা জানি না। শাস্ত্রী

মহাশয় অল্পমান করিয়াছিলেন, রাজপুতানার বোধগুরু
রাজাবিহিত "পোবরণ" নগরই গুণনিয়া-গিপির পুত্রগণ।

আমাদের ধারণা অন্তরূপ। গুণনিয়া-গিপির
চন্দ্রবর্ষার সঙ্গে দিল্লীর সৌন্দর্যের চন্দ্রের অথবা সমুদ্র-
তটের প্রান্তিক-লিখিত চন্দ্রবর্ষার কোনো সম্বন্ধ আছে
বলিয়া আমরা মনে করি না। আমাদের মতে
বাকুড়া জেলার "পবরণ"ই গুণনিয়া-গিপির "পুত্রগণ"।
বহু মহাশয় "বীরভূম-অঙ্গলদান-সমিতির" সভাপতি
ছিলেন। "বীরভূম-বিবরণ" সংগ্রহকালে গুণনিয়া-
গিপির আলোচনা এসে

বহু মহাশয়কে আমাদের
মতের কথা জানাইয়া-
ছিলাম। বাল্যকাল হইতেই
"পবরণ — পলাশডাঙ্গা"র
(ছদ্ম) পান্যপানি গ্রামের)
নাম গুনিয়া আসিতেছি।
স্বর্ণগত শাস্ত্রী মহাশয়কে
সে কথা নিবেদন করিয়া
তাহার নিকট পবরণ



সিংহবর্ষী ও অন্তরূপ হুগ্লীর তহান

পরিসরনের প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম। নানা কারণে
তাহা ঘটনা উঠে নাই। অতঃপর স্বর্গীয় নিধিনন্দন দ্বার
মহাশয়ের সঙ্গে গুণনিয়া-গিপি লইয়া আমাদের আলোচনা
হয়। কলে গুণনিয়া বেথিয়া আসিয়া তিনি গত ১৯৩০
সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা "ভারতবর্ষে" "গুণনিয়া পৈলে" নাম
দিয়া একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি,
শাস্ত্রী মহাশয় ও রাজালাসের মতের প্রতিবাদ করিয়া-
ছিলেন বটে, কিন্তু পবরণা না বেথিয়া সাহস করিয়া সে
সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারেন নাই। পবরণার বাঙালি ঘটে
নাই বলিয়া আমরাও এতাবৎ এ বিষয়ে বিশেষ কিছু
বলিতে পারি নাই, আমাদের সম্পাদিত পীতমোবিলে
বৈষ্ণব-ধর্মের ইতিহাস আলোচনার প্রসঙ্গতঃ পবরণার
কথা উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। সম্মতি চণ্ডীদাস-
পদাবলীর সম্পাদন ব্যপক্ষে পুঁথির সন্ধান বাকুড়া
ব্রহ্মকালে প্রতিভষ্যা অধ্যাপক বহুবর ভট্টর ঐন্দ্র

স্বনীতিভূমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমি পবরণা বেথিয়া
আসিয়াছি। সাহিত্যিক ও সাহিত্য-বন্ধ ঐন্দ্র
সত্যকিঙ্কর সাহান্য মহাশয়ের সৌম্যে গুণনিয়া
বেথিয়ার সৌভাগ্যও ঘটয়াছে। সুতরাং আমরা
এইবার আমাদের মতের কথা সাধারণ্যে প্রকাশ
করা কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। স্বনীতিবাবু
ইতিমধ্যেই তাহার লক্ষিণ মন্তব্য "বহুঐ" কান্ডন-
সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের বলিবার কথা
যোচনাটু এইরূপ—

(১) আমরা গুণনিয়ার

সিংহবর্ষী ও নান্দালোরের
সিংহবর্ষাকে এক ব্যক্তি
বলিয়া মনে করি না।
গুণনিয়ার সিংহবর্ষা
পুত্রগণ অধিপতি ছিলেন।
নান্দালোর-গিপির সিংহ-
বর্ষার পুত্র মরবর্ষা
আপনাদিপকে—

"(সিদ্ধ) সংগ্রহশিল্পে তই পুত্রায় বিভাঞ্চে

চতুসসমুদ্র-পর্বাঙ্ক-তোয়-পিঙ্গালবোণমঃ

ঐর্শালবণায়াতে প্রণতে কৃতসঙ্কিতে।"

"মানবগণায়াতে" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বোধ-
পূত্রের পোবরণ নগর যে ইহাদের রাজধানী ছিল,
নান্দালোর-গিপিতে তাহার কোন প্রমাণই নাই।
সর্গাপেকা উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই লিপিতে চন্দ্রবর্ষার
কোন প্রসঙ্গ নাই। সুতরাং কে বলিবে যে, মালবের
সিংহবর্ষার চন্দ্রবর্ষা নামেরে অপর এক পুত্র ছিল?
এই লিপির অষ্টম স্লোকে—

"বাহুসেবক লগদামমপ্রবেশমঙ্গ বিভূম্

নিরুত্তর্যন্ত সংকর্তা স্বকুলতাপ চন্দ্রমঃ

বত বিজঃ চ প্রাণাশ দেব ব্রাহ্মণে সাগতাঃ"

এই যে চন্দ্রমার উল্লেখ, ইহা হইতে যদি কেহ চন্দ্রবর্ষাকে
উদ্ধার করিতে চাহেন, আমাদের বলিবার কোন কথা

নাই। মালবের সিংহবর্মার পুত্র নরবর্মার ৪৬১
বিক্রমাব্দে, ৪০৪ খ্রীষ্টাব্দে, বোধ হয় লণপুরের
(মাধাসোদের) রাজা ছিলেন।

এর উল্লিখিত পারে, শুভনিগার চন্দ্রবর্মার শিলা
সিংহবর্মার বৈজব (?) এবং মালবের সিংহবর্মার বৈজব
ছিলেন, অতএব ইহাদের মধ্যে ঐক্য থাকিতে পারে।
কিন্তু মাত্র নাম-সাদৃশ্য ও ধর্ম-সাদৃশ্য দেখিয়াই
ঐতিহাসিক ঐক্য স্থিরীকৃত হইবে না। ভারতে বৈজব-



পথরূপার মহিষ-ধর্মী

ধর্মের আন্দোলন খ্রীঃ-পূর্বাব্দ হইতেই বেগ গ্রহণরূপে
বেগা দিয়াছিল। মালবের রাজা ভাগভদ্রের নিকট
সমাস্ত যবনরাজদূত হেলিওদোরসের বৈজব ধর্ম
দ্বীকা ও গুরুত্বপূর্ণ-প্রতিষ্ঠা (বেসনগর-লিপি) নানাঘাট
ও বোম্বাইয়ের লিপি, শক সম্রাটগণের বাহুবল নাম গ্রহণ
ও বহু কীর্তি পরিচয় প্রকৃতি নানাবিধ আবিষ্কারে
তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। শুণ্ড সম্রাটগণের সময়ে
রাজধর্মরূপে বৈজবধর্ম ভারতে আরো ব্যাপকভাবে
প্রসারলাভ করিয়াছিল। অতএব নামসাদৃশ্য বা ধর্ম-

সাদৃশ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ গ্রহণ করা চলিবে না।

(২) আমরা দিল্লী-সৌহৃদয়ের চন্দ্র এবং শুভনিগার
চন্দ্রবর্মাকে এক ব্যক্তি বলিয়া মনে করি না।

সৌহৃদয়ের লিপি এইরূপ—

“বজ্রোদ্বর্তনতঃ প্রতীপমুরগা শত্রু সমেত্যাগতান্
বধেব্রাহ্মবর্জিনোতিলিখিত। বঙ্গেন কীর্তিকৃত্বে
ঐষ্ঠ্য সপ্তমুখানি যেন সমরে সিদ্ধোজ্জিতা বালিকাঃ
বজ্রাত্মপাদিবারততে কলনিধিধীর্ঘ্যানিগৈর্দক্ষিণা
বিমুক্তেব বিশ্বমাসাং নরপতের্গম্যাপ্রভতেতরাঃ
বৃত্তা। কপ্পমিতাবনীং পতবতঃ কীর্ত্যাহিতত ক্ষিতৌ
শাস্ত্রেব মহাবনে ক্ষতভূমো বজ্র প্রতাপো মহান্
নাগাপুংস্বজতি প্রণাশিত রিপোর্ধ্বজ্ঞে ধোঃ কিচ্ছ
প্রাণেন বহুমাধিতক হুচিরঃ চৈক্যমিরাভঃ ক্ষিতৌ
চন্দ্রাঙ্কেন সমগ্র চন্দ্র সঙ্গীং বক্রপ্রিহঃ বিপ্রভা।

তেনায় প্রণিখায় ভূমিশ্রমিত। ধাবেন বিকৌ মতিন্
প্রাণ্ড বিকুশমে দিতৌ ভগবতো বিকোদ্রমঃ পাপিতঃ”

এই লিপি হইতে বৃকিতে পাঠ্য যায়, চন্দ্রের পুত্র
পর অপর কাহারো যাত্রা এই লিপি উৎকীর্ণ
হইয়াছিল। এই ব্যক্তি যে কে আমিও তাহা জানা
যায় নাই। এই চন্দ্রের উপনাম “ধাব” ছিল বলিয়া
সন্দেহ হয়। এই চন্দ্র বঙ্গ এর পূর্বক সিদ্ধর সপ্তমুখ পার
হইয়া বালিকগণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই চন্দ্র
বিকুশাদগিরিতে বিকৃত ধর্ম প্রতীষ্ঠা করিয়াছিলেন।
শুভনিগা-লিপির চন্দ্র নিজেকে পুত্রধারিণী এবং
মহারাজ নামে পরিচিত করিয়াছেন। তিনি বঙ্গ
হইতে বালিক গর্ভান্ত ধর করিয়াছেন, তিনি
কোনও সেনের নামে পরিচয় না দিয়া যাত্র
রামধানীর নামে, মহারাজাধিরাজ, পরম ভট্টারক
ইত্যাদি না লিখিয়া যাত্র “মহারাজ”—এই শব্দবীতে কেন
নিজের পরিচয় দিবেন, কেহ তাহা বুঝাইবার চেষ্টা
করেন নাই। বিকুশাদগিরি বলিতে পরার বিকুশাদ
মন্দির যেখানে অবস্থিত সেই স্থানকেই বুঝায়।
শুভনিগা কখনো বিকুশাদগিরি নামে পরিচিত ছিল না।
যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, সৌহৃদয়ই যেখানে প্রতিষ্ঠিত

আছে, ঐ স্থানেই বিষ্ণুনাথগিри নামে পরিচিত, স্তম্ভটি চত্রেই প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইলে তত্‌নিম্নার চত্রে স্বর্গারোহণের পর কে দিল্লিতে এই গিри উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন তাহারও ত' একটি পরিচয় চাই। কিন্তু সে কথাও কেহ বলিতে পারেন না। আমাদের মতে লৌহস্তম্ভের চত্রে স্তম্ভবর্ষীয় প্রথম চত্রে স্তম্ভ। তাহার স্তম্ভের পর সমুদ্রগুপ্তের আদেশে পিতার স্তম্ভস্তম্ভে এই স্তম্ভ-গিри উৎকীর্ণ হইয়াছিল। প্রথম চত্রে স্তম্ভ বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-প্রশস্তিতে দ্বিতীয়বার বঙ্গ-জয়ের উল্লেখ নাই। ঐতিহাসিকগণ অস্বীকার করেন, সমুদ্রগুপ্ত পিতামাতার স্বর্ণাৰ্ঘ্য বুড়া প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। স্তম্ভাং পিতার স্তম্ভ বক্ষ্য দিল্লীর লৌহস্তম্ভে গিри উৎকীর্ণ করানোর অস্বীকারও বোধ হয় চলিতে পারে। স্তম্ভনিম্নার চত্রে বর্ষা বৈকব (?) এবং দিল্লীর লৌহস্তম্ভের চত্রে বৈকব (?)। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি ইহাতে ইতিহাসের কিছু ব্যর্থ আসে না।

(২) সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-প্রশস্তির চত্রে বর্ষা এবং তত্‌নিম্না-গিри চত্রে বর্ষা যে একই ব্যক্তি, মোর করিয়া তাহা বলা চলে না।

সমুদ্রগুপ্ত আৰ্য্যাবর্ষের যে কয়জন রাজাকে পরাজিত করেন—তাহাদের মধ্যে কনসেব, মজিল, নাসদত্ত, চত্রে বর্ষা, গণপতি নাস, নাসসেন, অচ্যুত নন্দী ও বলবর্ষার নাম প্রশস্তিতে উল্লিখিত হইয়াছে। স্বর্গরত নারী মহাশয় প্রভৃতির মতে প্রশস্তিগিৰিত উক্ত চত্রে বর্ষা ও তত্‌নিম্না পাহাড়ের চত্রে বর্ষা অভিন্ন। কিন্তু ভারতের পূর্বে প্রাচ্যে অবস্থিত রাষ্ট্রের বনময় প্রদেশস্থিত পুণ্ডরীক মহারাজ চত্রে বর্ষা কি আৰ্য্যাবর্ষের রাজত্ব-তালিকা হান পাইবার যোগ্য? আৰ্য্যাবর্ষ বঙ্কিত সাধারণতঃ উত্তর-ভারতই বুঝায়। অতি পূর্বেকালে রাসসেন স্তম্ভ মেন নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তী কালে ইহার উত্তরাংশ ককতুজি ও দক্ষিণাংশ বঙ্কমান-ভুক্তিতে আখ্যাত হইত। একদিকে কনসেব, মজিল ও নাসদত্ত এবং অপরদিকে গণপতি নাস, নাসসেন,

অচ্যুত নন্দী ও বলবর্ষার রাজ্যের ভৌগোলিক সংস্থান নির্ণীত হইলে প্রশস্তির চত্রে বর্ষার অধিষ্ঠান-ভূমির লক্ষ্যন মিলিতে পারে। আৰ্য্যাবর্ষ বিস্তৃত হইলে সমুদ্রগুপ্ত আটবিক অর্থাৎ বনময় প্রদেশের সামগ্ৰিক জয় করিয়াছিলেন। এই আটবিক ভূমির মধ্যে রাষ্ট্রের সংস্থিত ধরিয়া লওয়া চলে। দক্ষিণাংশ-অভিধানের পথে সমুদ্রগুপ্ত যে দুইজন আটবিক ভূমিপতিক জয় করিয়াছিলেন তাহাদের একজন মজিল-কোণ-পতি



মিন-বুর্জি-চত্রে বর্ষা পাহাড়ের পিতা

মহেন্দ্র, অচ্যুত নন্দী মহাকান্ত্যপতি ব্যাঘ্ররাজ। বঙ্গ ও উড়িষ্যার মধ্যেই ইহাদের রাজ্য ছিল। এলাহাবাদ-প্রশস্তিতে সীমাত্ত বঙ্গভুক্তিগে সমুদ্র (পূর্ববঙ্গ), ডবাক, কামরূপ, নেপাল ও কর্ণাটের রাজ্যের নাম পাওয়া যায়। এই সমস্ত আশোচনা করিয়া বঙ্কিত পারি যে, বঙ্গ-কলিঙ্গাদির সঙ্গে রাষ্ট্র মেন ও স্তম্ভাভিধানের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। বাঙ্গালার নানা স্থানে স্তম্ভাভিধানের স্তম্ভ ও স্তম্ভাভিধান আবিষ্কৃত হওয়া

ইহা ঐতিহাসিক সত্যরূপে প্রতীত হইয়াছে। সে সময়
রাষ্ট্রধৰ্মে এমন কোন প্রবলপ্রভাব নবরপতি ছিলেন না,
যিনি গুপ্তসম্রাটগণের কবল হইতে আপনাব্যবসায়িতা
রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তথাপি
পূর্বরপাধিপতি চন্দ্রবর্মাই যে সমুদ্রগুপ্তের প্রণতির

প্রণতির স্বাক্ষর, দিল্লী-শৌহতস্থলিপির স্বাক্ষর এবং
গুপ্তনিয়া পাহাড়ের লিপির স্বাক্ষর প্রায় একই প্রকার।
অতএব গুপ্তনিয়ার চন্দ্রবর্মাই গুপ্তবাহাদুরের সময়ে
বর্তমান ছিলেন। এই অস্বাভাবিক সমর্থনযোগ্য। তবে
গুপ্তনিয়ার চন্দ্রবর্মাই যে সমুদ্রগুপ্তের সময়েই বর্তমান
ছিলেন, তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না। গুপ্ত-
সম্রাটগণের “উপরিক”গণ মহারাষ্ট্র আখ্যায় অভিহিত
হইতেন। আমাদের মতে হু, গুপ্তসম্রাটগণ এই
দেশ জয় করিয়া দেশের শাসন-সৌকর্যার্থে যে-সময়
“উপরিক” পদবীভুক্ত শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন,
চন্দ্রবর্মাই তাঁহাদেরই মধ্যে একজন। ইনি কোন
সম্রাটের অধীনে “উপরিক” নিযুক্ত হইয়াছিলেন,
জানা যায় না। তবে গুপ্ত আমলের স্বাক্ষর
সেনিয়া অঙ্কিত হু, সেন বধন স্থাপিত
হইয়াছিল, মগধের পিকা, দীকা, সত্যতা ও ধর্ম
এদেশে বধন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, চন্দ্রবর্মাই সেই
কালের লোক। ৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে (খ্রীষ্টাব্দ ১২৪)
বাহুর উত্তর সীমার দক্ষিণ উত্তর তীরে গুপ্তবর্ধন-
ভুক্তিতে মহারাষ্ট্রাবিভাগ কুমারগুপ্তের অধীনে
যে “উপরিক” ছিলেন, তাঁহার নাম চিত্রাতপ্ত।
এই চিত্রাতপ্ত বর্তমান বরেন্দ্রের উত্তরাংশে
কোটাধর্ম-বিষ্ণুর কুমারামাতা বেত্রবর্মাকে শাসনকর্তা
নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহা হইতে জানা যায়,
এদেশে সে সময় বর্মাই উপাধিধারী শাসনকর্তার
অপ্রভুত্ব ছিল না। যদি আমাদের অস্বাভাবিক সত্য
হয় তাহা হইলে বসিতে পারি চন্দ্রবর্মাই খ্রীষ্টীয়
চতুর্থ হইতে পঞ্চম শতকের মধ্যে বর্তমান ছিলেন।

গুপ্তনিয়া পাহাড়ের প্রায় ১২ কোশ পূর্বে
পথরপা গ্রাম। ইট ইতিহাস রেলপথে রাক্ষস
গ্রামের গন্ধিগে নামোদয়ের গন্ধিগে তীরে পাশাপাশি
দুইটা গ্রাম,—অধুনা “পথরপা-পলাশডাঙ্গা” নামে
পরিচিত। পথরপা সমুদ্র পল্লী। পলাশডাঙ্গার
একটা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় এবং ডাকঘর আছে।

পথরপা গ্রামের প্রাচীরে একটা উচ্চ ভূমিও



পথরপার প্রাচীরস্থ (বা প্রাক-ব্রাহ্ম) মূলের ব্রহ্মী
চন্দ্রবর্মাই, একথা বলিবার মত ঐতিহাসিক প্রমাণ
আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই।

(৪) আমাদের মতে গুপ্তনিয়া-লিপির চন্দ্রবর্মাই
বাকুড়া জেলার বর্তমান পথরপারই অধিপতি ছিলেন।

চন্দ্রবর্মার সময় সম্রাট হোর করিয়া কিছু বলা
জে না। লিপিতথ্যবিশ্ব অস্বাভাবিক করেন, এলাহাবাদ-

আমিও “গড়ের-জালা” নামে পরিচিত। জালায় উপরে কয়েক ঘর বাউরীর বাস, ইধাধিককে লোকে গড়ের বাউরী বলে। জালায় একদিকে এখন কতকগুলি ঘর হুলস্থলান বাস করে, তাহারই কাছাকাছি খানিকটা স্থান রাঘবাড়ী নামে পরিচিত। বিশাল পরিমাণ মন্দির। নিরাক্ষর, তাহারই কিয়দংশে মাঝে মাঝে বাধ দিয়া লোকে পুষ্করিণী প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে। তথাপি সেগুলি বেশিরা পরিবার লুপ্তাবশেষ বলিয়া বুঝিতে কষ্ট হয় না। পথেরপাশে প্রবাদ আছে, এখানে বহু পূর্বে একজন রাজা ছিলেন। প্রায় বিশ পটিল বস্ত্র পূর্বে পরিধান করিতেন। (বর্তমানে পুষ্করিণী) পড়োড়ার কারণে সেটা বাড়াই আকাশে লক্ষ্যমান। কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গিয়াছিল। প্রস্তরগুলি আদর্য্য সে বিষয় আদর্য্য হি। সেগুলি কোন মন্দির বা গৃহের অবশিষ্টে ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।



পথেরপাশে প্রায় তৎপূর্ণ সিংহবাহিনী বৌদ্ধ মূর্তি উদ্ধৃত্তে পুস্তক, এবং অপর দুই মূর্তি বীণা। এই মূর্তিটী কোন যুগের, স্থানীয় বা অন্যথায় নির্মিত হইতে পারে কিনা তাহা নির্ণয় করা যায় না। তবে প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছেন না, তবে প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। ক্ষুদ্র মূর্তির ভাষায় দেখিয়া বৃষ্ নির্ণয় বিশেষজ্ঞগণেরই সাধ্যাত্ত। তথাপি এ কথা বলা চলে যে, স্থাপত্য বা ভাস্কর্য্যের কোন বিশিষ্ট রীতির অনুকরণ বহু দিন ধরিয়া চলিতে থাকে। এমনকি একস্থানে কোন শৈলী এখনও বহুদূর পর্যন্ত আদর্য্য পৌছিয়াছে, অত্বে তখন সেই শৈলীরই দ্বারা প্রথম অনুকরণ শুরু হইতেছে, একদল মন্দির থাকে। রাজ্য চলিয়া গেল, সবুজ জনপদ ফলে হইয়া গেল, বিশেষজ্ঞ দ্বিতীয় অধিবাসিন ভাগ্যকে দ্বিধা পুরাতন রীতি-নীতি

মূর্তিগুলি প্রাচীন, তবে কত প্রাচীন নির্ণয় করা যায় না। অষ্টকুমা মন্দিরবাহিনী মূর্তিটি পাণ-রাজবংশের পেরের দিকের অথবা সেন-রাজবংশের প্রথম আমলের বলিয়া মনে হয়। অপরপাশে তৎপূর্ণ মূর্তি দেখিয়া কাল-নির্ণয় হয় কিনা সন্দেহ।

পথেরপাশে হইতে তিনটা মূর্তি সংগৃহীত হইয়াছে, (১) একটি পোড়ামাটির নারীমূর্তি; ঐচ্ছিক স্থানীয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে এটা কুশাণ-যুগের, এমন কি তৎপূর্ণ কালেরও হইতে পারে। (২) একটি সিংহবাহিনীর ক্ষুদ্র প্রস্তরমূর্তি, নারী সিংহের উপর উপবিষ্টা, বামহস্তে

একটা শিশু। বাম পার্শ্বে আরো দুইটা মূর্তি। স্থানীয় বাবু বলেন, এটা গুপ্ত যুগের। তুনিলায়, ইতিহাসিক রায় বাহাদুর ঐচ্ছিক রমাশ্রমাদ চন্দ এবং বিদ্যুৎ ঠেলা ক্রান্তির প্রভৃতিও নাকি এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

(৩) একটি বাগীচরী মূর্তি। এই মূর্তি চতুর্ভুজা। দক্ষিণ উর্দ্ধহস্তে দ্ব্যধাপূর্ণ কলস,

কিংবা একটি কমল, বাম উর্দ্ধ-হস্তে পুস্তক, এবং অপর দুই হস্তে বীণা। এই মূর্তিটী কোন যুগের, স্থানীয় বা অন্যথায় নির্মিত হইতে পারে কিনা তাহা নির্ণয় করা যায় না। তবে প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছেন না, তবে প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। ক্ষুদ্র মূর্তির ভাষায় দেখিয়া বৃষ্ নির্ণয় বিশেষজ্ঞগণেরই সাধ্যাত্ত। তথাপি এ কথা বলা চলে যে, স্থাপত্য বা ভাস্কর্য্যের কোন বিশিষ্ট রীতির অনুকরণ বহু দিন ধরিয়া চলিতে থাকে। এমনকি একস্থানে কোন শৈলী এখনও বহুদূর পর্যন্ত আদর্য্য পৌছিয়াছে, অত্বে তখন সেই শৈলীরই দ্বারা প্রথম অনুকরণ শুরু হইতেছে, একদল মন্দির থাকে। রাজ্য চলিয়া গেল, সবুজ জনপদ ফলে হইয়া গেল, বিশেষজ্ঞ দ্বিতীয় অধিবাসিন ভাগ্যকে দ্বিধা পুরাতন রীতি-নীতি

অঁকড়াইয়া বাস্তব মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া রহিল।
মুসের পর কুপ বহিয়া সেল, তাহাদের অবস্থা ফিরিল না,
তাহারা মৃতকে গ্রহণ করিতে পারিল না, ইতিহাসে
এ দুইজনের অভাব নাই। আবার পরবর্তী কের
আদিয়া পুরাতনের আরও কবিরাজের, কবর পুরাতনেরই

মূর্তি তিনটী সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলি কতদিন পূর্বে
কিভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, অথবা কেহ অস্ত কোন
স্থান হইতে বহন করিয়া আনিয়াছিল, স্থানীয় লোকে
তাহার কোন সংবাদ বলিতে পারেন না। সংগৃহীত
মূর্তি তিনটী মাটির উপরেই গ্রাম-সেবতার বোঁদীর মধ্যে
পাওয়া গিয়াছে। পোড়ামাটির মারীমূর্তি ও চতুর্ভুজা
বাগীষরী বাগ্‌দী-পাড়ার মনসাতলার এবং সিংহবাহিনী
মূর্তি বাজাপিড়ি ধর্মশালতলায় ছিল। এই দুই স্থানেই
আরো তত্ত্বমূর্তি ও প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে। আনাসের
মনে হয়, এগুলি পথরূপা বা আশ-পানের গ্রাম হইতেই
সংগৃহীত। নানা কারণে অস্বাভাবিক করিতে হয় যে,
চন্দ্রবর্মার পরবর্তী কালে পাল এবং সেন রাজাদের
সময়েও পথরূপা সত্ত্ব জনপদ ছিল। ততনিয়া পাহাড়ে
অপর যে কয়েকটী ক্ষুদ্র সিঁপি আছে, সেগুলির পাঠোচ্চার
হইলে অনেক রহস্যের সন্ধান মিলিতে পারে। এদিকে
ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পথরূপার দক্ষিণে “টানাই” গ্রাম। “সিলাই” নামে
একটা মলিনাটী (ঝোড়) ও “চক্কাই” গ্রামের নামাঙ্কনায়
স্থনীতিবাসু “চন্দ্রাবতী”, “সিংহাবতী,” এবং “চক্রাবতীর”
লগ্নাবনা অস্থান করিয়াছেন—চন্দ্রবর্মী, সিংহবর্মী এবং
চক্রবর্মীর মূর্তি উহারাই রক্ষা করিতেছে, এইরূপই
উদার অস্থান। পথরূপার আশ ক্রোশের মধ্যেই
চন্দ্রাবতী ও সিংহাবতীর দ্বিতী। সিলাই আবার গ্রামও
নয়, গ্রামের মল-নিকাসের বড় নালা। রাজধানীর
মধ্যেই তাহা হইলে সিংহাবতী ও চন্দ্রাবতী দুইটা পাড়া
ছিল, স্বীকার করিতে হয়। চক্রাবতীতে চক্রবর্মীর
মন্দির থাকিলে ততনিয়ার তাহার অস্ত দিলা-সেখের
প্রয়োজনীয়তা কেন হইয়াছিল, ভাবিবার বিষয়।
গ্রাম উৎসর্গের প্রাচীন রীতি ও এক্স ছিল না।
সিঁপিতে কোন বিষমপতি, বা পুতলাল, বা ত্রেটী, বা
কুলিক বা কাপড় প্রভৃতি কুইরীপকে কোন সন্ধান
নাই। স্তবরাং এই সমস্ত অস্থানের সমর্থনযোগ্য
আরো প্রমাণ চাই।

(৫) আনাসের মতে চক্রবর্মী বিজয় নাম



পথরূপার প্রাণ পরবর্তী-মূর্তি

পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে, এমনও দেখা গিয়াছে। স্বল্প
ঐক্যশ ভরণে সেখান কোন বিশেষ স্থান নির্ণয় কত-
খানি নিরাপদ বলিতে পারি না। বড় কোর এই
কথা বলা চলে যে, এই মূর্তি এই মুসের ভাব্যের
রীতিতে গঠিত।

পথরূপার যে মূর্তিগুলি সেখান আনিয়াছি, এবং যে

নহে, এবং লিপিতে কোন গ্রাম উৎসর্গের কথা নাই।

প্রাচীনকাল বিচাগের অন্ততম অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীমুক্ত কান্দিলাথ নারায়ণ লৌকিত মহাশয় “চৈত্ৰ-স্বামিনে বোলগ্রামোক্তি স্মৃতিঃ”—লিপির একাংশের এইরূপ পাঠ নির্ণয় করিয়াছেন। “খোস”গ্রাম গুণনিয়ার নিকটে পাওয়া যায় নাই। চকাই, সিন্ধাই, চাড়াই বাচিয়া থাকিলে তাহারও থাকা উচিত ছিল। আমাদের মনে হয় গুণনিয়ার বে অংশে লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে, পূর্ণে সেই স্থানে একটি গুহা ছিল, এবং সেই গুহা বা উক্ত স্থানটী চক্রবাসী নামক কোন সাধুকে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল। এই সাধু হয়ত চন্দ্রবর্ষার শুরু বা শুরুস্থানীয় ছিলেন। বিষ্ণুর সহস্র নামের মধ্যে অথবা কোন পুরাণ বা তন্ত্রাদিতে বিষ্ণুর “চক্রবাসী” নাম পাওয়া যায় না।

দামোদরপুরে আবিষ্কৃত খণ্ডপত্রের দ্বিতীয় তাম্রলিপি হইতে “কোকানুথ স্বামী” ও “বেতবরাহ স্বামী” সেবতাক্ষের নাম পাওয়া যায়। এই লিপির কাল আনুমানিক খ্রীষ্টাব্দ ১ম শতকের শেষ ভাগ। এই দুই দেবতার মন্দির পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির কোটীবর্ধ-বিষ্ণুর অন্তর্গত “হিমবন্ধিধর” নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রাধিপতিক ভাস্করপ্তের রাজ্যকালে (খ্রীষ্টাব্দ ৫০০-৩৪ অব্দে) বেতবরাহস্বামীর মন্দির পুনঃসংস্কৃত হয়। বেতবরাহ নাম পুরাণে পাওয়া যায়। “কোকানুথ” শব্দের অর্থ কি? কামদাসের অপর নাম কোকদাস। কোকানুথ কামদেব, কি বিষ্ণু, কি অপর কেহ—পণ্ডিতগণ তাহা নির্ণয় করিবেন। এই দুইটি নাম দেখিয়া চক্রবাসী যে বিষ্ণুর অপর নাম হইতে পারে না, যোগ করিয়া এ কথাও বলিতে পারি না। তবে সেকালে ব্যক্তিবিশেষেরও স্বামীমুক্ত নাম অনেক পাইতেছি। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মহীর নাম ছিল শিখরস্বামী। প্রথম কুমারগুপ্ত বরাহস্বামী নামক একজন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। বাখালায় বংশাদিত্যের তাম্রলিপিতে গোপালস্বামী, বাহুসেব-

স্বামী ও সোমস্বামী নাম পাওয়া যায়। গোপালস্বামী শাসনকর্তা, বাহুসেবস্বামী ভূমিদাতা, এবং সোমস্বামী ব্রাহ্মণের পরিচয় পাই। গোপালস্বামীর তাম্রলিপিতে শাসনকর্তা বংশপালস্বামী ব্রাহ্মণ ভট্টগোবীন্দর স্বামীকে ভূমি দান করিয়াছেন। সমাচারলেখকের তাম্রশাসনে হুগ্রতীকস্বামীর নাম পাওয়া যায়। চক্রস্বামী এইরূপ কোন ব্যক্তির নাম হওয়া আশ্চর্য্য নহে। উৎকীর্ণ চক্রটিকে দেখিয়া বিষ্ণুরূপ বলিয়াই মনে হয়। আমাদের অগ্রহমান, চন্দ্রবর্ষা অথবা চন্দ্রস্বামী অথবা দুইজনই বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন; চক্রটী তাহারই প্রতীকস্বরূপ উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহা “রাজমুদ্রার” মত ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা তাহাও চিত্তার বিষয়।

বীরভূমের সীমাগ্রে বৃন্দাবান জেলায় “গোকর্ণ” নামে একটি স্থান আছে। লোকের এখানে বলে, “গোকর্ণে কে কার কড়ি ধারে।” এইরূপ পথরণ্যের নামও “গোকর্ণ” ছিল বলিয়া সম্ভব হয়। গোকর্ণ সংস্কৃত রূপ ধরিয়া পুস্তকবা হইরাছে। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-প্রশস্তিতে “বেদীন্দর”, “এরুণ্ডর,” “কৃষ্ণপুত্র” প্রভৃতি নাম দেখিয়া মনে হয়, সেকালেও রাজধানীর নামে (পুত্র কুশ?) রাজাদের পরিচয় দেওয়া রীতি ছিল। সুতরাং চন্দ্রবর্ষা আপনাকে “পুস্তকরাধিপতি” নামে পরিচিত করিয়া কাল ও সেনের রীতি ও প্রভৃতি বিবৃদ্ধ কিছু করেন নাই। পরবর্তী কালে রচিত সঙ্ঘ্যাকরনন্দীর রামচরিতে এইরূপ নগরপুরের নামে পরিচিত সামন্তরাজগণের সাক্ষাৎ পাই। পথরণ্যের সীমানা খুব বড় ছিল বলিয়া মনে হয় না।

গুণনিয়া শৈলের সমুদ্রতটে, বাঁকড়া হইতে আসিবার পথের ডাহিনে একটি কুণ্ডা আছে। প্রতি চৈত্র-শুক্রাঙ্কিতে এই কুণ্ডার পাশে একটি মেলা বসে। এই স্থানের একটি মূর্তিকে লোকের নরসিংহ মূর্তি বলে। একশত প্রভেদের উপরে একটি সিংহের প্রতিমূর্তি। নীচে অর্ধাঙ্গক কোন সৈনিক বা সেনাপতির

সম্মুখে একজন লোক পথ দেখাইয়া চলিতেছে, পশ্চাতে একজন ছত্রধারী, অস্বাভাবিক স্তম্ভের মাগের ছাড়া ধরিয়া আছে।' স্থানীয়বাদী বলেন, এই ধরনের স্তম্ভের নাম "বীরকল"। দাক্ষিণাত্যে এইরূপ প্রস্তর-স্তম্ভ প্রচুর আছে। মুখে কোন সৈনিক বা সেনানী নিহত হইলে এসে সেখানে এই ধরনের স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার স্তম্ভ রক্ষা করা হইত। ছাত্রবাস এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামে এইরূপ স্তম্ভ করেকটাই দেখিয়া আসিয়াছি। এই স্তম্ভগুলি কি দাক্ষিণাত্যপতি রাজেন্দ্র-চোলের রাজ-অভিষেকের স্তম্ভ রক্ষা করিতেছে?

বঙ্গালার ইতিহাস আলিও লিখিত হয় নাই।

অথচ ইতিহাস না হইলে চলিবে না। নিজেকে চিনিতে এবং জানিতে হইলে ইতিহাস চাই-ই। অজ্ঞপায় জাতি-গঠনের কাজে, লক্ষ্য-নির্ধারণ ও পথ-নির্দেশে পদে পদে কটী-বিচ্যুতি ঘটিবে, বাধা আসিবে। স্তম্ভে। বঙ্গালার ইতিহাসে পশ্চিম-বঙ্গের স্থান উল্লেখযোগ্য। বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং বাকুড়া আলিও বেসমত উপকরণ ইত্যন্ত: ছড়াইয়া আছে, সেগুলি দেখিয়া দাখাইয়া গুছাইয়া লইতে পারিলে বঙ্গালার ইতিহাসের প্রায় অর্ধাংশের উদ্ধার সাধন হইতে পারে। আমরা এসিকে বঙ্গালার ভ্রম-দলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

“আপনি খাইব, মুখ হইবে আর একজনের; আপনি পরিব, তুষ্ট হইবে আর একজন; আপনি ধনসঞ্চয় করিব, আর একজনের ভাবী হিতসাধন হইবে; এই ভাবটি বিবাহ-প্রণালী হইতে অতি সহজে এবং সাধারণতঃ জন্মিয়া থাকে। স্বার্থ এবং পরার্থ মিলাইয়া দেওয়া বিবাহ-সংস্কারের কার্য। বিবাহ দ্বারা স্বার্থবুদ্ধি সংশোধিত হইয়া পরার্থের সহিত একীভূত হয়—এইজন্তই বিবাহ অতি প্রধান ‘সংস্কার’।”

—ভূদেব মুণোপাধ্যায়

ভারবাহী

শ্রীশৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়

ভবভূতি যে সভ্য-সভ্যই বহু পাশল হইয়া গিয়াছে, সে কথা বৃত্তিতে কাহারও বিশেষ সন্দেহ হইল না। কিন্তু সর্বনাশ, এত বড় একটা বিরাট সংসারের একমাত্র কর্ণধার ঐ ভবভূতি, — অতগুলি সোকের মুখে তাহাকেই ছুঁবেলা আর জোপাইতে হয়, অথচ সে-ই কিনা আশ উদ্ভাস হইয়া গেল। এমন বিখ্যাতর বিধান।

কিন্তু উদ্ভাস সে হইল কেন? স্বপ্ন, প্রিয়দর্শন সুবক, এই সেদিনও তাহাকে হাসিয়া কথা বলিতে দেখিয়াছি, বিপদের সময় তাহারই পরামর্শ চাহিয়াছি, কিছুদিন আসেও বাহাকে আমাদের গ্রামের সৌর্য বলিয়া মনে হইত, আজ আর তাহার কাছে সাহস করিয়া অগ্রসর হইবার উপায় নাই, বহু বলিয়া আপের মত তাহার কাছে গিয়া পাড়াইলে সে আর চিনিতেই পারে না। কে-ই বা তাহার বন্ধ, আর কে-ই বা আত্মীয়, কে-ই বা স্ত্রী, আর কে-ই বা কন্যা! এই দু'দিন আগে বাহারা ছিল তার সর্গাপেক্ষ! প্রিয়, এখন আর বেন তাহাদের সঙ্গে ভবভূতির কোনও সাক্ষর নাই, সে বেন তাহার বাস করিবার মত একটা পুশকু জগৎ মনে-মনে তৈরি করিয়া লইয়াছে; সেখানে কে যে তাহার সাক্ষী আর কে যে প্রিয়—কে জানে। তুমি মনে হয় দিব্যাত্মি তাহাদেরই সঙ্গে সে বেন বিড়, বিড় করিয়া কথা বলিতেছে। ডাকিলে সাড়া দেয় না, না ডাকিলেও চীৎকার করে।

ভবভূতিক দেখিলে চোখ কাটিয়া মল আসে।

ডাক্তারকে সেদিন মিথ্যাসা করিয়াছিলাম, ‘কেন এমন হ’ল বলুন যে’।

ডাক্তার তাহাদের ধ্বংসের বিবরণ জানিতে চাহিলেন। বলিলেন, ‘ওদের বংশে কেউ কোনদিন পাগল ছিল কি?’

ভিল না আমি জানি। বলিলাম, ‘না’।

তাহার পর ভবভূতিকে তিনি একদিন নিজে দেখিয়া গেলেন।

ডাক্তারকে সে বেশ ভালই চিনিতে, কিন্তু সেদিন আর তাঁতাকে সে চিনিতে পারিল না। ডাক্তার তাহার কাছে থিরা নমস্কার করিয়া পাড়াইতেই ভবভূতি চীৎকার করিয়া উঠিল, ‘বেরোও টুপিড, পাশি কাঁহাকা! টাকা! টাকা! আমি বৃত্তি টাকার পাহ? টাকা যদি আমার কাছে না থাকে ত’ তোর বাবার কি রে—!’

এই বলিয়া সে আপন মনেই বিড়, বিড় করিয়া কি বেন বলিতে বলিতে হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

ডাক্তারবাবু মিথ্যাসা করিলেন, ‘কি বলছ, ভবভূতি?’ ভবভূতি প্রথমে সাড়া দিল না। তাহার পর অনেক ডাকাডাকির পর সে মুখ তুলিয়া চািল। চাহিয়াই হাত নাড়িয়া দূর করিয়া গান ধরিল—

‘দিন ফুরালো আমিকে আমার ব্যাকুল বাসন-পাষে’।

এবং তাহার পরের লাইন হইল—

‘অলপ বয়সে পুত্রিত করিয়া রহিতে নারিছ যবে’।

এমনি সব ভবভূতির অনেক কাণ্ডকারখানা ডাক্তারবাবু স্বচক্ষে দেখিলেন। দেখিয়া আমার আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া মিথ্যাসা করিলেন, ‘আপনি যদি দয়া ক’রে একটি কাম করতে পারেন ত’ ভাল হয়।’

বলিলাম, ‘কি কাম বলুন?’

ডাক্তারবাবু তাহার জীবনের সমস্ত বুজান জানিতে চাহিলেন। বলিলেন, ‘আপনোড়া একটি কাগজে যদি আমার লিখে দিতে পারেন ত’ কেসটা একবার ঠাতি করতে পারি।’

বলিলাম, ‘ওকে সারিয়ে দিন, ডাক্তারবাবু, নইলে ওর দশোরে এই এতগুলি দায়ব—’

কপাটা ডাক্তারবাবু আমাকে আর শেব করিতে
দিলেন না, বলিলেন, 'বুকেছি।'

ডাক্তারের কথায় আশ্রয় হইয়া ভবভূতির জীবনী
আমি বখাসপত্র সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা
কোনও কাজে লাগিল না। সেখাটা ডাক্তারবাবু পড়িয়া
আমার পাতের উপর ছুঁড়িয়া দিলেন। বলিলেন, 'রাখিল,
এসব সাহিত্য কর্ত্তে তোমায় কে বসেছিল, হে
হোকেবা? আমি বা চেয়েছিলাম, এ তা' নয়।'

কি যে তিনি চাছিলেন, বুলিলাম না। আবার
যে নৃতন করিয়া লিখিব তাহারও অবসর আর নাই।
ভবভূতির পাশ্চাত্যি আরও বাড়িয়াছে। সন্সার ত'
একরকম অচল বলিলেই হয়।

ভবভূতি সম্বন্ধে বাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাই এখানে
তুলিয়া বিলাম। উহা ত' কাহারও কোন কাজে লাগে
নাই, স্তম্ভরাং সাহিত্যের কাজে লাগিতে পারে বলিয়াই
আমার বিশ্বাস।

ভবভূতিক বাল্যকালে আমরা ভূতি বলিয়াই
ডাকিতাম। এখন তাহার বয়স প্রায় পঁইত্রিশ, কিন্তু
নাম তাহার সেই ভূতিই রহিয়া গিয়াছে।

ভূতির জীবনের সমস্ত ঘটনা বিতারণিতভাবে
বর্ণিত বেলে প্রকাণ্ড একখানা উপভাস হইয়া পড়িবে,
কাজেই সে-চেটা আমি করিব না। বখাসপত্র
সম্বন্ধে তাহার জীবনের কথা বর্ণিত চাই।

ভূতির বয়স এখন পনেরো-ষোলো, তখনকার
কথাই বলি। ভূতি তখন ইকুলে পড়ে। গ্রাম
হইতে ইকুল প্রায় দাইল-ছইএর পথ। সকলে
মিলিয়া হাটিয়াই যাই, হাটিয়াই আসি। ইকুলে
হাইবার আগে ভূতিকে এক-একদিন ডাকিতে

হাইতাম; সেদিনও গিয়াছিলাম। গিয়া দেখি,
ভূতি তাহাদের সদর দরবার কাছটিতে বই-খাতা
হাতে লইয়া দ্রামমুখে ঝাঁড়াইয়া আছে, আর ঘরের
ভিতরে যা তাহার চীৎকার করিতেছেন। আমি
হাইবামায় ভূতি বলিল, 'চল।' বলিয়াই সে আমার
সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল।

মিঞাসা করিলাম, 'খেতেছি?'

ভূতি বোধ হয় 'হা' বলিতেই হাইতেছিল, কিন্তু
তাহা হইলে নেহাৎ মিথ্যা। বলা হয় বলিয়াই বোধ করি
বলিল, 'না।'

কিরিতে আমাদের সন্না হয়। বলিলাম,
কি রে! সন্না পর্য্যন্ত না খেয়ে থাকবি?'

ব্যাপারটা যেন কিছুই নয় এমনভাবে ভূতি বলিল,
'তাতে কি হয়েছে! তোমাই ত' আমি এসে খাই।'

'কেন? সকাল-সকাল রান্না হয় না ভূতি?'

ভূতি কথা বড় কম বলে। সস্ত দিন হইলে
হয়ত' চুপ করিয়াই থাকিত, কিন্তু সেদিন তাহার
কি হইয়াছিল কে জানে, কথা বলিল। ঈহৎ
হানিয়া বলিল, 'আমি আমাদের এখনও রান্নাই
চড়নি। ঘরে চাল নেই।'

অবস্থা তাহাদের ভাল নয় জানি, কিন্তু তাই বলিয়া
রান্না চড়ে না, সে কথা স্বরনাও করিতে পারি নাই।
তনিয়া হুং হইল। তাবিলাম, আমাদের বাড়ী
লইয়া গিয়া ভূতিকে খাওয়াই। কিন্তু তাহাকে
আমি বাল্যকাল হইতেই চিনি। জানি, সে হাইবে
না। কাজেই দু'জনে দীরবেই পথ চলিতে লাগিলাম।
খানিক পরে হঠাৎ মিঞাসা করিলাম, 'তোমার মা
বুঝি ঐকন্তেই কপড়া করছিল?'

মা অর্থাৎ ভূতির বিমাতা। তাহার মা নাই।
কপাটাকে ভূতি উড়াইয়া দিল। বলিল, 'না
না, ও কিছু নয়, সেমন্তে কেন হবে? ও—এমনি।'

হাই হোব, বুলিলাম—বলিতে সে চায় না।

গ্রামটাকে ঝাঁ-হাতি কেলিয়া রাখিয়া ইকুলে হাইবার
দর মার্ঠের উপর গিয়া যে পোখা রাতাটা আমার

আবিকার করিয়াছিল। মৃত্যুমাত্র তখন আমরা সেই মেঠো পথ ধরিয়াছি, এমন সময় পল্কাতে তাক তুলিলাম, 'কুতোদা! কুতোদা!'

হু'লেনেই পিছন ফিরিয়া তাকাইলাম। বেশি, তৃত্তির বৈশাখের ভাইটা ছুটতে ছুটতে আমাদেরই দিকে আগাইয়া আসিতেছে। ছেলের নাম নিরঞ্জন। কাছে আসিয়া বলিল, 'বাবা তোমার ডাকছে, কুতোদা।'

তৃত্তি ভিজালা করিল, 'কেন?'

নিরঞ্জন বলিল, 'তা আমি কি জানি! আসবে ত' এসো, না আসবে ত' বলে যিচ্ছি—এলো না।'

তৃত্তি আমার হৃথের পানে তাকাইল। তাকাইবার অর্থ—তুই আম একাই ইচ্ছলে যা, আমার ফিরিতেই হইবে।

বলিলাম, 'চল্ তবে মাঝ আমারও গিরে কাছ নেই। বাড়ীই ফিরে যাই।'

হু'লেনেই ফিরিলাম।

তৃত্তি একটুখানি তাড়াতাড়ি আগে-আগে চলিতেছিল, তাহার পর নিরঞ্জন, তাহার পর আমি। দুযোগ বুকিয়া নিরঞ্জনকে ডাকিলাম, 'শোন্!'

'কি?'

'তৃত্তিকে শুষ্ক লাগা বলতে পারিল্ না? 'কুতোদা' 'কুতোদা' কি?'

নিরঞ্জন বলিল, 'বা-রে! ঐ ত' ওর নাম।'

'দামাকে বুকি নাম ধ'রে ডাকতে হয়?'

'কি বল?'

'শুষ্ক 'দাদা' বলি। 'কুতোদা' আবার বলে নাকি? হি!'

নিরঞ্জন বলিল, 'আজ্ঞে বেশ মশাই, তাই হবে।'

ছেলেটি পাকা শরতান। তৃত্তির ভাই বলিয়া মনে হয় না। নিরঞ্জনকে চিনি। স্ততরাং বিম্বিত হইবার কিছুই নাই। তন্ কাছে পাইয়া মাথার তাহার ঠাল করিয়া একটা চক্ষু মারিয়া বলিলাম।

নিরঞ্জন একবার 'উঃ' বলিয়াই আমার হৃথের পানে

তাকাইয়া বলিল, 'হু' গিরে দাও, নইলে চল উঠে যাবে।'

খানিক দূর গিয়া ভাল করিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া ভিজালা করিলাম, 'হা-রে নীক, তোর বাবা ওকে কিভাবে ডাকছে রে?'

তৃত্তি তখন অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছিল। নিরঞ্জন আমাকে সব কথাই পুটিয়া বলিল। হু' তিন মাস ধরিয়া তৃত্তির ইচ্ছলের বেতন সেওয়া হয় নাই। পত করেক দিন হইতে তৃত্তি তাহার বাবাকে সেই কথাই বলিতেছিল। আম বলিয়াছিল, বেতন না দিলে সে পরীক্ষা দিতে পারিবে না। অথচ তাহার বাবার হাতে টাকা নাই। স্ততরাং না তাহার বাবাকে একটা খুব ভাল বুদ্ধি বিখাইয়া দিয়াছে। এই মাসেই তৃত্তির বিবাহ দিতে হইবে এবং তাহা হইলে ইচ্ছলের ব্যবতীর খরচ আর তাহাদের দিতে হইবে না, তৃত্তির পত্তর দিবে। তাই তাহার বাবা তৃত্তিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে আর ইচ্ছলে যাইতে হইবে না।

হাত নাড়িয়া চোপের ইসারা করিয়া কথাটা আমাকে নিরঞ্জন বেশ ভাল করিয়াই বুঝাইয়া বলিল। কিন্তু সেইখানেই বলা তাহার শেষ হইল না। পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ এক সময় গমঝিঝা গাড়াইয়া পিছন ফিরিয়া অত্যন্ত ছুপিছুপি করিল, 'কুতোদার ইচ্ছলের মাইনে এতদিন কে দিচ্ছে জানো?'

বলিলাম, 'কে?'

পত্তীরভাবে নিরঞ্জন বলিল, 'মা। পয়সা বিক্রী করে' দিচ্ছে।'

তাহার পরেই তৃত্তির বিবাহ।

বিরে কি রে! আমরা ত' অবাচ্! তৃত্তি কিন্তু চিরকালই কম কথা বলে। আমাদের এগ্রে সে একবার হাসিল মাত্র।

কিন্তু তাহার বাবা রামলোচনের মূখে আমরা সবই শুনিলাম। বাণেশিখাডাঙ্গ হরি মিছিরের পোদ্দারী ঘোঁকানের আট্টাচালার একটা পুঁটি হুঁসে দিয়া রামলোচনকে প্রায়ই বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। কেন যে তিনি সেখানে এমন কঠিন্য বস্তুর পর বসিয়া কাটান সে-কথা আমরা জানি, এবং জানি বলিয়াই কৃত্তিক কোনদিন জিজ্ঞাসা করি নাই।

রামলোচন গাঁজা খান।

অবশ্য একা খান না। সন্ধ্যার আগে গ্রামের আরও অনেকেই শুধু ঐ একই গ্রেগোয়াননে আসিয়া ঘোটে এবং অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঐখানে বসিয়া বসিয়া আড্ডা চালায়।

সেদিন ঐ আড্ডার হাকখানেই রামলোচন বসিয়া বসিলেন, ‘মাহুৎ তাহ’লে আর কিজন্তে সময়ের ছেলে চাষ বল দেখি, বিহারী! এই ত’, অবস্থা দেখেছ আমার এত খারাপ, ছ’দিন পরে আবার সেখা, কৃত্তির বিয়েটা একবার চুকে যাক্।’

বিহারী জিজ্ঞাসা করিল, ‘বিয়েতে কিরকম পাওনা হচ্ছে বল দেখি?’

রামলোচন হাসিয়া বলিলেন, ‘তা নগদে পহনা-গাঁটতে প্রায় হাজার-দেড়েক টাকা। কম কি?’

কম যে নয় সে-কথা সকলেই স্বীকার করিল। হুতরাং বৃত্তিতে পারা পেল, কৃত্তির বিবাহ রামলোচনের অভাব ঘুটাইবার ক্ষম।

কৃত্তির তাহাতে আপত্তি করা চলে না।

আপত্তি সে করিলও না। বিবাহ নির্মিমে চুকিয়া পেল।

সেখিলে মনে হয় কৃত্তিক সে কোলে করিয়া যায়। গাঁটা বারকতক্ দুধাইয়া আনিতে পারে।

বগসে সে কৃত্তির চেয়ে বড় কিনা সে সন্দেহও মনে-করিতে লাগিল, কিন্তু রামলোচন বলিলেন, ‘না, হে না, হুঁসীর বরের বেয়ে ত’ নয় যে, না খেতে পেয়ে শুকিয়ে এতটুকু হ’য়ে যাবে! অমনি বৌই আনি চেরেছিলাম।’

ইহার উপর আর কথা চলে না।

তা যেমন শাত্তী, তেমনি বৌ।

শাত্তীর নাম লক্ষী, আর বৌএর নাম সরস্বতী।

পৈতৃক যে কয় বিধা ধানের জমি রামলোচন পাইয়াছিলেন, একমাত্র তাহারই উৎপন্ন ফসল হইতে ভাতাকে সন্ধ্যার চালাইতে হয়। বারো মাসের খরচ তাহাতে ভাল করিয়া চলে না। একাত্তাই ধনন অচল হইয়া গঠে লক্ষী-বৌকে তখন তিনি বাগের বাড়ী পাঠাইয়া দেন। নিরন্তরকে লইয়া লক্ষী-বৌ বাগের বাড়ী চলিয়া যায়। কৃত্তিকে বলেন, ‘তুইও তোমার মাঝার বাড়ীতে দিনকতক থেকে আর সে যা। আর আদ্যবার সময় আমার কাছ থেকে কিছু চেরে আনিদু। বলিস—ইন্সুলের হাইনেটা মাসে মাসে পাটিয়ে নিও।’

এই ব্যবস্থাতেই বছরের পর বছর কাটিতেছিল।

কিন্তু এরকম সুব্যবস্থা সন্দেহ লক্ষী-বৌএর কয়েকটি সোনার পহনা সেই যে বন্ধক পড়িয়াছে, রামলোচন এখনও তাহা ছাড়াইয়া দিতে পারেন নাই।

লক্ষী-বৌএর কাছ হইতে রামলোচনকে তাহার ক্ষম পহনাও কম সহিতে হয় না।

লক্ষী-বৌ বলে, ‘মক্কাবার ধাড়ি! মাগ-ছেলে পোদ্দার ক্ষমতাই যদি না থাকে ত’ বিয়ে করুতে গিরেছিলে কেন?’

রামলোচন গাঁজা খাইয়া চোখ দুইটা লাল করিয়া শ্রীর ঘিকে একঘুটে তাকাইয়া থাকেন, আবার কখনও বা হি হি করিয়া হাসেন।

লক্ষ্মী-বৌ বলে, 'হাস্দ্ কোন্ লক্ষ্মার গনি !
এই বে পরমাণ্ডলে আনার—'

পহনার কথা উঠিলে সহজে আর পামিতে
চাহিবে না, রামলোচন তাহা জানেন। কাছেই
হা হা করিয়া হাত নাড়িয়া তাহাকে থামাইয়া দিয়া
বলেন, 'চূপ কর লক্ষ্মী-বৌ, তুতির বিয়েটা একবার
দিতে দাও, বস্তু, তোমার পরনা তখন যদি আমি
না ছাড়িয়ে দিই ত' তুণে সাত হাত নাকথৎ
সেবো।'

তা নাকথৎ তাহাকে দিতে হয় নাই। তুতির
বিবাহ দিয়া সর্বপ্রথম তিনি লক্ষ্মী-বৌএর পহনাগুলি
ছাড়াইয়া দিয়াছেন, বড়ের পরধানা নুতন করিয়া
ছাওয়াইয়াছেন এবং বাকি টাকা তানিয়া তানিয়া
দিন তাহাদের এখন বেশ ভালই চলিতেছে।

ঝিকির পুহুরে হাত খুইতে দিয়া সরস্বতী
গেদিন আছাড় বাইয়া পড়িয়া পেল। লক্ষ্মী বলিল,
'দে' সেলে, বোমা ? শাপেনি ত' ?'

সামান্য একটুখানি লাগিলেও বোমা ঝড় নাড়িয়া
বলিল, 'না।'

লক্ষ্মী বলিল, 'তোমার বাবাকে বোলো, বোমা,
এবার যেন কিছু টাকা তিনি তোমার হাতে দিয়ে
সেন। কিছু ইউ পুড়িয়ে এই ষাটটা তাহ'লে বাঁধিয়ে
সেবো, বাছা। বর্ষাকালে তোমার তাহ'লে কষ্ট হবে
না।'

সরস্বতী বলে, 'বলব।'

লক্ষ্মী বলে, 'আর শুধু ষাট বাঁধালেই ত' চলবে
না, না, ষাটির যত খাখ। তোমার অভ্যেস নেই,
তোমার ক্ষেপে দালান-বাড়ী ত' একখানি তোমার
বাবাকে তৈরি ক'রে দিতেই হবে। তোমার
শওরকে এবার আমি তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দেবো।
তুনি হয়ত শুদ্ধিতে তোমার বাবাকে সব কথা
বলুত পাববে না।'

সরস্বতী শেখিতে লম্বা-চওড়া হইলেও তখনও
নিভাত ছেলেমানুষ। ঝড় নাড়িয়া বলে, 'হ্যাঁ।'

কিছুদিন ধরিয়া আকাশকুহলের চাষ তাহাদের
এমন করিয়াই চলে।

তুতি আমাদের সঙ্গে ইকুলে যায়। বৌএর
কথা তুলিয়া আমরা তাহার সঙ্গে হাসি-রহস্য করিতে
ছাড়ি না। কিন্তু তাহার কি যে চূপ করিয়া থাকা
স্বভাব, অনেক করিয়া বলিলে হয়ত' একটুখানি
হাসে।

কিন্তু তাহার পড়া আর বেশি দূর অগ্রসর
হইল না, আর ছ'মাস ইকুলে থাকিলেই তুতি
ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিতে পারিত, কিন্তু লক্ষ্মার
সে তাহার ইকুলে যাওয়া বন্ধ করিল।

তুতির তখন বিবাহিত জীবনের দ্বিতীয় বর্ষ
চলিতেছে। লক্ষ্মা তাহার সেক্স নয়। লক্ষ্মা এইমত
যে, তুতির স্ত্রী সরস্বতী একটি কস্তা-সন্তান প্রসব
করিয়াছে।

এই ছ'বৎসরের মধ্যে তুতির শওর তাহার
কস্তার মত গালাদ-বাড়ীও তৈরি করাইয়া সেন
নাই, পুহুরের ষাট বাঁধাইবারও কোন ব্যবস্থা
করেন নাই। রামলোচন ও লক্ষ্মী-বৌ বৈবাহিকের
উপর রাগ করিয়াছেন।

তুতির যেহেতু এখন ছ'মাসের শিশু, রামলোচন
তখন একদিন নিজে দিয়া বোমাকে তাহার ঘরে
লইয়া আসিলেন। এইবার কেমন করিয়া বৈবাহিক
তাহাদের দুঃখ ঘুচাইয়া না সেন তিনি একবার
সেখিবেন—এইরকম মনের ভাব।

কসারে তখন তাহার অভাবের আর অস্ত
নাই।

বাড়ী কিরিয়া সেইদিন রাতেই রামলোচন
কিয়া বাঁধা টানিয়া আনিয়া সকলকে কাছে

ডাকিলেন। বন্ধিলেন, 'বোমা এসো। হুতি, হুইও
আর! আর হুমি—হ্যা, তুমিও থাকো।'

এই বলিয়া তিনি সরস্বতীকে ওনাইয়া ওনাইয়া
বলিতে লাগিলেন, 'আচ্ছা বোমা, এই ত' দেখছ না
আমার অবস্থা, হু'বেলা হুহুত' ভাল করে' খেতেই
পাবে না। কিন্তু মেয়ের এই এত কষ্ট দেখেও
তোমার বাবা কি কিছুই করবে না?'

সরস্বতী হেঁটমুখে নীরবেই বলিয়া রহিল।
কোনও কথা বলিল না।

লক্ষী-বৌ বলিল, 'কেন করবে না? পূব করবে।
মিন্দের দেবার ক্ষমতা ত' নেই তা নয়!
সেই না শুধু তুমি বলতে পার না বলে'। কই
এইবার একবার 'ভাল করে' বল দেখি।'

রামলোচন বলিলেন, 'আচ্ছা, সেই পরামর্শ
কন্টেই ত' ডাবলাম সবাইকে।'

লক্ষী-বৌ বলিল, 'বেশ, তবে কান্দকই একটি
পাইএর কথা লিখে দাও। বল যে, পাইএর
টাকা না পাঠালে নাভান্নী তোমার হুখ খেতে
পাবে না।'

কিন্তু শুধু পাইএ রামলোচনের মন উঠিল না।
বলিলেন, 'হ্যাঁ, তোমারও যেমন বৃদ্ধি! শুধু একটি
পাই হ'লেই তোমার হুখ খুচ যাবে? না, শোন,
তার চেয়ে লিখে দিই—অবিলম্বে একশ' টাকা
পাঠিয়ে দাও। না দিলে তোমার সঙ্গে ভদ্রতা
রাখা আর চলবে না দেখছি।'

লক্ষী-বৌ বলিল, 'সেই ভালো।'

সেই পরামর্শই স্থির হইল। তুতি একটি কথাও
বলিল না। পিতার আঙ্গানে যেমন সে নীরবে
আসিয়া পাড়াইয়া ছিল, আবার তেমনি নীরবেই
চলিয়া গেল।

রাত্রি গড়িকে তাহাদের ছই স্বামী-স্ত্রীতে কি যে
কথা হইয়াছে কে জানে, পরদিন সকালেই দেখা গেল,
তুতি কোথা হইতে একটা পাই কিনিয়া আনিয়াছে।

পাই দেখিয়া রামলোচন বিজ্ঞাসা করিলেন,

'এ কি রে! পাই কোথায় পেলি?'

তুতি বলিল, 'ত্রিশ টাকার কিনে আনলাম।'

'টাকা কোথায় পেলি?'

'ওর কাছে ছিল।'

ওর অর্থাৎ সরস্বতীর।

ব্যাপারটা রামলোচন যে না বুঝিলেন তাহা
নয়। পাইটার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া
গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'হঁ'।'

লক্ষী-বৌ ছুটিয়া আসিল, নিরঙ্কন আসিল।

রামলোচন বলিলেন, 'ওগো, তুনেছ? পাই
কিন্তে তোমার বোমা যে টাকা বের করে'
দিয়েছে।'

সরস্বতী তাহার মেরেকে কোলে লইয়া একটুখানি
দূরে পাড়াইয়া ছিল, লক্ষী-বৌ বলিল, 'তুমি কেন টাকা
দিলে, বাচ্চা? পাইএর টাকা তোমার বাবার কাছে
থেকে আদায় কর্তায়। তা বেশ করেছে, মা,
আরও খোটা-দশেক টাকা আমার আশ হুপুহবেলার
দিও। যত্নে একটি ভাল নেই, পাচ টাকার চাল
কিনব আর পাচ টাকার আমার সেই ছুড়িপাছটা
বন্ধক আছে—ছাড়িয়ে আনব।'

সরস্বতী কি বেন বলিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।
কিন্তু কি যে বলিল কিছুই ভাল শোনা গেল না।
হুপুহে আহাঃখানির পর লক্ষী-বৌ সরস্বতীর
কাছে হাত পাতিয়া বলিল। বলিল, 'কই দাও
বাচ্চা, সেখা আসি।'

সরস্বতী বলিল, 'কি?'

'ওমা! এ যে আকাশ থেকে পড়লে গো!
সেই যে বললাম সকালে,—দশটা টাকা।'

সরস্বতী বলিল, 'সকালে যে বললাম, মা, টাকা
ত' আমার কাছে আর নেই।'

লক্ষী-বৌ গম্ভীর ভাবে ঋণিককণ চুপ করিয়া
থাকিয়া বলিল, 'তুতি বৃদ্ধি শিখিয়ে দিলে।'

সরস্বতী বলিল, 'না মা, তার সঙ্গে ত' আমার
এখনও সেখাই হয়নি।'

লক্ষী-বৌ সেদিন আর কোনও কথাই বলিল না, কিন্তু তাহার পরের দিন দেখা দেল, তাহাদের বাসা চড়ে নাই, উনানটা পর্যন্ত না ধরাইয়া লক্ষী-বৌ শুষ্ক হইয়া পা হড়াইয়া চুল করিয়া বসিয়া আছে।

সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিল, 'উনানটা কি আমি গিয়ে ধরাব, মা?'

'কিছুতে ধরাবে, বাছা, ঘরে ঢাল বাড়ত।' বলিয়া সে যেমন বসিয়াছিল তেমনি বসিয়াই রহিল।

তুতি বাড়ী ছিল না, কিরিয়া আসিয়া সেবিল, সব চুপ্‌চাপ, কোথাও কোনও শাড়শব্দ নাই। রান্নাঘরটা একবার দেখিয়া আসিয়া উঠানে গাড়াইয়া আপন মনেই জিজ্ঞাসা করিল, 'মাঝ আমাদের উনান ধরেনি কেন গো?'

ও-ঘর হইতে লক্ষী-বৌ-এর দাবাব আসিল, 'কেমন করে' ধরবে, বাছা! বাড়ীতে তাড়ের ঢাল মনেই আর নিজের মেয়েটী দুখ খাবে বলে' গাই কিলে আনলে। এইবার মেয়েকে দুখ খাওয়াও আর বাপ-মা উলোম্‌ দিচ্।'

আরও কি যেন সে বলিতে যাইতেছিল কিন্তু তুতি আর কিছু না গুনিয়াই সেখানে হইতে বরে চলিয়া গেল। সরস্বতী বসিয়া বসিয়া তাহার মেয়েকে আদর করিতেছিল। সুখ তুলিয়া বলিল, 'কোথার দিলে এতক্ষণ? এদিকে রান্নাবান্না আঁম কিছুই চড়েনি।'

তুতি বলিল, 'জানি। কিন্তু তোমার কাছে ত' আর কিছুই নেই?'

সরস্বতী বলিল, 'স্বচ্ছই ত' দেখলে।'

বামী তাহার দান মুখে চুল করিয়া গাড়াইয়া গাড়াইয়া ভাবিতেছে দেখিয়া সরস্বতী বলিল, 'অমন মুখভারি করে' গাড়িয়ে থেকে না বাপু, আমার একটা পরন-চটনা। নাও, নিয়ে কোথাও ঢাকাকড়ির গোপাফ করে' কিছু ঢাল কিলে নিয়ে এসো।'

এই বলিয়া মেয়েকে সে তাহার কোল হইতে

নামাইয়া হাতের একপাছা সোনার চুড়ি তুলিয়া স্বামীর হাতে দিয়া বলিল, 'নাও।'

সংসারে বাহ্যের আর বলিতে কিছুই নাই অথচ বায় আছে, অভাব-অভিযোগ তাহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক। রামলোচনেরও সেই অবস্থা। রোজগার তিনি কখনই করেন নাই—এখনও করেন না। অভাব যখন দাক্ষ হইয়া উঠে, উনানে গাড়ি যখন লতাই চাপে না, তখন হয় তিনি তাহার নিজের খত্তের কিছা তুতির খত্তের দিন্দা করিতে বসেন। বলেন, 'আশা দিয়ে দিয়ে ওরাই ত' আমার সর্কনাপ করে' দিলে।'

লক্ষী-বৌ বলে, 'খবরদার বদ্বিহি, আমার বাবার কথা তুমি মুখে এনে না। আমার বাবা ভোষাকে অনেক দিয়েছে। পুছোর সময় যখনই সেছি, গুটিমুঠো একখোড়া ক'রে কাপড় দিয়েছে, মাঝ দিয়েছে, বাবার-আসবার গাড়ী ভাড়া.....এমন কে দেয় গো গুনি!'

রামলোচন বলেন, 'না গো না, তোমার বাবার কথা বলিনি। বদ্বিহি আমার আপেকার খত্তের কথা—তুতির মাঝা-মাঝ। তুতির মা ঠাকে দিয়ে একবার বললে, 'বাঁবা, আমার ওখানে বড় কষ্ট হচ্ছে।' তিনি বললেন, 'কত টাকা হ'লে তোমার দুখ-খোচে-বল ত', মা।' তুতির মা বললে, 'হাজার পাচেক টাকা দাও, বাবা, আমি আপনার ঘর-বাড়ী জমি-জমা সবই তাহ'লে ঐ খেকেই করে' নেবো।' হেসে বললেন, 'তাহ'লে পাচ হাজারের কম এবার আর তুমি খত্তরবাড়ী যাবে না বদ্বিহি।' তারপর কথা হ'ল যে, এক মাসের মধ্যে টাকাটা তিনি দিয়ে দেবেন। বাস্—সেই মাসেই তুতির মা গেল মরে।'

সে-সব বিন আর নাই। সে আশা-ভরসাও ঘুটিয়াছে। এখন ভরসা একমাত্র তুতির খত্ত।

কিন্তু তুতি কিছুতেই তাহাকে বলিতে দিলে না।

হামলোচনের নেশাটা যেদিন একটুখানি বেশি হইয়া যায়, সেদিন হুত কণা গুলিয়া তুতির উপর রাগ করিয়াই বলিয়া বলেন, 'লবাবের বাটা! যতরের কাছে চাইতেও লজ্জা! কুলীন আমরা—আমাদের চোক্ষ-পুঙ্খ যতরের কাছে চেয়ে এসেছে, তা জানিল? তা' বেশ, চাইতে পারবে না ত'—চালাও লসার। আর ত' ছোট ছেলেটি নও বাবা,—এখন উপযুক্ত হয়েছ।'।

এই বলিয়া একটুখানি খামিয়া তিনি আবার বলেন, 'আর আমাকেই যদি এই বয়েসে রোজদার করতে হয় ত' বেশ, তাও বল, বাই, কোনও দূর বেশ পানে চলে' বাই, গিরে বামুনের ছেলে তাত রাঁধিলে।'।

কথাটা গুলিয়া তুতির চোখ হইটা হুল্লুল করিয়া আসে। বাবা তাহার বহু দূর দেশে গিয়া তাত রাঁধিয়া রোজদার করিলে! না, সে নিজেই এইবার চাকরির লজ্জানে কোথাও বাহির হইবে।

হানবুখে তুতি সরস্বতীর কাছে গিয়া দাঁড়ায়। বলে, 'তুলে ত'। এই বয়েসে বাবাকে আমি তাত রাঁধার চাকুরি করতে সেবো না।'।

'তাৎ'লে তোমাকেই বেরোতে হয়।'।

'কাল সকালেই বাড়ী থেকে বাব ভাবছি। কল্যাণকুঠিগুলো একবার ঘুরে আসি।'।

কিন্তু সরস্বতীর ইচ্ছা, স্বামীকে যদি বাইতেই হয় ত' আর কিছুদিন পরেই বেন যায়। কারণ, তখন শ্রোতাস। বেনন রৌদ্রের ভেজ, তেমনি অসহ্য পরম। সময়টা খারাপ। তাহার চেয়ে—কল পড়ুক, আখ্য-প্রাবণের বর্ষা মাটিটা একটুখানি ঠাণ্ডা হোক।

ততদিনের ক্ষত আবার সে তাহার হাত হইতে একগাছা হুঁচি খুলিয়া দেয়। ঘরে আবার কিছুদিনের জিনিষপত্র আসে।

হামলোচন খুবী হইয়া বলেন, 'বেশ্‌ গো, ও লম্বী-বৌ, সেখো! এতদিন ছিলাম বাগের ছেলে,

এখন আমি ছেলের বাপ। আমার আবার তাবনা কিসের।'।

তখন হইতে তুতিকেই সব তাবনা তাবিতে চপ। বেন তুতিরই লসার।

এবার আমরা অনেকদিন পরের কথা বলিতেছি।

অনেকদিন—প্রায় বোলো বৎসর।

হামলোচনের বয়স হইয়াছে। তুতিকে দেখিয়া আর তিনিবার উপায় নাই। নিরাকনের বিবাহ হইয়াছে। একটি ছেলেও হইয়াছে। লম্বী-বৌএর আরও দু'টি মেয়ে আর একটি ছোট ছেলে। হয় নাই শুধু সরস্বতীর। তাহার সেই যে সেই মেয়েটি—তাহার পর আর সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। সেই মেয়ে তাহার বড় হইয়াছে। মারের মতই বাড়ন্ত গড়ন। দেখিতে অত্যন্ত সুন্দরী। নাম—অম্বপনা।

বহু-বশেক আসে তুতি একটি চাকুরি পাইয়াছে। হুঁকিয়াছিল পটিন চাকার, এখন হইয়াছে পঞ্চাশ। আমাদের গ্রাম হইতে ক্রোশছই দূরে ন্তন যে কল্লার কুঠি খুলিয়াছে, সেইখানেই তাহার কাছ। রোজ সকালে উঠিয়াই লাইকেলে চড়িয়া তাহাকে কুঠি বাইতে হয়, দুপুরে একবার খাইতে আসে, তাহার পর আবার যায়, বাড়ী কিরিতে কোনদিন সন্ধ্যা হয়, কোনদিন রাত্রি।

তাও তাগিয়া, খুঁটিয়া খুঁটিয়া সাহেবকে বলিয়া-কহিয়া ঐ চাকুরিটি তুতি পাইয়াছিল তাই বন্ধা, তাহা না হইলে সংসারে আশকাল ঐ অতগুলি লোক,—কাহারও গুণ-বস্তের আর লীমা থাকিত না।

সম্প্রতি গুণ-বস্ত তাহাদের খুঁটিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু হামলোচনের বেণা বেন একটুখানি বাড়িয়াছে। বাগুদিপাড়ার হরি মিহিরের সোলদারী মোকানের আটচালার তাঁহাকে আর বড় একটা সেখা বাগ না। বাড়ীর হুখে অস্বপ্নাছের তলাটা তুতি ইট দিয়া বাধাইয়া দিয়াছে। সেই বাধানো

রকের উপরেই সকল-সকল। আজকাল রামলোচনের আড়তা এসে। সন্ধ্যা-সন্ধ্যের তাঁহার সেইখানেই আসিয়া ঘোটে।

তবে তাঁহার বয়েসের সোবেই হোক কিংবা বেশার ভণ্ডাই হোক, কানে-কানে আজকাল তাঁহার একটুখানি কুলচুক হইয়া যায়।

যেমন থকন—

তুতি সেদিন তাহার কুটি হইতে বাতী ক্রিবিবামাত্র অমিয়ারের কাছারি হইতে লোক আসিল খামনারে তাগাহার।

তুতি বলিল, ‘মাইনে এখনও পাইনি, দিন সাতেক পরে যেনো।’

অমিয়ারের লোক বলিল, ‘আজ্ঞে হ’বছরের। গত বছরের খামনাও আপনাদের সেওয়া হয়নি।’

তুতি একটুখানি সবাক হইয়া গেল। বলিল, ‘হ’বছরের? না, আমার ঠিক সবগ হচ্ছে, গত বছরের খামনাও আমি বাবার চোটে পাঠিয়ে দিয়েছি।’

‘আজ্ঞে না। বাবাকে আপনি জিজ্ঞাসা করে’ দেখুন।’

রামলোচন তখন বাতী ছিলেন না। বাতী ক্রিবে তুতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘গত বছরের খামনা কি আনাবের সেওয়া হয়নি, বাবা?’

রামলোচন চোখ বুজিয়া একবার চিন্তা করিলেন। তাহার পর হাড় নাড়িয়া বলিলেন, ‘কই আর চ’ল? তুই কিরেচিলি ঠিক, কিন্তু তোর মার ত্রস্ত-উৎখাপনের সময় বেজ-বোমার সেই যে সেই গদনাটা বন্ধক পড়েছিল, সেইটে সিতে হ’ল ছাকিরে।’

আর বেশি কিছু বলিবার প্রয়োজন হইল না। হ’বছরের খামনা একসঙ্গে প্রায় তিরিশ টাকা দিতে হইবে, অথচ বেতন পাইবে পঞ্চাশ টাকা। তুতির মাথাটা একবার ঘুরিয়া গেল। কোনোরকমে হুণ বুজিয়া সে তাড়াতাড়ি বাড়িরের কাঁকা বাতালে দিয়া গাড়াইল।

কথাটা সববতী বোঝ করি গুনিতে পাইয়াছিল।

তুতিকে এক সময় একা পাইয়া বলিল, ‘হ্যাঁনা, বেজ-বোমার গদনা বুঝি ছাকিরে না দিলে চলে না, আর আমার গদনাগুলো? তাকুরি পাবার আসে যা বন্ধক দিলে তা ত’ আদমও কিংল না।’

তুতি বলিল, ‘যা পেছে তা পেছে, তার মজ্ঞে আর হুণু ক’রো না।’

সববতী বলিল, ‘তা না হয় হ’ল, কিন্তু অহুর বিয়ে? মেয়েটার দিকে একবার তাকিরে মেবেছ? যোশো পেরিরে সেল।’

কথাটা তুতি বিশ্বাস করিল না। বলিল, ‘যোশো পেরোবে কি রকম?’

সববতী রান একটুখানি হাসিয়া বলিল, ‘হিসেব করে’ দেখো।’

তুতি চুপ করিয়া কি বেন ভাবিতে লাগিল।

এ ভাবনা যে কিসের সববতী তাহা বুজিল। বলিল, ‘টাকার কথা জেবে আর কি ক’বে বল? সেই যে বসেছিলে—আগিল থেকে বার নেবে।’

তুতি বলিল, ‘খার বোঝ হয় পাব না। আগিলের সববতা ভাল নয়।’

সববতী বলিল, ‘না পাও, আমার সমস্ত গদনা আমি বিক্রি করে’ দেবো। ভাল মেখে তুমি একটি ছেলে দেখো।’

এই সেদিনের সেই ছোট অহুশমা ইহারই মধ্যে যে এমন সর্বাঙ্গস্বত্বী দ্ববতী হইয়া উঠিতে পারে, সে ধারণা তুতির ছিল না। সেদিন সে তাহার পরিস্পৃষ্ট মেহের পানে তাকাইয়া সহসা চমকিয়া উঠিল। সববতীকে বলিল, ‘গদনা তুমি ঠিক করে’ রেখো, অহুর বিয়ে আমি এই মাসেই দেবো।’

হাই হোক, অহুশমার বরের মজ তুতিকে খুব বেশি হারান হইতে হইল না। চিবকালই তাহার ইচ্ছা ছিল, ভাল বর এবং ভাল বর মেথিরা অহুর বিবাহ দিবে। শেষ পর্যন্ত হইলও তাহাই। হসলী কেশার একটি ছোকরা

তাহাদের আগিসে চাকুরি করিত। তাহার তাইপোটি সব এই বঙ্গের বি-এ পাশ করিয়া আবার কি সেন পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ছেলের বাবা মস্ত বড় উকিল। ছেলোটো দেখিতে চমৎকার।

বিবাহের বন্দোবস্ত সেইখানেই সব ঠিক চইয়া গেল। সত্বতী তাহার হুঁহাতে হুঁগাছি মাত্র ছুড়ি রাখিয়া বাকি সমস্ত গহনা তাহার স্বামীর হাতে তুলিয়া দিল।

বিবাহের মাত্র আর পাঁচ দিন বাকি। গহনা বেচিয়া তুতি টাকা সংগ্রহ করিয়াছে। বরদারীদের খাওয়ারিবার আরোজনও মন্ব হই নাই।

এখন সমস্ত দেখা গেল, রামলোচন ব্যাক্তিয়া বসিয়াছেন।

স্নানে সেদিন তিনি বাড়ী কিরিয়া নেপার কোঁকেই বোধ করি চাঁৎকার করিতে লাগিলেন, 'বিয়ে বন্ধ করে' দাও।' 'বিয়ে বন্ধ করে' দাও।' ডাকিলেন, 'হুতি, পোন্! এতদিন চুপচাপ করে'ই ছিলাম, কিছু বলিনি, ভাবছিলাম হুতির আদেশটাই দেখি। কিন্তু এবার ত' আর না বলে' থাকা গেল না!'

হুতি হেঁটুখে পাড়াইয়া রহিল। বলিল, 'কেন, কি হয়েছে, বাবা?'

রামলোচন বলিলেন, 'বৌমার কথা শুনে স্বার্থে তুমি অন্ধ হইয়াছ, বাবা, কি হয়েছে না-হয়েছে এখন ত' তা বুঝে না! তোমার অভাবও ঐ বোনের বিয়েটা রইল পড়ে' আর এখন বিয়ে দিচ্ছ কার? না—নিজের মেয়ের!'

রামলোচনের এ-পক্ষের মেয়েটি বড় হইয়াছে শত্রু, বেশিতেও মন্ব নয়, কিন্তু অল্পশয়র চেয়ে সে প্রায় তিন বছরের ছোট। তাহার যদি হয় বোলো ত' হুতির বহুল ভেরো।

হুতি সেই কথাই বলিল। বলিল, 'হুঁসি ত' অল্পর চেয়ে অনেক ছোট। বাবা!'

রামলোচন হাসিলেন। বলিলেন, 'তবে আর বলছি কেন! আরে, হাজার ছোট হোক, তু' শিশী ত'! শিশী থাকতে তাইতির বিয়ে হয় কখনও? কেউ চেনেহে?'

হুতি হেঁটুখে পাড়াইয়াছিল, বলিল, 'তোবেছিলাম আগে অল্পর বিয়েটা হ'রে থাক, তারপর একবার সামলে নিরে—'

রামলোচন এবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। 'তুই হাসালি, হুতি! মেরের বিয়ে বদে' কথা, সামলে নেওয়া কি এতই সোজা! তার চেয়ে এ বিয়ে তুই বন্ধ করে' নে!'

কিন্তু তাহাদের সে পাকা কথা মিথ্যাছে, আগামী উনিশে তারিখে বিয়ে। এখন বন্ধ করিবে বলিলেই বন্ধ করা যায় না।

রামলোচন বলিলেন, 'তার চেয়ে এক কাজ কর—পোন্। ঐ এক-খরচে দুটো বিয়েই সেরে ফেল। এইটাই ত' শেষ নয়, আবার ত' আর-একটা বোন আছে এখনও! সোতাকেও ত' তোকেই প্যার করতে হবে!'

হুতি তেমনি হেঁটুখে পাড়াইয়া পাড়াইয়া কি সেন তাবিল। বলিল, 'আচ্ছা তাই হবে বাবা, আপনি তাবুনের না, বান!'

এই বলিয়া তাহার বাবাকে সাধনা দিয়া কথাটা বোধ করি ভাল করিয়া তাবিবার লজ্জা স্বার্থক হুতি অল্পর চলিয়া গেল।

তুতি আশকাল একটি দ্বণ্ডের জন্তও ঘরে বাস করে না, সাইকেল পইয়া সিবারামি বাহিরে-বাহিরেই ঘুরিয়া বেড়ায়, কোথায় যে থাকে, কোথায় বান করে, কোদায় যায়, কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। সত্বতী জিজ্ঞাসা করে, অল্পশা জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু ভাল করিয়া কেহই কোনও জবাব পায় না।

বিবাহের আগের দিন তুতি জানাইল যে, হুতিরও বিবাহ হইবে সত্বতী পাত্র-ধরিত্রী তাহারও হোক।

কথাটা ওনিবামাত্র লক্ষী-বৌ রামলোচনের কাছে ছুটিয়া পেল। বলিল, 'হ'ল ত' এবার! ঐ নাও, শোনো কি বলছে।'

রামলোচন বলিলেন, 'ঠিকই ত' বলছে। কাল বিকে, আজ গায়ে হলুদ হ'বে না?'

লক্ষী-বৌ হাত কিছুক্ষিৎ করিয়া বলিল, 'গাছো খেতে খেতে তোমারে কি আর বুদ্ধিহুঁড়ি কিছু আছে? আমাই দেখলাম না কিছু না, কোথাকার কোন্ বাদর ধরে' এনে কাজ খেতে দেবার মতলব করেছে বুধুতে পাবুছ না?'

রামলোচন বলিলেন, 'না গো না, তা ও করবে না।'

লক্ষী-বৌ একবার এমিক-ওমিক তাকাইয়া বলিল, 'হ্যা, করবে না।' সং-বোনের ওপর দরদ করত।'

টিক সেই সময়েই হুঁড়ি করে ঢুকিতেছিল, রামলোচন মিজাসা করিলেন, 'হ্যাঁরে, বুঁদির বিয়ে কোথায় টিক করলি বল দেখি? আমাইট দেখুতে শুকুত বেশ ভাল হবে ত' ? দেখিল, বাবা, আমার বুঁদির মত মেয়ে বেশ দেখে চলে না পড়ে।'

হুঁড়ি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া খোরা-কেন্দ্রা করিতেছিল। বলিয়া পেল, 'আপনারা কিছু ভাববেন না, বাবা, সে ত' আমি আসেই বলে' দিয়েছি।'

অল্পশব্দকে বিবাহ করিবার দস্ত বর আসিল হুদলী মেলা হইতে। চন্দ্রকার ছেলেরা। বড়লোকের ছেলে। দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। অল্পশব্দর সঙ্গে মানাইবে ভাল।

কিন্তু বিবাহের সময় যে-ব্যাপারটা ঘটয়া পেল তাহা যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি অদ্ভুত।

রামলোচন মিজাসা করিলেন, 'আর-একটি জামাই কই এখনও এসে পৌঁছোল না ত' ?'

হুঁড়ি বলিল, 'অল্পর বিয়ে আজ বন্ধ করে' দিলাম, বাবা, আজ বুঁদির বিয়েটাই হ'বে থাক।'

বুঁদির বর যে এত সুন্দর হইবে রামলোচন তাহা ভাবেন নাই। বলিলেন, 'সেই ভাল।'

সুতরাং অল্পশব্দর বরের সঙ্গে বিবাহ হইয়া পেল বুঁদির। অল্পশব্দর বিবাহ সেদিন আর হইল না।

বরশব্দের বদিবার কিছুই নাই। বাবা পাইবার কথা ছিল সবই তাহারাই পাইলেন। বুঁদি-মেয়েটিও দেখিতে নেহাৎ মন্দ নয়।

কিন্তু সম্ভ্রামন করিয়া রামলোচন তাঁড়ারের দরদায় বসিয়া বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে তাঁড়ার আঙ্গুলাইতে লাগিলেন। ওমিককার কাম-কর্ম মেছ-বৌকে সঙ্গে লইয়া লক্ষী-বৌ নিজেই দেখাশোনা করিতেছিল। পাড়াপড়ুই হুঁচার জন মেয়েও আসিয়া-ছিল। তাহাদেরই মধ্যে কে একজন মিজাসা করিল, 'তোমার বড়-বৌকে দেখছি না বে, লক্ষী-বৌ? আর তার বেরেটাই বা পেল কোথায়?'

লক্ষী-বৌ বলিল, 'কি জানি, বা!।' বলিগাই সে তাহার কাছে আসিয়া হাত নাড়িয়া চোখ উলটাইয়া ঝেক হাসিয়া বলিল, 'সবই ত' তোমরা জানো, মা, তুঁ কেন বে মিজাসা করছ কে জানে!'

মেয়েটি বলিল, 'ভুলে যাই, বাছা, মনে থাকে না। তোমার ব্যাভারে সং-শাওড়ী বলে' ত' আর মনে হয় না, মা, তাই আজ তোমার আনন্দের দিনে ও-পক্ষের বৌ-বাটা না যদি আসে ত' বড় দুঃখ হয়।'

আর-একজন তাহার ঝিঝনি কাটিল। বলিল, 'তা আজকের দিনে বৌমার কিছু ঘরে বিল দিয়ে পড়ে' থাকটা ভাল হ'ল না, বাছা, তা তুমি যাই বল, আর তাই বল।'

যাই হোক, বড়-বউএর অভাবে কতি কিছুই হইল না। বিবাহ নিষিদ্ধই হুকিল।

সরস্বতী এমিকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া দাড়া।

অল্পশব্দ বলে, 'হুঁশ কর, মা, এর ক্ষেত্রে তোমার এত কাঁদা কিসের?'

সরস্বতী কিন্তু কিছুতেই চুপ করিতে পারে না। কানিতে কানিতে বলে, 'কেন যে কাঁদছি তা তুমি কেমন করে' জান্দি, মা! ডাক্ দেখি একবার তোর বাবাকে! কাল থেকে আমার গল্ তোর সেখাই হচ্ছে না।'

সেখা সে ইচ্ছা করিয়া করিতেছে না কিনা তাই বা কে জানে।

বাই হোঙ্ শেষ পর্যায় সেখা একদিন হইল।

সরস্বতী কানিল না, অশুশমার বিবাহের কথা তুলিল না, শুধু সন্তীরভাবে তুঁতি প্রবুধে হাত পাতিয়া বলিল, 'দাও আমার টাকাকড়ি দাও, আমার গয়না দাও!'

তুঁতি বলিল, 'সেবো।'

'সেবো নহ, একুশি দাও। তোমার চালাকি আমি কুতছি।'

তুঁতি বলিল, 'একুশি কোথায় পাব? সেবো দিনকন্ড পাবে। অল্প বিয়ের ছোসাড় ত' আমার কহতেই হবে।'

সরস্বতী বলিল, 'খাঙ্ আর অল্প বিয়েতে কাম নেই, তার চেয়ে তোমার আর-একটা বোন্ আছে, তার বিয়ের ছোসাড় করসে বাও।' এই বলিয়া সে একটু থামিয়া আবার বলিল, 'আমার সর্লখ আমি তোমার হাতে তুলে দিবেছি, স্বামী হ'রে এমন শত্রুতা ক'বে তা জান্জাম না। দাও, আমার সব কিরিয়ে দাও, অল্পকে নিয়ে আমি বাসের বাড়ী চলে' বাব।'

তুঁতি বুদ্ধিল—এগুলো রাসের কথা। ইংৎ হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা তাই বেও, তোমার সবই আমি কিরিয়ে সেবো।'

হাসি মেথিয়া সরস্বতীর সর্লখ এলিয়া সেল। বলিল, 'হাস্হ কোন্ লজ্জার! কবে সেবে বল।'

তুঁতি বলিল, 'এক সপ্তাহ পরে সেবো।'

সরস্বতী আর কোনও কথা কহিল না।

ভাবিল, এক সপ্তাহ সে নীরবে অপেক্ষা করিবে।

করিলও তাহাই।

সপ্তাহ শেষ হইবার আগের দিন বলিল, 'কাল

তোমার মেবার কথা, মনে থাকে যেন। না দিলে আমি কিন্তু কিছু থাকি বাব্হ না।'

কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে এত টাকা সে দিবে কেমন করিয়া! সিতে সে পারিল না।

সরস্বতী কিন্তু 'দাও' 'দাও' করিয়া জীবন তাহার অর্জিত করিয়া তুলিল। শেষে অশুশমাও তাহার মাকে বলিতে ছাড়িল না। বলিল, 'তোমার কি বুদ্ধি-হুঁচি কিছু নেই, মা? বাবাকে চলিণ বন্ধী গরকম করে' বলে! মাদ্ধটা পাপল হ'রে বাবে যে!'

সরস্বতী রাগিয়া বলিল, 'তা হোঙ্ পাপল। তুমি চুপ্ করে' থাক'।'

সেদিন রাতে অমনি স্বামীর সূবুধে খাবার খরিয়া দিয়া সরস্বতী বলিল, 'এবার কি আমরা মাঙ্কে-কিরে সন্মার দড়ি দিবে মল্লে তুমি স্ববী হও? আপিস থেকে খার ক'বে বসেছিলে, তাই কর না! মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আমার যে ঘ্ন হচ্ছে না। হি হি, এমন হতভাগা স্বামীর হাতে তুমি আমার দিবেছ, ভদ্রবান!'

তুঁতি তাহাকে ভাল করিয়া বুকাইয়া বলিল, 'তুমি এত স্ববীর হ'য়ো না, পোনো! আমার অবস্থাটা একবার বোঝো। টাকাকড়ি পাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু এখনও কিছু পাছি না।'

সরস্বতী বলিল, 'সং-হার শুটীর কাপড় ত' এল। কই তার কো ত' না-পাওয়া হও না!'

তুঁতি বলিল, 'ও ত' সামান্য কয়েকটা টাকা! বাবা বদল্শেন, কাপড়-চোপড় কারও কিছু নেই, কি আর করি বল।'

সরস্বতী ধাত কিড়মিড় করিয়া জবাব দিল— 'কি আর বল্হ তোমাকে! হি হি হি হি, এমন স্বামীর হাতে থাকার চেয়ে মরা ভালো।—তাও যদি নিম্হের মা হ'ত!'

হাত নাড়িয়া তুঁতি বেশ জোরে-জোরেই বলিল, 'গুণো চুপ কর! ওন্তে পাবে যে! হি!'

অত্যধিক জোরে সরস্বতী টীংকার করিয়া

উঠিল, 'না আমি চুপ করব না। আমি ওদের
ওনিয়ে তনিয়ে বন্দ। ওরা সৎ, ওরা—'

'মা:, কেব্‌ চোচ্চাই?'

'হ্যাঁ, চোচ্চাই বেশ করব। ওরা আমাদের শত্রু।
ওদের মুখে ছাই দিতে হয়।'

হুতির মত শাওলিট নির্ঝিরোবী মাজুলও
একবার পর হাসিয়া উঠিল। তাদের গ্রাম হাত
হইতে কেদিয়া দিয়া বলিল, 'চুপ করবে না?'

সরস্বতী বলিল, 'বেন, ভবে নাকি? না, চুপ
করব না।'

কিন্তু হুতিও বেন এইবার শপ্‌ করিয়া জলিয়া
উঠিল। নিজেকে আর সে সন্ধান করিতে পারিল না।
হাতের কাছে ডালের বাটটা তুলিয়া লইয়া সজোরে
ছুঁড়িয়া মারিল সরস্বতীর দিকে। বলিল, 'মু' তবে।'
বলিয়াই সে উঠিয়া পাড়াইল।

ওদিকে কাঁসার ঐ মত বড় বাট সরস্বতীর কপালে
লাগিয়া ছিটকাইয়া সেটা কন্‌ কন্‌ করিয়া হুতে দিয়া
পড়িল। অল্পশমা বোধ করি কাছেই কোথাও পাড়াইয়া
ছিল, শপ্‌ ওনিয়া ছুটিল। ঘরে চুকিয়াই দেখে, না
তাহার দুই হাত দিয়া কপালটা চাপিয়া ধরিয়াছে আর
তাহার আঙ্গুলের ফাঁকে পিচ্‌কারির মত কিন্‌কি দিয়া
কাঁচা রক্ত ছুটিল। দিয়া থালার ভাঙল্লাকে পর্বাঙ্ক
রাঙা করিয়া দিয়াছে।

অল্পশমা অনেক করিয়াও তাহার মা'র কপালের
রক্ত কিছুতেই বন্ধ করিতে পারিল না। বলিল, 'রক্ত
বে বন্ধ হচ্ছে না, বাবা, কি করি?'

বলিয়া নিত্যক অসহায় ভাবে পিছন কিরিয়া
তাকাইতেই দেখে, বাবা তাহার তখনও পর্বাঙ্ক হস্তভবের
মত এঁটো হাতে সেইখানে পাড়াইয়া পাড়াইয়া থন্‌
থন্‌ করিয়া কাঁপিতেছে, মুখ দিয়া তাহার কথা বাহির
হইতেছে না, জোখ দুইটা কলে হুল্‌হুল্‌ করিতেছে।

তাহার পরদিন, প্রত্যহ বেমন দার, সাইকেলে চড়িয়া

হুতি তাহার আগিন হাইতেছিল, কোথায় কোন্‌ পথের
দ্বারে ভিন্নগ্রামের পশ্চাৎবে একটা মড়া পুড়িতেছে
সেখিয়া। সেইখানেই সে গাড়ী হইতে নামিয়া সেই সিঁধ
পানে একমুঠে কিয়ৎকণ তাকাইয়া রহিল, একটা
সাম-পাছের ছাত্রার বলিয়া বলিয়া বানিককণ পান
সাহিল, তাহার পর আপন মনেই কি বেন বলিতে
বলিতে বাকী কিরিল।

বসিক গোয়ালো হুতের ভাঁড় লইয়া ভিন্নগ্রামে
বেটিতে হাইতেছিল, পথে তাহার সঙ্গে হুতির দেখা।
ভাঁড় দুইট মাটিতে নামাইয়া বসিক তাহাকে একটি
প্রণাম করিল, কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, হুতি বলিয়া
উঠিল, 'হাঁরে বসকে, তুই আমার খাছনার ঢাকাটা
কবে দিবি বল্‌ সেখি?'

বসিক ত' অবাক্‌!

খাছনার ঢাকা বসিকের পূর্কপুর্কবেয়াও হুতিক
কখনও ঘের নাই। বলিল, 'আমার কাছে খাছনার
ঢাকা...'

হুতি বলিল, 'হ্যাঁ, না যদি দিল্‌ ত' আমি সন্মান
করে' কেলব বলে' দিছি! বাট দিবে মাখা কাটিয়ে রক্ত
বের করে' দিতে পারি—হ্যাঁ।'

এই বলিয়া সে আর অশেমা করিল না। সাইকেলের
উপর চড়িয়া-বলিয়া সজোরে গাড়ী ছুটাইয়া দিল।

সেই তাহার পাদদামির প্রথম হস্তপাত!

তাহার পর পনেরোটা দিন পার হইতে না হইতেই
বন্ধ উন্মাদ!

এই পর্বাঙ্ক দিখিয়াই আমি ডাক্তারকে দিয়াছিলাম।
ডাক্তার পড়িয়া ত' হাসিয়া খুন! বলিলেন, 'এ
তুমি সাহিত্য কলিয়েছ, এ আমি চাইনি।'

মিছালা করিলাম, 'কি ভবে জেরেছিলেন?'

ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'সে তুমি বুঝবে না।'

তখনও আমাকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে
দেখিয়া ডাক্তারবাবু বিজ্ঞাস্য করিলেন, 'এই ক্ষতই কি
তবুহুতি পাগল হইতেছে, তোমার বিশ্বাস ?'
চুপ করিয়া বহিলাম ।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'ক'খনো না । এর চেয়েও
ক'ত ভীষণ ঘটনা । মাছবের জীবনে ঘটে থাকে ।
আমার জীবনেই ঘটবে । যদি তবুতে চাও ত' সন্ধ্যার
পৰ এসো ।'

গল্প-প্রতিযোগিতা

নিয়মাবলী

১। গল্প ফ্লক্ষেপ্ কাগজের ২১০ পৃষ্ঠার
মধ্যে হওয়াই বাঞ্ছনীয় । কাগজের এক পৃষ্ঠায়
লিখিতে হইবে । বামদিকে এক ইঞ্চি পরিমাণ
'মার্জিন' (margin) রাখিতে হইবে ।

২। গল্পের আখ্যানভাগ, লিখন-প্রণালী এবং
ভাষা—সকল দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া উহার
বিচার করা হইবে ।

৩। গল্পের সঙ্গে ভাল ছবি দিতে পারিলে
তাহার ক্ষুদ্র বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হইবে । ছবি
Drawing Paperএ বা Bristol Boardএ
আঁকা হইতে পারে । তুলি বা কলম ব্যবহার
করা হইতে পারে । কলমে আঁকিতে হইলে
লাইনগুলি গাঢ় কালো রঙের এবং পরিষ্কার
হওয়া দরকার ।

৪। প্রেরিত গল্পের আবরণের (cover)
উপরে "গল্প-প্রতিযোগিতা" লিখিয়া দিবেন ।

৫। নবোদীত গল্প প্রকাশিত করিবার সম্পূর্ণ
অধিকার "উদয়ন"-সম্পাদকের থাকিবে ।

৬। অমনোনীত গল্প ফেরত পাইতে হইলে
উপযুক্ত মূল্যের ডাকটিকিট পাঠাইতে হইবে ।

৭। গল্প পাঠাইবার সময় "গল্প-প্রতি-
যোগিতা"র কুপন পাঠাইতে জুলিবেন না ।
নিজের নাম ও ঠিকানা কুপনের উপর ল্পষ্ট
করিয়া লিখিবেন ।

৮। এ সম্পর্কে অস্বাস্ত্র জ্ঞাতব্য বিষয়
সাধারণ নিয়মাবলীতে দেখিবেন ।

৯। গল্প পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩০এ জ্যৈষ্ঠ ।

১০। প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে সম্পাদকের
বিচারই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে ।

প্রথম পুরস্কার	৫৭ টাকা
দ্বিতীয়	২৫ "
তৃতীয়	১৫ "
চতুর্থ	১৭ "

রয়েল বেঙ্গল টাইগার

শ্রীকুমদরঞ্জন মল্লিক

বাঙলা দেশের ছাঁঁধরী কাঠের জঙ্গলে
কেমন ক'রে জন্মালি তুই বাঘ ?
মেঘের দেশের অম্লান কোন্ খোঙ্গলে
হুগু ছিল প্রচণ্ড এ দাপ !

সেখার তীক্ষ্ণ দশক ধিরে নড়াতে,
দ্যাক্ষিণে বেড়াই, দৃষ্টি দেখায় হুগু ;
উঠিল কৈশে কানন যে তোর চক্কোতে,
যেমন আরাম, তেমনি তীক্ষ্ণ তুহু !

চকু ও কি ? নীল অনল-কুণ্ড যে,
ও কি নখর, ও কি দারুণ দাবা ;
যেমন গ্রীবা, তেমনি ও তোর হুণ্ড যে,
সিঁহ সেও হচ্ছে সেবে চাবা !

পল্লি বিপুল, বিপুলতর লক্ষ যে,
বহু সাহস ! আচ্ছা বুকের পাটা ;
খাকিস্ ধরায়, নাকে কাঁপাস্ অরয়ে,
কণ্ঠকিত পল্লিতে হয় পাটা !

নারেগ্রার এ মল-প্রপাত বৃত্ত কি ?
দাপছে 'মঁরি' দীবত এ বম বদি',
সত্য প্রলক-বুদি সাথে যুহুত কি ?
বস্ত্র বরি' ইস্তরাবের দস্তোদি !

বঙ্গী-চরা পলি মাটির পৃথ্বী এ,
জন্মক ছিল ধাত, পাণ ও সর্বপে ;
বৃত্তে নারি কোন্ খেগালীর কীর্তি এ,
কে জানুত এ বাঘের খাবার ভর স'বে ।

ভীতু ভেতো ভাঙা দেশের শর-ক্ষেতে
একি ভয়াল তীকনতার ভাঙারা,
হায় রে কপি-মনসার এ অর্ধোতে
লক্ষ্মীরে আজ পূজলে এ কোন্ পাঙারা !

এ নয় ফুল আর প্রজাপতির দেশ গুধু,
জেবো না কেউ কেবল কেউ আর ছাপ আছে ;
হেখায় জালে লতার ফুক তাঁপ, নধু,
মোদের বনে আশ্রয় এমন বাঘ আছে !



শ্রীবিষ্ণুপতি চৌধুরী, এম-এ

মেরে চারতলার উপরের ছোট একরকম ঘর।
তত্ত্বশাষের ওপর চুল ক'রে ব'লে আছি। হাতে
কোনো কাজ নেই। আজ তিন বৎসর হ'ল বি-এ
পাশ ক'রে বেরিয়েছি। মধ্যে মধ্যে কাজ ঘোটে—
সে কিন্তু টেম্পোরারি পোছের—আজ আছে, কাল
নেই। সম্ভ্রান্তি করে ক মাস বেকার ব'লে আছি।

ভেজা বাঙ্গালীর বেতো। শরীর,—সারাটা ছপুর
খুনিরেও বেন আশ মিটছে না। চোখের পাতা
ছুটা কুইতে-তেমা চটুই-পাখীর ডানার মত ভড়ির
রয়েছে। ঘুম ভেসেছে বটে, কিন্তু মনে হচ্ছে বেন
জোপে জোপে স্বপ্ন দেখছি।

স্বপ্নের দেয়ালে কড়িকাঠের কাছ-বহাবর একটা
টিক্‌টিক্‌ একটা আরসোলাকে জাক্ করছে;
আরসোলাটা আপন মনে আরামে ক্রিমোছে।
—বাহা রে! বিজ্ঞপত্র! সাথে গিখে গেছেন—“গহীত
ইব কেপেবু বৃহুনা বর্ণমাচরেং” শ্লোকখানি বেন
আমার চোখের সামনে চার পা ছুঁড়ে জাত হ'য়ে
পাড়াল।

হঠাৎ দেখি আরসোলাটা তৌ ক'রে দেয়াল
বেগে নীচের দিকে নেমে আসছে, আর টিক্‌টিক্‌টা
তার পেছনে এঁকে বেকে ছুটেছে। গন্ত ব'
বেচারা পালাতে পারত—কিন্তু পারলে না;—
মাকপখে মহাম্মা গাকীর ফ্রেনে-ব'খানে; ছবিখান।
পথ রুদ্ধ ক'রে পাড়াল। তারপর ছুঁ-চারবার পাখার
কটপট শব্দ এবং পরনুহুঁতেই সব ঠাণ্ডা। কাল
বৈকালে মহাম্মাকীর ছবিখানি সব ক'রে টানিয়ে-
হিলাম। কে জান্ত, অহিংস নীতির শ্রেষ্ঠ পুরোহিতের
ছবি হিংসার সহায়তা করবে।

হঠাৎ কার ভালাকঠের কাংল-ধ্বনিত অপ্রভর
হ'ল।—ছমারের দিকে চেয়ে দেখি—রায়বাহাদুরের
পেরারের খান্‌লামা বনমালী জোকাঠের বাইবে গরুড়
পক্ষীর মত হাত ঝোড় ক'রে দণ্ডায়মান।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলুম—“কি খবর, বনমালী?
রায়বাহাদুর কলকাতার ফিল্ডেন করে?”

উত্তরে সে বা বক্সে তার সারমর্ম এই যে, রায়-
বাহাদুর আজ তিন দিন হ'ল বেরাডুন থেকে কলকাতার

ফিরেছেন এবং তাঁর বরানগরের বাগানবাড়ীতে আস্তানা গেড়েছেন। উপস্থিত আমার ডাক পড়েছে।

তখাঙ্গ!—বড়লোকের হুকুম,—তামিল না ক’রে উপায় নেই। বললুম—“আচ্ছা, তুমি এগাও,—আমি এগুনি যাচ্ছি।”

এই ফাঁকে রায়বাহাদুর নামক জীবাটর সঙ্গে চ’চার কথা ব’লে রাখি। রায়বাহাদুর ক্ষেমদাকিন্দর রায়চৌধুরী বাংলাদেশের একজন মাঝারি গোছের জমিদার। জমিদারির আর নিতান্ত কম নয়। অখচ সংসারে ভোগ করবার কেউ নেই বললেই চলে। বয়স এখন ষাটের কিছু ওপর হবে। গোলগাল লোকটি—মাথাভরা প্রকাণ্ড টাকু। বছর পাঁচেক হ’ল পত্নীবিয়োগ হয়েছে। একটি মাত্র পুত্র, তাও চিররুগ্ন,—সুতরাং জমার অল্প দিন দিন বেড়েই চলেছে। ভদ্রলোকের নিজের কোন বাড়ুয়ানা বা বদ খেয়াল নেই। সখের মধ্যে ছু’টি জিনিষ এ পর্য্যন্ত আমার নজরে এসেছে,—একটি হচ্ছে সরকারী খেতাব অর্জনের বাসনা, আর একটি হচ্ছে লুপ্ত তত্ত্ব-শাস্ত্রের পুনরুদ্ধারের জন্ত উৎকট চেষ্টা।

আজ বছর চারেক হ’ল এ’র কাছে কিছুদিন কাজ করেছিলুম। কাজ আর কিছুই নয়—রোজ ঘণ্টা দুই ক’রে ডিক্টেশন্ লেখা। রায়বাহাদুর তাকিয়া হেলান দিয়ে গড়্গড়া টানতে টানতে তত্ত্ব-শাস্ত্র সংক্ষেপে বক্তৃতা ক’রে যাবেন, আর আমাকে তাই লিখে যেতে হবে।—এই হচ্ছে কাজ। এইভাবে প্রায় একটা বছর কাজ চলেছিল। তারপর একদিন বই লেখা শেষ হ’ল।—রায়বাহাদুর বইয়ের নাম দিলেন “কুলকুণ্ডলিনী-রহস্য”! বই ছেপে বেরুতে আরও মাস দুই লেগেছিল। দেড় হাজার পৃষ্ঠার বিরাট অতিকার গ্রন্থ—দ্বিতীয় মহাভারত বললেই হয়। এক কনি বই আমাকে উপহার দিয়ে বন্দন—“স্বর্গদেবী এরা একটা ইয়েরী জন্মবা কব্ব মনে করছি!—এসব জিনিষ পৃথিবীর লোকে বত পড়তে পায় ততই মঙ্গল,—বুঝ্লে কিনা!”

বললুম—“তা তো বটেই।”

তার পরই হঠাৎ একদিন জমিদার-পুত্রের শরীর খারাপ হ’ল। ডাক্তারের পরামর্শে রায়বাহাদুর সপুত্র দেহাভ্রম যাত্রা করলেন। বছর খানেক পর আজ খবর পেলাম—ভদ্রলোক কলকাতায় ফিরেছেন এবং আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।



বনবাণী পঙ্কজ গন্ধীর মত হাত ছোড় ক’রে দণ্ডায়মান সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বরানগরের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ’লুম। আমাকে দেখেই রায়বাহাদুর সোমসাহে ব’লে উঠলেন—“এস এস, আছ কেমন?” উঠরে কি বলতে যাচ্ছিলুম, জংলুকেই একটা অতিকার এর আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বন্দন—“সেবেশ?”

মশাটের ওপরকার সোনার জলে লেখা ইংরেজী
তরফুলোর দিকে নজর পড়তেই অবাক হ'য়ে
পেলুম,—বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—“Mysteries
of the Court of Kulakundalini.”

অতিকষ্টে হাসি সামলে বললুম—“খাসা নামকরণ।—
কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজী তর্জমাই
বা করলেন কখন, ‘আর বই-ই বা ছাপালেন কখন?’”

একটা চাপা গর্গের গাঙ্গি হেসে রায়বাহাদুর
বললেন—“সেবার্তনে এক রিটার্ড হেডমাষ্টার ফুটে
পেল। তাঁকে দিয়েই তর্জমা করা গেল—বেধকালে
আগাসোড়। অবস্ত নিজে সেখে দিয়েছি। নামকরণ
কিন্তু আমার নিজের। তারিখীবাবু নাম দিয়েছিলেন
Mysteries of Kulakundalini:—ও-নাম বে কুল
হ'ত তা নয়—কিন্তু কেমন বেন ভাড়া-ভাড়া ঠেকে
—বুললে কিনা!—সেখ, এইটুকু সর্জনা মনে রাখ'বে
বে, ব্যাকরণ-গুচ্ছ হ'লেই হ'ল না, —শব্দ-কঙ্কার
একটা মত বড় ঘনিষ!—এই সেখ না, রেনল্ড-
সায়েব যদি তাঁর বইয়ের নাম রাখতেন Mysteries
of London, তাতে ক'রে কিছু কুল হ'ত না তো!—
কিন্তু তা না ক'রে তিনি বে তাঁর বইয়ের নাম
রাখলেন—Mysteries of the Court of London,
সে কেবল শব্দ-কঙ্কারের খাতির,—বুললে কিনা!”

অতিকষ্টে হাসি সামলে বললুম—“বাস্তবিক এটা
এতদিন আমাদের মাথার আসনি।”

অত্যন্ত গভীর ভাবে রায়বাহাদুর বললেন—
“ত্রিভুজের পরিচালনা না করলে মাথা কি আপনি
বুলবে, পবেশ?”

বললুম—“তা তো কটেই!”

উৎসাহ পেয়ে রায়বাহাদুর ব'লে যেতে লাগলেন—
“তা ছাড়া তোমরা কোন ঘনিষ টিক নজর ক'রে
সেখ না। তুমি তো নি-এ পাশ করছ, এমন কোন
ইংরেজী ক্রিয়াপদের নাম কর দেখি—যা বাংলাভাষা
থেকে নেওয়া।”

একটু ক্ষেত্র নিয়ে বললুম—“আজ কাল হ'একটা

দেখি ক্রিয়াপদ ইংরেজীতে চল হ'য়ে গেছে বটে,—
যেমন ‘লুট করা’ কথাটার ভারপার ইংরেজীতে
আজকাল ‘loot’ শব্দটা অনেক সময় ব্যবহার হ'তে
সেখা যায়।”

অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে রায়বাহাদুর ব'লে উঠলেন—
“আরে না না, ও তো হালকিলু খাপার। আমি এমন
ক্রিয়াপদের নাম করব না কোন হুসে এমন থেকে
কল্পে সেছে তা ওয়াও জানে না—আমরাও জানি
না।”

বললুম—“তাই নাকি?”

বললেন—“হ্যাঁ!—এই ধর না, ‘অকাপাওয়া’
কথাটা তো বাঁটা বেশী শব্দ!”

বললুম—“সে-বিষয়ে সন্দেহ কি!”

বললেন—“আমি যদি এই কথাটাই ইংরেজী
গ্রামারের বইয়ে ক্রিয়াপদরূপে ব্যবহৃত হয়েচে দেখাতে
পারি—”

বললুম—“তাই নাকি!”

বললেন—“এখনি দেখাবছি দাঁড়াও!” কথাটা
শেখ ক'রেই একটা ফুলপাতা ইংরেজী গ্রামারের
‘কন্সপেনসেন’র ‘চাপটার’ খুলে আমার চোখের
সুখে মেলে ধ'রে বললেন—“দাপ-সেওয়া কথাটা প'ড়ে
সেখ তো!”

অবাক হ'য়ে চেয়ে দেখি—লেখা রয়েছে—“Occupy
—Occupied—Occupied.”

কিছু হুজুত না পেয়ে হ্যাঁ ক'রে রায়বাহাদুরের
মুখের পানে চেয়ে বইলুম। রায়বাহাদুর বললেন—
“কেমন, পেলে তো?”—তারপর তিনি প'ড়ে যেতে
লাগলেন—“অকাপাই—অকাপারেড—অকাপারেড।”

বলা বাহুল্য, হাসি চাপতে গিয়ে আমাকে সেদিন
হেঁচে, কেশে, ষাড় চুলকে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠতে
হয়েছিল।

রায়বাহাদুর বললেন—“চারদিকে একটু নজর
রাখ'তে হবে—গুণু পড়াপাখীর মত প'ড়ে সেলেই
হব না।”

কথাটা শেষ ক'রেই রায়বাহাদুর হঠাৎ ব'লে উঠলেন—“আর একটা গুতল সংবাদ আছে; কিছুদিন হ'ল লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা করবার অসম্মতি প্রার্থনা ক'রে এক পত্র লিখেছিলাম,— প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়েছে; ১৭ই আগস্ট দেখা করবার তারিখ পড়েছে। আজ হ'ল জেনার ১০ই জুলাই। তা হ'লে হাতে রইল মোটে একমাস ছ'দিন।—এর মধ্যে সব—”

কথাটা আর শেষ করা হ'ল না—হঠাৎ ব'লে উঠলেন—“এমিকে কিন্তু এক মহানুভব প'ড়ে গেছে যে,—আমাদের গ্রামের এক ছোকরা আজ ক'দিন হ'ল বসেই হাফামার বরা পড়েছে।”

বল্লভ—“তাতে আপনার বিপদ কোনখানটার তা তো বুঝতে পারব না।”

বিস্তৃত হ'য়ে উত্তর দিলেন—“তাকে যে আমিই মাসহারা দিয়ে কলকাতার লেখা-পড়া শিখতে পাঠিয়েছিলাম,—রাজপ্রত্নীকে মর্খসাহাব্য করা কতবড় অপরাধ তা জানি!—আমি অবশ্য না কেনে করেছি, কিন্তু পুলিশে কি তা গনবে!”

এই সব আলোচনার পর ভূরিভোজন সেরে বহন মেসে কিছুসময় তখন রাত দশটা বেয়ে গেছে।

চার দিন পরে রায়বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে গেছি। বেলা তখন পাঁচটা হবে। মহিয়ার-বাড়ীর সেইটি পার হ'য়ে উঠানে পা দিয়েই নিউরে উঠ'ল;—যেখি উঠানের পশ্চিম দিকের বকের উপর সেখানে ঠেস দিয়ে লাগ পানকীখারী এক পাহারাওয়াল। বিলু নাগিকা গর্জন পূর্ণক নিজা বাজে।—সে কি আগ্রহ!—পিলে চমকে ধরে। মনে মনে ভর সেলুম—গুলি কেন রে বাবা!—সেই বসেই ছোকরাকে মর্খসাহাব্যের ঘের নয় তো?

ভয়ে ভয়ে বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ ক'রে

রায়বাহাদুরকে হিজলা করলুম—“ব্যাপার কি, মশাই,—বাড়ীতে পুলিশ কেন?”

একটু মুচুকে যেলে রায়বাহাদুর বললেন—“ও হচ্ছে আমাদের খাটির পাহারাওয়াল।!”

বল্লভ—“তা তো বুঝ'লুম—কিন্তু এখানে কেন?”

বল্লভ—“ও যোজাই একবার ক'রে আসে।”



পাহারাওয়াল নাগিকা গর্জন ক'রে নিজা বাজে

বল্লভ—“রোজ আসে কেন?”

হঠাৎ অত্যন্ত গভীর হ'য়ে “উঠে বল্লভ—“বনবাণীকে পানকী বাধা দেখাতে।”

কথাটা শেষ ক'রেই ডাকলেন—“বনবাণী!”

সঙ্গে-সঙ্গেই বনবাণী তক্ত হুহানের দরত মোড়করে হুহুবে এসে ধাঁড়াল।

পাতলা লিঙ্গলিকে লোকটি। আকাশ-প্রাণের

ধানের মত বৈকে গেছে। বয়েস পোটা পরতাল্লিশ হবে।

অত্যন্ত ভারী কণ্ঠে রায়বাহাদুর বললেন—“পাগড়ী বাঁধা দ্রুত করিসনি কেন এখনও ?”

হাত ছোড় ক’রে বনমালী বলল—“আজ্ঞে, আপনি যে হুকুম করেছিলেন—আজ থেকে আপনার সাহসে পাগড়ী বাঁধা হবে।”

দশার বরটাকে আরও ভারী ক’রে তুলে রায়বাহাদুর বললেন—“আচ্ছা, ততখনিচক এইখানে ডেকে আন, আর আমি যে আধখান্ন শালু কাপড় কিনে এনেছি, যানোয়ারবাড়ুক বার ক’রে দিতে বল।”

কয়েক মিনিট পরেই আধখান্ন শালু বগলে বনমালী এবং তৎপল্লভ ততখনিচ, ঘরে প্রবেশ করল। রায়বাহাদুর বললেন—“দেখ ততখনিচ, আজ্ঞে আধখান্ন শালু বনমালীকে মজকসে বাঁধনে হোগ। পাগড়ী মত বড় হবে ইচ্ছা ততই বড়িত হোগ। কি না।”

“মি !” বলে পাহারাওয়ালাপুত্রব শালুর খানের পাট ডাক্তে হুক ক’রে দিলে। আধখান্ন শালু,—চাতুড়িখানি ব্যাপার তো আর নয়। মত খোলে ততই বেশ মনে হয় কাপড় বেড়ে যাক্কে। শ্রৌণবীর বগ-হরণের কথা মনে পড়ে গেল। পাট-তাক্সা বদিয়ে বা অতিকটে শেষ হ’ল পাগড়ী-বাঁধা আর শেষ হ’তে চায় না। একে বাদ্যলীর মাথা—বাস মান্তে চায় না—‘ট্র্যাক্সিবে’র অভাব। তার ওপর আধখান্ন কাপড়!—ধানিকদূর অবধি এসে, তার পরেই হঠাৎ পূলে যায়। এমনি ক’রে বার বার সাত বার তেঁতার পর অষ্টম বারে খেলাই ফেঁড় দিয়ে পাগড়ী অতিকটে খাড়া হ’ল, কিন্তু মুকিল বাধল বনমালীর। পাগড়ী খাড়া হ’ল বটে, কিন্তু পাগড়ীর ভায়ে বনমালী আর খাড়া হ’তে পারে না। একে লিঙ্গলিক পাত্শা মাহুঘ তার ওপর ঐ আধখান্ন কাপড়ের বিরাট পাগড়ী !

ততখনিচ চলে যেতে রায়বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করলুম—“রোজই কি এমনি ক’রে পাগড়ী বাঁধা হয়।”

বললেন—“হ্যাঁ—রোজই !—এর জন্তে ততখনিচক রোজ একটি ক’রে ঢাকা পারিশ্রমিক দিতে হয়।”

জিজ্ঞাসা করলুম—“এত বরত ক’রে একে পাগড়ী-বাঁধা শেখাচ্ছেন যে বড় ?”



পাগড়ীর ভায়ে বনমালী খাড়া হ’তে পারে না

বললেন—“জান না বুদ্ধি !—লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা করবার সময় বনমালী যে সঙ্গে থাকবে।”

কথাটা শেষ ক’রেই হঠাৎ অত্যন্ত চিত্তিকজাবে বললেন—“ঐ ব্যাটাকে নিয়েই তো ডাবনা !—ব্যাটা

সেখানে গিয়ে যদি খাব ড়ে খাব ?" পরক্ষণেই বনমালীর দিকে চেয়ে বললেন—“কি রে, লাট-দরবারে গিয়ে খাব ড়ে যাবিনে তো ?”

সে পাগড়ীটাকে মাথা থেকে একটু একটু ক'রে খসাতে খসাতে বলল—“আজ্ঞে খাব ড়া'ব কেনে—লাটসাহেবও মাহু'ব, আমিও মাহু'ব ।”

রাহবাহাদুর হতান হ'য়ে বললেন—“বাটা! সন্ধান ক'লে দেখছি!” আমি তো মবাক্—ভেবেছিলাম, বনমালীর সাহস দেখে রাহবাহাদুর খুশি হবেন—কিন্তু ফল হ'ল ঠিক উল্টো ।

বললুম—“ভালই তো, মশাই—ওর যদি ভয় না করে সে তো হুঁশের কথা ।” বললেন—“নাঃ—তুমিও দেখছি ওরই মতন দুখা হ'লে ।”

বললুম—“কিছুই তো বৃত্তে পাবছিনে, রাহবাহাদুর ।”

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে মতান্তর নিরূপণ কর্তে রাহবাহাদুর বললেন—“সারে বাপু, ভরকে জয় কল্পত হয় ভরের সঙ্গে লড়াই ক'রে, ভরকে এড়িয়ে গিয়ে নয়!—এ আমার কথা নয়!—একথা বগলা-তরুর মধ্যে লিখা—দুঃখছ!”

বললুম—“জিনিষটা ঠিক বৃত্তে পাবলুম না ।”

বিরক্ত হ'য়ে বললেন—“এসব কথা যদি এত সহজে বুঝে তা হ'লে তো ‘কুলকুণ্ডলিনী-বৃত্ত’ তুমিই লিখে ফেলত রে!” তারপর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে বললেন—“বাপাণটা ফুলে যদি নোবো,—ও বাটা যে বসুছে লাটসাহেবও মাহু'ব, ও নিজেও মাহু'ব—সে কথা ঠিক—কিন্তু লাটসাহেব না দেখে শুকখা বলা আর লাটসাহেব দেখে শুকখা বলা এক জিনিষ নয়।—লাটসাহেবকে আমি ভয় করি না, একথা বললেই ভয় চ'লে যায় না । বরং লাটসাহেবকে আমি ভয় করি, একথা বীকার ক'রে একটু একটু ক'রে খতাসের দ্বারা ভরকে জয় কল্পত হয়।—তারিকরা সেইভাবে ভূতের ভয়কে অস্বীকার না ক'রে অস্বাভাব্য ভাঙিয়ে—

শশানে গিয়ে ইচ্ছে ক'রে ভূতের ভয়ে আঁখকে উঠে, তবে ভূতের ভরকে জয় ক'রে কেনেন । ঠাকি চলে না বাপু—সব জিনিষেরই সাধনা আছে ।”

বললুম—“সে কথা ঠিক বটে।—”

সেদিনও মেলে ফিরতে অনেক রাত হয়েছিল ।

এমনি ভাবে দিন যেতে লাগল । রোজই বৈকালের দিকে একবার ক'রে বরানগর ফুরে আসি । উজ্জ্বলপূর্ণ বেশ বটা ক'রেই চলেছে । মাতে আর সাত দিন মাত্র বাকী ।—সবই প্রস্তুত । একখানা *Mysteries of the Court of Kulakundalini* দপ্তরীকে দিয়ে ভালো মরকো-লোয়ারে বঁধিয়ে বেজা হয়েছে । একটা জপোর ট্রে কেনা হ'য়ে গেছে । রাহবাহাদুরের পন্ডা'ব পন্ডা'ব ঐ জপোর ট্রে ওপর মরকো-লোয়ারে বাঁধানো *Mysteries of the Court of Kulakundalini* খানা দিয়ে বনমালী বাবে । কাছাকাছি দিয়ে ট্রে ওপর থেকে বইখানা তুলে নিয়ে রাহবাহাদুর নিম্নহাতে লাটসাহেবকে উপহার দেন । বাবদা সব আসে থাকতেই ঠিক হ'য়ে আছে—এখন কেবল গেসেই হয় । এতদিনেও কিছু বনমালীর পাগড়ী কিছুতেই বাপ হানু'হে না—কেবল ফুল ফুলে গড়ে । রাহবাহাদুরকে বলেছিলাম—“পাগড়ী ছোট ক'রে মিন !” রাহবাহাদুর বলেছিলেন—“তুমি দেখ, পরেশ, ঐ পাগড়ী আমি মাথার ফিট ক'রে দেবো।”

প্রতিদিনের মত সেদিনও বৈকালের দিকে অমিয়ার-বাড়ী গেছি । বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে দেখি—রাহবাহাদুর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বড়ার মতন প'ড়ে রয়েছেন, আর পাশে ব'সে এক প্রবীণ কবিরাজ নাকী পরীক্ষা করছেন । কয়েক সেকেন্ড পরে, পরীক্ষা শেষ ক'রে, দুখানাকে বাগের পাঁচের মত বৈকিরে কবিরাজ বললেন—“নাকী বড় দুর্বল !

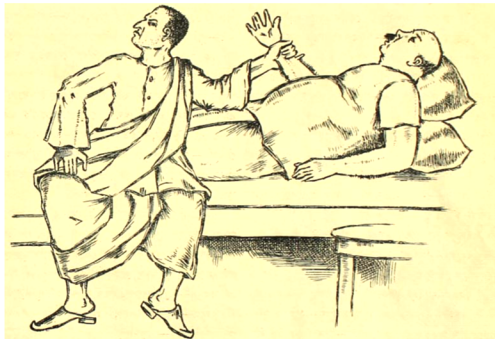
মাত্র দিন আসেও তো দেখে দেখি—তখন তো এরকম নাড়ী ছিল না। সম্মতি কি কোন নতুন হুঁচিয়া আপনায় রাখার চুকছে? খবরদার, আমার কাছে কোন কথা গোপন করবেন না। প্রতিকারের বাইরে গিয়ে পড়লে তখন আর কোন উপায় থাকবে না।

অত্যাধীক কষ্টে রাখাবাহার বললেন—“ওস্তাদার

আবার কিছুকাল চুপ ক’রে থেকে কবিরাজ বললেন—“বহু বৈষ্ণব দেখেন কি?”

“আজ্ঞে মেধি।”

ওই ব্যবস্থা ক’রে কবিরাজ চ’লে যেলেন। বাইরে গিয়ে নিজস্বা করলেন—“অবশ্যই কি, কবিরাজ নশাই?”



কবিরাজ রাখাবাহারের নাড়ী পরীক্ষা করছেন

তো কিছুই দেখলেন,—তবে চার দিন পর লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে—তারি মতে একটু ব্যস্ত আছি বটে।”

কবিরাজ শুধু বললেন—“হু”! তার পর কিছুকাল চুপ ক’রে কি ভেবে নিয়ে বললেন—“রাতে কি হুঁচিয়া হয় না?”

পূর্ববৎ অধীক কষ্টে রাখাবাহার বললেন—“আজ্ঞে না।”

একটু হেসে কবিরাজ বললেন—“নার্ভাসনেস্ আর কি?—ভয় হয়, লাটসাহেবের সামনে গিয়ে হাট্কেল না করেন।”

যে ক্রিয়ার এসে দেখি রাখাবাহার চক্ কুণ প’ড়ে রয়েছেন—খুঁচি কিছু আর আর নড়ছে—কি যেম বিড়, বিড় ক’রে বকছেন। হুঁচের কাছে কান নিরে ওনি, তিনি জ্ঞানসত্তাই আড়তে বাছেন—“অধীক-অধীক ভয় কি যে যার অবস্থা অন্তর্জীবি—হাসিও পেল।

হিংস্র হ'ল। বৃষ্ণুম তত্ৰলোক প্রাণপণে সাহস সঞ্চা করবার ভক্তে আদাহোণা খেয়ে সেগছেন। এখন 'অগদা জননী' মুখ তুণে চাটলেই হয়।

'অগদা জননী' লতাই মুখ তুণে চাটিলেন। পরদিন গিয়ে বেশি কবিরাজের বড়ীর গুলেই হোক, আর অগদাচার রূপ। লাভ ক'রেই হোক, রায়বাহাদুর অনেকটা চান্স। হ'লে উঠেছেন।

ঝিঞ্জালা কর্ণুম—"আজ কেমন আছেন?"

উত্তরে শুধু বললেন—"জীব-জন্তে ভয় কি রে বার অগদা জননী।"

আবার কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তার পর হঠাৎ ব'লে উঠলেন—"সেখ, একটা মতলব এটেছি।"

বল্ণুম—"কিসের মতলব, রায়বাহাদুর?"

বল্ণলেন—"এখনও তো হাতে তিন দিন রয়েছে।"

বল্ণুম—"আজ্ঞে হ্যা।"

বল্ণলেন—"বনমালী ব্যাটার মাথা কামিয়ে দিলে হয় না?"

বল্ণুম—"তাতে কি লাভ হবে, মশাই?"

বল্ণলেন—"আমার কথাটা মাপে শেষ অবধি শোনই না ছাই!"

বল্ণুম—"বলুন।"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন—"আজ যদি বনমালীর মস্তক নুগ্নন ক'রে দিই—তিন দিনে নিশ্চরই 'অগদা জননী' খোঁচা খোঁচা চুল গজাবে।"

বল্ণুম—"তা গজাতে পারে।"

বল্ণলেন—"গজাতে পারি কি—নিশ্চরই গজাবে। তোমরা তো ভ্রান্ত্রণ হে!—উপনয়ন হয়েছিল তো তোমার।"

বল্ণুম—"তা হয়েছিল বৈ কি!"

বল্ণলেন—"উপনয়নের সময় মস্তক নুগ্নন হয়েছিল তো?"

বল্ণুম—"আজ্ঞে হ্যা।"

বল্ণলেন—"গজ-ভাঙ্গনের দিন, মনে পড়ে, উত্তরী

দিয়ে মাথা ঢেকে বসন গজানানে দেখলে—তখন উত্তরী মাথার কি রকম কান্ডে ধরেছিল!"

বল্ণুম—"মনে পড়ে যটে—উত্তরীর খুঁতে বেশ বেশ পেতে হয়েছিল।"

বল্ণলেন—"মনে করবেই, বনমালীর মাথাটা কামিয়ে দেবে। তা হ'লে হবে কি জান,—এই তিন দিনে বেশ খোঁচা খোঁচা চুল গজাবে, তাতে ক'রে কল হবে এই যে, পাগড়ী বেশ মাথার সঙ্গে কান্ডে ধরবে—সহজে গুলবে না,—তুমি কি বল?"

কি আর বলব,—অবাক হ'লে লোকটার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম,—মাথা বটে!

আর বন্ধীর মধ্যেই বনমালীর মস্তক-নুগ্নন ব্যাপার সম্বোধে মূলশব্দ হ'লে গেল। বেচারার সে কি চোখ, সখের বাহুরী চুল,—কতকালের সাধনার ফল। স্পষ্ট দেখলুম—বেচারার চোখ দিয়ে টু টু ক'রে জল পড়ছে। কিন্তু উপায় কি?—চুল আগে, না চাকরী আগে!

বাইরে গিয়ে বনমালীর সে কি আবেগ!—আজও সেকথা ভুলতে পারিনি। সে বল্ণলেন—"বাবু, সব ঠিক-ঠাক—আর পনেরো দিন পরেই সেখ গিয়ে বিয়ে করব, এই সময় কিমা মাথা মুড়িয়ে দিলে!"

বল্ণুম—"এত বয়সে এখনও বিয়ে করিসনি?"

বল্ণলেন—"দ্বিতীয় পক্ষ, বাবু,—পনেরো বছরের সোমোক্ত মেয়ে—নেড়া-মাথা দেখলে কি আর বিয়ে করতে রাধী হবে?"

সেখি, বেচারার হৃ-গোখ বেয়ে জল পড়ছে।

আজ ১৬ই আগষ্ট। কাল বেলা দুটোর সময় লাট-দর্শন।

ঝিঞ্জালা কর্ণুম—"আজ কেমন বোধ করছেন?"

বল্ণলেন—"সেখ, আশ্চর্য্য ব্যাপার—আজ আর আমার একটুও ভাবনা হচ্ছে না।—অথচ শিরে দক্কাতি।"

বল্লভ—“ভালই তো!”

বল্লভ—“কৈ, আমাকে দেখলে কি নার্ভাস হয়েছি
ব’লে মনে হয়?”

বল্লভ—“বোটেই না!”—মনে মনে কিন্তু বেশ
বৃত্তে পারছিলাম—ভ্রমলোক অভ্যস্ত নার্ভাস হ’লে
পড়েছেন।

রায়বাহাদুর বল্লভ—“বেশ, ভয় ভিনিবটা হচ্ছে
মনের ব্যাপার। মন হাসের নিছক বদে—ভাব।
ভয়কে অন্যরাসে মন করতে পারে। এই সেখ না,
একটু একটা। বিশদ মাথার উপর ফুটছে—অস্ত্র কেউ
হ’লে হয়ত লুপা নিত—আমি কিন্তু মিথি নিশ্চিত
হ’লে ব’লে আছি।” আমি কি বলতে বাচ্চিলাম, বাধা
দিয়ে বল্লভ—“আমি এক বর্ণও বাড়িয়ে বলছিনে,
পরেণ!”

বিষয় নিয়ে চ’লে আসবার সময় বল্লভ—“কাল
সকালের দিকে একবার এসো, পরেশ। বাবার সময়
তোমাদের মুখগুলি একবার দেখে যাব।”

অতিক্রমে হাসি সামলে বল্লভ—“আসব বৈ কি!”

পরদিন বেলা দশটার সময় গিয়ে দেখি রায়বাহাদুর
সেজে-পুজে ঐকান্ত হ’লে ব’লে রয়েছেন। গায়ে প্রকাণ্ড
এক শালের মোকা, মাথার রেশমের বাঁধা পাগড়ী।
আমাকে দেখেই বল্লভ—“এসেছ, তোমার ভয়েই
অপেক্ষা করছি। এইবার তা’ হ’লে ‘হুগু’ ‘হুগু’
ব’লে বেরিয়ে পড়া বাচ্চ।”

মিস্ট্রের বদল—“এখন তো গবে দশটা;—
আপনার তো ঘুঁটোর সময় সেবা করবার কথা।”

বল্লভ—“আহা যাচ্ছে বকো কেন?—আমরা
তো আর এখন লাটসাহেবের কাছে থাকি।”

বল্লভ—“জবে?”

বল্লভ—“আমরা এখন থাকি ইডেন গার্ডেনে।”

বল্লভ—“তার মানে?”

বিস্ময় হ’লে বল্লভ—“বোকা না, কান্নাকাতি

থাকা ভাল, সময় হ’লেই শুটু ক’রে চ’লে যেতে পারব।”

বল্লভ—এর ওপর আর কথা চলে না।

‘হুগু’ ‘হুগু’ ব’লে রায়বাহাদুর বেরিয়ে
পড়লেন। আসে চলছেন রায়বাহাদুর, পদ্মভে
পদ্মবানদ মাথায় বনমাণী, সে এক অপূর্ণ দৃশ্য!



রায়বাহাদুর সেজে-পুজে অস্ত্র

ঘোড়ার ছাড়বার পূর্বে ম্যানোভারবান্ধ দিকে চেয়ে
বল্লভ—“ভক্ত্যনিত্যে নিয়ে আপনি কখন যাচ্ছেন?”

ম্যানোভারবান্ধ বল্লভ—“আপনি কিছু ভাবছেন
না, বারোটার মধ্যেই আপনার কাছে গিয়ে পৌঁছোছি।
প্যাসোভার তলায় থাকবেন তো?”

রায়বাহাদুর বল্লেন—“হ্যাঁ!” তারপর আমার দিকে অত্যন্ত করুণ নয়নে চেয়ে বল্লেন—“ওবেলা একবার এসো!”

বল্লুম—“নিশ্চয়ই আসব!”

রায়বাহাদুরের মোটর ছেড়ে বিলে ম্যানেজার-বাবুকে জিজ্ঞাসা করলুম—“তকসকলে নিয়ে যাবেন কেন?”

ম্যানেজারবাবু বল্লেন—“হুঁছেন না—এখন তো সব লুপটা—এর মধ্যে কতবার পাগড়ী গুলে যাবে তার ঠিক কি!—বড়লোকের কাণ্ড, মশাই!”

সমস্ত হুপটা ছুটুপুটু করে কাটতে বেলা পাচটা। নাগাদ বরানগর অভিমুখে রওনা হ’লুম। বুক হুঁক-হুঁক করছে—না-জানি কি গুস্তে হয়। সেট পার হ’লেই বনমালীর সঙ্গে দেখা। আমাকে যেখাই সে ছুটে এসে পা-ছটা ধড়িয়ে খ’রে কাঁদতে শুরু করে দিলে।

বুকটা ছাঁচ ক’রে উঠল, তবে কি?—

কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলুম—“ব্যাপার কি, বনমালী?”

পা ছেড়ে দিয়ে উঠে ধাড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে বল্লেন—“বাবু, আমার সর্জনাম হ’য়ে গেছে।”

কিছুই বুঝতে না পেয়ে বল্লুম—“কি হয়েছে, নিশ্চির গুলে বল!”

সে বল্লেন—“আমার চাকরী গেছে, বাবু!”

থড়ে বেন গ্রাণ এল। বল্লুম—“বাবু ভাল আছেন তো?”

বল্লেন—“তিনি তো খ্যা নিয়েছেন।—আমার কিছু কি হবে, বাবু?”

বল্লুম—“হয়েছে কি গুলে বল না!”

বল্লেন—“বাবুর মুখে সব শুন্বেন, ছাত্র!—আমার কোন কছর নেই, শু শু চাকরি দেল।”

বল্লুম—“আচ্ছা, বাবুকে বুঝিয়ে বলুন—এখন ছেড়ে যে!”

বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে দেখি—ঘর খালি—কেউ কোথাও নেই। বেরিয়ে আদুছি, ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে দেখা। আমাকে যেখাই তিনি বল্লেন—“এই যে, আপনি এসেছেন—বাবু আপনাকে অনেক দল থেকে হুঁছেন।—চলুন ওপরে।”

বল্লুম—“সত্য না হ’তেই আমি ওপরে উঠেছেন যে বড়?”

বল্লেন—“শরীরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ।—কবিরাম মশাই এইমাত্র ব’লে গেলেন—নাড়ী বড় ক্ষীণ।”

রায়বাহাদুরের ডেউলার শরনকে প্রবেশ করলুম।

ভদ্রলোক শয্যার উপর হাতপ ভাবে প’ড়ে রয়েছেন,—

“আমার লাকানো বাগান গুড়িয়ে পেল” সোহের অবস্থা। বাড়ীর গোকে কেউ ব্যাডাস করছে—কেউ পা টিপছে—কেউ কিছু করতে না পেয়ে গুঁই ভীড় বাড়ানো।—সে এক হে-ইহ ব্যাপার! আমাকে দেখেই কাছে গিয়ে বলতে ইঙ্গিত করলেন।

কাছে গিয়ে ব’সে জিজ্ঞাসা করলুম—“গাটলাহেবের সঙ্গে দেখা হ’ল?”

ক্ষীণ অগত উত্তেজিত কণ্ঠে রায়বাহাদুর বল্লেন—

“আমার সর্জনাম হ’য়ে গেছে, পরেশ!—বনমালী ব্যাটা সব নষ্ট ক’রে দিয়েছে।”

বল্লুম—“কেন, কি হয়েছে?”

সেকথার কোন উত্তর না দিয়ে ধাতে ধাত চেপে চাপা কুড়কটে রায়বাহাদুর বল্লেন—“ব্যাটাকে আমি দেখে নেবো!”

বল্লুম—“কেন, সে কি এমন অপরাধ করলে?”

একই দম্ব নিয়ে রায়বাহাদুর বল্লেন—“সব পোন তা’ হ’লে;—এখান থেকে তো বেয়েলুম।

তোমাদের সামনেই ত বিবি পাট্টা পাট্টা ক’রে মোটর দিয়ে বল্লুম। তখন পর্যন্ত নার্সালমেনের নাম-পদ্ব পর্যন্ত ছিল না। তার পর ইয়েল পার্ভেনে গিয়ে প্যাগোডার জমায় আত্মর নিদ্রা। তখন পর্যন্ত বেশ আছি। তার পর বারোটা নাগাদ

ম্যানেজারবাবু আর ডকংসি গিয়ে হামির হ'ল—
তখনো দিবি আছি।—ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে কত
কথা হ'ল—দিবি স্বাভাবিক অবস্থা।

“তার পর ক্রমে একটা বাজল। ডকংসি বন-
মালীর মাথায় নতুন ক'রে পাগড়ী বাঁধতে বসল,—
আমিও এদিকে তৈরী হ'তে লাগলুম।

“তখনো দিবি ঢাঙ্গা আছি।

“ক্রমে পৌণে দুটে। হ'ল। ওদিকে বনমালীর
পাগড়ী বাঁধাও শেষ হ'য়ে গেছে। নেড়ে-চেড়ে
সেখলুম—পাগড়ী দিবি মাথায় কাবড়ে বসেছে।
ভাতিয়া তিন দিন আগে মাথা কামানো হ'য়েছিল।
সবই তৈরী—যাত্রা করলেই হয়।

“ছুটা বাজতে দশ মিনিটের সময় লাটসাহেবের
ঘেটের সামনে হামির হ'লুম। স্বাস্থ্যময়ে ডাক পড়ল।
ম্যানেজারবাবু আর ডকংসি বাইরে মোটরে অপেক্ষা
করতে লাগল। আমি আর বনমালী ভেতরে ঢুকে
গেলুম।

“আমি আগে আগে চলছি—পেছনে ভণ্ডার ট্রের
ওপর মরকো-লেদারের বাঁধানো। *Mysteries of the
Court of Kulakundalini* নিয়ে বনমালী আসছে।
এবার সেখর পার হ'য়ে শেষকালে লাটসাহেবের
খাস্কাবরার দরজার সামনে এসে তো হামির হ'লুম।
পরক্ষণেই ঘরে ঢুকে হকুম এল। সজি বসছি, পরেশ,
তখন পূর্ণাঙ্গ একটুও নার্ভাস হইনি।

“প্রকাণ্ড হল—চলেছি তো চলেইছি,—দূর থেকে
সেখতে পাচ্ছি অনেক দূরে প্রকাণ্ড একটা উঁচু চেয়ারে
লাটসাহেব ব'সে রয়েছেন। এঙতে লাগলুম,—মনে
মনে কেবলই ডাকছি—মা মগদম্বা, পেরকে কোরো,
মা !

“আর বোধ হয় হাত দশেক এঙলোই লাটসাহেবের
সামনে গিয়ে উপস্থিত হই—এমন সময় হঠাৎ মনে প'ড়ে

গেল—বনমালী ব্যাটাকে তো দেখা হয় নি—ব্যাটা
টুক আসছে তো ?

“সঙ্গে-সঙ্গেই পেছন দিবে একবার তাকালাম।—
ডাকিয়ে যা দেখলুম—ভাতে সমস্ত শরীর কিম্ব কিম্ব
করতে লাগল। মাথাটা টপু মলু ক'রে উঁচল, চারিদিক
অন্ধকার হ'য়ে এল। দেখি, বনমালীর মাথায় পাগড়ীর
চিলমাত্র নেই। সঙ্গে-সঙ্গেই নজর প'ড়ে গেল,—অতবড়
হলুঘরের দরজা থেকে মুক ক'রে যে পর্যায় আমরা চ'লে
এসেছি, সমস্ত পথটি কে যেন শাপু বিছিয়ে দিয়েছে।
লাটসাহেবের দিকে কিরে দেখি তিনি সন্মাল বুখে
গিয়ে হাসছেন।—মাথা পুলিয়ে গেল।—দিখিনি-
জানশূন্য হ'য়ে তাড়াতাড়ি বনমালীর কাছে গিয়ে
ট্রের ওপর থেকে *Mysteries of the Court of
Kulakundalini*-খানা ভুলে নিয়ে লাটসাহেবের হাতে
দেখো ব'লে চলছি, এমন সময় হঠাৎ ধু ধু ক'রে
হাত দুটো কঁপে উঠল ; সঙ্গে-সঙ্গেই অতবড় মোটা
বইখানা ধপু ক'রে হাত থেকে ব'লে মেঝের ওপর
প'ড়ে গেল।

“অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে মেঝে থেকে
বইখানা ভুলে নিয়ে লাটসাহেবের হাতে দিতে গিয়ে
দেখি, মরকো-লেদারের মলাটটি কেবল হাতে ফুঁছে—
বইখানা মলাটহীন অবস্থায় মেঝের ওপর প'ড়ে
রয়েছে।

“তার পর যে কি হ'ল, জানি না। জোখ
চেয়ে দেখি নিজের গোবার ঘরে বিছানার ওতে
রয়েছি, আর কবিরাজ মশাই নাকী ধ'রে পাশে
ব'সে রয়েছেন।”

এই অবধি ব'লেই রায়বাহাদুর চুপ করলেন ; তার
পর হঠাৎ একসময় ব'লে উঠলেন—“আমার বুকটা কি-
রকম যেন করছে, জুখনি কবিরাজ মশাইকে খবর
দাও।”



ভারতের লুপ্ত অতিকায় সন্ন্যাস

ঐশ্বর্যবিনয় রায়চৌধুরী

কোট কোটি বৎসর পূর্বে—মানবের জন্মেরও
বহু লুপ্ত পূর্বে—পৃথিবীর অবস্থা কি ছিল, কিরূপ
শ্রেণীর জীব তখন পৃথিবীতে বাস করিত, তাহাদের

জীবনকালের কথা লইয়া “Palaeontology” নামক
শাস্ত্রই পড়িয়া উঠিয়াছে।

মাটির নীচে, প্রস্তরীভূত লুপ্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্থি-
কঙ্কালাদি অনেক স্থানে খনন করিয়া পাওয়া গিয়াছে,
এবং সেগুলিকে ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া ও সে-বিষয়ে
পবেষণা করিয়া পণ্ডিতেরা নানা সিদ্ধান্তে উপনীত
হইয়াছেন। লুপ্ত প্রাণীর সামান্য হই-চারিটি অস্থি
পাওয়া গেলেও বিশেষজ্ঞেরা সেই প্রাণীর চেহারা,
বস্তুত্ব, আকার প্রভৃতির বিষয় অনেক ধর বর্ণনা
দিতে পারেন। প্রস্তরের মধ্যে কোন্ শ্রেণীর লুপ্ত
উদ্ভিদ ও জীবের চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহা দেখিয়া
প্রস্তরের বয়স নির্ধারণ করার উপায় বাহির করা
হইয়াছে। আবার, প্রস্তর দেখিয়া লুপ্ত জীবের
অস্থি বা চিহ্ন পাওয়ার সম্ভাবনাও তাঁহারা নির্ধারণ
করিতে পারেন।

ভারতবর্ষে সেকালের জীব কিরূপ আকারের ছিল
এবং কোথায় তাহারা বাস করিত, সে-বিষয়েও অনেক
পক্ষেপা হইয়াছে ও হইতেছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভাস্কর
সি, এ, ম্যাটলি নামে এক বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত
জম্মলপুরের নিকটস্থ ‘বড়-সিরসা’ পাহাড়ে ‘ভাইনোসর’
জাতীয় লুপ্ত অতিকায় সন্ন্যাসের অস্থি আবিষ্কার
করেন। এ বৎসরেও তিনি জম্মলপুরে গিয়াছিলেন।
তাঁহার সঙ্গে ছিলেন ভারতীয় ভূতত্ত্ব-অগ্রগণ্য-বিভাগের
ঐশ্বর্যবিনয় রায়চৌধুরী। তাহাদের চোঁয়াড় এবারও



ঐশ্বর্যবিনয় রায়, বি.এস.সি (১৯০৭),
এ-আর-সি-এল

প্রকৃতি এবং আকৃতি কিরূপ ছিল, এসকল বিষয়ে
সাহস্য বিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক কথা জানিতে
পারিয়াছে। সে-কালের গাছশাখার ও লুপ্ত অতিকায়

‘ছোট-সিমলা’ নামক পাহাড়ে বননের ফলে কয়েকটি অভিকায় সন্ন্যাসের অগ্নি পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে, একটি কক্ষের হাড় লম্বায় ৪ ফুট ইঞ্চি, পাথরের চুইটি হাড় লম্বায় ২ ফুট ৮ ইঞ্চি করিয়া, সামনের পাথরের উপর নিকের হাড় লম্বায় ৩ ফুট, একটি পাথরের হাড় ২০ ইঞ্চি। এই জানোয়ার লম্বায় প্রায় ত্রিশ হাত ছিল। ১৯১২ সালে যে অগ্নি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা ছিল আরো বড় জানোয়ারের—লম্বায় সে জানোয়ার ছিল প্রায় চল্লিশ হাত। এবারে যে জানোয়ারের অগ্নি পাওয়া গিয়াছে, তাহার নাম সেওয়া হইয়াছে টাইটানোসরাস। এই জীৱের চেহারা ছিল অনেকটা, গোসালের দরারে সাপের মাথা

ও লম্বা গলা বসাইলে যেহেতু ২৩, সেইরূপ; তবে, আকারটি ছিল বিরাট। ইহার উভয় ছিল—অর্ধাৎ গলে-স্থলে বাস করিত; তবে, অধিকাংশ সময় গলেই কাটাইত। মৃত্যু নিত্যই ছোট ছিল এবং আশ্চর্য্যের বিশেষ কোন অঙ্গ ছিল না; সেহেতু গলে বাসই ইহাদের পক্ষে নিরাপদ ছিল।

এই সকল সন্ন্যাসের ‘ডাইনোসর’ নাম সেওয়া হইয়াছে (‘ডাইনো’ অর্থাৎ ভয়ানক, ‘সর’ বা ‘সরাস’ অর্থাৎ সন্ন্যাস—কথ্যগুলি গ্রীক)। ইহাদের মধ্যে নানা জাতীয় সন্ন্যাস আছে; আমিষতোজীও আছে। ভরতবর্ষেও আমিষতোজী ডাইনোসরের অগ্নি পাওয়া গিয়াছে।

“জাতির যে এত অধঃপতন ঘটছে, তার প্রধান কারণ, এই সব শক্তিসৃষ্টির অবমাননা করা। মহা বসেছেন, ‘বহু নারীশ পুঙ্খানু পুঙ্খানু নন্দে’ তবু দেবতা; বহুইচ্ছা ন পুঙ্খানু সর্গাক্রম্যকলা: ক্রিয়া:।’—যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নাই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে সত্যের—সে দেশের কখন উন্নতির আশা নাই। এই জন্য এদের আসে তুষ্টিও হবে—এদের মস্ত আদর্শ মট হাপন কর্তে হবে।”

—বিবেকানন্দ



['ইকরাম' সমালোচনার ৩য় পঞ্চসংস্করণ অনুগ্রহ করিয়া ইংরেজের নৃত্যক কুটুপানি করিয়া পাঠাইতে]

দি ইনসিওরেন্স এণ্ড ফাইনান্স রিভিউ—

ম্যানেজিং এডিটর—ডাঃ এস. সি. রায়। এডিটর—শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক।—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রিট, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। তৃতীয় বাবিকী সংখ্যার মূল্য এক টাকা।

ভারতীয় বীমা কোম্পানীদিগের বিশেষভাবে

রচিত এবং অতি-আধুনিক তথ্য সংবলিত প্রবন্ধগুলি আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে ; সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলিও অত্যন্ত সারবস্তাপূর্ণ।

মিত্র

গত তিন বৎসর হইতে এই পত্রিকা দেশীয় ব্যবসায়ক্ষেত্রে ভারতীয় অর্থনীতি, ব্যাঙ্কিং, বীমা, শিল্প এবং অগ্রাভিউ উপায় জাতিগঠনের বিশেষ সহায়তা করিতেছে। সত্যকার অগ্রদূতের প্রতি ভারতীয়দের বাহাতে শৈথিল্য না ঘটে, তদ্বক্ষেত্রে এই পত্রিকার অগ্রান্ত পরিশ্রম আমাদের জাতীয় জীবনে এক নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। শুধু সমাজ-সমূহের বিবৃতি লইয়াই ইহা ক্ষান্ত থাকে নাই, দেশের বিখ্যাত এবং বিখ্যাত অর্থনৈতিকদের এবং ব্যবসায়ীদের চিন্তার ফল এবং অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়া উন্নতির এবং কর্মকুশলতার নূতন পথ আবিষ্কারে সহায়তা করিতেছে।

এই সংখ্যা বিখ্যাত লেখকদিগের প্রবন্ধ ও নানা প্রকার নূতন তথ্যে পরিপূর্ণ। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ, অধ্যাপক রামচন্দ্র রাউ, যথাক্রমে বাংলার শিল্পোন্নতির উপায়, বিশ্বব্যাপ্তি অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং লণ্ডনের অর্থনৈতিক সম্মিলন সম্বন্ধে কয়েকটা হৃদয়গ্রাহী এবং সুস্বাদু প্রবন্ধ দিয়াছেন। ব্যবসায়ক্ষেত্রে সর্গোপেক্ষা খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দের আশীর্বাদচরনের সমৃদ্ধি মন্তকে লইয়া সত্যি এই 'ফাইনান্স রিভিউ' গর্বান্বিত করিতে পারে।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী (তৃতীয় ভাগ)—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিট, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। দাম তিন টাকা। কাপড়ে বাঁধাই ; ৪৮২ পৃষ্ঠা।

এই পুস্তকের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার কিছুই নাই। ইহার যে তৃতীয় ভাগ অবশিষ্ট লিখিত হইল, তাহাই ইহার সুপ্রচারের পরিচয়। অলস ও ঘরমুখে বলিয়া বাঙ্গালী জাতির কুখ্যাতি আছে। কিন্তু এই অলস বাঙ্গালীই জীবিকার সন্ধানে বা নূতন দেশ দর্শনের মোহে ভারতবর্ষের সর্বত্র ছুটিয়া গিয়াছে, এবং অদম্য সাহসে আপনার ভাণ্ডা গড়িয়া তুলিয়াছে। আলোচ্য পুস্তকে যে-সব বাঙ্গালীর জীবন-কথা পাওয়া যায়, তাহারা সকলেই উজ্জমী, উৎসাহী ও কর্মশীল—অর্থাৎ তাহারা অলস বাঙ্গালীর ব্যতিক্রমত্ব। এইসব কৃতী বাঙ্গালীর জীবন বাঙ্গালী-সাধারণের দ্বারা পঠিত হইলে বাঙ্গালীর নৈরাশ্রম্য জীবন আশাপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারিবে।

গুপ্ত



যে-সব সঙ্গদয় সাহিত্যিক ও কৃতবিদ্যা ব্যক্তি আমাদের ‘উদয়ন’র সাফল্য কামনা করিয়া প্রীতিপূর্ণ পত্র দিয়াছেন, তাঁহাদের শুভ-ইচ্ছাই আমাদের একমাত্র পাথেয়। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতেছি :—

মাননীয়। দেবী অবলা বসু, মেঘর শ্রীযুক্ত সন্তোষ-কুমার বসু, ডাঃ শ্রীযুক্ত স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চাকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কবিশেখর, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন, ট্রেটস্‌ম্যান্‌ পত্রিকা-আফিস হইতে মিঃ ওয়াল্টার বাক্স, অমৃতবাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা, এডভান্স, লিবাটি, বঙ্গবাণী, নবশক্তি, বীরভূম-বাণী, বাতায়ন, হিন্দু, জনশক্তি প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকগণ, “পৃথিবীর ইতিহাস কাগ্যালয়” হইতে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী এবং এফ্‌, ডব্লু, হিলজার্স এণ্ড কোং হইতে মিঃ ই, এ, বেলানি, প্রভৃতি।

‘উদয়ন’ যে সাহিত্য-জগতে একটা কিছু অভিনব ব্যাপার করিবার জন্ম আবহিত হইয়াছে, তাহা নহে। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যে সাহিত্যের সেবকমাত্র, ‘উদয়ন’ও সেই বাংলা সাহিত্যের সেবা করিয়াই আপনাকে কৃতার্থ করিতে চাহে। সেবার্যো জন্ম-বিচ্যুতি ঘটা অসম্ভব নহে। সতর্ক ও সঙ্গদয় পাঠকগণ আমাদের লক্ষ্য-সাধনে সহায়তা করিবেন, এ ভরসা আমাদের আছে।

লেখকগণের রচনা সংগ্রহ ও তাহা দ্বারাই কাগজের কলেবর পূর্ণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। অবশ্য, যে-কোনো সাময়িক পত্রিকার এইটাই মুখ্য কাজ ; তথাপি, সাময়িক পত্রিকার আর-একটি কার্য হইতেছে সাহিত্যের বিবর্তন-ধারার সহিত, তাহার অতীতের সম্পূর্ণতার সহিত বারংবার পাঠক-সাধারণের পরিচয় ঘটাইয়া দেওয়া। ‘উদয়ন’ সেই কার্যেও আপনাকে নিয়োগ করিতে চেষ্টা করিবে।

বর্তমানে একশ্রেণীর পাঠক দেখা যায়, যাহারা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র পাঠ করিয়াই বাংলা সাহিত্য অধ্যয়ন শেষ করেন। তাঁহাদের মতে প্রাক্-রবীন্দ্র-শরৎ বঙ্গসাহিত্য সাহিত্য হিসাবে গণ্যই নহে। অবশ্য, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রতিভাবলে যে বঙ্গসাহিত্য অত্যুন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু, মনে রাখা দরকার যে, জীবজগতে যেমন, সাহিত্য-জগতেও তেমনি ক্রমবিবর্তন আছে। ত্রিভি-শত জীবন যেমন অসম্ভব, অতীত-উৎস-শত সাহিত্যও তেমনি জল্লভ। বঙ্গসাহিত্যের বয়স প্রায় হাজার বৎসর ধরা যাইতে পারে। এই হাজার বৎসরের মধ্যে তাহার যুগ-বিভাগও কম নহে। অল্প কয়েকটি নাম করিতে হইলেও দেখিতে পাই, রামাই পণ্ডিত, বিজয় গুপ্ত, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস-কাশীরাম, গোবিন্দদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল ও মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র, দীনবন্ধু ও ইন্দ্রনাথ, বিহারীলাল ও অক্ষয়-কুমার, গিরিশচন্দ্র ও বিজ্ঞানলাল—প্রত্যেকেই যুগ-

সাহিত্যের সেবা অর্থে কেবলমাত্র বর্তমান

বিশেষের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। ইহাদের প্রত্যেকেরই সাধনার বঙ্গসাহিত্য পরিপুষ্ট হইয়াছে। স্মরণ্য এই যে সেবকদল, ইহাদের সাধনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির বিচার করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব আকস্মিক কি না, এবং আকস্মিক না হইলে তাহা পূর্ববর্তী সাহিত্য-ধারার সহিত কি সন্ধে আবদ্ধ, তাহা বুঝিতে হইবে। মুকুন্দরাম না থাকিলে ভারতচন্দ্র কতটা দাঁড়াইতে পারিতেন, ভারতচন্দ্র না থাকিলে কবিওয়ালারা কিরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারিতেন, কবিওয়ালারা না থাকিলে ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিভা কতটা গ্লিহিত, এবং ঈশ্বর গুপ্ত না জন্মাইলে রঙ্গলাল, মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনা কতটা অগ্রসর হইতে পারিত, এবং মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের অভাবে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রতিভা কতটা বিকশিত হইতে পারিত, তাহা বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ইহাই হইবে সাহিত্যের যথার্থ বিচার। এই সাহিত্য-বিচারে অথবা সাহিত্যের অতীত ধারা ও অতীত গৌরবের সহিত বর্তমান সাহিত্যের সন্ধ-নির্ণয়ে আমরা নিমুক্ত থাকিব।

সাহিত্যেরই একটা অঙ্গ। আমরা গতবারে এতথেকে দেশবাসীর নিকট আবেদন প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু চুপের বিষয়—আমরা এ জাতীয় কোনো প্রবন্ধাদি এখনও পাই নাই। আমরা আশা করি, এবিষয়ে দেশবাসী আপনাদের কর্তব্য বুঝিতে পারিবেন, এবং দেশ-প্রেমিক ব্যক্তিগণ গ্রাম্য গৌরব-বস্তুর বিবরণাদি পাঠাইয়া আমাদেরকে বঙ্গ-ইতিহাস গঠনে সহায়তা করিবেন।

* *

স্বাস্থ্যরক্ষা বা শরীরচর্চা সন্ধে ১০।১৫ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালীর যে ঔদাসীন্য ছিল, আজকাল বীরে ধীরে তাহা দূর হইতেছে। ইহা একটা বিশেষ আশার কথা। আরও আশার কথা এই—ব্যায়াম-চর্চা বাহাতে সাধারণের মধ্যে প্রসারিত হয়, তাহার জন্ম সাধারণের মোটা মোটা চাদার কলিকাতায় গোলদীঘির কাছে একটি বৃহৎ ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাঙ্গালী বালক ও যুবকগণকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলুক—ইহা আমাদের আন্তরিক কামনা। গত কয়েক বৎসরে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে কয়েকজন বীর জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীর চরিত্রতার ব্যতিক্রমহল হইয়াছেন। তাঁহারাই হইতেছেন,—শ্রামাকাশ, আশানন্দ, কর্ণেল হরেশ বিশ্বাস, ক্যাপ্টেন শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভীম ভবানী, গোবর, প্রভৃতি। কেবল সাহিত্য নহে, কলাচর্চা নহে,—শারীরিক বল অর্জনেও বাঙ্গালীকে বিশেষ ভাবে প্রভী হইতে হইবে।

* *

বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে বাঙ্গালীর কীৰ্ত্তি কাহিনীর যে-সব অবশেষ তাহার ভগ্ন মন্দির ও বৈশাখাঙ্কুর দীঘি প্রভৃতিতে আজও লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহার পরিচয় সর্গসাধারণকে দেওয়া—সাহিত্য-পত্রিকার কর্তব্য। কেননা, দেশের ঐতিহ্যের অহুসন্ধান



উদয়ন — আশাঙ্ক.



me hrz 29/10/19



উদয়ন

শ্রীকৃষ্ণদত্ত মল্লিক, বি এ

১

উদয়ন, শুভ উদয়ন,
অন্ধকারে জ্যোতির প্রপাত,
তৃতীয় নয়ন উন্মীলন,
শুভদৃষ্টি দেবতার সাথ।

২

নীল সিঁদু ময়ূন-কাতর,
অমৃতের আনিল সংবাদ,
মহাধ্যানে লভিল সাধক,
অরূপের রূপের আশ্বাদ।

৩

বান্দ্যাকির পূণ্য তপোবন
পরিপূর্ণ ছন্দের গৌরবে,
জ্ঞান পূর্বা হ'ল রসায়িকা
স্বজনের মহাঘোষাৎসবে।

৪

মানবের হৃদি পঙ্কাসনে
এলো তার আকাঙ্ক্ষিত জন,
নব্বর এ জীবনের নাথ
দেখা দিল অনন্ত জীবন।

৫

বৃন্দাবন-ক্ষেত্র উদয়নে
দূরে গেল ভীতি, ঘৃণা, ভরা—
মর-নারায়ণে কোলাকুলি,
দেবভূমি হ'ল বসুন্ধরা।

৬

উদয়ন, শুভ উদয়ন,
জীব নাথের শির আনিকার,
পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ,
শূনে গেল স্বরগের দ্বার।

মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

(১)

পর্যায় ভাষার একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, সে আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতা হারাইয়া ফেলে। এই কারণে দেখিতে পাই যে, আমরা হাত-পা শুটাইয়া আসতে বুঝা সময় কাটাই এবং অর্থনীতি ও সমাজনীতি সংক্রান্ত সমস্ত নোংরা পদার্থমণ্ডের কাছে চাপাইয়া বসি।

ইংরাজী ভাষা শিক্ষার বাহন করিয়া বিদ্যার্জন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ না করিতে পারিলে জীবনের ভবিষ্যৎ যে নষ্ট হইয়া পেশ—এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হওয়ার ফল হইয়াছে যে, বালকসমূহ তাহাদের প্রথম জীবনে যে সময় মানসিকময় impression (ছাপ) গ্রহণ করিতে পারে সেই মহামূল্য সময় বুঝা মগন হইয়া পাকে। ৭।৮ বৎসর হইতে ১৪।১৫ বৎসর পর্য্যন্ত বালক-বালিকার জীবন কৃত্তকারের হাতের কর্মের দ্বারা, তাহারা ইচ্ছা-স্বাধীন পাত্রের গঠন দিতে পারে। কিন্তু আমাদের শিক্ষাপ্রণালী এতই শাপগ্রস্ত যে, আমাদের বাল্যজীৱিত এই বিশদূর্য্যের নিমজ্জিত হইয়াও তাহার চৈতন্যের হইল না। ২।৩ বৎসর হাবং ক্রমাগত বাবলা-বাগিয়া মন্য পড়িতেছে। বাবলা বেশ কৃত্তিপ্রধান; খান, পাটের দর গড়ে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ, টাকার আদান-প্রদান বিশেষতঃ মফস্বলে একেবারে বহু, একখানি দশটাকার নোট ভাঙাইতে হইলে দ্রবতী কোন মহাজনের গদি বা ‘কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক’ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই দুর্লভের সবও প্রবেশিকা, আই-এ, আই-এসসি, বি-এ, বি-এসসি, পরীক্ষাবীর সংখ্যা সর্বাংশে বাতিয়া চলিয়াছে।

আজকাল এক ক্রন্দনবোল উঠিয়াছে, এমন কি বাহা। ভিত্তাশিল্প ও লক্ষ্যবিত্ত বসিয়া পরিস্ফুট ঠাট্টাও খবরের কাগজে কলমদগ্ধীর দ্বারা অভিযোগ

করেন যে, বাহা কিছু অর্থকরী বিভা ভাঙার সমাধান ও দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতেই দ্রুত।

কিন্তু এই ভ্রান্ত ধারণা এখনও বৃষ্টি না। কৃষ্টি কৃষ্টি প্রাক্কৃষ্টি দৃষ্টি করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য, তাহা তোমরা বচসে দেখিতেছ, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই আবার হেলেকে ডিগ্রীধারী করিবার দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতেছ; আজ সহস্র সহস্র দুবক বেকার অবস্থায় বসিয়া উপবাস করিতেছে, এমন কি সময় সময় আত্মহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না *। আমি প্রায়ই এই কথা বলিয়া থাকি যে, পাটের বাহার বড়ই মন্য, কত মহাজন সর্গস্বাত হইয়া বাইতেছে; যে মহাজনের গুণামে পাট অবিক্রি বসিয়া ২।৩ বছরের মাল জমাতে বা মন্থত রহিয়াছে, সেই মহাজন আবার কি নিজের পৈতৃক ভিটে-মাটি বাধা দিয়া পুনরায় পাটের মাদন করিবে? কিন্তু অল্প সংখ্যক এমনই মন্যপাত হইয়াছে যে, ইহা দেখিয়াও দেখে না,

* অল্প প্রান্তে (২৪শে জ্যৈষ্ঠ) এক সম্মেলনের সময় সৈনিক ‘মানবস্বাক্ষর প্রতিকার’ নিয়মিত নিয়ম কামিউনিষ্ট প্রতি মন্তর গল্প।

আত্মহত্যার কাহিনী—বেকার দুবকের আত্মহত্যা

হৃদয়গত, ৩।৪ মন

পত পতন তামিষে পৈলেনকুমার বার নামক জনক কৃত্ত দুবক অধিক দেখে আত্মহত্যা করিয়াছে। একজন যে, দুবকটি কিছুদিন হইতে বেকার ছিল, ইহাতে তাহার জীবন অল্প হইয়া উঠে। কল, এইজন্য তাহা আত্মহত্যা করে।

অতাবের আলার আত্মহত্যা—কোভাশ্বর পোচনী পরিশ্রম কোম্পানির কোভাশ্বরী কমেসের কর্তব্যী শ্রীকান্ত চন্দ্রবীর বৃত্তময় তাহার বাসার মন্থে পাতা দিয়াছে। তাহার বিকট একখানি পত্র পাওয়া গিয়াছে; ইহাতে সে লিখিয়াছে, জীবন দুর্লভ যোগ হওয়ার সে আত্মহত্যা করিতেছে। একজন যে, কয়েকদিন পূর্বে তাহার বাড়ী হইতে টাকার দ্রুত পত্র আসিয়াছিল। বাড়ীর লোকেরা ব্যক্তি প্রায় মন্থে দিন কাটাইতেছিল। কোন একবার অর্থের দ্রুত করিতে না পারিয়া তাহার ভ্রাতা নিম্নতম বিকট হইতে বিকট কাটাইতেছিল। ইহা সহ করিতে না পারিয়া সে নিগদনে আত্মহত্যা করিয়াছে।

তিনিও তনে না ; হোরিওপ্যাথি চিকিৎসক বলেন, *similia similibus curantur* অর্থাৎ 'বিষত বিষমৌষধ'। যেহেতু সহস্র সহস্র গ্রাফুয়েট দুৰ্ব্বল জীবন-সংশ্রামে পরাহৃত হইতেছে, তাহারই ঔষধ আবার নূতন করিয়া গ্রাফুয়েটের সৃষ্টি করা !

মানব-জীবনে বিজ্ঞানশিক্ষা যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। শিক্ষার উদ্দেশ্য এই যে, ছাত্রগণ সৰ্ব্বদিকে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, বাহ্যকে ইংরাজীতে culture বা কৃষ্টি বলে। শিক্ষাই মানুষকে শত্রু হইতে প্রকৃত মনুষ্যে পরিণত করে। বাংলাকালে আমাদের চাচী প্রাণপণ আমাদের বলিত, "বাবু, আমরা চোখ থাকতে কাপা, কাণ থাকতে কান"।

আমি যে সেপথের নবজাগরণের ও স্বাধীনতা লাভের মত নূতন হাওয়া প্রবাহিত হইতেছে, তাহা নিরক্ষর ও অজ্ঞ লোকের মধ্যে কণাচিৎ পৌছায়। এই কারণেই নবা জ্ঞানান, চীন, পারস্য, তুর্কী প্রভৃতি দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতাবদ্ধ হইয়াছে, এবং ইহার ফলে এই গড়াইয়াছে যে, যেমন ইউরোপ ও মার্কিন দেশে তেমনি জাপানেও আজ স্কুট-মুদ্র, দাস-দাসী, হালচাচী বহনই একটু ছুতছুত পায় অমনি খবরের কাগজ লইয়া কেবল নিজের সেশের নম্র, ছনিয়ার খবর লইয়া আলাপ করিয়া থাকে ; এবং এই ভাবে তাহাদের মধ্যে সেন্সািবোধ ও জাতীয়তা ভাব সঞ্চারিত হয়।

আমি বহন লিখিতেছি আমার সামনে অন্ধকার 'আনন্দবাজার' রহিয়াছে। আজকাল দৈনিক 'আনন্দ-বাজার' যে প্রকার স্তোত্রভাবে সম্পাদিত হয় অনেক ইংরাজী পত্রিকাও সেদগ্ন হয় না। ইহাতে 'রকটার', 'এসোসিয়েটেড প্রেস', 'ফ্রি-প্রেস'র বাবতীয় খবর থাকে এবং ভারতীয় ও প্রাদেশিক (বঙ্গদেশীয়) 'বাবস্থাপক সভা'র কার্যাবলী দেওয়া হয়। এতদন্তির যে সমস্ত সম্পাদকীয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রবন্ধ থাকে তাহা অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ। মনে করুন, আপনাদের ছেলে মার ছাত্রত্ব পূর্ণ্য পড়িয়াছে ; সে যদি এই প্রকার দৈনিক 'The Standard' নামক 'স্ট্যান্ডার্ড' 'জার্নাল' লিখিত

প্রভৃতি মাসিক-পত্রিকা চাইতে খবর বাত দিয়া বিবিধ প্রদশ, সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি পড়ে তাহা হইলে সে এত বিস্ময় জানিতে পারে যে, কোন ইংরাজীমবিশ গ্রাফুয়েটও তাহা জানেন না। উপরিনির্দিষ্ট পত্রিকাগুলিতে শুধু আমাদের দেশের নম্র, সমস্ত পৃথিবীর এত তথ্য থাকে, যদি তাহার এক-ভাষাও আমাদের উপাধিধারীরা জানিবার মত ব্যগ্র হইতেন তাহা হইলে আমি নিজেই দগ্ন মনে করিতাম।

আজকাল কপার কপার অলুযোগ করা হয় যে, ইংরাজী শিক্ষা বাতীয় পৃথিবীর বাবতীয় স্তোত্রব্য বিষয় জানিবার উপায় নাই ; এবং বড় বড় master-piece অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ চিত্রপূর্ণ্য গ্রন্থের সহিত পরিচয় রাখা অসম্ভব। এই অভিসেপের খোজিক্তা আমি আমি কিছু কথা হইতেছে এই যে, প্রত্যেক ছাত্রকেই কি ইংরাজী মত ইংরাজী শিখিতে হইবে ? কথাটি একটু বিশদরূপে বুঝাইতেছি ; বাবীকির-সামান্য দরগ তাহার রচিত, এমন কি স্থানে স্থানে উপক্রমদিকা ব্যাকরণ পড়িয়াই বেশ মনস্তম্ব করা যায়।

কিন্তু আমি মিজাদা করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারীদের মধ্যে কয়জন মূল বাবীকির-সামান্য পড়েন ? এমন কি ক্রুশের বিষয় এই যে, আজকালকার শিক্ষিতগণ কৃতিবাসী সামান্যেরও বড় খাব ধারেন না। আমাদের বুঝা পিতামহী ও সামান্য মোকানী-পসারীরা আজও ইহা আমাদের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। যদি বলেন, কৃতিবাসী ও বাবীকির সামান্যের মাঝে মাঝে ঘটনার পার্থক্য আছে ; কিন্তু হেমন্ত বিদ্যার মহাশয়ের যে মূল্যের বাবীকির মূল্যবোধ আছে তাহা আমাদের শিক্ষিতদের মধ্যে শতকরা ২০ জনই বোধ হয় কোন খোজ রাখেন না। মহাত্মার সঙ্কেও সেই কথা। ব্যঙ্গদেশের সংস্কৃত মহাত্মার দূরব কথা, কাশিদাসের সহিতও ইংরাজের পরিচয় খুব কম।

ইউরোপীয় দর্শন-শাস্ত্র সকেটস্, এরিস্টটল্ প্রভৃতি মনীষিগণের মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং প্রক্টোর কথোপকথন দর্শন-শাস্ত্রের একটি অসূর্ণ সম্পদ। কিন্তু আমি জানিতে চাই যে, কয়জন শিক্ষিত ইংরাজ গ্রীক

ডাটার পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া ইহাদের গ্রন্থ পাঠ করেন ? যদি প্রেটো পড়িতে হয়, তাহা হইলে Jowett-এর উৎকৃষ্ট ইংরাজী অনূবাদই লোকে পড়িয়া থাকে। কিন্তু এই সমস্ত ইংরাজী অনূবাদেই বা কয়জন ধর রাখেন ? সুতরাং ইংরাজী ভাষা বাহন করিয়া শিক্ষা লাভ করিতে হইবে, ইহা নেকামি ও পাশপাশি।

আমি যদি আমাদের মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন স্বরূপ ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলে এই এক শতাব্দীর মধ্যে কত পঠ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বঙ্গভাষায় রচিত হইত এবং বঙ্গভাষাও ক্রমান্বয়ে সসুজ্জিশাগিনী হইত।

আমি এ কথা বলিতেছি না যে, আমাদের কেহ ইংরাজী শিক্ষা করিবে না। বাহ্যিকের সাহিত্যে প্রকৃত অনুরাগ আছে, তাহাদিগকে বাধা দেওয়া উচিত নয় বরং উৎসাহিত করা দরকার, তাহারা আত্মীয় সাহিত্য-রসে চুবিয়া থাকুন এবং কেবল ইংরাজী কেন ফ্রেন্স, জার্মান প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষা অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান-নিপাস। নিরত করুন। অর্থাৎ বাহ্যিকের প্রকৃত প্রেরণা আছে তাহারাই সাহিত্য অথবা বিজ্ঞানের চর্চা করিবেন। আমার আশ-চরিতে বলিয়াছি যে, এখন আমি সাবেক কালের তৃতীয় শ্রেণিতে পড়িতাম, তখন আশ্চর্য্যের অর্থাৎ কাহারও সহায়তা গ্রহণ না করিয়া 'ল্যাটিন' ও 'ফ্রেন্স' ভাষা শিক্ষা করি। কেননা প্রেরণা ছিল।

আমাদের বালকগণকে ৫ বৎসর বয়স হইতে ইংরাজী শিক্ষার ক্ষর যে কিঞ্চদ ধর্মান্বিত করা হয়, তাহার ইহুতা নাই। ইহাতে বুঝা নক্তি ও সামর্থ্যের অপচয় হয়, এক প্রকৃত জ্ঞানলাভ পূর্ব কর্মই হইয়া থাকে। আমি সর্বত্রই বক্তৃতা প্রদেয়ে বলিয়া থাকি যে, "A degree is a cloak to hide the degree-holder's ignorance"। ছুই একটা ঘটনা হইতে আমি ইহার প্রমাণ দিতেছি।

সম্রাট প্রিন্সাবকাশে আমি একটা কলেজে কয়েকদিন অবস্থিত করি। একদিন মধ্যাহ্নে একটা আই-এ ক্লাসের ছাত্র আমার নিকট আসিয়া বলে, "ব্রহ্মণ্য, আমি বঙ্ক দর্যীব, বাহাতে কলেজে জি হইতে পারি জ্ঞান্যর ব্যবস্থা আপনায় করিয়া দিতে হইবে।" আমি

বলিলাম "হাকার হাকার প্রায়েট দুক বেকার অবস্থায় 'হা অর, হা অর' করিয়া বেড়াইতেছে, তুমি আবার তাহারের লম্বা বুদ্ধি করিয়া কি করিবে?" সে বলিল, "তাই বলিয়া কি জ্ঞানার্জন করিব না?" আমি মনে মনে বলিলাম, তবে ত' বাহু কীসে পা দিয়াহ। "আজ্ঞা বনত হায়রাবাদ কোথায়?" সে অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "মধ্যপ্রদেশে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "সেখানকার শাসনকর্তাকে কি বলে?" সে বলিল, "হায়রাবাদ একটা গণতন্ত্র (republic) দেশ।" তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, "আজ্ঞা বনত, 'গাঁথিব নৃত্য হালা রচিত মধুচক্র' কার লেখা এবং তারপরে কি?" প্রশ্নান্তরে সে বলিল, "ব্রহ্মণ্য, আমরা পাড়ারার মূল থেকে এসেছি, ওলব জানি না।"

আমার মেনের মূলেও ঠিক ঐ এর করটা জিজ্ঞাসা করিলাম। ছুই একটা ছেলে বাতীত আর সবাই হা করিয়া বলিল। এখন এই হইতে বোঝা বাইতেছে যে, ছাত্রেরা মূল-কলেজে কিঞ্চদ বিভা আহরণ করিতেছে। এবং ইহাদের ভবিষ্যৎ যে কিঞ্চদ উজ্জল হইবে, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

আমার এই বিজ্ঞান-মন্দিরে যে সমস্ত ছাত্র B. Sc. Honours লইয়া প্রবেশ করে, তাহাদের সামান্য সামান্য বিখ্যের অভ্যস্ত দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া পাই। বিখ্যবিদ্যালয়ের তথাকথিত শিক্ষা যে কি রকম সেকী ও জুটা, তাহা উপরিউল্লিখিত ঘটাত দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ প্রতি দশমনের তিতর নরজন হায়রাবাদ কোথায় বলিতে অক্ষম, এবং 'গাঁথিব নৃত্য হালা রচিত মধুচক্র' কল্যাণিত তাহাদের কর্তৃত্বেরে প্রবেশ করিয়াছে। পাঠ্যপুস্তক-তালিকাভুক্ত কোন বিখ্যের বাহিরে যে কিছু লিখিতে হয়, ইহা বিখ্যবিদ্যালয়ের উপাধি-প্রাধিগণ একপ্রকার বুলিয়া দিয়াছে, কোন রকমে নোট কর্তব্য করিয়া 'তন্ম্য' পাইলোই হইল। বিদ্যাশিক্ষা আবার কি? আগামী বায়ে এই বিখ্যর সবিত্তার আলোচনা করিবার বাসনা রছিল।

নতুনে পুরাতনে

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাল সারারাত চোখের জল পড়ছে। আটের
কি হ'ল, এ-ভাবনার নয়—একটা কুটো পড়েছিল,
তাই সারারাত নিদ্রা ছিল না। ঘুম পালালো যখন,
জাবনা এসো তখন আটের—পুরোনো আর নতুন
সমতা! পুরোনো চোখ, নবাত্তরীরে কণামতো
একে কি ছাড়া যেতে পারে? কিছুতেই নয়, পুরোনো
হ'লেও চোখ অমূল্য মিনিস। পুরোনো চোখের বললে
অপখোলমিষ্টের দোস্তান থেকে কাঁচে গড়া দিব্যচক্ষু
বসাতে চায় পুরোনো চোখের পুরোনো কোটরে?
কাষেই পুরোনো চোখকেই শালি বন্ধ ক'রে ধ'রে
রাখতে হয় চন্দ্রমার কাঁচের আড়াল দিয়ে। এই
হয় ধ'রে পুরোনো আটের কথা মনে আসে।
পুরোনো আছে ছ'রকমের। এক রকম পুরোনো,
ইংরিসিতে বাকে বলে rotten—পটা পনির, ফসল
দেয়াল, দুধ-খরা কাঠ, তারই মত আবাবহার্য
পুরোনো। সব দেখেই, সব আট্টেই, সব কাষে,
সব সাহিত্যে এই rotten পুরোনো আছে। দ্বিতীয়
রকম পুরোনো বেটা, সেটা আবহমান কালের
পুরোনো। যেমন পুরোনো চন্দ্র-খরা, যেমন পুরোনো
নবাবী আমলের দিরাঙ্গী মদ, যেমন পুরোনো পুরাতন
ফুসের শিল্প-সম্ভার, পুরান-ইতিহাস ও tradition।
Rotten পুরোনো সে আপনি মরছে, তার উপরে
ঝাড়ার বা দিয়ে কোন বাহাদুরী বেই। এই যে
পুরোনো টান — বাহাদুরী ক'রে এটাকে ঠেলে কেলে
দিয়ে ভালপাড়ার দেশাইএর হাতের ঢালধানার মতো
একটা কালো টান কিংবা খুঁচা বসানোতে ঐ
ভালপাড়ার দেশাইয়ের পল্লীর মকলই দেখানো হয়,
তা' ছাড়া আর ডো কিছুই লাভ হয় না।

পুরোনো চাঁল ভাঙে বাড়ে, একথা সকলেই
মানে। মল বতই পুরোনো হয়, ততই মনুষ্যতা

উৎকৃষ্টতা গুণকে পায়, বেশা দেখার নক্ষি পূব না
থাকলেও। পুরোনো ধী — গুচি ভাষা চলে না তাতে,
কিন্তু এটা দেখা যায়, পুরোনো ধী মালিন করাতে
পরম গুচি খাবার অবস্থার ঠিকিয়ে রাখে মাহুকে
অনেক দিন। তারতবর্ষ কোন্ কালের সেই ভরত
রাজার আমলের পুরোনো দেশ; এটাকে কেলে নতুন
একটা প্রবাল বীপের নরীচিকার মাঝে উপনিবেশ
স্থাপনের কর্তব্য নতুনমুখ থাকতে পারে কিন্তু—যাক!

এই ভাবনার রাত কাটলো। উদয়-কালে ঘর থেকে
বার হলেন। প্রবীণ ৩কবির কথা বলি, তখন —

“নিশি অবসান প্রায়,
সুখে সবে নিদ্রা যায়,
শয্যা কেহ ছাড়িত না ঢাকে।
বা দিগ্বা জনর মাঝে
মঙ্গল আরতি বাজে,
বেশুধনি কি মধুর তাহে।”

এই সময় কোন কাজ থাকে না, নির্মম্বে বিশ্বকর্মার
সঙ্গে দেখা হয় আমার। কথাবার্তাও চলে নিরিবিলি;
কেমন সময়টিতে দেখা হয় হৃদয়ে, তাও হৃদয়ীণ
৩কবির কথা বলি —

“বিহ্বল অতি এই কাল,
নাহি কোন দোলমাল,
নিরুদ্ধ ব্রহ্মাণ্ড সমুদ্র।
ভোপে কাড়ে অন্ধকার,
নভস্তল পরিহার,
লতাগাতা হিমবিশ্ময়।”

“তোমরা বিখাল করবে কিমা জানি না, এই
সময়টিতে সত্যই বিশ্বকর্মাণকে লসী ভাবে পান লক্ষ্য।

এর ছ'দিন আগে মত একটা ঝড় হয়ে গেছে আমার
বাড়ির দক্ষিণের কুণ্ডবনের উপর দিয়ে। বাগানের

একটি কোণে ছিল বটকালের এক মহাকাব্য মহানিম। তিতরটা তার ঘুণ খঁরে কোঁপরা হ'রে গেছে—বাইরে থেকে সেটা লক্ষ্য হয় না। সমুদ্র পাতার আড়ালে অনেকখানি বিস্তার ক'রে সে গাড়িরে ছিল সেদিনও। তারি উল্ল্য নবীন একটি রম্যল কুক নতুন মজরী ধরিয়েছিল। কড়ে ভেঙ্গে পড়লো মহানিম একাও বয়লার্কনের একটার মত মড় মড় শব্দে। যে আম-মাছ তার ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল, তাকেই পড়লো চেপে সে! Rotten পুরোনোর চাপে কি ভাবে মারা যায় শব্দ নতুন, তার প্রমাণ এই। লোকে উই-এ কোঁপরা করা মুটে। নোকোর চেপে যখন হাংরু খেয়ে উঠে আসে, তখন তোষ দেয় নোকোটার; কিন্তু নিঃশব্দ যে বুদ্ধির দোষ আছে, একথা অসাবধানি মানুষ অনেক সময় স্বীকার করছে ভুলে যায়; এবং বলে, যা' কিছু পুরোনো তাই দাও বিসর্জন। চিরন্তন পুরোনোর কথা তখন আর মনে থাকে না। বর-পোড়া গরুর মতো সে সিঁচরে বেশ দেখেও খাঁকে ওঠে। এই ভাবে সকল আটের মধ্যে সে একটা পুরোনো tradition, বোটা অববহান কালের, তারও উপর খান্না হয়ে যায়—দিতে চায় দৌড় যে দিকে যায় হুঁচোখ।

এই যে মহানিম সে যখন পড়লো, মানুষ তাকে আগানি কাঠ ক'রে ছেড়ে দিলে, তার বেশি মর্যাদা সে একটুও পেলে না। কিন্তু আমার মনে কেন বেদনা বাজছে এখনও সেই আমার মায়ের হাতে পোতা আধা-rotten মহানিম গাছের ভয়ে?

—সমুদ্র পাতার মনোহর ক'রে গেলছিল সে বটটা পারে বাগানের ঐ কোণটি। তার সেই কোঁপরা কুকর পাখরার বেয়েছিল বাসা সমুদ্রে একটি কাঠ-চোকা।

কড় কেটে গেছে। আদ্য সকালে বসন্তের বাতাস যখন বাজছে, পাশে এসে বসেছেন বন্ধু বিশ্বকর্মা। রোমে নতুন দিনে হুটিকেছে কুল বাগানের আর সকল গাছই। সেই সমর গুন্ডি কাঠ-চোকা কলম হুর—বাসা কোথায়—বাসা কোথায়—সেই গুন্ডেরা

মহানিমের গল্প তার বেদনা। সে যেন আমারও পোশন করার প্রকৃষ্ণিনি দিয়ে ঐ মহানিম গাছের কণ্ডে।

সেই সমর গুনি খাচার ঘর। পোশা ময়নাটাও ডাকছে—সরো—সরো—যেন সে বগছে নতুন খাচার কাঠগুলোকে সরে বেতে, হুষ্টি দিতে তাকে ঐ বাসা-খোঁজ। কাঠ-চোকা সসে এক বাগানে। নতুন খাচা আর পুরোনো খোঁজ বাসা, এরি রহস্য দেখছি আর ভাবছি, মনের ঠান্ডিতে বাজছে গলিত হুর সেই সমর।

বিশ্বকর্মা সসে আগাণ হুর করলেম—“শিরের আনন্দতরী সোনার চাপার তার নিয়ে কোণার চলেছে নতুন মাঝিরের হাতে?”

বিশ্বকর্মা বলেন—“সে ভাবনা তোমার কেন? তুমিও এখন সে-তরীতে বসে, আমিও নেই। আমরা তো হুঁচোতে ডাঙার প'ড়ে খাবি খাচ্ছি।”

—ওতে যে সোনার চাপা রয়েছে সোনার প্রাচীর-হুষ্টির মতো।”

বিশ্বকর্মা হাসেন, বলেন—“তাই ভাবছ? সে অনেক কাল বিসর্জন হ'রে গেছে, প'ড়ে আছে এর-ওর-তোমার পুরো-থেকেই বেগা হুঁচোতে চাপাখুলের পাপড়ি, একরাস সিঁটকাড চাপা।”

যন মানে না — “পুরোনোর উপর কি কারো বয়-মায়। হ'ল না?”

বিশ্বকর্মা বললেন — “তাই তো দেখছি, নোকো কেবলই আমদানী ও রপ্তানি করছে সিঁটকাড। চলে একবার দেখা থাকে সে নবীতীরে দিয়ে ব্যাপারখান।”

একাও নবী, এননী সে-নবী একখানে ঘূষ; ধীর-নবীর মতো অদূরত তার প্রোত। সেখানে ধাঁধা সেই অনাদি কালের মেলে-ভিতি; বিস্ময়াকা ইন্দ্রনাল বুদ্ধের তার মধ্যে ব'লে এক হুঁকা মেলে। হুঁজন বাজীর বেশি তাতে আর খরে না; ছই বহুকে নিয়ে ভিতি পৌছিল মাঝ-গরিমায় — যেন ছোট্ট একটি কলের গাথী অবলীলাত দাঁতুরে চলে দেশ ভেটে কাটরে।

একবারে দেখা যায় নবীর একমুখে বনর, আর

একস্থে ঘন কুহাসার কালো পর্দা জল পর্দার কালো ক'রে নেমেছে। বন্ধরের দিকে চেয়ে আছি, ছুটে বেরল একখানা নতুন রং-জন্মে বাচ খেলার শাক্‌লী, বাগ-ছেঁড়া কেপা খোড়ার মত, ভেজে বার হ'ল সে।

আমি বল্লেম—“গেল বৃষ্টি তলিয়ে—বেধ দেখ—”

বিষকর্ষা সাবেক কালের ছেঁড়া পোটিগা থেকে একটপ ধাতের বালী নদীর উপর ফেলে দিলেন—এপার-ওপার একটা মত্ত বালুচর স্থষ্টি করলেন ঠিক জলের ভলাস। বাধন-ছেঁড়া নৌকে পড়লো গিরে সুন্দর ক'রে চড়ার উপর কাং হ'রে। দুখটা রইল জলেতে বাগিতে জোবা, বাকিটা রইল শুককের লাগের মতো জলের উপরে ফেলতে-ফেলতে!

আমি বল্লেম বিষকর্ষাকে—“বাধা দিলে কেন ভেসে বাবার পথে, বেশ তো চলেছিল উধাও।”

বিষকর্ষা বল্লেম—“বাধা দিই নি, বাঁচালুম।” চড়ার-টেকা নৌকের গাড়খানা এলো ভেসে আমাঘের দিকে। নাবিক কুলের দিকে হাবুডুপু খেয়ে উঠলো।

ভারপর এলো স্তিমার—ভরজর রকম আধুনিক শক্তি নিয়ে। সে না মানে উজান, না মানে ভাঁটা, না মানে চড়া, না মানে কিছু। চললো নিষের জেমে বুক দু'গিরে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় দিক্ অন্ধকার ক'রে। তার ডেউ-এ আদরাও টলোমলো। পেরিয়ে গেল বাগির বাঁধ কেটে অনেক দূরে বেখানে কঠিন অন্ধকার মলকে কালো ক'রে গাড়িয়ে আছে, সেই পর্দা! তারপর আর বেধা গেল না! শুধু বাপীধ তরীর তড়কা বাঁধির জরাস-আগনো চাঁৎকার বাজাসকে ছির-ভির ক'রে পৌছল আমাদের কাছে একটা বার—

আমি বল্লেম—“কি হ'ল?”

বিষকর্ষা বল্লেম—“তলিয়ে গেল ভোগবতীতে বাচ খেলাতে।”

বানিক শুদ্ধ হ'রে থেকে বল্লেম—“বুকেছি। জাঙা চলো, আর কাষ নেই।”

অন্ধকার ভাঙার খায়ে খাট, সেখানে মনে পড়লো

গান—অনেক কালের পুরোনো, মনে নেই কোন কবিরের সেবা, —

“চিত্র সিখিলাম নরন কজলে

মেই নাই চরণ চলিবে ব'লে।”

বিষকর্ষা হেসে বল্লেম—“হাও নাই, ভালই করেছ। তা' হ'লে বাজারে চলতি চিত্রই এঁকে মন্তে!”

আমি বল্লেম—“বুখ্লেম বেন চিত্র সে চিত্রপুস্ত-লিকার মতো চিত্রপায়ের উপরে স্থির হ'রে থাকবে, হাটে-বাটে চ'লে বেড়াবে না, কিন্তু অচল চিত্র ব'লে রে লোকে বদনাম করে, তার কি?”

বিষকর্ষা বল্লেম—

“গদি কেও বলে, এ চিত্র কি চলে?”

দিও ব'লে—সময়ে চলে;

অচলাও চলে।”

আমি বলি—“তোমার চিত্র সে তো চলে হাটেও চলে, বাটেও চলে। সে কি উপায়ে, কেনই ব'লে?”

বিষকর্ষা বল্লেম—

“সময়ে চলে, অসময়ে চলে,

বেমন নলের দৃঢ় মীন সেও চলে

বেমন মুক্তিকার মদুর সেও পাখনা বে'লে চলে
কলে কৌশলে।”

এই দেশের কবির-কাদাল কতকালের মাহুল ভাসা কে জানে, তাদেরই সুখের এই সব কথা। বার। চিত্রস্তনের সেবা সেখে গেছে। মনের কিংবা কথা বহি চলাচলি করতে পারে, হুই চলাচলি করতে পারে, তেমনি চিত্রেরও চলাচল মন থেকে মনে, এ তো সহজ কথা। শিরীর কৌশল আর কিছুই নয়—স্থির যে চিত্র, চল-না যে চিত্র, তাকে মন থেকে মনে চলাচল করাবার কৌশল আবিষ্কার করায়। সবাই জানো শিরের একটি অর্থ নিয়েছেন আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরা—কৌশল।

নিশ্চয়ই একদিন আমাদের সঙ্গে পুরাতন সেই বিষকর্ষার সেবা হবে, যেমন আমাঘরও হয় মাঝে মাঝে। সেইদিন বুধবে, স্বীয় খাওয়া হ'রে সেলে

পৃথী কোন কাজে আসে না। শিল্পী হ'লে সেলে তখন আর কাগজের সার্টিফিকেট যেহেতুগেও প্রয়োজন থাকে না; ওর মর্যাদা ততক্ষণ বহুতর অমৃততাপান তাগো ঘটে নি।

শিল্প-সাধনার প্রথম সোপান হচ্ছে—অহংকার পরিত্যাগ। এইটুকু মনে রাখা এক বড়ত পাশ। আমাদের বেশেরই চকিরের মতো।—

“যার কুণ নকল ক'রে গরনা প'ড়ে

দিক্কে বে মন কতই বাহার।

তিনি যে লপৎগুরু কল্পতরু

তারে ভোগ, এতি ব্যাণার।

ও যার আকাশের রূপ দেখে

ও কবুতে শেখে লপৎ লসার

মিই তার পদে প্রণাম পদে প্রণাম

তার মতো কে আছে আর।”

এই অ:কাশ, বাতাস, পানীর গান, সবালের আলো, রাতের অন্ধকার—এসের দিকে মন চমুক্ তোমাদের; শিল্প-সাধনার অস্ত্র প্রস্তুত হবার অবসর পাও; শিল্প-রসের পেয়াদা তোমাদের হাতে আদর্শেই স্বপ্নের মূলমন্ত্রের মূহুরাসে। সেদিন খেয়ে নিও মনুত, ফেলে দিও পেয়াদা—মিথ্যা বাস্য কাটিয়ে।

শিল্পীর জীবন চাতক পানীর জীবন, সে চাহ মনুত-বিশ্ব। শিল্প হ'ল সাধনার বস্তু। কুটবলের মতো নিজের পিছের সঙ্গে নিজেকেও হাওয়ার কাঁপিয়ে নন্দন-বিলম্ব ব্যক্তার মতো বার্ষ চৌর আর কি হ'তে পারে?

শিল্পীর পুরস্কার এইটুকু—একটি কি দুটি মন্থা পানী জীর্ণ কোটরে বাসা বাসে। শিল্পী থাকে না যখন, দ্বারা জীর্ণ মহানিমের মতোই কড়ে ভেঙ্গে পড়ে যখন, তখন তারাই খোঁজে শিল্পীর কৃকর পাল্লের মন্থো তাদের হারানো বাসা, তারাই পাঠার কারা থেকে থেকে নতুন হুগের আনন্দ-কোলাহলের মন্থো। কোথায় বাসা? হায় কোথায় সে পুরানো দিনের নিবিড় ধোণ—বুড়ো-পাহের লব্ধ পাতার দ্বারা-আলোর লুকোচুরি!

মাল্লব মাত্রে পুরানো। কার্টের অধি-সংকারের আরোহনে যখন—কার্ট-ট্র্যাকরা পানী কাদে তখন লকান্দে-বৈকালে থেকে থেকে রাতের অগ্নেও গাড়া পৌছয় তার! •

• “বসন্ত চার্ট” ফলেজের শিল্প-অনুষ্ঠান পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা। বিদ্বতি চৌধুরী, ললোবটখান ও লিমনো-লাল পঙ্গোপাখ্যায় কর্তৃক গৃহীত।

“আমার বিবেচনায় ভালবাসা জিনিষটী নরনারীর শিরোভূষণ মুকুট-রূপ। উহা পথে ঘাটে বেখানে সেখানে কুড়াইয়া পাওয়া যায় না। উহাকে বহু ফল গড়াইয়া পরিত্ত হয়। ভালবাসাটী প্রস্তুতিত জ্বয়পত্র। ভালবাসা পদার্থটী অতীষ্ট দেবতা। গুরু মন্ত্র দিলেই অমনি সিদ্ধিলাভ হয় না। জপ, তপ, ধ্যান দ্বারগাদি করিতে করিতে ক্রমে মন্ত্র চেতন এক উপলব্ধি হয়।”

—ভুবেব মূখোপাখ্যায়

প্রকৃতি

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

১

তাই বলেন কথা হইতেছিল।

তাই—মোহনবাগানের গোপালকে তোর কেমন লাগে?

বোন—ওহ, আই লাভ হিম্!

তাই—সত্যি?

বোন—সত্যি নয় ত কি মিথো? বাঙ্গালীর মধ্যে এমন 'সিওর স্টু' কেউ আছে?

তাই—গোন্ পলি, দক্ষিণাঙ্কার কাকা তোর সঙ্গে গোপালের সন্ধ ঘেনছেন।

পলির পাঠশালা রাঙা চৌঁট হুঁশানিতে বেন বিক্রী খেলা করিয়া গেল, মুখখানিও রাঙা হইয়া উঠিল। সে হঠাৎ কিছু বলিতে পারিল না।

তাই পঞ্চম বলিল—আমাদের 'বারে'র একটি ছোকরাকে দিয়ে কাকা এই কথা আমায় জানিয়ে পাঠিয়েছেন। কি বলি বল ত?

—তোমরা কি বল?

পঞ্চম হাসিয়া বলিল—আমি ত' বিয়ে করব না যে আমার মত কাছে লাগবে? শোন, কথাটা তোকে আরো খুলে বলি। গোপাল তোকে দেখেছে, তার ভারি পছন্দও হয়েছে, গত পনিবারে মোহনবাগান-সীমানায় কাকাও আমাদের সঙ্গে বসেছিলেন-না, সেই সময়ই সে তোকে দেখেছে—

পলি রগ করিয়া বলিল—কি ক'রে তিনি আমায় দেখলেন?

—যেমন ক'রে লবাই বেখে, চক্ষু দিয়ে। কাকা আমাদের সঙ্গে কথা-টখা কইছেন সেখে, গোপাল সেইদিনই রাতে কাকার কাছে তোর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। পটাপটাই বসে, বিয়ে করতে চায়।

পলি এইবার ছত্র গাভীরোর-সহিত বলিল—তার পর?

পঞ্চম বলিল—তারপর আবার কি! আমার সেই উকীল বড়ুট বা' বললেন, তার মতাব্ব হচ্ছে যে, গোপালের আর্থিক অবস্থা ভাল, দুর্ভিক্ষাতায় একখানা, খিয়েটার রোডে একখানা বাড়ী আছে।

বাধা দিয়া পলি গভীররূপে বলিল—দক্ষিণা খানা ভাড়া দিয়ে খিয়েটার রোডে থাকি যাবে বল, বড়দা'?

পঞ্চম হাসিয়া বলিল—আচ্ছা আচ্ছা, তাই চাকরী-বাকরী কিছু করে না, অবিশিষ্ট জানে, জাহ্নুয়েট ত' বটেই, বছর ধানেক পড়েছিল। ইচ্ছে করলে চাকরী যে এড়াবে না পারে, তা' নয়—

—ও ইচ্ছেটা না করলেই ভাল, বড়দা'!

—তা' সত্যি। চাকরী এক বিষম বকরারী! তা' হ'লে খবর পাঠাই, তোর মত আছে, কেমন?

—ওমা! এত শ্রীশ্রী! তুমি বেন তাই 'কী'! হুঁশিন ধাঁড়াও, একটু ভাবি, একটু বিবেচনা করি।

পঞ্চম হাসিয়া বলিল—হা হা, আর বিবেচনা করতে হবে না। শোবার ঘরে মাথায় টাকিয়ে রেখেছে গোপালের ছবি, এইমাত্র।

I love him—আবার ভাবি! বিবেচনা ক'

পলি আরো হাসিয়া উঠিল, বলিল—না দাদা! তুমি একেবারে hopeless! ছবি ত' বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র নাথ, গান্ধী, সুভাষ, বিধান—মস্কোরই টালিয়েছি তাই ব'লে ওদের লবাইকেই বিয়ে করতে চাই?

পঞ্চম বলিল—ওরা ত' মার দেউ বিয়ে candidate নহ।

পলি মুখখানি করণ করিয়া বলিল—ও!

I plead guilty!

পঞ্চম বলিল—তা' হ'লে কলং তাই ব'

দশনা', ন' দাশা, ছোট দাশাকে
হ বলে?

লি নি, খেতে ব'লে রাতে বলব।

রা জুড়ে বসিল—তাই বোলো।

দশনা, তাই হবে।

১-বিয়ের হ'লেও কিন্তু তার বি-এটা
ফুটে পাবি নে।

কি বল তার ঠিক নেই, ডবল

চ'তে পড়বে যে! — বলিয়া বল

গেইয়া দিয়া পলি পলাইয়া গেল।

২

একটি মাত্র বোন। তারেদের

শরের অর্থ ছিল না, তারেদের

দুঃস্থ। পদ্ম, পরিমল, প্রহন,

এই সব শেবে এই বোনটি—পল্লব।

লিই মা মাতা বান, আর তাহার

শেবে 'বাবা'-ডাক ওনিতে ওনিতেই

বসিয়া বসে। আগার সিঁড়ি সার্ব্বভের

তরুণী পালারি (wet nurse)

তারেই বোনটিকে মাল্য করে।

এত, পরশা-কড়ি রাখিয়াও দিয়াছেন,

এত, বোন একসঙ্গে বাইত, একসঙ্গে

বড়াইতে বাহির হইত। ছোটবড়,

মাইয়া দিবার দত্ত বাহিরের কোন

ছিল না বলিয়া, ইহাদের সম্পর্কটা

শর মত! বোনটিকে ঘেয়ে-ইস'লে

পাচ তাই এক মুসে পড়িতে বাইত,

কিছু লইয়া পাচ জনে বাড়ী ফিরিত।

ইহাদের কেহ যে কোনদিন কোথায়

গিয়া যরণ করিতেই পারে না।

এ ন' পান করিয়া উকীল হইয়াছে;

এন-বির দত্ত এতট হইছে;

বখাকনে সিক্কে ও দিপ্ধ

ইয়ারে, প্রথম কোথ, পল্লব খাতি ইয়ারে
পড়িছে।

বাকালীর সমাধে পাচ-পাচটা ভগবান ও ভগবান

অনু 'পাত্র' ও একটা পূর্ণ-বোব। 'পাত্রী' থাকে

সবেও যে বঙ্গ-সমাধ চকল হইয়া উঠে নাই, তাহার

একমাত্র কারণ, চাকলা আগাইবার নিত্যতাই

লোকাভাব। দূর সম্পর্কের এক পুড়া দক্ষিণাভয়ে

হুইট পক্ষ এবং হুইট পক্ষের গুটি কড়ি শাবক লইয়া

এতই ব্যস্ত থাকিতেন যে কালে-ভয়েও ইহাদের 'পোষ-

বব' লইতে অস্বস্ত ছিলেন।

এই সেল পুড়া মহাশয়ের কথা। আর চাকলা

মানয়ন করিতে পারিত পক্ষদ্বারি সহপাঠিগণ।

কিন্তু এই পাচটি ভাই নিজেহাও যেমন কাহারও

বাড়ী বাইত না, বাড়ীতেও কাহাকে আনিত না।

কাছেই বহু মন্থাসে বহু কোকিলের কণ্ঠ-কিরিয়া

দিয়াছে, কত কাণ্ডন কত বনে কত লজ্জাকণ্ড

করিয়া দিয়াছে, গৃহমন্ডল পুষ্পোদ্ভানটিকে মন্থস্ত লক্ষ

মধুপ লক্ষ রমাই করিয়া দিয়াছে, কিন্তু রাজা চন্দ্রের

আগমনের পূর্ববর্তী কালে, কবের আশ্রমের মত এই

ঘরখানির অধিকারী ও অধিকারিণীদের নিশ্চিত-

থালে কোনরূপ বির ঘটে নাই।

খাওয়ার সুবিধা হয় বলিয়া ইহারা টেবিলে বসিত,

—বাইত পেশীর অর-বাজনাধি। রাতে 'ডিনার-

টেবিলে' পক্ষ কণাটা পাকিল—পাচ ছোড়া অর্থাৎ

দশটা চকু তীক্ষ্ণ ও তীর দৃষ্টি লইয়া কাঁপাইয়া পড়িল

পল্লবের মুখের উপর। সে মিটিমিটি হাসিতেছিল।

যেহ দাশা পরিমল, সে বলিল,—বেশ ও!

প্রহন সেহ দাশা, ইংরাজিতে বলিল—আমি ত'

বাকালীর ব'লেই মনে করি।

প্রবোধ, সেখানার কথাতেই সায় দিল।

প্রথম এতকণ হাত গুটাইয়া চূপ করিয়া

বসিয়াছিল, এক্ষণে কহিল—পলির বিয়ে হবে I. C. S.

না-হর কোন ব্যারিষ্টারের সঙ্গে! তা' নয়—

পলি হাসিয়া বলিল—কিছু জেবো না দাশা

প্রণবকুমার, তোমার মতে আমার I. C. S.-এর মতে
পুঁজু বই পুঁজু ব।

এই কথাই প্রণব ছাড়া সকলেই হাসিয়া উঠিল।
প্রণব বলিল—লোকের জিজ্ঞেস করবে, তদ্বিনীপতিটি কি
করেন? আমার বলতে হবে, ফুটবল খেলেন! আহা কি
পরিচয়!

পলি কি একটা বসিতে বাইতেছিল, পরিমল
তাহাকে খামাইয়া দিয়া, বলিল—তোমার মতে চাকরীটাই
বড় পরিচয়, না রে প্রণব?

প্রণব কহিল—তুমি আমার মতে নয়, সেন গুড
লোকের মতেও তাই মেধা!

পরিমল বলিল—এইত পড়কে পড়কে I. C. S.
এই বাংলা দেশেই আছে, ক'নের নাম লোকে
জানে? তুই বা ক'নের নাম জানিস্ বলত? আর
মোহন-নগনের জি, দানের নাম পোনে নি, এমন
লোক ভারতবর্ষেই ক'মন আছে?

পলি বাম হাত নিয়া, পাশ্বেপকিষ্ট প্রণবের পলাটি
জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার মুখখানা কাঁধের কাছে টানিয়া
আনিয়া বলিল—আহা, তোমরা আমার এই ছোট
দালাটির মতে I. C. S.-এর মতে নিত্যকাল নাই পাও
বদি, একটি আন্ত I. C. S.-ই না হয় দেখে দিও।

আবার তুমুল হাসা উখিত হইল।

একটু পরে প্রমোদ মিজাসিল—গোপালের আর
কে আছে-তাঁহে, কিছু শুনে?

পঙ্কজ বলিল—নেই কেউই! একটা বোন,
তদ্বিনীপতি ডেপুটি না সাব-ডেপুটি কি ছিল! এখনও
আছে কি নাই, এ'ও খবর জানে না, তাহাও খবর
রাখে না।

পরিমল বলিল—আস্বীত-চুটু বত কম থাকে ততই
ভাল, চাকের বাহির মত!

পলি বলিল—জ্ঞাতির চেয়ে মিত্র নেই যদি না
থাকে বেঁচে!

আবার সকলে হাসিয়া উঠিল।

পঙ্কজ বলিল—তা' হ'লে খবর দিই!

প্রণব ও পলব ছাড়া সকলেই মত মিল।

পলব বলিল—বড়না, এতই মধ্যে দুশে গেলে?

—ওহ, সেই কথা! তা' বিবেচনা করতে ক'দিন

লাগবে তোমার মতি?

—রবিবারে বলব।

প্রমোদ কহিল—You rat! আমি ধরিছি। নুতলে
না লাগা, মনিবারে Local vs. Visitor ম্যাচ আছে
না, পলি একবার ভাল ক'রে গোপালকে দেখে নিয়ে
জবে মত দেবে!

পঙ্কজ হাসিয়া বলিল—I See!

পলি বলিল—But why 'Gopal'? Why not

প্রহর বলিল—কেন, গোপাল নামটা কি খারাপ?
খিড়ার ভাগেই ত' রয়েছে, গোপাল বড় সুবোধ বালক,
সে বাহা পাঠ, তাহাই খায়—

পলি বলিল—সেই জন্তেই নামটা বদলান দরকার।
With due respect to Vidyasagar ম'শায়,
that goody goody "Gopal" won't do!

তাহার একটি বুড়ি কি ছিল, বাড়ীতেই থাকিত
পিত্রি-বারির মত। রাতে শুইতে দিয়া পলির কাছে
অনুরোধ করিয়া বলিল—হ্যাঁগা দিমিদি, একটা বসাতে
হোঁড়ার সঙ্গে নাকি দাশবাসুয়া তোমার বিয়ে নিচ্ছে?

—বসাতে কে বসে?

—ওমা, ফুটবল খেলে বেড়ার, তুমি বলছ বসাতে
নয়!

—তা' জোকেই বা সোব সোব কি বল! আমাদের
ছোড়ামার বিবাহও তোমার মত!

তাহার বিদ্যার সোব কোন্‌খানে, তাহা ত' সে
বুঝিলে না, উপরন্তু বুঝিল, না-বাবা নাই বলিয়া তাহেরা
ত্রিসূলে জনপুত্র, পিতৃমাতৃভাঙিত এক হতভাগার করে
দোনার বোমটিকে তুলিয়া দিতেই কৃতদয়। বুড়ির
কাটা পাইতেছিল। ঐ পঙ্কজ হইতে সব ক'টা
ছেলেমেয়ে ত' তাহারই হাতের উপর লক্ষগ্রহণ
করিয়াছে।

৩

যাক—বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পূর্বে একদিন আলাপ-পরিচয়ও হইয়াছিল। সে কৃতান্ত বোধ করি এক্ষণে নিস্ত্রোজন; তথাপি যদি কোন কৌতূহলী পাঠিকার সেই ঘটনাটা জানিতে বাসনা থাকে, তাহার কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য সম্পূর্ণ বিবরণ না দৌক, আংশিক বিবরণ দিতেছি। শনিবারে মাঠে খেলা ছিল, “সোহন-বাপান” বনাম “আর্চা”! বিজ্ঞান সমরে গোপাল তখন এককোষারের ফটক দিয়া বাহির হইয়া বাইতেছিল, পথের উকীল বহুট তাহাকে ডাকিয়া ইহাদের সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। উপস্থানের মত, নারক-নারিকার চারি চক্কর মিলন হইল। নারিকা প্রথমেই বলিল—আপনার আঙ্কুর খেলার আমরা কিং বড়ই ‘হতাশ’ হইছি।

নারক বলিল—মরাকে নাহতে কার ইচ্ছা হয় বলুন তা’?

নারিকা কহিল—কিন্তু লোকে তা’ বৃত্তে না; তার। বলবে, আপনাদের ‘চিন’ বসে দেখে।

নারক হাসিল, বলিল—ভাল, তা’ হ’লে গোটা কতক দিবে দেওয়া যাক।

কথা ঐটুকু ও ঐ পর্বত! কিন্তু যে কথা সেই কাক। শেষে “আর্চা” গণ দশটি গোণ ভঙ্গ করিয়া ফেলিল। পলির ভায়েয়া বলিল—তুইই ওদের মাছলি, পলি!

পলি সর্ব্বশেষে জানবে এই অপবাদ দিরোধার্থ করিয়া হাসিতে লাগিল।

বিবাহিত জীবনের সুখের দিনের একটি বৎসর কি আনন্দেই কাটি! অভিনন্দন কুড়াইয়া বেড়াইতে তাহাদের প্রাণ্ত আসিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু এতাব্যয়ন করাও চলে না। তোম বাইয়া বাইয়া পলির ভিক্ষণ দিয়া ধরিয়া গেল। গোপাল তখন পলিকে লইয়া বৈনিতাল পলায়ন করিল। সেখানেও অব্যাহতি নাট, হোকরায়া সভা করিল, তোমের ব্যবস্থা করিল, খেলার আয়োজন করিল, মিটার এক মিলে দাঁপের আগুনে শান্ত নীরব বৈনিতাল স্কেল হইয়া উঠিল।

বৈনিতাল হইতে দিল্লী, সেখানে হইতে নামিয়া আগ্রা, আগ্রা হইতে মুক্তারী, সর্ব্বশেষ শিমলা—থেকে পলায়ন—কিন্তু সর্ব্বত্রই সেই “ধর ধর” বব! এই অস্বস্তির ছিনিমিনির মূখে লোকে ছাড়িবে কেন? পলি, শেষে অনেক চিন্তার পর স্থির করিল, ছয় মাসের অন্তরালে আক্কেপোশন করিয়া যদি এই উপস্থানের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, তবে তাহারা তাহাও করিবে।

সে-বছর লণ্ডনের রেলের একদল নূবনবিধগী খেলোয়াড় ভারতবর্ষে ফুটবল খেলিতে আসিয়াছিল, ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে সমূহের মধ্যে খুব একটা মাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। সবক’টি নামমাঝা ও বড় রেলওয়ের কর্তারা বাছিয়া বাছিয়া খেলোয়াড় সংগ্রহ করিতেছিলেন। ই, আই, রেলের এক বড়লাহেব গোপালের বড় পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি গোপালকে শরণ করিলেন। গোপাল টেলিগ্রাম পাইয়া সতীক কলিকাতার চলিয়া আসিয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা করিল। সেই দিনই গোপালকে একটা চাকরী দিয়া, রেলের টিম-ভূত করিয়া লওয়া হইল। চাকরী লওয়ার পলির বিশেষ আগন্তি! গোপাল কুইল,—আমি যদি চাকরী না নিই, রেলের ডরকে খেলার অধিকারও আমার থাকে না। বিলাতের রেলওয়ের লোক বলবে, ভারতের রেল বাইরে থেকে লোক ডাড়া ক’রে নিয়ে খেলেছে, ভারতের রেলের পক্ষে সে বড় অপমান। আবার দেখ, বিলেতের রেলের কাছে ভারতের রেল যদি ছেরে যায়, ভারতের পক্ষে, ভারতবাসীর পক্ষে, আমাদের পক্ষে সেও বড় অপমানের কথা। না?

পলি আর তর্ক করিল না। যে স্বাধীন আবহাওয়ার মধ্যে জীবন সে বঞ্চিত, তাহাতে কুহুরীহিত সমর্থন না করিলেও, স্বাধীন প্রমত্ত ব্রজি অগ্রাহ করিতেও পারিল না।

বিলাতের খেলোয়াড়রা ভাবিয়াছিল, তাহারা ভারতকে ফু’রে উড়াইয়া দিবে—দিতও তাহাই, কিন্তু গোপাল তাহাদের আশা-ভরসা ছিন্ন করিয়া দিতে

দাশিল। এক গোপাল যেন শত গোপাল হইয়া মাঠের সর্বত্র বিচরণ করিতেছে। কোন এক বিবাহ সভায় এক বালিকাকে বিড়বিড় করিবার ক্ষমতা চারজন লোক তাহার কামা পতি সন্নিহিত বসিয়া গিয়াছিল, বালিকা পাচট ভাবী পত্রিক দেখিয়া বড়ই বিপদে পড়িয়া গেল, কাহাকে মাথা দান করে!

বিলাতের খেলোয়াড়রাও বেদিকে চাপ, গোপালকে দেখে। যে-তাহারা ভারতবর্ষকে ফুৎকারে উড়াইবে স্থির করিয়া অত্যন্ত অবজ্ঞাতরে মাঠে নামিয়াছিল, সেই-তাহারা চীৎকার করিয়া, বর্জন করিয়া, ধাক্কাধাক্কি করিয়াও কিছু করিতে না পারিয়া দুর্কিতে আরম্ভ করিল। ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, তাহারা শীতল বেশের লোক, যেখানে তাহাদের দ্রিষ্ট ও আন হইই বাহির হইয়া পড়িতেছিল। খেলা শেষ হয়-হয়, গোপাল হেড় করিল, বলটা সোজা গোলের ভিতর ঢুকিয়া নিশ্চল হইয়া গেল। মাঠের সে সমস্তকার লুপ্ত বর্ণনা করিতে আমি অক্ষম। আমার পাঠক-পাঠিকা মনস্তত্ত্বে তাহা পরিষ্কার দেখিয়া গাইতে পারিতেছেন, ইহাই আমার বিশ্বাস। হেডওয়ার্ড কোম্পানীর ভবনববাহু আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, মাঠ সাক করিবার কালে ধাক্কাধাক্কি তিন হাজার ছাতির ভয় বাট, প্রায় সাত হাজার ত্রাত্তল চট ও ষপ হাজার রুমাল ফুৎকাইয়া পাইয়াছিল। যেডিক্যাল কলেজ, শত্ৰুনাথ হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল প্রকৃতিতে খবর লইয়া জানা যায় যে, সেদিন নান্দশক্ষে নয় শত লোক ব্যাঙ-চ্যাণ্টা হইয়া চিকিৎসার্থ আসিয়াছিল, তন্মধ্যে সত্ত্বাহীনের সখ্যা তিন শত। বেচারী পলি, কর্মমর্দনের চাপে তাহার দক্ষিণ হস্তের কব্জিখানি প্রায় সপ্তাহ কাল অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছিল, 'গুলাড' লোশনের পটি বাঁধিয়া বাঁধিয়া হাতখানাই হাঝিয়া গিয়াছিল।

রেলের সেই বক্সাহেব বসিলেন—গোপাল, তুমি ভারতবর্ষের রেলমণ্ডলের মুখ রক্ষা করিয়াছ। কাল সন্ধ্যাকালে আমার সঙ্গে দেখা করিও, কথা আছে।

রেলের একেই গোপালকে সঙ্গে লইয়া লাটসাহেবের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন; লাটসাহেব ও লাট-পত্নী আসন ছাড়িয়া উঠিয়া গোপালের করপীড়ন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন; পলির ডাক পড়িল, লাট-পত্নী তাহার হাত ধরিয়া পার্শ্বে বসাইয়া, তাহার ক্ষমতা হইল ক্রীম করমোরগ করিয়া পাঠাইলেন। বিলাতের রেলের নেতা আসিয়া গোপাল ও মিসেস গোপালকে মালা-বিভূষিত করিল।

বাড়ীতে উঠিবার সময়, পলিকে একটু দূরে টানিয়া লইয়া দিয়া প্রণব বলিল—পলি আমাকে ক্ষমা করে। ভাই! ছাঃ I. C. S.! আজ গোপালের যে সম্মান বটকে দেখেছি তাহা তুলনায় I. C. S. কাই-সি-এস কিছুই নয়।

পরদিন রেলের সাহেব বলিগেন—গোপাল, তোমাকে আমরা এনিস্ট্যান্ট ট্রান্সিক ম্পারিক্টেণ্টে করছি। আশা করি অফিসের dignity (মর্যাদা) অক্ষুণ্ণ রেখে তুমি গোপালার সঙ্গে কাম করবে।

পলি যখন খবর শুনিল, প্রেসর অথবা অপ্রেসর হইল বলা গেল না, চুপ করিয়া রহিল।

৪

Dignity! এই ইংরাজী শব্দটা কি মত বিশেষ? যে খায়, খাতাল হইয়া সে আনন্দ উপভোগ করে; আর তাহার আত্মীয়-স্বজন মনে-প্রাণে অভিসম্পাত করে। Dignity রাখিতে রাখিতে গোপাল মস্ত মায়েব হইয়া উঠিয়াছে, অফিসে তাহার ভারী পায়। বাড়ীতেও কম কি! সকলে, রায়ে, বতরপ বাড়ীতে থাকে, ভিজিটর আর ভিজিটর! সকলেই প্রসাদ-ভিক্ষু। এই বহুজনবাহিত সম্মান-সুখা আকর্ষণ পান করিয়া গোপাল যখন অস্ত্র-পুরে আসিত, তখন তাহার সেহ-মন যেন বাতাসে উড়িত; নারী হাসিমুখে তাহাকে প্রতুলগমন করিয়া গাইত বটে কিন্তু কোন্‌খানটার যে একটা কাটা খচ্ খচ্ করিত, তাহা অস্ত্রে তো নহই, সে-ও বুঝিত না। অগ্রবোধ করিবারও কিছু নাই, তবু যেন কিসের একটা অভাব, কি একটা অপূর্ণতা

বহিরা বাহ, তাহার বাহা বটে মনের মত বন্ধ,
কিছু বাহ না, কিছুতেই বাহ না।

পলির তাহেরা যখন-তখন আসে, বসে, পড় করে,
খাও-মাও, দুঃখ করিবারও কিছু নাই, কখন-কখন
খাওয়াও হয়—জাহারাও বসিতে আরম্ভ করিয়াছে,
গোপালের সঙ্গে বসে ছুঁতে। কথা কইবারও ক্ষুদ্র
যেনে না যে রে! কেবল লোক!

পলি বলে—জালাতন শাস, জালাতন!

তাহেরা বলে—হুই কেন ধমকানু নে?

পলি বলে—ধমকাইনে বটে, তবে বলি। হাশে।

বেলা দেখা তো উঠিয়াই গিয়াছে! বাইবে কি
করিয়া, কাহারই বা সঙ্গে? অফিসার গোক, অফিস
হইতে, অফিসারদের সঙ্গেই মাঠে চলিয়া বাহ,
পলির বাওরা আর হয় না। তাহেরা লইয়া
বাইতে চাহ, পলি কানের চুড়া করিয়া কাটাঁয়া দেয়।
কাল তো তাহার কম নয়! অফিসারের প্যান্ট, কোট,
সার্ট, ভেঁই পলি নিজেই সব প্রস্তুত করে—সাহেব-
বাড়ীর পোষাকও তাহার তৈরী পোষাকের কাছে
হার মানে। তাহার অবসরই বা কই? গোপাল
বহন আকিসে থাকে, আকিসের বত ফাইল, বত
কামড় বাড়িতে পায়, পলি সমস্তই নিঃশেষে পড়িয়া
ফেলে। যদি দেখে, তাহার স্বামী বা অন্য কোন
অফিসার কোন কেরানী বা নিয়মসম্বন্ধ কর্তব্যের
প্রতি কোনরূপ অবিচার করিয়াছেন, তাহা হইলে,
সময় পাইবামাত্র, তাহা লইয়া স্বামীর সঙ্গে তর্ক
কুড়িয়া দেয়। গোপাল তর্ক করে না, মিষ্টি-মিষ্টি হাসে।

লাইনে বাইবার কথা উঠিলে, প্রথম প্রথম
পলি বাইতে চাহিত, গোপাল কাটাঁয়া দিত।
গোপাল যে বিশেষ অস্তায় কিছু বলিত, বা করিত,
তাহা নহে; ছুই একদিনের অল্প বাওরা, তাহাতে
'লটবহর' লইয়া বাওরার সুবিধা হয় না, এইটুকুই ছিল
তাহার বক্তব্য। তবে অল্প হইবার যে স্বাভাবিক
প্রকৃতি সকল নারীর মধ্যেই অরবিশ্বের হৃদয় বা
জাগ্রত থাকে, তাহাই পলির মধ্যে মাঝে মাঝে

সিদ্ধা উঠিত বলিয়া সে এই সমস্ত সিদ্ধান্তটুকুও
প্রকাশও একটা ব্যাপারে পরিণত করিয়া ছুঁতে
চেষ্টা করিত। তাই বলিয়া কেহ যেন মনে
করিবেন না, পলি কলং বা বচসা করিয়া, অথবা
মুখ অঙ্গুল করিয়া গোপালের মানসিক পীড়ায়
কারণ হইত। একেবারেই নয়। তবু ও শিক্ষিত
নারীর পক্ষে তাহা একান্তই অসম্ভব। সেইটুকু মত-
বিরোধ হইত, হাদিমুখে মানিয়া লইতেই পলি
অসম্মত ছিল।

আমি একটি উদ্ভাবনমত। দেখিতাম, এখনও
দেখি। যখনই দেখি, দেখি—লতাটি পত্রপুঞ্জে সম্বন্ধ
—শুঁত নাই, বর্ধা নাই, স্ত্রীশ নাই, বশত নাই,
সমক-অসমক নাই, লতাটির গারে স্তম্ভক। স্তম্ভক
ফুল ফুটিয়াই আছে। ইহাও দেখি, লতাটির সূলে কেহ
কখনও বারিসিকন করে নাই, কেহ গোড়াটি খুঁড়িয়া
নেয় নাই, কেহ তাহার অনাবৃত্তক ডাল-পালাগুলি
কাটনা-কুটনা কেরানী করিয়া দেয় নাই, তবুও
সেই চিত্রপুন্ডিতা লতাটিকে একটি দিনের জেরে
আমি শুক বা অঙ্গুর দেখি নাই। কে তাহাকে বহ
করিল, কি করিল না, কে তাহাকে আদর করিল,
কি করিল না, সে খবরের সঙ্গে তাহার যে কোন
সম্পর্ক থাকিতে পারে, সে যেন তাহাও জানে না।
তাহার পরিণতি পুন্ডিত হওয়ার, তাহাই সে হইয়া
চলিতেছে; শোভা বিকাশ করাই তাহার ধর্ম, সে
তাহাই করিয়া চলিতেছে—কে দেখে, কে ভোগ
করে, কে দেখে না, কে ভোগ করে না—সে
দৃশ্টিভা তাহার ছিল না!

ও

ছুই বৎসর পরে, একদিন গোপাল আকিস-ককে
বলিয়া একটা 'প্ল্যান' দেখিতেছিল, পলি ঘরে চুকিয়া,
টেবিলের সম্বন্ধে ঠাড়াইয়া বলিল—মান কঁমবে না?
বেলা যে বারোটা হ'ল।

—এই যে উঠি, বলিয়া গোপাল নিবিরচিত্তে
আবার প্ল্যান দেখিতে লাগিল।

—কিসের প্রান ওটা ?

হাঁটী থেকে কয়খু পর্যন্ত একটা নতুন মোটর-
রাস্তা হয়েছে, তারই প্রান।

—সেখানে সেখবার কি আছে ?

—পথে হুডু, আর রাস্তাপাশ দানোদানের উৎপত্তি
সেখা দায়। রাস্তাটা মাকানাকি মাগা দিয়ে
বেড়িয়েছে।

পলি একখানা চেয়ার অধিকার করিয়া ছাঁকিয়া
বসিল, বলিল—তোমার শুভ্রাইডের ছুটি আরন্ত কবে
থেকে ?

কক্ষ-প্রাচীরে রেলের লাগ-কালো-নীল তারিখ-
অঙ্কিত স্মরণ্য দিনপঞ্জী লিখিত ছিল, তৎপ্রতি দৃষ্টি
রাখিয়া গোপাল কহিল—এ বছর ইটটাও ঐ সঙ্গে
পড়েছে, বুধবার থেকে ছুটি আরন্ত।

পলি হিঙ্গাব করিতে লাগিল,—বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র
শনি, রবি, সোম—ছ’দিন ছুটি, কেমন ?

—হ্যাঁ।

—ইচ্ছে করলে আরও ছ’একদিন নেওয়া যায় না ?

—তা’ যায় ; কিন্তু কেন বল ত ?

পলি বলিল—চলো, কয়খু বেড়িয়ে আসি।
নতুন গাড়ীতে ঘুরে কোথাও যাওয়া হয় নি !

গোপাল বলিল—বরাবর মোটরে ! কি সর্বনাশ !

পলি ক্রিম কোণের সহিত বলিল—সর্বনাশ কি
আবার ! মোটরে হাঁটী যায় না, এমন কোন
লোক মোটর রাখে ব’লে আমি ত’ চিনি নি।

গোপাল বিষয়ের ভান করিয়া ঝিঝালিল—তাই
নাকি ? এমন ?

পলি বলিল—হ্যাঁ ; তাই ! এত স্মরণ্য রাস্তা আর
পথের এত দৃশ্য সৌন্দর্য্য যে একবার গেলে বারবার
যেতে ইচ্ছে হয়। লক্ষীটি, চলো।

গোপাল নিমরাশী হইয়া বলিল—তা’ সেলে হয়।
পলি সোৎসাহে কহিল—আজ রবিবার, কাল সোমবার,
পুণ্ড মঙ্গলবার, তারপর দিন ত’ বুধবার। বুধবার খুব
আরো বের হ’তে হবে। আমি আজই সব শুধিয়ে-

গাছিয়ে ফেলছি। আর কি-ই বা গোছাব ছাই-
তম আমার মাথানুহ ! একটা বেড়ি, হুঁটো হুটেকশ,
এই বৈ ত’ না ! কতকগুলি বা লাগবে ! রামগণন
ক্রিমার রাখে, ডাইভারের দরকার নেই, কেমন ?

—ডিকী ডিস্‌রিং তুমিই ত’ সব করছ, আমাকে
আর নিমিত্তের ভাণ্ডি করা কেন ?

—ডাইভার কি হবে ! তুমি ডাইভ না করলে
কি ডিস্‌টেন্স দিয়ে যুখ নেই ! সেই-ই একবার
যাওয়া হয়েছিল, মনে আছে, পাটনা থেকে আগ্রা,
আবার আগ্রা থেকে ফিরে ডেরা ! সে ত’ ছিল
ভাড়া গাড়ী, বাজে গাড়ী !

গোপাল চেয়ারে হেলান দিয়া আলতের চাই
তুলিয়া বলিল—প্রথমে-টুথব কেউ রাখে না কি ?

পলি বলিল—বললে যায় নিশ্চয় ; কিন্তু কাউকে
বলব না। একটু খামিয়া, দশটা একটু নামাইয়া,
স্বরে খানিক সোফাশ ঢালিয়া দিয়া আবার বলিল,
ওমু তুমি আর আমি !

—বাই দান ক’রে আসি, বলিয়া গোপাল চেয়ার
ছাড়িয়া উঠিল। পলি মনে মনে কত হিঙ্গাব-নিকানই
করিতেছিল, বলিল—রিভলভারটা নিতে হবে ;
ঠিক নিতে হবে ; আচ্ছা, রাইফটাও নেওয়া দাব্‌ না,
বলিই কোনদিন শিকার-টিকারে যাও ; বাইনাকুলার
দর কটাই নিতে হবে ; খামোঁ, হুঁটো নিলেই হবে,
একটা চায়ের, একটা জলের, কেমন ? তুমি দান
ক’রে এলে সেখবে, আমার সব গোছান সারা !

গোপাল হাসিয়া কহিল—আজই ত’ আর যাওয়া
নয়, এত ভাড়া কেন ?

পলি বলিল—হ্যাঁ ! বললে আর কি ! আমি না
গোছালে তুমি সব বেখে বুকে নেবে কি ক’রে মশাই !
বাকের ছ’দিনই ত’ তোমার আফিল ! সেবে সেখা
যাবে এটা কুল, সেটা কুল ! বিদেশে সে ভাবি
বিক্রী লাগবে। তার চেয়ে আমি এখনি শুধিয়ে
ফেলছি, তারপর ছ’মানে বেখে টেখে কিছু বাদ পড়ে
বদি, আবার ঠিক ক’রে নিলেই হবে। কেমন ?

গোপাল বলিল—মানটা ত কত বড়, তারপর দেখা যাবে।

নারীর শক্তি সহজে যে সকল পুরুষ সমিধের সচেতন নহেন, তাহার। ত' হারপাতেই আনিতে পারিবেন না যে, গোপাল মান দানিয়া বাহিরে আদিবার কিছু আগেই পলি ছইটা স্টেকেস, হ্যাণ্ড বক্স, বস্কের বাক্স, খার্মো, চর্চ, বিডলবার, কার্ড্ড সমতাই গুছাইয়া লইয়া ড্রিং রুমে বলিয়া গোপালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। গোপাল তাহার ঘুম দেখিয়া নব্বই মিনিট কিম্বা সেরেন্স না। তুলিয়া জিজ্ঞাসিল — খাবার দিতে বলেছ ?

পলি কহিল — না, বলি নি ; বলছি।

কিছুটা আদিয়া কহিল—চলো নিকিন, সব দেখে-জেনে নেবে !

গোপাল বলিল—খাওয়া-দাওয়ার পর।

আহারাদির পর, পলি পাণ খাইয়া ড্রিং রুমে আদিয়া দেখিল, গোপাল তথায় নাই, অফিস ঘরেও তাহাকে দেখা গেল না, পরনকড়ে চুকিয়া দেখিল, শব্দ্যর চৌদ্দ পোয়া হইয়া, চাঘর মুক্তি দিয়া সে পা নাগাইছে। পলির পরশবে তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। হসিয়া পলি পার্শ্বে আনিয়া বলিল, মুখের ঢাকা খুলিয়া দিয়া বলিল—তুমি যে বড় ঘুমে এসে ?

গোপাল পলিটা জড়াইয়া জড়াইয়া বলিল—ছুটির দিন, ছপুর বেলায় একটু ঘুমে না ?

—ওগুলো দেখে এসে ঘুমে, চলো।

—বিকলে দেখব'খন।

অপত্তা তাহাতেই সম্মত হইতে হইল। গোপাল তাহাকে শব্দ্যর আস্তান দিল, পলি বলিল—হ্যাঁ ! আমার ত' কাম-কর্ষ নেই, প'ড়ে প'ড়ে ঘুই আর কি ! —বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। গোপালের অফিস-কামরায় চুকিয়া সেই গ্ল্যান, সাফা কাপড়, লাল-নীল পেপিস লইয়া, কোথায় চা, কোথায় ব্রেকফাস্ট, কোথায় লাক, কোথায় বৈকালিক চা, কোথায় ভিনার খাওয়া যাইবে, কোথায় বা প্রয়োজন হইলে রাত্রিবার করা যাইবে, তাহারই স্থান এবং সময় নির্দেশ করিতে বলিল।

এসকল কাজে সময় খট্টা লাগা উচিত অথবা লাগিলে ভাল হয়, দুখের বিষয় তাহার চেয়ে কম সময়ই লাগে এবং সব শেষ করিয়াও অনেক সময় হাতে থাকিয়া যায়। ইহার মধ্যে দু'একবার শয়নকক প্রদর্শন করাও হইয়া নিম্নাচ্ছে, সেই বাস্তব পূরম নিকিত মনে নিম্নাঘর। কেন তাহার নারীর 'ইন্দ্রমনিয়া' হয় না, পলি কেবল তাহাই ভাবে !

চারের বেলা প্রায় শেষ করিয়া গোপাল শব্দা ত্যাগ করিল ; মান-কমরাতের অনেক দেরী করিল। পলি চারের টেবিল সম্মিত করিয়া বসিয়াছিল, গোপাল আসিতেই বলিল—তবু ভাল যে ঘুম ভাঙ্গল বাবু !

গোপাল বলিল—বড় ঘুমিয়ে পড়েছি, না ?

চাপান চলিতেছে, বেহারী একখানি কার্ড আনিয়া দিল, গোপাল কার্ডে অঙ্কিত নামটি দেখিয়া, আগন্তুককে অফিস ঘরে বসাইতে বলিল। পলি কার্ডখানা টানিয়া লইয়া, দেখিতে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও না দেখিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

গোপাল দানিয়া বাহিরে চলিয়া গেল এবং কিছুকাল পরে, বাড়ীর ভিতরে না আসিয়াই, আগন্তুককে সঙ্গে তাহারই গাড়ীতে বাহির হইয়া গেল। পলির ইচ্ছা হইল, সাঝান স্টেকেসাদি ভাঙ্গিয়া ছুরিয়া শতবান করিয়া ফেল। সব রাগ পড়িল, সেই অজ্ঞাত অপরিচিত আগন্তুককে উপর। ডাইনিং রুমে চুকিয়া সোফার কার্ডখানা জুড়াইয়া লইয়া দেখিল, কোন একজন ইংরাজের নাম ছাপা আছে। অফিস-নগিটে সোফা ভাঙিয়া পলির আরও রাগ বাড়িয়া গেল। চাকুরীর উপর তাহার গুণা চিরদিনই ছিল, আজও আছে এবং দিনের পর দিন তাহা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

গোপাল গভীর রাতে আহারাদি করিয়া শব্দ্যর প্রবেশ করিল। নিম্নে হইতে সে প্রসন্ন তুলিবে না, পলি ইহাও সম্মত করিয়া রাখিয়াছিল, গোপালও কোন কথা বলিল না, সেও তুলিল না, একজন অঘোরে ঘুমাইল, আর একজন সেই শব্দ্যতে ভইয়া ঘুমের চৌদ্দপুস্তক করিতে লাগিল। (আগামীবারের সমাপ্ত)

প্রাচীন কলিকাতা

(বাগবাজারের ইতিহাস)•

কবিজুবর্ণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, কাব্যরত্ন, উদুটনাগর, বি-এ

দুই শত বৎসর পূর্বের কলিকাতা ও বর্তমান কলিকাতা সম্পূর্ণ পৃথক্। আজ সেই স্বব-চার্ণক জীবিত নাই,—থাকিলে তিনি স্বল্পে বলিতে পারিতেন যে, ১৬২০ খৃষ্টাব্দে ২৪শে আগষ্ট (১০২৭ বঙ্গাব্দে ২২শে তাম্র) রবিবার বেলা ২০-টার সময়, উত্তরে ৮ আনন্দমহীর তলা ও দক্ষিণে শিবনারায়ণ ঘোষের বাড়ী বা মণ্ডল-টীট, এই সীমার মধ্যে ঘোড়া-বাগানের কোন এক স্থানে আহম্মদ হুইতে অবতরণ-পূর্বক সাত জন সহচর লইয়া ও আট খানি সোল-পাতার ঘর বাঁধিয়া এবং নিকটবর্তী স্থানতল নিখতলে বসিয়া কলিকাতার প্রাণ-প্রজ্জ্বা ও ইংরাজদিগের বাণিজ্য-বিস্তার সম্বন্ধে মনে মনে তিনি কি কল্পনা করিতেন, এবং তৎকালে তিনি কলিকাতার কিরূপ অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। আজ সেই স্বব-চার্ণক জীবিত নাই,—থাকিলে তিনি কহিতে পারিতেন যে, ব্যারাকপুরে (চাপকে) কোন্‌ ব্রাহ্মণ-কন্ডাক সহমরণ-চিতার তরীভব হইতে নিবৃত্ত করিয়া ও পরিণয়ে তাঁহাকে বিবাহ করিয়া আজিও উত্তরে পাণ্ডুরিয়া-বিক্রীর প্রাঙ্গণে সমাহিত রহিয়াছেন। আজ সেই স্বব-চার্ণক জীবিত নাই,—থাকিলে তিনি সাক্ষ্য দিতে পারিতেন যে, শিয়ালদহের অন্তর্গত একটা বট-বৃক্ষের তলে বসিয়া ও গুড়-গুড়ি টানিতে টানিতে সন্ধ্যা ৭০ কিট্‌ উচ্চ একখানি বৃক্ষের দিকে চাহিয়া ইংরাজদিগের বাণিজ্য-কুটী-নির্মাণ বিষয়ে মনে মনে তিনি কি চিন্তা করিতেন। আজ সেই নবীন স্ব-পুরুষ, নবাব শিরাজ-উদ্দৌলা জীবিত নাই,—থাকিলে তিনি স্বল্পে বলিতে পারিতেন যে, স্বীয় সেনাপতি, দুর্গুন্ডি কাপুখান মাসিকতাদের হস্তে ইংরাজ বন্দীশরণের ভার্য্য-পূর্বক তিনি কিরূপ

অশরণ্যাম-দর্শিতার কার্য্য করিয়া নিজ নাম বাঙ্গালার ইতিহাসে চির-কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। আজ সেই ওয়ারেন হেস্টেলে জীবিত নাই,—থাকিলে তিনি স্বল্পে বলিতে পারিতেন যে, কি কারণে তিনি ও তার ফিলিপ্‌ ফ্রান্সিস্‌ একদিন প্রত্যয়ে আদিপুর্বে বৃক্কতলে পিতল লইয়া স্কন্ধ করিয়াছিলেন। আজ সেই তার ফিলিপ্‌ ফ্রান্সিস্‌ জীবিত নাই,—থাকিলে তিনি স্ববন্দীশা-ক্রমে বলিতে পারিতেন যে, কোন্‌ রণীশ্বরী রমণীর রূপের মোহে যুগ্ধ হইয়া তাঁহার সতীত্ব নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বংশ-নিশ্চিত একখানি মহি-এর সাহায্যে প্রাচীর অতিক্রম করিয়া রাত্রিকালে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া তার ইশারিফা ইম্পের দরবারে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা ও ২৪৭১০ টাকা মক্কারাম খরচ দিয়াছিলেন। আজ সেই সুপ্রিয়-কোর্টের প্রধান-বিচারপতি তার ইশারিফা ইম্পে জীবিত নাই,—থাকিলে তিনি অনায়াসে বলিতে পারিতেন যে, কিরূপ অবস্থায় পড়িয়া “রাইটস্‌ বিল্ডিং”র পূর্ব-দিগ-বর্তী “ওল্ড-কোর্ট-হাউসে” বসিয়া গুড়-গুড়ি টানিতে টানিতে তিনি ব্রাহ্মণ-সন্তান মহারাজ নব-কুমারের কাদির হুকুম দিয়াছিলেন। আজ সেই ডক্টর জন্সন, বস্‌জেন্স ও সোল্‌জিমেথের পরম-শুদ্ধ এবং কলিকাতা-সুপ্রিয়-কোর্টের অন্ততম বিচারপতি তার রবার্ট চেম্বার্স্‌ জীবিত নাই,—থাকিলে তিনি অনায়াসে বলিতে পারিতেন যে, “কাপুখান

• মহারাজ কলিকাতার-অতিন বাগবাজার-নিবাসী হইতে ইংল্ট্র ইংল্যান্ড যে যোগেশের বাটতে কয়েকটা বাসক একটা লাইব্রেরী করিয়াছিল। ইংল্ট্র বাবু বসিতি এই এবং ৫টা পাঠ করিয়া একদিন তাহা বিক্রয় প্রাচীন বাগবাজারের অর্থাৎ জনাইয়া দিয়াছিলেন।—সেৎক

কেলশাল্ হাউন্স" হইতে ভবানীপুরস্থ স্বীয় বাগান-বাড়ীতে পারিলাভ করিবার আশায় দিয়া চৌরঙ্গীর চন্দ্রলিখিত বাগান-সমূহের ভীষণ বর্ণনে দ্বন্দ্ব কিত্তন অগতি রাখিয়া বন্ধু-হুতে সমস্ত রাখি তিনি অন্ত্রায় দাপন করিতেন। আশ সেই চৌরঙ্গী বিধি জীবিত নাই,—খাকিলে তিনি শাক্য দিতে পারিতেন যে, বর্তমান চৌরঙ্গীর মাটির উপর নিবিড় বন্যে বাগ ও অজ্ঞাত হিংস্র জন্তু কিত্তন ভীষণ চাংকার করিত, এবং তিনিই বা কিত্তন কষ্ট সহ করিয়া প্রত্যহ কালীঘাটে দিয়া ৮ কালীমাতার পূজা করিয়া আসিতেন! হুই পত বৎসর পূর্বে যে চৌরঙ্গীতে আটখানি মাত্র পাকা বাড়ী ছিল এবং চারিটা মাত্র আলোক অলিত, তাহা আজ পত পত সৌখিন্য ও সহস্র সহস্র বৈজ্ঞানিক আলোকে উজ্জ্বলিত। হুতর্য সে সময়ের কলিকাতা ও বর্তমান সময়ের কলিকাতা সম্পূর্ণ বিভিন্ন!

বাগবাগার অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থান। এই স্থানে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। পলাশী-যুদ্ধের বহুপূর্বে হইতেও বাগবাগারের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কি সাহিত্য, কি সঙ্গীত, কি সামাজিক ব্যাপার, সকল বিষয়েই বাগবাগার কলিকাতার অজ্ঞাত স্থান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। আদর্য্য ক্রমে ক্রমে এই সকল বিষয়ের অবতারণা করিব।

১। “বাগবাগার”-নামের উৎপত্তি

অনেকে মনে করিয়া থাকেন, এখানে একটা বাগার ছিল, এবং এই বাগারে “বাগ” বিক্রয় হইত বলিয়া ইহার নাম “বাগবাগার” হইয়াছে। কিন্তু বস্তুর তাহা নহে। উত্তরে বাঁধাটা ভিত্তি, দক্ষিণে আধুনিক বাগবাগার টীট, পূর্বে হলদাল মিডের টীট এবং পশ্চিমে গঙ্গা ও চিংপুর রোড,—এই চতুর্দিশার মধ্যে পেরিন-সাহেবের একটা বাগান ও একটা বাগার ছিল। বাগান শব্দের পারস্যী কথা “বাগ” এবং “বাগার” শব্দ আরবী বা পারস্যী ভাষা-বসক।

এই হেতুই, এই স্থানের নাম “বাগবাগার” হইয়াছে। পেরিন-সাহেবের কথা পরে বর্ণিত হইবে।

বাগবাগার টীট

বর্তমান সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, “বাগবাগার টীট”, “চিংপুর রোড” হইতে আরম্ভ করিয়া কর্ণওয়ালিস টীটের সহিত মিলিত হইয়াছে। এখন বাগাকে লোকে “অরপূর্ণা-ঘাট” বলে, পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে তাহাকে “ওল্ড-পাউজার-মিল ঘাট” বলিত। এই ঘাটের দক্ষিণ দিকে আর একটা ঘাট ছিল;—ইহার নাম “গুণু মিডের ঘাট”। এই গুণু মিড, কুমারটুলী-নিবাসী, সুপ্রসিদ্ধ পোবিন্দ্ররাম মিডের পুত্র। পোবিন্দ্ররাম মিড জেকোনিয়া হলওয়েল-সাহেবের অধীনতায় “ব্ল্যাক জবীয়ার” বা “ডেপুটী গভর্নর” ছিলেন। সমস্ত কলিকাতার ফৌজদারী বিভাগের তার তাহার উপরী অর্পিত ছিল। এতদ্বারা তিনি “ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী”র তরফ হইতে কলিকাতার রাজত্ব আদায় করিতেন। “বাগবাগার টীট” নাম ইহার কারণ এই যে, এই টীট বাগবাগারে পেরিন-সাহেবের বাগানের ও বাগারের পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে এই টীটের নাম ছিল “ওল্ড-পাউজার-মিল-বাগার রোড”। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে “ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী”র রেকর্ডে বাগবাগারের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে হলওয়েল-সাহেবও স্বীয় “কলিকাতার বিবরণে” বাগবাগারের নাম উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন। পলাশীর যুদ্ধের বৎসরে অর্থাৎ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার মানচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাগবাগার টীটের উত্তর পার্শ্বে স্থলর স্থলর বৃক্ষ বোপিত ছিল। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ডব্লু-সাহেব-বসন্ত মানচিত্রে নিদীত আছে যে, “বাগবাগার টীটের দৈর্ঘ্য দিকি মাইল।” বর্তমান “অরপূর্ণা ঘাটের” উপর হইতে পূর্বদিকে রাস ৮ পণ্ডপতিমাথ বহু মহাস্থলের আভ্যন্তর পর্য্যন্ত বর্তমান “বাগবাগার টীট” দিয়া লোকে যাতায়াত করিত। কিন্তু উক্ত আভ্যন্তর

হইতে বাগবাঝার মোড় পর্য্যন্ত স্থান অল্পে পরিপূর্ণ ছিল। ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে “কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট” নির্মিত হইলে “বাগবাঝার ষ্ট্রীটের” সহিত ইহা সংমিলিত করিয়া দেওয়া হয়।

১৭২৪ খৃষ্টাব্দে ২রা এপ্রিল তারিখের আগমন-কৃত মানচিত্রে “বাগবাঝার ষ্ট্রীটের” নাম ছিল “ওল্ড-পাউডার-মিল-বাঝার রোড”। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে “ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী”র আদেশ-মতে কলিকাতার অনেক রাস্তার নাম পরিবর্তিত হইয়াছিল। “ওল্ড-পাউডার-মিল-বাঝার রোড,”—এই নামটী অত্যন্ত লম্বা বলিয়া পেরিন-সাহেবের বাগান অর্থাৎ “বাগ”, এবং পেরিন-সাহেবের “বাঝার” এই দুইটা শব্দ মাত্র গইয়া “বাগবাঝার ষ্ট্রীট” এই সংক্ষিপ্ত নাম দেওয়া হইল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দেই এই ষ্ট্রীটের নাম “বাগবাঝার ষ্ট্রীট” হইয়াছে।

৩। পেরিন-সাহেবের বাগান (Perrin's Garden)

বর্তমান “বাগবাঝার ষ্ট্রীটের” উত্তর দিকে পেরিন-সাহেবের বাগান ছিল। উত্তরে “বার্ছ’স ডি’স্”, পূর্বে “হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট”, দক্ষিণে “বাগবাঝার ষ্ট্রীট” ও পশ্চিমে “জিম্পুর রোড”,—ইহাই এই বাগানের চতুর্সীমা ছিল। তখন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর সিভিলিয়ান-গণ স্ত্রী-পুত্র গইয়া প্রজাহু, আতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে এই বাগানে বেড়াইতে আসিতেন। লং-সাহেব দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই বাগানে কেবল সাহেবেবরাই বিহার করিতে আসিতেন। কোন বাঙ্গালী এখানে প্রবেশ করিতে পারিত না। তৎকালে বাগবাঝার আট ঘর সাহেবের বাস ছিল। পেরিন-সাহেব এই আট ঘরের মধ্যে এক ঘর। কিন্তু অবশিষ্ট বাক্তি-গণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তখন এই অঞ্চলে চারি ঘর সন্ন্যাস ও উভয়বধ বাঙ্গালীর নাম পাওয়া যায়। ইহাদের নাম,—গোড়াবাঝার-নিবাসী নন্দরাম সেন, কুমারটুলী-নিবাসী গোবিন্দরাম মিত্র এবং ডারবাঝার-নিবাসী দয়্যারাম

বহুর বংশধর নবীনচন্দ্র বহুর বাড়ীতে ১৮১১ খৃষ্টাব্দে “বিদ্যা-হ্রদর বাসা” অভিনীত হইয়াছিল। ইহাই বাঙ্গালা সেনে সর্বপ্রথম অবৈতনিক ব্যায়ের অভিনয়। নবীনবাবু অত্যন্ত বিলাসী ও সৌখিন ছিলেন। তিন স্ত্রী পাওনা হইয়াছিল। ইহাতে নবীন বাবু ২১০ লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছিলেন। অভিনয়ের জন্য “রামবাড়ী,” “মালিনীর সরোবর ও কুটার” এবং “হৃদয়ের হৃদয়” বর্খার্বই নির্মিত হইয়াছিল। তৎকালে দৃশ্যপটের প্রথা প্রচলিত ছিল না।

পেরিন-সাহেবের অনেকগুলি জাহাজ ছিল। তন্মধ্যে তিনখানি জাহাজ বর্তমান “অন্নপূর্ণা ঘাটে” বাধা থাকিত। বিলাত হইতে বাস আমদানী ও রপ্তানী করিবার অভিপ্রায়েই পেরিন-সাহেবের জাহাজগুলি এই ঘাটে থাকিত। আমার নিকটে একখানি অতি চুল্লী পুত্রক ছিল। ইহার নাম “Alexander Hamilton's Accounts of the East Indies.” পুত্রকখানি ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। স্মরণ্য ইহার বয়স এখন ১২৪ বৎসর। এই পুত্রকে বাগবাঝারে পেরিন-সাহেব সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য লিখিত আছে। Sceptre নামে পেরিন-সাহেবের একখানি জাহাজ “বাগবাঝার ঘাটে” বাধা ছিল। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী এই জাহাজখানি প্রেস্তায় করেন। কারণ পেরিন-সাহেব, টমাস্ গিট ও বেন্জামিন বাউচার সাহেবের নিকটে সেনাদার ছিলেন। কিন্তু কোম্পানী যখন জানিতে পারিলেন যে, এই জাহাজখানি পেরিন-সাহেবের অধিকারে আর নাই, তখন তাঁহারা পেরিনকে ও তাঁহার জাহাজকে ছাড়িয়া দিলেন। পেরিন-সাহেব কোম্পানীকে এই বাগানখানি বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। কোম্পানী ১৭৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বাগানখানি বাসে রাখিয়াছিলেন। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ২শে নভেম্বর তারিখের Consultations-এ একটী বিজ্ঞাপন এই মর্মে বাহির হয় যে,—“পেরিন-সাহেবের বাগান, রেজিমেন্টের জমাবের খ্রীষ্টান চেষ্টা পরিষাদে।

সিভিলিয়ান সাহেবগণ ভাল দীর্ঘতেই বেড়াইয়া থাকেন, এ বাগানে আর বেড়াইতে আসেন না। হুজুরা আগামী ১১ই ডিসেম্বর সোমবার তারিখে একান্ত নিশ্চয়ে ইহা বিক্রয় করা যাইবে।" বিখ্যাত স্কেলানিয়া হলওয়েল-সাহেব (বিনি অধকৃপে আবহ ছিলেন বলিয়া প্রকাশ) ২৫০০ টাকা দিয়া ইহা ক্রয় করেন। কেহ কেহ বলেন, হলওয়েল-সাহেব ২৫০০০ টাকার ইহা ক্রয় করিয়াছিলেন। বোধ হয়, একটা শুল্কের সোদমাণ হইয়া থাকিবে। C. F. Scott সাহেব তৎকালে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর সেনাপতি ছিলেন। ইনি গুৱায়েণ হেট্রিংসের পূর্ণ-পক্ষের স্বত্ত্ব। ইনিই পরিশেষে এই বাগানখানি হলওয়েল-সাহেবের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিলেন।

৪। পেরিন্স-পয়েন্ট (Perrin's Point)

বাগবাঝারে পেরিন-সাহেবের বাগানের উত্তর-পশ্চিম কোণকে Perrin's Point বলে। এখন যেখানে গঙ্গার দ্বিতীয় বাগবাঝার-বাগ মিলিত হইয়াছে, সেই দক্ষিণ-দিকই Perrin's Point। ইহার ঠিক দক্ষিণ-দিকে প্রস্তর-নির্মিত একটা ঘাট ছিল। তাহাকে লোকে "পারঙ্গী সাহেবের ঘাট" বলিত। এখন তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। Perrin's Point-এর কিয়দূর উত্তর-দিকে চিংগুরে মহম্মদ রেজা খান একটা অতি বৃহৎ স্তরমা মসজিদ। ও উজান ছিল। এখনও লোকে এই স্থানকে "নবাব-পটী" বলে। মহম্মদ রেজা খাঁ, বাদশাহা, বিহার ও উড়িষ্যার নায়ক-নামিন ছিলেন। চুঁচুকা ও বরাহনগর হইতে গুলশাহ-গণ, চন্দননগর হইতে কুলাঙ্গী-গণ এবং কলিকাতা হইতে ইরাক-গণ নবাব-সাহেবের অতিথি হইয়া নানাবিধ আহা-বিহার ও আমোদ-প্রমোদ করিতেন। তাহার অনেক হাটী ও অশ্ব ছিল। নবাব-সাহেব হাটীর উপর চড়িয়া দক্ষিণেবনের নিবিড় জঙ্গলে দিয়া ব্যায় ও অস্ত্রাঘাত হিংস্র দল শিকার করিতেন। পেরিন্স-পয়েন্টের দক্ষিণ-দিকে দুইটা কামান আঁধিও মাটির ভিতর প্রোথিত বহিয়াছে।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে বাগবাঝারে যুদ্ধ হয়। বোধ হয়, এই যুদ্ধের সময় নবাব মীরজাফর পরাজিত হইয়া এই কামান দুইটা সেনিয়া দিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের বিবরণ এই প্রবন্ধেই কিছু পরে দেখিতে পাইবেন।

৫। বাগবাঝার-রিডাউট বা পেরিন্স-রিডাউট (Bagbazar Redoubt or Perrin's Redoubt)

পূর্বে বাগবাঝারে পেরিন-সাহেবের বাগানের উপর একটা আট-কোণা হোট কেল্লা ছিল। ইহারই নাম Perrin's Redoubt। পূর্বেই বলিয়াছি যে, C. F. Scott সাহেব গুৱায়েণ হেট্রিংসের পূর্ণ-পক্ষের স্বত্ত্ব ছিলেন। তিনি "ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী"র অধীনতায় সেনাপতির কার্য করিতেন। এতদ্বারা তিনি Engineer Generalও ছিলেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রস্তাব করেন যে, মার্গট্ট-জিৎ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে; ইহা সম্পূর্ণ করা উচিত। এতৎ-বাতীত কলিকাতা রক্ষা করিবার জন্য পেরিন-সাহেবের বাগানের উপর একটা আট-কোণা কেল্লা নির্মাণ করা উচিত। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম-ভাগে তাহার দৃত্য হওয়াতে এই কার্যের ভার লেক্টেজান্ট ওয়েলস্-সাহেবের উপর অর্পিত হয়। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ১৮ই আগষ্ট তারিখে ওয়েলস্-সাহেবের দৃত্য হওয়াতে Bartholomew Plaisted সাহেবের উপর এই কার্যের ভার দেওয়া হয়। কিন্তু কোন কারণ-বশতঃ "ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী" তাঁহাকে কর্তৃত্ব করিতে ওঁ-হারা (O'Hara) নামক জনৈক সিভিলিয়ান ও সিম্পসন্ (Simpson) নামক জনৈক সৈনিক কর্তৃত্বকারীকে এই কার্য করিবার জন্য এজিনিয়ার নিযুক্ত করা হয়। এই দুই জনের তত্ত্বাবধানে ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে "বাগবাঝার-কেল্লা" (Bagbazar Redoubt) নির্মিত হইয়াছিল। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট তারিখের Consultations পাঠ করিলে "বাগবাঝার-কেল্লা" সম্বন্ধে এই কথা জানিতে পারা যায়,—“ওয়েলস্ ও ড্রেক-সাহেব বাগবাঝার-কেল্লা সম্বন্ধে

১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর-মাসের ৩৩ ১৭৮৮/১৫ টাকা খরচের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহা পাশ করা গেল। কাউন্সেলের প্রেসিডেন্ট বেন এই টাকা সরকারী তহবিল হইতে সেন।”

এখন যেখানে ঐশ্বর্য হরিদাস সাহা মহাশয়ের গদি ও চুপের স্তম্ভ রহিয়াছে, সেই স্থানেই Bagbazar Redoubt ছিল।

৬। বাগবাজারে বাক্স-খানা (Bagbazar Powder Mills)

পুর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, C. F. Scott, “ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী”র এজিনিয়ার ও সেনাবিভাগের এক জন অধ্যক্ষ ছিলেন। বাগবাজারের পেরিন-সাহেবের বাগানের উপর ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি “বাক্স-খানা” নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হইলে তাহার কৰ্ম্মাধ্যক্ষ Captain John Buchanan পেরিন-সাহেবের বাগান ও বাক্স-খানা ক্রয় করিয়া লইলেন। “ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী”, বুকানন-সাহেবের নিকট হইতে ৪০০০ টাকা মূল্য দিয়া পেরিন-সাহেবের বাগান, মন্দির, তত্ত্বপরিষ বাটী ও বাক্স-খানা সমস্তই কিনিয়া লইলেন। বাক্স-খানায় কিরূপ বাক্স প্রস্তুত হইত, তাহার ভবান্বিত করিবার ৩৩ বুকানন-সাহেবকে এককালীন কিছু টাকা দেওয়া হইয়াছিল।

এখন যে স্থানে ঐশ্বর্য নৃত্যোপাঙ্গন লব্ধ মহাশয়ের বাটী ও স্তম্ভকীর কল রহিয়াছে, সেই স্থানেই “বাক্স-খানা” ছিল। নৃত্যোপাঙ্গন বাবুর মূখে শুনিয়াছি, তিনি যখন বাটী নির্মাণ করেন, তখন তিত খুঁড়িবার সময় বহুবিধ সোহা-লক্ষ পাওয়া গিয়াছিল। কুকশিশোর নিরাপত্তা, নবলাল মুখোপাধ্যায়, নবীনকুমার সরকার ও বহুনাথ চট্টোপাধ্যায়,—এই চারি জন

কৃতবিদ্যা ও প্রাচীন লোকের মূখে “বাগবাজার” নাম শুনি নাই। তাহার “বাগবাজার” না বলিয়া “বাক্স-খানাই” বলিতেন। তাহার আশ্রয়ীভূত থাকিলে তাহারের বয়স ১০০ বৎসরের অনেক অধিক হইত।

৭। “ওল্ড-পাউডার-মিল বাজার” (Old Powder Mill Bazar)

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে উদ্-সাহেব-কৃত কলিকাতার মানচিত্রে একটি বাজার ও রাস্তার নামোন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাস্তার নিকট দিয়া নেবুবাগান গেল পর্যন্ত একটি রাস্তা “ডিংপুর রোড”র মূখ হইতে পুর্নদিকে অবস্থিত ছিল। ইহার নাম “Old Powder Mill Bazar Road”। রাস্তাটা বৈধে; সিকি মাইল। এই রাস্তার উত্তর-পূর্ব কোণে উক্ত বাজারটা অবস্থিত ছিল। তখনও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের সহিত এই রাস্তাটা মিলিত হয় নাই। পুর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, গভর্নর-জেনারল লর্ড কর্ণওয়ালিস বাংলাজের সময়ে ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে যখন “কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট” নির্মিত হয়, তখন ইহাকে “কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট”র সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

১৭২২ খৃষ্টাব্দে এ-মাপসন্-সাহেবের অঙ্কিত “কলিকাতা ও ত্রিকটবর্তী স্থানের মানচিত্র”খানি দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, আশ্রয় যেখানে ৮ মকরকুমার বহু, এজিনিয়ার ঐশ্বর্যকুমার সরকার ও আমার বাটী রহিয়াছে, সেই লীমার মধ্যভাগে একটি বাজার ছিল। ইহার নাম “Old Powder Mill Bazar”। বোধ হয়, মহারাজ নবকুমার দেব বাহাদুর এই “পুরাতন বাজারটা” উঠাইয়া লইয়া গিয়া বর্তমান “শ্রাববাগারের” সৃষ্টি করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

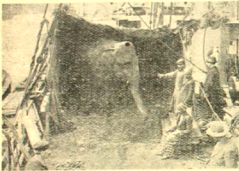




বস্তু-জগতের ব্যবসায়

শ্রীহরিনয় রায়চৌধুরী

বস্তু-জগতের ব্যবসারে কত লোকেরই বা অসু-সুস্থান
হইতে পারে ? কে-ই বা এত বস্তু-জগত খরিদ করিবে



ভারতীয় মাহাতের জিন্দার বন্দী হাতী ইউরোপে চালান হইতেছে
(আহাঙ্গের ডেকের দৃশ্য)

যে, তাহার একটি রীতিমত ব্যবসায় চালান যায় ? এ
বিষয়ে একটু চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, কত
প্রকার কাজে বস্তু-জগত ব্যবহার করা হয়। পৃথিবী
জুড়িয়া প্রায় সকল সভ্য দেশেই চিড়িয়াখানা আছে
এবং তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই প্রতিবৎসর নূতন

নূতন জন্তু আনবানী করা হয়। অনেকের সখের
চিড়িয়াখানাও আছে ; তাহার জন্তু জন্তু আবশ্যক।
সার্কাসওয়ালারা জন্তুর খেলা দেখাইয়া থাকে এবং
অনেকের সার্কাসের সঙ্গে ছোটখাট চিড়িয়াখানাও
থাকে। আহাঙ্গাল সিনেমার কিশ তুলিবার জন্তুও অনেক
বস্তু-জগত আবশ্যক হয়। অনেক সময় এক দেশ হইতে

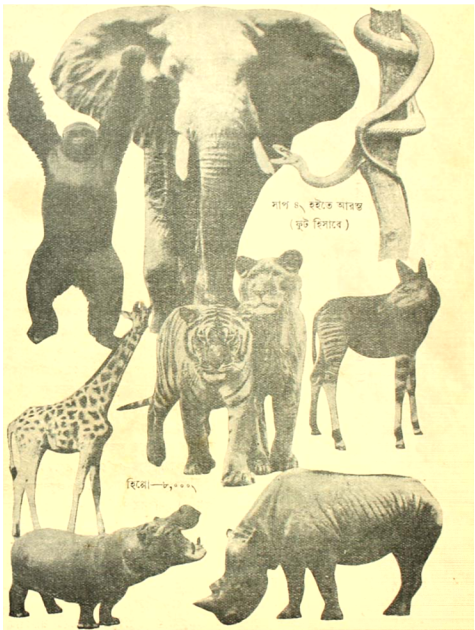
অন্য দেশে বস্তু-জগত লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়,
বাহাতে সেই দেশে ঐ জন্তুর বংশ বৃদ্ধি পায়। বহুকাল
পূর্বে অস্ট্রেলিয়ার কয়েকটি খরগোশ লইয়া গিয়া অনেক
মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ক্রমে তাহাদের বংশ এত
অধিক বৃদ্ধি পায় যে, তাহাদের হাত হইতে শস্ত ও
তরকারির ফসল রক্ষা করা এক গুরুতর সমস্যা হইয়া
দাঁড়ায়। মেসোপটেমিয়ার এক পাল বানর লইয়া
গিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল ; সেখানে নাকি বানর
আদৌ দেখা যাইত না।



১. জেত্রাজলিক নদী খরিদা চালান করা হইতেছে
সকলেই খিলাবে অভিযুক্ত

আহাঙ্গাল বস্তু-জগতের ব্যবসারের যথেষ্ট উন্নতি
হইয়াছে ; সঙ্গে-সঙ্গে খরার প্রণালীরও উন্নতি হইতেছে।
অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে-সঙ্গে জন্তুদের স্বভাব, চোখাফিরা,
খাবার ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়িতেছে এবং তাহার

বাক্সার-দলের নমুনা—গরিলা—১৪,০০০ ; শাভী—৭,০০০ হইতে ১০,০০০ ; বাঘ, সিং—৯,০০০



মাগ ৪ হইতে আরম্ভ
(ফুট হিসাবে)

হিরো—৮,০০০

বিরাট—১০,০০০ হইতে ১৪,০০০ ; ওকাপি—৪০,০০০ ; শগুয়ার—১০,০০০ হইতে ১৬,০০০

কলে জন্তু ধরা অপেক্ষাকৃত সহজ ও কম ব্যয়সাধক হইতেছে। পূর্বে বেসকল জন্তু ধরা হইত তাহার অনেকগুলিই বিক্রয়ের পুর্বেই মারা বাইত। কোন কোন জন্তুকে তো ধরিয়া বাচানই বাইত না,—এমন পরিমা। গভার, হিমোগটেমাস্ প্রভৃতি জন্তু ধরিলে তাহাকে বন্ধী করিয়া বিক্রয়ের স্থানে লইয়া আসা এক সমস্তার ব্যাপার ছিল। ত্রিংস বা ওর্ডাফ্ জন্তুদের

বজ্র-জন্তু পোষ মানান এখনকার দিনে সহজ ব্যাপার বলিয়া গণ্য হয়। বাঘ, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুও বহু ও স্টোর কলে পোষ মানে। একত্র করিতে না পারিলে অনেক সময় বৃত্ত জন্তু মনের দুখে ও কষ্টে ভ্রম-ভ্রম হইয়া মারা যায়। আশ্চর্য যে বনের পশু, কাল হইত সে পোষ মানিয়া ‘গৃহপালিত’ পশু হইয়া বাইবে। সহ্যদ্রুতি, বহু ও স্টোর কলে বজ্র-জন্তুর ব্যবসায়ের এত উন্নতি হইয়াছে যে, এখন আর বৃত্ত জন্তুকে ‘বান্দারে’ আনিয়া বিক্রয় করা ‘কখন-কি-বটে’র ব্যাপার নয়। অবশ্য, দুশ্রীয়া জন্তু সম্বন্ধে এখনও অতটা জোর করিয়া বলা কঠিন। বাঘা হউক, এখন ব্যবসায়ীর সাহসও বাড়িয়াছে; জন্তু লোদাড় করাও সহজ হইয়াছে। এক একজন ব্যবসায়ীর ‘একেন্ট’ পৃথিবীর চারিদিকে থাকে। আফ্রিকা ও ভারতবর্ষ জন্তু-সংগ্রহের বড় আচ্ছ।। হাতী, হিমোগ, গভার, বানর, বনমাহুৎ, সাপ, বাঘ, সিংহ, মেহরা, মিলাক, ভল্লুক,—এই সকল জানোয়ার আফ্রিকা ও এশিয়া হইতেই প্রধানতঃ চালান যায়। কার্ণেলীর গুল্‌স্ (Schulz) নামক পশু-ব্যবসায়ী সীতিমত আহাম ভাড়া করিয়া পৃথিবীর সকল বিচ্ছ হইতে বিশেষতঃ এশিয়া ও আফ্রিকা হইতে) পশু সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করেন। পশু-চালানের বে চারিটি ছবি নেওয়া হইল তাহা গুল্‌সের আহামের ডেকের দৃশ্য।

কার্ণেলী জন্তুর ব্যবসায়ের প্রধান দেশ। কাল্‌সেন্‌ বেক্ প্রভৃতি অনেক কার্ণাল বিশেষজ্ঞ জন্তুর ব্যবসায়ের ও জন্তুর স্বভাব সম্বন্ধে জানাশাওয়ার স্টোর বীবন কাটাইয়াছেন। সেন্‌ বেকের চিড়িয়াখানা বিশ্ববিখ্যাত। কার্ণেলীর অনেক জন্তু-ব্যবসায়ীও বিশ্ব-বিখ্যাত। পরিলাকে ধরিয়া আনিয়া পোষ মানান বা বাচাইয়া রাখা আসেকার দিনে এক প্রকার অসম্ভবই ছিল। বড় পরিমা ধরিয়া আনা তো সাহসেই তুল্য হইত না; বা-ও ধরা বাইত, অল্পদিনেই ভ্রম-ভ্রম হইয়া মারা বাইত। শিশু-পরিলাকে ধরিয়া আনিলেও অল্পদিন মধ্যে উদরানর রোগে উহার মৃত্যু হইত। কার্ণাল বিশেষজ্ঞেরা এখন পরিলাকে বাচাইয়া রাবিবার উপায়



বন্দী বানরেরা অজ্ঞাত দেশের গানে অর্থাৎ হইয়া চাহিতেছে
(মাহাম হইতে মাঝাইবার কালের দৃশ্য)

আমকাল প্রায়ই শিশু অবস্থায় ধরা হয়। শিশু অবস্থায় তাহাকে খাওয়ান, বাচান এবং পোষ মানান অনেক সহজ। বড় হইলে তাহাকে অধিক দামে বিক্রয় করিয়া ফেলা হয়।

জানেন,— দলে, এখন গরিবের ব্যক্তি অনেক চিড়িয়া-
খানায় দেখিতে পাওয়া

অভিজ্ঞতায়

কারণ, আফ্রিকার অসংখ্যকব গণন দলে মাংসের পর
মাপ অতি সাবধানে লুকাইয়া লুপ্তা করিতে
“একাপি”র দলন পাওয়া যায়। তাহা
তাহার পর। উক্তদিনে ৩৫৫ অত



শেট জুং খা'ক' দলের বন্য জন্তুর ব্যবসায়

বলা চলে। কয়েকটি ছদ্ম লা ভয়র মোটামুটি বাজার-
দর ছবিতে দেওয়া গইল। “একাপি”র দর প্রায়
৪০,০০০ টাকা। কিন্তু, এত ছদ্ম লা ওওয়া সত্ত্বেও
“একাপি” দ্বিবিতে ব্যবসায়ীরা একপ্রকার নাবাও

করিয়া। কেলা বাস : প্রাপ্তি হাতে করিয়াও থাকিতে
হয় না। “একাপি” অনেকা ছদ্মলা ওয় হাউচ,
বিশ্ব, তাহা এত বেধে ছদ্মলা যে, তাহার ‘বাজার-দর’
বলা অসম্ভব,— তাহার দর গণন দৃষ্টিয়া।



সর্বাণী

(উপভাস)

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

[পূর্ণাহরতি]

(৩)

ছোট একটা গহ্বর। নেহাৎ গায়ের উপর নয়, একটু দূরে দূরে চিত্তরেখার মত গহ্বর রঙের পাহাড় বেধা যায়; সুগন্ধের পান-পাওয়া, কোথাকার করণা-করা একটা বেন ছোট পাহাড়ী নদীও একটা পাশে বয়ে থাকে। নদীটার কি একটা বিশিষ্ট কটোমটো দেশোয়ালি নাম আছে, সেটা মরচন ও সর্বাণীর পছন্দ নয়। তাই এঁরা নিজেরাই একটা বেশ পছন্দসই দেখিয়া নাম রাখিয়া দিয়াছেন, ‘কম্বোলা’; ‘কম্বোলা’ নামটীতে নামের মর্যাদা ক্ষুদ্র হয় নাই, আবার কবিকল্পিতও পরিচর পাওয়া গিয়াছে। ‘কম্বোলা’—যেমন তার অবিহল কল্-কল্ ছলছল নাগ, যেমন তার কল্-কল্ কম্বোলাস্, তার উপবৃত্তই তো নাম রাখিতে হইবে? নাম রাখিয়াছিল সর্বাণী। এই নদীর তীরেই তাদের বাসাবাড়ী; ভাড়া-করা বাড়ী নয়, জম-সাহেবের বাড়ী। বরাবর বে-কোন জম এখানে বন্দী হইয়া আসেন, এই বাড়ীতেই থাকেন। সাদারগণঃ ইংরেজ মহোদয়ই আসিয়াছেন, তাই সাহেবী কেতার বাড়ীটা লক্ষ্যনো; বাড়ীর সঙ্গে এর আনুমানিক যে সকল ছোট ছোট রাস্তাবাড়ী প্রকৃতি আছে, সে সব তাঁদের ঘোসা করিয়াই করা অর্থাৎ বাবুচান্না, সুন্দার ঘর—এই সবই আছে, হিন্দু-গৃহিণীর উপবৃত্ত ভাঁড়ারঘর বা রাস্তাঘর নাই। সর্বাণীর এর ভিতরেই চলিয়া বাইত; ভাঁড়ার সে এই বাড়ীরই একটা পাশের দিকের ঘরকে করিয়া লইয়াছে। সন্সারে তো তাদের গোক কত! বাপ আর মেয়ে বই তো নয়! কিন্তু অভাব বোধ হইত তার সব চাইতে এখানকার এই সর্বা-হীনতার জন্ত। মাথার উপর দিগন্ত-প্রসারী আকাশ আর

দূর দিগন্তে বিলীমমান-প্রায় কখন নীল কখন খুসরাত পর্ষদের একটুখানি বেধা, আর ছোট নদীটার জলে হর্যোর ঘর বৌয়ের খেত আভা, প্রভাত-রবির রক্তোচ্ছলছটা, সাদা তপনের স্বর্ণভাদীপ্ত তরঙ্গের লীলাদুঃ, আর তা’ ছাড়া ছোট ছোট লতাগুহ্র হইতে বড় বড় পাছগুলার অপরূপ ভ্রামণোতা; তাহারোও সকলে, বিকালে, মধ্যাহ্নে, সায়াকে রত্ন এবং বেধা পরিবর্তিত করিয়া নৃতন সৃষ্টিতে চোখের সামনে আবির্ভূত হইতেন, এদব অনেক কিছুই এখানকার এই মুক্ত দেশের মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে দেখার আছে, এবং এদের মধ্যে মিশিয়া গিয়া এদের ভাল করিয়া অহুতব ও উপভোগ করিতে সর্বাণীর বেশ ভালই লাগে; কিন্তু তাই বলিয়া সর্বাণী তো আর ‘কপাল-কুণ্ডলা’ নয়, যে কানন-বনরী আর নবগুণিতা বন-মল্লিকার প্রেমে বলিয়া মাথায়ের লল-লিপা ত্যাগ করিবে! বনবাসিনী ‘নকুল’ারও চ’লন সবী ছিল; শিলী গৌড়মী তার রোগ-শয্যার তত্ত্বাবধান করিতে আসিতেন। অনেক সময় সর্বাণী একা একা বলিয়া গাঢ় সবুজ রঙের একটা কাঁঠালী চাঁপার কোণের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আনমনে ঐ কথাটাই মনে করিয়াছে; অহুহুয়া-প্রিয়না নাই হোক, শুধু অনহুয়া কিংবা শুধু একটা প্রিয়না যদি তার থাকিত! কিন্তু কোথায় পাইবে? ও তো আর বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় না!

এর একটু পরেই যখন অতঃস্থর্যের অঙ্গ হইতে উচ্ছল লাল আলো টিক্কাইয়া আসিয়া সমস্ত

ঐকৃত্তিকে একেবারে লালে লাগ করিয়া দেয়; পাড় শব্দ, পাড় নীল, এমন কি নদীর স্বচ্ছ সাদা জল সব কিছুই সেই পাড় লালের মধ্যে বেন ছবিয়া যায়, আর বার্ণিচ ন বা টেনিসনের একখানা বই কোলের উপর খোলা রাখিয়া সর্বাঙ্গীও বিষমগ্ৰস্ত মুখে সেই লাগ আলোতে বেন বসীন হইয়া উঠে; আবার তারপরই বেন সেই অশ্রুপূর্ণ ও অপরিপাক রঙের খেলা, সেই অপূর্ণ সার্বভৌমত্ব সন্ধ্যার মাঝখানেী আঁচলের তলায় আচ্ছাদন করিয়া বলে, দূরের পাহাড়, অদূরের বনশ্রী, অনতিদূরের নদীজল সমস্তকেই ব্যাপ্ত করিয়া সরম-কুণ্ডিতা সন্ধ্যারান্তরী দূর অবগুণ্ঠনখানি নামিয়া আসে, ও একটু একটু করিয়া বেন একটা মোহময় আবেশের আবেষ্টনে আবিষ্ট হইয়া এতদশব্দকার কণ্ঠ-তৎপর সচল বিশ্ব তাহারই মধ্যে ধীরে ধীরে চলিয়া পড়ে, সর্বাঙ্গীর এই শারাস্বত ধরিয়াই বেন মনে হইতে থাকে, কি বেন নাই, কি বেন হইল না, কিসের বেন একটা মন্তব্য ফাঁক বহিয়া গেল! জীবনের সব-পাণ্ডার মারখানে কিসের যে এতদৃষ্টি একটা অপূর্ণতা এবং অস্বার্থকতা—তার সেই শূন্যতা! তাকে অনবরত বেন শীড়ন করিয়া চলিয়াছে! সঙ্গল সমন ধরিয়াই মন বেন মনে মনে বলে, ‘সব অস্বার্থক! সব কীকি!’

অথচ কি-ই বা তার নাই? বাপ তাকে ভালবাসেন, বড় ভালবাসেন, এত ভালবাসেন যে, সে মাটিতে হাঁটিলেও বুধি তাঁর বুকে বাধা বাধে। দাদ-দাদী, অশ্বন-বসন, অলঙ্কার-প্রসাধন কিছুই তার অভাব নাই, অথচ মন কেবলই তার কাছে নাগিন জানাইজেছে—নাই, নাই, নাই!

এতটা বুৎবুতে হওয়া সাহসের পক্ষে ভাল না! মা নাই, কি ভাই-বোন হয় নাই, তার ভক্ত কে কি করিতে পারে, বল? বা’ জুটিয়াছে আশ্রয় মিটাইয়া ভোগ-কর, তা’ নয়; অনেকের পক্ষে চুল্লীত অনেক কিছুই তো পাইয়াছে, সে দিকে না চাহিয়া, কি নাচ নাট। তাকারই ভক্ত বুণ্ডার আর অভিমান

করিতে বলা! হাতের মধ্যে সেটা পাওয়া যায় সেইটাই নাকি নেহাৎ সত্তা হইয়া পড়ে, তাই এসব নজরে চোকে না, না? জুর বাপ, ভোর করিলেই কি কপালের মেঘা মুছবে?

সাবী একটা জুটল। হু’মাইল দূরে মাহলীপুরে থাকে, সামান্য কাটা বেগুলালের বাপরা-ছাওয়া বাড়ী, বাড়ীর গায়ে তরিতরকারির সঙ্গে গাঁদা, দোশাচী, রসুনীপক্স আর একটা কুন্ধকো-লতার বেড়া বেগুলা বাগান আছে; একটা চালায় গু-গুলি গাই-গরু আছে। এখানকার ফুল-মাঠার এবং তার ব্রী মণিক। মাঠারের নাম শিবেশ্বর। শিবেশ্বর ভালমাহুং গোছের লোক, চলিত কথাই থাকে বলে গোবেচারা। তা’ হোক তার ভক্ত লসার-খণ্ডে কিছু অটিকার না। মণিকার কাজ চালাইয়া লওয়ার ক্ষমতা আছে; গভী অক্ষম হোক, মণিকার চাতে পড়িয়া মাঠের আঁড়ের ছেলে শিবু দিনে-দিনেই মাহুং পড়িয়া উঠিতেছে; কিন্তু এদিকে ভাল-মাহুং হইলেকি হয়, শিবু-মাঠার বেশিন রাগে, মণিক। বত বড় লজ্জা মেয়েই হোক, তাকে বাগ মানাইতে পারে না। এসের একটা ছোট ছেলেও আছে, তার নাম মণিক। মণির ছেলে মণিক হওয়াই তো সঙ্গত!

সর্বাঙ্গী এর আগে বাপের সঙ্গে দৈ-লগরে থাকিত, সেখানে একটা ক্যাথলিক কনভেন্ট ছিল। সেখানেই সে পড়িত; এখানে আসিয়া ফুলে পড়ার কোন সুযোগও নাই, ফুলে পড়া তার শেষও হইয়া গিয়াছে। কলেজে যোড়ার হইয়া থাকা তার মনোপূত নয়, বাপকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে; কিন্তু ভাল মাঠার ছাড়িয়া এখানে মন মাঠার গুচ্ছ যে পাওয়া যায় না, তার কি? হু’মাইল দূরে সহরে ছেলেদের ভক্ত যে ফুলটী আছে, তারই মাঠার মশাইরা এসেদের সয়ল। বাপ বলিলেন, ‘ওদেরই একজনকে মাঠার রাখি—!’ মেয়ের তা’ পছন্দ হয় না। তার বিবাহ—বাবাদী মাঠার আবার কেমন পড়া পড়াইবে? সে শিনিয়র কেব্রিউ পাশ করিয়াছে; প্রেক ভাষার মোটামুটি কথা বলিতে পারে; অংক-মথলা ধুতি আর জেপের গুচে, বাসের গুচে ভরা পিরান-পরা একটা

খাঁটি বাঙ্গালী কি-না তাকে বিদ্যমান করিবে? কি জানে সে? যদি পড়িতেই হয় তো বাপের কাছে—হ্যাঁ সেই ভাল। ইংরেজী লেখেন ঠিক ইংরেজের মতন! ফ্রেন্স অথবা জার্মানি না, হোক, তা', সেটা না হয় নিক্কে-নিম্নেই কাজ চালাইয়া গিয়া বাইবে, আর না হয় ওর বললে সম্ভব—আরে ছাঃ! ক্ষুণ্ণে আছে কি? পড়া যরা কাজের পড়া ভাষা। কং কং কং—ওগে তো পুস্তক-শুলার চাল-কলা ঠকাইয়া গইবার ফনি! ও গইয়া সর্বাঙ্গী করিবে কি? কিন্তু সত্যের যে কি বিশিষ্ট বিধান! শেষ পর্যন্ত সত্বে সেই বসন্তী নোয়া মাটার এবং পড়া ভাষারই আশ্রয় লইতে হইল। তার আই-এ পরীক্ষাটা তা' না হইলে দেওয়া হয় না। নিক্কে-নিম্নে ফ্রেন্স পড়া ভাল লাগে না, তা'তে রস পাওয়া যায় না; দূর হোক—বন্ধুত্ব, ঐ চোখ পুস্তকের স্রাব্দ করার ভাষাটাকেই দেখা বাক্। নোকে বিস্তীর্ণ্যে মামাও ও জিনাসেরও তো দেখিতে যায়। মাটার আসিল তার কখনোকে সার্বক করিয়া, বাঙালেশের মধ্যস্থিত প্রেমী বাঙ্গালীর ঘরের সাধারণ ছেলেরা যেমন হয়, এ ঠিক তেমনি, একটুও বিশেষ নাই। গায়ের রঙ, তাম্বালা; নাক-চোখ মনও না, খুব ভালও না; চুলগুলি সোজা-সোজা কিন্তু তা' ঠকাইয়া ঠা নিক্কে সিঁথে কাটা; হুতিবাণি ঘোটা। তবে মগসা পরে না, আর গায়ের যেমো গজটাও বড় পাওয়া যায় নাই। দু'চার দিনেই সর্বাঙ্গী অক্ষর চিনিয়া 'মঃ ধাখতি', 'সোঃ মধ্যরত' ইত্যাদি পড়িতে আরম্ভ করিল। মাধ্যমিকের মধ্যেই তার "ভানুরক-কিং", "কুলীরক-বক:" প্রভৃতির সহিত বহিষ্ঠ পরিচয় শেষ হইয়া গেল; ব্যাকরণ তার অনেকখানি আয়ত্তের ভিতর আসিয়া পড়িল; প্রাণান্ত পরিশ্রমের সাক্ষ্য লাভ আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া সে প্রীত হইল এবং হ'মাসের মধ্যেই তার আর মকা-পোড়নের আর স্তরের আশ্রয়ের সেকলে ভাষাটার উপর কিছুমানি বিশেষ থাকিল না। সে তখন আরম্ভ করিয়াছে "অধ্যাপকঃ হিপি সেবতাম্বা হিমালয়া নাম নগাধিরাঃ।..."

চমৎকৃত, বিস্মিত, সর্গভোগ। হইয়া সে এই ভাষা-সাধের ভূমি। গিয়া পড়িতে লাগিল,

"মহাকবিঃ পরঃশেষঃ বিপ্ণবারণমাবিলন্।

হেমাঙ্কোহনতানঃ ত্বেবাণো ধাম সাম্রজ্যং।"

মাটার মনাইকেও সে ভ্রম করিল প্রচুর। ভালমাত্র শাস্ত্রজ্ঞান কিন্তু কর্তব্যে দৃঢ় এই সামান্য ঘরের সাধারণ ছেলেরা এর মত কি কম খাটাইয়া খাটাইয়া? নাঃ, মাহু, মাহু বটে! সর্বাঙ্গী তার মধ্যমির উপলক্ষ করিয়া মাটার মনাই-এর ব্রীকে নিমগ্ন করিয়া আনিল, তার ছেলেরা একটা ভাল হাট, অনেকগুলি বেগলা, আর মণিকাকে দামী শাড়ী দিয়া তহ করিল। তারপর হইতে দু'জনে হ'লনকার বন্ধ।

মণিকা ছেলেবেলা বাঙা হুলে পড়িয়াছে; ইংরেজী বিভাগে অর-অর আছে, ক্যানন করিয়া শাড়ী পরিতে জানে; আঁচলে যে গোট আঁটে, তা রূপার বটে, ডিআইনটী কিন্তু অমৃত্যু গুহার। কামে পিশুল-পাতা পরে, বোঝকরি শাড়ীর কাছে পাইয়াছিল, মাকখানে সেকলে হইয়া আবার একালের রসভূমে প্রবেশ-বিকার পাইয়াছে, সর্বাঙ্গী তাকে একমোড়া কুম্ভোকা গড়াইয়া দিল। ক্রমে এমন হইল যে, মাটার মনাই-এর সকল মহিমাকে পরিত্যক্ত করিয়া তার গুরুপতীর সঙ্গে এমনই মধুর সখী মমিমা উঠিল যে, সে তার নাম বহিষ্ঠেই আদৃত করিয়া দিল। 'মণিকা' নামটা বেশ! সর্বাঙ্গীর মতন এমন বিলম্বটে হতভাগা নাম নয়। এমন নাম যদি ধরিবে না, তবে ধরিবে কি! নাঃ, সে হয় না, হইলই বা সে বললে হ'বছরের বড়! হ'বছর বই তো নয়, সে তো দেখিতে দেখিতেই কাটা যায়, এমন বেশ দিন তো সে নয়। আর মাটার মনাই? হইলেনই বা উনি মাটার মনাই, তাই বলিয়া ওর ব্রীকে বলিতে পাইবে না 'মণিকা'! এমন চমৎকার নাম দেখিয়া তা' হইলে বিবাহ করিয়াছিলেন কেন? সে মণিকাই বলিবে।

এদের ভালবাসা এতটাই গাঢ় হইয়াছিল যে, এদের ভিতরকার অবস্থার বাবধান সেন দূরে চলিয়া গিয়াছিল, সর্বদাই মনিকাক্ষে এদের বাড়ী আসিত হইত। সবই কি সেখানে না যায়? এককুড়ি চারাগাছ আর মানো লইয়া দিয়া সকাল বেলাই উপস্থিত, বাগানে পুষ্টিতে হইবে। তঁহিনি আচার আর শুদ্ধরীতি পোষের নিম্নের হাতে রিতে আসিয়াছে, একটা হাতের সেলাইএর আসন, একখানা ছোট টেবিল-বুখ, কাগজটা পরিপাটি, বড় টেবিল তো এঁরাভীতে নাই।.....

আজ যে তা'রা কতদিনই গত হয় সেসেপ ছাড়িয়া আসিয়াছে এখনও কেহ কাছাকাছি আসে নাই, চিঠিপত্র হু'পক্ষেই চলে। অবশ্য আগের মত ঘন ঘন নয়, তবু মাসে দু'ক্ষেপ আসা-যাওয়া করেই। সর্বাপি এক-এক সময় চুপচাপ বসিয়া বসিয়া ভাবে, কি স্থখেরই সে-সব দিন ছিল; সে-দিন যদি তার গত না হইত! অথচ সে এ'ও জানে যে সে-দিন না আসিলে হয়ত তার এ-দিনও আসিত না। বোটের উপর তার আশ্রয়ের এই জটিল অবস্থার ঐ মনিকা দেবীরও একটা অংশ আছেই তো! সে কথাটা শুধু এক-এক সময় সে ভুলিয়া যায়; হয়ত তেমন করিয়া কোন বিনই ভাবে নাই; অথচ অনেকেই হয়ত তা' দেখিতে পারিত। ভালবাসা মানুষকে অনেকটা অন্ধ করে বই কি!

(৪)

মনিকার সঙ্গে মিশিয়া সর্বাপির যে উপকার হইল তার চেয়ে বেশী উপকার হইল মনিকারই। সেখা-পড়া সে বেশী করিতে স্বেচছ পায় নাই, জীবনের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের পরিধি তার সঙ্গীর্ষই ছিল; সর্বাপির দল তাকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে বেন একটা পরিচয়ের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল। সংসারের বখা-নির্ধিষ্ট কাছ-কর্কের পর বিবানিজ্য ও মাছানিজ্য দিনগুলোকে দূর না করিয়া এখন সে দীর্ঘ অবসরগুলোকে

কাজে খাটায়। সেলাই করে, বোনে, বই পড়ে, ছেলেটিও তার ডাগর হইতেছে—তাকে অক্ষর-পরিচয় করায়; এমিকে সর্বাপিও তার কাছে সাংসারিকতার অনেক কিছু শিখিয়া ফেলিয়াছে। সে আম-ডেল, মিঠে-আমলী নিজের হাতে তৈরি করে, ফাঁরের পানচুয়া, বাজা নিজেই পড়িয়া ভাষিয়া বসে বসাইয়া বাগকে বাগুয়ার, পাচকনের সঙ্গে কেমন করিয়া চলিতে হয়, কি কথা কেমন করিয়া বলিতে হয়, সে-সবেরও বেন কতকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছিল; মা-হারাপো মেয়ে, কে-ই বা তাকে কি শিখাইয়াছে!

সুহৃদ্রন এই পরিবারটির 'পরে সমুদ্র' ছিলেন। এরা দু'জনে তাঁর মেরেকে পুঁদী করিতে পারিয়াছে, অতএব এদের যদি কোন গুণ না-ও থাকিত তথাপি এরা তাঁর কাছে অর্পের দেবদেবীর মতই বিচিত্র হইয়া উঠিত। মাতার মশাই-এর কিছু বেতন-বৃত্তি তিনি নিজে ইচ্ছা করিয়াই করিয়া দিলেন। প্রত্যাবর্তা করিয়াছিল অবশ্য সর্বাপি।

একদিন—সেদিনের কি তিথি, কোন গ্রহ কোথায় ছিল—পাঙ্গি দেখা হয় নাই, পনি কি রাহ, মঙ্গল কি পাণবৃত্ত কোন চর্মল গ্রহ এই অনন্তসহায় শিতা-পুহীর ডাগরায়নে সেদিন নিকটই উকি দিয়া থাকিবে—এমনি একটা দিনে—সেদিন আবার শেখ-আবাক্কের একটা বর্ণন-প্রায় মেঘ-মেঘের দিবসায়; যোয়ার রঙের মেঘ-কুহেলিকার সারা প্রকৃতিকে, বেন ময়লা ঢাগর চাপা দিয়া বিছানায় পড়িয়া কখনোইলা অভাগী নারীর মতই, কতক দেখাইতেছিল। পাছে পাছে বৃষ্টি-জমা জলের কৌটোগুলি হু'প্‌টা, করিয়া পড়িয়া বেন সেই বিরহকাতরা অন্ধুর বেগনার পরিচয়ে এতোক নরনারীকে পরিচিত করিয়া তুলিতেছিল। সেদিন জলসাহেবের বাগানের সমুখের জনবিরল বাগানখা আর জনশূন্য, কদাচিত কোন হাঁটুর-উপর-খুঁজি-তোলা ছাতা-মাখায় পানচাচার পথবাহী, দু' কদাচিত একখানা চটের ছেঁড়া-ছেঁড়া বোরা ঢাক। সেওমা মাল-বোঝাই গরুর গাড়ি লইয়া তার গাড়োয়ান অনবরত টক্-টক্, হেই-হেই শব্দ

করিতে করিতে হিপ্টির পর হিপ্টি মাথিয়া
পূর্ত্যার-নমিতসহে এবং কর্মমাক্তপদ্যুক্ত একান্ত
অনিচ্ছুক বলয় ছুইটাকে কোনমতে টানিয়া লইয়া
চলিয়াছিল। আকাশের পশ্চিম সীমান্তে বেলাবেগে
তক্তাবি যেন কার যোবতীর দৃষ্টিপাতের ভ্রায় মথো মথো
সচল মেঘের স্তর ভেদ করিয়া বাসো। বাড়ীর টান।
লাগানের ইচ্ছিত্যারে অর্ধপারিত সুরজনের এবং ঐ
লাগানেরই আর একপ্রান্তে পঠন এবং পাঠনশীল
শিষ্য ও ছাত্রীর মুখের উপর ক্ষণে ক্ষণে চাহিয়া
সেখিতেছিলেন। এসে হুই পক্ষের মাঝখানে যেকের
উপর মাহুর পাতিয়া বসিয়া মণিকা ছুই কাঁটার বোনার
লাল উলের একটা ছোট কোট বুনিতেন, আর তার
ছেলে মণিক টিনের কলের-বাড়ী চালাইয়া মুখে-মুখে
শব্দ করিতেছিল কু—উ ঘাস্-ঘাস্-ঘাস্।

এসের আঙ্গ সন্ধান হইতেই এ-বাড়ীতে নিমন্ত্রণ
ছিল। কথা আছে, রায়েও আঙ্গ তাদের নাকি
বাড়ী কেতা খট্টের না। এমন ঘটনা ইহানীং
নিভাই খটে।

সর্দারের 'কুমারসন্তান' শেষ হইয়া গিয়াছে। সে
এখন 'নেবন্ত' পড়িতেছিল। বাহিরেও সেই সজল
প্রকৃতি, কাবোর বর্ণনাতেও তাই চমৎকার লাগিতেন
ছিল, যে তার পরিতৃপ্ত অন্তরের প্লেকোঙ্কাস ঢালিয়া
দিয়া পড়িতে লাগিল—

“মন্ডা মন্ডা হুতি পবনচাতুর্কুলোবধ। বাং

বামচাত্তর নবতি মধুর চাতকন্তে সর্দার—” ইত্যাদি

শিবধর নভেন্দ্রে যির হইয়া বসিয়া তার সর্দারের
উচ্চারণের মাহুরা অল্পভব করিতেছিল; গনিতে গনিতে
প্রসাদ-সৌরবে তার সমস্ত চিত্ত যেন তরিয়া উঠিতে
লাগিল। এত শীঘ্র মাত্র একটি বৎসরের মধ্যে এতখানি
উজ্জ্বল—একি আর কাহারও বাহা খট্টে পারিত ?
এ ক্ষেত্রে সাধারণ মেয়ে নয়, সাক্ষাৎ সন্ন্যাসী এ ! সন্ধ্যার
পর মণিককে ঘুম পাড়াইতে মণিকা বিদ্যানার চুকিয়াছে,
সর্দারী মশারি তুলিয়া প্রবেশ করিল। মণিক অমনই

বসিয়া উঠিল, “মা চলে” বা, মাসিমা। গম্ব বগবে, মাসিমা
ডায়ে গম্ব জানে, মা জানে না।”

মণিকা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিল, বসিল, “বেশ
বাপু, তোর মাসিমা বলুক তোকে গম্ব, ঝাটি আমি,
বকে বকে ঘুম বাপা হতে দাও, চোকে আর ঘুম
আসে না।”

সুরজন বারা-বার সেই ইচ্ছিত্যারেটাতেই আধ-পোতা
হইয়া বই পড়িতেছিলেন, সামনের ছোট টিপরের উপর
চুতা বড় সামান্যনে আলো আলিয়া রাখিয়া দিয়াছে।
স্বামী-স্ত্রী আসিয়া ইতস্ততঃ রক্ষিত হু-খানা চোয়ার টানিয়া
লইয়া বসিয়া পড়িল। সুরজন একবার চাহিয়া দেখিলেন,
আবার যেমন পড়া চলিতেছিল তেমনই চলিতে লাগিল।
তিনি খেলী কথা বলার লোক নহেন, অপ্রয়োজনীয়
কথা বড় একটা বলেন না।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকিয়া মণিকা ঈষৎ সংগ্ৰাহের
স্বরে ডাকিল “কাকাবাদু!”

সুরজন মুখ তুলিয়া তার দিকে কিরিয়া তাকাইলেন,
তার জিজ্ঞাস্য দৃষ্টিই তার হইয়া প্রশ্ন করিল।

“গব্ব বিয়ে কি দেবেন ? একটি ভাল ছেলের
খবর পেয়েছি। সব রকমে ওর সঙ্গে বেশ মিলবে।
আবারই সম্পর্কে লেওর হয়।”

সুরজন অবস্থান এই অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবে বোধকরি
বেশ একটুখানি বিমম্বাহতব করিলেন। যেন এ-পর্যন্ত
এ-বিষয়ে তার ভাবনার কোন কারণই খটে নাই, এমনি
ধায়া মুখ করিয়া তিনি একটুক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া
থাকিলেন, তারপর ধীরে ধীরে অতি চিন্তিত ভাবে প্রশ্ন
করিলেন, “ছেলেটা কি করে ?”

“এ—এসি পাশ করেছে ; কাছকর্ষ এখনও কিছু
করেনি ; ওবুহি কোখার নাকি কেমিটার প্রেসের
হয়েছে, শিগ্গিরই সেখানে যাবে। আমার ল্যাং-বগুর
—নিজের নয় পিসুতো, তাঁদের অবস্থাও ভাল—সেদিন
একখানা চিঠি দিয়েছেন ; তাতে তার ভ্রাতৃ একটা ভাল
মেয়ে খোঁজবার কথা লিখেছেন ; তাই আমার সর্দারী
কথা মনে হ’ল।”

হৃদয় আবার কিছুক্ষণ নীরব চিন্তায় পর প্রের
করিলেন—

“ছেলেটাকে তোমরা নিয়েয়া দেখেছ? স্বভাব
ভাল, চেহারা কি রকম? বাপ খুব কৃপণ নহে তো?”

মণিকা হাসিয়া ফেলিল, সহান্তে কহিল—“সে সবই
ভাল না হ’লে কি সত্তর ঘণ্টে বলুতুম? আপনি তো
জানেন সবুকে আমার কত পেরে করি। আমার আট-
ষট্ঠরই এঁকে মাথায় করেছেন, মা-বাপ ছোট বেলায়
মাঝে যান কিনা; পয়সা একটু ভালবাসেন, তবে
কৃপণ নন।”

হৃদয় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর কোন কথাই
কহিলেন না, কি জানি কতকিই না তিনি তারিতে
লাগিলেন। খুব লম্বা নহ, তবে অনেক কিছুই বেন
আব্বা-আব্বা ভাসা-ভাসা অতীতের দৃষ্টকারী হুতির—
সে হুতিকে তিনি তাঁর মনের মধ্যে প্রের দিতে প্রস্তুত
নহেন, তেমনি সব অগত্যা তিনিষের দু’চারটে টুকরা
বেন চকল বিছাতের মতই মনের মধ্যে চলাচল করিতে
লাগিল। বর্তমানের, তারপর ভবিষ্যতের একটা অপ্রিয়
অবস্থার ছায়া! ঐহব একটা নিঃশ্বাস উঠিয়া আসিল,
ঘীরে ঘীরে সেটাকে মোচন করিলেন। একবার
বাধিরের (তখনও) মেঘবাণ্ড কালিমাগ নীরব,
আকাশের দিকে তাকাইলেন, প্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র-সুগের
চিহ্নও নাই, সব একাকার করিয়া একমাত্র অন্ধকারময়
পৃষ্ঠতা বিস্তার করিতেছে! কিরিয়া চাহিলেন,
দু’জনকারই দৃষ্টি সমুৎসুক হইয়া তাঁহারই মনোভাব
পর্য্যবেক্ষণে নিয়োজিত। ঝিকাকে আর মনের মধ্যে স্থান
দিলেন না, একবারেই নিশ্চিত নিরাসর চিতে বলিয়া
ফেলিলেন,—“আমার মত আছে, তাঁদের লিখতে পার ;
কিন্তু সবুকে এখন কিছু ব’ল না। সে আমার ব’লে
রেখেছে, সোনা-ধানার মতন তাকে যারা বাচাই করে’
নিতে চাইবে, সে তাঁদের বউ হবে না। তাকে তো
জেন।”

হ্যাঁ, সর্গাণীর একটু জিন আছে বটে, তবে সে
এমনই বা কি বেশী? মেহাকুর বাপের মন তাকে

পুণিবার সকল অসম্মান হইতে ঢাকা দিয়া রাখিতে বসটা
বাগ, সে নিজে হুত তত বেশী নহে, কারণ সে তো
যোকা যেতে নহ! মনে মনে ঐশ্ব্য হাসিয়া মনিকা
প্রকান্তে পিতার লিখিত সহায়তীত জানাইতে বাকি
রাখিল না। সে প্রস্তাব করিল, ছেলের বাপকে তার
বাজীতে আনাইয়া সে সর্গাণীকে নিমন্ত্রণ করিয়া সেখানে
লইয়া বাইবে। দেখা-শুনা হইবে, কিন্তু সর্গাণী তার
খবর পাইবে না।

প্রস্তাবটী বড়ই সমীচীন ঠেকিল; এ রকম সুযোগ
অল্প মিলিবে না, এই মনে করিতেই হৃদয়নের মনের
সকল বিভিন্নসুখী চিন্তা একসুখী হইয়া এট প্রস্তাবিত
বরপায়টাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া লইল। ছেলের ক্ষেত্রে
আনাইয়া দেখা দেণ, সে সুখী পূর্ণ। সুখী তার
কোনমতেই মন হইতে পারে না, এক পারে রঙ; তা-ও
যখন পিবেধর আর মণিকা ওঁকনে বণিজেছে, তখন
নিশ্চয়ই রঙ তার কালো নহ। বরের বাপের সর্গাণীকে
পছন্দ হইয়াছে, এত পছন্দ হইয়াছে যে, তিনি অগাধ মাস
পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিতে প্রস্তুত নহেন। পর
দিয়াছেন, তাহাতে লাভ কথার সঙ্গে একটা শাস্ত্রীয় যুক্তিও
সেখানে হইয়াছে—“ওতত শ্রুত”—যুক্তি। খাটে বেণ,
ওনিতেও ভাল, কিন্তু ইহারই বাকি অর্ধেকটাকেও এই
সঙ্গে বেন মনে পড়াইয়া দেয়। “অওতত কাণহয়নম্”
এ-ও তো খুব অযৌক্তিক ব্যবহা নহ! জাবিয়ার
কথা আছে বৈকি! চিঠি পড়িয়া হৃদয় অনেক বার
মাথায় হাত লুটাইলেন (অবশ্য নিম্নেরই মাথা), নাড়ি
গমাইতে দেয়া হয় নাই, চিন্তকে আবুল গণিয়া বণিয়া
অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন; — তারপর মণিকাকে
তাকাইয়া বলিলেন,—

“এত ডাকডাকি হ’লে উঠবে কেন? আমি বলি
কি অগাধ মাসেই হোক।” উত্তর মণিকা ঠিক করিয়াই
আসিয়াছিল, বলিল, “ও যে বড়ছেলে, অগাধ মাসে তো
বিষে হয় না।”

সমস্তার কথাই! “দৈর্ঘ্যেই” তো ঘোঁঠপুতের বিধে
হয় না জানা ছিল, আবার অগ্রহায়ণও যে সে-পথ বড়

করিয়া বসিয়া আছেন, পুরুষ মানুষ হ্রস্বজন তা' কেমন করিয়াই বা জানিবেন? আশাও মাস তেও ফুরাইয়াছে, মণল আছে ঘর-প্রাথের স্তম্ভিত করা দিন কয়টা। আচ্ছা তাই হোক! ছুটির সবথার কাশই লেখা হইবে, যদি মন্থর হব, কলিকাতার যদি বাড়ী পাওয়া যায়, "ভক্ত ভক্ত"ই হোক।

আর তেও সর্বাঙ্গিক লুকাইয়া রাখা চলে না। সব কথাই তাকে বলা হইল। হ্রস্বজন নিজেই বলার ভারটা হাতে রাখিয়া ঐ বিকক-মন্দতির হাতে শুভ-বিবাদের আর সমস্ত ভারই ছাড়িয়া দিয়া একেবারে নির্মিচায়ে নিদ্রিত হইয়া রহিলেন। তাঁর বিখাল রহিল, তিনি যে-কাগজটার ভার নিজের চোখে রাখিলেন, সেই ভারটাই এ বিবাহ-বাণীরের সর্গাপেক্ষ! বেকী কটিন ও মটিল সমজামকন মজার। নিশ্চয়ই পানি সেবিস্য নয়, অব তাঁর মনের মধ্য হইতে কাছাকাছি যে-দিনের যে-সময়টিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হইল, তিনি সেই সময়টাই বেয়েকে কাছে বসাইয়া, অনেক ভাষণগড়া করিতে করিতে নিজের বলব্যাটকে বেশ গোছ করিয়া দিয়া, তারপর তাকে তার আসন্ন-প্রায় শুভোৎসাহের স্তম্ভবাদটা অত্যন্ত কুণ্ঠিতমুখেই প্রকাশ করিয়া জানাইয়া দিলেন। নিজের বয়ঃকৃতি, শারীরিক অপটুতা, ভবিষ্যতের অনির্বেত্ততা—সব কিছুই বলিতে থাকি রাখিলেন না; তারপর কার্য-কারণের সমস্ত সেবাইয়া গভীর ভাবে একটা নিশ্বাস কেবল মনে মনে নিজেকে মাঝনা গান করিয়া ভাবিলেন, একটা মতবদ্ধ কর্তব্যের সমাধান করিতে পারিয়াছেন। মেয়ের হাত ছুঁই নিজের একখানি হাতের মধ্যে ধরিয়া তার ঈশ্বর মতকের উপর আর একখানি হাত ক্লাইতে ক্লাইতে গভীর সেহলুর ঈশ্ব বাথবাথ কর্তে অতি দীর্ঘে বলিলেন,—

"বেশ ভয়লোক, তোমার একটা দিন মাত্র নিবেদনের বাড়ীতে সেখ সেছেন, টাকার কথাই তোলে ন; নবর পেরেছি সব দিক্ থেকেই ভাল, তোমার হস্ত অমত হবে না? যদি কিছুমাত্র

আপত্তি থাকে বল, আমি এতদিন ঠেসের জবাব দিই নোব। কিছুমাত্র যদি থাকে বলতে দিখ। ক'র না, কিছুমাত্র যদি থাকে, বুঝে যা।"

সর্গাণী তা' বুঝিয়াছিল। বাপের মনের কোন কথাটাই বা সে না বুঝিত? অলকাল নত মতকে নীরব থাকিয়া তারপর সে ষাফ তুলিয়া বাপের মুখের দিকে চাহিল, কোন দিখা না করিয়া, কিছুমাত্র আপত্তি না জানাইয়া পূর্ব পরিচার সহজ শব্দেই উত্তর করিল,— "না বাবা! আমার কোন আপত্তি নেই।"

হ্রস্বজন বেন হঠাৎ চমকাইয়া উঠিলেন। এ বেন প্রত্যাশা করেন নাই। এত শীঘ্র এত সহজে এতনি করিয়া—! গোখের দৃষ্টি ঈশ্ব বিক্ষিপ্ত হইয়া আসিল, দুই চোঁট ঈশ্ব বিতক্ত হইয়া রহিল, কিছুক্ষণ একটা কথাও কহিতে পারিলেন না, তারপর বখন পারিলেন, ঈশ্ব একটু সতকন হাসি হাসিয়া আবার নিজের শিথিল করণ্টু মেয়ের বগাফানে সন্তত হাত ছ'খানি গাণিয়া ধরিয়া বেন কিছু বাগ্রভাবেই কথিয়া উঠিলেন,—

"টিক করে' বলি' মা! তাড়াতাড়ি বা' হয় একটা বেন বলে' কেলি' নি। ভাল হবে মনে হ'চ্ছে তো? এ না হয় কি ছেড়েই যোব? বেনী শিশু'দিত হ'য়ে যাচ্ছে না?"

সর্গাণী তার অচল কালো ধরিত-গোখের তারা হ'টা বাপের উত্তমনা-বায় গোখের উপর স্থির করিয়া একাডই অহুত্ব ঈশ্ব কর্তে জবাব করিল,—

"মন্দও তো কিছু মনে হচ্ছে না, বাবা! তাড়াতাড়ি আর এমন বেনীই বা কি হবে?"

"হবে না তো? তা হ'লেই হ'ল। আচ্ছা আমি পিলুকে একটা চেক লিখে দিই, নিয়ে কলকাতায় যাক; তোমার কাকাদের টেলিগ্রাম্ করবে' দিই একটা বাড়ী টিক করে দিতে—হ্যাঁ ভাল কথা, পহনা কি রকম হবে, সে তুমিই টিক করে দিও, কি বল? আর যে-নব দিতে হয় সে আবার কে টিক করবে? ওঁরা তো কিছুই চান নি, আর চাইবেনও না। কিন্তু, সেই জন্মেই

তো আরও ভাল করে' দেখে' শুনে' দেখা চাই।—
দৃষ্টি!"

স্বরজন নিম্নের গৃহস্থ তুলিয়া লইয়া আবার
একবার কেশবিরল মাথাটাকে চুসকাইয়া ঢাকা করিয়া
গইতে চাহিলেন। তা' করার ইচ্ছিত বৃত্তিতে তো
সর্গাণীর আটকাই নাই; সেও বাপের মনোপাত ভাব
বৃত্তিগাছিল, বলিল,—“তুমি কিছু ভেবা না, আমি
সমস্ত কর্ণ করে' দিচ্ছি; ওদখ আমি মলিনাদি'র
বিয়ের সময় দেখেছি।”

মলিনাদিদি সর্গাণীর এক পুড়ুতো বোন; বছর-
খানেক হইতে যার তার বিবাহোপলক্ষে ইহার।
দেখে গিয়াছিল।

স্বরজন বেন অকূল সমুদ্র হইতে কুলে নামিলেন;
এই মেয়েটাই তো তাঁর সকল দিকের একান্ত লক্ষ্য।
পাছে নিম্নের বিবাহে সে বহুবালার আত্মবিক লক্ষ্য-
সরমের দ্বায়ে নির্দিষ্ট থাকিতে চায়, (তার স্বাধীন
ইচ্চার উপর হস্তক্ষেপ করা তো আর স্বরজনের
সাধ্য নয়) সেই ভয়েই তিনি মেয়ের বিয়ের দ্বায়ে
বাস্তবপক্ষেই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। এখন
নিম্নের কাম সে নিম্নের হাতে তুলিয়া লওয়া এক-
বারে বেন বাঁচিয়া গিয়া বন বন চুকট টানিতে আরম্ভ
করিয়া গিলেন। সর্গাণী এখন সব তার গইয়াছে,
আর তাহাকে সাহায্য করিবার ক্ষমতা শিবেরবাও
রহিয়াছে, তখন তাঁর আর ভাবিবার কি আছে?
মেয়ের বিয়ে তাঁর হইয়া গিয়াছে ভাবিলেও ভাবিতে
পারা যায়!

সর্গাণী বাগকে যে কথা বলিল, কাষেও তা'তে
কুল করিল না। একখানা সমস্ত কর্ণ সে
লিখিল। বরের রিট-ওয়াচ, হীরার আঙী, বেনারসী
ঝোড়, একটা শোবার ঘরের মতন ফাঁদার, আর
নিম্নের ক্ষম সোনার হুঁসোড়া স্ত্রী চুড়ি, মক্চেন,
কার্দিগু তাগা, সোনার স্রিগ, কাঁটা, ব্রোচ, একছড়া
আটপোরে সব বেক্লেস, আর হীরার একটা মোড়া-
নুল। বাগকে কর্ণ আনিয়া দেখাইতে স্বরজন বেন

কতকটা হতাশ হইয়া পড়িলেন। একবার, চ'বার,
তিনবার কর্ণটা আগাগোড়া পড়া হইয়া গেলে চিত্তিত
মুখে প্রশ্ন করিলেন,—“একি নেহাৎ কম হবে না?
তুমি যা কর্ণ করেছ, ও তো হাজার-তিনকের ভিতরের
মতনই মনে হচ্ছে; হচ্ছে না, মা? আচ্ছা হিসাব করে'
দেখো; কি লিখেছ? কত ভরি? চুড়ি মণ+মণ=চুড়ি
ভরি। সোনার সব কত ধরেছ? ২০+? আচ্ছা, হ'ল
তা হ'লে ৪০+; ও: বামি আছে, হ্যাঁ সে কত টাকা?
৮০? মোটে? মত কম? মত কমে ওদখ জিনিষ
কেমন করে' গড়ে? হয়? ভাল হয় না তেমন বোধ
হয়? যেমন সেই তোমার একবার আমি নিম্নে
গিয়ে কিনে নিয়েছিলাম?”

সর্গাণী খুব টিপিয়া ঈং হাঙ্গিল। সেই যে
এবার বছর বয়সের জন্মদিনের সময় তার বাবা
নিম্নে মোকানে গিয়া তাকে একঝোড়া সব সোনার
তারের বালা পছন্দ করিয়া কিনিয়া গিয়াছিলেন,
তারপর হইতে আত্মিকার দিন পর্য্যন্ত এখনই কোন
পছন্দ-সই ভাল জিনিষের উপস্থিতি মিলার দরকার হয়,
তিনি ঐ কথারই উল্লেখ করেন। হাসি চাপিয়া
আত্মবিক মুখ করিয়া সর্গাণী জবাব দিল, “কম হবে
না, বামি এখন সস্তা হয়েছে।”

“ও: তাই বোলো!” বলিয়া স্বরজন বেন হাঁপ
ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কিন্তু বতই যা' হোক, তাঁর
একমাত্র মেয়ের বিয়ের কর্ণখানা তাঁর খুবই মনোপুত
হইতে পারে নাই। একি একটা সেওয়া? যার ক্ষম
সর্ব্বই দান করাতেও আপত্তি নাই, তার বিবাহে খরচ
হইবে মোটে তিন, মাড়ে-তিন হাজার? ভাল দেখার
কখন? সমস্ত? না, নিশ্চয়ই না। মণিকাকে
বলিলেন, শিবেরবাও জানাইলেন। শিবেরবা চূপ
করিয়া থাকিল, মণিক। তাঁর মতকে প্রশ্ন ভাবেই
সমর্থন করিল। তার মতে, হীরার হাটে পছন্দ,
হাজার টাকার নমস্বামী মূল্যবান, বরাভরনে হীরের
বোতাম, বড়ি, বড়ির চেন, রূপার শুধু পাশা বেশাশ
বাটী রেকাব নয়, বড়া পাছ পুরাপুরি সেট; আর

ফাগিটারেরও একটা ড্রেসিং রুম এবং ড্রইং রুম মাঝানোর সেট ওর সঙ্গে যোগ করা চাই। হ্যাঁ, পরীবার ঘরের মেঝে-বউ হইলো কি ওর, মেঝেটার নকশা আছে।

সর্দারী সেই ঘরের কাগজখানি হাতে নিয়া ফেরে আসিল, ডানহাতে একটা মুখবড় পেন্সিল।

“মাক্কা, বাবা! ওকের ঘরে কি মা আছেন? তা’ হ’লে শুকে একটা পেন পরদের শাড়ী দেওয়ার বিধি আছে, আর সব আত্মীয়দের জন্তে খোয়া মিলের কিংবা কোরা তাঁতের বেগ চকড়া-পাড় সেখে সেখে শাড়ী নিতে হবে। পঁচিশ খানা, আর দশখানা খান দু’টি যথেষ্ট! ওর বোনী আত্মকাল কাক আত্মীয় থাকে না। আগে ওনেছি, একশো খানা দিতে হ’ত, তখন পাড়ার লোককেও অপনার মনে কব্—সেদিন নেই—হ্যাঁ ভাল কথা; বোন বেই তো? নন-ওয়েমী না। নিজে আবার ভারী দোষ হয়; মলিনানি, বেচারীকে ঐ অশুভে কাম কথা ওলুত হয়েছ! পাক তো ক’জন একবার খবরটা নিও।”

সুহৃদ কৌনুদিক দিয়া কপাটা পাড়িবেন দ্বির করিতে না পারিয়া মাথাটা একই চুলকাইয়া, একবার উর্দ্ধদৃষ্টে কড়িকাঠ পানে তাকাইয়া, পরে সাহস লগ্নে পূলক কল করিয়া বলিয়া কেলিলেন, “তা’ নেবো, তা’ হ’লে শাড়ীয়ার একটা বেনারসী আর নন-ওয়েমীতে একটা করে’ সিনি আর একখানা করে’ বেনারসী শাড়ী দিলেই হবে। ভাল কথা, শাড়ীগুলোর জন্তে কি বেনারসেই লেখা হবে? না, লোক পাঠাবে? তোমারও তো চ’পাখানা চাই!”

সর্দারী ঠোঁটের দু’পাশে ঈষৎ চাপা হাসির ছুইটা বিদ্যুৎ-রেখা স্মৃতিত হইয়া উঠিল, “এসব আবার কোথায় তুমি শিখতে সেলে, বাবা? এসব আবার কি? নাঃ, সাধা শাড়ী আর চারটে করে’ টাকা, বাস! কেন, দেখনি আমাদের মনীষার বিয়েতে আমরা কি পেয়েছিলাম? মোটে দু’টাকা করে’। নিছের নন ক’জন ওসু ওর সঙ্গে একখানা করে’

শাড়ী। আর মা’য়ের পক্ষে পরনই ডের হবে। বেনারসীর কড়িয়াস শাড়ীও দিতে পার, দেখতে ভাল হবে, আপত্তি নেই; কিন্তু আমার পাঁচখানা বেনারসী একদলে কি চবে, তনি?”

সুহৃদনের মনে সাহস বাড়িতেছিল, একটু ধোর করিয়াই বলিলেন, “কি হবে, কি? শব্দে তুমি। নেহাৎ তুচ্ছ তাবে তো আর আমি তোমার ভাবের বাড়ী পাঠাতে পারব না। তুমি বা’ ঠিক করেছ, ওর উপর হীরের হাট এখন। আর বরেরও কিছু; তা’ ছাড়া বাড়ী সামান্যের ফাগিটার, রপার দু’সেট বাসন, আরও দরকারী অনেক কিছুই দিতে হবে। তারা এখন কিছু চায়নি, এ না তাবে যে, চায়নি বলে’ ঠেক পেল।”

সর্দারী সেই ঈষৎ স্মৃতিভাষার স্বগার হাসিতে তরিতা উঠিল। সে ভীতস্বরে তৎক্ষণাৎ দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “যদি সত্যিই তারা কিছু না চেয়ে থাকে, আমার ফর্দই যথেষ্ট হবে; আমাদের মত অবস্থাপন্ন মেয়ের বাপরা বা’ দিতে পারে, ওদের মত মেয়ের বাপরা তা’ পাবার অযোগ্য মন। মেয়ের বনন বাপের বাড়ীতে মজ পাওনা নেই, তখন বিয়ের সময় অবস্থা মত ব্যবস্থা করে’ বাপ তাকে কিছু-কিছু ধেবেন বই কি; কিন্তু যদি তাঁদের এ-মতলব থাকে যে, এ-মেয়ের তাই-বোন নেই, না চাইতেই ডের বেশী পান এবং তার মধ্যেও আবার একজন প্রতিনিধিকেও যথাস্থ রাখা হ’য়ে থাকে, তা’ হ’লে অবশ্য তার কথা বড্ড! কিন্তু আমার এখন তার দিচ্ছে, ফেরানো চন্দ্রের না; বা কহব, আমিই কবব, মদিকা বর-পক্ষের লোক, তার মতে এসব হ’তে পারে না।”

সুহৃদন একেবারে তক্ত হইয়া পেলেন। তার বে আর বদল হইবে না, তা’ জানাই ছিল; মনের মধ্যে কিছু অনেকটা অস্বস্তি জন্মিয়া উঠিল। অমন ছেলে, ভাল বর, এত কমে যদি তা’রা—নাঃ, মেয়েটাকে বুঝাইতে হইবে।

চোঁচ করিয়াছিলেন। মেয়ে ব্যক্তিগত না; সে বলিল, “রপার সেট, হীরের হাট, ওসব পরীষ বামুনের

থবের ক্ষতে নব, বাবা! ধনী কারুহৃদয়েরই ওসব রীতি। আমাদের গবে ক'জন মেয়ের বিয়েতে মন হাজার টাকা খরচ করবার যোগা, বল তো? তিন, পাঁচ-তিন এই যথেষ্ট! কেন তাব্ব? ভ্রমলোক হ'লে এতেই লজ্জা হ'তে বাবে। আর না হ'লে কুমি কুবরের ভাণ্ডার ভেগে দিতেও পার পাবে না।”

স্বরজনের মন বুলিল না; কিন্তু তিনি স্তম্ভিত-ভরক পরাত হইয়া অগত্যা নীরব রহিলেন।

চুটী নব্বু হইয়া গেল, বাড়ীও মিগিল। গড়কুতা ভাইয়ের মধ্যে হু'একজন সপরিবারে আগেই আসিয়া বাড়ী মগল করিলেন, হাট-বাড়ারও প্রচুর ভাবেই করা হইল, সানাই-বাগ্‌পাইপের করমাস, সন্দেশ-দরবেশের করমাস—সবই হইতে লাগিল; অনেক দূর-দূরান্তর হইতেও আশীত, বহু, কুইথ, তত কুইথেরা আসিয়া আসিয়া বর-বার, ছান-উঠান ভরাইয়া ফেলিলেন। এদিকে খাড়া-প্রাণের বর্ণণ-খারাও অবিশ্রামে চলিত লাগিল। খানা-পুহুর তো ভরিলই, ‘গালদীবা’, ‘গোলদীবা’ ভরাইয়া অবশেষে বৃষ্টির মল কলিকাতার রাস্তা-পথ-ঘাট নিকিচারে চুবাইয়া দিতে লাগিল। বিবাহ-বাড়ীতে ব্যাগ্‌পাইপের বাজনা, সানাইয়ের তাল—কোন কিছুই তাল ভাবে মমিয়া উঠিল না; তুতুতাক, বাটী-পোতা সব কিছুই হইতে লাগিল; কিন্তু বৃষ্টির আর ধরণ নাই। আকাশ যেন আঁধা হুটা হইয়া গিয়াছে, অথবা দিব্যাক্ষনদের চোখের মধ্যে ধত মল মমিয়া রহিয়াছিল, সমস্তটাই যেন নিঃশেষে আঁধা এই বিবাহ-বাড়ীটার উল্লেখে তাঁ'রা অবাধে ঢালিয়া দিয়াছেন। থাকিয়া-থাকিয়া উল্লা উল্লরে' হাওয়া উজ আর্ক-নিমানে হাঁকিতেছিল, ‘হা-হা-হা’; লমটা কানের কাছে পৌঁছিয়া ঠিক যেন শুনাইতেছিল, ‘না-না-না’; কিন্তু কি যে সেই ‘না’, এইটুকুই তাল করিয়া বৃষ্টিতে পাতা ঘাইতেছিল না, এইটুকুই না সৈব-বিফনা। বিবাহ স্থিরীকৃত হইবে না, ইহারই ‘না’, অথবা বিবাহ দিও না, এত বড়ই সে ‘না’? কে জানে? কে বলিতে পারে?

মৈবের পক্ষে মৈবজ্ঞাই ধরিতে পারেন না, সাধারণ লোকে আর কি পারিবে? তবে এই সব নানা দিক্‌ দিয়া বিচার করিতে করিতে মনের মধ্যে কি যেন একটা অপরিণীম অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন স্বরজন, আর করিতেছিল মণিকা। তার অবশ্য আধি-ঐগবিক ছাড়িয়া আধি-ভৌতিক কারণও কিছু কিছু ছিল; স্বরজনকে সে সেকথাটা গোপনে জানাইতেও ক্রটি করে নাই এবং তাহাদের হু'জনের ভিতরে আরও গোপনে একটা রকার কথাবার্তাও হইয়া গিয়াছে; তথাপি মন তার ভালরূপে শান্তি পায় নাই। সর্গাশীকে আরও কয়েকবার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, ঐ ছেলেকে পত্ররূপে পাওয়া যে তার বস্তুত সৌভাগ্য, সে-সবছরেও হিসাব খতাইয়া, নম্বর দিয়া সঙ্গমাণ করিয়া দিতে ক্রটি করে নাই যে, সর্গাশীর ব্যবস্থা তাকে ঠাঁকিতে ফেলিতেছে। অস্ত্র এক বাড়ীতে গুঁরা গুণে পাচোড়ার টাকা নগদের সঙ্গে সোনা হুট, হীরে হুট গহনা ইত্যাদি পাইতেছিলেন, শুধু সর্গাশীদের কথা দিয়াছেন বলিয়াই তাহাদের বিব্রুণ করিতে হইল, অতএব ক্ষতি-পূরণটা সর্গাশীদের করা উচিত। সর্গাশীর কিয় সেই রকমই ধস্তাধস্ত পণ। সাধারণ ভ্রমলোকের পক্ষে বড়টুকু সম্ভত, তার চেয়ে বেশী পণ দিয়া সে বিবাহ করিবে না। “চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী”—এ জানা কথা, মণিকা রাগ করিয়া নীরব হইল। কাকীমা-পিদীমা'দের মধ্যে অনেকে বলিলেন, “সবু আমাদের আভেল আছে, বেশ করেছে; এমন না হ'লে লেখা-পড়া দেখা! এই ধরো, গুর বিয়েতে অধিক্ত মন ছেড়ে ভাস্কর-ঠাকুর (অথবা দাদা) বিশ হাজারও খরচ করতে পারতেন, কিন্তু তার পরদিন আমাদের মেয়েগুলোর মশা কি হ'ত? ওদের ক্ষতেও ঐ রকম দাবী উঠত তো? না; এ ভালই করেছে।”

আবার কেহ কেহ মূখ বাকাইয়া বলিলেন, “তা' ঘাই বলো, নব্বর একটা মিনিবই আশাদা, নব্বর কি

দবার থাকে? আর সবই এখন যেহেঁই থাকে, তখন একটু সামিরে গুছিয়ে নিলে পাচকনে তুণ চোখে দেখত! কিপটে স্বভাবও একটু আছে, আর তা' ছাড়া এখন ওগব নিলে কুইমকেও কিছু দিতে হবে কিনা, তাই সেটা খাচালে। সপু চালাক কি কম!”

সকালী ছ'রকম কথাই গুনিল, ভাল-রকম কোন কথাই বলিল না, সে বরং মলিনার সঙ্গে মিলাইয়া এক রকমের শাড়ী কেনা, এক ওজনের পহনা পড়ানোর ব্যবস্থা করিল। তপার দান, পিডল-

কাসার ঘর্ষ সেজ-কাকীয়ার বাজ হইতে চাচিগা লইল এবং ননদ-ক্ষেত্রী আর নমদারীর ভার দিল সেজ-কাকারই উপর। তার মলিনাদি'র বরটা কিন্তু সারেশ্বের ছাত্র নয়, আটের। এ-এ পাশ করিয়া সে-ও পোরানিঘরে প্রবেশের হইয়া গিয়াছে। বিবাহ-উপলক্ষে ছুটি লইয়া সে-ও এখানে উপস্থিত হইয়াছিল। তা' আসাতে কোন কুলে কাহারও তো বাকি ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি শান্তিনিকেতন *

শ্রীকালিদাস রায়

দুবনডামার মাঠ,—কত মৃগ হ'তে ছিহ্ন পড়ি',
নিখম পল্লবতলে জীর্ণ নর-কঙ্কাল আঁকড়ি,
নিশ্চেষ্টে দহ্যার দল পুকাইত মোর শুশ্রূষনে,
পবিত্র তেজস্বল চীৎকারি' উঠিত ক্ষণে ক্ষণে,
করত খুঁজিত পেহু দুর্গাধুর দিনের বেলায়,
ক্রৌঞ্চেরা সেবিত রৌত্র, রাখালেয়া মাতিত খেলায়,
অধিনকুলের ঘণ্টে খোঁপিতাল নবর-কোবিত
এ রূঢ় তাক্তের বণ্ড। ভাঙ্গা তার একি আশাভীত!
কেমনে সন্ধান পেলে, বাহিরে আনিলে জুমি টানি'
বজ্রি পুস্তক-বৃত্ত রসরাজ-সিঁহাসনখানি
তাহার অন্তর হ'তে? পূর্ণ ছিল বসীকের গুলে
অমর তার, বিদ্যারি' তা' অভিনব স্নোজ-কোমলসে
বাহিরিল রম্যারা,—বোঝিয়ারা দুলত তার সাথে,
জানি না কে সমাহিত ছিল তার অখণ্ড-ছায়াতে!

নব নিরঞ্জন! মনে তুমিয়ার অশূর্ণ মিলন,
তমস্বিনী মাথে হেথা নিরঞ্জন বিবার মতন,
সম্ভা কিরিয়া গেল হারা কণ্ঠ বেন এ ভারত,
একসাথে উচ্চারিত চৈত, মঠ, আশ্রম, নন্দ

নবমৃগ-মর্যোদয়ে। বত মৃত্যু উল্লীরের মূল
ভূ-পল্লব তামি বোঝে পুণ্ড্রমে করিল আতুল।

তোমার চরণ-স্পর্শে মোর এতি পল্লব-মর্ষর,
এতি ভূপ, এতি কীট অপার্থিব সঙ্গীতে মৃগর,
অদাড় কঙ্কর মূলি রসাবেশে জীবন ঢকল।
নিখিল ধরণী চায় মোর পানে বিশ্বদ-বিস্মল।
পাহিছে তিত্তিরি হ'য়ে এতি পক্ষী নবোপনিষৎ
মিলে এ সন্ধিতা-খামে কত তত্ত্ব, কত 'শত পথ'।

হে রবি, সহস্র দলে চিন্তাস্রোত ছুটা'লে আমার
তোমার সহস্র করে। বাণী-করে বাজে অনিবার
সহস্র তারের বীণা সে পরোজে। বিধে ছিল বত,
অকথিত বাণী, হৃদয় অমনি হ্রস্ব গীত অনাহত
নিমগনে মুচ্ছ'না লভে। শোনে মৃত্ত বিশ্বচরাচর,
কোটি-কর্ণ-বলয়িত চিত্ত মোর কাঁপে ধর-ধর।

কত মৃগ মৃগ হ'তে পুণীভূত রসের দক্ষ
নিম্বে। হ'য়ে করে দান সরস্বতী,—একি এ বিশ্বদ,

বিনা তপস্যায় তাই লভে অজি বিব কুতুহলী ;
আমারে ঘেরিয়া আজি বিকসিত লগ্ন অজলি ।
সৌরবের বাই সৌমা । এ মহিমা ল'বে কি আমার ?
সগ্ন হিমাহি নারে বহিবারে এ পৌরব-ভার,
সহিবারে এ মহিমা । পদে পদে কঠ পাগ বাধা
উজ্জ্বলিত মুগ্ধ স্বরে প্রচারিতে আপন মর্যাদা ।

ক' দিনের এ অরুণি ? থাক আশ্বিনোরের কথা !
শাগ-বনে ঘনাইছে প্রতাপের বিরহের বাধা ।

ভোমা পানে চেয়ে দেখি, হে আমার চিত্তের সম্মুখ,
লোকান্তর ভাবনায় আকৃষ্ট ভোমারো লগাট ।
বিশ্ব-মহামানবের চিত্তলোক-অস্ত্রাল পানে
খন খন চাহ তুমি । ক্রান্ত কণ্ঠে অনন্তের পানে,
কি যেন কহিছ বীরে । চারিদিকে বৈতালিক দল,
তব আবুফামনায় উড়ে গাছে লরী-মল্ল ।
স্বগায়ন-গোম-ধমে হেরি তব স্তম্ভিত আনন,
কুণ্ঠিত মহিমা মোর । অস্তি-হুখ হারায় এ মন ।

ভোমার বীণার বাজে সঙ্কল্প সাত্যাহ-পূরবী,
মর্গের মন্থন-বনে তব তপ্ত নিঃশ্বাস স্রবতি ।
কোন্ দূর ভূতাত্ত্বের নভে শুকভারার আশাস
অজ্ঞের রহস্যআল ভেদি' বহি' বোধন-আভাস

পরশে লগাট তব, অতীতের আনন্দ-বনিম।
বোণুলি-বিগত-সম মুখে তব ফুটায় শোনিম। ।
আজি শুধু মনে পড়ে কত বারই বসিয়াছ হার
পথের দলার মত জড়িয়ে বা' ধরে গুটি পাথ,
অনন্ত পথের ব্যাক্তি দেহ তাহা কিম্বারে দুলিরে ;—
প্রত্যাহার আশ্রয়ে মরনব পূর্ণাচল-শিরে,
জীবন উৎসব শেলে মুগ্ধপাতের মত পাত্রে ঠেলে
চলে যায় মহোৎসব-ক্ষেত্রখানি উপেক্ষার কলে ।
বৃথা প্রেরে রোষে পথ । এই কথা বার বার 'সরি'
উঠে মোর অস্তরের দুলি মাটি শিহরি' শিহরি' ।

সাত্যাহের রবি পানে বস চাই রক্তিম পপনে,
লগ্নপর্ক-তরুণির হেরি দাত অস্ত্রিম কিরণে,
গ্রামান্তের রেখা বস নুহে বের গোণুলি আধার,
বিদ্যাক-মাহন্য বাজে ক্রান্ত কণ্ঠে পিক পাপিয়ার,—
কোণার্কের কথা 'সরি' চিত্ত মন হর বে অধীর ;
চলিছে রথের রবি,—তার লাসি বৃথা স্রীমন্নির,
দুঃখ-গুণান্তের পথে ব্যাক্তি তার অব্যবহিত-পতি,—
এ সত্য না বুঝি হার সিদ্ধ-ভীরে গড়িল নৃপতি
রবির ধৌলখানি করি চাক-কলা-ঐ-মণ্ডিত,
খেদানে অসম্মত ব্যাক্তি শমন্যে সন্ময়ে মিলিত
বহিল সহস্রকরে । 'সরি শুধু তার পরিণাম,
সৌরবের কুশলুকে চিত্ত মোর গাহে লজ্জা-গাম ।

“মনের নগ্ন জ্ঞানবস্ত্রে আবৃত, অর্ধেক ভোমার হৃদয় আবৃত রাখ,
অর্ধেক বাহ্যিক বসাদ ।”

—বঙ্কিমচন্দ্র

ঈশ্বর

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

জাভারকে ঢেকে পাঠাতে চল। আমাদের আইন বড় দয়াময়; হুঁদিন বলে যে কানিকাঠে কুলুবে, তাঁর একটু ভর হয়েছে কি আমরা তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করি; কয়েদখানায় সে যখন অপেক্ষা করছে তবে শেখরায়ে আসবে তাঁর ডাক, তখন যদি তাঁকে অস্থিরে মত্তে দেওয়া হয়, সেটা তো হ'ল বর্জ্যরতা। আমাদের আইন যে 'হিউম্যান্যু' মতরায় অনেক বড় করে' তাঁকে সারিয়ে তোলা হবে, যাঁতে সে নিজেরে মত্তে পারে। থাকবে তাঁর সম্পূর্ণ আইনসম্মত ভাবে মরবার তত্ত্ব।

কিন্তু চূপচাপ, শাস্ত ভাবে সে তাঁরে ছিল, এক হাত মাথার নীচে—হঠাৎ দেখলে মনে হ'তে পারে, ঘুমুচ্ছে। তাঁর চোখ দুটো লাল, নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন-ঘন। একদৃষ্টে সে তাঁর উটো দিকের পাশা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে—শাদা, কঁকা, মৃত দেয়াল।

জাকারটির বয়স অল্প; তিনি 'অভিজ্ঞ' লোক নন। মানে, তিনি এখনো সে-অবস্থার এসে পৌঁছন নি, যখন আমরা কথায়-কথায় বলি, 'ও, রেখে দিন মশাই, অমন চের দেখছি।' যখন আমরা কিছুতেই অধ্যাক্ষ হই নে, কিছুতেই চটে' বাই নে—সব জিনিষই অন্যায়সে যেনে নি, আবার, কিছুই বিবাস করি নে, এরি নাম সাংসারিক ভাষায় অভিজ্ঞতা, যা'র নাকি সোনার নাম, যা নাকি সহস্রাত বুদ্ধি ও অর্জিত বিজ্ঞার চাইতে চের, চের দাবী। একেবারে ঠাণ্ডা, আগাপোকা কদাট, পাকা জিনিষ। জাকারবাবুর মনে ষাণিকটা নবীনতা জেলের চাকুরি সবেও রহে' গিয়েছিল। এর আগেও তিনি হু'বার এমন রোশি দেখেছিলেন, যা'র কানির হুকুম হয়েছে; তবু তাঁকে দেখতে এসে তাঁর মনটা অল্পত একটু মোড়ক দিয়ে উঠল। ষাণিকটা কল্পনা, একটু ভয়—আর কোকুল।

জাকারের সাদা পেয়ে সে একবার মুখ ঘুরিয়ে দুইদিকের জন্তে তাকাল তাঁর দিকে; তারপর আবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করল দেয়ালের উপর। এ ক'টা দিন সে আশ্চর্য্য রকম চূপচাপ কাটিয়েছে; চক্কিল যক্টা তবুই থেকেছে, উঠে বসেছে শুধু খাবার এলে। মাথা নীচু করে' খেয়ে উঠেছে; কখনো একটা কথা বলে নি। বেশির ভাগ সময় তাকিয়ে থেকেছে দেয়ালের দিকে—কখনো-কখনো, বোধ হয় শ্রেক স্রাব্ধিতে, দেয়ালের নিরবজ্জির শালায় আর অপরিণীত লুপ্ততার স্রাব্ধ হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সজাগতা কানি হবার আগেই নাকি অনেক করেবী মরে' থাকে; এ-ও তাঁরই একটা উদাহরণ।

কিন্তু জাকারের পরীক্ষা। (তাঁর হাতে নিম্নকে সে এমন ভাবে ছেড়ে দিল যেন তাঁর দরীরাটা এক টুকরো কাঠ) শেষ হবার পর সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, 'জাকারবাবু, আমি কি ঝাঁচু না?' তাঁর বিচার শেষ হ'য়ে বাবার পর এই হচ্ছে প্রথম কথা, যা' তাঁর মুখ দিয়ে বেরল।

প্রশ্নটা একটা হাতুড়ির বাড়ির মত জাকারের হৃকের উপর এসে পড়ল। ষাণিকক্ষণ তিনি চূপ করে' তাকিয়ে রইলেন তাঁর মুখের দিকে। তারপর আঙুল-আঙুলে বললেন, 'না, তুবি সেয়ে উঠবে বই কি।'

'আর, না-ই যদি উঠে, তা'ডেই বা কী? আমাকে খুন করার সব ব্যবস্থা তো প্রস্তুত।' লোকটার চোঁট একটা বিজী চঙে বেকে সেল—সব চেয়ে বিজী এই যে, সেটা। প্রায় হাসির মত দেখতে। জাকারবাবু-বুদ্ধিতে পাল্লেন না, কী ভাবে সেটাকে নেবেন। প্রথমে তাঁর মনে হয়েছিল, লোকটার মাথা ষাণাণ হ'য়ে গেছে; এখন তাঁর সম্বন্ধ হ'তে লাগল, সে মুখ পুকিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে হাসছে।

কিন্তু সেই বিক্সি হান্সি লিঙ্গিরই মিলিয়ে গেল; আবার ছুক হ'ল তাঁর নিঃশ্বাস ডাকিরে থাকা যেমতের নিকে। তখন ডাক্তারবাণ বন্দ্যার কথা বুঝে গেলেন, 'পুন তো তুমিই আগে করেছ। একথা কেনো, তোমার উপর কারো রাগ নেই।' 'তা' আমি।'

'সকলের ইচ্ছা এক রকম হয় না; কিন্তু সব লোকের ইচ্ছা যোগ করলে মোটামুটি যা' পাড়ায়, তা'র নামই তো আইন।'

'তা-ও আমি।'

ডাক্তারবাবু এসব বিষয়ে কিছু পড়াশুনা করেছিলেন, তাঁর আরো অনেক কথা বন্দ্যার ছিল। কিন্তু কী হবে বলে—তিনি ভাবলেন—বে-লোক মত বসেছে, কোনো দায়, কোনো তবুই তাঁর আর কাছে লাগবে না। তাঁকে সে হতা কব্বে, সে যে কোনো ব্যক্তিবিশেষ—এমন কি, কোনো দানবতর নহ—সমগ্র মানব জাতির সমবেত ইচ্ছা, একথা শুনে ভারি তো সাধনা সে পাবে। তাঁর কাছে আইনের 'ক্লিনক' অ্যাসোসেনা করা—ডাক্তার-বাবুর মন এমন মিঃলাড় হ'য়ে পড়ে নি যে, তাঁর অজ্ঞতা, অসীলতা তিনি উপলব্ধি করতে না পারেন।

লোকটি বেধে হয় চোখের কোণ থেকে ডাক্তার-বাবুক দেখে নিম্নিল; হঠাৎ সে বলে' উঠল, 'আমি যা' করেছি, বেশ করেছি। আমি একটুও হুঁত নই।'

কথাটা শুনে ডাক্তারবাবু চমকে উঠলেন। কথার সুরে কোনো রাগ ছিল না, ঝাঁক ছিল না,—বেন নিজস্ব লাধারণ একটা উক্তি কব্বে, এই রকম। তাঁর মুখের ভাব ডেমনি নিরেট, নিশ্চয়। তাঁর শরীরে এক অনির্বচনীর বিরতা—বেন তাঁর আত্মা তাঁর শরীর ছেড়ে গেছে, বেন ভিতর থেকে কথা করে' উঠছে এক প্রেত। অর্ধ-মুট সুরে ডাক্তারবাবু বন্দ্যেন, 'ওকথা বোলো না।' জবাবত. 'না. ওকথা বোলো না।'

ব্যাপারটা লজ্জা বড় ভগ্নানক—ডাক্তারবাবু তা' মনে-মনে ভাবতেই নিউরে উঠেন। ছোরাটা পেটের মধ্যে এতদূর বসে' গিরেছিল যে, ভিতরকার সব নাড়িহুঁড়ি উন্টিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। তহলোক পুচ্ছিলেন। টাকার জন্তে, নিছক টাকার জন্তে একাক্ষ করা! প্রমাপের কোনো অভাব ছিল না; ছিল না তাঁর ধাতব্য, তাঁর দত্ত লবু হ'বার এতটুকু অছিল। তহলোক পুচ্ছিলেন, পরে লোকের দাড়া গেয়ে চমকে উঠতেই...

'কেন, কেন তুমি ওকাজ করতে গেলো?'

'কী করব? টাকার যে দরকার।'

'কিন্তু তাই বলে', ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্বরে একটু উত্তেজনা প্রকাশ পেল, 'তাই বলে' তুমি দ্বন্ডে পারছ না, তুমি কী করেছ? অস্ত্র সব রকম ক্ষতি যেটানো দায়, কিন্তু প্রাণ—বে-প্রাণ তোমার দেবার ক্ষমতা নেই... এ যে পরম পাপ—' ডাক্তারবাবুর বক্তব্য অগোছাল হ'য়ে পড়ল।

'কিন্তু একজাই যখন পূর্ব জাঁকজমক করে' করা হয়, সেটা হ'লে ওঠে মহাপুণ্য।'

'তা'র মানে?'

'যখন একজন লোক আর-একজনকে মারে না, যখন হাভার-হাভার হাভার-হাভারকে মারে। নিজের কোনোরকম ভালোর জন্তে নয়—এমন কি, টাকার জন্তেও নয়; কেন যে মাঝে আর মন্ডে, তা' তাঁর। জানে না। তখন তাঁর নাম হয় দেশের জন্তে প্রাণ নেওয়া। তা'রাই হয় দেশের বীর।' খুব আন্ত-জ্ঞে, বেন অনিচ্ছায় লোকটি কথাগুলো বন্দ্যে।

'কিন্তু বুঝ—তা'র কণা যে আলোনা।'

'হ্যাঁ, আলোদাই তো। কিন্তু আমার মনে হয়, কেন মারছি, তা' না কেনে মারবার চাইতে টাকার জন্তে মারা অনেক ভালো। আমার একটা কারণ ছিল।'

'পৃথিবীতে যে দুঃ হয়, তা'রও কারণ থাকে।'

'কী কারণ?'

‘যদি জানুই চাও, তা’র কারণও টাকা।’

‘কিসের জন্যে টাকা? বড়লোক হবার জন্যে। সেটার নাম শোভ। কিন্তু আমার যে ছিল দরকার—বেঁচে থাকবার দরকার। ডাক্তারবাবু, বাঁচবার অধিকার আমারও আছে।’

‘বেলোকটিক তুমি মেরেছ, তা’রও ছিল। তা’র অবস্থার নিম্নে তুমি একবার ভেবে দ্যাখো, কেউ যদি ওরকম করে তোমাকে মারত।’

‘কী আর হ’ত। মরে’ বেতাহ। একটা সুদীর্ঘ, একটা ভেড়ার, একটা মাছের কি বাঁচবার অধিকার নেই? তা’দের সামর্য নিম্নিবাসে মারি—কেউ কিছু বলে না। কেননা, তা’দের মারলে আমাদের লাভ। আর তা’দের চাইতে আমাদের ঢের বেশি ক্ষোভ। আর মোর, মারতে তার সোণ নেই।’

‘ও সব কেন বলছ? ও হচ্ছে শুধু কথা, সুখের কথা, মনের ভিতর তাকিয়ে দ্যাখো। সুদীর্ঘ কি ভেড়া আমাদের পক্ষে কখনো গতি বেঁচেই থাকে না। কিন্তু একজন মানুষ, মানুষ! একটা গ্রাম পৃথিবীতে এসেছিল, কী হুন্সর সে গ্রাম, আসার মত, আসার মত। যেন কোনো দাওতে একটা আশ্রয় ফল ফুটে উঠেছে। সেই ফল তুমি পায়ের নীচে মাক্কির দিলে, সেই আশ্রয় তুমি নিষিদ্ধ দিলে। যে ছিল, সে নেই। কোনোখানে নেই। এক দাক্তার তুমি তা’কে ঝেঁলে ফেলে দিলে পৃথিবীর বাইরে—সে কোথায়, কোথায়? আর সে কিরে আসবে না—কখনো, কখনো, কখনো নয়। তা’র মনের এত ভাবনা, এত ইচ্ছা—তা’র সব কাশ আর চঃখ, ভালো না লাগা আর চূপ করে’ থাকা, তা’র বদর দেখে সুখ থেকে ফেসে ওঠা আর হাসির শব্দ—তা’র বদরের মধ্যে বাত এক পৃথিবী—সব তুমি এক মুহূর্তে শূন্য করে’ দিলে। কেন তুমি তা’কে বাঁচতে দিলে না? তুমি তা’কে বাঁচতে না দেবার কে?’

‘কে জানুত সে গতি-গতি মরে’ যাবে।

কী অল্প তা’র চেহারা হয়েছিল—সেখণ্ডে হাসি পায়। নৃত্যতর—তা’ এটি নাম? বোকা, বোকা—বোকা না হ’লে কেউ অমনভাবে মরে! যেন ক্ষেদ করে’ সে রক্ত বইয়ে দিল। কে জানুত তা’র শরীরে এত রক্ত আছে।’

লোকটি খানিকক্ষণ চূপ করে’ বইল; কিন্তু মনে হ’ল আরো কিছু সে বলবে। যেমন তা’বে সে শুয়েছে, তার শরীরের সেই শক্ত ভরীতেই যেন ঢাপা কথা। ডাক্তারবাবু নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তা’র চোখের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিল একটা প্রশ্ন; আন্তঃ-মাত্রের সেটা ফেসে উঠল, ফুটে উঠল। অর-বক্তির চোখে সোজা ডাক্তারবাবুর সুখের দিকে সে খানিকক্ষণ তাকিয়ে বইল। তারপর হঠাৎ ঢাপা গলায় ক্রিয়ার কবল, ‘খুব কি লাগে?’

‘কী? কিসে?’—ডাক্তারবাবু প্রশ্নটা বৃহতে পারলেন না।

‘এই—কান্ডিতে?’

ডাক্তারবাবুর জড়পিত্ত হঠাৎ যেন লাগিয়ে উঠল। ‘না, না,’ তাকাতাড়ি তিনি বললেন, ‘খুব বেশি লাগে না।’ তারপর, আশ্চর্যতা কিরে পেয়ে বললেন, ‘তুমি যা’কে মেরেছিলে, তা’র বতটা ফেসেছিল, তা’র চাইতে অনেক কম লাগবে। গতি কলতে, এতে একটুও বহুলা নেই।’

‘তা’ হ’লে সুখ পেয়ে মরবে—কী বলেন? ভালো।’

‘শেষ পর্যায় কদা কোরো না। নরম হও, নরম হও; তা’তে শান্তি পাবে।’

লোকটির যেন একেবারে পেটের ভিতর থেকে উঠে এল একটা অস্পষ্ট শব্দ—মাছের হাসির কোনো অস্বাভাবিক, বিকৃত ‘প্যারডি’। ‘আমি যা’কে মেরেছি তা’কে মেরেছি; ওরা আমাকে মাছবার কে? আমি ওদের কী করেছি যে, ওরা আমাকে মাছছে?’

‘নরম হও, নরম হও। তুমি যে-পাপ করছ, শান্তি নাও তা’র। তোমার হাতের রক্ত—’

‘সে-রক্ত কি আমার রক্তে বৃহৎ বাবে?’ জ্ঞান-বাহকে কণা শেষ করতে না দিয়ে লোকটি বলে উঠল, ‘রক্ত জো রক্ত পেলে আরো লাল হ’বে উঠবে। এ তো প্রতিজ্ঞা!’

‘না, না, হিংসা নয়। ধরো, তা’র ছেলে যদি তখনই তোমাকে ঘেরে ফেলত—’

‘সেটা বোঝা যেতো; তা’র রাগের খণ্টে কারণ ছিল আমার উপর। কিন্তু ওরা কে? ওরা আমাকে মারবে কেন? ওরা লম্বাই মন্ত লোক—জালী আর মানী। আমি একটা পোকের মত। আপনি বলছেন, আমি পাণ করেছিলাম—পরম পাণ। কিন্তু সেই পাণই তো ওরা করলে আমার উপর। কেন ওরা আমাকে ছেড়ে দিতে পারলে না! কেন ওদের আমাকে খুন করতেই হ’ল?’

‘এখন—এখন আর মনে রাখা যেনো না। তোমার উপর ওরা যা করেছে—হত্যা নয়, তা’ তোমার মুক্তি। কী করে? তুমি বাচতে—তোমার হাতে একজনের রক্ত, সে ভীষণ ভীরু কী করে? বধন করতে? সেই রক্ত যে চীৎকার করে উঠে তোমার নামে—ছায়াযাত্রা করে দিত তোমার জীবন। এই শক্তি যে তুমি গ্রহণ করছ—এটাই তোমার শক্তি, তোমার মুক্তি।’

‘হ্যাঁ, মরে দিতে শক্তি, মরে গিয়ে মুক্তি! তা’র চেয়ে আমি বরং বাচতাম—আমার পাণ নিয়ে, দুঃখ নিয়ে, মনের মধ্যে জলজ নরক নিয়ে বরং বাচতাম। এমনিও, আমি একটা পোকের বেশি কিছু নই। আমাকে বরা করতে পূর্ব বেশি দয়ার দরকার হ’ত না। আমি মাটিকে গড়িয়ে থাকতাম, মাটির উপর মুখ খুঁড়ে পড়ে থাকতাম—কে আমাকে রেখে দেবে আস্ত? কেন ওরা আমাকে বাচতে দিল না?’

‘তুমি যা করেছে—কে তোমাকে দয়া করতে পারত, কমা করতে পারত?’

‘কিন্তু কেউ যদি কমা না করে, তা’ হ’লে আমারই বা চলে কী করে?’

‘তবু নেই তোমার, ঈশ্বর তোমাকে কমা করবেন।’

‘ঈশ্বর!’ চীৎকারের মত করে সে বলে উঠল।

‘ঈশ্বরের উপর আশা রেখো, তা’র অসীম ভালোবাসা। তিনি তোমাকে—’

হঠাৎ ডাকারবাবু শেনে গেলেন। বৃষ্টির মধ্যে পোকটির নৃতি একেবারে বদলে গেছে। কবরের উপর ভর দিয়ে, হাতের উপর মাথা রেখে সে আদ্যেক উঠে বসেছে; তা’র সমস্ত মুখ টুকটেকে লাল, জোখ ছুঁটে। বিস্ময়িত, বেন বেরিয়ে আসছে। কপালের উপর নপুংস্ক করছে একটা মোটা নীল শিরা। ডাকারবাবু একটু ভর পেয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কী হ’ল?’

কোনো কথা না বলে পোকটি আবার গুয়ে পড়ল। ধানিকরণ ঘোরে-ঘোরে বইল তা’র নিঃশ্বাস। তারপর আর-আরো তা’র সেই মৃতের মত, প্রেতের মত শাস্ততা করে এল। তখন সে বললে, ‘একটা পয় শুকনো? ছোট! ১২ মনে পড়ে’ সেল।’

ডাকারবাবু নীচু হ’য়ে তা’র কপালে হাত দিলেন। মরটা বাড়ছে। আর তা’কে বকানো উচিত নয়। ‘এখন থাক। তুমি এখন—’

‘না, না শুকনো। ছোট পয়।’

‘আর এক সময় এসে শুকনো।’

‘না, না—এখনই, এখনই। শুকনো, ছোট এক ছেলে ছিল, তা’র মা-র পূর্ব অমৃত। কী? আপনি ভাবছেন, আমি কুল বকছি? মোটেও তা’ নয়; আমি জানি, আমি কী বকছি। একটু শুকনো, তা’ হ’লেই বৃষ্টিতে পারবেন। হ্যাঁ—মা-র ছিল পূর্ব অমৃত। মরণাপন্ন। শুকনো?’

‘হ্যাঁ—বলো, বলো।’

‘মা আর ছেলে—সংসারে আর কেউ তা’দের ছিল না। তা’রা ছিল পরিব—এত পরিব যে, একবেলা পেট ঘরে খেতে গেলে তা’রা পুঁসি হ’ত; আর তা’ বেদিন ছুঁত না, তা’দের একটু মন খারাপ হ’ত। কখনো তা’রা পরমা চোখে তাক

নি; একটা টাকা। ছিন্ন তাঁদের কাছে আকাশের চাঁদের চাক্তির মত।

‘ছেলেটা কোমরে ছেঁড়া কপড় জড়িয়ে দারাবিন টই-টই করে’ বেড়ায়; কাঁধের বাগানে পেয়ারা পাকল, কোন্ পাছের নীচে মিষ্টি ফুল করে’ পড়ছে, কোন্ বাহুরে বাঙ্কিতে ঠিক সময় কুয়ে গিয়ে হাতির হ’তে পারলে ছুটেও বেতে পারে একটা চিড়ের মোরা কি একটু আমলস্ব—এসব ছিন্ন তাঁর মুখস্থ। তাঁর চোখ পাক্ত সব সময় ভোঙ্কের উপর; সেটা চাটুকেদের ঘিড়িকির বাগানে আরম্ভ করে’ শেষ কব্জ চাই-কি যোঙ্কের বাড়ির নকর সঙ্গে ঘুঝ-ঝুঁ-ঝুঁ—যদি কপাল ভালো পাক্ত। ছেলেমাংস—খেতে ভালোবাস্ত, খেতে পেত না। ওর মুখের চেহাবাই এমন—দেখলেই মনে হ’ত, কিছু চায়। দয়া করে’ মনেকেই ওকে দিত কিছু না কিছু। কিন্তু সব সময় ও যে দয়ার অপেক্ষায় বসে’ থাক্ত, তা’ নয়। হুবিষে পেলেই মিঠিয়ে নিত গর গোভ। বাঁকে বসে গিয়ে চুরি। তাঁর ফলে ঠাণ্ডানিও ওকে কম খেতে হ’ত না; কিন্তু তা’ ও পারেই মাখ্ত না। পেটে খেলে পিঠে মর।

‘এদিকে গর মা এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে একটা বেগুন কি আমখানা কুড়ো ছুটিয়ে আন্ডন—মোটা করে’ক উচ্ছে, একছুটা তেঁকিখাক। আর বেদিন আয়াকে ব’লে-ক’য়ে একটু জিড়ী কি বলবির গুঁড়োর লোপাড় হ’ত, সেদিন তো কপাই বেই। সেদিন বাড়িতে দস্তরনত হৈ-ঠৈ।

‘হুপূর পার করে’ গিয়ে ছেলে তাঁর পাক্তা বেড়ানো লেরে কিস্ত বাড়িতে; নাওগায় পা দিয়েই বল্ত, “মা, খেতে নাও।” মা বলতেন, “বতি ছেলে, এতক্ষণ কোথায় ছিলি রে?” ছেলে হাসিমুখে বল্ত, “উঃ, নকর মা আশ বা’ বাগালে, মা—একটা আশ কলা—একবারে আশ। এই এ—ত বড়—চেয়ে জাখো, মা।”

‘মা চেয়ে দেখে বলতেন, “তা’ হ’লে পেট তো জোর ভরাই আছে—এখন আবার খেতে চান কেন?”

“না, মা, একটু ভাত খাব—এই ইটুখানি। বেগুনখোড়া-দিয়ে এক প্রাণ ভাত।”

“বু’ বোকা—আম গুজুরবার, বেগুনখোড়া খাব কী রে? খেন্, আতা আম জিড়ী দিয়ে গেছে।”

“জিড়ী মাছ! কই, নাও মা, বিপদির।”

“তড়বড় করিন্ নে গরকম। বা, একটা ডুব দিয়ে আর আসে।”

“না, মা, একুনি, একুনি নাও।” ছেলেটা ছুটে গিয়ে মা-কে শিগুন থেকে জড়িয়ে ধরে’ ঠাণ্ডামেচি করে’ বাঘিয়ে তুলত গলুগলু।

‘আর একদিন হুত ছোশটি বল্ত, “বড় খিদে পেরেছে, মা।”

“তোর সব সময় খালি খিদে। এতক্ষণ যে বাইরে ছিলি—খান্ নি কিছু?”

“গোনো, মা, নবীলের বাড়িতে একটা আতা-গাহ আছে না, মা—আমি কিছু করি নি, খালি দেখছিগুন, আতা ধরেছে কি না—নবীর সেই বুড়ী পিলী ঝাঁটা নিয়ে আমাকে তাক্স কহলে। তা’ ও-বুড়ী ছুটে পায়বে কেন আমার সঙ্গে? ঠেঁচিয়ে ঠেঁচিয়ে বল্তে লাগল, আমি নাকি গুয়ের সব আতা খেয়ে শেষ করি—আবার আমাকে দেখতে গেলে হাত মটকে দেবে। ইন্, দিক্ তো দেখি মটকে, কেমন পারে জোর! আর, সত্যি বলছি, মা—আমি গুয়ের ছুটোর বেশি আতা খাই নি—কি ভিনটে হ’তে পারে।”

“বেশ, বেশ, খান্। কুই-ই বা গুয়ের আতা চুরি করে’ খাবি কেন?”

“কী মিঠি, মা। একদিন বাগানো তোমাকে একটা এনে।”

“খান্, আমাকে আর বাগানতে হবে না।”

“না, দেখো একটু খেতে, তারপর বোলো। কই, ভাত খেবে না?”

‘মা হঠাৎ ছেলের গায়ে হাত দিয়ে ঢল্কে ওঠেন, “এ কী? তোর অর হয়েছে নাকি রে?”’

‘দূর, অর হবে কেন?’

‘ছেলের গায়ে ভালো করে’ একটু হাত বুলিয়ে মা বলেন, “ভাই ভো, একটু ছাঁতছাঁত করছেই তো পাটা। বা একুণি, গুয়ে পড়গে, আম আর তোর নেয়ে-খেয়ে কাজ নেই। কান্তিক মাসের দিন, চারদিকে অরমারি হ’চ্ছে—শেষটার একখানা থেকে আর-একখানা হয়ে বস্তুক।”

‘ছেলের মুখ ততক্ষণে শুকিয়ে কালি হয়ে গেছে। ভয়ে ভয়ে বলে, “কিছু খাবো না, মা? বিশেষ পেরেছে বড় ডা।”

‘মা একটু ভেবে বলেন, “আজকে বৃষ্টি আবার পক্ষমীর মো পড়েছে। না রে, আজকের দিনটা একটু কষ্ট করেই থাক। আমিও তাবুছি উপোস সেবো—শরীরটা কেমন ম্যাংম্যাং করছে রে।”

‘মোটের উপর, বা-ই হোন্, এসের দিন একরকম চলে’ যাক্সি, বদিন না মা পড়লেন অল্পে। অল্প নিয়েও তিনি বখিন পারলেন, বইলেন পায়ে ঝড়িয়ে, বাঁধতে লাগলেন ছেলের মত্তে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন দিন এল, যখন তিনি শয্যা মিলেন। মনে-মনে তিনি বুঝলেন, শেষ হ’য়ে এসেছে।

‘ছেলেটার অবস্থা এবার একেবারে পথের কুকুরের মত হ’ল। এমন কেউ নেই যে, জেকে একটা কথা কয়। পাড়ার চপলা-মাসী দয়া করে’ তাঁর বাড়ীতে গুর মত্তে হ’বেলা হুঁটো ফুটোতেন; কিন্তু মা কাছে নেই বলে’ গুর খেতে ভালো লাগত না, খেয়ে পেট ভরত না। যদিও বাওয়া হিসাবে চপলা-মাসীর বাড়ির বাওয়া ছিল ঢের বেশি ভালো।

‘ছেলেটা দারাদিন কোথায় থাকে, কী করে, কেউ জানে না। কখনো হুপুর বেলায় তাঁকে দেখা যায়, একটা আম-গাছের নীচে পড়ে’ অঝোরে ঘুচ্ছে—সারা গায়ে মলো, মাথার চুলগুলো হলুদ-মত রং’ পেছে। কোনো দিন বিকেলে বা সে সোকার পাড়ির দাওয়া ধরে’

সোকা চলতে থাকে রেল-ইঞ্জিনের দিকে—কেউ ডাকলে ফিরে ডাকার না। একদিন সেখা পেল, একটা কুকুরের বাচ্চাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে সে তাঁর গায়ে একটার পর একটা কুলের বাঁচি ছুঁতে মাঝে। যখনই একটা লাগছে, বাচ্চাটা কেঁসে উঠছে কঁকিয়ে কঁকিয়ে।

‘বোপেথ মাস পড়ল। মা হুঁমাস গুরে আছেন—মার বেশি দিন নেই। একদিন ছেলেকে ডেকে তিনি বললেন, “বাইরে-বাইরে কোথায় থাকিস্ তুই দারাদিন—একটু কাছে আর না রে।”

‘ছেলে কাছে এল।

‘মা তাঁর মুখে একবার হাত বুলিয়ে বললেন, “হুঁ কী ছিরি হয়েছে চেহারার। আম নানু নি রে?”

‘না, মা।”

‘না মাইলে কি শরীর ভালো থাকে রে, বোকা? খেতে বাবার আগে হুঁব দিয়ে নিস্ একটা—চপলার কাছে থেকে একটু তেল ছেয়ে নিস্ মাখাও দিতে। চুলগুলো তো একেবারে মট পাকিয়ে গেছে।” মা তাঁর চুলের তিতর একটু আঙুল বুলিয়ে গেলেন। “মার শোন্—মাকে-মাকে আমার কাছে এসে একটু বসিস্, কেমন?”

‘“আমি তো কত সময় আসি, মা; এসে দেখি, তুমি জুমাছো।”

‘“আমি জুমাই না রে, চোখ বুজে থাকি শুধু। তুই আমার গায়ে হাত দিল, তা’ হ’লেই আমি কেঁপে উঠব।

‘“তোমার খুব কষ্ট হয় নাকি, মা?”

‘“না, না, আমি বেশ মাছি। তুই বা এখন—বাইরে থেকে একটু জুর আর। চাইবোদের বাগানে কাঁচা আম পড়ছে নাকি রে?”

‘“হ্যাঁ, মা; সেদিন স্বড় হ’ল না, মা—এক ঠোঁড় কুড়িয়েছিলুম—তারপর আর খেতে ইচ্ছে করল না; ভট্ট, ননী আর পোপুগ্যকে সব বিগিরে দিলাম।”

‘কয়েকদিন পর ছেলেটা মার বিছানার পাশে এসে

বলল। বলল, “মার ভালো লাগে না, মা। মা, তুমি কবে ভালো হবে?”

“ভালো তো আমি হ’বেই গেছি।”

“তা’ হলে তুমি ভগ্নে আহ কেন? এবার কাহুন্নি করলে না, মা; আম-মাথা আর খাওয়া হ’ল না।”

“হবে না কেন রে—তপলার কাছ থেকে একটু কাহুন্নি ছেয়ে আনলেই হবে।”

“তা’ হলে তুমি শিগ’ির সেরে ওঠা—মা”

“এই তো, হাক্ না আর ছুটো দিন।”

“মা, ডাক্তার ডাকলে তোমাকে আদ্যকেই বোধ হয় ভালো করে’ দিতে পারে।”

“তুই-ই তো আহুন্নি রে সব-চেয়ে বড় ডাক্তার।”

“না, মা, সত্যি। মনে নেই, সেবার যে তোমার মার অস্থির করেছিল—ওর মামা সহর থেকে নিয়ে এল ডাক্তার। কত লোক এসেছিল দেখতে—তোমাকে কেউ দেখতে আসে না, মা।”

“কথা শোনো তেলের! আমার কী হয়েছে যে, আমাকে দেখতে আসতে হবে।”

“আমাদের বৃত্তি কেউ নেই, মা?”

“এসব কথা তুই কোথায় শিখি’ রে?”

“না, মা, বলো না, মা।”

“মার কেউ যদি না-ই থাকে, আমাদের তো ঈশ্বর আছেন।”

“ঈশ্বর আমাদের?”

“হ্যাঁ, ঈশ্বর তো আমাদেরই; তিনিই তো তোকে আমার দিয়েছেন।”

“ঈশ্বর খুব ভালো নাকি, মা?”

“খুব ভালো, সব-চেয়ে ভালো; তাঁর মত ভালো কিছু নেই।”

“সে তোমার অস্থির সারিরে দিতে পারে?”

“হিম্মে করলে তিনি সবই পারেন রে।”

“তা’র সঙ্গে বেধা করা যায় না, মা?”

“চাইলেই তাঁর বেধা পাওয়া যায়।”

“চাইলেই?”

“হ্যাঁ—মন দিয়ে, সমস্ত মন দিয়ে যদি চা নিশ্চয়ই।”

“কোথায় থাকে সে?”

“তিনি তো সবখানেই আছেন।”

“তা’ হলে আমরা তাঁকে দেখিনে কেন?”

“তিনি বেধা মেন চুপে চুপে, নির্ভনে।”

“আমাদের কনমতলার মাঠেও সে আছে, মা?”

“হ্যাঁ, আমাদের কনমতলার মাঠেও।”

“পরদিন ছেলোটা খুব ভোরে উঠল ঘুম থেকে।

বাড়িতে কিছু ছিল না; সব হাড়িভুড়ি খুঁজে ঘোটে এক

টুকরো মিছরি পাওয়া গেল! হাক্, গুতই হবে।

মিছরি টুকরোটা হাতে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি

থেকে। গ্রামের বাইরে একাও কনমতলার মাঠ,

জমিটা কোনো কারণে বেন আগাপোড়া কলসে গেছে—

একটা গাঁছ নেই, এমন কি, বাসন্তীসোও বেন দিটোনে,

তেনন সবুজ নয়। গ্রামের লোক সেখানে বড় একটা

কেউ আসে না। দায়দাটা সব চাপ্তি পথের বাইরে।

তা’ হাফা, পোড়ো জমি বর্শে’ দায়দাটার নানা রকম

বন্দামও আছে। হর্যোদয় থেকে হর্যোত্ত, মত্ত মাঠ

খা-খা করে।

‘সেখানে গেল সেই ছেলে, তখনও ভালো করে’ হর্য

ওঠেনি। মাঠের উপর হাঁটু পেড়ে বর্শে’ পড়ে’ সে চোখ

বুল্ল। মনে মনে বলতে লাগল, ‘ঈশ্বর, ঈশ্বর, তুমি

এসো। তুমি এসো। আমি তোমাকে ডাকছি। তুমি

আমার মা-কে ভালো করে’ লাও।’ তাঁর একভাবে সে

রইল; বার-বার, বার-বার মনের মধ্যে আউড়ে

বেতে লাগল—সেই এক কথা, ‘ঈশ্বর, তুমি এসো।’

অনেকক্ষণ কাটল। রোম তাঁর গায়ে পড়তে লাগল

পরম হ’তে, তাঁর বোমা চোখের অন্ধকার লাল হয়ে

উঠল, শল্ল মাটিতে তাঁর হাঁটুর চামড়া ছড়ে’ বেতে

লাগল, তাঁর কোমর উল্ল টন টন করে’। তারপর,

বখন আর সে ও-ভাবে থাকতে পারছিল না, তখন সে

চোখ সেল্ল। অতক্ষণ চোখ কুছ থাকবার পর

প্রথমটার কিছুই দেখতে পেল না। তাওপর দেখল, দু'রে একটা শাদা-কালো গোক সোপানভাবে গেল নাড়ছে।

‘না, হু হু নি। এবার সে আসল-পিড়ী হ’বে বসে’ নিলে। “আমি তোমাকে চাই, ঈশ্বর, আমি তোমাকে চাই। তুমি এসো। আমাদের আর কেউ নেই, শুধু তুমি আছ। মা’র অস্থির তুমি ভালো করে’ মাও—ইচ্ছে করলে তো তুমি সবই পার। আমাকে তুমি আর বসিয়ে রেখো না, বড় রোগ। আমি কিছু খাই নি। কিন্তু তোমার জন্তে এই গাধা মিছরি এনেছি—”। তার হে-হাতে মিছুরির টুকরোটা ছিল, সেটা সে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল—“তুমি কি মিষ্টি ভালোবাস না? এটা তুমি খাও। তোমার জন্তেই এনেছি এটা। আর-কিছু ছিল না আমাদের ঘরে। ঈশ্বর, তুমি এসো।”

‘রোগ চড়তে লাগল; নকল করে’ ছেলেটার না দিয়ে খাম করছে, তা’র মাথা ফেটে যাচ্ছে। তবু সেই মিছুরির টুকরো বাড়িয়ে দিয়ে সে বসেই রইল, বসেই রইল। বেলা বাড়ল, রোগ আরো চড়ল। জমি জ্বতে উঠছে আঙনের মত, আকাশ থেকে করে’ পড়ছে আগুন।

‘ঈশ্বর, আর সে’রি কোরো না, আর আমি থাকতে পারছি নে। বড় রোগ—আর আমার এমন ভেটী পেরেছে! ঈশ্বর, তুমি এত ভালো, তুমি সব-চেয়ে ভালো—তবু তুমি সে’রি করছ কেন? তুমি লিপ্সির এসো, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। আমি তোমার বেশিঙ্গল ঘরে’ রাখব না; তুমি যদি শুধু বল, আমার মা-কে ভালো করে’ সেবে, তা’ হ’লেই চলে’ যাব। আমার মা-কে তুমি ভালো করে’ মাও, ঈশ্বর, ভালো করে’ মাও।”

‘সে চোখ মেলেতেই রোসে তা’র চোখ বেন কলসে পেল। মকছুমির মত খাঁ-খাঁ করছে মাঠি—চারদিকে একটা কাকপকী নেই। এমন কাঁকা, এসে চলল—বেন হাওয়ারের অন্ধকারের কালো

বড় ছাঁচাং শাদা হয়ে গেছে। হাওয়া বইছে আগুনের হকার মত। ছেলেটার মাথার ভিতরটা সেন কেটে পড়ছে। সে আর সহ করতে পারছিল না।

‘ঈশ্বর, আমার গলা একেবারে শুকিয়ে গেছে, বড় গোল হচ্ছে মিছুরির টুকরোটা মুখে দেবার। কিন্তু তোমার জন্তে এনেছি, তুমি আগে খাও। তুমি একটুখানি খেয়ে মাও, ঈশ্বর, না হ’লে আমি যে খেতে পারছি নে।”

‘হাত বাড়িয়ে ছেলেটা ব’লে রইল; তা’র মনে হ’তে লাগল, কেউ যেন আসছে—গোনা যাচ্ছে পানের হালকা শব্দ। চুপ-চুপে সে আসছে। সে দেখা দেয় চুপ-চুপে, নির্ঝন। কাছে আসছে পানের শব্দ—না থেকে মাথা পর্যায় তা’র সমস্ত গা কঁটা দিয়ে উঠল, হাঁচাং সেই পরমের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বেন বয়ে’ গেল তা’র বেকশত দিয়ে। আরো কাছে। সে নীচু হ’য়ে তা’র হাত থেকে তুলে নিচ্ছে মিছুরির টুকরো। চুট করে’ সে চোখ মেলে ফেলল। তা’র চারদিকে, তা’র উপরে আর নীচে—রোগ আর রোগ, আর রোগ।

‘তখন সে হাত থেকে মিছুরির টুকরোটা ফেলে দিয়ে সেই শব্দ আর পরম মাটির উপর হ’হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে উপুড় হ’য়ে গুয়ে পড়ল। “না-ই বা তোমার দেখা পেলুম, ঈশ্বর, আমি তোমার দেখতে চাই নে। তুমি শুধু একটু মিছরি খেয়ে খাও—এক কামড়, একটুকু। আমি নিজে না খেয়ে রেখেছি তোমার জন্তে—তুমি একটুখানি খাও। তুমি থাক না বসে’ আমিও খেতে পারছি নে—ভেটীর আমি মরে’ যাবি। তোমার পায়ে পড়ি, ঈশ্বর, তুমি একটু খেয়ে খাও; তা’ হ’লেই আমি বুব, তুমি এসেছিলে, তা’ হ’লেই বুব, মা ভালো হবেন। আর কিছু আমি চাই নে।”

‘মনে-মনে একথা বলে’ ছেলেটা লম্বা হ’য়ে গুয়ে রইল; রোসে তা’র সমস্ত শরীর কামা হ’য়ে বেতে লাগল। বেন একটা মুছায় সে রইল পড়ে—আর তা’র কোনো কষ্ট নেই। হুপু পড়িয়ে গেল; আকাশ

বোম্বে তোমার সঙ্গে' বেতে লাগ্ন, হাওয়া বেশ মরে'। সমস্ত পৃথিবী বেন সেই ছেলেরাই মত হৃদিত হ'য়ে পড়ে' আছে।

'বেন দুখ থেকে কেনে উঠে' ছেলেরা দেখল, তাঁর সেই বিছুরির টুকরোটাকে লাখবানেক পিশুকে আক্রমণ করেছে। হঠাৎ এক লাখি ঘেরে সে সেটাকে পাঠিয়ে দিল অনেক দূরে—কতগুলো পিশুকে ছড়িয়ে পড়ে' গেল। তারপর হন্ হন্ করে' ফিরে এল বাড়ি।

'এসে দেখল, তাঁর মা চোখ কুমে গুয়ে আছেন। কাছে গিয়ে সে তাঁর গায়ে হাত লাগ্ন। তিনি চোখ মেলে'লেন না। আঙে সে ডাকল, "মা"। মা চোখ মেলে'লেন না। একই ঘোরে আবার ডাকল, "মা, মাপো"। তবু তিনি কোনো লাড়া দিলেন না। তখন সে তাঁর বুত্বি ঘরে' নাড়া দিল। তাঁর মুখটা হাঁ হয়ে গেল—আর বুল্ল না। তা' দেখে ছেলেরা একই ভর পেয়ে গেল। চাঁৎকার করে' ডাকতে লাগ্ন "মা, মা, মাপো।" তাঁর গলা প্রায় ছিঁড়ে গেল, কিন্তু মা কোনো জবাব দিলেন না। তখন সে বাবের বৃক্কের উপর লুট্টিয়ে পড়ে' আকুল হ'য়ে কান্ডে লাগ্ন।

'চাঁৎকার শুনে লাড়া-পড়ুয়া সবাই ছুটে এল। "আহা কী মরাটাই মজল গো—মুখে এক কোঁটা বল দিতে কেউ ছিল না।" "ছেলেরা এখন কী দশা হবে!" "বে কষ্ট শামিল, বেচেছে।" চপলা-বালীমা আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, "এই, তুই অত কাদিস্ বে—তোর মা'কে ঈশ্বর জেকে নিয়েছেন তাঁর গায়ে।"

'হঠাৎ আমার সব কান্না বন্ধ হ'য়ে গেল। দুখ তুলে আমি প্রাণপণে চাঁৎকার করে' বল্ল লাখলুখ, "মিথো কথা, মিথো কথা! চোর! চোর! ঈশ্বর চোর, ঈশ্বর ঠক্—মিথো, মিথো—"। ভিতর থেকে একাত ঢেউয়ের মত কান্না ঠেলা দিয়ে উঠে আমার বাকি কথা আটকে দিল।

'ভাস্করবাবু, মরাটা বোধ হয় বাড়ল—একটু দেখবেন? এই মরেই কি আমি মরব, আপনার মনে হয়? 'আচ্ছা, সজা করে' বলুন, কেন মরা আমাকে মারলে? আমি কেঁচে থাকলে কী ক্ষতি হ'ত গুনের? আমি যে বাঁচতে চাই—আবার সেইমতো কিছু না? আপনাকে বলছি, আপনি কি গুনেরকে আমার মারতে দেখেন? আপনিও কি আমাকে কমা করতে পারেন না? ঈশ্বর, ঈশ্বর...'



পদব্রজে ভারতবর্ষ

শ্রীহৃগোপদ ভট্টাচার্য্য

[পূৰ্ণপ্রকাশিতের পর]

‘কীলাই’ শেরিয়ে বড়ার চার মাইল দিগবে পপ চপ্তে লাগলুম। আট-নশ মাইল বাই, আবার একটু বিশ্রাম করি। বোকাটা বেশীকণ বাধা কষ্টকর হয়, স্নান হ’লে তার খেন বেড়ে যায়, চামড়ার বাধন হ’লে পরীরের মধ্যে কেটে বস্তু থাকে।

পরিপার্শ্বের ছোট-খাট দোকানের কোনটাতে জল পান ক’রে ও সময়মত কিছু কিছু খেয়ে নিজে, কোথাও বা গাছের নীচে একটু-আধটু মিড়িয়ে, পথ অতিক্রম করতে লাগলুম। কখনও ক্ষেতের বুক ভেদ ক’রে, কখনও ছোট-ছোট পরীর মধ্য বা পার্শ্ব দিয়ে চ’লে, আবার সেই ‘কীলাই’ নদীটি পার হ’তে হ’ল; এবার কিন্তু বড়পা হাতে নিয়ে ছোট নদী পার হ’লুম; কেননা, জল ছিল কম। সন্ধ্যা সাতটার পচিল মাইল পথ ধেঁটে মেদিনীপুর পৌছলুম; এবং সহরের বুক স্থল-বাড়ারের এক ব্রাহ্মণের হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করলুম। সন্ধ্যার পর থেকেই এই পবিত্র-বিরল অচেনা পথটা ভরে ভরে অতিক্রম করতে হ’য়েছে—অন্ধকারে পথের মাঝখানে লক্ষ চক্ষুকে ধাপ বারংবার নক্ষের প’ড়ে সর্পের গুত-প্রস্থান বিজ্ঞাপিত করেছে—কোণ-বাড়ের অন্তরাল থেকে বিভিন্ন নিশাচর-পশুও আচম্ভক্য কানে বেধে মনটাকে সন্ত্রস্ত ক’রে তুলেছে। এ অবস্থায়, শুষ্ক ঠারই বোহাই পাড়তে পাড়তে চ’লে এসেছি, ধীর কথা বিপদে না পড়লে মাহুং ভাবে না।

হাত-পা ধুয়ে হোটেলে ঝাওরার ও পরিচয় দেওয়ার পর শয়নের ব্যবস্থা করা গেল। হোটেলওয়ালার বসুলেন, ‘এক আনা চৌকী-ভাড়া লাগবে’। যখন গ্রাম থেকে গ্রামাঙ্করে পৌছাই পরীরটা তখন খেন অসাড় হ’লে আসে; যেহেতু কল-কজার বত মানি, সময় বৃষ্টি এক-যোগে আক্রমণ করে। শীত ব’লে পলে মান করা

প্রায়ই সম্ভব হয় না, বিশ্রাম নিয়ে পরীরটা একটু চান্দা হয় বটে, কিন্তু আবার পথ চলার ফের পূর্ণা-বহাতেই ফিরে আসে। ভাবি, এমনি কি বেশ পর্যায় চন্দ্র ? হাতে টাকুরের সঙ্গে পল্ল-প্রসঙ্গে জানা গেল যে, প্রায় মাসখানেক আগে ললিটবাহন গান্ধী নামে এক ভ্রমলোক এই হোটেলেই এসেছিলেন, আর তিনিও নাকি পায়ে চৌটেই যুঁছেন; বাড়ী—কলকাতার বাগবাড়ার। কতকটা আশ্বস্ত হওয়া গেল; এটা যখন ‘টুরিষ্টের’ই আড্ডা হ’তে চলেছে, তখন অপরিচিত স্থান হ’লেও তার পাবার কিছু নেই।

হোটেল বস্তুত বা’ বোকার, এ অবস্তা সে হোটেল নয়; এ হচ্ছে শুখাবার ও ব’ধবার ঘর; মাসিক থাকেন এক পাশে, সকলের আহারাদির পর ভবে হয় তাঁর পোবার স্থান। বহাদরমন্ডে কল-চানর নিয়ে জৌকী মঞ্চল করা গেল। খাতির করে ‘শশান-ফেরত’ মাথার বালিশও একটা দিলেন।

সকালে কাগজ-পত্র সমেত, মেদিনীপুর থানায় যাওয়া গেল। ভারতের ঘটনাক্রম জন্মে যে তীব্র আকার ধারণ করছিল তা’তে সোমোমোসের ভয় ছিল। বা’ হ’ক মারোয়া প্রভৃতি সকলে দেখে বসুলেন, “না, আপনার কোন ভাবনা নেই; তবে পুলিশ দেখা করা মন্দ না হ’লেও, না করাই ভাল”। কথাটার গুস্তি উপলব্ধি ক’রে ফিরে এলুম। ঘানের কোন ব্যবস্থা হোটেলে ছিল না; কাছে একটা ব্যাটার জলের পুতুল, যদিও অশিক্ষিতেরা ব্যবহার করতে ছাড়ে না। কিছু দূরে গ্রামের মধ্যে কতকটা জল ভাল। এক পুকুরে গিয়ে কমাল, গেজি, কাপড় প্রভৃতি পরিষ্কার ক’রে, জানায়ে হোটেলে গেবে মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ ক’রে মেদিনীপুর ‘বার-শাইবেরী’তে গিয়ে প্রেসিডেন্ট ঐচ্ছিক

উপপ্রনাথ মাইতি মহাশয়কে পরিচয় নিম্ন।
আশালত-গৃহ গ্রামের প্রান্তে : এখান হ'তে ছই মাইল
দূরে ছোট-ছোট পাহাড় আছে : বাকালীন লুপ্ত
নাকি পুর স্মরণ। পাহাড়-তলে ঘর-বাড়ী আছে, আর
সেই সব ঘর-বাড়ী নাকি বিরাট রাজার গোশালায়
ফলসাবণে। প্রবাদ—পাহাড়ে কেউ বাস করলে তার
প্রাণ নষ্ট হয়। বেহিনীপুর হ'তে ছই মাইল দূরে
'কর্ণপদ' : রাজা নরেন্দ্রলাল ঝাঁর ভূপ্রাধিকৃত পুরাতন ঘর-
বাড়ীও গোশ-পাহাড়ের উপরশে আছে। 'গোশনকিনী'
স্থিতিও আছে। বেহিনীপুর রেল-স্টেশনের কাছে
'ককিরের কূপ' নামে কুয়া আছে ; জন নাকি স্বাস্থ্যকর
এবং ব্যবহার করলেও চূরার না। গোশ পাহাড়ে শাল-
পাতা সঙ্গ্রহকারীরাই বেশী বাতায়ত করে।

'বারে'র অল্পম বেষর ঐক্লুত স্থানমর ব্যানামী
আমার সঙ্গ-পথে সহায়তা করবার জন্য সকলকে
উত্থিত করেছিলেন, ফলে পরদিন আমার আশা
ফলবতী হয়েছিল। সাহায্য পাবার আশার সঞ্চিত লবণ
থেকে ছই টাকার ক্রেপ-গোল ছুতা কেনা সেল ;
কারণ বড়পা পাত্রে পথ চলা ক্রমেই অচল হ'য়ে
পড়েছিল। বঙ্গ্রামে চিঠি লিখ-লুম—অবস্থানের কথা,
পথের দূরত্ব ও ভ্রমণের সঙ্কল্পিত বিবরণ দিয়ে।

আরও কতকগুলি টিকানা পাকা করেও তাঁদের
সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হুঁশিয়ার মনে হ'ল না। নিষেধকে
বেশী প্রচার করবার ইচ্ছা ছিল না তো বটেই, তা' হাড়া
সামর্থ্য-হীন হ'য়ে ফিরে যেতে হবার ভাবনাও অল্প ছিল
না। বিশেষতঃ, অপরিচিত স্থানের দূরত্ব বেশ থেকে বত
বেশী হয়, ততই ভয়ে ও ভাবনায় মনের বল কমতে
থাকে।

আজ আশালতে গিয়ে কিছু সাহায্য পাওয়ার আশা
হ'ল। হোটেল-খরচা ছুটিয়ে হাতে কিছু অতিরিক্ত
থাকবে ; তারপর বড়পপুরের মতন জন-বহুল জায়গা
থেকেও কিছু না কিছু সম্ভবীত হ'তে পারবে ! মন
খন বিমর্ষ হয়, তখন এমনি ক'রেই আশার অভাব বাণী
তাকে ভরসা জোগায়। পাত্রে যা ও শরীর অনেকটা

আশাভরক ; অল্প কাম না থাকায়, মানজিমথান
ফুল পথের সন্ধান নিতে ব'লে সেলুম।

বতই বেশি ততই প্রাণ থেকে আশার বাতি নিবে'
যেতে থাকে ! এখনও বাংলা দেশ ও ভাষার রাজ্যে
র'য়ে গিয়েছি ; তবু উদ্ধারের পার্শ্বকাটুকুতেই মনে
হচ্ছে, চিরপরিচয়ের বেশ যেন করুণের কেসে এসেছি !

১২ই ডিসেম্বর বেলা চারটার হোটেলের সেনা চুকিয়ে
ছুতা ও মোকা প'রে রওনা হ'লুম বড়পপুরের দিকে।
খানিক পথ এসেই আবার সেই 'কীসাই' নদী ; এবারও
নৌকার ব্যবস্থা ; নদীতে বাধ বেওয়ার জল ছিল বেশ।

পাত্রে কড়ি মিষ্টি দিয়ে আবার পা চালালুম !
সন্ধ্যার পূর্বকই ছয় মাইল পথ এসে, 'বড়পপুর-পুরী'র
পথের ধারে এক ধর্মশালায় আশ্রয় নিলুম। পথে
আসতে, পার্জাত এসেশের মত স্থানে-স্থানে পাথর চোখে
পড়ে। পথটা প্রায় নির্জন ; রেল-সাইন পার হ'য়ে,
স্টেশনকে ডানদিকে রেখে, অল্প-খল মোকান-বাগানের
বধা দিয়ে বেরিয়ে গেছে উদ্ভিচার দিকে। ধর্মশালায়
প্রথমে ঘর পাওয়ার বাধা ঘটে ; পরে এক মোকান-
দারের পরামর্শে কোন মেসের অধিকারী ক্রামসিং ও
রামসিং বাবু সৌমন্ত্রে ঐ ঘর পাওয়া যায়। তাল-
চাবি না থাকায় এক চৌকীদারের পরামর্শ হ'তে হয়,
এবং বাবার ব্যবস্থা হয় ঐ মেসেই। মেসটা জনকতক
ছাত্রের জন্যই তৈরি হয়েছে। প্রকৃত সহর এখান থেকে
কিছু দূরে। স্টেশন পার হ'য়ে মেসেই একঘায়ে
ইউরোপীয়, অল্পবারে ভারতবর্ষীয়দের বাস ; বেশ
জনকালো সহর, ভল্লোলকের বাসও যথেষ্ট। কাজেই
খন বাঙ্গালী-জাতি 'ধর্মাবাসী' হয়ে তখন মনে অনেক
আশাই লাগতে লাগল। কয়েকদিন বিজ্ঞানের
পর মাত্র হ'মাইল দাঁটার আশ আশ ক্রান্তি ছিল না ;
বেশ উন্নমেই সহরে এসে 'ধর্মাবাসী'র পথ মিলাসা
করলুম ; হাতে ছিল খাতা, 'রোড-ব্যাগ' ও ব্যাগ।
পৌছে সেনা সেল, জাবটী বেশ স্থলর ও স্থলজিত।
কিছু দিনের পরিচয় দিয়ে ও উদ্বেগ জানিয়েও এখন
মাতঙ্গরদের কোন উৎসাহই পেলাম না, তখন স্তম্ভনে

এতাবধূন-পথে রেলের ভারতীয় স্রাবও একটা। ‘হু’ নিম্নম; এখানেও ঐ তাল চৌকাই সার হ’ল।

রাত্রি প্রায় দশটার দাক্ষিণ্যে মিসে মিসে ফিরে এলাম। আহা! শৈশব হ’লে, পরশা দিতে বাঙালি গ্রামসিং বাবু প্রাচীনতম চারের নিম্নম কর’রে বললেন, ‘এখানে সকলেই গরীব ছাত্র, তা’রা অল্প সাহায্য কিছু না করতে পারলেও এখানকার খরচা বাটতে দিতে চায়।’

এই আর্থিক বদান্ততার অল্প ধনবান মিসে ধর্মশালায় ফিরে এলাম।

পরিচিন পরিবার প্রাচীনতম-কিরণে মিতের প্রেক্ষাপ কিছু কন্ডে রামসিং ও শ্রামসিং বাবুর নিম্নম রক্ষা করার পর পথের সংবাদ কেনে বওনা হ’লুম। এঁদের কন্ডমি পাঠ্যাবে হ’লেও জিণ বংসর বাবু বাংলায় থেকে বহুভাষ্য বৈশ্ব অধিকার লাভ করেছেন। এঁদের দুখে কাঁপির সন্ধে অনেক কথা গোনা সেল; আর জানা সেল যে, প্রথমে এঁরা আমাকেও ঐ ‘স্বরাধা দলে’র লোক মনে করেছিলেন। ‘স্বরাধা দল’কে সাহায্য করতে অনেকেই ভয় পান। এবার যে-পথ ধরলুম সে পথে মোটর ও বাস-মালি আছে; আর ঐ পথই কাঁথি দিয়েছে। আমারই মত পোষাকে অনেকে নাকি সে দিকে পূর্বে বাড়া করেছেন।

ফুড়ি মাইল দূরে বেলুনা গ্রাম; পথের ধারে হোটেল আছে; মন্দির-সংলগ্ন ধর্মশালাও আছে, গুনে এসেছি। পথ চলতে লাগলুম বেশ ছোটেই; ইচ্ছা—‘বাসে’র ড্রাইভারবা। আমার হাটার তারিক করক, আর আমি যে হেটে যাচ্ছি তাও প্রমাণ হ’ল। সঙ্গে ছিল চা, কিন্তু ‘পারমো’টা ছিল বোতলের মধ্যে; চামড়ার ঝোলা আধারাটী ভুলবশতঃ কেনা হয়নি।

এক একে বাহার, পোকান প্রভৃতি পার হ’য়ে ক্রমে নির্জন পথে এসে পড়লুম। কখনও হুঁ-একজন পথিক, হুঁ-একখানা মোটর, গরুর বাড়ী, পাথের ধানক্ষেতে হুঁ-একজন কৃষকের ও পথি-পার্থের বাগানে

হুঁ-একটা লোকের কঠোর, অথবা গ্রাম্য কৃষ্টিতে কলচিৎ কাগারত নরনারীর সাদা পাওয়া যাচ্ছিল।

কাঁথি বাবার একটা পথ পার হ’য়ে চলেছি আপন মনে; ভাবনাই ছিল সার্থী। একবার গাড়ির পেছা নিম্নম সেই সেন-বিক্রম কাঁথি বাবার পথ—যে-পথে চল’ আমারই মত কত উৎসাহী প্রাণ নিম্নম-সাথে ফিরে এসেছে; যদি আমাকেও ফিরে যেতে চায়? যদি ফিরিয়ে দেয়—পথ থেকে সহরের কোন মতনতর বিপত্তি? ভাবছি আর চলেছি।

প্রায় নয় মাইল পথ চ’লে আসার পর সেখি, হুঁ-জন স্রাব—একজন মাইকেলে ও অপরজন হিন্-স্থানী পাগলসে—আমারই দিকে আসছেন; এঁরাই কিছু আগে আমার পথবা পথের দিক থেকে খড়প-পুতের দিকে গিয়েছিলেন। আমার নাগাল হবার পর তাঁদের গতি মন্ত হওয়ায় তত্প্রলোকটীকে জিজ্ঞাসা করলুম—‘বেলুনার আগে কোন মোকান বা গ্রাম আছে কি?’ প্রতিপ্রদ হ’ল—‘আপনি কে? কোথায় যাবেন? বেলুনা কি দরকার?’ ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে নিজের কথা জানালে তিনিও পরিচয় দিতে জানলেন যে, তাঁর আগ্রহেই মধ্যাক কাটাতে পারা যাবে, তবে পথ ছেড়ে আথ মাইলটাক বিপথে সেলে তাঁর বাড়ী পাওয়া যাবে। আমার আপত্তি ছিল না; যদি বিজ্ঞান নিয়ে, ও এই ভাবে আহা! পথে পথ চলতে পারি, তার চেয়ে স্রবের কথা আর কি হ’তে পারে? ইনি কলকাতার লাহা বাবুরের জমিদারীর একজন সহকারী ম্যানেজার; গিয়েছিলেন চাকর সঙ্গে নিয়ে একটা লোকের সন্ধানে। ‘ম্যানেজারবাবু বহু কাছারীতে আছেন; সেখানে গেলে বিশেষ কোন কষ্টই হবে না।’ এই প্রকার আশাস-বাক্য শুনেও তত্প্র তাঁর সঙ্গে চলতে লাগলুম।

মোট প্রায় বাত্রে। মাইল আসার পর ‘নারায়ণপড়’ গ্রামের খানা পথের পাশেই পাওয়া বেল, এবং সেই তত্প্রলোকটী আমার খানার নিয়ে এসে বললেন,— ‘দাব্-ভিত্তিন্যায় ম্যাগিষ্ট্রেট মোটরে যেতে আপনাকে পথে দেখে পরিচয় নিতে বলে গেছেন।’

সুখের কথাই বিধান-স্থাপন হয় না বলেই বাবার প্রাকালে সংগৃহীত হয়েছিল 'ব্রাহ্ম'। সরকারের অনুমোদিত সেই 'ব্রহ্ম' প্রস্তাবন করতই ময় হ'ল : এমন কি মানাহারের ব্যবস্থাও চলতে লাগল। যে ছোটখাটু আমায় প্রেরণ করছিলেন, তিনি বড়-বাবুকে সঙ্গে ক'রে উপস্থিত হ'তেই বললুম—'ঠকে গেলেন, কেবল বোকাই বাড়ল।' বড়বাবু হেসে উত্তর দিলেন—'জন্মে আপনাদের মত নিরীহ অতিথি পেলে আমাদের সুবিধাই বেশী।'

বলতে না বলতেই ম্যাক্সট্রেট সাহেবের মোটর ফিরে যাবার সুখে পথে এসে গাড়ী'ল এবং সকলেই সেই দিকে ছুটলেন। আমার কথাই হচ্ছে যুঁকে, বন্ধকবচ নিয়ে অগ্রসর হ'লুম ; লোকটি দেখে ম্যাক্সট্রেট সাহেব বললেন—'মাতৈঃ ; আপনাদের ভ্রমণের পক্ষে এইগুলিই যথেষ্ট। কেন আপনি বকসপুরে আমার বাড়ী যান নি ? যখন সাধারণের সাহায্য নিচ্ছেন, তখন আমারও কিছু সেবার অধিকার ছিল।'

যেথা গেল, গোড়া থেকেই এইটে ভুল হ'রে আসছে ; প্রতি ঘানের উত্পন্নই ভ্রমলোকের অথবা রাজকমচারীর পত্র ভ্রমণের পক্ষে বিশেষ উপকার করে। স্থির করা গেল—অতঃপর এই শ্রেণীর লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব—এবং ধারা সাহায্য করবেন তাঁদের সেই ধাতার রক্ত ক'রে চললেই এক চিলে ছই পাখী মারার কাছ হবে। এ ধারণা কিন্তু পরিবর্তন কর্তৃত্ব হয়েছিল বহীশূর দিয়ে।

আহারের ব্যবস্থা হয়েছিল কাছেই, পোটমার্টার পাহাড়ী মহাপ্রভুর গৃহে। ইনি উৎকলী ব্রাহ্ম—বেশ ভ্রমলোক ; সবিনয়ে বললেন—'তাকাড়ি বা'

হয় ছতী খান ; সময় অভাবে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা কর্তৃত্ব পারি নি।' খেতে বসিয়ে, তাঁর স্ত্রী অনেক প্রশ্ন করলেন—বিবাহিত কিনা ? পিতামাতা ও বাড়ীর লোক ? চঃ ক'রে বললেন—'মাকে কষ্ট দিয়ে, এমন ছেলে পথে-পথে গৃহে'র' বলে' বললুম—'মায়ের এই চর্ক্ষণতাই বোধ করি ভারত-সত্যানন্দের এত চর্ক্ষণ ক'রে দিয়েছে। অথচ প্রাকালে ঐ মায়ের উত্থাহ ছেলের কতই লক্ষটনক কাছে ত্রী করেছে—আশীর্বাদ করন বেন উদ্ভেদ সকল ক'রে ফিরতে পারি।' বহীশূরী মাড়ুগর ঐ সামান্য কথাতেই জল হ'রে গেল, এবং তিনি উজ্জ্বলিত গুণ্ডল্যায় আমার সিল্প ক'রে মিলেন।

আর আট মাইল দাঁটার পর, পূর্ণ লক্ষ্যায়, বেলমা গ্রামে এসে ডাক্তার ঐন্সল টি, এম, যে মহাপ্রভুর আতিথ্য গ্রহণ করা গিয়েছিল। ১৪ই রবিবার প্রাতে তাঁর কাছ থেকে কিছু সাহায্য ও পরবর্তী প্রানের অল্প এক ডাক্তারের ঠিকানা চেয়ে নিয়ে পা চালালুম। বারো মাইল পথ অতিক্রম ক'রে 'ধাতন' গ্রামের ডাক্তার ঐন্সল ড্রামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাপ্রভুর বাড়ী এসে, স্বচ্ছতায়া এক পুষ্করিণীতে হান ও পরম পরিচোষ পূর্ণক আহ্বার সমাধা করা গেল।

ডাক্তার বাবু এতীণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি—চলে-আস। পথটার সকল কথা দু'টরে দু'টরে জেনে গেলেন এবং একদিন থেকে বাবারও আমরণ জানালেন। তা' সম্ভব নয় বলায়, অসত্য্য বোল মাইল হুববর্তী 'জলেশ্বর'র শ্রেনমার্টার ঐন্সল পঞ্চানন রায় মহাপ্রভুর ঠিকানা দিয়ে বিদায় গেলেন।

(জন্মণঃ)



রবীন্দ্রনাথের নৃপকাব্য

শ্রীচাক্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

‘ভগ্নহৃদয়’

রবীন্দ্রনাথ ১৬ বৎসর বয়সেই হুঁখানি কাব্য ‘এন্থল’ ও ‘কবিকাহিনী’ রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। তিনি ১৭ বৎসর বয়সে প্রথমবার বিলাতে যান।

রবীন্দ্রনাথ বিলাতে থাকিতেই ‘ভগ্নহৃদয়’ নামে একখানি কাব্য-নাটিকা রচনা করিতে আরম্ভ করেন, এবং তাহা বাংলা ১২৮৭ সালের ‘সত্যজী’ পত্রিকার কার্তিক হইতে মাস সংখ্যায় ছাপা হয়, এবং পরে ১৮০০ শকাব্দার অর্থাৎ ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে বা বাংলা ১২৮৮ সালে পুস্তকাকারে ছাপা হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহা আর দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হয় নাই, কেবল ইহার কোনো কোনো অংশ স্বতন্ত্র ক্ষতিকবিতার আকারে ও ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া প্রথম-প্রকাশিত প্রত্নাবলীর মধ্যে ‘কৈশোরক’ পর্বাণ্ডে ছাপা হইয়াছিল; এখন তাহাও আর ছাপা হয় না। এই নাট্য-কাব্য রচনার সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল উনিশ বৎসর মাত্র।

এই কাব্যের পাত্র-পাত্রীগণ—কবি, অনিল, মুরলা—অনিলের ভগিনী ও কবির বালা-সংচরী, ললিতা—অনিলের প্রেমস্বিনী, নলিনী—এক চণল-সজ্জাবা কুমারী, চণলা—মুরলার সখী, লীলা, স্বকৃতি, মাধবী প্রভৃতি—নলিনীর সখীগণ, অরুণ, বিমল, বিনোদ প্রভৃতি—নলিনীর বিবাহ-প্রার্থী বা প্রেম্যাকাঙ্ক্ষী।

কাব্যখানি চৌত্রিশ সর্গে বিভক্ত। প্রথমই বনের মৃত্যু। বনের মধ্যে মুরলা একাকিনী বসিয়া আছে, চণলা তাহাকে পুঞ্জিতে পুঞ্জিতে সেখানে আসিয়া বলিল—

সখি, তুই হলি কি আপনা-হারা ?

• • •

অটল-সত্ত্বক বট চারিদিকে স্থকি !

ছয়েকটি রবিকর সাহসে করিয়া ভর
অতি সজ্ঞপণে বেন মারিছে উকি।

চণলা মুরলাকে বলিল—‘মনে আছে, অনিলের মূল্যবায় আজ ?’ ইহার পরে সে অনিল ও ললিতার পূর্ণরূপের কাহিনী বিবৃত করিল, কেমন করিয়া একদিন সে লুকাইয়া থাকিয়া অনিল ও ললিতার মিলন সেবিয়াছিল এবং তাহাদের সমুখে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে অপ্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। ইহা শুনিয়া মুরলা বলিল—‘আহা, কেন বাধা দিতে গেলি তাহাদের কাছে ?’ ইহার উত্তরে চণলা বলিল—‘বাধা না পাইলে সখী জুথেকে কি লুখ আছে ?’

ইহার পরে কথার কথার চণলা মুরলাকে বিভ্রাস্ত করিল যে, সে কোন্ ব্যক্তি বাহ্যকে ভালোবাসিয়া মুরলা দিব্যরাজি এমন বিজনে চিন্তা করে ?

মুরলা বলিল—সে ব্যক্তি উচ্চ, আর আমি তুচ্ছ, হুজুর তাহার নাম আমি মুখে উচ্চারণ করিতেও সাহস পাই না।

ভালবাসি ; শুধায়ো না কারে ভালবাসি।

সে নাম কেমনে গরি, কহিব প্রকাশি !

আমি তুচ্ছ হ’তে তুচ্ছ, সে নাম যে অতি উচ্চ,

সে নাম যে নহে বোণা এই রসনার !

সুত শুই কুমুদটি পৃথিবী-কাননে

আকাশের তারকারে পুষে মনে মনে—

বিন বিন পূজা করি’ শুকায়ে পড়ে সে করি’,

আজ্ঞার নীরব প্রেমে বার প্রাণ তার।—

তেমনি পুষ্টিয়া তারে এ প্রাণ বাইবে হা রে,

তবুও লুকানো রবে একথা আমার !

চণলা বলিল—মুরলার এ প্রণব স্মৃতিছাড়।

প্রেমিনী তো প্রেমীর নাম ভণমালা করে, তাহার রসনার খেলনা করে। মুরলা যদি তাহার প্রেমীর

নাম প্রকাশ করিয়া বলে তাহা। হইলে তাহার সখী
চপলা তাহাকে অধিরাম তাহার নাম পান করিয়া।
তনাইবে, আর —

ফুলের মালায় কুমুম-আখরে
নিখি' দিব সেই নাম ;
দশার পরিবি — মাখার পরিবি,
তাহারি বলয় কাঁকন করিবি,
ছব্ব-উপরে বসনে ধরিবি

নামের কুমুম-নাম !

তখন মুরলা ধূরে বেনখোর দিকে চাহিয়া কবিকে
দেখাইয়া দিল।

কবি হুই সখীর নিকটে আসিল এবং মুরলাকে
বনসেবী বলিয়া সম্বোধন করিল এবং চপলা প্রহরান
করিল। কবি মুরলাকে বিজ্ঞাসা করিল, সে কোনো
দ্ব্যক্কে কি ভালোবাসিয়াছে, বাহার মত সে এমন
নিভৃত চিহ্নামত্যা হইয়া থাকে ? কে সেই দ্ব্য ?
কবির প্রশ্ন শুনিয়া মুরলা কাতর হইল এই ভাবিয়া
যে, কবি তাহার ছব্বের গুঢ় তথ এখনো ধরিতে
পারে নাই। কবিও মুরলাকে বলিল—তাহার
অস্তরে যেন কিসের অভাববোধ তাহাকে পীড়িত
করিতেছে, সে কোথাও আশ্রয় পাইতেছে না।

প্রাণের সত্ত্ব এক আছে যেন এ দেহ-মাঝারে,
হৃদ-উজ্জ্বলসের সিদ্ধ বস্তু এই কৃত্ত কায়াগারে ;
মনের এ রুদ্ধ স্রোত সেহুখানা করি' বিহারিত
সবত অগ্নি যেন জাহে সখি করিতে প্রাবিত।
অনন্ত আকাশ যদি হ'ত এ মনের ক্রীড়াফল,
অগ্ন্য ত্যক্তকারণি হ'ত তার খেলনা কেবল,
তোমিকে দিগন্ত আনি' রবিত না অনন্ত আকাশ,
প্রকৃতি জননী নিজে পড়াইত কালের ইতিহাস,
হৃদয় এ মন-পিত প্রকৃতির তত্ত পান করি'
আনন্দ-সঙ্গীত-স্রোতে কেলিত গো পুতুল তরি'।

কবি-মনের বিশ্বগ্রাসী মুখ। কবিকে বিহ্বল করিয়া
ভুলিয়াছে। কে এই অনন্ত মুখা নিহারণ করিতে

পারিবে ? মুরলা পাত্রে, কিন্তু সে তো তাহার প্রাণের
অপরিসের প্রণয় করিকে নিবেদন করিতে সাহস পায়
না। সে পান পাহিয়া তাহার শৈশব-সহচর করিকে
সাহস দিতে চেষ্টা করিতে লাগিল — সেই পানের ভিতর
দিয়া কাবোর পরিণামের পূর্ণ্যাতাস সেও হইয়াছে—

কতদিন একসাথে ছিহ ঘুমঘোরে,
তমু আনিতাম নাকে ভালোবাসি তোরে।

• • •

অবশেষে এ কপাল ভাঙ্গিল যখন,
ছেলেবেলাকার বস্তু ফুরাল যখন,
গইয়া বলিত মন হইই প্রবাসী,
তখন আনিহু সখি কত ভালোবাসি।

ভিত্তীয় সর্গের স্থান ক্রীড়াকানন, এবং ব্যক্তি
নলিনী ও তাহার সখীপদ। নলিনী ফুলবেশ
পরিভেদে। নলিনী তাহার পোষা ভ্রাতা-পাখীকে
পান পেতে পেতে তালি দিতে দিতে 'নাচাইতে
লাগিল—'নাচ ভ্রাতা, তালে তালে।' এই কবিতাটি
প্রথম-প্রকাশের 'কেশোরক' বিভাগে ছাপা হইয়াছিল,
পরে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আম বিবাহ-সভায় নলিনীর ভক্ত অহুতেরা সকলে
আসিব, তাহাদের মনোহরণের মত নলিনীর বেশভূষা
শোভন ও শোভন করিতে হইবে, কিন্তু তাহাদের
কাহাকেও নলিনীর পছন্দ নয়, সে সখীদের বলিল—

হেথা আর তোরা, সে সখি সাম্যরে
ভ্রাতা পাখীজির ঘোর !
হুট ফুল বলা হুইট ডানার,
বেলহুড়ি-মালা কেমন মান্য
সুগোপ গলায় গুর !

তৃতীয় সর্গে মুরলা ও তাহার দাদা অনিলের
কথামতঃ বর্ণিত হইয়াছে। মুরলা এক দুর্বল মুহুটে
তাহার প্রাণের সোপান প্রদানের কথা তাহার দাদার
নিকটে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল। অনিল কবিকে
মুরলার প্রতি উদাসীন দেখিয়া ও তদনীর বিজ্ঞতা

শেখি যা কবিকে নিলা করিতে উত্তম হইতেছিল,
কিন্তু মুরলা তাহাকে বাধা দিল, সে কবির নিলা
কিছুতেই সঙ্গ করিতে পারিবে না।

চতুর্থ সর্গে কবি একাকী গান গাহিয়া ফিরিতেছে—

বিশাশার স্তীরে স্নিহাবারে বাই,
প্রতিদিন প্রাতে শেখিবারে পাই
লতা-পাতা শেখা জানালা-মাকারে
একটি মধুর নুঃ।

চারিদিকে তার ফুটে আছে ফুল,
কেহ বা হেলিয়া পরশিছে ফুল,
হুয়েকটি শাখা কপোল ছুইয়া,
হুয়েকটি আছে কপোলে দুইয়া,
কেহ বা এলায়ে চেতনা হাবারে
চুমিয়া আছে চিবুক !

পর পর ছাটি গানে কবি সেই মনোরম-নুঃ-ধারিণী
রমণীর প্রতি নিষেধের প্রেমের কথা ব্যক্ত করিল,
এবং অবশেষে তাহার নামও বলিয়া কেলিল—

ওনেছি — ওনেছি কি নাম তাহার —

ওনেছি — ওনেছি তাহা।

নলিনী — নলিনী — নলিনী — নলিনী —

কেমন মধুর আছা !

* * *

নলিনীর মতো চন্দ্র তাহার

নলিনী বাহার নাম !

পঞ্চম সর্গের স্থান কানন, কাল রাতি, পাত-পাতী
অনিল, ললিতা, নলিনী, নলিনীর সখীগণ, বিজয়, প্রবেশ,
বিনোদ, প্রেমোদ, অশোক, নীরব। কাননের এক
পাশে অনিল তাহার নব-পরিণীতা বধু ললিতাকে
গান করিয়া বলিতেছে—

‘বউ ! কথা কও !’

অনিল তাহার নবোঢ়া লজ্জিতা প্রণয়িনীকে কথা
কহাইবার ভয় কত সাধা সাধনা করিল, কিন্তু

লজ্জিতা ললিতা কিছুতেই তাহার প্রাণের প্রাণ
প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিল না। বিবশা ললিতা
স্বখাতিশয়তার অসহনীয়তার কান্না কেলিল।

কাননের অপর পাশে নলিনী অভিমান করিয়া
বিষমকে তাহার ভালোবাসার অপসীততার ভয়
ভংগনা করিতেছিল, কেবল নুঃ ভালোবাসি বলিলে
ভালোবাসার ও রমণী-ছবির অপমান কত। হুঃ।
যদি প্রকৃত ভালোবাসার পরিচয় দিতে হয়, তবে
‘স্বপ্নের অঙ্গ বেশ’ দিবানি পদতলে।’ ইহার
পরে নলিনী বিষমকে একটি কামিনী-কুলের শুদ্ধ
তুলিয়া দিতে বলিল। বিষম জিজ্ঞাসা করিল—
‘কি পাইব প্রত্যাহার ?’ নলিনী বলিল—

একটি কুসুম, যদি ঠাই পায়

আমার অলক-মাল্যে,

একটি কুসুম হুয়ে গড়ে যদি

এ মোর কপোল ‘পরে,

একটি পাগড়ি ছিঁড়ে গড়ে পারে

গুণ্ড মুহুরের তরে,

তুলে যদি রাখি একটি কুসুম

বজিতে এ কণ্ঠহার —

তার চেয়ে বল’ আছে তাগো তব

আর কিবা প্রত্যাহার !

বিষম ফুল তুলিয়া দিল। নলিনী সেই ফুল পদদলিত
করিয়া বলিল—

‘অনুগ্রহ করি’ এ চরণ দিয়া

ফুলগুলি তব দিলাম বলিয়া,

এই তব প্রত্যাহার !

বিষম বলিয়া উঠিল —

আছা ! আমি যদি হেতুম সজনি,

একটি কুসুম ওর, —

ওই পদতলে বলিত হইয়া

ত্যাগিতাম বেহ মোর !

নলিনী বিজয়ের কথা কৰ্ণপাত না করিয়া
নিজ মনে গাহের নিকে চাহিয়া ফুলগুলিকে লগোমন
করিয়া গান করিতে লাগিল। দুই হইতে অগোক্ষ,
সুরেশ, বিনোদ, নীরদ, প্রমোদ বিজয়কে নলিনীর
নিকটে দেখিয়া তাহার সোভাসো ভ্রম্যাবিত হইয়া
উঠিতে লাগিল। প্রমোদ নলিনীর নিকটে গিয়া
গান ধরিল—

আধার পাখা উদয় করি'
হরিত পাভা বোম্বটা পতি'
বিজন বনে মালতী-বালা
আছিল কেন ছুটিয়া ?

* * *

নলিনীও গান গাহিয়া ইহার উত্তর দিল—

আধার বনে আছি সো ভালো,
অবিক আশা রাখি না।
তোমার চিনি চতুর অলি,
মন-ভুলানো বচন বর্ষি'
ফুলের মন হরিয়া ল'য়ে
রাখিয়া ঘাস বাত্মা !

*

নলিনী প্রমোদকে পরিত্যাপ করিয়া বিজয়ের
কাছে গেল। বিজয় প্রত্যাখ্যানের ভয়ে নলিনীর
কাছে যায় না, কিন্তু নলিনী তো চায় প্রণয়ভিলাষী
পুরুষকে প্রত্যাখ্যান করিবার আনন্দ। তাই সে
বাঁচিয়া গিয়া বিজয়কে তাহার প্রসন্ন বচনে
প্রলুব্ধ করিতে লাগিল—

এ মুখ আমার, এ রূপ আমার
পুতান হইয়াছে ?
ভালো কথা, ভালো, প্রেম না থাকিলে
আসিতে নাই কি কাছে ?

কিন্তু বিজয় নলিনীর চপল চরিত্রের পরিচয়
পাইয়াছিল, সে আর কিছুতেই নলিনীর নিকটে
ধরা দিল না।

যত্নমর্মে পুনরায় কবি ও মুরলার কথোপকথন।
কবি মুরলার মুখ রান দেখিয়া তাহার সান্নিধ্যের কারণ
জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু সে কিছুতেই প্রকৃত কারণ
অন্ততঃ করে না; কবির কল্পনা মুরলাকে মুগ্ধ
করে। কবি মুরলাকে বলিল—‘আমার একটি গোপন
কথা আছে আমি তোমাকে বলিব।’ মুরলা ইহা
শুনিয়ায় ভক্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কবি সেই
গোপন কথা মুরলাকে প্রকাশ করিয়া বলিয়া ফেলিল—
‘শুভ্র এ সময় মোর ভালোবাসিয়াছে।’ মুরলা এই
কথা শুনিয়া উৎসুক আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—

ভালোবাসে ? কারে কবি ? কারে কথা ? কারে ?
কবি উত্তর করিল—

মধুর নলিনী সম নলিনীবালায়ে।

এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া মুরলার বুক ভাঙ্গিয়া
গেল। তথাপি সে মনের ক্রেশ গোপন রাখিয়া
সেবতার কাছে তাহার বালাসখাকে স্থায়ী করিবার
জন্ত প্রার্থনা জানাইল। সে আবার কবিকে জিজ্ঞাসা
করিল—‘বড় ভালোবাস কি সে নলিনীবালায়ে ?’

তাহার উত্তরে কবি বলিল—

শুধু যদি বলি যদি ভালোবাসি তাত,
এ মনের কথা বেন তাহে না ছুয়ায় !

* * *

মনে কয় বেন যদি এত ভালোবাসা
কেহ কারে বলে নাই, কারো মনে আসে নাই,
প্রকাশিতে নারে তাতা মানুষের ভাষা।

এই সময়ে নলিনী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল
এবং কবিকে লক্ষ্য না করিয়াই উপেক্ষা করিয়া
চলিয়া যাইতেছিল। তখন কবি গাহিয়া উঠিল—

পূর্ণিমা-রূপিণী বালা, কোথা যাও, কোথা যাও !
একবার এইরিকে মুখনি ছুঁিয়া চাও !

কবি মুরলাকেই সাক্ষী মানে যে সে কি কোথাও নলিনীর
অপেক্ষা স্থায়ী কাহাকেও দেখিয়াছে ? মুরলা বলিল—

হা, ঐ সৌন্দর্যই কবি-প্রিয়। হইবার ধোনা। এবং
সে মনে মনে বলিল—‘তুমি যদি হুঁই হও, কি হুঃ
আমার !’

চপলা আসিগ পান পাতিতে পাহিতে—

সখি, ভাবনা কাহারে বলে ?

সখি, বাতনা কাহারে বলে ?

তোমরা যে বলে দিবস রজনী

ভালোবাসা, ভালোবাসা,

সখি, ভালোবাসা কারে কর ?

চপলা মুরগার মুখে হাসি দেখিয়া তাহাকে হুঁই মনে
করিল, এবং তাহাকে ডাকিল। লইয়া প্রস্থান করিল।

সপ্তম সর্গে অনিল ও ললিতার কথা। অনিল
ললিতাকে কাছে চায়, তাহার মুখে প্রেমের কথা
তিনিতে চায়, কিন্তু ললিতা লজ্জায় পারে না, কিন্তু
তাহার সমস্ত অন্তর তাহাই চায়, সে তাহার দহিতের
আদর সোহাগ আরও আরও চায়। কিন্তু সে নিজেকে
এমন সামান্য অল্পবল্লু মনে করে যে, সে সাহস করিয়া
তাহার চন্দ্র উল্লু করিতে পারে না।

অষ্টম সর্গে মুরলা ও চপলার কথা। মুরলা যে
তাহার সখীর নিকটেও চন্দ্র-বেদনা ব্যক্ত করে না,
ইহার অভিযোগ চপলা জানাইল। মুরলা বলিল—

বাহ্যেরে মুখে আমি মুখে রই,

সকলোই হুঁই তার।।

চপলা মুরলাকে সন্ধান দিল যে —

এতদিনে দেখি কবির অধরে

হরৎ-কিরণ আসে,—

যেন ঝাঁপি তার ভূবিয়া গিয়াছে

হৃদয়ের অশন-তলে !

মুরলা ভিজ্ঞাসা করিল—‘বড় কি সে মুখে আছে ?’

চপলা সন্ধান দিল যে কবি নলিনীকে ভালোবাসে
কিন্তু নলিনী নিষ্ঠুর-কদম্বা, তাহাকে চপলা দেখিতে পারে
না। তখন মুরলা নলিনীকে সন্দর্শন করিতে লাগিল,

কিন্তু সে কবি সে-রহস্যময় ভালোবাসিয়াছে তাহার

নিম্না মুরলা সহ করিতে পারে না। পরে চপলা
সন্ধান দিল যে, নলিনীও কবি কবিকে ভালোবাসিয়াছে।
তখন মুরলা বলিল—

নলিনী-বালায়ে ভালোবেসে যদি

কবি মোর মুখে থাকে,

তাহা হ’লে সখি, বল যেখি মোরে,

কেন না বাসিরে তাকে ?

মোরা তাহা ল’য়ে ভাবি কেন এত ?

চপলা লো আমরা কে ?

চপলা সেই ভাবে পান ধরিল—

কাজ কি লো, মন লুকানো থাক,

প্রাণের ভিতরে ঢাকিয়া রাখ।

হাসিয়া খেলিয়া ভাবনা ভূবিয়া

হরবে প্রেমোকে মাতিয়া থাক !

নবম সর্গে নলিনী ও সখীপদ। নলিনী পান
পাহিয়া সখীদিগকে বলিতেছে—

কি হলো আমার ? স্মৃতি বা সন্ধান,

কদম্ব হারিয়েছি !

সে কবির সর্পন পাইবার অন্ত ব্যস্ত। সে সখীকে
বলিল—

পথের ধারেতে বসি’ র’ব মোরা,

সেই পথে বাবে কবি।

দশম সর্গে মুরলার স্বপ্নোক্তি। কবি তাহার কাছে
আসিয়া, নলিনীর প্রতি প্রণয়ে তাহার মন যে কেমন
করিয়া ভরিয়া উঠিয়াছে, সেই বার্তা ওনাইতে লাগিল।
অধীর-হর্ষে তাহার শূভ্র অন্তর যে পূর্ণ হইয়াছে তাহা
সে তাহার বালাসখী মুরলাকে না ওনাইয়া কোথাও
শান্তি পাইতেছিল না। কবি মহানন্দে পান ধরিল—

কে তুমি গো খুলিয়াছ সর্বের দ্বার ?

চানিতোহে এত সুখ, ভেঙে গেল—গেল বুক—

যেন এত সুখ কসে ধরে না গো আর !

তোমার সৌন্দর্য্যভারে চূর্ণক-চন্দ্র হ। রে
অভিহৃত হ'য়ে বেন পড়েছে আমার !

তোমার চরণে দিলু প্রেম-উপহার ।
না যদি চাও যে দিতে প্রতিলান তার,
নাই বা মিলে তা বালা, থাক' ছদি করি' আলা,
জন্মের থাকুক ভেদে সৌন্দর্য্য তোমার !

একদশ সর্গে অনিল ও ললিতা । অনিল ললিতার
কাছে প্রণয়ের পরিচয় পায় না বলিয়া ক্ষুর । প্রণয়ের
বাস্তবতা-বিহীন প্রণয়িনী—

বেন সে বাহার তরে মন ব্যগ্র আছে,
অশ্রুতীরী ছায়া তার ঠাড়াইয়া আছে ।

ললিতা প্রিয়তমকে বিধ্ব দেখিয়া চিহ্নিত ও ব্যাকুল ।
কিন্তু সে সাহস করিয়া তাহার বিধ্বভার কারণ জিজ্ঞাসা
করিতে পারিল না । ইহাতে অনিল আরও ক্ষুর হইয়া
প্রস্থান করিল । ললিতাকে সে সন্ধ্যায় না করিয়াই
চলিয়া দেখ' যেখান ললিতার জন্ম হাহাকার করিতে
লাগিল ।

ষাদশ সর্গে নলিনী ও তাহার প্রণয়্যাকাঙ্ক্ষীপণ ।
পুরুষ-পতঙ্গ রূপসীর রূপের শিখায় পাখা পুড়াইয়া আর
নড়িতে পারিতেছে না । কিন্তু নলিনীর ইহা মনঃপূত
হইতেছিল না—

রূপ—রূপ—রূপ—শোড়্য রূপ ছাড়া
আর কিছু মোর নাই ?

নলিনী সকলকে উপেক্ষা করিয়া বাক্যবাহে বিদ্ধ
করিয়া প্রস্থান করিল । অনিল নলিনীকে দেখিল, এবং
মনে মনে ললিতার সহিত নলিনীর রূপ তুলনা করিতে
লাগিল ।

উভের মধুর মুখ, ললিতার নলিনীর,
অবীর সৌন্দর্য্য কারো, কারো বা প্রাণত দ্বির !

কিন্তু সব আলোচনা করিয়া অনিল বুঝিতে পারিল—

ললিতা নলিনী-কাছে না-হয় রূপেতে হারে,
ভালোবাসি—ভালোবাসি তবু আমি ললিতারে ।

অনিল প্রস্থান করিল । সকলে চলিয়া গেলে দেখিয়া
নলিনীর মন কাতর হইল । সে দেখিল কবি তাহার
দিকে আসিতেছে । সে কবির প্রণয় চাহে না,—

আমি যে অবলা—কবির প্রণয়
অত নাহি করি আশা ।
আমি চাই নিম্ন মনের মাহুণ,
সাদাসিধে ভালোবাসা ।

একদশ সর্গে আমরা দেখি ললিতার লজ্জার বাধ
ভাঙিয়াছে । সে মুখ ফুটিয়া প্রিয়কে প্রণয় করিতেছে—

দিয়েছি তো ঘাঘা কিছু ছিল আপনার,
তবু কেন শুকাল না অঙ্গবরিধার ?

অনিল তাহাকে বলিল—বাহার এমন প্রেমময়ী
প্রণয়িনী আছে তাহার আর কিসের অভাব, কিসের
হ্রস্ব ? কিন্তু ললিতার প্রেমের দৃষ্টিকে সে ঠাকি দিতে
পারিল না, তাহার হাসি যে বরণার ছন্দবেশ তাহা
ললিতা বুঝিয়া বলিল—

মমতার অঙ্গরূপে নিভাইব সে অনলে ।

চতুর্দশ সর্গে কবি দুরলাকে বলিতেছে যে, আমি
অনেকদিন তোকে বিরলে কীদমিতে দেখিয়াছি, তুই
কি কাহাকেও ভালোবাসিয়াছিল ? যদি আমার এ
অল্পমান সত্য হয়, তবে তাহা আমাকে বলিল । কিন্তু
দুরলা সত্যোক্তে নিষেধ বাধার কথা ব্যক্ত করিতে পারিল
না । সে নলিনীর প্রেম উত্থাপন করিয়া নিষেধ
প্রসঙ্গ চাপা দিল । কবি নিষ্ঠুরা নলিনীর আচরণে
ব্যথিত হইয়া আসিয়াছে, সে পুনরায় নলিনীর মন
জানিবার জন্য প্রস্থান করিল । দুরলার সব আশা
নির্ধূল হইয়া গেল, সে সন্ধ্যাসিনী হইবে সন্ধ্যা করিল ।

পঞ্চদশ সর্গে কবি ও দুরলার পুনর্মিলন । দুরলা

কবিকে শিখ্রাঙ্গা করিল—আমি মরিয়া গেলে তোমার
কি বড় কষ্ট হইবে? কবি বলিল—অমন কথা বলিতে
নাই, হাজার হোক ‘তুমি ছেলেবেলাকার সঙ্গিনী
আমার!’ বুরলা বলিল—‘কবি, তুমি মূল ভালোবাস’
বলিয়া আমি তোমার মন্ত কিছু রজনীগন্ধা মূল
আনিয়াছি, তুমি কি সেগুলি লইবে?’ কবি সেই মূল
লইবার কথা কহিয়া নলিনী সে তাহাকে মূল দিয়াছিল
তাহার প্রসঙ্গ তুলিল—

সখি গো, নলিনী কাল ছুট চাপা তুলে’
পরায়ে দেখিল মোর ছই কর্ণমূলে;
পরশিতে দলগুলি পড়িছে করিয়া,
এখনো সুবাস তার ব্যগ্রনি মরিয়া!

বুরলা মূল করিয়া কবির হাত ধরিল—

সেখি সখা, একবার সেখি হাতখানি,
এ হাত কাহারে কবি করিবে অর্পণ?
কত ভালো তোমারে সে বাসিবে না জানি!
না জানি, তোমারে কত করিবে বচন!

কিলে তুমি র’বে সুখী সকলি সে জানিবে কি?
সেখিবে কি প্রতি স্তম্ভ অভাব তোমার?
তোমার ও মুখ সেখি’ অমনি সে বুঝিবে কি
কখন পড়েছে কসে একটু ঝাঁক?

কবি কিন্তু কিছুতেই বুঝিতে পারিজেছে না যে,
তাহার মনের স্তম্ভতা কেন পূর্ণ হইজেছে না—

কিছু হারায়েনি তবু পুঁজিয়া বেড়াই,
কিছুই চাই না তবু কি বেন কি চাই!
কোনো আশা না করিয়া বৈরাগ্যেতে বহি,
কোনো কষ্ট না পাইয়া তবু কষ্ট সহি।

কবি মনে করিল তাহার এই যে অতৃপ্তি তাহা
বোধ হয় বুরলার মনের কোনো অতৃপ্তির মাত্রই। তাই
সে বুরলাকে তাহার স্বর-কথা প্রকাশ করিতে
অগ্ররোধ করিল। কিন্তু বুরলা বলিল—

তুমি সুখী হও কবি, এই আমি চাই,
স্বস্তি অমী ম’লে মোর কোনো চঃখ নাই।

কবি সুখী হইবার জন্য নলিনীর লজ্জানে প্রস্থান
করিল। বুরলা উভয় সঙ্কে পড়িল, কবির কাছে
থাকিলে সে নিম্নে সুখী হয়, কিন্তু কবি তাহার বালা-
সহচরীর গোপন হৃৎ অহুতব করিয়া হৃৎখিত হইয়া
বুরলাকে হৃৎখিত করিয়া তোলে। সে একবার মনে
করে যে, কবির নিকট হইতে চিত্র-বিপাশ লইয়া বাইবে,
আবার মনে করে—

কিন্তু কবি মোর আং ভালোবাসামত,
আমারে না সেখি যদি তার কষ্ট হয়!

কিন্তু অবশেষে বুরলা স্থির করিল সে কবিকে
ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। বাইবার আগে সে প্রার্থনা
করিল—

অস্থগ্যাদী মেঘতা গো, তন একবার,
যদি আমি ভালোবাসি করিবে আমার,
কবি যেন সুখী হয়, নলিনী সে মুখে বয়,
সবারে আমার আমি ভালোবাসি বড, —
নলিনী-বালাও যেন ভালোবাসে তত।
নলিনী-বালার বড আছে মুখ ভালো,
সব যেন মোর হয়, মুখে থাকে বালা!
তবে চলিলাম কবি, আমি চলিলাম,
বুরলা করিছে এই বিদায়-প্রণাম।

যোড়শ সর্গে ললিতার স্বপ্নতোজিল। সে যে লক্ষ্য
ত্যাগ করিয়া প্রিয়কে প্রণয় নিবেদন করিতে পারে
নাই, তাহার ফলে প্রিয়ের মন তাহার প্রতি বিমুখ
করিয়া দিয়াছে, এবং সেই সর্জনশের উপক্রম করিয়া
এখন সে লক্ষ্য ত্যাগ করিয়াও আর সর্জনশ রক্ষা
করিতে পারিল না। সে তাহার প্রিয়ের মনের
পরিবর্তন বুঝিয়া চিন্তিত অহুতপ্র ভীত হইয়াছে। অনিগ
তাহাকে ত্যাগ করিয়া একাকী বিপাশার তীরে নির্জনে
দাপন করে, ললিতা তাহার কাছে বেলে তাহার মুখে
বিস্তারিত ভাব তাহার মজ্ঞাতসারেই ফুটনা উঠে, অখচ
কেন যে সে ললিতাকে ত্যাগ করিয়া একাকী বিপাশার
তীরে দিয়াছে তাহার পত সহস্র কারণ প্রদর্শন

করিতে থাকে। ললিতা তাহার কাছে পেনেই ললিতা
মেখে—

সহসা চমকি উঠি' কি বেন চরেছে ফুট
আমারে কাছেতে এনে ডাকিয়া বসান।

* * *

আপনি বলেন 'আদি' ভাসোবাসি, ভাসোবাসি,
সম্বন্ধ করেছি বেন প্রণয়ে তাহার!

সপ্তদশ সর্গে মুরলা একাকিনী প্রাঙ্গরে চিত্তা
করিতেছে—

হার কেহ নাই তার সব আছে,
সমস্ত জগৎ মুক্ত তার কাছে ;
তারি ডরে উঠে রবি নদী তার,
তারি ডরে ফুটে কুহন পাছে ।
একটি বাহার নাহিক আলর
সমস্ত জগৎ তাহারি বর,
একটি বাহার নাই সখা সখী

কেহই তাহার নহেকো পর !

মুরলা এইরূপ দার্শনিক চিন্তা করিয়া নিজের মনকে
সাম্বনা দিতে চেষ্টা করিতেছে। যে কবি পরবর্তী
কালে লিখিয়াছিলেন—

মনে ভাবিলাম যোরে ভগবান্ রাখিবে না মোহগর্ভে,
তাই লিখি' মিলে। বিধ-বিধিলি হু-বিধার পরিবর্তে ।

তাহারই দার্শনিকতা এই সর্গে সোথিতে পাই।

অষ্টাদশ সর্গে ললিতা চিন্তা করিতেছে যে, সে তো
এখন না ডাকিতে কাছে যার, যাচিয়া সোহাগ করে,
তু' সে বেন তাহার প্রিয়তমকে স্থানী করিতে পারিতেছে
না। চপলা আসিয়া ললিতাকে দেখিয়া বলিল—‘ভূমিও
কি শেষে মুরলারই নতো হইতেছ' এমন সময়ে কবি
সেখানে আসিল। চপলা কবিকে মুরলার নিকটে
বাইতে অহরোধ করিল। কবি মুরলার ক্ষত হৃদিত ;
মুরলা যে তাহার মনের বেদনা প্রকাশ করিয়া কবিকে
বলে না, ইহার ক্ষত কবি ব্যথিত। কিন্তু কবি কিছুতেই

অগ্রভব করে না যে, সে তাহার বালালনী মুরলাকে
ভালোবাসে বা মুরলা তাহাকে ভালোবাসে। ইহা অতি-
পরিচিত বনিষ্ঠতার ফল—নৃতনব না থাকিলে প্রণয়
মনকে সচেতন করিয়া তুলে না।

উনবিংশ সর্গে অনিল বিলাপার তীরে আসিয়াছে,
তখন তাহার মনেও ক্ষুদ্র বহিঃক্ষে, বাহিরেও ক্ষুদ্র
বহিঃক্ষে। ললিতা আসিয়া উপস্থিত। সে তো
হায়ার ক্রান্ত অনিলের সঙ্গে সঙ্গে দূরে। তাহাকে দেখিয়া
অনিল মাগ্ধে তাহাকে কাছে ডাকিয়া আদর করিল
এবং তাহার গান শ্রবণে কারণ জিজ্ঞাসা করিল।
তাহাকে প্রেম করিবার ক্ষমতা অনিল ললিতাকে গান
গাহিতে অহরোধ করিল। ললিতা গান গাহিল—

বুকেছি বুকেছি লখা, ভেসেছে প্রণয়,

ও মিছা আদর তবে না করিলে নয় ?

ও শুধু ব্যাড়ায রাখা, সে-সব গুণাগো কথা

মনে ক'রে মের শুধু, ভাঙ্গে এ ছন্দ ।

অনিল ললিতার তিরকারে ক্রুদ্ধ হইল, সে মনে
করিল যে, সে তো ললিতার প্রতি কোনো প্রণয়হীনতার
পরিচয় দেয় নাই, তবে কেন সে কৃথা তিরকার
সহ করিবে। সে ললিতাকে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান
করিল।

ললিতাও অভিমানে দ্বিষ্ট করিল—

হবে যা হবার,

না ডাকিলে কাছে কদু বাব নাকে। আর !

বিংশ সর্গে নলিনী একাকিনী গান গাহিতেছে—

পেরেছি পেরেছি আমি সখী,

একটি সমগ্র মন প্রাণ ।

সেবা কি ইহারে দূরে কেনে,

অথবা রাখি কাছে ক'রে,

তাই ভাবিতেছি মনে মনে,

কি করিব, বল তাহা যোরে ।

একবিংশ সর্গে অনিল চিত্রা করিতেছে—

ভেবেছিছি ঘাবি ভেসে কোনো কুলময় ঘেপে,

চাঁদের চুম্বনে বেথা ঘুমারে গোলাপ

হৃষের স্বপনে কহে স্মৃতি প্রলাপ ।

কিন্তু তাহা তো তাহার তাগো হয় নাই । চন্দরের
হত্যা করা বার বাবলাত, এমন রমণীর প্রতি তাহার
বিরাগ জন্মিয়াছে, তাই সে নলিনীকেও আর চান না,
কিন্তু গ্লানমূখী ললিতাতেও তাহার আর কৃপা নাই ।
কাজেই সে ললিতাকে আদিত্য দেখিবার প্রয়াস করিল ।
ললিতা অনিলকে জিজ্ঞাসা করিল—

বলো সখা কোথা যাও, চাও কি করিতে ?

অনিল উত্তর করিল—

মরিতে ! মরিতে বালা ! যেতেছি মরিতে !

অনিল প্রস্থান করিল এবং ললিতা স্তম্ভিতা হইয়া
পড়িল ।

ষাণ্মিংশ সর্গে নলিনীকে সন্ধান করিয়া বিনোদের
গান—

তুই রে বসন্ত-সদীরণ,
তোর নহে স্নেহের জীবন !

এই গানটি সম্পূর্ণ ‘কৈশোরকে’ হাণা হইয়াছিল ।

ত্রয়োবিংশ সর্গে কবি মুরলীকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে,
মুরলীর সখী চন্দাও মুরলীকে খুঁজিতে খুঁজিতে কবিকে
দেখিল এবং উভয়ে মুরলীর সন্ধানে যাত্রা করিল ।

চতুর্বিংশ সর্গে নলিনীর মনে সংসার উপস্থিত
হইয়াছে যে, গুরুষ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ না পাইয়া
হত্যা হইয়া চলিয়া যায়, কেন ?—

এ কি ভবে মন বিনিময় ?

জন্মের বিলম্বন নয় ?

পঞ্চবিংশ সর্গে মুরলী পথপ্রাপ্ত হইয়া সন্ধ্যাকালে
চন্দার অভাব বোধ করিতেছে এক খেদ করিতেছে
তাচার একাকী জীবনের ভ্রত, কবির গজও তাহার মন

হাহাকার করিতেছে । কিন্তু সে মনকে সাহস
দিতেছে—

দম্ব হুহুহু হোর মরণের সাধে, —

সে রে হোর হাত তার অস্থির হাতে !

এ সংসারে কেহ বনি হোরে ভালোবাসে

সে কেবল ওই মৃত্যু — ওইরে আকাশে !

শুভতার রক্তহীন হিম-হৃদে তার

আগিলন করেছে সে চন্দ্র তোমার ।

হে মরণ প্রিয়তম— স্বামী গো — জীবন মম,

কবে আমাদের এই সন্মিলন হবে ?

জীবনের দুঃখ-শয্যা তেজস্বি কবে ?

ষড়্বিংশ সর্গে নলিনী তাহার প্রেমিকের
প্রত্যাখ্যানে ব্যথিতা হইয়া চিত্রা করিতেছে যে, ইহার
আশে যে ব্যক্তি তাহার চরণের ধূলা হইবার জন্য ব্যগ্র
ছিল সেই ব্যক্তিই আজ তাহার প্রতি বিমুখ হইয়া চলিয়া
গেল ?

সপ্তবিংশ সর্গে কবি মুরলীকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে ।

অষ্টবিংশ সর্গে নলিনী দৌবনের অবসান অসুভব
করিয়া চিত্রিতা হইয়াছে, সকলে তাহাকে প্রত্যাখ্যান
করিয়া চলিয়া বাইতেছে দেখিয়া তাহার জ্ঞান হইতেছে
—ওবে কি ‘নলিনী হতেছে পুরাতন ?’ তাই সে
সখীদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছে—

ভালো ক’রে সাজারে যে দোরে ।

মুগ্ধি রূপ পড়িতেছে ক’রে !

করিতে করিতে খেলা জীবনের সন্ধ্যাবেলা

মুগ্ধি আসে ভিল ভিল ক’রে !

চির আশ্ব-বিলম্বন করে যে ভবত-মন

হেন মন কোথা পথি পাই ?

ঊনবিংশ সর্গে ললিতা প্রাপ্ত জীবনে মৃত্যুর বিশ্রাম
প্রার্থনা করিতেছে, তাহার ‘নিঃশেষ নিভার কোলে
ঘুবাতে দিয়াছে সাথ ।’

ত্রিংশ সর্গে মলিনীর—

বড় সাধ পেছে মনে ভালোবাসিবারে,
সখি, তোরা বল দেখি, ভালোবাসি কারে ?

একত্রিংশ সর্গে অনিল কবিকে মুরলার অবস্থা
কথিতে হাইবার জন্ত আচ্ছাদন করিতেছে। মুরলার
মুচু আসল, সে মরিষার আগে একবার কবিকে
সেখিবার জন্ত তাতাকে কবির সন্মানে পাঠাইয়াছে।

ছাত্রিংশ সর্গে মলিনীর নিঃসঙ্গ জীবনের হাংসকার
বর্ণিত হইয়াছে—

আজ আমি নিত্যর একাকী,
কেহ নাই, কেহ নাই হার !

একত্রিংশ সর্গে মুরলা পূর্ণপথ্যার শয়ানা, তাহার
পার্শ্বে চপলা আসীনা, কবি ও অনিলের প্রবেশ।
আজ কবি মুরলাকে চিরকালের জন্ত হারাইতে
বসিয়া দৃষ্টিতে পারিতেছে যে মুরলা—

প্রাণ মোর, মন মোর, লগনের ধন মোর,
সমস্ত জন্ম মোর, জন্ম আমার !

• • •
এতদিন এত কাছে ছিল এক ঠাঁই,
মিলনের অবসর মোরা পাই নাই।
কে জানিত ভালো সখি, ঘড়িবে এমন—
মরণের উপকূলে হইবে মিলন !

আজ মুরলার আর সুখের অবশি নাই, সে
তাহার প্রিয়তম কবির মুখে শুনিল যে, সে তাহাকে
ভালোবাসে। তাই সে কবিকে বলিল—

এই মরণের দিন যদি না ফুরায়—
মরিতে মরিতে যদি বেঁচে থাকি যায় —

কবিও তাহাকে বলিল —

বিবাহ হইবে সখি আজ আমাদের,
দাক্ষিণ্য বিবাহ ওই আসিবার আগে মই,
অনন্ত মিলন হোক এই দুজনের !

আকাশেতে শত তারা চাহিয়া নিমেষব্যাহার,—
উহার অনন্ত সাক্ষী র'বে বিবাহের !

আজি এই চুটি প্রাণ হইল অভয়,
মরণে সে জীবনের হবে না বিচ্ছেদ।
হোক তবে হোক সখি বিবাহ সুখের —
চিত্তার বাসরশয্যা হোক আমাদের !

আজ মুরলার আনন্দের দিন, সে কবিকে অল্পবোধ
করিল—

তবে তুলে আনো বরা রাশি রাশি ফুল ! —
চিতা-শয্যা হোক আমি কুহ্মমে আকুল !
বলনীরদ্বার মালা গাথো গো বরায়, —
সে মালা বলল কবি' দিগ এ দলায় —

অনিল ফুল আনিতে গেল ও ফুল লইয়া আসিল।
মুরলা আনন্দে বলিল—

কবি গো, স্বপ্নেও আমি ভাবি নাই কত
শেষ দিনে এত সুখ হবে মোর প্রভু !

কবি ফুলমালা বদল করিয়া মুরলার শয্যা কুহ্মম-
চূড়িত করিয়া দিতে দিতে বলিল—

বিবাহ ঘোড়ের আজ হ'ল এই অবসর,
ফুল বেধা নাওকার সদা ফুটে শোভা পায়
সেখার আরেক দিন ফুলশয্যা হবে !

মুরলা চিরবিদায় লইল কবি ও ভ্রাতা ও সখীর
নিকটে, তাহার মুখের শেষ কথা—

আজ তবে বিদায় বিদায় !

চতুত্রিংশ সর্গে মলিনীর অন্তিম কাল, সেও শেষ
পথ্যার শয়ানা থাকিয়া আশ্রয় মনে পান গাহিতেছিল—

বাবু বাবু, কি দেখিতে আসিয়াছ হেথা ?
কৌতুকে আকুল !

আমি একটি জুই ফুল !
গায় রাত এ মাথায় পড়েছে শিশির —
পগেছি কেবল !

প্রভাতে বড়ই শ্রান্ত রাত যে নদীর !
অতি হীনবল !

ভাষা কুন্তে ভর করি' তবেছি জীবন বরি'
জীবনে উদাস !
ওগো উষার বাতাস !

কাননে হাসিত চাপা হাসিত গোলাপ
আমি হবে মরিত্যের কাহি',
আজো হাসিবেক তারা শাখার শাখায়
হাতে হাতে কাহি' !

সে অমর হাসি থাকে — সে চরমরাশি থাকে
কুন্ত এই বিবাসের হইবে সমাধি !

অনিদ্র প্রবেশ করিল। সব ছুটাইয়া পেল !

এইখানে কাব্যের পরিসমাপ্তি। এই কাব্য আখ্যায়িকামূলক হইলেও ইহা 'সিরিকে'র মালা এবং ইহার অধিকাংশ ঐতিক্যবিভাই কবির প্রধাবনীর 'কৈশোরকে' নিবিষ্ট হইয়াছিল। তাহার পরে আর কোনো কবিতা ছাপা হয় নাই। আমি 'ইতিহাস পার্লিশিং হাউসে'র পক্ষ হইতে কবির সমস্ত বই প্রকাশের ভার লইয়া এই পুস্তক পুনঃপ্রণয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। বে বইখানি হইতে অংশ নির্বাচন করিয়া ও বাস্তবরচনা। সন্দেশন করিয়া কবি বঙ বঙ কবিতার বিভিন্ন নাম রাখিয়া 'কৈশোরকে' নিবিষ্ট করিয়াছিলেন, সেই বইখানিই তিনি আমাকে প্রেরণ-কপি করিবার ক্ষম দিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকে কবির নিজের হাতের সন্দেশন ও নামকরণ প্রভৃতি থাকতে ইহার ঐতিহাসিক মূল্য আছে মনে করিয়া আমি সমস্ত বই হাতে লিখিয়া নকল করিয়া প্রেসে 'কপি' দি, আসল বইখানি হস্তাঙ্গা ও বহুমূল্য বলিয়া আমি নষ্ট করি নাই। সমস্ত বইখানি একসঙ্গে কম্পোজ করাইয়া 'ইতিহাস প্রেরণ' বহন কবির কাছে এক পাঠাইলেন, তখন

কবি প্রক পড়িতে পড়িতে বিরক্ত হইয়া প্রক ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং আমাকে বলিলেন—
"এ কি আবার দেখা ! আর এই জুনি ছাপতে চাইছ ! না, এ ছাপা হবে না।"

কবি তাঁহার নিজের পরিণত প্রতিভার বিচারে বাহাকে ছাপার অযোগ্য বিবেচনা করিয়া প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিলেন, তাহার মধ্য হইতে আমরা বে-সমস্ত অংশ অল্প অল্প উদ্ধার করিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, ইহার মধ্যে কি কবিতা ও রচনা ছিল। ঠাট্টা অপরিণত রচনাও অনেক আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে মধ্যে বিকাশোন্মুখ মহা-প্রতিভার পরিচয়ও পদে পদে পাওয়া যায়। ইহা প্রতিভার সৌরমণ্ডলের নীহারিকা-অবস্থা, সে কথা কবি নিজেও তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে স্বীকার করিয়াছেন।

মাহুয় নিকটের মিনিসক অবস্থো করিয়া ধীরে চলিয়া যার, তাহাতে সে নিকটকে হারায়, দূরকেও পায় না,—এই কথাটি কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বাল্যকালের রচনা 'কবিকাহিনী' হইতে আরম্ভ করিয়া বহুবার বলিয়াছেন। মায়ার খেলার, লিপিকার তপসীর কাহিনীতে ও শরীর কাহিনীতে তিনি এই কথাই স্মরণতর করিয়া বলিয়াছেন। অতএব এই-সব শৈশব-রচনার মধ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি মূল স্রবের সন্ধান আশ্রয় পাই। অতএব কবিকে সম্পূর্ণ ভাবে বৃত্তিতে হইলে তাঁহার এই-সব বাল্য-রচনা অবহেলা করিবার উপায় নাই।

ভট্টা—রবীন্দ্র-পরিচয়—ঐপ্রশান্তরত্ন মহলানবিশ, প্রবাসী, ১৩২৮, মাঘ—চৈত্র ; ১৩২৯, চৈত্র, আষাঢ়, ভাদ্র। রবীন্দ্রপ্রশস্তী—ঐপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। 'জীবন-স্মৃতি', ১৪৫ পৃষ্ঠা ১০

* সেক্ষ 'রবিরাজ' নামে কবি-চক্র সমগ্র কাব্যের পরিচয় লিপিতোছেন ; তাহারই এক পরিচ্ছেদ — উষন-সম্পাদক

“আবাচুস্ত প্রথমদিবসে”

শ্রী প্রভাতকিরণ বহু, বি-এ

তোমার তুলিকাপাতে ওগো কবি, ওগো বরগীষ,
শতাব্দী শতাব্দী ধরি আবাচু হয়েছে রমণীয় ;
নবখনমেঘজায়া, বরষার অশ্রাস্ত বর্ষণ

জনশব্দবধূম সুখে হুগে করেছে হরণ,
বিরহী পেয়েছে তৃপ্তি, প্রেমিকের মিলনরজনী,
ভগোবন-তরুড়লে ঐশ্বরের মধুকলস্রনি
ইন্দ্রিত হইয়া আছে, হইয়াছে অম্বকরণী ;
অনির্জ্ঞা ব্যাতি তব, ওগো কবি, ওগো বরগীষ !

কল হ'ল কত রাজা, কত রাজা হ'ল নামধেয়,
কল হ'ল কত নদী, কল হ'ল কত বনোদ্দেশ,—
বসি কবে শিলাপটে পিপ্রাজটে রাজসভাকবি,
অপূর্ণ অশ্রুজলধে কুটাইলে কি বিচিত্র ছবি,
আজো তা রহিয়া গেছে,—চিরকাল রহিবে কখনে,—
একথা কি কেবেহিলে কোনোদিন অসতর্ক-কখনে ?

কি তোমার স্বেচ্ছা কৃষি প্রকৃতির গোপন বিলাস
নদীস্রবনবনপথে যে লীলা চলেছে বারোমাস !
মাধুর্যেরো প্রকৃতির ব্কেহিলে বিরীক্ষণ করি,
শাখত বা চিরন্তন, তাহারে লেখনীস্থে ধরি

রাখিলে অমর ক'রে, ধরনীতে রছিলে অমি
কাবাণিশাহুর লাগি, ওগো কবি, ওগো বরগীষ !

কাল দ্বারা এসেছিল, আজ তারা মিলানো কোথায় !
তারের পুঁথির পাতা হুলিডলে সময়ে লুটার !
আজ দ্বারা লম্বানিত, একদিন রহিবে না তারা,
বদন্তে হৃদয় বায়ু, বরষায় অবিপ্রান্ত দ্বারা
তবুও চলিবে নিত্য, চিরদিন চলিবে যেমন,
বিস্তৃত দিনের মত অনাগত নবীন জীবন
তোমাতে করিবে পূজা, তোমাতে ভাবিবে পরগীষ,
ভারত-ভারতী-পর্ক, ওগো কবি, ওগো বরগীষ !

নূতন সভাতা এল, চ'লে গেল কচি পুরাতন,
জাদিল নূতন ভাষা, নব আশা, নব আশিকন ;
পরিবর্তনের হুগে প্রতিদিন হেরি অগ্রগতি,
তবুও অম্লরী প্রীতি কেন পুরাতনতম প্রীতি ?
বর্ষে বর্ষে এলে কিংবদন্তি আবাচু প্রথম দিবস,
একাগের কবিচিত্র হয়ে গুঠে অনুভবতম,
ছায়া হুলুহুলার স'রে বায়,—যেরি চিত্তপ্রিয়
শত শতাব্দীর তুমি—ওগো কবি, ওগো বরগীষ !





জেজুরের কাহিনী

শ্রীযুগারকুমার মিত্র

জেজুর হলদী মেলায় অপর্যন্ত শ্রীযামপুর মহত্বনার একটি বড়িছু গ্রাম। পূর্বে এই গ্রামের নাম ছিল, 'কসবা', এবং জনশ্রুতি আছে যে, ১০৫০ সালে পোবিন্দ্ররাম মিত্র এই গ্রামের 'জেজুর' নামকরণ করেন। কিংবদন্তী এইরূপ যে, প্রত্যাকালে এই গ্রাম 'নাগর' নামক এক রাজার রাজধানী ছিল। বর্তমানে সে-স্থানে জেজুরের স্থান অবস্থিত, তথায় রাজ-প্রাসাদ ছিল বলিয়া প্রকাশ। মদুরতম স্টেটের কুতপূর্ণ প্রত্নতত্ত্ববিদ কয়েক বৎসর পূর্বে স্থানের নিকটে একটি পাথরের স্তম্ভ আবিষ্কার করেন। তাহার অভিমুখ এই যে, জেজুর পূর্বে একটি নগর ছিল। প্রশাসনিক গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ বর্তমানে 'নাগর-গাছি' বলেন।

জেজুর গ্রামের উত্তরে 'মোঙ্গলপুর' ও 'মদনাপাড়া' নামক দুইখানি গ্রাম, পশ্চিমে 'নুসিংহ আড্ডি বোড' নামক ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সাতা; দক্ষিণে 'নারায়ণপুর', ও 'রাজাপাড়া' এবং পূর্বে 'বলীপুর' নামক গ্রাম। এই গ্রামের মধ্য দিয়া একটা নদী প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। 'নাগর-গাছি' নামক স্থানের উত্তরে 'রাণীয়া' নামক একটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। উহার চারি পাশে স্থানীয় কুলের বাগান এবং বহু বাঁধান ঘাট ছিল বলিয়া প্রকাশ। বর্তমানে ঘাটগুলি নষ্ট হইয়া গেলেও, তাহার ভয়াবশেষ এখনও দেখা যায়। কিংবদন্তী এইরূপ যে, রাজার মহিলীগণ ঐ পুষ্করিণীতে স্নান করিতেন বলিয়া উহার নাম 'রাণীয়া' হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে পুষ্করিণীটার পকোদ্ধার কালে, উহা হইতে বহু

বিষুবৃদ্ধি এবং শিববৃদ্ধি বাড়ির হয়। পূর্বে নগরটী শৈব-প্রধান ছিল বলিয়া মনে হয়। প্রবাদ এইরূপ যে, কালাপাহাড় আসিয়া সূত্র 'নাগর' রাজাকে পরাস্ত করিয়া শেষে তাহার রাজধানীর সমুদায় দেব-দেবীর স্তুতি 'রাণীয়া' পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দেন।

বর্তমানে এই গ্রামের মধ্যে একটি ভীষণ মাঠ দেখা যায়; উহাকে গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ 'গড়ের মাঠ' বলেন। প্রবাদ এইরূপ যে, রাজার এইস্থানে 'গড়' ছিল। 'নাগর' রাজার পূর্ব-সমৃদ্ধির বহু পরিচয় সর্বত্র পরিণক্ষিত হইলেও, তাহার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণাদি কিছু পাওয়া যায় না।

জেজুরের পার্শ্বস্থিত গ্রামসমূহের নামকরণ 'নাগর' রাজার স্মৃতি হইতে হইয়াছে বলিয়া গ্রামবাসিনদের বিশ্বাস। যেমন, বলীপুর্কে যে স্থানে বাবা হইত, তাহার নাম 'বলীপুর', রাজার হাতীশালা যেখানে ছিল, তাহার নাম 'হাতীশালা', রাজার ধনদৌলত বেহানে থাকিত, তাহার নাম 'ভাগ্যহাটা', প্রভৃতি। এসমস্ত কথা সত্য। নিশ্চয় করিয়া বলা এক প্রকার অসম্ভব, তবে বহু প্রাকাল হইতে এই সমস্ত কথা লোকমুখে চলিয়া আসিতেছে।

'নাগর' রাজার বহু পরে, কুচপালের নবাব-বংশের এক নবাবও এখানে থাকিতেন বলিয়া শুনা যায়। তাহাকে সম্বোধে 'মোগল-না' বলিত। কিংবদন্তী এইরূপ যে, তাহার নাম হইতে জেজুরের পার্শ্বে 'মোগলপুর' গ্রামের সৃষ্টি হইয়াছে।

উদয় ও অস্ত

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

তাকাতাড়ি আকিসের পোখাক পরিতে পরিতে
পরীক্ষিত ডাকিল, “পাণ কই শিসীমা—পাণ?”

রাসাখর হইতে শিসীমা বলিলেন, “ওই বে, জোর
টেবিলের ওপর ডিবের রসেছে বে।”

সমস্ত টেবিল হাতড়াইয়া পরীক্ষিত পাণ পাইল না ;
রাগ করিয়া বলিল, “আর পাণ খেয়েছি। এতটা বেলা
মাঝ হ’রে গেছে, সারের মাঝ বা’ বলবে, তা’ বুঝ্বেই
পারছি—”

“এই বে দাশবাবু, পাণ এনেছি—”

পাণের ডিবা হুতে বে মেয়েটি প্রবেশ করিল, তাহার
পানে একবার তাকাইয়াই পরীক্ষিতের ব্যস্ততা বেন
বিশ্লিষ্ট বাড়িয়া গেল।

মেয়েটি আত্তে আত্তে টেবিলের উপর পাণ রাখিয়া
বাহির হইয়া গেল।

ডিবা খুলিয়া ছইটা পাণ একবারে মুখে পুরিয়া
পরীক্ষিত গম্-গম্ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

ঈন্দের দিন, বাড়ী কিরিতেই সন্ধ্যা হইয়া আসে।

বাড়ীর কাছাকাছি একটা গলির মুখে বে লোকটা
ধাঁড়াইয়া ছিল, সে তাহার পরিচিত। মূখের আলাপ
কোন মিন না থাকিলেও প্রতিদিন বাঙলা-আসা
করিবার সময় পরীক্ষিত এই লোকটাকে সন্ধ্যাকার-প্রার
ছোট একটা খরে দেখিতে পায়। এই বরটীর মধ্যে
সোকানের জিনিষ-পত্র থাকে, চা’ল, তা’ল, লবণ,
মিছ্রি—কিছুই অভাব নাই।

লোকটাকে জিনিষ-পত্র ওজন করিতে দেখা যায়,
মাঝে মাঝে সে হুত করিয়া রাসায়ন-মহাভারতও পড়ে।

পরীক্ষিত দেখিতে পায়, অনেক উড়িয়া দেবীর
লোক সেই পাঠ গোনে, শেষকালে তাহাকে ভক্তিতরে
প্রণাম করিয়া চলিয়া যায়।

লোকটা যেমন কালো, তেমনি মোটা। মাথায় মত

বড় একটা শিখা আছে, বলাব পূর্ব মোটা দাদা
পৈতাত্যও দেখা যায়, কাষেই সে বে পবিত্র ব্রাহ্মণ-বংশে
জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আজ পরীক্ষিত পাণ কাটাইয়াই চলিয়া আসিতেছিল,
লোকটা বাধা দিল। অত্যন্ত বিনয়নয় কণ্ঠে ডাকিল—
“বাবু—”

সে বে পরীক্ষিতকেই ডাকিতেছে তাহা পরীক্ষিত
প্রথমে বুঝিতে পারে নাই, সেই ক্ষণেই একবার
কাছাকাছি স্থান দেখিয়া লইল—আর কোন বাবু
নিকটে আছেন কি না।

লোকটা ছই পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাহার
সম্মুখে ধাঁড়াইল, হাত হু’খান। কচলাইতে কচলাইতে
বিনমূল্য কণ্ঠে বলিল, “আপনাকেই ডাকছি বাবু,
একটা বিশেষ কথা আছে।”

“আমার ডাকু? আমার সঙ্গে কথা আছে?”—

পরীক্ষিত বেন আকাশ হইতে পড়িল।

দীর্ঘ পাচটা বৎসর সে এই গলি দিয়া বাঙলা-আসা
করে, প্রতিদিনই এই লোকটাকে দেখিতে পায়, তাহার
সঙ্গে কোন দিন একটা কথা হয় নাই। আশ এমন কি
বিশেষ কথা তাহার সহিত থাকিতে পারে, বাহার ক্ষত
সে বোকান বন্ধ করিয়া পথে আসিয়া ধাঁড়াইয়াছে।

পরীক্ষিত বলিল, “কি কথা বল, একটু তাকাতাড়ি
বললেই ভালো হয়।”

মোটা লোকটা বাধিত হইয়া গিয়া বলিল, “আজ
তাকাতাড়িই বশু’বৈ কি। আমি সোকানদার হ’লেও
আমার কি সে জ্ঞান নেই যে, আপনি সেই ন’টার সময়
আকিন দিয়ে এই সন্ধ্যা বেলায় বাড়ী ফিরছেন। আমি
সোকানদার বটে বাবু, কিন্তু, ওই নিতাই, হ’রের
মতন দুখা সোকানদার নই; শোকের কষ্ট বেশ বৃদ্ধি।
আপনাকে কষ্ট দেব না বেশীদূর ধাঁড় করিয়ে রেখে—”

সে আরও কথা বলিত, বিবস্ত্র হইয়া পরীক্ষিত বলিল, “না, তুমি যে মুগ্ধ নও, বেশ সে জানা, তা’ আমি বেশ মনেছি। তোমার কথা বেশছি আশা বড়ার দেন হওয়ার মত। এক কাজ করো বাপু, কাল সকালে বরং আমার বাড়ীতে বসো, এই কথানা বাড়ীর পরেই—বস্ত্র নথরের গাল বাড়ীটা — বুঝে ? সকালে কাল বাড়ীতেই থাকব, তোমার কথা পোনা হবে।”

অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া মোটা লোকটি বলিল, “আজ্ঞে, আমি তো আপনার বাড়ী যাব না। যেতুম যদি—করদিন আগেই যেতে পারতুম। আপনার বাড়ী আমি বেশ চিনে রেখেছি, নথর সেওয়ারও কোন ধরকার ছিল না।”

আশ্চর্য হইয়া দিয়া পরীক্ষিত বলিল, “তোমার কথার মানে তো কিছু বুঝে পারব না, বাপু। বাড়ী ঢেন — তুমি যেতে পার না, — মানে ?”

মোটা লোকটি একটু কানিয়া বলিল, “আজ্ঞে, আমার পরিবার যে আপনার বাড়ীতেই আছে কিনা, সেই জন্তেই আমি যেতে পারছি নে। সে যদি আপনার বাড়ী না থাকত, আমি কি আপনাকে ছাড়তুম, বাবু-মশাই ? আপনার সঙ্গে সঙ্গে এতক্ষণ চ’লে যেতুম।”

পরীক্ষিত বেন আকাশ হইতে গড়িল, “তোমার স্ত্রী আমার বাড়ীতে আছেন ?”

প্রায় কাঁধ-কাঁধ হইয়া লোকটি বলিল, “আজ্ঞে বাবু, সে আমারই স্ত্রী। দেখেছেন বোধ হয় তাকে, চাপা-ফুলের মতন রঙ, চুল তার হাঁটু ছাড়িয়ে পড়ে, আর কি চোখ-মুখ—কি গড়ন—”

বাধা দিয়া পরীক্ষিত বলিল, “অত ভালো ক’রে দেখি নি, বাপু; চাপাফুলের মত রঙ, কি অমাবস্তার মত অন্ধকার, চুল তার—”

মোটা লোকটি অবশ্যই উত্তেজিত হইয়া বাধা দিল—“কালো বলবেন না, বাবু। দেখবেন বরং, কালো সে কিছুতেই নয়। আমার কথা মতি কি না একবার দেখলেই বুঝতে পারবেন।”

পরীক্ষিত বলিল, “বহুশুন,—কিন্তু মাগল কথা যে কি, তাই কেবল ভয়ে পেলুম না, কাজেই বুঝতেও পারলুম না। আর নথ বাপু, তোমার দা’ কথা বলবার না-হয় কাল সকালে আমি এখানে এসে ত্রেন হবে। বেজার শ্রুত ধরেছে, এখন কথা পাক। এই তো আশাশ-পরিচর হ’ল, কাল সকালে কথাবার্তা হবে।”

মোটা লোকটিকে আর একটা কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া পরীক্ষিত হুন্স করিয়া চলিল। খানিক দূর দিয়া একবার পিছন দিগিয়া দেখিল, মোটা কেটে লোকটি পথের পাশে তেমনই আড়ট তাবে দাঁড়াইয়া আছে।

কয়েক দিন পূর্ণ হইতে মেয়েটাকে বাড়ীতে সেবা যায়। একদিন তাহার কথা কানে আসায় পরীক্ষিত তাহার পরিচর লইবার মত ব্যগ্র হইয়াছিল।

কিন্তু পরিচর সে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই, পিসীমাও কিছু বলেন নাই।

আজও সে পিসীমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না; অপরিতোষা মেয়েটার নাম মুখে আনিতে কোথায় যেন বাধিয়া যায়।

সন্ধ্যা ৩-বেলা সে আসিয়াছিল,—একটা কথাও বেন বলিয়াছিল, কি কথা তাহা সে ভুলিয়া গিয়াছে, কথার স্মরণটাই মনে পাইয়া আছে।

এত স্মরণ—এত কোমল কণ্ঠস্বর মানুষের হয় ! আশ্চর্যের বিহীনভাবে শুইয়া পড়িয়া সে স্বপ্নের একখানা উপজ্ঞানের পাতা উঠাইতেছিল—বাহিরে পিসীমাকে লক্ষ্য করিয়া যে-মেয়েটা কথা বলিতেছিল, সে যুঁচা মানবা কখনই নয়।

এই মেয়েটা নাকি কোথায় মত স্মরণী, অমাবস্তার অন্ধকারের মত কালো তাহার চুল। বাড়ীতে আশ করটা দিন সে আসিয়াছে, পরীক্ষিত

আজ মাত্র তাহাকে নিষেধ করে আদিত্যে দেখিয়ারছিল
—অথপি সে ভাকার নাই।

তাহার পরের ঐ কিরিয়। বিয়াছে, এ কথা
নভা। যেখানে যে ভিনিসটী থাকিলে মানায়, সেই-
খানে সেই ভিনিসটী সাঝানো। টেবিলের উপর
বই-খাতাগুলি চিরকাল অপোছাণ ভাবেই পড়িয়া
থাকে, কেহই কোন দিন শুইয়া দেয় নাই। সে
নিষে কত দিন মজলব করিয়াছে, টেবিল ও আল-
মারিটা শুদ্ধাইয়া রাখিলে, কিন্তু সে ভিত্তি কোন দিন
কার্যে পরিণত হয় নাই, তাহার সার্থকতা সব
উদয়ন নই করিয়া দেখিয়াছে।

আজ কহদিন হইতে টেবিল প্রত্যহ শুদ্ধানো
সেবা বার, আলমারীর বইগুলি স্ফুর ভাবে সাঝানো।
সেখিলেই বৃদ্ধা বার, কেহ সতর্কণে সব সাঝাইয়া রাখা।

মনের মধ্যে উদ্ভূত করে, আনিবার প্রবল
বাসনা জাগিয়া উঠে—এ কে, কোথা হইতে আসিল।

পরিচয় বাঁকী হইতে জানার চেয়ে বাহির হইতে
জানা ভালো, আর সেইটাই প্রকৃত পরিচয়। বাঁকীতে
সে কি বলিয়া আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, কে জানে।
বৃদ্ধা পিসীমা তাহাকে জেনেন না, জানেন না,
অনিনই বেধে গিয়া দিয়া টানিয়া লইয়াছেন।

পিসীমা ওইতে ঘাইবার সময় দরজার মুখ
বাঁকাইয়া বসিলেন, “ওমা, এত রাত হ’ল, এখনও
আলো নিভিলে তলি নে, পরী? আবার তো উঠ’বি
সেই ভোর বেলায়, আর কোন রকমে নাকে-মুখে হ’টি
ডাট বিয়ে ন’টা বাহুতে মোঁকাবি। বে নে, বই
পড়া রাখ্ বাপু, জুনা।”

পরীক্ষিত একটু হাসিয়া বলিল, “স্বস্ত্যক্কে ব’লে
রেখেছি পিসীমা, ঠিক ণটা বাহুতেই সে এসে আলো
নিভিলে দরজা বন্ধ ক’রে ঘিরে যাবে এখন। তুমি আর
এই ঈতে হি হি ক’রে ঈপ’ছ কেন—ওতে যাও।”

পিসীমা বলিলেন, “এই বে ঘাই।”

একটু ইচ্ছাকৃত করিয়া বলিলেন, “সেখ্ পরী,
কাল মনে ক’রে আবার জন্তে বাপু একছোড়া চোড়া

লালপাড় শাড়ী কিনে আনিব তো। পোড়ার-
মুখে মনোমুগ্ধক টাকা দিগুন, সে কিনা কালোপাড়
শাড়ী নিয়ে এল। বিবির মজ্জি—কালোপাড়
পছবেন না, ওর জন্তে লালপাড় কাপড় চাই।
ওই বে বলে না—পুঁটেবুজুরীয়ে ছেলের নাম
পছলোচেন—ওর হজ্জাহ তাই। কোন্ চুলোর যেতে
হ’ত ঠিক নেই, আদর ক’রে নিয়ে এগুন—কাপড়
দিগুন—পছল হ’ল না, লালপাড় শাড়ী চাই। দাব্
সে, তুই বাপু কাল একছোড়া লালপাড় শাড়ীই
আনিব, বুজ্দি।”

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।
কথাটা শুনিয়াও হাসি পায়।

এ নিশ্চয়ই সেই স্ফুর যেরেটীর আব’হার।
সে লালপাড় শাড়ী চায়, পিসীমা মুখে ঘাই বসুন,
অজ্ঞে তাহাকে সমর্থন করেন, সেই জন্তেই লাল-
পাড়ের অর্ডার দিয়া গেলেন।

কিন্তু সে অত স্ফুর, তাহার তো কালোপাড়ই
মানার ভালো।

কে জানে মেয়েদের কি পছন্দ, লালপাড় না
হইলে হয় তো মহাভারত অণ্ড হইয়া ঘাইবে।

ভোর বেলা খুদ জাগিয়া গেল।

তন্ বানিকস্গ বিছানার ওইয়া থাকিয়া থেয়ে
পরীক্ষিত উঠিয়া পড়িল।

বাঁকী হইতে বাহির হইবার পথেই বেধা হইল
সেই মেয়েটীর সঙ্গে,—অত ভোরে দাম্প ঈতের
মধ্যেও সে গদাঘান করিয়া ঈপিতে ঈপিতে
কিরিসেছে, হাতে একটা জলের বট।

হা, অপক্লপ স্ফুরী বটে, বেঁটে লোকটা বাহা
বলিয়াছে, মিথ্যা নহ।

মেয়েটী তাহাকে সজ্জ্ব দেখিয়া একটু হাসিল,
জিজ্ঞাসা করিল, “দাদাবাবু, কোথায় যাচ্ছেন?
আমি এখনই চা ক’রে দেব—থেকে বার হবেন।”

উত্তর কি সেওয়া বার?

কিন্তু উত্তর দিবার আগেই দৃতি গরিয়া গিয়াছিল,

পিছন ফিরিয়া পরীক্ষিত আর তাহাকে দেখিতে পাইল না।

ফিরিয়া আসিয়া সে নিশ্চয় করে বলিল।

একটু পরেই এক কাপ চা ও কয়েকখানি বিস্কিট লইয়া প্রতি প্রবেশ করিল—

“নিম্ন দাখাবাবু, খেয়ে নিজে বার হ'ন।

একটু বেলা না হ'লে ডো কাপড়ের দোকান পূর্বে না। এই ভোরবেলা গিয়ে কি-ই বা কখনে? পিঙ্গামার বেমন কাছ নেই, ও'তে বাচ্ছেন বারোটোর সময়, তখন কিনা কাপড়ের কথা বলতে এলেন।”

পরীক্ষিত চারের কাশে চুপ দিতে দিতে কষ্টকটে বলিল, “এ তোমার ভারি অজ্ঞার; পিঙ্গামা কি বলেছেন, সে সব কথা ভুলি মুকিয়ে ওনেছ।”

হাতদুই মেরেটা হুঁটা হাত ঝোড় করিয়া বলিল, “কোহাই, ও অপরাধটা সেবেন না। মুকিয়ে শোনার অভ্যাস আমার কোন কালেই নেই। কি কব্ব বলুন, আপনাতা অত ঘোরে কথা বললে তা' কি কানে না এসে পারে?”

পরীক্ষিত আর কথা বাড়াইল না। ইহার কথা বলিবার ধাঁধ দেখিয়া সে চমৎকৃত হইয়াছিল, তাহার জরও হইয়া গিয়াছিল। সামান্য অশিক্ষিতা মেয়ে বলিয়া ইহাকে উড়াইয়া সেওয়া চলিবে না, ইহা বেন সে তাহার একটা কথার ভদ্রমাতেরই ধরিয়া গিয়াছিল।

প্রতি বেমন আসিয়াছিল তেমনই চলিয়া গেল, পিছনে এই ছেলের মনে যে ছাপ রাখিয়া গেল, তাহা একটা বার ভাবিলও না।

অকস্মাৎ অবরোধের অন্তরাল হইতে সে যে বাহির হইয়া আসিল, তাহাতে পরীক্ষিত খুসিই হইয়া উঠিয়াছিল। যতদিন প্রতি বাহির হয় নাই, ততদিন তাহার সম্বন্ধে যে বিরাট কৌতুহলটা আসিয়াছিল, এবার সম্বন্ধেই তাহার বীশাস হইয়া গেল।

সেই বেটে কাশা লোকটার কথাটাই মনে আসিয়া মাঝে মাঝে মাথা ধারণ করিয়া দেয়। সে বলিয়াছে,

প্রতি নাকি তাহার স্ত্রী; কিন্তু এও কখন সম্ভব হইতে পারে? সেই বেটে, ভীষণ মোটা, ভীষণ কাশা লোকটা—সে কিনা এই নিরুপমার স্বামী? এ কখনই বিশ্বাস করা যায় না।

সেদিন ফিরিবার পথে আবার সেই লোকটা আসিয়া ধরিল।

তেমনই বিনয়নয় কণ্ঠে বলিল, “তারপর বাবু, আমার কথাটা—”

উগ্রভাবে পরীক্ষিত বলিল, “কি তোমার কথা বাবু,—ব'লেই ফেল বা' বলার আছে। এক বন্টা সময় চাই, নিরিবিদি জাহা চাই,—অত খোস মেঝায়ে তুব্বার সময় আমার নেই তা' তো জান।”

লোকটা বলিল, “যাচ্ছে, এক বন্টা সময় আর নিরিবিদি জাহাওয়ার দরকার আমার নেই, এখানে পাড়িয়ে কথাটা শুুন।”

তেমনই উগ্রকণ্ঠে পরীক্ষিত বলিল—“বল।”

সে ঘোড়া বলিল তাহা এই—

তাহার বাড়ী বর্ধমান জেলার একটা পরীগ্রামে। ইয়ল-কলমে না পড়িলেও গুরুদ্বারের পাঠশালা পড়িয়াছে, এবং প্রতিবৎসরই পরীক্ষার পূর্ব দ্বন্দ্বানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে। খুব ছোট বেলায় পিতামাতা মারা গান, পিঙ্গামাই তাহাকে মানুষ করেন।

তাহার পর বিবাহ হয়। তখন সে ছিল উনিশ বৎসরের, এবং প্রতি ছিল পাঁচ বৎসরের বালিকা। সেই মেয়ে তাহাকে তখন হইতে বড় কম আগ্রাসন করে নাই। কতদিন তাহার টিকি কাটিয়া দিয়াছে, একদিন নাকি ঝগড়া করিয়া এখন রানতারণ বুঝাইয়াছিল তখন টিকিতে আগুন পথ্যত ধরাইয়া গিয়াছিল, তাগো সে আসিয়া উঠিয়াছিল, তাই তক্ষা, নহিলে সেদিন সে তো পড়িয়াই মরিত।

প্রতির বয়স এখন ডের হইয়াছে, বাইশ-তেইশ হইল, আমও সে সেই ছেলেরাছকটাই বহিয়া গিয়াছে। তেমনই ঝগড়া কান্নাকাটি আছে, তাগোর কথা যে টিকিটার দিকে আর দৃষ্টি দেয় নাই।

এই কয়েকদিন আসে বানী-রীতে তুলে কপড়া হয় ; বাড়ীর অন্ত ভাড়াটিয়াবা মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, একথা না বলিলে সত্যই মহাপাপ হয় । তারণ খিচুড়ি খাইতে চাহিয়াছিল, ধুতি ভাত মিলাছিল । তারণ পলাষাতে সব ভাত কেলিগা মিলাছিল এবং অত্যন্ত রাগের বশে কুড়িকেও একটা চড় মারিয়াছিল । ধুতি সেদিন সত্যই বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, আর ফিরে নাই ।

অবশ্য ত্রীকে প্রহার করা তারণের পক্ষে বড় অস্ত্রায় হইয়াছিল—সে পরম্পংগেই তাকে বুকিয়া ত্রীর অন্ত ছুটাছুটি করিয়াছিল । তাহার অনেক উড়িয়া বধু তাহাকে খবর দিয়াছিল—‘মারি’কে সে পক্ষার দিকে ঘাইতে দেখিয়াছে ।

ইহা শুনিয়াই তারণের চুহির হইয়া গিয়াছিল, এবং সে প্রায় কামিতে কামিতে পল্লভীরে ছুটিয়াছিল । সেখানে গিয়া অনেক অহুগন্ধান করিয়া সে জানিতে পারিল যে, ধুতি পল্লভীরে গিয়াছিল বটে, কিন্তু চুবে নাই । সে পরীক্ষিতের পিসামার সহিত তাহার বাড়ীতেই গিয়াছে এবং মহা আরাধনে সেখানে রহিয়া গিয়াছে । এদিকে তাহার বানী বেচারী যে কি দারুণ কষ্ট ভোগ করিতেছে, সে কথা সে একটি বাতগু ভাবে নাই ।

কথাগুণা বলিতে বলিতে কতবার তারণের কষ্ট রুদ্ধ হইয়া আসিল, কতবার হৃদয় চোখেও জল আসিল, অন্তিকণ্ঠে সে নিষ্পেক্ষে সামলাইয়া দাঁল ।

পরীক্ষিত হাসিলে কি কামিবে ভাবিয়া পায় না, বলিল, “তা’ আমার বলার ক্ষেত্রে তুমিই দিলে একবার বল না বাপু, তোমার কথা শুনে তার মনটা বরম হ’তে পারে ।”

যেন চম্কাইয়া উঠিয়া তারণ বলিল, “আমি বলব—তার কাছে ? তবেই আমার দেবেছেন, বাবু । তাকে বেখেই রাগে আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত অ’লে উঠবে, সে-রাগ সামলাতে পারব না, পেছটার বী-হত্যা ক’রে বলব ?”

শঙ্কিত হইয়া পরীক্ষিত বলিল, “না বাপু, তবে থাক,

তোমার আর বেতে হবে না । ‘আচ্ছা, আচ্ছা তুমি যাও, তাকে যা’ বুঝিয়ে বলবার তা’ আমিই বলব এখন ।”

অনুনবস্পূর্ণ কণ্ঠে তারণ বলিল, “হ্যা, অবিত্তি ক’রে বল’বেন, বাবু । বল’বেন—সে দিয়ে পর্য্যন্ত আমার আহার নেই ; বুবুই বটে—বদিত পুরো ঘুম হয় না । রোম চ’বেলা আহার হইতেছে ছাতু-গুড়—”

পরীক্ষিত আশ্চর্য হইয়া বলিল, “কেন, ভাত হ’লে ছুটুছে না তোমার কপালে ?”

করুণ স্বরে তারণ বলিল, “কেনন ক’রে ছুটুবে, বাবু ? ও বে আমার পরকাল খেয়েছে, ইহকাল করুণের ক’রে দিয়েছে । কোন দিন আমার একখটি জল পড়িয়ে খেতে দেয় নি, একটা পান পর্য্যন্ত না । হাতে-হাতে সব জুগিরে আমার মাথা খেয়েছে । দুঃখের কথা বলব কি, বাবু—উনোন ঘোটেই ধরাতে পারলুম না । শেষে অনেক কষ্টে উনোন ধরল—ভাতও হ’ল—কিন্তু এই হাতটাই পেল ।”

বাম হাতখানা লাম্বে বাহির করিতেই, বৃহৎ কোরা দেখিয়া পরীক্ষিত চম্কাইয়া উঠিল—“ইগ, বড় পুড়েছে তো !”

তারণ সঙ্গল নেড়ে ফোফাটার পালে চাহিয়া বলিল, “তবে আর বলছি কি ? এই দুঃখেই আর উনোনের খারে বাই নি । যা’ হোক, দোকানে ছাতু, চিড়ে, গুড় আছে, খেয়ে দিন কাটাচ্ছি ।”

পরীক্ষিত সমবেদনার স্বরে বলিল, “এক কাছ কর না কেন । যে কদিন তোমার বী না আসে, কোন হোটেল দিয়ে খাও না ।”

নিঃস্থিয়া উঠিয়া তারণ বলিল, “তা’ হ’লে ও কি আর আমার বুধ দেখবে কেবেছেন ? মা’তের বড়াই কত,—অহুকার দেখে সজা রাগ হয় । বলে, ‘হোটেলের কত সুচি দেখার বলার হতো খুশিরে এসে রান্না করে । যেদিন তবু হোটেলের খেয়েছ, সেই দিনই বাড়ী থেকে বার ক’রে দেব, নয় নিষ্পেক্ষ চ’লে যাব ।’ এতদিন কি কষ্ট ক’রতুম, বাবু ? পাছে একগা শুনে চ’লে যায়—এই ভয়ে দ্বিগে থাকলেও হোটেলখুঁধো হইনি ।”

পরীক্ষিত বলিল, “সে জানবে কি করে?”

তারপুঙ্খ হাসি হাসিয়া বলিল, “ও কথাটা বলবেন না; ওর চোখ সব দিকে আছে। কোথায় কি করি না করি, সব খবর ওর কানে আসবে। কেমন করে যে পায়, কে জানে।”

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে হাত হ’খান। কপালে টেকাইয়া বলিল, “আচ্ছা! আসুন বাবু, আপনার অনেক দেহী করিয়ে দিলাম, কিছু মনে করবেন না।”

আগে আগে সে চলিয়া গেল।

ওই মোটা বেটে লোকটার বুকের আড়ালে যে কতখানি প্রেম ও প্রেহ লুকাইয়া আছে, তাহাই তাবিত্ত্য পরীক্ষিত আশ্চর্য্য ভাবে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

পরিচয় বেশ হইয়া গিয়াছিল।

প্রতি কোন দিনই লজ্জা-সঙ্কোচ করে নাই, পরীক্ষিতের সঙ্কোচও আগে আগে সরিয়া গেল।

সেদিন সে স্পষ্টই বলিল, “আচ্ছা, তোমার স্বামী বেচার। না হয় তোমার একটা ফুই মেরেছিল, সে ক্ষেত্রে তোমার বাড়ী ছেড়ে এমন করে বার হ’য়ে পড়া উচিত হয় নি।”

বড় বড় হইটী চোখের পৃষ্টি পরীক্ষিতের মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া প্রতি সঙ্কোচকে বলিল, “ও, এদর কথা আপনার সঙ্গে হ’য়ে গেছে কুষ্টি?”

পরীক্ষিত গম্ভীর হইয়া বলিল, “শক্তি, কামটা তোমার ভারি অভ্যাস হয়েছে, প্রতি।”

প্রতি মুখ ভার করিয়া বলিল, “এক তরফ দেখে বিচার করবেন না, দাদাবাবু। সে লোকটা হুঁটে কথা বলে, হুঁফোটা চোখের জল ফেলেই আপনার মন গলিয়ে দিয়েছে দেখছি। আমি সব শুনেছি—সব জানি। পথে-ঘাটে বার-ভার কাছে আমার নিষে গেষ্টে বেড়াচ্ছে—সে আমি সব জানি।”

পরীক্ষিত উঠা উৎপত্তি দেখিয়া প্রমাদ গমিল, তাকা তাকি বলিল, “নিষে কিছু করে নি গো, আমার কাছেই হুঃ করেছে—কেমনা, তুমি আমার বাড়ীতেই আছ। সে বেশ জানে, তার কথা সব আমি তোমায় বলছি।”

প্রতি রাগভরেই বলিল, “আপনার মুখ দিয়ে তাইই কথা কেন আমি শুনি বলুন, দাদাবাবু? শক্তি তার যদি হুঃখই হ’ত—সে নিষে আসতে পারত না, পথে কিছু বলতে পারত না?”

হাসিয়া কেলিয়া তখনই গম্ভীর হইয়া পরীক্ষিত বলিল, “না, এক্ষেত্রেও তাকে মোথ বেগুরা চলে না। সে তোমায় সাংঘাতিক ভয় করে দেখলুম; তোমার ভয়ে সে হোটেলে না থেয়ে টিঁড়ে-ছাতু থেয়ে দিন কাটাচ্ছে।”

কঠিন মুখেই প্রতি বলিল, “আমার ভয়ে নাকি হোটেলে যায় না, নেকা বুঝাচ্ছে আর কি? নিজের ভাত হাঁখতে কি হয়েছিল?”

পরীক্ষিত বলিল, “প্রথম দিনের চেষ্টার ফলেই অনেকখানি হাত পুড়েছে দেখলুম।”

হঠাৎ মগ্ন করিয়া দিয়া উঠিয়া প্রতি বলিল, “ও সব সেকাঝো—আপনি বলে তাই বিশ্বাস করেছেন, আমি কখনও বিশ্বাস করবুম না।”

পরীক্ষিত বলিল, “বা, অন্ত বড় কোথাটা যে হাতে দেখলুম, ওটা তা’ হ’লে কিছুই নয়?”

প্রতি বলিল, “মঃ কে বলছে, দাদাবাবু; তবে শক্তি ওটা যে ভাত হাঁখতে নিয়ে হয়েছে, তা’ আমি কিছুতেই মানব না। ও সব কেবল আমাকে জ্বল করার—”

বলিতে বলিতে সে খামিয়া গেল এবং অভ্যাস গম্ভীর মুখে কি যেন ভাবিতে লাগিল।

পরীক্ষিত বলিল, “সে বাই হোক, তোমার কিন্তু ওখানে যাওয়া দরকার মনে করি। বেচার। কোন দিন আমার কি করে বসবে, তখন—”

প্রতি মূগ্ধ হইয়া উঠিল, বলিল—“হ্যাঁ, আমি যাব বই কি? আমার ওখানে—ওই স্বামীর কাছে আমি যাব।”

আজ এত বছর বিয়ে হ'য়েছে, একটা দিন যদি আমার একটা ভালো কথা বলে থাকে। নিতা কপড়া-বিবাদ—ভালো লাগে না বাপু; তার চেয়ে এই যে আমি এখানে রয়েছি—শান্তিতে আছি, নির্ভর্য্যে আছি। আবার আমি বাব? নিতা একে ডাক, একে ডাক, এ ও সে এসে কিনা কপড়া মিটার। চিরটা কাল এক সমান, একটু বদলায় নি—আর বদলাবেও না।”

পরীক্ষিত শান্ত ভাবে বলিল, “উণ্টো কথা বলছ। সে বললে, তুমিই নাকি কতবার তার টিকি কেটে দিয়েছ; অবশেষে একবার নাকি আগুন দিয়েছিলে?” সমর্পে গুটি উত্তর দিল—“হ্যাঁ, দিয়েছিলামই তো! সেব না? তোক আমি দুমিরে পড়লে আমার মাথার বেইটাকে খাটের পায়ের এমন ক'রে বেঁধে রাখত যে, খুন ভেঙ্গে পরিজাতি চীৎকার করতে হ'ত। বেশ করেছি, টিকি কেটেছি, আগুন দিয়েছি, সেই ভয়েই তো টিকি ছোট করেছি।”

পরীক্ষিত আর কথা তুলিল না, ব্যাণার শুকুতর দেখিয়া হুপ করিয়া দেল।

পিসীমা দিন পনেরর অল্প বেশে বাইবেল। গুতি আম কয়দাম আসিয়াছে, পিসীমার ভারি বিশ্বাসের পায়ীও হইয়াছে। পিসীমার মুখে এ মেয়েটার লুখ্যাতি আর ধরে না। বাড়ীর আশে-পাশে বতগুলি বাড়ীর বাসিন্দা আছে—প্রত্যেককেই কনাইয়া মিয়াছেন, মেয়েটা যেমন লুখরী, শুণও তার তেমন।

গুতির হাতেই সঙ্গারের সমস্ত ভার দিয়া তিনি একদিন শুভক্ষণে বড়না হইয়া সেলেন।

বতদিন পিসীমা ছিলেন, নিলক্ষ্যে ততদিন কথা-বার্তা চলিয়াছে। পিসীমার গাড়ীতে উঠার সঙ্গে সঙ্গে গুতি বেন সঙ্গারের পূর্ণ কর্তী হইয়া পড়িল,—তাহার আর সেবা পাওয়ারই দরক হইয়া উঠিল।

পরীক্ষিত অস্থির হইয়া উঠে।

এই লুখরী মেয়েটার সঙ্গে কথাবার্তা বলিবার লোভ সে সামলাইতে পারিত না। আমকাল আফিসে বাইতে তাহার যেমন গেরি হয়, দিগিয়া আসে তেমন সকাল সকাল।

গুতি গস্তীর মুখে জিজ্ঞাসা করে—“এত সকাল সকাল আমকাল আসেন যে, সারের কিছু বলেন না?”

পরীক্ষিত কোনদিন বলে—সাংহেব আফিসে নাই, কোনদিন বলে—মাথা ধরিয়াছে।

সেদিনে মাথার বগ্নায় সে ছটকট করিতেছিল। গুতি প্রথমেটা আসে নাই, দামীর মুখে শুনিতে পাইল—পরীক্ষিত বগ্নায় অস্থির হইয়া তাহাকে ডাকিতেছে।

ঘরে আসিয়া দেখিল, পরীক্ষিত সজাই ছটকট করিতেছে।

গুতিকে দেখিয়া একটু রাগ করিয়াই সে বলিল, “বেশ মাছ তুমি, গুতি। মনে কর, আমি যদি পিসীমা থাকতেন, তিনিই মাথার কাছে বসতেন। তিনি তোমার কেবল সঙ্গার দেখা শোনার ভারই তো দিয়ে দান নি, আমার সেখ'বার ভারও দিয়ে গেছেন। আমি এই বগ্নায় বসি, আর তুমি কিনা—”

অপ্রতুত হইয়া গুতি তাহার মাথার কাছে বলিয়া হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

পরীক্ষিত চম্ বুমিয়া হুপ করিয়া বানিক পড়িয়া রহিল—

“দান গুতি—তোমার সেই কদাকার স্বামী কাল-পরগু মেনে চ'লে যাচ্ছে সোকান তুল দিয়ে।”

মনে হইল গুতি বেন কাঁপিয়া উঠিল।

পরীক্ষিত তাকাইয়া দেখিল, গুতির লুখভাবেব এতটুকু পরিবর্তন হয় নাই।

সে বলিল, “বেটা আজ সকালেই আমার ধরেছিল। ছোটলোক কিনা—বত দূর দূর করি, তত কেনে লুখ ভালায়—আর বলে—‘একটা বার সেবা করব’। ল্পট

ব'লে নিগেছি, দেখা হবে না। চাকরটাকে ব'লে রেখেছি, আমি যদিও থাকার সময় যদি আসে তখন পুসিনের হাতে দেবে।"

যুতি একটা উত্তরও দিল না—সে যেন কি ভাবিয়েছে।

পরীক্ষিত বিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি তার কাছে যেতে চাও, যুতি—?"

যুতি উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিল—"না।—"

পরীক্ষিত বলিল, "গতি কথা। সেই কালো বেঁটে বামন—সে কি তোমার মত হুন্দরী মেয়ের স্বামী হওয়ার উপযুক্ত? যাকে দেখলে হুগা, হুধ, আমি নে—কি ক'রে এতদিন তারই ঘরে ছিলো। সেখ'তে ওই বিজীষণ চেহারা, প্রকৃতিও অজৈবিক চমৎকার,—কোনো কালে ওর চেয়ে বদাকার কোনো মেয়েও ওকে ভালোবাসতে পারবে না, এ আমি ঠিক ব'লে মিছি।"

হাতখানা সরাইবার চেষ্টা করিয়া যুতি বলিল, "এবার আমি ঘাই দাদাবাবু, তখনাথকে আদতে বলি, আপনাবা মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে।"

হঠাৎ মোর করিয়া তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া পরীক্ষিত বলিল, "তখনাথ এসে কি ক'বে, যুতি? তোমার হাত মত নয়, তার হাত তেমন নয়। আমি আশা তোমাকেই চাই, সেই জন্তে বাড়ী চ'লে এসছি।"

যুতির চোখ চুইটা একবার ধক্ করিয়া চলিয়া উঠিল, সে ধীরে ধীরে হাতখানা মুক্ত করিয়া বলিল, "তাই হবে, একটু ওরে ধাক্কা — আমি আসছি।"

ক্রম পদে সে বাহির হইয়া গেল।

যুতি চুপ করিয়া বাদামাখার ধারে দাঁড়াইয়া ছিল। নিকট হইয়া পরীক্ষিত বলিল, "তুমি নাকি চ'লে যাক্, যুতি?"

ফিরিয়া তাহার মুখের উপর মৃদল চোখের দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া যুতি বলিল, "হ্যাঁ, আমার স্বামী বাড়ী আনতে গেছেন। আমার আশাই বইমানে চ'লে যাক্, কলকাতার আর থাকবে না।"

"তোমার স্বামী —?"

পরীক্ষিতের আর কথা ফুটিল না।

যুতি উত্তর দিল, "হ্যাঁ, আমার স্বামী।"

পরীক্ষিত বলিল, "সে তোমার অপমান করেছিল না?"

একটু হাসিয়া যুতি বলিল, "অপমান? না, তাকে অপমান বলে না, দাদাবাবু; সামগ্রিক ভাবে আমার একটু রাগ হয়েছিল, সে-রাগ মিটে গেছে, তাই তারই সঙ্গে বাড়ী যাক্।"

এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া সে বলিল, "ঘর কল্লতে সেলে এমন খুঁটিনাটি কেবোই থাকে। মোব তার একবার নয়, আমারও বটে। সে যা' বলত, আমি তা' শুনতুম না—কেবল তাকে রাগাবার চেষ্টা করতুম। সে সেখ'তে বিজী, তন্ তাকেই আমি পৃথিবীর সব মিনিসের চেয়ে—আমার নিম্নের চেয়েও ভালোবাসি, দাদাবাবু। তুমি তো অতি ছোট, আমি যদি সর্বশ্রেষ্ঠ রূপবান পুরুষ আমার সামনে এসে আমার প্রার্থনা করে, আমার কুসং স্বামীর তুলনায় সেও হবে অতি অল্প, অতি কুসং।"

বেচারি পরীক্ষিত একটা কথাও বলিতে পারিল না।

যুতি বলিয়া চলিল, "মেয়েদের এতটুকু ধর্ম্মতার অবকাশ পেলে তাদের সর্পনাশ করতে বেরো না, দাদাবাবু। ওদের বাইরের আকৃতি দেখে বিচার করতে বেরো না। ওদের মধ্যে বেধানে গতিকার দর থাকে, সেই দায়গাটা আসে দেখতে চেষ্টা কোরো। কোনো—সকল মেয়েই স্বামী কন্যাকার হ'লে হুগা করে না, গতিকার প্রেম-ভালোবাসা মাছের মৈত্রিক সৌন্দর্য দেখে বেচারি না, সে দেখে মাছের অস্তর,—সেইখানেই তার বন্ধন। তাই তোমার প্রেম-নিবেদন বার্থ হবে

সেহে, তোমার হৃদয় আকৃতি আমার চোখে অতি
ক্ষমত ব'লে বোধ হয়েছে।"

নীচে গাড়ী আসিয়া গাড়াইল, তারপর পরীকে
ডাকিতে আসিল।

পরীকৃতকে দেখিয়া সে মহানন্দে একগাল হাসিহাসিয়া
বসিল—“এই যে, বাবু; আপনাদের দয়াজেই আমি আবার
ওকে ফিরে পেলাম। আপনি এসে ওকে আমার সব
কথা বলেছিলেন ব'লেই ও কাল আমার কাছে লোক
পাঠিয়েছিল। আপনি মিটাবার চেষ্টা না করলে এ
মনোস্তর কখন মিটত না। এ কতটা মাস ওকে আপনারা
না রাখলে কোথায় ভেসে চলে যেত, আপনারা
রেখেছিলেন ব'লেই ওকে আবার আমি পেলাম।"

প্রথম ভক্তিরূপে সে অস্তিত্বপ্রাপ্ত পরীকৃতের পায়ে
শলা লইয়া মাথা দিল।

গতি নত হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া গাড়াইল,
বসিল, “কিছু মনে করবেন না, দাদাবাবু। অনেক
অকথা-কুখ্যা বলেছি, ‘আপনি’ ছেড়ে তাপের মাথা
‘তুমি’ও বলেছি। মোটে ধব্বেন না, ছোট বোন ব'লে
কথা করবেন। শিলীয়া কাল কিংবদন্ত, তাঁর সঙ্গে
আর দেখা হ'ল না, তিনি নিশ্চয়ই আমার অকৃতজ্ঞ
ভাববেন। আপনি দয়া করে তাঁকে কেবল এই কথাটা
বলবেন, আমি অকৃতজ্ঞ নই, তাঁর দত্তার কথা
চিরকাল—বেথানেই থাকি আমার মনে থাকবে।"

স্বামী-স্বী বীরে বীরে নামিয়া গেল।

পরীকৃত সেবিল—হাসিদুখেই তাহার গাড়ীতে
উঠিল।

মুজের নারী-চরিত্র—

পরীকৃত কেবল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস সেলিল।

“পরম্পরের সুখবর্ধন জন্ত সকলেরই জন্ম; যে স্ত্রী হুমণ্ডলে
আসিয়া শয্যা গড়াইয়া, দর্পণ সম্মুখে কেশরঞ্জন করিয়া, কার্পেট তুলিয়া,
নীতার বনবাস পড়িয়া এবং সন্তান প্রসব করিয়া কাল কাটাইলেন,
আপনার ভিন্ন কাহারও সুখবর্দ্ধি করিলেন না, তিনি পত্নজাতির অপেক্ষা
কিঞ্চিৎ ভাল হইতে পারেন, কিন্তু তাহার স্ত্রীজন্ম নিরর্থক।"

— বঙ্কিমচন্দ্র



সেবা-ধর্ম

[বালদেব দত্ত চিত্রক]

কৃতিবাসের গঙ্গাবতরুণ

শ্রীমলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম্.-এ

১৮-২ খ্রীষ্টাব্দে কেরিগ্রন্থ ঐরামপুরের মিশনারী-
গণ পণ্ডিত ময়নোপাল ভট্টশালীকে দিয়া সম্পাদিত
করাইয়া 'মিশন প্রেস' হইতে কৃতিবাসী রামায়ণ
মুদ্রিত করেন। ঐশ্বর্য পূর্ণিত্র বে উটোপার মহাদেব
লিখিয়াছেন — (তৎসম্পাদিত কৃতিবাসী রামায়ণ,
ভূমিকা—১৫ পৃষ্ঠা) "এই পুস্তকখানি অতি চমৎকার!
আমি হইখানি স্বাক্ষর এই পুস্তক কলিকাতায়
সেবিয়াছি।" পুস্তকখানি চমৎকার হইবারই কথা,—
বর্তমান ১৯০৩ সনে উহার বয়স ১০১ বৎসর
হইল। সৌভাগ্যক্রমে এই পুস্তকখানি পুস্তকের
সম্পূর্ণ পাটটি বগুই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যপাঠ্য
স্বরক্ষিত আছে। সর্বসাধারণের একটা নিত্য
ভিত্তিহার ধারণা আছে যে, কৃতিবাসী রামায়ণের
সর্ববিধ বিকৃতি-দুর্গতির মূল এই পণ্ডিত ময়নোপাল-
কৃত সংশোধন। এই ধারণা নিত্যই ভুল। পণ্ডিত
ময়নোপাল সাধারণ রকম বর্ণগুণিত সংশোধন ও
বিবদ পদের ছদ্মাদির অশুদ্ধতা বিধান ব্যতীত
কৃতিবাসী রামায়ণের (অর্থাৎ তিনি কৃতিবাসী
রামায়ণের যে পুঁথি পাইয়াছিলেন, এবং বাহা খাঁটি
কৃতিবাসী রচনা নহে বলিয়া সন্দেহ করিবার কোন
কথাই সম্ভবতঃ পণ্ডিত মহাশয়ের মনে উঠে নাই)
পায়ে আর কোন হস্তক্ষেপই করেন নাই। আমার
এই মতবোয় প্রমাণ দিতে হইলে ইহা লইয়াই
একটা স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়,—কিন্তু তাহাতে
কাল নাই। আপাততঃ পাঠকগণকে আমার
কথায় বিশ্বাস করিরাই কৃতিবাস-বিকৃতীকরণের
অপরাধে বহুদিন ধরিয়া অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত
ময়নোপালকে বেকসুর খালাস দিতে হইবে। বস্তুতঃ,
ময়নোপালের বহুপুস্তকেই কৃতিবাসে বিকৃতি প্রবেশ
করিয়াছিল। সেখান হইতে কৃতিবাসের রামায়ণ গাওয়া

হইত এবং উদ্ভোগী গায়নগণ বহুদিন পূর্বে হইতেই
তাহাতে মজা কবির রচনা আনিয়া প্রবেশ করাইয়া
আমর সম্মুখেই চোঁটা করিতেন। ফলে বহুই দিন
যাইতেছিল, কৃতিবাসী পুঁথিগুলি ততই পাচনিশাণি
হইয়া উঠিতেছিল। ময়নোপাল অমনি একখানি বা
একখানি পাচনিশাণি পুঁথি সেবিয়া কৃতিবাসী রামায়ণ
সম্পাদন করিয়াছিলেন। এবং আশ ১০১ বৎসর
ধরিয়া সেই পাচনিশাণি পুঁথিখানিই বাঙ্গালা দেশে
কৃতিবাসী রামায়ণ বলিয়া চলিতেছে। প্রাচীন পুঁথির
সঙ্গে বাজারের মুদ্রিত পুঁথি মিলে না সেবিয়া
অসুসঙ্গতমুদ্রণ ময়নোপালকেই অপরাধী সাব্যস্ত
করিয়া বলিয়া আছে।

বস্তুতঃ প্রাচীন কৃতিবাসী পুঁথির সহিত বাজার-
সংস্করণের কৃতিবাস যিনি মিলাইতে বলেন, খুব
কড়া কড়া মতবা তাহার লেখনী-মুখে বাহির হইয়াই
স্বাভাবিক। ঐশ্বর্য হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বর্ষীয়
মাহিষ্ঠ পরিচয়ের মত অবোধ্যাকাণ্ড সম্পাদন করিতে
বসিয়া ভূমিকায় এই মতই নিরূপণ মতবা করিতে
ক্ষিা করেন নাই—

"এখন বটভগ্নার বাহা কৃতিবাসী রামায়ণ বলিয়া
বিক্রম হয়, মূল কৃতিবাসী হইতে তাহাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র
গ্রন্থ বলিলে অসঙ্গতি হয় না। এই বিষয়ে আরও
আলোচনার কালে আমার মত প্রতীতি অনিবার্য
যে, প্রচলিত রামায়ণ এমন কোন এক পুঁথি
বিরল বাহাতে কিছু না কিছু ভগ্নাত্তর ঘটে নাই।"

চক্ষুমান পাঠক যাক্টে জানেন যে, এই কথা কেবল
বটভগ্নার রামায়ণগুলি সম্বন্ধে নহে,—ঐ রামায়ণের
ভঙ্গবৎসরী বস্তুগুলি সংস্করণ বাজারে চলিতেছে
তাহাদের সমস্তগুলি সম্বন্ধেই খাটে। কৃতিবাসী
রামায়ণের যে সংস্করণগুলি স্থলর ছাপা, অনেক

হুবি এবং চমৎকার বাঁধাই-এর জোরে বাজারে চলিতেছে, তাহাদের প্রত্যেকখানিই বটতলা-সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ যাহ। ১৮০২ সনের শ্রীরামপুরী সংস্করণের উত্তরকাণ্ডের আরম্ভে ছিল—

আজি কালিকার বেন বৈকুণ্ঠ নগরী।

শম্ভু চক্র গদা পদ্ম শারঙ্গ ধারী।

আর যে কোন ভদ্র সংস্করণ বা বটতলা-সংস্করণ হুনিয়া দেখুন,—উত্তরকাণ্ডের আরম্ভে আছে—

আজি কালিকার বেন বৈকুণ্ঠ নগরী।

শম্ভু চক্র গদা পদ্ম শিবা শারঙ্গধারী।

কোন কোন সংস্করণে দেখিতে পাইবেন,—শাস্ত্রীকার ব্যাখ্যার ভান আছে। কিন্তু আদিকালিকার বৈকুণ্ঠ নগরী শম্ভু চক্র গদা পদ্ম শারঙ্গধারী কেমন করিয়া হইতে পারে, কোন সংস্করণেই তাহার ব্যাখ্যা পাইবেন না। বস্তুতঃ, সম্পাদক-পরম্পরার সূত্রক (১) দৃষ্টি এড়াইয়া এইরূপ অর্থহীন ছোট্ট ছর উত্তরকাণ্ডের আরম্ভে কেমন করিয়া এই ১১১ বংসর ধরিয়া বিরাম করিতেছে, তাহা নিত্য আশ্চর্যের বিষয় নহে কি ?

কৃত্তিবাসী রামায়ণের এই অবস্থার বহন নিত্যতাই বেন সৈবগ্রেহিত হইয়া ১৪১১ শকাব্দের একখানি সাতকাণ্ডে সম্পূর্ণ কৃত্তিবাসী পুঁথি আমার হাতে আসিয়া পড়িল, তখন খাটি কৃত্তিবাস উদ্ধারের কল্পনা আমাকে পীড়িত করিতে লাগিল। ইহার অল্প পরেই আমার আর একখানি সাতকাণ্ডে সম্পূর্ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথি আমার হস্তগত হইল। এই পুঁথিখানি প্রথম-খানির প্রায় ১৫০ বংসরের পরবর্তী—কিন্তু প্রথম-খানির সহিত চমৎকার মিল আছে। স্বরণ রাখিতে হইবে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় এক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালায় কাণ্ডে কাণ্ডে বিভক্ত, কঠিং ছই ভিন কাণ্ড একত্র, কৃত্তিবাসী রামায়ণের বহু পুঁথি আছে। মুদ্রিত তালিকা হইতে ঠিক সংখ্যা দিতে গেলে বলিতে হয়,—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে ১৬২ খানি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

আছে ৪১২ খানি। কিন্তু সাত কাণ্ডে সম্পূর্ণ রামায়ণের পুঁথি একখানিও নাই।* এইরূপ দুইখানি সম্পূর্ণ রামায়ণের পুঁথি বহন হাতে আসিয়া পড়িল, তখন কার্য্যভারে নিত্য ব্যস্ত ছিলাম। ঐ কাজ থামাইয়া রাখিয়া রামায়ণের দিকেই মনোযোগ দিতে হইল। এই দুইখানি পুঁথি এবং ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালায় পুঁথিগুলির তালিকা পর্যালোচনা করিয়া বুঝিলাম, এইবার মূল কৃত্তিবাস উদ্ধারের চেষ্টার হাত দিবার সময় আসিয়াছে বটে। উপকরণ প্রচুর,—বিশুদ্ধ-পরিপ্রসঙ্গ-কীর বাদ্যলী মনকে একবার কাণে ডেবাইতে পারিলেই হয়!

মহা হইতে সুন্দরকাণ্ডে সম্পাদন আরম্ভ করিয়া দিলাম,—এই আশায় যে, মহাবর্তী ঐ কাণ্ডে সম্ভবতঃ ভেদান কম পাইব। আমার উদ্দেশ্য ছিল—খাটি কৃত্তিবাস উদ্ধার করিব, কিন্তু তাহাকে প্রয়োজন-মত সামান্য অদল-বদল করিয়া কালোপযোগী করিয়া লইব এবং বাদ্যলী-পাঠক-সাধারণের গম্ভীর সংস্করণটি সম্পাদন করিব। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর ঐশ্বরী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চট্টোপাধ্যায় এই সময় ঢাকার আসিয়া সমস্ত সোলমাল করিয়া দিলেন। তাহার অহুরোধ মত সাধারণ সংস্করণ মূলত্ববী রহিল—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গম্ভীর মূলগ্রন্থ সংস্করণেই হাত দিতে হইল। কাজটি কিরূপ পরিপ্রসঙ্গাধ্য, তাহার আভাস ‘বঙ্গশ্রী’ পত্রিকার জ্যেষ্ঠ সংখ্যায় দিয়াছি। উপকরণ-প্রাচুর্য্য মন মগ্নে মগ্নে অবসর ও দিন-ব্রাত হইয়া উঠে,—স্রাজিতে কর্ণবিমূহ হইয়া ঝড়ায়। ইহার উপরে, কৃত্ত কল্কটু নিঃসন্দেহাক্ত হইল কি না, সেই বিষয়ের মনের সম্বন্ধ কিছুতেই গুচ্ছিত চাহে না। এই অবস্থায়, কি করিয়াছি, কি করিতেছি, বঙ্গীয় সুখীজনকে তাহা মথো

*মহা কল্কটুনি পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ উদার ত্রিপুরা পাখার সম্পাদক কল্কটুনির দ্বারা মহাশয়ের দিকট হইতে সম্পূর্ণ রামায়ণের একখানি পুঁথি উপহার পাইয়াছে। পুঁথিখানি ১৯১৮ সনের বঙ্গ এক ৪৪০ পাতার সমাপ্ত।

মথো আনান আবতক বিবেচনা করি,—তাইদের লহাহুত্বিত ও সজ্জম আলোচনার উপকৃত হইব, এই আশায়। সোবকটিও লগেখিত হইতে পারিবে।

আদিকাণ্ডের বহু স্রষ্টাটান পুথি আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, বাহার-সত্তরণে উহার আদিত্তেই যে নাভায়ণের চারি অংশে একাংশ এবং দশা বাণীকির কাহিনী লক্ষ্যীত দুইটি নিবন্ধ পাওয়া যায়, উহা কৃতিবাসী রামায়ণের অঙ্গ নহে। প্রথমটি হালের অর্থাৎ শ'সেড়েক বছর আগের পশ্চিম বছর কোন গায়েরের রচনা। দ্বিতীয় উপাখ্যানটি অল্পতাত্ত্বের রামায়ণ হইতে গৃহীত। অসল কৃতিবাসী রামায়ণের আরম্ভ অঙ্গ একাধারে। বাক্, আছ আদিকাণ্ডের একটি বিনিষ্ট প্রদশ,—“গঙ্গাবতরণ”—লইয়া আলোচনা করিব।

মূল রামায়ণে দেখা যায় যে, গঙ্গাবতরণ-কাহিনী তাত্ত্ব-বধ এবং বঙ্গ-বন্ধার পরে জনক-ভবনে পমনের পথে বিধারি তাম-লক্ষণকে ওনাইয়াছেন। আমার অবলম্বিত খাটি কৃতিবাসী পুথিখানিতেও এই কাহিনীর ক্রম অল্পদূরপাই। বাহার-সত্তরণে কিছু এই কাহিনী স্থানচ্যুত হইয়া অপ্রাসঙ্গিক রূপে আদিকাণ্ডের আদিত্তে হাইয়া বসিয়াছে। পণ্ডিত লর-যোগালের অবলম্বিত পুথিগুলি কিরূপ বিশৃঙ্খল ছিল,—এই ব্যাপার হইতেই তাহা বুঝা যায়।

বহু কৃতিবাসী পুথি মিলাইয়া গঙ্গাবতরণ-কাহিনীর যে পাঠ পাড়ায়, বাহার-সত্তরণের ঐ প্রদশের পাঠ তাহার সহিত মিলে না। কিন্তু তুলনা-মূলক সমালোচনা আরম্ভ করিবার পূর্বে পাঠক-সাধারণের বৃত্তি পুনরলীল করিবার জন্ত গঙ্গাবতরণ-কাহিনী লক্ষ্যে এই স্থানে বলা দরকার।

পূর্বাংশে লগর নামক বৃপতি ছিলেন,—কেপিনী ও লুমতি নামে তাহার দুই পত্নী। কেপিনীর এক পুত্র হইয়াছিল, তাহার নাম অসমজ। লুমতির ঘাট হাজার পুত্র হইয়াছিল। লগর রাজা অবশেষে বঙ্গ আরম্ভ করিলেন—ঘাট হাজার ছেলে অধের রক্ষক

হইয়া চলিল। কপিল দুনি পাতালে বসিয়া তপতা করিতেছিলেন—ইঞ্জ বজ্রের খোড়া চুতি করিয়া কপিলের পিছনে নিয়া বাধিয়া রাখিলেন। লগর-লক্ষ্যনগণ ঘাট পুঁড়িয়া চারিটি লগর কাটিয়া কেলিল—পরে কপিলের পিছনে খোড়া বাধা দেখিয়া কপিলকে চোর তাবিত্য প্রহার করিল। ধ্যান তাবিত্য কপিল চক্ষু মেদিয়া চাহিলেন—চোখের আন্তরন লগরের ঘাট হাজার ছেলেই তত্ত্ব হইয়া গেল।

এদিকে প্রধা-শীড়ন সোমে লগর অসমজকে তাভা পুত্র করিয়াছেন, অসমজের পুত্র অংগমান্ পিতামতের প্রিয়পাত্র হইয়াছে। খোড়া লইয়া ছেলেরা নিরিভেহ ন। দেখিয়া লগর অংগমান্কে খোড়ার খোঁজে প্রেরণ করিলেন। অংগমান্ কপিলকে ভুত করিয়া খোড়া লইয়া আসিল এবং গঙ্গাভাগ ল্পর্শে ভবীভূত পিতৃবাগনের বৃত্তি হইবে, কপিলের নিকট এই তথ্যও জানিয়া আসিল। লগর অনেক তপস্যা করিয়াও লক্ষ্য আদিত্তে পারিলেন না। লগরের পরে অংগমান্ রাজা হইলেন—লক্ষ্য আদিত্তে তিনিও বিফলস্বর হইলেন। অংগমানের পুত্র দিলীপও অনেক চেষ্টা করিয়া লক্ষ্য আদিত্তে পারিলেন না। দিলীপের পুত্রের নাম ভগীরথ। ভগীরথ অনেক তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে লক্ষ্য প্রাপ্ত হইলেন। ভগীরথের তপস্যায় ঐত মহাশেষ স্বর্গ হইতে মর্ত্যে পতন কালে লক্ষ্য বৈদ ধারণ করিলেন। ঐরাবত আসিয়া হিমালয়-শিখরে আবদ্ধ লক্ষ্য লজ দত্তে লক্ষ্য বিদার করিয়া পথ মুক্ত করিয়া দিল। লক্ষ্য ছই মূল তীর্থ বর্টি করিয়া নীচে নামিয়া আদিত্তে গাদিলেন। পথে এক স্থানে লক্ষ্য দুনি তপস্যা করিতেছিলেন। তাহার বঙ্গস্থান লক্ষ্যপ্রোতে তাবিত্য বায় দেখিয়া বাপ করিয়া লক্ষ্য দুনি লক্ষ্য লল লব পান করিয়া কেলিলেন। পরে ভগীরথের স্মরণার্থে ভুত হইয়া বীর লাহ নখে দিলীর্ষ করিয়া ঐ ঘার দিয়া লক্ষ্যকে বাহির করিয়া দিলেন। লক্ষ্য কপিলপ্রমহিত লগরসম্মানলগের তত্ত্ব ল্পর্শ

করিয়া তাহাবিগ্ধে নৃত্তি প্রকাশ করিলেন এবং সাগরে বাইরা মিলিলেন।

এখন এই কাহিনীর এক একটি অংশ ধরিয়া বিচার করা বাউক। প্রথমে—

গঙ্গার উৎপত্তি

যাহার-সংস্রবণে কপিল সন্দেশে কয়েকটি মাম হইবে অগুমান্যকে গঙ্গার উৎপত্তি-কাহিনী গুনাইয়াছেন—

একদিন শোলোকে বসিয়া নারায়ণ।
গান পকমুখেতে করেন পকাননঃ
শিখা বলে শ্রীহাম, ডব্বরে বলে হরি।
পকমুখে পকানন গান ত্রিপুরারিঃ
গঙ্গী সহ বসিয়া আছেন মহাপর।
ওনিয়া সে গান হইলেন প্রবমঃ
প্রবল্প হইলেন নিম্নে চক্রপাণি।
সেই গঙ্গা জন্মিলেন পতিতপার্বতী।
সেই জল কমণ্ডলু ভরিয়া আদরে।
রাবিলেন তুলিয়া বিধাতা নিম্ন ঘরে।

কপিল এই কমণ্ডলুবাসিনী গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনিবার জন্য অগুমান্যকে উপদেশ দিলেন। কতিবাসী পৃথিবীতে কিছু গঙ্গার উৎপত্তি-বর্ণনা একখানিতেও খুঁজিয়া পাইলাম না। বিস্মিত হইয়া গঙ্গার উৎপত্তি-কাহিনীর মূল খুঁজিতে লাগিলাম।

মূল রামায়ণে গঙ্গার উৎপত্তি-কাহিনী আছে। আদিকাণ্ড, ৩৭শ সর্গ। তিনি হিমালয়ের আঁঠা কল্প। দেবগণ প্রার্থনা করিয়া তাহাকে স্বর্গে লইয়া যান। ভগ্নবীরের তপস্যায় তিনি স্বর্গ হইতে নিবজটার পতিত হন। রামায়ণে গঙ্গার বিকল্প হইতে উদ্ভবের কোন কথাই নাই।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে গঙ্গার এই বিকল্প হইতে উদ্ভবের কাহিনী বিস্তৃতরূপে পাওয়া যায়। প্রকৃতিখণ্ডের দশম অধ্যায়ে আছে, কার্তিকী পূর্ণিমায় রাধার রাস-মহোৎসবে ব্রহ্মা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া শত্ৰু রাস-

মণ্ডলে উপস্থিত হইলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক সনাত আরম্ভ করিলেন। ইহাতে রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ গনিয়া জল হইয়া গেলেন। এইরূপে গঙ্গার উৎপত্তি হইল। পরে কৃষ্ণ তাহাকে ব্রহ্মাণ্ডের নানা স্থানে স্থাপিত করিলেন। ইহার পরে আবার আর এক কাহিনী আছে। তাহাতে দেখা যায়, সৃষ্টিমতী গঙ্গাকে কৃষ্ণপার্থবতিনী ও কৃষ্ণাভূরাগিনী দেখিয়া রাধা তাহাকে গম্বুধে পান করিয়া কৈলিবার ভয় দেখাইলেন। গঙ্গা ক্রুদ্ধের পরে বিলীন হইয়া গেলেন। সমস্ত শোলোক শুভ হইয়া গেল। পরে ব্রহ্মা ও শিবের অমুরোহে কৃষ্ণ গঙ্গাকে পান্যদ্রষ্ট দ্বারা বাহির করিয়া দিলেন। ব্রহ্মা তাহাকে নিম্ন নিক কমণ্ডলুতে স্থাপন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণের খণ্ডে, ৩৪শ অধ্যায়ে আবার এই কাহিনী পুনরুক্ত হইয়াছে।

বামন পুরাণে ২২ অধ্যায়ে আছে, বামনের উদ্ভবানী পদ বন ব্রহ্মাণ্ডের কটাং তেজ করিল, তখন অবলম্বনে গঙ্গা নামিয়া আসিলেন। অল্পরূপ কাহিনী বৃহস্পতির পুরাণেও আছে,—বনবাসী-সংস্রবণ, একাদশ অধ্যায়, ১৭৮—১৮১ শ্লোক।

কবিকল্প চণ্ডীতে আছে, বামনের পদ ব্রহ্মলোকে বাইরা উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা কমণ্ডলুহিত গঙ্গাকল-দ্বারা সেই পদ মৌত করিয়াছিলেন। উহা অবলম্বনে গঙ্গাম্রোত নিঃস্রাবী হয় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত সংস্করণ, ৬৪৪ পৃষ্ঠা)। এই কাহিনী ব্রহ্ম-পুরাণের ৭৩ম অধ্যায়ে আছে। বৃহদ্রথপুরাণেও এই কাহিনী আছে—১২শ অধ্যায়।

ব্রহ্মবৈবর্ত মিত্র মহাপর তাহার সম্বলিত ব্যাঙ্গ্য অভিধানে গঙ্গার উৎপত্তি সম্বন্ধে এক “গৌরাগিক কাহিনী” দিয়াছেন, কিন্তু কোন পুরাণের এই কাহিনী তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। কোষগ্রন্থে নির্দশী না থাকিলে অল্পসংখ্যক বর্ণের শুক্লের অমুখিয়া হয়, ইহা বলাই বাহুল্য। এই কাহিনী মতে নারদের অন্তঃ গানে রাসরাসিনী বিকলাপ রূপে পথে পড়িয়াছিল। নারদের ভিজ্যসার তাহার

বলিল, মহাসেবের তানলগবিত্ত লগীতে তাহাদের
অঙ্গবৈকল্য দূর হইতে পারে। তথা ও বিকৃত
প্রোতাক্ষে পাইলে মহাসেব গাহিতে স্বীকার করিলেন।
মহাসেবের দানে রাধরাণী কিরিয়। ষাভাবিক
অবস্থা প্রাপ্ত হইল। তথা সেই গান কিছুই
বৃষ্ণেন না। বিকৃত কিছু বৃষ্ণাই প্রব হইয়া গেলেন,—
তথা সেই প্রব বিকৃত কমনুতে তরিলেন।
উহাই গঙ্গ।। পুষ্টিতে পুষ্টিতে পাইলাম,— এই
কাহিনী বৃহদ্রথপুরাণের মধ্যখণ্ডের ১৪শ অধ্যায়ে আছে।
পাঠ করিয়া বুঝা গেল, গঙ্গাবতরণ-কাহিনী কৃতিবাস
সমস্তটাই বৃহদ্রথপুরাণ হইতে লইয়াছেন,— রামায়ণ
হইতে নহে।

রঙ্গপুর পরিষদ হইতে অমৃতচাক্ষুর রামায়ণের
যে অদিকাণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে গঙ্গার উৎপত্তি
সম্বন্ধে অল্প কথাই আছে। কিন্তু এই মুদ্রিত পুথিখানি
অমৃতের সম্পূর্ণ পুথি কি না, সম্বন্ধের বিষয়।
কারণ আমি অমৃতের অদিকাণ্ডের অনেকগুলি পুথি
পরীক্ষা করিয়াছি, যাহাদের পাঠ মুদ্রিত পুথির
সহিত কতক মিলে, কতক মিলে না। এই রকম
একখানা পুথিতে গঙ্গার উৎপত্তি নিম্নলিখিত রূপে
বর্ণিত হইয়াছে।

দশনও গঙ্গাসেবী আড়ে পরিদর।
মহা বেগবতী অতি শ্রোত খরভর।
বিখ্যামি প্রেমিল গঙ্গা ধরশনে।
গঙ্গাআন করিলেক সঙ্গর বিধানে।
গঙ্গাকে সেবিয়া রাম গোছে সুনি স্থানে।
কেনতে অশ্লিষ্ট গঙ্গা আনে কোন জনে।
তিন জন বসিলেক গঙ্গাসেবীর তীরে।
হস্তছোড়ে সুনিবর লাগে বলিবারে।

ইহার পরে ভৃকু ও নারসের সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা
সম্বন্ধে এক কাহিনী আছে—উহা বাদ দিলাম।
ভৃকু ও নারসের সঙ্গীত-প্রতিযোগিতার বিবরণ
লিখপুরাণের উত্তর ভাগের ১—৩ অধ্যায়ে আছে।

প্রভাত কটাহে নগ বোজন বিস্তার।
তাথে সভা করি বৈশে সেব গঙ্গাবর।
তথা আমি সেব আইল আর প্রহুতিদি।
কলা কাটা (১) নগ পল আর দিবা রাত্রি।
অবিক্রান্তি আসিলেক বদানি করণ (২)।
বিশুস্তাঙ্গি বোণ আইল উনপঞ্চাশ পবন।
মাস অথ আসিলেক আর বড় ষষ্ঠ।
শক্তি সঙ্গে সঙ্গে সেলা বিকু আজ্ঞা হেতু।
চতুর্দিকে রহিলেক করি ঝোড় হাত।
গভাকে বসিতে আজ্ঞা কৈলা জনমাধ।
বিকু বোলে তন সতে আমার বচন।
তুমি লবে কর পাএন করিব প্রবন।
এতক কাহিন্য যদি সেব গঙ্গাবর।
নাচিতে লাগিলা প্রহু সেব মহেশ্বর।
দুই মুখে পাএন শিব লাগে করিবারে।
তিন মুখে খই খই তাল ঝে কুকারে।
দুই মুখে শ্রুতি (৩) মাতা পূরেন পার্শ্বতী।
আগনি বৃদ্ধ গৈলা সেব গণপতি।
তৈরবা ভৈরবী তথা হৈ হৈ করে।
নকী মহাকাল লাগে ধোজ (৪) বাজাবারে।
মধুর বীণা বাজাএ নারদ উপাধন।
আনন্দিতে তাল ধরে সেব সুনিগণ।
দীর্ঘে দীর্ঘে ত্র্যম্বকে সেব করতালি।
সিংহাসনে উঠি নৃত্য করে বনমালী।
বিকু পদাঘাতে কাশে ইতিম ভুবন।
সেখিয়া বিদিত হৈল ভক্ত সেবগণ।
নৃত্য সেখি সেব সব হইল কীদর।
ইন্দ্র আমি সেব আইল পলাইয়া সন্দর।
তথা বিকু রহিলেক সেব ত্রিলোচন।
আর মাজ রহিল নারদ উপাধন।

(১) স্তম্ভাংশ নিদেবারক কাল। (২) অমৃতদিগি পরিমিত
কালকে কহা বলে।

(৩) নগবরের মাতাকে শ্রুতি বলে। শ্রুতি ২২টি।
করতাল।

মহাদেবের পাএনে কিছু হইল বিস্তার ।
 প্রথমটা হইল প্রহর দেব গলাধর ।
 গঙ্গাদেবী লক্ষ হৈল ব্রহ্ম এ জানিল ।
 খাৰা দিয়া মহাদেবে চেতন করাইল ॥
 পাএন লক্ষ্মিণ হর, এছা করতালি ।
 উঠিয়া বসিয়া প্রহর দেব বনমালী ।
 এছা দেব জানিল গঙ্গার উপাদান ।
 সেই ফলে অর্ঘ্য দিয়া করে গঙ্গাদান ।
 গঙ্গাকে রাখিল কমণ্ডপুর ভিতর ।
 কমণ্ডপু রাখে এছা কটার ভিতর ।
 সভ্যতর হৈল সব পেল নিমন্ত্রণে ।
 এছাও কটাতে গঙ্গা রৈল সেই হনে ।
 বে কালে হইল তুমি বামন দূরতি ।
 ছলিয়া পাঠাইল। বলি পাতাল বসতি ।
 একপদে আচ্ছাদিলা সপ্ত বহুমতী ।
 আর পদে সপ্ত বর্গ আশ্রিয়া ঐশ্বরি ।
 সেই পদে এছাওর কটাই তেলিল ।
 পায়ে ত্রৈক কমণ্ডপু কাইত হৈয়া পৈল ।
 প্রতাপ বাইয়া গঙ্গা বৈকুণ্ঠ আসিলা ।
 বিকুলসোঢ়বা গঙ্গা সেই হতে হৈলো ।
 কুণ্ড হৈয়া রৈল গঙ্গা বৈকুণ্ঠ ভূবন ।
 এই মতে গঙ্গা হৈলো গুন নারায়ণ ॥

পুণ্ডেই বলিয়াছি, গঙ্গার এই উৎপত্তি-কাহিনী
 কৃত্তিবাসী পুথিগুলিতে নাই। অল্পতাত্ত্বিকের রামায়ণ
 হইতেই উহা সঙ্কীর্ণকৃত হইয়া ঐরামপুরী রামায়ণে
 প্রবেশ করিয়া থাকিবে। অল্পতাত্ত্বিক হইতে ঐরাম-
 পুরী রামায়ণ আর একটি অল্পতাত্ত্বিক কাহিনী গ্রহণ
 করিয়াছে, তাহা—

ভগীরথের বিচিত্র জন্মকাহিনী

বাক্য-সংকরণে ভগীরথের জন্মকাহিনী নিম্নরূপ
 বর্ণিত আছে —

অগুমান রাজ্য করে অযোধ্যা নগরে ।

ভার পূর হইল দিলীপ নাম ধরে ।

চলিল দিলীপ রাজ্য গঙ্গা অঙ্গুলারে ।
 কঠোর তপস্তা করি থাকে অনাহারে ।

তথাপি না পায় গঙ্গা না হয় অযোধ্যা ।
 মরিয়া দিলীপ রাজ্য পেল ব্রহ্মলোক ॥

দিলীপের দুই পত্নী ছিল নিজ দেশে ।
 পত্নর সেলেন তথা আরোহিণী কুশে ॥
 দৌহাঙ্কর প্রীতি কহিলেন জিহুরারি ।
 মম বরে পুত্রবতী হবে এক নারী ॥

দৌহেতে জানিল যদি দৌহার সন্দর্ভ ।
 দৌহে কেলি করিতে একের হৈল গর্ভ ॥

ইহার পরে অহিহীন ভগীরথের জন্ম এবং অষ্টা-
 বক্র-শাপে তাহার স্বাভাবিক অবস্থা-প্রাপ্তি বর্ণিত
 হইয়াছে। —

আসিলা সকল মুন করিল কলাপ ।
 ভসে ভসে জন্ম হেতু ভগীরথ নাম ॥

ভগীরথের এই বে বিচিত্র জন্মকাহিনী, ইহা
 বাস্কীর রামায়ণে নাই। মুদ্রিত কোন পুরাণে
 অথবা মহাভারতে এই কাহিনীটি পাইলাম না।
 অথচ কাহিনীটি বাঙ্গালা দেশে খুব প্রচলিত ছিল।
 কবিকল্প ভণীতে ইহা এসত হইয়াছে, — কলিকাতা
 বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত—ঢাক বন্যোপাধায় সম্পাদিত
 সংস্করণ; ১৯০২ পৃষ্ঠা। ১মতীশচন্দ্র রায় মহাপাত্রের
 সম্পাদনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত কবি
 ভবানন্দ্যের 'হরিবংশ' নামক প্রাচীন কাব্যেও এই
 কাহিনীটি এসত হইয়াছে; ৪২ পৃষ্ঠা,—১৮৮১-২৪০৮
 পংক্তি ও পাদটীকা। কাহিনীটির বিশ্লেষণ নিয়ে
 এসত হইল—

(১)

মুদ্রিত অঙ্কুতাচার্য্য। দিলীপ পদার ভক্ত
আরাধনা করিয়া বিকল মনোরথ হইয়া প্রাণত্যাগ
করিলেন।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী। ঐ ঐ

বাজার-সংস্করণ কৃতিবাসী রামায়ণ। ঐ ঐ
আদিকাণ্ড সম্পাদন করিতে কৃতিবাসী রামায়ণের বে
সমস্ত পুঁথি আমাদের খাঁটিতে হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে
একখানি বিভিন্ন পুঁথি পাইয়াছিলাম। ইহা অঙ্কুতা-
চার্য্যের রামায়ণের পুঁথি কিন্তু ভণ্ডিতা সর্ব্ব কৃতিবাসের।
আবার পাঠও অঙ্কুতের মুদ্রিত পুঁথির সহিত সর্ব্ব মিলে
না। আমার পাণ্ডুলিপিতে ইহাকে ‘খ’ পুঁথি বলিয়া
অভিহিত করিয়াছি। এই খ-পুঁথিতে আছে —

খ-পুঁথি। সমস্ত কুরঙ্গকুরঙ্গিণীর মধ্যে
কুরঙ্গকে বধ করায় দিলীপ—“সমকালে বৃদ্ধা হইবে”—
কুরঙ্গিণী কর্তৃক এইরূপ শাপপ্রদ হইয়া ঐরূপ উত্তরে
মারা গেলেন।

(২)

অঙ্কুতাচার্য্য। হর্গাবশের খস হু সেথিয়া
ত্রুঙ্গা আসিয়া ছই রাণীকে নিষেধের চোয়ই পুত্র-
উৎপাদনের উপদেশ দিলেন।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী। দুর্ব্বাসা রাণীকে বর
দিলেন এবং পুত্র-উৎপাদনের উপায় বলিয়া দিলেন।
বাজার-সংস্করণ রামায়ণ। এম্মা শিবকে
পাঠাইলেন, শিব “পুত্রবতী হও” বর দিলেন এবং উপায়
বলিয়া দিলেন।

খ-পুঁথি। সেবগণ মত্তা করিয়া মদকে
পাঠাইয়া দিলেন। কুতুম্বী রাণীকে মদনের প্ররোচনা
কেনি করিলেন এবং একজন গর্ভবতী হইলেন।
গর্ভবতী রাণী কলঙ্কের জরে ভুবিয়া মরিতে গেলে এম্মা
আসিয়া নিবারণ করিলেন এবং স্বস্ত সমস্ত পাপভার
গ্রহণ করিলেন।

(৩)

অঙ্কুতাচার্য্য। বশিষ্ঠের উপদেশে অধিবহীন
ভণ্ডীরথকে অষ্টাবক্র মুনির পথে পোয়াইয়া বেড়াইল।
কিন্তু ভণ্ডীরথকার অধিবহীন শিশু তাহাকে বিদ্রূপ
করিয়াছে মনে করিয়া অষ্টাবক্র শাপ দিলেন — “এই
অবস্থা তোমার স্বাভাবিক হইবে মত্তদের স্বাভাবিক
স্বাকার প্রাপ্ত হও। নচেৎ এইরূপ অবস্থায়ই জিরকাল
পাক।” এই শাপের ফলে ভণ্ডীরথ বাহুরের আকৃতি
প্রাপ্ত হইল।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী। ঐ ঐ—অতি সংক্ষেপে
বিস্তৃত।

বাজার-সংস্করণ। ঐ ঐ
খ-পুঁথি। অষ্টবক্র-শাপের
উল্লেখ নাই।

এই বিশেষণ হইতে বুঝা যাইবে যে, কাহিনীটি
বাঙ্গালা দেশে শোকেব মুখে মুখে প্রচলিত ছিল কিন্তু
লোকে ইচ্ছামত ইহার এক আখঁই অমল-বদল করিত।
কৃতিবাসের কোন পুঁথিতে এই কাহিনী পাই নাই।
কৃতিবাস যে এই কাহিনী জানিতেন, তাহার কোন
প্রমাণ তাহার রামায়ণে নাই—কানিসেও এই সম্বন্ধে
তিনি ইংরেজীতে বাহাকে বলে discreetly silent !
বাজার-সংস্করণে এই কাহিনী যে অঙ্কুতাচার্য্য হইতে
আসিয়াছে, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই কাহিনীটির পৌরাণিক মূল খুঁজিয়া খুঁজিয়া
হয়রাণ হইয়াছিলাম। অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
পুঁথিরক্ষক শ্রীমান নুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ,
এই কাহিনীর মূল খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ
হইয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে ‘বান্ধিত
রাবান’ নামে একখানি সংস্কৃত রামায়ণের পুঁথি
আছে — নং ২৪২। হস্তদ্বয় অক্ষতান করিতে
পারিলাম, তাহাতে অঙ্কুত পুঁথি পুঁথিবীর অত্র কোন
সংগ্রহে আছে বলিয়া জানিতে পারিলাম না। এই
বান্ধিত রামায়ণখানি বীরভূম জেলা হইতে প্রাপ্ত।

ইহাতে রামায়ণের আদি হইতে উত্তর পর্যন্ত সমস্ত কাণ্ডের বহুবিধ কাহিনী আছে। লব-কুশের দুয়ের কাহিনীও ইহাতে বিস্তৃত ভাবে আছে। এই পুথিতে দুই বাণীর সম্বন্ধে ভগ্নীরথের জন্তকাহিনী বিস্তৃত হইয়াছে, এবং ভগ্নীরথের নামের স্থাপত্য পর্যন্ত বর্ণনা আছে। কিন্তু এই বিরল-প্রচার গ্রন্থ হইতে অল্পটাকাড়া এই কাহিনীটি গ্রহণ করিয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত লম্বত বলিয়া মনে হয় না।

দোভাষ্যক্রমে ঐমান্য সুবোধচন্দ্র পদ্মপুরানের মত জনশ্রুতি এবং সুপ্রচারিত পুরানের স্বর্ণখণ্ড হইতেও এই কাহিনীটি পুথিয়া বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বঙ্গবাসী-সংস্করণের মুদ্রিত স্বর্ণখণ্ডে এই অধ্যায়ই নাই! এই স্বর্ণখণ্ডের পৃষ্ঠটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিখানার ১৩২৫ নং পুথি, বীরভূমের ঐমুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের নিকট হইতে ক্রীত। ইহার ৪১ পাতায় হর্ষাবংশের রাজ্যসের তালিকা আছে, তাহাতেই ভগ্নীরথের কাহিনীটি আছে। ইহাতে দেখা যায়, নিলীপ পুত্রহীন অবস্থায় মারা গেলে তাহার দুই পত্নী বশিষ্ঠাক্রমে গমন করিলেন, এবং হর্ষাবংশের ধ্বংসের কথা বশিষ্ঠ মুনিকে নিবেদন করিলেন। বশিষ্ঠ মুনি যাহা অবশ্য হইয়া বলিলেন,—হর্ষাবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে না। তিনি হর্ষাবংশ বংশধর-উৎপাদনের জন্ত পুত্রোৎপাদন করিলেন এবং রাজের চক্ৰ এক রাষ্ট্রকে ভোজন করাইলেন। অস্ত্র বাণী তাহাতে পুরুষবৎ আচরণ করিলে প্রথম বাণীর গর্ভে পুত্র হইল। এই কারণে পুত্রের নাম ভগ্নীরথ হইল। অষ্টাবক্র-কোষে সে স্বাভাবিক আকৃতি প্রাপ্ত হইল। এই পদ্মপুরানের মূল হইতেই বাঙ্গাল্য কাব্যগুলিতে এই বিভিন্ন কাহিনী প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

ঐরাবতের কাহিনী

কৃত্তিবাসী পুথিগুলি মধ্যে মধ্যে—“পুস্তক বিশাল হও লিখিব কভেক”—বলিয়া কাহিনী বাদ দিয়া গিয়াছে।

আমাদের অবলম্বিত আদর্শধারিণিও (ক-পুথি) এই সোম হইতে মূল্য নহে। তবে অনেক পুথি মিলাইয়া পাঠ উদ্ধার করাও আদর্শ পুথির ক্রটি অল্প কোন পুথি-দ্বারা সংশোধিত হইতে পারিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই সর্বজনবিদিত ঐরাবতের কাহিনীটার উল্লেখ করা যায়।

এই কাহিনী মূল বাণীক রামায়ণে নাই। অল্প কোথাও এই কাহিনী পুথিয়া পাইলাম না, একমাত্র বৃহচ্ছন্দপুরাণেই ইহা আছে। বৃহচ্ছন্দপুরাণ হইতেই কৃত্তিবাস এই কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের ক-পুথিতে সংক্ষিপ্ত ভাবে এই কাহিনী আছে। গঙ্গা হিমালয়-শিখরে আটকাইয়া গেলেন,—বলিলেন, “ইস্ত্রের ঐরাবত ভিন্ন অস্ত্র কেহ আমাকে এই স্থান হইতে মূল্য করিতে পারিবে না।” ভগ্নীরথ বাইয়া ঐরাবতের আগ্রহনা করিলেন। ঐরাবত পারিশ্রমিকরূপে গঙ্গার প্রণয় প্রার্থনা করিল। ভগ্নীরথ আসিয়া এই লজ্জাজনক কথা গঙ্গাকে জানাইলেন। গঙ্গা বলিলেন, ঐরাবত যদি আমার তেজ সহিতে পারে তবে আমি তাহার অস্ত্রকাহিনী হইব। ঐরাবত বীকৃত হইয়া ধস্ত-দ্বারা পর্জন্ত-শূন্য বিলীর্ণ করিলে গঙ্গা সেই পথে নিয়-গামিনী হইলেন। ঐরাবত গঙ্গাস্রোতের বেগে-ভাসিয়া চলিল এবং ডেউরের চোটে অল খাইয়া কীপের হইল। অবশেষে গঙ্গাকে মা ডাকিয়া পরিভ্রাণ পাইল।

এখন বিবৃতি-বৈষম্যগুলি দেখুন। আমাদের গ-পুথিতে আছে, ঐরাবত উক্তবিধ পারিশ্রমিক চাহিয়াছিল বটে, তবে ইস্ত্রের উপদেশে ক্ষান্ত হইয়াছিল। মেদিনীপুরে প্রাপ্ত ক-পুথিতে এবং বাহুবল্য প্রাপ্ত স্ব-পুথিতে পারিশ্রমিকের প্রসঙ্গমাত্র নাই। ঢাকার প্রাপ্ত হ-পুথিতে ক-পুথি অনুযায়ী বর্ণনা আছে, কিন্তু রচনা বিস্তৃততর ও সুন্দর। এত সুন্দর যে, পাঠকগণের জন্ত উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না।

চন্দ্রসেক ঐরাবত প্রেম জয়।

প্রবীন পরীর যেন দ্বিতীয় হিমালয়।

কনক কঙ্কণ শোভে সুললিত অতি।

গলে ঘণ্টা বাজে ধায় হৈয়া বলে মাতি।

উচ্চ ছই দস্ত বেন ফটকের দস্ত ।
 চলে হস্তীর মনে করি অতি দস্ত ॥
 চলিলেক ঐরাবত হরষিত চিত্রে ।
 নিখুঁত মতিত তও শোভে ভাল মত্রে ॥
 নিঃশাসেতে ধূল্য উড়ে চলে মহাবল ।
 কুণ্ডলী করিয়া তও অতিশয় বীষণ ।
 কপালেতে মদগন্ধে মাতি তুলে অলি ।
 পান করে অলিহুল বেশি অতি ভালি ॥
 পদে পদে চলিতে অবনী হয় বাদ ।
 বৃক্ষ ভাঙ্গে অতিশয় গুনিতে প্রমাদ ॥
 বৃক্ষ পাখর সমুখেতে বাহা দেখে ।
 নিঃশাসের ভরে বাইরা পড়ে অস্ত কুণ্ডে ॥
 বড় বড় পক্ষত সব সমুখে দেখিয়া ।
 নানা দিকে কেসে নিজ দরে উপাড়িয়া ॥
 কেহ বলে কেহ বলে বত প্রাণীলগ ।
 অতিভয় পায় তারা গুনিয়া তর্জ্জন ॥
 গর্জ্জন গুনিয়া যে আইসয়ে নিকটে ।
 ধ্বংসোপ ভায় হাতী অভিবেসে ছুটে ॥
 সিংহ ব্যাঘ্র আদি বত পতশকীলগ ।
 নিজ প্রাণ রাখিবারে সব ভয় মন ॥
 পাতালের আগমন হয় চমকিত ।
 ঐরাবত পদভরে বাহুকী চিত্তিত ॥

ঐরাবতের এই চমৎকার বর্ণনাটি হ-পুণ্ডি ভিন্ন
 অত কোন পুথিতে পাই নাই । অতঃপর হাতী আসিয়া
 পদ মূল করিয়া দিলে—

হাতী যেহি ভাঙ্গিরখী কোপদৃষ্টে চায় ।
 মহাম্রোতে পদব্রজে ভাসি ভাসি যায় ॥
 পৃথিবী মণ্ডলে হৈল গঙ্গা অবতার ।
 অস্র অস্র জ্বলি হৈল এতিন সংসার ॥
 গঙ্গাধেবী ঐরাবতে ভাসায় বর ঘোড়ে ।
 অবিরত গঙ্গাধেবী পড়ে পৃথিবীতে ॥

তরঙ্গে পড়িয়া হাতী কৃপ বেন ভালে ।
 বেশি ভঙ্গিরণ রাজ্য হরিষ বিশেষে ॥

বলকীর্ণ হঞা হাতী যায় প্রচুর জল ।
 গ্রহিবারে ঐরাবত নাহি পায় স্থল ॥
 অবিরত ভাসিঞা বেড়ায় ঐরাবতে ।
 কৃপ ভায় ভালে হাতী অশাখ জলেতে ॥
 আছুক লাভের কার্য্য জীবন সংশয় ।
 লম্বটে ঠেকিল হাতী উপায় না দেখয় ॥
 আকুল হৈল ঐরাবত প্রাণ রাখিবারে ।
 লম্বটে পড়িয়া হাতী গঙ্গা ভ্রুতি করে ॥
 জল হৈতে তুলি তও উর্দ্ধ করি মাথা ।
 ভ্রুতি করি ধীরে ধীরে গঙ্গায় কহে কথা ॥

ভ্রুতি করে ঐরাবত করিয়া বিনয় ।
 গুনিঞা জম্বিন দয়া গঙ্গার জদয় ॥
 এক তরফেতে তীরে কেনিলেক হাতী ।
 প্রাণ পান্যে কর্ণ ঝড়ো বেষ শিখরতি ॥

শেষ ছত্রের বর্ণনাটুকু হাতরনের বিস্তারক !

গঙ্গাভীর্বের বিবরণ একমাত্র হ-পুণ্ডিতেই
 বিস্তৃত ভাবে আছে—অত সম্বৎসরি পৃথিই এই
 স্থান লক্ষিত করিয়া দিয়াছে । এই স্থানে একটি
 দুর্গাচার ব্রাহ্মণের কাহিনী আছে । ব্যাঘ্র-নিহত
 এই দুর্গাচারের অস্থি বনমধ্যে পড়িয়াছিল—উহাতে
 গঙ্গাঙ্গল-স্পর্শে ব্রাহ্মণ মূল হইয়া বর্ষে চলিয়া গেল ।
 বাজার-সংকরণে এই ব্রাহ্মণের নাম কাণ্ডার মুনি ।
 আমাদের হ-পুণ্ডিতে ব্রাহ্মণের নাম—চন্দ্র
 পুণ্ডিতে বর্ষকেতু । এই পট্টীর মূল বনপুত্রানের
 কাশীধৃত, পূর্বাঙ্ক, ২৮ন অধ্যায় । তথায় ব্রাহ্মণের নাম
 বাহীক ।

অতঃ পুণ্ডি গঙ্গাপান প্রসঙ্গে মূল ব্রাহ্মণে আছে—
 অতঃ পুণ্ডিকে কর্ণপথ দিয়া বাহির করিয়াছিলেন ।
 কৃতিবাসের পুথিগুলিতে দেখা যায়, বিদীর্ণ জাহ্ন
 দিয়া গঙ্গা বাহির হইয়াছিলেন । এই জাহ্নপথে
 নির্গম-কাহিনী বৃহদ্রথপুত্রানে আছে ।

পদ্মানদীর উৎপত্তি-কাহিনী প্রসঙ্গে বাজার-

সভারূপে দেখা যায়,—ভাণ্ডারখন্ডে বসে। পূর্ণ মূর্তির পিছনে চলায় পদ্মা নদী উপরে হইয়াছিল। ইহার মূলও বৃহৎপুত্রায়। তথায় দেখা যায়, পদ্মা জল মূর্তির কক্ষা,—পদ্মাকে দেখিতে তাঁহার ইচ্ছা। হওয়ায় তিনি শব্দজনি করেন। তাহা গুনিয়া পদ্মা অধিকোপে ধাবিত হন—পরে ভাণ্ডারখন্ডে শব্দজনি গুনিয়া ফিরিয়া আসেন (মধ্যখণ্ড — ২২১৩২-৩৭)। অষ্টোত্তাচার্যের মুদ্রিত পুথিতেও পদ্মাজয়প্রসঙ্গ আছে — কিন্তু জন্ম কাহারও পিছনে চলিয়া নহে। ঋ-পুথিতে পদ্মাহরের পিছনে চলিয়া।

বাক্য। দেবের ভাণ্ডারখণ্ড-ভীতহু পদ্মাতীর্থগুলির নাম ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক হিসাবে প্রয়োজনীয়। কিন্তু মূল রামায়ণে জল-প্রদেশের পরেই সাগর প্রবেশ। বৃহৎপুত্রায় জল-প্রদেশে পদ্মা হইতে বাহির হইয়া যমুনাস্র পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ মূলস্রোতী জিবেঐ-সমুদ্রায় হইয়া পদ্মার সাগরে প্রবেশ বর্ণিত আছে। আবার ক-প-ত পুথিতে রামায়ণবৎ বর্ণনা। ঋ-পুথিতে আসিতা তীর্থ, একাদশী তীর্থ ও সমুদ্রায়ের উল্লেখ আছে। বাম্বার-সম্বরণে ইন্দ্রেশ্বর, মেড়াতলা ও সমুদ্রায়। ঋ-পুথিতে শীতলপুর, নবদীপ, সমুদ্রায়।

মুদ্রিত অষ্টোত্তাচার্যে তুলসীঘাট, মহেন্দ্রনগর, নেতাই খোপানীর ঘাট, কপিলমূর্তি, পদ্মাসাগর। কৃত্তিবাসের কোন পুথিতে নবদীপের নাম পাই নাই—উহা একমাত্র ঋ-পুথিতে দেখিরাছি। সম্মতি পণ্ডিতবর ঐশ্বর্য খোপেশচন্দ্র রাধ কৃত্তীর ব্যতীত পদ্মার কৃত্তিবাসের জন্ম ১৩২০ খৃস্টাব্দে মাঘ মাস, রবিবার ঐশ্বকর্মা দিন হইয়াছিল বলিয়া বিদ্যারিত করিয়াছেন। তখন বাক্যলার রাজধানী পাণ্ডুয়া,—দৌড় পরিত্যক্ত। কৃত্তিবাস ১৩৩২-১৩৪০ খৃস্টাব্দে বিংশবর্ষ বয়সে রাজা গণেশের সভার উপস্থিত হইয়াছিলেন। পদ্মার গমন-পথে নবদীপের মত প্রধান স্থানের অগ্রসেবা দেখিরা মনে হয়—ই-বৃত্তিকালীন-বিস্তৃত নবদীপে তখন পর্য্যন্তও পুনঃবার জনবসতি আরম্ভ হয় নাই।

ঋ-পুথিতে ইহার পরে চন্দ্রকর একটি বচনায় পদ্মা-মাধাশ্রা বর্ণিত আছে। উহা সম্পূর্ণ বৃহৎপুত্রায়ের অগ্রসারী। কিন্তু প্রবক্তা বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই এই মাধাশ্রা পাঠের পূর্বা হইতে পাঠকগণকে সঙ্গ্রহে বঞ্চিত করিলাম। *

* 'তাহার' 'তাহাদের' প্রভৃতি বানান লোকের মৈথিল্য। — উদয়ন-সম্পাদক

“যেদের ইতিহাসধারণ লোককে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ, এক তাহাই আমাদের অবনতির একটি কারণ। যতদিন না ভারতের সর্বসাধারণ উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে, উত্তমরূপে খাইতে পাইতেছে, অভিজাত ব্যক্তির বতদিন না তাহাদের উত্তমরূপে বস্ত্র লইতেছে, ততদিন বতই রাজনীতির আন্দোলন করা হউক না কেন, কিছুতেই কিছু ফল হইবে না।”

—বিবেকানন্দ

দরদী

(লণ্ডন-সরসাতিক)

শ্রীদির্দাপকুমার রায়

গনি' বংশি বিভল হিয়া উর্নি-উতল, শিগাসল সে চায় লো—ত্রিভল ভ্রামল
 বার রাগ রটে "অনয়ে অনয়ে
 মোর মুর্ছনাগল বধে মুছে অমল—ভবে বিহরি' ছুখ বাখা বক্যা বিকল
 আর পান-ডটে শরৎ পরবে ।" ...
 ছিল লংসারে আশ কত...দীর্ঘ নিশাস ধবে বকিল—অন্তরে সিদ্ধ-উদাস
 যবে ডমক তুহার নিনামিল হে !
 সেই বোল তব জংপুরে লকলি' নিম্নরে স্বপ্ন-আগিন্ধনে দীপ্ল তিগাস,
 রক্ত-পথে অভিসারিল যে !...
 বাখা নিত্য-মুতন বত পঞ্জিল—মন তত তৃফিকা লক্ষ্যি' লো ছুটুল বনে—
 হেলি' পতি-গোরব সুখ-সাধ তরম,
 সবে পতিগ : "হায়, রাখা কষ্টক-পার কী নিরুদ্দেশে যারিল মুকুপণে ?
 ধনি' বাজ কুলে তামি' লাজ ধরম !" ...
 যল-তৃপ্ত যে অন পেয়ে—কুক-চরণ-ডাকে হয়নি কলভিনী সর্গনাথ—
 বে না বেগ-কুলে নিতি সর্প সয়ে—
 মোর পুঞ্জ-বেধন তারে বসুতো কেমন ক'রে বদি লো মই—যে না শুন্ল বাপি—
 সতী-ঈষিত আঘতি বার্থ বধে ?
 কতু কিতিনী-করণে-বহুত-অমনে মুক্তি-মকং তোলে দীপ্তি বলি' ?
 কতু মোহ-বিলাস-বিলোল ভরী
 ধায় অধুনি-আজ্ঞানে শঙ্খ-উপাঙ-টানে সৈকত-অঙ্কন। বুতো দলি' ?—
 উঠে কুল-কুলে যে চির শিহরি' ?
 যেত মন্বর-সৌধ যে সম্পদ-উরসে মদ্বি' বরণ করে মুক্তপাদি—
 সে কি বোম-বিতান পিধান অণে ?
 উলু উৎসব-উল্লাসো নিত্য বে-কুল্লরা—কান পাতি' তনবে সে যৌন বাণী ?
 মদ-রক্ত সভা ব্রত-নয় কণে ?
 হায় বহুছাড়া অঙ্কনে পুত্র ভূবন প্রেমে নীলগে নমিত মেখল না যে—
 তার নয়ন নীলমণি কতু কি করে ?
 ছুই' বিধ বে অধরপুটে হয়নি অমর—শিতিকর্ষ-শিবাক্ষনে তার কি নাচে
 কুক অমৃত-রসে লহরে লহরে ? *

* এতি প্রবন্ধের প্রথম ও তৃতীয় লাইন পরসাতিক ছন্দে (যদিবা) রচিত ; (যতীয় ও চতুর্থ লাইন লণ্ডন ছন্দে, অর্থাৎ আ, ই, ঔ, ঐ, ও, ঔ, ছ'যাতা। অতিপঞ্জিক শব্দগুলি (গনি' বার মোর ইত্যাদি শব্দ) বাজাকৃত রচিত।

অরুণোদয়

(উপভাস)

খ্রীষ্টানত্বানন্দ মুখোপাধ্যায়

[পূর্বাাহুতি]

কলিকাতায় স্নেহবস্ত্র বস্ত্র রোগের মহামারী
হুত্ব হইয়াছে। বীরেন স্নেহ-দিন আপিস হইতে বাড়ী
কিরিয়াই নারায়ণীকে সাবধান করিয়া দিল।—‘সেখো
বেন ছেলেটার ঠাণ্ডা দেগে হঠাৎ মত-মালা না হয়।
তোমার বাড়ীউলী-মা’কে ব’লে দিও।’

নারায়ণী বলিল, ‘হ্যাঁ, তাই শুনি। মা
বলছিলেন, ঐ বে ঐখানে কখনোই গালা বাড়ীটা
আছে না, ঐ বাড়ীতে কার বেন কি হয়েছে।’

বীরেন বলিল, ‘ছেলেটাকে বাড়ী থেকে বেরোতে
দিও না।’

যাড নাড়িয়া নারায়ণী বলিল, ‘বেশ।’

‘তুমি বেশ বলল কি হবে? তোমার সঙ্গে ত’
আর বেরোয় না, বাড়ীউলীকে সাবধান ক’রে দিও,
তা’ হ’লেই হবে।’

নারায়ণী বলিল, ‘মা’কে কিছু বলতে হবে না।
তিনি তোমার চেয়ে বেশী জানেন।’

কিছু ব্যাধি এখন আসে, তখন আর জানা-জানির
তোয়াড়া রাখে না। দিন কয়েক পরে একদিন
সন্ধ্যায় দেখা গেল, দেবুর রীতিমত মৃত হইয়াছে।
শরীর বেন আন্তরের মত গরম, চোখ দুইটা লাল।
নারায়ণী তাহাকে বিছানার পোয়াইয়া গায়ে ঢাক।
দিয়া শিয়রের কাছে বসিয়া রহিল। মাসি তাহাকে
আশ্বাস দিয়া বলিল, ‘ও কিছু না মা, হৃ’দিনেই
সেরে যাবে।’

মাতের মন কিছু তাহাতে আশ্বাস মানিল না।

পাড়ার চারিঘিকে বস্ত্র হইতেছে, শ্রাবী তাহাকে
আপে হইতেই সাবধান করিয়া নিগাহিল, তবু ছেলেটার
মৃত হইল, সে হুত্ব আপিস হইতে কিরিয়া তাহার
অপমানের কিছু আর বাকী রাখিলে না।

তা’ অপমান করে করুক, হে ভগবান, তাহার
ছেলের বেন কিছু না হয়।

বীরেনের মৃত রাতে প্রতিদিন নারায়ণীকে রাগা
করিতে হয়। স্নেহ-দিন তাহার রাগের কথা আর
মনেই রহিল না। ছেলের শিকরে বসিয়া ভয়ে-ভাবনা
সমুচিত হইয়া গিয়া হুর্দল ও মলহারের একমাত্র
ভরসা সেবতাদের কাছে তাহার কাতর প্রার্থনা
জানাইতে লাগিল।

মাসি বলিল, ‘ভর কিসের নারায়ণী, ছেলের
অস্থখ-বিস্থখ হবে না?’

নারায়ণী বলিল, ‘কিন্তু এ-সময় অস্থখ করলে যে
বড় ভয় করে, মা।’

মাসি বলিল, ‘কিন্তু ভয় নেই, মা; ভয় করিসনি।
তুই বরং ছেলের কাছে বোস, আমি তোর রাগা
ক’রে দিই।’

বসিয়া নারায়ণীকে ছেলের কাছে বসাইয়া মাসি
নিষেই রাগা করিতে গেল।

বীরেন তখনও বাড়ী কিরে নাই। বাড়ী কিরিয়া
ছেলের অস্থখ দেখিয়া কি বে সে বলিবে, কে
জানেন। বাহিরের দিকে কান পাতিয়া সে তাহার
পায়ের শব্দ শুনিতে লাগিল।

চ’কনের রাগা এখন বিশেষ কিছুই নয়। শব্দ
হইতে বেশী বেশী হইল না। মাসি বলিল, ‘রাগা-
থরই সব ঢাকাহুকি দিবে রাখাম না, বেড়ে

নিরে বা'ল্—কিন্তু বীরেন আজ এখনও কেন আসছে না, বল দেখি? আসবে না—না কি?'

বাড় বাড়িয়া নারায়ণী বলিল, 'আমু'বে।'

'এসে যদি ডেকে বকাবকি করে ত' আমাকে ডেকে দিল, বাছা, আমি ওকে বুঝিয়ে বলব।' বলিয়া মাসি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মাসি বোধ হয় তখনও তাহার উপরের ঘরে দিয়া পৌছে নাই, এমন সময় ছুতার শব্দ করিয়া বীরেন ঘরে ঢুকিল।

ঢুকিয়াই নিজাস করিল, 'ও কি? খোকা ওরকম ডাবে গুয়ে কেন?'

নারায়ণীর মুখখানি তখন ভরে শুকাইয়া গিয়াছে, গলা দিয়া আগুয়ান্ন বাহির হয় না! শেবে অতি কষ্টে গলাটা একবার পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, 'অর হয়েছে।'

'হঁ' বলিয়া গভীর সুখে বিছানার কাছে আগাইয়া গিয়া খেবুর মাথায় গারে হাত দিয়া বীরেন বলিল, 'চমৎকার!'

তাহার পর জামা খুলিয়া, ছুতা খুলিয়া, কাপড় ছাড়িয়া হঠাৎ সে উদ্দেশের মত চীৎকার করিয়া উঠিল, 'বা' ভেবেছিলাম, ঠিক তাই।'

বলিতে বলিতে সে হাত-পা ধুইবার জন্য কলতলার দিকে চলিয়া গেল। বলা তাহার তখনও শেষ হয় নাই। কলতলার হাতে গারে জল ঢালিতে ঢালিতে সে বলিতে লাগিল, 'হি হি হি হি, এবার আমি করি কী! এই ক্ষণে কতদিন ধ'রে মাখান ক'রে দিছি, তবু হ'লু নৌই।'

সিঁড়িতে গাড়াইয়া গাড়াইয়া মাসি সবই শুনি। তাহাকে সাহসনা বিবার জন্য কি যেন সে বলিতেও হাইভেছিল, কিন্তু কথাটা তাহার মূখ দিয়া বাহির হইবার আগেই বীরেন বলিয়া উঠিল, 'নাঃ, ছেলেকে আমার ভালবাসতে হবে না। বুড়ী মাণী—এইটুকু ছেলেকে নিরে পাড়ায় পাড়ায় ঘুর বেড়াচ্ছ, জানো না যে ঘরে-ঘরে বসন্তের কণী। কণী যেতে যেতে হচ্ছে হয়

ত' নিজে বাও না বাসু, ছেলেকে সঙ্গে নিরে যাওয়া কেন?'

কথাটা যে তাহাকেই বলা হইতেছে, মাসি তাহা বুঝিল। ছেলেকে সঙ্গে লইয়া সর্বত্রই সে যায় সন্ধ্যা, ছেলেটা কিছুতেই তাহাকে ছাড়ে না, কিন্তু ছেলে লইয়া কোনও রোগীর বাড়ী সে কোনও দিনই যায় নাই। এবং অমুখ যে তাহার গুণু সেই ক্ষণেই, এ তুল ধারণাই বা বীরেনের হইল কেন!

সিঁড়ির এক ধাপ এক ধাপ করিয়া বীরে বীরে মাসি নীচে নামিয়া আসিল। বীরেন কলতলার হইতে ঘরে দিয়া হাত মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল, 'মাণীকে তুমি বুঝিয়ে ভাল ক'রে বলনি যে, পাড়ায় বসন্ত হচ্ছে, ছেলেকে এ সময় কোথাও তুমি নিরে যেয়ো না?'

নারায়ণীর মন ভাল ছিল না। কথাটার সে ভাল করিয়া শবাব মিতে পারিল না; বলিল, 'এ তোমার কি যে শব্দাব, কে জানে। কেন তুমি ওকে মোহ দিচ্ছ, বল ত? ছেলে তোমার মা মা ক'রে মজান! একা ওর এক-শা বাড়ী থেকে বেরোবার জো আছে? গুঝিয়ে বেরিয়ে সেলে কাঁদতে কাঁদতে সেবু ওঁর শিঁদু-শিঁদু ছোটো।'

বীরেন বলিল, 'তাই বলে এই অমুখ-ব্যারামের কথা কেনে শুনেও নিরে বেতে হবে? কচি খুকি ত' নয়,—বুড়ী মাণী জানে না যে—ছেলের যদি এখন ঐ রকম একটা কিছু হ'রে যায় ত' বিচানো শক্ত হবে!'

মাসি অশ্রুকারে গাড়াইয়া ছিল। ইহারা কেহই তাহাকে দেখিতে পার নাই। মাসিও আর চুপ করিয়া গাড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া দরজার কাছে আগাইয়া আসিল। বলিল, 'মনরক আমায় তুমি কেন সোবী করছ বাবা, ছেলের দরদ আমি বুঝি।'

বীরেন হাসিয়াই ছিল, তেমনি হাসিয়াই শবাব দিল। বলিল 'ছাই হুকেন। নিছের ছেলেশুলে হয় নি, কেমন ক'রে বু'বন আপনি?'

সে যে হঠাৎ এত বড় একটা শব্দ কথা বলিয়া বলিবে, মাসিও তাহা বুঝিতে পারে নাই, নারায়ণীও

ভাবে নাই। ছি ছি, এ তার তারি অজ্ঞান। নারায়ণী মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া তৎক্ষণাত্ বাট হইতে নামিয়া মালি যেখানে গাড়াইয়াছিল, সেইদিকে আশাইয়া গেল। কিন্তু অকস্মাৎ কাহাকেও দেখিতে পাইল না। ডাকিল, ‘মা!’

কাহারও সাড়াশব্দ না পাইয়া বলিল, ‘মা, আপনি কি চ’লে গেলেন?’

এবারও কোনও জবাব পাওয়া গেল না। নারায়ণী পুনরায় ঘরে চুকিয়া বীরেনের কাছে গিয়া গাড়াইল। বলিল, ‘ছেলের অস্থব্ধ, বেশি কিছু তোমায় বলব না, কিন্তু তোমার পায়ে আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে।’

‘কেন?’ বলিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বীরেন তাহার মুখের পানে তাকাইল।

নারায়ণী বলিল, ‘কেন, তা’ বুঝতে পারছ না? মা’কে তুমি মিছামিছি অপমান ক’রে দিলে, উনি রাগ করে চ’লে গেলেন।’

বীরেন গাভমুখ ঝিটাইয়া জবাব দিল। বলিল, ‘না না, রাগ করে নি। তোমার সবচেয়ে বাড়াবাড়ি। যাও—ছেলের কাছে চূপ ক’রে বোসো পে মাও।’

তবে আর নারায়ণী কোনও কথা বলিল না। একবার ভাবিল, উপরে গিয়া মায়ের রাগ ভাসাইয়া আসে, কিন্তু স্বামী পাছে আবার রাসিয়া চীৎকার করিয়া জর্তু বলিয়া তাহাও সে পারিল না, আবার জেঁনি বীরে বীরে সেবুর শিররের কাছড়িতে গিয়া চূপ করিয়া বলিল।

বীরেন খানিক চূপ করিয়া হেঁটমুখে কি বেন ভাবিল, তাহার পর হঠাৎ এক সময় খুব জুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘রাস্যাবাদ্য কিছু হচ্ছে, না তাও হয় নি?’

নারায়ণী বলিল, ‘হয়তো। তুমি একটু এইখানে এসে বোসো, আমি তোমার খাবার এনে দিচ্ছি।’

ছেলের অস্থব্ধের চিন্তায় পাওয়া সেদিন কাহারও আর ভাল করিয়া হইল না। আহাৰাদির পর

বীরেন গুইয়া পড়িল। লঠনটা হাতে গইয়া হেসেলের কাজ সারিবার নাম করিয়া নারায়ণী কিঞ্চিটু করিয়া একবার উপরে উঠিয়া গেল।

বেশিগ, বরজার বিল বন্ধ করিয়া মালি তখন গুইয়া পড়িয়াছে। ‘মা’ ‘মা’ বলিয়া বারম্বার ডাকাডাকি করিয়াও বিল বন্ধন তাহাকে সে পোষাইতে পারিল না, তখন কি আর করিবে, বাধ্য হইয়া সে নীচে নামিয়া আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া বরজার কাছে চূপ করিয়া গাড়াইয়া গাড়াইয়া কি বেন ভাবিল, তাহার পর লঠনটা খাটের কাছে নিবাইয়া রাখিয়া সেখুঁকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া গুইয়া পড়িল।

সমস্ত রাত্রিটা এক রকম বিনোদিত অবস্থায় কাটাইয়া ভোরের দিকে নারায়ণী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সকালে বীরেনের ঘুম ভাঙিতেই দেখিল, মা ও ছেলে দু’জনেই দু’জনকে লড়াইয়া ধরিয়া ঘুমাইতেছে। সেবুর গারে হাত মিডেই সে চমকিয়া আসিয়া উঠিল। জোখ মেলিয়া চাহিয়াই বাবাকে সে তাহার মুখের উপর হুকিয়া পড়িতে দেখিয়া কি বে ভাবিল, কে জানে; কিন্তু করিয়া একবার হাসিয়াই সে তাহার মা’র মুকের ভিতর খুখানি লুকাইয়া ফেলিল।

‘সেবি বাবা, আর একবার সেবি’—বলিয়া বীরেন তাহার গারে হাত দিয়া দেখিল, উজাপটা বেন কাল রাত্রির জেরে অনেক কম। তাহা ছাড়া সমস্ত রাত্রির মধ্যে সেবু একবার খুব জুলিয়া তাকানো দূরে থাক, একটা সাড়াশব্দ করে নাই, আরের ঘোরে বেহালু হইয়া পড়িয়াছিল; এতক্ষণ পরে খুবে তাহার হাসি ফুটিয়াছে। তবু বিশ্বাস নাই, সময় খারাপ, ভাল একজন ডাক্তার ডাকিয়া দেখানো উচিত। অথচ, আট টাকা ‘ভিকিটু’ না দিলে ভাল ডাক্তার বোধ হয় পাওয়া যাইবে না। শাইফ ইন্সপেক্টরের প্রিমিয়াম বিয়া হাতে তাহার মাজ সোটা দশেক টাকা রহিয়াছে।

ডাক্তারের ঠিকবে যদি এ দশটি টাকা আজই খরচ
হইয়া যায় ত' মাসের বাকি কয়টা দিন তাহাদের
খাওয়ার ব্যবস্থা কি যে হইবে, কে জানে।

মাথা কি আর সাথে বিন্ড়াইয়া যায়!
নারায়ণী বুঝে না। তবে, বুঝি সে ইচ্ছা করিয়াই
বাহার-তাহার সঙ্গে কদড়া করিতেছে।—এমনি সব
নানান্ কথা ভাবিতে ভাবিতে বীরেন হাত-মুখ মুইতে
পেল।

কিরিয়া আসিয়া দেখিল, নারায়ণীর ঘুম ভাঙিয়াছে
এবং সে লম্বাভ্যাপ করিয়া উঠান খরাইয়া গরের
কানকর্ণ করিতে বসিয়াছে।

বীরেন আসিতেই নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল,
'আপিস যাবে ত' ?'

বীরেন বলিল, 'যাব।'

বলিয়াই সে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,
'মাগে একজন ডাক্তার ডেকে আনি, কি—'

এই বলিয়া তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া
নারায়ণী বলিল, 'কি ?'

বীরেন বলিল, 'টাকাকড়ি হাতে নেই, কি যে
হবে, কে জানে।'

নারায়ণী একবার তাহার মুখের পানে তাকাইল,
একবার সেবুর দিকে তাকাইল। বলিল, 'পাঁড়াও,
তোমার চা এসে' মিই, বোসো।'

চা খাইয়া বীরেন ডাক্তার ডাকিতে বাইবে
বলিয়াছে, কিন্তু হাতে তাহার টাকা নাই। নারায়ণী
তাহার গলার সর হারগাছি খুলিয়া চুপিচুপি বীরেনের
হাতে দিয়া বলিল, 'বন্ধু দিয়ে যা' পাও তাই
দিয়ে কোনও রকমে এখন চলিয়ে নাও, কিন্তু মাইনে
পেলে আদর্শ-মাসে আবার ছাড়িয়ে দিয়ো বেন।'

হার ছড়াটি হাতে লইয়া বীরেন চুপ করিয়া
বসিয়া রহিল। কি করিবে, বোধ কবি তাহাই
ভাবিতেছিল, এমন সময় বাহিরে অপরিচিত কণ্ঠের
ডাক শুনিয়া সে উঠিয়া পাড়াইল। বলিল, 'কে ?'

'কে' বলিয়া আর বাহিরে বাইবার প্রয়োজন হইল

না, যিনি ডাকিতেছিলেন তিনি যত্ন আসিয়া। উপস্থিত
হইলেন। সেবা দেণ, অপরিচিত এক বৃদ্ধ—মাথার
লম্বা লম্বা পাকা চুল, বুখে একমুখ শাদা দাড়িগোঁস,
একবারে দরজার কাছে আসিয়া বলিতেছেন,
'কোথায় গো মা—মাথা কি বল্ল, নামটি যে
ভুলে গেলাম। কার সম্বন্ধ করেছে গো, কই
কোথায় ?'

বীরেন আদাইয়া পেল।—'কাকে চান আপনি ?'

আশ্চর্য বলিলেন, 'আমাকে চিন্তে পাবলে না,
বাবা ? বড়ো চিন্তামনি কোব্রেরের নাম শুনেছ ?'
বীরেন বলিল, 'ওনেছি।'

'হ্যা, তা' ত' শুনেই, বাবা। এ পাড়ায় রয়েছ
যখন... আনিই সেই বৃদ্ধ। কোব্রের। সেই কোন্‌ ভোর
রাতে মা আমার দিগে ব'লে এলো—ছোট একটি
ছেলের নাকি মা শ্রুতলার কৃপা হয়েছে, কই দেখি
বাবা, একবার ছেলেকে আমি দেখে ব।'

একক্ষণে ব্যাপারটা বুঝিতে কাহারও আর বিলম্ব
হইল না।—মাসি দিয়াই কবিরাজকে ডাকিয়া দিয়াছে।

বীরেন বলিল, 'মাসুন।'

বলিয়াই সে তাহাকে সেবুর কাছে গইয়া দিয়া
বলিল, 'এই ছেলে।'

কবিরাজ মহাশয় পায়ের চট মোড়াটি ধরের
বাহিরে খুলিয়া রাখিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছিলেন।
খাটের একপাশে চাপিয়া বসিয়া সেবুর মুখের 'পরে
সুঁকিয়া পড়িলেন। বুড়ার লম্বা লম্বা দাড়ি দেখিয়া
সেবু তখন ভয়ে একবারে কাঠ হইয়া দিয়াছে।

হাত বাড়াইয়া কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, 'কই
দেখি বাবা, হাতটি দেখি।'

জয়ে-ভয়ে সেবু তাহার হাতটি বাহির করিল।

নিবিষ্ট মনে কিয়ৎক্ষণ নাড়ি টিপিয়া কবিরাজ
মহাশয় একবার বীরেনের মুখের পানে বিশ্লেষ্ট
বৃত্তিতে তাকাইলেন। বলিলেন, 'রাতে বৃষ্টি মর
হয়েছিল।'

বীরেন খাড় নাড়িয়া বলিল, 'মাঝে ঝাঁ।'

কবিরাজ মহাশয় ঠেং হাঙ্গিয়া বলিলেন, 'কিছু
এর বলহু হয়েছে, কে বললে ?'

বীরেন বলিল, 'রায়ে ভয়ানক জ্বর—জ্বরের
ঘোরে একেবারে অচেতন হ'য়ে প'ড়ে ছিল, তার
শর এই সমস্তটার প্রায় ঘরে-ঘরেই ঐ ব্যারাম
হচ্ছে কি না, তাই একটুখানি—'

কুৎ কবিরাজ খাড় নাড়িয়া, নাড়ি নাড়িয়া
বলিলেন, 'না। বলহু গর হবে না। সে জ্বরের
চেহারাও আপনাদের বাবা, সে-সব কিছু নয়। আপনারাই
সন্তান বুড়ি ?'

বীরেন বলিল, 'মাকে হ্যাঁ।'

কবিরাজ মহাশয় উঠিয়া গাড়াইলেন। বলিলেন,
'মাতুল আমার সঙ্গে, হুঁটা বড়ি দেবো, মনু দিবে
মেড়ে বাইরে দেবেন, কাল আপনার ছেলে ছুটে
বেকাবে।'

বীরেন একটা বস্ত্রি নিঃখাল ফেলিয়া জামাটা
পারে দিতে দিতে মিচ্চাস্য করিল, 'কশী বেখ'তে
আপনি কটাকা—'

কবিরাজ বলিলেন, 'সে ত' আমার মা-ঠাকুর
আসেই দিবে এসেছে, বাবা। বল্যাম, আসে

আর শোন্বার মেয়ে ? কিছুতেই ঢকলে না, বললে,
সন্ধান বেলা আপনারকে ডাকতে এসেছি, টাকা
হুঁটি আপনারকে নিতেই হবে।'

বলিতে বলিতে তিনি ঘরের বাহিরে আসিয়া
গাড়াইলেন।—'কই, আমার মা কোথায় গেল মো ?
মা'র সঙ্গে যে আমার কথা হ'ল না !'

বলিয়া তিনি দি'ড়ির কাছটার গাড়াইয়া একবার
উপরের দিকে তাকাইলেন।

পালসেই কলঘর। মাসি এতকল বোধ করি এই
খানেই কোথাও গাড়াইয়া ছিল, কলঘরের ভিতর
হইতে তাহার পলার আঞ্জাক পাওয়া গেল।—
'আপনি যান। আমি সব শুনেছি।'

কবিরাজ হাঙ্গিয়া বলিলেন, 'যে বকম ভর পেয়ে
আমার কাছে ছুটে গিয়েছিলে মা, জেবেছিলাম দাঁতাই
বুড়ি বা কিছু হয়েছে। কিন্তু এসে মা' দেখ'লাম,
ও কালই আমার তোমার পিছু-পিছু ছুটে বেকানে, মা।
কিন্তু জেবো না।'

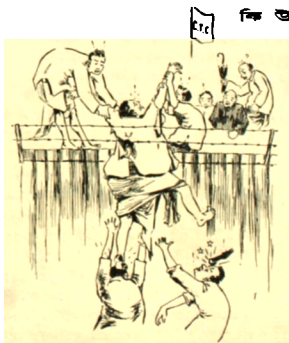
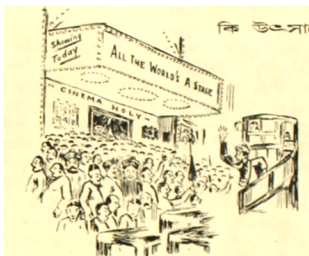
মাসির কাছ হইতে আর কোনও জবাব পাওয়া
গেল না। কবিরাজ ও বীরেন বাড়ী হইতে বাহির
হইয়া গেল।

কেন মা, কল আগে দেখে আসি, কিন্তু সে কি

(ক্রমশঃ)



আমরা কিসে কম ?



সর্বদা আলো-চাওয়া উদ্ভূত রাপি ব'লে আমাদের মুখে তো ঠাণ্ডা লাগে না ! আমি যুরোপ ভ্রমণকালে, শীতকালে ও বরফের উপরেও হুড়ির সঙ্গে মোড়া না প'রে অনেক বেড়িয়েছি ; কৈ, ঠাণ্ডা তো কখনও লাগে নি। হাতে দস্তানাও (gloves) পরি নি ; বরং পকেটে সেখেছি হাত যেন আরও শীত কন্কন করে। কারণ এই যে, মুক্তি-সোষকে আমাদের পা সর্বদা অনাবৃত থাকায়, যুগের মত সর্বদা আলো-বাতাসের সম্পর্ক লাভ করে। অবশ্য খুব শীতের কথা বলছি না। আমাদের প্রাচীনপন্থী মেয়েরা, বিশেষতঃ বিধবারা, ঐ একখানি কাপড়ে যেমন শীত সহ করতে পারেন, আমরা নবায়নীরা কাপড়ের উপর কাপড় ঢাণিয়েও তা' পারি না ; সন্ধ্যাকালিও বন্ধ হয় না।

আমি দেখছি, এদিকে-খুব-পণ্ডিত এক বাগকে, যেহেতু কানিপিছু “আবার কাশ্‌হু! গায়ে বা পদায় আর একটা কাপড় জড়াও” ব'লে, শৈত্যের খোঁসার মত, কাপড়ের উপর কাপড় ঢাণিয়ে তাকে প্রায় সোণালুপ্তি ক'রে ফেলতেন ! তার পর বটায় বটায় ঐকথ সেলাও তো আছেই !

সভ্যতা কত কৃত্রিম উপায়ে ও রকমে, আমাদের আহার্যাসামগ্রীর ব্যবস্থাপনা তো নষ্ট করেছেই ; আবার তাদের শোভনীয় ও রসনা-উত্তেজক ক'রে আমাদের স্বাভাবিক স্বেচ্ছা-পরিতৃপ্তির যে সহস্র প্রকৃতি তার অভিরিক্ত এক অনাবশ্যক ও অস্বাভাবিক স্বেচ্ছার কাম বা চালসার উত্তেক করে। ফলে, তার তৃপ্তিসাধন করতে গিয়ে, অপরিমিত ও অস্বাস্থ্যকর ভোজনের দ্বারা আমরা আমাদের পরিপাক-ব্রণগুলিকে বিকৃত, রক্তকে তচ্ছনিত হুঁত ও শরীরকে দুর্বল ও রোগগ্রস্ত ক'রে ফেলি। আমরা যেন বাচ্চার মত খাই না ; খাবার জড়ই বাঁচি। সহরে ও আশুরে কুসুহ-বিভাদের কথা বলছি না, সভ্যতাসোমে তারাও দুষ্ট ; কিন্তু সহস্র প্রকৃতি-চালিত প্রাণীদের মধ্যে, আহায়ে একামপ্রকৃতি দেখতে পাওয়া যায় না।

সভ্যতা, আমাদের স্বাভাবিক ও আনন্দময়, প্রমদিস্থ

ও বিলাসী ক'রে, আমাদের দেহের পেশীগুলিকে নরম ও রোগ-প্রতিবেদক ক্ষমতাকে ক্ষীণ ক'রে, আমাদের দুর্বল ও ক্ষীণকার ক'রে ফেলেছে ; আর দেহের ‘হৃদয়’কে, যেন নরম ‘গারমাটি’ পেয়েই, বিবিধ রোগের বীজবল সংঘে অক্লান্ত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে।

এদিকে আবার এই বর্তমান কল্মসবল, সগাচকল, উত্তেজনাশূর্ণ জীবনযাত্রা কত দিক থেকেই আমাদের শরীরের উপর তার কুপ্রভাব বিস্তার করেছে ! নারসিক দুর্বলতা (Nervous debility, Neurasthenia) রক্তের চাপবৃদ্ধি (Blood pressure) এখন যেন সভ্য সমাজের এক অঙ্গ হ'তে দাঁড়াচ্ছে। তা' ছাড়া, কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation), বৃহৎক্ষয় (Dyspepsia), বহুমুত্ররোগ (Diabetes), দূরীকীর্ণতা (Short-sightedness), মেহবৃদ্ধি (Obesity), কৰ্কটরোগ (Cancer), হৃদরোগ (Heart-disease) প্রকৃতিকে সভ্যজগতের রোগ বলা যেতে পারে।

সভ্যতা ও বিজ্ঞান

সভ্যতামূলক বিভিন্ন ও জটিল জীবনযাত্রার পাকে আমাদের সহস্র জ্ঞান ও বুদ্ধি যেমন এক দিকে হারিয়ে ফেলেছি, তার পরিবর্তে এই সভ্যতাই আবার, আমাদের নিত্য নব অহুহুতি ও অভিজ্ঞতা-শূর্ণ বৈজ্ঞানিক জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও অঙ্গলান মোটাবার মত, বিজ্ঞানের সহায়ন করেছে।

এই বিজ্ঞানের আলোকেই আমরা আজ হিন্দু-মাত্রির স্বাস্থ্যমূলক নিত্য ক্রিয়ার অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করছি, যা' প্রাচীন কাল থেকে আমরা ধর্মের নামে অহসরণ ক'রে আসছি। পদায় (বা নদীতে) গানের মজনিবিত অর্থ বুঝি এই যে, ধর্মের নামে এই ‘বাবু-পত্র’ আমাদের নোরে গুঁঠাচ্ছে, পানিকটা বা অনেকটা রাস্তা পায়ে হাঁটাচ্ছে ; ভুব দিইরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ার দ্বারা নদীর উপরকার বিগুহ বাধুর সত্বসে আমাদের রক্ত

পরিষ্কার ও সজ্জ করছে : সীতারের দ্বার। অক-
চালনা ও ব্যায়ামনাথনা হচ্ছে ; খোলা গায়ে
বাতাস ও বোদের সম্পর্কে শরীর দৃঢ় ও সুস্থ
হচ্ছে ; প্রোডের জলে গামছা দিয়ে খঁসে শরীরের
সকল ময়লা ধুয়ে তো বাচ্ছেই, তা' ছাড়া দেহের
আবরণ যে-কব্, তাকে সক্রিয় করছে ; আর ঐ
কলসভায় বহুলোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের দ্বারা
চিত্তদুর্ভি লাভ ও জ্ঞানবিস্তারে সাহায্য করছে।
এই এক Prescription-এ কত কাণ্ড হচ্ছে। তা' ছাড়া
প্রত্যহ্ন রাহের কাঁচা ডালটা ভেঙ্গে, চিবিয়ে চিবিয়ে তা'
দিয়ে টাটকা টাটকা 'কুশভাণ' ক'রে তাই দিয়ে
পাতন করা ; এতে পাতের ব্যায়াম ও গোড়া পড়া
হয়। হেল্পকে ভেল মাথিয়ে কিছুকণ রোমে কেন্দ্রে
গাধার ও গৃহিণীর সিল্প দীর্ঘ কেশকে শুকাবার জন্য
ইচ্ছা-অনিচ্ছায় বানিকটা রৌদ্রমাণে রৌদ্রসেবন
হ'রে যায়। তা' ছাড়া, আমাদের উদ্ভিষ্ট-জ্ঞান রোপ-
সঙ্ক্রামণে কত বাধা দেয়। কলার পাতা বা মাটির
সেলাস একবার ব্যবহার ক'রেই কেন্দ্রে গি। বাইরের
জুতা ও তা'র সঙ্গে ধূলা-ময়লা খাবার ঘরের
ভিতর আসক্ত দিই না। দারু-লাগা কাপড়
প্রত্যহ্ন কল-কাচা ক'রে রোমে শুকিয়ে নিই।
আহুতিতে বেশ ভাল ক'রে কুলুড়ো ক'রে সুখ
ধুয়ে কেলি। এবং যে একটা পাণ চিবোই,
তা'র উপকারিতাও অনেক। সেদিন একখানি দ্বাদ্বা
সময়ে বইয়ে পড়লাম—বইখানি আমেরিকার ১২টা
দ্বাদ্বা-সমিতির সংবেদিতায় লেখা—যে, মানুষের
আদর্শ-পোষাক হবে, সাদা, সুতোয়, বা' সর্বদা
সঙ্গে থেঁতা যায়, হাতা ও আলো ; এক কথায়
বললেই হ'ত যে, আমাদের শাড়ী, আমাদের ধুতি-
চালর ; প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদেরও বোধ হয়
তাই ছিল। এতকাল ধূলাবানের ব্যবস্থা ছিল—হঁকো ;
গড়পড়ির জলের ভিতর দিয়ে ধোঁয়াটাতে অনেক
পরিমাণে 'নরম' ও বিচল ক'রে সেবন করা।
আর মস্ত তো আছেই—'অপের, অসের, অশুভ,

অগ্রাহ্য"—ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই সব কথা একবার
(১৯৩০ সালে) লন্ডন শহরে একটা সভায়
ব'সেছিলাম। ইংলণ্ডের বিখ্যাত (অর্থবিখ্যাত) ও
শ্রেষ্ঠ অর্থচিকিৎসক ও এখন নৃতন দ্বাদ্বাধর্ম-অর্থের
প্রধান প্রচারক Sir Arbuthnot Lane সেসভায়
প্রধান বক্তা ছিলেন। তিনি আমার কথা শুনে
বললেন যে, "ভারতবর্ষ এখনও বহুকাল (বা কিছু
কাল) আমার ঠিক মনে নেই। ইংলণ্ডে দ্বাদ্বাধর্ম
শেখাতে পারে। এই ক্ষুদ্র ঘটনাটির উল্লেখ করার
উদ্দেশ্য এই যে, আমরা আমাদের বা' সব ভাল
তা' ভাল ক'রে জানি না ; সেগুলি যে কতটা
বিজ্ঞানানুসারিত তা'ও বুঝি না। এইগুলিকে আমাদের
আবশ্যকমত সম্পোষিত ও সংস্কৃত ক'রে সমন্বয়পনোয়
ক'রে নিতে হবে।

সত্যতাম্ব্যত এই বিজ্ঞান আজ আমাদের এই
শিক্ষা দিচ্ছে যে, "Health is won more by a way
of living than by bottles of medicine"—অর্থাৎ
যোজন যোজন ঔষধ সেবন অপেক্ষা আমাদের
জীবনযাত্রার রীতিনীতির দ্বারাই দ্বাদ্বালাভ হয়। এই
way of living-এর অর্থ biological living, অর্থাৎ
স্বাভাবিক জৈববিজ্ঞানসম্বন্ধ নীতি অনুসারে জীবন-
যাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করা।

সহরে এবং গ্রামেও আমরা নানাবিধ রোগবীজ
যায়। পরিবেষ্টিত—তা'দের মধ্যেই বাস করছি।
দ্বন্দ্বা, ইনফ্লুয়েন্সা, নিউমোনিয়া, সর্দি-কাশি, বসন্ত,
হান, প্রভৃতির রোগবীজ বা' ধূলা-বাতাসের সঙ্গে
স্বাসপথ দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে ; কলেরা, আমাশয়,
টাইফয়েড, প্রভৃতি রোগের বীজ বা' আহাৰ্য্য ও
পানীয় জ্বাবর সঙ্গে স্বাসপথ দিয়ে দেহমধ্যে আসে ;
ম্যালেরিয়া, কালার, সোদ, প্রভৃতি রোগ বা' মশা
প্রভৃতি কীটসমূহের দ্বারা, এবং চুনীতিমূলক অত্যন্ত
কুৎসিত রোগ বা'র জীবাত্ম কুলসম্পর্কের দ্বারা সাক্ষাৎ-
ভাবে রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে, এই সকল বীজ বা
জীবাত্মক বস্তু বিশিষ্ট রূপ ও সারাস্বক গুণ আছে।

এরা শরীরমধ্যে প্রবেশ লাভ ক'রে মাছদের রক্তের বীজাণুটি প্রতিরোধ ক'রবার ক্ষমতার তারতম্য অনুসারে বৃদ্ধি পায়। রোগের প্রকাশ ও প্রকোপ নির্ভর করে—যেহেতু “মাটি” ও রোগের “বীজ”, এই দুয়ের পরস্পরের প্রতিক্রিয়ার (reaction) উপর। আমরা এই সকল বীজের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করি চুই উপায়ে—এক, আমাদের জ্ঞানপ্রয়োগের দ্বারা এবং শরীরমধ্যে প্রবেশ ক'রতে দিই না; যেমন, কলেরার সময় জল শুধু ছুটিয়ে খাই, বাতন্ত্রব্যে কলেরার বীজ-বহনকারী মাছি বসতে দিই না; কলেরা-রোগীর কীবাণুপূর্ণ মলমূত্রবিরি এমন ব্যবস্থা করি, যাতে সেই সব বীজ সংক্রামিত হ'তে না পারে; প্রসবকালীন নাকী বাধবার হুতা-কাটি ভাল ক'রে ছুটিয়ে নেওয়া ও প্রসবকত্রীর হাত ও প্রহতি-মাত্রার লম্পর্কিত কাপড়-জামার, তুলা একেবারে বিতুষ ও পরিষ্কার রাখা; ইত্যাদি। দ্বিতীয়, সেহেতু “মাটিকে” শক্ত করার; অর্থাৎ সেহমধ্যে, আমাদের সতর্কতা লব্ধ ও বা অনতর্কতার জন্ত, রোগ-বীজ প্রবেশ করলেও তা' যেন ‘শিকড়’ বসাতে বা বাড়তে না পারে। এই বে সেহেতু “জমি” শক্ত করা, বা তা'র রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ানো—এইটাই হ'ল স্বাস্থ্যরক্ষা লব্ধে আল কথ্য। শারীরিক দিক থেকে, এইটী আদর্শ হ্রয় জীবনের প্রধান ভিত্তি। এটি লাভ ও রক্ষা হয়, সুনিয়ন্ত্রিত ও জৈবনীতিসম্মত জীবনযাত্রার প্রণালীর দ্বারা। এই প্রবন্ধে সেই কথায় সংক্ষেপে উল্লেখ কর্ণাম। বধা—

১। বিতুষ হুক্ত বাহু সেবন—অস্ত্রের, অর্থাৎ স্বাস-প্রবাহের দ্বারা বাসবহের (ফুসফুস) মধ্যে সাক্ষ্য ভাবে রক্তের সঙ্গে যোগস্থাপনে বা বাশ্ববিনিময়ে; এবং বাহু-মান—বাহিরে, অর্থাৎ বেহের রক্তের সঙ্গে বাহুর সাক্ষ্য সংস্পর্শে।

২। স্বর্ধ্যাণোকের সহিত অনাতৃত বেহের বধাসম্ভব

লম্পর্করায়ার ।

৩। পরিমিত পুষ্টিকর ও বধা-পরিমাণে বিভিন্ন বাত্মপকরণসমবিত (balanced) টাট্কা বিতুষ বাত্মে।

৪। নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম ও অঞ্চালনার; এবং বধোচিত বিশ্রামলাভে।

৫। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, অর্থাৎ সেহের ভিতরে ও বাহিরে (Personal hygiene), ঘরের ভিতরে ও বাহিরে (Domestic hygiene) এবং সহরে, গ্রামে ও দেশ-বিশেষে রোগ-জনক জীবাত্মবৃহের প্রাত্তর্ভাব ও আধিপত্য নষ্ট বা হ্রু করা।

এর সঙ্গে আর একটা স্বাস্থ্য-মন্ত্র যোগ কর্তে পারি, সেটা—

৬। রোগের ও ঔষধারি বাত্মকবর্জন।

বিতত মহাত্মদের (১৯১৪-১৮) সময় সেখা সেল বে, যুরোপ আমেরিকার মত শক্তিশালী ও অগ্রণী ভাতি সন্মহের মধ্যেও, সৈন্তসংগ্রহের সময়, শতকরা তেরিশটী বা এক-তৃতীয়াংশও লোক পাওয়া যাদ্ধিল না দ্বারা হ্রু ক'রতে শক্ত ও সমর্থ। আর আমরা যদি আমাদের মধ্যে সৈন্তসংগ্রহের চেষ্টা করি—শতকরা ক'জন পাই? ঐ অগ্রদ্যাপিত অভিজ্ঞতার, পাশ্চাত্য জনতে এক মহাত্মতনার উল্লেখ হ'ল। সেই অবধি যুরোপ ও আমেরিকার, প্রকৃত শক্তি ও স্বাস্থ্যলাভের জন্ত বিরাদ্ধি আন্দোলন চল্ছে। কোনো কোনো সেপে এমন আইন বিধিবদ্ধ হয়েহে বে, যদি ২১ বছরের নীচে কোনো পুরুষ ও নারীকে ধ্বতে পারা যায়, যিনি, বিশেষ কোন কারণ বাত্মীত, নিয়মিত শরীরচর্চা কর্ণছেন না, তবে তিনি তা'র জন্ত লগুনীর হবেন। আক-কাল তাই যুরোপে সেধতে পাওয়া যায় বে, সন্ধ্যার পর বড় বড় ‘হল’-ঘরে, কিশোর ও প্রৌঢ়েরা, তাঁদের নিশ্চিষ্ট সময়ে, কিছুক্ষণ জিম্জাজিক-ব্যায়াম অভ্যাস ক'রে আসেন। তুল-কলেহে এটি নিষ্কার একটা বল হ'বে ধীকিয়েহে; এবং তা'র জন্ত চমৎকার বন্দোবস্ত ও পরদ্রায় প্রকৃতিও আছে। জার্মানীর বার্লিন সহরে উজ্জলিষ্কার জন্ত বেহেদের একটি বিদ্যালয়ে সেখাই

অতীত নিয়ে

বোধন চলে অতীতকে

স্মৃতিতে অতীত

ও স্মৃতিতে অতীত,

অতীতের অতীত

অতীতের অতীত নিশ্চিত চলে, বা

অতীত নিয়ে অতীত অতীত। ঐ "অতীত"

বহুমান অতীতের অতীত, অতীত

এই একই অতীতের অতীত অতীতের অতীত

চলে এই অতীতের অতীত অতীতের অতীত

একই অতীতের অতীতের অতীত অতীতের অতীত

এই অতীতের অতীতের অতীত অতীতের অতীত

এই অতীতের অতীতের অতীত অতীতের অতীত

এই অতীতের অতীতের অতীত অতীতের অতীত

এই অতীতের অতীতের অতীত অতীতের অতীত

এই অতীতের অতীতের অতীত অতীতের অতীত

এই অতীতের অতীতের অতীত অতীতের অতীত

এই অতীতের অতীতের অতীত অতীতের অতীত

এই অতীতের অতীতের অতীত অতীতের অতীত

এই অতীতের অতীতের অতীত অতীতের অতীত

এই অতীতের অতীতের অতীত অতীতের অতীত

এই অতীতের অতীতের অতীত অতীতের অতীত

এই অতীতের অতীতের অতীত অতীতের অতীত

এই অতীতের অতীতের অতীত অতীতের অতীত

এই অতীতের অতীতের অতীত অতীতের অতীত

এই অতীতের অতীতের অতীত অতীতের অতীত

এই অতীতের অতীতের অতীত অতীতের অতীত

এই অতীতের অতীতের অতীত অতীতের অতীত





প্রশ্ন

(৩)

(১)

‘হৃদয়বন’ নামটির উৎপত্তি কোথা হইতে? এবং
এই নামটি কত প্রাচীন?

হিন্দুসমাজে অশ্মুগ্রভার উৎপত্তি হ’ল কিরূপে?
এর ঐতিহাসিক কারণ কি? আত্মভেদের
সঙ্গে অশ্মুগ্রভার কোন সম্পর্ক নাই কি? অশ্মুগ্রভা
জিরোহিত হ’লে আত্মভেদও কি জিরোহিত হবে না?
আত্মভেদ বলতে কি বোঝায়?

শ্রীনীহাররজন মিত্র

(৪)

বাংলা শাল কোন সময় হইতে পণনা করা হয়?
‘শাল’ শব্দের উৎপত্তি কি করিয়া হইল?

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

(২)

শ্রীকরণা দেবী

পরামরোক্ত যে ব্যবস্থাবলে বিজ্ঞানাগর মহাশয়
হিন্দুসমাজে বিধবার পক্ষে পত্যস্তর গ্রহণের বিধি
প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন সেই ব্যবস্থাহুসারে
নষ্ট (নিকশিষ্ট), প্রেরজিত (মরাঙ্গী), স্ত্রী ও
পতিত (অধর্ষভ্যাঙ্গী) পতির পত্নীর পক্ষেও অস্ত
পতিগ্রহণের বিধি বিদ্যমান আছে। শেথোক্ত চতুর্বিধ
পুরুষের ভাষ্যার অস্ত্র এ পর্য্যন্ত পুনর্জীবনের কোথাও
কোন চেষ্টা হইয়াছে কি না? যদি না হইয়া থাকে,
তাহার কারণ কি?

(৫)

হিন্দু-বিজ্ঞানে লিখিত আছে, ঋতুমতী নারী বীর্ষকাল
অনুভূত অবস্থায় থাকিলে, তাহাদের বস্মা, ক্রম, পৌষ,
শ্রবণ, রজস্বল্য প্রভৃতি রোগে সংক্রমে আক্রমণ করে,
ইহা প্রকৃতই ঠিক কি না? কোনও বিশ্ভ ব্যক্তি
ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন কি না?

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ

শ্রীদীনেন্দ্র সেন কবিরাজ

(৩)

(৭)

“তোমার গলা পার হওয়া উচিত নয়”—
এই পদটির কি বাচ্য? এবং পরিবর্তিত বাচ্যেই
বা ইহার রূপ কি হইবে?

বসভাষার উৎপত্তি—সংস্কৃত, না অস্ত্র কোন
ভাষা হইতে? পাণি ভাষার সহিত বঙ্গ এবং সংস্কৃত
ভাষার কি সম্বন্ধ?

শ্রীঅনিলকুমার সরকার

শ্রীঅখাংশুকুমার দত্ত

(৮)

বাংলা ভাষার বর্তমান বয়স্ক কত? বাংলা কবিতার জন্ম কোথা হইতে? বাংলা ভাষার ছড়া হইতেই কি ইহার উৎপত্তি? কোন্ কবিতা বাংলা ভাষার প্রথম কবিতা বলিয়া পরিচিত? বাংলা ভাষার আদি উৎপত্তির কথা এবং কবিতার জন্ম-কথা সম্বন্ধে কোন পুস্তক পাওয়া যায় কি?

কুমারী বিচিত্রা দেবী

উত্তর

বৈশাখ মাসের 'উদ্ভবের' প্রথম প্রশ্নের উত্তর—

প্রাচীন বেদ-বেদান্ত নামে "হিন্দু" শব্দ পাওয়া যায় না; কিন্তু বেদের কিছু পরকালীন বা সম্ভাব্যময়িক নামে "হিন্দু" শব্দ আছে। পার্শ্বাদিদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ জেদাবেস্তা গ্রন্থে এবং ইহুদিদিগের ধর্ম-শাস্ত্র Old Testamentও 'হিন্দু' শব্দ পাওয়া যায়; এবং যেমন বেদের নিরুক্ত ব্যাকরণ অনুসারে অনেক বৈদিক শব্দ নিশ্চয় হয়, তেমনি এই প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থেরও বৈদ্যাকরণিকদিগের প্রবর্তিত নিয়ম অনুসারে "হিন্দু" শব্দ নিশ্চয় হয়। হিন্দু ভাষার হিন্দু শব্দের অর্থ বিক্রম, ভৈরব, সৌর্য, বিভব, প্রজা, শক্তি, প্রজ্ঞা ইত্যাদি। খটাক্স শব্দে, "ভারতবর্ষের বিক্রম ও সৌর্য দেখিয়াই ইহুদিরা ঐ দেশকে (ভারতবর্ষকে) হিন্দু বলিয়া ডাকিত; ঐ নাম এদিয়ার অনেক দেশে অনেক কাল পূর্বে প্রচলিত ছিল। হিন্দু ভাষা, কেন্দ্র ভাষা হইতে উৎপন্ন—জেনের

'হিন্দু' হিন্দুভাষার 'হিন্দু' হইয়াছে। যে পথ দিয়া গ্রীক বীরেরা ভারতে আসেন, সেই পথে কুমারাবৃত্ত অকুড় গিরিমালা দেখিয়া তাহার নাম জানিতে গাহিলে একজন পুরোহিত বলেন, "তিনিরাহি ইহার একদিকে হিন্দু দেশের লীমা, অপর দিকে কুশ রাজ্যের রাজনৈতিক লীমা"। ইমিয়ারোপীয়া রাজ্যের হিন্দু নাম Cush (কুশ)। গ্রীকরা হিন্দু দেশের লীমা-জাপক পর্ত্ত, এই অর্থে ঐ পর্ত্তকে "হিন্দুকোশ" বলিয়া অভিহিত করেন। এই "হিন্দুকোশ" অপরূপে "আন্দাকশ" (Indikos) হইয়াছে...এখন তাহাই India হইয়াছে। হিন্দুকুশের নিকট প্রচলিত ভাষা পশ্চু...পশ্চু ভাষাভাষীদের আদি নিবাস পারস্যদেশ। পশ্চু ভাষাভাষী লোকেরাই হিন্দু শব্দের উত্তর ব্রহ্ম উ প্রয়োগ করিয়া হিন্দু শব্দ করেন। পশ্চু ব্যাকরণে 'উ' স্তম্বচাক জাতি বা স্তম্বচাক পুত্রদের উত্তর প্রত্যয় হইয়া থাকে। প্রাচীন আর্থা জাতির সৌর্য, পবিত্রতা, বিভব, মহিমা প্রভৃতি ধর্মান্ত করিয়া পশ্চু ভাষাভাষীরা ঐ উ প্রত্যয় করিয়াছিলেন। বাবা নানকের সময় শুক্লমুখী ভাষার হিন্দু শব্দ পাঞ্জাবী সৈনিকদিগের দ্বারা 'হিন্দু' শব্দে পরিণত হয়। এ বিধে বহু সংবাদ পাইবেন ১৩০৬ সালের মার্চ মাসের "ভারতী" পত্রিকায় ঐমতী সরলা দেবী মহাশয়ের "হিন্দু ও নিগর" প্রবন্ধে এবং ১৩০৮ সালের আশ্বিন ও কা্তিক মধ্য "ভারতী"তে ও ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়ের লেখা "হিন্দু" শব্দতত্ত্ব প্রবন্ধে।

শ্রীমতীস্মরণাথ ঘোষ



বর্ষাতি

শ্রীমদ্রামোহন মুখোপাধ্যায়

১

বেলা তিনটা। হুইতে মুলদ্বারে কুঠি নামিয়াছে। মাঝারি মাস। আশ বর্ষার মধ্যে কলিকাতার রাস্তা ঘলের নীচে অশ্রুত চইয়া পেল।

সেদিন শনিবার। এদিকে বিবাহের লগন্থা — ওদিকে মাঠে মাচা — আর এই কুঠি! কি করিয়া কি হইবে! ঘরে-বাহিরে লোকের আকুলতার আর লীলা নাই!

কাঠম্ অফিসের এক ঘরে বসিয়া বিনোদ। তার হাতের কলম গরিতে চায় না। বড় জানালার দাঁক দিয়া বাহিরের আকাশ বেটুকু দেখা যায়, তাহারি পানে সে চাহিয়া ছিল। বাহিরে বন-বোহর অন্ধকার। বর্ষা শনিবার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না!

অবনী আসিয়া কহিল, — আজ না তোমার সেই ফ্রেণ্ডের বিয়ে?

বিনোদ কহিল, — হ্যাঁ!

অবনী কহিল, — কি ক'রে যাবে?

সমস্ত! বিনোদ কহিল, — তাই ভাবি!

অবনী কহিল, — না সেলেও নয়!

— তাই।

ফ্রেণ্ডটি বিনোদের বাংলা-বন্ধু অজয়। অজয় বিলাত গিয়াছিল; ফিরিয়াছে। নব্য বারিষ্ঠার। বিনোদ কাঠম্ অফিসে ন' খানেক টাকা মাহিনার নগদা করিয়া। আজও তু' প্রীতির অভাব ঘটে নাই।

বিনোদও একদিন উচ্চ আশা-মন্ডের উপর নিজের ভবিষ্যৎকে ভুলিয়া ধরিয়াছিল। কিন্তু ভাগ্য! এখন সে থাকে কলিকাতার মেশে, প্রতি শনিবারে অফিসের পর দেশে যায় — সোমবার দশটার বাজী হইতে অফিসে আসে। দেশ কাছে — তেলিনীপাড়ার।

আজ অজয়ের বিবাহে নিমন্ত্রণ হইবে বলিয়া সে ছিন্ন করিয়াছিল, অফিস হইতে মেশে ফিরিবে; দেখান

হইতে পোষাক বদল করিয়া সোজা কস্তাপন্দের গৃহে গিয়া উঠিবে। কস্তার পিতা বিমল চক্রবর্তী জীকট্ লজ — বিবাহের অন্ত লোক হোডের কাছে একটা বাড়ী ভাড়া লইয়াছেন — সেই বাড়ীতে বিবাহ হইবে।

পাঁচটা বাজিল, তু' কুঠির বিরাম নাই। বিনোদ একখানা রিক্স ডাকাইয়া তাহাতে চড়িয়া কলেজ ষ্ট্রিটের মোড়ে আসিল। একটা সৌখীন বর্ষাতি-কোট কিনিল। বর্ষাতির প্রয়োজন ছিল, — আজ না কিনিলেও চলিত! তবে নেহাৎ বিরূপায়! কাণেই।

বেশ পটলডাঙ্গার। এদিকে পূর্ণ আজ আর পক্ষ নাই — যেন নদী বহিজেছে! ট্যান্ডিগুলা পথের মধ্যে ঘলে অর্ধময় পড়িয়া আছে। রিক্স চড়িলে ভিঁঝিয়া যাবা হইতে হয়।

বালায় আসিয়া বেশ-বুঝা বদল করিয়া সে কুড়িল, রিক্সর যাত্রা-নাতি! গদির হুঃ জামান-কাপড়ে এমন হোপ লাগাইয়া দিয়াছে! — যেন সে বহুতলীর চিত্র-বিচিত্র বেশ! সে-বেশে সৌখীন আসরে দিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা চলে না! ট্যান্ডির তো ঐ অবস্থা!

চট্ করিয়া খেয়াল হইল, এলুপানেন্ডের ট্রাম বন্ধ নয় — ওপথে চল তেমন অমিতে পার না! ঠিক! এখন হইতে একটা মোড়ার বাড়ীতে চড়িয়া এলুপানেন্ডে গিয়া ট্রাম ধরিবে — খরচ হইবে। তা' হোক, জামা-কাপড় ভিঁঝিবে না! তারপর নেক হোডের কাছাকাছি একখানা ট্যান্ডি লইসেই চলিবে।

সে তাহাই করিল। গারে দামী বর্ষাতি-কোট — দল লাগিবে না!... বিবাহ-বাড়ীতে এ-কোটটা রাখিবে কোথায়?... মিছা চিন্তা। যা' হয়, তখন দেখা হইবে।

বিবাহ-বাড়ীতে অল্পবিধার অন্ত নাই। পূরদা খরচ করিলেও এ-কলে আরাম পাওয়া মতাই হুফর!

বাড়ীর সামনে মত্ত কম্পাউণ্ড — আপাদ-মস্তক

গোপলায় ঘেঁরা। গোপলার নীচে বিভিন্ন রঙীন কানো-
ঝাঁটা; তাহাতে চীনা লতন, নেটের পর্দা, নানা
সরঞ্জাম। চেয়ার দিখা আসর লাগানো। বর তখনো
আসে নাই; কস্তা-ধাত্রীর কলরবে আসর সুব্রিত।
বিনোদ আসিয়া সে-আসরের একধারে চুপ করিয়া
বসিল।

আসর-আপ্যারিটের অভাব নাই! পাগড়ী-বাড়ী
'বর' আসিয়া সামনে ট্রে বসিল; ট্রে'র উপরে পাণ,
চুস্ট, সিগারেট, দিরাশপাই। বিনোদ ভাবিল, বর'র
মক্ হইবে না। সে চুস্ট খায় না—তু'কেমন লোভ
হইল। চার-পাঁচটি চুস্ট জুলিয়া গইল; একটা
বরাইয়া। বাকীগুলো বর্ধাতি-কোঠের পকেটে ফেলিল।
অভ্যাস নাই—চুস্টের টান্ সঠিবে বেশ? কাশি
ধানাইয়া মকলের দৃষ্টি একাইয়া এক সময় দুখের চুস্ট
ভুমে ফেলিয়া সেটাকে ছুতা দিয়া মড়াইল।

আলাপ করিবে, এমন একটি শোক নাই। সে হাত-
ঘড়ির পানে চাতিতেছিল—পাতটা বাঁকিয়াছে। সাড়ে
আটটার হাওড়ায় তাতাকে ট্রে'র ঘরিতে হইবে।
নহিলে...

বাড়ীতে কতটুকুই বা পারিতে পায়! ও'বছর
বিবাহ হইয়াছে—পত্নী শান্তি আশুও রেছে-গ্রেমে
বেন লক্ষ-বিবাহিতা নব-বধূ! লক্ষ্মা আছে, সেই
সঙ্গে যান, অভিযান, যোবের শুল্লি, সোহাসের
অল...এস্তাও! ভাগ্যে এগুলো আছে, তাই
প্রাণটা কোনোমতে আশ্রয় পায়, আবার নতুন করিয়া
ভবিষ্যতের স্বপ্ন-রচনার বিতোর হয়!

কিন্তু মুকিল বাহিল। জাকিয়া কেহ কথা কয় না!
কাহাকেও বলিতে পারে না—বশা, আবার ট্রে'য়ের
তাক্সা আছে, দয়া করিয়া যদি কোণাও একধারে
একটা আসন পাতিয়া...

তখন শোক কৈ? তা' হাড়া এ-আসর ইক-বরী
—ইহাদের কারো-কাহন তার অবদিত! সে ভাবিল,
চুপ চুপ সরিয়া পড়িবে না কি? কিন্তু অমর
তার সঙ্গে সেবা না করিয়া সরিয়া পড়া ভালো হইবে

না। কালও তার অফিসে আসিয়া বিশেষ করিয়া
বলিয়া দিচ্চাছে—আমি চাই! কোনো ওজর তুব
না! এমন বন্ধ ... না, সরা টিক হইবে না।

'বর'টা আবার আসিয়া সামনে ট্রে বসিল—
এবারও ডিন-চারটি চুস্ট সে জুলিয়া গইল। লক্ষ্মা
ছিল না! আশে-পাশে নিম্নরিজের দল কেহই চুস্ট
নহিতে কার্পণ করিতেছে না—ও'চারিটার কম
চুস্টও কেহ নয় না!...

কিন্তু আর না। হাত-বড়িতে... ইং, আটটা
বাজে! বিনোদ উঠিল। একটি ডব্লগোক কহিলেন,—
পাতা হয়েচে। ধারা বসতে চান, আসুন।

বিনোদ আশ্রয়ের নিঃশ্বাস ফেলিল। ভগবান
একজন মাথার উপর আছেন! অজ্ঞান্যাতী তিনি—
বিনোদের মন কি চায়, তিনি তো চিরদিন তাহা
বুঝিয়াছেন! বুঝিয়া

পাতা পড়িয়াছে বাড়ীতে। সেখানে আদিত হইল।
সামনের হল-ঘরে এক খানসামা নিম্নরিজের ছাতা
ও বর্ধাতি-কোঠ গইয়া পাশের আলনা'র বাঁধিতেছে।
বর্ধা'র বর্ধাতি-কোঠ অনেকের গারে—কাছেই এ
বন্দোবস্ত! মোস্তাফার বারান্দার পাতা পড়িয়াছে।
বাবু'র ভালো। সোর-সোলে নাই—বাহা দিবার,
পাতে দেওয়া হইয়া দিচ্চাছে, আহার করিতে বিলম্ব
বড়িবে না!

আহার সারিয়া নীচে নামিয়া বর্ধাতি-কোঠ হাতে
গইয়া বিনোদ গুলিল—বর আসিয়াছে, আসরে আছে।
বিবাহ সেই শেষ বাজে।

তখন বৃষ্টি নামিয়াছে! কালো মেঘের গা চিরিয়া
হ'চারি ইকরা সাদা বেশ—তার যুগে টিকিমিকি
পাচ-পাতটা নক্ষত্রও উকি দিতেছে! পাড়ী-ভাড়া
পক্ষা ঝিল্লি-ভাবিয়া বিনোদ আশ্রয় হইল। একবার
মনে হইল, বর্ধাতি-কোঠা—জাই তো! অনবরক বামে
বরত হইয়া সেল!... হান্, অসময়ে কাছে লাগিবে।

সে আসিয়া আসরে বরের সঙ্গে দেখা করিল, কহিল,—আজ আর বন্ধ না, তাই—বাড়ী যেতে হবে। ট্রেনের টাইম

অল্প কহিল,—বৌ-ভাতের পাওয়ার দিন আসা চাই নোনা...এক নয়, দুগলে!

—নিশ্চয়! নিশ্চয়!

বিদায় লইয়া বিনোদ পথে বাহির হইয়া পড়িল। গুটি নাই। বর্ধাতি-কোট আর গায়ে চড়াইতে হইল না।

২

সকাল বেলা। চমৎকার রৌত্র ফুটিয়াছে। কেশন আলত হইতেছিল, বিনোদ তাই বিছানায় পড়িয়া আছে। শান্তি চারের পেয়ালা হাতে ঘরে ঢুকিল, কহিল,—ঐহিরি পার্থক্সন এখনো চলেছে! ওঠো, ওঠো...বেলা হ'য়ে গেছে। আর গুয়ে থাকে না! জা তৈরী।—উঠ।

বিনোদ উঠিল; ভাড়াভাড়ি দুখ-হাত খুইয়া চারের পেয়ালায় মনোনিবেশ করিল।

শান্তি কহিল—অমন ক'রে ভিজতে হয়! জুতো-ঝোড়া ভিজে চাপ্‌চাপ্‌ করছে! বেন আমদর! যা গো! ঐ ভিজে জুতো পারে এই পথ এসেচো! যদি অস্বস্তি করে? তখন ম' মাশী তুই ভেবে!

শান্তির এ-বৃষ্টি বিনোদের বড় ভালো লাগে! বেন অমহার সে—তাকে দেখা-তনা করার অস্বস্তি তাই এ সতর্কতা!

হাসিয়া সে কহিল,—তুমি সেবা করবে।

কৃত্রিম কোণের ডাবে শান্তি কহিল,—ব'য়ে গেছে আমার! ইচ্ছে ক'রে অস্বস্তি ডেকে আনবে—আর আমি করব সেবা! কথ'খনো না!

বিনোদ কহিল,—কাল বে-বৃষ্টি গেছে, শান্তি...সেই জলে নেমস্তর পাওয়া!

শান্তি কহিল,—না হয়, একখানা পাড়ী ক'রেই কেতে! ট্রায়ে যাওয়া কেন! হ'পজার এ শান্তর না-ই কর্তে!

বিনোদ কহিল,—হ'পজা নয়! বহুত বেশী খরচ হ'ত। তোমার একটা কথা বোঝা...বেবেচি—সেবেচো!

বর্ধাতি কিনেচি! বহুদিন থেকে বলচ! নাও'লে বর্ধাতি-কোট আমার লাগে না, সতি! পড়িল টাকা দাম প'ড়ে গেল।

শান্তি কহিল—কিনে ভালোই করেচো। কত পরকারে লাগে, বলা-দিকিনি!...বিসেসে প'ড়ে আছে—জল-বৃষ্টি—কত অসাবধানে থাকো! ভাবনার এখানে সারাম্প কাটা হ'য়ে থাকি! নেহাৎ নাতি উপায় নেই!

শান্তির কণ্ঠস্বর আর হ'ল। সে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

বিনোদ কহিল,—তোমার জন্ত একখানা ভালো সিনের পাড়ী কিনে তা'ছিন্ন—তা' আর হ'ল না। ঐ বর্ধাতি-কোট কিনে ফেললুম।

শান্তি কহিল,—আমি খুব খুশী হয়েচি। পাড়ী গেলে এত আল্লাদ হ'ত না, সতি!

বিনোদ কহিল,—তা' আমি জানি। সতী-সাধী স্ত্রী—

শান্তি কহিল,—থামো, থামো। তুমি খুব পণ্ডিত, আমি জানি।

সকালের আলো এমি পর্যন্ত। তারপর শান্তি ঢুকিল স্নানঘরে—চা বাইয়া বিনোদ গেল বনবাগীসের বাড়ী। বনবাগীস গৃহে 'ভেগিনীপাড়া' বান্ধব নাট্য-সমিতি'র ব্রিহান্নাল বসে—রবিবারে আসর ভালো করিয়া জমে। কলিকাতা-বাগীস অনেকই বনিবার রাতে বেশে আসে, তাই।

আসর রাতিয়া বিনোদ বাড়ী কিরিল বেলা বারোটার। শান্তি আসিয়া দেখা দিল না। পাওয়ার সময় ছোট খুড়ী আসিয়া কাছে বসিলেন। বিনোদের ভালো লাগিল না।

ছোট খুড়ী কহিলেন,—বোমা কি আজই হুঁচড়ায় দাবেন সে?

হুঁচড়ায় শান্তির পিজালর। সহসা হুঁচড়া যাওয়ার

কথা শুনিয়া বিনোদ বিস্মিত হইল, কহিল,—চুঁচড়ো !
আমি তো চুঁচড়ো বাগ্গার কথা জানি না ।

—জানি না ?

—না ।

—সে কি রে ! বোঝা সেই চান ক'রে ইতরক বায়না
ধরেচেন, সেল-রাতে ভারী হুঃখন্ন সেবেচেন—মন অস্থির
রয়েচে—কিছু ভালো লাগ্গে না...

রাতে হুঃখন্ন ! কৈ, শান্তি তো এমন হুঃখন্নের
কোনো আভাস দেয় নাই ! চারের পেয়াদা আনিয়া
দেখা দিল, হাসি-মুখ, খুঁই-মন...ত এমন হুঃখন্ন সেবিলে
বিনোদকে বলিত না ?

ছোট খুড়ী কহিলেন—তুইই তো নিরে বাণি ?
না হ'লে বাবেন কার সঙ্গে !

বিনোদ ত্র কুণ্ডিত করিল, গম্ভীর স্বরে কহিল,—
আমার সময় হবে না...

—তবে কার সঙ্গে বাবেন ?

বিনোদ কহিল,—হাবুলকে ডাকাও । সে পারে,
নিরে বাবে ।

তারপর চুপচাপ...

আহার শেষ করিয়া বিনোদ উঠিবার উদ্যোগ
করিল, ছোট খুড়ী বলিলেন,—তোর মত আছে তো ?
আমি বসেছি, বিনোদের যদি অমত না থাকে, বাও
বাছা ! তা, কি বলিঙ্গ ?

বিনোদ কহিল,—আমার মতামতে কিছু এসে
বাবে না !

তার বিয়ক্তি ধরিয়াছিল । বিশেষে দার্য্য নগ্ৰাহ
প্রক্টিয়া থাকে, একটা দিন বাড়ী আসে—শান্তির সঙ্গ
প্রদিয়া মন কতখানি আকুল হয় !...শান্তির সেমিকে
শেয়াল নাই ! তাদের প্রেম এখনি এখন পুরানো
হইয়া গেল ? অভিমানে তার বুক ভরিয়া উঠিল ।

নিশ্চয় যবে আসিয়া সে বলিল । অভিমানের
হুঁচকিটা বচনের শোভা ছাড়া কঠিন ! শান্তি একবার
আদিলে হয়... বলিয়া বলিয়া অভিমানের কয়েকটা
তীর বচন সে মনে মনে আঁচিতে লাগিল !

কিছু শান্তির দেখা নাই । একখানা খবরের কাগজ
ছিল — বিনোদ সেখান লইয়া তার পুষ্টাঙ্গলা বার-বার
পড়িল । রাগের খবর সুখ হইয়া গেল । এখনে।
আসে না ? শান্তি কি করিতেছে ?

উঠিতে হইল । বীচের দালানে আসিয়া দেখে,
শান্তির হাতে ছোট একটা পুঁচলি—শান্তি হাবুলকে
বলিতেছে,—আর কিছু বেবার নেই, ভাই । চলো...

সদৃশে বিনোদকে গেরিয়া শান্তি কহিল,—আমি
চুঁচড়োয় বাছি

গম্ভীর কণ্ঠে বিনোদ কহিল,—বেশ !

শান্তি কহিল,—হাত বোড়া, নমস্কার কর্তে
পারলুম না ! মনে মনে নমস্কার জানাচ্ছি ।

বিনোদ কোনো কথা কহিল না । তার মনে
ঠাইতেছিল, শান্তি অল্পমতি চাহিবে — চাহিল না ।
...কবে ফিরিবে, কে-কথাটা... ?

তা'ও বলিল না ! শান্তি ঘর ছাড়িয়া বাহিরের
উঠানে নামিল । বিনোদ অবচল লাড়াইয়া রহিল,
বেন পাখরের মূর্তি...এমন ব্যাপার সে কখনো কল্পনা
করে নাই ! তার শান্তি

বিনোদ নড়িল না । শান্তি ও হাবুল সদরের চৌকাঠ
পার হইল । পথে পাড়ী । ছোট খুড়ী বলিলেন,—
হাবুলকে দিয়ে খপর পাঠিয়ে, মা,—আমি ভারী
ভাব্ব

—হ্যাঁ, খুড়ীমা, খপর পাঠাবো । বলিয়া শান্তি
বাহির হইয়া গেল । বিনোদের চোখের ল্যামে ঘর-
দালান, চুনিয়া—সব অশ্লষ্ট স্বাপ্না হইয়া গেল ।...সে
বেন চেতনা-হীন ...

চেতনা ফিরিল হাবুলের কথায় । হাবুল আসিয়া
বলিল,—তোমার বিছানায় বালিসের তলার চিঠি
আছে—বৌদি তা'তে সব কথা লিখে গেছেন । তোমার
সে-চিঠি পড়তে বললেন !...

কথাটা এক-নিঃশ্বাসে শেষ করিয়া হাবুল সদরের
দিকে ছুটিল । পথে ত-দিকে চলত পাড়ীর একটা শব্দ ...
এদিকে বিনোদের অন্তর চিরিয়া মন্ত এক নিঃশ্বাস !...

বিনোদ সোভলার উঠিল; উঠিয়া নিজের ঘরে আসিল। বালিশের তলায় চিঠি—শান্তির লেখা :—

চিঠি পুঁথিয়া বিনোদ পড়িল, লেখা আছে—

—তোমার মেয়ের উপর কেন এত টান, বুদ্ধিগাহি।
প্রিয়তমা প্রণয়িনী পাইয়াছ! ভালো! তোমার বর্ধাতি-
কোটটা! শুভাইয়া রাখিতে দিয়া হাতে পড়ে, হীয়ার
কচ—তাহাতে টিকিট খাঁটা—‘প্রাণের প্রিয়তমা শ্রীমতী
নীহারিকাকে প্রেমোপহার’! কচটা কেনিয়া দিই
নাই। তোমার আলমারির ডুয়ারে রাখিয়া দিয়াছি।
রবিবারের দিনটা পাড়ারগারে আমার মত ঘূর্ণ পচা
আনোয়ার ব্রীকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিবার কোনো
প্রয়োজন ছিল না! তোমার ছুটি দিয়া সেলাম—কোনে
চক্ষু-লজ্জা করিয়ে না। নীহারিকার কাছে বাও। সে
আশা-পথ চাহিয়া আছে!—প্রেমোপহার পাইলে
তোমার প্রেমের বস্তার ভালাইয়া দিবে।

ভ্রমরের কথা আমি শিরোধার্য্য করি—বতদিন
তোমার বিশ্বাস, ততদিন আমারো বিশ্বাস। বতদিন
তোমার ভালোবাসা, ততদিন আমারো ভালোবাসা।
আমি স্ত্রী—ত্যা’ বলিয়া তুমি যাহা করিবে, তাহাই
মানিয়া চলিতে আমি পারিব না! হস্ত কালের
সোৎ—কিন্তু এ-কালেই অস্থিগাহি। সেকালে অস্থি
হস্ত তোমার নীহারিকার দাসী হইয়া তাহার
পরিচর্যা করিতে পারিতাম। কিন্তু এ-কালের মনকে
সেকালের হাঁতে ভৈরব করিতে পারি নাই। বোধ
হয় পারিব না।

আমি হুঁচুড়ায় চলিলাম। সোমবার তুমি কলিকাতায়
পেলে ফিরিব। তারপর আবার শনিবারে চলিয়া
যাইব। তোমার সামনে ণ্ডাইয়া তোমার অপ্রতিভ
করিতে যেমন পারিব না, তেমন নিজের দুর্ভাগ্য
বহিয়া দাখী সতীর মত তোমার পরিচর্যাও করিতে
পারিব না। ইহাতে যদি অপরাধ হয়, ক্ষমা
করিয়ে।

শান্তি

চিঠি পড়িয়া বিনোদ হতভব! নীহারিকা! হীয়ার
কচ! প্রেমোপহার!—এ-সব কি কথা! শান্তি এ-সব
কাহিনী কোথায় পাইল! তবে কি সত্যে এই স্বপ্নই
সেঁধিয়াছিল!

এ কি শাপলাসি!

কিন্তু না!...

আলমারির ডুয়ার চানিয়া দেখিলে তো সব সোল
ঝিট্টা যায়! বিনোদ আসিয়া কল্পিত বৃকে ভ্রমার
চানিল। ডুয়ারের মধ্যে একটি ভেলভেট-কেশের মধ্যে
সতাই হীয়ার কচ; আর তাহাতে খাঁটা ছোট গিঁথে
লেখা আছে—‘প্রিয়তমা প্রণয়িনী শ্রীমতী নীহারিকাকে
প্রেমোপহার’!

বিনোদের মাথা গুরিয়া সেল—পায়ের তলায় মাটি
হুঁচুড়িয়া উঠিল। নীহারিকা! কে এ নীহারিকা? হীয়ার
কচই বা কোথা হইতে আসিল?...
আর-ব-রজনীর কাহিনী সত্যকার ভগতে সতাই
যটে না!...

বর্ধাতি-কোটটা বিছানার উপর সে ফেলিয়া ধরিল,
তার পকেট হাতকাঁড়িয়া দেখে, কিছু নাই। মনে
পড়িল,—চুড়টগুলা!...কাল নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে বহু চুড়ট
হাতাইয়া সরাইয়া পকেটে গুরিয়াছিল! অফিসের বন্ধ
অধরবাহু চুড়ট ভালোবাসেন—তার মত...

সে চুড়ট কোথায় সেল?

তবে কি? তাই! নিশ্চয় তাই! বর্ধাতি বদল হইয়া
দিয়াছে! কিন্তু কাহার সঙ্গে বদল হইল? সে যেখানে
বর্ধাতি রাখিয়াছিল, সেখানে দ্বিতীয় বর্ধাতি ছিল না।
ওখু সেটোকষেক ছাড়া! কুল! কুল...কুল হইয়াছে—
কোনো লক্ষ্য নাই!—এখন এ-কুল ওখু-তাইতে...

সে কোথায় যায়? হুঁচুড়ায় শান্তির কাছে?
না, কলিকাতায় অজরের গুহানে?

হুঁচুড়ায় দিয়া লাভ নাই! শান্তির কাছে কি করিয়া
গ্রামাণ দিবে, নীহারিকাকে সে আনে না, চিনে না—
এ-কচ সে চক্ষেও দেখে নাই—কেনা! তো ঘূঁষের
কথা! অজরের কাছে বাওয়াই কর্তব্য—সেখানে

হস্ত ক্রম হাবানোর ভক্ত চুরির মত কলহব চলিয়াছে !

বিনোদ হাড়াইল না—কাপড় বদলাইয়। তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল।

নাচে বঁটি পাতিয়া ছোট পুড়ী নারিকেল-পাতা কাটিল। তাহা হইতে কঁটার কাটি বাহির করিতেছিলেন। তিনি কহিলেন,—চুঁচুড়োর খাঙ্কিস্ নারি ?

—না, কলকাতায়।

—কলকাতায় ?

—হঁা, আপিসের একটা জরুরী কাম আছে।

—ক্ষিবি তো ?

—যদি কাজ মেটে, ক্ষিবি। না হ'লে থেকে থেকে হবে।

বিনোদ হাড়াইল না—বাহির হইয়া গেল।

৩

সন্ধ্যার সময় অন্ধরের গুহে পৌঁছিয়া বিনোদ তুলিল,—অন্ধর বাড়ী নাই। পিবপুরে তার এক বানাতো বোনের বিবাহ—সে পিবপুরে নিমন্ত্রণ দিয়াছে। সে-রাস্তাে ফিরিবে না !

বিপদ আর কাহাকে বলে !

বাড়ীতে সে ফিরিল না। কার ভক্ত ফিরিবে ? পাতি নাই—তাই সে অত্যন্ত ব্যাকুল হ্রিতে মেনের বসায় ফিরিল।

বাসার শোক তাকে দেখিয়া অবাক ! শাক্তহবাবু কহিলেন,—কি ভায়া, অসময়ে বিগ্রহ-বিক্রম !

বিনোদ কথা কহিল না। শাক্তহবাবু কহিলেন,—বৌমার সঙ্গে কলহ না কি ?—তুল করচো ভায়া ! একলহের পর ঘুরে থাক। তা'তে বাধা চতুর্গণ বাড়ে। সুখ-ভার ক'রে কাছে-কাছে থাকতেও আত্মায় বেলে ! তা'তে মাথুণী আছে।

কথাটা কতখানি খাট, বিনোদ তাহা হাড়ে-হাড়ে

বুঝিয়াছে। শাশি স্বখন চুঁচুড়ার ঘর,—তখন বাড়ি। চুঁটা কথা কহিলে এখন এমন হতখোলে মরিতে হইত না। সঙ্গে করিয়া পাতিকে চুঁচুড়ার লইয়া সেলেও হয়ত এই তারী মুখেই এক সময়ে হাদির কিলিক কুটিয়া এ-মনাঙ্করের অবসান ঘটত ! আবার মনে হইল, সে সকালে আড়ডা দিতে পাড়ার যদি না বাহির হইত, তাহা হইলে এ-ব্যাপার ঘটিত পারিত না ! এমনি বহু চিন্তা মনকে জর্জরিত করিয়া তুলিল। এক দিন পাতিকে কাছে পাইয়াও তাহার সান্নিধ্য হাড়িয়া পাচমন বহুকে লইয়া সে বাসে আসার বদাইয়াছে—হাতের লম্বীকে পায়ে ঠেলিয়াছে ! সে-সব দিন-কল অধিকবার মত মনের আঁধার পটে লুপ্তি নিবিতে লাগিল। চায় রে, সাথে লোকে বলে, দাঁত থাকিতে দাঁতের মত আসরা বুঝি না ! মাসের মধ্যে কঁটা দিন বা শাতির সান্নিধ্য মিলে ! সে-দিনগুলোতে সব ভুলিয়া শাতির 'পরেই যদি সকল মন মত্ত করিত।...

চিন্তার সঙ্গে নিঃশ্বাসের বোকার বুক ভারী হইয়া ওঠে।... নিষেধ করে বাতি নিবাইয়া বিছানায় সে পড়িয়া রহিল। আঁধারের অশ্রুতম শাতিকে মুকুর কাছে নিবিড় করিয়া বেন পাওয়া বাহ—আলোর তীব্রতার শাতির চিন্তাও ঘুরে সরিয়া যায়।

শাক্তহবাবু আসিয়া কহিলেন,—খাবে চলো, ভায়া !

বিনোদ কহিল,—পেটটা ভার আছে। খাবো না।

শাক্তহবাবু কহিলেন,—ও ব্যথার নিশ্বাসে ! খেলে সে-রে খাবে।

বিনোদ কহিল,—না।

শাক্তহবাবু কহিলেন,—কথা পোনো ভায়া ! না হয় কাল অধিন-কোরত বাড়ী গাও—বউমার চরণ ল্পন ক'রে সক্তি করো ! ওদের উপর মান ক'রে কোনো বীর আশ পর্গত অটল থাকতে পারেন নি—না রাধা রামচন্দ্র, না সেকন্ডর শাহ, না নেপোলিয়ন !

বিনোদ কোনো জবাব দিল না। শাক্তহবাবু কহিলেন,—খাও। ভায়া ওবে বিরহ-তপোবনে আস-মনে উদাসী ! বিরক্ত ক'ন না। এ-সময় বহুর

শাশ্বদা বচন মনে শরৎপদ্য রচনা করে—মানি, ভায়া, মানি। এ ভোগ ভুগেচি এটা একদিন। এখন গৃহিণী ছিলেন—

শান্তহৃদ্য বিবাহ মইলেন। বিনোদ বিবাহার পড়িয়া রহিল। তার মনে হইতেছিল, জনিয়ার অঁট-শাঁট বাধা বিধি-বাবহার দুপল্লা কোথায় যেন ঢিলা হইয়া গিয়াছে—হুনিয়া জই নম্পণ করিয়া নড়বোড়ে হইয়া ঘুরিতেছে! কোথাও শৃঙ্খলা নাই!

স্বামিটা কোনো মতে কাটিয়া গেল। ভাগো নিভ্রা-দেবীর প্রাণে মমতা আছে! বাধাকুর, পোকাকুরের প্রতি ভাগো তার মমতার মাত্রা একটু বেশী! নসিলে, জনিয়ার মাহু বোধ হয় বাঁচিতে পারিত না! সন্ধ্যা-হারিদৌ নিভ্রা—কথাটা ভারী সত্য!

সকালে অকিস। কাজে-কর্মে বিনোদ মনকে ছুঁবাইয়া গিল। কিন্তু এত সন্তোষ মনকে আঁটিয়া উঠিলে, ক্ষুদ্র মাহুয়ের এমন কি লাধা আছে!—

ভুব উপায় এখন নাই—

বৈকালে অকিস হইতে কিরিয়া সে সামলজ্ঞা করিল। অজয়ের গৃহে আশ ফুলশায়া, বৌ-ভাত। নিমন্ত্রণ আছে। নিমন্ত্রণ বাইবার ভক্ত চাকলা বেশী। হীরার ক্রমের সন্ধান করিতে হইবে!—

অজর বাহিরের ঘরে ছিল। বিনোদকে দেখিয়া কহিল,—একা যে! শান্তি দেবীকে আনোনি?—

বিনোদ কহিল,—না। উপায় ছিল না, ভাই।

অজরের কাছে সোপানে সে মুক্তাখুণিয়া বলিল। জনিয়া অজর কহিল—আমার হীর নাম নীহারিকা!

নববধূর নাম নীহারিকা! তাই তো!

কিন্তু ভাহাকে প্রেমোপহার দিতে কে আসিল? শুধু প্রেমোপহার নয়—প্রিয়তমা প্রণয়িনী! বিনোদের গারে কাটা গিল। ক্রুট্টা সে সঙ্গে আনিয়াছিল, কহিল,—এই ভাখো!—

প্রিয়ের লেখাটুক দেখিয়া অজর হাসিল। কহিল,—

সেই, তার কোনো ভক্তপূর্ণ lover-এর উপহার! কার লেখা, তা' অবস্তা চিন্হি না!

বিনোদ যেন কঠি! কহিল,—হুমি হামু!

অজর কহিল,—কীমতে বলো? যদি কেউ তাঁকে ভালোবেসে থাকে!—ভালোবাসার উপর কি কারো হাত আছে, ভাই? আমার হীকে হুমি ভাখোনি, বোধ হয়—তাই বুঝে না! She is so lovable! তা' ছাড়া I feel myself proud। সত্যি বিনোদ, এঁকে দেখে ভালো না বেসে থাকি যায় না। আমি তো শুভবুদ্ধির সময় থেকেই ভালোবেসে কেনেচি! I am love-mad. Really!

বিনোদ অবাক! অজর কহিল,—শও, তাঁকে ওটা দেখাই গিরে। একে ভালোবাসা, তার সঙ্গে হীরার ক্রুট! নারী জাতি, yes—they adore both... ঘেঁষে ভারী খুশী হবেন 'বর'!—

বর-চালিতের মত বিনোদ অজরের পানে চাহিয়া রহিল, অজর ক্রুট লইয়া অঘরের দিকে গেল।

বিনোদ যেন পাথরের 'ঠাট্টা'! বাহিরে তুলল কমরব। লোকজনের হাঁকাহাঁকির অস্ত নাই। পাণ, চা, জামাক, চুটু...সেই সঙ্গে—ওরে শিবু, এই হুঁট ভন্দর-লোককে নিয়ে গিরে চুটু করে বাইরে বে—এঁরা অপেক্ষা করতে পারবেন না—টুপে কিয়বেন। যেন সেই pandemonium! তার ঘরেও লোকজনের আলা-বাওয়ার বিবাহ নাই। বাস্তব-ভাব; কেহ কিরিয়া চাহে না—আসে, আসিয়া কি পোকে এবং পরস্পরে চলিয়া যায়!

আশ ঘন্টা পরে অজর ফিরিল, কহিল,—না হে, হাতের লেখা তিনিও সনাক্ত করতে পারলেন না। তবে শুনু, এমন প্রণয়ী তার হুঁতিনটি আছেন—ভারী ভালোবাস করেন! এ-উপহার কার হাতের—তিনি ঠিক ধরতে পারলেন না। তবে এখন সন্ধান পাবো। এ-বস্তুটা এখন তোমার কাছেই রাখো।

বিনোদ বিমূর্ছের মত বসিয়া রহিল। অম্বর
তো ভারী মজার মানুষ! হীর প্রণয়-সীল্য নইয়া। এমন
স্বামোহ বোধ করে! এ বিলাত বাওয়ার দল,
নিষ্ঠুর!...

অম্বর কহিল,—এখানে বসে থাকবে কুনোর মত?
না, আসরে আসিব?

বিনোদের কিঞ্চৎ কলরব অম্বর বোধ হইতেছিল।
সে কহিল,—এখানেই থাকি।

—বেশ!...

৪

খট্টাখানেক পরের কথা। বিনোদের সে নিষ্ঠুর
কোণটিতে ক্রমে কোলাহল-কলরবের ডেউ আসিয়া
লাগিল। পাচ-পাচ জন ভ্রলোক আসিয়া জাহ্নবা
ছুঁড়িয়া বসিলেন।...

বাহিরে হাস্য-কলরবের অম্বর নাই! একজন
ভ্রলোক বলিতেছিলেন,—হাত ভারী সাফ!...কিন্তু
তাই বা কি ক'রে বলি! নূন নিষ্ঠুর! না ত'লে বলি
একটা বর্ষাতি দিলে যাবে কেন? বেটা দিলে সেছে,
quite fresh! আন্ধুকারা নতুন — তার পকেটে
একরাশ চুকট!

বিনোদের দুই চোখ বিস্তারিত হইল। কবে সেই
কলঙ্ক-পড়া miracle-এর কথা মনে জাগিল!

সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সামনে একটা বেয়াড়া—
তাহাকে কহিল,—অম্বরবাবুকে একবার খপর দাও
তো স্বপ্নির

অম্বর আসিল। বিনোদ কহিল,—বোধ হয়, বাগের
কিনারা হবে ছে!

অম্বর কহিল,—কি রকম?

বে-কথা গুনিয়াছে, বিনোদ বলিল।

অম্বর কহিল,—বাইরে এসো।

হুকমে বাহিরে আসিল।

বাহিরে মোহরা গল্পের এক সৌধীন ভ্রলোক—
বহলে প্রোঁড়। তখনো তাঁর মুখে সেকাহিনীর দের
চলিয়াছে। প্রোঁড়াসের মুখে কোঁকু-হাত।

অম্বর ডাকিল,—প্রকাশনা!

ভ্রলোক কহিলেন,—কি বল্‌চো, ভায়া?

—একবার এদিকে আসিবেন?

—নিষ্ঠুর।

প্রকাশনা উঠিয়া আসিলেন। অম্বর কহিল,—এ
মিনিটে। দেখুন তো।

বিনোদের কাছ হইতে ক্রচ লইয়া অম্বর প্রকাশনার
হাতে দিল। প্রকাশনা ক্রচ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন,
কহিলেন,—বাঃ! এই তো সে বস্তু... আমার হাতের
লেখা টিকিটুই অবধি...

হাসিয়া অম্বর কহিল,—এ'র সঙ্গেই আপনার বর্ষাতি-
কোট বদল করিতে... সেজ্ঞ এ'র গুহে অপাতির
সীমা নেই। পাতি দেবী গুহ ছেড়ে মান-ভরে পিত্রালয়ে
সেছেন।

প্রকাশনা কুতূহলী দৃষ্টিতে বিনোদের পানে
চাহিলেন; অম্বর তাঁহাকে বিনোদের করুণ কাহিনী
বিস্তৃত করিয়া বলিল।

গুনিয়া প্রকাশনা কহিলেন,—আমার গুহেও বিভ্রাট
অর ঘটেনি, ভায়া! অর্থাৎ আমি একটু... মানে,
শ্রৈণ! হু'দিন পরিচর হ'লেই আকৃত পাবুবে।
কাজেই আগে থাকতে স্বীকার করায় আমার
বিলুপ্তা লক্ষ্য নেই!

হাসিয়া অম্বর কহিল,—বিষাদ হয় না, গাণা! শ্রৈণ
মানুষ পরকীয়ার প্রেমে বিভোর হয় না। আপনার
এই নীহারিকা-প্রীতি...

—ও! প্রকাশনা হাসিলেন; কহিলেন,—এটুকু
latitude আমি পেয়েছি! শ্যালিকাদের প্রতি প্রেম-
পোষণ আমার অধিকার আছে। গৃহিণী প্রেম মনেই
আমার সে অধিকার দান করেছেন। নীহারিকা
আমার সব-চেয়ে প্রিয়তমা ভ্রালিকা — তাই তাঁর প্রতি
আমার প্রেমও অগাধ!

—জবে আপনার বিভ্রাট ঘটল কিংবা?

প্রকাশনা কহিলেন,—পাণ-তামাক দ্রব্যগুলি আমি
উপভোগ করব, তোমার যদি তা' বরদাশ কর্তে

পারেন না। আমি পান-চুকটের একটু খেঁচি তুলি
হিঁসুম। একবার গাভের রোগ হয়—ভারী কষ্ট
পাই। ডাক্তারের ব্যবহার কাছেই পান-চুকট
ভাপ করতে হয়। তোমার মিমি এসবকে ভারী
হ'নিয়ার। হ'ঁচার বার আমার তুল-চুক খটেছিল—
মাহব মাহেরই তুল হয়, খানো তো ভাই ! তা সে
তুল-চুকের ক্ষত দীর্ঘ সপ্তাহ কাল জীর
segregation-এর ব্যবস্থা করেছিলেন। একটি
কথা কননি, আমার ঘরে আসেননি, এক-
শয়া গ্রহণ করেন নি ! বীপান্তর-বাসের চেয়েও
কঠোর শাস্তি ! প্রিয়তমা আপে-পাশে ঘুড়েন—কথা
কইবেন না, হাসবেন না, আমার পানে চাইবেন
না—বেন সেই টাণ্ডালাসের কাণ ! কৃষাকুরের
সামনে পেয়ালা-ভরা সিদ্ধ পানীয়, অথচ তা'তে
অধর-স্পর্শ ঘটবে না ! আমি তাঁকে বলি,
তুমি এত strict বন, তোমার উচিত ছিল
আমার গৃহীণীনা ছেড়ে হাইকোর্টর বেকে
বসা !—তা সে-রাতের কথা বলি, শোনো—

বাধা দিয়া অম্বর কহিল,—কিছু যোগানে
আমার জীর চিত্ত-হরণের এই চেষ্টা—এর
নালিশ মিমির কাছে আমি পেশ করব।

হাসিয়া প্রকাশনা কহিলেন,—তা'কোহো। তা'তে
আমার acquittal হবে।—সেই কথা বলি,
শোনো—অর্থাৎ বিয়ের দিন রাতে আমার বর্ধাতি
খোঁচা যায়—তার সঙ্গে ঐ প্রেমোপহার ! বাসরে এ
উপহার নীহারিকার হাতে দেবো, সক্ষম ছিল—অর্থাৎ
একটা triangle-এর আভাস জাগবে ! পুতান প্রেম
নৃজন প্রেমের পার্শ্বে টে'কে কি না, তারও পরীক্ষা
হবে ; বর্ধাতির সঙ্গে ক্রম অধিক হ'তে মন ব্যাধান হ'য়ে
সেল। বাসরে সেলুম না। রিক্ত হাতে বাওয়া
সাথে না, ভাই। গভীর রাতে বদলি-বর্ধাতি খাড়ে
শোবার ঘরে এসে শয্যা গ্রহণ করি। এ-বর্ধাতির
পকেটে স্বতকঙ্কণো চুকট তখন লক্ষ্য করি !
ঐ লক্ষ্যই—তা' নিয়ে কিছু ঘটতে পারে,

কখনার আসে নি ! মনের সে-অবস্থার কখনা
সাজা তোলে না ! শোবার ঘরেই বর্ধাতি ছিল।
—তোমার দ্বিধির একটা স্বভাব আছে—ভানো
বলো, আর মনাই বলো,—প্রভাত সকালে আমার
জামার পকেট সার্চ করেন। কাল সকালে সার্চ
ক'রে ঐ বর্ধাতির পকেটে এল-গাদা চুকট পান।
আমি ব'লে একটা হিসাব নেখ'চি, তিনি চন্
ক'রে খাতার উপর চুকটের রাশ ফেলেন নিঃশব্দে
গাড়িরে রইলেন। তাঁর দুখের পানে চেয়ে আমি
দেখি—সে কি ভাব ? কবিরা ব'লে গেছেন,
কড়ের পূর্ণকণে প্রকৃতির রস্বিত ভাব ! ঠিক তেমনি !
সে ভাবে দাক্ষিণ কঙ্কণ, আর নিগ্নবের আভাস !
আমার মত পরী-প্রেমিক ছাড়া সে-লক্ষণ অপরকে
বোধগম্য হয় না...

হাসিয়া অম্বর কহিল,—তারপর ?

প্রকাশনা কহিলেন,—তারপরও ক্রম্ভে চাও,
ভায়া ! তার আর পর নেই—ট্রাফেডির ঐখানে ব্রহ্ম,
ঐখানেই ইতি। তারপর প্রাণনে ব্যাক্যাপান বন্ধ।
বীর-নারী চানবিবির মত তিনি উদ্ধত পিরে চলা-
কেনা কর্জেন—কথাটি কন না। আমি সেখে
বহবার কথা কইতে গেছি, মিনতি-ভরা বচনে ভুট
কহতে চেয়েছি, তিনি তা'তে দৃষ্টিপাত করেন নি।

অম্বর কহিল,—তা' হ'লে চলুন, এই বায়াল-সম্মত
আপনাকে তাঁর সাহসে খাড়া ক'রে দি। এত না
কুলোর, বন্ধ বিনোদ আছে। তার বাচনিক এলাহার।
বিনোদের দশা আরো লম্বী কি না—হুঁচড়ার কোটে
আপনাকে বৃষ্টি-বা হামির হ'তে হয় লক্ষ্য দিতে।

বিনোদ কহিল,—তার প্রয়োজন আছে ! এবং
বত শ্রী সত্তব...

অম্বর কহিল,—সহুয়ায় বলব ?

বিনোদ কহিল,—বলো।

অম্বর কহিল,—কাল তুমি শ্রীমতী শান্তি মেবীকে
এইখানে নিয়ে এসো...

প্রকাশনা কহিলেন,—আনাড়ির কাছ হবে...আরে

রামচন্দ্র ! এমন কাজও করে ! তিনি বলবেন, আমি শেখানো নাকী ।

অমর কহিল,—তব ?

প্রকাশনা কহিলেন,—অর্থাৎ কাল অমর, নীহার, বিনোদবাবু এবং সতীক আমি—ক'জনে মিলে চুঁচড়ার বাই, চলো—এ-রকম এমনি গোপন থাকুক—কালের সোপানসে বিরহ-বেদনা নিখিল হবেই ; তারপর ক'জনে একত্র হ'বে এ-রকমের এমি মোচন কর্ব। আমার কথা শোনো তাহা—বহুকাল বাবু আমি স্ত্রীর সঙ্গে বর কর্ছি। নারী-প্রকৃতির লমকে আমার জ্ঞান কাবা থেকে সংগ্রহ করা নয়, প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা-সম্প্রাপ্ত। আড়াল-সাবধান, কিংবা গোপন রুদ্ধে আমার নিষেচা,

কি স্ত্রীপদের চিত্র বিশ্রোহী হয়েছে ! এ-তব আমার ভালো রকম জানা আছে !

অমর কহিল,—উত্তম পরামর্শ ! কি বলো, বিনোদ ?

প্রকাশনা কহিলেন,—আমার দীর্ঘতর অভিজ্ঞতা—আমার কথা শুনি। প্রেমান-বন্ধন ছুটে। বর্ধিত সঙ্গে বাবে। আর আমার ইনি স্ত্রীমতী নির্ঘণাবাগাও চুঁকট পাওয়া, ক্রচ উপহারের কথা সাক্ষ্য বলবেন। আমায়ের সাক্ষ্যে অবিশ্বাস হ'লেও সে-আমায়ের নারীর সাক্ষ্য অকাটা হবে। এ-ছাড়া সহপাঠ তো আমি সেন্ধি না !

বিনোদ কহিল,—বেশ, তাই হোক ।

শিশিরকুমার ইন্সটিটিউট

ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশন

সত রবিবার ২১শে যে অপরাহ্নে শিশিরকুমার ইন্সটিটিউটের ত্রয়োদশ বার্ষিক সভার অধিবেশন স্বর্গীয় বার নন্দলাল বসু মহাশয়ের বাগবাছারহ বাসভবনে কর্পোরেশনের সেধর ঐন্ড্র সজ্ঞাবহুমার বহু মহাশয়ের সভাপতিত্বে হইয়া দিয়াছে। কলিকাতার বহু সন্ত্রাস্ত ভক্তলোক ও মহিলা সভায় আগিয়াছিলেন।

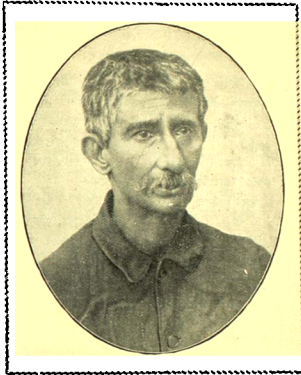
ইন্সটিটিউটের সম্পাদক ঐন্ড্র বিমলকান্তি ঘোষ যে ত্রয়োদশ বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন, তাহাতে সেবা বার, ইন্সটিটিউট সাহিত্য, সমাজসেবা, নাট্যকলা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের সেবা করিতেছে। ইহা আলোচ্য বৎসরে দশ মাইল ভ্রমণ-প্রতিবেদিত্যর বাবস্থা করিয়াছিল ; তাহাতে ছয়টি কাপ ও এগারটি পদক, 'কার্যম'-প্রতিবেদিত্যর একটি কাপ ও দুইটি পদক

এবং নাট্যাভিনয়ে সাতটি পদক পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। স্বর্গীয় সোলাপলাস ঘোষ মহাশয়ের বৃত্তি স্বকর্ণ প্রবেশ-প্রতিবেদিত্যর ইন্সটিটিউটের সহ-সভাপতি ঐন্ড্র সৃণালকান্তি ঘোষ স্ববর্ণ পদক প্রদান করিয়াছেন। আলোচ্য বৎসরে ইন্সটিটিউটের সমস্ত লম্বা প্রথমে ছিল ১৪৮ জন ; শেষভাগে হয় ২২৬ জন। লাইব্রেরীতে আলোচ্য বৎসরে ৩৬০০ খানা পুস্তক ছিল ; পূর্ববর্তী বৎসর হইতে ৩১১ খানা পুস্তক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কলিকাতা কর্পোরেশন ইন্সটিটিউটের বার্ষিক সাহায্য বৃদ্ধি করিয়া ৩০০ টাকা করিয়াছিলেন ; বর্তমান বৎসরে উহার পরিমাণ আরও বাড়িয়া ৫০০ টাকা করিয়া দিয়াছেন। ইন্সটিটিউট স্ত্রীর-চর্চা এবং খেলা-প্লামত বাবস্থা করিয়াছে। উপলক্ষ্যে সম্পাদক বলেন,

ইন্সটিটিউটের কাজকর্ম এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এচেন্সের প্রকাশনা করিয়া প্রতিপ্রতি যেন যে, সমিতির বর্তমান আফিসে আর স্থান নহুলায় হইতেছে না। সাহায্য বৃদ্ধির জন্য তিনি স্বাধাধা চেষ্টা করিয়াছেন।

সমিতির একথানা নিম্ন বাকী আবৃত্তক।

অভ্যন্তরীণ শ্রুত
ব্রাহ্মসমাজের
বীজবো, শ্রুত
প্রবর্তন হিন্দু
সিদ্ধি ও শ্রুত
ভূতনাথ মুখো
সমিতির প্রকাশনার
কালের অধ্যাপ্তি
করিয়া বক্তৃতা
করেন। সর্বশেষে
সভাপতি মহাশয়
একটি নাতীর্ঘ
বক্তৃতা করিয়া
বর্ণনা মহাশয়।
শিশিরকুমারের
বৃত্তির প্রতি
প্রদাননি অর্পণ
করেন এবং
সমিতির কর্ম-



মহাশয় শিশিরকুমার বোম

ভারপর কুমারী
কন্যাশী চাইবো
নারী একটি আট
বন্দর বহুত
বালিকার নৃত্য ও
শ্রুত, শ্রুত, অশ্রুত
ভট্টাচার্য ও শ্রুত
নির্মল ভট্টাচার্যের
বাউল-সঙ্গীত,
বান্ধবাকার ফ্রেণ্ড
ইউনিয়নের আটটি
বালিকার সঙ্গীত
ও পল্লী-নৃত্য, উক্ত
ইউনিয়নের সুবক
সদস্যদের বক্তৃতা ও
সুখের এবং স্বর্গীয়
ব্রাহ্মসমাজ সৈন্যের
“মানবনী গার্লস্
ক্লাব” ও শ্রুত
এবং বহু-
মারের “গুণবান্ধা”
অভিনীত হয়।



['ইরবন' সমালোচনার রক্ত প্রকাশণ অগ্রসর করিয়া তাহার পুস্তক হইলানি করিয়া পাঠাইবেন]

ভারত কি সভ্য ?—শ্রীমদবিকের "Is India Civilised ?" হইতে অনূদিত। অম্বাবানক—শ্রীঅনিলবরণ রায়। শ্রীমদবিক নাইবেরী, কর্ণওয়ালিশ টাউ, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। দাম বারো আনা।

কয়েক বৎসর হইল উইলিয়ম আর্চার (William Archer) নামক একজন লেখক "ভারতের সমগ্র ভূ-বন ও শিক্ষাদীক্ষাক উৎকট ভাবে আক্রমণ করিয়া একখানি বই নিব্বিয়াছেন।"

"তিনি ভারতের দমন, ধন, আই, সাহিত্য, উপনিষদ, রামায়ণ সব একসঙ্গে ভুড়াইয়া বসিয়া দিয়াছেন—স্ফটিকজনক অকথা বর্ষবতার স্তূপ।"

এই পুস্তক প্রচারের অল্পকাল মধ্যে কলিকাতা হাইকোর্টের হুতপুল জজ ও প্রতিভাশালী তত্ত্বাবধায়ক দ্বারা জন উদ্ভোক মি: আর্চারের এই বিষয়বুদ্ধি-প্রণোদিত নিলক্ষ আক্রমণের প্রতিবাদ করিয়া একখানি পুস্তক লেখেন—তাহারই এই চমকপ্রদ নাম—"Is India Civilised ?" শ্রীমদবিক এক ইংরাজী প্রবন্ধে এই শেখোক্ত প্রবন্ধে নিম্ন অভিমত লিখিবদ্ধ করেন। সমালোচ্য পুস্তিকাখানি (৬৮ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ) অবিলম্বপূর্ব্বকৃত সেই প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্ভোক সাহেবের মতে—"ভারতীয় সভ্যতাকে রক্ষা করা মানবজাতির কল্যাণের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়।" সেজন্য তিনি মনে করেন—"এই সব অল্পতাপূর্ণ আক্রমণকে অবহেলা করা কখনই উচিত নহে।"

এই ধারণাতে এমন তাহে তিনি মি: আর্চারের সিদ্ধান্তগুলি অসৌক্লিক, ভ্রাম্যশব্দক ও হৃৎক্লিষ্টমূলক প্রমাণিত করিয়া দিয়াছেন যে, অস্থায়িক মহাপ্রবল

ভাষা—"যেন একটা প্রমাণভিত্তিক (না—ভবন পোকা) কীভাণ পিছিয়া ফেলা হইয়াছে।" তিনি অবিস্মরণীয় রূপেই দেখাইয়া দিয়াছেন যে, "মি: আর্চারের যোগাগুলি উদ্ভেদ হইতেছে রাষ্ট্রনৈতিক।" আধুনিক ইউরোপের ইস্ত্রিভোগাশব্দক সভ্যতার এই উপাসক বলিতে চান—

"হয় তাহাকে (ভারতকে) তাহার সমগ্র সভ্য ইউরোপীয় ভাষাণ, বুদ্ধিগণ, জড়বানী হইয়া উঠিতে হইবে এবং এই তাহে স্বাধীনতার যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে নতুবা তাহাকে পরাধীনতাগণে বদ্ধ রাখিয়া শাসন করিতে হইবে, তাহার কিংকোটি ধর্ম্মভীর বর্ষরকে ধোর করিয়া চাপিয়া রাখিয়া... ইউরোপীয়গণের দ্বারা শিক্ত ও সভ্য করিয়া তুলিতে হইবে।"

ইহা হইতে বৃথা যায়—"এটা হইতেছে কালচারের কল, এবং রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার দ্বারা ইহা আরও জটিল হইয়া পড়িয়াছে।" উদ্ভোক সাহেবের আপত্তি—"একদিকে ইউরোপীয় আধুনিকতার হতীয়া আক্রমণ, অন্তরিক তাহার (ভারতের) সম্মানগণের নিদাক্ষণ অবহেলা"—ইহার ফলে হুত ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ভাঙ্গিয়া বাইবে। তাই তাহার উপদেশ হইতেছে—"এখন তাহাকে (ভারতকে) নিম্নের পায়ে ভর দিয়াই পাড়াইতে হইবে, বিশেষ প্রকাবে হইতে নিম্নের কালচারকে রক্ষা করিতে হইবে, তাহার বিশিষ্ট আশ্রা, মূলসত্তা নীতি, স্বভাবাভ্যাসী অস্থায়ন সমূহ রক্ষা করিয়া নিম্নের বুদ্ধি-সাধন এবং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ-সাধন করিতে হইবে।"

ঈশ্বরবিশ্ব তাঁহার প্রবন্ধে বলিতেছেন—“এই নতুনবাদের সহিত মোটামুটি ভাবে আমার মতের ঐক্য আছে; ...কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে তাঁহার (স্বাধীন জন উদ্ভাসের) সহিত আমার কিছু মতভেদ আছে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া ভাল মনে করি।” আর তিনি তাহা বেশ ভাল করিয়াই দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এখানে তাঁহার সমাজ আন্দোলন সম্বন্ধে বলা নহে।

এই পুস্তক স্থলভ হইলেও বহুল। ক্ষুদ্র হইলেও গুরুত্ব। বিশেষতঃ বর্তমানে মুখ্যতর-মুখ্যতর তুলনাপরি-বর্তনের সঙ্কটস্থল সঙ্কটস্থ রাষ্ট্রনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে প্রাচীনের ও নবীরের, প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের ভাব ও আদর্শের পারস্পরিক সংঘাতে ধর্মক্ষেত্র ভারতে যে প্রবল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে—এই মনীষ্য তাহার বিশদ সমাধান করিতে চাহেন, তাহা অবশ্যই দেশের ও জাতির প্রেরণাময়ী প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাধান্যবোধ।

কিন্তু গ্রন্থের বিষয়, অনিলবাবুর অল্পবয়স সত্ত্বে আমরা বলিতে বাধ্য, তাহা গুরুত্বপূর্ণ হইলেও যথেষ্ট প্রাঞ্জল নহে; এমন কি অনেক স্থলে—বাহ্যাসের মনো প্রাধান্যতঃ অল্পবয়সের আবশ্রুতকতা—সেই ইংরাজী-অনভিজ্ঞ পাঠক-সিঙ্গের বোধগম্য হওয়া দুষ্কর। পরন্তু, অল্পবয়স নিত্য “আক্ষরিক” হওয়াতে বহুক্ষেত্রে তাঁহার ব্যঙ্গ। উৎকট ইংরাজী পদ্য বিকীর্ণ করিতেছে। এছাড়া এতটুকু একখানি বই, তাহাও ভূরি ভূরি ছাপার ভুল ভরা। আশা করি ভবিষ্যৎ সংস্করণে এসবল ত্রুটি পরিহারে তিনি যত্নবান হইবেন।

বীকন

দ্বিতীয় — উপজ্ঞান। ঈশানসিংহ দেবী ও প্রভাবতী দেবী সম্বন্ধী প্রণীত। ৪৪নং কৈলাস বহু টাইট, কলিকাতা হইতে ঈশানসিংহ দেবী মণ্ডল কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

বর্তমান যুগে বাংলা ভাষায় পত্র-উপজ্ঞান লিখিয়া যে কল্পনাময়ীরা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এই উপজ্ঞানখানির লেখিকাশ্রয়ের নাম সঙ্গমানে উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য গ্রন্থখানিতেও তাঁহাদের স্বেচ্ছাকৃতত্বের পরিচয় বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়। বইখানি আশাশুভ। বেশ চিত্তাকর্ষক। একটানা পড়িয়া দাঁড়িতে একটুও বিরক্তি বোধ হয় না। উপজ্ঞানখানির “দ্বিতীয়” নাম সার্থক হইয়াছে; কেননা, পুস্তকে বর্ণিত ঘটনা-সম্ভ্রান্ত এমন বিচিত্র গতিতে আবর্তিত থাকিয়া গিয়াছে যে, প্রত্যেকটি কাহিনীর ক্ষণ এক বা অত্যধিক বাস্তবিক দ্বিতীয় করা চলে।

অথচ চরিত্র সৃষ্টির দিক দিয়া এই উপজ্ঞানখানির উপর পরমোচ্চের বিখ্যাত উপজ্ঞান “পদ্মসমাজ”ের বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া মনে হইল। পুস্তক-খানিতে কিছু কিছু দুঃস্বাদ-প্রমাদ দেখা গেল। এইরূপ দুই একটি মোহ-দ্রষ্ট বাদ দিলে বইখানিকে মোটের উপর বেশ ভাল বলা যায়।

দ্বিতীয় বর — উপজ্ঞান। ঈশানসিংহ দেবী মণ্ডল প্রণীত। ৪৪ নং কৈলাস বহু টাইট, কলিকাতা হইতে ঈশানসিংহ দেবী মণ্ডল কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

এক স্বামী-অন্যদ্বিতীয় অথচ স্বামীপ্রেম-ভিত্তিক দ্বিতীয় আত্মকাহিনীর আকারে এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। কামনা-পূর্ণিতা দ্বিতীয় মনোভাব লেখক বেশ নিপুণ ভাবেই ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তিনি সর্বত্র তাঁহার এই নিপুণতা বলার বাধিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ, শেষের দিকে যখন সঙ্গী-কল্পা আসিয়া বিমাতা ও পিতার প্রেম-ব্যাপারে বোধ দেয় এক ভূতপূর্ব দ্বিতীয় সহায়তার বিমাতাকে এককথায় জোর করিয়াই পিতার শরনকে পাঠাইয়া দেয়, তখন পাঠকের হৃদয়-বোধে বড়ই আঘাত লাগে।

দ্বিতীয় ভাগ। দ্বিতীয় ও কামনা চলনসই।

ঈশানসিংহ দেবী মণ্ডল

বোম্ব-বিলোপ—শ্রীশ্রী সেন-প্রবীণ। প্রকাশক—শ্রীশ্রী সেন সরকার, বাজার পাখিগি হাউস, ১৪৪, বম্বালা হাট, কলিকাতা।

বার্ষিক প্রেমের মিলন-বিরহের কল্প কাহিনী। এনাকী ও বিনয়ের উপাখ্যানই plot, সন্তান ও নমিতার ইতিহাস by-plot। ছোট গল্পটির জীবনের বোম্ব ও বিয়োগ অপভ্রংশ সুন্দরানার সহিত দেখানো হইয়াছে। প্লট বোয়ালো, হইলেও লেখকের ভাষা বোয়ালো, সমালোচনা খারালো এবং মজার প্রকাশে অল্পটমার গেমমাত্র নাই। আধুনিক সমাজ ও অতি-আধুনিক সাহিত্যের বা-কিছু শোষ, এবং আভিমান্যতার নামে যে আধুনিকতম সভাভা (?) চলিয়া বাইতেছে, তাহার বা-কিছু ক্রটি, তাহার প্রতি কণাঘাত রীতিমত সাহিত্যিকতার সহিত করা হইয়াছে। কাণ্ডের বিরিস্তি দিয়া এক একটা type এমন উচ্ছল করিয়া তোলা হইয়াছে যে, মনে হয় যেন আমরা ইহাদের প্রত্যেককেই ভাল করিয়াই চিনি এবং নামও জানি। দেহ স্থানে স্থানে অতি তীব্র হইলেও বাহ্যের গলি দেওয়া হইয়াছে, তাহারও উপভোগ করিবে, এবং হস্ত নিষেদের সংশোধনও করিতে পারে। লেখক নৃত্য, কিন্তু নৃত্যের অক্ষমতা চোখে পড়িল না; সহজ, সরল এবং মনোরম করিয়া লিখিবার কায়দা করায়ত্তই মনে হইল। কেবলমাত্র কোনোকোনো দ্বারদ্বার পরিণতিটা abrupt লাগিল। আর অক্ষম কবিদের বার্ষিক কাব্য-প্রচেষ্টার স্থানীয় নমুনা না মিলেও চলিত। ছাপা, বঁধাই ভাল। ছাপার কুল সফল প্রকাশকের আক্ষেপান্তি সবেও বিশেষ কুল নজরে পলিল না।

শ্রীশ্রীভক্তিরূপ বহু

Women of India—by Otto Rothfeld, F. R. G. S., I. C. S. with 48 Full-page illustrations. Edition—De Luxe. Price Cloth Rs. 20, Popular Edition Rs. 11.

উপহারের পক্ষে অতি উপায়ের পুস্তক। সারা

ভারতবর্ষের ৪৮টি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর নারীর চিত্র একত্রে প্রদত্ত। লিখিতাংশও সুপাঠ্য। চমৎকার ছাপা, চমৎকার বঁধাই।

Do We Agree? বার্গড ৭ ও মি. কে, জেট্রাটনের মধ্যে বিতর্ক। সভাপতি—বেলক্। মূল্য—১/০। বইখানি সাধারণের পাঠ করা উচিত।

The New Webster's Collegiate Dictionary—মূল্য ১৫৫। বিশ্ববিখ্যাত Webster অভিধানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ১২৪০ পৃষ্ঠার অধিক, ১০৬,০০০ শব্দানি আছে, ১৭০০ ছবি আছে এবং তাহাতে সত্যই অভিধানের গৌরব বাড়িয়াছে। জীবন-চরিতাংশ ইত্যাদি আরও কয়েকটি মূল্যবান অধ্যায় গৃহীত হইয়াছে।

New Discoveries relating to the Antiquity of Man—by Sir Arthur Keith, M. D. (Aberdeen), D.Sc. (Oxford, Durham and Manchester), LL.D. (Aberdeen and Birmingham) F. R. C. S. (Eng.), F. R. S. মূল্য—১৫০।

মুন্ডার পুস্তক; ভাষা সহজ করিবার দিকে লেখকের বিশেষ দৃষ্টি আছে। মানুষের নিম্ন ইতিহাসে যদি সত্যকার কৌতূহল থাকে তবে পুস্তকখানি নিশ্চয়ই পঠিতব্য।

Faridu'ddin 'Attar: The Persian Mystics: 'Attar. By Margaret Smith etc. John Murray 1932. 3s-6d.

(ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান্ মি: কে, এম, আনউল্লার সৌজন্যে প্রাপ্ত)

“Wisdom of the East” series-এর এই ছোট বইখানিতে কবির মুনীর একটি ছোট জীবনচরিত এবং তাহার দার্শনিক যত্নের পরিচয় আছে। অনুবাদগুলি হইতে Sufism-এর মুনীর একটি আভাস পাওয়া যায়। এসময়ের কাব্য-সঙ্গতে Sufism-এর প্রতি উৎসাহের পরিচয় পাওয়া বাইতেছে—মনে হয়, বাঙ্গালী পাঠকেরা পুস্তকখানি পড়িয়া আনন্দ পাইবেন।

“ন”



ইতিহাস—

চণ্ডী দেবায় প্রাচীন নগরী আবিষ্কার—

শ্রী ব্রজনাথ রায়

(প্রবন্ধ—বৈশাখ, ১৯৪০)

সিংলী প্রবাস ও উপাখ্যান—

স্বামী ভগবীবরানন্দ

(বঙ্গলক্ষী—বৈশাখ, ১৯৪০)

অতীত ও ভবিষ্যৎ—ঈশ্বরনাথপ্রসাদ চন্দ্র

(প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৯৪০)

লোকালের কথা—ঈশ্বরেশ্বরনাথ বল্লভাধ্যায়

(প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৯৪০)

বুদ্ধকথা—শ্রী অমল্যচন্দ্র সেন

(বঙ্গশ্রী—জ্যৈষ্ঠ, ১৯৪০)

প্রাচীন ভারতে বিত্তরী মহিলা—

শ্রীমতী কমলাদেবী গঙ্গোপাধ্যায়

(বঙ্গলক্ষী—বৈশাখ, ১৯৪০)

বঙ্গের স্বাধীন-প্রভাব প্রবেশের ধারা—

মুহম্মদ এনায়েত হক, এম্-এ

(মাসিক মোহাম্মদী—জ্যৈষ্ঠ, ১৯৪০)

গ্রীক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত—

ডাক্তার ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত—

(প্রদীপ—জ্যৈষ্ঠ, ১৯৪০)

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাণ—

শ্রীচন্দ্রের মুখোপাধ্যায়, এম্-এ

(অন্ধাঙ্গ—বৈশাখ, ১৯৪০)

সাহিত্য—

কবি ভানসেন—ঈশ্বরনাথপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

(প্রবাসী—বৈশাখ, ১৯৪০)

কবিতার ছিন্নপত্র—ঈশ্বরনাথ চৌধুরী

(বিচিত্রা—বৈশাখ, ১৯৪০)

কাব্য-সাহিত্যের উপেক্ষিত—শ্রী প্রিয়লাল দাস

(অজ্ঞান—চৈত্র, ১৯৩৯)

বৈষ্ণব কাব্য—ঈশ্বরেশ্বরনাথ গুপ্ত

(প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৯৪০)

উৎকলের প্রাচীন সাহিত্য-সম্পদ—

ঈশ্বরচন্দ্রনাথ সেন, বি-এসসি, বি-এড্

(ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৯৪০)

ঈগিটপোবিন্দে কৃষ্ণলীলা—

ঈশ্বরেশ্বরনাথ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন

(ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৯৪০)

জননী, রমণী, নন্দিনী—

শ্রীযোক্তিসেন চট্টোপাধ্যায়, ভাগবতভূষণ

(ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৯৪০)

সাহিত্যে অনীলতা—ঈশ্বরচন্দ্রনাথ দাস

(বঙ্গশ্রী—জ্যৈষ্ঠ, ১৯৪০)

বঙ্গ কুতিবাসের অঙ্গসম্বন্ধ—

শ্রীমলিনীকান্ত ভট্টাচার্য, এম্-এ

(বঙ্গশ্রী—জ্যৈষ্ঠ, ১৯৪০)

সাহিত্য-প্রদর্শন—শ্রী কালিদাস রায়

(পুষ্পপাথ—জ্যৈষ্ঠ, ১৯৪০)

লোকসাহিত্যের ধারা—

শ্রীমদোমোহন নরহর

(বঙ্গলক্ষী—বৈশাখ, ১৯৪০)

বাঙলা সাহিত্য ও মুদ্রণসময় সমাজের কৃতি-বিপণ্য—

মোহাম্মদ আবুল্লাহের কাফী
(মাসিক মোহাম্মদী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

দর্শন—

ভারতীয় দর্শন—স্বামী চন্দ্রশেখরানন্দ
(ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

ধর্মজীবন ও বিজ্ঞান—

আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুজ্জীন
(মাসিক মোহাম্মদী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

বিজ্ঞান—

ডবল বাবু—মোহাম্মদ ইসহাক, বি-এলসি
(মাসিক মোহাম্মদী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

বৈজ্ঞানিক শক্তির আবিষ্কারের কাহিনী—

ঐন্দ্রেশ্বরকর চট্টোপাধ্যায়
(মাসিক মোহাম্মদী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

ট্রায়ড ভাদল—ঐন্দিবসেনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
(মাসিক বহুমতী—বৈশাখ, ১৩৪০)

অর্থনীতি—

দেশের অর্থ ব্যয় কোথায়?—

ঐন্দ্রেশ্বরকর মুখোপাধ্যায়
(প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

বাল্মীকির অর্থনীতি—

ঐন্দ্রেশ্বরকর মুখোপাধ্যায়
(ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

দেশের অর্থের সন্ধান—

ঐন্দ্রেশ্বরকর মুখোপাধ্যায়
(স্টাইল ইন্ট্র—বৈশাখ, ১৩৪০)

চরিত্র—

মহাপ্রবোধনের পথে—

ঐন্দ্রেশ্বরকর মুখোপাধ্যায়
(ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

হুসী—প্রজ্ঞানপুত্রী—

ঐন্দ্রেশ্বরকর মুখোপাধ্যায়
(ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

মুহম্মদীয়—

অধ্যাপক ডাঃ ঐন্দ্রেশ্বরকর মুখোপাধ্যায়,
ডি-এলসি, এম-বি
(ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

সিউইসের দেশে—

ঐন্দ্রেশ্বরকর মুখোপাধ্যায়
(প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

প্রজ্ঞাপুত্র—

ঐন্দ্রেশ্বরকর মুখোপাধ্যায়
(প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

ভূগোল—অমরনাথ—

ঐন্দ্রেশ্বরকর মুখোপাধ্যায়
(মাসিক বহুমতী—বৈশাখ, ১৩৪০)

বাস্তব ও ব্যঙ্গ—

ভবনের দেহচর্কা—ঐন্দ্রেশ্বরকর মুখোপাধ্যায়
(ভারতবর্ষ—বৈশাখ, ১৩৪০)

বেকার-সমস্যা—

বীমা ও বেকার-সমস্যা—ডাক্তার এল্‌সি, রায়
(জীবন-বীমা—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

পুর্নবিদ্যা—

The Early History of Irrigation—
Sukumar Ranjan Das
(Modern Review—May, 1933)

কৃষি—

আগরতলায় মোহাম্মদের জায়—

ঐন্দ্রেশ্বরকর মুখোপাধ্যায়
(কৃষিপুত্রী—বৈশাখ, ১৩৪০)

জীবন-চরিত্র—

মহাপ্রবোধন—ঐন্দ্রেশ্বরকর মুখোপাধ্যায়
(কৃষিপুত্রী—বৈশাখ, ১৩৪০)

শিক্ষা—

শিক্ষার আদর্শ—ঐন্দ্রেশ্বরকর মুখোপাধ্যায়
(কৃষিপুত্রী—বৈশাখ, ১৩৪০)



(১)

আমরা থাকে ঘরের কথা বলি, তা' যে কতটা ঘরের, কতটা বাইরের, তা' বলা কঠিন। কারণ আমাদের মন শুধু ঘরেই থাকে না, বাইরেও থাকে। নিত্য বাইরের পাঁচরকম জিনিষ আমাদের মনে প্রবেশ করে ও মনকে ধাক্কা দেয়; এবং তার ফলে আমাদের অন্তরে নূতন ভাব, নূতন চিন্তার উদয় হয়। বাইরের অধীনতা থেকে আমাদের কারও মন মুক্ত নয়। বরং সত্যকথা এই যে, বাইরের সঙ্গে সম্পর্কহীন মন বলে কোনও পদার্থ আছে কিনা, তা' আমরা জানিনে, — হয়ত বোণীরা জানেন।

(২)

বিশেষতঃ এ-রূপে সংবাদপত্র ও রেডিও প্রভৃতির প্রসারে বাইরের সঙ্গে আমাদের মনের সম্পর্ক চের বেশি ব্যাপক হয়ে পড়েছে। পৃথিবীতে কোথায় কি ব্যাপার ঘটছে, তা' আমাদের না জেনে উপায় নেই। এর ফলে আমাদের আত্মজ্ঞান বাতুল আর না বাতুল, আমাদের বাহ্যজ্ঞান ক্রমেই বেড়ে চলেছে। পৃথিবীতে কোথায় কি ঘটনা হচ্ছে, কে কি করছেন, কে কি বলছেন, সে খবর আমরা নিত্য পাই। এবং এ-সব খবরে আমাদের মন নিত্য উত্তেজিত হয়, ব্যতিবাস্ত হয়, বিক্ষিপ্ত হয়। আর এইরূপ দৈনিক উত্তেজনা আমাদের একরকম নেশার মধ্যে হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ-স্বাভাবিক বসন্তাধবরের মৌতাত আমাদের প্রতি সকালে হয়, আর চায়ের মৌতাতের চাইতে খবরের কাগলের মৌতাত এক বিশৃঙ্খল ক্রম নয়; ফলে বাইরের কথা একালে একরকম ঘরের কথা হয়ে উঠেছে।

(৩)

এক কাল ছিল যখন বাঙালীর কাছে “ঘর হতে আত্মনা বিদেশ” ছিল। আর এ-রূপে প্রায় সমগ্র পৃথিবী, অর্থাৎ বিলকূল বিদেশ, আমাদের ঘরের আত্মনা হয়ে উঠেছে। আমাদের ঘরের সঙ্গে বাইরের, দেশের সঙ্গে বিদেশের, সম্পর্ক অতি নিকট হয়ে উঠেছে। সকাল বেলায় খবরের কাগজ পুুলেই দেশ-বিদেশের কথা আমাদের চোখে পড়ে, আর আমাদের মনটা সমস্ত পৃথিবীর হৃদয়ে পড়ে। আর এই সব বাইরের কথার সঙ্গে ঘরের কথার কি যোগাযোগ আছে, তা' আমরা ভাবতে বাধ্য হই;—কারণ যোগাযোগ যে আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। খবরের কাগজে প্রকাশ যে, আমেরিকা Dundee থেকে নেদার পাট কিনছে। এর ফলে যে বাঙালী পাটের বাজার চড়ে বাবে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত নয়। ফলে, বাঙালীর বর্তমান সৈভ যে কতক পরিমাণে গুচবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ বাঙালীদের টাকা হচ্ছে বাঙালীর পাট। আর পাট সত্তা হলোই বাঙালীর টাকার দ্রুতক হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে ঘরের কথা বাইরের কথা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেছে, কারণ ঘর এখন নানা বিষয়ে বাইরের একান্ত অধীন হয়ে পড়েছে। এ-রূপে কোন জাতির পক্ষে সম্পূর্ণ আত্মবশ হওয়া অসম্ভব। অথচ প্রতি জাতিই যখন আত্মোন্নতির বিষয় চিন্তা করেন, তখন ঘরের উন্নতির কথাই ভাবেন—পরের উন্নতির কথা নয়। এর ফলেই এ-রূপে জাতিতে জাতিতে দূত বিরোধের সৃষ্টি হয়।

(৩)

এই আন্তর্জাতিক বিরোধ বাহ্যিক-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পৃথিবীর economic war-এর সূত্র করেছে। আর পৃথিবীর বহু বড় বড় অর্থশাস্ত্রীর মতে মানুষের বর্তমান অর্থগত প্রধানত: এই economic war-এরই অবশ্রুতভাবী ফল। এই কারণে Roosevelt যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, এ-ঘটনা বাইরের একটা বড় ঘটনা। Roosevelt পৃথিবীর এই economic war-এর পরিবর্তে শান্তি স্থাপন করতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন; এবং কতক পরিমাণে তিনি যে উর উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবেন, এতদ্বা সন্দেহ কত। আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে এক হিসেবে Dictator বলা যেতে পারে, কারণ সিনেটরের অনেক ক্ষমতা তাঁর আছে। সুতরাং পৃথিবীর অনেক দেশ এখন বিষম ভাবাক্রান্ত, এবং আমেরিকাই হচ্ছে সে সব দেশের প্রধান উত্তরণ। সুতরাং তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে যুরোপের কণ্ঠের অনেকটা শাসন করতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি নিজের দেশের অর্থগত দূর করার জন্য gold standard বর্জন করেছেন। অর্থাৎ কিছুদিন পূর্বে ইংলও আশ্চর্য্যের জন্য যে পদা অবলম্বন করেছিল, আমেরিকাও আজ সেই পথের পথিক। উপরন্তু Roosevelt আমেরিকার টাকা পতন করার উপায় অবলম্বন করেছেন। ইংরাজীতে যাকে বলে টাকার Inflation, আমেরিকার গবর্নমেন্ট নির্ভর তারই শরণাপন্ন হয়েছেন। সেখান টাকার পরিমাণ বাড়লে যে জিনিষপত্রের দাম বাড়বে, সে কথা বলাই বাহুল্য। টাকার অভাব ঘটলেই টাকার মূল্য ঊর্ধ্বে বেড়ে যায়। অর্থাৎ টাকার জিনিষ এক টাকার কেনা যায়। Inflation-এর ফলে দেশের সেই বস্তুসমূহ লোকের কিস্তি কতি হয়, যারা তাদের টাকার একটা বাঁধা উপসর্গ ভোগ করে, যথা টাকার মূল ইত্যাদি। বাদ থাকি সকলের এই ব্যাপারে লাভ বই লোকসান নেই। জীবিত্যে কেবা যাবে এর ফল কি হয়।

(৪)

পৃথিবীর আর একটা বড় ঘটনা হচ্ছে—Hitler-এর জাতিতান্ত্রিক হঠাকতাবিধাতা হওয়া। কারণ তাঁর কথাবাত্তায় বোঝা যায় যে, তিনি পৃথিবীর পোলিটিকাল শান্তিভঙ্গ করার জন্য বহুপরিচর হয়েছেন। জাতিতান্ত্রিক গত মুহুরের ফলে একটি অর্থগত ভাঙ হয়ে পড়েছে। Hitler আবার জাতিতান্ত্রিক আশ্রয়প্রার্থী করতে ব্রতী হয়েছেন। ফ্রান্স তার পায় থে, Hitler যে উপায়ে জাতিতান্ত্রিক আবার আশ্রয়প্রার্থী করতে চান, তা' ফ্রান্সের আশ্চর্য্যের অস্বরায়। ইংলও তার পায় থে, সে দেশের সামন্ততান্ত্রিক যুরোপের জাতিভেদ জাতিভেদে যে আশোষবীমালাসার প্রস্তাব করেছেন, Hitler তাঁদের সে চেষ্টা বাধা করবেন। Roosevelt যেমন economic war বন্ধ করতে চেষ্টা করছেন, Hitler আবার নূতন political war বাধাবার চেষ্টা করছেন। পৃথিবীতে economic শান্তি অথবা political দুই, বাই বটুক, তাঁর মূল্য ও মূল্য আদর। ভারতবাসীরাও ভ্রমশ করব। অথচ এই শান্তি স্থাপন অথবা বৃহৎসংঘটনের উপর আমাদের কোনই হাত নেই। আমরা মনেপ্রাণে সম্পূর্ণ পরবশ। সুতরাং বিশেষের এই সব বড় বড় কথা হ'লিন যাবে আমাদের ঘরের কথা হয়ে উঠবে। এই কারণেই পূর্বে বলেছি যে, এ-মুহুরে বাইরের কথা আমাদের ঘরের কথা হ'য়ে উঠছে। ভবিষ্যৎ চিরকালই মানুষের আশা ও ভয়ের দেশ। গত শতাব্দীতে ভবিষ্যৎ প্রধানতঃ আশার দেশ ছিল; বর্তমানে তা' হয়ে উঠছে প্রধানতঃ ভয়ের দেশ। এর কারণ, গত শতাব্দী ছিল যুদ্ধাভি: পৃথিবীর আর্থিক প্রগতির মূল; আর বর্তমানে হয়েছে শান্তিভঙ্গ আর্থিক প্রগতির মূল। কিন্তু এই আর্থিক প্রগতিক প্রগতিভিত্তি পরিণত করা সম্বন্ধে আমাদের হাত কন, বাইরের হাত বেশি।

(৫)

এখন ঘরের কথায় ফিরে আসা দাখ। ভারতবর্ষে সম্মতি সর্বপ্রধান ঘটনা হচ্ছে বহাঙ্গা গাভীর অনশন ব্রত। এ-ব্যাপারে দেশবহু লোক যে কতদূর চমৎকৃত,

উদ্বেষিত এবং উদ্বেষিত হয়ে উঠেছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। বহুলাংশ মনে করেন যে, মহাশয় পাকীর কার্যকলাপের উপর বেশের তাগা অনেকটা নির্ভর করছে। এই কারণে, সেনের লোকের কাছে তাঁর জীবন সঙ্গীলেক্ষ্য বহুলা। এই বহুলা জীবন তিনি হেলাত বিসর্জন করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন,—এতে যে সেনের লোক দুঃপণ্ড তাঁর ও বিন্দিত হবে, তাতে আর আশঙ্কা কি? তবে মনে হয় যে, মহাশয় পাকী কোন জীবন রোগে আক্রান্ত হলে, তাঁর পরিণামের ক্ষত বেশের লোক এতটা উল্লাস হয়ে উঠত না। মহাশয় যা' বরণ করেছিলেন, সে হচ্ছে যেকাদুত্ব, এবং তাঁর উদ্দেশ্য অতি মহৎ। তাঁর এ-প্রায়োগবোধনরূপ কঠোর সঙ্কল্পের মূলে ছিল 'হরিজন'দের অশুভ্রতা হিন্দুসমাজ থেকে দূর করার একান্ত আকাঙ্ক্ষা। হিন্দুসমাজের অশুভ্রতারূপ গাণের তিনি প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। বোধহয় তাঁর আশা ছিল যে, তাঁর প্রায়শ্চিত্তের ফলে হিন্দুসমাজ এ-পাশ হতে মুক্ত হবে। তিনি যে প্রায়শ্চিত্তের জীবন অধি-পরীক্ষা অক্ষত পরীয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন, এতে সেনের লোক হাঁক ছেড়ে বেঁচেছে। এ-অনশনরত গালন ক'রে তিনি আবার প্রমাণ করেছেন যে, তিনি সেহে ও মনে একজন অসাধারণ পুরুষ। বারা মহাশয়ের শিষ্যও নয়, অহুরন্ত তরুণও নয়, তার্যও স্বীকার করতে বাধ্য যে, তাদের তুলনার তিনি একজন superman। Supermanমাইই সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। মহাশয়ের জনৈক সহচর ও অহুরন্ত বলেছেন যে, তিনি একজন mystery-man; একথা সত্য। কারণ আমরা সেই ব্যাপারকে mystery বলি, যার কার্য-কারণ আমরা আমাদের সহজ মন দ্বিগ্রে স্পষ্ট বুঝতে পারিনে, অথচ যার শক্তিও আমরা অস্বীকার করতে পারিনে।

(৭)

এখন মহাশয়ের অহুরন্ত ত্রুতের ফল কি হবে, তা' অহুমান করতে চেষ্টা করা বাহু।

প্রথমতঃ, মহাশয়ের তাক্তারবহুদের মতে তিনি এই প্রমাণ করেছেন যে, তাঁর মন তাঁর সেতের উপরে ক্ষরণাত করেছে। মাহুদের মন তাঁর সেহ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, এবং মনের শক্তি যে সেহকে অনেক পরিমাণে নিগ্রহিত করে, এ-সত্য বর্তমান বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু মহাশয় এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রমাণ করার ক্ষত অনশনরত প্রণ করেনি। যে উদ্বেষে তিনি এই জীবন ত্রত অবলম্বন করেছিলেন, সে উদ্বেষে তাঁর প্রায়োগবোধনের ফলে কতটা নিছ হবে, তাই হচ্ছে আসল বিচার্য।

মহাশয়ের এই প্রায়শ্চিত্তের ফলে হিন্দুসমাজও যে অহু-প্রায়শ্চিত্ত করবে, এজন্য আশা করা অসম্ভব; এবং হরিজন-সমতা যে তাঁর চূড়াত সমাধানের পথে বেশি দূর এগোবে, এমনও মনে হয়না। মহাশয় পাকী আশ ১৩১৪ বৎসর পূর্বে অশুভ্রতাবর্জনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু এই এক হুণের আশ্বোসনের ফলে হরিজনরা কি হিন্দুসমাজের স্বত্বহৃত হয়েছে!—একন এই বাঙালার কথা। এ-অক্ষলে অশুভ্রতার কোন ব্যাড়াবাড়ি নেই। এর প্রথম কারণ, বাঙালোনে অধিকাংশ নিগ্রহেষ্টির লোক অশুভ্র বলে গণ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ, বাঙালার উগ্রপ্রেষ্টীর অধিকাংশ লোক ইংরাবীশিকিত। ফলে, তাঁরা মাহুকে স্পর্শ করা অমর্শ বলে বিবেচনা করেন না। অথচ আমরা জাতিভেদের গতির ভিতর বাস করি বলে, সে গতি লক্ষ্য করতে প্রমত্ত নই। মনে আমরা অধিকাংশ লোক অশুভ্রতা মানিনে, কিন্তু আমাদের হালচাল ব্যবহার পূর্কের মতই রয়ে সেহে, বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি। কেবলমাত্র বর্তমান হুণ যে-যে হলে জীবনযাত্রার ক্ষত আমরা থেকেলে বন্ধন চিলে দিতে বাধ্য হয়েছি, সেই সব হলে আমরা ব্যক্তিগতভাবে সুবিধার খাতিরে কতকটা মুক্তিলাভ করেছি—গামাধিকভাবে নয়। আমাদের জীবনে ও মনে যে মিল নেই, একথা ত সঙ্গজনবিধিত।

(৮)

আমল কথা এই যে, হিন্দুসমাজে জাতিভেদ প্রথা রক্ষা করে হিন্দুসামর্থ্য সর্বল শোকে একজাতিতে পরিণত করা অসম্ভব। কারণ, জাতিভেদ-প্রথা অর্থই হচ্ছে উচ্চনীচের প্রভেদ। মাহুসমাজকেই মাহুস হিসেবে গণ্য করা সামাজিক হিন্দু পক্ষে সম্ভব নয়। আর আমাদের এই হুসনিক্ত সংসার ও অভ্যাস একদিনে দূর করা সম্ভব নয়। হিন্দুসমাজ এক নয়,—অসংখ্য ভাষাভেদে সমৃদ্ধ। এই ভাষাভেদগতিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করা আমাদের পক্ষে পোশটিকার হিসেবে নিত্যক কাম্য হবে উঠেছে; তাই আমাদের পোশটিকাল নেতারা পুণা-প্যাট প্রভৃতির দ্বারা সে পোশটিকাল বোধসাধন করবার চেষ্টা করছেন। বলা বাহুল্য, এ-বোধ সামাজিক বোধ নয়। ইলেকশনের ক্ষেত্রে সমাজগঠন করা যাবনা। এই উচ্চনীচের অসম্ভব প্রভেদ হিন্দুসমাজের গুণ পাণ নয়, তার দুর্দলতারও মূল। বর্তমান এই ভেদবুদ্ধিকে আমরা আঁকড়ে ধরে থাকব, ভর্তসিন আমরা জাতক জাত দুর্দল থেকে ক্রমে দুর্দলভর হব। যে সমাজ আজ দু'হাজার বৎসর ধরে গড়ে উঠেছে, তার হঠাৎ-পরিবর্তন কি করে সম্ভব হতে পারে, তা' বুঝতে পারিনি। অথচ এ পরিবর্তন করা যে নিত্যক প্রয়োজন, সে বিচার সম্মত নেই। এ-অবস্থার মেনে গুরুত্বপূর্ণ মহাত্মা গান্ধীর মতের সঙ্গে মনে মনে সার দেবেন; কিন্তু জীবনে তাঁর মতের অস্থায়ী হবেন না, বা হতে পারবেন না। মহাত্মা গান্ধীর প্রারোপবেশনের বিষয় দেশে দেশের লেখাপড়া ও বলা-কওয়া হচ্ছে; কিন্তু কি উপায়ে যে তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করা যায়, সে বিষয় বড় কিছু আলোচনা শোনা যায় না। বরং মহাত্মা গান্ধী পোশটিকাল ক্ষেত্রে

শক্তিশূন্য করবেন, কি অশক্তির পুষ্টি করবেন, এই নিয়ে পোশটিকাল দল ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

(৯)

হরিজন উদ্ধারের অন্তরায় সনাতনপন্থীর দল নয়। কারণ এ-দল স্বলসংখ্যক, উপরন্তু এ-দলের বা' প্রধান শক্তি—দীক্ষালব্ধ জ্ঞান ও বুদ্ধি—সে শক্তিতে তারা বঞ্চিত। হুতরা শিক্ষিত সম্ভ্রমের বনি আমাদের সামাজিক গঠনের পরিবর্তন সাধনে বার্থ্য ত্রুটি হন, তাহলে সনাতনপন্থীদের দল বাধা তারা অন্যরাসে অভিক্ষেপ করতে পারেন। ইংরাজী শিক্ষার ফলে আমরা বহু নতুন আইডিয়াল লাভ করেছি। কিন্তু সেগুলিকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করবার সাহস ও চরিত্রবল অর্জন করিনি। অনেক সময় মনে হয় যে, শিক্ষিত লোকের এসব আইডিয়ালের সার্থকতা আছে একমাত্র বক্তৃতার ক্ষেত্রে—কর্ণক্ষেত্রে নয়। একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায় যে, সনাতনপন্থীরা কে-সব কথা খুঁচুটে বলছেন, কে-সব কথা অনেকটা আমাদের শিক্ষিত দলেরই গোপন মনের কথা। কথার মনের যে অংশটুকু প্রকাশ পায়, সেইখানেই আমাদের ও সনাতনপন্থীদের মনের অনৈক্য আছে। কিন্তু যে মন জীবনের রূপ দান করে, সে মনে বাদবাকি লোকের সঙ্গে শিক্ষিত লোকের মনের বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। কোন সামাজিক প্রথা উপর আমরা হস্তক্ষেপ করতে ভয় পাই, কারণ আমরা আশঙ্কা করি উক্ত পরিবর্তনের ফলে সমাজ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে। এবং কোন নতুন সমাজ গড়বার শক্তি যে আমাদের আছে, সে বিচার আমাদের কোন ভরসা নেই। হরিজনদের উদ্ধার করবার পূর্বে আমাদের নিম্নের মনকে এই সামাজিক অভ্যাস থেকে উদ্ধার করতে হবে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

উদ্বোধন — আদি, ১৭৪০



Andersson



সমস্ত সংস্কার কার্যে 'সেব'।
সমস্ত 'সেব' কার্যে। সমস্ত

সিউর- 'সেব' সমস্ত

সেব- সমস্ত 'সেব' ২২ ৩৩

সমস্ত- সমস্ত 'সেব' সমস্ত

সমস্ত সমস্ত সমস্ত

২২(সে-সমস্ত), ১৯৪০



অর্পিত্বারে

শ্রীকালিদাস রায়

অট আনালাব কাছ	যেটি বসিমা আছে	সে পথে ভুলে না বাতি	অশেষ
পালে রাখি চাতখানি তার,		অশেষ নাক চক্কু তারা রাখি,	
চক্কুদার মুখখানি,	দাঁপ পাণ্ডু ছুটি পানি,	মিলিয়ে না কারো দেখা,	যেতে হবে তার এক',
শিরে কেশ করে ছাড়াকার।		এখানে পড়িয়া ববে সবি।	
অগাধ কাকপো তারা,	যেন স্বাচ দিয়ে পড়া	ধাক্কনি কখনও হয়	এক'ক' এ ডনিগাছ,
বড় বড় চোখ ছুটি মেলি		ম'রা প্রাণ ডাট কাপে চবে,	
অনিবেশে চেয়ে চেয়ে	কি দেখিছে অই মেয়ে?	সবাই থাকিতে তার	কেউ হবে নাক আর,
দেখিছে কি ভরষের কেলি?		সাদী চ'তে দুই দিন পরে।	
ও যে চেয়ে আছে তার	দিগন্তের নীলিমায়	অর্ধেক বকন ফুলে	এসেছে দিহুর কলে
অজানা সে অনন্তের পানে,		পিছে গানে অর্ধেক বকন,	
প্রতিটি ভরষ-মোড়ে	অদূর দিগন্ত ত'তে	ভকানো মৃণাল পবে	ফুলে পড়ে বায়তবে
অনন্তের আনন্দের আনে।		হেমন্তের পতনের মতন।	
হহ ক'রে আসে বায়ু	নীলসম কাপে আবু,	ধরতীর কোল ভেঙে	যেতে ভগ্নাতুর সে যে,
ঘনায় আসিছে আঁধার,		তুণ্ডেতে তবে মনে জানি	
চিড়াধুমের ধলে	বেতে হবে অই পথে,	পুঁজিছে দিগন্ত-লোকে	নিঃসৃত আগত চোখে
অই পথ অকূল অপার।		শেষ গুটি আগন্তকের পাণি।	

মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন

আচার্য্য প্রকৃষ্ণচন্দ্র রায়

২

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে যখন লর্ড ওয়েলেসলি কোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন, তখন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, বিণাড-আম্বধানী সিভিলিয়ানরা বাঙ্গলা, উর্দু, পার্শী প্রভৃতি দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিবেন, বাহাতে তাহী শাসনকর্তারা ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ, লেক্টেন্যান্ট-গভর্নর প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত হইয়া সাধারণের সহিত ভাবের আদান-প্রদান ও যোগাযোগ করিতে পারেন। এখানে ইংলিশেই যথেষ্ট হইবে যে, কোর্ট উইলিয়াম কলেজে উইলিয়াম কেরীই প্রথম বাঙ্গলা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহারই উৎসাহে ও সাহচর্য্যে রামরাম বসু, মুতাজ্জ বিজ্ঞানভার, রাবীন্দ্রচন্দ্র প্রভৃতি বাঙ্গলা ভাষার নানাগ্রন্থ রচনা করেন। ঐশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও (১৮৪১ সালে) কোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন; আবার ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর হইতে উইলিয়াম কেরী প্রবৃথ মিশনারীগণ কর্তৃক “সমাচার দর্পণ” প্রকাশিত হইতে লাগিল, অপর দিকে রামমোহন রায় “সমাচার কোমলী” এবং শৌভলিকতা নিবারণ ও সহায়ণ প্রথা দমনের জন্য বাঙ্গলা ভাষার বহুবিধ পুস্তিকা রচনা করেন। এই সকল মহাপুরুষ তত্ত্বিগ্ন দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন যে, মাতৃভাষা ব্যতিরেকে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিভার অসম্ভব। ইহার পরে যখন হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য আমাদের পূর্ণপুরুষগণ পাদল হইয়া উঠিলেন। ইহা স্বাভাবিক। এতদিন আমাদের দেশ নানাবিধ অন্ধবিদ্যা ও কুসংসারে আবদ্ধ ছিল; কাজেই পান্ডিত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্যের চর্চা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। মহাত্মা রামমোহন রায় ১৮২৩ সালে সংস্কৃতকলেজ স্থাপনের বিরুদ্ধে গভর্নর-জেনারেল আমহার্ডের নিকট যে পত্র লিখেন, তাহা হইতে

তখনকার দেশের উদার-প্রকৃতি লোকদিগের মনোভাব বেশ বুঝিতে পারা যায়।

বাগবিকই ইংরাজী ভাষা শিক্ষা লব্ধে বিমত থাকিতে পারে না। কিন্তু আনুবেদিক আবার বিশদ ভাষিয়া আন। হইল। ইংরাজী শিক্ষার জন্য যে কি প্রকার প্রবল আকাঙ্ক্ষা আগ্রহ হইয়াছিল, তাহা বোখিচন্দ্র বসু রচিত “মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত” এবং সিধনাথ শাস্ত্রী রচিত “রামচন্দ্র লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ” পাঠ করিলে সর্বিশেষ অবগত হওয়া যায়।

কিন্তু এই ইংরাজী ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার অনাদর হইতে লাগিল এবং মাতৃভাষা অবলম্বন করিয়া যে শিক্ষাবিভার হইতে পারে, সে বিষয়ে সকলে উদাসীন হইতে লাগিলেন।

ধাহারা ইংরাজীতে রুচিবদ্ধ হইলেন, তাহারা নান। বিভাগে উচ্চ উচ্চ পদে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। কাজেই মাতৃভাষার সাহায্যে বিভাগিক। ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল এবং ইহার ফলে ছাত্রবৃত্তি, মাইনর প্রভৃতি কৃপাগুলি ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে লাগিল।

আম বাঙ্গলা দেশে এই ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের দকন ১২০০ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং প্রায় চল্লিশটা কলেজের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং প্রত্যেক বৎসরে হাজার হাজার যুবক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাগির হইয়া বেকার-সমতাকে আরও অটল করিয়া তুলিতেছে। এখন অনেক এক ব্রাহ্ম ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন যে, এই বেকারসমতার জন্য গভর্নমেন্টই দায়ী; পরাধীনতার ও দাসমনোবৃত্তির ইহা একটী প্রধান লক্ষণ। কথায় বলে, “ঘর ঘোষ, নন্দ ঘোষ”। আমরা নিজেদের পায়ে নিজেয়াই কুঙ্কল মারিতেছি,

এবং সমস্ত বোম্ব বর্তমানেটের খাড়ে চাপাইয়া নিশ্চিতভাবে কাশ্যাপন করিতেছি।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে লর্ড অক্লামণ্ড (Auckland) আনন্দেত পানী ভাবার পরিবর্তে ইংরাজী ভাষা প্রবর্তিত করেন এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের পরীক্ষার্থীরা ছাত্রেরা আনন্দে অধীর হইয়া বর্তর-মেনারেণ হার্ডিং (Hardinge) মহোদয়কে একখানি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অভিনন্দন প্রদান করেন। কিন্তু তখন তাঁহারা একথা ভুলিয়া গেলেন যে, বর্তই ইংরাজী শিক্ষা হোক না কেন সেখের লক্ষ লক্ষ লোকের অজ্ঞতা তাহাতে কখনও দূর হইতে পারে না। তাই আর বাঙ্গলা যেনে এখনও শতকরা ৯০।২৫ জন অজ্ঞানাকারে আচ্ছন্ন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, অতি উচ্চাঙ্গের শিক্ষা লাভ করিতে হইলে, ইংরাজী কেন দ্বার্য্যন, ফ্রেন্স প্রভৃতি ভাষাও শিক্ষা করা প্রয়োজন। কিন্তু সকলকেই যে ইংরাজী শিক্ষা করিতে হইবে, ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে বলিয়াছিলেন যে, এক কল্যাণ হইত যাহা একজন ইংরাজ লোক বা ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন; এই কারণে আনন্দেত সমস্ত কার্যকর্ম ইংরাজীতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এখন আবার অনেক কল্যাণ আসে ইংরাজ লোক বা ম্যাজিষ্ট্রেট নাই, কিন্তু সমস্ত proceedings ইংরাজীতে হওয়া চাই। এই প্রসঙ্গে একটা হাতকর ঘটনার উল্লেখ করিতেছি; যাহা বৎসর হইল আমি হাইকোর্টে একটা দায়রা বোকক্ষম্য জুরীতে বসি এবং কোরম্যান (Foreman) নিযুক্ত হই। যখন বিচার শেষ, বিচারপতি আমার তৃত্বপূর্ণ হইল, কিন্তু যে প্রেসন অভিনীত হইল তাহার কথাই বলিতেছি। Standing Counsel বাঙ্গালী এবং অপরাধের ব্যারিষ্টারও বাঙ্গালী। কিন্তু প্রত্যেক দায়ীর বাঙ্গলা ভাষায় জবানবন্দী সে-জারী (Interpreter) কর্তৃক অনুবৃত্ত হইয়া লক্ষ ও জুরীদের নিকটে আসিয়া পৌছাইতে লাগিল। আমাকে কোন কথা লক্ষকে জিজ্ঞাসা করিতে হইলে My lord বলিয়া সন্ধান

করিতে হইল এবং বিচারপতিও দ্বার্য্যনকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইলে আমাকে Mr. Foreman বলিয়া সন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু এই সকল কার্য্য যদি বাঙ্গলা ভাষায় চলিত তাহা হইলে বোম্ব হয় ইহার সিকি সমস্তও লাগিত না।

আর একটা উদাহরণ দিতেছি, যাহাতে আমাদের জ্ঞানমনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা জাতীয়তাবাদী, কিন্তু চণ্ডীদাস, বজ্রমন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির পুস্তকাবলীর সমালোচনা ইংরাজীতে না করিলে সম্মান-হানি হয়; প্রায়ই সেখা যায় যে, পরংমন্ত্রের উপভাস-গুলির দায়ক-দায়িকার সমালোচনা মাতৃভাষায় লিখিতে আমরা লক্ষিত, এমন ইংরাজী সাময়িক পত্রে বিশেষতঃ ভাষায় এই সব চরিত্র বিশ্লেষণ করা হইয়া থাকে।

বজ্রমন্ত্রের সময় হইতে, বিশেষতঃ যেনি হইতে তিনি "বঙ্গবর্নন" প্রকাশ করিলেন, আমাদের মাতৃভাষা একতরফা নবজীবন লাভ করিল। ইহার পূর্বেও মহাশি সেবেশ্রনাথ ঠাকুর "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" এবং ব্রাহ্মসমাজ যিনি "বিবিধার্থসংগ্রহ পত্রিকা" প্রকাশ করিয়া, বিশেষতঃ বিজ্ঞানবিষয়ক নানা তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়া, জনসাধারণের জ্ঞানসুখ জাগ্রত করিয়াছিলেন এবং অগণ্য কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। তারপর রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে মাতৃভাষা যে কি প্রকার সমৃদ্ধিলাভিনী হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করা নিম্নয়োজন।

আম্বকাল বাঙ্গলা ভাষায় সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকাগুলি উল্লেখ্যরূপে কি প্রকার ঐক্য লাভ করিতেছে, তাহা পূর্ব্বেকার প্রবন্ধে যৈনিক 'আনন্দ বাম্বাভের' কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম। আমার সম্মুখে অত্ধকার 'যৈনিক বহুমতী' তহিয়াছে, ইংহাতে প্রায় সময় তারের খবরগুলি আছে। এতদুপরি 'মাসিক বহুমতী'তেও পৃথিবীর নানা দেশের যে সমস্ত সম্মি ধর্ম্মীয়তন প্রবন্ধ থাকে তাহা হইতে মানবিক জ্ঞাতব্য তথ্য লগ্নেয় করা যায়; পত মাসের (মার্চ, ১৯০০)

বহুমতীতে নিউ আসির যে বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতে হুম্বর হুম্বর ১৬০০ আদ্যোক্তিক আছে। প্রথমতঃ পড়িলে যেন হয় বেন সেই বেগুনী নবমর্ণণে দেখিতেছি, এবং অস্ত্রান্ত প্রকারেও অনেক বিবরণ জানিবার থাকে। পুরাতন বংশের বাহান বহুমতীর পাঠা উঠাইয়া দেখিলে নবা তুর্কী, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশের সচিব বিবরণ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য মসিক 'প্রবাসী' ও 'ভারতবর্ষ' এই বক্স উদ্বারের। এতদ্ব্যতীত বাহলা ভাবার নবা জাপান, চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ সঙ্কে অনেক পুস্তক বাহির হইয়াছে। সুতরাং একথা বোটেই বাটে না যে, বাহলা ভাবার সাহায্যে বিভাগিকা আসিও হয় না। ইউরোপীয় সমাজে বলে যে, he is an well-informed man অর্থাৎ লোকটার বেশ পড়াশুনা আছে এবং খোঁজ-খবর তাৎপে। ইহাই প্রকৃত শিক্ষার পরিচয়। আমার মতবা এই যে, যদি যাকুজাখা শিক্ষার বাহন করিয়া বিভাগিকা আরম্ভ হয়, তাহা হইলে ১২১৪ বৎসরের মধ্যেই সবগুলিরই কিছু কিছু আয়ত্ত হয়। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে আমি যখন হেয়ার স্কুলে পড়িতাম, তখন দেখিতাম যে, ছেলেরা মাইনর স্কুল হইতে বৃত্তি লইয়া হেয়ার ও হিন্স স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে আসিয়া ভর্তি হইত; তাহার্য্য জ্যামিতি, ভূগোল, ইতিহাস, পাঠ্যপুস্তক এবং বাহলা সাহিত্য ও মোটামুটি সমস্তই পড়িয়া আসিত। কেবল ইংরাজীতে পঞ্চাশের বলিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তাহাদের আর চারি বৎসর অপেক্ষা করিতে হইত। আমকালও অনেক স্কুলে সেবা যার যে, মাইনর পাশ ছাত্র অনেক বিধে ইংরাজী স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রাপেক্ষা অধিকতর পারদর্শী; আমার এইটুকু বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করা দরকার, কিন্তু ইহা বাহনস্বরূপ ভাষা বিবরণ পড়িতে হইলে আমাদের ছেলেরদের ৪৫ বৎসর, এক পরে দেখাইব যে ৭৮ বৎসর, কৃষা নষ্ট হয়।

বালকসমূহের শিষ্টাচার ও অবিভাবকরণ স্কুল

হাট দিয়া আমাকে বহন ত, তাহাদের পুস্তকপত্রের ইংরাজী শিক্ষার স্কুলে কোন গৃহ অভিজ্ঞি আছে কি না? আমি তাহাদের পক্ষ হইতে বাস্তব করিতেছি যে, তাহারা এই অভিনিহিত আশা পোষণ করিয়া থাকেন যে, তাহাদের প্রত্যেক ছেলেই হাইস্কোলের জন্য হইবে, না হয় মুনসেফি, ডেপুটিমিট্রী ইত্যাদি একটি উচ্চপদ লাভ করিবে, অথবা বড় বড় উকিল, ডাক্তার না হয় ইঞ্জিনিয়ার হইবে। অতএব, গোড়া হইতেই যদি ইংরাজী দেখান না যায়, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বা মিলিবে না, এবং চাকরীর আশাও অস্বস্তি হইবে; কিন্তু তাহারা কুলিয়া যান যে, দশ হাজার গ্রাফুয়েটের মধ্যে একজনের হাইস্কোলের জন্য হইবার সম্ভাবনা, আর ২১০ হাজার গ্রাফুয়েটের মধ্যে একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বা মুনসেফি হন; এবং আমি এই বলিয়া বলিয়া হয়রান হইয়াছি যে, এক আলিমপুরের 'বারে' সহস্রাবিক উকিল, সেখানে পতকরা ৫ জনের হুজুররূপে অঙ্গসংস্থান হয় কি না সন্দেহ, আর ২৫ জন কি হাজার খাইয়া মিনাতিপাত করেন? আমার নিজ বাসভূমি, খুলনা একটি ক্ষুদ্র জেলা। কিন্তু ইহার সদর খুলনা নগরেও ১৫০ জনের উপর উকিল। এই ভীষণ প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও প্রত্যেক মেসার ময়দুমার আদালতসমূহেও নূতন নূতন B. L. ভর্তি হইতেছে। আমি ইহাদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়া থাকি যে, তোমরা জানিয়া গিয়াও এই অর্থনীতিগত আশঙ্কতা করিতেছ কেন?

এই সকল বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, প্রকৃত উচ্চশিক্ষার অর্থাৎ এম-এ, এম-এসসি, সি-এইচডি, ডি-এসসি, বি-এল, এম-এল, ডি-এল এর জন্য বাছা বাছা ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা উচিত। আমার মতে এখন যদি বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যার এক-দশমাংশ উচ্চশিক্ষার পথে ধাবিত হয়, তাহা হইলে বাহলা দেশের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইবে; অথুনা কলিকাতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০,০০০ ছাত্র ভিত্তির মধ্যে হুড, আমি বলি, মাত্র ৩০০০ ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করুক।

আগামী বার হইতে ক্রমশঃ যেখান বাইবে সে, যেখান পূর্বকণ্ঠ জীবন-সংগ্রামে বিক্রম বিধ্বস্ত
ইংরাজী ভাষা শিকার বাহন করিয়া যেখান শিকার- হইতেছে । •
বিভ্রান্তের পথ বিক্রম সংকীর্ণ হইয়াছে এবং ইহার মন্ত • শ্রীবাস্তব সত্যের কবুত অমুদিত

অপ্রেমিক

ত্রিকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি.এ

অপ্রেমিকের পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখছি অনন্ত,
বড়ই কঠিন অশ্রুধারের সাধন-পথ ।
পক্ষ তাঁরে যাত্র কি বেঁটা,
গৃহিণী ঘর পদ্মালতা,
অঙ্গবাসেই অহতিত জ্বর দিগন্ত ।

ওই যে নিখিল পাগল করা অনিষ্ট আশি,
লক্ষ্য শ্রম বসু দেখি মোর কোন্ খানে রাখি ?
আরতি কার করতে যাবে
প্রাণীপ ক্ষেপে চার সেখাঝে,
জকার চোখের চাওনি ল'য়ে বলিয়া থাকি ।

উহার পুঙ্খানুপুঙ্খ উপকরণ বলো কি করবো,
চূর্ণ হ'য়ে যায় যে আমার সকল গর্ভ ।
নিজে যিনি রসের পাখার
মিষ্ট জিনিষ কি দিব আর,
বসতি ঘর স্বীকৃত্যে সাগর অমৃতলভ ।

যদি বহু ভাষা আবার হয় খো প্রসন্ন
কৃন্দাবনের প্রেমের তাজে হয় সেহ খর,
রাখা পাখের পরাণ যদি
প্রেমিক করে পাখাণ ছবি,
এ'সে আহি আমি শুধু তাহারি মন্ত ।

৩

পাত সেবো কাহার পায়ে হয় বড় লজা,
উদ্ধব হার বেধার হ'ল পাবনী লজা ।
সাগরকে এই শিশির দিতে
হয় না সাহস আবার চিত্তে,
কাণা কড়ি কুবেরকে দান বাজারে ডকা !

৩

হয়ত আমার নিগড় ভবন হবে দো ভদ্র,
জীতি আবার হবে নিবিড় গুলকে ময় ।
বেহুতা এই কীদর গলি'
হয়ত হবে তাঁর দুরলী
কোন্ জনমে আসবে আমার সে গুণ লগ ?

ফরাসী জাতির স্বরূপ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

ইংরাজ বাতীত অল্প বিশেষ জাতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় কম, আর যেহেতু পরিচয় আছে তা'ও ইংরাজি সাহিত্যের ভিতর দিয়ে। ব্যবসায়ের মধ্য দিয়ে অনেক জাতির নাম আমাদের ঘরে এসে পৌঁছেছে — কিন্তু তা'তে সে সব জাতির কোন পরিচয়লাভ হয় নি। তাই ফরাসী জাতির সম্বন্ধে সাধারণতঃ আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। অথচ এ জাতি বর্তমান জগতের ইতিহাসে কত পরিবর্তনই না এনেছে। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ও আর্টের নানা দিক দিয়ে বর্তমান যুগের প্রধান বস্তুগুলি এই জাতির হাতেই হয়েছে।

ফরাসীর মত এত খোলা অথচ এত চাপা জাতি বিরল। প্রথম আলোপে মনে হয় যে, এ জাতির চরিত্র সংকোচবোধ, কিন্তু পরমুহূর্তেই তা'র চরিত্র প্রকোপ হ'য়ে পড়ে; অর্থাৎ নিজের জাতি ও সমাজকে ব্যাচিরে রাখবার জন্য ঘরের ও বাইরের মধ্যে যতটা ব্যবধান রাখা উচিত, তা' তা'রা জানে ও রাখে। সেই জন্যই বাইরে থেকে ফরাসী জাতিকে অনেকটা অদ্ভুত মনে হয় — মনে হয় যেন তাদের চরিত্রে পরস্পরবিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ হয়েছে। অথচ প্রকৃত হিসাবে তা' নয়। নিজেকে চরিত্রে নানা বিসম্বল গুণের সামঞ্জস্যবিধান তা'রা করতে পেরেছে।

ইতিহাসের দিকে তাকালেও সেই একই কথা মনে হয়। সেই ইতিহাসের ধারা উজ্জ্বল কিন্তু অপ্রতিষ্ঠ। তাই বেথা যায় কখনও ফরাসী জাতি উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছে — কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই নীচে নেমে এসেছে। অল্প কোন জাতির ইতিহাসে অল্পকালের মধ্যে এত পরিবর্তন ঘটে নি। নানা কড় এ জাতির গুণ দিয়ে বয়ে গেছে — অল্প-বিপ্লব, বাইরের আক্রমণ, ও অভ্যন্তর জাতির ধীরে

বে সমস্ত বিপদ ঘটে, তা' সবই ফরাসী জাতির ভাগ্যে ঘটেছে। কিন্তু সে কড় শেষ হ'বার পরমুহূর্তেই যে আবার ফরাসী জাতি গা' তাক্সা দিয়ে উঠেছে, তা' তা'র ইতিহাসের আলোচনাতেই ধরা পড়ে। তখন আর তা'র চরিত্রে কোন অশক্তির ছায়া লক্ষিত হয় না — একটা অদ্ভুত নিশ্চিন্ত-ভাব ধরা পড়ে। এ ভাব তা'র নিজস্ব।

এই জাতির স্বরূপ নির্ধারণ করবার জন্য সত্যি একজন খ্যাতনামা ফরাসী লেখক কলম ধরেছেন। পল ভালেরি (Paul Valery) নাম স্থপরিচিত, তিনি বহুদিনের লেখক, ফরাসী একাডেমির সভ্য ও প্রজিভ্যান্স। সাহিত্যের নোবেল প্রাইজ বে ঠিকই তাঁর ভাগ্যে ঘটবে — একবার অনেক দিন থেকেই কানাকুনি চলেছে। লেখক হিসাবে তিনি সুবিবেচক, তাঁর লেখার বীতিতে বাকীর বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর ভাষা বিত্ত — শব্দ-বিজ্ঞান অতুলনীয়।

ভালেরি ইউরোপীয় সভ্যতার বিশেষ আত্মবান — গত মহাযুদ্ধের পর যখন অনেকের মনে ইউরোপীয় সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয় ও রোমাঁ বোলাঁ, কাইসারলিং প্রভৃতি লেখকেরা প্যাকাতা সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্য প্রকাশ করেন ও বলতে শুরু করেন যে, প্রাচ্য সভ্যতার সাহায্য ব্যতিরেকে আর ইউরোপের রক্ষা নেই, তখন ভালেরি ছোট্ট হাতে কলম চালিয়েছিলেন ও বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, ইউরোপীয় সভ্যতার সভ্যই কোন আশঙ্কাজনক অবনতি হয় নি। সে সভ্যতার উন্নতির ধারা অপ্রতিষ্ঠই রয়েছে। শুধু কবিক অবসাদের জন্য ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্য এসেছে মাত্র। আর সে অবসাদের প্রধান কারণ হচ্ছে শুধু দার্শনিক ইউরোপীয় মন। বস্তুতঃ, ভালেরি মতে ইউরোপীয় পন্থা পরিত্যাগ ক'রে দাবাইকে

যোগ্যদনে বসবার কোন দরকার নেই। ইউরোপীয় সভ্যতা ঠিকই আছে — ঠিক নেই ইউরোপীয় মন।

ভাসেলির সম্রাতি নিম্নের দেশের সভ্যতার স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন যে, ফরাসী দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, তা'র জলস্রোতা, তা'র কুলকল ও প্রাকৃতিক শক্তিসম্পদই ফরাসী সভ্যতার গঠনে সাহায্য করেছে। *

* * *

ফরাসী চরিত্রে নানা পরম্পরবিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ ঘটে ও তা'র ভিতর যে সমীকরণ দেখতে পাই, তা'র, যৌগ তা'র দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যেই পাই। নানা বিভিন্ন প্রকৃতির এসেশ নিয়ে ফরাসী-দেশ গঠিত। কোথাও ভূমি সমতল, কোথাও উচ্চাবচ, কোন এসেশ পর্বতময়, কোথাও সমুদ্রতীর সমভূমি, আবার কোথাও সমুদ্র পর্বতমালা ও সমুদ্রের একত্র সমাবেশ। ফ্রান্সের ভিতরী সমুদ্রতীর পরম্পর বিভিন্ন প্রণেয়। ফ্রান্সের ভূমিতে ফরাসী জাতির যা কিছু দরকার, সমস্তই উৎপন্ন হয়। কোথাও শস্ত, কোথাও বা আশুর, ভূগর্ভে লৌহ ও কয়লার খনি, গৃহনির্মাণোপযোগী প্রস্তর — সমস্তই ক্ষুদ্র পরিমাণে ফ্রান্সে পাওয়া যায়। অতঃপর বর্তমান যুগে ইউরোপীয় মন যে সমস্ত অভাব বাড়িয়েছে, সে সবের পূরণ হয়ত শুধু তা'র ভূমি দিয়ে হয় না। কিন্তু ভাসেলির মতে সে সব অভাব শত্কার নয়, হুজুরা চিরস্থায়ীও নয়। ফরাসী জাতি তা'র সভ্যকার প্রয়োজনীয় বস্তু সব তা'র দেশের মাটিতেই পায়, তা'র জন্য তা'কে অস্ত্রের সুশাসনশীল হ'লে থাকতে হয় না।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেন ইউরেনিয়া-মহাদেশের দেশ প্রায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমুদ্র ইংলণ্ডকে ও পিরিনিজ পর্বতমালা স্পেনকে এই মহাদেশ থেকে বিছিন্ন ক'রে তা'দের পৃথক অবস্থানে সাহায্য করেছে। কিন্তু ইউরোপীয় থেকে ফ্রান্স সে ভাবে বিছিন্ন নয়। উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে মহাদেশের সঙ্গে ফ্রান্সের সম্পূর্ণ

যোগাযোগ আর অত্যন্ত দিক দিয়ে সমুদ্রপথে দেশান্তর থেকে ফ্রান্সে পৌঁছবার সম্পূর্ণ সুবিধা রয়েছে। তা'র ওপর ফ্রান্সের উর্বরা ভূমি ও সহনীয় জলবায়ু। নানাভাবে বাইরের জাতির চিত্তাকর্ষণ করেছে। তাই ফরাসী জাতির গঠন মালাচন। করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন পথে নানা জাতির লোক এসে এ জাতির গঠনকার্যে নিজস্বের প্রভাব বিস্তার করেছে — তাই এ জাতির চরিত্রে বৈচিত্র্যময়। বহিঃপক্ষের আক্রমণ, অধিকার বিস্তার, যজ্ঞাত প্রবেশ, প্রভৃতির জন্য ফরাসী জাতির গঠন কখনও প্রতিহত হয়েছে, কখনও বা সমৃদ্ধ হয়েছে। এ দেশে উত্তর ও পূর্ব দিক থেকে যুগে যুগে কড়ের হাওড়ার মত মানুষের হাওয়া এসে পৌঁছেছে। আর দক্ষিণ দিক থেকে আর পরিমাণে হ'লেও প্রাচীন-কালে গ্রীক, ল্যাটিন, ফিনিশীয়েরা ও পরবর্তী যুগে মুর ও পারস্যদেশেরা এসে দক্ষিণ ফ্রান্সে তা'দের প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু এই নানা জাতির আপমানে ফরাসী জাতির স্বরূপ বলেছে, এমন কথা মনে করবার কারণ নেই। প্রত্যেকেই যেন উভার মত এসেছে—কিন্তু ফ্রান্সে পৌঁছে সে ফরাসী জাতির ভিতর নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছে — তাই তা'র পুরনো সভ্যতার কোন বৈশিষ্ট্য রাখতে পারে নি।

হুজুরা ফরাসী জাতির গঠনের একটি প্রধান উপকরণ হচ্ছে, ফ্রান্সে নানা জাতির অবস্থান ও তা'দের সমিশ্রণ। ইউরোপের প্রায় সব জাতির মধ্যেই কিছু না কিছু সমিশ্রণ ঘটেছে, কিন্তু ফ্রান্সে সবচেয়ে বেশি। তা'র তা'র বর্ণ ও ভাষার সমৃদ্ধিতেই বলা পড়ে। ফরাসী জাতির গঠনের এইরূপ বিশেষণ ক'রে ভাগেলি বলেছেন যে, এ জাতিকে দেখলে এমন একটা যুদ্ধের কথা মনে হয়, যা'র বহুবীর ‘কদম বঁধা’ হয়েছে — তা'র কদমের গুণ ও স্থান ভেঁদিয়ে হয়েছে নানা একাত্তর রসের একত্র সমাবেশে।

* * *

এই কারণেই সভ্যকার ফরাসী শিক্ষাকেন্দ্রগুলি দেখলে মনে হয় যে, জাতীয় ঐক্যের দিকে

* Les Regards sur le monde actuel: Introduction aux images de la France. (Librairie Stock, Paris, 1931)

নক্ষর রেখেই সেগুলি তৈরি। আর এই একাধ ঐক্যের ধারণা অত্যন্ত বিস্ময়। এর দৃষ্ট কারণ পৃথক্বে সেমে যেথা যায় বে, ফরাসীর জাতীয় জীবনে যে সব বড় ঘটনা ঘটেছে, তা' সাধারণতঃ ছুই প্রকারের— নানা জাতীয় উপাধানের মধ্যে যে একা সমাবধান করা হয়েছে, একদিকে সেই একাক্ষে নষ্ট করবার চেষ্টা, আর অন্যদিকে তার বিপরীত চেষ্টা—সঙ্গে পুনরায় গৃহ একাবদ্ধন। এই ছুই ধরনের ঘটনাবলীর আলোচনা করলে মনে হয় যে, ফ্রান্সে যখনই কোন অন্তর্বিগ্রহ ঘটেছে তখনই দ্বিতীয় প্রকারের চেষ্টা— অর্থাৎ পরস্পরবিরুদ্ধ উপাধানগুলির মধ্যে পুনরায় নামের দৃঢ় পত্তনের চেষ্টাই সর্বদা জড়ী হয়েছে। সেই ক্ষুদ্র ফরাসী জাতির বৈচিত্র্যময় ইতিহাসে কতকগুলি ব্যক্তি (personnes), পরিবার (familles) বা গোষ্ঠির (assemblées) নামই বড় হ'য়ে বেথা দিয়েছে। কারণ এই সব ব্যক্তি, পরিবার বা গোষ্ঠির ভিতর দিয়ে অন্তর্বিগ্রহের সময় পুনরায় জাতীয় একা স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে এবং বস্তুতঃ জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন হয়েছে। তাই Capetians, Jeanne d'Arc, Louis XI, Henri IV, Richelieu, La Convention অথবা Napoleon সবতাই ফরাসী জাতির একাবদ্ধনের প্রতীক।

এই একাবদ্ধনের আর এক প্রতীক মহানগরী (city)—আর সে নগরী হচ্ছে প্যারিস। বহু শতাব্দী হ'য়ে এই মহানগরী ফ্রান্সের ইতিহাসে প্রধান স্থান অধিকার ক'রে আসছে। প্যারিস সর্বত্রোভাবে ফ্রান্সের কেন্দ্র। শিক্ষা, বীক্ষা, বাণিজ্য, রাজনীতি প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই ফরাসী জাতি প্যারিসের মুখশেকী। তাই ফ্রান্সের যে কোন প্রদেশেই বাঙালা যায়, সেখানেই প্যারিস সম্বন্ধে লোকের উচ্চ ধারণার বোঝ পাওয়া যায়। ফ্রান্সে বহু বিখ্যাতলায় আছে—কিন্তু তন্মধ্যে প্যারিস বিখ্যাতলায়ই সর্বশ্রেষ্ঠ। প্যারিস বিখ্যাতলায় বা সোরবোনে (Sorbonne) শিক্ষা বহুব্রী, আর এই সোরবোনের আওতার নানা শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। তাই ফ্রান্সে যারা অধ্যয়ন ও অধ্যাপন্যক জীবনের

ব্রত ক'রে নিয়েছে, তা'দের সবাই প্যারিসে এসেই শিক্ষা সমাপ্ত করে। ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাসের আলোচনা করলেও বুঝতে পারা যায় যে, প্যারিস না থাকলে এ সাহিত্য কখনও গড়ে উঠত না। এ সাহিত্যের আদর্শ প্যারিস থেকেই গড়ে উঠেছে। অজ্ঞাত কলাবিজ্ঞা, চিত্র, সঙ্গীত প্রভৃতি সম্বন্ধে ঐ একই কথা বলা চলে। এক কথায়, সমস্ত ফরাসী-সভ্যতার ইতিহাস প্যারিসের সঙ্গে গুড়গুড়াত ভাগে জড়িত। মৈনখিন জীবনের আদর্শও ফরাসী জাতি প্যারিস থেকে নিয়েছে—সাদা-সজ্জা, আচার-ব্যবহার, ভাষা প্রভৃতির আদর্শের ক্ষুদ্র ও এই মহানগরীর দিকেই ফরাসী জাতি তাকিয়ে রয়েছে। তাই সভ্যতার প্যারিস দেখলে ও বুঝলে ফরাসী জাতি ও তা'দের দেশের অনেকখানি ধরতে পারা যায়। বস্তুতঃ, সর্বত্রোভাবে কেন্দ্রীভূত এই মহানগরী ফরাসী জাতির হাতেই গঠিত। প্যারিস-গঠনের শিল্পনেও ফরাসী জাতির সেই একই চেষ্টা রয়েছে—যা'তে পরস্পর-বিরুদ্ধতাব্য চরিত্রগুলির একীকরণ পড়ব হয়।

* * *

ফরাসী ভাষা আলোচনা করলে ভালেরির মতে ঐ একই জিনিষের বোঝ পাওয়া যায়। বিভিন্ন ও বিভিন্ন উপাধানের সম্মিশ্রণই হচ্ছে ফরাসী ভাষার বিশেষ সৃষ্টির কারণ। অজ্ঞাত—গাটিনীয়, ইতালি, স্পেন, পর্তুগীষ প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে তুলনা করলেই ফরাসী ভাষার অপূর্ণ সৃষ্টি বিশেষভাবে ধরা পড়ে। বিভিন্নভাবে ফরাসী ভাষা বলা হ'লে (Français bien parlé) সে ভাষার তিনটা জিনিষ চোখে পড়ে, যা' অন্য ইউরোপীয় ভাষায় নেই। প্রথমতঃ, ফরাসী ভাষার নাকি-স্বর (sing-song) নাই বললেই চলে—অতি সাধারণ ভাবে এ ভাষা বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ, ফরাসী ভাষায় বাঞ্ছনবর্ণগুলির কর্ণ উচ্চারণগুলি একসম নেই—তাই ইংরাজী t, d, h ফরাসীতে নেই। ফরাসী ভাষায় r এর উচ্চারণ অবিকৃত (neither rolled nor aspirated)। কর্ণ উচ্চারণ বাদ দেবার এই চেষ্টাভেই অনেক কথার রূপ

বহলে গেছে। ফরাসী ভাষার তৃতীয় বিশেষ্য তা'র বহুবর্ষে। এত বিভিন্ন বহুবর্ষ আর কোন ভাষায় নেই। শব্দভবের দিক্ দিয়ে দেখলে ফরাসী ভাষায় ৩০টা স্বর ও ২৮টা দ্ব্যবধার (diphthongs) পাওয়া যায়। ফরাসী ভাষায় ষোড়শের (accent) অভাবের ক্ষত ভাল কবিতা হয় না, একথা অনেকে মনে করেন। কিন্তু ভাস্কেরি বলেন যে, স্বরের বৈচিত্র্য দিয়েই সত্যকার কবি সে অভাব পূরণ করতে পারেন।

নানাতারী জাতির সম্মিশ্রণের ফলই ফরাসী ভাষার এ রূপ ধাড়িয়েছে। ফ্রান্সের নানা প্রদেশে এখনও বিভিন্ন ভাষা বলা হয়—ভূটানীতে বুটন, পিরিনিয় সীমান্তে বাস্ক্ (Basque), দক্ষিণে প্রভান্স (Provençal) পূর্বে ও উত্তরে কার্মানিক। এ ছাড়া নানা স্থানে স্থানীয় ফরাসীও (jarois) চলতি আছে। এ সমস্ত বিভিন্ন ভাষার প্রভাবে ফরাসী ভাষার উচ্চারণ ও শব্দসম্ভার জন্মঃ সৃষ্টিলাভ করে তা'র বর্তমান রূপ নিয়েছে। এর পিছনেও ফরাসী জাতির সেই একীকরণের চেষ্টা রয়েছে। তাই কোন প্রাদেশিক ভাষাতে সাহিত্য সৃষ্টি না হ'য়ে বিতণ্ড বা পারিসের ভাষাতেই সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। ফরাসী দেশের হ'লন বড় ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক শাতোব্রিঁ (Chateaubriand) ও রনঁ (Ernest Renan) উভয়েই ছিলেন বুটন—তা'দের মাতৃভাষাও ছিল বুটন। কিন্তু তা'দের রচনা ফরাসী ভাষায় অমর হ'য়ে রয়েছে। মিস্ত্রাল (Fredric Mistral) ছিলেন দক্ষিণ ফ্রান্সের কবি, তিনি স্থানীয় Provençal ভাষায় কবিতা রচনার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তা' ফলবতী হয় নি। অথচ একই প্রদেশের শেবক দোয়ে (Daudet) ফরাসী সাহিত্যে দরপদ হয়েছেন, কারণ তিনি বিতণ্ড ফরাসীতেই লিখতেন।

ফরাসী ভাষার আর দু'টা বিশেষ দৃষ্টান্ত, একটা হচ্ছে শব্দের সঠিক প্রয়োগ, দ্বিতীয়টা হচ্ছে রচনার বহুতা। ফরাসীতে ভাসা-ভাসা কথা বা রচনা সম্ভব নয়, তাই ফরাসী ভাষা বহুবিন ব'য়ে ইউরোপের সাধারণ ভাষার (lingua franca) ছিল, ও আন্তর্জাতিক

ব্যবহার এই ভাষাতেই হ'ত। এর প্রধান কারণ হচ্ছে ফরাসী ভাষার clarity ও precision। আরও অন্য কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যায় যে, নানা বিভিন্ন জাতির সম্মিশ্রণে পঠিত একটা জাতির অভাব পূরণ করতে দিয়েই ভাষার এ বহুতা ও সুদৃ প্রয়োগ এসেছে; অর্থাৎ ফরাসী ভাষা যে ইউরোপের আন্তর্জাতিক ব্যবহারের উপযোগী তা'র কারণ যে তা'কে প্রথমেই ফরাসী দেশের তেজেরেই আন্তর্জাতিক ব্যবহারের উপযোগী হ'তে হয়েছে।

সংক্ষেপ ক'রে বলতে গেলে ফরাসী জাতির যে বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই তা' যাতে চাপিয়ে দেওয়া বৈশিষ্ট্য নয়, সে বৈশিষ্ট্যের দ্বারা তার দেশ, দেশের মূল-হাওয়া, মূল, মূল ও গাছ, পশালভার ও তা'র বিভিন্ন জাতি-সংশ্লিষ্ট মনোবৈ পরিণত হয়। এ বৈশিষ্ট্যের পিছনে রয়েছে বহু শতাব্দীব্যাপী পরিবর্তন, পরিবর্তন ও বিবর্তন। তাই দেশের মাটির ফল ফরাসী জাতির এত মায়া, patrie বা মাতৃভূমির ক্ষত তা'র এত আকর্ষণ ও পারিসের ক্ষত এত টান। বর্তমান ইউরোপে রাজনৈতিক বিবেচনাতঃ নানা পতি টানা হ'লেও ফ্রান্সের দিকে ইউরোপীয় মনের একটা দৃঢ় আকর্ষণ রয়েছে, একথা স্বীকার করতেই হবে। পূর্বে ইউরোপের নানা দেশে ফরাসী ভাষা, সাহিত্য ও জীবনের ক্ষেত্র পরিচর—শিক্ষার প্রধান অঙ্গ ছিল। যুগে স্বীকার না করলেও কার্যতঃ ফরাসী ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতার সে প্রভাব এখনও অটুট রয়েছে। আর বন্দুকের নানা সময়ে যে ইউরোপের নানা স্থান থেকে পর্যটক ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশে ছুটে আসে, তা'র কারণ তলিয়ে দেখলে বোকা যায় যে, তা' শুধু আনন্দ-প্রমোদের ক্ষত নয়, ফ্রান্সের মনোহাওয়া, মূল, মূল প্রভৃতির একটা অটুত মোহিনী শক্তি আছে, আর সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপভোগে যা'তে মানুষের কোন ব্যাঘাত না ঘটে তা'র ক্ষত ফরাসী জাতি তা'র গৃহকেও তিতাকর্ষক করেছে—তাই French Dishes, অথবা French Drinks এখনও সর্বত্রই আদর পেয়ে আসছে।

স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত রচনা

ভূমিকা

[১২১৬ সালের ১লা বৈশাখ (১৮৭১ খৃঃ) উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে নামে একখানি পুস্তক 'মুখোপাধ্যায়ের' হাতে প্রকাশিত হয়। ভূদেববাবুর কোন প্রাথমিক তাঁহার বিকট গনিয়া এবং তাঁহারই কাণ্ডে বসিয়া এই পুস্তক রচনা করেন। কাটকট করিতে করিতে রচনা একপ্রকার তাঁহারই হাঁড়াইয়া যায়। শেষ অধ্যায়টি সম্পূর্ণরূপেই ভূদেববাবুর নিজের লেখা। উহাতে ভূদেববাবুর কবিত্বশক্তি স্পষ্ট ঐতিহাসিক দৃষ্টি এবং যৌগিকমনস্কতা পরিব্যক্তি প্রকটকৃত। ঐতিহাসিক শক্তিতে বাহ্যে বটে মহাশয়। তাহা পূর্বে হঠাৎই দেখিতে পাব এক সেটিকে লোকের মনে কিয়টটা রাখেন। ভূদেববাবুকে 'বৈদ্য বনেই ভূদেব প্রবর্তক' বলিয়া বিবেচনা করা সকলেরই স্বীকার করিয়া থাকেন।—ভূদেব-চরিত্র, প্রথম খণ্ড ৪০৫ পৃঃ।]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নামক একখানি ছদ্ম বাস্তব পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা অনেকদিন হইতে ভাবিয়াছিলাম, সত্য সত্যই কি ভদ্রবান্ ব্যাসদেব এখন পর্য্যন্ত পুত্রাণ রচনা করিতেছেন? কখন মনে করিতাম, না, এমন হইবে না, ভদ্রবান্ আর এই কলিযুগে দেখেনা ধারণ করিবেন না; আর যদিই করেন তথাপি কখনই বাস্তব। তাহার লিখিবেন না। আবার এ'ও মনে করিতাম, ব্যাসদেব তো চারি যুগ অমর, তিনি তো এখন জীবিত আছেন; আর যদি জীবিতই থাকেন, তবে চিত্তান্ত পুত্রাণরচনা কেন করিয়াই বা একবারে পরিত্যাগ করিবেন? অবশ্যই লিখিতেছেন।—যদি লিখেনই তবে এখনকার লোকে যে ভাষা বুঝিতে পারে তাহা ভিন্ন অন্য ভাষায় লিখিবেনই বা কেন?

* এতদূর অনেকই জানেন না, আজ বেশ ব্যঙ্গাত্মকতার যে হাজতা বহির্ভূত। যে পত্রা পুত্রীত হইয়াছে, তাহার সমুদায়ই ভদ্রবান্ পূর্বে বর্তমান মহাশয় ভদ্রবান্‌কর্তৃক পূর্বাবধি এই বাস্তবায়নেরই এক বর্ণনাপ্রাণ মহাশয় সম্বন্ধিত হইয়া-পাঠ করিয়াছিল। বাস্তবী হইলে ইনি ভূদেব বাবুই প্রদীপিত পত্র লইয়াছেন বলিলে অস্বাভাবিক হয় হইত না। অশ্রুত-বর্ণনোক্ত, যখন ভদ্রবান্‌কে ইচ্ছাসে, পুণ্ড্রাঙ্গি এখন ভাস, লিখি এবং ভিত্তি তার, সামাজিক এবং আর্থিক পরিসর এই ভদ্রবান্‌কে সত্যসত্য নির্ণয় করিতে যে তেহই পারিবেন। এমন কি পুণ্ড্রাঙ্গিতে মহাশয়ই-মহাশয় সামাজিক কায় করিবেন। "কুর্বাণী" তাঁহার অধরে দূর ভবিষ্যৎ হাজাপাঠ

মধ্যে মধ্যে এইরূপ চিত্তা করি, হঠাৎ গনিলাম আশাদেশের প্রতিবেশী ভদ্রবান্‌পণ্ডিত ঠাকুরের পরলোক হইয়াছে এবং তাঁহার পুত্র (ইনি ইংরেজীতে কৃতবিদ্যা) আপন পিতার রচিত বাবতীর পুঁথিপত্র বিক্রয় অন্যত্র বিবেচনার পক্ষাঙ্গে নিষ্কণ করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন।

আমরা দ্বীর্ঘ ভ্রাম্য-পণ্ডিত ঠাকুরকে সর্বাত্মক-করণে ভক্তি করিতাম। ভদ্রবান্ তাঁহার পুঁথিপত্র-গুলি পক্ষাঙ্গে বিসর্জিত হইতে চলিল গনিয়া হস্তে হইলাম এবং পুস্তকভারবাহী ভদ্রাদিদের সম্ভাব্যাহারে পক্ষাট্টে মগ্ন করিলাম। ভদ্রবান্ প্রভুর আদেশ পালন পূর্বক দূর জলে দিয়া পুঁথিপত্র সমুদায় নিষ্কণ করিল। অনন্তর তাহার। চলিয়া গেলে ভূদেব দিয়া আমরা সেই হানে অহলজ্ঞান করিতে লাগিলাম। কিন্তু ভদ্রবান্‌কে কথা কি বলিব, একখানিও পুঁথি হস্তগত করিতে পারিলাম না। ভদ্রবান্‌র প্রথর শ্রোতে সমুদায় ভাসিয়া গিয়াছে।

বিতার হস্তপণ্ডিত হইয়া প্রত্যাগমন করি, এমন সময়ে একখানি বাতা হাতে ঢেকিল। তাহাই বহুপূর্বক আনিলাম এবং কাগজগুলি রৌদ্রতাপে শুকাইয়া লইলাম। অনন্তর পড়িয়া দেখি পুস্তকখানি আতাপাত বাস্তব। তাহার রচিত এবং লিপি-প্রাণীও একপ্রকার প্রচলিত রূপ।

পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনিলাম যে, ইহা উনবিংশ শতাব্দীর অন্তর্গত তীর্থবর্ষ নামক। ইহারও বস্তা ব্যাসদেবপুত্রীত, চিত্তাঙ্গী, শ্রোতা ভদ্রবান্‌র অথবা অন্য বদ।

কি না? পুণ্ড্রাঙ্গির ভদ্রবান্‌র আজ পাঠকের বিকট সত্য এবং সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। তার পুণ্ড্রাঙ্গির শেষ নির্দেশ-ইহুই কি এসেদের তাপাবিত্যে অশ্রু রাখিবেন?

কলকথা, সত্যম্বে সমস্তসমস্ত একখানি যে তাহা সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এই যুগে তাহাও-সমস্তসমস্তের প্রতিভা সেই কার্যের তার সর্বাঙ্গ হইয়াছে। ইহাবিশেষই যেন পূর্ব-পিতৃবর্ষের স্মরণ্যের স্মৃতি হইবে।—পুণ্ড্রাঙ্গি, ২৭ তাল।

পুস্তকখানি যে স্বাক্ষর-পণ্ডিত ঠাকুরের রচিত নয়, তদবান্বেষণেই বিবর্তিত এবং দৈবাহুগ্রহে আমাদের হস্তগত, তথ্যের বিশ্বাসে সন্দেহ নাই।

আমরা পাঠ করিয়া ইহার সমগ্র তাৎপর্য বুঝিতে পারি নাই, অথবা যেরূপ বুঝিয়াছি প্রকৃত তাৎপর্য তাহাই কিনা তথ্যের বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। যাহা হউক আমরা যে স্থান বেরূপ বুঝিয়াছি তাঁকাকারে তাহার আভাস লিখিয়া পুস্তক মুদ্রিত করাইলাম।

বেদব্যাস যে এখনও পুরাণ রচনা করিতেছেন এবং বাঙ্গালা ভাষাতেই তাহা লিখিতেছেন তথ্যের আমরা নিঃসন্দেহ হইয়াছি। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে বিশ্বাস না হইবে কেন? — ৩ ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

অধিকারীভেদ ও স্বদেশীয়রূপ

১। আমি মাতৃহৃমির নানাদেশ দর্শন করিয়াছি। যে সকল ভাগ স্বচক্ষে দেখি নাই তাহারও বিবরণ যতপূর্বক সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিয়াছি। যখন যেখানে গিয়াছি অথবা যেখানকার ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়াছি, সকলই যেন ছই প্রকার চক্ষে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইয়াছে। এক আমার চক্ষুচক্ষে, অপর জন্মদায়িত্তি কোন মহাপুরুষের জ্ঞানচক্ষে। যখন আমার বয়স পঞ্চবর্ষের অনধিক তখন পিতৃদেবের স্থানে রামায়ণের প্রথম স্কন্ধ আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছিলাম। দ্বাদশ বা ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে

তাঁহারই হানে ঐ স্কন্ধের সর্বস্বনবিনিস্ত শৌকিক ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলাম। যখন বয়স চত্বারিংশবর্ষ তখন তাঁহারই হানে আবার ঐ স্কন্ধকেই আধ্যাত্মিক ভাবে অবগত হইয়াছিলাম। একই স্কন্ধ, একই গুরু, একই শিষ্য; কিন্তু কালভেদে অধিকারভেদ এবং ব্যাখ্যার প্রভেদ।

২। যখন হিন্দুকলেজে পড়িতাম তখন সাহেব মাষ্টার বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুজাতির মধ্যে স্বদেশাহরণ নাই, কারণ ঐ ভাবার্থ-প্রকাশক কোন বাক্যই কোন ভারতবর্ষীয় ভাষার মধ্যে পাওয়া যায় না। তাঁহার কথায় বিশ্বাস হইয়াছিল এবং সেই বিশ্বাসনিবন্ধন মনে মনে যৎপরোনাস্তি চঞ্চোলভবও করিয়াছিলাম। তখন অন্নদামঙ্গল গ্রন্থ হইতে দক্ষকর্তা সতীর দেহত্যাগ-বিবরণ জানিতাম; কিন্তু সেই বিবরণ জানিয়াও শিক্ষক মহাশয়ের কথা প্রকৃত উত্তর অথবা আপনার মনকে প্রবোধ প্রদান করিতে পারি নাই। এক্ষণে জানিয়াছি যে, আর্ঘ্যবংশীয়দিগের চক্ষে ৫২ পৃষ্ঠ সমন্বিত সমুদায় মাতৃহৃমিই সাংখ্য ঈশ্বরীদেহ*। — ৩ ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

* গ্রন্থটী অবশ্যই, দুই সম্বৎ পুণ্যজাগি দ্বিতীয়ভাগে সন্নিবিষ্ট কোন রচনা। এইরূপ কিছু কিছু, এবং মহাছা ৩ ভূদেব বাবুর ভাষারি এবং পত্রাবলীর (জীবনচরিতে অপ্রকাশিত) কোন কোন অংশ আবার 'উপহাসের পাঠকবর্গকে মধ্যে মধ্যে উপহার দিব হিব করিয়াছি।—সম্পাদক, উদয়ন



ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা

ঐশ্বশোকনাথ ভট্টাচার্য, শাস্ত্রী, বেদান্তভীর্থ, এম-এ

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে কোন দৃষ্টকাণ্ডের অভিনয় আরম্ভ করিবার পূর্বে কুশীলবগণ একত্র মিলিত হইয়া রত্নবিয়শাস্ত্রির উদ্দেশ্যে একপ্রকার মাসনিক উৎসবের আয়োজন করিতেন। উহার নাম ছিল “জর্জরোৎসব”। প্রাচীন ইংলণ্ডের May-day rites বা May-pole dance-এর সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য ছিল। সে-যুগের অভিনয়ের সহিত জর্জরোৎসবের সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ ছিল যে, একটিকে বাদ দিয়া অপরটির কল্পনাও করা যায় না। এই জর্জরোৎসবের ইতিহাসই ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা।

* * *

পুত্রাকালে একদিন মণি ভরত তাঁহার নিজা ভ্রূণ শেব করিয়া শতপুত্র ও শিশু পরিবৃত্ত হইয়া উপাধানে বসিয়া ছিলেন। সেদিন অনঘাঘ—বেদপাঠের পরিভ্রম হইতে কথিগণ মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। অতএব, ইহাই উপরুক্ত অবসর বুঝিয়া আত্মপ্রশংসা জিতেন্দ্রিয় সুনিগণ ভরতকে প্রশংসা করিলেন—“বেদাভ্যাসোদিত ও চতুর্ভুজের সমকক্ষ নাট্যবেদ নামে যে গ্রন্থ আপনি কিছুদিন পূর্বে সঞ্চয়িত করিয়াছেন, তাহা কিম্বশে ও কাহার নিমিত্তই বা উৎপন্ন হইয়াছিল?” ইহা হাড়া—নাট্যের কয়টি অঙ্গ, কি প্রমাণ ও রসমন্ডে উহার প্রয়োগবিধি কীদৃশ—এসকল বিষয় সম্বন্ধেও তাঁহারা বর প্রশংসা করিয়াছিলেন। সুনিশ্চেষ্ট ভরতও একে একে ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন।

প্রথমেই নাট্যের উৎপত্তি ও নাট্যবেদরচনার কথা।

সাধারণের ধারণা নাট্যবেদ ত্রাচার্য রচিত। কিন্তু একতপক্ষে চতুর্ভুজের দ্বারা উহাও অশৌকসের ও অনাদি। ত্রাচার্য উহার প্রবর্তনিতা যাহা, রচনিতা নহেন। বারম্বার হইতে আরম্ভ করিয়া বৈবস্বত অবধি

প্রত্যেক মন্বন্তরেই • ত্রোভাযুগে নাট্যবেদ শিতামহ- (৩৩৫) কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কখনও কোন সভাযুগে নাট্যবেদের প্রচলন হয় নাই।

বারম্বার হইতেই প্রতি কল্পের আদি মন্বন্তর। উহার প্রথম সভাযুগ ও সভা-ত্রোভার সন্ধিকাল অতিক্রান্ত হইবার পর ত্রোভাযুগের প্রারম্ভে—শেব, দানব, বক্ষ, বক্ষঃ, পক্ষর্ক, মহোদধি প্রভৃতির দ্বারা সমাক্রান্ত—লোকপালগণ-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত—মানবের কর্তৃত্বমূলক যুগেই—প্রমাণতঃ গ্রাম্যমণ্ডে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কারণ, ত্রোভাযুগ প্রবৃত্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই লোক-সমাজে একপাদ পাপ সঞ্চারিত হইয়াছিল। প্রমাণতঃ পাপসঞ্চারের ফলে কাশ ও শোভের বস্তুভূত—ঐর্ষা, ক্রোধ প্রভৃতির দ্বারা বিমুক্ত হইয়া মুখ ও হৃদয় ভোগ করিতেছে যেখানি ইন্দ্রাদি দেবত্ব শিতামহ ত্রাচার্যকে বলিলেন—

“শিতামহ! আমরা চিত্তবিনোদনের উপযোগী এমন একটি হিতকর কীড়ার প্রচা চাই, যাহা একাধারে পুত্র ও প্রজা হইতে পারে। পুত্রভাতিভূমির পক্ষে বেদাধ্যায়ন বা শ্রবণের কোন বিধি নাই। অতএব, আপনি ভূপাণ্ডুরক সকল জাতির শ্রবণযোগ্য একটি সার্বভৌমিক পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করুন।”

তরুণ ত্রাচার্য “তথাস্থ” বলিয়া সমস্তবেদ বেদব্যাসকে

• মনু মোট ১৪ অঙ্ক—(১) বারম্বার, (২) দ্বাপর্যুগ, (৩) ত্রৈতয়, (৪) কাল, (৫) বৈবস্বত, (৬) চতুর্ভুজ, (৭) বৈবস্বত, (৮) শারদ, (৯) কল্যাণ, (১০) ত্রয়োমণি (১১) কর্তৃ-দ্বাপর্যুগ (১২) কল্যাণ (১৩) বেদব্যাস ও (১৪) ইন্দ্রব্যাস। এক এক মনু অধিকার কালের বাহ এক মন্বন্তর—কালিক্রম ৭১ বিদ্যায়। ১০০০ বিদ্যায় = ১৪ মন্বন্তর = ১ কল্প = ত্রয়োমণি ১ বিদ্য = ৪০০ কোটি বৎসর। সভা, ত্রোভা, দ্বাপর ও কল্যাণ পরিমাণ = ৪০০০০০ বৎসর। সভাযুগ = ১৭৫০০০ বৎসর। ত্রোভা = ২২৫০০০ বৎসর। দ্বাপর = ১৭৫০০০ বৎসর। কল্যাণ = ৪০০০০০ বৎসর। বর্তমান কল্যাণ বেদব্যাসের কল্পের অন্তর্গত সভা বৈবস্বত মন্বন্তরের সীমাবদ্ধ। প্রতি কল্পান্তে একবার করিয়া মহাশয় হইয়া থাকে।

তখনকার মত বিস্মার দিলেন। পরে যোগবলে চতুর্ধেদের স্বরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তখন সমস্ত করিলেন — “আমি নাট্যাধ্যা এমন এক পঞ্চম বেদ সন্ধান করিব, যাহা ধর্মপ্রতিষ্ঠা অতুল্য, অর্থপ্রদ, ক্ষয়, প্রয়োজনীয়, মনস্ত, নানা উপদেশবহুল, ধর্মার্থকান-মোক্ষাধিক চতুর্ধেদের উপায়প্রদর্শক, চতুর্ধেদের দাঃপ্র-দ্বন্দ্ব (digest), সর্মগানের সাহচর্য, সর্মগ্রকার শিল্পের আকরবস্ত্র ও ইতিহাসসমৃদ্ধ হইবে।”

এইরূপ সমস্ত করিয়া তদবান্দ লোকশিতামহ ব্রহ্মা চতুর্ধেদের অবলম্বিত নাট্যবেদ প্রণয়ন করিলেন। অতঃপর হইতে গ্রহণ করিলেন উহার পাঠ্য অংশ, সামবেদ হইতে গীত, যজুর্বেদ হইতে অভিনয় ও অথর্কবেদ হইতে লাইসেন্স। এইরূপে সর্মগবেদবিং শিতামহ-কর্তৃক চতুর্ধেদ ও আর্কোমাদি উপবেদগুলির সহিত সমস্ত নাট্যবেদ সঠি হইল।

ভারতের নাট্যশাস্ত্রে ভারতীয় নাট্যবিচার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে অশূর্ল কাহিনী বিদ্যুৎ হইয়াছে, তাহা এইরূপ। অবশ্য পাশ্চাত্য গবেষকগণ ইহাকে একেবারেই ভ্রমকথা বলিয়া উড়াইয়া দেন। নাট্যোৎপত্তি সম্বন্ধে তাহাদিগের বিভিন্ন মতবাদ এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে।

নাট্যবেদ সন্ধানের পর ব্রহ্মা সুরেশ্বর ইন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন — “সেধ, দেবরাজ! ইতিহাস (মনস্তপক) ত আমি সৃষ্টি করিলাম। এখন তুমি দেবগণের মধ্যে উহার প্রচার কর। বাহাতা উল্ল বিজ্ঞা গ্রহণে (গুরুত্ব হইতে শিক্ষা করিতে) ও ধারণে সমর্থ, উদ্যোগে বিচার করিতে অপরায়ু, লোকসমাধে ভীত (nervous) নহেন—এইরূপে কুলগ, বিদগ, প্রদলত ও দ্বিতপ্রম শিক্ষাধিগণের মধ্যে এই নাট্যবেদবিজ্ঞা তুমি বিতরণ কর।”

ইহার উত্তরে ইন্দ্র হৃদয়গলিগুটে ব্রহ্মাকে বলিলেন — “ভগবন্! সেবগণ চিত্তবিনয়ী স্বভাবসে অত্যন্ত। নাট্যবেদের গ্রহণ, ধারণ, জ্ঞান (উদ্যোগবিচার), প্রয়োগ (রসমহক অভিনয়) প্রভৃতি পরিপ্রসঙ্গাশেক নাট্যকর্মে তাহার কখনও সমর্থ হইবেন না।

বেদের রত্নবিং, কটসহ, জিতেশ্বর, রত্ননিগমপরাগ অভিনয়ই নাট্যবেদ শিক্ষা ও প্রয়োগ করিবার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র।”

ইন্দ্রের এই দৃষ্টিভুক্ত বাক্য প্রবণে কমলাসন ব্রহ্মা মহর্ষি ভরতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন — “তুমি শতপুত্র সম্বোধে নাট্যবেদের প্রথম প্রয়োগ কর।”

অনন্তর ভরত ব্রহ্মার নিকট ধর্মাবিধি নাট্যবেদ অধ্যয়নপূর্বক নিম্নের শতপুত্রকে ধর্মারীতি নাট্যশিক্ষা প্রদান করিলেন। অভিনয়ে যিনি যে ভূমিকা গ্রহণের যোগ্য, তাহাকে সেই ভূমিকা প্রদান করা হইল। সর্মনাট্যের মাতৃকাস্বদশি চারিটি বৃত্তির (style in composition) কথা হইতে নাট্যপ্রয়োগের উপযোগী দেখিয়া ভরত প্রথমে তিনটিমাত্র বৃত্তি বাছিয়া লইয়া-ছিলেন। ভারতী, সাম্বতী ও আরভতী — এই তিনটি বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভরত নাট্যপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন ব্রহ্মা উদ্যোগিদের সহিত কৈশিকী বৃত্তিও = যোগ করিতে আদেশ দিলেন। উক্তের ভরত বলিলেন — “শিতামহ! কৈশিকীপ্রয়োগের উপযুক্ত উপকরণ

• ভারতী — মাতৃকাস্বদশ, পুত্রপ্রযোজ্য, স্বাক-প্রদান ব্যাপার। ভরতপুত্রের ইহার প্রথম প্রয়োগ করণ বলিয়া ইহার নাম ভারতী। অভিনয়গণের মতে ইহা বায়ু-বৃত্তি। ইহা কণ্ঠে হইতে বৃহত। কল ও অতুল্যের ব্যবহার। ইহা সাধারণতঃ প্রযুক্ত। সাম্বতী — মন, পৌর, তাপ, ধর্ম, কলুতা প্রভৃতি কণ্ঠ করিবার উপযোগী। উৎকট হ। ইহাতে আছে — কিছু শোক নাই। অভিনয়গণের মতে মনোব্যাপারস্বরূপ সাম্বতী বৃত্তি সাম্বতী। মন — মন। যজুর্বেদ হইতে ইহা বৃহত। মন, মৌর ও অতুল মন করিবার উপযোগী — শোক বা দুঃখের করিবার অপর্যাপ্ত। আরভতী — বাত। ইন্দ্রজাল, মঃপ্রাণ, প্রোহ, উদ্ভাস্তরতী, মন, মন, নিগণ, মন প্রভৃতি দেখাইতে ইহার উপযোগ। অভিনয়গণের মতে ইহা কার্যবৃত্তি। অর = সোহাগ, অবলম্ব। উ = চর, কৃত। অবলম্ব কৃতের যে মনস্ত ভগ — অস্বাভাব। মিথ্য = ফাক, কপট — সে মন ইহাতে আছে। ইহা অপর্যবেদ হইতে বৃহত। তখনও, বীতল ও মৌর মনে আনতট বৃত্তি ব্যবহার। কৈশিকী — দ্বিমা সোহাগ পরিচয় ইহার প্রয়োগ করিতে হয়। ইহা প্রাণতুল্য, মৃত-শীতল ও দুঃখমহতীপাশক। অভিনয়গণের মতে ইহা শীতলোৎপাদনী ব্যাপার। কল যেমন কোন প্রয়োজন পোষ বা করিলে বীত-সোহাগের ইহা থাকে, ইহাও সেইরূপ। ইহা সামবেদ হইতে বৃহত। দুঃখ ও হাজসে ইহা ব্যবহার্য। — নাট্যশাস্ত্র — ২২ অ।

আমার অধিকারে নাই। সে ব্রহ্ম আপনাকেই সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে। এই কৈশিকী বৃত্তি নৃত (১) ও অসহায়সম্পন্ন, রসভাবক্রিয়াস্বত্ব, প্রকল্পনপথযুক্ত ও পুস্কারসমভূত — ইহা আমি ভগবান্ শঙ্করের নৃত্যে লক্ষ্য করিয়াছি। একমাত্র ‘পরিপূর্ণানন্দনির্ভরীভূত-বেদ লুপ্তাকার’ অর্চনাকৃতসাম্প্রত্য অর্চনারীশ্বরসেব বাতীত অপর কোন পুরুষের পক্ষে কৈশিকীপ্রয়োগ অসম্ভব। শুধু অভিনেতার দ্বারা এ কার্য চলিবে না — অভিনেত্রীরও প্রয়োজন।

এই কথা শুনিয়া পিতামহ নিম্ন মন হইতে নাট্যা-লঙ্কারচতুয়া (২) অঙ্গরোগণের সৃষ্টি করিলেন। এই অঙ্গরোগণ ব্রহ্মার মানসী সৃষ্টি। ইহারাই ভারতের আদি অভিনেতা। আর ভারতের শতপুত্র হইলেন প্রথম অভিনেতা।

তাহার পর সশিখা স্বাতি নামক ঋষি ভাওর অধিকারে ও নারদাদি পদস্বর্গদণ্ড পানবোশে (৩) নিযুক্ত হইলেন। ইহাই হইল ভারতের প্রথম নাট্যসম্প্রদায়।

এইরূপে নিম্নের দশ পঠন করিয়া ভারত কৃত্যত্রাঙ্গ-পুটে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন —

(১) নৃত — অঙ্গোপাঙ্গদ্বয়ের দ্বিলাস বিক্ষেপ। অঙ্গহর — অঙ্গদ্বয়ের অঙ্গকীর্ণভাবে স্ফুটিত হ্রাস প্রাপ্ত। নৃত্য — ভাবাকিবিকি সহ অঙ্গবিক্ষেপ। রসভাবক্রিয়াস্বত্ব — রসসমূহের যে যে ভাব (ভাবনা) অর্থাৎ রস, নৈসাম্বাজিকসম্পন্ন হ্রসবে ব্যাপ্তি; তাহার যে ভিন্ন অর্থ ইতিকর্ষকতা, তাহাই স্বাভা (ব্রহ্ম) বাহ্য — সেই বৃত্তি কৈশিকী। প্রকল্পন-পা — চিন্তা পোষক — Dushabille।

(২) বাট্যসম্প্রদায় — নাট্যের বৈচিত্র্যসমূহ প্রদান অলঙ্কার-বন্ধন কৈশিকী বৃত্তি। অলঙ্কারগণ নাট্যসম্প্রদায় — রীতাক্ষের বস্তাবল অলঙ্কার গণঃ সৌন্দর্য, বিলাস, বিমিশ্রিত, বিম্বহ, কিসকিচিত, মেট্রিকিত, দুর্ভাবিত, বিলোপ, ললিত, বিকৃত; অলঙ্কার অলঙ্কার শাস্ত্রী — শোভা, কাঁড়, বঁপিত, বাহুল্য, বৈধা, প্রাথমিকতা, ঔপাধ।

(৩) ভাও — বাস্তবদিক। প্রথমে চক্কা জাতীয় বাস্তব — অবনত বা পৌনর বাস্তব। পণ, ক্রম, কসরী, একত্রিত পুস্কর জাতীয় বাস্তব ইহার অঙ্গভূত। পানবোশ = ক্রীতের অধিকার নহে। পান — তত (বা ততঃ) বাস্তব অর্থাৎ তার বা তাঁতের ক্রম ও দ্বিধা (হাতার বাহন)। ইহা চাক্কা বাস্তব বাস্তব (দন) ইহাতে ছিল। বাস্তব বোটে চারি প্রকার — তত, দ্বিধা, ক্রম ও অবনত। এক্ষণে ইহাদিগকে ‘নৃত্য’ বলিত।

“পিতামহ! নাট্যশিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে। এখন কি করা যায়, আদেশ করুন।”

পিতামহ উত্তর দিলেন — “ভরত! নাট্যপ্রযোগের উপযুক্ত অবসর ত সমুখে উপস্থিত। ঐমান্ মহেশ্বরের ক্ষমমহোৎসব প্রস্তুতপ্রায়। ইহাতেই নাট্যবেশের প্রয়োগ কর।”

সেবগণের সহিত সম্বর্ষে অম্বর ও দানবগণ নিহত হওয়ার মহেশ্বরের বিজয়শ্রুতি স্বকার নিমিত্ত একটু অমরগণ একত্র মিলিত হইয়া উক্ত ইন্দ্রক্ষম মহোৎসবের আয়োজন করিতেছিলেন।

শতক্ষমমহোৎসবে অভিনয়ের প্রারম্ভে ভরত প্রথমে নানী রচনা করিলেন। ঐ নানী আশ্চর্যজন-সংযুক্ত, বিচিত্র, বেদগম্বত ও অষ্টাঙ্গশয়সংযুক্ত হইয়াছিল (৪)। তাহার পর ধ্রুপদে সৈত্যগণ সেবগণের নিকট পরামিত হইয়াছিলেন, তাহার অনুকরণে ঠিক তৎসমুদ্রপ ঘটনার সন্নিবেশ নাট্যে করা হইল।

ব্রহ্মাদি সেবগণ অভিনয়ের আয়োজন কর্ণে পরম পরিভূত হইয়া ভারতের পূরণপক্ষে সর্বপ্রকার উপকরণ প্রদান করিলেন। প্রথমেই প্রীত হইয়া ইন্দ্র দিলেন তাহার শুভ বিজয়লক্ষ্য। ব্রহ্মা দিলেন বিদ্যুৎকর্ত ব্যবহারোপযোগী কুটিলক অর্থাৎ বক্র দণ্ড। বরুণ দিলেন পারিবারিকের উপযোগী কুম্ভার। হর্য্য দিলেন অলঙ্গপ্রতিম ছত্র বা বিতান (চামোয়া)। শিব দিলেন সৈবী ও মাছুবী সিঁদ্বি। বায়ু দিলেন ব্যঘন, বিজু — সিঁদ্বাসন, কুবের — দুতট ইত্যাদি।

অতঃপর সৈত্যদানবনাগের অভিনয় আরম্ভ হইল। তাহা দেখিয়া যে সকল সৈত্য অভিনয়বর্ণনার্থ তথ্য সমাপ্ত হইয়াছিল, তাহারা কৃত্তিকিতে বিভ্রাৎ প্রভৃতি বিভ্রাণের সহিত পরামর্শ আঁটল — “এরূপ ধরনের অভিনয় আমরা পছন্দ করি না। অতএব, আইন — ইহাদিগকে কিছু শিক্ষা দেওয়া যাক।”

(৪) অষ্টাঙ্গশয়সংযুক্ত — আটটি পদ দ্বারা অঙ্গভূত। ‘স’ বলিতে অভিনয়কর্তার মতে স্বতন্ত্র-ভিন্ন পদ অথবা অঙ্গভূত, যাক্ উক্তই বুঝায়। নানী দানবদ্বি (নায় দানবঃ)।

তখন অম্বর ও বিষ্ণুগণ মায়ামলে অদৃষ্ট হইয়া রসমগ্নত নর্তকগণের বাক্য, শারীরিক চেষ্টা ও ভূতি সজ্জিত করিয়া কেলিল। হৃদযথারূপে এইরূপে সহসা বিস্মৃত হইতে দেখিয়া দেবরাজ—“একি ! কোথা হইতে সহসা অভিনয়ের এ প্রকার বৈষম্য উপস্থিত হইল।”—বলিয়া ধামনয় হইলেন। বোধবলে তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন যে, বিষ্ণুগণ অদৃষ্টভাবে রসমগ্নগণটিকে একেবারে ছাইয়া ফেলিয়াছে। আর হৃদযথার ও তাঁহার সহকারী সকলেই তাহাদের প্রভাবে নষ্টোজ ও অস্বীকৃত হইয়া পড়িয়াছেন। ব্যাপার ওকতর বুঝিয়া ইজ্র সহসা উঠিয়া তাঁহার বিষয়বস্তু তুলিয়া লইলেন। বিষ্ণু হইতে উদ্ধারের পথ আবিষ্কার করিতে তাঁহার ক্ষমতাত্ত্ব ও বিলম্ব হইল না। ধর্মরাজওকত তিনি যখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার সেই বিভিন্নরূপপ্রভার ভাবের হইয়া উঠিয়াছে; ক্রোধে রক্তাভ নয়ন আত্মদিত। রক্তপীণ্ডত বিষ্ণু ও অম্বরগণকে সেই ধ্বংসপ্রহারে তিনি ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। বিষ্ণু ও অম্বরগণের মধ্যে কেহ নিহত, কেহ বা পলায়নপর হইলে সেবগণ চক্ষুমনে বলিতে লাগিলেন—“দেবরাজ ! অদৃষ্ট তোমার এই দিব্য প্রেরণ, হাহার সাহায্যে তুমি মানবগণের সর্বত্র ধ্বংস করিয়া দিয়াছ। যেহেতু উহার প্রহারে বিষ্ণু ও অম্বরগণ ধ্বংসীকৃত হইয়াছে, অতএব অদৃষ্ট হইতে তোমার এই দিব্য ধ্বংসের নাম হউক—‘ধ্বংস’। যে সকল দুষ্ট অতঃপর নাট্যাঙ্গিনার চেষ্টা করিবে, তাহারা এই ধ্বংস দেখিলে আর পলাইবার পথ পাইবে না।” ইজ্র উত্তর দিলেন—“তথ্য। আর হইতে রক্তালয়ের রক্তক হইবে এই ধ্বংস।”

ইহার পর ধ্বংসহোৎসব আবার বলিয়া উঠিল। অভিনয় পুনরায় আরম্ভ হইল। কিন্তু হতাবশিষ্ট বিষ্ণুগণ সহজে নিরস্ত হইবার পাত্র ছিল না। তাহারা অদৃষ্ট থাকিয়া নর্তকবিশেষের ভয় অস্ত্রাইতে লাগিল। তখন তরত পিতামহকে সন্ধান করিয়া বলিলেন—“বিষ্ণুগণ নাট্য-বিন্যাসের লজ বহুগরিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। অতএব, আপনি স্বয়ং ইহার রক্ষা বিধান করুন।”

তখন ভগবান্ রক্ষা বিধিকর্তাকে ডাকিয়া। সর্গহুলকণ-সম্পন্ন চূড়ান্ত দিব্য নাট্যাঙ্গ হইয়া নির্ধাণ করিতে আসেন দিলেন। অস্তির প্রেক্ষাগৃহ নির্ধিত হইল। পিতামহ সেবগণকে ডাকিয়া বলিলেন—“তোমরা এক একজন নাট্যাঙ্গের এক এক অংগ রক্ষার ভার লও।” সকলেই সম্মত হইলেন। রত্নগরকার তার পড়িল চক্ষুনার উপর। লোকপালগণ দিক্‌রক্ষা ও মাস্তুলগণ বিদিক্‌রক্ষার ভার লইলেন। নেপথ্যহীনিকার নিষ্কৃত হইলেন মিত্র। অম্বর রক্ষা করিতে লাগিলেন বকণ। রসবেদিকার রক্ষক হইলেন অমি ও বাস্তভাও রক্ষার অবশিষ্ট সকল দেবতাই তৎপর রহিলেন। এইরূপে এক এক জন দেবতা নাট্যাঙ্গের এক এক অংগরক্ষার্থে যোদ্ধাসেবক লাগিলেন।

তখন সৈভান্যাক বস্ত্র ধ্বংসের শিরোভাগে নিষ্কিপ্ত হইল। আর উহার এক একটি পর্কে অমিত্তেভাঃ সেবগণ অধিষ্ঠান করিলেন। সর্বোচ্চে শিরঃপর্কে বলিলেন ত্রায়া স্বয়ং, তাহার নিম্নপর্কে শতর, তৃতীয়ে বিষ্ণু, চতুর্থ বস্তু ও পঞ্চম বা সর্বনিম্ন পর্কে বলিলেন—শেখ, বাহুকি ও তক্ষক—এই তিন মহান্যাক। ন্যাকের রক্ষার ভার লইলেন ইজ্র, ও ন্যাকিকার রক্ষার নিষ্কৃত হইলেন সরস্বতী।

তাঁর পর দেবগণের অমুরোধে বিষ্ণুগণের সহিত বিবাহ মাগোষে মিটাইবার নিমিত্ত ত্রায়া তাহাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“অভিনয় পও করিবার লজ তোমাদের এত প্রয়াস কেন ?”

ত্রায়া বাক্যে একটু নরম হইয়া বিব্রাণাক সৈভা ও বিষ্ণুগণের মুখপাত্র হইয়া বলিল—“সেবগণের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে আপনি যে নাট্যবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ত দেখিতেছি লোকচক্ষুর সমক্ষে আমাদিগের হেয়তা প্রতিপাদন করা। সেবতাই বলুন, আর সৈভাই বলুন—সবই ত আপনার সৃষ্টি। আপনার বিকট আমরা উভয় পক্ষই সমান। তবে সেবতাদিগের প্রতি এ পক্ষপাত কেন করিলেন ?”

পিতামহ হাসিয়া উত্তর দিলেন—“বস্তু সৈভাগণ !

তোমরা ক্রোধ ও বিবাদ পরিত্যাগ কর। কেবল তোমাদেরই পরিভব দেখাইবার নিমিত্ত নাট্যবেদ সৃষ্ট হয় নাই। আর দেবতাদিগের নিছক স্তুতিবাদের নিমিত্ত যে ইহার সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাও মনে ভাবিও না। প্রকৃতগণকে সমস্ত ক্রৈলোক্যেরই ইহা ভাবাহু-কীর্তনস্বরূপ। ইহার মধ্যে কোথাও ধর্ম্মাহুতান, কোথাও বা জীভা, কোথাও অর্থগাভ, কোথাও বা শমপ্রাপ্তি, কোথাও হাস্য, কোথাও বা যুদ্ধ, কোথাও কাম, কোথাও বা বধ প্রদর্শিত হইয়াছে। ধাত্মিকগণ ইহাতে ধর্ম্মের সন্ধান পাইবেন। কামাভিলাষীর ইহা কামপরিপূরক। ছবিবিনীতের ইহা নিগ্রহস্বরূপ। বিনীতগণের পক্ষে ইহা দমক্রিয়া। শূরমানিগণের ইহা উৎসাহজনক। মৃতগণের পক্ষে ইহা শিক্ষার উপায়। পণ্ডিতগণের নিকট পাণ্ডিত্যপ্রকাশের উপযুক্ত উপকরণ। ঐশ্বর্য্যশালীর নিকট ইহা বিলাসের উপাদান। শোকগ্রস্তের ইহা শান্তিদাতা। অর্থলিপ্সুর পক্ষে ইহা উপার্জনের একটি প্রধান উপায়। উষ্মচিত্তের ইহা ঔষ্যসম্পাদক। সপ্তর্ষীপের মধ্যে যেখানে যাহা ঘটয়াছে বা ঘটতে পারে—দেব, দানব, রাজা, ঋষি, মন্ত্রা — যাহার বৈরূপ স্বভাব — তাহার অবিকল অহুকরণ এই নাট্য। এক কথায়,

ইহাকে ‘জীবনের জীবন্ত অহুকরণ’ বলিতে পারা যায়। অতএব এ ব্যাপারে তোমাদের ক্রোধের কোন কারণ থাকা সম্ভব মনে করি না। কারণ, ইহাতে সত্য ঘটনারই হুবহু অহুকরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। আমার ইচ্ছা, তোমরা ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া দেবতাগণের সহিত বিবাদ মিটাইয়া ফেল।”

এইরূপে সামগ্র্যোগে বিষয়গণকে শাস্ত করিয়া ব্রহ্মা দেবতাগণকে আদেশ দিলেন—“আজ নাট্যমণ্ডপে তোমরা যথাবিধি যজ্ঞ সম্পাদন কর। ময় পাঠ করিয়া বচা-বলা-ব্রীহি প্রভৃতি ওষধি দ্বারা হোম কর। মোদকাদি ভক্ষ্য দ্রব্য ও ক্ষীর-ইক্ষু-দ্রাক্ষারস-পায়স-কুসর (খিচুড়ি) প্রভৃতি সরস দ্রব্যের দ্বারা বলি প্রদান কর। তোমাদের দেবীয়া মন্ত্রের অধিবাসিগণ জর্জরের পূজাবিধি শিক্ষা করিতে পারিবে। রঙ্গপূজা না করিয়া কদ্বাপি অভিনয় করিতে নাই; করিলে অভিনয় নিফল হয় ও অভিনয়কারিগণ ত্রিয্যগুবোনি প্রাপ্ত হন। পক্ষান্তরে রঙ্গপূজা দ্বারা অতীষ্টসিদ্ধি ও স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটয়া থাকে”। ইহা বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন।

পরবর্তী সংখ্যায় এতথ্যকে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল—লেখক।



উদ্বলন — জাবন, ১৩৪০



জিবন শোম

প্রকৃতি

ত্রিবিজয়রত্ন মজুমদার

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সোম-মঙ্গল আকস্মিকের দিন, কথা কহিবার সময়ই বা কখন ? মঙ্গলবার আকস্মিক হইতে কিরিয়া গোপাল চা বাইতে বাইতে মিছাদিল—তোমার গোছান পাছান হ'ল ?

পলি মনে মনে রাগে বিতুবন অঙ্ককার দেখিতেছিল, বলিতে বাইতেছিল 'না', কিন্তু বলিল না ; মুখে হাসি আনিয়া স্বভাবসিদ্ধ হয়ে বলিল—সে সব ত আমি রোহব্বারেই ক'রে রেখেছি।

গোপাল এক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল—সেখ, আমি ভেবে সেখগুম, পূজার ছুটির সময় বেকেনো বাবে।

পলির মনের তিতরকার কথা বলিবার অনধিকার চোঁটা আমি করিব না, তবে তাহার হাসিমুখের উপরে যে চোখ দু'টি, তাহা বেন পদ্মপথে কলের মত টল টল করিয়া উঠিল, তাহা স্পষ্টই দেখা গেল। যে দেশের নারী অস্ত্রের ইচ্ছার ভলে নীর ইচ্ছা, লাখ, কামনা বিসর্জন দিতেই চিত্তাভ্যস্ত, সে দেশের নারী ইহা লইয়া তর্ক করে না, করিতে চায় না, পারে না, বোধ হয় তাহার প্রবৃত্তিও হয় না। পলি চুপ করিয়া রহিল, চায়ের পেয়ালার মধ্যে চামচ ভুবাইয়া, নিজ মনের উত্তাল তরলকেও ভুবাইতে চোঁটা করিতেছিল।

গোপাল অস্ত্রমনস্কের মত বলিল—পাচদিন সময়, পাচ-সাত ম' মাইল মোটর-কার্নি ক'রে তয়ানক ল্লাভ হ'য়ে পড়তে হবে, আমি শুধু তাই ভাবছি। যে তোমার শরীর !

পলি বলিয়া উঠিল—আমার শরীরের খায়াপটা কি সেখানে আবার !

—খায়াপ ! রানো—জন্মভোগ !

পলি এইবার রাগ প্রকাশ করিল,—বাবে না, ইচ্ছে

নেই,—তাই বল না ম'শাই, আমার শরীরের মোহাই পাড়া কেন মিছামিছি !

গোপাল বলিল—স্বাধ না, তা' ত বলিনি—

পলি বলিল—আবার বলা কাকে বলে ?

গোপাল এক চুপকে অনেকখানি সরন চা পান করিয়া লইয়া, বেন পরম হইয়া উঠিল, বলিল—অব চমো, বেকেনো হানু !

—ঠিক ? ঠিক ? ঠিক ?

—ঠিক ! ভিন্ন সত্যি।

কেহ কোথাও নাই দেখিয়া লইয়া, পলি তারি সন্ধাননে একটা কাগা করিয়া, হাসিয়া লুটাইয়া থর হইতে এক ছুটে বাহির হইয়া গেল।

পথ স্ফলর, মোটর নৃতন, সন্ধিনী মধুর, দাড়ী তিন ঘণ্টার পথ এক ঘণ্টার অতিক্রম করিয়া চলিল। পলির টাইম-টেবল অল্পদূরে মান, পানাহারও বখালমত্রে জলম্পর্ন হইল।

আজ সেই অবিবাহিত জীবনের দিনগুলির কথা পলির মনে পড়িতেছিল। পাচটি ভায়ের একটিমাত্র বোন সে ভায়েসের সঙ্গে যে আনন্দে, যে পুঙ্কক ভাসিয়া বেড়াইত, মখোর কয়েকটা দিনের অঙ্ককার বিগত দিনের হৃৎশূন্যতা কুলাইতে বলিগাছিল, আজ হৃৎগোরব পুনরঙ্কর করিয়া নইতে পারিয়া তাহার আনন্দের সীমা-পরিণীমা নাই। গোপালের সিগারেট খাওয়া সে কোনদিন পছন্দ করিত না, কিন্তু আজ গোপালের সিগারেট-কেস তাহার কোলের উপরে, সে সংগে বার বার তাহার মুখে সিগারেট গুঁমিয়া দিগাছে, স্বয়ং অসিলযোগও করিয়াছে।

আর মাইল দুই পথ অতিক্রম করিতে পারিলেই কতাপুর ডাক বাঙলোর পৌছিতে পারা যায়। এমন

সময়ে এক বিপদ! সন্ধ্যার অন্ধকার দাছপালার ভিতরে নিবিড় হইলেও দরবী তখনও সুস্থিষ্ট। হঠাৎ এক সময়ে তাহাদের মোটরের বিশ হাত ধরে ধাক্কাইয়া। এই পুলিশ প্রহরী সন্ধান সমেত বন্ধু তুলিয়া হাঁকিল—হু কাম দার (Who comes there)?

ব্রেক চাপিয়া বাড়ী ‘ডেড ট্রপ’ করিয়া কেলিতে হইল।

পুলিশ তখনও হাঁকিজেছে—হু কাম দার?

সোপাল বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিল—কি বিপদ!

শেষে কি মিলিটারী সীমানার পড়া সেল না কি?

—হু কাম দার?

পলি সোপালকে বলিল—স্টপ্‌দার বন, ফ্রেণ্ড।

—তা’তে কি হবে?

—তুমি বন ত!

সোপাল বলিল—ফ্রেণ্ড:

বন্ধুকের মাথা উঠিয়া পড়িল। পুলিশ বান্ধী বাঝাইয়া বিয়া মোটরের দিকে অগ্রদর হইল। বান্ধীর শব্দে দূর হইতে অত্র একটা প্রহরী অস্ত্রদিকে চলিয়া সেল।

প্রহরীর সঙ্গে কথাবার্তা করিয়া বুকা সেল, ছোট নাপথুরের পার্শ্বতা আভিরা কিছুদিন পূর্বে বিশ্রোহভাবে ধারণ করিয়াছিল। তখন হইতে এখানে আইন প্রচলিত হইয়াছে—সন্ধ্যার পর চিহ্নিত সীমার মধ্যে কোন সোকেব প্রবেশ করা আইন-বিরুদ্ধিত ব্যাপার। সেদিন একটা জলিও হইয়া গিয়াছে। সোপাল খেলোয়াড় লোক, খেলাধুলা আনন্দ-প্রমোদের সঙ্গেই তাহার পরিচয়, স্কটিশমানা, সোলমাল, এসকলের নামেই তাহার মস্তক বিদূর্ণিত হইল এবং এই সমস্তের মূলেই যে পলির জেদ, তাহা মনে করিয়া সোপাল দরম হইয়া বলিয়া উঠিল—‘ত্রিভুজি প্রলম্বকরী’, এই জন্মেই বলে!—বলিয়া ঘন ঘন কমাগে দুখ বৃদ্ধিতে লাগিল।

বিপদে বৈরা হারায়েতে নাই, এলিকা পলির ছিল, আশ্চর্য্যের অভাবও তাহার ছিল না; দ্বির দাঙ ধরে বলিল—আমরা না জেনে এসে পড়েছি, এখন কির য়েতেও পারি, তুমি দেখ,

এতে কোনই সোপ হবে না।—সে প্রহরীকে কহিল, তোমাদের অফিসার সাহেবকে খবর দাও।—প্রহরী অস্থূলি সন্ডেতে ধোকাইয়া কহিল—সাহেব আতা হার।

সাহেব বটে, তবে বাঙালী সাহেব। প্রহরী সামগ্রিক কার্যনার সেলাম করিয়া গরিয়া গাড়াইল। সাহেবের পিছনে উজ্জল বস্ত্রিকা হুতে ছুইটা লোক। সোপাল তখনও ক্রমাল দিয়া দুখের, কানের, নাকের ধূলা কাদা তুলিতেছিল, সাহেবের আগমন-বার্তা বোধ করি সে পায় নাই। পলি বাড়ীর ঘর তুলিয়া নামিয়া পড়িয়া, নমস্কার করিয়া শুদ্ধ ইংরাজীতে ব্যাপারটা বুকাইয়া দিল; মিচ্ছাসিত হইয়া তাহাদের পত্ৰবা স্থান এবং উদ্দেশ্যও কহিল। সাহেব হাসিলেন, বলিলেন—কি মুড়িল। কথায় যেতে হ’লে মোটর ছেড়ে দিয়ে হু’মাইল বনের মাঝে পথ হাঁটেতে হবে; শুনা যায়, বাঘ-ভাদুকও আছে, সাপ-খোপ দাকাও অসম্ভব নয়। তার ওপর আপনারা পথ জেনেন না! এই রাত্রিকাল! এ কি দুসাহস!

সোপাল তীর পানে যে ভাবে চাহিয়া ছিল, তাহার অর্থ বৃদ্ধিতে পলির কিছুমাত্র কষ্ট হয় নাই, কিন্তু কোন সময়ে কোন কারণে আভাবিক মন্থতা নষ্ট হইতে যাবে না, ইহাই তাহার জীবনের সর্বপ্রধান শিকা। আশ্চর্য্য তাহার ব্যতিক্রম হইল না। মিষ্ট হাসির দ্বারা স্বামীকে নীরবে একটু ভৎসনা করিয়া সাহেবকে বলিল—ফরেনার্ড কি দকল দেখেই ক্ষমার বোধ্য নয়?

সাহেব বলিলেন,—অবস্ত। আপনাদেরও ক্ষমা করা যায়, যদি আপনারা অস্ত্রস্ত রাষ্ট্রিটার মত এই গরীবের কুটীরে নির্বিঘ্নে বাপন করবার প্রতিজ্ঞা করেন।—বর্তিকাবাহীসের মধ্যে একজনকে কহিলেন,—মেস সাহেবকা খবর দেও, হি’জা আনে কহ সেও।—লোকটি চলিয়া গেলে, কহিলেন—তিনি হয়ত পূজো-আফিকে ব’লে গিয়েছেন, টিক আনিনে, তা’ হলে কিন্তু আমার নিমন্ত্রণেই আপনাদের চ’লে আসতে হচ্ছে।

পলব কহিল—তাকে বুকা কষ্ট মিলেন, আপনায়

নিম্নরূপ ঐশ্বর-অনুগৃহীত, আমরা তা' শিরোধার্য্য ক'রে নিয়েছি।

—তা' হ'লে গাড়ীটা একটু ব্যাক্ ক'রে নিন, আমার ক্যাম্পের ফটক ঠেটে!—বলিয়া তিনি অনুমতি-নিবেশে ফটক খোলাইয়া দিলেন।

পলি আর গাড়ীতে উঠিল না; সে নিঃশব্দে এই অপরিচিত লোকটির সঙ্গে বীরে বীরে গাড়ীর পিছুনে গিহ্নেনে আগ্রসর হইতে লাগিল।

—আপনারা কলকাতা থেকে বেয়িবেছিলেন কবে?

—আজই। পথে সময় নষ্ট বড় করিনি। আজ পূর্ণিমা-রাত্রি, চাঁদের আলোর কয়ালু ও রামরূপা দেখার ইচ্ছে।

গাড়ী ফটকে ঢুকিয়া পড়িল। সাহেব বলিলেন—
সোজা চলিয়ে যান।

আলোকবাহী লোকটা ফিরিয়া আসিয়া বলিল—মেম্ সাহেবকা কামরা বন্ধ ফায়, হুদুর।

—বা' বসেছি, তিনি পুজোর বসেছেন।

চলিতে চলিতে কথা হইতেছিল। রক্তককরমর পথটি, দুই পার্শ্বে ময়দা-শ্রেণী, মহারর কল পড়িয়া গাছ-তলা নামা হইয়া দিয়াছে, স্মৃষ্টি পক্ষে বাতাল মাতাল হইয়া উঠিয়াছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে ক্ষীণ ঘোংখা কখনও কখনও ইহাদের মুখে আসিয়া পড়িতেছে।

পল্লব জিজ্ঞাসিল—এ জায়গাটার নাম কি?

—নাম বিশেষ কিছু না, একটা বনের কতকটা কেটে কুটে গাফ্ ক'রে আমরা ক্যাম্প বসিগেছি।
টিকানা—ক্যাম্প, পোটাকিল র'টী, এই মাত্র।

—লোকবনের বাস আছে?

—লোক আমরা, জনও তাই। ছ'চার মাইলের মধ্যে আর কেউ না।

—আপনার কথা বলি না, কিন্তু আপনার গ্রীর এই নির্জনবাস কেনন লাগে?

—স্বন্দ লাগে ব'লে ও মনে হয় না। আপনারা হ'লেন মীতা, সাবিত্রী, সমরকীর জাতি, কনবাসে আপনারা ও তিরদিনই অভ্যস্ত।

পল্লব হাসিয়া বলিল—অস্বীকার করবার উপায় কি?

তাহারা ক্যাম্পের সমুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে একখানা ছোট টেবিল, চারি পার্শ্বে দুই তিনখানি চেয়ার পাতি ছিল। ক্যাম্প-স্বামী চেয়ারগুলি দেখাইয়া বলিতে বলিয়া নিম্নেও বসিলেন; জিজ্ঞাসিলেন—একটু চা করুক, কি বলেন?

পল্লব হাসিয়া বলিল—কি?

মুখের কথা বসাইতে হইল না, লোক চলিয়া গেল। সাহেব গোপালের দিকে চাহিয়া বলিলেন—আমরা কেউ কায়ও নাম জানি নে, তার জন্তে বতখানি অজুবিধা হ'বার তা' ত হচ্ছেই, সে অজুবিধা এখনই মিটে যাবে'খন। তার আগে, আপনার মত একটা লোকের মুখ আমার মনে পড়ে। আমি যখন তাকে দেখেছি, তার বয়স তখন মণ এগারো হবে। নাম ছিল, গোপাল; গোপালেরই মত পাক সুবোধ ব্যাক।

গোপাল জিজ্ঞাসিল—কোথার দেখেছিলেন?

—মধুরাপুরীতে।

মধুরাপুরী নামে কোন স্থান গোপালের, তত গ্রা পল্লবের অভিজ্ঞতার অভিধানে শিখিত ছিল না; উভয়েই বিম্ময়গণ হইয়া চাহিয়া রহিল।

—কথাটা একটু লক্ষ্যার। তা' লক্ষ্য ক'রে আর কি-ই বা হবে। সেই যে গোপাল, সে-গোপালের সঙ্গে আমার সখ ছিল, এখনও আছে, সখক বিকট ও মধুর।

গোপাল বলিল—কি বকম সখক?

সাহেব হাসিয়া, খোটা হই হাই তুলিয়া, কুড়ি দিয়া আঙে আঙে বলিলেন—সেই গোপালের ভদ্রী আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী।

—আপনি কি সন্তোষবাবু?

—সন্তোষ নিশ্চয়ই, তবে বাবু কিংবা সাহেব, সেটা আমার বিবেচ্য নয়।

—আমিই সেই গোপাল।

টিক এই সময়ে ক্যাম্পের পর্দা সরাইয়া মেম্ সাহেব

বাহির হইলেন, সন্তোষ বলিলেন—গন্ধা! নারীর ভূষণ, তা' লকলেই জানে; আপাততঃ ভূষণ ভাগ ক'রে চ'লে এস, গোপাল দলদীয়ে উপস্থিত।

—কে গোপাল?

—তাই গোপাল।

—সত্যি?—বলিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন। পরনে লাল পাড় পরনের শাড়ী, আঁচলটা পলায় জড়ানো, সেবিলাই মনে হয়, পূজার আসন ছাড়িয়াই আসিয়াছেন।

—কত বড় হয়েছিল, গোপাল? লিহিকে চিনতে পারিল? কোন বোঁজ খবর ত রাখিল নে। জোর বোঁ? বেশ বোঁ? গোপাল! বৌয়ের নাম কি—

সন্তোষ কহিলেন—ধাম, ধাম, ঐ প্রহরলোর আসে ভাবা নিয়ে নাও, তারপর আবার একদফা প্রশ্ন ক'রে। বল গোপাল এক এক ক'রে—কত বড় হয়েছ?

গোপাল বলিল—বড় বড় হওয়া সম্ভব। চিনতে পারার কথা না তোলাই ভাল; আর বোঁজ খবর? বললে বড়, মাঝে বড় হ'য়ে নিদি বতটা রাখেন, গোপাল তার চেয়ে কম রাখে না। হাঁ বোঁ-ই বটে, তুমি বেশ বলায় ঐ ব্যক্তি নিশ্চয়ই খুঁজি হয়েছ; বৌয়ের নাম পল্লব, লোকে পলি ব'লে ডাকে।

সন্তোষ পল্লবের দিকে চাহিয়া, হাসিয়া বিভ্রাসিলেন, আমরা কি বলব, তাই বলুন!

—আমি কেন বলব, পল্লব হাসিয়া দিমির দিকে চাহিয়া, কথাগুলি বলিল।—আমি বড় জোর এই বলতে পারি, বা-ই বলুন, আমার কাছে অপ্রীতিকর হবে না।

চা আসিল। পল্লব বলিল—মিদি কসবেন না?

মিদি বলিলেন—কুড়ো মাগী, আমি যাব চা?

সন্তোষ কহিলেন—বলুন যত বাড়ি, মোতান্তের তত দরকার, পল্লব সম্ভবতঃ এই উত্তরই দেবে। পল্লব, তুমি—ঐ বা, 'তুমি' ব'লে কেলসাম, তা' হ'ল, কি বল—তুমি যদি তোমার ঐ সিদ্ধিষ্টিক অন্ততঃ চারের মোতান্তটা ধরিয়ে দিলে যেতে পার, আমি খুঁজি বই অখুঁজি হব না। একলা ব'লে চা খাওয়া, আর সেলমানার ব'লে পাখর ভাড়া, প্রায় এক।

হাসিগরের মধ্যে সভা জমিয়া উঠিছেছিল, দিমি বলিলেন—তোমরা! কাপড়-চোপড় বদলাও, খুঁজ-হাত খাও, আমার কাছ একটু বাকী আছে, সেবে আসছি।

তাঁহাকে বাস দিয়াই, তখন সভা চালাইতে হইল।

৩

আহারাদির পর, আবার সেই মহাভাষার সভা বসিয়াছে। সন্তোষ বন্ধুটার দর পরীক্ষা করিতে করিতে বলিতেছিলেন—আজ কাল বাঘের দশন বড় পাওয়া যায় না, চারদিকে আলো, পাহারা—এসব তাঁদের বোধ হয় বড়ই অপছন্দ, এপথ মড়ান না, মাঝে মাঝে ভালুক ম'শায় এসে মহা ভয়ে যান। ঐ যে সব মহা কুল পড়েছে, ওগুলোর ওপর তাঁর ভারি টান। খেতে মিষ্টি, একটু নেপাও হয়, খেতে দেখে ভালুক ম'শায় ভোঁলু ভোঁলু ক'রে ঘুমান পড়ে।

পল্লব বিভ্রাসা করিল—ভালুক কি মাছ মাঝে?

—মারব ব'লে মাঝে না, আলিঙ্গন করে, মাছ আলিঙ্গনের চোটেই মারা যায়।

পল্লব বলিল—আপনি ব্রাহ্মত্বপা গেছেন?

সন্তোষ বলিলেন—পানপুত্র বিধো কথাই শোভা পায় বটে, তবে সত্যি বলাতেও দোষ নেই; একবার পেছলুম।

—ভাঙ্গনাটা নাকি ভারি সুন্দর?

—কবিতা নিশ্চয়ই তাই বলবেন!

—আর অকবিতা কি নিষেধ করবেন?

—নিষেধ হয়ত করবেন না। তবে সেই পাখর, সেই জল, সেই বন,—বৈচিত্র্য হয়ত দেখতে না-ও পেতে পারেন। আমার ক্যাম্পের কাছেই একটি ঝরণা আছে, লোকে বলে, সেটিও খুব সুন্দর; আমি কিন্তু—

পল্লব সাঙ্গেই কহিল—কতদূর সেটা?

—খুব কাছে, দশ মিনিট লাগে।

—এখন বাওয়া যায়?

—কেন যাবে না!

—চলুন, যেনে আমি।—গোপালকে বলিল, চলে না, সেবে আমি।

গোপাল আরাম কোঠার সটান পা ছড়াইয়া দিয়া বলিল—ইচ্ছে হয় তুমি যাও, আমি এখন 'পারমেশ্বর' ন গচ্ছামি।'

—আমি ও বাবই। এমন জ্যোৎস্না রাত, এমন হৃদয়ঙ্গম আকাশ, এমন মনোমুগ্ধকর পার্শ্বতা প্রবেশ, তবে প'ড়ে থেকে লাগে কি! চন্দ্র সন্তোষ বাহু! দিদি কি আসবেন?

সন্তোষ বলিলেন—সাদারই দিদি ত! আসবেন ব'লে মনে হয় না।

—আমি একবার ভিজ্ঞাসা ক'রে আসি।—বলিয়া পল্লব ক্যাম্পের ভিতর চলিয়া গেল। একমিনিট পরে কিরিয়া আসিয়া বলিল—দিদির এখনও স্নান শেষ হয় নি।

—হবেও না, বলিয়া সন্তোষ পাড়াইয়া উঠিলেন, বলিলেন, চলো ঘুরে আসা যাক। ওহ গোপাল, তুমি মাথকটাকা বিরহ-দগ্ধতা ভোপ কর, আমরা একটু বেড়িয়ে আসি।

গোপালের মাসিকা, গর্জন করিয়া দগ্ধিত জ্ঞাপন করিল।

ফাল্গু দুই সোজা রাস্তার চলিয়া একটা অপ্রশস্ত পার্শ্বতা পথ ধরিতে হইল। পাথরগুলি এলোমেলো ভাবে পড়িয়া আছে, তাহারই উপর দিয়া পথ। চলিতে চলিতে একটা অসমতল পাথরের উপর পাড়াইয়া পড়িয়া সন্তোষ বলিলেন—এই উঁচুনিচু পথে, রাত্রির বেলা, তুমি কি পারবে চলতে?

পল্লবের ধমনীতে বাসিকাবয়সের নবীন পোড়িত প্রোত প্রবাহিত হইতেছিল; বলিল—পারব।

—কিন্তু ওপাথর থেকে এটার কি আসতে পারবে? আমরা এককালে সাগর লঙ্ঘন করেছিলাম, আমরা পারলেও তোমাদের দ্বারা তা' সম্ভব হবে না। এক কাজ কর, আমার হাতে হাত দাও।

পল্লব নিঃসঙ্কোচে সন্তোষের হাত ধরিল, সন্তোষ টুক করিয়া পার করাইয়া দিলেন। মোড় কিরিয়া যে পুত্র যেথা গেল, পল্লবের মনে হইল, না দেখিতে

পাইলে জীবন বুঝা হইয়া বাইত। নির্বরিত কুণ্ড কিত্ত দুই দিকের স্তম্ভল তরুণতার সখা দিয়া, ক্রম প্রস্রবের উপর বেত বারিধারা নামিয়া আসিতেছে, জ্যোৎস্না দ্বিগুণ প্রাবৃত করিতেছে, মনে হইতেছে কে যেন পর্দাভিনয়ের কোন অদৃশ্য স্থান হইতে তরলিত রৌপ্যধারা ঢালিয়া দিতেছে। নীচে যে স্থানে জল জমিয়া, আবার একটি স্থল পথ ধরিয়া সমতল ভূমির দিকে বাইতেছে, সেইখানকার জলে পূর্ণ চন্দ্র হাসিতেছে। দুই মনে জলের ধারে আসিয়া পাড়াইল।

সন্তোষ বলিলেন—এল, এখানটার একটু বসি। তিনি কামাল লইয়া দুইখানি পাথর মুছিয়া দিলেন।

পল্লব ইহাই চাহিতেছিল। বসিয়া জলে হাত দিয়া খেলা করিতে করিতে বলিল—কি চমৎকার ঠাণ্ডা জল!

—স্বাভাবিক পূর্ব। খাবে একটু?—পকেট হইতে ছোট একটা ক্রান্ত বাহির করিয়া, এক ক্রান্ত জল তুলিয়া পল্লবের হাতে দিলেন। পান করিয়া পল্লব বলিল—আঃ, গলাটা যেন ছুড়িয়ে গেল। এইবার আপনাকে একটু তুলে দিই।

সন্তোষ বলিলেন—নাও।

পল্লব বলিল—সরগার লম্বটা ঠিক যেন কাটার মত, নয়?

—আমার কাছে কিত্ত তা' মনে হয় না। আমার মনে হয়, ও যেন শুণ শুণ ক'রে পান পাইছে। এখন এর এই ঈর্ষ রূপ দেখছেন, বাঙালীর যত্নের কিশোরীট যেন, বর্ষাকালে ও পূর্ণবোবনা প্রস্ফুটানারী, সর্ব্বদা যৌবন ফেটে পড়ছে। তখন কি তেজ, কি ল্প!

পল্লব বলিয়া এক মনে নিব্বরের গান গনিতেছিল, কোন কথা বলিল না।

সন্তোষ বলিলেন—ওপাশ থেকে দেখলে ওর আর এক রূপ দেখা যায়; কিত্ত পথটা ভাল নয়, ছুতো চলবে না।

পল্লব কহিল—ছুতো খুলতে কতক্ষণ?—বলিও

বসিতে সে ছুটা পুটিয়া ফেলিল। ভিত্তাসিল — ছুতো এখানেই থাক্ ?

—খাঙ্ক !

আবার উঁচুনিচু পথে হাত ধরিয়া সস্ত্রাঘ সমুদ্রে তাহাকে টিপাটার অপর পার্শ্বে দইয়া গেলেন। করণার জল স্থল একটি রেখাপাথ ধরিয়া কত দূর যে চলিয়া গিয়াছে, তাহার কোন সীমা নাই। জোৎস্না-লোকে সেই রেখাপাথটি কাপড়ের নীল পাড়ের মত দেখাইতেছে। মরীচলোকে এত সৌন্দর্য্যও যে ছড়ান আছে, পল্লব তাহা কোন কল্পনা করিতেও পারিতেছিল না। কাহারও মনের অপেক্ষা না করিয়াই সে সেই জলরেখাটির পাশে চাহিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। অগত্যা সস্ত্রাঘকেও বসিতে হইল।

সস্ত্রাঘ বলিলেন—রাত কিম্বা অনেক হইবে !

পল্লব হাসিয়া বলিল—আপনার কষ্ট হচ্ছে বন্ধি ?

সস্ত্রাঘ হাসিয়া কহিলেন—আমার ? তাই বটে !

—তবে বহুল চুপ কর্বে। আমি দেখি।

—দেখ, ততক্ষণ আমি একটা সিগারেট খেয়ে নিই।

—সেই ভাল। ওনেছি পুরুষরা আমাক পেলে বড় লম্বট।

এক সময়ে পল্লব ভিত্তাসা করিল — আচ্ছা এটা ত নদী ?

সস্ত্রাঘ বলিলেন — সম্ভব তাই !

—বরাবর কি এই রকম ছোট ?

—তাই ত মনে হয়। অন্ততঃ পাহাড়ের ওপর ঐ রকম ছোটই, নীচে নিচে বড় হ'য়েও থাকতে পারে।

—ওর ধারে ধারে যদি দাওয়া দায়, কোথায় নিচে পড়েছে জানা যায় ত ?

—জান। যাবারই ত কথা ; তবে এ পর্য্যন্ত সে ইচ্ছা কেউ করে নি ব'লে জানা যায় নি। ভূমি যদি বাও, নীমাসো হ'য়ে যেতেও পারে।

—আপনি সঙ্গে যাবেন ত ?

সস্ত্রাঘ হাসিয়া গুণ গুণ করিয়া রাখিলেন—

‘পল্লব-দ্বাি আচ্ছা দিলে—’

পল্লব বলিল—আমি পল্লব-দ্বািও নই, আচ্ছা দেবার অধিকারও আমার নেই। আপনি যদি যান, আর দয়া কর্বে আমার সঙ্গে যেন, আমি যেতে পারি। এর পরিণতি দেখে আসা যায়।

—কিন্তু সে কি ভাল লাগবে ? একঘরে ব'লে মনে হবে না ? ধারে একটা গ্রাম পড়বে না, একটা পল্লব দেখা যাবে না, একখানা নৌকা নেই, আর জল, তা'ও ঐ হুঁকি, কোথাও পল্লব নয় যে রক্তাক্ত ব'লে মনে হবে, সে কি ভাল লাগবে ?

—তা' বটে !

দেখিন এখন তাহারা ক্যাম্পে ফিরিল, আকাশে চন্দ্র চলিয়া পড়িয়াছে।

প্রভাতে পল্লবভাঙ্গ করিয়া সুখ দুইয়া বাহিরে আসিয়া পল্লব দেখিল, প্রণাণ হাসিমুখে সস্ত্রাঘ বসিয়া আছেন। সস্ত্রাঘ চোখের ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া, মুগ্ধভাৱে জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন — তোমার ক্ষত্রেই ব'লে আছি। পাহাড়ের পাশ থেকে সুর্য্যোদয় দেখতে বড় সুন্দর।

—চলুন, দেখি সে। একমিনিট, আমি স্নিগারটা বদলে আসি।

পথে বাহির হইয়া সস্ত্রাঘ বলিলেন — আমাদের এখানে এখনও সুর্য্যোদয় হয় নি, নীচে কিন্তু অনেকক্ষণ হুঁহা উঠেছেন। তার কারণ, চারমিকেই পাহাড় দেখছে ত ! এই পরীক্ষণেই ভেদ কর্বে বেকতে তাঁর দেহী লাগে !

পল্লব বলিল — আমি ভেবেছিলাম, আপনি এখনও ওঠেন নি ; আপনাকে তুলাব মনে করছিলাম। তুলে, কোন জায়গার একই বেড়িয়ে আসা যাবে, এই ভাবছিলাম। রাতে কতক্ষণই বা ওয়েছি, তা'ও ঘুম হয়নি। কেবল মনে হইতেছে কখন সকাল হবে, কখন বেকব, কখন কিছু দেখব। জানেন ত,—

‘পোখা নাবী, গিরাই মুদিলে

চাহে পুনঃ পশিতে কাননে।’

তাহারা সে সময়ে পক্ষতের সাহায্যে উপস্থিত হইল, সেই সময়ে কপ করিয়া তখন অকণ কোন কাকে যে বাহির হইয়া পড়িলেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। সমস্ত ভূমির সঙ্গে পার্থক্য এইখানেই। সমস্ত ভূমিতে আমরা কি দেখি? প্রত্যাহার আকাশে একটির পর একটি বর্ষ বিকশিত হইতে থাকে, যখন স্বর্ষবর্ণ ধারণ করে, তাহার পরই সুর্য্যোদয়! এখানে তাহা নয়। অকণ যেন পাহাড়ের অপর পার্শ্বে কাহারও সহিত লুকোচুরি খেলিতেছিলেন, হঠাৎ এক সময়ে বৃষ্টি ছুঁইয়া নির্ভয় হইয়া প্রকাশ হইলেন!

পল্লব আসন্বে উজ্জ্বলিত হইয়া বলিয়া উঠিল—যে ক’দিন থাকব, এ দৃশ্য দেখব।

গোপালের তখনও অর্ধেক রাত্রি, পল্লব দিবিয়া আসিয়া অনেক চৌকালি করিয়া তাহাকে জাগাইল। গোপাল বলিল—ছুটির দিনেও যে একটু ভাল ক’রে ঘুমব, তোমাদের ক্ষেত্রে তারও যো নেই!

চাতুর্য টেবিলে সন্ধ্যায় বসিলেন—খাওয়া নাওয়া দেহেরই কিন্তু বেকতে হবে, নইলে কিরতে রাত ঘ’রে যাবে।

গোপাল ভিমাহিতে ভিমাহিতে প্রব্রু করিল—চুপুচু নই করতে কোথায় যাওয়া হবে শুনি?

সন্ধ্যায় বসিলেন—রাজকন্যা বাগদার কথা আছে না? পথে কয়খু? সেখানেই লাক, টি খাওয়া যাবে, বাবুবা হ’য়ে গেছে।

গোপাল বলিল—তোমার অকিল নেই?

—অকিল না থাকলে খাব কি রে, খালা! বাঙালীর অকিলও চিরতন, ফ্রেন্স লিভও দনাতন। আজ সেই বাবুবা।

পল্লব বলিল—সকলেই ত আর অকিলকে মণমালা করে না।

গোপাল হাসিয়া খোঁচাটা ভক্ষণ করিয়া কহিল—তা’ যেন হ’ল, সেখানে কি আছে ওমতে পাই কি?

—রাজকন্যার দামোদরের উৎপত্তি—হিন্দুগণের মন্দির—পরমেশ্বরের অস্তিত্ব পীঠস্থান।

গোপাল চক্ষু বৃদ্ধিঃ বলিল—মাথা খাড়াপ না হ’লে ঐ সব দেখবার ক্ষেত্রে কেউই চুপু নই করতে বাধ্য হয় না। আমার মনে হয়, তোমাদের একবার কাকে পুর আসা দরকার।

রাজার মন্দিরটহটী কাকে পন্নীতে মন্দির চিকিৎসালয় অথবা পাদনা। সারর প্রজিষ্ট, ইহা হইতেই ঐ রহস্যের উৎপত্তি।

পল্লব বলিল—ওলব কথার আপনি কান মেবেন না, মি: বোন্স! বেবে ত আসি, পরে দরকার হয়, কাকে বাগ্না যাবে। বিশেষে এলে, যারা কিছু বেবে না, আর প’ড়ে প’ড়ে গুমোর, কাকে তারের বেব না গা?

গোপাল মিটি মিটি হাসিতে লাগিল।

পল্লব বলিল—দ্বিদি যাবেন ত?

সন্ধ্যায় বসিলেন—সে ভড়ৎও বাদি! তিনি যাবেন কখন বল। এই মাত্র পুমোর যবে চুপলেন, বেকতে বেকটা, ভুটা হবে। যটী যানেক বাইরে পেকে আবার চুপতে হবে, বৈকালীর বাবুবা করতে হবে।

পল্লব বলিল—তা’ হ’লে আপনি আর আসি।

সন্ধ্যায় বসিলেন—আর কেউ দ্বি না ছোটো। অবশ্য সকলেই welcome! এস ভাল, না এস, তাও ভাল।

সন্ধ্যায় ‘বর’কে ভ্রাইতারকে ববর দিয়া রাখিতে বসিলেন, গাটী একটার সমর রাজকন্যা দাইবে, সে যেন জোয়ার থাকে।

গোপাল গোটা কতক হাই ভুলিল, আড়মোড়া ভাবিল, তারপর সকলের বিকে আছে আড়ে চাহিতে চাহিতে উঠিয়া দিয়া আবার পব্যায় প্রবেশ করিল।

—আজ্ঞা মি: বোন্স, দ্বিদি কি বোম ঐ বাবুবা?

—বোম, ভাই, বোম! জিন ন’ পদ্যদ্বিদি।

পল্লব কিয়ৎকাল চুপ করিয়া বহিল, তারপর বলিল—আপনি একলা একলা কি করেন?

—কি আর করব বল, ভাই! বতখন অকিলের কাক-কর্ষ থাকে, করি; তারপর অধর-ওবর; এগাশ-ওপাশ; শোয়া-বলা! কান!

পন্নব ছোট্ট একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—
আমারও ঠিক ঐ দশা ! সমস্ত দিন-রাত খাচার মধ্যে
জন্ম। কেড়ে কাটাতে হয়।—বলিতে বলিতে পন্নবের
দশরের অন্তত্বল মথিত করিয়া আর একটি দীর্ঘ
নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

সন্তোষ আপন মনে বলিতে লাগিলেন—তদবান্
তোমাদের অর্থাৎ ঐক্যজাতিক পুস্তকের অপেক্ষা
অধিক মাত্রার বুদ্ধি দান করেছেন। তাই তোমার
মিদি দেখলেন, এ লোকটা। হাকিমি ক'রে গ্রন্থ। ঠেসিয়ে
পাশই ক'রে চলেছে, হুতরাং তিনি স্থির করলেন, এই
পাশাঙ্গার সঙ্গে থেকে পাশে দিগ্ধ হওয়ার চেয়ে
পরকালের দিকে এগিয়ে যাওয়াই ভাল। আর এ-সকল
বাংলাদেশে চিন্তা কার্যে পরিণত করতে শেখাও তোমাদের
হয় না। কারণ পরকালে লক্ষ্যে তোমাদের চেতনা
পুস্তকের চেয়ে চেয়ে বেশী। হাক্কে গল্প বাজে কথা !
এক হাত তাসে রাজী ?

—ও'কনে ? কি খেলা হবে ?

—কিছু না হয় পিটোপিটিও হবে। অকিসটা যে
কানাই করা গেল, তার একটা মর্যাদা আছে ত ?

পন্নব সাগ্রহে কহিল—বেশ ত !

হু'হাত পিটোপিটি খেলিয়া দেখা গেল, মনে না।

সন্তোষ বলিলেন—এস, ক্যারাম খেলা যাক।

ক্যারামে পন্নব 'সবাসাটা' বলিলেও চলে, ভারতের
সঙ্গে খেলিয়া খেলিয়া এ-খেলার সে বিশেষদগ্ধ দক্ষতা
অর্জন করিয়াছিল ; বলিল—সেই ভাল।

হু'টার খটাখট শব্দে পার্শ্বের ক্যাম্পের পর্দা সরাইয়া
গোপাল বাহির হইয়া আসিল, বলিল—না, একটু
নিরিবিলা শাখনা করবার স্থানেরও অভাব হ'বে পড়ল
দেখছি।

পন্নব বলিল—ছুটির দিনে ঘুম, এত অল্প শব্দে ভাঙে ?
গোপাল একটা কেদারা টানিয়া বলিয়া পড়িয়া
কহিল—বেশ ভেবে সে ত দেখতেই পাচ্ছি।

সন্তোষ বলিলেন—না হে গোপাল, অমন কুঁড়ুর মত
ব'লে থেকে। না, আর খানিক জুমাবার চেষ্টা করলে।

—না, দশটা বাকল, একেবারে বানাহার সেবে
শোয়া যাবে 'খন।

—দশটা, তাইত ! বলিয়া পন্নব তাড়াতাড়ি খেল।
তাহিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল ; বলিল—দান সেবে নিই
সে, বারোটা 'রেডি' হ'তে হবে ত ?

—Latest মাড়ে বাতো, বলিয়া সন্তোষ সিঁদারেট
ধরাইলেন। পন্নব বাহির হইয়া গেল।

গোপাল ক্যাম্প খাটের উপর ভুইয়া এপাশ-ওপাশ
করিতেছিল, পন্নব বেশবাপ হুসপার করিয়া আসিয়া
কাছে গাঁড়াইয়া বলিল—তা' হ'লে বাই ?

গোপাল তাহার পানে চাহিয়া রহিল ; চাহিয়া বেন
তাহার আশ মিটিতেছিল না। পন্নব স্তম্ভরী, এ-সজ
তাহার চেয়ে বেশী অবগত কে ছিল ? তবু তাহার মনে
হইল, আম বেন রূপপাশে বান ডাকিয়াছে। গোপাল
কন্ করিয়া পন্নবের একখানা হাত ধরিয়া ফেলিয়া
কহিল—কোথায় যাবে এই রোমে ? তার চেয়ে তব
পড়—আরাম কর !

পন্নব শব্দায় বলিয়া কহিল—না ছিঃ। উনি প্রায়
আমখন্টা 'রেডি' হ'য়ে গাড়িতে রয়েছেন। তুমিও কেন
চলো না, লস্টাটি, চলো।

আজিকার কুজলচর্চা হইতে জুতাটি পর্দাত
গোপালের পর্দাবেষ্ণের বন্ধ হইয়া উঠিয়াছিল,
গোপাল সেখিতে সেখিতে বলিল—দিসিরও ইচ্ছে নয় যে,
তুমি বাও।

পন্নব সন্তত হইয়া উঠিয়া কহিল—মিদি ত পুঝো-
আজিক নিজেই বাস্ত, কে কোথায় যাচ্ছে না-যাচ্ছে তার
খবর তিনি কি রাখবেন ?

—তুমি জিজ্ঞাসা ক'রে এ-না-হয় দিমিকে।

পন্নব একমুহুর্ত নীরব থাকিয়া, কঠিন হইয়া কহিল,
দিমিকে বলতে পেন কে ? তুমি ?

গোপাল এ কথা আর দাবা দিল না।

পন্নব বলিল—আমি বাড়ি দিসির কাছে। গার
আপত্তি। কি ছেনে আমা দরকার।

—গুনবে, আপত্তি কি ?—বলিয়া গোপাল হাসিল।

—না। ওনতে হয়, তাঁর মুখে ওনব।

এই সময় বাহির হইতে ডাক আসিল—পন্নব, এরই মধ্যে তুমি জিন কোয়ার্টার সেরী ক'রে কেনেছ।

—আমি আসছি। বাহিরের দিকে চাহিয়া পন্নব এই কথা কয়টি বলিয়া নত হইয়া গোপালের কুকের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিল—আমি না, দিদির অমত কেন ও কিসের! জানবার চেষ্টা না করাই বোধ হয় ভাল। সে বাই হ'ক, তুমি চলো, তোমার পায়ে পড়ি, আমার এই একটি কথা রাখ।

গোপাল বলিল—বোড়-ক'প, চুটোছুটি আমার ভাল লাগে না।

—কিন্তু আমার লাগে যে! আমার ধীবনটা যে ঐ ক'রেই কেটেছিল গো! তোমার পায়ে পড়ি, ব্যগ্রতা করি, একটাবার একটি কথা আমার রাখ, আর কখনও তোমায় কোন অহরোধ করব না।—গলায় স্বরে ধল হুলহুল করিতেছিল, প্রাণপণ বসে পন্নব অপ্রতিরোধ্য করিয়া রাখিয়াছিল।

গোপাল বলিল—এমন হাতী-বোড়া কি আছে যে, না গেলেই নয়?

পন্নব অতিক্রমে কহিল—মাস্তব কি হাতী-বোড়া দেখেই বোড়ায়? তা' ছাড়া আর কোন আনন্দই তার নেই?

গোপাল ওশাল কিরিতে কিরিতে কহিল—আমি জানি নে, ইচ্ছে হয় যেতে পার। আমি ওসবের মধ্যে নেই।

পন্নব নিম্নলিখিত নৃত্য মাটির পানে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গোপাল তাহার দিকে চাহিয়া নাই মনে হইতেই ছুইট চক্ষু কাটিয়া ধরবার ধারে অঙ্গ বাহিরিয়া আসিল। ছুই চোখের ছুইট ধারা গড়, গড় হইতে চিবুক ভাসাইয়া বিগ্নু বিগ্নু করিয়া মাটিতে করিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, ডাক ছাড়িয়া কীসে! আরও ইচ্ছা হইতেছিল, সে চলিয়া যাব। কাহারও কথা সে ওনিবে না। সারাটা জীবন সে কি অন্ধকারে আবদ্ধ থাকিতেই

সমগ্ররূপ করিয়াছিল? তাহার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন দুলাই কি নাই?

গোপাল ভদ্রিক কিরিয়, চক্ষু বৃষ্টিয়া পড়িয়াছিল, কহিল—বাবে ত যাও না, ব'লে রইলে কেন?

পন্নবের বাগ চড়িয়া গেল। বলিল—বাবই ত! বদিয়াই সে পদ্মা নদীয়া বাহিরে আসিল। কোমের মাগনে চল শুকাইয়া নিয়াছিল, দাখটা বহাফলে হুঁহিয়া ফেলিল।

সন্ধ্যা কার্পেটের উপর পায়চারি করিতেছিলেন, নিমিষ্টের মত বলিয়া উঠিলেন—আজ তবে থাক পন্নব, বেলাও প্রায় প'ড়ে এল, আর—

'আর'টা শেব হইল না; পন্নব 'আর'-এর শোনাগে ওনিবার মত কিংকাল অপেক্ষা করিয়া রহিল; তারপর দীর স্বরে ভিজালা করিল—বাবেন না?

সন্ধ্যা প্রোন্ম ও প্রোন্ম কঠে কহিলেন—না। বিশেষ, গোপালের যখন ইচ্ছে নেই, তখন থাক।

পন্নব মাটির পানে চাহিয়া নির স্বরে কহিল—ওর অমতে বিশেষ আসত বে'ত না, দিদি অমত করাতেই সব গোল হ'য়ে গেল।

সন্ধ্যা আকাশ হইতে পড়িয়া বলিলেন—ঠারও অমত! তা' হবে! তবে ত গোথবোধ হ'য়ে গেল, পন্নব। ছড়িটা ছুড়ায় ঠুকিতে ঠুকিতে বলিলেন—তা' হ'লে বাই, বাদর-লাজন্তো হুঁপিয়ে।

তিনি চলিয়া দ্বাইতেছিলেন, পন্নব ডাকিয়া বলিল—মি: বাস!

কিরিয়া গাড়াইয়া সন্ধ্যা বলিলেন—বলুন।

'তুমি' যে 'আগনি'র রূপ পরিগ্রহ করিল, পন্নব তাহাও লক্ষ্য করিল।

—বাইরে চলুন, বলিয়া পন্নব নিজেই অগ্রসর হইল। বাহিরে আসিয়া অতি দরিকটে গাড়াইয়া বলিল—আগনি আমার তুল বুজেন না ত?

সন্ধ্যা হাসিয়া বলিলেন—না, পন্নব।

পন্নব অঙ্গকণ্ড কঠে কহিল—আমায় কমা

করেছেন বলুন! আপনার কাছ থেকে জবাবটি না। শুনলে আমার লজ্জার গীমা থাকবে না।

'আগনি' আবার 'তুমি' হইল।

—না, না, তোমার দোষ কি, পল্লব? তুমি ক্ষমা চেয়ে আমাকে অপরাধী ক'রো না।

পল্লব যেন শুনে নাই অথবা জুখের চাপে তাহার সর্বেঞ্জির অবশ হইয়া গিয়াছিল, বলিতে লাগিল—আমার যে কি কষ্ট হচ্ছে তা' আমি কি ক'রে বোঝাব আপনাকে! বিয়ের পর থেকে বেশ ত বদ্ধ ছিলাম নিজের ঘরে; আমার বালা, আমার কৈশোর, আমার প্রথম যৌবন সেই বদ্ধ ঘরের মধ্যেই সমাধিহ হইয়াছিল। এই ছ'দিন আপনার এখানে, আপনার আদরে, আপনার ঘরে আমার জীবনের সেই প্রথম দিনগুলি ফিরে পেয়েছিলাম! কিহ সে আমারই ক্লম! বা' সমাধিহ তা'কে ফিরে পেতে বাজরাই ক্লম! আমাকে আগনি বাপ করুন, সর্বোৎসাহ, আপনাকে অপাক্তির যাবে কেনে আমার জুখের গীমা নেই, আমার একথা আপনি বিশ্বাস করুন।—সে আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

—আমি বিশ্বাস করেছি, পল্লব। নিজের মনের পতি দিয়েই বিশ্বাস করেছি। ঐ পুজো-পাঠ সন্ধ্যা-আত্মিকের ভলে আমার জীবনকেও আমি বহনিন পোর দিয়েছি।

আমারও উচিত ছিল না সে পছোড়ার করতে যাওয়া।

পল্লব সন্তোষের কণ্ঠের কাতরতা মর্মে মর্মে অশ্রুভর করিতেছিল, প্রত্যেকটি শব্দে যে দরদ করিতেছিল তাহা তাহার হৃদয়কে মথিত করিতেছিল। এ প্রসঙ্গ শেষ করিবার মানসে মিনতিপূর্ণ স্বরে কহিল—তা' হ'লে বাই। বলুন, মনে জুখ রাখবেন না?

সন্তোষ ক্রিষ্ট স্বরে কহিলেন—মাপ কর, পল্লব! অতবড় মিথোটা গলা দিয়ে বেরবে না। জুখ থাকবেই, হয়ত আমরণ থাকবে, হয়ত পরকালে এ জুখের বোঝা নামাতে পারব!

পল্লব ত্রুতে দ্বিজালা করিল—পরকালে কেন?

—শুনবে কেন?

—না, না, শুনব না, দয়া ক'রে পোনাবেন না! আপনার পায়ে পড়ি, পোনাবেন না—বলিয়া, কাঁদিয়া, হস্তপায় অস্থির হইয়া, বাগবিদ্ধা হরিণীর মত পল্লব পলাইয়া গেল।



প্রাচীন কলিকাতা

(বাগবাজারের ইতিহাস)

কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, কাব্যরত্ন, উল্টটমাগর, বি.এ

(পূর্বাহ্নতি)

৮। মার্হাট্টা ডিট ও মার্হাট্টা ডিট লেন

রত্নাকী ভোঁসলার পুত্র নানকী ভোঁসলা বহু-সংখ্যক মার্হাট্টা-সৈন্য লইয়া ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা-দেশ আক্রমণ করেন। মার্হাট্টা-সৈন্যগণ “বনী” নামে খ্যাত। বালেশ্বর হইতে রাজমহল পর্যন্ত স্থান তাহারা ভীষণ উৎপাত-পূর্বক দমত্বনি করিয়া কেসিয়াছিল। তাহারা প্রথমতঃ হাবড়ার আসিয়া উপস্থিত হইল। তৎপরে মালিখা, বাগি, উত্তরপাড়া, ভক্তকালী, ঈরামপুর, হুগলী, বৈষ্ণী প্রভৃতি স্থান লুণ্ঠন করিতে করিতে বর্ধমানে দিয়া দেখা দিল। এখানে তাহারা রাজবাড়ী লুণ্ঠন-পূর্বক কালনা, কাটোয়া প্রভৃতি স্থানে উপদ্রব করিয়া তাহা চাষিয়া কেলিল। অবশেষে নবী-পার হইয়া তাহারা মুরশিদাবাদে নবাবের নিকটে দিয়া চৌধ অর্থাৎ রাজস্বের চতুর্থাংশ চাহিয়া বলিল। শুধু তাহাই নহে। জনং খেতের (১) বাটী ও তাহার টাকশাল লুণ্ঠন করিয়া তাহারা গারি কোটা টাকা মুদ্রার স্বর্ণ ও রৌপ্যের সামগ্রী লুণ্ঠন করিয়া লইল। বর্গাদিদের নাম শুনিতেও অজ্ঞান বাঙ্গালীর হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

সন্ধানদীর পশ্চিম-পার হু প্রজাদপ এবং কলিকাতার বসিন্দুগ ও অজ্ঞাত অধিবাসি-সমূহ বর্গাদিদের ভয়ে ভীত হইয়া ইরোজদিদের নিকটে দিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তখন নবাব আলিবর্দী খাঁ বাঙ্গালার সিংহাসনে আসীন বহিয়াছেন।

(১) কডোয় জনংখতের দিগুণ ইখা দিল, এবং কৌশল গাংর প্রতি কিলুপ ভৌগল স্বজাতের করিয়াছিল, তাহা “রদ-মাসর” নকশাত ভাঙুতী মহাপনের নিঃসিহিত সমস্তা-পূহল-কবিতা দেখিলেই জিলক্স বৃকিতে পাশা যায়—

বাঙ্গালীরা ইরোজদিগকে বলিলেন, “আমরা স্বয়ং অর্ববায় ও পরিশ্রম-পূর্বক বাগবাজার হইতে আরম্ভ করিয়া এবং কলিকাতার পূর্বদিক দিয়া ভবানীপুর পর্যন্ত একটা খাত কাটিয়া দিতে প্রস্তত আছি। আপনাতা এ বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করুন। আপনাদিগকে টাকাকড়ি দিতে হইবে না। খাত কাটিয়া কলিকাতা ঘেরিয়া কেসিতে পারিলে বর্গীগণ আর কলিকাতায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। আমাদিগকেও তাহাদিগের নিখাতন সহ করিতে হইবে না।” ইহা শুনিয়া প্রেসিডেন্ট সাহেব কহিলেন, “নবাব আলিবর্দী খাঁর অহুমতি না পাইলে আমরা তোহাদিগকে খাত কাটবার অহুমতি দিতে পারি না।” ইহা বদিয়াই তিনি খাত কাটবার অহুমতি লাভের ক্ষত নবাবকে বিশেষ অহুরোধ করিয়া

দমতঃ—“জনংখতের কাহে কুদর কোবার।”

মুদে—কি নবাব, কিবা রাজা, কিবা মহারাজ,
কি আমানী, কি করাসী, অথবা ইরোজ,—

যখন টাকার ধার হ’ত জয়োজব,

খুঁধিয়া উল্লিত বাখা কুহারি তখন,

জনংখতের কাহে তিবিই হাইবা

ঈরনাসহিব-পাঠ দিতেন সিখিয়া।

যাঁর হাবিদের সঙ্গে যবে কৌশল

সোণার মুরশিদাবাদ করে আক্রমণ,

জনংখতের পদে তখন লুটিল,

গারি কোটা টাকা কোরে কাড়িয়া লইল।

হীরা মণি মুদ্রা সোণা কণা কত আর,

কতই বডকী ছিল, কত অলঙ্কার,—

এ সব খুঁধিয়া যবে কৌশল লেন,

জনংখতের মনে ছুব নাহি হ’ল।

হেসে হেসে কল সোহে শেঠ-গিরী বুড়ো,

গারি কোটা টাকা মোর গারি কড়া কড়ি।

এ রদ-মাসর তাঁই যেন হার হার,

“জনংখতের কাহে কুদর কোবার।”

একখানি পত্র দিছিলেন। আলিবর্দী বাঁ বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি স্বস্তি বর্গীদিগের হস্তে নিরতিশয় নির্ভাতন সহ করিয়াছিলেন। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, “খাত কাটিবার অসম্মতি দিলে কলিকাতা অনেকটা নিরাপদ হইবে। বিশেষতঃ বর্গীদিগের উপদ্রব-নিবারণ করিতে হইলে ইংরাজেরাও আমাকে অনেকটা সাহায্য করিতে পারিবেন।” নবাবের অসম্মতি আসিল। প্রেসিডেন্ট সাহেব কলিকাতায় ও রঙ্গা-পারায় লোকদিগকে খাত কাটিবার অসম্মতি প্রদান করিলেন। প্রথমতঃ স্থির হইয়াছিল যে, উক্ত খাত ২১ হাত অর্থাৎ ৩১১০ ফিট প্রশস্ত হইবে। বাঙ্গালীদিগ কাল-বিলম্ব না করিয়া ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে খাত কাটিতে আরম্ভ করিলেন (১)। নিয়ম হইল যে, প্রত্যেক গৃহকে অন্ততঃ একটা করিয়া মজুর দিতে হইবে। কুমারটুলী-নিবাসী “গ্রাফ-মনিয়ার” প্রসিদ্ধ গোবিন্দরাম মিত্র মহাশয় সর্দাপেক্ষা অধিক মজুর নিয়াছিলেন। তখন এক জন মজুর উদ্বাস্ত পরিশ্রম করিয়া একটা পয়সা মাত্র মজুরী পাইত। তাহাতে তাহার ধোরাবী চলিত। সুরনিদ্রাবাসে নবাব-বাড়ীর রেকর্ড হইতে জানা যায় যে, তৎকালে একজন চোকপুত্রী বলবান পুরুষ পাচ আনা মাত্র খরচ করিয়া একমাস কাল স্বচ্ছন্দে জীবিকা-নির্ভর্য করিতে পারিত। সর্বমুখ দাত মাইল খাত কাটিবার কথা। হয় মাসের মধ্যে তিন মাইল কাটা হইল। একিকে বাসবাজার হইতে এবং ওদিকে গোবিন্দপুর হইতে খাত কাটা হইতেছিল। নন্দন-বাগানে গোবিন্দরাম মিত্রের এবং হালদী-বাগানে উমিচাঁদের সুরমা প্রাসাদ ও উজান ছিল। তাহারা তৎকালে কলিকাতার শ্রেষ্ঠ ও ধনাঢ্য লোক। তাহারা উভয়েই প্রেসিডেন্ট সাহেবকে

বলিলেন, “আমাদের বাদান-বাড়ী গড়ের মধ্যে রাখা হউক। গড়ের বাহিরে থাকিলে চোর ডাকাতের উপদ্রবে আমাদের বাস করা অসম্ভব হইবে।” ইহা শুনিয়া প্রেসিডেন্ট সাহেব হুতুম দিলেন যে, এই দুই জনের বাগান-বাড়ী গড়ের মধ্যে রাখিয়া একটু দুরিয়া দিয়া বেন খাত কাটা হয়। এই সময় আলিবর্দী খাঁর সহিত বর্গীদিগের সন্ধি হইল। বর্গীরা আর কলিকাতার দিকে আসিল না। অগত্যা আর খাত কাটিবার প্রয়োজন হইল না। ইটালী-কর্ণারের নিকট হইতে দক্ষিণ-দিকে ক্রিয়মাণ স্থান পর্য্যন্ত খাত কাটা বন্ধ রহিল। যে যে স্থানে খাত কাটা হইল, তাহা জলে পরিপূর্ণ হইল বটে, কিন্তু কয়েক বৎসর পরে নানা আবহাওয়া-রাশি পড়িয়া খাতের জল ভ্রংশ ও অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিল। তখন লর্ড ওয়েলেসলি এদেশের গভর্ণর-জেনারেল। তিনি মার্চ’টাউন্স-ক্লাইয়া দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু বস্ততঃ ক্লাইয়া সেওয়া হয় নাই। তবে খাত কাটিয়া যে মাটি চুই পার্শ্বে পর্জত-প্রমাণ জমা হইয়াছিল, তাহাই চৌরসু করিয়া ১৭২২ খৃষ্টাব্দে Circular Road নির্মাণ করা হইল। এখন আমরা যে স্থানকে “গড়পার” বলি তাহা গড়ের (মার্চ’টাউন্সের) পারে (বাহিরে) ছিল বলিয়া তাহার নাম “গড়পার” হইয়াছে। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে সাহেব ও বিবিগণ এই সারকুলার রোডে প্রাতঃকালে বাহু-সেবন করিতে আসিতেন।

কিন্তুপে মার্চ’টাউন্স (বর্গীর খাত) খনিজ হইয়াছিল, তাহা নিম্ন-লিখিত সমস্ত-পুথক কবিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। একদা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র দ্বীপচন্দ্র বীর সভাপতিত্ব রস-সাগর কৃষ্ণকায় ভাঙী মহানরকে “বর্গীর খাত” সম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত সমস্তাটী পূরণ করিতে নিয়াছিলেন। তদনুসারে রস-সাগর মহাশয় এই সমস্তা পূরণ করিয়াছিলেন—

সমস্তা—“অতাপি বর্গীর খাত রহে বিভ্রম।”

পূরণ—কি কাণ্ড হইয়াছিল হার কাটোয়ার,

ওমিলেই বাঙ্গালীর নৃক ফেটে যায়।

(১) “মার্চ’টাউন্স-ঘননের দ্বিত্ব ইংরাজেরা বাঙ্গালীদিগকে ২৫০০০ টাকা করের নিয়োগিলেন। বাঙ্গালীরাও এই টাকা ৬ মাসের মধ্যে ইংরাজদিগকে পরিশোধ করিয়াছিলেন।” *The Calcutta Municipal Gazette*, 1st. June, 1929

কাটোয়ার ছিল এক শতের ভাগ্য,
যদি দিয়া বণীপণ করে হারবার।
যাহা কিছু প্রকাশের ছিল টাকা-কড়ি,
পুত্রিয়া নইল সব করি' জুড়াহুড়ি।
ভীষণ বণীর ভরে দত্ত প্রকাশণ
মাটির ভিতরে পুঁতে রেখে দিল ধন।
কাল হাড়ি ছায়া করি' মাথায় লইয়া
প্রাণভরে ভলে দায় ব্যাকুল হইয়া।
মৃতিকায় নষ্ট করি' ল'য়ে ছায়া টোকা
আশ্রয় নইল তবে দিয়া মাথা ঢাকা।
কোম্পানীর কৃপাবলে কত শত জন
ধন ধান প্রাণ রক্ষা করিল তখন।
দক্ষার পশ্চিম পায়ে অধিবাসি-চর
প্রাণভরে নিল কলিকাতার আশ্রয়।
আলিবর্দী-নবাবের লইয়া সম্মতি,
নিরমিয়া গড়-খাত ইংরাজ স্মৃতি।
বাগ-বাড়ার হ'তে খাত আরম্ভ করিলা,
হয় মাসে দেড় কোণ প্রস্তুত হইলা।
করিল বেপের লোক কিবা পরিভ্রম,
এক এক বিহবল্য ব'লে হ'ল ভ্রম।
বণী-হাঙ্গামের এক প্রধান প্রমাণ,
“অভাপি বণীর খাত রহে বিজ্ঞান”।

মাহ'ট্টা-ডি-লেন সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।
কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি সেবিলেন, মাহ'ট্টা-ডি-
ক্রমশঃ বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইতেছে। তাহার জল
এত পঙ্কিল ও অস্বাস্থ্যকর হইতেছে যে, ইহা মান্যবিধ
চুক্তিক্রিয়া রোসের আবালকৃষি হইয়া উঠিতেছে।
বর্ষাকালে কত শত জন্তর বৃহস্পতি তাহাতে পড়িয়া চতুর্দিক
দুর্গন্ধবর করিতেছে। এই হেতু, মিউনিসিপ্যালিটি
ইহা বুঝাইয়া কেলিবার আদেশ দেন। বুঝাইয়া রাজ্য
প্রস্তুত হইল; এবং ইহার নাম হইল, “মাহ'ট্টা-
ডি-লেন।” ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দেই বোধ হয় এই নাম
হইয়াছে।

২। বাগবাড়ারে যুদ্ধ

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ১০ এপ্রিল তারিখে বাঙ্গালা, বিহার
ও উড়িষ্যার মহাব আলিবর্দী বা উমরী-রোপে
প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার তিনটি কন্যা ছিলেন,—
বেসেটী বেগম, মহম্মানা বেগম ও আমিনা বেগম।
বেসেটী বেগমের সন্তান ছিল না। আমিনা বেগমের
তিনটি পুত্র ছিলেন,— সিরাজ-উদৌলা, একরাম-
উদৌলা ও মিরজা মাদৌ। বেসেটী বেগমের সন্তান
না থাকায় তিনি একরাম-উদৌলাকে পোষ-
পুত্র লইয়াছিলেন। বেসেটীর স্বামীর নাম নিবাইল
মহম্মদ। আলিবর্দীর মৃত্যুর কিছু পূর্বে তাঁহার ঘোড়া
জামাতা নিবাইল মহম্মদের বৃত্তা হইয়াছিল। বৈষ্ণ-
ব-বংশের রাজা রাজবল্লভ (১) আলিবর্দীর সময় হইতে
ঢাকার নৌ-বিতাদের শাসন-কর্তা ও নিবাইল মহম্মদের
নায়েব ছিলেন। আলিবর্দীর মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে
তিনি সিরাজের ভয়ে আপনাবর ধন ও গোণ নিরাপদ
নহে, মনে করিয়া পুত্র রুক্মবল্লভকে বীর প্রচুর ধন
ও বহুদ্রব্য প্রদানি সহ কলিকাতার ইংরাজদের
আশ্রয়ে পাঠাইয়া দিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইহার
নাম রুক্মদাস। রুক্মবল্লভ গুর্জবতী নীকে সঙ্গে লইয়া
৩ পুরীধাম বাইবার ছলে ঢাকা ত্যাগ করিয়া ১৩ মার্চ

(১) আলিবর্দী বা ও সিরাজ-উদৌলার সময় বাঙ্গালার
ইতিহাসে দুইজন রাজবল্লভের নাম উল্লিখিত পাওয়া যায়।
একজন বৈষ্ণব ও আর একজন চাহার। যিনি ঢাকার নৌ-
বিতাদের শাসক ছিলেন, তিনি বৈষ্ণব ও তাহার উপাধি “সেন”।
পদ্মাবতীর তীরে তাহার ব্রহ্মা প্রাসাদ ও নবদ্বার ছিল। কাল-
প্রভাবে তাহা পতনপূর্ণ কিলৌ হওয়ার এই হাশে পদ্মাবতীর নাম
“কীর্তিনাশা” হইয়াছে। এখানে এই আসোচ্য “রাজবল্লভ”
বৈষ্ণব-রাজ্যের। মহাব নীরকালিহ ই'হাক ও ই'হার পুত্র
রুক্মবল্লভকে সম্রাট বাগির বক্তা রাখি। ও যুদ্ধ-বৃত্ত হইতে পরায়
নিকোপ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। আর একজন “রাজবল্লভ”
চাহার। ই'হার উপাধি “সোম”। ইনি মানকীরানের পৌত্র
ও কলিকাতার পুত্র। রাজবাড়ারে যে “রাজবল্লভ টিউ” আছে,
ইনিই সেই রাজবল্লভ। মানকীরান আলিবর্দীর বশকে বণীপের
সম্বন্ধে এবং রূপ-ভাবন পদার্থ হইতে সিরাজের বশকে তাইয়ের
সম্বন্ধে বুঝ করিয়াছিলেন। রাজবল্লভ পরিলেই ই'ইতিহাস
কোম্পানীর “রাজবল্লভ” (king of kings) হইয়াছিলেন।

তারিখে কলিকাতার আসিয়া উপস্থিত হইলেন।
আসিয়ার সময় কৃষ্ণবল্লভ কামিন্যবাজারের কুঠীর
অধ্যক্ষ জ্যাক্‌স্‌-সাহেবের নিকট হইতে ড্রেক-সাহেবের
নামে একখানি সুপারিস্‌-পত্র আনিয়াছিলেন। ড্রেক-
সাহেব তখন বালেশ্বরে বায়ু-পরিবর্তনের নিমিত্ত
সিরাহিলেন, এবং তাঁহার স্থানে ম্যানিংহাম-সাহেব
কার্য্য করিতেছিলেন। কৃষ্ণবল্লভ আসিয়া উমিচাঁদের
পথে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইংরাজেরা বলেন, কৃষ্ণ-
বল্লভের অকূল ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার নিমিত্তই
উমিচাঁদ তাঁহাকে সাধুর আশ্রয়-দান করিয়াছিলেন।
কৃষ্ণবল্লভকে ধন-সম্পত্তি সহ মুরশিদাবাদে ফেরৎ
পাঠাইবার নিমিত্ত সিরাজ ক্রোড়চরে ইংরাজদিগকে
পত্র লেখেন। ফাইট, জ্যাক্‌স্‌-সাহেবকে এই মর্মে
পত্র লিখিয়াছিলেন যে, আমি বরং কৃষ্ণবল্লভকে ধন-
সম্পত্তি সহ নবাবের নিকটে ফেরৎ পাঠাইতে পারি, কিন্তু
তাঁহার বাটীর ব্রীলোকদিগকে কিছুতেই ফেরৎ পাঠাইতে
পারিব না। এই কথা ফাইটের মাধ্যমের পরিচাষক।
জ্যাক্‌স্‌-সাহেব সিরাজকে এই কথা জানাইবা সিরাজ
সিরাজ ক্রোডে অধিপতি হইয়া উঠিলেন। ইংরাজদের
এতি সিরাজের আজ্ঞাক্রমে ইহাই প্রথম কার্য্য।

ইংরাজদিগের এতি সিরাজের আজ্ঞাক্রমে দ্বিতীয়
কার্য্য এই — উমিচাঁদের আত্মীয় রাজারাম-নামক
একটি লোক সিরাজের প্রধান চর ছিলেন। সিরাজ
কিছু পুর্বেই রাজারামের মূখে জনিয়াছিলেন, ইংরাজেরা
কলিকাতার দুইটী নতুন চূর্ণ নির্মাণ করিয়াছেন,
এবং পুরাতন চূর্ণের ক্ষয়্য করিতেছেন। ইহা সত্য
কি না, তাহা জানিবার জন্য সিরাজ রাজারামকে আমে-
শন। রাজারাম নিজ মহোদয় নারায়ণ দাসকে এই
বিষয় জানিবার নিমিত্ত কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন।
নারায়ণ দাস হুঙ্গলী পর্য্যন্ত আসিয়া গুলিলেন যে,
সিরাজের লোক কলিকাতায় বাইলে ইংরাজগণ-কর্তৃক
হৃত হইতেছেন। তাঁহার সঙ্গে নবাব-প্রেরিত একখানি
চিঠি ছিল। ইহা ড্রেক-সাহেবের নামে লিখিত। ইহাতে
সিরাজ লিখিয়াছিলেন, "তোমরা পত্র-পাঠ-মান

কৃষ্ণবল্লভকে তাহার ধন-সম্পত্তি ও ব্রীলোকগণ সহ
পাঠাইয়া দিবে।" নারায়ণ দাস উমিচাঁদের বাটীতে
সিরা আশ্রয় লইয়াছিলেন, কারণ উভয়েই পরস্পর
আত্মীয়। ড্রেক-সাহেব সেদিন বারানসিতে সিরাহিলেন।
একজ্ঞ উমিচাঁদ, নারায়ণ দাসকে সঙ্গে লইয়া হুঙ্গলয়
ও শিয়ার্কিন্স-সাহেবের নিকটে সিরা তাঁহাদিগকে
সিরাজের পত্রখানি দিলেন। তাঁহার পত্রখানি লইলেন
না। পরদিন প্রাতঃকালে উমিচাঁদ ও নারায়ণ দাস
পুনর্বার ড্রেক-সাহেবের নিকটে গমন করেন। তখন
ড্রেক, ম্যানিংহাম ও হুঙ্গলয়-সাহেব, পত্রখানি লগ্‌য়া
উচিত কি না, এবিষয়ে ভ্রূ-বিতর্ক করিতেছিলেন।
পরে তাঁহার সিদ্ধি করিলেন, পত্র লগ্‌য়া হইবে না,
ইহা এখনই ফেরৎ দেওয়া উচিত। ড্রেক-সাহেব হুঙ্গল
দিলেন যে, এখনই নারায়ণ দাসকে কলিকাতা হইতে
বাহির করিয়া দেওয়া উচিত। ড্রেক-সাহেবের হুকুমে
নারায়ণ দাসকে নানাজগে লাঞ্চিত ও অপমানিত
করিয়া কলিকাতা হইতে ডাফাইয়া দেওয়া হইল।
নারায়ণ দাস সিরাজের একজন বিশ্বাস চর। তিনি
ইংরাজদিগের কার্য্য-কলাপ দেখিতে লাগিলেন। লোকের
পুনর্বার কলিকাতায় প্রবেশ করিয়া তিনি বাণবাজারে
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন, পেরিন-সাহেবের
বাগানের উপর একটী আট-কোণা চূর্ণ নির্মিত
রহিয়াছে, এবং তাহার উপরি-ভাগে প্রহরী সকল পাহারা
দিচ্ছে। তৎপরে সন্ধ্যার উপর দিরা উত্তর দিকে
হাইতে হাইতে দেখিলেন, চিৎপুর নবাব-পটীর কিয়দূর
উত্তরে কান্দিপুর-নামক স্থানে আরও একটী আট-
কোণা কেলা নির্মিত রহিয়াছে। এই কেলায় নাম
Kelsall House বা Kashipur House (১)। এই বাড়ী-
খানি এখনও বিদ্যমান। নারায়ণ দাস মুরশিদাবাদে
সিরা সিরাজকে জানাইলেন যে, ইংরাজেরা দুইটী কেলা

(১) এই বাড়ীখানি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। বাণবাজার বাসের
উপর দিরা বরাদনবর খাইতে হইলে যদ্যে কান্দিপুর পড়ত।
এই কান্দিপুরে ৮৭তলাগ দিলের যে জিল ছিল, তাহার
উত্তর-দিকে পূর্ব-পশ্চিম বিস্তৃত একটি স্নাত্ত আছে। ১৮৮০

নির্মাণ করিয়াছেন,—একটি বাগবাগানে ও আর একটি কান্টিনে। ইহা গুনিয়াই সিরাজ ক্রোধোত্তর হইয়া ড্রেক-সাহেবকে পত্র লিখিলেন, “তোমরা এখনই এই চুইটা কেন্দ্র ভাঙ্গিয়া ফেল, নচেৎ আমি ঈর্ষই দিয়া কলিকাতা-আক্রমণ করিব।” প্রথমতঃ সিরাজ কাশিমবাগারের কুড়ী আক্রমণ করিয়া তাহা একপ্রকার ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি কলিকাতা-আক্রমণ করিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

ইরোজেরা সিরাজের আগমন-বার্তা গুনিয়া আপনাদের কিল্লা গোলা-গুলি, কামান ও রসম আছে, তাহাই পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ১১ জুন তারিখে পল্টার ড্রেক-সাহেব হিঙ্গাব করিয়া দেখিলেন, ইউরোপীয়, আর্মিনিয়ান ও ফিরিসি সৈন্য গইয়া সর্ব্ব-সম্মত তাঁহাদের ৫১৫ জন বোজা আছে। তাঁহারা নামে বোজা,—শীঘ্রই একদিনও বন্দুক ধরেন নাই। কর্ণেল ফট-সাহেব, অর্ধ-সাহেবকে লিখিয়া-ছিলেন, কলিকাতা রক্ষা করিতে এক হাজার সোকের অধিক লাসে না।

খ্রীষ্টাব্দে আদি দেখিয়াছি যে, এই রাজার উত্তর পার্বে বড় বড় লাক্ষী বাড়িবাড়ি ছিল। এখন তাহা আর নাই। এই রাজা বহিরা পশ্চিম-দিকে বাইরেই একটা প্রসিদ্ধ গ্রাম দেখা যায়। ইহা টিক বহাভীরে অবস্থিত। এই গ্রামে ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্তারী কেল্ডাম্ (Kaldam) নামক একজন লাসেব একাধিক বাগান ও একটি আটকোয়া বাড়ী নির্মাণ করাইয়া-ছিলেন। ১১০৭ খ্রীষ্টাব্দের জীবন জন্মে ইহা তার ও ইহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হওয়ায় ১১০৮ খ্রীষ্টাব্দে কেল্ডাম্-সাহেব ইহার ক্ষতকার করিতেছিলেন। সিরাজ-উদ্দৌলার এগান ৫৪ রামারানের সহায়ক দায়িত্ব দায়িত্ব দাস এই আটকোয়া বাড়ীখানিক কেন্দ্র বসে করিয়া সিরাজকে তাহা বলিয়া বিদ্যাহিসেন। ১১১৪ খ্রীষ্টাব্দে তার হবার্ট ডোম’ লুইস-ফোর্টেস জন্ম হইয়া কলিকাতায় আসেন। তিনি আসিয়া এই বাড়ীখানি কেল্ডাম্-সাহেবের বিকট হইতে ক্রম করিয়া ইহাতে বাস করিতে থাকেন। ডোম’ এই বাড়ীতে একটি সুবৃক্ষ লাইব্রেরী করিয়াছিলেন। এই বাড়ীঘরের বাড়ী হইতেই তিনি মহারাজ নবজাদার কানিস কিলসের সমস্ত লুইস-ফোর্টেস দাঁড়তেন। এখন কোনো জ্ঞানীপুত্র হজবাবুর বাহার আছে, সেইখানে জাহার একখানি বাগান-বাড়ী ছিল। ডোম’-সাহেব, ডটর জন্সন, পোন্ডলি, বৃদ্ধজন্ম ও তার জোড়বা কেন্দ্র পদম বসু ছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া

Hill সাহেব মহাপ্রসিদ্ধিগ্ৰাহকেন (২), “ইরোজেরা সৈন্য-সহিবের করিবার এইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন। বর্তমান রাইটস’-বিগলিডের পূর্ণসিদ্ধি “কোট হাউসের” নিকটে এক সারি কামান বসান হইল। ফেটন ও হুগ্গেল-সাহেব ইহার অধ্যক্ষ রহিলেন। সেখানে ১৮ জন সৈন্য বসিত হইল। দক্ষিণ দিকে এক সারি কামান বসান হইল, এবং ১৮ জন সৈন্য ও সেখানে রাখা হইল। কামান ও ন্যাকট সাহেব এইখানে কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। উত্তর দিকে যে সকল কামান বসান ও ৬৮ জন সৈন্য রাখা হইল, সিন্ ও মেশ লুইট-সাহেব তাহাদের ভারত্ব করিতে লাগিলেন। পুরাতন কোলা ভারত্ব করিবার নিমিত্ত নির্মিত ও বেলাদী সাহেব-দর নির্মিত রহিলেন। বাগবাগানে পেরিন-সাহেবের বাগানের উপরি যে নুন্ন কেন্দ্র নির্মিত হইয়াছিল, সেখানে এন্সাইন্ পিকার্ড-সাহেব ২৪ জন মাত্র সৈন্য গইয়া তাহা রক্ষা করিবার ভার প্রাপ্ত হইলেন। প্রথমেই সিরাজের সেনাপতি বীরজাদার বাগবাগার আক্রমণ করিবেন, ইহা জানিতে পারিয়া বর্তমান অল্পপূর্ণ-বাটের নিকটে পহার

দর ডোম’, ডটর জন্সনের বিকট হইতে একখানি পিকার্ড-পত্র (Letter of introduction) আনিয়া গায়েন বেটসকে ইহা বিদ্যাহিসেন। তিনি কলিকাতার জব্বারী চাকরী করিত আসিলে জন্সন, বৃদ্ধজন্মকে বলিয়াছিলেন, “Chambers, you find, is gone far, and poor Goldsmith is gone much further.” ১১১৮ খ্রীষ্টাব্দে ফিট-বন্দ-কালে ডোম’ তাহার জন্মলা লাইব্রেরী একজন টাকা দুগো বাগিন লাইব্রেরীকে বিকৃত করিয়াছিলেন। তৎপরে ডোম’ের বাগান-বাড়ীখানি “কেল্ডাম এন্ড গোয়াস কোম্পানী” দ্বারা ক্রয় করেন। ইহার ক্রয়কৃত দর দর তার দর দর লিগ (Sir Lawrence Paul) এই বাড়ীতে বাস করতেন। সর্ব্বশেষে ডি-এন্ড রিচার্ডসন (D. L. Richardson) এই বাড়ীতে ১০০০ টাকা ভাড়া দিয়া বাস করিয়া পটৌলচাচার হিন্দু-লোকে পড়াইতে বাইতেন। লট কালন বাহার এই বাড়ীর লুণ্ণ একখানি পিকার্ড-কালে লিখিয়া রাখিয়াছেন, “This house was the residence of Sir Robert Chambers, Chief Justice of the Supreme Court, Calcutta, 1791-1798.” এখন এই বাড়ীর নাম “লোন্ডন বাগান বাড়ী”।

উপরি-ভাগে তিনখানি ঘুঘুর জাহাজ রক্ষিত হইল। প্রথমখানির নাম Prince George, হেস্-সাহেব ইহার ক্যাপ্টেন্; দ্বিতীয়খানির নাম Fortune, ক্যাম্বেল-সাহেব ইহার ক্যাপ্টেন্; এবং তৃতীয় খানির নাম Chance, চ্যামপিয়ন-সাহেব ইহার ক্যাপ্টেন্ রহিলেন। আরও বন্দোবস্ত রহিল যে, যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে গ্র্যাপ-সাহেব ২০ জন সৈন্য লইয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন। বাহারা কামান ছুড়িবার ক্ষমতা লভ্য ছিল, তাহাদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইল। কুলী-গণ পাছে ভয়ে দুঃস্থল হইতে পলাইয়া যায়, এই ভেতু তাহাদিগেরও বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইল। ইংরাজদিগের এই উদ্ভাবনা রহিল যে, তাহাদিগের কামান ও সোলা-গুলি অতি অল্প। বাহা কিছু বাক্স ছিল, তাহাও ভিন্না অর্থাৎ ভাংখুঁতে। পুরাতন কেল্লার ভিতরে অধিক সোকা থাকায় ভিন্না বাক্সগুলি ভোজে ওকাইয়া লইবার স্থান ছিল না। আরও বন্দোবস্ত রহিল যে, ইংরাজ সীলোকগণ কামানে বাক্স ঠাসিয়া দিবেন। কলিকাতার উত্তর-দিক্‌বর্তী বাঙ্গালী-লিপকে রক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থা করা হইল না। কেবল বলিয়া দেওয়া হইল, তাহারা বয়ঃ আশ্রয়কা করিবে এবং রাত্তা সকল বড় বড় গাছ কাটিয়া তাহা ফাটা বন্ধ করিয়া রাখিবে। ইংরাজেরা মনে করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালীগণ আমাদের প্রজা; হুতরাং তাহারা আমাদেরই সাহায্য করিবে। কিন্তু সাহায্য করা হুত্রে পাকুক, তাহারা পূর্বেই হইতেই ধন-সম্পত্তি ও স্ত্রী-পুত্র লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। এই দলে মনে রাখা উচিত যে, সাহসী ও তেজস্বী পুরুষ, কুমারটুলী-নিবাসী নহর-কোতোয়াল গোবিন্দরাম মিত্র মহাশয় এই সময়ে আপনার লাঞ্ছিত, সড়কীয়, বন্ধুস্বামী লইয়া আশ্রয়কা করিয়াছিলেন। মিত্র মহাশয় বড় বড় গাছ কাটাইয়া আনিয়া চিংপুর-রোডের উপর পাহাড়ের মত তৃণাকার করিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন আমাদের মনে রাখা উচিত যে, সে সময়ের পূর্বেই

গোবিন্দরাম মিত্র ৮সিঙ্গেসবী-মুন্ডি, নবরত্ন এবং মোড়-বাঙ্গালা স্থাপন করিয়াছিলেন। ৮সিঙ্গেসবী দেবীর পশ্চিম-দিকে পাঠকরণ যে একটি বৃহৎ মন্দির দেখিতে পান, তাহা ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দরাম মিত্র নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহার নাম ছিল “নবরত্ন”। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দের তীব্র কড় তাহার বৃহৎ রত্নটী পড়িয়া যায়। বর্তমান অষ্টাদশোন্নী মহামেট অপেক্ষাও ইহা উত্তর ছিল।

১৩ জুন দিবসে গঙ্গার উপরে একখানি নৌকা ধরা পড়িল। ড্রেক-সাহেব হতুম দিয়াছিলেন, বাহার প্রতীক্ষণ হইবে, তাহাকেই যেন গ্রেপ্তার করা হয়। নৌকার গাভি-মাতীকে ধোঁয়া করায় তাহারা বলিল, “এই নৌকার ভিতরে দুইখানি চিঠি আছে। যেদিনী-পুরের কোমদার ও দিয়ারের প্রধান চর রামারাম এই দুইখানি চিঠি উন্মিচাদকে দিয়াছেন।” রামারাম বৈবাহিক হুত্রে উন্মিচাদের কুটুম্ব ছিলেন। তাই তিনি এই চিঠিতে উন্মিচাদকে সাবধান করিয়া দিতেছেন যে, “নবাব কলিকাতা-আক্রমণ করিতে বাইতেছেন। আপনি বিশেষ সাবধান থাকিবেন। আপনার মূল্যবৎ বস্ত্র ও ধন-সম্পত্তি নিরাপত্তে রাখিবেন এবং আমারও খিনিগ-পত্র কলিকাতায় না রাখিয়া তাহা আমাদের কেন্দ্র পাঠাইয়া দিবেন।” চিঠিগুলি পাঠাবী তাহার দেখা ছিল দেখিয়া ড্রেক-সাহেব উন্মিচাদের প্রতি অবিবাল করিতে লাগিলেন। শুধু তাহাই নহে,— ড্রেক-সাহেব তাহাকে পুরাতন কেল্লামধ্যে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এদিকে উন্মিচাদের সম্বন্ধী হজুরীমল হালদী-বাগানে উন্মিচাদের বাড়িতে এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। তিনি বাটার চাকরদিগকে বলিলেন, “যে সকল সাহেব আমাদের আশ্রয় করিতে আসিয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে গুলি কর।” হজুরীমল গ্রেপ্তার হইবার পূর্বেই আপনার বাম হস্তখানি কাটিয়া ফেলিয়া-ছিলেন। জগন্নাথ সিংহ নামক একটি সোকা উন্মিচাদের পুরাতন ভৃত্য ছিল। বাটার সীলোকগণ জগন্নাথকে বলিলেন, “তুমি আমাদের ক্ষমতা চিতা প্রদত্ত কর।

সামর্য্য লকলেই অধি-কৃষ্ণে স্বীণ দিহা পুড়িয়া মরিব।”
 ক্ষয়প্রাপ্ত বাড়িতে আত্মন ধরাইয়া গিলেন, এবং
 উমিটাসের বাড়ীর ১০টা গ্রীলোকের এবং ৩টা বাগ-
 বলিকার মন্তক স্বহস্তে কাটিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি
 যহুতে আপনায় পলায় স্ফল্যায় দিয়া আঘাত করেন।
 কিন্তু তাহাতেও তাঁহার মৃত্যু হইল না। মহাশয়
 চল্লিশের সাহেব ডাক্তার ও সার্জন ছিলেন। তিনি
 তৎক্ষণাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত পলায় ব্যান্ডেজ বাঁধিয়া ও চিকিৎসা
 করিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন। এই সময়ে কৃষ্ণবস্ত্র
 পলাইবার চেষ্টা করিলে চল্লিশের সাহেব তাঁহাকে
 কোয়ার্টার মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

কলিকাতায় ইংরাজদিগের কথা এতক্ষণ বলা
 হইল; এখন সিরাজের সৈন্যশাসক মীরজাফর কি
 করিলেন, তাহাও বলা উচিত। চিৎপুর, কান্দীপুর,
 পাইকপাড়া, বরাহনগর ও টালার নবাবের সৈন্য
 তাঁহু কেলিয়া বসিল। দিল সাহেব মহাপ্রসন্ন বসেন,
 “তাঁহাদের দখ্যা ৩০,০০০ হইতে ৪০,০০০ এর
 মধ্যে। সঙ্গে ১৫০ হস্তী ছিল এবং কামান দুইভিয়ার মত
 ২৫ জন ইউরোপীয় ও ২০০ ফিরিবী পটুগিজ ছিল”।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জুন (১৭৬০ বঙ্গাব্দে ৬ আষাঢ়
 বুধবার) আসিয়া উপস্থিত হইল। বেলা ১২টার সময়
 চিৎপুরের দিক্ হইতে বজ্রধ্বনির জ্বায় কামানের ঘন
 ঘন ভীষণ গর্জন শুনিতে পাওয়া গেল। পূর্বে
 বলিয়াছি, বাগবাঝারে যে ৮-খর সাহেবের বাস ছিল,
 তাঁহার্য্য আত্ম অস্ত্রধ্বন করিলেন। যে কয়েক খর
 বাগদারী ছিলেন, তাঁহারা বীর বীর ধন-সম্পত্তি লইয়া
 কোথায় চলিয়া গেলেন, তাহা বলা যায় না।
 কলিকাতার অধিকাংশ বাগদারী ব্যবসায়িগণ সম্রাট
 পশ্চিম-পারে ও মজার্ত্ত হায়ে প্রস্থান করিলেন। প্রথমতঃ
 সিরাজের ৫০০০ সৈন্য মার্শাটা-ডিউ অতিক্রম করিয়া
 বাগবাঝারে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিল। তৎকালে
 চিৎপুরে মার্শাটা-ডিউর উপরিভাগে একটা draw-
 bridge (টানা দাঁকো) ছিল। মনে করিলে ইংরাজেরা
 এই ব্রিজ গুলিয়া বিতে ও বন্ধ করিতে পারিতেন।

বেলা ১টা বাজিল। নবাব-সৈন্য বাগবাঝার-
 কোয়ার্টার উপরি-ভাগে গেলো বর্ধন করিতে লাগিল।
 এখানে এনসাইন্ড পিকার্ড-সাহেব এই কোয়ার্টার
 করিতেছিলেন। স্কেটক্রাউট গ্রাফ, তাঁহাকে সাহায্য
 করিবার মত ২টা কামান ও ৫০ জন সৈন্য লইয়া উপস্থিত
 হইলেন। নবাব-সৈন্যের পরাধর্য্য হুতি হইল। কয়েক-
 জন ইংরাজ নিহত হইলেন। আহাৎ ও দুর্লে থাকিয়া
 থাহার্য্য দুহু করিতেছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ পলায়
 প্রাপ্ত হইলেন। দমদমা রোডের নিকটে Cow Cross
 নামক একটা স্থান আছে। (১) নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা
 এই স্থান হইতে আসিয়া ও মার্শাটা-ডিউ পার হইয়া ১৬ই
 জুন শুক্রবার বিকসে দ্বিতীয় সোহানর একরায়-উদ্দৌলার
 সহিত কলিকাতায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে
 ১০০০ লুটনকারী লোক ছিল। তিনি হাঙ্গলী-বাগানে
 উমিটাসের দুববা ও স্ত্রীস্বত প্রাসাদে আসিয়া বাস
 করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে ১৫০টা হাতী
 আসিয়াছিল। যে স্থানে তাহার্য্য থাকিত, সেই স্থান
 মজাণি “হাতীর বাগান” নামে বিখ্যাত হইয়া বহিয়াছে।
 বাগবাঝারের দুহু সিরাজের সেনাপতি মীরজাফর
 পরাধিত হইয়া দমদমা-রোড দিয়া লাগ-বাঝারে
 প্রবেশ করিলেন। কারবাইকেস-ইসলাজারের নিকটে
 মীরজাফর ২টা কামান কেনিয়া দিয়াছিলেন। ৮১০ বৎসর
 হইল যখন দমদম ব্রিজ নির্মিত হয়, তখন প্রায় তিন
 জালার নিয়ে এই দুইটা কামান পাওয়া দিয়াছিল।
 একটা কামান ৮-ফুট ২-ইঞ্চি ও আর একটা কামান
 ৮-ফুট ৮-ইঞ্চি। বড়ীর দুখের ব্যাস-পরিমাণ ৪৪-ইঞ্চি
 ও ছোটটির ৪-ইঞ্চি।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে আমি বাগবাঝার-খালের দক্ষিণ
 পাড়ে ১টা কামান মাটিতে পোতা দেখিয়াছিলাম।
 এখন তাহা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ
 হয়, পলি-মাটিতে তাহা ঢাপা পড়িয়া গিয়াছে।

(১) এই স্থানের আর একটা নাম “ক্যাম্প বাগান”
 (Camp Bagan)। সিরাজ-উদ্দৌলার সৈন্যগণ এই স্থানে ক্যাম্প
 করিয়া তাঁহু কেনিয়াফিল বহিয়া ইহা এখনও “ক্যাম্প বাগান”
 বলিয়া অভিহিত বহিয়াছে।—লেখক

এখন কেবল ২টী মাত্র কামান দেখিতে পাওয়া যায়,—
গদ্যার ধারে চিংপুর-পোলের ঠিক দক্ষিণ দিকে একটী,
এবং তাহার কিছু পূর্বে আর একটী। বোধ হয়,
মীরজাফর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া এই কামানগুলি ফেলিয়া
গিয়াছিলেন।

সিরাজ-উদ্দৌলার কতকগুলি সৈন্য সিমলায় আসিয়া
রহিল। ইংরাজেরা তাহাদের অনেকগুলিকে বন্দী
করেন। বন্দীগণ বলিল, “নবাব বলিয়াছেন, ১৮ জুন
জুজবার মুসলমানদিগের মতে অতি শুভদিন। ঐ
দিন তিনি পুনর্বার বাগবাজারের কেল্লা আক্রমণ
করিবেন”। উমিচাদের ভৃত্য জগন্নাথ সিংহ সিরাজের
নিকটে উমিচাদের একখানি চিঠি আনিয়া দিল।
তাহাতে লেখা ছিল, “মাহাড়া-ডিচ্ এখনও সম্পূর্ণ কাটা
হয় নাই। আপনি ডিচ্ অতিক্রম করিয়া ও লাল-
বাজার হইতে ধাপা পর্য্যন্ত রাস্তা দিয়া স্বচ্ছন্দে
পুরাতন কেল্লা আক্রমণ করিতে পারেন।” পুনর্বার

বাগবাজারের কেল্লা সিরাজ আক্রমণ করেন নাই।
এই পর্য্যন্ত বাগবাজারের যুদ্ধের কথা শেষ হইল। তার
পর অনেক কথা আছে। লালবাজারে যুদ্ধ, রাণীমুদীর
গলিতে (ব্রিটিশ্ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে) যুদ্ধ, বড়বাজারে
আগুন ধরাইয়া দেওয়া, মিসন-রো’তে যুদ্ধ, অন্ধকূপ-
হত্যা ইত্যাদি অনেক বিষয় আছে, তাহা বাগবাজার-
যুদ্ধ-বর্ণন-কালে বর্ণনা করা আবাস্তর। *

(ক্রমশঃ)

* Hill's Bengal in 1756-1757, Vol. I; Mr. W. H. Carey's The Good Old Days of John Company, Vol. I; Dow's Hindusthan; Orme's War in Hindusthan, Vol. I; Blochman's Calcutta, A Century Ago; Holwell's Black-Hole; Captain D. L. Richardson's Siege and Fall of Calcutta; A. K. Roy's Calcutta, Past and Present, —এই সকল পুস্তক অবলম্বন করিয়া “বাগবাজারে যুদ্ধ”-বিবরণ লিখিত হইল। — লেখক



ইংরাজী শিক্ষা ও তাহার প্রথম যুগ

শ্রীঅনাদিনাথ মুণোপাধ্যায়

ইংরাজী ভাষা এখন আমাদের রাজভাষা। আমাদের ব্যবসা, চাকুরী প্রভৃতি দাবতীয় সৈন্যবিন কার্য বর্ধমানে ইংরাজী হাব-ভাব এবং ইংরাজী ভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে চলে না। আপন বন্ধ-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজন — এমন কি পিতামাতার সহিত আলাপ-আলোচনা, বরকল্পার কথা কহিতে গেলেও, সেই কথোপকথনের মধ্যে দুই-চারিটা ইংরাজী শব্দ না থাকিলে আমরা যেন আমাদের বক্তব্য স্পষ্টে ভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। বিভিন্ন-জাতির ভাষার মধ্যে বিশেষত্ব-জাতির ভাষা অল্প-বিস্তর সর্বমুখেই সম্মিশ্রিত হইয়া থাকে; কিন্তু বঙ্গভাষার মধ্যে বিভিন্ন বৈশেষিক শব্দ বৈদেশিক অধিক পরিমাণে প্রবেশলাভ করিয়াছে, সেজন্য আর কোন ভাষার পাওয়া যায় না। বঙ্গভাষার উৎপত্তির প্রকৃত ইতিহাস এবং তাহার উৎকালীন বিকাশ এখনও গঠিতরূপে নির্ণীত হয় নাই। বর্ধমানে যে সময় হইতে আমরা বঙ্গভাষাকে শ্রদ্ধা পাইতেছি, তাহার সমকাল অথবা তাহার কিছু পরবর্তী সময় হইতে বঙ্গদেশে বিদেশীয়দিগের আগমন আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারি। আমাদের মনে হয়, এই কারণেই বঙ্গভাষা কখন স্রষ্টভাবে পড়িয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। মুসলমান স্বাধীনতার বাঙ্গালার কবিশস্যময়ের কথা ইতিহাসে কিঞ্চিৎ-পরিমাণে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু উদ্ভাষা বাঙ্গাল ভাষা কখনও পূর্ণ হয় নাই। মুসলমান-শাসক একত্বিন বাঙ্গালার পৌরাসিক কাহিনী রচনা করাইয়া রচয়িতাকে পুত্রকৃত করিয়াছেন, আবার একত্বিন বাঙ্গালার কবিকে হত্মকৃত করিয়া বৈরাগ্যে তাহাকে বশপূর্ণে পাঠাইতেও ছাড়েন নাই *। পাঠানদিগের সময় হইতে ক্রমান্বয়ে সে

এক-একটা জাতির আগমনে এক-একটা রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইতে লাগিল, এবং যখন যে জাতির প্রাধিকার বর্ধিত হইল, তখন সেই জাতির শাসন, ব্যক্তি-বিশিষ্ট এবং উৎকালীন নৃপে সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাহাদের দুই-চারিটা শব্দ বঙ্গভাষার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। এইরূপে আব্দী, ফারসী, আর্মী, পর্তুগীষ, ওলন্দাজ, কন্নড়ী, মিনেমার প্রভৃতি অনেক ভাষার অনেক শব্দই বঙ্গভাষার অঙ্গীকৃত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বঙ্গভাষার মধ্যে ইংরাজী শব্দ যে পরিমাণে প্রবেশলাভ করিয়াছে, সেজন্য অধিক পরিমাণে আর কোন ভাষা আমাদের ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় নাই।

ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা আমরা লাভবান অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, তাহা আলোচনা করিতে চাহি না; কিন্তু ভাষা ও মস্তিষ্ক অল্পবোধে আমরা ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, আমরা ইংরাজী শিক্ষা একমিকে আমাদের প্রাচ্য স্বাভাবিকে যেমন নষ্ট করিয়াছি, তদন্থিকে সেইরূপ আমরা যথেষ্ট উন্নতিলাভও করিয়াছি। পাকাতা শিক্ষার শিক্ষিত যুগের মধ্যে আমরা একত্বিন সুরাপান ও উদ্ভান-বাটিকার আনন্দ-প্রমোদকেই ইংরাজী শিক্ষার চরম সার্থকতা মনে করিতাম; কিন্তু আজ সে সুল আমরা অনেকটা বুঝিয়াছি। ইংরাজী শিক্ষা একত্বিন আমরা 'Captive Lady', 'Rajmohan's Wife' প্রভৃতি লিখিত শিখিয়াছিলাম, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে আমাদের সে ভ্রম কাটিয়া যায়,—আমরা 'সেবনান বধ', 'জর্জনানন্দিনী' প্রভৃতি লিখিয়া বঙ্গভাষাকে পৌরবাসিত করি। বঙ্গভাষার এই পৌরব-প্রাপ্তির নিমিত্ত আমরা যে ইংরাজী ভাষা-শিক্ষার নিকট কণী তাহা স্বীকার করা যায় না। আজকাল আমাদের মূখে একটা

* ভট্টাচার্যের বক্তব্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন, ভট্টাচার্য কখনও স্বাধীনতা বৃত্তি করেন, সেই সময় তাহাকে তাহার পুত্রদের ভোষণে মৃত্যু উদ্ভাষা দেওয়া হয়।

কথা শাণিয়া আছে যে, আমাদের স্বকীয় কাব্য, মর্শম, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, পবিত্র প্রকৃতি সকলই ছিল,—বিশেষ্যবাদের আগমনের বহুপূর্ব হইতে আমাদের দেশে সে সকলের মধ্যে আলোচনা হইত এবং তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়। স্বাক্ষকাল ইংরাজী-শিক্ষার মধ্য দিয়া বাহ্য। কিছু পাইতেছি, তদনুসারেই আমাদের পুরাতন জিনিষ বলিয়া আমরা গুরু অমূল্য করিতেছি। ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা যে আমাদের হাতছাড়া হইয়াছে—এ কথাটাও বিখ্যাত নয়। এই হাতছাড়া হইবার দুইটা কারণ আমরা দেখিতে পাই;—এক বিশেষ্য আক্রমণ ও দ্বিতীয় আমাদের অবিশুদ্ধকায়িতা। আমরা বোধ হয়, শ্বেতাঙ্ক কারণই অধিক পরিমাণে আমাদের পুরাতনীকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ভারতের বাহিরে অজ্ঞাত দেশেও যুগে যুগে বহু রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইয়া দিয়াছে, কিন্তু ভারতের মত এমন করিয়া তাহারা তাহাদের পূর্বজন পৌরবাদি মিলেতে কানদাগরে নিষ্কিপ্ত হইতে দেয় নাই। চং, দারিদ্র্য, অস্বাভাবিকতা, সাম্যপরিবর্তনের পর আবার তাহারা যখন তাহাদের হুদিন ফিরিয়া পাইয়াছে, তখনই তাহারা তাহাদের হারানোকে আবার খুঁজিয়া আনিয়া তাহার পৌরব আরও বর্ধিত করিয়া তুলিয়াছে; কিন্তু ভগবৎ-রূপায় আমাদের যদি কখন আবার হুদিন ফিরিয়া আসে, তখন কি আমরা আমাদের ক্ষত রক্ত উদ্ধারের ক্ষত তাহার প্রকৃত উপাদানের একটু অংশও খুঁজিয়া পাইব? বর্তমানে ইংরাজী শিক্ষার সাহায্যে তাহার মধ্য দিয়া আমরা যদি আমাদের পুরাতন ককালেরও সাক্ষাৎ পাই, তাহা কি আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর নয়? বিশেষ্য ভাষার বিশেষ্য লিখিত আমাদের ইতিহাসকে আজ আমরা ব্রহ্মাস্বক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি, কিন্তু আমরা যে আমাদের পিতামহের উত্তরন আর এক পুরুষের নাম বলিতে পারি না, সেটা কি একটা জাতিসত্ত্ব কলঙ্কের কথা নয়? একদিন বাহা হারাইয়া আমরা অপরাধ করিয়াছি.

বিশেষ্য ভাষার সাহায্যে তদনুসারের কথকিৎ পুনরুদ্ধার দ্বারা আজ তাহারই প্রায়শ্চিত্ত করা হইতেছে বলিয়া আমাদেরকে মনিয়া লইতে হইবে।

ইংরাজী শিক্ষা বহুবাহীর মধ্যে কেমন করিয়া প্রচলিত হইল, তাহার ইতিহাস আমরা অনেকই জানি না। ইংরাজ জাতি এসেছে আসিয়াছিলেন বণিকের বেশে—বাণিজ্য করিতে। তখন এসেবাসীকে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া অথবা এসেছে ইংরাজী সাহিত্য প্রচার করিবার কোনই সার্বকতা তাহাদের ছিল না। বরং এসেদের ছই-চারিটা কথাবার্তা তখন জনগণের করিয়া লইতে পারিলে ব্যবসারের পক্ষে তাহাদের সুবিধামূলক হইত। এই সকল বিশেষ্য বণিকৃদিগের সংস্পর্শে আসিয়া যে ছই-চারিজন এসেদীয় ব্যক্তি ক্ষুদ্র স্বার্থের বিনিময়ে বিশেষ্যগত বণিকৃদিগকে বহুমাত্রার অনন্ত ভাণ্ডারের সন্ধান দিবার ক্ষমতা নিহত হইত, তাহারাও পরস্পর সমিশ্রণের ফলে ছই-চারিটা ইংরাজী শব্দ শিখিয়া ফেলিত। সেই সম্পদের বলে তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বাহা পারিত বণিকৃদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিত; অবশিষ্টাংশ হস্তগত নাড়িয়াই শারিয়া লইত। এইভাবে কিছুদিন কাটিবার পর ইংরাজেরা যে পরিমাণে এসেদীয় ভাষা আয়ত্ত করিলেন, তাহার পরামর্শের একাংশও এসেদীয়গণ ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে পারিল না। এসেদের শ্রীমন্তগণত, এসেদের

• কুলচাণ্ডাল্য আমাদের বংশজালিকা সঙ্কট রক্ষা করেন বলিয়া জানা যায়। সেই সকল বংশজালিকার ধর্ম্য মূল্য-নির্ধারণের ক্ষমতা বহুমাত্রাধারায় হরপ্রণাল্য শাস্ত্রী-বহাণর জনক মূলকারিকা-রক্ষকের নিকট তাহার নিজ (মূলকারিকা-রক্ষকের) বংশাবলীর পরিচয় চান; কিন্তু হুসেয়ে বিদ্য, সেই রক্ষক মহাশয় তাহার সমস্ত পরিচয় দিতে পারেন নাই। ইহাতে শাস্ত্রী মহাশয় এর করেন যে, বাহায়া গয়ের বংশাবলী যুগ যুগ বয়িয়া সত্যক রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাহাদের নিজ বংশের প্রতি এ উপাসীত কেন? ইহাতে সেই রক্ষক মহাশয় উত্তর দেন যে, গয়ের পিতা-পিতামহের নাম কলনামূলক করিয়া দেওয়া যায়, কিন্তু নিজ বংশে বা' ডা' নাম প্রয়োগ করা সেই বংশেরের পক্ষে অশুভ।

ব্যাকরণ বিভিন্ন ভাষার অনুবাদিত হইয়া লন্ডনের এক লিঙ্গনের হাশাখানার মুদ্রিত হইয়া গেল; কিন্তু এসেইরপণ তখন মুদ্রাশ্রয় অথবা মুদ্রিত পুস্তকের কোন আভাষও পাইল না। বহুবাসীকে ইংরাজী শিক্ষা দানের জন্য ইংরাজগণ তখন মনসেযোগ্য করিবার



উইলিয়াম কেরী

সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই এবং চেষ্টাও করেন নাই। তাহার। আপন ব্যবসা-বাণিজ্য সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রথমে ছুটাহুটি করিয়া দিন কাটাইলেন। তাহার পর খটনাটকে যখন বাজালানের একটু শীর্ণ আলোক তাহাদের চক্ষুর সম্মুখে হুটীয়া উঠিল, তখন তাহাদের নিকট হইতে বাঙ্গালীর ইংরাজী শিক্ষার আশা অয়িত হইতে সরিয়া গেল।

বাঙ্গালী ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিবার প্রথম সুযোগ পাইল ঐরামপুরের খুটান ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারীদের নিকট হইতে। ইহার বহুপূৰ্ণ হইতে কেবলট প্রভৃতি মিশনারীরা খুটেশ্ব-প্রচারোক্ষেত্রে একদেশ আদিত-হিসেন, কিন্তু তাহারা আপনাপন প্রচারকাৰ্য্য লইয়াই দিন কাটাইয়া গিয়াছেন। মিনেমার-অধিকারবৃত্ত ঐরামপুরের পাদরী কেরী, মার্ম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ

মনীষিগণই আমাদিগকে পাশ্চাত্য শিক্ষার শিক্ষিত করিবার প্রথম এবং প্রধান উদ্যোক্তা। এদেশে ব্যক্তিরা তাহার। নিমেষের। এসেইর বিভিন্ন ভাষা ধ্বংস যথেষ্টরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রতীচ্যের অনেক কিছু তাহার। অকাতরে আমাদের দান করিয়া এইখানেই জীবন শেষ করিয়া গিয়াছেন। খুটেশ্ব-প্রচার যদিও তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি এসেমবাসীর সর্ববিধ উন্নতির জন্য তাহাদের যে আন্তরিকতা দেখা বাইত, তাহা খুটেশ্ব-প্রচারের অভিনব কোণল বলিয়া মনে করা যায় না। বাঙ্গালা দেশকে তাহার। আপন। ভাবিয়া, তাহার। স্বয়ং থেকে যত্নপভাবে আপন। করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয় যে, আমাদের উন্নতির পথে তাহাদের সাহচর্য্য সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত বা ধর্মগত স্বার্থপ্রবোধিত নয়।



জন মার্ম্যান

ইহার জন্য তাহাদিগকে নিগ্রহ সহ করিতে হইয়াছে, হুর্দশায় পতিত হইতে হইয়াছে, কেবল বিশ্রাম এবং আমাদের জন্য অর্থকষ্টে পতিত হইয়া মার্ম্যান সাহেবকে জীবন বিসর্জনও দিতে হইয়াছে।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে দিনেমারগণ তাঁহাদের সনক অল্পবায়ী বার্ষিক ৩০,০০০ ত্রিশ হাজার টাকা ধাননা নবাব সরকারে আহার দিয়া বৎসরে প্রথম ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদিগকে চন্দননগরের সরকারে করাসীদিগের আশ্রয়দানে দেখা যায়। তাহার পর ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর তাঁহারা নবাবের পরওয়ানা অল্পবায়ী ঐরামপুর ও আক্কাইর হাট বিধা জমি অধিকার করিয়া তাঁহাদের নিজস্ব উপনিবেশ স্থাপন করেন। মধ্যে ইরোজদিগের সহিত তাঁহাদের ছইবার সনোমালিকি সংঘটিত হয়; কিন্তু তাহা আপোষে মিটিয়া যায়। পরে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর নিয়ানকুই বৎসর তিন দিন অধিকারের পর দিনেমারগণ ইরোজের হাটে ঐরামপুরকে দিয়া দেশে ফিরিয়া যান।

ঐরামপুরে দিনেমার-অধিকারের নিয়ানকুই বৎসরের শেষ অর্দ্ধাংশ আমাদেব ইংরাজী-শিক্ষার প্রথম যুগ। মি: টমাস নামক একজন ইংরাজ চিকিৎসক এদেশে আসিয়া কলিকাতার এক মিশন স্থাপন করেন। পরে তিনি নীলকর সাহেব হইয়া নালদহে গমন করেন এবং সেখানকার নীলচাষীদিগের মধ্যে খৃষ্টধর্ম-প্রচারের চেষ্টা করেন। ইহাতে স্বকল পাইয়া তিনি ১৭২২ খৃষ্টাব্দে ইংলেণ্ডে ফিরিয়া গিয়া সেখানে আপন সাক্ষ্যের কথা বিবৃত করেন। মি: কেরী ইহার কথা আকৃষ্ট হইয়া পর বৎসর এদেশে চলিয়া আসেন এবং খৃষ্টধর্ম-প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ১৭২২ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর কুক পাল নামক জনৈক খেঁয়র ব্যক্তিকে তিনিই সর্বপ্রথম খৃষ্টধর্মে নীক্ষিত করেন। ওনা যায়, এই বীক্ষা-কার্য কুক পালের অহুরোষে ক্রিষ্ট আরাধ্য ভাবীরখীতটে পুত আক্কাইরশিলবারা সন্মানিত হইয়াছিল। ইহার পর মি: কেরী দিনাকপুর অকলে গমন করিলে ডা: মার্শম্যান ও মি: ওয়ার্ড আর হুইজন পাদরী * সমভিব্যাহারে আমেরিকান + জাহাজে

চড়িয়া কলিকাতার আসিয়া পৌছান। এখান হইতে তাঁহারা কেরী সাহেবের সহিত মিলিত হইবার জন্য মালদহের উদ্দেশে যাত্রা করিবার উত্তোপ করিলে ইংরাজ কোম্পানী তাহাতে বাধা দিলেন। ইউরোপে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের তখন বিপুল বিক্রম। এসময়েও ইংরাজ ও ফরাসীতে খৃষ্টানতা লাগিয়াই আছে। মার্শম্যান ও ওয়ার্ড সাহেবকে ইংরাজগণ ফরাসীদের গুপ্তচর ভাবিয়া মালদহে বাইতে দিলেন না। তাহার



উন্নয়ন ওয়ার্ড

পর অনেক ভাবিয়া ও চিন্তা করিয়া ইংরাজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধ্যক্ষ তাঁহাদিগকে কলিকাতার অদূরে দিনেমার-উপনিবেশ ঐরামপুরে বাইয়া অপেক্ষা করিতে বলেন। ১৭২২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর রবিবার সকালে তাঁহারা ঐরামপুরে আসিয়া পৌছান। ঐরামপুরের দিনেমার গভর্ণর কর্ণেল বাই তাঁহাদের যথেষ্ট অভ্যর্থনা করেন। এখান হইতে তিনি পুনরায় মি: ওয়ার্ড ও মি: ব্রান্সফোর্ডকে ইংরাজদিগের নিকট বাইয়া তাঁহাদের সৎ উদ্দেশের কথা জানাইবার জন্য কলিকাতার প্রেরণ করেন। তাহাতেও কোন ফলোদয় হইল না। দিনাকপুরে সূক্তনবাটীর নীলকুঠিতে বসিয়া মি: কেরী যখন মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতির আসমন ও হুঁকারি সন্বাদ পাইলেন, তখন তিনিও অনেক চেষ্টা করিয়া ইরোজদিগের মন পাইলেন না।

* Grant ও Brunsdour.

+ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কোর জাহাজে তাঁহাদিগকে উঠিতে দেখা হয় বাই।—Bengal as a Field of Missions—Wylie.

তখন দিনেবার গভর্ণর ঈরামপুরেই তাঁহারে নিবন
প্রতিষ্ঠা করিবার ক্ষমতা অধিকার করিলেন এবং সেই
কার্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার ক্ষমতা নিজেও প্রতিপন্ন
হইলেন।

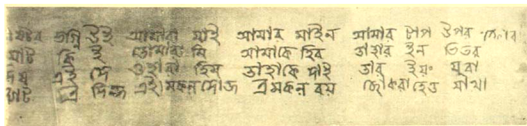
দর্শনাত্মকদিগের সহিত ইংরাজদিগের এই অহি-
নকুল সম্বন্ধ একমাত্র রাজনৈতিক কারণ বলিয়া ধরিয়া
গণ্য হইয়া না। তখনকার ইংরাজ-সমাজ যে সকল
কার্যে নিপুণ থাকিতেন, তাহার সহিত দর্শনের সম্বন্ধ ছিল
পরস্পর-বিরোধী। কোনজন দর্শনের সম্পূর্ণ তাহারা
যেন সহ করিতে পারিতেন না। এমন কি ইংরাজ-
অধিকারের মধ্যে যে কোন দর্শনাত্মককে দেখিতে
পাইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ আশ্রমে চাপান করিয়া
দিবার ব্যবস্থাও গভর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলে ঘোষিত
হইয়াছিল। ইতিহাসের ব্যক্তিগতভাবেই সেই সময়ের
ইংরাজ-সমাজের ইতিহাস আশ্রমে করিলে ইহার
প্রকৃত কারণের সন্ধান পাইবেন। ইংরাজ-সমাজের
ছোট-বড় কেহই এই পুণ্ডিতদের পাপের হস্ত হইতে
নিষ্কৃতি পান নাই। হেষ্টিংসের নৈতিক চরিত্র,
ফ্রান্সিসের পাপ-প্রবৃত্তি, ম্যাকডোনাল্ডের উদ্যম শাসনা,
পরব্রাহ্ম-ব্রাহ্মণ ব্যক্তিত্ব, বারওয়েল-স্ট্রোভার ও হেষ্টিংস-
ফ্রান্সিসের বৈরত-বুদ্ধি, এমন কি মুসলিম কাউন্সিলের
সদস্যদের মধ্যে পরস্পরের হত্যাকাণ্ডের ও প্রধান
বিচারপতি হার ইলাইজ। ইম্পের নৃশংসতা, সন্তোষাচার
ও পাশাপাছান প্রভৃতি সর্বজনবিসিত কাহিনী
ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মুসলমানগণ এদেশে ইসলামধর্ম
প্রচারে বহু-পরিশ্রম করিয়াছিলেন, পর্তুগীশগণ দ্বন্দ্ববৃত্তি
অবলম্বনের সহিতও অসংখ্য বীজ্য ভূমিতে দৃষ্ট
হইতেন না, ওলন্দাজগণ আপন ক্রম উপনিবেশ সমূহের
বিস্তৃতি হানে ইট-পাথরের উপাধানে-মন্দির নির্মাণ
করিয়া সহরের শোভা বর্ধন করিতেন, বৃটিশ-প্রচারই
যুগ উদ্বেগ উদ্ভাব করিয়া স্পেন ও আমেরিকা জয়
করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু ভারতে ইংরাজ ইট
ইতিয়া কোম্পানী আপনাদের অধিকারের মধ্যে বৃট-

দর্শনাত্মকদিগকে যে বাস করিতে দিতেন না, এবং
দূর করিয়া দিবার ক্ষমতা বিবেচনায় চেষ্টা করিতেন,
তাহার একমাত্র কারণ — তৎকালীন ইংরাজ-সমাজের
দর্শনবিশিষ্ট নৈতিক অবস্থা। দর্শনাত্মকরা যে পাপের
প্রতিবাদ করিবেন, — ইহা তখনকার বেজাজারী
ইংরাজদিগের সহ্য হইত না।

কয়েক সপ্তাহ পরে কেরীসাহেব ঈরামপুরে
আগিয়া উপস্থিত হন এবং মার্ম্যান-প্রমুখ মিশনারীদের
সহযোগে বিখ্যাত 'ঈরামপুর মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন।
দর্শনাত্মক মিশন-পরিচালনার ক্ষমতায় তাহাদিগের
এতদধীন জ্ঞান ও তাত্ত্বিকতার প্রয়োজন হইল।
তাঁহারা হিন্দু-পণ্ডিত রাখিলেন, মৌলভী নিবৃত্ত
করিলেন এবং আরও শিক্ত বিভিন্ন ভাষা-ভাষীদের
নিকট হইতে নানাবিধ ভাষা শিক্ষা করিয়া সন্তত,
বাঙ্গালা, তিব্বতী, পারসিক, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী,
উড়িয়া, কন্নড়ী, তেলুগু, বর্মী, আসামী, বুটানী,
মালয়ী, তিস্তী এবং চীনভাষার বাইবেল অনূবাদ
আরম্ভ করিয়া গেলেন। বৃটিশ-প্রচার করা যদিও
তাঁহাদের যুগ উদ্বেগ ছিল, তথাপি এতগুলি ভাষা
আরম্ভ করিবার সময় বিভিন্ন বৈদ্য লোক ও সমাজের
সম্পর্কের প্রভাব তাহাদিগকে কেবলমাত্র প্রচারকের
আবেষ্টনীর মধ্যে আটক করিয়া রাখিতে পারিল না।
আপনাদিগের উদ্বেগ বশাস্তব বজায় রাখিয়া এই
দেশ ও জাতির কল্যাণ-কামনা তাঁহাদের মনোমধ্যে
বীরে বীরে জাগিয়া উঠিল। ইহাদের পূর্বে ও
সমকালে হালহেড, যে প্রচলিত সাহেবেরা এতদধীন
হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তত কার্যকরী
চল নাই। বৈষ্ণব-সাহিত্য হইত ইহা বাঙ্গালা পুস্ত-
সাহিত্য বৈষ্ণব উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, মিশনারীদের
প্রচেষ্টায় এই সময় বাঙ্গালা পুস্ত-সাহিত্যও সেইরূপ
উন্নত হইবার প্রথম পদ পুঁজিয়া পাইয়াছিল।
'মুহাজ্জরী' অথবা 'ঈরামপুরী' বাংলা বলিয়া নামেরা
সেই সময়ের পুস্ত-সাহিত্যকে উপর্য উপর দেখিলেও

ইহার প্রথম প্রচার ও প্রচলনের অধিকাংশ সম্বন্ধ সেই সকল মিশনারীদেরই প্রাপ্য। এসেপবাসীকে পাণ্ডাত্য শিক্ষা দান করিবার আগ্রহ যদি একমাত্র পুষ্টি-ধর্মপ্রচারোদ্দেশ্যেই হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের অস্মিত বন্ধভাবার পুষ্টি ধর্মপুস্তকসমূহই যে কার্য সাধন করিতে পারিত। কিন্তু সে উদ্দেশ্য তাঁহাদের ছিল না। এসেপের সমাজ ও আচার-বিচারের সহিত তাঁহার্য্য ক্রমে ক্রমে এমন ঘনিষ্ঠ সংঘর্ষে অভিভূত হইয়া পড়িতেছিলেন যে, ওয়ার্ডসাহেবের সহিত মেরী কাউন্টেন নাম্নী এক বেতমহিলার বিবাহের চুক্তিপত্র কর্তৃকখন যেতাম কর্তৃক স্বাক্ষরিত হওয়া সবেও হয় ঘন বাঙ্গালীকেও স্বাক্ষর করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের নাম বখাক্রমে,—ঐক্যচন্দ্র, পীতাম্বর সিংহ, কমলাকান্ত শর্মা, পীতাম্বর মিত্র, রমাকান্ত ও ভ্রামান্যাস।

ছাত্রদিগের পাঠ্য-পুস্তক মুদ্রণ সম্ভবপর হয় নাই। তখন কেবীসাহেব পুঁথির আকারে স্বল্পে পুস্তকাদি লিখিয়া প্রাথমিক শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ঐকল্প পুঁথির আকারে হস্তলিখিত একখণ্ড ইংরাজী ওয়ার্ড-বুকের সন্ধান আমি শ্রীরামপুরে পাইয়াছি এবং তাহার একখানি কটোগ্রাফও তুলিয়া আনিয়াছি *। এই পুঁথির ইংরাজী ভাষা এবং তাহার বঙ্গার্থ সমস্তই বঙ্গাক্ষরে লিখিত। ইংরাজী-অক্ষরজ্ঞানহীন বঙ্গবাসীকে সেই বন্ধভাবার লিখিত পুঁথিই ইংরাজী শিক্ষার প্রথম পদ দেখাইল। ঐ পুঁথির মূল্য তখন ছিল পাচ (সিকা) টাকা। কিছুদিন এই ভাবে কটিবার পর মিশনারীদের মুদ্রাস্থ হাণ্ডিত হইলে ও ফুলের ছাত্রসংখ্যা বর্ধিত হওয়ার পাঠ্য-পুস্তকাদি মুদ্রণ আরম্ভ হইল। এইরূপে ক্রমে সেই সকল মুদ্রাস্থের



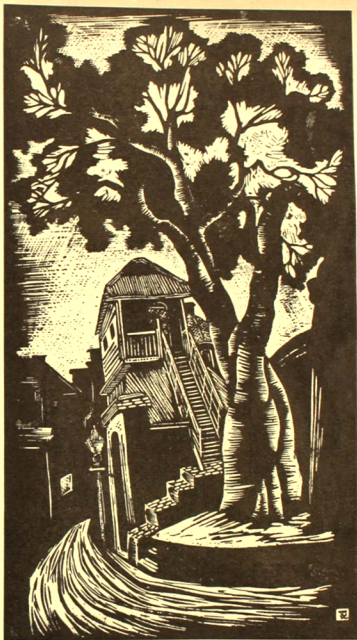
কেবীর হস্তলিখিত ওয়ার্ডবুক

এই হস্তলিখিত চুক্তিপত্র এখনও শ্রীরামপুর কলেজে রক্ষিত হইতেছে।

১৭২৪ খৃষ্টাব্দে দিনাকপুরে কেবীসাহেব এক ফুল খুলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই। তাহার পর তিনি সহকর্মীদের সহযোগে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১লা মে শ্রীরামপুরে প্রথম ফুল খোলেন। ছেলেরা বিধবী হইয়া বাইবে এই ভয়ে প্রথমে অনেকে আপনাপন পূর্বপণকে সেই বিজ্ঞানের পাঠ্যইতে সাহসী হইতেন না। পরে ফুলের বলাবৎ পরিচয় ও গুণাবলীর কথা প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিলে ক্রমে ছাত্রদিগের স্থান সন্ধান হওয়া অসম্ভব হইল। উঠিল। ফুল প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে

সাহায্যে ইংরাজী অক্ষর, হিসাব-নিকাশ, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতির প্রচার ছাত্রদিগের মধ্যে ক্রমবর্তিতে অগ্রসর হইতে থাকে। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা কলিকাতার ত্রিংশ নাইলের মধ্যে এইরূপ একশত পনেরোটি ইংরাজী বিদ্যালয় গড়িয়া তুলিলেন এবং সেই সকল বিদ্যালয়ে প্রায় বৎসর হাজার ছাত্র নিত্য ইংরাজী ও অল্পাংশ ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইল। শ্রীরামপুরে বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার সময় তাহার এক বিজ্ঞাপনে লানা যায় যে, সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে

* শ্রীরামপুরের শ্রীকৃষ্ণ কলিত্রাণ চন্দ্রবীর কহুড়ে এই পুঁথির কটোগ্রাফ হইতে সন্ধান হইয়াছে।—লেখক



প্রভূষ

শিল্পী শ্রীযুক্তকুমার রায় অঙ্কিত একখানি 'লিনো-কাট'। এই 'লিনো-কাট'খানি ১৯০১

www Indian Gallery of Oriental Arts এর Exhibition-এ সর্বপ্রথম প্রদর্শিত হয়েছিল।

বোডিং-এ বসবাস, কাপড় ধোলাই, পড়া, লেখা, গণিত-শিক্ষা, হিসাব-শিক্ষা, এবং ভূগোল প্রভৃতি শিক্ষার জ্ঞান মাসিক রিশ (সিদ্ধা) টাকা বেতন দিতে হইত। এতদ্বিন্ন লাটিন, গ্রীক, হিব্রু, পারসী অথবা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে অতিরিক্ত পাঁচ (সিদ্ধা) টাকা লাগিত। বিস্তৃতরূপে ইংরাজী শব্দ উচ্চারণ করাইবার জ্ঞান এই সকল বিদ্যালয়ে বিশেষ যত্ন লগয়া হইত। *

ইহার পর মিশনের চেষ্টায় ডাঃ কেরী এবং তাঁহার সহকর্মীগণ উক্তত্তরের শিক্ষার নিমিত্ত শ্রীরামপুরে প্রথম কলেজ ও ইউনিভারসিটি গড়িলেন, ছাপাখানার সাহায্যে প্রথম দেশীয় সংবাদপত্র প্রচার করিলেন, বিভিন্ন ভাষার অক্ষরের ছাঁচ তৈয়ার করাইয়া বিভিন্ন ভাষার বিখ্যাত গ্রন্থসমূহের মুদ্রণ আরম্ভ করিলেন, বাপ্পীয় পেশণ-যন্ত্র স্থাপন করিয়া তদ্বারা কাগজ প্রস্তুত প্রকৃতি অনেকানেক উন্নতিমূলক সংস্কার করিলেন। মধো ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ আগুন লাগিয়া তাঁহাদের ছাপাখানার অধিকাংশ সরঞ্জাম ভস্মীভূত হইয়া যায়। কেবলমাত্র বারেটি মুদ্রায়ন্ত্র এই অগ্নির কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।† এদেশীয় প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ ও সেই সকলের নকল প্রস্তুত করা মিশনারীদের আর এক মহান কীর্তি। ইহার কতকগুলি তাঁহারা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং কতকগুলি এখনও হস্তলিখিত অবস্থায় শ্রীরামপুর

কলেজে পড়িয়া রহিয়াছে। এই সকল নকলের মধো অক্ষরসজ্জন করিলে আমরা হয়ত আমাদের অনেক প্রাচীন ভূস্বাপা গ্রন্থের সন্ধান পাইতে পারি। ইহার মধো সংস্কৃত রক্ষপুৰাণ, অগ্নিপুৰাণ, সংস্কৃত-অভিধান প্রভৃতি অনেকগুলি হস্তলিখিত গ্রন্থ আমি দেখিয়াছি। সংস্কৃত-অভিধানখানি হরিশ্চন্দ্রবর্মের মোটা কাগজে লিখিত বৃহদাকারে পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত এক বিরাট গ্রন্থ। ইংরাজী-শিক্ষাদানের প্রথম যুগের পুরোহিত ডাঃ উইলিয়াম কেরী ও তাঁহার সহকর্মীগণ ত্রিশ বৎসরেরও অধিককাল এইভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর শ্রীরামপুরেই তাঁহাদের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ছাত্রদিগের শারীরিক উন্নতির জন্ত তাহাদিগের মধো ব্যায়াম-প্রচলন প্রকৃতি বহুবিধ সংস্কারের দ্বারা যুগান্তের পর বাঙ্গালীকে আবার মানুস করিয়া গড়িয়া তুলিবার ভার তখন যেন তাঁহাদের উপরই জ্ঞাত হইয়াছিল। এমন কি দরিদ্র বালকদিগের মধো পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দিবার মানসে তাহাদের মলিন বস্ত্র সাজিমাটিদ্বারা স্বহস্তে দৌত করিয়া দিতেও তাঁহারা কখন কুণ্ঠিত হইতেন না। এইরূপে এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের ভিত্তি স্থাপন করিয়া ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে প্রথমে গুয়ার্ডসাহেব, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কেরীসাহেব এবং সর্বশেষ ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে মার্শম্যান সাহেব আপনাদিগের কর্মভূমিতেই দেহরক্ষা করেন। *

* ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল তালিকা সাহিত্য সম্মিলনের ইতিহাস-বিভাগে শ্রীযুক্ত রমাগোবিন্দ চন্দ্র (রাধ বাহাদুর) মহাশয়ের সভাপতিত্বে গঠিত।—শ্রীমনিলাকর দে, অতীত-সমিতির সম্পাদক

* Selections from Calcutta Gazette, Vol. III p. 544

† Selections from Cal. Gazette, Vol. IV. p. 265





মহানাদে প্রাচীন নগরী আবিষ্কার

শ্রীগুরুদাস রায়

[কিছুদিন পূর্বে শ্রীহৃত গুপ্তদাস রায় হুগলী জেলার অন্তর্গত মহানাদ গ্রামে বাংলার একটি প্রাচীনতম নগরীর ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাইয়াছেন। সেখানে কুশান ও গুপ্ত যুগের এক আকস্মিক সময়ের ধ্বংসপ্রাপ্ত, বহুলখণ্ড প্রস্তরমূর্তি, তাম্রপ্রাচীর, বৃহৎ স্তম্ভের ভগ্নের ও ধ্বংসপ্রাপ্তের ভাঙ্গাবশেষ প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। জিবরী, সপ্তগ্রাম, পাওরা প্রভৃতি স্থানিহীন গ্রাম হানজনিত হইবার ক্ষণ পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কয়েকটি তাম্র পাতলা খিরায়ে, সর্বাঙ্গোৎকৃষ্ট বৃহৎ পুণ্ডরীক অর্ধবর্গ হাইলেরও অধিক হান মুদ্রিত। বর্তমানবাবু এই নগর হানের আঙ্গোষ্ঠ-চিত্র দইখা আদিয়াছেন, তদ্বারা কয়েকখানি চিত্র তৈয়ারি লিখিত এই প্রবন্ধটি সহ প্রকাশিত হইল। কলিকাতা সরকারী প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের শ্রীহৃত কাশীনাথবাবু লীকিত মহাপুত্র ই হাননী পরিচর্যন করিয়া আদিয়াছেন। উ: ন:]

ই, আই রেলের মগরা জংশন হইতে তারকের পর্যায় একমাত্র বাঙ্গালী কোম্পানীর বে রেল-পথ গিয়াছে, তাহারই মধ্যবর্তী হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি হানের নাম মহানাদ টেশন। টেশন হইতে এক মাইল দূরে গ্রাম। বর্তমানে গ্রামের আরতন প্রায় পাঁচ বর্গ মাইল; ইহা বাইনটী পাড়ার বিভক্ত। এতদ্ব্যতীত বরাটা, আলিনগর, সিংহসড় প্রভৃতি কয়েকটি পাড়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। টেশনের নিকট লক্ষ্মণহাটী গ্রামখানি সেকালের রাজা লক্ষ্মণ স্তম্ভের ক্ষীণ মূর্তি আদিও বহন করিতেছে। এইখানেই রাজা কেশব গুহ কেশবপুর, কস্ত গুহ কস্তগ্রাম ও চও গুহ চও বা লওগ্রাম স্থাপন করেন। এইখানেই মহারাজ হরিশ সিংহ ও মহারাজ সর্বাঙ্গী বিরাট স্তম্ভ অপ্রতিষ্ঠিত প্রভাবে রাজত্ব করেন। পরবর্তী কালে কাহ্ন রাজা রামসুন্দর দত্ত ও হুগলী-বন্দিক রাজা বাধাকান্ত রায় এখানে রাজত্ব করেন। বর্তমানের রাজা ভেকান্ত কর্ণালের পর ইহা পোতা-বাছারের রাজা নবকান্ত সেব বাছারের জমিদারীভুক্ত হয়।

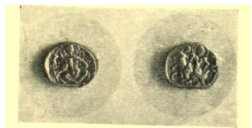
রাজের রাজধানী ছিল এই মহানাদ—ইহা এখনে বর্তমান ও পরে গুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। এখন

হইতে গুপ্তযুগের কুমার জগৎর নামাঙ্কিত ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে রাজমূর্তি ও অপর পৃষ্ঠ লক্ষ্মীমূর্তি সন্ধানিত ও বহন



গুপ্তযুগের প্রস্তাপ: ধ্বংসপ্রাপ্ত: ০০—৪০০ খ্রীস্টাব্দ

জগৎর রমণী-মূর্তি (শ্রী বা লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি) সন্ধানিত এবং পশাভের সময়ের তাম্র-মুদ্রা পাওরা গিয়াছে। এমন কি



রাজা পশাভের মুদ্রা: ৬২০ খ্রীস্টাব্দ

কুশানযুগের হবিফের মুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজা কখনাথ সিংহের ধ্বংসপ্রাপ্ত ও রাজা সৌরীনাথ সিংহের

রৌপ্যমুদ্রা। পুত্রবিশ্ব বননের সমগ্র পাওয়া বিরাহে।
এখানকার রাজা হেমন্ত সিংহের নামাঙ্কিত মুদ্রার কথা।
ইতিহাস-লেখক হান্টার সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন।
ঐসুল জিতেন্দ্রনাথ কবির বাড়ীতে আমি একটি স্বর্ণ-
মুদ্রা দেখিয়াছি। তিনি বলিলেন যে, অনেক বৌদলী
পাঠোচ্চার করিয়া সেটিকে আলাউদ্দিনের সময়ের মুদ্রা
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ঐসুল লীক্ষিত এবং
আমি উহাকে আকবরের সময়ের মুদ্রা বলিয়া নির্দেশ
করি; কারণ উহাতে হুস্পষ্ট ভাবে “জালালুদ্দিন
আকবর” এই কথা লেখা আছে, এবং বোধ হয় বৌদলী
সাহেব এই জালালুদ্দিন নামটী ভুল করিয়া আলাউদ্দিন
পড়িয়াছেন। এতখাতীত আরও কয়েকখানি নানা
প্রকারের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার এখনও
পাঠোচ্চার সমাপ্ত করিতে পারি নাই। শব্দকের মুদ্রাটী

সিংহবন্দীধরণ শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত জনমণ্ডলীকে
উত্তেজিত করেন। এই উত্তেজনার ফল স্বরূপ এখানে
নাথ বর্গের উত্থান হয়।



বৌদ্ধমতাবলম্বীদের সমগ্র পৌরীপট্টব অঞ্চল
(আবর্তন—২৪ ফিট দীর্ঘ)

মহানাদের রাজা হরিশ সিংহ বৌদ্ধ ছিলেন।
মহাক্তি বীরবর বীরবাহুও বৌদ্ধ ছিলেন। সিংহ ও
গুহবন্দীয়েরা রাঢ়ে বহু ধর্মরাজিকা প্রতিষ্ঠা করিয়া-
ছিলেন। বহুদিনের অস্তবিশ্রব ও বৃত্তবৃত্তের ফলে
বৌদ্ধধর্মের বিলোপ সাধনের পর মহানাদে পুনরায়
প্রাচীনকালের বৈদিক ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়।

মহানাদের সিংহবংশ সৌরবংশীয়। “শবনদুত্তম”
গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, লক্ষ্য সেন কোনও এক সিংহ-
উপাধিবাহী বীরকে রাজসেনাপার্বত গম্বাটীতে রাজপথে
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সিংহবংশের কুলীনারায় আছে
যে, হরিশক্ত “সিংহ বিক্রমশালী ছিলেন বলিয়া সিংহ
উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।” অন্তর আছে “সময়ে
হরিশ সিংহ অত্যন্ত প্রবর। স্বদেশের কুল্য পুর অবনী
তিতর।”

অম্বর-শিখ রাঢ় দেশের রচনা। বাহু-বিজ্ঞান প্রথমে
রাঢ়ে পুরম্বরপূর শত্রু সিংহ কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল।
নানা প্রকারের ইষ্টক প্রতিষ্ঠা পর্বাবলম্বন করিয়া ইহাই
অল্পমিত হয় যে, বৃত্তীয় তৃতীয় শতাব্দীতে মহানাদ
নিরাসর্ণের চরম উন্নতিসাধন করিয়াছিল।

রাঢ়ের রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয় সিংহ প্রথমে



আকবরের স্বর্ণমুদ্রা

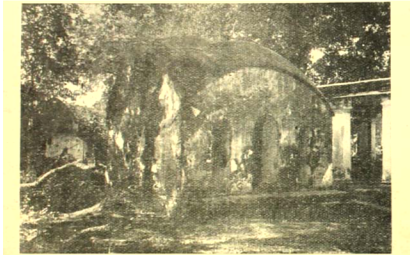
৬২০ খ্রীষ্টাব্দের মোহরাজিত। ঐ প্রকারের মুদ্রা
ভারতীয় সরকারপাণ্ডের আর মাত্র চারি খানি আছে।
জবিহের স্বর্ণমুদ্রাখানি দ্বিতীয় শতাব্দীর। উত্তরবঙ্গে
ঐতপ আর একটীমাত্র মুদ্রা পাওয়া বিরাহিল।
এতখাতীত পাঠোচ্চারের দিক্ হইতে প্রাপ্ত ঐ প্রকারের
১৮ খানি মুদ্রা বর্তমানে কবিয়ার সরকারপাণ্ডের সমগ্র
রক্ষিত আছে। কোচ-রাজা এবং আগামের রাজাদের
মুদ্রাও এখানে পাওয়া বিরাহে। এই সমগ্র মুদ্রা
হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন কালে বাণিমা-
ব্যাপসে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীতে নানা দেশের মুদ্রার
আবাদানী হইত।

৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে রাঢ়ে রাষ্ট্রবিশ্রব উপস্থিত হয়, সেই
সময়ে কখন হইতে বৌদ্ধপ্রভাব ফল করিবার ক্ষম

কান্টিকোপলেশ্বর প্রসেনমিত্তের কল্পা অম্বালিকার পানিগ্রহণ করার নিত্যর ক্রোধ-নয়নে নিপতিত হইয়াছিলেন। তাঁহারই পুত্র পুরোহিতপিত পুরন্দর। এই বিজয় সিং জয়প্রাপ্তী বীণ লয় করিয়াছিলেন এবং সিং বংশের নামানুযায়ী ঐ বীণের নাম সিংহল হয়, একশ প্রবাদ আছে।

মহানাদের রাজ্য চন্দ্রকেতু সিং বংশের লক্ষ্য সেনের অধীন করয় উপস্থিত ছিলেন। শ্রী গোরাচাঁদের সহিত যুদ্ধে মহারাজ চন্দ্রকেতু বন্দী হন। কিন্তু রাজপুত্র

বহিঃপত্রের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণাদ বেঠেন করিয়া স্বপুত্র চন্দ্রক প্রভরদর্শ ছিল—অত্যানি সেই অতীত যুগের জীর্ণ স্থিতি বহন করিয়া বহু নিদর্শন বর্তমান আছে। ধনন কার্ণার সময় গুহান হইতে কতকগুলি বুদ্ধ-মূর্তি, বিষ্ণু-মূর্তি, মহেশ্বরী-মূর্তি, হরগৌরী-মূর্তি, একপান চৈতন্য-মূর্তি, দ্বারকাচৌ-মূর্তি এবং বৌদ্ধদের ধনদেবতা লক্ষ্মীর মূর্তিও ধনন কার্ণার সময় পাওয়া গিয়াছে। লক্ষ্মী-মূর্তিটির অপর পৃষ্ঠে কতকগুলি বৌদ্ধ মূর্তি খোদিত আছে।



আলোকের দ্বারা গুহানিকিতের অগ্রকরণ অপরূপ প্রাচীন মন্দির

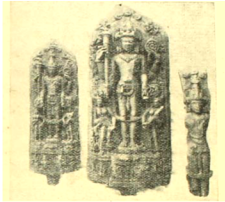
বিজয়কেতুর সাহায্যে মুক্তিলাভ করেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে, তাঁহার পরাক্ষ হইয়াছে মনে করিয়া রাজ-মহিষী ও পুত্রনারীষণ সুশমানের আত্যাচার আনন্দ করিয়া চন্দ্রকেশের মলে দীর্ঘন বিসর্জন দিয়াছেন,—তখন মহারাজ চন্দ্রকেতুও আত্মীয়-বন্ধনের পোকে উদ্রাব হইয়া সেইখানে মলে ভাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করেন।

কেতুগানে চন্দ্রকেতুর রাজপ্রাসাদের নিকট এক পুষ্করী হইতে অপর এক পুষ্করীর মধ্যে বাতায়নের স্বকল ছিল। রাজপ্রাসাদ স্বপুত্র প্রভরদর্শিত ছিল।

স্বপুত্র রাজপুতানা হইতে এককল সময়কাল রাজপুত্র বীর মহানাদে আসিয়া বসবাস করিয়াছিল। ঐ স্থানটী এখন জনমানবশূন্য হইয়া বিঘন অরণ্যানীতে পর্যাবলিত হইয়াছে।

রাজা প্রোদ্র সিং জলাদ্বারা দমন করিবার জন্য মহানাদ হইতে এক বিপুল বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং বাহিরের আক্রমণ বিরোধ করিবার জন্য রাজপ্রাসাদের চারিদিকে দুর্গপ্রাকার রচনা করিয়াছিলেন। ৩১২ খ্রীষ্টাব্দে ইহাদের

আবিষ্কারে মাপসূরীপত্র কলিল প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত
হইয়াছিল।



প্রাচীন বিষ্ণুদেব

বৈদিক ভক্ত শব্দে সিংহ দীর্ঘ দিন ধরিয়া অস্তিত্ব
ভাঙে চোটে করিয়াও মহানাদ হইতে তাত্ত্বিক প্রভাব
বিশৃঙ্খল করিতে সমর্থ হন নাই।



বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের সমন্বয়িত হর-পার্বতীর প্রভাবদূর্গ

১৫২ খ্রীস্টাব্দে বিষ্ণুদেব সিংহ মহানাদে হুবিখ্যাত বৌদ্ধ
পণ্ডিত হিসাবে দ্ব্যধিষ্টা অর্জন করিয়াছিলেন।
মহানাদের সনাতন সিংহ আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত
হইয়া কেতোরি বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন। হরিণ সিংহের
সময়ে সেখানে বৌদ্ধ ও জৈনগণ প্রবল ছিলেন।
মহানাদের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বমলেশ্বর প্রণীত “জায়বিশ্ব
পদ্য পক্ষে সংক্ষিপ্ত” নামক হুবিখ্যাত ১:৭ ভিত্তিতাধিপতি



একপাশ তৈরবদুর্গ এবং হাজিরের নৃপতিনিষ্ট একটি
পদ:প্রণালীর প্রাসাদ:প্রাঙ্গণ

দশাই নামার সহযোগিতায় তিস্তারী ভাষার অনুদিত
হয়।

হরিণ সিংহ মহাবীর্ষে একটি নগর নির্মাণ করেন
এবং অগ্রবীণ ও নববীর্ষে দুইটি মহাকাশ-মন্দির প্রতিষ্ঠা
করেন। চক্রবীর্ষে তিনি যে মহাকাশ-মন্দির প্রতিষ্ঠা
করিয়াছিলেন, তাহার ভাঙ্গা অক্ষুণ্ণ হইয়া বহিয়া
শোন। যায়।

পাল ও সেন রাজবংশ মহানাদে রাজ্য বিস্তারের

চৌ করিয়াছিলেন। এখানে কত যে দুঃস্থ হইয়াছে, তাহার ইহুতাই নাই। আজ পর্য্যন্তও বহু দুঃস্থেরই নিৰ্ম্মণ আছে। প্রত্যয়ের গোণা এবং কামানের ব্যবহার এক সময় এখানে যে খুব বেশী হইয়াছিল তাহারও নমুনাদি পাওয়া গিয়াছে।

সিরাঙ্ক-উলোয়ার সেজ্ঞান-রাজা নাবিকটান সিং মহানাদবাদী ছিলেন। মহানাদের রাজা চন্দ্রকেতুর বংশধরদের মধ্যে রাজা গোতা সিং, রাজা মতেন্দ্র সিং, রাজা হেমন্ত সিং, রাজা পদুম সিং, রাজা লক্ষীকান্ত সিং, রাজা শক্রজিৎ সিং, রাজা চর্চন সিং, রাজা সময় সিং, রাজা পূরণ সিং বিভিন্ন সময়ে মুসলমান শাসন অবসান করিবার জন্য বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, ইহা বাকশাহ-নামাতে পাওয়া যায়।

নবাব মুরশিদকুলি খাঁ মহানাদ নগরে সিং ও শুহ বংশীয়দিগকে আত্মশত্ৰু বীকার করাইবার জন্য রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র-রাজকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আইন-ই-আকবরীতে রাজা ভট্টরথের বংশে জগৎ সিং, ব্রহ্ম সিং, বিনোদ সিং, উদয় সিং, বিব সিং, সৎ সিং প্রভৃতি বৃপতিগণের নামোল্লেখ আছে।

চন্দ্রিশ বংশের পূর্বেও রাজভট্ট নামে এক জাতি মহানাদে বাস করিত। ইহারাও মহানাদের প্রাচীন অধিবাসী ছিল। পালবংশের প্রথম রাজা গোপাল এই রাজভট্টবংশের ছিলেন।

প্রায় ৭০ বৎসরে পল্লবেরা মহানাদ আক্রমণ করিয়াছিল।

রাজা পুরুষোত্তম সিংহের শুক্ল তত্ত্বাবধানে ১৮১০ নির্ধাণাধে গয়ায় একটি বৌদ্ধমণ্ড-কূট নির্মিত হয়।

মহারাজ চন্দ্রকেতু-প্রতিষ্ঠিত সেবাসয়, জটেশ্বরনাথের মন্দির, অনাদি নির্বাসিত, জামাই-জামাল নামে দুঃপ্রসন্ন রাজা, গড়পাড়ার সুবিদ্বত গড়, সৌতা ও বর্শিষ্ট-গদা নামে দুঃস্থ জ্ঞানশ্র, জীকুণ্ড নামে একটি সেবখ্যাত কুণ্ড এবং ইহা একটি তৃণ জাগিও কোন্ দুঃস্থ-অভীভূতের প্রাচীন নিৰ্ম্মণ লইয়া থাকাইয়া আছে। মহারাজ চন্দ্রকেতু মহানাদ হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত যে রাজপথ

নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহার প্রস্থই ২২৫ ফিট বা সেরুপত হাত। রাজবাড়ীর হাতীশালা প্রচুরিত্রও কিছু কিছু নিৰ্ম্মণ পাওয়া গিয়াছে। মহানাদের সীমান্তে ধনশোভা নামক যে প্রকাণ্ড প্রাচীর বর্তমানে বিকল অরণ্য সমাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ধনন কার্য করিলে অতীত যুগের বহু চিহ্নই আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। এতদ্ব্যতীত রাজা মহেন্দ্র সিং যে সুবিভীর্ণ জ্ঞানায় ধনন করাইয়াছিলেন, তাহার পরিমাণ ৮০ বিঘা। মহানাদের দুঃস্থকুণ্ডের নীচে ভূগর্ভস্থ অট্টালিকার প্রাচীর দেখিতে পাওয়া যায়। মহানাদের শুহ রাজবংশের অন্তিম রাজা বরাটের দুঃস্থ হইতে পাড়া ও হসলী পর্য্যন্ত একটি সু-উচ্চ রাজপথ নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মেঘিনীপুর এবং মদুভক্তের নানাভাবে মহানাদের শুহ রাজবংশের প্রাচীন কীর্ত্তির অনেক প্রমাণই আজ পর্য্যন্তও বিদ্যমান আছে। বরাটের বিরাট ধ্বংসস্থপগুলি দেখিয়া মনে হয়, রাজা বিরাট শুহের রাজপ্রাসাদ বর্তমান গোণাপুতুরের সন্নিকটবর্তী স্থানে ছিল।



একট অট্টালিকার নিদান; ইহারই উপর এতদুর্ভব বদান থাকিত

মহারাজ সিংহবাহুর পরে রাজা মাধব সিং ৩৮৭ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে মহানাদে রাজত্ব করেন। তাঁহার পর আরও ছয়জন নরপতি রাজত্ব করার পর এখানে সৌর ও হসলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজ্য রাজা মুকুট রায় মহানাদের সন্নিকটে

সম্রাটশিখর নামে একটি গড় নির্মাণ করেন। ১০ জন মুসলমান রাখা। ১২৪৪ বৎসর মহানাদে রাখার করিলে মহারাজ রামদেব বর্মা পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন।

বৌদ্ধরাজ পাণ্ডুদাস মহানাদে বাস করিতেন। তাঁহার নামে পাণ্ডু-পুঙ্কর অত্যাধি বর্ধমান আছে। বামনার বার কুঁইয়ার মধ্যে মহানাদের মহেন্দ্র সিং অস্ত্রতম ছিলেন। “সংবাদ রত্নাকর” গ্রন্থে আছে —

“হাতে কুক বেষ্টিত বসেছে বার কুঁঞা।

মহেন্দ্র সিং আর কত জন বড় দিঞা।”

হরিশ সিংহের বংশে বিষ্ণু-বিরাণী বৌদ্ধ মূর্তি মাণিকচক্র ও গোবিন্দচক্র অঙ্গগ্রহণ করেন।

স্বকালিত ভারতে ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গাওয়ার পর তাহাদেরই একজন মহানাদে আশ্রয় বসবাস স্থাপন করে। রাজ্য বিতাট গুহ জনমিশ্রকে বিভাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া ‘সেনের পরসেবন’ আখ্যা পাইয়াছিলেন। ৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে বালাবিড্য গুহ বসে হনদের উদ্দেশ্য সাধন করেন। গুপ্তবংশের নামাঙ্কিত মুদ্রা দৃষ্টে অস্বস্থিত হয় যে, তাম্রলিপ্তের দক্ষণে গুহবাধনিসের পদে প্রাচুর্ভূত হন। ৩০৪ খ্রীষ্টাব্দে মহানাদের গুহবংশের একটি শাখা তাম্রলিপ্তে রাখার করিত। বুদ্ধদায় একটি বৌদ্ধ মন্দিরের দ্বারদেশে যে প্রস্তরলিপি আছে, তাহাতে দেখিতে পাই যে, মহানাদের সিংহ বংশের অশোকচক্র সিংহের নাম অঙ্কিত আছে। অশোক সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার দশরথের কোষাধ্যক্ষ মহেন্দ্রপাদ ভট্টের আদেশে লক্ষপাণের ত্রিসপ্ততিতম বর্ষের ১২ই বৈশাখ বৃক্ষপতিবার উহা লিখিত হয়। ১১৩১ হইতে ১১৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজা মাধব সেন মহানাদের অন্তর্গত টঙ্গর নগরে রাখার করিতেন। ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ জাতীয় মহানাদে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজ্যের রাজত্বকালে মহানাদ বৌদ্ধধর্ম প্রচারের অত্যন্ত কেন্দ্রস্থল হইয়া থাকায়।

মহানাদের রাজপ্রাসাদের ক্ষলোবশেষ পরিদর্শন-কালে অফিসবোলে গলিত ধাতুসম্বন্ধের একটি অর্ধসের

পরিমিত জমাট পাওয়া গিয়াছে। প্রাসাদের একস্থানে ইষ্টক সংগ্রহ করিবার সময় একটি ডাবার মধ্যে ক্ষলোবশেষের ভিতর ডাবা সমেত প্রায় একশন চুণ পাওয়া গিয়াছে—সেই চুণ প্রায় ১০০ শত বৎসরের পুরাতন বলিয়া অস্বস্থিত হয়। একটি স্থান বননকালে প্রায় সহস্রাবধি বৎসর পূর্বের মাটির ধাঁড়ি ও অস্ত্রাত্ত বৃক্ষাশ্রয়ও পাওয়া গিয়াছে।



মাটির ধাঁড়ি; প্রায় এক হাজার বৎসরের পুরাতন

মহানাদের সিংহ ও গুহ রাজবংশের মিলিত শক্তি ৪১০ বৎসর বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সঙ্গোপনে লড়াইমান ছিল। যখন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ধর্ম পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিল—তখন নানা অসত্য জাতীয় লোকেরা এখানে বসতি স্থাপন করে—এক পরে উহারও এক দুর্ভাগ্য সামরিক জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। অগ্ন্য বীরের লীলাক্ষেত্রে মহানাদ একদিন তাহাদেরই বকোশোক্ষিতে বিরুদ্ধিত হইয়াছিল। রাজা দিলীপ সিংহকে নিহত করার পর ইরোক্ষণ দ্বন্দ্বদেশে প্রবেশ করিতে পান। রাজা শোভা সিংহের বিজ্ঞাহের কলে ইরোক্ষণ কোট উইলিয়ম দ্বর্ধ নির্মাণের স্থাপ্য পাইলেন।

• এই একটি লিখিতবার মত সুযোগ-প্রদানত ইন্ডিয়ানার ইন্সট্রাক্টর সিংহ মহাপার তাঁহার নিকট লিখিত প্রাচীন মুদ্রা হইতে রাজবংশের যে নামগুলি মাঝাক লিখিয়া বিলাহিনে তখন তাঁহার নিকট আধুনিক কৃতজ্ঞতা একা করিতেছি।

—সেবক



গান

পক্ষা সিদ্ধ নন্দনা কাবেরী ধ্বনা ওই,
 বহিরা চ'লেছে আগের মত,—কইরে আগের মাহুদ কই ?
 মৌনী শুভ সে-হিমালয়
 তেমনি অটল মহিমময়,
 নাহি তার মাথে সেই ধানী কবি,
 আমরাও আর সে-জাতি নই ॥
 আছে আকাশ সে-ইজ্ঞ নাই,
 কৈলাসে সে-যোগীজ্ঞ নাই,
 অরুণ-মুখ ভিকা চাই,
 কি কহিব এরে কপাল বই ॥
 সেই আগ্রা, সে-সিরী ডাই
 আছে প'ড়ে, সে-বাদশা নাই,
 নাই কোকিলের মধুর-তরু,
 নাই সে-বাহিনী বিশ্বজয়ী ।
 আমরা জানি না, জানে না কেউ,—
 কুলে ব'সে কত গণিব ঢেউ,
 বেবিরাহি কত, মেবির এ-ও
 নিষ্ঠুর বিধির লীলা কতই !

কথা ও ছন্দ—কারী নবকল ইসলাম

স্বরলিপি—ঐকগং ঘটক

	সা	-।	সা		গা	না		মপা	-।	পা		পা	-।	
	গ	ঙ	গা		দি	ধু		ন	ব	ব		না	.	
	পা	-।	পা		পা	পা		পা	-।	পা		পদা	-পদা	-পা
	কা	.	বে		বী	ব		বু	.	না		ও	..	ই

I	গা	মা	মপা	পা	পা	পা	পা	পা	খা	ধসী	গা	-১	I
	ব	হি	ধা.	চ	সে	হে	আ	সে	বু	ম.	ত		
I	ধা	-১	পা	মা	মধা	-পা	গা	মপা	-মা	গা			II II
	ক	ই	রে	আ	সে.	বু	মা	ধু.	বু	ক			
II	মধা	খা	ধা	ধা	ধা		ধা	ধা	ধা	ধা			I
	বো.	.	নী	সু	ব		সে	হি	মা	ল			
I	মধা	খা	ধা	[ধনা]	ধা	মপা	-সী	ধা	স'ধা	খা	পা		I
	তে	বু	নি	অ	ট.	ল	ম	হি.	ম	ম			
I	গা	মা	পা	-১	পা	পা	পা	খা	ধসী	স'ধা	-পা	খা	I
	না	হি	তা	বু	সা	বে	সে	ই	ধা.	সী.	অ	নি	
I	মা	-১	মা	-মা	মা	খপা	মা	মপা	না	গা	-১		II II
	আ	ম	রা	ও	আ	বু.	সে	আ.	তি	ন	ই		
II	মা	মা	মপা	-ধা	-১	ধনা	না	-সী	না	সী	-১		I
	আ	হে	আ.	কা	বু	সে.	ই	বু	ত্র	না	ই		
I	পা	-মা	না	না	সী	সী	নসী	-র'সী	গা	খা	-১		I
	কৈ	.	লা	সে	সে	বো	সী.	বু.	ত্র	না	ই		
I	সী	-সী	গী	গী	গী	গী	গী	-গ'সী	-রী	সী	-১		I
	অ	বু	ন	দা	হু	ত	তি	..	আ	চা	ই		
I	পা	না	না	না	না	-সী	ধা	ধসী	-১	না	খা		I
	কি	ক	হি	ব	এ	রে	ক	গা.	বু	ব	ই		
I	পা	-ধা	পা	মা	মধা	-পা	মা	মপা	-মা	গা	-১		III II
	ক	ই	রে	আ	সে.	বু	মা	ধু.	বু	ক	ই		
II	মধা	খা	ধা	ধা	ধা		[-সী	গা]					I
	সে.	ই	আ	আ	সে		না	খা	ধা	-১	ই		
I	মধা	ধা	ধা	ধা	ধা	-সী	ধা	-স'গা	ধা	পা	-১		I
	আ	হে	ল	ফে	সে.	.	বা	বু.	না	না	ই		
I	গা	-মা	পা	পা	পা		পা	খা	ধসী	স'গা			I
	না	ই	কো	হি	বু	বু	ম	বু	বু.	ত.	ক		

I	ধা	-১	পা	না	মধা	পা	I	গমা	-মপা	মা	গা	গা	-১	II
	না	ই	সে	বা	তি.	নী		বি.	..	ব	হ	কী	.	
II	মা	মা	মা	ধা	ধা	না	I	না	স'১	না	স'১	-১		I
	জা	ম	রা	জা	নি	না		জা	নে	না	কে	উ		
I	পা	না	না	না	স'১	স'১	I	না	স'স'১	গা	ধা	-১		I
	কৃ	সে	ব	সে	ক	ত		গ	বি.	ব	ডে	উ		
I	স'১	গ'১	গ'১	গ'১	গ'১	গ'১	I	গ'১	গ'ম'১	-র'১	স'১	-১		I
	সে	ধি	গা	ছি	ক	ত		সে	ধি.	ব	এ	ও		
I	পা	না	না	না	স'১	-স'১	I	না	স'র'১	স'র'স'১	গা	-ধা		I
	নি	ট্ট	ব	বি	ধি	হ		কী	না.	ক..	ত	হ		
I	পা	-ধা	পা	না	মধা	-পা	I	গা	মপা	-মা	গা	-১	-১	II II
	ক	ই	রে	আ	সে.	হ		মা	হু.	হ	ক	ই		



অরুণোদয়

(উপভাস)

শ্রীশৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়

[পূর্ণাঙ্গস্বয়তি]

বুড়া কবিরাজ মিথ্যা বলেন নাই। সেই দিনই বৈকালে সেবু উঠিয়া বলিল। কিন্তু সারাদিন কিছু খায় নাই বলিয়া নারায়ণী তাহাকে আর বাট হইতে নাচে নাখিতে মিল না।

আজ সে যেমন পারিয়াছে, সকালে চারটি রান্না করিয়া বীরেনকে খাওয়াইয়া দিয়াছে, নিম্নেও খাইয়া গিয়াছে। মাসি কিন্তু সারাদিনের মধ্যে একটিবারও হেসের খোঁজ লইতে আসে নাই। নিশ্চয়ই সে রাগ করিয়াছে। নারায়ণী ভাবিয়াছিল, হুগুরে একবার সে উপরে গিয়া তাহার রাগ ভাঙাইয়া আসিবে, কিন্তু কাল সারাটা রাত একরকম আঁসিয়া কাটাইয়া। হুগুরে সে সেবুর সঙ্গে গল্প করিতে করিতে এখন বুঝাইয়া পড়িয়াছিল যে, ঘুম বন্দ তামিল, বেশা তখন পড়িয়া আসিয়াছে। বন্ধমড় করিয়া তৎক্ষণাত্ সে উঠিয়া বলিল। সেবুল, সেবু তখন বলিয়া বলিয়া তাহার বাবার-আনিয়া-সেওয়া সেই বোটা ছবির বইখানি খুলিয়া ছবি দেখিতেছে। নারায়ণী তাহার গায়ে মাথায় একবার হাত দিয়া সেবুল, আর একেবারেই নাই। বলিল, 'বোন্ বাবা, মা কি করছে আমি একবার ওপর থেকে চটু ক'রে দেখে আসি।'

সেবু বলিল, 'মা ত' ওপরে নেই।'

নারায়ণী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি দেখে এসে বুঝি?'

সেবু হাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

'অর তুমি জানলে কেন ক'রে? চুটু ছেলে, তুমি না গিয়ে কখনও থাকতে পার! তুমি নিশ্চয়ই গিয়েছিলে।'

সেবু বলিল, 'মা ওইখানে কাঁদছিল যে।'

'কাঁদছিল কি রে?'

'হ্যা, এই দেখ না!'' বলিয়া সেবু তাহার বিছানার তলা হইতে কাগজে মোড়া খানিকটা মিছরি, দু'টি কমলা সেবু ও বিস্কুটের একটি টিন বাহির করিয়া বলিল, 'এইগুলো চুপি-চুপি দিয়ে বেশ।'

নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল, 'কি বল্লে?'

সেবু বলিল, 'কিছুই না। শুধু কাঁদছিল। তারপর ছুটে পাসিয়ে দেল।'

নারায়ণী শুন্ হইয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

সেবু বলিল, 'বিস্কুটের টিনটা তুমি খুলে দাও না, বোমা!'

নারায়ণী বলিল, 'আমি ত' খুলতে মানি না, বাবা। তোমার বাবা এসে খুলে দেবে।'

বীরেন ভাবিয়াছিল, ছেসেটার বসন্ত নিশ্চয়ই হইবে, এবং বলন্ত হইলে তাহাকে আর কেহই বাঁচাইতে পারিবে না। কিন্তু তাহা বন্দ হইল না, তখন সে বোধকরি আনন্দে আত্মহারা হইয়াই তাহার প্রতিজ্ঞা "তুলিয়া সেল এবং আপিল হইতে সেদিন বাড়ী কিরিবার গথে একটুখানি মত্ত পান করিয়াই বাড়ী কিরিল।

নারায়ণী রান্না করিতেছিল, বামৌকে বাড়ী কিরিতে দেখিয়াই সে তাহার কাছে আসিয়া বাঁড়াইল। বলিল, 'বাও, হাত-পা ধুবে এস, তোমার সঙ্গে কথা আছে।' বীরেন বলিল, 'হাত-পা ধোবো না, কি কথা বল।' সে যে মদ খাইয়া আসিয়াছে, নারায়ণী তখনও তাহা বুঝিতে পারে নাই। বলিল, 'বাকে চট্টরে দিয়ে জরি থালাপ কাচ করলে কি?'

মুখ তুলিয়া বীরেন বলিল, 'কেন ?'

নারায়ণী বলিল, 'মাত্র সঙ্গে দেখা হ'ল, কি বলছিলেন জান ? বঙ্গদেব, ভাড়া যদি তোমরা না দিতে পার, মা, তাহ'লে আমি মত ভাড়াটে আনব'।

বীরেন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'বেশ ত'। কলকাতা নহবে বাড়ী কি আর আমরা পাব না, নাকি ?'

তাহার কথা বলিবার ধরণ এবং এই নিরর্থক হাসি দেখিয়া নারায়ণীর মনে হঠাৎ কেমন যেন একটা সন্দেহ হইতেই, সে তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া দিয়া বলিল, 'আজ আবার খেতে এসেছ ? তবে যে এই সেদিন বললে—'

হাত বাড়াইয়া বীরেন তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল, 'খানো। অনেক ভুনেছি'।

নারায়ণী বলিল, 'কিছু বলব না, কিন্তু এমন ক'রে কতদিন আমাদের চলবে ?'

বীরেন বলিল, 'বতদিন চলে।'

বলিয়াই সে আবার হাসিতে লসিল।

নারায়ণী একবার দেবুর দিকে ফিরিয়া তাকাইল। তাহাকে সে ছবির বইখানি দিয়া বিছানার উপর বসাইয়া রাখিয়া দিয়া করিতে দিয়াছিল, এখনও সে ঠিক তেমনি বসিয়া আছে।

নারায়ণী বলিল, 'তোমার বিস্কুটের টিনটা এইবার খুলিবে নাও'।

দেবুর সেকথা মনেই ছিল না, তৎক্ষণাৎ টিনটা হাতে লইয়া সে তাহার বাবার কাছে আসিয়া গাড়াইল।

বীরেন বিজ্ঞাসা করিল, 'এ টিন তুমি কাকে দিয়ে আনালে ?'

নারায়ণী বলিল, 'মা দিয়ে গেছেন। সেবু দিয়ে গেছেন, মিছরী দিয়ে গেছেন—দেখ, মাকে তুমি কোনও কথা ব'লো না, তা'নি অস্বাভাব্য হবে'।

বীরেন আবার হাসিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইল। বলিল, 'ছেলের ওপর যে খুব ভালবাসা।'

অমত ভাড়া দিতে না পারলে ছেলের বাবাকে ত' ডাকিয়ে দিতে চান !'

এমন সময় দরজার বাহিরে মাসির কঁঠাবর খেনা খেন। সে যে কখন সেখানে আসিয়া গাড়াইয়াছে, ইহার কোনও তথ্য বুঝিতে পারে নাই। বলিল, 'না বাবা, ডাকিয়ে দিতে আমি চাই না। নীচের ভিনখানা ঘরের মধ্যে হ'খানি তোমরা নাও, আর একখানি ঘর আমি মত কাউকে ভাড়া দিই। নইলে আমি খেতে পারছি না বাবা, বড় টানাটানি চলছে।'

বীরেন বলিল, 'বেশ ত', আমরা আগে উঠে যাই, তারপর আগনি একখানি কেন, সব ঘরই ভাড়া দিতে পারেন।'

মাসি বলিল, 'তোমরা উঠে যেতে চাও—বাবে'।

নারায়ণী ভাড়াডাকি মাসির কাছে দিয়া গাড়াইল। বলিল, 'না মা, মত কথা আগনি শুকছেন কেন, উঠে আমরা যাব না'।

বীরেন বলিয়া উঠিল, 'উঠে যাব না কি-রকম, নিশ্চয়ই যাব। তিন মাস আমরা এখানে আছি, এক মাসের ভাড়া মেওয়া হ'য়েছে, আর দু' মাসের ভাড়া বিদিয়ে দিয়ে আমরা উঠে যাব। এই আমি শের কথা ব'লে রাখলাম আপনাকে'।

মাসি আর কোনও কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। নারায়ণী হতভম্বের মত চুপ করিয়া গাড়াইয়া বসিল।

বীরেন বিজ্ঞাসা করিল, 'ওখানে এমন ক'রে থাকিয়ে রইলে যে ?'

নারায়ণী ধীরে ধীরে ঘরে আসিয়া বসিল। মুখ তুলিয়া বলিল, 'মুখে থাকত তুমি চাও না, না ?'

বীরেন বিস্কুটের টিন খুলিতেছিল, সেবিল, নারায়ণীর হই চোখ মলে ভরিতা উঠিয়াছে। বলিল, 'কীদ্বারা কি হ'য়েছে ? কীদ্বারা যে ?'

'কিছুই হয়নি'। বলিয়া সে খাঁড়ল দিয়া চোখ দুইটা তাহার মুখিয়া লইল।

বীরেন তাহার হেলোটাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে

লাগিল, 'বেথ, বেথু, মা'টা তোর ভারি বোকা, বুঝি-বুঝি ওর কথায়না হবে না।'

সেবু খড়্গে নাড়িয়া বলিল, 'হাঁ, বোকা। কে বোকা বাবা।'

'তোমার বা।'

'মাকে বলে আসবে?'

বীরেন বলিল, 'তোর ও-মা মর রে, এই বা। এই যে পাড়িয়ে রয়েছে, এই ঘেরোটা।'

'তোমাদের সঙ্গে ব'কে কি হবে, আমার রান্না প'ড়ে আছে, আমি বাই—'বলিয়া নারায়ণী রান্নাঘরে চলিয়া গাইতেছিল, বীরেন বলিল, 'শোন। কেন উঠে যাব বললাম, বুকে পাতলে না?'

'বোকা মাহুদ, কেনম ক'রে বুঝে বল।'

বীরেন মুখ তুলিয়া ঝৎ হাঙ্গিল। বলিল, 'আমাদের এই ছেলোটাকে বুড়ী ভালবেসে ফেলছে। আমরা যত যাব যাব ক'র ও তত আমাদের এখানে থ'রে রাখতে চাইবে। তা' জান?'

নারায়ণী বলিল, 'কি জানি বাপু, অত সব বুঝি না।'

বীরেন আবার হঠাৎ টাঁককার করিয়া উঠিল,—

'বোঝো না ত' যেমন মাহুদ তেমনি চুপ ক'রে থাক!'

আবার হুত এখনই একটা বিজ্ঞী কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে ভাবিয়া ভয়ে ভয়ে নারায়ণী সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

বীরেন বলে, 'বেথ না তবোটাকে দিয়ে আমি এই বাড়ীখানা খোকার নামে লিখিয়ে নেবো।'

নারায়ণী বলে, 'ওসো, তোমার ছুটি পায়ে গড়ি, ওসব কথা ভূমি টেড়িয়ে ব'লো না। মা যদি ওসুতে পান ত' ভারি খারাপ হবে।'

বীরেন বলে, 'জই ত' তোমাদের মোথ! জইই ম'লে। বাড়ীখানা দেবে না ত' কি করবে, কে নেবে ওর বাড়ী? কে আছে?'

'কেউ নেই, কিন্তু বাড়ী উনি দেবেন কেন? ভূমিই ত' মাকে সেদিন চটিয়ে দিয়েছে।'

বীরেন হাসিতে থাকে। বলে, 'বেথ, মেয়ে-মাহুদের কাছে যদি কিছু আদায় করতে হয় ত' খোর ক'রেই করা উচিত। মরম হ'লে যেহেঁরা কিছু দেয় না, তখন শেষে বলে।'

নারায়ণী চুপ করিয়া শোনে। মুখ সেখিয়া মনে হয়, কণাটা সে বিশ্বাস করে নাই।

বীরেন বলে, 'বিশ্বাস হ'ল না? তোমার নিজের কথাই ভেবে দেখ না! আপে এখন তোমার আমি গুব দানম করতাম, মন খেতাম, বাড়ী আসতাম না, এতটুকু আমার ক'রে কথা বললে গ'লে একেবারে মল হ'রে যেতে। আর, আমাকাল হ'রেই ঠিক তার উল্টো, জর ত' মোটেই কর না, দুখের ওপর অব্যব গাও, দিনকতক পরে হয়ত আমাকে অপমান করতেও বাধ্য হবে না।'

নারায়ণী বলে, 'হা' তা' বক্ছ কেন, চুপ কর। আমা তোমার নেপাটা একটুখানি বেশি হয়ে গেছে।'

'নেপা? বীরেন আবার হাসিতে হাসিতে বলে, 'নেপা আর আমার তোমরা করতে দিলে কোথায়, রান্না! ছেসেবেলায় তাব'তাম, বড়লোক হব, অনেক টাকাকড়ি হবে, দীঘলটা বেশ লুখেই কাটিয়ে দেব। কিন্তু বড় হ'য়ে বেখ'লাম, বড়লোক ত' হ'লামই না, দুঃখ-দুঃখে কুটো একেবারে কাঁধ'রা হ'রে সেল। দুপু'জোলবার মতে বড়দের পানায় প'ড়ে নেপা ব'ললাম। ভেবেছিলাম, নেপার কোঁকেই কোনরকমে সব-কিছু ফুলে থাকবে। কিন্তু তাতেও তোমরা দুই মারে আর ছেলের বাধ সাধ'লে। এখন বেখ'ছি—তোমরা আমার ভাল-মাহুদ না ক'রে আর ছাড়'বে না।—বজো বেশি ব'ক্ছি, না? আম্মা, এই চুপ ক'রে রইলাম।'

ব্যাপার সেখিয়া নারায়ণী মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। হাসিটা বীরেন সেখিতে পাইয়াছিল। বলিল, 'হাস'ছ বুঝি? হাস। কিন্তু বেথ, তোমরা আমার যত খারাপ মাহুদ তাব, তত খারাপ আমি নই। খারাপ

বটুকু আমার হ'তে হয়, সে শুধু আমার অভাবের জন্তে। তা' নইলে হাতে যদি আমার অনেক টাকা থাকত, তোমাদের যদি আমি খুব সুখে রাখতে পারতাম, তা'হলে বেশত, আমার সুখাভিষ্টে বেশ একবারে ভরে যেত। আচ্ছা থাক, কথা কইব না তা'বলম, আবার কথা কইছি।—সেই ঘুমিয়েছে।'

সেবুর বিছানার দিকে তাকাইয়া তাহাকে একবার সেঁবিয়া লইয়া নারায়ণী ষাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ ঘুমিয়েছে।'

বীরেন বলিল, 'তুমি গাড়িতে বসিলে যে ? উঠে এস। এদ, আমরা খোকার কথাই বলি।'

নারায়ণী গাড়ের উপর উঠিয়া বামীর পাশে পিয়া বলিল। বলিল, 'তোমার কি মনে হয়, খোকা বড় হ'লে খুব রোজসার করবে ?'

বীরেন বলিল, 'করুক আর নাই করুক, আমাদের ভাবতে মোহ কি !'

নারায়ণী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'আমার ভাবতে বেশ লাগে। এক-এক সময় একা-একা ঘরের কামকর্ম করতে করতে আমি শুই সব কথা ভাবি। ভাবি—খোকা আমাদের বড় হ'লে, যে ঘরে এসেছে, খোকা খুব রোজসার করছে, আর আমরা দুই বুড়ো-বুড়ী ব'লে ব'লে তাই বেশছি, আর আনন্দ করছি। কিন্তু সে ভাবি কি আর আমাদের হবে ? আমরা হয়ত কষ্ট ক'রেই যাব, ছেলের দুখ আর বেশতে পার না।'

বীরেন বলিল, 'আর আমি কি ভাবি জান ? আমি ভাবি—হঠাৎ একদিন আমার ভ্রান্নক অস্থির কর্দ, হাতে ভক্তার দেখাবার পর্যা নেই, অথচ বাঁচতে হবে। বাঁচবার জন্তে অতি কষ্টে হয়ত হালপাতালে পেল্যাম। পর্যা অভাবে, লোক অভাবে তোমরা হয়ত আমার সেখানে বেশতে যেতেও পারলে না। আমি সেইখানেই ব'লে সেলাম। খবর পেতে তোমরা—'

বীরেনের সুখানা নারায়ণী তাহার হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল।

হাডটা সরাইয়া দিয়া বীরেন বলিল, 'কিন্তু মুহূর্ত যদি

এমনি ক'রেই আসে তাকে ত' তুমি অটকিতে পারবে না, রাণী ! অথচ আমে হোক, কাল হোক, মুহূর্ত একদিন আসবেই। তখন তোমরা গণে বসবে। এখন অবস্ত আমি মাত্রা পেলে একহাজার টাকা তোমরা পাবে, কিন্তু সে একহাজার টাকা আর ক'দিন ! তারপর ? এই দুঃখের দুনিয়ার নিত্য অলহাৎ একটি নাযালক ছেলে কোলে নিয়ে তোমার মত চিরহুঃখিনী একটি বিধবা মেয়ে—ভাবতেও কষ্ট হয়, নারায়ণী, মনে হয়, বিয়ে-না না হ'লেই ছিল ভাল। তাই আমি মন খেতে মাতাল হ'লে অনেক সময় কুলে থাকি।'

ভবিষ্যৎ জীবনের দুখ-শান্তির আলোচনা করিতে পিয়া এই দুঃখের প্রসঙ্গ আনিয়া গড়ে। তখন হৃৎকেন্দ্রেই ক্রিয়াক্ষণ চুপ করিয়া থাকে।

তাহার পর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস কেলিয়া বীরেনই প্রথমে তাহাদের সেই অবাধিত নীরবতা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করে। নারায়ণীকে সাধনা দিবার জন্তে যোষ হয় হাত বাড়াইয়া তাহার একখানি হাত নিম্নের হাতের সূত্রির মধ্যে ধরিয়া বীরে বীরে বলিতে থাকে, 'এ সমস্ত ত' সকলের জীবনেই আছে, নারায়ণী। মাছুব বাঁচবার জন্তে চিরকাল আসে না, মরতে তাকে একদিন হয়ই। তাই ব'লে মরবার কথা দিবারাজি ভাবলে ত' আর কোনও কাম চলে না। ভেবে না। অমৃত্তে বা' আছে তাই হবে।'

নারায়ণী কোনও কথা বলিজেছে না সেঁবিয়া বীরেন তাহার হাতখানি একবার নাড়িয়া দিয়া বলে, 'কি ভাবছ ?'

নারায়ণীও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস কেলিয়া বলে, 'ভাবছি—তোমার আসে আমি যেন মরতে পারি। ভববানের কাছে শুধু আমার ভই একটি প্রার্থনা।'

এমনি করিয়া নিম্নের দুঃখের আলোচনা করিতে করিতে এই দুই স্বামী-স্ত্রী কখন একসময় যে সুখাইয়া পড়ে, নিম্নেরই স্মৃতিতে পারে না। তাহার পর অতি প্রকৃষ্ণে দেখা যায়, প্রতিদিনের অভ্যাস মত নারায়ণী সর্দায়ে শয্যাভ্যাস করিয়া গুহের কামকর্ম করিয়া বেড়াইতেছে।

সেই সেদিন সকালে উঠিয়াই টুক টুক করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া কখন যে উপরে উঠিয়া দিয়াছে, কেহই বুঝিতে পারে নাই। মাসি আত্মকাল কখন যে বাড়ীতে থাকে, কখন যে বাহির হইয়া যায়, কখন রঁধে, কখনই বা খায়—কেহই বড় একটা চেষ্টা করে না। অধিকাংশ সময় দেখা যায়, সে তাহার উপরের ঘরের মেঝের এক পাশে বসিতে আসিল বিছাইয়া শুইয়া আছে। একটা মাত্র মাহুকের কি-ই বা কাম! তাহার উপর হাবির অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই তাহার শয্যাভাগ করার অভ্যাস চিরকালের। কামকর্ম্ম সারিয়া সেদিনও মাসি তেমনি মেঝের একপাশে চুপ করিয়া শুইয়া ছিল। সেবু তাহার কাছে দিয়া গারে হাত দিয়া ডাকিল, ‘মা!’

আচম্ভা চমকিয়া উঠিয়া মাসি একবার চোখ মেলিয়া মেলিল। অল্প হইতে উঠিয়াই সেবু আশ্রয় আর থাকিতে না পারিয়া অবাচিত ভাবে তাহার কাছে আসিয়া বসিয়াছে। ইচ্ছা করিল, তাহাকে আদর করিয়া হাত বাড়াইয়া কোলের কাছে টানিয়া আনে, কিন্তু কিসের বেন একটা দ্রুত অভিমান মাসিকে পাইয়া বলিল। আবার চোখ বুজিয়া সে যেমন পড়িয়াছিল তেমনি পড়িয়াই রহিল,—সেবুর ডাকের উত্তরে একটা মাড়া পর্যন্ত দিল না।

সেবু আবার ডাকিল, ‘মা!’

হাত দিয়া মাসি তাহাকে সরাইয়া দিয়া বলিল, ‘তুই আবার এখানে কেন এসেছিস বাবা, নীচে বা। বেথুতে সেলে হোর বাবা এগুনি বঁকে আর কিছু ব্যক্তি রাখবে না।’

সেবু বলিল, ‘না, বাবা বন্ধে না, তুমি ওঠো।’

মাসি চুপ করিয়া রহিল।

সেবু এবার তাহার হাতখানা ধরিয়া টানিতে লাগিল।—‘ওঠো। পদ্মা নাইতে বাবে না।’

মাসি বলিল, ‘না, আমার অল্প করছে।’

সেবু তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া নীচে নামিয়া আসিল। সেখান, তাহার বাবা ওখনও চোখ বুজিয়া বিছানার পড়িয়া আছে। সেদিন তাহার অল্পের সময় পাথরের

বে বস-হুড়ি ও একশিশি মধু কিনিয়া আনা হইয়াছিল, তাহাই সে হাতে লইয়া আবার চুপি চুপি উপরে উঠিয়া গেল। মেখিল, মাসি ওখনও তেমনি পড়িয়া আছে। খলের উপর শিশির ছিপি ধুসি। একটু মধু ঢালিয়া হুড়ি দিয়া তাহাই মাজিতে মাজিতে সেবু বলিল, ‘নাও, তোমার ওখু এনেছি, খেয়ে গেল, ভাল হ’রে বাবে।’

মাসি একবার আড়চোখে ব্যাপারটা দেখিয়া নইল। এবারও ভাবিয়াছিল সে চুপ করিয়া থাকিলে, কিন্তু সেবুর অপরিস্রব, সে এক স্তীর্ণ ব্যাপার।—অল্প বয়স করিয়াছে, ওখু তখন তাহাকে পাইতেই হইবে।

মাসি তাহার হাত হইতে নিষ্কর্ত পাইবার ভয় বলিল, ‘ওখু তুমি শুইখানে বেধে বাও, আমি এখনও জল খাই নি, কাল একাধনি সেহে—’

একাদশীর দিন মাসি উপবাস করে এবং তাহার পরের দিন সকালে উঠিয়াই সে মিছুরির সরবং খায়, সেবু তাহা খানে। তাই সে ঔষধের বলহুড়ি ঘরের একপাশে নামাইয়া রাখিয়া আবার তাহারের বীচের ঘরে নামিয়া গেল। তাহার অল্পের সময় যে মিছুরিটা আনিয়া বেঞ্জা হইয়াছিল তাহার সবখানি সে খাইতে পারে নাই, ব্যক্তিটা এখনও তাহার বিছানার ভ্রাম্য হইয়াছে। সেবু সেই মিছুরিটা হাতে লইয়া আবার উপরে উঠিয়া গেল। দিয়া আর কোনও কথা না বলিয়া মাসির রাস লইয়া ধুঁহো হইতে খানিকটা জল মেঝের কেলিল, খানিকটা ঢালিল, তাহার পর মিছুরির জোটা লইয়া সে সরবং তৈরি করিতে বলিল।

ব্যাপারটা মাসির মনে লাগিতোছিল না। এমনটি তাহার ভয় কেহ কখনও করে নাই।

মাসি মাথা ভুলিয়া ডাকিল, ‘পোন্!’

মিছুরির জোটা কিছুতেই পড়িতে চার না। ‘খাই’ বলিয়া সেবু রাসে রাসে ঢালাঢালি করিয়া আরও ব্যয়কতক সেটা গলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই না পারিয়া শেষে রাস দুইটা সেইখানেই নামাইয়া রাখিয়া মাসির কাছে দিয়া বলিল, ‘কি বন্ধ।’

‘বোস’ বলিয়া মাসি তাহার হাতে বরিষা তাহাকে বসাইল।

‘হাঁরে সেব, তুই আমার এত ভালবাসিস্?’

সেবু মাথা ঠেট করিয়া নীরবে বলিয়া রহিল।

কোনও কথা বলিল না।

মাসি বলিল, ‘আচ্ছা, আমার এই বে অস্থ করছে, আমি যদি ম’রে বাই পোকনু—’

কথাটা বলিতে গিয়া কি জানি কেন অমনা বাসোপাঙ্কালে কণ্ঠ তাহার রুদ্ধ হইয়া গেল, কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না এবং চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল।

কাপড়ের আঁচলটা টানিয়া লইয়া চোখ মুছিয়া মাসি জিজ্ঞাসা করিল, ‘হাঁরে, আমি ম’রে গেলে কি করবি? কাঁদবি?’

সেবু তাহার গায়ে একটা চড় মারিয়া গিয়া বলিল, ‘বা:!’

‘হা নয় বাবা, আমাকে মিছেমিছি ভাল তুই আর বাসিস্ নি।’

বলিয়া মাসি বীরে বীরে উঠিয়া বলিল, তাহার পর হাত বাড়াইয়া সেবুকে তাহার কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, ‘নীচে তোর বাবা রয়েছে?’

বাড় নাড়িয়া সেবু বলিল, ‘হ্যাঁ।’

‘তুই এখানে এসেছিস্ তা’ সে দেখেছে?’

সেবু বলিল, ‘বা-রে, আমি গুঁকিয়ে পালিয়ে এলাম যে! বেধতে পার নি।’

মাসি বলিল, ‘বেধতে গেলে কিন্তু তোমার বক্বে।’

‘হাঃ, বক্বে কেন?’

মাসি বলিল, ‘হ্যাঁ বক্বে। তুমি জান না বাবা, তার চেয়ে তুমি আর আমার কাছে এস না।’

কথাটা সে যে কি-কণ্ঠে উচ্চারণ করিল, তাহা জানিলেন একমাত্র তাহার অন্তর্দ্বারী। কিন্তু সেবু লেখনা বিবাস করিল না। বলিল, ‘হ্যাঁ, আসব না।’

মাসি উঠিয়া পাড়াইল। বলিল, ‘চল, তোমার দিকে আসি।’

এমন কথা মাসির মুখে দেবু কোন দিন শোনে নাই। তাই সে একবার অবাঞ্ছিত তাহার মুখের পানে তাকাইল। বলিল, ‘বা:!’ তাহ’লে অস্থর তোমার করে নি। মিছে কথা?’

মাসি বলিল, ‘না বাবা, মিছে কথা নয়, অস্থ করছে। চল।’

‘না, বাব না’—বলিয়া দেবু ছুটিয়া একটুখানি দূরে চলিয়া গেল।

মাসি তাহার শিছু শিছু দিয়াও তাহাকে বহিতে পারিল না। বলিল, ‘এ ত ভারি বিপদে পড়লাম দেখছি! সেব, বা বলছি, নইলে আমি কিছু বাকি রাখব না।’

খাটের তলা দিয়া গলিয়া সেবু ওপাশে গিয়া পাড়াইয়া ছিল। মুখ ভারি করিয়া বলিল, ‘আমি বাব না।’

মাসি এইবার একটুখানি নক্স হইয়া উঠিল। রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, ‘বাবি না কি-রকম?’

সেবু বলিল, ‘না, বাব না। আমার গাড়ী লাগ, আমি খেলা করব।’

সেবুর অস্থখের দ্বায়ে বীরেনের কথা শুনিয়া মাসি তৎক্ষণাৎ উপরে গিয়া সেবুর টিনের গাড়ী, বাস্কি, খেলনা, কাপড়-কাপো, খাবতীয় বস্তু তাহার কাছে ছিল সবই একটা পুঁচিলিতে বাঁধিয়া ঘরের এককোণে নামাইয়া রাখিয়াছিল। সেইমিকে আতুল বাড়াইয়া মাসি বলিল, ‘ওইখানে সব বেঁধে রেখেছি, নিয়ে যা।’

এমন করিয়া তাহার সব জিনিষ একসঙ্গে পুঁচিলি বাঁধিয়া রাখিবার উদ্দেশ্য সেবু বুঝিল না, জাবিল, অমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে গাড়ীটা হুত তাহার ভাঙিয়া যাইবে, তাই সে চীৎকার করিয়া উঠিল, ‘কেন তুমি বেঁধে রেখেছ, গাড়ীটা আমার ভেঙ্গে যাবে, তুমি খুলে দাও।’

‘এ ত আমি ভারি বিপদে পড়লাম দেখছি।’ বলিয়া মাসি তৎক্ষণাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দার রেলিংএর কাছে গিয়া ভাকিল, ‘বসি ও বৌমা, তোমার ছেলে নিয়ে বাও ত’ বাছা!’

রাগ করিয়া এমন কথা সে যে আজ বলিবে, নারায়ণী তাহা জানে। তাই কথাটা সে গুনিয়াও গুনিল না।

মাসি আর-একবার ডাকিল।

নারায়ণী এবারেও চুপ।

মাসি তখন বোধকরি বীরেনকে ওনাইয়া ওনাইয়া বলিতে লাগিল, 'কাজ কি বাপু আমার শুকুনো ভালবাসায়! আমি বুড়ী মাগী—ছেলে মানুষ করতে জানি না, সঙ্গে ক'রে বেখানে বেখানে নিয়ে যাই, ছেলের অল্পধ করে, তা' বেশ ত', ছেলেকে আমার কাছে আসতে বাধ্য ক'রে দিলেই ত' হয়! আমি ত' বাপু এত ক'রে বলছি, তবু ত' নড়ে না।'

এই বলিয়া মাসি আবার ঘরে ঢুকিল। কিন্তু এবার সে আর ঘরে ঢুকিয়া চুপ করিয়া রহিল না, ভাড়াভাড়ি সেবুর কাছে দিয়া তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া তাহাকে টানিয়া লেখান হইতে অতি নিষ্ঠুরভাবে ঘরের বাহির করিয়া দিয়া বলিল, 'বা বাপু বা, কাজ নেই আমার ভাল-বাসায়, কখার গল্পনা সইতে আমি পারিব না।'

সেবু দুখ ভাব করিয়া হেঁটমুখে গড়াইয়া রহিল। মাসি সেখিল, চোখ দুইটা তাহার হৃৎ হৃৎ করিতেছে। তবু সেদিকে সে ত্রুক্ষেপ না করিয়া ঘর হইতে প্রথমে তাহার ভিনিষ-পত্র-বাঁধা কাপড়ের পুঁচুসিটি, পরে খলছড়ি, মধুর শিশি এবং মিছরি-ভিঝানো গাসটি ছোর করিয়া চৌকাঠের বাহিরে নামাইয়া দিয়া বলিল, 'পরের ছেলে মানুষ করার সাথ আমার মিটেছে বাবা, এবার বা!' বলিয়া উচ্ছ্বসিত জন্মনের বেগে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া দরজাটা বাসি তাহার চোখের স্ফুটবেই হুঁহাত দিয়া সম্বোরে এক লম্বে বন্ধ করিয়া দিল।

এ কয়দিন নারায়ণীর সঙ্গে মাসি ভাল করিয়া কথা বলে নাই। মাসি যে রাগ করিয়াছে, নারায়ণী তাহা

বুঝিয়াছে। কিন্তু বুঝিও সে তাহার রাগ ভালাইবার অবসর পায় নাই। তাহিগাছে, সেবু সারিষা উঠুক, তাহার পর মাসির কাছে দিয়া একদিন সে ভাল করিয়া কথা বলিয়া আসিবে। স্বামী তাহার অজ্ঞার করিগাছে, সে-কথাও জানাইবে এবং তাহার ক্ষত মাসির পাতে ধরিয়া কমা চাহিতেও সে কল্লর করিবে না।

বীরেনকে সেদিন বিছান। হইতে তুলিয়া দিতে আসিয়া নারায়ণী সেখিল, সেবু ইহারই মধ্যে উঠিয়া বোধকরি মাসির কাছেই চলিয়া গিয়াছে। পাছে স্বামী কিছু বলে তাহিষা সেবুর লম্বে কোন কথায় না মিথ্যাসা করিয়া বলিল, 'ওঁচো পো, আর কতক্ষণ তরে থাকবে!'

বীরেন বলিল, 'উঠি।'

নারায়ণী বলিল, 'রাহা যে আমার শেখ হ'রে এল। চাই বা কখন ধাবে, ভাঙই বা কখন ধাবে?'

বীরেন বলিল, 'তা আজ আর ধাব না। এক গাস লরবৎ ক'রে দাও।'

লরবৎ করিবার ক্ষত চিনির লকান করিতে দিয়া নারায়ণী সেখিল, ঘরে চিনি নাই। হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, সেবুকে মা সেদিন অনেকখানি মিছরি দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মিছরির অতবড় লোটা কোথাও সে বুঁজিয়া না পাইয়া ডাকিল, 'সেবু!'

নারায়ণী জানে, সে নিশ্চয়ই উপরে গিয়াছে। তাই সে সিঁড়ির কাছে দিয়া আবার ডাকিল, 'সেবু!'

কিন্তু সেবুর কোনও সড়াপশ পাওয়া গেল না।

নারায়ণী তখন বীরে বীরে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল এবং সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌছিয়া যে লুত তাহার নজরে পড়িল, তাহাতে তাহার আর বিশ্বাসের সীমা রহিল না। সেখিল মার ঘরের দরজা বন্ধ এবং সেই বন্ধ দরজার বাহিরে চৌকাঠের কাছে ছেলে তাহার বলিয়া বলিয়া কান্ডিতেছে। চৈতনের রৌদ্র ইহারই মধ্যে বেশ কড়া হইয়া উঠিয়াছে এবং দক্ষিণের বায়বাস্য অতিক্রম করিয়া সে-রৌদ্র আসিয়া পড়িতেছে

দেবুর গারে। বৌদ্রে যে বামিয়া উঠিয়াছে, তু তাহার
সেধিকে হ'ল নাই। নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল, 'কি

রে, কীদুছিস্ বে? মা বুকি এখনও দরজা খোলেন নি?
—ওমা, এই যে মিছরির ঢেলাটা! তবে আর আমি
মিছরি খুঁজলে পাব কোথায়! এ কি রে, এত বড়
এই মিছরির ঢেলাটা পেলাসে দিয়ে জল ঢেলেছিল
কেন?'

দেবু বলিল, 'মার অশ্রুত করেছে বে!'

'অশ্রুত করেছে? কেমন ক'রে জানলি? দরজা
বন্ধ বে রে! মা! মা!' বলিয়া নারায়ণী নিজেও
বারকতক দরজাটা ঠেলাঠেলি করিল, কিন্তু দরজাও
খুলিল না, মার কোন সাড়াও পাওয়া গেল না।

'এ খলছড়ি কে আনলে? আর এই মধুর
শিশিটা?'

দেবু আবার বলিল, 'বললাম ত' মার অশ্রুত
করেছে।'

'তাই বুকি মাকে ওধু খাওয়াতে এসেছ?'
বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া সে কাপড়ে-বাঁধা পুটুলিটার
হাত দিয়া বলিল, 'এতে কি আছে?'

বলিয়াই সেটা সে খুলিয়া ফেলিল। দেখিল, দেবুর
কয়েকখানি হাক্-প্যান্ট, কাপড়-জামা, ডিনের বাঁশী,
রেলের গাড়ী, মোটরকার, পুতুল ইত্যাদি যাবতীয়
জিনিষ তাহার মায়ের ঘরে ছিল, সবই একসঙ্গে বাধিয়া

রাখা হইয়াছে। ইহার অর্থ সে ভাল করিয়া গ্রন্থে
বুঝিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিল, 'এ সব এখানে
কে রাখলে, দেবু?'

কথাটা বলিতে গিয়া দেবুর মুখখানা আবার
কান-কান হইয়া উঠিল, বলিল, 'মা আমাকে তাড়িয়ে
দিলে।'

এবার আর বুঝিতে তাহার কিছু বাকি রহিল না।
চূপ করিয়া সেইখানেই বসিয়া বসিয়া একবার কি যেন
সে ভাবিল, তাহার পর জিনিষ-পত্রগুলি তুলিয়া লইয়া
দেবুকে বলিল, 'চল।'

দেবু বলিল, 'না, যাব না।'

'যাবি না? এই রোদুবে ব'সে ব'সে কীদুবি? চল
বাবা, চল—আজ সবে জর থেকে উঠেছিস্—চল।'

দেবু বলিল, 'না, ও দরজা খুলবে না কেন?'
নারায়ণীর এবার সত্যই বড় জং হইল। তাহার
স্বামী না হয় ছুটা কথা তাহাকে বলিয়াছে, তাই বলিয়া
যে-ছেলে তাহাকে এত ভালবাসে, তাহাকে এমন করিয়া
এই রোদের মাঝখানে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিয়া,
দরজায় খিল বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে তিনি চূপ করিয়া
রহিয়াছেনই বা কেমন করিয়া!...

নারায়ণী এইবার জোর করিয়াই দেবুকে একরকম
টানিতে টানিতে নীচে নামাইয়া আনিল।

(ক্রমশঃ)



ভালোবাসা—মরে সেও

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

আমো ডাকিতেছি প্রিয়া,

ডাকিতেছি মোর জীবন-মরণ সকল চিত্র দিয়া ।
ডাকিতেছি মোর চোখের সলিলে সাগর রচনা করি',
ডাকিতেছি মোর উচ্চ শোণিত অধা-পায়ে তরি' ।
উচ্চ শোণিত—টপ্‌ বসু করি' কুটে বা মর্ষ তলে,
কামনার দাহ—বহির জ্বালা দার মাঝখানে জলে ।
তুমি জ্বালায়েছ কামনার দাহ—নীল পরশের শিখা,
মরণ-মরুর তীরে তীরে তাতা আঁকিছে তুমার শিখা ।
মরুর পিণাসা—বত গোড়ে আরো পড়িবারে চার তত,
তাই তো তোমারে ডাকিতেছি প্রিয়া — ডাকিতেছি
অবিরত ।

ভালোবাসা মরে সেও—

আমার চেয়েও ভালো ক'রে আর একথা জানে না কেও !
আমার কাহনা ফুটেছে তোমার, তবু মোর এই কূক,
তুমি ভেসে আছো মহারহত অনন্ত কোকুকে ।
তুমি ভেসে আছো নৃত্তির অভঙ্গে ওত্র পরশম,
তুমি ভেসে আছো বর্ষমানের সকল ছুখে মম ।
তুমি ভেসে আছো যে জন এখনো নামে নি ব্যাড়া-পথে,
অনাগত সেই ভবিষ্যতের অস্ত-বৌত রথে ।
তোমার দিকের আলো নিতে' পেছে—আমার মর্ষ দ্বাৰে
যে আলো তোমার নিজ হাতে জ্বালা তেমনি সে
জ্বালা আছে ।

মোর আলো নিতে নাই—

কত দিবসের কত কথা আমো সে আলোকে পড়ি তাই ।
আলো পড়ি 'তব নয় কূকের মাঝখানে মাখা রাপি',
জনন আমার যে কথা ক'রেছে নিশ্চয় রাপি জাপি' ।
চাঁট বেধে যবে এক হ'য়ে গেছে বাহিত বাহতলে,
আমো পড়ি তার মিলনের লেখা ককণ কোকুহলে ।
পড়ি ব'লে ব'লে যে কথা লিখিত মথরে মহাক্ষণ,
গাঢ় চুম্বন আঁকিবার ছলে লুপিত হুৎ মন ।
অলিখিত পুঁথি—বত পড়ি হার বেড়ে বার কথা তার,
হৃৎমার পড়া একা পড়ি আজ—পড়িতেছি বারবার ।

কতদিন চ'লে যায়—

কতদিন আজ বসি নি তোমার এলো অলকের হার !
তোমার 'টোপো'রে ডাকো নাই তুমি কতদিন চ'লে গেছে,
'ওসা'টাকি ক'রে 'টোপো' হ'য়ে গেল তাও মনে পড়িছে ।
পথে যেতে যেতে লহা পেমিন সন্দেশ সাগর কূলে,
নীল আঁখি কোনো বিদেশী নারীতে ছুঁয়েছিল বাহতলে—
অতিমানে তব ঠোঁঠের চুম্বারে বনালো মেঘের রেখা,
সেই রেখাটিও বার বার আজ মরমে দিচ্ছে লেখা ।
সাগরের কেনা কণা কুসে' তার দিরেছিল বত গুথ,
কুসে' গেছি সব—হুগি নি তোমার কঠিন কুৎ গুথ ।
ছোট কথা সব বড় হ'য়ে জঠে নৃত্তির পুঁথির পরে,
আগমনের শিখা রেখা টেনে যায়—অপ্রবিশু স্বরে !

মিছে কথা তারা কর—

বেহঁ মিরেছিলে জানি—

যারা বলে—প্রেম শুধু বিলাস, নেই তাহে লেশ্বর।
পলে পলে মনে লেশ্বর আসে, অবিস্মারের দ্বারা
কত বাশের বৃক্ষ ডোলে, কত রূপে ফেলে ছায়া।
কত বাণ তুমি কত না রকমে ফেনেছ আমার বৃকে,
বাখা বাজিয়াছে, ব'লেছি কত কি নির্ভুর কৌতুকে।
তবু আজ বৃক্ষ—তারি মাঝে ছিল সঙ্গী

প্রেমের ভাষা,

তারি মাঝে ছিল তোমার মনের অক্ষরনে। ভালোবাসা।
লেশ্বর পেছে, শ'ড়ে আছে শুধু বিচারের শত হল,
শুধু বিচার—তার মাঝে কোটে প্রেমের পদদল।

জানি তারে নিয়ে আসো করা যায় বত খুঁশী টানাটানি।
সেহ-তীরের পুছারী বাহায়া, নারী-মাসের লাপি'
দোলুপ ফুখার বহি বাসের নয়নে ব'য়েছে জানি',
খুঁশী হোক তারা—মনহীন সেহ আমার নিকটে আর
শোনো প্রিয়ে, কই—ভোগ ক'রে জানি, কোনো দাম
নাহি তার।
প্রাণ চেয়েছিল, পারো নাই দিতে—তাই তো এসেছি স'রে,
এই বিরহের বিষের পরোখি পিইছি পেহালা ভ'রে।
প্রিয়েরে তোমার হারাবেছ তুমি, আমি হারাই নি প্রিয়া,
তাই তো তোমারে ডাকিতেছি আসো সবল চিত্ত দিয়া।

“ঐতি সন্সারে সর্বব্যাপিনী — ঈশ্বরই ঐতি। ঐতিই আমার কর্ণে একপকার
সংসারদঙ্গীত। অনন্তকাল সেই মহাসঙ্গীত সহিত মনুষ্য-কল্পতরুী বাজিতে থাকুক।
মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার ঐতি থাকে, তবে আমি অস্ত্র স্থখ চাই না।”

—বঙ্কিমচন্দ্র



হুকু ওয়ার্ম

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্তী

আগে — কর্ণকণাও

ছিলেন সাব-রেজিষ্টার, — শেষ-বয়সে একসঙ্গে মাথায় মাথা চুল এবং লম্বকে মাথা টাকা সজর করিয়া গইয়া, প্রবাস হইতে যাত্রায় আসিয়া বসিলেন অবকাশ বাশন করিতে। কিন্তু কর্ণবীর শ্রীনিবাস চট্টরাম — অলস অবসর ঠাহার হাতে সহিবে কেন? কটতি উঠিয়া গাড়াইলেন পরোপকারের পৈঠার।

কি সর্বনাশ! — গ্রাম বে উৎসব হায়েতে বসিয়াছে! নদী পিয়াছে কচুরি-পানার ঢাকিয়া, — পুকুর-পুকুরি গইয়া মজিয়া একাকার, — জলসে আগাছার গ্রামের পথ সমাচ্ছন্ন কর্ণকণা পিত্তা সব, — গলাবরোখে বন্ধিনী বাত্‌জাতি, — নিরুদ্ভব সুবকের মল। ইহা-বিগকে টানিয়া তুলিতে হইবেই! — শ্রীনিবাস গ্রামের শ্রী কিরাইয়া আনিতে উৎসব হইয়া বীর গৃহের দিকে দূর ফিরাইলেন।

কিন্তু শ্রীমুখ চট্টরাম পরোপকার-প্রবৃত্তির পান্থে চম্‌মায় গ্রামের দুর্দশার বে কন্ধান-মুষ্টি নিরীক্ষণ করিলেন, প্রকৃতপক্ষে তত্‌ম্ব কঙ্কালসার অবস্থা তাহার ছিল কি? একটা মাখানদীর ওপার-ওপার গইয়া পাশাপাশি দুইটি গ্রাম। — নদী অবস্ত্র বালা সেপের অস্ত্রাত্ত নদীর মতই কচুরি-পানার আচ্ছন্ন, — বর্জ্যমানে নদী না বলিয়া মালা বলাই সম্ভব। নদীর ওপারে, বিত্তীয় গ্রামপ্রান্তের রেল-স্টেশনটিকে কেন্দ্র করিয়া, গজ-পোলা-মাড়ম সহ বেশ একটা ছোটখাটো নগরের মতই আবেটন পড়িয়া উঠিয়াছিল — ডাকঘর, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতিরও অভাব ছিল না। মাইনর কুলটিকে পত বৎসর হইতে এন্ট্রান্স কুলে পরিণত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ওপারে, যে গ্রামের কথা বলা হইতেছিল, সেটিতে মস্তায়ে দুইবিন হাট বসে, — একটি উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয় ও একটি টোল

আছে। গ্রামের মধ্যে দুইটি পুকুর — একটি দক্ষিণ পাড়ার পৌসাইসের, অপরটি উত্তর পাড়ার চট্টরাম পরিবারের। প্রাচীন কালের পুকুর হাজিয়া মজিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু পৌসাইসের পুকুরের জল তখনও পানের অযোগ্য হয় নাই, — যদিও উত্তর পাড়ার পুকুরটি অধিকারীদের সুবীৰ্য অস্থগণ্ডিত ও অনবধানতার অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়াছিল। গ্রামে সাধারণতঃ কুশের জগই উৎকৃষ্ট বলিয়া গৃহীত হইত। শ্রীনিবাস বসিতেন, — কুশনগুজ বাহার, কুশোদক তাহাদেরই একমাত্র কামা!

নবমুখত বহির্কটীর প্রাঙ্গণে পাথচাচি করিতে করিতে চট্টরাম মহাপ্রবীর দৃষ্টি পড়িল সর্বাপ্রাণে ঠাহার পিতৃপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত হুশরিসর পোড়ো পুকুরটিরই প্রতি: এবং বিত্তীয় দৃষ্টিপাত হইল — পার্শ্ববর্তী আগাছার ভরা বৃহৎ পতিত জমিখণ্ডের উপর। লক্ষ্যের দিকে হুকুিয়া, পক্ষ্যমুখে উত্তর হস্ত কিরাইয়া কিছুকাল তিনি বকর-পীড়ন করিলেন, — চম্‌মা-নিম্নর উত্তর চকু-প্রান্তবর্তী মালা-পুত্‌তাসে দক্ষিণ হস্তের অন্তঃ ও তর্জনী তড়না করিলেন কিছুকাল, — একবার স্রুঙ্কল হুশরিস্ট হইল, — তাহার পরই অপরূপ সৌন্দর্য্য হাসিতে ঠাহার মুণ্ডিত মুখশ্রী রমা-তা ধারণ করিল।

হুই বৎসর পরের কথা। কে না বীকার করিবে, এই হুই বৎসর চট্টরাম-প্রবর্তিত পরোপকার-প্রসতি বেশ কিয়দূর অগ্রসর হইয়াছে? উত্তর পাড়ার সেই সুসুখ পুকুরটি, অস্থগণ্ডিত গ্রাম্য লোকবিশেষ

প্রথমে, আজ বিগতশত হইয়া ‘ঐনিবাস সাগর’-রূপে নববোধন লাভ করিয়াছে; এবং সেই পতিত ভূমি-ভাগ—কি অলৌকিক তাহার পরিবর্তন!—প্রাচীর-পরিবেষ্টিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেখানে অমর বৃদ্ধ-প্রজ্ঞান—প্রারম্ভ ভাগে ‘নিবনিবাস’, প্রত্যয় ভাগে ‘অরুণাঙ্কেত’।

‘নিবনিবাসের’ ভোর-সূর্যে একটি বেত-প্রস্তর-নির্মিত বৃহৎ শিবমূর্তি—লগাটেনজহানে বজ্রাকারে কোদিত হইয়াছে, ‘বাহা’। মূর্তিটির দুইট বাক দুইদিকে প্রসারিত—বাম বাহুতে উৎকীর্ণ ‘সব্ধী’, উহা ‘অরুণাঙ্কেত’কে নির্দেশ করিতেছে; দক্ষিণ বাহুতে উৎকীর্ণ ‘মন্ত’, উহা ‘ঐনিবাস সাগর’ের পথনির্দেশক।

দুই বৎসর মাত্র পূর্বে, একদিন চট্টগ্রাম মহাশয় তাহার গ্রামের কর্ণধর শিঙসের দেখিয়া, নিরানন্দ গৃহাবরোধে বন্ধিনী মাতৃস্বাত্তিক মরণ করিয়া, নিরুদ্মন যুবকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গ্রুংখ প্রকাশ করিয়া-ছিলেন এবং করুণার আর্দ্র হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া-ছিলেন—ইহাদিগকে টানিয়া তুলিতে হইবেই। আপনায়াই বলুন, সে-প্রতিজ্ঞা অশেষতঃ তিনি পালন করিয়াছেন কি না? অধুমান নহে, প্রত্যক্ষ উপান-‘মান’ দেখুন,—

(ক) কর্ণধর শিঙসের জন্ম ‘নিবনিবাস’ প্রত্যহ প্রাতে সেমিওপাখি রূপ হৈমবতী-প্রদাস বিতরণ করেন—অবস্ত্র নিবাসের মঙ্গল-ভাগের জন্ম প্রতি পক্ষমাত্রায় এক পক্ষা করিয়া স্বসামান্য প্রণামী গৃহীত হয়।

(খ) মাতৃস্বাত্তিক—মৃত্যুতঃ ছোট-মা’রা অর্থাৎ বালিকা ও না-বালিকা কুমারীরা নটন: নটন: নিরানন্দময় গৃহাবরোধ ত্যাগ করিয়া আনন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিতে অগ্রবর্তিনী হইতেছেন। ‘অরুণাঙ্কেত’ে সব্ধী-শব্দের সহিত সেই আনন্দের চাপও অঙ্গীকৃত হয়। সব্ধী-বিক্রমলভ্য অর্থ ‘অরুণাঙ্ক-ভাগ্যের’ সঞ্চিত হইয়া থাকে; কবিশিঙ্গিকে কিছু কিছু করিয়া শাক-সব্ধী—মাসে দুই দিন—আপাততঃ উপহার দেওয়া হইতেছে।

(গ) যুবকদিগের উদ্যমের পরিচয় ‘ঐনিবাস সাগর’-সংক্তি ও ‘ঐনিবাস সাগর’ে মংসোর চাক্রে অতিক্রম করিয়া ‘নিবনিবাসের’ মঙ্গল-প্রচারে তর-তর ক্রম-প্রবহমাণ। বিশেষ বিশেষ কর্ত্তের জন্ম কবিশিঙ্গকে পুরস্কৃতও করা হইতেছে। যথা—(১) ‘মঙ্গল-ভাগ্যের’ প্রণামী-সংগ্রাহকগণ শতকরা মুহূর্ত্তা লক্ষ্যশক্তি আশীর্বাদী স্বরূপ নিয়মিত ভাবে পাইয়া থাকে। (২) ‘মংসাগন্ধা বিভাসের’ কবিশিঙ্গকে ‘ঐনিবাস সাগর’-বৃত্ত মংসা-এ-গায়ের হাটে ও ও-গায়ের বাজারে বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত লভ্যাংশের এক-মণমাংশ সমভাগে বন্টন করিয়া দেওয়া হয়। (৩) এতদ্ব্যতীত, একজনকে প্রধান প্রচারকস্বরূপে নিশ্চিই বেতন দিয়াও রাখা হইয়াছে।

—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বদান্ত ঐসূক্ত ঐনিবাস চট্টগ্রাম,—তাঁহাকে পাইয়া তাহার গ্রাম ও গ্রামবাসিগণ সত্যি আজ পৌরবাসিত—হয়!

অন্তঃপর—

যথো — নর্থকাও

বড়দিনের মদুহনে আশ্রয় সহর কলিকাতা হইতে আচম্কা আসিয়া পড়িল—‘হুক্ ওয়াবু’। চম্কাইয়া উঠিবেন না,—বীরে স্বহৃৎ হৃদিতার বলিতেছি।

অগ্রহায়ণ দিয়া পৌষ মাস পড়িয়াছে। অগ্রহায়ণে মহা দুঃখবনে ‘অরুণাঙ্কেত’ে নবান্নোৎসব হইয়াছিল,—এবার হইতেছে জ্যোতিষ সমারোহের সহিত ‘কপি-উৎসব’। কপি-উৎসবের আশ বিতীর দিন—কাল বাধাকপি-পক্ষ দিয়াছে, আশ ফুলকপি-পাক্ষণ।

কপিপাতা-রঙের সবুজ শাড়ী পরিয়া বয়স্ক কেককবিশিরা, তাঁহাদের পশ্চাতে বালিকারা, কেহ খোঁপার কেহ বেষ্টীয়ে কেহ চুলে ডাঁটা-ভাঙা ফুলকপির ফুল ভাঁজিয়া, পার্শ্ববর্তী চিহ্নিত ফুলকপি-কেস্ট্র

চারিদিকে ধীরে ধীরে ঘুরিয়া। সপ্তপদিক্রম্য সমাধা করতঃ সারি ধাখিয়া গাড়াইলেন।

কিছু দূরে কয়েকখানি চোমারে, একতাপে ঐক্লু চট্রাচ্ছ এবং গ্রাম্য কয়েকজন মাতঙ্গর ব্যক্তি উপস্থিতি,—অন্ততাসে ঐক্লু চট্রাচ্ছদৃষ্টিওকে ক্ষেত্রমাতা বা ন্যেক্সে ক্ষেত্রমা, নিম্নরিতা বর্ষায়সী জনকয়েক এবং চট্রাচ্ছকস্তা কুমারী চিন্মরী চট্রাচ্ছ বসিয়া ছিলেন। ক্ষেত্রমা ঠাহার সমুখে রক্ষিত একটি ছোট টেবিলের উপর হইতে একখানি নিষিদ্ধ কাগজ তুলিয়া লইয়া তাহাতে একবার চোখ ফুলাইলেন, পরে বখাস্তব প্রতিদ্বন্দ্বা ধরে বলিলেন,—

‘তোত্রো’

কুমারী চিন্মরী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বহুচিত্রিত তোত্রোটি স্থর করিয়া পাঠ করিতে শুরু করিলেন। তিনি তোত্রোর এক-একটি চরণ এক-একবার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন এবং নতুনত্বানা অদ্ব-বক্তিনী ক্ষেত্রকিন্মরী ও বালিকারা সমবেত-কণ্ঠে অভিনব স্থরলয়ে তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিলেন। তোত্রোটির ভাব-তাৎপর্য এইরূপ—

‘হে পরমেশ্বর! সর্বাঙ্গী-স্বন্দরী ফুলকপি, আমরা তোমাকে নমস্কার করি,—আমাদের নমস্কার গ্রহণ কর তুমি! তুমি আমাদের ঘরের মেয়ে পরমেশ্বরী না হইলেও, তোমার আদর্শ আদ্য আমরা ঘরে ঘরে গ্রহণ

করিতেছি, করিব; তুমি আমাদের সহায় হও। তুমি বিলাসের বস্ত্র ফুলই নও তুমি, অথবা কেবল খাবাসামগ্রী কপিই নও,—একাধারে তুমি ফুল ও কপি অর্থাৎ ফুলকপি! তোমার ফুলখ মিটার আমাদের মনের কথা এবং কণির মিটার মেয়ের কথা;—হে পোহ-মোনামরী দীবন্ত সর্বাঙ্গী-স্বন্দরী, আমরা তোমাকে নমস্কার করি,—আমাদের নমস্কার গ্রহণ কর তুমি! গড়?—না-ই বা খাটুক গড় তোমার, রূপ তোমার কোন্ ফুলের চেয়ে কম? আর খাবাখানে ফুলনা তোমার কোথায় গো! হে রূপস্বাদামরী পরমেশ্বরী সর্বাঙ্গী-স্বন্দরী ফুলকপি,

আমরা তোমাকে নমস্কার করি,—নমস্কার গ্রহণ কর তুমি আমাদের!’

প্রবল কতালি-ফরির সহিত তোত্রো-বৃত্তি শেষ হইল। পরে তোত্রোর কথা ও স্থরের অন্ত রচয়িত্রী কুমারী চিন্মরী কে মোখিক স্বতন্ত্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া একজন বিশিষ্টা ক্ষেত্রকিন্মরী তাহাকে একটি তাজা ফুলকপি উপহার দিলেন। তিনি উপস্থিত ফুল-কপিটি ঈষৎ শিরঃ-সঞ্চালন সহ উভয় হস্তে গ্রহণ করিয়া



কুমারী চিন্মরী তোত্রোপাঠ করিতেছেন

সেই ছোট টেবিলটার উপর রাখিয়া দিয়া, মুখ তুলিয়া মুখ হাজ করিলেন।

ক্ষেত্রমা ঠাহার বহুত কাগজখানির দিকে চাখিয়া বলিলেন,—‘কপি-বৃত্তা’

এবার চেম্বার হাফিঙ্গা উঠিয়া পাড়াইসেন একজন গ্রামবাসী বিশিষ্ট বৃদ্ধ — হাইচরণ ভট্টাচার্য মহাশয় । ইনি গ্রামের সরকারী হাইচরণ খুড়া এবং ঐ নামে বন্যবানি গ্রামের লোকের পরিচিত । খুড়া ভট্টাচার্যই একই কোলকুন্ডা,—বার্দ্ধাকারনতঃ এখন কুজতর হইয়া পড়িয়াছেন । তিনি তাঁহার নিজস্বচর তৈলপক বংশ-বহিষ্ট আন্দোলিত কল্লিবারমা সন্মুখের নব্বু শাড়ীর সারি হইতে উঠিয়া, নব্বু পত্রীর মত ছুটিয়া আসিল ঘামখট হোট হোট বালিকা । ক্ষেত্রপার্শ্বে আলমিত একটি পর্দার অন্তরায় হইতে অগ্ন্যান বালিকা উঠিল । বালিকারা বনলগ্নিহিত হইয়া, শিঠ বাকাইয়া, মাখা নোজাইয়া, সোড়ালির উপর পা তাকিয়া বসিয়া, পরস্পর বাততে বাহে জড়াইয়া, গড়াইয়া গড়াইয়া সে কি নৃত্য ছুড়িয়া দিল — অকুলনীর কপি-নৃত্য । এই নৃত্য হাইচরণ খুড়ার আবিষ্কৃত এক বালিকাদিনকে স্বল্প বয়সকালে জালিম দিয়া তিনি পড়িয়া জুলিয়াছেন । প্রথম-দ্ব্যবসে সন্মুখের খিচোরে নৃত্য করিয়া তিনি যে ‘মোড়েল’ পুরকার পাইয়াছিলেন বসিয়া পোনা বার,— এই বৃদ্ধবয়সের আবিষ্কৃত কপি-নৃত্যের নৃত্য-চল দেখিয়া তাঁহার সেই নৃত্য-প্রতিভা সন্মুখে কাহারও আর সন্দেহ থাকিতে পারে না । নৃত্যজ্ঞসে অগ্ন্যান বালিকা চলিল,—বালিকারা নৃত্য করিতে লাগিল,—সঙ্গে সঙ্গে ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার হাতের লাঠিট খুড়াইতে খুড়াইতে এগাশে ওগাশে হেলিয়া-হুলিয়া, ব্যায়ামের বৈঠকের জায়গাতে বন বন উঠা-বসা করিতে লাগিলেন । সতাই সে এক স্বর্গীয় পোতনীর বৃত্ত ! হঠাৎ—

আহা-হা! কি হ’ল,—কি হ’ল! — খুড়া হঠাৎ হুস্ফি ঝাইয়া পড়িয়া সেলেন বৃষ্টি! ভয় নাই,—ঐ যে তিনি আগনি আবার উঠিয়া পাড়াইয়াছেন — না, বিশেষ কিছু বাধা পান নাই তিনি! অনেকেরই মুখে নুত-কি-হাসি ছুটিয়া উঠিল, কেহ কেহ মুখ ঘিরাইয়া ব্যস্ত-হাসি গোপন করিলেন । একটি বালিকা মুখে অঁচল চাপা দিয়াও প্রবল নুত-হাসির বেগ সামলাইতে না পারায় কুমারী চিরবীর নিকট ভিরক্ত হইল ।

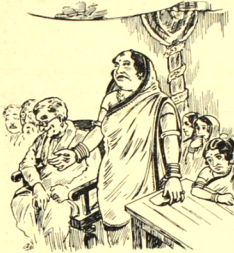
ক্ষেত্রমা পুনরায় উৎসব-হটী পাঠ করিলেন,— ‘কপি-কামিনী একাঙ্কিকা’ ।

একাঙ্কিকা অভিনীত হইল।— ‘কবি কুল লইয়া জুলিয়া ছিল — কল্পনা-বিলাসী বিভোল কবি । পুণ্ডিত লতাঝিকানে বসিয়া জাশিয়া জাশিয়া স্বপ্ন দেখিত সে— মধুর বসির দিবাশ্রম! একদিন বার, হুইদিন বার, তারপর তিনের দিন — সেদিন সেহের মুখা মনকে তার মুচুড়াইয়া আশাইয়া দিল বাতব জনতে । মুখা,— মুখা,— মুখা,— হুলে ত’ কই মুখা মিটে না রে! সঙ্গা কপি-কামিনী আশিয়া কবির সন্মুখে পাড়াইলেন । কবি হাত বাড়াইল — তিনি মিলেন তার হাতে একাধারে কুল ও কপি — কুলপং দেহ ও মনের মুখা নিটাইবার অপূর্ণ বনীকৃত মুখা কুলকপি ’ — একাঙ্কিকার নারিক । কপি-কামিনী পরিলেবে সমাপ্ত ভঙ্গ মহোদয় ও মহোদয়গণকে একখানি প্লেট হইতে একটুকরা করিয়া সঙ্গ কপিসিদ্ধ বিতরণ করতঃ ‘মধুরেণ সমাপয়েৎ’ করিলেন ।

এবার ক্ষেত্রমা বহু উঠিলেন বক্তৃতা করিতে — ‘খুড়া মাছুর আমি, এই বয়সের দাবীতে এবং এ বয়সে অনেক দেখেছি ওনেছি, এই জ্ঞানের দাবীতে এই ক্ষেত্র-নতার সামান্য কিছু বলতে সাহস করি, নতুবা তেমন কিছু বিজ্ঞা-বুদ্ধির আহ্বান নই আমি — সেকথা বরং কইতে পারেন আপনারা গুরু ।’

অঙ্গুলি-সম্বন্ধে ক্ষেত্রমাতা ঠাকুরাণী এইখানে চট্টোয় মহাশয়কে নির্দেশ করিলেন । চট্টোয় মহাশয় দ্বিত-হাতে তুমিসম্বন্ধ নত-বৃষ্টিতে বিনয় প্রকাশ করিলেন । ক্ষেত্রমা বসিয়া চলিলেন,— ‘কিন্তু আমি বা’ বলছি, জা’ আমার আত্মার মধ্য থেকে পাওয়া — ধার করা নয় । আমার হৃদয় গহ্বর থেকে আমার আত্মব্রহ্মই নুকিয়ে থেকে কথা কইছেন — আমি নই । এটা পূর্ব-পন্ডিলে মিলবার ও মেলাবার স্থান; — একদিন আমার অন্তরবাসী ব্রহ্ম বললেন, তুমি তোমার প্রাণের মেয়েদের নিয়ে এই মিলনের সহস্র-তার নীলার দু’একটা তার জুড়ে’ দাও না, মেয়ে । ব্রহ্মানন্দে বিললিত হ’য়ে

ওর সঙ্গে এলাম গ্রামে চলে — তারপর এই প্রতিষ্ঠান-
প্রতিষ্ঠা, — এই ‘অর্থপূর্ণকরে’।’



‘সেকথা বরং কইতে পারেন আপনারা ঠিক’

ফেতমা হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলেন, কুমারী চিন্ময়ী
টেবিলের উপর হইতে জলপূর্ণ কাচের গ্লাসটি তাঁহার
দিকে আগাইয়া দিলেন, তিনি ‘শ্রীনিবাস সাগরের’ নির্মল
নীতল বারি পান করিয়া পুনর্বার আরম্ভ করিলেন,—
‘আজকের এই উৎসবের মধ্যেও পূব-পশ্চিমের মিলনের
সহস্র-তার বীণায় তার জুড়বার স্বপ্ন ইঙ্গিত আছে।
আপনারা জানেন, গত মাসে আমরা নবীন ধাজে
নবান্নোৎসব করছি — আমাদেরই ঘরের জিনিষ সেই
ধান। কিন্তু, কপি পরদেশী স্বজা হ’লেও, এই কপি-
উৎসব সেই নবান্নোৎসবেরই পরপৃষ্ঠা। কপি পরদেশী
ব’লেই আমাদের এই উৎসব অর্থপূর্ণ এবং সার্থক।
আমরা এই উৎসবের মধ্য দিয়ে ইঙ্গিতে জানাচ্ছি,
ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে বিদেশীয় জড়বাদও আমরা
গ্রহণ করলুম — পূর্বের প্রাণশক্তির সঙ্গে পশ্চিমের
কর্ষশক্তিকেও আমরা মিলিয়ে নিলুম। অল্প দিক
দিয়ে, উদ্ভিদের প্রাণবত্তা স্বীকার করে আমরা
বিশ্বপ্রেমের প্রতিষ্ঠা করলুম আমাদের এই —’

শ্রীমুক্ত চট্টরাজ পাড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, — ‘হা,
আচ্চা! জননীপাত্র এই কথাই বলেন।’

ফেতমা তাঁহার অর্জুনমাত্র বাক্য শেষ করিলেন,
— ‘বিশ্বপ্রেমের প্রতিষ্ঠা করলুম আমাদের এই অর্থ-
পূর্ণাকরে, আমাদের এই গ্রামে, আমাদের এই গ্রামের
ঘরে ঘরে।’

করতালি, জলধ্বনি, শব্দধ্বনি — এই মিলিত
মিশ্রনি-যন্ত্রবাদ ফেতমা’র বক্তৃতার উপর সমভাবে
বিস্তৃত হইয়া ‘জলকপি উৎসবের’ সমাপ্তিক্রিয়া ঘোষণা
করিল। সকলে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পাড়াইলেন।

বিশিষ্ট-বিশিষ্টাদের মধ্যে বিদায়-পূর্ণ অভিবাদন-
প্রভাবিবাদন চলিতেছে, এমন সময় ‘শিবনিবাসের’
দিক হইতে আশু-কলিকাতা-কোরং শ্রীমুক্ত অংশুমান
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অংশুমান বাবু আমাদের
চট্টরাজ মহাশয়ের শ্রালক এবং তাঁহারই সম্মানিত
পোষ্য,—অধুনা শিবনিবাসের প্রচার-বিভাগের কর্মস্বাক্ষ।
ইনি গতকলা গ্যাটার্ণ-লেকচার বা আলোক-বক্তৃতার
জ্ঞান পূর্ণে করমাইস-দেওয়া কতকগুলি নূতন সুইড
এবং আরও দুইট নূতন লণ্ডন কিনিয়া লইয়া আসিতে
কলিকাতা গিয়াছিলেন — আজ এইমাত্র ফিরিয়া
আসিলেন।

শ্রীনিবাস তাঁহার শ্রালকের দিকে চাহিয়া
বলিলেন,—‘খবর কি, অংশু? সুইড, লণ্ডন—সব
এনেছ ত’?’

অংশুমান বলিলেন,—‘আজ্ঞে, হ্যাঁ। আর এই
দেখছেন আমার হাতে—?’

অংশুমান এক বাগিল কাগজ উঠু করিয়া ধরিলেন।
—‘ও কি?’

অংশুমান মুখ গম্ভীরতর করিয়া বলিলেন,—
‘এ কি? এ হচ্ছে হৃৎ ওয়ার্ম! হাসছেন?—হাসবেন
না। আমার সঙ্গে এসেছেন কলকাতার বিখ্যাত
লণ্ডন-বক্তা মিঃ মদন মণ্ডল, আমি নিমন্ত্রণ করে
এনেছি তাঁকে, আজ সন্ধ্যায় কিছু বলবেন এ সম্বন্ধে।’

এই বলিয়া শ্রীমুক্ত অংশুমান তাঁহার হাতের

কাসেমের বাড়ির পুলিশা ইনিবাসের হাতে এক-খানি মিমা, করেকখানি নিমের হাতে রাখিয়া, বাকী কাসেমগুলি ছুড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিলেন। চতুর্দিকে সোরসোগ উঠিল—“হক্ ওয়াব্দ!” “হক্ ওয়াব্দ!” “হক্ ওয়াব্দ!”

অন্তে — চর্মকাণ্ড

শিবনিবাসের প্রচার-বিতাসের সোল টেবিলটিকে বেঠেন করিয়া বসিয়া, তিনজন প্রচারকর্মী বৈপ্রহরিক কালা করিতেছিল। একজন পত্রনিখন-কর্ণে বাসুত —অপর চইজন উব্ হইয়া বসিয়া, আগামী আলোক-বজ্জতার মজ সুইড্-গুলি বাছিয়া বাছিয়া পর্যায়ক্রমে নুতন করিয়া সামাইয়া, বিভিন্ন বায়ের ভিতর জুছাইয়া তুলিয়া রাখিতেছিল। কাজের কঁকে কঁকে চলিতেছিল নানাপ্রকার গল্পগম্ব।

দাও পোঁলাই বলিল,—‘বাই বস জুঁচায়, মদন মজলের হক্ ওয়াব্দ এসে এ জামাটা শুভ জলট-পালট ক’রে দিয়েছে। বেমন বজ্জতা, তেন্নি তার সুইড্-জামো—চমৎকার!’

দীহু সৈজ বলিল—‘গতি পোঁলাই, ভারী চমৎকার! সুইডের হক্ পোকাজলের শুভ মেখেই?—বাবাঃ—এইয়া বড়-বড়! তার ভপর—’

দীহু জুঁচায় বৈজের সুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, ‘তার ভপর তার সেই জুঁতোর সুইড্-ক’খানা, না? সোকটা চামার না কি কে, তাই ভাবি।’

দীননাথ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। পোঁলাই হাসিল না, বিজ্ঞভাবে বলিল, ‘ঠান্ডা কর আর বাই কর যে, মদন বাবুর ক্ষমতা অবীকার করবে কে? সোটা একহুয়াও শেরোর দি, এই মেখ না এরি মধ্যে এঁলা-এঁলা। জুঁকে জুঁতো পদবার হিড়িক প’ড়ে সেল কি রকম!’

সৈজ বলিল, ‘শক্বে না? এ ত’ লখ ক’রে নহ, ভর ক’রে। হক্ পোকোর ভর! জেবে মেখ একবার, সেই শুভওয়লা হক্ পোকোর দল পা হুঁড়ে, মাংস ভেদ ক’রে, হুড়্-হুড়্ ক’রে সলার গ। বেয়ে বেয়ে উঠে—! জুরে বালাঃ রে! জুঁতের ভয়ের বাড়ি ভর বে! জুঁতো না শ’রে হইবে কোন—’

একটা বড় ঘরকে পাটিশন দিয়া দুইটি ছোট কামরায় পরিণত করা হইয়াছিল। তাহারই একটিতে বসিয়া প্রচারকর্মিণ কাজ করিতেছিল। অপরটি অংওয়ান্ বাবুর কর্শ-কক্। তিনি সাধারণতঃ তিনটারও পর তাঁহার কর্শ-ককে আসিয়া বলেন। তখনও তাঁহার আসার সময় হয় নাই তাবিয়া, কর্মীরা তাহাদের গল্পের লাগাম বেগরোয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। লাগাম-ছাড়া বোড়া যখন তড়-বড়্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহারই কঁকে অংওয়ান্ কখন আসিয়া তাঁহার কর্শ-ককে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কর্মীরা জানিতেও পারে নাই।

দীহু তখন মিঃ মদনের প্রদক্ষে বলিতেছিল যে, কলিকাতার লোককে বিশ্বাস করিয়া অনেক সময় ভয়ানক ঠিকিতে হয়, যেমন ঠিকিয়াছিলেন একবার তাহার মামার বাড়ীর পাঁজের অধিকারীরা; ব্রাহ্মণ অভিক্ষিক লইয়া আহ্বার করিতে বসিয়া অকস্মাৎ তিনিলেন তাঁহারা, শৈতাধারী ব্রাহ্মণপুত্র বলিতেছেন,—‘পানির সোটা কই, লিবেদন করহু!’—অতএব, এ সোকটাও যে চামার নহ, তাহা কে হলপ করিয়া বলিতে পারে?

এমন সময় পার্শ্বের কক্ হইতে একটা হুড়-হুড়্ ধনি উঠিয়া, পাটিশন পায় হইয়া সেই সোল টেবিলের দিকে দ্রুত ‘হুড়’ করিয়া আসিতে লাগিল। অংওয়ান্ বাবু!—দর্শনাশ!—প্রচারকর্মিণের সম্মুখে উঠিয়া গাড়াইয়া নুজলক ললাটে তুলিয়া নবদ্বার জাপন করিল।

অংওয়ান্ বাবু প্রতিক্রমতার দ্বারা না করিয়া

করুণ হয়ে বলিয়া উঠিলেন,—‘কামকর্ণ নেই, ব’লে ব’লে আত্মতা দিচ্ছেন আপনারা!’

সেই বলিল,—‘আজ্ঞে না, তেমন এইসব সুইড—’

সেইরূপে কথা শেষ করিবার অবকাশ না দিয়াই শিবু ওরফে শিবেন ভট্টাচার্যের দিকে কট্টমুঠ করিয়া তাকাইয়া অণ্ডমান্‌ বলিলেন,—‘শিব বাবু, আপনি বিঃ মদনের নামে ঘাড়েতাই ফুৎল। ছড়াতে হুক করেছেন, আরি স্বর্গে গেলেন। যোধ হর — কোলাসি। কোনদিন এমন পেক্‌চার গুলেছেন? আপনার ত’ কোনই মুরোম নেই—হাবু-কাবু কি সব ছাই কম্বলেন সেদিন। আমারই দম্‌মা করছিল! শিব-নিবাসের পাব/সিগিট অকিসার আপনি—এর ক্ষেত্রে আপনাকে বিশেষ-বেতনের ব্যবস্থা ক’রে রাখা হয়েছে।—তারী ডিপ্লোমেট্‌ মশাই আমরা আপনার কাছে!’

অণ্ডমান্‌ কাহারও নিকট কোন কৈকিল্য ওনিবার প্রয়োজন যোধ না করিয়া, হুতা মচ্‌মচ্‌ করিতে করিতে তখনই তাঁহার কামরায় গিয়া চলিলেন। শিবু কিন্তু আপনাকে অত্যন্ত অগম্যবিত মনে করিল—নিজের বক্তৃতা-শক্তি সত্বে তাহার আত্মবিবাস প্রায় ও প্রায়ের বাহিরের প্রোক্ত-পাথর্য কটুক বহুল-সমর্থিত এক শিবনিবাস-কটুক তাহার মুখস্ত দেখিয়া তাহাকে ধামোকাই এমন বেতন দিয়া রাখেন নাই। বীজ মৈত্র হতভব হইয়া শিবনের দিকে চাহিয়া ছিল। পৌলোইয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা হইল,—মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ বাহিরে আবার কিসের সোরসোল উপস্থিত হইল?—ব্যাপার কি? আত্মও কোকুদী হইয়া, একদিক দিয়া শিবনিবাসের কর্ণিশ এক অতদিক দিয়া অণ্ডমান্‌ বাবু তাকাতেই বাহিরে আসিয়া ধাক্কাইলেন। চাহিতেই নম্রত পড়িল—অদ্রবতী পথ বাহিয়া, একাও একটা চট্টের খলে বাড়ে করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে, প্রায় সোঁকাইবার মতই ফুটিয়া আকিড়েছেন বিঃ মদন মণ্ডল,—আর আত্মসদকারী সৈন্যসৈন্যের মত একদল পোক তর্জন-পর্জন করিতে

করিতে তাঁহার প্রতি সবেশে ব্যবধান!—ওকতর ব্যাপারই বটে!

অণ্ডমান্‌ দক্ষিণ হুত কুণিয়া হাঁকিতে হাঁকিতে বানিকটা পথ আদাইয়া গেলেন,—‘কি হ’ল? কি হ’ল?’

হতভুতি কর্ণিশ অণ্ডমানের মহাবতী হইবে কি না তাহিজেহ,—কিন্তু তাহাশিপকে আর অগ্রসর হইতে হইল না, সেই মুহূর্তেই মদন মণ্ডল আসিয়া তাহাদের করেক হাত মাত্র দূরে চট্টের থলি সমেত মাটির উপর হতুড়ি পাইয়া পড়িয়া গেলেন এবং আচম্বিতে সেই হুক থলি পুণিয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। নানা আকারের অনেকগুলি আত্মকারা হুতার পাটি!—বিশ্বের পরিপাটি প্রকাশ!



মদন মণ্ডল হুতার থলি সমেত হতুড়ি পাইয়া পড়িয়া গেলেন

‘প্যাণ্টেট্‌!’—শিবেন লাকাইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল,—উত্তমনার হুক কুণিয়া গিয়াছিল যে,

সেখানে অণ্ডমান্ বাবু উপবিষ্ট আছেন,—যেহ জোর করিয়া তাহাকে ধামাইয়া দিল। সোঁদাইবী একবার আড়চোখে তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, অগ্রণী হইয়া হাত ধরিয়া মদন মণ্ডলকে টানিয়া তুলিতে তুলিতে কহিল,—‘আহা! ওকনে মাটিতে মদন ক’রে আহাড় খেলেন, মদন বাবু? উঃ!—হাটুর কাছে এই যে ছ’ড়েও পেছে অনেকটা দেখছি—’

অণ্ডমান্ ব্যথিত হইলেন। অল্পসরণকারীদিগের প্রতি কষ্ট হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তিনি হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন—অল্পসরণ প্রতিরুদ্ধ হইল। তাহার দ্বাবীর টোলের পাঠাখী করেকজন বয়স ছাত্র এক পথচারী করেকজন কোতুকী পথিক। অণ্ডমানের চক্কে তাহার করেক-পা পিছাইয়া গেল।

‘মদন বাবু, ব্যাপার কি?’—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অণ্ডমান্ মিঃ মদন মণ্ডলের বহনমণ্ডলের প্রতি চাহিলেন।

হাত সোঁদাই বলিল,—‘ওঁকে একটু জিরোতে দিন না দয়া ক’রে! এখন কথা কইবেন কি উনি,—হাঁপাচ্ছেন কেমন, দেখছেন না?’

কতক টোলের হেলেনিগকে দেয়া করিয়া, কতক মিঃ মণ্ডলের ঘুখে গুলিয়া সংঘটিত ঘটনাকে কিছু পরে আকার দান করা হইল এইরূপ—মিঃ মণ্ডলের অস্থায়ী বাসের ক্ষত টোলবাড়ীর একটা কোণের ঘর নির্মিষ্ট হইয়াছিল। হুতাং সেই ঘরে আশে ছিন্নায়েবী জটনৈক ছাত্র আবিষ্কার করিয়া ফেলিল—চমৎকার জুতার আড়ং! সহায়্যারীরা প্রথমে তাহার কথা বিশ্বাস করিল না, কিন্তু অচিরেই প্রমাণিত হইয়া গেল যে, আবিষ্কার নিষ্ঠাৰ্ণ সত্য; এবং তৎকালেই তাহার সেই চমৎকারবায়ীর হুঁতর জন্ত—পকির টোল-বাড়ীকে অপকির করিবার দুসাহসিকতার জন্ত, নিষেধারী দণ্ডতার গ্রহণ করিয়া, চমৎকার লুপ্ততাহাকে চতুশাণী হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়া তাহার পক্ষাভাবন করিল। —কিন্তু কি অবিশেষক, কি দৃষ্ট এই পোঁদো ছাত্রের দল! ইহারা কি একবারও

বিবেচনা করিল না যে, কত কষ্টে, কত অর্থব্যয়ে, এই জনহিতৈষী অবৈজ্ঞানিক স্বাধাত্তপ্রচারক মিঃ এন্স, এন্স, মণ্ডল অকালমৃত্যুর হাত হইতে, হৃৎস্পোকের ঘূষ হইতে তাহাদের গ্রামকে উদ্ধার করিবার জন্তই এতদূর বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছেন ঐ সব পাণ্ডকাভরণ কীটমাগ স্ববভুলগি?—নামবাজ ঘুলো এগুলি ত’ তিনি তাহাদিগকেই বিতরণ করিয়া দিয়া বাইতেন!—হায় রে অকৃতজ্ঞ, দুইকন্য়ার দল!

সোঁদাইবী আসিয়া অণ্ডমান্ বাবুর কানে কানে কি কহিল। তিনি শিবু ভট্টাচার্যের দিকে ক্ষুদ্র দৃষ্টি হানিলেন—টোল-কর্তা মণেশ ন্যায়বাণীশের জাহ্নুম্বর এই মিটিমিটে পল্লভান শিবেন ভট্টাচার্যই বত অনিষ্টের মূল। অণ্ডমান্ কহিলেন,—‘ভট্টাচার্য, আজ থেকে আপনি ডিসমিস্‌ড!’

সোঁদাই একবার নিম্নের ধীর্ণ পাণ্ডকার প্রতি ও একবার সেই হুড়াইয়া-পড়া চক্কে জুতার পাটিগুলার প্রতি চাহিয়া মিঃ মদনকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—‘আহা! মণ্ডল সাহেব, কেন এই পরীষের বাড়ীতে অভিযি হ’লেন না আপনি?—তা’ হ’লে কি এই বিভ্রাট ঘটে!’

অল্পসরণকারীদিগের ভীড়ের মধ্যে মিশিয়া পথচারী ভিন্নগ্রামবাসী কয়েক ব্যক্তি গাড়াইয়া ছিল। ঐ দলের একজন নিয়ন্ত্রণের লোক অণ্ডমানের সমুখে আসিয়া সেলাম দিয়া কহিল,—‘আমার কথাটা দয়া ক’রে ওল্‌বেন কি একবার, হুঙ্কর!’

‘আঃ বল না’—শিবু মোখায়ে লোকটিকে বলিল। এ যে তাহার পরিচিত কেটা মুচি! কি বলিতে চাহে সে?

কেহ লক্ষ্য করিল না, এই সময় মিঃ মদনের ঘুষ পাণ্ডবর্ণ ধারণ করিল। অণ্ডমান্ শিবুর দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়া, অপরিচিত লোকটিকে তাহার বক্তব্য বলিতে অস্বস্তিচক্ক ইঙ্গিত করিলেন। সে বলিল,—‘হুঙ্কর, এই মণ্ডলের-পো আপনাদের গাঁয়ে নয়া মাদ্রু হ’লেও আমাদের গাঁয় পুরানো।

গেল ক'বছর থেকে আমাদের সঙ্গে এঁর চামড়ার কারবার আছে। কলকাতার সেই যে কি বলে— তারি উনি চামড়ার দালাল। আমার নাম কেটা মু—'

অন্তমানে মি: মণ্ডলের হাত ধরিয়া অবিলম্বে শিবনিবাসের গেটের খিলানের তলে গিয়া দাঁড়াইলেন। টাংকার করিয়া বলিলেন,—‘সব ঐ শিবু ভট্টাচার্যের কারসাজি—বদ্মাইসি! দাঙ, দীহ, তোমরা চ'লে এস। এই রামরতন, হেই দারোয়ান, ভীড় ভাঙ্গাও ত্বরম্!’

সন্ধ্যার পর শিবনিবাসের কণ্ঠকর্তৃগণের বিশেষ-অধিবেশন বসিল। শিবু ভট্টাচার্যের পদচ্যুতি সমর্থিত হইয়া, সেই শৃঙ্খলপদে মি: এম, এল, মণ্ডলকে মাসিক পক্ষাংশ মুদ্রা পারিশ্রমিকে কায়মনী ভাবে স্থাপন করা হইল। দাঙ গোঁসাই মি: মণ্ডলের বিশেষ-সহকারীরূপে মাসিক বিশেষত্বের প্রোমোশন পাইল। মৈত্রকে আপাতত: তাড়িত করা হইল না বটে, তবে স্থির হইয়া গেল, কিছুদিন পরে মণ্ডল সাহেবের

মানুভূতা ভাই এখানে আসিয়া পৌছাইলে তাকে তৎক্ষণাৎ সরাইয়া দেওয়া হইবে। সর্বশেষে স্থানীয় টোলের মাসিক সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

অধিবেশন-শেষে ত্রিগুত চট্টরাজ তাহার নিরুত লাইব্রেরী-কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। আলমারি খুলিয়া বাহির করিলেন কলিকাতার পুরাতন বইয়ের ষ্টল হইতে কিনিয়া আনা একখানি সাপ্তাহিক ‘স্পেক্টেটর’। পৃষ্ঠা উল্টাইয়া বাহির করিলেন ‘মেজর এডেলিন রেল’ লিখিত বিখ্যাত পাছকা-ব্যবসায়ী ‘বাটা’র জীবন-পরিচায়ক বিশেষ একটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি একাগ্রমনে পাঠ করিলেন।

সেইদিন রাতে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন—প্রকাণ্ড প্রাস্তরজোড়া এক ইমারত,—তাহার এক দিক দিয়া চামড়া বোঝাই অগণিত শকটশ্রেণী প্রবেশ করিতেছে এবং অল্প দিক দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে অজস্র প্যাকবন্দী জুতার বাগ বোঝাই গাড়ীর সারি। পৃথিবীর অল্পতম কণ্ঠবীর ও ধনবীর ধীমান ‘বাটা’ যেন স্বপ্নে তিনিই—তাহার আদেশের অপেক্ষায় তাহারই নিজের আরোপ্লেন প্রস্তুত হইয়া আছে,—এখনই তাহার পাখার শব্দ শ্রুতিগোচর হইবে!



পদব্রজে ভারতবর্ষ

শ্রীহুগাপদ ভট্টাচার্য্য

[পূর্ণপ্রকাশিতের পর]

লন্ডন গ্রামের একজন অবসর-প্রাপ্ত উকিল আমার চলার ধরনে খুশী হ'য়ে আর একটা টিকানাও সেন— সেটা হ'চ্ছে ময়ূরভৈরব । কিন্তু সে-টিকানার বিজ্ঞানার কথা পরে হবে ।

সন্ধ্যার 'চলেশ্বর'-ট্রেনে তার মহাশয়কে আবিষ্কার করা গেল । তাঁকে ধাক্কেনের কথা ও নিষেধ উদ্বেগ বস্তুতে আরম্ভ করেছি, এমন সময় এল এক পুলিশের দোক । সন্ধ্যা — কলকাতার 'রাইটার্স' বিল্ডিং-এ নাকি খুন হ'য়ে গিয়েছে । আমার পথের সবল, মোটা-কমলাদি ও সরকারী কাগজ-পত্রগুলো সন্নিবিষ্ট দৃষ্টিতে পরীক্ষা করার পর, রাত পোহালেই রওনা হ'ব কিনা জানুত চাওয়ায়, হুদিন ক্রমাগত পথ-চলার স্রুতি শেষেও "হ্যাঁ" বলতে হ'ল । দুব্বীর উদয়াস্ত-কালের মধ্যে বেশখা থেকে আটপা মাইল চলে আসাও, তার মহাশয় বেরকম উৎসাহে 'বাহবা' মিলেন, তা'তে আর পরের দিন বেরুতে সেরী করার ইচ্ছা থাকলেও, উপায় ছিল না ।

সকাল-সকাল নৈশ-ভোজন শেষ হ'য়ে গেল ; ঘা'কে তা'কে হান বেওয়া সে-সময়ে যে কত বিশৃঙ্খলক, একাধিক দৃষ্টান্ত সহ তার মহাশয় তার পরিচয় মিলেন ; কথাপ্রসঙ্গে তাঁর মুখে পোনা গেল যে, এখান থেকে সাত মাইল দূরে 'রাক-বনিয়া' নামক স্থানে বিরাট রাজ্যের পক্ষ প্রতীতি পৌরাণিক কীর্তি-কলাশের জলসাবণে সেখ'তে পাওয়া যায় । প্রাতে শব্দাত্ম্যদের পর, আগ্রহবানে কোনও বিশৃঙ্খলটে নি সেখে রাক-পরিবার যে অনেকটা আশ্রয় হয়েছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল, বখন পাশের শোকান থেকে আমাকে ভারমোক্তার ভ'রে চা আনুত সেখে তার মহাশয় বললেন—"শোকানে কেন গেলেন ; চা বাকীতেই হ'ত" ।

বিদায়ের সময় প্রায় ধোল মাইল পথের মাধ্যম 'বত্ৰা' গ্রামের খানার দারোগা শ্রীহুগ মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের টিকানা ব'লে মিলেন ; বললেন— "তাঁর কাছে আমাদের নাম করলে বাহবা হবে ।"

অতিক্রমে পথ ঠাট'তে লাগলুম । পারের ওলা আর বেন পাড়া যার না, ঐতে আড়ট আত্মলগ্নো কন কন করুতে লাগল । কিছু দূর এসেই সামনে পড়ল পথ-জাপ-করা একটা 'নালা' । জুতো-মোজা খোলার দৃষ্টাবনা মনে আসবার সঙ্গে-সঙ্গেই চোখে পড়ল একটা বকর গাড়ী ; গাড়োয়ানকে স্রাখি করিয়ে, ঐ গাড়ীর সাহায্যেই জলটুকু পার হ'য়ে কের চলতে লাগলুম । মাইল কতক এসেই সামনে পড়ল 'হুর্বারেখা' ; যদিও ছিল রেখার মত, তবু বর্ষায় যে ভীষণ হয় তার প্রমাণ উভয় তীরের ব্যবধান । রাত্রে ক্রমে জলহীন বালির ওপর বেমে আসার বালি ভেঙ্গেই জলের কাছে আসতে হ'ল ; কান্দা থাকার এইবার জুতো-মোজা কুণুত হ'ল । পাশেই রেলের পুল, তবু পুল দিয়ে পার হ'তে সাহস হ'ল না ; পারানি দিয়ে নৌকার পার হ'য়ে এসে চলতে চলতে এক প্রান্ত্য চৌকীদারের সঙ্গে দেখা হ'ল ; সে চলেছিল খানার 'হামিরা' দিতে ।

দারোগাবাবুর বাসায় ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণে চলেছি, এ-খবর তাকে দিয়েই আগাম পাঠিয়ে, পথের ধারের এক 'কাক-চু' নদী-কুলে দানোভিপ্রায়ে পিঠের বোতা নামান গেল । অগ্রগামী চৌকীদারকে উঠে-খরে আবার খবরটা শৌছে দিতে বললুম । দান দেবে, গামছা তুকিয়ে, 'বত্ৰায়' আসতে একটু সেরীই হ'ল । খানার এসে শুক্লুম দারোগাবাবু বাইরে গেছেন, আছেন তাঁর ছেলে ; বাসায় এসে ঘোষ মহাশয়ের নাম ক'রে ডাকতেই তাঁর ছেলে বেরিয়ে এলেন । আশ্চ-

পরিচয় এলানের পর, চৌকীদারকে দিয়ে খবর পাঠানর কথা বলতেই তিনি বেন আকাশ থেকে পড়লেন। চৌকীদারও পাশেই ছিল, তাকে সেখানে দিলুম; বেচারী বকুলী খেল; অতঃপর তিনি লম্বকতঃ অতুল অপর কারও স্মরণে গ্রাস আমার জন্তে ব্যবস্থা করে দিলেন।

মারোপাবাবুর ছেলে ছিলেন Sub-Inspector: চাকরী সাপারাপি করে ছেড়ে দিয়েছেন। বললেন—“এক হপ্তা আগে খবর পেলে আমিও যেতাম সলী হ'য়ে, কিন্তু হঠাৎ কি করি? আটক রাখাও যায় না; দেখছি, এমন সলী হেলায় হারালুম; বাড়ী ব'লেই বা লাভ কি?” এক বাবাঝীর নামে তিনি একখানা চিঠি লিখে দিলেন—নর মাইল পরে ‘রপসা’র, পথের পাশে এক সাধুর মঠে। সন্ধ্যার ‘রপসা’র এসে পরহুজ্জ বাবাঝীকে নমস্কার জানান পেল। চিঠির সৌন্দর্যে খাতির-বহু, আহ্বার ও আশ্রয় কিছুই অস্বীকার না। হোট মঠ; খানকরেক চান্দবর; ঠাকুর, শিখ ও আছে; খাট-বিদ্যান ও দু'একটা দেবা পেল। গ্রামের লোকের বাবাঝীকে বেশ ভক্তি করে ব'লে মনে হ'ল।

সকালে দুম ডাকডেই মনে ভাবলুম—“মহুর্ভজ থেকে কিছু সাহায্য পেলে অতীষ্ট-শান্তের সুবিধা হবে, রাজবাড়ী সেবাও হ'তে পারবে; কিন্তু ও-রাজ্য বখন সোজা পথের বাইরে, তখন হেঁটে না গাওয়াই ভাল।” মঠ থেকে রপসার ট্রেন গ্রার দেখে মাইল দূরে, আর ঐ ট্রেন থেকেই মহুর্ভজের narrow gauge রাড়ী State-এর বিম্বয় লাইন ধ'রে বাড়ী বহন করে চলে। এগার আনার টিকিট কিনে উঠলুম রাড়ীতে; দুপুর বেলা ‘বারিশাবা’ টেক্সন নামা পেল—সহর এখান থেকে এক মাইল দূরে। সহরে এসে এক হোটলে মান, আহ্বার পেয়ে আশ্রয় নিলুম মহারাষ্ট্রের ধর্মশালায়! খাওয়ার খরচ এখানে খুব কম, সাধারণ লোক খায় হ'লুয়া ও হ'লুনা, আর ভরলোক বেশ দশ পক্ষা; উরকারীর অন্নতা ও আদিকাই খরচের ঐ ভারতসেবার কারণ।

উকিল ঐনুল লাদেবান পতি ও মহারাষ্ট্রের ডাক্তার ঐনুল মহেশ্বর পতি মহাশয়দ্বয়ের পরিচয় লাক্ষ্যং ক'রে সকল কথা বললুম—যার ট্রেনে আসা পর্যন্ত। তাঁদের নির্দেশ-মত পেলাম দেওয়ারের ভবনে; একজন বললেন, “তিনি বাড়ী নেই, জা' ছাড়া, সেবা করতে হ'লে proper channel দিয়েও আসা সরকার।” রাখার অর চ'লেছিল; এাইতেটে সেক্রেটারীর সেবা পেলুম; স্মৃণে উৎসাহ দিলেন মাম। বার-লাইবেরীতে পেলুম, বাজে কথায় সময় কাটল। হঠাত হেঁটে এলে কল হ'ত কিছু, কিন্তু রাড়ীতে আসায়, অপরের সহায়কুতি তো স্মৃণের কথা—নিষেধ মনেই বেন ছোর পৌঁছানিলা না। সন্ধ্যার হোটলে বেতে, গ'লাম ধর্মশালায়; ঐত খুব কমকেন; রাতে ভাল ঘুম চ'ল না; পরসাত পেল স্মৃণেরে; পড়লুম হুচিহায়া।

১৭ই সকালে, যে ক'টা পরসাত ছিল বড়ি ও চা বেতে রাখমর্শন-ইচ্ছার রাখ-বাড়ীর স্মৃণং তোরণ ও রক্ষীসের বাহু ভেল ক'রে, waiting room পর্যন্ত এগিয়ে, বিকল-অবোরণ হ'য়েই ফিহুতে হ'ল। সাতাটী দিন Hydro-Electric Power-House, Excavation, মন্দির, ধর্মশালা, নলী ও পর্কতময় হানের বৃত্ত প্রকৃতি দেখে বেড়ান পেল। মহুর্ভজ থেকে প্রায় ১০১২ মাইল দূরে এক পাছাড়ে প্রাপ্ত 'Iron-ore'-এর প্রাচুর্য্য নাকি ‘টাটা’র সৌধ পণের খুব সুবিধা বাটরে দিয়েছে।

সকলেই পরামর্শ দিলেন, এই সব দেখে বেতে, কিছু বাই কি নিয়ে? সন্ধ্যার পরীর হ'ল ক্লাস; ধর্মশালায় এসে দেখি সন্ধ্যাত পাছে ভিখারীর দল। আমি ব'লে সেথতে লাগলুম। আমাকেও পের প্রায় হ'ল—“হুমি কিছু নেবে?” অত্তে পাচ্ছিল ‘আনি’—কিন্তু, আনি একে ভরলোক, তার রাখমর্শনাভিলাসী—তার তপস প্রথম দিনে কিছু গ্রহণ করি নি—হুতরাং চতুর্গণ পাবার বোধ্য বিবেচিত হ'লুম। পোনো পেল—ঐ ধর্মশালায় দৈনিক সন্ধ্যাতের budget

নির্ধারিত আছে; প্রাণী শোকের অল্পতা ও অধিকা অল্পসারে বস্টনের পরিমাণ কম বেশী হয়।

পরিষদ উকিল ঐক্লু লাগবোহন পতি ও ডাক্তার ঐক্লু মহেশ্বর পতি মহাশয়ের অর্থ-সাধ্যা বাডায় লিবিয় নিয়ে, আহারান্তে, যে-পথে এসেছিলেন সেই পথেই সন্ধ্যাকালে সেই বাবাখীর ঘটে উপস্থিত হওয়া গেল। মনে মনে সন্দেহ করণুম, যেখানেই বাই, হ'ক তা' শাখা-পথ, অতঃপর হেটেই বাব; যেতে না পেলোও, হাটা-পথে ছাড়া সস্ত উপায়ে কোনখানেই আর যাওয়া নয়।

১২৫ গুরুবার সকালে বাবাখীর কাছে বিদায় নিয়ে বারো মাইল দূরবর্তী 'বালেশ্বর' রওনা হলুম। 'হুশলা' নদী নৌকার পার ঘ'রে, এবং ষ্ট্রিট এদিকে কম থাকার মান প্রকৃতি পথেই সেবে, মধ্যাহ্নে বালেশ্বর সহরের এক ধর্মশালার উপস্থিত হ'লুম। এক চোটেলে আহার সেবে প্রায় দুই মাইল দূরে বালেশ্বরের ঠেপনের কাছে S. D. O. জানবাবুর বাড়ী অভিমুখে রওনা হ'লুম। কাছাকাছি এসেই মনে প'ড়ে গেল, এই ঠেপনেই ঐক্লু ইন্দুবাব চ্যাটার্জি মহাশয় কাম করেন। বোম নিয়ে, তাঁর বাসাতেই আশ্রয় নিলুম। ঠেপনে দেখা হ'ল আর এক ভক্তলোকের সঙ্গে; তিনি মছুরী টেটের ম্যানেজার, নাম ঐক্লু রত্নাকর বোহাতি, থাকেন আখোয়াপোতা, ভক্তকের পর যেখানে 'গ্রাম্ভী' পার হবার রাস্তা। ইনি ব'লে দিলেন—পথে যেন তাঁর বাড়ী বাই।

S. D. O. জানবাবুর বাড়ীও হ'রে এলাম; সে-সময়ে তাঁর ছেলের অস্থখ, ভু ইন্দুবাবুর বাড়ীর আশ্রয়ে থেকেই জানবাবুর বাড়ী আহারাদির ব্যবস্থা হ'ল।

পরিবার সকালে জলমোষণের পর বিদায় নিয়ে জানবাবুর সহিত দেখা ক'রে একটা টাকা পথঘরচা চেয়ে নিয়ে পথ ধ'রলুম। পুলিশ-ঠেপনের কে একজন বিজ্ঞাসা করতই বললুম—“জানবাবুর আতিথ্য

গ্রহণান্তে চলছি”। আর বিকল্পিত না ক'রে বললেন “মাপ করবেন”।

মাঝে মাঝে বিপ্রায় নিয়ে ও পথে যান সেবে কুড়ি মাইল পথ হেটে বিকালে পৌছলুম 'গেটো' নামক গ্রামে। পথ হ'তে গ্রাম কিছু দূরে। পথ ও গ্রামের মধ্যে এক উকিয়ার হোটেলে আশ্রয় লাভ করা গেল। গ্রামে আর সেলুম না, আশ্রয় সত্য ছিল এবং ইচ্ছা ছিল যে, এই নির্জন স্থানটীতে বিপ্রায় নিয়ে কামা-কাপড়গুলোও একটু পরিষ্কার ক'রে নিতে হ'বে। ছ'তিন জন উকিয়া বছর সঙ্গে নারকেল-পাতার 'চাটাই' পেতে হুঁহুটা রাত বেশ কাটালাম। পথটা বেশ নির্জন; অনতিদূরেই পাহাড় দেখা যায়; ডাকবালাও একটা আছে।

২২৫ সোমবার সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'সোমো' থেকে যাত্রা করলুম ভক্তকের দিকে। সঙ্গে ছিল কয়েকটা ডিম সিদ্ধ, পথে যান সেবে তাই খেয়ে নিয়ে, ভক্তক নদীর পুল গেরিয়ে লঙ্কার সহরের contractor ঐক্লু প্রবোধচন্দ্র মুখার্জী মহাশয়ের গৃহে উপনীত হলুম; হাকিমসেবে সেখান থেকে সাত মাইল দূরের এক অফিসেন ও গভিন্কা ব্যবসায়ীর বাড়ীতে মধ্যাহ্ন ভোজন সেবে, লঙ্কার প্রায় ত্রিশ মাইল পথের প্রান্তে 'আখোয়াপোতার' এলাম। 'গ্রাম্ভী' নদীর তীরেই এই জায়গাটি; ভেসে যাওয়ার ভয়ে নদীতে বাধ দেওয়া আছে। লঙ্কার আখোয়াপোতার বাঁয়ের ওপর ঘিরে 'এ্যানিকটের' কাছে Inspection Bungalow ও টোল-গেটের ব্যবসার নিকট—মছুরীর পথ বিজ্ঞাসা করি, এবং আরও চার মন cycle-tourist-এর অবস্থানের কথাও জানতে পারি। জলপরিপূর্ণ স্থান; সঙ্গে লোক নিয়ে, গ্রাম্য পথ ভেসে গৌ বালেশ্বর ঠেপনের পরিচিত ঐক্লু রত্নাকর বোহাতি মহাশয়ের বাড়ী সেলুম। তাঁর অস্থপরিষিদ্ধে নিরপায় হ'রে অস্থবে সন্ধ্যা পাঠাইকেই স্বপ্ন হ'ল; তাঁর দয়ানতী শ্রীর আতিথ্য গ্রহণ করলুম।

পরদিন ২৪এ বুধবার। এই বুধবারেই একবার ক'রে মহানন্দা ত্রাণের স্মৃতি গ্রাণে ভাবে। সকাল হ'তেই বারো মাইল পূর্ববর্তী বামপুত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। টিকানা ছিল ঐক্য গোবিন্দপ্রসাদ ঘোষ মহাপুত্রের বাড়ীর; মধ্যাহ্নে বৈতরণী হেটে পার হ'য়ে এসে বামপুত্রের দান ও আহার করি। বামপুত্র একটি তীর্থস্থান; বৈতরণীর তীরে স্নান প্রভৃতি ক্রিয়া প্রথমে। গঙ্গার লেখ ব'রে ঐ নদী পার হ'লে, গঙ্গারীরে বর্ষাকালীন অসামান্য হ'য়ে আসে, এইজন্য প্রসিদ্ধি। একে সাধুভিত্তিশ্রম জালা, তাঁর তীর্থস্থান, হুতরাং এ জায়গার মাহাত্ম্য অবশ্য স্বীকার্য। পরের দিনটী পুত্র-কিরে চতুর্দিক দেখে ও সাংঘাত্য সংগ্রহ ক'রে কাটানোর পর পরাগোপ ঐক্য মহাপুত্রের ভট্টাচার্য্যের উপদেশবানী মন্ত্রণ ক'রে, তত্ত্বাবধায় পুনরায় রওনা হ'লুম। বারো মাইলের মাথায় হরিপুর গ্রামের ডি, এম, ঘোষ মহাপুত্রের বাড়ী মধ্যাহ্ন-ভোজনান্তে আরও বারো মাইল হেটে 'নেউলপাড়া' এলাম। এখানে আসতে বিজ্ঞান ও মহানন্দার মাঝে হেটে পার হ'য়ে আসতে হ'য়েছিল। হুঁজুন ছাত্রের সাহায্যে, নিকটস্থ মাঠ পার হ'য়ে, ছোট পাছাড়ে মন্দির ও ঐক্যকল্লের করণ। দেখে এক দেবালয়ে আগ্রহ গ্রহণ করলুম। রাতে ভগবানের প্রসাদ লাভাণে এক নিদ্রায় রাত কাটালুম। সকালে পথে বেঞ্চাইই একদল লোককে হৈ হৈ পুষে লাঠি হাতে ছুটতে দেখে কারণ বিজ্ঞান ক'রে জানা গেল—কেতের মধ্যে এক হরিণের গুণ্ডাসমন বটেছে। এ দেশের বড় হরিণকে "শমর" বলে। বাঘ বা মজ্জা কিছু ভেবে হঠাৎ যে একটু আতঙ্ক সৃষ্টি হ'য়েছিল, এটা স্বীকার করলেই সত্যের অপলাপ হয়। পথে আহাণ্যের অভাব ও শীতের প্রভাব অসহ্য হ'তে পারার, কিংবা চানের আশায় পথ ছেড়ে হুঁ মাইল দূরে রেল-স্টেশন 'বর্ডনা'তে উপস্থিত হই। বিশেষ কোন ব্যবস্থা না থাকায় কাছেই শ্রমীর স্টেটের ম্যানেজার মহাপুত্রের বাড়ী থেকে একটু দুধ আনিবে, কোন-রকমে-

প্রথম-করা একটু জলে ঢা তিহিরে পশাৎকরণ করার পর আবার নিখিষ্ট পথে এসে চলতে আরম্ভ করি। পথের ধারে গ্রামের স্বী-পুত্রের যে সব ফল-ফল বিক্রী করছিল, তাই খেয়ে এবং পথ ভুলে সন্ধ্যায় এলাম 'কলংসিগুহ'। এখানে হোকার-পত্র, রেল-স্টেশন ও মহানন্দা পারাপারের ব্যবস্থা আছে। হুঁটার তীমার ও নৌকা ছেড়ে দিয়েছিল। অকস্মাৎ এখন পুত্রের ওপর রেলপথও বিপজ্জনক ভেবে, প্রায় ত্রিশ মাইল পথ হাঁটার পর অবশেষ নদীরে স্টেশনে এসে এক আনার স্টিকিট কিনেই ট্রেনে মহানন্দার পরপারে রাতি আটটার পৌঁছান গেল। আরও কিছু চলেছিল, কারণ চিঠি দিয়েছি ২৭এ কটক দাব। অকস্মাৎ অজানা সহরে, গেলাম ডাক্তারালোর সন্ধান। প্রায় এক মাইল হেটে এসে দেখা গেল ওহানের ভাড়া অতিরিক্ত। হোটেলে আগার বেগ ক'রে, ত'লাম কেমার কাছে পথের ধারে এক পাছতলায়। মহানন্দাও এখানে চ'তে কাছাই। রাত প্রায় ১২টার কে একজন আলো-হাতে নদীতীরভিত্তিতে চ'লেছে দেখে, ডেকে আগ্রহ-প্রাণী হ'লুম। ইনি মন্দিরের রক্ষক ও পুষ্কারী; আগ্রহ দিলেন কটকচতীর মন্দিরে, যেখানে ঐচ্ছিক দেব পুত্রীর পথে প্রথম মহানন্দা পার হ'য়েই কটকে শ্রীপাদপন্ন রক্ষা করেন। এই নির্জন মনোরম স্থানে, মহানন্দার তীরে, পরিষ্কার কৃষ্ণলগ্নে দিহ, পবিত্র দেবমন্দিরে রাতটা কেটে গেল।

সকালে জানাতে প্রসাদ লাভের পর, ঐক্য মহাপুত্র বাবুর পিতা ঐক্য জ্ঞানকীনাথ বহু মহাপুত্রের বাড়ীর সন্ধান পেলুম। সন্ধ্যায় উকিরা-বাগারের বোম্ব ক'রে, সেই বাড়ীতে উপস্থিত হ'য়েই দেখা পেলুম ঐক্য মহাপুত্রের বহুর। তাঁকে নিবের পরিচয় দিলাম; সেখানে পরদিন আগ্রহের ব্যবস্থা হ'ল।

সকালে ত্রি বেঁচে ও মন্দিরের পুষ্কারীকে পত্নবান দিয়ে চ'লে এলাম সন্ধ্যায় বাবুর বাড়ী। বাগান-বাগিচা ও স্কল-ভিত্তিসমস্ত আসবাব-পত্র পূর্ণ এ বেন এক বামপ্রাণাদ। মিষ্ট ভাষায়, অসামান্য ব্যবহারে ও

পরকে আপন করার সম্বন্ধ স্থতাব দেখে সব কষ্ট ভুলে সেলাম ; গ্রামে নুতন উৎসাহ-উদয় এল।

সন্ধ্যায় সুরেশ বাবু আশায় নিয়ে ‘টুরিষ্ট’দের কত কাছ, তার বিবরণ দিতে বসলেন, এবং ভারতের ও দিগন্তের বহু বিখ্যাত স্থান ও দেখ্যার ভিনবিশের নাম ও বস্তুদের টিকানা লিখে দিলেন।

করেকল্লন বাদামী গুহ্রলোকের সহিত দেখা ক’রে কিছু সাহায্য নিলুম ; ইনিও কিছু দিলেন ; সঙ্গে বাবার রাখা উচিত, চলা-পথে লাঠি প্রয়োজনীয়,— ‘সকেছলু’ বা এই প্রকারের কিছু সঙ্গে রাখলে শিশু-সন্তান হ’লেই নিবৃত্ত হ’বে বলার পর, কি ক’রে শরীর রাখতে হয়, হাঁটার পর কি করা উচিত, এ সম্বন্ধেও বিশেষ ক’রে অনেক উপদেশ দিলেন।

৩-এ মঙ্গলবার, সকাল আটটার সুরেশ বাবুর সেওয়া বাধার ও কটক থেকে কেনা কিছু শ্রিনিধ-পত্র নিয়ে শহর ত্যাগ করা গেল। অল্প এসেই ‘কাটজুর্ডি’ নদী—জল না থাকায় সন্নিহিত সাহায্যে তার খোদাটা অশ্রুতঃ ভরাট ক’রে চলাচলের পথ প্রস্তুত হ’য়েছে—পার হ’য়ে ভূবনেশ্বরের স্নাত্যার পড়লুম। লতাভঙ্গ ও বৃক্ষবল ছায়ায়মা নির্জন পথ কখনও বা হোট হোট গ্রামের মাকধান দিয়ে, কখনও বা শতক্ষেত্র ও বিহঙ্গ-কাকলী-বুঝিত বনভূমির অভ্যন্তর দিয়ে অগ্রসর হ’য়েছে ; তত্বে এক-আধটা Inspection-Bungalow গাছ-পাশার কাঁকে কাঁকে খাড়া আছে, সেখা যায়। অরণ্য-বিহারে অল্পটি ধ্বংস নেকড় প্রকৃতি ব্যায় জাতীয় জীবও এ পথে পায়চারণ ক’রে থাকে ; তবে দিনের আলোয় তাদের বড় একটা দেখা যায় না। সুরেশ বাবুর উপদেশ সসূহের প্রসঙ্গে আশ নির্ভরেই পথ চলেছিলাম।

বেলা ত্রিপ্রহরে, কটক থেকে আঠারো মাইল পথ অতিক্রম ক’রে, ভূবনেশ্বরে স্নাত্যাবাসের বাড়ীর সম্মুখায় গতি বন্ধ হ’ল। এখানে চাকরের নাম খ’রে জেকে ও সুরেশ বাবুর হাতের লিখন নিয়ে থাকার ব্যবস্থা পাকা

করা গেল। তার পর, আহারাতির আয়োজন হ’ল। সে সময়, এখানে অনেকই বাহু-পরিবর্তনে এসেছিলেন ; হারাে তাঁদেরই একজনের বাসায় আহার দেয়,—চৌহ-ডাকাত ও বাঘের বহু অশকীতির কাহিনী শুনে,—মন্দির, পুস্তক, কুণ্ড ও নবুভমিকার পাহা দেখে পথের ক্রান্তি দূর করা গেল। দু’এক বেলা জাটটেরিগাসেও নিমন্ত্রণ হুটেছিল।

পরের দিন সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে বাতায়তে স্নাত মাইল হ্রের দু’টা হোট পাহাড় দেখতে গেলুম,—অন্তগিরি বা খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি নামে অভিহিত হ’য়ে



মৈন ওয়ার গুহ (৭০মিতি)

কোন্ স্রুত কাল থেকে এঁরা বহু তীর্থ-যাত্রীর অফেতুকী শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক’রে আসছেন। ইতরাঙ্গী বর্ষের শেষ দিনটিকে (৩১এ ডিসেম্বর, ১৯৩০) এ অন্তগিরি থেকেই অন্তগমনের অধিকার সেওয়া গেল,—নববর্ষের প্রথম উষাও হুহত এখানকার উদয়গিরি থেকেই উদিতা হ’য়ে থাকবেন,—কিন্তু আমি সে সময় ভূবনেশ্বরের বন্ধ-ঘরে গুয়ে পুঁরী পথেরই পথ দেখছিলাম।

(ক্রমশঃ)

বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

শ্রীহরেশচন্দ্র নন্দী

সম্ভাব্যিক বংসর পূর্ণে বাঙ্গালী জাতি জ্ঞান, সভ্যতা ও শিক্ষার কত উন্নত এবং ধর্ম, শিক্ষা, জ্ঞান ও সভ্যতা প্রচারে কিত্তপ অগ্রণী ছিল, তাহা পাল-সাম্রাজ্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে স্মৃতিতে পাতা যায়। সুবিশাল পাল-সাম্রাজ্য বাঙ্গালীর কর্মশক্তিতে পূর্ণ — রাজ্য-প্রসিদ্ধিতা বাঙ্গালী — রাজ্য-পরিচালক বৃহস্পতিকুলা বুদ্ধিমান মন্ত্রী বাঙ্গালী — রাজ্য-রক্ষক ধনঞ্জয়কুলা বোদ্ধা সৈন্যবাহক বাঙ্গালী! সমগ্র পাল-সাম্রাজ্য বাঙ্গালীর কর্ণোস্থাননা—বাঙ্গালীর কীর্তি-সৌরব-মহিমার সমুচ্ছল!

পাল-সাম্রাজ্যের ইতিহাস—বাঙ্গালীর সিংহাসনের ইতিহাস! সে-ইতিহাস কত ভাঙ্গলিপি, শিলালিপি, কত চৈত্যা, বিহার, জুপ, স্তম্ভ, কত পাথরে গঠিত দেবদেবী-মূর্তি পদপ্রস্থ, কত শত মন্দিরে উৎকীর্ণ হইয়া বাঙ্গালীর বিম্বর-সৌরব-মহিমা ঘোষণা করিতেছে!

বাঙ্গালী রাজা ধর্মপাল, দেবপাল দেব বেমন সিংহবর্মণ করিয়া সদাপরা ধরণীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তেমনই বরহননীর মুখোজ্জলকান্তী বাঙ্গালী পণ্ডিত ঈশ-ভদ্র, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ও শাস্ত্রবন্ধিত ভারতের ধর্ম, সভ্যতা, শিক্ষা, জ্ঞান-ঐক্য বিস্তার করিয়া বহির্ভারত ভ্রম ও বাঙ্গালী জাতিকে অর্ধ-এসিয়ার নম্র ও শিক্ষা-ভঙ্কর আসনে অধিষ্ঠিত করেন।

সিংহবর্মণী বাঙ্গালী নরপাল ধর্মপাল দেব ধর্ম, শিক্ষা, সভ্যতা প্রচারের উদ্দেশ্যে অষ্টম শতকের শেষ পক্ষে বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পাল-সাম্রাজ্যের অধ্বাসরের সঙ্গে সঙ্গে সুবিশাখ্য নরেন্দ্র বিহার বা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তাহার কর্তৃবাহীন হয় এবং তিনিই নালন্দা ও বিক্রমশীলা—উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন করেন।

শ্রীযুগ ধর্ম এবং অষ্টম শতকের মধ্যে এবং শেষ পক্ষে

মধ্যে যথাক্রমে নালন্দা, উদয়পুরী ও বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা—ভারতবর্ষের ইতিহাসের মত মানব-সভ্যতার ইতিহাসেরও অমূল্যতম উল্লেখযোগ্য দরশনীয় ঘটনা। নালন্দা যেমন শ্রদ্ধাদিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া, পঞ্চম হইতে দশম শতাব্দী পর্যন্ত, মহাপাল দেব প্রমুখ রাজস্ববর্ষের সাহায্য-প্রাপ্ত হইয়া সুদীর্ঘ পাঁচ শতাব্দিক বংসর জগদ্বাসীকে জ্ঞান বিতরণ করিয়াছিল, বিক্রমশীলাও তেমনই ধর্মপাল হইতে আরম্ভ করিয়া নরপাল প্রমুখ পৌড়-মগধ-বঙ্গের অধীশ্বরগণের সাহায্যপুষ্ট হইয়া চারি শতাব্দিক বংসর ভারতে ও বহির্ভারতে অসংখ্য ভাবে জ্ঞান বিতরণ করিয়াছিল। নালন্দার পর বিক্রমশীলা ভারতীয় বৌদ্ধ-ধর্মের — বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হয়।

বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় একাধারে ধর্ম ও বিজ্ঞানমন্দির। তিস্তাতীর্থে ঐতিহাসিক নামা ভারনাথ বলিদ্রাঘেন, এই জ্ঞানের মন্দির মগধ সহরে পক্ষার ধর্মপ জীরবন্তী এক পদমন্ডপী পর্তুগোপরি অবস্থিত ছিল (১)।

বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাপ্যারা হোজ-টীকা (২), বৃহৎ বয়জু গৃহাণ (৩) এবং তিস্তাতীর্থে ভাবার অনুবিত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে (৪) বিক্রমশীলার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বিক্রমশীলা বিহারের প্রতিষ্ঠাপ, মহামহোপাধ্যায় স্বরীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক অজ্ঞাত (৫) বলিয়া

(১) Taranath. PP. 234-242; J. A. S. B. 1909, P. 3; Indian Pandits in the Land of Snow, P. 58; History of Mediaeval School of Indian Logic, P. 150.

(২) Bibliotheca Indica Series. Edited by S. C. Vidyabhusan, P. 50.

(৩) Edited by M. M. H. P. Sastri. PP. 320-321.

(৪) Têngywo, Ryud. La. Folios 11-26, 34 etc.

(৫) J. A. S. B. 1910, P. 11.

উল্লিখিত হইলেও, ঐতিহাসিক ত্রিসেক্ট শিখ (৬), স্বর্গীয় পরমহংস দাস (৭) এবং মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় সত্যচন্দ্র বিদ্যাবূষণ (৮) এই বিহার ঐতিহ্যের অষ্টম শতকের শেষ পাশ্বে পাল বংশীয় বিভিন্ন নরপাল ধর্মপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বিক্রমশীলা বিহারের স্থিতিস্থান সম্বন্ধে, পণ্ডিতগণের মতভেদ ঘেঁষিতে পাওয়া যায়। জেনারেল কানিংহাম বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণদের ছয় মাইল উত্তরে আধুনিক বড় পাণ্ডুরের (প্রাচীন নাগলা) গ্রাম) অন্তর্গত শিলাও গ্রামে (৯), মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় সত্যচন্দ্র বিদ্যাবূষণের মতে ভাগলপুর জিলার কলগড় নামক স্থানে (১০), স্বর্গীয় প্রত্নতাত্ত্বিক নন্দলাল দে'র মতে ভাগলপুর জিলার 'পাথরঘাটা' নামক স্থানে এই বিহার অবস্থিত ছিল (১১)। স্বর্গীয় দে মহাশয় বলিয়াছেন, পাথরঘাটার প্রাচীন নাম বিক্রমশীলা-সম্ভারাম; ইহাই ক্রমশঃ ক্ষুণ্ণিত ভাবে "শিল-সদম" অর্থাৎ বিক্রমশীলা বিহার নামে পরিচিত ছিল।

মোটকথা, যতদিন না এই স্থানটী ধ্বনন করা হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত ইহার স্থায়ীমাংসা অসম্ভব। যদি কখনও এই স্থান ধ্বনন করা হয়, আশা করা যায় এই স্থান হইতে এমন কোন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইতে পারে, যদ্বারা বিক্রমশীলা বিহারের স্থিতিস্থানের চূড়ান্ত স্থায়ীমাংসা হইবে।

বিক্রমশীলা বিহারের নামকরণ সম্পর্কে দুইটী এবাদ প্রচলিত আছে, যথা — প্রথমটী, বিক্রম নামক এক বৃক্ষ এই পর্লভশিখরে বাস করিত, তাহারই নাম হইতে এই বিহারের নামকরণ হইয়াছিল (১২)। দ্বিতীয়টী

এইরূপ, — বৌদ্ধ তায়িকাচাচা কাল্পিলা এই শব্দকে মহাবুদ্ধাধোপ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি পদ্মাতীর্থবতী পুণনন্দী পর্লভশিখরের বিহার প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্বাচন করেন, এবং ধ্যানযোগে ইহাও জানিতে পারেন যে, এই বিহার রাজ্যগ্রন্থে পরিচালিত হইবে, এবং পরক্ষণে তিনিই রাজ্য ধর্মশালারূপে গম্যগ্রহণ করিয়া এই বিহার প্রতিষ্ঠা করিবেন (১৩)।

নাগলা বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান থাকিতেই বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয়। বিক্রমশীলা বিহার — বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম-স্থল হইতে ব্রাহ্মসাহায্য লাভ করিয়াছিল বলিয়া ব্রাহ্মকীয় (বিক্রমশীল) বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত হয় (১৪)।

নরপতি ধর্মশাল বিক্রমশীলা বিহারের সমস্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করেন (১৫)। বহুলোক গ্রাম ব্যাপিতা বিহারের বিস্তৃতি ছিল। বিহার পুণনন্দী প্রকাণ্ড ঐতিহাসিক; ছয়দিকে ছয়টী প্রবেশদ্বার। বিহার-চব্বার দ্রুত — বহুযোগন ব্যাপী; উহার মধ্যস্থলে আট হাজার দোকের স্থান সমুদান হইতে পারিত। তিস্তী হ্রদ নানচো'র লিখিত বিবরণ হইতে একবার ধার্মার্থ্য প্রতিপন্ন হয় (১৬)। বিক্রমশীলা বিহার যে পুণনন্দী বিরাট ঐতিহাসিক, তাহাতে বিশ্বাস সন্দেহ নাই। এই বিহার একদম চমৎকার কোশলে ও সুন্দার সহিত নির্মিত যে, কোন বিশেষ শোক পর্লভস্থিত বিহারে উঠিতে কোন প্রকার ক্রেশ অসম্ভব করিত না। যদি একদম ভাবে গঠিত না হইত, তাহা হইলে তিস্তী হ্রদ নানচো বিনাশলে

(৬) Early History of India, 3rd edition, P. 396.

(৭) Hindustan Review 1906, PP. 190-191.

(৮) History of Medieval School of Indian Logic, P. 150.—S. C. Vidyabhusan.

(৯) Arch. Survey Report, Vol. VIII P. 83.

(১০) History of Medieval School of Indian Logic, Appx. P. 150.—S. C. Vidyabhusan.

(১১) J. A. S. B. 1909.

(১২) Journal of the Buddhist Text Society, Vol. I, Part I, P. 11.

(১৩) Journal of the Buddhist Text Society, Vol. I, Part I, P. 11.

(১৪) History of Medieval School of Indian Logic, P. 150; Indian Pandits in the Land of Snow, P. 50.

(১৫) Introduction to Ramcharit, Edited by M. M. H. P. Sastri, PP. 5-6.

(১৬) Indian Pandits in the Land of Snow, P. 58 By S. C. Das

পতীর নিম্নে বিহারে প্রবেশ করিতে মনর্থ হইত না। বিহারের নিম্নতলে ধর্মশালায় সুবিশেষতঃ থাকা সম্বন্ধে তাহার অবস্থান না করিয়া, পক্ষত অতিক্রম করিয়া বিহারে প্রবেশ করে (১৭)। শুধু ইহাই নহে, ধর্ম ও বিজ্ঞানমণ্ডির ছিল বলিয়াই তিনজনীয় রান্না নিম্নদেশে বিহার এই বিহারের আশ্রমে পঠন করিয়াছিলেন (১৮)।

বিহারের চতুর্দিক বৃহৎ ও অশুচ প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। ইহার চতুর্দিক বেঁটন করিয়া ১০৭টা ছোট ও বড় মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। মধ্যস্থলে মহাবোধি মন্দির মহামন্দির মত শোভা পাইত। সর্বত্র ১০৮টা মন্দির বিহারের শোভা বর্ধন করিয়াছিল। এই কারণে বিক্রমশীলা বিহার “সেব-বিহার” নামেও সুপরিচিত ছিল (১৯)।

নালন্দা বিহারের মত বিক্রমশীলা বিহারও ছয়টি কলেজে বিভক্ত ছিল। এই ছয়টি কলেজের পরিচালন-কার্য ছয়জন ভিক্ষুর উপর অর্পিত ছিল। উপরোক্ত ছয়টি কলেজের মধ্যে চারিটি কলেজে ছাত্রদের আশ্রয় করিত। মধ্যম ভাগের মন্দির — “বিজ্ঞান-মন্দির” নামে পরিচিত ছিল। এই মন্দিরের আচার্য্য ভিক্ষুগণ প্রজ্ঞাপারমিতার অধ্যাপনা করিতেন। মধ্যম ভাগের কলেজে হুইজেন পণ্ডিত পরমার্থ-তত্ত্ব অধ্যাপনা করিতেন। ইহার ষষ্ঠকক্ষে বিহারের প্রথম ও দ্বিতীয় “অন্ত” নামে খ্যাত ছিলেন (২০)।

এই বিহারে ১০৮ জন আচার্য্য বাস করিতেন। ইহা ব্যতীত একজন উপসম্প্রদাচার্য্য, হুইজেন ব্রহ্মচার্য্য, একজন কর্ণপরিচালকচার্য্য, একজন ভূতা-দ্রবরহকারক, কাপোতবক্ষক, তীর্থধাত্রী ভিক্ষুগণ ও বহুসংখ্যক অস্থায়ী ভিক্ষু বাস করিতেন। মহারাজ বর্ষপাল মূলতঃ এই সমস্ত ব্যক্তির ব্যয়ভার বহন

করিতেন (২১)। লামা তারনাথ এই বিহারের পরিমাণ নিম্নবিত্ত করিয়া দিয়াছেন। একজন গৃহস্থের সঙ্গার প্রতিপালন করিতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইত, একজন ভিক্ষুর তাহার অপেক্ষা চতুর্গুণ অধিক ব্যয় হইত (২২)। বিহারের ছয়টি প্রবেশদ্বার ছয়জন আচার্য্য-ভিক্ষু রক্ষা করিতেন। এই কারণে ইহার “বার-পণ্ডিত” নামে সম্বোধিত ছিলেন (২৩)।

নালন্দা বিহারের মত বিক্রমশীলা বিহারেও ছাত্র-পরীক্ষা প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রবেশদ্বার উত্তীর্ণ না হইলে যেমন গৃহপ্রবেশ করা যায় না, সেইরূপ বিহার-প্রবেশার্থী ছাত্র বার-পণ্ডিতের পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে তাহার বিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার অধিকার ঘটিত না (২৪)।

যে সমস্ত ছাত্র কোন বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইবার জন্য বিহারস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে আশ্রয়ার্থ আশ্রয়ন করিত, কেবল মাত্র সেই সকল ছাত্রই বার-পণ্ডিতের পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশপাত্র করিত। হিউয়েন সাংয়ের লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, গ্রীক এইরূপ প্রথাগুলারে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-পরীক্ষা করিয়া বিহার-প্রবেশার্থীকে প্রবেশ-অধিকার দেওয়া হইত (২৫)।

বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারি সম্ভাগের প্রায় ঠুই সহস্র ভিক্ষু আশ্রয়ন করিত (২৬)। দর্শন, ব্যাকরণ, চিকিৎসা, ত্রায় ও তত্ত্ব বিশেষ ভাবে অধ্যাপনা করা হইত (২৭)। মহাবান মন্তব্যের মাধ্যমিকা যোগাচার-

(১৭) Journal of the Indian Buddhist Text Society. 1893.

(১৮) J. A. S. B. 1909, P. 4.

(১৯) Hindustan Review, 1906, PP. 190—191.

(২০) Ibid.

(২১) Journal of the Buddhist Text Society. Vol. I. Part I, P. 11.

(২২) প্রবালী—১৯০০ পৃ. ১১।

(২৩) Hindustan Review. 1906. PP. 190—191.

(২৪) Manual of Buddhism, P. 133—Dr. Kern.

(২৫) Eul's Records of the Western Countries.

Vol. III. P. 171.

(২৬) Journal of the Buddhist Text Society. Vol. I. Part I, P. 11.

(২৭) History of Medieval School of Indian Logic, P. 151.

সম্পন্নও বিশেষ ধরের সহিত ভিক্ষুগণকে শিক্ষা দেওয়া হইত (২৬)।

বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরস্থ প্রাচীর-পায়ে বৌদ্ধ-জ্ঞান-বিজ্ঞান-শাস্ত্রে অধিষ্ঠার মনীষী পণ্ডিত-গণের মূর্তি চিত্রিত থাকিত (২৭)। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষার উত্তীর্ণ ছাত্রগণের উপাধি ছিল—‘পণ্ডিত’। বৌদ্ধ-মাহিষ্টা-বর্ণন-বিজ্ঞান-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছাত্রগণ শেষ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া এই জ্ঞানের মন্দির হইতে অশেষ সম্মানজনক ‘পণ্ডিত’ উপাধি ও সঙ্গে সঙ্গে লোহিত বর্ণের ‘পণ্ডিতোক্তীয়’ লাভ করিতেন। সম্ভবতঃ নান্দবা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পণ্ডিতোক্তীয় প্রদান প্রথার প্রথম প্রচলন হয় (৩০)। রাঝা স্বয়ং উপাধি ও প্রাঙ্গমাণের স্বাক্ষর করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রকে দান করিতেন।

বৌদ্ধ নৈয়ায়িক আচার্য্য জেতারি ৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মহীশালের স্বাক্ষরিত উপাধি, প্রাঙ্গমাণের ও পণ্ডিতোক্তীয় লাভ করেন (৩১)। কান্দীর দেশের আচার্য্য রতবল্ল নরপতি কনকের স্বাক্ষরিত উপাধি, প্রাঙ্গমাণের ও পণ্ডিতোক্তীয় লাভ করেন (৩২)। ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দে নৈয়ায়িক বহারি রাজা নরপালের রাজত্বকালে ‘পণ্ডিত’ উপাধি, প্রাঙ্গমাণের ও পণ্ডিতোক্তীয় লাভ করেন (৩৩)।

ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান বৌদ্ধ পণ্ডিত বিক্রমশীলা বিহারের অধিনায়ক নিযুক্ত হইতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাদ্বায়ে বিহার একজন পৃষ্ঠদরিদ্র মহাপণ্ডিত ভিক্ষুর অধীনে থাকিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়কের অধীনে ছয়জন ‘স্বায়-পণ্ডিত’ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা করিতেন। সর্বাধ্যক্ষ ভিক্ষুর কর্তৃত্ব সকলকেই স্বীকার

করিত হইত। ভাঁহার আদেশ চরম আদেশ বলিয়া গণ্য হইত। সর্বাধ্যক্ষ ভিক্ষু বিহারবাসী ভিক্ষুগণের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চরিত্রের দিকে সমভাবে দৃষ্টি রাখিতেন। তিনিই বিহারবাসী সমস্ত ভিক্ষুর চরিত্রের ক্ষত্র দাত্তা থাকিতেন (৩৪)। মহারাধক্ষ বর্ষশালের রাজত্ব সময়েই মহারানীষী প্রাক্তবর বুদ্ধজ্ঞানপাদ বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন (৩৫)। এই সময়েই প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য জীনরক্ষিত মগধ-রাজ-গুরুপনে বৃত্ত হইয়া বিক্রমশীলা বিহারে বাস করিতেন (৩৬)।

বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় সুদীর্ঘ চারিশত বৎসর ব্যাপিত্য ভারত ও বহির্ভারতে জ্ঞান বিতরণ করিয়াছিল। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ২৬ জন বৌদ্ধাচার্য্য এই জ্ঞানের মন্দিরের গৌরোহিষ্ঠ্য করিয়াছিলেন। বিক্রমশীলা বিহারের অধিনায়কগণের ধারাবাহিক তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল,—(১) বুদ্ধ-জ্ঞানপাদ, (২) লভাসরভট্ট, (৩) প্রিধর, (৪) ভব-ভট্ট, (৫) তথাকীর্তি, (৬) নীলবল্ল, (৭) চর্ম্মরভট্ট, (৮) রুদ্ৰসমরবল্ল, (৯) তথাগতরক্ষিত, (১০) বোধ-ভট্ট, (১১) কমলরক্ষিত, (১২) রত্নাকরশাস্ত্রি, (১৩) বাণীশবরকীর্তি, (১৪) নাড়পাদ, (১৫) প্রভাকরমিত্তি, (১৬) রতবল্ল, (১৭) জ্ঞানশ্রী মিত্র, (১৮) নীপকর শ্রীজ্ঞান, (১৯) মহাবজ্রাসন, (২০) কমলকুলীশ, (২১) নরেন্দ্র শ্রীজ্ঞান, (২২) দানরক্ষিত, (২৩) অভয়াকর গুপ্ত, (২৪) চতাকর গুপ্ত, (২৫) জনারকশ্রী, (২৬) শাক্যশ্রী (৩৭)।

কিছুকালের ক্ষত্র নান্দবা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ (intercourse) ছিল (৩৮)। একই অধ্যাপক উভয় বিভাগদ্বিধে

(৩৪) Hindustan Review, 1906, PP. 190-191.

(৩৫) History of Medieval School of Indian Logic, P. 151.

(৩৬) Sanskrit Buddhist Literature of Nepal—by R. L. Mitter, P. 229.

(৩৭) Journal of the Buddhist Text Society.

(৩৮) History of Medieval School of Indian Logic, P. 146.

(২৮) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1909, P. 4.

(২৯) History of Medieval School of Indian Logic, P. 151.

(৩০) গাহিত্য-পরিবেশ-পত্রিকা ১০২১। (৩১) History of Medieval School of Indian Logic, P. 151.

(৩২) History of Medieval School of Indian Logic, P. 141.

(৩৩)

অধ্যাপনা করিতেন। একই রাণা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন বলিয়াই বোধ হয় এইরূপ নিয়ম হইয়াছিল। বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকবর্গ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকলাপের প্রতি সন্নিবেশ দৃষ্টি রাখিতেন (৩২)।

খ্রীষ্ট দশম ও একাদশ শতক বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ-জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য নালন্দার প্রবল প্রতিপালী প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল (৪০)। এই জ্ঞানের দম্বর শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করিয়া ধীর পৌরব অক্লান্ত রাখিয়াছিল (৪১)। নরপতি মহীপাল দেবের রাজত্ব সময়ে খ্রীষ্ট একাদশ শতকের প্রারম্ভে নালন্দার সমস্ত শক্তি বিক্রমশীলার কেন্দ্রীভূত হয় (৪২)। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমশীলা ভারতের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ-জ্ঞান-বিজ্ঞানের পীঠস্থানে পরিণত হয়। ঠিক এই সময়েই ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান বৌদ্ধ পণ্ডিত বাঙ্গালার পৌরব বাঙ্গালী দীপঙ্কর জিজ্ঞান দৌড়-মদণ-বন্দের অধীশ্বর নরপালদেব কর্তৃক মনোনীত হইয়া বিক্রমশীলা বিহারের মহা পৌরব ও দারিদ্র্যময় অধিনায়ক পদে অধিষ্ঠিত হন (৪৩)।

ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী পণ্ডিত মহামনীষী প্রাজ্ঞবর দীপঙ্কর জিজ্ঞানকে বিক্রমশীলা বিহার—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়কপদে অধিষ্ঠিত করার যে তাঁহার পৌরববৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহা নহে—পরন্তু, যে অধিনায়কপদে তাঁহাকে মনোনীত করা হইয়াছিল, সেই পদেরই পৌরববৃদ্ধি হইয়াছিল,—আর যিনি এই জ্ঞান-বৃদ্ধক এই পদে মনোনীত করিয়া দণ্ড হইয়াছিলেন, সেই বাঙ্গালী রাজা নরপালদেব ইতিহাসের পূজ্য অধিগ ব্রহ্মী।

দীপঙ্কর জিজ্ঞানের অধিনায়কতার সময়েই বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৌরব সমধিক বর্ধিত হয় (৪৪)। এই সময়েই ভূতাকর গুপ্ত, রত্নাকরপাণি, জ্ঞানজি বিহর, নাড়পার প্রভৃতি দ্রাবিড়্য বৌদ্ধাচার্য্যগণ বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন। অধিনায়ক দীপঙ্কর জিজ্ঞান এই সকল বৌদ্ধাচার্য্যগণের উপর অধিষ্ঠিত ছিলেন (৪৫)। ইহার পূর্বে এতজন দ্রাবিড়্য আচার্য্যের একত্র সমাবেশ হয় নাই। কাম্বোই বলিতে হয়, মহামনীষী আচার্য্য দীপঙ্কর জিজ্ঞানের অধিনায়কতার সময়েই বিক্রমশীলার পৌরব ভারতে ও বহির্ভারতে সমধিক বিকৃতি লাভ করিয়াছিল।

যে সকল বৌদ্ধাচার্য্যের ঐতর্য্যভলে বসিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান-দাতক দীপঙ্কর জিজ্ঞান নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামনীষী রূপে প্রচ্যর্জন করিয়াছিলেন, তদুপ হইয়াও বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহা দারিদ্র্য এবং পৌরবময় অধিনায়কপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি তাঁহার সেই শিক্ষা এবং দীক্ষাভঙ্গবশত উপর কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন।

নালন্দা যেমন বৌদ্ধ-জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থানে পরিণত হইয়া জনসাধারণকে জ্ঞান বিতরণ করিয়াছিল, বিক্রমশীলাও রূপে জ্ঞান বিতরণে রূপগত করে নাই। বিক্রমশীলার দান ভারতে ও বহির্ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। নালন্দার পৌরব-পৌরবে আকৃষ্ট হইয়া জনগণের নানা দ্বিপক্ষে হইতে বহু জ্ঞানপিপাসু ছাত্র যেমন তথায় আসিয়া সমবেত হইত, বিক্রমশীলায় খ্যাতি-পৌরবে আকৃষ্ট হইয়া তেমনই ভারত ও বহির্ভারতের বহু জনগণের বহু জ্ঞানার্থী জ্ঞানশুন্দের নিমিত্ত এই জ্ঞান-বিজ্ঞান-মন্দিরে আসিয়া সমবেত হইত।

ইতিহাস-বিখ্যাত চৈনিক ভ্রমণ ফিউয়েন সাঙ যেমন নালন্দার বাঙ্গালী অধিনায়ক দীপঙ্করের ঐতর্য্যভলে বসিয়া অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানের অধীশ্বর হইয়া যুগে

(৩১) Indian Buddhism—By Teranath.

(৪০) Introduction to Ramcharita—Edited by M. M. H. P. Sastri, P. 11.

(৪১) Hindusthan Review 1906, PP. 190—191.

(৪২) Journal of the Dept. of Letters, Cal. Uni. Vol. I

(৪৩) Introduction to Ramcharita, P. 11.; Indian Pandits in the Land of Snow, P. 51.

(৪৪) Journal of the Dept. of Letters, Cal. Uni. Vol. I

(৪৫) সাহিত্য-পরিবেশগতিকা, ২য় খণ্ড, ১০২০ পৃ. ৮৬।

প্রচাৰণ করিয়া ভারতের বৌদ্ধধর্ম, জ্ঞান ও সভ্যতা প্রচার করিয়াছিলেন, তেমনই তিব্বতীয় ছাত্র বর্ণকীর্তি বিক্রমশীলার সুশিক্ষিত হইয়া স্বদেশে বৌদ্ধ-ধর্মের মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় যেমন ক্ষুদ্রত প্রব্রাজীকৃত তিব্বতীয় ও চৈনিক ভাষায় অধ্যাপকের কেন্দ্র হইয়াছিল, বিক্রমশীলাও তেমনই ক্ষুদ্রত প্রব্রাজীকৃত তিব্বতীয় ভাষায় অধ্যাপকের কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল।

নালন্দার বৌদ্ধ ধর্ম, মহাবান ও তত্ত্ব-সাহিত্য-সৃষ্টির যে বীজ উপ হই, পরে উহাই বিক্রমশীলার পুত্র হইয়া মহামহীকহে পরিণত হয়। অশ্ব-মৃচনা হইতেই বিক্রমশীলা বৌদ্ধতত্ত্বের স্রবৎ প্রভিত্তানে পরিণত হয়। এই বিহারের অধিনায়কগণ প্রত্যেকেই মন্বন্তরচারণা ছিলেন (৪৬)।

নালন্দা বিহার তত্ত্ব-সাহিত্যের অম্বহান হইলেও তত্ত্বের দার্শনিক বাখ্যা-বিশ্লেষণ নালন্দা হইতে বিক্রমশীলার বিহারের বাখ্যা-বিশ্লেষণ সমধিক পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ছিল (৪৭)।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যেমন বহুসংখ্যক ভিক্ষু বৌদ্ধধর্ম প্রচারার্থ চীন, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে গমন করিয়াছিল, বিক্রমশীলা বিহার হইতেও তেমনই বহুসংখ্যক বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বত দেশে গমন করিয়াছিল। বাঙ্গালী

বৌদ্ধ পণ্ডিতগণই ধর্মপ্রাণ তিব্বতবাসিন্যের অগ্ররোধে তিব্বত দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও সংস্কার করিবার ক্ষম প্রথমে তিব্বত দেশে গমন করেন। গৌড়দিবাসী নালন্দা বিহারের অধিনায়ক, তাত্ত্বিকচারণা শাস্ত্রমণ্ডিত প্রথমে তিব্বত দেশে গমন করিয়া বাহ্যগতরূপে রত হন (৪৮)। আচার্য্য শাস্ত্রমণ্ডিত তিব্বতীয় বিহারের প্রথম বাঙ্গালী অধিনায়ক (৪৯)। ইহার কিছুকাল পরে আচার্য্য দীপঙ্কর জ্ঞানান ১০৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পরবর্তী তিব্বতবাসিন্যের অগ্ররোধ-আমন্ত্রণে তিব্বতীয় বৌদ্ধ-ধর্মের সংস্কার করিবার ক্ষম চিরজুয়ারায়ত তিব্বত দেশে গমন করেন (৫০)।

বিক্রমশীলা চারিপদ বৎসরকাল অস্বাভাব্যে ভারতীয় সভ্যতা, বিদ্যা, জ্ঞান, ধর্ম প্রচার করে। মুসলমান আক্রমণের পূর্ববর্তী অস্তিত্ব বিহারের মত বিক্রমশীলাও ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে ধ্বংস হইয়া যায় (৫১)। এই সময় কাম্বীর দেশীয় পণ্ডিত আচার্য্য শাক্যজী বিক্রমশীলা বিহারের শেষ অধিনায়ক ছিলেন।

বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুসংখ্যক সুবিখ্যাত পণ্ডিতের উদ্ভব হইয়াছিল। পদ্মসত্ত্ব, শাস্ত্রমণ্ডিত, দীপঙ্কর জ্ঞানান, ভেতারি, জ্ঞানজী মিত্র, অভয়াকর গুপ্ত, শুভাকর প্রভৃতি অধিষ্ঠীয় পণ্ডিতগণের প্রাচুর্য্য হইয়াছিল।

(৪৬) Indian Pandits in the Land of Snow—by S. C. Das, P. 49.

(৪৭) History of Medieval School of Indian Logic—by S. C. Vidyabhusan, P. 125.

(৪৮) Ibid, P. 50. (৪৯) Early History of India—by V. A. Smith.

(৪৬) Indian Buddhism—by Taranath P. 257; Kern's Manual of Buddhism, P. 132.

(৪৭) Magadhan Literature—by M. M. H. P. Sastri, P. 131.

উন্নয়ন — শ্রাবণ, ১৩৪০



শিকারী

[চাকর — মিল্ক আর, কে, গান মহাপায়েৰ পট্ট পুঁজিৰ সঁচকিণি]

“কতদিনে ফিরিবে?”

শ্রীমাদিক ভট্টাচার্য

(১)

ভাঙ্গার শশাঙ্ককুমার শোথ খুবক হইলেও ইহারই মধ্যে কলিকাতার ভিতরে ও বাহিরে ঘেঁষে নাম করিয়াছে। সকালে ঘণ্টা দুই পুছানত বোদিশপকে শেখিবার পরেই তাহাকে বাহিরে যাইতে হয়। বিভিন্ন স্থানে রোগী দেখা, বেলগাছিয়ার কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে ঘণ্টাখানেক ছাত্রীরা বেড়া—এ সব সারিয়া বেলা একটা কি দুইটার আগে তাহার গৃহে ফিরিবার অবকাশ হয় না। অপরাহ্নের দিকে প্রতিদিন লাড়ে চারটা, হইতে পাঁচটা পর্যন্ত সে তাহার লুক্ষিত তরঙ্গী শ্রী সন্ধ্যারাগীর সহিত একত্র বসিয়া চা-পান ও গল্প-গুজব করিয়া তবে বাহিরে যায়। ঐ সময়টুকু সাধারণ প্রয়োজনে সে উঠে না। অবশ্য মরণাপন্ন রোগীর ক্ষত আত্মান আঙ্গিলে সেকথা স্বভাব।

সেদিনও স্বাভাবিক শশাঙ্ক উপরে বসিয়া শ্রীর সঙ্গে গল্প করিতে করিতে চা পান করিতেছে—সঙ্গে অবশ্য কিছু খাতও আছে। একবার খাত ফুটাইয়া যাইতেই সন্ধ্যারাগী উঠিয়া আবার খাত দিয়া, চায়ের পাত্র হইতে আর একটু চা ঢালিয়া দিতেছে। স্বামীর সঙ্গে একসঙ্গে বসিয়া সে খাবার খায় না। কেবল চা পান করে। কিন্তু তাহাও পোপনে। প্যাছে ভূতেরা কেব্ সেখিতে পায়, এমন বতঙ্গ পর্যন্ত শশাঙ্ক নীচে না নামে, ততঙ্গ কাহারও উপরে আদিবার আশে নাই। যদি বিশেষ প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাহার সিঁড়ির ছায়ার বাহির হইতে জাকিবে—ইহাই বিবন।

সমস্ত দিনের মধ্যে এই সময়টুকু সন্ধ্যারাগীর নিজস্ব সময়। এই সময়ে তাহার স্বামীর উপর আর কাহারও কোন অধিকার নাই। বিশেষ কোন কাজ আদিয়া না পড়িলে চাপানের পরেই ছইজনে কখন কখন

কিছুক্ষণের ক্ষত বেড়াইতে বাহির হয়। কাজ পড়িলে শশাঙ্ককে একাকীই বাহিরে যাইতে হয়।

শশাঙ্ক চায়ের বাজিত চুপু দিয়া ‘কান-খাড়া’ করিয়া বসিল, কে ডাকছে না?

সন্ধ্যারাগী নিঃশব্দ ফেলিয়া বসিল, মাস্তুরের শরীরকে ঘোর ক’রে ধ’রে রাখা যায়, মনকে যায় না।

শশাঙ্ক ব্যস্ত হইয়া বসিল, কেন, একথা কেন বলছ?

সন্ধ্যা। সমস্ত দিনের মধ্যে তুমি এইটুকু সময় তুমি দিয়া ক’রে রেজের থাক। তার মধ্যেও কত জনের ডাক তোমার কাছে এসে পৌছায়। সত্যিকারের ডাক তো আছেই, তার উপর ক্যান্টিন ডাকেরও অভাব নেই। তুমি ভাঙ্গার না হয়ে কবি বা গল্পলেখক হ’লে বোধহয় বেশী উত্তরিত করতে পারত।

শশাঙ্ক। যদি অসুস্থ হ’তাম, না হয়, আজ থেকে চেষ্টা করি।

সন্ধ্যা। র’কে কর। কবি বা গল্পলেখকের লেখা পড়তে ভাল; কিন্তু স্বামী হিসেবে তাঁরা মাথা খাটুন!

শশাঙ্ক। তাঁদের প্রতি তোমার এ অবিচার কেন?

সন্ধ্যা। এ অবিচার নয়, পুঁজিচার। তাঁদের ক্ষেত্রে তাঁরা সমস্ত, অন্য ক্ষেত্রে নয়। আমার স্বামীকে আমি ভাবব, অপর কেন ভাববে?

শশাঙ্ক। ভাগ্যে লিখতে শিখি নি! নইলে কি জরুপাই হ’ত তোমার হাতে!

সন্ধ্যা। যা’ শিখেছ, তাতেই আমি সস্তির। ঘণ্টা বাজলেই আমার ভগ লাগে।

এমন সময় সিঁড়ি হইতে সত্যি আত্মান-পরিবাগিয়া উঠিল।

সন্ধ্যা বিরক্ত হইয়া বসিল, সেখানে, এই সময়টুকুও একটু শান্তি নেই। ব্যর্থ করলেও তো ডাক-বাকর শুনে ওনবে না।

বোধহয় বিশেষ কিছু কাজ পড়ে থাকবে, নইলে এ সময়ে এরা খন্টা বাজাবে না বা বাজাতে দেবে না,—বসিয়া পশাৎ, কি হইয়াছে জানিবার জন্য, সিক্তির কাছে উঠিয়া আসিল।

একই পরেই পশাৎ বাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমার এক পুরানো বন্ধু অনেক দিন পরে এসেছে। তুমি চাও খাবারের ব্যবস্থা কর; আমি তাকে এখানে আনতে চললাম।

সন্ধ্যা মিথস্রাস করিল, কে সে বন্ধু?

পশাৎ বলিল, তুমি তাকে চেন না। সে আমার বন্ধু উপকারী বন্ধু। তুমি একই শির ক'রে নাও, আমি এলাম ব'লে।

বসিয়া পশাৎ দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল।

সন্ধ্যা বিম্বিত হইয়া ভাবিল, কে এমন বন্ধু আদিল যাহার অন্ত উনি এমন ব্যক্তি হইয়া ছুটিলেন! অথচ সে তাহাকে চেনে না!

(২)

কিছুক্ষণ পরে পশাৎ একা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তুমি ঠিকই বলেছ সন্ধ্যা, কবি হ'লেই ভাল হ'ত। অন্ততঃ ভাঙার না হ'লেই ভাল ছিল।

সন্ধ্যা বিম্বিত হইয়া বলিল, কেন? আর তুমি একা যে! তোমার বন্ধু কোথায়?

পশাৎ বলিল, সেই কথাই তো বলছি। এত বছর পরে শৈলেন এল, অথচ আমাকে এখনই বাইরে যেতে হচ্ছে। ও কি, তোমার শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?

সন্ধ্যারান্নি হঠাৎ চমকিত হইয়া উঠিয়াছিল। দেয়ারের হাতল ধরিয়া আপনাকে যেন সামলাইয়া সে বলিল, ও কিছু নয়। আচ্ছ হুপুর থেকে কেমন মাথা ঘুরছিল। তা এখন বাইরে যাবে কেন?

পশাৎ বিরক্তি-ভরা মুখে বলিল, পতপতিবান্ হঠাৎ অভ্যাস হ'তে সিজছেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা নাকি পক্ষাঘাতের মত হ'য়েছে; তাই তাকাতাকি ডাকতে এসেছে। অন্ত কোন নতুন রোগী হ'লে না পেলেই হ'ত। এখানে যে যেতেই হবে। আমি এখনই চললাম। খন্টা-

যানেরের মধ্যে ফিরব। শৈলেন এখন ওপরে এল না। বললে, তোমার বৌয়ের সঙ্গে দেখা করব এই অবস্থায়! ও এখন গ্রানের ঘরে চুকেছে। বানিক পরে আসবে। যদি দেরী হয় ডাকিয়ে এনো। লক্ষ্য ক'রে না। শৈলেন আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। ওর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। আমি না ফেরা পর্যন্ত আতিথ্যের ভার তোমার। ঐ দেখ, আমার হর্ণ দিতে শুরু করলে। চললাম।

পশাৎ যেমন দ্রুতবেগে আসিয়াছিল তেমনই দ্রুতবেগে নামিয়া গেল।

একই পরেই হর্ণ দিতে দিতে একখানা গাড়ী বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যা বসিয়া বলিয়া ভাবিতে লাগিল, সে কি করিবে? স্বামীর বন্ধুকে কি উপরে ডাকাইয়া আনিবে? কতি কি? কেন আনিবে না? বিশেষ, যখন তিনি এত করিয়া বলিয়া সিদ্ধাছেন। নামে ভয় কি? শৈলেন তো একটা সাধারণ নাম। ঐ নাম বাংলা দেশের অন্ততঃ একশ' লোকের আছে। কি ভীত সে! ভাব্যে তিনি তেমন কিছু মনে করেন নাই। এতকাল পরে সে আসিবে? তাহা সম্ভব নয়। আসিবার হইলে সে বহুপূর্বে আসিত।

সন্ধ্যা ঘোর করিয়া উঠিল। স্বামীর বন্ধুর জন্য চাও খাবারের ব্যবস্থা করিতে গেল।

কিছুক্ষণ পরে নীচে হইতে খবর আসিল, বাবুর দান হইয়া গিয়াছে। তাহাকে কি উপরে ডাকিয়া আনা হইবে?

তাহাকে ডাকিয়া আনিতে বলিয়া সন্ধ্যা উদ্বিগ্নচিত্তে বসিয়া বহিল।

এতর বন্ধুকে উপরে পৌছাইয়া দিয়াই তৃত্য নীচে চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গাইতেই আগন্তুক অপরকাল সন্ধ্যার ভীত-আনত মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কি আশ্চর্য! তুমি!

সন্ধ্যা নির্দোষ!

আগন্তুক সন্ধ্যার দিকে আবার বানিকখন চাহিয়া

খাকিয়া, আমন ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল, তুমি সন্ধ্যা!
তুমি নশাবতের স্ত্রী!

সে বেন উত্তরের ক্ষত বস্ত্র অপেক্ষা করিয়া,
পুনরায় বলিল, আমার কি পরিচয় দিতে হবে যে, আমি
শৈলেন, বার সঙ্গে তোমার—

সন্ধ্যা এতক্ষণে বলিল, আমার ক্ষমা কর।

আগন্তুক আবার সন্ধ্যার সুখের দিকে ঝানিকল্প
চাহিয়া বলিল, ক্ষমা কথাটি তোমার মূখ থেকে বেরল?
তোমার ক্ষমা কেন করব? তুমি আমার নাম পর্যন্ত
ভুলে গিয়েছ, তাই? তুমি আমার ভুলে, তোমার
প্রতিজ্ঞা ভুলে, আমার এক বন্ধুকে বিবাহ করেছ,
তাই?—

সন্ধ্যা কাতর হইয়া বলিল, আমার দয়া কর,
শৈলেন।

শৈলেন নিকটস্থ একখানা চোয়ারে বসিয়া বলিল,
তুমি আমাকে কতখানি দয়া করেছ, সন্ধ্যা? আমি
নশাবতের সঙ্গে দেখা ক’রেই আজ রাত্তিরে ট্রেনেই
কোণার ঘাব ভেবেছিলাম, জান? আমায় ঢাকা-
মেলে ঢাকা যেতাম। দিয়ে তোমাদেরই বাড়ীতে
সঙ্গপ্রথম উপস্থিত হ’তাম। ভালই হ’ল, অনেকটা
পরিগ্রাম বেঁচে গেল। সেখানে গিয়ে যে জানলায়
হ’ত, কলকাতাতেই সেটুকু লাভ করলাম। ওখানে
দিয়ে যা’ গুনে কর্ণ নীতল হ’ত, দস্ত হ’তাম, এখানে
তাই বলুক দেখে চন্দ্র পরিচূর্ণ হ’ল, কৃতার্থ হ’লাম।
হাঁ, ভাল কথা—তোমাদের ক’ বছর বিবাহ হয়েছে?

সন্ধ্যা অতি ধীরে ধীরে কীপন্বয়ে বলিল, চার বছর।

শৈলেন প্রোথাক্ষ বয়ে জিজ্ঞাসা করিল, আর
ক’ বছর প্রেমে পড়েছিলে? বোধহয়, বাকি হ’বছর
হবে? তা’ হ’লে বিরহে তেমন হুখ লাগে নি, মনে হয়।
কি বল?

সন্ধ্যা এবার জাহ্নু পাতিয়া বলিল, আমি অপরাধিনী,
আমার চিত্ত দুর্বল। আমি অজ্ঞায় করেছি। তোমার
পানে ধ’রে আমি ক্ষমা চাইছি। তুমি স্বহস্তে, আমার
ক্ষমা কর।

শৈলেন বিভ্রান্তেই আমন ছাড়িয়া একটু দূরে
আসিয়া বলিল, আমি মত? আমি মাহুদ নই?
আমার সুখ-দুঃখ, আশা-ভরসা সেই? তুমি জান,
এ কয় বছর তোমাকে কেন পর লিপি নি? পাঁছে
তোমরা কোন বিপদে পড়। পাছে আমার চিঠি
তোমাদের কারও কাছে পৌঁছলে তোমাদের কারও
কোন ক্ষতি হয়, সেই ভয়ে। কিন্তু আমার আশা
ছিল, তোমার উপর আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিল,
তোমার প্রতিজ্ঞা তুমি ভুলবে না। বত বছর পরেই
আমি হাই না কেন, তোমার আমি ফিরে পাব।
তোমার শেলেই আমার সকল দুঃখ, সকল ব্যথা সার্থক
হবে। কি ভুল আমার! কি নির্দোষ আমি। অথচ
দবাই বলত, আমার মত বৃদ্ধিমান্ ধুব কম দেখা
যায়। এই আমার বৃদ্ধির পরিণতি! তোমার মত
সামান্ত্র একটা মেয়েমাহুদেও আমাকে চকোতে পারে
—আর এমনি ভাবে! বনের পর দিন, রাতের পর
রাত, বহুদীন, আত্মহীন হানে আমি তোমার
এই প্রভাষণপূর্ণ সুখানি ভেবে, তোমার ঐ সুখের
প্রেমের কথা মনে ক’রে কাটিয়েছি। আর সেই তুমি
তখন পরম আনন্দে অস্ত্রের সঙ্গে প্রেম করছ।
আমিও এর প্রতিশোধ নিতে জানি। তোমার লেখা
চিঠি আমার সঙ্গে ছিল জান তো? এখানে সেই চিঠি-
গুলির মধ্যে আমি বেঁচে ছিলাম—বেমন তুমি নুওন
প্রেমের মধ্যে ছিলে! সে চিঠিগুলির মধ্যে একখানা
নশাবতকে দেখালেই চপবে।

সন্ধ্যা ছই হাতে মূখ ঢাকিয়া উজ্জ্বলিত কর্তে
কাঁদিয়া উঠিল। তাহার স্নানর চন্দক-খিনিষিত অন্তরির
কাঁক দিয়া বস্ত্র বৃষ্টাবার মত বিন্দু বিন্দু মধু করিয়া
পড়িতে লাগিল। শৈলেন কিছুকণ বহুদুঃখিত সেই
বিললিত অজ্ঞানতার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,
তোমার চোখ থেকে মধু করতে দেখলে একদিন
মনে হ’ত সুখ বিস্ময় পর বিধে; আর আজ
তোমার এক এক কৌটা চোখের জলে বেন আমার
দুঃস্বপ্নে এক একটি কদম ফুল ফুটে উঠছে। তা-রি

আনন্দ হচ্ছে। বাঃ! এতেই এত আনন্দ, না জানি, যখন শশাঙ্ক ফিরে আসবে, তাকে যখন সব কথা বলতে পাব, তখনকার আনন্দ কি রকমের হবে!

সন্ধ্যা এবার হাত হইতে মুখ সরাইয়া অপ্রিয়লিঙ্গনেই শৈলেনের পানে চাহিয়া বলিল, তুমি এত বিষ্ঠুর হ'তে পার?

শৈলেন সন্ধ্যার মুখপানে চাহিয়া বলিল, কি আশ্চর্য্য, চোখের মলে তোমার এখনও এত সুন্দর দেখায়! এত প্রভাবপাতের মূখের ভাব বদলার নি। আশ্চর্য্য! ক্ষমতা আছে তোমার বটে!

এমন সময় হর্ষ দিয়া পেটের মধ্যে গাড়ী প্রবেশ করিল।

সন্ধ্যা কণ্ঠিতভাবে উঠিয়া শৈলেনের কাছে আসিল ও তাঁহার একখানি হাতুড়িয়া বলিল, আমার স্বামী আসছেন। আমার সন্মান করো না। একদিন আমার ভালবাসতে। সেই কথা ভেবে আজ আমার দয়া কর।

নীচে মোটর থামার শব্দ শুনা গেল।

শৈলেন হাত সরাইয়া লইয়া বলিল, সে-ভালবাসার কথা মুখে আনতে তোমার লজ্জা হ'ল না? সে-কথা আর তুলো না। চিরকালের মত তার সমাধি হ'রে গেছে। তুমি আমার দয়া কর নি, আমিও করব না। তোমার মুখে রেখে, আমি তোমার বেগুনা দুঃখ নিয়ে নির্দাসনে জীবন কাটাও, সে-আশা আমার কাছ থেকে ক'রো না। সে-মহর আমার মধ্যে নেই।

সিঁড়িতে ছুতার শব্দ হইল। সন্ধ্যা বিপণীত দিকে মুখ ফিরাইয়া বস্ত্রাকলে মুখ ও চক্ষু মুছিয়া লইল ও কাতর দৃষ্টিতে একবার শৈলেনের পানে চাহিয়া নিকটবর্তী একটি আসনে বসিয়া পড়িল।

পরমুহুর্তে শশাঙ্ক সিঁড়ির দ্বার খুলিয়া বারান্দার প্রবেশ করিল।

কক্ষমধ্যে আসিয়াই শশাঙ্ক বলিল, কর্তব্য এত অপ্রিয় জীবনে আর কখন হয় নি, শৈলেন। তুমি এতকাল পরে এলে, আর আমি তখনই বাইরে চ'লে

গেলাম; এতটুকু ডাক্তারি কৃতির উপর আমার রাগ হইছিল।

শৈলেন শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, তারপর তোমার রোগীর খবর কি?

শশাঙ্ক বন্ধুর পানে চাহিয়া বলিল, একটু ভাল। আর একজন ডাক্তার আনিবে, তাকে কাছে বসিয়ে, সব কুসিরে দিয়ে তবে ছুটি শেরেছি। চা খেয়েছ তো?

শৈলেন খুব সহজভাবে বলিল, তুমি এলে একসঙ্গে খাব ব'লে এখনও খাই নি। একা যাওয়া তো আছেই, আর থাকবেও চিরকাল। তার উপর তোমার স্ত্রীর সঙ্গে এই প্রথম পরিচয় হ'ল,—সেটাও চায়ের চেয়ে কম মধুর নয়। তোমার স্ত্রী অবশ্য কেবলই জিন্ করছিলেন বাবার ক্ষত।

শশাঙ্ক হাসিয়া বলিল, তোমার স্বখার ভবী এখনও তেমনই আছে দেখছি। 'তোমার স্ত্রী' বলবে কেন তুমি? তুমি 'সন্ধ্যা' বলবে। 'তোমার স্ত্রী' মানে মিসেস্ শোখ — যেটা তোমার বলা মাঝে না।

পরে সন্ধ্যার দিকে চাহিয়া বলিল, শৈলেনের কথা বলার ক্ষমতা একেবারে অসাধারণ ছিল। তুমি শৈলেনকে জান না। ও আমার—

শৈলেন বাধা দিয়া হাসিয়া বলিল, কি ক'রে জানবেন, বল! তুমি তো বল নি, আর উনিও কিছু হাত শুদ্ধে জানেন না।

সন্ধ্যা উঠিয়া মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, সব তৈরী আছে; আমি নিরে আসি? কেবল চা বদলে আনতে হবে।

শৈলেন ব্যত হইয়া বলিল, না, না, আমি চাও চাই ভালবাসি। সেই চাই দিতে বসুন। আপনাই বা কেন উঠছেন? আর কাউকে দিতে বসুন না। আপনি একটু গল্প করুন।

শশাঙ্ক বলিল, ঐ গুঁর হতাশ। আপন হাতে ঐটুকু না দিয়ে গুঁর কৃতি হয় না।

সন্ধ্যা বীরে বীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। যখন সে চা ও বাবার লইয়া ফিরিতেছিল, তখন

ছাড়ার বাহির হইতে সে তবিল, বৈলেন বলিতেছে,
I congratulate you, Shashanka. She is really
an angel. তোমার স্ত্রীভাণ্ডা অতি সুন্দর। কেবল

তোমার স্ত্রী, তাই আমি ঈশা গল্প করলাম। নইলে—

সন্ধ্যা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল। তাহার
হৃৎকৃত পাতাগুলিও একটু হু হু শব্দ করিয়া পড়িতে
পড়িতে গিয়া গেল।

কোনমতে শৈলেনের সমুখে পাতা ধরিয়া দিয়া
সমুখের একটা আসনে বসিয়া পড়িয়া সন্ধ্যা গতির
নিঃশব্দ ফেলিল।

(৩)

আকাশে হঠাৎ মেঘ করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে
শুরু করিয়াছিল। কাছে কোথাও বোঝার কুঠি
হইতেছিল। মনে হইতেছিল, এখানেও কড় হইতে
পারে।

বাঘার ও চা শেষ করিয়া শৈলেন খড়ি মেঝে
বসিল, এখনও বন্টা গুরুক আমার পরমাত্ম এখানে
আছে।

শশাঙ্ক বিস্মিত হইয়া বসিল, তার মানে ?

শৈলেন বসিল, আটটার সময়ই আমাকে আবার
উঠতে হবে।

শশাঙ্ক। সেকি ! আজকের রাতটাও তুমি এখানে
পাখবে না ?

শৈলেন। তুমি তো আমার অবস্থা জান।
কলকাতার বাস এতাজুট। থাকবার আমার অধিকার।
তারপর কালই আমাকে ঘেঁষে রক্তা হ'তে হবে।

শশাঙ্ক। সেসে কিছুদিন থাকবে এখন ?

শৈলেন। থাকব ভেবেছিলাম; কিন্তু আর থাকব
না।

শশাঙ্ক। কেন ?

শৈলেন। কি হবে ? ঘেঁষে কে আছে ? কলকাতার
আমার থাকবার উপায় নেই। কামেই আবার বার্মিন
কিরে দাব। এখনও কিরে সেসে সেখানকার কামটা
পাব। যে ক' দিন বাঁচব, সেখানেই থাকব।

শশাঙ্ক। কেন ? এখন যখন গেল কিরে আদ-
বার অধিকার পেয়েছ, সেসে থাক তাই। তুমি
কলকাতা না আসতে পাও, আমরা গিরে তোমার
সঙ্গে দেখা ক'রে আসব। তুমি তো তিরকাল নারীকে
প্রচা ক'রে এসেছ, এবার বিবাহ কর, স্ত্রী হও।

শৈলেন। সে প্রচা আর নেই, শশাঙ্ক।

শশাঙ্ক। তোমার স্ত্রী তো একথা মানায় না,
শৈলেন। আর তুমি তো কখন গ্রেমে পড়নি—বে,
বার্ম-গ্রেমে নারীর উপর প্রচা হারিয়েছ।

শৈলেন। চারদিকেই সে বার্ম-গ্রেমের ছবি,
শশাঙ্ক। নিজে গ্রেমে না পড়লেও তো নিস্তার নেই।
চারদিকেই বার্ম-গ্রেমের ছবি। পুরাতন গ্রেম ক'জন
মনে ক'রে রাখে ? ভালবেসে ক'জন লোক স্ত্রী
আছে ? তোমার কথা ছেড়ে দাও, তোমার স্ত্রী সন্ধ্যা
সেবীর কথা ছেড়ে দাও। খুব কম লোকেরই এমন
স্ত্রী হয়।

শশাঙ্ক। তুমি একবার ব'লে দেখ, সন্ধ্যা, তোমার
কথা যদি শৈলেন রাখে। তুমি এর পরিচয় জান না।
আমরা একসঙ্গে পড়তাম। হঠাৎ ওকে একবার
intern করবার কথা গুটে। সে-খবর শু পায় এবং
কতনার সে-স্বীকরণ ওর অসহ্য হওয়ার পুর্বেই ও পালিয়ে
বিলেতে চ'লে যায়। সেখান থেকে ও ঘুরোপের দানা
স্থানে ছুটে বেড়ায়। সেখানে ওর কোন বিপদ হয় নি;
কিন্তু ঘেঁষে ফেরা সেই থেকে ওর নিষেধ হ'য়ে যায়।
জই অবস্থাতেও সেখানকার এক মুনিভাষিণী থেকে
M.A., Ph.D হয়, ও শেষে বার্মিনে প্রফেসরি পেয়ে
চ'লে যায়। ঘেঁষে ওর চাকরির অভাব নেই। ও
ও থাকবে না।

সন্ধ্যা কম্পিতকণ্ঠে বসিল, উনি অত ক'রে
বলছেন, তুমি—আপনি থাকুন না কেন। আমরা
সবাই বড় স্ত্রী হব তা' হ'লে।

শৈলেন। আপনাদের অন্তরে সত্যের সমুদ্র, তাই
আপনি এমন ক'রে বলছেন। কিন্তু আমার থাকার
কোন উপায় নেই। আমার লজ্জাও বটে, আপনার

জ্ঞান বটে। আমার অতি-আপনার জনের মধ্যে এমন কেউ আছেন, যিনি আমি চলে গেলে তাঁর কুসংস্কারে শেগ ব'লে মনে করবেন।

সন্ধ্যা কি-একটা বলিতে বিয়া নিঃশব্দ ফেলিয়া চূপ করিল।

শব্দ শ্রীর পানে চাহিয়া বলিল, একবার ক্ষুদ্র ভূমি প্রদর্শিত হইয়া না, সন্ধ্যা। শৈলেনের কথা বলার ধরণই এই। কাউকে ছাড়া সেও তাঁর উদ্দেশ্য নয়।

এই সময়ে একটা দমকা বাতাসের লগ্নে কুটী নামিয়া আসিল। উপরে পতীর বীণ আকাশ, নীচে ভূবার-গত ছুটন্ত মলিকা ফুলের মত কুটীবিশুভূতি তিড় করিয়া নামিয়া আসিল।

হুঁতনেই কিছুকণ আনমনে বাহিরের বর্ণনের পানে চাহিয়া রহিল।

হুই বন্ধুত্ব ধীরে ধীরে আরও অনেক কথা চাইল। চটাত শব্দ বলিল, ভূমি একসময়ে কবি ছিলে, শৈলেন। এই বর্ণার মধ্যে একা চলে যেতে কি করে মন চাইছে তোমার?

শৈলেন উদাসীনের হাসি হাসিয়া বলিল, এখন আমি দারুণ অকবি, শব্দ। কবিত্বের এক বিশৃঙ্খল আচ্ছ আমার অন্তরে নেই। আর হুই এক জনের সঙ্গে দেখা করে আজ রাত্রেই আমার দেশের ট্রেন ধরতে হবে। আমি উঠলাম।

বলিয়া শৈলেন শক্তির পানে চাহিয়া সত্যি উঠিয়া পড়িল।

শব্দ অত্যন্ত ব্যাকুল ও বিহ্বিত কণ্ঠে বলিল, সে কি, শৈলেন। ভূমি এই কুটীর মধ্যে বাবে?

শৈলেন শব্দের কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিল, হ'লই বা, ভাই! বাইরে বেরিয়েই আমি ট্যান্ডি পাব।

শব্দ ক্ষুদ্রকণ্ঠে বলিল, আমার গাড়ী করে যেতেও তোমার বাধা আছে, শৈলেন?

শৈলেন। তাতেও তোমার বিপদ আছে, ভাই। সামান্য অগ্নির ক্ষুদ্র এসে তোমাকে একটা চিরকালের বিপদ দিয়ে দাব, এতে যে আমি বড় দুঃখ পাব,

ভাই। আমার উপর ক্ষুদ্র হয়ো না। তোমাকে ও সন্ধ্যারবীকে চিরকাল আমি দেখানে থাকি মনে রাখব। শরীরের দূর্য কিছুই তো নয়, ভাই; মনের দূর্যই সব।

তিন জনে কিছুকণ চূপ করিয়া রহিল। বাহিরে কুটীর ধারা তখনই করিতে লাগিল। মেঘের ছায়া সন্ধ্যাকে আরও অশোভিতা আনিল। তিন জনেই বৃষ্টি আপন আপন চিন্তায় বিতোর হইয়া রহিল।

শৈলেনই যে নিতুচ্ছতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, তোমরা বল; আমি নীচে থেকে তৈরী হ'য়ে এখনই আসছি।

হুই জনে বলিয়া রহিল। শৈলেন ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

শব্দ স্ট্রিট ঘরে বলিল, একটা কথা তোমাকে আজও বলি নি, সন্ধ্যা। আজ যে আমি নির্দিষ্ট হ'য়ে ডাক্তারি করছি, সে শৈলেনেরই স্বার্থভ্রাতার ফল।

সন্ধ্যা বিভ্রান্ত ভাবে স্বাভাবিক মুখের পানে চাহিল।

শব্দ বলিয়া বাইতে লাগিল, তখন তখনক ধর-পাকড়ের দুপ। ধরা আর 'অন্তরীপ' করা।

আমি তখন স্বদেশে আবেশনের মধ্যে পূর্ণ প'ড়ে গেছি।

এমন সময় পুলিশ একদিন এসে আমাদের বেশ ঘেরাও

করলে। তখনকার দিনে বাসের নামের উপর পুলিশ

গদ্য ছিল না, তাদের হুই একখানা চিঠি আমার কাছে

ছিল। সেগুলো নির্দোষ হ'লেও তাদের চিঠি।

শৈলেন সে কথা জানত। তাড়াতাড়ি সে ঘরের

দুয়ার বন্ধ করে দিয়ে আমার বাসটা তার বিহানার

কাছে নিয়ে আমার চাবি দিয়ে বাস খুলে ফেললে।

সাতখানা খামের চিঠি। চিঠিগুলো খাম ক'খানা টুকরো

টুকরো করে ছিঁড়ে তাতে তখনই শৈলেন সেগুলোই ফেলে

দিলে। এমন সময়ে দুয়ারে লাগির শব্দ। অস্থান্যে

যোকা গেল যে, সে শব্দ লাগি এবল পুলিশের। আমি

তাড়াতাড়ি উঠে বাক্ষিলাম। শৈলেন ইহিতে

আমাকে নিষেধ করলে। চিঠির টুকরোগুলো আপন

মনে পুড়ে লাগল। এবার গর্জন শোনা গেল, দুয়ার

খোলা, নইলে দরজা তাল। হবে। আমি বাত হ'য়ে

উঠলাম। শৈশবের চুপি চুপি বললে, ভাকতে দে।
তুই চুপ ক’রে থাকবি। মা’ বলবার আমি বলব।
এমন সময়ে দশবে চুপের ভেত্রে গেল। সঙ্গে সঙ্গে
হু’মেন পুস্পের দোক এলে তার হাত চেপে ধরল।
তখন সে চিঠির টুকরো ভুলে। তখন হ’লে দেখে, তা’ থেকে
আর পাঠোদ্ধার অসম্ভব। পুস্প বিজ্ঞাসা করলে—এ
চিঠি কার? নিতীকভাবে শৈশব বললে—আমার।
পুস্প বিজ্ঞাসা করলে—কার লেখা? উদাসীনভাবে
শৈশব বললে—কাক হবে। আবার প্রশ্ন হ’ল—
পোড়াক্ষিলে কেন? শৈশব বললে—কেনন জগে,
তাই লেখছিলাম। আমি ভবে বিশ্বাস একবারে শুধ
হ’য়েছিলাম। এখন পুস্প সঙ্গে ক’রে তাকে নিয়ে
যাবার উদ্যোগ করছে, আমি মুখ মূগতে যেতেই পুস্পের
অলসে। সে আমাকে চক্ষের ইচ্ছিতে নিয়ে করলে।
আমি কিছু বলবার আগেই তাকে নিয়ে পুস্প
চ’লে গেল। এমনি ক’রে আমাকে সে বাঁচিয়েছিল।
তারপর তার নামে কে’ল হ’ল। কোন প্রমাণ না।
পাওয়ায় সে খালস গেল। এর পরেই তার অন্তরীণে
আবদ্ধ হবার কথা উল্লেখ। এর মধ্যে অতি পোপনে
সে পাঠাবী লেখা ইংল্যান্ড চ’লে গেল।

ইংল্যান্ড যাবার কথা সন্ধ্যা জানিত। যাবার আগে
শৈশব পোপনে তাহার সহিত বেধা করিয়া দিয়াছিল।
বুনিয়া দিয়াছিল পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে সে দায়বদ্ধ
হইয়া নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবে। সন্ধ্যা বেন তাহার দ্বন্দ্ব
অপেক্ষা করে। সন্ধ্যারও মনে পড়িল, সে বলিয়াছিল,
পাঁচ ছয় বৎসর কেন, যাবজ্জীবন সে শৈশবের দ্বন্দ্ব
অপেক্ষা করিয়া থাকিবে।

ষ্টক ছয় বৎসর পরে শৈশব ফিরিয়াছে। সে
তাহার কথা রাখিতে পারে নাই।

শৈশবের পদমণ্ডল তলা গেল। হু’মেন চাহিয়া
দেখিল, শৈশব তাহার বর্ণাভি, বাস ইত্যাদি লইয়া
একবারে সম্মিত হইয়া আসিয়াছে।

শৈশবের পানে চাহিয়া শৈশব বলিল, যাবার সময়
সন্ধ্যা ঘেঁষকে একটা উপহার দিতে চাই। দিতে পারি?

শৈশব বলিল, একথা তুমি বিজ্ঞাসা করছ?

শৈশব আর কিছু না বলিয়া একটি ব্রহ্ম মন্ডলের
কেস্ আমায় পকেট হইতে বাহির করিয়া সন্ধ্যার হাতে
দিয়া বলিল, এটা পরবেন।

তারপর বন্ধুর দুই হাত পরিয়া বলিল, তবে বাই,
তাই; হু’ল ক’রো না। বিশ্বাস ক’রো, তোমাদের
চেহে লগতে আমার আপনায় আর কেউ নেই।

তারপর শৈশবের দ্রুতপদে সে কক্ষ ত্যাগ
করিল।

কক্ষের বাহির হইতে শৈশব মুখ দিরাইয়া বলিল,
তোমরা বেনে এস না। তোমরা ঐ জানলার কাছে
ধাঁড়াও, আমি যাবার পথেও তোমাদের লেখে যাব।
সেই আমার পাথেয়।

শৈশবের পদমণ্ডল সিঁড়িতে স্তব্ধ হইয়া আসিল।
কক্ষ পরেই একখানা ট্যান্ডি হু’ল বাজাইয়া তাহাদের
পেটের সম্মুখে ধামিল।

হু’মেন জানালায় হু’কিয়া দেখিল, পাশে রাস্তার
উপর একখানি ট্যান্ডি আসিয়া পৌঁছিল। শৈশব ট্যান্ডি
হইতে মুখ বাজাইয়া তাহাদের পানে চাহিল। হাত
তুলিয়া সে সন্ধ্যাকে নমস্কার করিল। শৈশবের পানে
চাহিয়া একবার অতি রক্ত মধুর হাসি হাসিল।

ট্যান্ডি ক্রমে দূরীকরণের অতীত হইয়া গেল।

শৈশবের চক্ষু অন্ধ আসিয়াছিল। অন্ধ হইয়া
সে সন্ধ্যাকে বলিল, শৈশব কি লিখে গেল দেখত।

সন্ধ্যা কে’ল বুনিয়া দেখিল, একগাছি অতিমুখের
কাককাঁধীযুক্ত চিকণ সোনার হার; তাহাতে একটি
ব্রহ্ম লকটে লাগানো। লকটে খোদাই করা এই
কবিতা—“কতদিনে ফিরবে?”

সন্ধ্যার মনে পড়িল, এখন শৈশব ঢাকা হইতে
কলিকাতা পড়িতে আসিয়াছিল, সেই সময়ে এই
লকটেট ভেরারী করাইয়া সে-ই শৈশবকে উপহার
দিয়াছিল।

এতদিন পরে শৈশব সেই উপহার আবার
সন্ধ্যাকেই ফিরাইয়া দিয়া গেল।

আমরা কিসে কম?

নিম্ন ভারত হরিজন দিনস



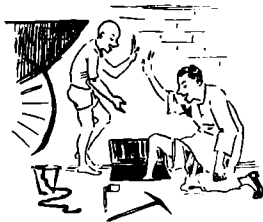
এই ভাবে



পানন করিতে পারিলে



দেশ এই মুহূর্তে



এক (আকান) হইয়া নান্দ

স্রষ্টা

প্রাণী অনুকম্পা দেবী

[পূর্বাহ্ন]

(৫)

তা আশ্রয় ; একটী ঘরের বিয়ে, যেখানে যে আছে সকলেই আশ্রয় না ; বারণ তো নাই ; নিমন্ত্রণ-পত্র অপব্যাপ্ত হাশাও হইয়াছে, বিলি করার ভারও আছে তাঁদের হাতেই, আর ইচ্ছা সেই আশ্রয়, আরো কতক, খাওয়া-দাওয়া কতক, আগুনি কিছুই নাই। শুধু তাই এই যে, সেই আসিলেনও সকলে, অথচ সকলের মুখেই সেই এক বাণী, “এত বর্ষার মাকাল হ’তে এতদূর থেকে কে-ই বা আসত ? শুধু ঐ নেমন্তন্ন-পত্রের সিরেই না ঘোর ক’রে নিশে এস !” ছ’একবার একথাও হয় যে, “দিলেই হ’ত সেখের বাড়ীতে বিয়ে ; বতই হোক, এ ভাড়া-বাড়ীতে সন্মাহিকার তো আর এক-একটা ঘর কুসোয় নি, দুর্দশার একশেষ ! এমন জানুল কে-ই বা এখানে আসত !”

স্বপ্নজন তো বাইরের ঘরের একটী পাশে থাকেন ; সেইখানেই রাতে তাহাকে বিছানা পাতিয়া দেওয়া হয় ; সর্দাণী থাকে তার খুঁড়ুতো বোনদের সঙ্গে এক বিছানায় ঠাণ্ডাঠাণ্ডি হইয়া ; কেনবা, তাহার নরীদার বউকে একটা পুত্ৰা ঘর ছাড়িয়া দিতে হয়, নতুন-বিয়ে-হওয়া ছেলে-বউ। মলিনাদি’র ঘর লম্বা, তারও একটি চাই। ‘তরলদিদির সাতটা ছেলেমেয়ে, বর্গটীর ঘুম না হ’লে ‘কলিক’ ধরে। চারজন কাকীদার চারটা ঘরের দরকার, তার উপর পিলীদার, আর অস্ত্র কটুখ-কুটুখিও বিত্তর আছেন। তা এর লজ সর্দাণীর কোন আগতি ছিল না। ইহারা

তাহাদের বাড়ীর আগমক, অতিথি, বাড়ীর কে-কিছু স্থখ এবং স্বাচ্ছন্দ্য, সে তো ইহাদেরই প্রাণ বটে ! আর তাহাতেও যে ইহারা থাকিয়া থাকিবে। অসন্তোষ প্রকাশ করেন ; তাহাদের বাড়ীতে এরকম অবস্থার কি থাকি যটে, তাহারই উদাহরণ উঠিতে-বসিতে টানিয়া আনেন। এইতেই বাপ ও মেয়ে বিভ্রাট বিপন্ন বোধ করিতে থাকে, আর নিজেরা ক্রমশই কোণঠাসা হয়।

সেদিন সর্দাণীকে তাহার ভাবী শত্রু পালা দেখা দেওয়া পিছাচ্ছেন। ইহাদের বাড়ীর মাতলবরা সর্দাণীর বাপকে সঙ্গে করিয়া পাত্র-আশীর্বাদ করিয়া আসিয়াছেন একখানা মোহর দিয়া। এগুকের ইচ্ছা ছিল, আশীর্বাদে অস্ত্রতঃ একসঙ্গে হীরার বোতাম দেওয়া হয় ; কিন্তু সর্দাণীর কি যে ঐ ধনুর্ভঙ্গ পণ, সে-বন্দোবস্ত তাহার মনঃপুত হইল না। মলিনাদি’র বরকে বখন মোহর দেওয়া হইয়াছিল, তখন একেই বা হীরার বোতাম দেওয়া কেন ? বাড়ীর একটা বাধা চলে থাকা ভাল ! সেমকাকীকে সে নিজেই এই কথা বলিয়া দিল, বাবাকে তো সব কথা বলিয়াই রাখিয়াছে। সেমকাকী শুনিয়া কিন্তু মনে মনে দুসীই হইলেন। “তা সবার আমায়ের বেশ আকল আছে বাবু ! সত্যি তো, একবাড়ীর মেয়ে হাজারও হোক ; একমনের অনেক হ’লে আর একমনকার তো মনে বাজে ; জামাইবাও সব এসেছেন, তাঁদেরও মনটা খরাপ হবে। আবার দেখ বিয়ে, এই তো মাথার মাথার

হ'রে ব'য়েছে আমাদের জুগোচনা, প্রতিমা, আর সরলা, ভবের বেলায়ও তো আবার দাবী উঠতে পারে। নাঃ, বেশ কয়েকে সব, এই তো ভাল।"

ছোটগিনী বলিলেন, "এই বেশ ভাই, তোমরাই তো বলতে, লেখাপড়া শিখিয়ে পাশ দিয়েছে ভাববঠাকুর মোটোকে বিধি ক'রে ভুলছেন। তা এখন বেশ সকাই, কত মিসি মেয়েই ও হয়েছে।"

হ্যাঁ, একখাটা অনেকবারই উঠিয়াছে বটে! সেমকাকী লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "অনেকেই হয়, তবে বাপের শিক্ তাল আছে কিনা, তাই গর গটা হয় নি।"

ছোটকাকী এদের বড় ভালবাসে, সে একটু খুসী হইয়া বলিল, "সবুজ! মেয়ে বড় ভাল, সে আমি বরাবরই জানি।"

অমনি চারিদিক্ হইতে তাহাকে প্রতিবাদ করিয়া অনেকগুলি প্রবল কণ্ঠ বাজিয়া উঠিল, "ওনা, তুমি আর ক' দিন এসেছ, ছোটবউ! অতবড়টা গুরু কয়ল কে? আমাদের ঘরের মেয়ে, আমরা চিনি নে? তুমি আজ গুরু আমাদের কাছে চিনির মেয়ে?"

অপ্রতিত হইয়া ছোটবউ নীরব রহিল। কাকীদের মধ্যে এই কাকীটাই একটা আত্ন ঘরের দাবী রাখে নাই। আর সর্কাণীর বাপের খাওয়া-দাওয়ার তদারক যথাযথ নিয়মের হাতে রাখিয়া সর্কাণীকে বতটা পারে ছুটি এই-ই দিয়াছে।

বরের বাপ সকাল বেলাতেই পাজী-আশীর্বাদ সারিলেন। বল তিনি কোথাও বান না, এখানেও থাকিলেন না; সুখ একটু বেন তার-ভার; একখানি সিনি দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। সঙ্গে দু'জন মাত্র লোক, একজন আখীর, একজন গুরোহিত। আর শিবের তে। ছিলই; সে তো 'বরের ঘরের মাসি, আর ক'নের ঘরের পিনী।'

এবাড়ীর অন্ততঃ গণ্ডা পাচছয় ছেলে-সুড়ো মিলিয়া ওবাড়ীতে পাকা দেবা সেখিতে দিয়াছিল! সর্কাণী খুব চট্টা মেলেও কাহাকে ঠেকাইবে ভাবিয়া পার নাই।

এখন ইহারা বলাবলি করিল যে, বরকর্তা ইহাদের সুখের মতন ছুতা দিয়াছে। তা দিক না, পেটে খেলেই পিঠে নয়। সন্দের দু'ঘনকে খাওয়াইয়া অনেক প্রকার মিষ্ট কথা দিয়া ভুট্টে করিবার চেষ্টা করা সবেও তাঁহারা ভুট্টে হইলেন কিনা, স্থিরিত পাড়া পেল না। একটু পরে তাঁহারা বিদায় হইলেন।

মেঘেরহলে অনেকে বলিল, "ওমা—ভেবেছিলাম, একখানা পরনা দেবে! একটা সিনি হাতে ক'রে দিলে কি ব'লে?"

আবার অনেকে মিলিয়া প্রতিবাদও করিল, "তা বাবু, কেনই বা দেবে? তোমরা মোহর দিলে, ওরা সিনি দিয়েছে, তাই তো সবাই দেয়। ক'নেরই তো বেশি দিতে হয়। এই বেশ না, সন্দের টাকা তোমরা পকাশ দিয়েছিলে, ওরা পটিন দিয়ে পেল। তাই নিরম। মনিয়ার দত্তরই বা কি দিয়েছিল।"

সেদ্বিধী ভারী সুখ আর একটুখানি ভারী করিয়া বলিলেন, "ওর সঙ্গে, আর এর সঙ্গে! আমাদের পাটী, আর ওর এই সবে তো একটা। মনে তো জানবে—সবই ওর। মিনসে একটু কিপুটে আছে।"

একজন মন্তব্য করিলেন, "তা ভাই, ছেলের কুইম কিপুটে ভাল।" আর একজন বলিলেন, "একটাই হোক, আর পাটীই হোক, ও তো আদিত্তে সুখ বেধা; যেমন মেয়ে, তেমন পারে।"

এদব ভরকৈ কোন মীমাংসা হয় না।

কিন্তু বাহারা সর্কাণীর ভারী শওরকে ক্রূপণ বলিয়াছিল, তাহাদের ভুল স্বীকার করিতে হইল তাহাদের আইবুড় ভাতের তত্ত্ব দেখিয়া। এমন তত্ত্ব এবাড়ীর কোন ঘরের জন্তই নাকি এর আসে আসে নাই! খেলনা পুতুল, ড্রেসিং কেস, টয়লেটের স্নায়বান জিনিসপত্র, রাইট কেস, মাস 'টেনিসন', 'বায়রন', 'সেলী', 'কিপ'লি'এর ভাল ভাল বীধানো বই, বাগ্গার নামকান্য লেখকদের লেখা গল্প-কবিতা-উপন্যাস এবং কাব্য! এছাড়া খুতী আর রেশমী

শাট ক'নের মত সেটা কুড়ির কম তো নয়ই। পাঁচ এরোর মত বেশব জিনিষ আসিল, তাহা দেখিয়া আশ্চর্যসম্পন্ন বউজিনের সকলের মনেই একটুখানি প্রবল রোষের উদ্রেক হইল। যেতে পাচটা জিনিষ, অথচ প্রাণী অস্ত্রঃ পটিলী।

কুইন-বাড়ীর শোকেদের ভাল করিয়া খাওয়ান এবাড়ীতে হয়, আশংক্য হইল। মদিকার ইচ্ছা ছিল, দু'টাকা করিয়া বিয়া দেওয়া হয়, বং করা দুটি দিলে ভালই দেখাইত; সর্গাশি তার সেধকালাকে আসিয়া বলিল, “মদিনাদির বণ্ডর-বাড়ীর শোকেদের যা দিয়েছিলে, এদেরও তাই দাও।”

কাকা এবার একটু চাল চালিলেন, জবাবটাকে একটু বুঝাইয়া দিলেন, বলিলেন, “সন্মাইকে তো সন্মান দেওয়া যায় না। নাশু'তের পাওনা আশায়া, আর যে বাছ আসে, তাকেও বেশ দিতে হয়; বাকি সব দুটি আর এক টাকা ক'রে দিয়েছি। পাড়ীতাক্তা এছাড়া।”

হিসাবে তুল হয় নাই, কিন্তু যোগ দিতে তুলটা সর্গাশির মন এড়াইয়া দেল। মদিনার বণ্ডর-বাড়ীর লোক ছিল জন কয়েক, জিনিষ-পত্র বেশীর ভাগ আসিয়াছিল বেড়ার পাড়ি করিয়া, এদের বাড়ীর তত্ত্ব আনিয়াছে আশী জন লোকে।

বিয়ায় নিয়া কুইন বাড়ীর লোকেরা খুব খুলী হইল না। তাহারা আশা করিয়াছিল, দু'টাকা নগদ বিয়ায় পাইবে, এমন নাকি কোথাও কোথাও পাইয়াছে। বিয়ায় পাইয়া না হোক, বউ সেখিয়া সকলেই এক বাকো সুখ্যাতি করিল। দিয়ার পুরাতন কি, এই বিবাহ উপলক্ষে যে দাবী তদর পাইয়াছে, তাহা পরিয়া আসিয়াছে। সেধকর্তাকে সে-সব দেখাইয়া বেশ কিছু পুরস্কারের দাবী তুলিল। ব্যাপারটা স্ত্ররজনের কানে উঠায় তিনি বিষের হাতবাক্স খুলিয়া চুপি চুপি দুশী টাকা তদরের দান বেওয়াতে মন খুলিয়া সর্গাশির জপের খ্যাতিটা সে-ই একবাক্যে খুব দলা ছাড়িয়া প্রচার করিতে লাগিল। এ-বাড়ীতে

যত পারিল বলিল, সাধীদের মধ্যে বসিতে বলিতে শেল, আবার সে-বাড়ীতে দিয়া এমন দলা ছাড়ির করিল যে, সে-বাড়ীর আশ্চর্যেরা বউ দেখার মত উন্মত্ত ও অধির হইয়া উঠিল। ‘সে-বাড়ীর মা’ বলিয়া সর্গাশি বাহার উল্লেখ করিয়াছিল, যদিও তিনি বরের আসল মা নয়, বিমাতা, তথাপি বউ তোমার আশ্রয়, তাহারও বোধকরি, আশংকা থাকিলে যতখানি হইত, তার চাইতে কিছুমানও কম হইল না। হেঁদেকে মার ছেপে বেশী বা মার মতন ভালবাসেন বলিয়া নয়, সতীনশো-বউ কতবড় সুন্দরী হইতেছে, সেইটা সেখিবার জ্ঞানই।

বরপক্ষ হইতে মদিকাদের দাবী করিয়াছিল; কিন্তু স্ত্ররজন তাহাদের ছাড়িলেন না। বরক'নের সঙ্গে একত্রেই তাহারা সে-বাড়ীতে বাইবে, এই রকমই ঠিক রহিল।

বখালাসে সকল বাধা-বিপত্তি সরাইয়া বিবাহের লগ্ন নিকটবর্তী হইল। বরের বাড়ী লাগিয়ায়; বড়-জলের মত ওরা আসে হইতেই কলিকাগর আসিয়া কোন এক আশ্চর্যের, না বন্ধুর, বৈঠকখানা দখল করিয়া বসিয়াছিলেন। লগ্ন একটু বেশী রায়ে; সন্ধ্যার পূর্বেই অতঃপূর্বা একটা বার আরক্ত চন্দ্র দেখিয়া সারা-দিনের অপ্রাণতমসিন স্নহ প্রকৃতির শোকাচ্ছন্ন মুখের পানে চাহিয়া সেখিলেন। কাল আসিয়াছে, চোখ দিয়া তখনও বিষ্ণু বিষ্ণু মল পড়াইতেছে; বধীর হাওয়ার বুকভাঙ্গা দীর্ঘবাস তখনও থাকিয়া থাকিয়া খসিয়া উঠিতেছে। মলকালার সামনের সাতটা জমাবহ হইয়া উঠিতে আর কিছুমাত্র বাকি নাই। বাধা মেয়াদের উল্লার করাস পাতা হয় নাই; বেকি বিয়া, চেয়ার পাতিয়া আসর শৃঙ্খল। হইয়াছে। বরের বসিবার লায়লা ‘শ্রোদের’ মত করা, তার শিহনে একখানি নতুন ‘আঁকা ‘সীন’, বৃত্ত খুব ভাল। মাদিনী নবীর তীরে নবীসদ্বিনী শকুন্তলা কলসী ভাসাইয়া মল আহরণ করিতেছে; অজ্ঞের বিমিত্ত আগন্তুক হৃদয়ের দিত্তসুখ অবস্থিতি; নবীকলে বোধকরি বা স্নোত ছিল না, রাসি

রাশি পল্লী ছুটি রহিয়াছে (হুত এরাই একদিন বিরহতাপনপ্রাণ শূন্যতার বিরহপনের সহায়তা করিবে); মরাল (হুত বা মৃগাল দোভেই) এই নবীতে বিচরণ করিতেছিল; অসিদ্ধল ও অসুস্থ ছিল না, তাহাদেরই একটা শূন্যতার সুখের কাছে উড়িয়া মিয়াছিল আর কি! নারক-নারিকার প্রথম ধর্মনের মধুর চিহ্ন! অচন-ভরীটিও অস্তি পরিণামি।

বর যখন আসিল, বৃষ্টি আবার নামিয়াছে; টিপিটিপি নহে, প্রায় সুবলারার। মোটরগুলির 'হুত' তো তোলাই, কতগুলির আদ-পাদও বহু। বরের 'সিডান বডি উইলিন্সনাইট কার' নাম। চুলপাতা ও নানারকমের লতার মধ্যে ইলেকট্রিক বাল্ব দিবা সাধনো হইয়াছিল; বৃষ্টির বাত্রে ফোটা ফুলগুলি বাতায় পুষ্পরূপে করিতে করিতে নিজেহা ললহারা হইয়া আসিয়াছে। জায়গার জায়গার লতাশাভাও ধারা-জাবনের প্রচণ্ড ধারাশাত সহিতে পারে নাই। জানাঘার একটা হাওল ঠিক ছিল না, কাঁচ তোলা বেশ না; মাথ রাত্তার বৃষ্টি যখন চাপিয়া আসিল, তখন গাড়ী বয়ল করার উপায় নাই, মিতবর এবং চ'একজন বন্ধুর সঙ্গে বরও রীতিমত ভিজিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।—বিবাহ-বাড়ীতে ঠিক এই সময়টাতোই কেহ বর আসার ক্ষত প্রকৃত হয় নাই। অনেকশ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করার পর বৃষ্টি যখন রীতিমত চাপিয়া আসিল, বাড়ীর কর্তারা মনে করিলেন, এত বৃষ্টিতে নিশ্চয়ই বর বাহির হইবে না। লম্ব যখন বেশি হায়ে, সময় যখন রহিয়াছে, বৃষ্টি অন্ততঃ কনিধে বর আসিবে। তাহারা নিজেদের কুটুম্ব-আত্মীয়-বন্ধুদের খাওয়াইয়া বানিকটা কাজ চুকাইয়া রাখিতেছিলেন। চুকিল তো সব, মাঝে হইতে একটা পগোলা!

রাত্তার উপর একটুখানি থোলা অমি, সেখানে না ঢোকে গাড়ি, আর না আছে ছাঁস; ছাতা রাখারও ব্যবস্থা হয় নাই। বরহাজীসের বতটুকু বা ধূপা হইতে বাকি ছিল, তাহাও পূর্ণ হইতে বাকি থাকিল না। এ অবস্থায় ন-বরবাজী বরকর্তার মেগাধী কেন

হইতে পারে, বরকর্তা তির সেকথা কাহারও মাথার চুকিবে না!

বরকে অবশ্য পরিশেষে ছাতা ধরিয়া হাতে বহিয়া আনা হইল, কিন্তু সে-রূপে কি ছাতার আটকায়! একটা 'গরটোরপ্রক' আনা উচিত ছিল; আছেও বাড়ীতে কিন্তু দে-কথা যখন ওদের খেঁচা খাইয়া মনে পড়িল, তখন বৃষ্টিজলে ভেজা বরের অঙ্গ হইতে বেনারসীর তেলির নীল ধাতা ধীরে ধীরে গড়াইয়া পড়িতেছে, জলের ছাটে লগা চন্দন তাহার চোখের উপর, পালের উপর অঙ্কুত ভাবে নামিয়া আসিয়াছে। ক্রোধে, ক্ষোভে অথবা ধন্যন পূর্বক সে শুষ্ক হইয়া গড়াইয়া রহিল, পুণ্ডরুকের আনা তোয়ালে ও নববস্ত্রের আশ্রয় গ্রাহ্য করিল না। স্বরজন মিছে আসিয়া যখন অল্পরোধ করিলেন, তখন শুধু এই কথাটা বলিয়া উত্তর করিল, "থাকতে দিন, সকলেই যখন ভিজেছেন, তখন একা আমি কাপড় ছেড়ে আর কি করব?"

সত্য কথা! অপ্রতিভ হইতে আর কিছু বাকি থাকিল না, কিন্তু উপায়? এতগুলি লোক; তা প্রায় শ' দুই হইবে, এদের সবাইকে কাপড় যোগান কেমন করিয়া সম্ভব? সবাই মুখ চাওয়া-চাওনি করিল, স্থানে স্থানে জটলা পাকাইয়া সমস্ত সমাধান করিবার চেষ্টা করা হইল, বরকর্তাকে এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য, বাড়ীর মধ্য হইতে বতগুলি ধূতি ছিল আনিয়া ফেলা হইল; কিন্তু তাহাতে বন্ধুত্বের মন তিরিশেক লোকের ধূপা বৃষ্টিতে পারে, বাকি লোকের কি হইবে? এরাও সব ক'দিনের জন্য এখানে জড়ো হইয়াছে, তার উপর বৃষ্টিতে কাহার রোজ হ'বেলা কাপড় মল্লা হয়; বরং মল্লা কাপড়ের বাস্তবী খুন্সি বিতর ধূতি মিলিতে পারিত; তাহা তো আর মেজাজ ধার না!

অনেকগুলি মাথা চুলকাইয়াও এর সীমাসী মিলিল না। একপক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া সৈববিড়ম্বনার সমুদায় অপরাধটাকে অপর পক্ষের বাড়ি চাপাইয়া দিয়া মনেতো নিশ্চয়ই, মুখও কতক কতক বিমোহন করিয়া মেঘ-তন্তিত আকাশের মতই তীব্র হইয়া রহিলেন, অপর

শব্দ প্রায়-অকারণে, হৃৎ বা অতি তুচ্ছ কারণেই, অতদ্ব্য একটা অভিপ্ৰাণের বোঝা মাথার উপর ধরিয়া বিদ্যুৎবাহ্য পতিত হইলেন। হুরজেন তো হতভয়; তাঁহার প্ততুতো সেখ ভাই-ই তাঁহার বল-বৃদ্ধি-ভরণ। চারটা মেয়ের বিবাহ তিনি দিয়াছেন, আশা করেন, আরও তিনটীর দিবেন; তা ছাড়া ভাই-ভি-রাও আছে। সেই তিনি-ধেন কুটুম-বেঁধা, এবং কুটুম-তোষা দশকর্ষাবিত পুরুষও যখন সর্দারীর ভাবী স্বত্তরের কাছে ঝোড়োত করিয়া করিয়া হাত হ'খানা ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াও না পারিলেন তাঁহাকে কাশড় ছাড়াইতে, না পারিলেন খাইতে বসাইতে, তখন হুরজেনের প্রায় ধাত ছাড়িবার উপক্রম হইল। তাঁহার কেমন যেন আগাগোড়াই মন বলিতেছিল, ভাল নয়, ভাল নয়, এ বিবাহ যেন ভালয় ভালয় হওয়া দুর্ভট!...

অথচ ঐ বরশব্দই তো ধরিতে গেলে এইটা ঘটাই-
 রাছেন। কি পরকার ছিল অত ভাড়াভাড়ি করিয়া। এই ভরা বর্ষায় বিবাহের দিন ফেলিবার? কৃতকর্মের ফলটাকে অস্ত্রের খাড়ে ঠেলিয়া ফেলিয়া, আগুনে হাত দিয়া হাত পোড়ানো আবদার? ছেলের মতই, তাঁহার। এ নিম্মল ক্রোধ দেখাইতেছেন; কিন্তু এ ক্রোধের খাড়া সহিতে যে আর বৈধা থাকে না! হুরজেনেরই না হয় কড়াধার, তাঁহার আত্মীয়দের...

বিবাহের লগ্ন কাছে বৈশিষ্ট্য আসিতেছে। পুরোহিত পাশগ্রাম পিলা আসে লইয়া উৎকর্ণ। বামনা এতক্ষণ স্ত্রীর দাগটে শোনা বাইতেছিল না, এতক্ষণ বর্ষাধারার পাকভক্তবর স্ত্রী হওয়াতে সাহানার আলাপ কানে আসিয়া পৌছিতেছিল; কিন্তু কি ছুর, তা' ভাল বোঝা হাইতেছিল না। কিছুকিন, কথঞ্চ, টিপ্‌টপ্ একটা না একটা তো আছেই, আর প্রোভাবের মনের কানও তখন বেঝায় বেঝর চড়িয়াছে। সাহানার আনন্দ-উজ্জল আশ-নিবেদনের মিলন-মধুর তানকে থাকিয়া থাকিয়া তৈরবীর কণ সূঁচনা বলিয়া তুল হইতে থাকিলে মোহ বেগাও বায় না। কানে তার

রেণু চুঁকিতেছিলই বা কার কতটুকু? বড় বড় মাঁতলরধের তখন মাঝে পুরিয়া গিয়াছে!

অংশেণে বরকর্ভা কি ভাবিয়া বরক, আর বা'সের বা'সের ভক্ত প্তবস্ত্র পাওয়া সম্ভব হইল, তা'সেরও কাশড় ছাড়িতে অশ্রুতি দান করিলেন। ঘর অবস্ত্র তিনি নন, হুরজেনই; কিন্তু আশ হ'জনের অবস্থার বিলম্ব পরিবর্তন ঘটাইছে। মনে করা বিচি নহ যে, ইনিই বিচারক, আর তিনি আসামী। আর তা-ও নেহাৎ ছোটখাটো আশীল নয়, মরণ-বাচনের ব্যাপার!

বরবাতীর বুদ্ধি; ততক্ষণ পাইলেই ষায়, শুকুম পাওয়ার ভয়ও যে কাউন্সিল বসিয়াছিল, তা-ও অশ্রম্যন করিলে নেহাৎ তুল হয় না,—বৈধর তাপ লোকেই অর্থাৎ বরকৃত্যন মূস-কাসু করিয়া বশিতেছিল, “এদের ঘোষ কি?” বর বেচারীও তাহার বন্ধুর বুদ্ধি তনিতে তনিতে কাঠের মত শক্ত হওয়া ছাড়িয়া, সহজ মননীর হইয়া গুনের মতোই একটা চোয়ার লইয়াছিল। পুনে দিয়া বসার ভক্ত বসিও তাহার মনে মনে অশাষ ছিল না, কিন্তু সেটা তো এখন আর কোন দিক দিয়াই পোতনীর হইবে না। বিবেক করিয়া, এই নীলবর্ণরঞ্জিত এবং পলিতচন্দন কিছুত সূরি লইয়া। ছেলেবেলার-শোনা নীলবর্ণ শৃঙ্গলের রাঙ্গবেণটা মনে পড়িয়া তাহার এই মানসিক বিপ্লবের মধ্যেও ঐকং হাসি পাইল।

বরকর্ভাকে বাদ দিয়া বরবাতীর বন অনেকই কতাপক্ষের প্রতি সহায়ত্বিত প্রকাশ করিতে উভত, তখন বিচক্ষণ বরকর্ভা নিজের ‘গ্রেপ্তার’ বন্ধার বাবার ভক্তই হোঁৎ পূব বেশী মহারিক হইয়া উঠিলেন। “হাঁ, হাঁ, কর কি নয়, খেতে বসিয়ে নাও, লগ্ন যে এসে পড়ল! খোকা! জুনি বাও, একটু পরম কলে চান সেরে নিয়ে ভৈরী হও যে। ওরে, ও—নাশুতে বোটা সেল কোথায়? ওরে রাণী! খোকা বাবুক সাবান দিয়ে চান করিয়ে দে না। আপনারা একটু চন্দন পাঠিয়ে দিন আর পরম কল, একটা সাবান, জোয়ালে—”

বাৎ সমস্তার সমাধান হইল! যেন মননীর-ব-
 বগ্না হইতে মুক্তিলাভ! ব্যাগ-পাইল, পানাই নুতন

একটা হুঁর বাঁধিল। হুঁরটাকে বুঝিতে এবার আর কাহারই হুঁর হইল না। সেটা বেহানই বটে! অন্ধাপুরে ঘোর ঘোলে শাঁখ বাজিয়া উঠিল। নৃতন-কাপড়-পরা, নবপ্রদাধনে সজ্জিত বর এইবার ছাব্বা তলায় প্রবেশ করিবার ক্ষণ দানের ঘর হইতে বক্তরের দ্বারা সঙ্গীত হইয়া উঠিয়া আসিলেহে। মুখ তাহার প্রসন্নতার নীতিতে সন্মুখিত, লগাটে উৎসাহ-সৌরভের ভরসীকা, অতীত কালের সলিলাঙ্গ। বিব্রণতার অস্বাচ্ছন্দ্য সঙ্গীতসেই তাহার মনের উপর হইতে আশ্বাবিলোপ করিয়াছে। (খোঁদ বানার যে বসিতে পার নাই, সেই ছুঁখটাই যেটুকু নাকে নাকে ঝিক মারিতেছিল।) সীনে আঁকা রামা চক্করের মতই তাহার হৃদয়িত মুখে চোখে কোঁঠালের একটা মধুর উদ্ভাপনা বেন ক্রীড়ার ছলে খেলিয়া বেড়াইতেছিল; সেটুকু সেই আদবালে মলিনসেচেনিরতা অকস্মৎ-প্ৰাণকৃত্যর মতই পুষ্পমালাভকরা, তাহার এতদিনের অসম্পন্নীয় পঞ্চাঙ্গের পরিসমাপ্তির উগ্র ব্যঞ্জনা। বুক তাহার সখন আবেশে ছক ছক করিয়া উঠিতেছিল; প্রতি মুহূর্তক লীল্য যুগান্তর এবং প্রত্যেক অস্থানটিকে একান্ত অনর্থক বলিয়া বোধ হইতেছিল।

মহলা তাহার পিতা পতীর পলায় হাঁকিয়া উঠিলেন, “খোকা! একটু গাড়িতে বাও।” দাতার আদর্শন আসীন, কোমরবদ-পরিহিত, এতক্ষণের পর আমাত্ম-কর্মে প্রসন্নমুখজ্ববি, স্বভাবতই পায়বৃত্তি বৈবাহিকের দিকে কিরিয়া গড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“কারিচার, বরাত্তর বা? মিছেন, সে তো দেখাই সেল। সেয়ের দ্বারেও কি এই হিসেবের গয়না গড়িয়েছেন? আমি একবার দেখতে চাই—”

হুঁরজনের মুখ ওকাইয়া সেল, প্রস্তের উত্তর তাহার মনে পড়িল না। তিনি অসহায়ের মতই চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। দেহকর্তা তখন তেতলার ছাদের উপর বরবাত্রী খাওয়ানোর ব্যস্ত আছেন।

বড় অর্থাত্ত হুঁরজনের দ্বিগবে যিনি বেহকর্তা, তিনি অগ্রসর হইয়া আসিয়া প্রণাবটী অগ্রদোষন করিলেন,

বলিলেন, “সে তো ভাল কথা, আপনি আহুন, যেহে এখন পুঁতি-কোলে বসেছে, এখন তো ওখান থেকে ওঁচাতে বই; আপনি এসেই না হয় দেখে যান—”

বর সেইখানেই বাপের হুকুমের প্রতীক্ষা করিয়া গাড়াইয়া থাকিল। মুখের হাসি তাহার ঔৎসাহ-পাত্তির বিরমতার পরিবর্তিত হইয়া সেল, ত্র একটু কুচকাইয়া সে তাহার তীক্ষ্ণ চোখের মূহ দৃষ্টি গোপন করিবার ক্ষণই হ্রস্ত মেঘের বসান কাচের টুকরাগুলার রং মিলাইতেছিল।

সর্বাঙ্গীর মুখ খোলা, হুকানে ছুঁটা হীরা গলিতেছে, গারে ক'খানি সোনার গহনা। কাঁকার, পিলীরা, কোন কোন বিধি লেদপিন, ইয়ারিং, ছোট বেস্কেলেট, স্ক্রি, সোনার শাঁখা এমন সব উপহার দিয়াছে, সে-সব পরে নাই, কাড়া কাড়া ঐ করেকখানি মাত্রই গহনা তাহার গারে; একখানি লাল রংয়ের বেনারসী পাড়ী পরা।

বরকর্তাকে হাত তুলিয়া, কান পুগিয়া, পোঁপা কিরাইয়া সব দেখান হইল। দেখিতে দেখিতে তাহার মুখ বহানলবন্ধ অন্ধকারাঙ্কর আকাশের মতই কঠিন ও তীক্ষ্ণ হইয়া আসিল; রোষতীত কঠোর ঘরে তিনি বলিয়া উঠিলেন—“আপনাদের বাড়ী বিয়ে দিতে স্বীকার ক'রে আমি দেখছি মণাই, একেবারে সকল দিক থেকেই কঁকিতে পড়ে গেছি। তা' কি ভরতীর দিক থেকে, কি দেবা-পাওনার দিক থেকে। মনহাচার টাকা নিয়ে খোপামোদ করেছে; ছেলের সব বিদ্যান বটে, তাই তা'দের কথা কানে তুলি নি, তার ফল হবে না? নিকু এখন খোকা তার বিদ্যান কটোর পা ধুরে ধুরে জল থাক!”

রোষজরে তিনি কিরিয়া আসিলেন। হুঁরজনেরকে পাইয়া যে অনলোদ্গীরণ করিলেন, তাহার ভাবা যে আরও একটু কঠোর হওয়াই স্বাভাবিক, তাহা বোধকরি বলাই বাহুল্য! তবে, অপমানে হুঁরজনের মুখে কথাই ফুটিতেছিল না; কিন্তু তাহাকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা সেখা দিল শিবের।

তাহার মনে কথাই ছিল, যদি একটা গোপদাল উঠিয়া

পড়ে, সেই কাছটা করিবে। পূর্ণধাবস্থা মত সে কাছ
খঁসিয়া গাড়াইয়া ঠেং নিঃ কঠে, পদদলিত দম্পত্যের
মতই দংশনোদ্ভূত হইয়া পর্জনকারী বরকর্তার কানের
কাছে কি কয়েকটা কথা বলিল, কি যেন একটা ভিন্ম
একটা রেশমী কাছ করা শোটকোনিও একটুখানি
পাঁক করিয়া দেখাইল, অমনি যেন মস্তোষি-মস্তবীর্ণ
সর্বরাশের মতই বাঙ্গালী ঘরের বরকর্তা নম্র ও নত
হইয়া পড়িলেন। ঠেং মস্তের ভাইপোকে কি একটা
প্রস্তাব করার সঙ্গে সঙ্গেই যে উত্তরটা পাইলেন, ঠিক
মনস্কৃত না হইলেও ঐ খাতার মধ্যে পাচ হাজার টাকার
কারেন্সি নোটগুলিও তো কুড় নর! যেতের আপত্তি!
আন্দর্য্য কথা! তা' আন্দর্য্যই বা কি? দেখাপড়া
করিতে করিতে হেলেনেমেয়েরা কতই না বেয়াল
করে! তাঁহার হেলেনীও এবিধের একটা বহুর্ভর না
হইলে দুখিপাতের অমিসারবাকীর ঘেয়ে কবে না
কবে তাঁহার ঘরে আসিত। বাপের বিবর সে-ও কি
অর্ধেক পাইত না? একটা সবলম বা জমের
কতই বা টাকা থাকিতে পারে? তাও তো বৃহৎ
সোজি, আর একাধিকটা পরিবার।

ছাড়পত্র সংগ্রহ করিয়া বর আসিয়া ছান্দা তগায়
পৌছিল। পুনঃ পুনঃ বাধা পাইয়া তাহার মনটা
বিনদাইয়া গিয়াছে; উৎসাহের ঝোয়ারে যেন তাঁটা

আসিয়াছে। তথাপি এবিষটে কিরকম? জীবনের মধ্যে
এমন দিন তো আর মিলিবে না। মনকে সে
থখালাগা চাষ। রাখিতে চাখিয়া মনে মনে এই লাইন
ছঁটা আত্মপ্রতি করিল —

“Hope, like the gleaming taper's light—
Adorns and cheers the way.”

আবার আকর্ষণ অপরিমিত স্বর্ণালঙ্কারে, আর নিষেধ
বিবাহকালের সেই সনাতন রাম। বেনারসীর মোটা
চেনিখানিতে সর্বশরীর মুক্তি কেলিয়া শান্তকীহানীয়া
মেধনিরী তাঁহার বেদবহুল মালগ বেহ লাইয়া কোন
মতে বর বরণ করিলেন। নানান লামের লাজ করিয়া
প্রানো, ককা এবং পোরাসিনী জীরা বরণভাঙ্গা, দম্বীপ
জলর চিতার কাঠা, শ্রীমন্তিক-সমদিত পাত্ৰাদি লইয়া
হাতরম্বত ছড়াইতে ছড়াইতে সাতপাক গুরিয়া শুভমুষ্টির
অবসর করিয়া দিল। চারিদিকে সব উটিল, “ক’নে
আন, ক’নে আন,—একি এত দেবী কিসের? গর যে
ব্রট হ’য়ে যায়—”

কিন্তু কই, কোথায় ক’নে? শিড়ির উপর বরের
পরিভ্রান্ত চাষের উপর চতীর পুঁথি পড়িয়া আছে,
কাঙ্কলনটা পড়িয়া আছে, ক’নে তো নাই।

গায়া বাড়ী বুম্বিয়া কোথাও ক’নে মিলিল না।

(ক্রমশঃ)

“শ্বরূপ ত্রাখিও, হ্রাস খাটলে শ্রী বার্ডকা উপস্থিত হয়, অঙ্গী,
কোষ্ঠবদ্ধতা, পাকস্থলীতে কত (gastric ulcers) এবং হৃষ্টকত
(cancer) ও আব (tumour) রোগের সৃষ্টি হয়। খাদ্য বিশেষব্রজগণ
বলেন যে, শস্ত-খাদ্য (ভাত, ভুটি), ফল, শাক-সব্জী, পর্বাণ্ড পরিমাণে
দুধ, পনির, ডিম ইত্যাদি সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক খাদ্য।”

—D. A. R. Aufranc



প্রশ্ন

(১)

“Surplus Value” ও “Relative and Absolute Surplus Value”-র বাঙ্গালা প্রতিশব্দ কি?

শ্রীবিনয় দাশগুপ্ত

(২)

কর্ডাভা সন্দ্রহারের প্রবর্তক কে? তাঁহাদের শ্রীত্বান কোথায় এবং তাঁহাদের বর্ণাশ্রমের পদ্ধতি কি? উক্ত বর্ণাশ্রমবর্গী কোন ব্রহ্মিত গ্রহ আছে কি না?

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ পাল

(৩)

কান্দলে চোখে জল আসে—কেন?

শ্রীঅনিলকুমার সরকার

(৪)

‘বঙ্গদেশ’র নামটি কি অতীতের হইয়াছে? ইহা কত প্রাচীন? রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে বঙ্গদেশের নামোল্লেখ আছে কি না? পুরাকালে বঙ্গদেশের সীমানা কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল?

শ্রীসুধাংশুকুমার দত্ত

(৫)

করেন, ধরেন প্রভৃতি বাঙ্গালা শব্দে ব্যাকরণের বাক-বিধান অতীতের ন হানে? হয় না কেন?

শ্রীনিহাররঞ্জন মিত্র

উত্তর

(১)

আমিচ সংখ্যার তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর—

‘ভোমার গদা পার হইয়া উঠিত নর’—এই বাক্যটি ভাববাচ্য। ইহার পরিবর্তিত বাচ্য—

তুমি গদা পার হইও (বা হ’ও) না—অহঙ্কা

তুমি গদা পার হইবে (বা হ’বে) না—বিধিগ

শ্রীশিশিরকুমার মুখোপাধ্যায়

(২)

আমিচ সংখ্যার চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর—

সুন্দরবন—এই বন “সুন্দরী” গাছ বিশিষ্ট জঙ্গল বলিয়া ইহার এই নামকরণ হইয়াছে। চট্টগ্রামের সমুদ্র উপকূলস্থ বন সমুদ্র-বন নামে অভিহিত ছিল; ইহারই অপভ্রংশ সুন্দরবন। ১৪৫৯ খৃঃ এই বন আবিস্কৃত হয়।

শ্রীসুধাংশুকুমার দত্ত



অর্থনীতি—

- বর্ষমান—ঈশনাথপোপাল সেন
(প্রবাসী—আষাঢ়, ১৩৪০)
শ্রমের মর্যাদা—হাভেলীর পরামর্শ—
আচার্য্য ঐহুমল্ল রায়
(প্রবাসী—আষাঢ়, ১৩৪০)
রেল বনাম মোটর-প্রজিবেশিতা—
ঈ—(বঙ্গঈ—আষাঢ়, ১৩৪০)
ব্যাঙ্কের কয়েকটি নুতন—
ঈবোলেচর সেন
(জীবন-বীমা—আষাঢ়, ১৩৪০)
বিশ্বব্যাপী অর্থগত—ঈশ্বরেন্দ্রনাথ প্রসাদ মিত্র
(প্রবাসী—আষাঢ়, ১৩৪০)

সমাজতত্ত্ব—

- কেন দৃষ্টিতে অশুভতা—
ঈশ্বরগুপ্তা লালসুখা
(ভারতবর্ষ—আষাঢ়, ১৩৪০)
যদিও প্রবেশে সনাতনী মতবাদ—
ঈহুঁকনাথ তত্বেচার্য্য
(ঐবর্ডক—আষাঢ়, ১৩৪০)
বিশ্ব অধঃপতন কেন?—
ঈশ্বরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী
(মাসিক মোহাম্মদী—আষাঢ়, ১৩৪০)
পরিবর্তন বা পরিবর্তন—
ঈপ্রবন্ধনাথ তর্কভূষণ
(উত্তরা—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)
অশুভতা—আচার্য্য ঐহুমল্ল রায়
(পুষ্পপাত্র—আষাঢ়, ১৩৪০)

জীবন-চরিত—

- পণ্ডিত শ্রীমদেবপ্রসাদ বিজ্ঞানবিনোদ—
ঈবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
(ভারতবর্ষ—আষাঢ়, ১৩৪০)
মৈত্রী তীর্থদত্ত মহাবীর—
ঈবিমলাচরণ গাঙ্গুলী
(ভারতবর্ষ—আষাঢ়, ১৩৪০)
বসিকরুণ মলিক—
ঈযোগেশচন্দ্র বাগল
(বঙ্গঈ—আষাঢ়, ১৩৪০)
অধিকাচরণ উকীল—
ঈহুধাও বিকাশ রায়চৌধুরী
(ক্রাইট্‌ স্ট্রিট—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

ভ্রমণ ও দেশ-পরিচয়—

- সিংহলের চিত্র—ঈমণীজুহুগুণ্ড
(প্রবাসী—আষাঢ়, ১৩৪০)
প্রত্যাভর্তন—ঈকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়—
(প্রবাসী—আষাঢ়, ১৩৪০)
অগ্নিগর্ভ মাকুরিয়া—
ঈপটুগোপাল মুখোপাধ্যায়
(ভারতবর্ষ—আষাঢ়, ১৩৪০)
তীর্থকামীর পত্র—ঈনিকুপমা দেবী
(ভারতবর্ষ—আষাঢ়, ১৩৪০)
উদয়-পথের সহযাত্রী—
ঈতিথিরবরণ তত্বেচার্য্য
(ভারতবর্ষ—আষাঢ়, ১৩৪০)

আত্ম-ঐক্যরচন দত্ত

- (প্রবর্তক—আষাঢ়, ১৩৪০)
 সাতসাগরের পারে—কুমারী অমলা নন্দী
 (বঙ্গী—আষাঢ়, ১৩৪০)
 নিগনের ঘাটী—ঐপ্রবোধচন্দ্র বাগচী
 (উত্তরা—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)
 পানীরের রূপলোক—
 ঐবামিনীকান্ত সেন
 (বঙ্গী—আষাঢ়, ১৩৪০)

টানের স্বতি—

- ঐকেশবরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
 (বিজিতা—আষাঢ়, ১৩৪০)

বিজ্ঞান—

- ক্রমবিকাশের সমতা—
 ঐশশাঙ্কশেখর সরকার
 (প্রবাসী—আষাঢ়, ১৩৪০)
 তরল বায়ু—মোহাম্মদ ইস্‌হাক
 (মাসিক মোহাম্মদী—আষাঢ়, ১৩৪০)
 বিজ্ঞানে অনির্দেশ—
 ঐশিশিরকুমার মিত্র
 (বিজিতা—আষাঢ়, ১৩৪০)

ইতিহাস—

- মহাত্মারতে ভারত-বৃদ্ধ কাল—
 ঐবোধেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি
 (ভারতবর্ষ—আষাঢ়, ১৩৪০)
 বঙ্গের স্বকীয়-প্রভাব-প্রবেশের দ্বারা—
 বুদ্ধদেব এনামুল হক
 (মাসিক মোহাম্মদী—আষাঢ়, ১৩৪০)
 গ্রীক ইতিহাসের স্বকীর্ণ—
 ঐকুপেন্ড্রনাথ দত্ত
 (প্রবীণ—আষাঢ়, ১৩৪০)

সাহিত্য—

- বাংলা কবিতার প্রথম অভিভাষক হুদ—
 ঐআফতাব ভট্টাচার্য
 (ভারতবর্ষ—আষাঢ়, ১৩৪০)
 প্রাচীন মুসলিম বঙ্গ-সাহিত্য—আবুল করিম
 (মাসিক মোহাম্মদী—আষাঢ়, ১৩৪০)
 উপভাসে জাতীয় আদর্শ—
 মোহাম্মদ আব্দুস সৌদুরী
 (মাসিক মোহাম্মদী—আষাঢ়, ১৩৪০)
 ভারতীয় সাহিত্যে ভারতীয় সমাজের ছায়া—
 ঐঅমৃতলা দেবী
 (প্রবাসী—আষাঢ়, ১৩৪০)

- বর্ণপরিচয়—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ—
 ঐকমলাকান্ত বসু
 (অর্কনা—আষাঢ়, ১৩৪০)

- গল্প বনাম উপভাস—
 ঐবীরেন্দ্রলাল ধর
 (অর্কনা—আষাঢ়, ১৩৪০)
 সাহিত্য-প্রসঙ্গ—ঐকালিদাস রায়
 (পুষ্পপাত্র—আষাঢ়, ১৩৪০)

- কাব্যের কথা—ঐরুকমিলা দেবী গুপ্ত
 (অনুদয়—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

- বাংলার পারদীক বঙ্গ—ঐবটরুক ঘোষ
 (বঙ্গী—আষাঢ়, ১৩৪০)

শিক্ষা—

- সাধনা ও সিদ্ধি—ঐরমাপ্রদাস চন্দ্র
 (অনুদয়—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)
 নিরন্তরতার বিরুদ্ধে অভিযান—
 কুমার সুব্রত দেব রায়
 (বিজিতা—বৈশাখ, ১৩৪০)
 শৈশব চাই—ঐমহেন্দ্রচন্দ্র রায়
 (অনুদয়—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

অসাধারণ

শ্রীপ্রবোধকুমার সাখ্যাল

কত বড়ই তোমরা শোনালে, পুনি হ'লে শুনে শোনাম।
কোনোটায় বস, কোনোটায় তব। জীবনকে জানবার
আগ্রহ তোমাদের প্রবল, তোমরা চেষ্টা মানব-চরিত্রের
সকল রহস্যকে উন্মোচিত কর্তে—

একখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের একটি তৃতীয় শ্রেণীর
কামরায় বসিয়া প্রায়-মুহুর্ত এক ভদ্রলোক এই কথাগুলি
বলিয়া তাঁহার সঙ্গীদের মুখের দিকে তাকাইলেন।
সঙ্গীরা নবাই হুবক, সম্ভবতঃ পুন্ডার অবকাশে
কনসেন্স টিকেট লইয়া তাহারা পশ্চিমে ব্যহির
হইয়াছিল। কিরিবার পথে মাঝ ফটা দুই আসে
এই মুহুর্তে সহিত তাহাদের পরিচয় ও আলোচনা।
ভদ্রলোকটির বয়স পঞ্চাশ কি ষাট—তাঁহা কাঁচাপাকা
চুল সেখিয়া সহজে ঠাছুর করিবার উপায় নাই।
মধ্যমণ্ডে কখনও তিনি উঠিয়াছেন, কখনও পালে আসিয়া
বসিয়া হোকারাসের গল্প শুনিতে শ্রুত করিয়াছেন,
অথচ একজন কোনো চাকলা প্রকাশ করেন নাই
—কখনও এক কোথায় তিনি নাশিবেন, তাহাও
ইহাদের অজ্ঞাত।

ছেলেরা কহিল, আপনি এমনিই নিঃশব্দে শুনিছিলেন
যে, আমরা ভাবি ছিলাম আপনি ঘুমোছিলেন এতক্ষণ,
বলিয়া তাহারা হাসিল। পুনরায় কহিল, এতটা পথ
বেতে হবে, আমরা চারজন বাহিরে খেচি—কে ক'টা
গল্প শোনাতে পারে। আমাদের বিষয়বস্তুটা হঠাৎ
মানুষের জুরীখা দিকটার প্রতি ইঙ্গিত করা।

—জুরীখা যদি হয় তবে তার কোনো ইঙ্গিত নেই।
আমি বলি শুটা জুরীখা। এই বলিয়া ভদ্রলোকটি
শ্রুত করিলেন, মাঝে ও নিম্নেই দৃষ্টির এই অনন্ত
বহ্যাব্যবহার এক একটি 'নিম্নবল', তাদের চরিত্রকে
দু'য়ে বিশ্বের বিপুল বিস্তৃতিক আমরা অন্বেষণ করি।

কপের পারে বস, কখার পারে বাঁধনা, কুলের পারে
সেমন গছ। কিন্তু আমি তোমাদের যে-পল্লী শোনাবো
সেটি অত্যন্ত মানসিখে, সরল এবং সহজবোধ্য।
মন-প্রবের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা অথবা মানব-চরিত্রের
জুরীখ রহস্য—এ দুটোর কোনো প্রবেরই তাকে ফেলা
চলে না।

রাত্রির অন্ধকারে চলন্ত ট্রেনের মধ্যে বসিয়া তার
মোড়া কোঁকুৎসময় দৃষ্টির সম্মুখে ভদ্রলোক তাঁহার
গল্প কবিলেন।

• • •

গোমো : প্রায় পশ্চিম বহুর আগের কথা।
তখনো আমার জীবনে অভিজ্ঞতা আহরণের পালা
চলেচে, চোখে তখনো নির্বিড় কোঁকুৎসময় রঙ
মাথানো, সজ্জিত জ্ঞানের গর্ভে তখনো পৃথিবীকে
কল্পনা কর্তে শিথি নি। সেখিনো এমনি ট্রেনে
চলেছিলাম। পথে বার দুই গাড়ী বদল কর্তে হয়।
বেলা অপরাহ্ন : প্রান্তরের পারে অন্তর্গামী হুগোর
কিরণে দিনান্তকালের আকাশ রঙীন হ'লে এসেচে।
কি-একটা ট্রেনে গাড়ী এসে থামল। রাত্রির ভিত্তি যুগ,
ভিত্তির গোলমাণ চলে, বাইরে নানা কণ্ঠের আবেগগনে
সমস্ত ট্রেনটা তখন মুখরিত। ট্রেন অন্ধকণই থামবে।
এমন সময় গোমো গেল বাইরে একটা হৈ চৈ।
ভিত্তি পার হ'লে গাড়ী থেকে নেমে সমস্তটা জানুয়ার
চোঁটা আমার ছিল না, কেবল বোকা গেল ট্রাইক্লমের
ভিত্তি একটি ভদ্রমহিলা ও একটি হুবক ব্যাকুল হ'লে
কাকে বেশ খোঁজাখুঁজি কর্তে; প্রত্যেক কামুয়ার
পরমাণু-পরমাণু তাঁরা মাথা কুটে কিংকটন, কি-একটা
নাম ধ'রে সমস্ত ট্রেনে তাঁরা হাঁকাহাঁকি কর্তে।
গাণ বেমন হারায় মাথার হাণি, চক্ৰবাক বেমন খোঁজে
তার সান্দীকে, বড় বড় বেমন পাগল হ'লে ফেলে

তার চতুর্ভাবকের অধেষ্টন—সে কি তোমাদের জানা আছে? আমিও হাথুর মতো ব'লে আত্মীরের জন্ত আত্মীরের এই ব্যাকুলতার দিকে নির্ভীক হ'য়ে চেয়ে রইলাম। ঝাঁপে বাজিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিল।

গাড়ী চলে। অপরায় সেল সোহ্মিত, সোহ্মি সেল সন্ধ্যায়। একটা অস্ট্র কোলাহল শুনে মুখ কিরিয়ে সেখি একখানা বেকির ডলার মালপত্রের খিচিরি তিডর থেকে একটু দুবতী বেয়ে অতি কঠে বেরিয়ে আস্ভার চেষ্টা কর্চে। গাড়ীর ভিতরে পশ্চিমা এবং মুসলমানের সংখ্যাই বেশি। তাদের করো। পা, কারো হাত, কারো বা মিনিসপত্র নির্দিষ্টভাবে চেষ্টাটুলে সরিয়ে যেয়েট গা কাড়া দিবে উঠে পাড়ালো। তার এই বহুভব আত্মবোপন, এই চৌখ্যবৃত্তি ও চুরতপনা দেখে মনেকেই চকল হ'য়ে তাকে নানা প্রশ্ন কর্চে লাগ্লে। বরদা তার কাশ নয়, চেহারাটা তার নিরাপদে চলবার মতোও নয়। উঠে পাড়ালেই আমার প্রথম চোখে পড়্লে তার পরনে একখানা সপ্পাকৃ বৃত্তি এবং মাথার বাঁধিত চুলের মাফতানে চগড়া সিঁচুরের দাগ, যেম নববর্ষার ঘনায়মান আকাশ বিদ্যুৎবহির্নিখার খিখিত হ'য়েচে। কোনো প্রশ্ন ও কোলাহলের সিকেই সে ভ্রম্বেপ কর্লে না, সমস্ত গাড়ীর ভিতরটায় চেয়ে চেয়ে একসময়ে হেসে হঠাৎ আমাকেই তার কথা কইবার মাহুৎ বেছে নিল। বল্লে, 'ওরা চ'লে গেচে মনেন? বা আর দাদা?'

বিস্ময়ে অভিকূত হ'য়ে পড়েছিলাম, চোক গিলে কি-একটা উত্তর সেবার আগেই বেকের উপর দিয়ে চপ্কে মেয়েটি কাছে এসে বস্লে। হাতের মধ্যে ছিল সামান্য একটা বিছানা। গাড়ীর বাতীরা তাব্লে আমি বৃত্তি বা তার পরিচিত মাহুৎ, নানা মটলা ও কান্যাকনি স্ব'রে এক সময় তারা নিরস্ত হ'লো।

'এত সেল পালিহে-পালিহে জুরেচি তু' জবের বিশ্বাস, একলা বেকলে পণ্ডে-খাটে আমার বিশদ ঘটবে,—কিছুতেই ছাড়্তে চায় না। সকল, বিছান্যটা পেতে বসি।'

অতি চকল তার চোখের চাহনি, কিন্তু সে-চাহনি কোনো চট্টলবতাবা নাত্রীর নয়, সে-চাহনি আধ-পাসলের মতো অস্থির। বিছানা পেতে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'লে সে এক হাতে মুখের উপর থেকে চুলগুলি সরিয়ে দিল। বার বার মুখের উপর থেকে ঝাঁকিয়ে চুল সরিয়ে দেওয়া তার একটা মুদ্রাণোষ। বল্লাম, 'টিকিট্ কর্চেন?'

'কহ্লেই হবে এক সময়, আমি ও আর কীকি মেবো না, কাছে অনেক টাকা আছে। হাতে এই বালা, পলার রয়েছে হার, তাবনা কি? তা' ছাড়া সব মেদের ষ্টেন্দ-মাত্রাররা আমাকে চেনে।' ব'লে সে একবার হাস্লে।

পরম প্রশ্নরী নয়, কিন্তু সে-প্রশ্নের চারিদিকে ছিল একটা অনির্কচনীয় ঘোড়িম'ওল, তার ভিতরে সাধারণের প্রবেশ-নিষেধ। আপন ইচ্ছায় হুনিয়াকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় এমন বেয়ে তোমরা মেখেচ? তার সাধারণ সেই চগড়া সিঁচুরের দাগ শুধু যে সময় জাগায় তা' নয়, মাহুৎকে তার কাছে অবনত করে, মনে মনে কেমন একটা ভর এনে দেয়! তার চোখের উপরে চোখ রাখা যায় না।

এক সময় জিজ্ঞেস কর্লাম, 'কতুরে যাবেন?'

'টিক নেই, সেখি না গাড়ীখানা কোন্ দিকে যায়!'

আগনি যাবেন কোথায়?'

বল্লাম, 'সেবিনাথ হ'য়ে যাবো—'

'সেবিনাথ? ও, এই সময়ই ত সেখানে মেলা বসে,—চলুন, শুই দিকেই বাওয়া যাক্। হাঁটাচাপে কিন্তু, হাঁটতে পার্বেন, কঠ হবে না? শখে ভাল খাবার-দাবারও পাওয়া যায় না, তারি বিক্রি লাগে।'

কথা বলার এই কে-পরোয়া ভঙ্গী দেখে আমি আড়ত হ'য়ে বসেছিলাম। এ-পাশলের সঙ্গে কি কথা বলা চলে? মনে হচ্ছে যদি কোথাও সতের দিল না হয়, তা' হ'লে এখনি অশমান কর্চেও এ-মেয়ে হস্ত বিখ্য কর্বে না। উজ্জল চক্, হৃদয় সুখী, বেহ-সেপ-হীন কক্ কল, বলিষ্ঠ মেহ—পাখর কেটে বিখ্যাতা গড়েচেন

সে-সেই। যুব তুলে তার সঙ্গে কথা কইতে গেলে যুগে একটি ভীষণতা ছুটে ওঠে।

সকল কথা আম তোমাসের বল্লভ পার্বো না, পুথ্যাহুপুথ্য মনেও নেই, শুধু আছে বসি। চিত্রটা নেই, কেবল আছে রঙ—জলে যোরা রঙ। বলিয়া ভদ্রলোক একটু থামিলেন। নত্ন বাহির করিয়া নাকে লইয়া পুনরায় কহিলেন, ইসলামপুরের ঘাটে এসে পাড়ী পায়লো। ইং, বল্লভে তুলেচি মেয়েটির নাম চাকবালা। তার নাম যে চাকবালা একথা সে কথাক-কথার অন্তত পঠিন বার আমাকে জানালো। পাড়ী থেকে নেমে আমাকেই সে পথ সেধিয়ে বাড়ীশালার নিয়ে এল। অনেক গ্রী-পুত্ব জমেচে। রাত কাটিলে সকালে উঠে সবাই ধুবুে ইমার; সকলেরই পতি সৈবিনাথের মেসার দিকে। লোকজনের হাত-পা মাড়িয়ে, পাপ কাটিয়ে, এঁকে বেকে বাড়ীশালার একান্তে একটু নির্জন ভাঙ্গায় সে এসে থামলো। এ বেন তার অভ্যাস,—সমস্তটাই তার পরিচিত। নিঃশব্দে তার বিলি-বাবহাকে বেনে নেওগা ছাড়া আমাক আর গতাত্তর ছিল না। আমি তখন কেবলমাত্র অভিভূতই নহ, আপন ব্যক্তিত্বকেও হারিয়ে ফেলেচি। হারাবারই কথা; সেই রাত, আসে পাশে সেই হুটীভেদ অন্তকার, বাড়ীশালার সেই ক্রমবিলীয়মান কলরব, ভিমিত আলো—তাদের মাকথানে এসে সেই অভ্যন্তরুশলীয়া রহস্যময়ী হুত্ববীর অঙ্গুলি-নির্ধে—জানিয়ে এরকম ঘটনা তোমাসের জীবনে ঘটচে কি না।

‘ভায়রটা রাধবেন, আমি আসচি!’ এই ব’লে হাতের বিছানাটি আমার বিছায় রেখে চাকবালা একবার অতৃত্ব হ’ল। কী অস্ত্রাত সে, কী তার উদাম! কিরে এখন এল, তার হাতে একরাশি ধাবার। নিঃসঙ্কোচে ছ’ভাগ করলো, এক ভাগ দিল আমার দিকে এদিয়ে।

‘ওই বা, জল আনা হয় নি। দিন বেধি আপনার কণ্ডপুটা!’

ধেবার অপেক্ষা সে রাধলো না, হাত বাড়িয়ে

কণ্ডপুটা নিয়ে সে আবার জল আন্তে ছুটলো। জল এনে রেখে পরিষ্কার সহজ কর্তে বল্লল, ‘ধাবারের মকন তিন আনা আপনি আমাকে দেবেন।’ —কোনো দ্বন্দ্বোচ, কোনো অস্কারণ চকুলুজা এবং সামাজিক সৌক্য তার নেই।

সে-রাত কাটলো। ভেবেছিলাম একটু আলাপ করব, তার কথা জানুবো, তার এই বাধাবন্ধনহীন জীবনের আসল কথাটা শুনে নেবো, কিন্তু হুযোগ পেলাম না। আমিভাগিনী মেয়েটি সেই-যে বিছানা পেতে শুয়ে চোখ বুজলো, আর মাংশো না, নিশ্চিত নির্ভরতার পাশে শুয়ে অন্তঃকণের মরোই তার নাক জেকে উঠলো।

প্রত্যতে ইমার ছেড়ে বেলা ন’টা আশ্বাস পারের ঘাটে এসে লাগলো। মাকথানে চাকবালা একবার অতৃত্ব হলো, ইমারে কোথাও তাকে পুঁজে না পেয়ে ঘাটে বেনে এলাম। ঘাটে এসেও প্রথমটা পাই নি। তবে কি চলে গেচে? ব্যাকুল চোখে গারিগিক হাতড়ে হাতড়ে কিহুচি এমন সময় দেখলাম, দান পেয়ে ঘাটের ধারে সে জপে বসেচে। সে কী জপ, বেন সে পাথর হ’রে গেচে! কতকণ পরে তার জপ শেষ হলো। তারপর উঠে এসে হুহুখে আমাকে দেখেই সে বিস্মিত হ’রে বল্লল, ‘একি, এখনো যে পাড়িয়ে? চ’লে যান্ নি?’

মাঝার সেই চণ্ডা সিঁহর জল সেপে আরো বেন উজ্জল হ’রে উঠেচে। সকালের রোদ এসে পড়েচে যুখে। হুকোমল সে যুখশ্রী। বল্ললাম, ‘আপনারি অপেক্ষায়—’

‘আমার অপেক্ষায়? বৈধাত আপনার কম নয়!’ ব’লে হেসে সে হুখাঃপ্রথমটা সেরে নিল।

বল্ললাম, ‘তা হ’লে আমি এখন যাই, আপনি আসবেন পরে।’

‘পাড়ান, পাগলের গুপ্তর রাধ করবেন না। মেয়েমাহুদক আশাটার কেলে রেখে স’রে পড়তে চান? আমি কী করেচি আপনার? —এখন বেধি বিছানাটা, নকর পাড়ী পর্যন্ত ব’য়ে নিয়ে চলুন।’

আমার হাতে বিদ্যানাটা নিয়ে ভিঝা কাপড়খানি হাতে নিয়ে গুণপাঠ করতে করতে সে আসে আসে চলতে লাগলো। ভিঝা চুলের বাশ থেকে টু টু ক'রে জল প'ড়ে তার পিঠের কাপড়টা তখন স্প স্প ক'রচে। এবারের সে শাড়ী পরে নি, আর একখানা নকশপাড় খুঁত। তাকে অহুসরণ ক'রে চললাম। কিছুদূর এসে পরর গাড়ী পাওয়া গেল। কয়েকজন বাড়ী ইতিমধ্যেই উঠে বসেচে, বারো জন হ'লেই গাড়ী ছাড়বে। বারো জন হলো কিন্তু গাড়ী ছাড়তে দেরি হ'তে দেখে চাকবালী বকাবকি করতে লাগলো। এমন চকল, এমন অধীর ঘেরে কু-ভারতে দেখা যায় না। ঝাঁঝে দিয়ে কপালের চুল সরায় আর হেসে-হেসে সকলের সঙ্গে গল্প শুরু ক'রে দেয়। কয়েকজন পশ্চিমা খ্রী-পুরুষ তার পরিচার হিন্দী ভাষায় রসিকতা শুনে হেসে পড়িয়ে পড়তে লাগলো। যেমন সহজ তেমনি সাবলীল। একসময় উদ্ভাস্ত হ'লে সে ছইয়ের ভিতর থেকে নেবে পড়লো। চোখ রাঙা ক'রে হিন্দী ভাষায় জানাশো, 'চড়'বো না তোমার গাড়ীতে, আমার সময়ের দান আছে। পরশা দিলে কত গাড়ী মিলবে।'

ভিঝা কাপড় আর বিদ্যানা নিয়ে সে হু হু ক'রে চলতে লাগলো। গাড়োয়ান ছুটলো তার পিছনে-পিছনে। অনেক দেখে ভাল কথায় বুঝিয়ে তাকে আবার ফিরিয়ে আকুলো।

গাড়ী যখন ছাড়লো তখন সে ভিঝা কাপড়খানা ছইয়ের উপরে টাঙিয়ে রোদের দিকটা আড়াল ক'রে দিল। বসল, 'কি দেখলে বোকার মতো, ভাল হ'রে বজ্রন।'

একটি বুঝক হঠাৎ এই সময় বলিল—তারি বুঝরা মেয়ে ত ?

—ওখু বুঝরা ? ভয়লোক কহিলেন, বাচাল, বেয়াবন, মাকে-মাকে তার অমার্জিত অস্ত্র মস্তব্য শুনে গায়ের রক্ত আমার আঙন হ'রে উঠ'ছিল। নারীর 'স্বচ্ছ মনের লাগণ্য আর সলজ্জতা তার

বিশ্বমাত্রণ নেই। এমন একটা উদ্ধত, বেয়াড়া মেয়ে আমি জীবনে দেখি নি। কোনো মেয়ের দাঁবনে যদি শৃঙ্খলা না থাকে তবে তার চেহারা হয় কী ভয়ানক ! হ্যা, শব্দটা ছই বাগে অষ্টভুজার মণিরের ধারে এসে গাড়ী ধাঁড়ালো, এইখান থেকেই পাংড়ী হাঁটা পথ। মণিরের কাছে প্রকাণ্ড এক আশ্রম, সদায়তাপ্তি করেকজন সন্ন্যাসী এখানে ভগ্নতা করেন। চাকবালী নেমে এসে বলল, 'আশ্রম, দেখিয়ে দিই আপনাকে, এই আমার গুজবাড়ী।' বামিজীকে দর্শন ক'রে যাবেন ?'

বললাম, 'না, আপনি খুঁর আশ্রম, আমি এখানে ধাঁড়াই।'

'এই যে,—বলি, কি সো সবতের মা, এই যে বড়পিলী,—তোমরাও এসেচ দেখচি।' বামিজীম এই দিক দিয়ে, ভাবলাম গুজবেবকে একবার দেখেই যাই। চলো।'

একরল খ্রীলোকের সঙ্গে চাকবালী ছুটে গেল। তারা পরস্পর হাসাহাসি ক'রে বলতে লাগলো, 'ওমা, কি হবে সো, পাংলী আবার কোথা থেকে উড়ে এল না ?' সিঁছর দিয়ে মাথাটা বে জুবড়ে রেখেচিন্ বুধশুড়ি ? এখনো মতিপতি করে নি ? ক'বছর হলো ?'

একে-একে সকল বাড়ী হাঁটতে হাঁটতে চললো, হুলোর আর রোসে আমি রইলাম ধাঁড়িয়ে। সে যে কী আকর্ষণ, কী মোহ তা' আর তোমাদের বোকাতে পাক্কা না, আমি তার অন্তে সব হারিয়ে যেউলে হ'রে গেছি !—এ রোমাঞ্চ নয়, প্রেম নয়, একটা প্রবল ইশ্‌হান্দ, একটা হুঃস্র !

ছেলেরা কহিল, আর তার দেখা পান্ নি ?

—কিছুকাল পরেই দেখা পেলাম। বৃদ্ধ বলিলেন, হতাশ হ'রে ভাব'চি, আর কেন ? অনেক দূর পথ, এবার আসে আসে যাই। কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে এসে বা' দেখলাম, আমি একেবারে বিশ্বয়ে হতবুদ্ধি ! বর্ণমালায় লিপ্যনে ব'লে চাকবালী নিঃশব্দে চোখের জল

কেন্দ্রে। বহন আমার অঙ্গ, প্রায় তারই সমবয়সী, নারীর অকৃত্রিম আঁচনী সইতে পারিনি, সমস্ত মন আমার সমস্ত ব্রতীকৃত হ'য়ে এল। কাছে গিয়ে বললাম, 'কি হলো এর মধ্যে, কান্ডেন কেন?'

'আপনি বাম, আমি আর দুখ দেখাবো না। কাঁচ কাছে।' ব'লে সে দানানে উপকৃত হ'য়ে গ'রে আবার কুল-কুলে কান্ডে লাগলো। কিন্তু আমি সেলাম না, কোথাও যাবো তাকে কেনে? আমার তখন সব হারিয়ে গেছে! চূর্ণ ক'রে তার পায়ের কাছে ঠাকিয়ে বইলাম। অশ্রুতে অভিমানে কন্ধকটে একদমের সে বসল, 'আমাকে কোনো অধরোপ করবেন না, আমি এইখানে জীবন নিয়ে প্রারম্ভিত ক'রে যাবো। সবাই আমাকে অপমান করবে, আমি কি এতই হীন? যে-কলর কাছে য় নিজেটি তাঁর অজ্ঞোপ বেষ্ট্রার অধিকার আমার নেই? তোমরা ব্রাহ্মণ, আমি না-হয় তাঁতীর মেয়ে! বেশ, আমি তাঁতী, আমি চণ্ডাল, আমি ডোম, আমি...' অতোরে আবার সে কান্ডে লাগলো। '—আজ বুললাম যে, আমি ছোট ভাতের মেয়ে, আমি হীন, কুৎসিত; তোমরাই বড়, তোমরাই মাজ!'

বহু ক্ষেপান্তির পর সে চোখ মুছে উঠে বসলো। ছ' একটা কথা বলতে সেলাম কিন্তু সে গ্রাহ্য করলো না। নিষেধ মনে উঠে ভিনিদগ্নর নিয়ে সে কোনো-দিকে না তাকিয়ে পথে নামলো। স্বঘাতের রোগে চারিদিক তখন চাঁ চাঁ করছে। হৃষের উপর থেকে চুল পরিয়ে সে নিঃশব্দ পথ ছাটতে লাগলো।

শ্রুতির শেষ। সন্ধ্যের ছোট একটি পাহাড়ী নদী পার হ'তে হবে। নদীর ধারাটি অতি শীর্ণ, সহজেই ছেঁটে পার হ'য়ে সেলাম। নদীর পারেই পাহাড়ের পথ। চাকুলা আশে-আশে কিছুই এগিয়ে পাহাড়ের অনেকখানি অতিক্রম ক'রে সেল। পিছনে সে চাইলো না, আমার সঙ্গে বন্ধুত্বের কোনো মূল্যই সে দিল না, অতএব তাকে অহংসর্য করার প্রবৃত্তি আমারো আর ব্রইলো না, আমি চললাম বীরে-বীরে। পাহাড়ের এক একটা বাক বহু দূরে তার ক্রতগতিশীল লীলাবিত

বৃত্তিটি দেখতে পাচ্ছিলাম, সে অস্ত্রাচ চলেছে, কোথাও থামতে না, তাকে যেন পেয়ে বসতে এক অবিরাম জ্যার নেপা! আমি তার কাছে হার মানলাম।

হেলেনা কহিল, এখানেই শেষ?

আর একবার নত লইগা বৃদ্ধ করিলেন, এখানে শেষ হ'লে মন হ'তো না, কিন্তু তা' হয়নি। শেখটুকু সামান্যই, খুব সামান্য, জলের মতো সহজ। তার চরিত্রের খেটুকু অশপটতা সেইটুকু আমার কাছে বহু হ'য়ে গেছে। বলি যোনো—

সাত আট মাইল পাহাড় জেতে সন্ধ্যার প্রাকালে এক নদীর তীরে এসে পৌছলাম। নদীর স্রাব, শ্রিত ধরেছে। কাছেই ছোট একটি বর্ণাশালা, কিন্তু যাত্রীর লক্ষ্যে এত বেশি যে জাঙ্গা দুলান হলো না। নদীর ধারে কয়েকটা দরকারি তাঁবু পড়ছে, সেখানেও স্থান নেই। এখানে-ওখানে আগুন জালিয়ে যাত্রীরা রাত্রা করছে বসে গেছে। আশে-ভাষে এসে হরত আশ্রয় ছুটতে। নদীর চকাতের বাত কাটানো লাকার ক'রে কয়েক পা এসেতেই পানের তাঁবুর তিতর থেকে চাকুলায় পলার মাঞ্জাষ সেলাম।

'এই যে, আহন আহন, মাজগা পান নি বৃত্তি?—তা' ত দেখতেই পাচ্ছি। এত দেবী হলো আসতে? আধা, ইটা অতোপ নেই কিনা, তারি কট পেয়েছেন, কেমন?'

তার সার অত্যর্থন্যর তীত ও প্রতীত হ'য়ে সেলাম। যে-মনে সে কাছে জেকে নেয়, সেই মনেই সে অকারণে মাহ্মকে বিভাঙিত করে। বললাম, 'মাজগা হবে?'

'হ'তেই হবে, আহন, নৈলে এই রাতে যাবেন কোথায়? এইটুকু তাঁবুতে বৃত্তি করেন ওপর পোক। এই খুঁটিটার কাছে একটু মাজগা হ'য়ে যাবে। খাওয়া-মাঞ্জার কি ব্যবস্থা?'

'রাত্রা ক'রে নেবো।' ব'লে তাঁবুর মধ্যে ঢুকলাম। তিতরটা যেন মন বিশেষের খোঁজাড়া। কোনো ক্রম এক জাঙ্গার কোলাটা নামিয়ে বললাম, 'আপনার আহারাদি?'

‘ওই বে, বাইরে মহারাজ-বী রাজ্য চকিরেচে।’

‘মহারাজ আবার কে?’

চাকরালো কলকণ্ঠে হেসে উঠে তাঁবুর ভিতরটা সুবরিচ ক’রে তুলে। বসলে, ‘নতুন বন্ধ। এমন সবিনয়ে পথের মাঝখানে আলাপ করলো যে, মেয়ে-মাজুরের মন, তখন খুঁসি হ’য়ে গেলো। যেখ, ভাল, চরপথ পথে সঙ্গে একটা পুরুষ মাহুত থাক। মন কি? জমো ও মহারাজ?’

তখন অচকার হ’য়েচে। বাইরের খোলা আয়নার বেখানে আগুন জ্বলে রাজ্য হ’ছিল সেখান থেকে শুকনটীর কণ্ঠে জবাব এল, ‘কেও জি?’

‘চাওল বোলুতা হার?’

‘জি।’

আমার দিকে দ্বিরে হেসে চাকরালো বললে, ‘কী নিঃস্বার্থ বন্ধ বন্ধন ত, এমন সেখানে কোথাও? জল এনে দিল, রাজ্য ক’রে দিলে, পথে গুলিরেচে ভগ্ন-পান, আমার সুখ-সুবিষের দিকে কড়া নম্র, কিসে আমি খুঁসি হই—যদি আপনি, আর সেই কব্জের না, ভাল আর আলু এনে ভাতে-ভাত চকিরে দিন, লারামিন ত উপবাসেই কাটলো আপনার।’

বর্ষাশায়ার সোকান থেকে জিনিসপত্র সংগ্রহ ক’রে আনলাম। ঈশ্বরের হাওয়ার অচকারে বাইরে থাকা এক ভয়ানক সমস্যা। কিন্তু উপায় নেই, পেটের খুঁখাটা সমস্ত জুখোঁদকে তাক্সিলা করচে। কাঁঠ এনে কয়েকখানা পাখর একত্র ক’রে আগুন জাল্‌বার চেষ্টা করলাম। উঠনটা ঠিক ছতলাই করত পাচ্ছিলে, ঝাট এত চাপা যে, জ্বলত চার না। সে এক বিষম বিপদ। ইতিমধ্যে মহারাজের রাজ্যবাসী হ’য়ে সেল, ভাট-ভরকারি নিয়ে সে ছুকলো তাঁকৃত। এককণ্ঠে হারিকেনের আলোর তার চেহারাটা দেখলাম। বসল তার পঞ্চাশ থেকে সত্তরের মতো, মাথার একমাথা টাক, গলার একটা তুলসীর মালা, মুখে লাফি-লাফ, হোট-হোট ছোটো চোখ। সবার সে চাকরালার কাছে হাতের জিনিসপত্র নানালো, চাকরালো তখন কল ও বিদ্যায়ার মধ্যে

অতি আরাধ্যে ব’লে অজ্ঞাত বাস্তবের সঙ্গে মধুরকণ্ঠে আলাপ করচে।

‘মহারাজ, বাস্তব সে সেও বাবুতো।’

মহারাজ বললে, ‘কোন বাবু?’

‘ওঁহা বো চাওল বনাতা, খেচারাকো। তুলসি-যোতা হার।’

মহারাজ অসঙ্কট দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে তাকিয়ে বললে, ‘তুলসি ত কখনো চাই, তীরখ-গুদালে, —বাস্তি কইসে বেই?’

‘তোবার মুখে আগুন, ইতর কোথাকার।’ ব’লে বিদ্যায় ও কল জ্বলে চাকরালো বাইরে এল, আমার হাত থেকে জিনিসপত্র ছিনিয়ে নিয়ে বললে, ‘সকল, মকদ্দার চিপি আপনি, এমন করে উঠন তৈরী করে? কার্টের আগুন জ্বলত জানেন না, কী জানেন জব?’

তিন চারখানা পাখর লাগিয়ে অতি সহজেই সে উঠন তৈরী ক’রে আগুন জ্বললো। বললে, ‘বার কাল তারেই সাথে, পুরুষ মাহুত কি আর রাজ্য ক’রে খেয়েচে কোনোদিন?’

ভাতের হাড়ি উঠলে সে চাপিয়ে দিল। বললাম, ‘তরকারি কিছু কব্জেন?’

মুখের উপর সে ধমক দিল,—‘তরকারি? ভারি গোল যে আপনার! বসে, বস্তুত পেলে গুতে চার। ভাতে-ভাতই হ’য়ে গুতে না, আবার তরকারি!’ তারপর সে হেসে বললে, ‘লোকটার কি হিসেবে দেখলেন আপনার ওপর?—আলোটা দিলে না!’

বললাম, ‘কিসে কেন? কী করলাম ওর?’

‘ভাবি স্তাধা আপনি।’ বসে সে হুঁ দ্বিরে কাঁঠ আলিয়ে দিল। আলোর দেখলাম, কার্টের খোঁয়ায় ইতিমধ্যে তার চোখ দুটি রাজ্য হ’য়ে উঠেছে, জল পড়চে।

অনেক সাহায্যই চাকরালো করলো। খাওয়া-পাওয়ার পর নদীতে বাসন মেঝে সোকানদারকে ছিরিয়ে দিয়ে বন তাঁবুর ভিতরে এসে ছুকলাম তখন বেশ রাত হ’য়েচে। পঞ্চমাত্র বাস্তবী বিপদ কেউ মেসে নেই। পাশাপাশি সবাই জ্বরে। চাকরালার পাশে মহারাজ।

চাকুড়া মাথাটা সে দরিতে এনেচে চাকুড়ার বিছানার কাছে। লোকটা একটু বেহ-বমতা চাহ।

‘আহা, বুড়ো কত গরুই কলো আমার কাছে। বৌ ম’রে বাবার পর থেকে সরিসী হয়েছে, অনেক বেশ গুরচে, কিন্তু জীবনে আমার মতো মেয়ে আর দেখেনি— এই সব।’

তার কথা শুনে মহারাজ মাথাটা উঁচু ক’রে বললে, ‘কেয়া বোন্তা?’

চাকুড়ার এক হাতে তার মাথাটা দাবিয়ে দিলে বললে, ‘বশতি যে, চুপ পাকুলেই, পুরুষ মাহুর বোকা হয়! বুকেতে গেলেও পক্ষি?’

মহারাজ অতি গুসি হ’লে আবার চোখ বুজলো। চাকুড়ার আবার বললে, ‘বুড়ো হয়েছে তবু মেয়ে-ছেলের ওপর কী চান দেখছেন?—তোমার কি আর কিছু হবে বাবা? ইচ্ছে হচ্ছে, তোমার দলী ঝিলে ভাতারাত্রি শেষ ক’রে দাবি! আচ্ছা, মহারাজ?’

মহারাজ মুখ তুলে হেসে বললে, ‘কেয়া?’

চাকুড়ারও হেসে হেসে বললে, ‘সেখান থেকে, আমার মাথা খান, এবার এর মতল চেঁহারাটা একবার দেখুন, যেন বুঝে ওয়। মুখে কী লোগুন কাঠালপাতা দেখেচেন,—এরাই আসে পুণ্যদল্লের! মহারাজ, তোমাকে কি শান্তি দেওয়া উচিত জানো?’

মহারাজ বোকার মতো অতি আনন্দে মাথাটা আবার উঁচু ক’রে তাকালো। চাকুড়ার চোখ দুটো তখন নপ্ নপ্ ক’রে ঝলচে। তবু সে হাসিমুখেই বললে, ‘মনে ক’রো না, যেদ্বার উঠে তোমার কাছ থেকে ন’রে যাবো, সে-মেয়ে আমি নই। কিন্তু আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জানো?—পরম শাঁড়ানি দিয়ে তোমার চোখ দু’টো উপড়ে ফেলতে!—হাচ্, শাঁড়ানি ও আর নেই হাতের কাছে, তুমি বেঁচে গেলে! কিন্তু যদি দরকার হয়, তোমার হৃৎকর ওপর ব’লে নথ দিয়ে তোমার গায়ের চাকুড়া ছিঁড়ে নেবো, বুকে বহু!’

তার ভিতরে সেই তিমিত আলোর চাকুড়ার

চেঁহারা দেখে আমার গা কেঁপে উঠলো। বললাম ‘ও একটু এগর পেলে মননি করুচে, আপনি না-হয় একটু ন’রেই যান না?’

‘যাবুন আপনি, ঠিক এমন ক’রেই পোষো এখানে, ভয় কিসের? সারারাত ও কেঁপে থাকবে, আর আমি নাক তাকাবো!’

বাইরে অন্ধকার, ঈতাক্ত বারি নী নী করচে। নদীর ওপারে বন, সেই বনে হাজা উঠে কড়ের মতো শব্দ আসুচে, তার সঙ্গে নদীর ভর ভর কলতান। বাতীরের কলরব নীরব হ’লে গেচে। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটবার পর চাকুড়ার বললে, ‘আপনার শোবার কঠ হচ্ছে, বিছানাটা দেখো?’

আবার সেই নাঁথের কলতান! হা না, কিছুই বলতে পারলাম না, চুপ ক’রে রইলাম।

‘সুমনে নাকি? এমন ঘুম ত কোথাও দেখি নি বাপু?’

বললাম, ‘বিছানা চাই নে, এইতেই হ’য়ে যাবে’। সে বললে, ‘আমার বিছানাটি দেখেচেন ত? একটু ছোট বালিশ, আর অল্প-পরানো একখানি কাঁধা!’

‘কখন একখানা আসলে পাবুচেন!’

‘না, এ দুটো হাড়া আর কিছুই আমি ব্যবহার করি নে। কি ঈত, কি পরম,—এই কাঁধা আর বালিশটি। আর ন’বছর এই দুটো আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে।’ দুই হাতে তার দিগে উপড় হ’য়ে মাথাটা সে তুললো। তিমিত দীপালোকে তার মাথার চকুড়া সিঁড়রের দানটা মন্ মন্ করুচে!

হৃৎকের ওপর থেকে চুপ দরিতে সে বললে, ‘আপনাকে বিছানাটা নিতে চাইলাম বটে কিন্তু সিতাম না, এ বিছানার আমি কাউকেই ওতে দিই নে। কেউ এর বোকা নয়!’

এইবার হুবিধা পেয়ে বললাম, ‘আপনার দাবী কোথায়?’

‘এই বিছানা তারই,—কিন্তু তিনি নেই!’

‘নেই, যানে?’

‘সে অনেক কথা। আমার বয়স তখন আঠারো, —বাগের বাড়ী থেকে আসছিলাম বড়বাড়ী। বড়বাড়ীর দরজার পা দিতেই ওন্যাম, স্বামী মারা গেছেন ক’দিন আসে।—এ কি হয় কখনো? হুত মাহুৎ রেখে গেলাম, জলজাঙ্গ মাহুৎ, সে বাবে ম’রে? ম’বা কি এতই সহজ? সত্যি বলতে কি, আমি সেদিন পাগল হ’য়ে গেলাম। সে ম’বে নি, তার ম’বার কথা নয়,—চক্ষিৎ বহুরের জাকা-বুকে। ছেলে। যদি সে ম’ব’ই, আমার কোলে তার মরণ হলো না কেন? তখনি ছুটলাম সেই মৃত্যুর পিছনে। মৃত্যু প’ড়ে বিবাহ হ’গেছিল, সে-ময় কি এত বড় মিথো? তাকে আমি ফিরে পাবোই একদিন, একদিন না একদিন তাকে খ’রে কেন্দুবোই!’

সেদিন কী রহস্যময় অন্ধকার রাত! জোমরা কখনো দেখেচ, নারীর আশ্র-প্রত্যয়ের চেহারা কেমন? ভিতরের স্রোতিঃ বাইরে আসে কেমন স্রোতিঃবর্তন হ’বে? জোমরা কোনোদিন সতী-নারীর দেখা পোয়েচ?

‘ফিরে পাবোই একদিন—’এই কথা বলতে বলতে চাকবালা রোমাক চলে। চোখে তার এল স্বপ্নস্মরণ, কণ্ঠে এল সঙ্গীত, তার রূপ হোল অপূর্ণ! সেদিন আর তাকে বিচার করি নি, বিশ্লেষণ করি নি, সেদিন তাকে অহুতব করেছিলাম। সে আমার বললে, ‘ন’বহুর কাটসো তাঁকে খুঁজে-খুঁজে। এই বিছানা তাঁর, এই বেহ তাঁর, আমি তাঁর, আমার দাঁ কিছু সমজই তাঁর হাতে প’লে সেবো ব’লে ছুটে চলেছি, আমাকে ছেড়ে তিনি কোথায় যাবেন বলুন ত? কত রূপে আমার দিন কাটে, কত বিপদে ...তিনি নির্দয়, আমায় তাঁর দেখা নেই!’ বলতে বলতে চাকবালার চোখে জল এল।

‘সমস্ত জীবন খ’রে লোকের ভিত্তি তাঁকে খুঁজে

বেড়াবো। পাবো না তাঁকে, খুঁজে পাবো না, বলুন ত আপনি?’

পাগল, পাগল, উদ্ভ্রান্ত মনে! তাঁতীর রক্ত তার মেখে, তাই হরত আমায় বলতে তার ইচ্ছাছিল!

• •

প্যাসেল্লার ট্রেনের গতি মগর হইয়া আসিল। রাত আর বাকি নাই। বৃদ্ধ ভ্রমশোকটি উঠিয়া গাড়াইয়া কহিলেন, পচিশ বছর আগের ঘটনা, শুধিয়ে বলা পেল না তাই। আশ্চর্য,—এই ট্রেনে আমাকে নামতে চবে।

ছেলোয়া ব্যত হইয়া কহিল, তারপর, তারপর? গাড়ী তখন থামিয়াছে। হ্রাস্টকশটা হাতে গইয়া তিনি কহিলেন, তারপর সকাল হলো। ঘুম ছাড়িয়ে আমি আর মহারাষ্ট্র উঠে ব’লে অবাক হ’য়ে দেখলাম, তাঁর মধ্যে কেউ কোথাও নেই। বাতীর দলের সঙ্গে চাকবালা জোর হায়েই পালিয়েচে আমাদের ঘেড়ে। বলিয়া ভ্রমশোক নামিয়া পড়িলেন।

অন্ধকারে গলা বাড়াইয়া একটি দুবক ব্যাকুল হইয়া কহিল, আর দেখা পানু নি? ও-মশাই?

দূর হইতে উত্তর আসিল, ‘না’

চারিজনই নীরবে বসিয়া রহিল। আবার গাড়ী ছাড়িয়াছে। কোথায় যেন তাহার ভাঙিয়া চুরবার হইয়া গিয়াছে। আর তাহার কথা বলিবার কিছু নাই।

একজন কেবল কহিল, লোকটার চুল পেকেচে, কিন্তু কী মিথোবাদী বল ত? সাবিত্রী-সত্যবানের গল্পটা কেমন সৌন্দর্যময় বিরে চাপিয়ে পেল? — স্রোতের কোথাকার!

কিন্তু বাকি তিনজন তেমনিই নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। গাড়ী গা-গা করিয়া ছুটিয়েছে।

কবি

শ্রীযেতকুমার মুখোপাধ্যায়

আমি কবি—মোর লাগি প্রকৃতির পুষ্পঅর্ধাভার,
বহি আনে বড় কত, পূর্ণ করি হৃদ্যপায়ে তার।
আমি কবি—মোর লাগি সিদ্ধবৃক্ষে বেগে ওঠে হাসি;
ছবে ছবে পুষ্প-গনে দিগন্তেতে বেজে ওঠে বাঁশি।
অরে ফুল, বন্ধ তার দিকে দিকে যায় শুধু ভেসে;—
পূঁজে কেবে চির যম অর্ধা নিয়ে সন্ধ্যা হেসে।

জ্যোৎস্না-লাবণ্য-মুগ্ধ বনানীর প্রাচল্য কুন্তল,
অনন্ত আকাশে জাগে জ্যোতির্পথ তারকার নল।
প্রকৃতির হৃদ্যপায়ে পূর্ণ এত অকৃতের রাশি;
আমি কবি—মোর লাগি দিকে দিকে এত কলহাসি।
আকাশে বাঁশির সুরে ফলে ফলে মুগ্ধ-শিহরণ;—
আমি কবি কুপে কুপে তার মাঝে পেতেছি আসন।

বসন্তে বকুল বনে অশ্রুক্ষণ জাগে বে হিলোল,
শ্রামল পাতার শাখে বিহগের আনন্দ-কল্লোল।
আমি কবি—মোর ঘারে নিতা তারা সন্ধ্যা-সুরে
স্থান চায় মুহূর্ত্ত;— প্রেমাসন পাতিবার তরে।
অনন্ত আকাশ-বৃক্ষে নীলিমার দিশাহারা গীতি;—
জ্যোৎস্না-রাত্রে মধ্যপথে ক্ষীণ-প্রভা শূন্য ছায়াবাঁশি।

বরিবার শ্রাম-খন লক্ষ্যহারা মেঘের কুন্তলে,
বাধা মোর জেগে থাকে অসীমের রক্ত আঁখি-জলে।
কিশোরের চিরস্বন এই মধু সমীরণ দোল
ছন্দে, ছন্দে, স্নিগ্ধ গীতে এত স্বর এত বে হিলোল।
তরুণ বসন্তরাত্রে স্বপ্ন-মুগ্ধ আকুল পূর্ণিমা;—
আমি কবি—মোর চেয়ে আনন্দে সে নাহি পায় সীমা।

বসন্তের কুঞ্জবন অল্পরাগে ভরা তাই আমি,
প্রিয়া-হারি কোকিলের কুড়বাণী উঠিয়াছে বাজি।
যার যত জীবনের চিরপূণ্য সন্ধ্যার রাশি,
আমার জুয়ারে সবে অর্ধা-সম দেয় ভালোবাসি।
আমি কবি—হরি' মোর সন্ধ্যার সুরে যত গানি;—
মোর লাগি জলে তাই আরতির পঞ্চদীপখানি।





['উন্নত' সমালোচনার রত প্রকাশক অগ্রহ করিয়া প্রাচ্যের নৃতক উইখানি করিয়া পাঠকবর্গ]

সন্তান পালন—ডাঃ ব্রিজানেন্দ্রনাথ বাগচী, এম. এম. এস. প্রকৃতি। প্রান্তিয়ান—সরকার বিশ্বাস এও কোং, ৭২/১১ এ, মোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা দুই আনা।

সন্তান কেবল মাতা-পিতার কেন, সমগ্র জাতির দ্বন্দ্ব। এই সম্পত্তি (assets) অর্জন, সংরক্ষণ ও পরিবর্তনে যে পরিবার বা যে জাতি বহু যত্নবান, সেই জাতি বা পরিবারেরই সেই পরিমাণে উন্নতি হইয়া থাকে। ভারতে সন্তান-পালন ও সংরক্ষণ প্রদানের প্রকৃতি পক্ষা ছিল। প্রকারের চরক, হস্তচের উন্নয়ন করিয়াছেন, ইহাতে ঐ বিশ্বের অঙ্গুলকানের ইতি পাওয়া যায়। তবে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান তিনি অবদান করিয়াছেন, হস্তচা প্রকৃতি এবং শিশু-চিকিৎসার তিনি জ্ঞানবীর্য ব্যবহার করিয়াছেন। শিশু-গ্রন্থ ভেদে আবহাওয়ার পার্থক্য দেখা যায়; সেইজন্য শিক্ষা-নীক্ষারও বিভিন্ন জাতির পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। সন্ত, সমস, সন্তাচার প্রধান ভারতীয় সন্তাচার। সেই ভারতের শিশু-শিক্ষা-প্রণালীও সেই বিদ্যামহাশয়ী বংগ। স্বাভাবিক এবং কার্যকরী। আমোদ-প্রমোদের ভিতর দিয়া শিক্ষা, আমোদপ্রিয় জাতি পড়িয়া তুলিবে। তারপর পেটেন্ট খাতের কথা, কলে তৈয়ারী খাতের কথা। ইহা স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। এ বিশ্বের পাশ্চাত্য জ্ঞানবর্গেরই বহু নিবিল্যাম—Lt. Col. W. Shirely, C. M. G., M. A., writes—Whatever may be the ultimate verdict of science as to Calories, Vitamins etc., it is certain that most artificial foods, highly

milled cereal products, muscle meat, etc. are insufficient by themselves to maintain animals in health. The quantity of insidious poisons in each of these manufactured food articles is so minute that positive and obvious injury is out of the question, for the time being, but their cumulative effect in the course of years is bound to become visible... No organism can stand it indefinitely.

‘মনের পরিবর্তনের উপর বাস্তব ও শিক্ষার প্রভাব’ অধ্যায়ীও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-আলোচনা সমন্বয়ে, আরও সংক্ষেপে এবং সহজে লিখিলে, পড়িবার, বুঝিবার এবং কাৰ্য্য করিবার সুবিধা হইবে।

প্রকারের মন উদ্বেগ দেখানী জগৎকর্ম করিয়া, কার্য্যতঃপর হইন, শিশুগণকে কালের মাহুৎ পড়িয়া কুসুম—তাহা হইলেই তাহার জ্ঞান, গুণ, সজ্জিততায়, কষ্ট, কষ্টের মর্ধ্যালা, এবং জননী জগৎকর্মের পৌরব রক্ষার সক্ষম হইবে।

ঐক্যমেশ শর্মা

WOOD & LINO-CUTS. Fifteen Wood & Lino-cuts Being Studies in Portraits and Landscapes of Bengali Life and Locality. By Sudhansu Kumar Ray. (The Book Company Limited. College Square, Calcutta.) মূল্য ২০ টাকা।

Wood-cut বা কাঠখোদাই-এর সহিত আমাদের যে-ভাবে পরিচয়, তাহাতে এই শিল্প সম্বন্ধে আমাদের

কোন উচ্চ ধারণা থাকা সম্ভব নয়। পূর্ণের কাঠ-খোদাই ছিল পুস্তক চিত্রিত করার প্রধান উপায়; কিন্তু হার-টোন এবং লাইন-ব্লকের প্রচলন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঠ-খোদাই অল্পে অল্পে উঠিয়া বাইতে গাশিল। ইতিমধ্যে ইউরোপে কাঠ-খোদাই-এর পুনর্জাগরণ দেখা গিল। বিংশ শতাব্দীর কাঠ-খোদাই-শিল্পী সামান্য কালের অপূর্ণ খোদাই-চিত্র প্রকাশ করিতে গাশিলেন। কাঠ পল্ল জিনিষ বলিয়া কেহ কেহ 'Linoleum' (বাঁহা ঘরের ঘেঁকের উপর বিছান চর) কাটরা চিত্রের রূক প্রস্তুত করিতে গাশিলেন এবং এই 'লিনো-কাট'-এরও (Lino-cut) একটি আটের সৃষ্টি হইল। বাস্তবের হুবহু অঙ্কন নয়। করিয়া, বাস্তব জিনিষের সহিত নিষেধ করনা মিলাইয়া বিংশ শতাব্দীর শিল্পী হৃদয় খোদাই-শিল্প গড়িয়া তুলিলেন।

আমাদের দেশের কয়েক জন নবীন শিল্পীও এই 'কাঠ-খোদাই' ও 'লিনো-কাট'-এর চর্চা করিতেছেন এবং আলোচ্য পুস্তক বানিতেও শিল্পী শ্রীকান্ত হুগাং কুমার রায় কর্তৃক খোদিত কতকগুলি অতি হৃদয় উদাহরণ ছাপা হইয়াছে। সামান্য কয়েকটি মোটা টানে বস্তু হৃদয় ছবি হইতে পারে, আলোচ্য পুস্তকের ছবিগুলি দেখিলে তাহা বেশ বুঝা যায়। বাস্তবের ছায়া সহিত এই নবীন শিল্পী নিষেধ করনা মিলাইয়া কয়েকটি অপরূপ চিত্র গড়িয়া তুলিয়াছেন। এই চিত্রগুলির মধ্যে "A Weather-beaten Face" নামে কুছের মুখের ছবিটি আমাদের সকলের চেয়ে ভাল গাশিয়াছে। গ্রাম্য-বালিকার ছবি (১নং), ব্রহ্ম-গুরুশাসী কুছের ছবি (২নং), বাস্কের ছবি (৩নং), কলিকাতার ময়মানে তরুণের ছবি (৪নং) এবং কলিকাতার একটি পুস্তকের ছবিও (৫নং) আমাদের খুব ভাল গাশিয়াছে। আশা করি এই নবীন শিল্পী ভবিষ্যতে আমাদেরকে আরও হৃদয় হৃদয় খোদাই-চিত্রের উদাহরণ দেখাইতে পারিবেন। ছবির কানকগুলি এবং কালো কালি চক্কে না হইলে ছবিগুলি আরও

হৃদয় দেখাইত। আশা করি, পরবর্তী সংস্করণে শিল্পী বা প্রকাশক এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখিবেন।

শ্রীহরিনন্দন রায়চৌধুরী

দ্বিতীয়—কাব্য। শ্রীকৃষ্ণভ্রমার রায় প্রণীত; মূল্য চার আনা।

হোই একটি বইয়ের একটি মাত্র কবিতা; কবিতাটি কিন্তু হোই নয়। কাব্যের সমস্ত উপাদানই ইহাতে আছে। হৃদয়িত ভাষা, হৃদয়ের কথার, অলঙ্কারের মাধুর্য, বর্ণনার ঐচ্ছল্য। স্থানে স্থানে কবিত্বের উজ্জ্বলিত পারদ-স্নানকার মত দৃষ্টান্তকে ওর দিগ্ধ রক্ত-ধারার দ্বারা করা হইয়াছে।

কাব্যের মধ্যে আরও উপভাসের সেন নৃতন ব্যাখ্যা কবি ওনাইয়াছেন, তাহা যেমন মৌলিক তেমনি হৃদয়!

অব এ ধরণের দীর্ঘ কবিতার পাঠক সংগ্রহ করা কঠিন। কারণ, লোকের সময় কম, খেঁচা কম। তবে 'দ্বিতীয়' সম্বন্ধে ইহা বলা যায় যে, সমস্ত বইটি এক নিঃশ্বাসে গড়িয়া ওনাইলেও কাহারও স্নানিত আশিবে না। কারণ, ইহার দর্শ্য অলঙ্কারের, উপমা, অলঙ্কারের ঐচ্ছল্য কম মন করিতেছে।

দ্বিতীয় হাওয়া—কবিতার বই। শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু প্রণীত। মূল্য আট আনা। পকেট-বই আকারের ৬৬ পাতা। নাম একটু বেশ মনে হইল।

প্রভাতকিরণ বসু বহুদিন ধাবৎ বহুবিধ মাসিক পত্র কবিতা গিথিতেছেন; তাঁহার রচনা মিষ্ট ও সরস হইয়া থাকে। লম্বা ও গলিত কবিতা ধারার ভালোবাসনে প্রভাতকিরণ বাবু 'দ্বিতীয় হাওয়া' তাঁহাদিগকে নিষ্করই কিংবদন্তির দ্বারা আঘাতিত করিবে। পুস্তকের প্রথম কবিতাটি serious কবিতার মধ্যে ভালো গাশিল; 'দ্বিতীয় পক্ষ', 'উঠা দৃষ্টান্ত', 'হাওয়া', 'হাওয়া', প্রভৃতি দ্বিতীয় কবিতাগুলি বেশ উপভাষ্য।

আমরা কবির সজ্ঞাত পরবর্তী রচনা-সংগ্রহের অপেক্ষার রহিলাম।

শ্রীরাঘবেন্দু দত্ত

পদ্মা—শ্রীকুমোদন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।
প্রকাশক শ্রীমতীঃ চট্টোপাধ্যায়, সোলাপ পারিখি:
হাউস, ১২নং হরীতকী বাগান লেন, কলিকাতা।
মূল্য এক টাকা।

কবিতার বই, সবচেয়ে দ্রুত কবিতা আছে।
অতি আধুনিক কবিরের মধ্যে কুমোদনের একটি
বিশিষ্ট স্থান আছে, তাই সংগ্রহের সহিত বইখানি
লইয়া বসিলাম। সব কটি কবিতার একটা সংঘ-বৈশিষ্ট্য
আছে, ছন্দ সাবলীল, ভাব ও ভাষা সত্যসুপ্তিক
পথ ছাড়িয়া বহু বিচিত্রতার সমুদ্ভূতি। বিশেষ
করিয়া এই ক'টি কবিতা আমাদের ভালো লাগিল—
প্রভাতে তবির কর, নিশান-বাসর রাতে, স্বপ্ন-সিঁহাসন,
জ্বলাশী, অথচ শুধু মনে হয়, প্রেমের পরোক্ষি মধুনে,
সকলেই তুলিয়াছে, ও শেষ। সে দিন পরব বাবে,
এখনো আফ্রান ও আবাদের প্রথম বর্ণণে—কবিতার,
বিশেষ করিয়া শেখোক্তিতে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা
অনুভবিত পড়িয়াছে, বেঁটু ন। পড়িলেই ভালো হয়।

বইখানির ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট সুসুচিন্দিত
ও মনোহর।

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

নিশিপত্ত—গল্পের বই। লেখক—শ্রীপ্রবোধকুমার
সত্যাপ। প্রকাশক—সুন্দরাস চট্টোপাধ্যায় এও সন্স,
কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

বর্তমান যুগের উদীয়মান কথা-সাহিত্যিকগণের
মধ্যে প্রবোধকুমার স্বীয় প্রতিভাবলে একটি বিশিষ্ট
স্থান অধিকার করিয়াছেন। চরিত্র-স্বপ্নের নৈপুণ্য
এবং নরনারীর জগত্ভাবের বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতাই
তাঁহার ছোটগল্প-রচনার বৈশিষ্ট্য। বলা বাহুল্য, সে-
বৈশিষ্ট্য তাঁহার এই গল্পের সমগ্রভিত্তিতেও বর্তমান
আছে। তাঁহার লিখিত বিজ্ঞান, ভাবের পতীরতম
ইন্দিজ, স্বপ্ন-ভঙ্গীর প্রাণ-চাকলা—‘নিশিপত্ত’র একটি
মিকের পরিচয়।

‘নারায়ণ’, ‘পতীর’, ‘ছন্দোপনত’, ‘বাতাস দিল
সোল’—এই চারটি গল্প আমাদের অস্তিত্বের সোল
দ্বিগাছে। এ কয়টি গল্পে লেখকের প্রতিভার পূর্ণ
পরিচয় পাওয়া যায়। ‘নিশিপত্ত’, ‘মর্মকামনা’ ও
‘কঙ্কাল’ চমকনয়। ‘প্রসাধন’ আমাদের ভাল লাগে নাই।
ছাপা ও বাঁধাই ভাল; প্রচ্ছদপটের ছবিখানি
বেশ মনোহর।

মধুরা—কবিতার বই। স্বপ্নীয়া হরবালা বোম
প্রণীত। ১১০ ককরাম বস্তুর ট্রাট, কলিকাতা হইতে
শ্রীমদ্বন্দ্যনাথ বোম কর্তৃক প্রকাশিত।

আলোচ্য গল্পকথ্যনিতে মোট নয়টি কবিতা
সহিবেশিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি কবিতাই এক-একটি
কুয় গল্প। লেখনীর সাবলীল গতি-ভঙ্গী, তাঁহার স্বচ্ছ
প্রবাহ, গল্পের মাধুর্য ও অন্তর্নিহিত পবিত্রতা কবিতা-
গুলিকে পরম উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। কুয়
গ্রন্থে ভীতীর মত সেন্তলি ছন্দোবৃত্তে আর যুগ্মম
সঙ্গীতে পাঠকের চিত্ত সরল করিয়া তুলে।

শ্রীনিহাররজন মিত্র



১। অতি আধুনিক 'অটো-গাইরো'

উদ্বলনের প্রথম সংখ্যায় 'অটো-গাইরো' লম্বে বলা হয়েছে। সম্মতি Senor Cierva নামক এক ব্যক্তি সর্বশেষ আধুনিক প্রণালীতে একখানি 'অটো-গাইরো'-বিমান প্রস্তুত করিয়াছেন। একখানি ডিম-কলা 'রোটর' (বাহ্যতে জড়িত-শক্তি উপর এবং বিমানের গতিশীল হয়), একখানি দ্বি-পৃষ্ঠকলা (tail plate) ও একখানি হস্তায়মান ডানা না থাকিলে ইহাকে ডানাহীন 'অটো-গাইরো' বলা হইত। এই বিমানখানির কার্য-কলাপ সেখিরা British Air Ministry-র অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিশেষভাবে বিবর্তিত হন। এই পক্ষ পরিমিত স্থান সৌকর্য্যই এই বিমানখানি ১০০ ফুট উপরে উঠে এবং বর্তায় ১০০ মাইল বেগে উড়িতে থাকে।



Senor Cierva উড়ার অটো-গাইরো হইতে পার্শ্ব দৃশ্য করিয়া
লেখা হইতেছেন

এই সময় উহার ইঞ্জিনের বাষ্প-প্রবাহ বন্ধ করা হয় এক বিমানখানি ধীরে ধীরে ঠিক সোজা ভাবে নীচের দিকে নামিতে থাকে। মাটি হইতে ১২ ফুট উন্নত আদিত্যই আবার ইঞ্জিন খুলিয়া বেরিয়া হয়

এবং উহা পুনরায় উড়িতে থাকে। ইহার কিছুদিন আগে একবার, ইহা একখানি পাণ্ডকের মত ভূমির উপর নামিয়া আসে এবং ২০ ফুট সৌকর্য্যই উপরে উঠে। তারপর ইহা লাকাইয়া লাকাইয়া কতকগুলি ফিটার বেড়া তিলাইয়া এমন আন্তে আন্তে শক্তির

উপর ঘুরিতে থাকে যে, ভূমি হইতে একজন লোক অন্যত্রাসে পার্শ্ব দৃশ্য করিতে পারিত। ইহার পূর্বে পক্ষীয় অঙ্গকরণে বিমান নির্মিত হইত বলিয়া ইহার পক্ষে সরল ভাবে ওঠা-নামা করা অথবা বাহ্যকালে ঘুরিয়া বেড়ান সম্ভব হইত না। বর্তমানে এক প্রকার কীটের অঙ্গকরণে বিমান-প্রভৃতির কথা উঠিয়াছে। পানীর মত ডানা কাপ্টা না দিয়া এই কীট পক্ষ-সকল করিয়া ক্রমাকারে ঘুরিতে থাকে। বাহ্যক এই কোশল আরও

করিতে পারিলে বিমান-নির্মাণে ক্রান্তর আসিবে।

২। 'অকোনে' (Ozone) জল পরিষ্কার

লন্ডনের Metropolitan Water Board সন্থের পানীয় জল পরিষ্কৃত করিবার অস্ত্র Chlorine-এর

পরিবর্তে (Ozone ব্যবহার করিবার চেষ্টা) আছেন। Oxygen-এরই অণুগত Ozone ; ইহার প্রতি অণুতে (molecule) দুইটির পরিবর্তে তিনটি করিয়া পরমাণু (atom) থাকে। একটি পরমাণুতে বীজাণু ধ্বংস করে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে বায়ুমণ্ডল হইতে Ozone গৃহীত হয়, এবং Chlorine-এর মত ইহাও ফলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত (blown) করা হইয়া থাকে। ফলে দুর্বল বা বীজাণু থাকিলে ইহা তাহা নষ্ট করে, কিন্তু Chlorine-এর মত ইহার কোন দুর্বল নাই।

আমে ডিটামিন

লণ্ডনের Lister Institute-এ আমের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে, আমে A ও C ডিটামিন প্রচুর পরিমাণে আছে। কোন কোন আমে C ডিটামিনের পরিমাণ প্রায় লেবুর সমান।

এই পরীক্ষার ফলে, রোগ-প্রতিষেধক বাত্ৰ হিসাবে আমের দৃশ্য বাড়িয়া গিয়াছে। আর-কোন ফলে

আমের মত এত অধিক পরিমাণে A ডিটামিন পাওয়া যায় না। তবে সকল প্রকার আমেই A ডিটামিন প্রায় মাঝনের সমান আছে। কিন্তু মাখন অলপকাণ্ড ইহা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়; কারণ, মাখন চর্কি-প্রধান বস্তু বলিয়া ইহা পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটায়, কিন্তু আমে তাহা হয় না। এই জন্য গু-সেনে ইহাকে Queen of fruits বা ফলের রাণী বলে।

৪। নুতন ধরণের নিব্

Joseph Gillett & Co. এক প্রকার নুতন ধরণের নিব্ তৈয়ারী করিয়াছেন; কোন প্রকার কালি ব্যবহারেই ইহাতে মরিচা ধরিবে না, বা ইহা ক্ষয় হইয়া যাইবে না। কাউন্টেন্ পেনের ব্যবহার যে এত বেশী তার কারণ সাধারণ নিব্ তাড়াতাড়ি ক্ষয় হইয়া যায়; এই নিবের প্রচলন হইলে একটা মত অসংখ্য দূর হইবে।

শেষের বাণী

ঐকর্ষ্যযোগী রায়

নিম্নাহারা নবন ল'য়ে জাশিয়া আহি বিরহ রাত্তি
বাছিরে হাজরা পানলপারা কুহুম বাসে উঠেছে রাত্তি!

চাঁদের ঝাঁক চাহনি নিয়া

গরবে হাসে নীলিমা প্রিয়া,

সরসী বৃ ককল দলে প্রিয়ার মালা রেখেছে পাঁখি।

নিম্নাহারা নবন ল'য়ে জাশিয়া আহি বিরহ রাত্তি!

সকল রিয়া অশন-শীনা, বিরহ শুখু আমারি বৃকে
অতীত বৃত্তি জাপায় তুলি গীরব হাসে গভীর হৃদে!

ধরার বেন বিবাহ আজি,

বাসরে বেন চলে সে সাজি,

বিদায় শুখু লিখেছে খাতা বেধনা-স্নান আমারি বৃখে

সকল চিত্রা অশন-শীনা, বিরহ শুখু আমারি বৃকে!

জীবন-নদী বহিয়া চলে পরাণ-হীন মম্বরতা

কহিছে শুখু হৃকূলে তারি পোশনতম বাখার কথা!

নাহিক হাসি কলপনি

হৃদয়-ভার অঙ্গ রপি'

মানস-বনে মানসী মন আজিকে শুখু কাননরতা

জীবন-নদী বহিয়া চলে পরাণ-হীন মম্বরতা!

স্নাত্ত সেহে স্নাত্ত মনে সেহের বাণী বাছিরে কবে
হারিয়ে যাওয়া প্রিয়ার সাথে মরণ-পায়ে মিলন হবে!

রয়েছে জমা হতেক ছুখ

হয়নি পাওয়া যে প্রেমমুখ

সকলি এসে সে রমণীর আমারি প্রিয়ে তুলিয়া লবে

স্নাত্ত সেহে স্নাত্ত মনে সেহের বাণী বাছিরে কবে!



(১)

আজকের দিনে কি-বরের কি-বাইরের বিষয়ে লিখতে বসলেই, বীরবলের কলম ধরবার দোভ হয়। আজকের দিনে বা বড় ঘটনা ঘটে, তার ইংরেজী নাম হচ্ছে Conference। আর Conference ব্যাপারই হচ্ছে বলারপে লক্ষ্যক্রিয়া। আজ এক স্থান ধরে যে League of Nations-এর বৈঠক বসছে, তার ফলে আর হাই হোক, জাতিতে জাতিতে কোনও সন্ধি হয়নি। আর, সম্মতি বিস্মেতে যে Economic Conference বসেছে, তাও যে ভূমিতে কেঁসে ধাবে, তার সব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে; যদি না ইতিমধ্যেই তা কেঁসে দিয়ে থাকে।

Conference-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঁচজনকে জড় করে একমত হওয়া। কিন্তু যেখানে পাঁচজনের মনের মিল নেই এবং কেউ কারও কথায় বিশ্বাস করেন না, এবং সকলে ঠিকবার ভয়েই অধির,—সেখানে পাঁচজনের পক্ষে একমত হওয়া অসম্ভব। অথচ সকলেই যখন বোঝেন যে, পৃথিবীর জাতিমাঝেই এইরকম পরস্পর রোষারোষির ফলে নিত্যমাত্র ছরবছর পড়েছে, তখন পরস্পরের সঙ্গে সন্ধ্যাপরামর্শ করে এই আন্তর্জাতিক Economic War-এর একটা আপোষ-মীমাংসা করবার প্রবৃত্তিও অতি স্বাভাবিক। এই মতই ইউরোপে আনুমানিক নানারকম Conference বসে; এবং সেখানে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মনের ও মতের অনিল প্রচার করেই, যে ব্যাপ্তি ঘনানো সবে' পড়ে। এ ক্ষেত্রে বীরবলের প্রবৃত্তির লোক ব্যাপার দেখে যেসে উঠবেন, কারণ তিনি বিকাশ ধর্মের চক্রে অর্থাৎ ফলনিরপেক্ষ বলাকওয়ার অর্থ বোঝেন না।

আমি কিন্তু এই সব Conference-এর ব্যর্থতাকে হাদির ভিন্নিধ মনে করিমে, কাগ্যর জিনিষও মনে করিমে।

(২)

ওনতে পাই বহুকাল পূর্বে গ্রীক দার্শনিক Plato বলে দিয়েছেন যে, সমতার অর্থই হচ্ছে Force-এর উপর Persuasion-এর ক্ষয়। একথা সর্বাঙ্গীকরণে গ্রাহ্য করি। কারণ, অগ্রাহ্য করবার কোন দম্বত কারণ নেই। মানবসমাজে সমতা বলে যদি কোনও পদার্থ থাকে, আর মানবসমাজে ইতিহাসিমান বলে যদি কোনও ধর্ম থাকে ও সমাদমাজের ইতিহাসিমানের ইতিহাস Plato-র মতই প্রমাণ করে। এ মত গ্রাহ্য করতে অনেককে যে ইতস্ততঃ করবেন, তার কারণ বলপ্রয়োগের ফল বড়টা প্রত্যক্ষ, Persuasion-এর ফল আমাদের চক্ষুচোরে কাছে ততটা প্রত্যক্ষ নয়। বিশেষতঃ এ দেশে আমাদের যখন হারাশ্বক বল নেই, তখন আমরা কলনায় বলকে খুব বড় করে দেখি। Conference-এ যে কোনও সমতার চূড়ান্ত মীমাংসা করতে পারে না, তা আমরা নিতাই বোধতে পাই; কিন্তু Force-ই কি কোন বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করতে পারে?—ইউরোপের পত্তনমের মত বিরাট ক্ষুদ্র বোধের পৃথিবীতে ইতিপূর্বে কখন হয়নি। এর তুলনায় ক্রিকেটের ক্ষুদ্রকণ Football Match-এর পর্যায়ে কোলা বেতে পারে। কিন্তু পত্তনম কি কোন মানবসমাজের মীমাংসা করেছে, না নানা নতুন সমতার সৃষ্টি করেছে? অপর কথা ছেড়ে দিলেও, পৃথিবীর বর্তমান আর্থিক দ্বর্পতি কি পত্তনমের

অনিবার্য ফল নয়? আর বর্তমান Economic Conference কি যতদূরকণ পাশের শান্তি থেকে উদ্ধার পাবার উপায়ের সন্ধান পাবার চেষ্টা নয়? এক হিসেবে তর্কাত্মক অংশে আমরা আমাদের মনোমত। বুকের কথা থাকলে সর্বাধিক অগাধ হয়ে ওঠে, আর ইকনমিক্সের তর্কে তা আমাদের অবিকার্য পাঠকের কাছে অগাধ হয়ে পড়ে।

(৩)

এর কারণ, নিরীহ লোকে পুন-জন্ম করতে ভাল না বাসুক, পুন-জন্মের কথা শুনেও তার অভিনয় দেখতে ভালবাসে।

গড়ের মার্চ নিতাই দেখা যায় যে, Football Match দেখতে হাজার হাজার লোক উপস্থিত হয়, আর ম্যাচ নামক নকশা বুদ্ধ দেখে তাদের কি উৎসাহ, কি আনন্দ হয়! এ আনন্দের কারণ, এ খেলাতে হাতাহাতি আছে, লাগামাশি আছে, আর পুন না হোক জন্ম আছে।

তারপর সিনেমার এত পসার কেন?—সিনেমাতে চামড়ার গোলা নিয়ে নয়, রক্তমাংসের রমণীর কায় নিয়ে না হোক, ছায়া নিয়ে কাড়াকাড়ি, মারামারি আছে: অবশ্য: ছদ্ম আসে ছিল। আর এ ধর্মকের দল আবালবৃদ্ধবিনিতা, ছোট-লোক, বড়-লোক সবাই। অপর পক্ষে ইকনমিক্স সম্বন্ধে বক্তৃতা শোনবার নিমন্ত্রণ আমরা ক'জন রক্ষা করি? যদিও ইকনমিক্সের ক্ষেত্রে হার-জিতের উপর আমাদের ঘাতির জীবন-মরণ নির্ভর করে। আর অপর দুই ক্ষেত্রে হার-জিতের ফলে কারও কিছু আসে যায় না।

ইকনমিক্সের বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন, কেননা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এ বিষয়ে কিছু জানবার আমাদের কৌতূহল পর্যন্ত নেই। ফলে, খবরের কাগজের সেক্টিমেন্টাল ইকনমিক্সের বুলিগুলো আমরা বুঝ করেই সজ্ঞে থাকি। কিছুদিন থেকে আমরা গরিব-নারাডের মত ভক্ত হয়ে পড়েছি,

অবশ্য: মুখে। এর একটা কারণ—ও মনগড়া নারায়ণের পূজার ভোগ দিতে হয় না। তা' যদি দিতে হত, তাহলে গরিব আমাদের কাছে নারায়ণ না হয়ে রাক্ষস হয়ে উঠত; যেমন ইংলও dole-এর কৃপায় ধনী সম্প্রদায়ের কাছে তারা হয়ে উঠেছে।

(৪)

ইকনমিক্স সম্বন্ধে আমাদের এ অজ্ঞতা, এ ঔগা-সীজের অনেক কারণ আছে। তার ভিতর একটি স্পষ্ট কারণ এই যে, বঙ্গমহিতো আম পর্যন্ত ইকনমিক্সের স্থান নেই। বাংলা যে আমরা ইংরেজীর চাইতে ভাল বৃত্তি, আর চের সম্বন্ধে বৃত্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং ইকনমিক্স শাস্ত্রের যদি বাংলা ভাষায় প্রচার হত, তাহলে এ বিষয়ে কোনরূপ মত দেবার অধিকার আমাদের না জন্মালেও, ইকনমিক্স-শাস্ত্রীদের মতামত বোঝবার অধিকার আমরা লাভ করতুম। ইংরাজিতে থাকে Science বলে, তার সম্বন্ধে আমাদের অবিকার্য লোকের জ্ঞান কি এই জাতীয় নয়? আমাদের দিনে পৃথিবী যে দুর্ভিক্ষে প্রাধান্য করছে, এ সত্য আমরা সকলেই মানি; কিন্তু কি প্রমাণের ফলে এ সত্য আমরা মানতে বাধ্য, তা' কি আমরা সকলেই মানি?

অবশ্য ইকনমিক্স কিম্বদন্তির তুল্য Science নয়; তবে ধনের সৃষ্টি-হিত-প্রদায়ের যে কতকগুলি মোট। নিয়ম আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। অধ্যাপকরা যদি বাংলায় কথা কইতেন, ত আমরা সাধারণ লোকে ইকনমিক্সের কতকগুলি সাধারণ নিয়মের সঙ্গে পরিচিত থাকতুম। তাঁরা যে তা' করেন না, তার কারণ তাঁরা অধ্যাপনা করেন ইংরেজী ভাষায়। তার থেকে হয়ত তাঁদের ধারণা ক্ষেপেছে যে, ও শাস্ত্র-বচন বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করা বেতে পারে না। কারণ পারিভাষিক শব্দে বাংলা ভাষা গরিব। কিন্তু পরিভাষা বাদ দিয়েও যে ইকনমিক্স শাস্ত্র বোকানো যায়, ও জ্ঞান বোধহয় অধ্যাপকদের নেই। আর এ শাস্ত্রের পরিভাষা যে নানা লোকে নানা অর্থে বোঝেন, অথবা

বোম্বেন না, তার বত প্রমাণ আছে। অতএব
পরিভাষাক্ত দৃষ্টিতে তার কতবার কোন প্রয়োজন
নেই।

(৫)

বিলেতি অর্থদ্বারাও যে বাংলা ভাষা, অর্থাত্
যে ভাষার আমরা লিখি আর পাঠককে পড়ে, সেই
পরিচিত ভাষাতেই পরিষ্কার করে লেখা যায়, আমি
সম্মতি তার প্রমাণ পেয়েছি। প্রেসিডেন্সি কলেজের
অধ্যাপক ও ইকনমিক্স শাখায় সুশীলিত ঐশ্বর্য
চন্দ্র সিংহ পণ্ডা প্রবাসী-সাহিত্য-সম্মেলনের ইকনমিক্স
শাখার সভাপতি হিসেবে যে অভিভাষণ পাঠ করেছেন,
সে অভিভাষণের ভাষা ইংরাজী নয় বাংলা; তাও
আবার সাধু বাংলা নয়, চলতি বাংলা। উক্ত প্রবন্ধ
যে কত সরল ও সহজবোধ্য, তা বঁার ইচ্ছা তিনি পড়ে
সেখতে পারেন।

আর পণ্ডা বাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় ঐশ্বর্য অনাথ
সোপাল সেন নামক কোনও নতুন লেখক স্বপ্নমান
দৃষ্টিতে একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রথমতঃ
তিনি যে ভাষায় লিখেছেন, তা' বাংলা; কারণ প্রবন্ধটি
বিনা আয়ালে আত্মোপাধ এক নিঃশব্দে পড়া যায়।

Gold-Standard ইকনমিক্সের একটি জটিল
সমস্যা। এ বিষয় ইকনমিক্সের নানা মূর্খির নানা মত।
গুণু তাই নয়, নানা গভর্ণমেন্টেরও নানা ব্যবহার।
কেউ Gold-Standard আঁকড়ে ধরে আছেন, কেউ
বা তা' প্রত্যাখ্যান করেছেন। সে হাই হোক,
Gold-Standard-এর পক্ষে কি বলবার আছে,
ঐশ্বর্য অনাথসোপাল সেন তা' অতি সহজ ভাষায়,
অতি বিশদ ভাবে আমাদের সুকিরে দিয়েছেন।
পরিভাষার সাহায্য তাঁকে একরকম নিতেই হয়
নি। পরিভাষার অনেক স্তম্ভ থাকতে পারে, কিন্তু
তার মহা বোঝ হচ্ছে এই যে, অনেক শাস্ত্রী ঐ
পরিভাষাকেই মাত্র বলে কুল করেন। তখন এই শাস্ত্রের
পণ্ডিতে পণ্ডিতে বোঝাপড়া হতে পারে, কিন্তু আমাদের
পক্ষে তা' সম্ভব নয়।

(৬)

এখন ইকনমিক্স Conference-এর আলোচনার
ক্ষিরে আসা দাও।

এ শাস্ত্রের শাস্ত্রীরা বহুকাল পূর্বে আবিষ্কার
করেছেন যে, বর্তমান অর্থদ্বারা শুধু আমাদের কিছা
তোমাদেরই ঘটেনি, তাদেরও ঘটছে। অর্থাত্
পৃথিবীতে এমন কোনও দেশ নেই, যে দেশ অর্থের
অভাবে বিপর্যয় হয়।

কলে কোন দেশই নিজের চেঁচায় এ দুর্গতি থেকে
উদ্ধার পাবেন না। কারণ প্রতি জাতির স্বার্থপরতা
এ দুর্গতির অন্ততম কারণ। সুতরাং সকল জাতি একত্রে
হয়ে মিলেমিলে পরামর্শ করে, এ বিপদ কাটিয়ে ওঠবার
উপায় স্থির করতে হবে।

এই কারণেই এই ইকনমিক্স Conference-এর
বৈঠক বসেছে। পৃথিবীর এই আর্থিক হুঁপা প্রধানতঃ
দুই দৃষ্টির ফল। এ দৃষ্টির চারটি প্রত্যক্ষ ফল
আছে—(১) Reparation বা ক্ষতিপূরণ, (২)
হুঁকণ, (৩) তত্ত্বাবধির দ্বারা আমদানি রোধ, (৪)
টাকার মূল্যের অস্থিরতা।

এই Conference-রে Ramsay Macdonald ও
Chamberlain-এর কথার সুকলিঙ্গম যে, ওদের হার
কমানো, হুঁকণ থেকে অর্থদ্বারা জাতিদের নিষ্কৃতি দেওয়া,
ও নানা দেশের টাকার একটা বাধ্যদার মূল্য স্থির
করবার জন্যই এ Conference-এর প্রয়োজন। ইংলণ্ডের
প্রধান বাহনদারী ও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট স্বয়ং
ইতিপূর্বে এ বিষয় সোপানে পরামর্শ করেছিলেন, তখন
অসুস্থ্যন করেছিলেন যে, তাঁরা দুজনে একমত হয়েছেন।

(৭)

এ Conference-রে কিন্তু Reparation-এর কথা
ওঠেনি, সম্ভবতঃ এই কারণে যে, ক্ষতিপূরণের প্রধান
বেনদার জার্মানী, ও পাশ্চাত্যের ফ্রান্স; আর ইতিপূর্বেই
আমেরিকার স্বাধীনতার সে সেনা-পাশ্চাত্য মূল্যস্থি
রাখা হয়েছে। অর্থাত্ ফ্রান্সের ডিক্টারী বন্ধাব আছে,
কিন্তু সে ডিক্টারী জারি হুঁসিত রাখা হয়েছে।

ভারতীয় মুদ্রণ যেখানেই ছিল, সেখানেই রয়ে গিয়েছে। আমেরিকা ইংলণ্ডকে যে টাকা ধার দিয়েছে, সে টাকা সে হাট্বে না। ইংলণ্ড এ ক্ষেত্রে আংশিক ক্ষমতা হারিয়ে দিয়ে তামাদি রক্ষা করেছে। সুখী ইংলণ্ড এবার সোনার বসলে রূপো দিয়েছে।

এত রূপো ইংলণ্ড পেলে কোথেকে?—ভারতবর্ষের কাছ থেকে। ভারত গভর্নমেন্টের অধিনে অনেক রূপো মজুত ছিল, বৃটিশ গভর্নমেন্ট সেই রূপো কিনে তাই দিয়ে এ কিস্তির আংশিক টাকা দিয়েছেন।

ঐক্য নবীনীরজন সরকার বলেন যে, বৃটিশ গভর্নমেন্ট আমাদের গভর্নমেন্টের কাছ থেকে সত্তার রূপো কিনে, চক্কা নামে আমেরিকায় তা চালান দিয়েছেন। ফলে ভারতবর্ষের এক ক্রোর টাকা লোকসান হয়েছে। সরকার মহাপ্রবলের কথার গভর্নমেন্ট কোনও প্রতিবাদ করেন নি। এর কারণ নাকি এই যে, কোন প্রতিবাদ করার প্রয়োজন নেই। একটি ইরানী ব্যবসায়ী এই মত প্রকাশ করেছেন যে, এ ব্যাপারে ইংলণ্ড লাভবান হতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। ইকনমিক্স্ শাস্ত্রে ধর্মের অন্তর্ভুক্তি আছে, তাঁরা নাকি এ কথা সহজেই বুঝতে পারেন। আমাদের নেই বলেই আমাদের মনে ঝটকা লাগে।—সে বাই হোক, এই মুদ্রণ বাইরের কথা হলেও যে আমাদের ঘরের কথা,—এই লেনদেনই তার প্রমাণ।

(৮)

সব কিস্তির টাকা ইংলণ্ডকে সোনার দিতে ছাড়ছিল। সে সোনাও সরবরাহ করেছে ভারতবর্ষ। এ ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষের ক্ষমতা ব্যতীত ইংলণ্ড তার কিস্তির টাকা দিতে পারত না। ভারতবর্ষ যে এ ক্ষেত্রে ইংলণ্ডকে তার দায় হতে মুক্ত করেছে, অন্ততঃ Keynes, Salter প্রভৃতি ইংলণ্ডের অগ্রগণ্য ইকনমিক্স্ শাস্ত্রীদের মত তাই।

অনেকের বিধান, কোটি কোটি টাকার সোনা রপ্তানি করা আমাদের দেশের পক্ষে ক্ষতিকর।

গভর্নমেন্ট বলেন, তা' নয়। এখন এ ক্ষেত্রে কার কথা ঠিক বলা কঠিন। তবে এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, পৃথিবীর বহু জাতি আইনের দ্বারা সোনা রপ্তানি বন্ধ করেছে; ব্যাপারটা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর, এই বিষয়ে। শুধু ভারতবর্ষের সোনা রপ্তানির পথ খোলা। এর থেকে এই প্রমাণ হয় যে, অপর জাতির পক্ষে যা ক্ষতিকর, ভারতবর্ষের পক্ষে তা' লাভজনক।

সে বাই হোক, এই সোনার বিনিময়ে ভারতবর্ষ কি পেয়েছে?—অবশ্য সোনা নয়, রূপো নয়, তামা ত নয়ই; অতএব ধরে নিতে হবে যে, ভারতবর্ষ সোনার বসলে কাগজ পেয়েছে—বাকি ইরানীতে বলে note। এ সব বিবেচনা নোটের বাজারে কাটতি নেই। অতএব এ সব বিবেচনা নোট বসলে স্বর্ধিক্রান্তারা যেই নোট নিয়েছেন। অবশ্য নোটও টাকা; তবে এই কোটি কোটি টাকার নোটের মৌদতে, ভারতবর্ষের টাকার বাজার লজা হয়নি। এত নোট যখন বাজারে নেই, তখন সেল কোথায়? মুক্তরাং বাইরের কেনা-বেচার কারবার আসলে ঘরেই লাভলোকসানের কথা।

(৯)

এই ইকনমিক Conference-এর ফলে কোন জাতিই মুদ্রণের দায় থেকে অব্যাহতি পায়নি, কোন জাতিরই Tariff-এর প্রাচীর ভেঙ্গে পড়েনি, আর এক দেশের টাকার সঙ্গে অপর দেশের টাকার চির সম্বন্ধ স্থির হয়নি; আর সম্ভবতঃ হবেও না।

Exchange-এর সমস্যা ইকনমিক্সের বিধম কুটিল সমস্যা। ইউরোপের পলিটিক্যাল সম্বন্ধে এ সমস্যাতে সন্দেহ করতে পারবেন, একদম আশা করা কৃথা; কারণ পলিটিকিয়ানরাই এ সমস্যাতে কুটিল করে চলেছেন।

যে সব জাতি Gold-Standard-কে ত্যাগ করেনি, সে সব জাতি বলছে যে, অন্ততঃ পাউণ্ডের সঙ্গে ডলারের বিয়ে সেওয়া হোক; যখন আমাদের দেশের গভর্নমেন্ট

টাকার সঙ্গে পাউণ্ডের বিপ্রে নিয়ে বলে আছেন। এই অবিস্ফেত বিবাহের কল প্রকারান্তরে Gold Standard বলায় রাখা। আমেরিকা যে এ প্রস্তাবে সম্মত হবে, তার কোনই সম্ভাবনা নেই। কেননা, এ প্রস্তাব গ্রাহ্য করলে inflation বন্ধ করতে হয়। সুতরাং এ Conference-য়ে নানা সমস্যার বিচার হবে, কিন্তু কোন বিষয়েই মনে মিলে এক রায় দেবে না। উৎসবেও বলি, এ Conference একেবারে নিরর্থক নয়। অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, পাউন্ডকে একত্র করতে পারলেই সকল গোল মিটে যাবে। সে বিশ্বাস যে ভুল, এ Conference-এর বার্ষিকাই তা' প্রমাণ করবে। ইকনমিক Nationalism বহন লোকের মনে প্রভুত্ব করছে, তখন এই সব international সঙ্গ, national মন নিয়ে international বিষয়ে একমত হতে পারবে না। ইকনমিক্সের বিধি-নিষেধ সর্বসাধারণ, কিন্তু পলিটিক্যাল বিধি-নিষেধ বিশেষ করে জাতিগত।

(১০)

এই সময়েই বিল্ডেড আর একটি বৈঠক বসেছে, ভারত গভর্নমেন্টের Constitution নতুন করে গড়বার জন্ত। এ গড়নটা যে কি হবে, তা' White Paper-এই প্রকাশ। এই White Paper-এর কি মন-বদল করা হবে, তারই আশ বিচার চলছে। উক্ত প্রস্তাবের লক্ষ্য ও বিপক্ষের সাক্ষী বেজা, উকিলদের বাহ্যিক শোনা হচ্ছে। রায় কি হবে, দুদিন পরেই জানা যাবে।

ঐচ্ছিক সুপেয়নাথ সরকার বিলেত থেকে গিয়েছেন যে, ও বঙ্গের বিশেষ কোন বল দেবে না। White Paper-এর বিপক্ষে হুঁশ পাড়িয়েছেন। বিল্ডেড Churchill-প্রমুখ Conservative-রা, এবং এ যেনে কংগ্রেসওয়ালারা।

আমাদের দেশের ব্যবসার কাসম পড়ে' মনে হয়, Churchill-প্রমুখ Conservative-দের এ বিপক্ষতা শুধু বিপক্ষতার স্বপট অভিনয়, —আসলে Baldwin ও Churchill একমত।

আমার বিশ্বাস অন্তঃস্থ। বিল্ডেড সব দলের পলিটিকিয়ানরা সব বিষয়ে একমত নন।

Baldwin-এর মত যে, তিনি ও তাঁর সহ-মন্ত্রীরা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করেছেন। Churchill-দলের মতে ঐ ব্যবস্থাতেই ভারত গভর্নমেন্টের অবস্থার ঘোর পরিবর্তন হবে; আর সে নতুন অবস্থার নাম ভীষণ দুঃস্বাদ। কার ভরবরা? দেশের শোকে, না ইংল্যান্ডের? এঁদের মতে, উভয়েরই।

কিন্তু Conservative সঙ্গে Churchill-এর দল ভোটে হেরে গেছেন, Baldwin-এর দল জিতেছে। এর থেকে অনুমান করা যায়, Churchill-এর বিপক্ষতার White-Paper-এর দল বিশেষ বিচলিত হবেন না।

(১১)

এই প্রস্তাবিত মন Constitution-এর সোড়ার দমন এই যে, সেটি জাতিভেদের উপর প্রযুক্তি। আমাদের ভিতর সাময়িক জাতিভেদ আছে, সেই জাতিভেদ এখন পলিটিক্সে ডবল প্রয়োগান পাবে। আমরা আমাদের সাময়িক জাতিভেদ গুলকর্ষের ফলপ্রসূত বলে মনকে প্রবোধ দিতে পারি; —কিন্তু এই পলিটিক্যাল জাতিভেদ যে গুলকর্ষের বিভাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, এমন কথা বুঝেও আনবার মতো নেই।

ডবিয়াং লাট-কাউন্সিলে সেনী রাজারা হবেন এক জাত, মুসলমানরা আর এক জাত, হরিজনরা আর এক জাত, ইয়েদরা আর এক জাত, আর জাতি-হিন্দুরা অর্থাৎ আমরা সব পঞ্চম জাত। আর আমরাই সব ক্ষমতার মণ্ডা। জাতি-হিন্দুরা যে অবিকালেই শিক্ষিত, অর্থাৎ ইংরাজী-শিক্ষিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর শিক্ষার যদি কোন কল থাকে ত জাতি-হিন্দুরাই যে পলিটিক্যাল হিসাবে স্তম্ভী, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই; কিন্তু লাট-বরাবরে এ স্তম্ভের কোনও মানা নেই। কার কি বশ, তার উপরই শোকে পলিটিক্যাল কর্তৃক নির্ভর করবে। আমরা যাকে democratic

পতৰ্ভূমেন্ট বলে জানি, তা' অবশ্য এ পদ্ধতিতে গড়া নহ।

ঐক্য নৃপেন্দ্রনাথ সরকার বলেন, এ কাঠামোর কোনও বল্য হবে না। আর বাঙালার ধরবারে আমাদের অভিনিবিষ্টা কোণঠাসা হয়ে থাকবে। বাঙালার যে এ অবস্থা হয়, তা' নাকি বাকী ভারতবর্ষেরও অভিমত। এর কারণ, বাঙালীরা নাকি একমাত্র বাঙলাকেই ভারতবর্ষ বলে গণ্য করে।

(১২)

তায়ণর White-Paper-এর প্রত্যাশিত Safe-guardগুলি সবই বন্ধার থাকবে। আমাদের ভাবী পতৰ্ভূমেন্টের দেশী মন্ত্রীসের হাতে যে সময়বিতাপ ও অর্থবিতাপ তুলে দেওয়া হবে না, এ বিষয়ে বিলেতের সকল রাজনৈতিক দলের কঠোরাক্ষিয়া একমত। পতৰ্ভূমেন্টমোহরেই প্রধান বল হচ্ছে অন্তরাল ও অর্থবল। এ ছই বল হত্যাকর করে ইংরেজ সরকার যে সাকী-সোপাল হয়ে এখানে বসে থাকবেন, আশা করি এ আশা কেউ করেন নি।

White Paper-এর প্রধান পুৰোষাচক Baldwin সাহেব শাউ করে বলেছেন যে, ভারতবর্ষের Fiscal policy দেশী মন্ত্রীসের মহাহুয়ারী হবে না। তিনি বলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বহু Dominions আছে, তাদের সঙ্গে ইংলণ্ডের বহু মতান্তর ও মনান্তর ঘটেছে, সবই এই Fiscal policy নিয়ে। অবশ্য Dominions-র কালক্রমে এ বিষয়ে স্বাভাৱ্য লাভ করেছে। তা' যে করেছে তার প্রমাণ, বৰ্তমান Economic Conference-তে, Canada ইংলণ্ডের সঙ্গে একমত হতে পারছে না। স্বভাৱ্য ভারতবর্ষকে বৰ্তমান এ বিষয়ে স্বাভাৱ্য দেওয়া অসম্ভব। ধরুন যদি লার্ড-কাউন্সিলের বড়কর্তারা দেশীসোক হতেন, তাহলে দুই সম্ভবতঃ সেখ থেকে সোনা রপ্তানি বন্ধ করতেন, আর সত্যাহরে রূপাও বিক্রী করতে রাজী হতেন না। কলে, দুইজনের দুই মিতে ইংলণ্ডকে কি হজিসেই পড়তে হত। এ কুসের বহু পলিটিক্যাল

সমস্যা, একটু জলিয়ে দেখলে দেখা যায় সবই আসলে বৰ্ণচোরার ইকনমিক সমস্যা।

(১৩)

ঐক্য নৃপেন্দ্রনাথ সরকার বিলেতে গিয়ে আবিষ্কার করেছেন যে, বাকী ভারতবর্ষের পলিটিসিয়ানরা বাঙালীর প্রতি অহুকুল নহ। পূৰ্বে পূৰ্বে তারা Round Table Conference-য়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের মুখে এই একই কথা শুনেছি। অপর প্রসঙ্গের এই বাঙালী-বিরোধের কারণ কি?

এর কারণ, বাঙলা বহুকাল পূৰ্বে স্বাভাৱ্য অবলম্বন করেছে, এবং বাঙালীরা নিজেদের ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ জাত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। অতঃপরে পলিটি-সিয়ানসের মধ্যে, কলিকাতা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল বলে বাঙালীরা ছন্দ্র দেয়াকে হয়ে উঠেছিল। কলিকাতা রাজধানী হওয়ার বাঙালী মনের কি বিকার ঘটেছিল, সে কথা এখন থাক।

কিন্তু যে বাঙালীরা সমগ্র ভারতবর্ষ বুক জুলিয়ে বেড়াত, তারা যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্ভাৱ্য—সে বিষয়ে আর সম্ভব নেই।

পতৰ্ভূমেন্টে, সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ও মধ্যপ্রদেশে যে বাঙালী অধ্যাপক ও বাঙালী উকিলই প্রচুর করত, সে কথা অস্বীকার করা চলে না। এবং এই দুজাই বাঙালী তার বিভা-বুদ্ধির পরিচয় দেয়।

আমরা কে-সব বাঙালীকে বাঙালার গৌরব মনে করি, তারা যে সকলেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে গড়া শোক, তা' অবশ্য নহ। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনকালেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার দ্বারেন নি। কিন্তু অবিকাপ বাঙালী যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপায় পণ্যাব্যাহ হয়ে উঠেছিলেন, এ ত প্রত্যক্ষ সত্য। জাতি হিসেবে... বাঙালীর প্রাধাত্য তার বিকার উপরেই নির্ভর করত।

(১৪)

বোধহয় এই কারণেই ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে নানা ভাঙের বিশ্ববিদ্যালয় গুলিয়ে উঠেছে। এক হিসেবে

এ অতি সুখের কথা। এত বড় বিরাট দেশের উচ্চ শিক্ষা ছাড়া ডিগ্রী বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে উঠতে পারে না। ইংরাজীতে একটি কথা আছে—the more, the merrier। হুজুর এ ব্যাপারটা বিশেষ আনন্দের কারণ হত, যদি প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পে একটি বিদ্যম অর্থসমৃদ্ধ না থাকত।

কাগজ খুঁসেই বেখুঁতে পাই, অনেক বিশ্ববিদ্যালয় টাকার অভাবে নাকে কাঁদছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা নেই, কাম্বীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের তিকার কুণি রাজারাজ্জার দরবারে নিতা উপস্থিত করা হচ্ছে। এলাহাবাদ University তার পরচু হুসোতে পারে না; এবং আমার বিশ্বাস—মত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও সমবহ।

বহুকাল পূর্বে অনেক ইংরাজ educationist-এর বইয়ে পড়ি যে, প্রতি জাতি তার নিজস্ব coal according to cloth কাটতে বাধ্য। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর যা' শুধু থাকে আর না থাকে, এ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়ার আছে জাতীয় ইকনমিক অবস্থা। অর্থাৎ আমাদের কাগজ কম, কিন্তু আমরা মত মত coal কাটতে ত্রুটি হয়েছি। আমরা একবার ভেবেই দেখি যে যে, আমাদের জাতির পক্ষে এতটা উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন আছে কি না। আমরা কি সশক্ত লোককে ব্রাহ্মণ করে তুলতে চাই? এত ব্রাহ্মণের ভিক্ষে বোসাবে কে! আমাদের দেশে শিক্ষা বিত্বারের অপাধ অবসর আছে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার তেমন অভাব নেই, যেমন আছে লোক-শিক্ষার। উচ্চ শিক্ষারও অবশ্য প্রয়োজন আছে, কিন্তু সে বহুলোকের জন্য নয়—বরং সংখ্যক লোকের জন্য। কারণ উচ্চ শিক্ষার অর্থ হা'ই হোক তা' নে লোক-শিক্ষা নয়, তা' বলাই বাহুল্য। উচ্চ শিক্ষা Compulsory নয়, Freeও নয়।

(১৪)

উচ্চশিক্ষা যে বহু অর্থব্যয় করে অর্জন করতে হয়, সে বিষয়ে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গত মাসের প্রকাশীতে তিনি এ বিষয়ে

যে নীতিরূপ প্রবন্ধ লিখেছেন, সে প্রবন্ধ আমি সকলকে পাঠ করতে অনুরোধ করি।

আমি পূর্বে বলেছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা অর্থের অভাবে কাতর হয়ে পড়েছেন। অপর পক্ষে, এ শিক্ষা লাভ করতে বিভাগীদের অর্থাৎ আমাদের মধ্যবিত্ত সম্ভ্রমদের কি বিপুল অর্থব্যয় করতে হয়, তার হিসেব আচাৰ্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আমাদের দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, পাঞ্জাবে প্রতি ছাত্রকে মাসে ১৪০ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত শিক্ষালাভের হণ্ড দিতে হয়। এ কথা শুনে চমকে উঠতে হয়। পাঞ্জাবের প্রতি কলেজ কি রাজকুমার কলেজ? আমাদের ধারণা ছিল যে, বাঙালার কুলনার পাঞ্জাব দরিদ্র দেশ। কলেজের ছেলেদের এত টাকা মাসে কিসে?—শুনতে পাই, বিলেতি পোষাকে। বিলেতি শিক্ষা চর্চার অর্থ কি বিলেতি পোষাকের চর্চা!

বাঙালার অবশ্য বিভাগিকার ধাম এর চাইতে চেয়ে কম। ছেলেদের মাদরাসা বোধহয় গড়পড়তা মাসিক পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু এই পঞ্চাশ টাকাই বাঙালার মধ্যবিত্ত সম্ভ্রমের কি অল্পে দিতে পারেন? যেহেতু বিয়ে সেওয়ার চাইতে ছেলেকে B. A. বানাবার ব্যয় সম্ভবতঃ কম নয়। দুপং কস্তাদার ও পুরোদায়-এত বাঙালী জম্বলোকের আর্থিক অবস্থা যে ভীষণ, তা' বলাই বাহুল্য। এই বিভাগিকার ফলে বাঙালী জাতির দারিদ্র্য বাড়ছে না? কমছে, তা' লোকদেরই ভেবে দেখা কর্তব্য। কারণ, জাতীয় দারিদ্র্য উপেক্ষার বিষয় নয়।

(১৫)

ধাঁরা বলেন যে, “অর্থনৈতিক ভাবের নিত্যতা”, উদ্দেশ্যও বিজ্ঞান্য করি যে, উচ্চশিক্ষা লাভ করে কি বাঙালী জাতি স্বার্থা শিক্ষিত হচ্ছে? তার মহাশয় বলেন যে, না। তাঁর কথা তাঁর সুখেই শোন। থাক —

“আমরা এই বিজ্ঞান-মন্ডিরে যে-সমস্ত ছাত্র B. Sc. Honours লাইরা প্রবেশ করে, তাহাদের সামান্য সামান্য বিজ্ঞানের অজ্ঞতা দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি

হইয়া বাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত নিকা বে ক্রিয়াকর্ম সেকী ও ফুটো, তাহা উপরিস্থিত দুটোতারা প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ প্রতি মনস্কনের ভিতর নরমকন হাড্ডাবান কোথার বলিতে অক্ষম, এবং "পাঁখিব নুজ বালা রচিব মনুজ" কথাটি তাহাদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে। পাঠ্যপুস্তক-ভাগিকানুসৃত কোন বিজ্ঞানের বাহিরে যে কিছু লিখিতে হয়, ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপাত্রাধিন পত্রপ্রকার কুণিয়া লিখায়ে। কোন রকমে নোট লুপ্ত করিয়া "তকমা" পাইসেই হইল। বিজ্ঞানিকা আবার কি?" (উন্নয়ন, আবার, ১০৪০)

অখট Science College-ই বিশ্ববিদ্যালয়ের অপূর্ণ কীর্তি।

এর থেকে দেখা যায় যে, কি-খরে কি-বাইরে, সর্বত্রই এ দুয়ের প্রধান সমতা হতে বর্তমান ছাত্রের সমতা। আর বিধান দুজিমান সোকাবের চিত্ত খোর অব্যবস্থিত। কলে, আককের যিনে সত্যকথা বলতে বললে, প্রিয়কথা বলা যায় না। আবার এই কনোভাবকে যদি কেউ pessimism বলেন, তাহলে তাঁর কথার প্রতিবাদ করব না। আমি বাঙালী, অতএব বাঙালী জাতির economic, political ও educational উন্নো-প্রগতির সব লক্ষণ দেখে মনমরা হয়ে গিয়েছি।

ঐশ্বর্য চৌধুরী

প্রবাসে বাঙালী ছাত্র

আমরা শুনিয়া খুব আনন্দিত হইলাম যে, কালীঘাট নিবাসী ঐশ্বর্যদেব বহু ও বেঙ্গল্যা নিবাসী ঐকেশবজ্ঞ

কোন কারখানায় Electrical Engineering বিশেষজ্ঞ Bulbs তৈয়ারী দিলা করিবেন, এবং আমাদের



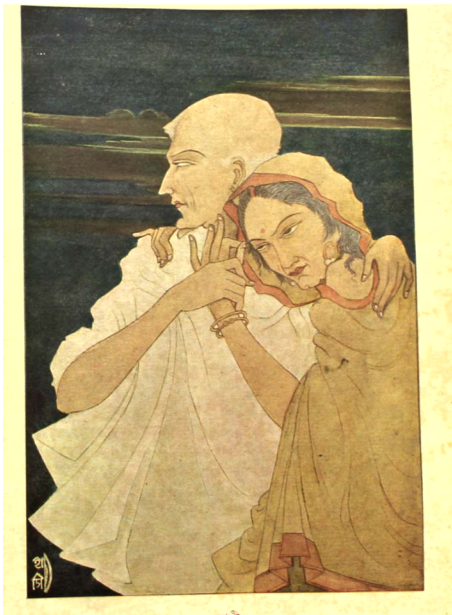
ঐশ্বর্যদেব বহু

যেব নামক দুইজন বাঙালী যুবক ইটালীতে Electrical Engineering শিখিতে গিয়াছেন। ঐকেশ প্রকাশ যে, ইহার দুইজন প্রথমজ্ঞ স্থানীয় এক University-তে কিছুকাল অধ্যয়ন করিবেন এবং পরে ঐ দেশের



ঐকেশবজ্ঞ যোব

দেশে স্বদেশী Bulb তৈয়ারী করিবার জন্য এক ফুন্ড কারখানা স্থাপন করিবেন। আমরা উক্ত যুবকদ্বয়ের সাফল্য সর্বতোভাবে কামনা করি।



উদয়ন — ভাদ্র, ১৩৪০



দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

জন্ম — ২২এ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৫ খুঁটাঙ্গ

মৃত্যু — ২২এ জুলাই, ১৯৩৩ খুঁটাঙ্গ

ভাদ্র

উদয়ন

প্রথম বর্ষ

পঞ্চম সংখ্যা



দেশপ্রিয় মতীন্দ্রমোহন

শ্রীমতীন্দ্রমোহন নাগজী

বিন্দুমাঝে সিদ্ধু মিলে,
সুদ্রমাঝে রুদ্র দেয় সাড়া।
তোমার খণ্ডিত রূপ
দিল সেই সত্যের ইসারা
আজি বহুদিন পরে
আবার তন্ত্রিত বঙ্গমাঝে ;
তাই আজি কোটি কণ্ঠে
তোমার নামের শব্দ বাজে, —
দিক্ হ'তে দিগন্তরে
পদা হ'তে অদূর জাহ্নবী ;
এহণের দিনে যথা
হেরি' নভে রাহুগ্রস্ত রবি।

একাধারে ভীমকান্ত —

প্রদীপ-উদার রূপজ্যোতি !

ভ্যাগের হৃদয়ে নিত্য

সাধিয়াছ শক্তির আরতি ।

দেশের লাক্ষিত মন্থে

ছিল তব অন্তরের বাসা,

দেশের বাক্ষিত ধর্ম্মে

ছিল তব আর্ত ভালবাসা,—

মানেনা যা' কোনো বিশ্ব

সবাসাটী অর্জুনসমান,

স্বর্গের সীমানা ভেদি'

করে বে-বা বীর্ঘ্যের সন্ধান ।

অর্জিতে চিন্তের মুক্তি

মৃত্যুরে করনি তুমি ভয়,

নীলকণ্ঠ সাজি' তাই

আজিকে হয়েছ মৃত্যুঞ্জয় !

কি গান গাহিবে কবি,

ওগো বন্ধু, ওগো দেশপ্রিয়,

তোমার অভয়মন্ত্রে

লক্ষ কর্ণে দীক্ষা আজি দিও ।

কণ্ঠে মোর নাহি হ্রস্ব,

মুদ্র বাণী শোকে হৃনির্ব্বাক্ ;—

কত কথা আসে মনে —

কি হবে তা' ? মনেই সে থাক্ ।

বাবসা-বাণিজ্য ও বিজ্ঞাশিক্ষা

আচার্য্য ত্রিপ্রহরচন্দ্র রায়

ইতি-পূর্বে "সাত্তাধা শিক্ষার বাহন" শীর্ষক চইটি প্রবন্ধ দিয়াছি, ভবিষ্যতে এবিধের আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। কিন্তু, আপাততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিভ্যাসের উন্নততা আমাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে কতটা গিছাইয়া দিতেছে, তাহার আলোচনা করা হইতেছে এবং ব্যবসায়ী হইয়াও যে আশ্চর্য্যের মধ্যে দেখাপড়া সেখা যায়, তাহাও সেখান হইতেছে। মূল প্রবন্ধের সহিত এই প্রবন্ধের মধ্যে সন্দেহ আছে; পরে তাহা সেখান হইবে।

যদি বিজ্ঞানিকার দ্বারা প্রকৃত শৃঙ্খলা থাকে, তাহা হইলে অতি শৈশবাবস্থা হইতে বাবসায়ে শিক্ষানবিশী করিলেও বিজ্ঞানজনের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। মনে করুন, একটা ছাত্রকে বাইরের বা ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়াইয়া কোন বড় সোকানবার অথবা একজন ব্যবসায়ের নিকট শিক্ষানবিশ করিয়া সেওয়া হইল। তাহা হইলেই যে সেই সময় হইতে তাহার বিজ্ঞানিকার পথ রুদ্ধ হইল, ইহা মনে করা ভুল। আমার আশ্চর্য্যের "সময়ের সন্ধ্যাবহার ও অপব্যবহার" শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। মনে করুন, আপনার ছেলে ১০।১৪ বৎসর বয়সে কোন একটা বড় সোকানে প্রবেশ করিল। সাধারণতঃ বেলা ১০টা হইতে ৪টা বা ৬টা পর্য্যন্ত তাহাকে হাজির থাকিতে হয়। আমি এই বৃত্তবয়সেও প্রত্যয়ে প্রায় ৪টার পূর্বে শয্যাভ্যাগ করি, এবং প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া অন্ত্র আদ-বষ্টা কাল সবসে বেড়াইয়া থাকি; পরে সামান্য কিছু প্রাতঃভোজনের পর ৬টা-৬।৩০টার সময় হইতে অধ্যয়নে নিরত হই এবং ৮।০ টার মধ্যেই বাহা কিছু শুকতরার বিষয়ের অধ্যয়ন, তাহা শেষ করি। এখন, ছেলের বয়স ১৪ বৎসর; শুকতরা তাহার অন্ত্র ৮খণ্টা নিম্নার প্রয়োজন। সে যদি রাতি ২টার শয়ন করে এবং ৪টার

সময় শয্যাভ্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার প্রতি কোন অবিচার করা হয় না। সে ছেলে প্রত্যহ অন্ত্রতঃ ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে পড়িতে পারে। যদি এই হিসাবে আশ্চর্য্যের পড়াওনা করে, এবং কোন বিষয় চুজের হইলে অপরের নিকট হইতে সাহায্য লয়, তাহা হইলে সে বৎসরের পর বৎসর এই প্রকারে যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করিতে সক্ষম হয়। এইরূপে আপনার ছেলে একজনের নিকট শিক্ষানবিশী করিয়া অভিজ্ঞতা লভ্যের পর নিজের পাতে পড়াইবার উপযুক্ত হইল, এবং আপনি তাহাকে একখানি ছোট সোকান করিয়া দিলেন। সে সরকার হইলে ২টা হইতে লভ্য। পর্য্যন্ত সোকানে রহিল। প্রায়ই সেখা যায় যে, বিপ্রহর হইতে বেলা ৪টা পর্য্যন্ত বহিঃস্থানের সমাপন খুবই কম হয়। যদি বাড়ীতে সন্তান পড়ার সুবিধা না থাকে, তাহা হইলে সে এই তিনখণ্টা কাল বেশ পড়াওনা করিয়া সময়ের সন্ধ্যাবহার করিতে পারে। আসল কথা এই যে, ব্যবসায়ে চুকিলে যে দেখাপড়ার পথ রুদ্ধ হয়, ইহা অত্যন্ত ভুল ধারণা।

আমি অনেক স্থলে এনট্রু কারমেরি কথা বলিয়া থাকি। বাংলাকালে তাঁহাকে কঠোর হারিয়ার ও প্রতিকূল অদৃষ্টের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। একদিন তিনি সমস্ত দিনের শুকতরার পরিভ্রমের পর রাত্রিতে ঘিরেটার দেখিতে দিয়াছিলেন। সেখানে তিনি সেক্ষণীয়ের একখানি নাটকের অভিনয় দেখেন, এবং ইহা তাঁহার এত মনগ্রাহী হইয়াছিল যে, তিনি এই সময় হইতে মহাকবির নাট্যাবলী পড়িবার দ্বারা অত্যন্ত আগ্রহাধিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু শুকতরার পরিভ্রম পড়িবার মত সক্তি তাঁহার ছিল না। এমন সময় তিনি গুনিলেন যে, কোন সন্ধ্যায় প্রতিকূল তাঁহার পাঠ্যপত্রের পুস্তক সর্ম্মাদ্যাবধিক

পণ্ডিতে দিতে ইচ্ছুক। কারনেদী এই পুস্তকালয় হইতে লেকশনারের নাটকাবলী সংগ্রহ করিয়া কেবল বে কঠর করিলেন, তাহা নহে,—ব্রহ্মপুত্র করিলেন। তাঁহার আশ্চর্যতে দেখা যায় যে, তিনি প্রায়ই এই মহাকবির পরাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন। পরিণামে তিনি সাহিত্যিক হিসাবেও প্রতিপত্তি লাভ করেন। তিনি কেবল মার্কিন দেশে নয়, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একজন প্রধান লৌহকারখানার মালিক ও ধনকুবের বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

এইবার বেজামিন ফ্রাঙ্কলিন-এর আশ্চর্যত হইতে কিছু বলিব। ইহার পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। চর্মের বাতি তৈয়ারী করিয়া কোন রকমে দিন ভরান করিতেন। বেজামিনও বাল্যকালে তাঁহাকে এই কার্যে লগ্নেই সহায়তা করিতেন। কিন্তু অবসর সময়ে আশ্চর্যের পড়াওনা করিতে কখনও ছুটি করিতেন না। পুস্তক কিনিবার সক্তি ছিল না। ছুই-একজন পুস্তক-বিক্রেতার সহিত ভাব করিয়া সন্ধ্যার পর তাহাদের নিকট হইতে এক একখানি পুস্তক, পরদিন সোকান খুদিবার পূর্বেই প্রেরণিত হইবে এই সত্রে, ধার করিয়া আনিতেন। কায়েই তাঁহাকে রাত্রি জাগরণ করিয়া পুস্তক পাঠ করিতে হইত। ইনি প্রথমে কম্পোজিটরের কাজ করিতেন, পরিণামে নিজে মুদ্রায় স্থাপন করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন, এবং রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রেও অসামান্য প্রতিপত্তি লাভ করেন।

বিখ্যাতজ্ঞানের মোহ হইতে যদি কেহ অব্যাহতি লাভ করিতে না পারেন, তাহা হইলেও এই তুম্বা উপার্জন করিয়াও যথেষ্ট সময় থাকে। সে সময়টা যেকোন এক ব্যবসারে শিক্ষানবিশী করিতে পারা যায়। উল্লেখ্য এই ইংরাজী-বিজ্ঞানের প্রায় ৪০ মাস, কয়েক ৬ মাস, এবং পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে প্রায় ৭ মাস ছুটি থাকে। আমাদের ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদের ১৫ই মার্চের মধ্যেই পরীক্ষা শেষ হইয়া যায় এবং আবার ১৫ই জুলাই-এর পূর্বে ক্লাস

খোলা হয় না। এই মহাশূণ্য সময় হাজিরগ দিবানিত্রা, আড্ডা, থোন্স গল্প, ডান্স-কেবল ইত্যাদিতে বৃথাই নষ্ট করে। এই সম্পর্কে অত্যন্ত সামগ্রিক পত্রিকার, ইহার সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। এখানে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে বাহারা জগতের মধ্যে নীর্ণহান অধিকার করিয়াছেন, যথা ইংলণ্ডের প্রধান বহী ম্যাকডোনাল্ড, ইটালীর সর্বময় কর্তা মুসোলিনী, জার্মানীর ভাগ্যবিধাতা হিটলার ও সোভিয়েট রাশিয়ার ষ্টালিন্ প্রভৃতি অতি হীন অবস্থা হইতে কুলি-মজুরের কাজ করিয়া ও আশ্চর্যের অধ্যয়ন করিয়া এই সকল উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছেন। কতদিনকালেও ইহাদের কাহারও বিখ্যাততালয়ে প্রবেশ করিবার সুযোগ হয় নাই।

আমাদের দেশেও এইরূপ যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। ভারতের অর্থনীতি, Exchange, Currency ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাহারা মাহু বসিয়া গয়া তাহাদের মধ্যে শ্রুত বনভ্রাম দাস বিরলা, বালচাঁদ হীরাচাঁদ, নারায়ণ দাস কল্যাণদীর্ঘ নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে কেহই যে বিখ্যাতজ্ঞানের সম্পর্কে আসিয়াছিলেন, তাহা আমার জানা নাই। অথচ ইহারা খীর খীর প্রতিজ্ঞা-বলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যেমন উচ্চহান অধিকার করিয়াছেন, তেমনি অর্থনীতির জটিল গ্রন্থের সমাধান করিতেও বিশেষ পারদর্শী। বাবলা দেশের মধ্যেও শ্রুত নলিনীরঞ্জন সরকার, যিনি সমগ্র ভারতের কেডারেটেড চেম্বার অব কমার্স-এর সভাপতিত্ব করিতেছেন, তিনিও বিখ্যাতজ্ঞানের প্রবেশ করেন নাই। অথচ তিনি অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বাবতীয় বিক্রে বাবলা দেশের মুখপাত্ররূপ। সর্জনসেই হইতে এখনই Tariff-ও, Industry-এর প্রভৃতি বিষয়ক যে সব Commission নিযুক্ত হয়, তখন ইহাদেরই মধ্যে কেহ না কেহ নির্বাচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু সুখিত পণ্ডিত অধ্যাপকের বড় একটা ডাক পড়ে না। এই সব জগত উদাহরণ দিবার উদ্দেশ্য এই যে,

ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই যে 'আমর নিরেট মূৰ' হইয়া থাকিতে হইবে, ইহা ভুল ধারণা। বাহ্যর শিবির আর ইচ্ছা আছে, তাহার পথ সদাই প্রশস্ত। কিন্তু আমাদের দেশে পাশ করার মোহ এত অনর্থ বহি করিয়াছে যে, ডিগ্রীলাভ করাই বেন জীবনের এক মূখ্য উদ্দেশ্য এবং তাহা হস্তগত হইলে বোধহয় পুত্রকর্তা ২৫ জনও আর পুত্রকের খার ধারেন না।

বঙ্গালী যুবকগণ কেন ব্যবসা-ক্ষেত্রে পরাভূত তাহার আরও কারণ দেখাইতেছি। প্রথমতঃ, মা-বাপের উৎসাহেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপখারী চক্কো চাই, তখন তাহার জীবনের ২০-২২ বৎসর কাটিয়া দিয়াছে, নূতন কিছু শিখিবার আর উৎসাহ বা আগ্রহ নাই এবং পুণ্ডিত বিদ্যার অভিমানে সে বিতোর। আমি অনেকগুলি কল-কারখানার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সঙ্গিষ্ট। যদি কোন গ্রাহকেরটকে কোন বিভাগে লওয়া যায় এবং তাহাকে বলা হয় যে, শিক্ষানবিশীকালে কিছুদিন অল্প ভাতা লইয়া যৈণা ও সহিষ্ণুতা সহকারে কার্য শিক্ষা কর এবং অভিজ্ঞতা লাভ করিলে সিঁড়ির সোপানের জায় তোমাকে ঘীরে ঘীরে উঠিতে হইবে, তখন প্রায়ই দেখা যায় যে, ৪০ দিন তিনি এই প্রকার ছুরিয়া কিরিয়া বসেন যে, একাধ তো আমার পেছা হইয়া দিয়াছে; এইবার নূতন কোন কাৰ্য্য দিন, অথবা যে-বিভাগে আমি যোয়াখুরি করিয়াছি, সেই বিভাগে মোটা বেজনে একটা চাকরী করিয়া দিন। বলা বাহুল্য যে, এই বিভাগে সম্যকভাবে কাৰ্য্য শিখিতে হইলে তাহার অন্ততঃ ৪০৫ বৎসর শিক্ষানবিশী করা আবশ্যক। শুধু আমেরিকা ইংলও কেন, এদেশেও অনেকে একটি মশালার দোকানে কাছাড়ার হইয়া বা সামান্য কোন কার্যে নিযুক্ত হইয়া পরে সেই ব্যবসারে অস্বীকার হইয়াছেন বা অভিজ্ঞতা লাভের পর সেই ব্যবসা স্বাধীনভাবে অবলম্বন করিয়া প্রকৃত ধনোপার্জন করিয়াছেন। পরলোক-পুত্র কুশলানাথ বহু মহাশয় India Council-এ যোগ্য ছিলেন; একদিন তিনি জাহার একজন সহযোগীকে (colleague) কোন

বঙ্গালী যুবককে Banking শিবিরে ভ্রম apprentice লইতে অনুরোধ করেন। India Council-এ অর্থনীতিজ্ঞ, বিশেষতঃ ব্যাংক-সংশ্লিষ্ট, দুই একজন যোগ্য সঙ্গী হইতেন। এই যুবকটার সহিত সাক্ষাতের পর তিনি কুশেনবাবুকে বলিলেন, করিয়াছেন কি? যুবকটা জঁকাল রকম উপাধিধারী এবং তার বয়সও ২০-২২ বৎসর। এবরসে আমাদের দেশে apprentice লওয়ার প্রথা নাই। আমাদের এখানে School final Certificate লইয়া ১০-১৪ বা বড় বেশী ১৬ বৎসর বয়সে প্রবেশার্থী কোন Bank-এ চুক্তিয়া দরকার মত বর কাঁট দেয়, সিঁড়ন হইয়া টিপিপত্র বিলি করে এবং অবসর মত এক-একজন অভিজ্ঞ কর্মচারীর নিকট বসিয়া কাৰ্য্য শিখিয়া থাকে; এই প্রকারে সে পরিচেষ্টে উপযুক্ত হইলে ব্যাংকের এক বিভাগে অল্প বেতনে চুক্তিয়া ক্রমোন্নতি লাভ করে, এবং ১৪-১৫ বছর পরে সেই বিভাগের কর্তা হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও এই কারণে বাহ্যারা বংগালুরুমে ব্যাংকা করিয়া আসিতেছেন, বলা সাহা, তিনি, পদ্মবিনিক, কপালি ইত্যাদি—তাঁহাদের সম্ভান-সহিত এই প্রকার ১০-১২ বছর বয়স হইতেই আরম্ভ করিয়া য় য় ব্যবসারে অভিজ্ঞতা লাভ করে, আর মাফোয়ারী বা ভাটিয়াদের ও কথাই নাই।

কলেজ-শিক্ষিত যুবক কেন এত অপর্য্যাক্ষ হয়— তাহার আরও কারণ দেখাইতেছি। ইহাদের প্রথম হইতে লম্বা-চওড়া নম্বর দেখা যায়। অনেক সময় পৈতৃক বৎসরকর্ম লইয়া, কখনও-বা বড়রের ঘাড় ভাঙ্গিয়া, টাকা সংগ্রহ করে। ইহাদের ব্যবসা করা মানে, সহরের সময় আছায়া আসে একটা আফিস খোলা — সেখানে আবার চেয়ার-টেবিল সাজান চাই — বৈজ্ঞানিক পাখা ও বাতি ও কটেই, আবার সময় সময় মোটর গাড়িও থাকে। কিন্তু তিনি যে সোফাঘর গলব করেন, তাহা তাঁহার মাথার প্রবেশ করে না। শুধু যুবকদিককে সোব দিলে কি হইবে? তাহাদের অভিজ্ঞতাব্যবসায়ও এবিধের সম্পূর্ণ অভাৱ, বাহ

আড়ম্বরে ইহারা ব্যবসার অঙ্ক বদিয়া মনে নিকট সেই জিনিষ বেচিতে হয়, তাহার কোন খোঁজ করেন। ক্রিয়ান্দের কোন অভিজ্ঞতাও নাই-ই; সবাই রাখেন না; হুতরাং, ব্যবসা-ক্ষেত্রে ইহারা এবং পূর্বে বর্ধিত শিক্ষানবিশির অভাবে কোথায় কতকগুলি লোকের জীভার পুত্রদি হইয়া গিয়াছে। • কোন্ জিনিষ কি মরে কিনিতে হয় এবং কাহার •

• ক্রিয়ান্দের সর্বদা কর্তব্য অনুষ্ঠিত

স্বর্গত সুখী জগদানন্দের উদ্দেশে

শ্রীকালিদাস দ্বানন্দ

দিলে আনন্দ বাঙালী জাতিরে জগতের কথা বলি',
 তাই বুঝি তব জগদানন্দ নাম ;
 ছিলে সৃষ্টির গুণ রহস্য খুঁজিতে কৌতূহলী,
 বিশ্ব তোমার ছিল রহস্যধাম ।
 জটিল ভাষা নীরস সভ্য তোমার লেখনী চুমি'
 ধরিয়াছে সব রসসাহিত্য-রূপ,
 শুধু আশ্রমগুরু নও, দেশে লোকগুরু ছিলে তুমি,
 বাণী-মন্দিরে তুমিই ছেলেছ ধূপ ।
 ক্ষুদ্র কীটের জীবনধর্ম খুঁজেছ অন্ধকূপে,
 ক্ষুদ্র কুলের প্রাণের মর্মখানি,
 অক্টা কোথায় বনের আড়ালে রচিছেন চুপে চুপে
 উঁকি দিয়ে তুমি তাহাও এসেছ জানি ।
 নব তমসার আশ্রমে দিলে যথুক-তরুর ছায়
 রসের সঙ্গে সত্যের পরিণয়,
 করে বিজ্ঞান অর্থা প্রদান রসলক্ষ্মীর পাশ,
 তোমার জীবনে পাই তার পরিচয় ।
 প্রকৃতি-পুরীর কত যবনিকা ভেদিয়াছ অহরহঃ,
 তোমার জীবনে আজি যবনিকা-পাত,
 সকল তারকা এহের বার্তা শুনাতে, হে দূত, কহ
 কোন্ গ্রহে গেলে পাব তব সাক্ষাৎ ? •

শিশু-সাহিত্য

শ্রীশান্তা দেবী

শৈশবে মানবকন্ম বাংলা বই পড়িবারি। কোনটা কোন ভাল সাহিত্যকে এবং তাহার ভিতর এক একটা কোন চিত্রদিনের মত মনে আঁকা হইয়া গিয়াছে, তাহা তখন বৃষ্টি নাই, এখন ভাবিয়া সেখানে অনেকটা বৃষ্টিতে পারি। কিন্তু তবু একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে অতীতকে অতীতের চোখে দেখিবার ক্ষমতা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। স্মৃত্তরায় কেবলমাত্র নিছক শৈশবের অভিজ্ঞতাকে বর্তমানের বিচার-শক্তির সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়া শিশু-সাহিত্যের মাল-মশলা ভেঁয়া করা যায় না। আমার অভিজ্ঞতাকে নূতন ও ধীরে করিয়া নূতন দৃশ্যের ধীরে শিশুর ভিতর দেখিতে হইবে। সে দেখা কেবলমাত্র চোখের দেখা নয়, শিশুর সহিত একাক্ষ হইয়া তাহার খেলা, তাহার পড়া, তাহার কল্পনা, তাহার সঙ্গ-কিছুই লাগী হইয়া তাহার মনোলোকে ভ্রম করিতে হইবে, তবে শিশুর প্রয়োজন, শিশুর আনন্দ-উৎস, এবং শিশুর জ্ঞান ও কল্পনা বিকাশের পথ আমরা বুঝিয়া পাইব। কিন্তু দ্রুতের বিষয়, মাতা ও শিক্ষক, ঐহারা শিশুকে এমন করিয়া দেখেন, তাহারা শিশু-সাহিত্য রচনা করেন সচিব; আবার ঐহারা শিশু-সাহিত্য সরবরাহের ভার লইয়াছেন, তাহারা শিশুর সহিত যোগ রাখেন না অবিকালে ফুলেই। তাহার ফলে অবিকালে শিশু-সাহিত্য, শিশুর কাষে লাগে না, সাহিত্যেরও কাষে লাগে না।

এখনও, শিশু-সাহিত্যকে হুইট বড় ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম আনন্দ-বিতরণ অর্থাৎ মনের উৎসব পুষ্টির ক্ষণ, দ্বিতীয় জ্ঞান-বিতরণ অর্থাৎ জিন্সের প্রসারতা বৃদ্ধির ক্ষণ। কিন্তু কেবলমাত্র এই হুইট কথা মনে রাখিরাই অনেকে কাষে অগ্রসর হন। তাহারা কাহাকে মানস এবং জ্ঞান মিছে আদিরাছেন, তাহা ভুলিয়া যান। শৈশব কালের

সীমা অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহার রূপ বিভিন্ন। ভোরের আকাশের রং সেরন ফলে মধ্যে নূতন রূপ ধারণ করে, শিশুর মনও তেমনি বর্ষে বর্ষে নূতন আলোর বতীন হইয়া উঠে। শিশুর বর্ষ-পরিচয়ের দিন হইতে তেজ-চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যদি একই মনোভাব লইয়া আমরা তাহাদের চিত্তবিনোদন ও জ্ঞানদান করিতে বসি, তাহা হইলে আমাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ যায়। যে শিশুর বয়স বড় কম, তাহার জগতের পরিধিও তত ছোট। সচরাচর দেখা যায়, শিশুরা সাত-আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যেক ইঞ্জিনগ্রাহক বিষয় ও বস্তু হাড়া আর কিছুতেই বিশেষ রূপ পায় না। সেইজন্য চিত্রহীন গল্পে তাহারা আনন্দ পায় না। রামায়ণের গল্পের রাম-সীতাকে যদি দেখিতেই না পাওয়া পেন, তবে অনেকা অজানা লোকের গল্প শুনিয়া লাভ কি? এই যে চিত্র, ইহা শুধু চিত্র হইলে হইবে না, গল্পটো হইবে বাক্য দিয়া আঁকা ছবিরাই মালা। তিন বৎসরের শিশুকে বলুন—“অযোধ্যায় দশরথ নামে এক মহা রাজা ছিলেন।” তাহার কিছুই আনন্দ হইবে না, যদি-না আপনি রাজার সোনার মুহূর্ত, মুক্তার মালা, হীরার হুল, ছবির পোষাক, চোখের হুহুয়ার আগাশোড়া বর্ণনা করেন। তাহার প্রকাণ্ড রাজা ও অনন্য প্রজা বলিলে ছত্র-শাত বৎসরের শিশু পর্য্যন্ত সহজে বুঝিবে না এবং বুঝিলেও তাহার কল্পনা খুব-কিছু বোরাক পাইবে না। চার বৎসরের শিশু দৃষ্ট শুনিয়া খুশী হইবে যে, দশরথের সপথানা গাড়ী, কুড়িখানা গাড়ী, পশিষ জন চাকর ইত্যাদি ছিল। এইভাবে রাজ-প্রজা তাহাকে বুঝিতে হইবে। না হইলে, ছয় বৎসরের বেশ তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিশুও বুঝরাই রাজার একশত হেলে ছিল শুনিয়া প্রশ্ন করে—“এত হেলেরক পাইতে দিত কিসে করিয়া? এত থালা ও মাছের থাকে না।” রাজা

নামক জীবটিকে সাধারণ মানুষ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিয়া তাহাতে শিক্তরা সচরাচর সাত-আট বৎসর পর্য্যন্ত পারে না। সুতরাং তাহার যে অনেক অর্থ, এবং সেই অর্থের বিনিময়ে যে একশত হেলের খাশা-বাসন সবই কেনা যায় এবং সে অর্থ যে রাশা প্রভাবের কাছ করার বলসে পান, এই প্রত্যেকটি কথা ছাত্র-সাত বৎসরের শিক্তকে সম্পূর্ণ দৃষ্টান্তের সাহায্যে বর্ণনা করিয়া বলিয়া দিতে হইবে। কিন্তু দশ বৎসরের বাসককে একথা বলিতে সেলে সে অগম্যন বোধ করিবে। কাম্বই দেখা হাইড্রেছে, শিক্ত-সাহিত্য সকল শিক্তর প্রয়োজন মিটাইতে পারে না, যদি-না তাহার প্রত্যেক বয়স অঙ্গুসারে নূতন রকম চোরায়া হয়।

যা যদি তাহার সন্তানকে আগাগোড়া নিষেধ হাতে মানুষ করেন, তাহা হইলে যে বয়সের হেলের সঙ্গে তিনি যেমন করিয়া যে বিষয়ে গম্ব করেন, এবং তাহারা নিষেধের মধ্যে যেমন করিয়া বাহা লইয়া খেলা করে, প্রধানতঃ সেইগুলি অবলম্বন করিয়াই সেই সেই বয়সের শিক্তর সাহিত্য রচনার ভিত্তি গড়িতে হইবে। অবশ্য এই ভিত্তির উপর রচনা ও জ্ঞানের সৌধ অনেক নূতন মাল-মশলা দিয়া গড়িতে হইবে, না হইলে শিক্তর মনের বিকাশে সাহায্য করা হয় না।

চার, সাত-চার বৎসর বয়সে অনেক শিক্তই বর্ণ-পরিচয় প্রথম ভাগ পড়ে। তাহাদের মস্ত আশকাল মুক্তাক্ষবল্লিত বই দেখা হয়। এই রকম একখানা বইয়ে যদি ছাত্র দেখা যায়—“লেডার মোকানের দামনে পকেটে হাত দিয়া বেগিয়ান বাসের টিকিট কিনিবার পরয়া নাই”, তাহা হইলে মনে হইবে লেখক অন্ততঃ ৮৯ বৎসর বয়সের হেলেকে গম্ব বলিতেছেন। চার বৎসরের বাঙালী শিক্ত কখন লেডার মোকান বেগিয়াছে, এবং কখনই-বা পকেটের পরয়ার অভাব বুঝে? শিখি-বার সময় আমরা এই কথাগুলি সম্পূর্ণরূপে ছুটিয়া বাই।

ছোট হেলেরা অঙ্গুপ্রাঙ্গণ ও ছক খুব ভাজিয়াছে। তাহার মস্ত কবিতার প্রয়োজন আছে। সে কবিতা অর্থহীন আবল-তাবল হয় কতি নাই; কিন্তু তাহাতে

মস্ত মস্ত তথ্যকা থাকিলেই বিশেষ। অনেকের ধারণা, রবীন্দ্রনাথের “শিক্ত” আগাগোড়াই শিক্ত-সাহিত্যের দলে। বইখানি উচ্চবয়সের সাহিত্য—সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা যে অনেকাংশে শিক্ত-বয়সের অধিকারী যাহার অন্তর-রাশোর খালো-হাওয়ার ইতিহাস, শিক্তর মাতারই মূখপাঠা সাহিত্য, তাহা ছুটিয়া আমরা শিক্তের নির্মিচায়ে সব কবিতা পড়াইতে বসি। দেখিতে পাই যেখানে—

“বুড়ী জোয়ার কিছু বোকে না মা।

বুড়ী জোয়ার তারি হেলেনায়াহা।”

কিবা, “বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে!

কিছুই বোকা যায় না সেখেন কি যে!”

অথবা, “আমাকে মা শিখিয়ে দিবি, রাম-বাহার পান,
নাথার বেঁথে দিবি চুড়ো হাতে ধুক-বাণ!”

প্রকৃতি সম্পূর্ণ হুবি আঁকা আছে, সেখানে শিক্তের পড়িবার উৎসাহের অন্ত নাই। কিন্তু যখন পড়াইতে বসে যায়—

“মা যবে ছিল কিশোরী মেয়ে

কলপ তারি পরাণ ছেয়ে

মাধুরীকণ্ঠে মুরহি ছিল

কখনি কোনো কথা

যোকার পারে মিলিয়ে আছে যে কটি কোমলতা।”

তখন শিক্ষকের মুখে মন তাহাতে ঢুবিয়া যায়, কিন্তু শিক্ত ছাত্র-ছাত্রী বলে—“আমাকে বড় হাই উঠেছে, খেলা করি গিয়ে।”

কিন্তু শিক্তের মাসিক পড়ে দেখা যায়, এইরূপ তৎপূর্ণ অনেক কবিতাই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য না বুঝিয়া পরিবেশন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ কোন্টা ছাত্রের মস্ত গিবিয়াছেন, তাহা কেবল তাহে না।

অথচ আট-নয় বৎসরের শিক্তের যে সমস্ত কবিতায় বাস্তবিক রূপ পায়, আশকাল তাহাতে অভাব বাহিয়া চলিয়াছে। আমরা শিক্তকালে শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয়ের রচিত কবিতা মুক্কাইয়া পড়িয়াছিলাম, আশাও মনে আছে :—

“হু! গু! অথ দুটি করেতেছিলে জলশান,

এমন সময় এলেন তথায় বহু একজন লম্বাফান”

কিন্তু অনেক মুখস্থ করিয়া পড়া অক্ষরভ্রমের দ্বারা মহাপ্রভুর “বিভা অলুয়া ধন” আচ্ছ “চাকপাঠ” খুলিয়া পড়িয়া দেখিতেছি, এক অক্ষরও কোনো দিন পড়িয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে না।

এই পুস্তকে শিশুদের পাঠ্যপুস্তকের কথাও কিছু আসিয়া পড়ে। আট-নয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ইঞ্জিরগ্রাফ বহু ছাড়া অত্যন্ত বিষয়ে শিক্ষা দিলে শিশুরা তাহা স্পষ্ট বৃত্তিতে পারে না। কারণ ভাববাচক, গুণ-বাচক, কি তত্ত্ববাক্য জিনিষ বুঝিবার মত মন তখনও তাহাদের গঠিত হয় নাই। তাহারা আপন আপন মনের ভিতর এমন কোনো স্থলে পায় না, বাহ্যকে অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞা, সত্যোৎপাদ, আত্মপ্রকাশ, আত্ম-মানি, কৃতজ্ঞতা, পিতৃভক্তি ইত্যাদি বিষয় বৃত্তিবে। “চাকপাঠ” খুলিয়াই আচ্ছ দেখিতেছি উচ্চ প্রভবণ, দীপমক্ষিকা, জলজন্তু, পুরুষ প্রভৃতি আচ্ছ ও অজানা বিষয়গুলির বাস্তব রূপ আছে বলিয়া তাহাদের কথা বাহা পড়িয়াছিলাম, অনেকটাই মনে আছে। কিন্তু সত্যোৎপাদ, আত্মপ্রকাশ, আত্মমানি ইত্যাদি লইয়া পরিণত বয়সে প্রত্যাহ কারবার করিতে হইলেও এগুলির বিষয়ে বালাবীচনের কোনো বৃত্তি নাই। সেই জন্য আমার মনে হয়, তবু কি ভাববাচক বিষয় শিশুদের মন-মন বৎসরের পূর্বে পড়াইয়া কেবল মনর নষ্টই হয়। বহু-বিষয়ে এই বয়সে তাহাদের যে উৎসাহ, সে উৎসাহকে ধ্বংস ভাবে কাজে লাগাইতে পারাই তখন প্রয়োজন।

শিশু-সাহিত্যের ভাষা, বিষয়, ছবি ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কথা বলিবার আছে, সংক্ষেপে বলা নক্ত। কেবল একটা কথা এখানে বলিয়া রাখি। শিশুদের দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ এবং তাহারা অত্যন্ত কঠিন মনোযোগের। শিশু-সাহিত্য লেখকদের (এবং অল্প লেখকদেরও) কোনো-সময় নাই, সুতরাং তাহাদের বাহার বাহা কিছু

ইচ্ছা। সেইরূপ ভাষা ও পদ প্রয়োগ করিয়া বিষয়টি লম্বা হইয়াছে দেখিলেই তাহারা শিশু-পাঠ্য হইল মনে করেন। একজন লেখক লিখিলেন “বোশা”, আর একজন লিখিলেন “বোবা”, একজন লিখিলেন “গুপ্ত বোলা”, একজন “গুপ্ত”, আর একজন “গুপ্ত বোলা”। শিশুরা বর্ণপরিচয়ের বিজ্ঞা লইয়াই ইহাদের কুল বরিতে বলে এবং শিক্ষক পূর্ব কড়া না হইলে, বহু বিভিন্ন ভাষা প্রত্যাহ পড়ে, ক্রমে তত হতাপ হইয়া যখন বাহা খুলী লিখিতে থাকে। শিশু-সাহিত্য: এবং কুল-পাঠ্য সাহিত্যের ভাষার একটি নির্দিষ্ট আদর্শ ও ধারা থাকা প্রয়োজন। মানুষের শিক্ষা শেষ হইয়া গেলে সে আপনাব পথ বাহিয়া লইতে পারে, কিন্তু পথ-চলা লিখিবার সময় তাহাকে যদি প্রতি পায়ে কাঁটাবন লাড়াইয়া ও থানাবন্ধ ডিকাইয়া চলিতে হয়, তবে সে চিরকালের মত পন্থ না হইয়া যায় না। শিশু-সাহিত্যের তরুণ পথপ্রদর্শকরা এইরূপ সোলক-খাঁচার পৈশ্বে খুরিয়াছিলেন বলিয়াই তবিত্য-ব-বীর্ষদের তাহারা এমনি থানায় বসে কেলিজেছেন, বেশ বৃত্তিতে পায়। যায়। সুতরাং আর মন-নায়ে বৎসরে ভাষার সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও কেম্বাচার আসিবার পূর্বে এই বোলা ইহার একটা স্বাভাবিক বাঁধিয়া দেওয়া প্রয়োজন। কথা ভাষার অস্বাভাবিক ক্রিয়া ইত্যাদির আসে তাহাকে না লাড়াইয়া বই-এর লম্বা ভাষাই তাহার আদর্শ হইলে ভাল হয়। শিশুদের সহিত তর্ক করিয়া দেখিয়াই পাঁচ বকম কথা ভাষার চেয়ে একবকম পাঠ্য ও লেখ্য ভাষার প্রয়োজনীয়তা তাহার। লম্বা মানিয়া নয়। শিশু-সাহিত্য সৃষ্টি বিষয়ে ভাবিতে বসিলে মনে বহু চিন্তার উদয় হয়, তাহার ভিতর লাড়াইয়া পড়ার আসে এইখানেই শেষ করা ভাল। *

* ভালকলা সাহিত্য-লক্ষণের “মহিলা বিভাগ ও শিশু-সাহিত্য” পাতায় লিখিত-ব পত্রিক। — শিশু-সাহিত্যের লক্ষণ।

আবরণ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

সকলেই বলে স্বপ্নের সংসার ।

কোলাহল-কলরব নাই,—অশান্তি-অসন্তোষ দূরায়িত
হইয়া উঠে না,—নির্জিন্দে, সুশৃঙ্খলে চলে পাড়ার মধ্যে
আম্বৰ্ণ সংসারটি ।

বিখনাথ বি-এ পাশ করিয়া জেলা-স্কুলের মাষ্টার
হইয়াছে । বেতন বাহা পায়—পত্রিপত্রী ও ছাঁট
সত্তানের স্বধ-সন্তোষের সুখ মিটাইয়াও সেজিল ব্যাচে
মাসে মাসে কিছু জমা হয় । গৃহ-সল্য ছোট পুত্রে
চার মাসে জন্মিরাছে প্রচুর ; সোশালে গুটি চারেক
ছদ্মবতী গাড়ী এবং পুত্রবীর চারি পার্শে নাতিবৃৎ
আমবাগানের একাংশে কলা-সুনার চাষও কিছু কিছু
হইয়া থাকে । সর্গোপরি—রাড়সেলে বিধা কতক
ধানের জমি আছে । বৎসরান্তে বাজনা মিটাইয়া ধান
বাহা ধরে আসে, তাহাতে এই কয়টি প্রাণীর অন্যায়সে
চলিয়া যায় ।

স্বলভা হুটীশির ভালরূপই জানে । জেলার মধ্যে
রন্ধনের কার্যে তাহার হুনাম প্রচুর এবং বিদ্যুৎ
বলিয়াও খ্যাতি আছে । নিতা দ্বিপ্রহরে বাড়ীতে তাহার
ছোটবাটো পাঠশালা বসে । প্রাথমিক শিক্ষা, হটী-
শিত, পান, গৃহকর্ম ইত্যাদি বিষয়ে সে বালিকাদের
শিক্ষা দিয়া থাকে । সকলেই স্বলভার আত্মীয়—
সকলেই তহাঁকে ভালবাসে ।

অজ্ঞাত মাষ্টারেরা বিখনাথকে হিসা করিয়া বলেন,
“সন্সারে এসে তুমিই মহাটা লুটলে, বিত্ত । আর
আমাদের সংসার, না কর্তব্যোপ । যেমন যেজাখ
গৃহিণীর, তেমনি বেয়াদা ছেসে-মেরেগুলো, তেমনি কি
'নৈই' 'নৈই' রব ! রোসে, অভাবে, তাড়নার—যাচে
মাঝে ইচ্ছে হয়—সেকথা প'রে একদিক পানে দৌড় বিই !”

বিখনাথ হাসে, কিছুই বলে না । সকলে লক্ষ্য
করেন,—পরিপূর্ণ ভূমির হাসি ।

কোথাও কলহ-বিবাদ হইলে লোকে আশুল
বাড়াইয়া নারিকেল গাছগুয়াশা বাড়িটা দেখাইয়া
বসে, “বা, দেখে আরবে ওখানে, সংসার কাকে বলে ।
এ কেবল ভুতের বোঝা বওয়া বই তো নয় !”

লোকে জানে সে কথা ।

বিখনাথ কোন দিন অকারণে উজ্জ্বলিত হইয়া হাসে
না, কোন দিন কৌতুককর কথা কেহ তাহার মুখে
ওনে নাই । চাপল্য, অতিরঞ্জন, মিথ্যা বা আচরণের
কিটি বিশ বৎসরের মধ্যে কেহ তাহার নিকট হইতে
পায় নাই । বর্ষার ভরাননী যেমন সৌন্দর্য্যপিপাসু
মনকে তৃপ্তি দেয়,—এ সন্সারের পানে চাহিলে তেমনিই
একটা পরিপূর্ণতার আভাস জাগে মনে । সাত্ত্বীর্ঘ্য তার
কণ্ঠের তুলস,—মিতাচার হুচাক বদন এবং সংঘম—
স্বপ্নের রূপশ্রী । বিখনাথকে সকলে ভালবাসে, অতরে
অতরে প্রছাও করে ।

সে যখন নিঃশেষে হাসে, পাড়লা চোঁট ছ'খানি ঝেং
কীপিয়া উঠিয়া যে অপরূপ সুখমার বিকাশ করে, তাহা
নাকি শূন্যের । স্বলভার হাসিটিও তার প্রতিচ্ছায়া ।
বেখানে বিশম—সেখানে বিখনাথের ওই স্বপ্নের হাসিভরা
মুখ ও স্বলভার সেবা-স্বকোমল কথ—বিশ্বের মনে
আপার সঞ্চার করে । লোকের অভাবে বিখনাথের
হাতবাষ্টার বার বার উজ্জ্বল হইয়া যায়, খানীর আদেশ
না পাইলেও স্বলভা হাংছে খরচ করে ।

বাহিরের ঘরে চারিটি আলনারি-চাঙ্গা বই ।
একবার সে-ঘরে গিয়া বসিল বিখনাথ বিছক ভূমিয়া
বার । স্বলভা সুকীট চরণে আসিয়া কতবার ছম্বারের
নিকট হইতে ফিরিয়া যায় । অলক্ষ্যে তন্নয় খানীর
জ্ঞান-আহরণে তৃপ্তিভরা মুখখানি দেখিয়া পুনী মনেই
হয়ত বা খানিক ঠাড়াইয়া থাকে । বেশী বিলম্ব হইলে
চারির গোছাটা ফেলিয়া তপসীর তপস্তা-জন্মের চেষ্টা

করে। তাহাতেও সন্দেহ না হইলে নিকটে আসিয়া দুহুয়ের ডাকে। কখনও কখনও গা ঠেঁসিয়া না থাকিলে বিশ্বনাথের ধ্যানভঙ্গ হয় না।

চমকিত বিশ্বনাথ হুলতার কুস্তি মূখের পানে চাহিয়া পরম্পরেই ষড়ির পানে চায়। পরে বাতস্তার সঙ্গে বলিয়া উঠে, “উঃ, রাত যে একটা বাজে। আমার এতক্ষণ ডাকনি কেন, হু?”

হুলতা হাসিয়া উত্তর দেয়, “তুমি যে বই পড়ছিলে।”
তাড়াতাড়ি বই মুড়িয়া বিশ্বনাথ বলে, “চল।”

আহার-পূর্ব মিছিলে ক্রান্ত বিশ্বনাথের নমন ঘুমভারে ভরিয়া আসে। হুলতা আসিয়া আলো নিবাইয়া তাহার পাশে ওইয়া পড়ে। কোন কোন দিন বা ক্রান্ত স্বাভাবিক পরসেবা করিতে করিতে সেইখানেই মাথা রাখিয়া ঘুমায়।—তৃপ্তির ঘুম।

দিনের আলোকে হুঁশেরইই কামের বেন অস্ত থাকে না। ছেলে-পড়ানো গইয়া বিশ্বনাথ নটা অবধি কাটাইয়া—দশটা বাজিতে কয়েক মিনিট থাকিতে পুত্রে হুঁব দিয়া—বাইতে বসে। তারপর স্নান। গুণ আনুভূততে ভাত বা আদর্শিত ভাল দিয়া খাওয়া নয়। ভোরে উঠিয়া গৃহকর্ম সাধিয়া হুলতা উনানে খাঁচ দেয়। ডাল, মুক্ত, ভাড়া, ডালনা, চুর্চরী এবং পূর্ব দিনের মাছ না থাকিলে হাত-আল ফেলিয়া পুত্রে হইতে টাটকা মাছ বরিয়া ঝোল ও অল্প রাঁধে। বাজিতে দুখের দই পাতিয়া রাখে; নিম্নহাতে তৈয়ারী পাওয়া বী স্বাভাবিক পাতে সে নিভা ঢালিয়া দেয়। এক অপরাহ্নে স্নান হইতে ফিরিলে সেই গৃহমণ্ডা খোলটুকু দিয়া সে দুখের সরবৎ প্রস্তুত করিয়া শিশালার্ঘ্য স্বাভাবিক ক্রান্তি দূর করে।

মধ্যাহ্নে মেয়েগুল বসে।

অপরাহ্নে স্বাভাবিক অনুশোচন করাইয়া তাহার ছোট বরখানিতে বই, বাতা, মোরাত্ত, কলম, রঙি প্রভৃতি সজাইয়া রাখে। বিশ্বনাথের দেবার অভ্যাস আছে। সন্ধ্যা না হওয়া পর্য্যন্ত সে গিঘিয়া চলে। সন্ধ্যার পূর্বে হুলতা গুনবার ঘরে হুঁকিয়া তাহার স্বাস্থ্য

সঙ্গে মাঝবান বাঈ প্রবেশ করিয়া বিশ্বনাথকে ভ্রমণে পাঠাইয়া দেয়। কোন দিন বা পুত্রে পাড়ে, কোন দিন বা গ্রামের মাঠে পাচচারি করিয়া—বিশ্বনাথ বাঈ খটার ফিরিয়া আসে। ফিরিয়াই সেই ছোট ঘরের ছোট টেবিলটিতে বই খুলিয়া বসে,— একবারে বাঈ গভীর। তারপর আহার, বিশ্রাম এবং নিশ্রা।

পরিপূর্ণ শান্তির এতটুকু ব্যাঘাত ঘটে না।

গ্রামে, স্কুলে এবং সমাজে—বিশ্বনাথের যথেষ্ট স্থান। সে নগর-আশ্রমের একটা মহান আশ্রম।

সন্ধ্যা অতিবৃত্ত তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় স্বর্গীয় হওয়ার স্মরণ-কর্তৃপক্ষ গ্রামে উপস্থিত লোক না পাইয়া কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন। তিন দিনের মধ্যে আবেদন-পত্র আসিল একশতেরও উপর। তার মধ্যে বাহিয়া বাহ্যকে নিয়োগ-পত্র দেওয়া হইল, তিনি বয়সে সর্বাঙ্গশক্তি তরুণ। তাহাকে সেখান কর্তৃপক্ষ মনে মনে ঈর্ষ্য পূর হইলেন। কিন্তু অসংখ্য আবেদন-পত্রের মধ্যে তৃতীয় উত্তম তাহারই ছিল বেশী।

লোকটি আসিলেন সতীক। বছর দুই হইল কলেজ ছাড়িয়াছেন এবং ইতিমধ্যে বিবাহও করিয়াছেন। বর্তমান সময়ে বর্তমান ভ্রুত তিনি বাস করেন; রঙের অভাবে সুখখানি তাঁর নবা হস্তময়। মাটারঘের নীরস পাত্রীর্ঘ্য, ছাত্রদের বন মানাইবার রূপ ভ্রুত তাহার নাই। মাটারেয়া পরম্পর সম্বন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন,— তাকনা ও হাসি গইয়া কি মাটারী করা চলে?

সময় সময় তাহার হোকবার হাসিকে ‘হ্যাংলাসো’ বলিয়া বৃহৎ অনুশোচন করিতেও ছাড়িতেন না। সে অনুভবের মত স্বাভাবিক স্নানমুখে চূপ করিয়া থাকিয়া এক সময় হাসিয়া উঠিয়া শিক্ষকদিগকে কহিত, “স্নান করবেব, দাদা, ভটা আমার অভ্যাসের সোব।”

বৃদ্ধা পতিত স্বাভাবিক নাড়িয়া বলিতেন, “অস্ত হাসি হলো না, বাপু। কথায় বলে, ‘অস্ত হাসি—তস্ত কথায়, ব’লে দেখে বাস শর্মা।’”

এত হাসি বিখনাখেরও ভাল লাগিত না। তাহার মিটাচারের গতি ছাড়াইয়া, সব্বের উত্তরেখা প্রাথিয়া এ বেন এক চুর্বার বজা শান্তি-কুণ্ঠির কুটীরে অভিলাশের মজ্জাই আনিয়া পড়িত। তাক্যাত এককালে সকলেরই থাকে, তা' বলিয়া পৃথনীময়ের সম্মান না দেখাইয়া নৃপ্ত যৌবনের উজ্জ্বল যখন তখন অসম্মানকর হাসি হি। এ যে উজ্জ্বলতার প্রবৃত্ত। বেগবান পতন ইহারই পথ ধরিয়া সাহসকে অস্ত্রভঙ্গোপরে টানিয়া লইয়া যায়।

মাঝে মাঝে বিখনাখ পতীর ভাবে তাহাকে ছ'চারিটি উপদেশ দিত, সে-ও একরকমে গনিত। কিন্তু কয়েকদণ্ড পরে তাহার ক্রাসের পাশ দিয়া বাইতে বাইতে উজ্জ্বলির কলরোল যখন বিখনাখের কানে আনিয়া বাজিত এবং কোকুলবনে উঁকি মারিয়া সে যত্নের মাটার ও ছাত্তের আশোষ-উদ্ভাস সেবিত, তখন তাহার সাতা অন্তর কোড়ে, হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া পড়িতে চাহিত। হার রে উপদেশ! এ কেবল বেনাফনে মৃত্যু ছড়ান বৈ ত নয়। বিখনাখ পারের পতি বাড়াইয়া প্রচণ্ড শব্দে বারান্দা মুখরিত করিয়া অপর ক্রাসে দিয়া চুকিত। পারের ঘরের হাসিও সেই শব্দে থামিয়া বাইত।

সেদিন সিক্কিনের বড়ার হেড্ মাটার নতুন মাটার হরেনকে ডাকিয়া বলিলেন, "হরেন বাবু, হাসি-ঠাট্টা-গুলো পড়াবার সময় একটু কম করবেন। অস্ত্র ক্রাসে পড়াবার ক্ষতি হয়।" হরেন অপ্রতিভ হইয়া শঙ্কিতভাবে বলিল, "কি জানেন, আমার বিশ্বাস—হাসি-আনন্দের মধ্যে দিতে বেশিকটা সেওয়া যায়—"

হেড্ মাটার চোখের চশমাটিক নাকের উপর তুলিয়া মুখখানা অস্ত্র ঝুঁকাইয়া কহিলেন, "সে আপনার কলঙ্ক-লাইকে চলে। বেত শুকানে অচল। কিন্তু এখানে—"

পণ্ডিত মহাশয় ত্যাগত্যাগি বলিলেন, "বা করে—তাঁট আর নোনা আটার ডাল। এক একটা হাত আত্ত ভূত। জানেন ও, মারের চোটে—"

হরেন বিনীত হাতে উত্তর দিল, "আজ্ঞে জানি।

কিন্তু—ভুতের যোরাখা বেড়েই যায়। ভুতের মাখায় সাহসকে ঠাঁই দিতে হ'লে বেতের চেয়ে মিষ্টি কথা বেশী উপকারী। অবস্ত আমার অভিজ্ঞতা—"

পণ্ডিত মহাশয় প্রবল হাতে সেকথা উড়াইয়া দিয়া কহিলেন, "তোমার আমার অভিজ্ঞতা। কাল-কের ছেলে, কলমী পদ্ম গা থেকে যায় নি এখনও। বলে, কত ছেলেকে বেতের চোটে মাদ্রু ক'রে দিলাম! হ্যাঁ!—তারা কেউ ভদ্র, কেউ প্রোফেসর, কেউ আপিসের বড়বাবু, কেউ ব্যবসাদার।—হেঁ—হেঁ—"

হেড্ মাটার নাকের মাথখানে চশমাটি নামাইয়া পতীরভাবে বলিলেন, "বাই হোক, অস্ত্র মাটারের কাছে ব্যাখাত সেবেন না। আপনার নীতি আপনি মেনে চলুন, আগতি নেই, কিন্তু অস্ত্রকে বাচিয়ে।"

হরেন কুণ্ঠিত হয়ে বলিল, "তাই হবে।"

সে সববেত মাটারদের পানে চাহিয়া সেবিল, সকলেই এই শাসনে বেশ একটু উন্নতি হইয়াছেন, কেবল বিখনাখ নির্মিতার প্রপাত ভাবে একখানি বইয়ে মনোনিবেশ করিয়াছে।

ইহার ঠিক ছয় দিন পরে হরেনকে জ্ঞানমুখে ফুলে আঙ্গিতে সেবিতা সকলে আশ্চর্য হইয়া গেল। সে অস্ত্র একটু খোঁড়াইয়া চলিতেছিল এবং তাহার হাতে শাবা ক্রাকড়া দিয়া ব্যাঙের বাঁধা। ভাবে বোধ হইল, হাতখানি আড়োঁ।

বসিও ডান হাতখানির কাজ ফুলে তাহাকে বেশী করিতে হয় না (অর্থাৎ ছাত্র-ভুলের মাখায় প্রবল বেগে বেত্র-বারি বর্ষণ), তথাপি সেটার যত্না একদা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল যে, হাসিমুখে শুধু স্কোরে বসিয়া পড়াইয়া বাঙলাও অসম্ভব।

সে তিন দিনের ছুটি চাছিল।

সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপার কি?"

হরেন লম্বাখ মাথা নীচু করিয়া রহিল, কোন কথা কহিল না।

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, “কেমন, বলেছিলাম না—
যত হাসি, তত কান্না।”

হরেন হাসিয়া ফেলিল। পণ্ডিত ত্রুটি করিলেন।

হেড্‌ মাস্টার বলিলেন, “আম্মা ছুটি না-হর দিলাম,
কিন্তু ডাক্তারবাবার ঘরে একটা সোফান দিয়ে
আম্মন।” হরেন বলিল, “আইভিন দিয়েচি।”

হরেনের চেয়ে বছর দুইয়ের বড় সুরেশ্বর ঈক
নিঃশব্দে বলিল, “বাপার কি?”

হরেন তেমনিই নিঃশব্দে বলিল, “কাউকে
ব’লো না মেন। কাল সামান্য একটা কথা নিয়ে
বউয়ের সঙ্গে হ’ল তর্ক। সেই কবে মূলশস্যার
সাক্ষিতে কে কি ব’সেছিল—তারই বিস্তারিত বিবরণ।
জন্মের ঐক্য মনে থাকে, তাই! আমিই দ্বন্দ্বত্ব লুপ্ত
ব’সেছিলাম,—এই হ’ল রূপ। তর্ক থেকে কলহ,
তারপর—হুজুহুতি, তারপর—” বলিয়া চুপ করিল।

পাশেই বইয়ের বিবনাথ বলিয়া ছিল। হরেন কটাক্ষ-
পাতে সেখিকে চাহিয়া দেখিল, সে নির্দিকার—তব্বর।

সে মুহূর্তে বলিল, “তারপর দিলে এক কামড়
বসিয়ে।”

সিহরিয়া সুরেশ্বর বলিল, “কামড়ে মিলে?
রাস্কী নাকি?”

হরেন ত্রুত হইয়া কহিল, “চুপ! হাঁ, কামড়াতাই
বর বর ক’রে রক্ত। রক্ত-না দেখে রাগ একবারে
জল; মরে হাউ হাউ ক’রে বেঁচে। ব’ললাম, ঈর
কেন, একটু আইভিন আন, স্নাকডা একখানা ক’লে
বেঁচে দাও ছায়াপাটার,— বাস, কাল আর কিছু
থাকবে না। তাই ক’রলে; কিন্তু সারারাত ঘুমে না,
তাই। খালি কান্না, খালি কান্না! ভারি ভালবাসে
কিনা।”

সুরেশ্বর গভীর মুখে কহিল, “কট মাছ, কামড়াবে
কি? হেলো না হরেন, এই বেলা থেকে না শোষণালে
শেষ অহত্যাণের ঠাই থাকবে না।”

হরেন বলিল, “কি ক’রব তাই, হেলোমাছ—
একটু বেশী ঢল।”

সুরেশ্বর কহিল, “হ’রেনে! এই কেলতাই হচ্ছে
‘কট মাছ, মাছ’। শাসন কর, এই বেলা থেকে কড়া
শাসনে রাখ, নইলে হাত ছেড়ে মাথাব বাড়ি মারবে
কোন্ দিন।”

হরেন হাসিয়া বলিল, “শাসন আমার আসে না,
তাই। আর তারই বা শোষ কি? হুজুহুতি ক’রতে
আমিও যে ভালবাসি না, তা’ নয়। শাসন ক’রতে
হ’লে আসে আমার মনকে শাসন ক’রতে হয়।”

সুরেশ্বর ইঙ্গিতে বিবনাথকে দেখাইয়া কহিল,
“সেখটো ত ঈক, এ জেলার মধ্যে এমন দুই দশটি
আর নেই। ঈদের জীবন-বাজা-প্রণালীটা যদি দু’দিন
অধ্যয়ন কর—”

হরেন বলিল, “রকে কর তাই,—যত পাত্তাখা
আমার সইবে না! ও-রকম শাস্তির চেয়ে এই অশান্তি
শতগুণ ভাল। এত তু জীবনের শাসন আছে।
তোমার সীকাও বোধ করি ওর কাছে? বরলটকে
নিয়মের শেকলে বেঁধে কেমন কাটছে?”

সুরেশ্বর বলিল, “মম্ব কি। ভালই। তবে ওর মত
সবটুকু যদি শাসন ক’রতে পারি ও ভাবনা কিসের?
জী-জান্য অনেকটা ভাল বরাতের ওপর নির্ভর করে।”

হরেন উঠিয়া বলিল, “আম্ম আসি।”

সে চলিয়া গেলে রাস বলিবার খটা গড়িল।

একে একে সকল মাস্টারই উঠিল, বিবনাথ উঠিল
না। হেড্‌ মাস্টার মিনিট মলেক তাহার ঘোলা বইয়ের
পানে দীরবে চাহিয়া থাকিয়া দেখিলেন, বিবনাথ
পাতা উচাইল না। নিঃশব্দ বড় করিয়া একটা
লাইনের উপর একাধি চক্ষুর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া
রাখিয়াছে।

উঠিয়া আসিয়া তিনি ষ্টেট হইয়া কহিলেন, “শাব-
কেউটা খুব ইন্টারেস্টিং বুঝি? কি বই? ইতিহাস?”
বিবনাথ চমকিত হইয়া কহিল, “হাঁ। খট্টা প’ড়ে
গেছে।”

হেড্‌ মাস্টার খাৎ নাড়িতেই বিবনাথ তাড়াতাড়ি
উঠিয়া—ফ্রণ্ডশিপ রাসের অভিমুখে চলিয়া গেল।

কোথায় ছিল ইতিহাসের কাহিনী! হরেনের প্রতিটি মুহূর্তে তীব্র কণ্ঠকের মত তাহার অন্তরে আসিয়া বিঁধিতোছিল। পতীর মনঃকোচে সে মুখ তুলিতে পারে নাই, হঠাৎ উপদেশ দিতেও বাধিতোছিল।

মনটা বিকশিত ছিল। ক্রমে পড়াইতে গিয়া কুল করিল। অকস্মাতেই গিয়া আগরদক্ষেবের হাফিখাতা-অভিনানের কত খটনাই না বলিয়া চলিল।

টিকিনের খণ্ডার বিশ্রাম-কক্ষে বসিতেই গুলিল,—
হরেনের কথা লইয়া সেখানে তুলুল আলোচনা চমকিতোছে।

হরেন আসা অবধি এই মাস দুইয়ের মধ্যে তাহার স্বামী-স্ত্রী মিলিয়া বে-সব কীর্তি করিয়াছে, তাহা নাকি সমাজ-শিষ্টাচার-বহির্ভূত।

প্রথমতঃ লজ্জা উৎসাহের নাই বলিলেই চলে। ও-বাড়ির পাশ দিয়া বাইবার সময় সবসময়ই নির্দোষের উচ্চহাসি, মুখের পলকনি ও চক্কা কথা শুনিয়াছেন। সে-সব কথা নাকি শুনিবামাজই হুকানে কুলা গুলিতে হয়, মাথা লজ্জার তুপার আপনা হইতেই হেঁট হইয়া যায়। বেহায়ার একশেষ।

মারের শব্দটিও বাধ যায় না। অথচ হরেনকে জিজ্ঞাসা করিলে বেশ সপ্রসক্তভাবে হাসিমুখে উত্তর দেয়, “ও কিছু নয়, একটু ছেলোমায়বী হ’জিল।”

বিখনাথ আসিতেই সুরেশ্বর তাহার নিকট গরিয়া আসিয়া কহিল, “দাদা, আপনি এর যা-হয় একটা উপায় করুন। হতভাগার মুখে কীর্তিকাহিনী বা’ গুলি, কোন্ দিন বৌটার হাতে-খুল হ’য়ে না যায়। আর ও-রকম একটা মন example গ’য়ে থাকাত ত ঠিক নয়।”

বিখনাথ তাহার পানে চাহিয়া মুহূর্ত হাসিল।

সুরেশ্বর বলিল, “হাসলে হবে না, কাল সকালেই গুলে-ব’য়ে নিয়ে যাব আপনার বাড়িতে। সেখান, যদি আপনারদের মধ্যেও কিছু শোধরাতে পারে।”

বিখনাথ বলিল, “ও কথা শুনেই ব’সে বোধ হয় না।”

সুরেশ্বর বলিল, “ইস, না তরলই আমরা ছাড়টি কিনা। গায়ের মধ্যে এসব...না, না, গুলে শোধরাতে

আপনার হবেই। একদিন না হয়—রোম সকালে-বিকালে—”

হাসিয়া বিখনাথ বলিল, “হবে, হবে, বাত কেন?”

সুরেশ্বর বলিল, “বাত হই সাথে? আশ কামড়ান’র ইতিহাসটা শুনেচেন কি?”

বিখনাথ উত্তীর্ণা বলিল, “খাক, কাল শুনে।”

বলিয়া ক্রমের খটা না পড়িতেই বাহির হইয়া গেল।

বিখনাথ বৈকালে জলযোগ করিয়া কাগজ-কলম লইয়া বসিল, কিন্তু কিছুই লিখিতে পারিল না। সন্ধ্যার সময় জলতা আসিয়া কহিল, “ওঠ, বেড়িয়ে এস।”

বিখনাথ বলিল, “প্র, এই চেয়ারটার এসে ব’সো, কথা আছে।”

সে বলিলে বিখনাথ বলিল, “হরেন আমাদের নতুন বাড়ার—তাদের কথা শুনেচ কিছু?”

জলতা ঘাড় নাড়িলে বিখনাথ বলিল, “ভারা গায়ের মধ্যে নাকি যা-তা ক’রচে। না লজ্জা, না আকল—”

জলতা বিস্মিত ভাবে কহিল, “কৈ, তা’ ও শুনি নি! আমি নিজের চক্ষে দেখে এসেছি, ভারি লজ্জী বোঁ। মুখে হাসিটি লেসেই আছে। আমায় দিদি ব’লতে অভ্যস্ত।”

বিখনাথ বলিল, “বখন তখন বেহায়ার মত হাসিও ভাল নয়। পাড়ার সবাই শুনেচে ওরা মারামারি, গালাগালি করে। এমন কি বৌটি ও আকল হরেনের হাতেই কানড়ে দিয়েচে।”

জলতা হাসিয়া কেলিল।

ব্রহ্মটি করিয়া বিখনাথ বলিল, “হাসতো বে?”

মুহূর্তে হাসি থামাইয়া জলতা বলিল, “ওদের ছেলোমায়বীর কথা শুনে। চুটোই আত পাগল! আমি বেড়াতে গেলে হ’পকেন নাগিশের আর অক থাকে না।”

চলু বিস্ময়িত করিয়া বিখনাথ বলিল, “ওবে?”

হুলতা বলিল, “জবে কিছু নেই; যে বসে যা’। একই হাঙ্গি-তামাসা, খুব-হুট-বগড়া, ও কি ধর্জবোর মধ্যে? হাঙ্গি-আলাপ ক’রবার এই ত সময়।”

বিচ্ছারিত ঢকে ত্রুটি হাতা পড়িল। বিখনাথ বলিল, “অভ্যাস বড় খারাপ জিনিষ, হু। পোড়া থেকে ও-গুলোকে ধমন না ক’রলে লগ্যারে অশান্তি আসে।”

হুলতার চক্ৰ দৃষ্টি অকস্মাৎ বেন নিখিয়া গেল। কপেকের তর হস্ত অঙ্গ-খায়েনে তাহা হুদিয়াও আসিল। অত্মদিকে হুখ ফিরাইয়া সে হুহু-হরেই বলিল, “অভ্যাস খারাপ জিনিষ—সে আনি ভাল ক’রেই জানি। কিন্তু প্রকৃতিকে ঠেকিয়ে রাখতে খালি খালি যদি ঐ অর্থই ব্যবহার করা যায় ত মনের মরণ আসতে দেয়ী হয় না। বাহুল্যের জীবনকে তমু অভ্যাস—নিবেধ, নিয়ম, লবন এই লবের দফাফদি নিরে ক’লে বাঁধলে মহুত্বের আত্ম ক’নগেই যে নিঃশেষ হ’য়ে যায়—এত বই প’ড়ে একখাটা আত্মও বুকলে না—এই আমার তারি আতর্জা ঠেকে!” বাক্যলমে কষ্ট তাহার ভারী হইয়া কষ্ট হইয়া গেল।

সে ক্রতপসে কক্ষ ত্যাপ করিল।

ভক্তিত বিখনাথের ঢকে সম্ভার আকাশ বেন হুদিয়া উঠিল। হুগিতে হুগিতে বিশ বৎসর পূর্বের অজীত আশিয়া কুঁজিত চরণে লক্ষ্যে ধাঁড়াইল।

লক্ষ্য ধরপীতে বসন্ত-সমারোহ। লব্ধের লবীরে প্রচুর আনন্দ। জীবনের সে এক নবীন প্রভাত।

কলেশের জীবন। নীতিশাস্ত্র, গীতা, বেদ প্রকৃতি পড়িয়া বিখনাথ জীবনের গভিকে লু-নিয়ন্ত্রিত করিবার দ্বত সত্যবদ্ধ হইয়াছিল। ভবিষ্যৎ জীবনকে শাস্ত্রময় ও লগ্যারে আদর্শ স্থাপন করিতে সে অনাবশ্রক আড়ম্বর, আভিষা, বাহুল্য প্রকৃতিকে শাসনের নাপ-পালে কড়া ভাবেই বাঁধিয়া কেলিয়াছিল।

লক্ষ্য ধরপীর পানে চাহিয়া চাঁদের আলোর বোবনময় বেদ তাহার লবন-লগ্যের প্রয়াসে কি বিপুল উচ্চাসেই না আত্মসি-বিকৃতি করিত। অবনই মনে পড়িত ভবিষ্যৎ মহুত্বের আদর্শ। রক্ততমু

লইয়া সেই সব মিখা। তরহকে সবলে তাদিয়া সে শাসন করিত।

ভরঙ্গ তাক্তিত, উচ্চাস কেনার মত জঘন-তটলনে বিলীন হইয়া যাইত। কি এক অবসানে বিখনাথের লমগ্র অস্তর লুর্দীহতের মত লব, ল্পর্শ, লবীরের অজীত হইয়া পড়িয়া রহিত।

তারপর জাগিত অপূর্ণ আত্মতৃপ্তি।

এমনই দিনে—হুলতা আসিয়া লক্ষ্যে ধাঁড়াইল। বিখনাথ তরঙ্গ নহন হইতে অঙ্গ-খোর কাটাছিয়া—লবন-লগ্যাহিত অস্তরের মাঝে কটোর দৃষ্টিপাত করিল। সেই অকল্প লবন-প্রহারে হুলতার আয়ত নেয়ে অস্তরেখা লুজিত না লুজিতে মিলাইয়া যাইত, লগ্য-পাপুড়ীর মত অথরোঁঠ কাঁপিয়া থির হইত এবং গুঁটি লগে রক্তরাগ লুজিবার লুহতে পা দুহতার ভক্তিয়া আসিত। লকের মাঝে লুককাটা লীর্ণখালে নাত্রী-অস্তর তাহার কাঁপিয়া কাঁপিয়া বোবনের আত্মকে নিঃশেষ করিয়া লইত।

পাচটি বৎসরের অনাহত লবন—হালি, উচ্চাস ও বাক্যের উপর মিখা বহিয়া গিয়াছিল। পাচটি বৎসরের শাসনে বর্ষের আবরণ লুজিত ও কটিন হইয়া উঠিল। ভবিষ্যৎ শাস্তিকামীর অস্তর আদর্শকে লাভ করিয়া লবের আনন্দে মাতিয়া উঠিল। লকলেই বলিতে লালিল—ধত, ধত।

বিশ বৎসর পরে বিখনাথ আত্ম লভাই ধত। লেশোর মধ্যে তাহার আদর্শ লম্পতি, লবন ও নীতি শিকার একখানি জীবন্ত ইতিহাস।

হুলতার দ্বরত বোবন লবন-লগ্যাহিত হইয়া শাস্তিলাভ করিয়াছে। বিখনাথের লাবনা লবলুল।

তাহাদের লুত্বার পর এই আদর্শকে ধাঁড়াইয়া রাখিতে বিখনাথ থির করিয়াছে, নদীর তীরে লুতি-লবির লুগিবে। অর্থ সে পোষ্টাকিসের লভায় লব্ব করিয়া রাখিতেছে। লল্লুককে এ-লগ্যে উপলেশও মিখা যাইবে। প্রতীচা-লোহলুৎ লেশবাসীর লল্লুককার লানলে নদীর লারে লুল লুল থরিয়া ভারতের বৈশিষ্ট্যকে লবণ

করাইয়া দিবার জন্য বিশ্বনাথের সমগ্র জীবনের এই বিশূল আরোহণ। আদর্শ তাহার হৃদয়ন করিবেই — জীবনে এবং মরণেও।

তথাপি আজ সন্ধ্যার আকাশ স্নানতার একটি স্বপ্নের আঘাতে বর্ণ হারাওয়া অন্ধকারে ভুব দিল কেন? তারার তারার বেন স্নানতার গোপন অস্তর প্রতিবিম্ব—আকাশের সারা সেহে কালো মেঘের বিস্তৃত ছায়া!

বিশ বৎসর পূর্বের অতীত কি আজ স্নানতার নব বেশ পরিধান করিয়া আদর্শ নরকে ফুলাইতে আসিয়াছে? না—বিশ বৎসর পূর্বের অভিমানক্লান্ত অস্তর গুচ্ছ বেনদার জলভরা। নরন হৃদয়ে ধীরদিন-সঞ্চিত পরাভবের কাহিনী লিখিয়া রাখিয়া সন্ধ্যালোকে ভাঙিয়া পড়িতে চাহিতেছে? বিশ্বনাথ ত জীবন চাহে নাই, সে চাহিয়াছিল আদর্শ। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বার লেখা সৌর্য-মালার মত ছলিবে। যে জীবন মানব-মনের স্নান-প্রতি, শ্রম-বিচ্যুতি, অপৌরব-অন্যায়, অস্বাভি-কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া জীবন-সোলাকে প্রবলবেশে মোহাইয়া থাকে—সে জীবন নহে।

বাহিরের রাতি অন্ধকারে গভীর হইয়া উঠিতেছে। স্নানতার হৃদয় রক্তন শব্দ হয় নাই। না, উপলভ অস্তর শোঁয়ার স্নানতার স্নান করিয়া দিয়া বিশ বৎসরের সঞ্চিত বেনদার মাঝে স্নানতা আপনাকে হারাওয়া কেলিয়াছে।

অত্যাশ বোঝাপা একথা স্নানতা এই মাত্র বলিয়া সেল। কিন্তু কিসের সে ইচ্ছিত? বিশ বৎসর পূর্বের জীবনের অনাসক্ত উচ্ছ্বল পক্ষমনি, না, আদিকার খাদক কামনার মরণোন্মাদ? কি এ?

আদর্শ জীবন! চিত্তার উপর মঠ উঠিবে! সঙ্গারীরা সবিস্ময়ে চাহিয়া সন্ততি প্রগতি দিয়া সে আদর্শের সম্মান রাখিবে। হৃদয় কোন স্নেহের উচ্ছ্বলিত লেননী এই পবিত্র জীবন-কাহিনী লিখিয়া সন্ধ্যাকে পর্বাৎ স্নানতার নির্দেশ দিয়া স্নানতার স্নান হইতে বাঁচাইবে।

তথাপি স্নানতার সন্ধ্যা—একটি নিঃসঙ্গ দীর্ঘ নিঃসঙ্গের মত বিশ্বনাথের চোখের স্নান হইতে রাতির অন্ধমণ্ডে পলকে আত্মগোপন করিল।

নিরা সে-রাজিতে বিশ্বনাথের চোখের পলক স্পন্দ করিল না।

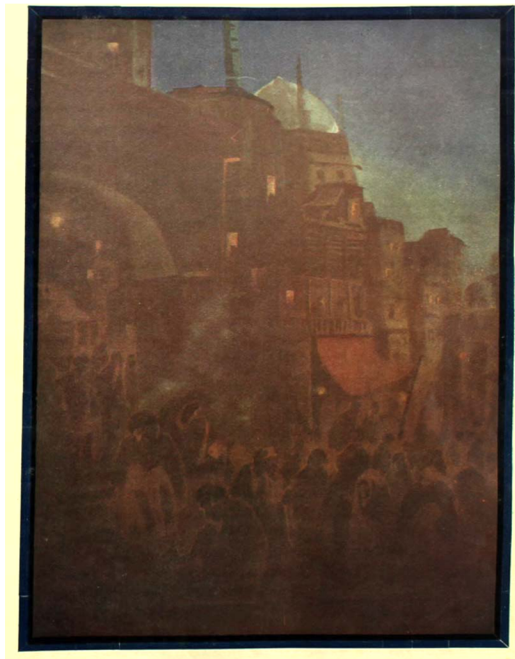
বাহিরের কোলাহলে—অতি প্রভাতে বিশ্বনাথ শয্যা-ত্যাগ করিল।

সে বাহিরে আসিতেই হৃদয়ের হরনের ব্যাওজ-বাধা হাতখানি ফুলিয়া ধরিয়া বলিল, “সেবেচেন একবার কাঁড়খানা? এই ওদের ভালবাসা! আপনি একটু উপদেশ দিন যাঁতে এ হতভাগার চোখ কোটে।”

লজ্জিত হরনের অবনত মুখের পানে চাহিয়া বিশ্বনাথের কঠোর দৃষ্টি হুকোমল হইয়া উঠিল।

হরনের হাতখানা ফুলিয়াছে। আত্মসের স্নান শিথলনে ভিতরের স্বপ্নের আভাসও সর্জন চকুর দৃষ্টিতে বরা পড়ে; যেহেতু স্নান বিবর্ণ। তথাপি সমস্ত স্বপ্না জয় করিয়া প্রবীণ সৌরবে ও উল্লাসে ওই স্নানত চকু হাট কিসের পরিপূর্ণতার বেন টল টল করিতেছে। রাতির শিমির-সঞ্চিত কমলের উপর প্রথম প্রভাতের স-মেহ স-প্রেম দৃষ্টিপাত বেন।

বিশনাথ অগ্রসর হইয়া হরনের কাঁখে একখানি হাত রাখিয়া পূর্ব-চ্যুতির হাসি হাসিয়া মধুর স্বরে বলিল, “লজ্জা কেন, ভাই? তোমাদের পুণ্ডার আরোহণ সার্থক। তোমরা যাঁ পেয়েচ,—প্রার্থনা করি, জীবনে সেই পাওয়াই পূর্ণতা লাভ করুক। ভগবানের বেত্তা। স্নানত জন্ম—আলো, বাতাস ও প্রকৃত্তিক চিনে তার মাঝেই বেন আনন্দে কলরবে নিঃসঞ্চিত হইবে বার, এর বড় প্রার্থনা তোমার এই মামার আর নেই।”



কলিকাতার নৈশ শোভা

জড়, জীব ও ধাতুপুরুষ

উত্তর শ্রীহরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, এম্-এ, পি-এচ্-ডি

পৃথিবীর খাৰতীয় পুত্ৰমান বস্তুসমূহকে যেটামুটি
হুই তাহে বিভক্ত করা যায়,—অজীব ও জীব। অজীবকে
জানিবার ক্ষমতা সৰ্বত্র পাৰ প্রচলিত আছে, তাহাকে
জড়বিজ্ঞান বলে। জড়ের নানা ধৰ্ম জানিবার ক্ষমতা
নানা পদার্থ ও নানা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ইহার
প্রত্যেক পদ্ধতির অঙ্গস্বরূপে বিভিন্ন বিভিন্ন জড়বিজ্ঞান-
শাস্ত্র পড়িয়া উঠিয়াছে। Physics বা পদার্থবিজ্ঞান
বিশিষ্ট যে শাস্ত্রটি প্রচলিত আছে, তাহা জড়ের
অন্ত সত্ত্ব বিক বৰ্দ্ধন করিয়া কেবল তাহার
প্রমাণ (mass) ও শক্তি (energy) এই উভয়ের
আলোচনা সহ্যাই বাস্তব। ইংরাজীতে প্রমাণ বা mass-
এর লক্ষণ বলা হইয়াছে, "mass is the quantity of
matter contained in a body", অর্থাৎ যে
বস্তুতে যে পরিমাণ পদার্থলব্ধ আছে, তাহাকেই
তাহার প্রমাণ বলে। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠে যে,
পদার্থলব্ধির অর্থ কি? তাহার উত্তরে এই বলা হইতে
পারে যে, কোন নির্দিষ্ট আয়তনের (volume) মধ্যে
যেখানে পরমাণুগুলির ঘনসংকীর্ণ বস্তু সেই এবং
তাহাদের অস্তিত্বই অবকাশ বস্তু কম, সেখানে সেই
পরিমাণেই পদার্থ-প্রচুরের আধিক্য। কিন্তু এই
উত্তরই শেষ কথা নয়, কারণ বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যেও
পদার্থ-প্রচুরত ভিন্নতম আছে। কারণ পরমাণুগুলি
proton ও electron-এর গঠিত—কাজেই যে
পরমাণুতে বস্তু অধিক পরিমাণে proton ও electron
আছে ও নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে তাহাদের অস্তিত্বই
অবকাশ বস্তু কম, সেই পরমাণুতেই প্রমাণ বা
পদার্থ-প্রচুর (mass) তত অধিক; সুতরাং প্রত্যেক
বস্তুর পদার্থ-প্রচুর বা প্রমাণ সেই বস্তুর ঔপা-
দানিক এক বা বিভিন্ন ভাৱীয় পরমাণুর সমষ্টি
proton ও electron-এর লব্ধা ও বৃদ্ধি বা সংযোজন-

সমষ্টি ও সেই বস্তুর আণুবীক্ষণিক (molecules) মধ্যে
পরমাণুগুলির বৃদ্ধি বা সংযোজনসমষ্টি ও আণুবীক্ষণিক
মধ্যেও পরস্পরের বৃদ্ধিসমষ্টির উপর নির্ভর করে।
কাজেই দেখা হইতেছে যে, পদার্থ-প্রচুর-প্রমাণী
বৃদ্ধিবার চেষ্টার মধ্যে একটুও পদার্থ নাই, আছে কেবল
লব্ধা ও বৃদ্ধিসমষ্টি। লব্ধাও একতরফ সমষ্টিই
নামান্তর, কারণ এক, দুই, তিন বা বহু পরস্পরলব্ধ
আণুবীক্ষণিক-সমষ্টির উপর নির্ভর করে। দুই তিন এর
সহিত সম্পর্ক নাই বৃদ্ধিতে এককে বোকা যায় না, এবং
এককে নাই বৃদ্ধিতে দুই তিনকে বোকা যায় না।
পরস্পরলব্ধ ও অপ্রত্যক্ষ সমষ্টিবাদের উপর
লব্ধাভাজন নির্ভর করে, কাজেই দেখা হইতেছে যে,
পদার্থ-প্রচুরের জ্ঞান অর্জন করিতে গেলে ব্যতিক্রম
বৃদ্ধিমান ও পুত্ৰমান পদার্থকে পরিচয় করিয়া
তাহার অস্তিত্ববিধি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সমষ্টি-
পরস্পরকে কোনও বিশেষ নিয়মসমষ্টির দৃষ্টিতে
অনুমান করিতে চেষ্টা করিতে হয়। এই প্রচেষ্টার
মধ্যে লব্ধা বা বস্তু থাকে সৌম্য এবং সাম্প্রতিক
ভাবে কেবলমাত্র সমষ্টিবাদের রূপে বস্তু আর সমষ্টি
হয় নুহা। জৈব শক্তির বিকৃতি বিশেষ বিশেষ করিতে
গেলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, শক্তির আশ্রয়ে
পাওয়া হুইত হইয়া উঠে। একই সমষ্টি কোনও সমষ্টি
শক্তিৰূপে এবং কোনও সমষ্টি বা শক্তিমান বা শক্তি-
প্রচুররূপে আপনাকে প্রকাশ করে এবং কোনও সমষ্টি
বা উভয়সমষ্টিই আপনাকে প্রকাশ করে। কোনও
শক্তিকে বৃদ্ধিতে হইলে যে ঘটনা-পরস্পরার মধ্যে
সেই শক্তির পরিচয় আদর্য্য পাই, তাহা হাড়া সেই
শক্তির অস্ত্র পরিচয় পাওয়া কঠিন। জড়বিজ্ঞানশাস্ত্র
বেদিকে অনুদিশিত করিতেছে, তাহার অঙ্গস্বরূপ
করিলে স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে, বস্তুৰূপে শক্তিকে

বীকার করিবার প্রয়োজন যোগ হয় নাই। কারণ, কতকগুলি সৰ্ব্ব-পরম্পরায় ঘটন, বিঘটন বা অন্তর্ঘটন এইটাই আমাদের জ্ঞানের সোচনীভূত হয়। এই সৰ্ব্ব-পরম্পরায় ঘটন-বিঘটনের মূল কারণরূপে যে কোনও শক্তি আছে, ইহা কল্পনা করা কার্যোপযোগী নিছক কল্পনা মাত্র। Gravitation বা মাধ্যাকর্ষণ এতদিন পর্যন্ত Physics বা পদার্থবিজ্ঞানের একটা প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল। Gravitation বা মাধ্যাকর্ষণ শব্দের তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক বস্তুই য় য় পদার্থ-প্রচর ও বাশেখ দূরত্বের তারতম্য অনুসারে পরস্পরকে আকর্ষণ করে। কেমন করিয়া পরস্পর অসংখ্য হুইটী বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তাহা কল্পনা করা কঠিন। কালেই এই আকর্ষণের মূলে পত্তিক্রমী কোনও অনির্বাচ্য পদার্থবিশেষকে বীকার করিতে হইত। আৰ Einstein-এর অনেকাবাদের আলোচনায় দেখা বাইতেছে যে, মাধ্যাকর্ষণরূপী কোনও বস্তুই পত্তিকে বীকার করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। পদার্থ-প্রচরের তারতম্যানুসারে পার্শ্ববর্তী ব্যোমপ্রদেশে যে বিভিন্ন দ্বাতীর কুটিলতা ও বক্রিমতার সৃষ্টি হয়, বা যে নূতন সম্পর্কবিশেষের সঞ্জন হয়, তাহারই সম্পর্কীভূত হইয়া যখন কোনও বস্তুর কোনও বিশিষ্টজাতীয় ক্রমাবধী সম্পর্কব্যবহার সঞ্জন হয়, তাহাই দ্বিতী-পত্তিরূপে প্রতিভাত হইয়া মাধ্যাকর্ষণপত্তির প্রকাশরূপে পরিণতি হয়।

চৌধক আকর্ষণ মূলেও চৌধক ও সৌহাতবর্তী ক্ষেত্রের যে নানা সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে, তাহারই ফলে সৌহ ও তৎপার্শ্ববর্তী ক্ষেত্রের যে ধর্মপরিণাম ঘটে, চৌধকাকর্ষণ তাহারই নামান্তর মাত্র। পূর্বে বৈজ্ঞানিকেরা ঈশ্বার বলিয়া একটা সর্বগোপী পদার্থ বীকার করিতেন এবং ঈশ্বার-তরঙ্গের সঞ্চরণকেই আলোকরশ্মি বলিয়া বর্ণনা করিতেন। এখন ঈশ্বার সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ আদিয়াছে এবং ঈশ্বারের সত্তা অনেকেরই এখন কাল্পনিক বলিয়া মনে করিতেছেন। সেইজন্য হুঁয়ামণ্ডল হইতে কোনও তরঙ্গ আদিয়া

আমাদের চক্ষুর সন্ধানীয় হয়, আলোকের এই পরিচর এখন ক্রমশঃ অপ্রতিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। হুঁয়ামণ্ডলের কোনও বিশিষ্ট পরিণামের মাত্র তৎপার্শ্ববর্তী আকাশ-মণ্ডলের মধ্যে যে বিক্ষেপের সঞ্চার হয়, সেই বিক্ষেপের ফলে ক্রমব্যবহার ক্রমশঃ আলোকবাহকের যে পরিবর্তন হয়, সেই পরিবর্তন যখন চক্ষুসংলগ্ন আকাশ-প্রদেশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়, তখনই আলোকরশ্মি দেখিলাম বলিয়া প্রতীতি করে। এইরূপে Physics বা পদার্থবিজ্ঞান আলোচনা-প্রণালীর প্রতি অভিনিবেশ করিলে দেখা যায় যে, প্রাকৃতিক নানা ব্যাপারের মধ্যে দিক্-কাল-ঘটতি যে যে নানা সৰ্ব্ব বহিরাছে, সেই সৰ্ব্বগুলির মধ্যে কি মূল্য ও সামঞ্জস্য আছে, তাহারই অন্বেষণ এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

দিক্-কালের মধ্যে প্রত্যেকনিষ্ঠ ও পরস্পরনিষ্ঠ যে সমস্ত ব্যাপক সৰ্ব্ব-পরম্পর্য সন্ধ্যাসম্বন্ধের মধ্য দিয়া প্রকাশ বা অঙ্গুপন্ন করা যায় তাহারই অন্বেষণ করা পণ্ডিতশাস্ত্রের কাৰ্য। কোনও দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষিক বাস্তব (concrete) জিনিষ লইয়া পণ্ডিতশাস্ত্র আলোচনা করে না। বস্তুকে ছাড়িয়া দিক্-কাল-ঘটতি কতকগুলি ব্যাপক সম্বন্ধের (universal) ধর্ম নির্ণয় করিতে চেষ্টা করে বলিয়াই পণ্ডিতশাস্ত্র বাস্তবতাবান্ধিত সন্ধ্যাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। পণ্ডিতের জগৎ আমাদের সাধারণ মানুষের জগৎ নহে। পণ্ডিতে বিন্দুর (point) লক্ষ্য দিতে গিয়া বলিয়াছে, “তাহাকেই বিন্দু বলা যায়, বাহার অবস্থিতি আছে কিন্তু ব্যাপ্তি নাই।” রেখার লক্ষ্য দিতে গিয়া বলিয়াছে, “তাহাকেই রেখা বলা যায়, বাহার সৈধ্য আছে, বিস্তৃতি নাই।”—এই বিন্দু ও রেখা আমরা কেহই প্রত্যক্ষ করি নাই, ইহার কোনও প্রত্যক্ষিক দৃষ্টি নাই, অথচ এই রেখা বা দ্বিগ দ্বিগ্ধবস্তুর ধর্ম নিরূপণ করাই জ্যামিতির লক্ষ্য। এমন কোনও রেখা চান্না যায় না, বাহার সৈধ্য আছে অথচ বিস্তৃতি নাই; কালেই, জ্যামিতি যখন রেখার কথা বলে তখন কোনও দীর্ঘ বস্তুর দীর্ঘতমাত্র আমাদের

কল্পনার বিপরীত হইবে। বিস্তৃত লক্ষণও দেখা যায় যে, কাল্পনিক অবস্থিতিমাত্রকে ঘোড়না করাই তাহার উদ্দেশ্য। এই কাল্পনিক সৈন্যের দ্বারা সিদ্ধান্ত নানাক্রমে অবস্থিতি হইতে পারে এবং বিভিন্ন কাল্পনিক সৈন্যের পরস্পর সন্ধিগোচরে নানাক্রমে সন্ধি প্রকটিত হইতে পারে। এই সমস্ত কাল্পনিক সন্ধির ধর্ম ও পরস্পরসাপেক্ষ সম্পর্ক বিচারই জ্ঞানিতির উদ্দেশ্য। বৃত্ত ও ব্যত্যয় বস্তুর প্রাথমিক ধর্ম লইয়া আলোচনা করে না বলিয়া পণ্ডিতগণকে বিকল্পমূলক শাস্ত্র (abstract science) বলা ঘাইতে পারে। যাহার প্রত্যক্ষ ও বৃত্ত বৃত্তন নাই, অথচ তাহা ও সঙ্ঘতের ইন্দিতে যাহার বৃত্তন উপস্থাপন বা স্মৃতি হয়, তাহাকেই বলে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের স্বনির্দিষ্ট ও পরস্পরনির্দিষ্ট বহুভাষী সন্ধি থাকিতে পারে। তাহার মধ্যে কতকগুলি বিশিষ্ট ও সার্বভৌম সন্ধির স্বরূপ লক্ষ্যের ইন্দিতে চিত্রশটে পরিষ্কৃত করিয়া তোলাই পণ্ডিতের কাজ। পদার্থবিজ্ঞান যেখানে তত্ত্বশক্তি, আলোকশক্তি, চৌম্বকশক্তি, তাপশক্তি, অভিঘাত শক্তি (mechanical force or force by impact) প্রভৃতি বিবিধ শক্তির ও পদার্থ-প্রত্যাহারক জড়বস্তুর সহিত তাহাদের নানা সন্ধিতে যে সমস্ত বিবিধ ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয়, বা যে সমস্ত নূন নূন ধর্ম উপস্থাপন হয়, পারীক্ষিক (experimental methods) উপায়ে তাহা প্রত্যক্ষ করে, সেই হিসাবে বা সেই পরিমাণে তাহা দৃষ্ট শাস্ত্র (experimental science) ও পণ্ডিতশাস্ত্রের বহির্ভূত। জড়বস্তুর পরীক্ষাসিদ্ধ এই সমস্ত দৃষ্ট ব্যাপারের অন্তরালে তাহাদের কারণ-ভূত যে সমস্ত দিক-কাল সন্ধি তাহাঙ্গিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে সেইগুলির আলোচনার দ্বারা এখন পদার্থবিজ্ঞান উপায়ে এই সমস্ত জগদ্ব্যাপারের কারণ ও তত্ত্বনির্ণয় করা যায়, তখন সেই আলোচনা-পদ্ধতিকে পদার্থবিজ্ঞান (mathematical physics) বলা যায়। পণ্ডিতে যে সমস্ত দিক-কাল সন্ধি আলোচিত হইয়াছে, সেইগুলিই স্থূল ব্যাপার-পরস্পরার মধ্যে ব্যবহার করিয়া

সেই সমস্ত ব্যাপার-পরস্পরার ক্ষেত্রক্ষেপে যে সেই সমস্ত পদার্থিক সত্যগুলি বিব্রাজ করিতেছে, ইহা সেখানই পদার্থিক পদার্থবিজ্ঞানের কাজ। সেই পদার্থিক পদার্থবিজ্ঞানের আলোচনা-পদ্ধতিতে স্থূল পুত্রমান জড়বস্তুর স্থান নাই, জড়বস্তুর ও জড়শক্তি হইতে পুঞ্জীভূত হইয়া তাহাদের যে ব্যাপক সন্ধিগুলি লক্ষ্যের দ্বারা প্রকটিত হইতে পারে, পদার্থিক পদার্থবিজ্ঞান তাহা লইয়াই ব্যস্ত। সেই পদার্থিক পদার্থ বিজ্ঞানমূলক শাস্ত্র, পদার্থিক পদার্থবিজ্ঞানও সেইরূপ বিজ্ঞানমূলক। পদার্থিক পদার্থবিজ্ঞানের জগৎ আমাদের দৃষ্ট জগৎ নয়, তাহা বিজ্ঞানের জগৎ (the world of abstraction)। পদার্থিক পদার্থ-বিজ্ঞানে দুইটা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। একটা পারীক্ষিক উপায়ে দৃষ্ট ক্ষেত্র সহিত দৃষ্ট কালের অবিনা-ভাব সন্ধি অবগত হইয়া তাহার অন্তরালে তাহার সেক-দণ্ডস্বরূপ বা কাঠামস্বরূপ সঙ্ঘটক ও নিয়ামক যে সমস্ত দিক-কাল সন্ধি বহিয়াছে, তাহার তত্ত্ব উন্মোচন করা, সেই দিক-কাল সন্ধির দ্বারা জগদ্ব্যাপারের ক্ষেত্র-কাল নির্ণয় করা এই পদ্ধতির উপায়। অপর পদার্থ-পদার্থিক পদার্থবিজ্ঞান কতকগুলি দিক-কাল সন্ধির বিচার করিয়া এখন কোনও নূন সন্ধির আবিষ্কার করে, তখন সেই আবিষ্কারের বলে অনন্তব্যাপী প্রাথমিক দৃষ্ট কাল সন্ধি ভবিষ্যৎ বাণী করে, সেই ভবিষ্যৎ বাণীর সহিত যদি দৃষ্ট কাল মেলে, তাহা হইলে সেই পদার্থিক সন্ধির আবিষ্কার সন্ধি নিঃসঙ্গর হওয়া যায়। Einstein তাঁহার অপেক্ষাকৃত পদার্থিক উপায়ে স্থাপন করিয়া ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন যে, তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্ব যদি সত্য হয়, তবে দুর্ঘটকগুলির সন্ধি-ক-বর্তী নবজন্মশক্তি স্রল না হইয়া থাকিবে। দুর্ঘটকগুলির সময় কটো লইয়া দেখা মেল যে, স্থিতিতে পরিষ্কৃত নবজন্মশক্তি থাকিবে। ডিব্রোগি (De broglie) পদার্থিক উপায়ে এখন এই সত্য উপনীত হইয়াছিলেন যে, জগতের সমস্ত জড়বস্তুই বিদ্যুৎ-শাখাঙ্ক (electrical) তখন একরূপ উপহাস্যাম্পদ

হইয়াছিল। পরে পারীক্ষিক উপায়ে তাহার কথা প্রমাণ হইয়াছিল।

অণুতের সমস্ত বস্তুর দিক্-কাল সত্যতির (space-time-continuum) ধৃশি বা উপস্থিত হউক বা না হউক, কতকগুলি দিক্-কাল সত্যতের সংরচন-চক্র (system) যে, সমস্ত অণুপ্রক্রিয়ার পঞ্জরীকৃত সত্য হইয়া রহিয়াছে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না। এই পঞ্জরীকৃত সত্যের মধ্যে বতই পত্তীরভাবে আমরা প্রবেশ করিতে পারি, ততই সমস্ত অণুবস্তুর সর্বসাধারণ ও সার্বভৌম তথ্যগুলি আমাদের নিম্নে ক্রমশঃ পরিষ্কৃত হইয়া উঠিবে। কিন্তু একটা অণুবস্তুর যে সমস্ত নানা ধর্ম আমরা নানা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করি সেই সমস্ত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ জাতীয় ঐন্দ্রিয়ক ধর্মগুলি এই সাধারণ ব্যাপক পঞ্জরীকৃত দিক্-কাল-বস্তুত সত্যসংরচন-চক্রের (system of relation) অন্তর্ভুক্ত করিয়া যুক্তিতে পারি না। বিভিন্ন জাতীয় মূল পরমাণুগুলির পরস্পর-সম্মেয়ে ও বিভিন্ন বৈদিক পদার্থের উপাদানীকৃত মূল পরমাণুগুলির পরস্পর বিস্মেয়ে যে সমস্ত বিভিন্ন জাতীয় ঐন্দ্রিয়ক ধর্ম উৎপন্ন হয় ও ব্যাপার সম্মতিত হয়, তাহারই অঙ্কন করা রসায়ন শাস্ত্রের কার্য। পারমাণবিক সম্মেয়ে ও বিস্মেয়ে এই যে নানা জাতীয় ধর্মের উৎপত্তি হয়, গাণিতিক বা পদার্থ-বৈজ্ঞানিক দিক্-কাল সত্যের ভাব্য বা সত্যতে সেইগুলিকে প্রকাশ করা যায় না। রাসায়নিক সম্মেয়ে যখন দুইটা বা ততোধিক পরমাণু মিলিত হইয়া একটা অণু, আণু বা চতুঃপুঙ্ক হয়, তখন সেই অণু, আণু বা চতুঃপুঙ্কের (molecules) মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় পরমাণুগুলির কিরূপ সন্নিবেশ হয় বা তাহাদের পরস্পরের মধ্যবর্তী আকর্ষণ-বিকর্ষণের ক্ষেত্র কিরূপ ভায়াক্রান্ত হয়, সে বিষয়ে গাণিতিক রসায়ন (mathematical chemistry) বা পদার্থবিজ্ঞানবস্তুত রসায়ন (physical chemistry) অনেক ইঙ্গিত দিতে পারে ও অনেক তথ্য আবিষ্কার করে। একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে একটা proton ও electron-এর কি খেলা চলিতেছে,

দুইটা হাইড্রোজেন-পরমাণু ও একটা অক্সিজেন-পরমাণু মিলিত হইয়া যে অণু হয়, তাহার মধ্যে হাইড্রোজেন-পরমাণু দুইটার সহিত অক্সিজেন-পরমাণুটির কিরূপ সন্নিবেশ-বৈচিত্র্য ও তাহাদের আকর্ষণক্ষেত্র কিরূপ ভায়া-ক্রান্ত এবং তাহাদের কিরূপ শিথিলতার অণুকের মধ্যে কিরূপ পারমাণবিক বিস্মেয়ে হয়, গাণিতিক বিজ্ঞানের দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারিলে গাণিতিক বিজ্ঞানের সহিত রাসায়নিক নানা ধর্ম ও ব্যাপারের যে এক নিপুণ সম্পর্ক আছে, তাহা বোঝা যায়, কিন্তু এই সম্বন্ধ-বিজ্ঞানের দ্বারা বা রসায়নের গাণিতিক তত্ত্ব-বিজ্ঞানের দ্বারা (mathematical foundation of physics) রাসায়নিক নানা ধর্মের পরিচয় টানিয়া আনা যায় না। দুইটা হাইড্রোজেন-পরমাণু, একটা পঙ্ক ও চারিটা অক্সিজেন পরমাণুর সন্নিবেশে একটা sulphuric acid-এর অণু হয়। Sulphuric acid-এর অণুজটীর মধ্যে এই বিভিন্ন পরমাণুগুলির সমাবেশ-বৈচিত্র্য হইতে sulphuric acid-এর নানা ঐন্দ্রিয়ক ধর্ম, তাহার রস, তাহার আশ্বাদ, তাহার অস্ত্রবিধ প্রতিক্রিয়া কিছুতেই অনুমান করা যায় না। হাইড্রোজেন এক অক্সিজেন পরমাণু মিলিলে এমন কি ঘটে বাহ্যতে তাহা এমন যেত শুভ্র বস্তু দেখায় এবং আমাদের পিণ্ডা হরণ করে, তাহা বলা যায় না। একটা গোলাপ ফুলের মধ্যে আণবিক সন্নিবেশের সমস্ত তথ্য জানিলেও, সে ফুলের দ্বারা বর্ণ, গন্ধ, সুবাস, কোমলতা, সৌন্দর্য্য তাহার যে সমস্ত বৃত্ত ধর্ম পরিষ্কৃত হইয়া উঠে, তাহার কোনও পরিচয় নির্ণয় করা যায় না। গাণিতিক বা পদার্থ-বৈজ্ঞানিক দিক্-কাল-বস্তুত সত্যসংরচন-চক্র যে জাতীয় তথ্য, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ প্রভৃতিকে আমরা কোনও রূপেই সন্ধ্যার ভাব্য বা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিতে পারি না। অথচ, তাহারা যে ক্রমের সহিত অবিত, তাহার অভ্যন্তরীণ সন্ধ্যানের প্রকৃতি সন্ধ্যার ভাব্য প্রকাশযোগ্য, সেই

সংস্থানের পরিবর্তনের যে সমস্ত নূতন দিক-কাল সঞ্চয়ের
সম্মতন হয়, তাহাও সংখ্যার ভাষায় প্রকাশযোগ্য।
ইহাও আমরা জানি, সেই সমস্ত অমূর্ত সঞ্চয়ের সামান্য
পরিবর্তনে ও রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি মূর্ত ধর্মের অনেক
পরিবর্তন ঘটে। অতএব অমূর্ত ধর্মের সহিত মূর্ত ধর্মের
যে একটি নিপুণ সম্বন্ধ আছে, তাহা কোনও ক্রমেই
অস্বীকার করা যায় না। অথচ অমূর্ত ও মূর্তের
প্রভেদ অনেক এবং চ'এর মধ্যেই যে গভীর ব্যবধান
রহিয়াছে, তাহা কোনও ক্রমেই অতিক্রম করা যায়
না। অমূর্ত হইতে মূর্তে আসিবার কোনও উপায়ই
আমাদের জানা নাই। মূর্ত ধর্মগুলির মধ্যেও একটি
হইতে অপরটীতে আসিবার কোনও উপায় নাই।
রূপ হইতে রসে, বা রস হইতে রূপে পৌছিবার
কোনও পথই আমাদের জানা নাই। তাহা হইলেই
সেবা হাঁহেতেই যে, কতকগুলি অমূর্ত সঞ্চয়ের সরলনে
যে সংস্থান নির্মিত হইয়াছে, তাহাই লক্ষ্যবোধ্য তিরি।
তাহার উপর অবলম্বন করিয়া নানাবিধ ঐশ্বরিক মূর্ত
ধর্ম আপন আপন স্থান নিজে পরস্পর একীভূত
হইয়া আত্মপরিচয় দিতেছে। ঐশ্বরিক মূর্ত ধর্মগুলির
স্বার্থ স্বরূপ কি, তাহার আলোচনা আমরা এ
প্রবন্ধে করিব না, তবে আমরা এ পর্যন্ত যাহা
আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে এইটুকু বুঝিতে পারা
যায় যে, অমূর্ত ধর্মের সংস্থানের সহিত একাধ-
সম্বোধে সন্নিবিষ্ট হইয়া নানা পর্যায়ের মূর্ত ধর্ম আপন
আপন নিজে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এই একাধ
সম্বোধের তাৎপর্য এই যে, বিশেষ বিশেষ বিভাসের
(যেমন রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির) বিশেষ বিশেষ আত্মনির্ভ
সম্বন্ধ-পরস্পরার পৃথক পৃথক সরলনে থাকিলেও
তাহারা পরস্পরের সহিত এমন একটি সম্বোধে বা
সহায়বৃত্তিতার আবদ্ধ থাকে যে, তাহাদের এই
বৃত্তির ও বস্তুবৎ মূর্ত ব্রহ্মের অথও একটীকে
ব্যাহত করে না। এই পরস্পরসহায়বৃত্তিতার একটি
তাৎপর্য এই যে, একটি অপরটার অঙ্গুলে প্রস্তুত
থাকে। রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ঐশ্বরিক ধর্মপর্যায়গুলি

প্রত্যেকেই আপন আপন নির্দিষ্ট নিয়মে চলে। অথচ
তাহারা পরস্পরের অবিরোধে এবং মূল দিক-
কালঘটিত সম্বন্ধ-চক্রের অবিরোধে ও অঙ্গবৃত্তিতার একটি
অথও মূর্ত ব্রহ্মকে আমাদের সম্মুখে পরিচয়িত করে।
এই অঙ্গবৃত্তিতা ও সহযোগিতাই বহু ভেদসমবাহের
মধ্যে কোনও বস্তুকে তাহার বস্তুত্ব অতিরিক্ত ও
অথও করিয়া রাখিয়াছে। কোনও বস্তুকে দেখিলে
তাহাকে আমরা কেবলমাত্র কতকগুলি ঐশ্বরিক
ধর্মের সমষ্টি বলিয়া মনে করি না, কিংবা দিক-কাল
সম্বন্ধে একটি বিশেষ সরলনে মাত্র বলিয়াও মনে করি
না, তাহাকে একটি অথও বস্তু বলিয়াই মনে করি।
বস্তুর মূল কাঠামো বা সংস্থান তাহার আত্মবৃত্তি
দিক-কাল সম্বন্ধে সরলনে। তাহার সহিত তাহাকে
অবলম্বন করিয়া নানা বিভিন্ন পর্যায়ের ঐশ্বরিক
ধর্মপরস্পরার সহযোগে ও অবিরোধে প্রকাশিত
হয়। তিনি দেখিতে লামা, আশ্বমেধে ঘিষ্ট, উপাধানে
কল্যাণ, স্পর্শে কর্কশ; তাহার আত্মবিক সংশ্লিষ্ট-বিভিন্ন
ও অমূর্ত অভ্যন্তরস্থ সরলনের মধ্যে অঙ্গলতান করিলে
আমরা আরও অনেক নূতন নূতন তথ্য উপনীত
হইতে পারি। এই বিভিন্ন পর্যায়ের বস্তুগুলির মধ্যে
এক একটি পৃথক পৃথক ভাবে তাহার নিজ নিজ
পরিচয় ঘেঁষ, অথচ তাহারা একাধিতাব সম্বন্ধে একটি
অথও বস্তুর ধর্মরূপে নিজেদের জানায়। Berkeley
যখন বলিয়াছিলেন যে, ঐশ্বরিক ধর্মগুলির যে পরস্পরের
এক তাহাদের মূল কাঠামোর সহিত একটি একাধিতাব
লক্ষ্য সম্বন্ধে বন্ধন রহিয়াছে, তখন তিনি এই কথাটী
অগ্রহণ করেন নাই। Locke এবং বৈশেষিক যখন
বলেন যে, শুণ ব্রহ্মপ্রাপ্ত, তখন ব্রহ্মকে শুণাত্মী ছাড়া
আর কোনও লক্ষ্য তাহারা বলিতে পারেন নাই।
ব্রহ্ম বলিতে আমরা বুঝি যে, কতকগুলি ধর্মপরস্পর
একটি মূল সম্বন্ধ-চক্রের অথও ও অঙ্গবৃত্তিতার পরস্পর
একাধীভূত হইয়া রহিয়াছে। এই একাধীভূত সরলনে-
পরস্পরার একেবারে নামই ব্রহ্ম। ক্ষেত্র আরও কেমন
করিয়া হইল, তাহা বলাও যেমন কঠিন, প্রাপের আরও

কেমন করিয়া হইল, তাহা বলাও তেমন কঠিন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, নানা ধাতার সম্বন্ধ-সম্বন্ধের (series of relations) সমাবেশে জড়ত্বের পরিচয়। এই সম্বন্ধ-সম্বন্ধগুলি জড়ের আভ্যন্তরীণ নানা ব্যবহার নানাবিধ জড়শক্তিরূপে প্রকাশ পায়। জড়শক্তি প্রধানতঃ তিন প্রকার,—আতিশািতিক (molar), অণু-মলকনামক (molecular) ও বৈদ্যুতিক (electrical): এই তিনটা শক্তির প্রত্যেকটী অপরটীতে পরিবর্তিত হইতে পারে। অর্থাৎ তাপশক্তি হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি করা যায় এবং বৈদ্যুতিক শক্তিকে তাপশক্তিতে পরিণত করা যায়, তেমন আতিশািতিক শক্তি হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। কাজেই মূল একই জড়শক্তি, আতিশািতিক-শক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি মলকনশক্তি রূপে এবং তাহার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা শক্তিরূপে (বহা, রাসায়নিক, জৈবিক ইত্যাদি) আত্ম-প্রকাশ করে। যখন বিভিন্ন প্রকারের জড়শক্তি কোনও একটা কেন্দ্রে সমাবিষ্ট হয়, তখন তাহাদের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত হইয়া বোম-বিস্ফোরণের মতো যেটুকু অবশেষ থাকে, তাহারই পরিচয় পাই। যেখানে ঘাত-প্রতিঘাত হয় না, সেখানে প্রত্যেকটী শক্তি স্বতন্ত্রভাবে আপন স্বনির্দিষ্ট রেখায় প্রবাহিত হয়। কিন্তু তাহার কোনটাই অপরটীর অপেক্ষা রাখে না, বা অপরটীর পরিবর্তনে আপনাকে পরিবর্তিত করে না। কিন্তু, জড়শক্তিকে অবলম্বনীয় করিয়া যখন প্রাণ-প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়, তখন আমরা একেবারে একটা নূতন রাজ্যে আসিয়া পড়ি। এই প্রাণ-প্রক্রিয়ার স্বরূপ তাহার প্রকাশ করা একজন অসম্ভব। কোনও জড়বস্তুর সম্বন্ধে যেমন আমরা মনে করি যে, সেই বস্তুতে নানা জল ও ক্রিয়া ধর্মরূপে বা বিশেষবৈশিষ্ট্য হইয়া আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার ভাবপ্রকাশের প্রণালীও অনেকটা জটিল। তাহা মাঝেই কঠা, জিয়া, কণ ও ইহাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন বিশেষণ লইয়া গঠিত। এই ক্রিয়া, কণ ও বিশেষণগুলি নানা প্রকার পরস্পর-সম্বন্ধে জড়িত হইয়া কঠার বিশেষ রূপে

প্রকাশ পায়। কেহ কেহ বলেন যে, কঠা, কণ প্রভৃতি ইহারা সকলেই পরস্পর-সম্বন্ধে ক্রিয়ার বিশেষণ। যে মতই গ্রহণ করা হাউক না কেন, প্রবাহিত জাতীয় সম্বন্ধও হা', বিশেষ-বিশেষণ জাতীয় সম্বন্ধও তাই। কাজেই, আগ্রহান্বিত ভাব ছাড়া অস্ত্র জাতীয় ভাব তাহার প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু প্রাণ-পার্থ্যারের মধ্যে যে একটা বিশেষ প্রক্রিয়া প্রকাশ পায়, তাহার মধ্যে এরূপ আশ্রয়-আশ্রিত ভাব নির্ণয় করা যায় না। যে সমস্ত বিবিধ ব্যাপার-পরস্পরার সংগঠন-প্রক্রিয়ায় (organisation of relations) প্রাণ-পার্থ্যার প্রতিক্রিয়া, তাহার মধ্যে কোনওটাকে কোনওটীতে আশ্রিত বলিয়া নির্দেশ করা যায় না। এই নূতন পার্থ্যারের তরুকে সেই জড় ভাষায় বুটাইয়া তোলা দুষ্কর। জড়ত্বের প্রতিক্রিয়াতে ও জড় জাতীয় ভাবম্বলিতে সনকে আবিষ্ট না রাখিয়া মনের মধ্যে হইতে একেবারে একটা নূতন জাতীয় দৃষ্টি প্রসারিত করিতে না পারিলে, প্রাণ-পার্থ্যারের লীলা কিছুতেই চিত্রপটে স্ফুট হইয়া উঠিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাণ-পার্থ্যারের তিনটা বিশেষ স্বভাব প্রাণব্রহ্মণ হইতে পৃথক্ করিয়া দেখাইতে গেলে বাস-প্রবাস, রস-সংকরণ ও পাকক্রিয়া এই তিনটা ব্যাপার বিস্তারিত রহিয়াছে। তিনটী যেমন তিনটা গণের উপর সন্মারিত, প্রাণ-প্রক্রিয়াও তেমনই এই তিনটা ব্যাপারের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যাপার তিনটার যে কোনওটির অভাব হইলে প্রাণ-প্রক্রিয়া বিফল হয়। কিন্তু, এই প্রক্রিয়া পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া মনে হইলেও এক তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ নির্দিষ্ট কার্য থাকিলেও তাহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। একই প্রাণ-প্রক্রিয়ার স্বরূপ যেন ত্রিধা বিভক্ত হইয়া এই তিনটা ব্যাপারের মধ্যে দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়া তুলিতেছে। প্রাণ-প্রক্রিয়া ছাড়া এই তিনটার কোনওটাই কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। অথচ প্রাণ-প্রক্রিয়া আসে, কি এই তিনটা প্রক্রিয়া আসে, কি প্রাণ-প্রক্রিয়া অবরহী, ইহারা তাহার অবরহ, এরূপ কোনও সিদ্ধান্তেই উপনীত

হওয়া যায় না। বস্তুতঃ অবস্থক-অবস্থকী সত্ত্ব, বিশেষক-বিশেষক সত্ত্ব, আন্তঃ-আন্তঃ সত্ত্ব প্রভৃতি কোনও এক-স্থকী সত্ত্বের কথাই গ্রাণ-প্রক্রিয়ার পর্যায়োচন-প্রদে উঠিতে পারে না। বাসাদি ব্যাপার গ্রাণ-স্বরূপে আত্মিত, একথা যেমন পতা, গ্রাণ-প্রক্রিয়াও ঐ ব্যাপারগুলির উপর আত্মিত হইয়া আছে, ইহাও তেমনি সত্য। গ্রাণ-প্রক্রিয়া মূল, না বাসাদি প্রক্রিয়া মূল বা প্রথম, তাহা নির্ণয় করা যায় না। বাসাদি প্রক্রিয়া ছাড়া স্বতন্ত্র কোনও গ্রাণ-প্রক্রিয়াও আমাদের প্রত্যক্ষীকৃত হয় না। আবার বাসাদি প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটির সহিত অপরটির এমন একটা অসুত্বসিদ্ধ সত্ত্ব রহিয়াছে যে, তাহাদের একটির উৎকর্ষাপকর্ষে অপরটির উৎকর্ষাপকর্ষ সঙ্গটিত হয়। বাস-প্রকাশ প্রক্রিয়া যদি উত্তমরূপে চলে, তবে রস-সঞ্চালন বা পরিণামকামি ব্যাপারও সুচলিত হয়; আবার সঞ্চালনকামি প্রক্রিয়া যদি ভাল চলে, তবে বাসক্রিয়া ও পরিণামকামি ভাল চলে। আবার পরিণামকামি প্রক্রিয়া ভাল চলিলে বাসাদি প্রক্রিয়া ভাল চলে। তেমনি ইহাদের কোনও একটির কিছু দুর্বলতা হইলে অপরটিও দুর্বল হইয়া পড়ে। এই যে পরস্পরাসংকেতি, ইহা গুণ-অবিরোধে স্থিতি বা অস্থূলক অবস্থার স্থিতি নহে। সেই জন্ত ইহাদের সত্ত্বকে একাধিকতা সত্ত্ব বলা চলে না। ইহারা পরস্পরের সহায় হইয়া পরস্পরের মধ্যে পর্যাপ্ত একটা গ্রাণব্যাপারকে সঞ্চালিত করিয়া রাখিতেছে। ইহারা যেন প্রত্যেকই প্রত্যেকের আশ্রয়স্থল হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের কাহাকেও ছাড়িয়া কাহাকেও পাইবার উপায় নাই। সেই জন্ত এই সত্ত্বকে এক-কারিত্ব বা একাধিকারিত্ব সত্ত্ব বলা বাইতে পারে।

আর এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে গ্রাণ-পর্যায়ের কয়েকটা প্রধান লক্ষণ স্বত্বভাবে নির্দেশ করা বাইতে পারে, যথা স্বস্থীত বর্জন (self-dissassimilation), স্বস্থাপন (self-preservation), স্বার্থ গ্রহণ, বর্জন, বৃদ্ধি ও আত্মপ্রকাশি প্রক্রিয়া, স্বপ্লী বা বংশবিস্তার প্রক্রিয়া (self-multiplication), স্বপরিণাম (self-development) এবং স্বনিয়ন্ত্রণ (self-regulation) স্বার্থ

স্বপ্লীত স্বপ্লীয়া নিয়ন্ত্রণ, পারিপার্শ্বিক স্বপ্লীতত্ব বাহুল্যে পরিবর্তন সাধন ও ভগ্নপেছার স্বকীয় পরিবর্তন সাধন এবং স্বকীয় বিবিধ বৈদ্যনা সম্পাদন ও বৈদ্যনা সাম্যসাধন (self-differentiation, self-adaptation, self-adjustment ইত্যাদি) প্রত্যেক গ্রাণ-পর্যায় পারিপার্শ্বিক স্বপ্লীতত্ব হইতে আপন মেতাপেছাই বাত্ম আপনি প্রস্তুত করিয়া লয় এবং তাহার দ্বারা আপন দেহ পঠন করিয়া তোলে। কৃদামি চারিদিকের ভল, বাতাস, আলোক ও ভূমিরল হইতে আপন দেহের উপযোগী বাত্ম আপনিই প্রস্তুত করিয়া লয় এবং সেই জন্ত প্রত্যেক গ্রাণ-পর্যায়ের প্রস্তুত বাত্ম (proteid) অপরাপর পর্যায় হইতে বিভিন্ন। প্রত্যেক গ্রাণ-পর্যায়ের পরীক্ষের মধ্যে এই যে বাত্ম-সংগ্রহ ও পরীত-বিধারপের প্রক্রিয়া চলিতেছে, তাহাকে ইংরাজীতে বলে anabolism এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণগুণীতের অপচয় ও বিপর্য প্রক্রিয়া চলিতেছে, তাহাকে বলে katabolism। এই উভয় প্রক্রিয়ার সমষ্টি ও সাম্যত্বের নাম metabolism। যেখানে জীবন আছে, সেখানেই আমরা তাহার এই গ্রহণ-বিপর্যায়ক প্রক্রিয়ার পরিচয় পাই। যে মৈব ধাতু বা proteid পদার্থের গ্রহণ-বিপর্য প্রক্রিয়ার দ্বারা গ্রাণ-পর্যায় আপনাকে প্রস্তুত রাখে, সেই ধাতুটি প্রত্যেক গ্রাণ-পর্যায়েরই যোগযোগী ইতর ভিন্ন ও ইতর ব্যাবর্তক। যেতার রক্ত উপাদানিক স্বপ্লী হিসাবে পাথার রক্ত হইতে বিভিন্ন। এই ধাতুসত্ত্ব বৈদ্যনা প্রস্তুতই অনেক সময়ে দেখা যায় যে, একজনের পক্ষে বাহ্য। পুষ্টিকর, অপরের পক্ষে তাহা বিবলুনা। জীব-পরীক্ষের মধ্যে লক্ষ্য যেমন রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলিয়াছে, তেমনি তাহারই আত্মপ্রকাশি ভাবে বিপর্যের কামও চলিয়াছে। আবার বিপর্যের আত্মপ্রকাশি ভাবে গ্রহণ চলিয়াছে। একটা নির্দিষ্ট কালের জন্ত এই গ্রহণ-বিপর্য ব্যাপারের এমন একটা স্থল আছে যে, সত্ত্ব আপন-নির্গম-গ্রহণ-বিপর্যের মধ্যে দিয়া একটা দ্বারী গ্রাণ-প্রবাহ আপনাকে আপনি প্রস্তুত রাখে। একটা প্রকাণ্ড স্থির মধ্যে যেমন

নতন জল আসে ও পুরাতন জল বাহির হইয়া যায়, কিন্তু এই কালের আগমন-নিৰ্গমনের মধ্যে ভূগিণী আপনাকে অব্যাহত রাখে, প্রাণ ব্যাপারও তেমনি একটি নির্দিষ্ট কালের ভিত্তি স্বরূপের উপচাপাচরের মধ্যে আপন প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখে। আবার অনেক সময়ে দেখা যায় যে, এই দীর্ঘকাল ধরিয়াও যদি এই প্রাণ-বিশবাস্যক প্রাণ-ব্যাপার শুদ্ধ থাকে, তথাপি প্রাণ-প্রক্রিয়ার কোনও হানি হয় না। কোনও কোনও বীজ ৮৭ বৎসর পর্যন্ত পড়িয়া থাকিয়াও অক্ষুণ্ণ হইতে দেখা দিয়াছে। এই দীর্ঘকাল পর্যন্ত ব্যাপারের না হইয়াও একটি অর্থও প্রাণন কেন্দ্র করিয়া সঞ্চিত হইয়াও আশুপ্রসিদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা মনীষীদেরও হৃদয়ঙ্গব। প্রাণ-পর্যায় পারিপার্শ্বিক বহির্গত হইতে শক্তি আহরণ করে, সঞ্চিত শক্তি সঞ্চিত করিয়া রাখে, মিতব্যয়িতার সহিত ব্যয় করে ও অপর প্রাণ-পর্যায় সৃষ্টি করিয়া তাহাতে সেই শক্তি সঞ্চারিত করে। "The animate system is aggressive on the energy available to spends it with economy and invests it with interest till death finally deprives it of all."

প্রাণ-পর্যায় যে কেবল বহির্গত হইতে আহরণ করিয়া নানা ব্যাপার-পরম্পরা পরিবর্তনের মধ্যে নিজের কার্যোপযোগী সেই ঘটন করিয়া তুলিয়া নানা স্ব-কর্ত্তির মধ্য দিয়া আপনাকে সুপ্রসিদ্ধিত রক্ষিয়া চলে তাহা নয়, সে তার আপন সূক্ষ্ম প্রাণ-পর্যায় সৃষ্টি করিয়া ধারা-প্রবাহে নিরন্তর আপনাকে সঞ্চারিত করিয়া রাখে। পারিপার্শ্বিক বাহিরের অর্থকে সে যেমন একদিকে আপন অঙ্গুলে, আপন সেম্বাহুতে পরিণত করিয়া তোলে, তেমনি পারিপার্শ্বিক জগতের সহিত সামঞ্জস্য চলিবার জন্য আপনাকে অঙ্গুলে পরিবর্তিত করিয়া তোলে। উপনিষদে আছে "ভবৈক্যং বহুত্বং"। তাঁহার ঐক্য ক্রিয়ার দ্বারা তিনি আপনাকে বহুতা বিভক্ত করিয়া তুলিলেন। তেমনি সেবিতে পাই যে, একটি জীবকোষের মধ্যে কি অজাত ঐক্য-ক্রিয়ায় কলে তাহার অন্তর্গত ক্রোমোজম-

গুলির মধ্যে কি এক প্রক্রিয়া চলে, বাহার কলে সেই জীবকোষী আপনাকে বিধা বিভক্ত করিয়া বহুত্বভাবে হই পৃথক্ প্রাণ-প্রক্রিয়ার আয়ত্ত করে। আবার বহুকোষী (multi-cellular) প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় যে, যদিও প্রত্যেকটি কোষের স্বতন্ত্র জীবন-প্রণালী চলিয়াছে, তথাপি অল্প কোষের দ্বারা ব্যতীত তাহাদের পরস্পরের স্বতন্ত্রভাবে প্রাণ ব্যয় করা অসম্ভব। একটি প্লিনাশ পাছকে টুকরা করিয়া কেদিলে, তাহাদের প্রত্যেকটি জীবকোষের জীবনই অসম্ভব হয়, আবার একটি শ্মশ্রুকে চূর্ণ করিয়া কেদিলেও প্রত্যেক চূর্ণ আপন জীবনশক্তির প্রভাবে আপনাকে বহুতা বিভক্ত করিয়া নিজের জীবনকে প্রসিদ্ধিত করিয়া তোলে।

জাদুইনের ক্রমবিকাশ মতের তাৎপর্য এই যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেও আহরণ-সংগ্রামের জন্য জীব-জগতে প্রাণ-পর্যায়ের পরস্পরের মধ্যে সর্বদা একটা যুদ্ধ (struggle for existence) চলিয়াছে। সেই যুদ্ধে ঘটনাক্রমে যে জীবের যে সুযোগপটী আসে, সেইটাই তাহার সহায় হয় এবং বংশ-সম্প্রতির মধ্যে বাহাদের সেই সুযোগপটী থাকে বা অল্প জাতীয় কোনও সুযোগ আসিয়া ছোটে, তাহারাই জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া যায়। এমনি করিয়া দেখা যায় যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার উপযোগী সুযোগ-সুবিধা লইয়া নানা প্রাণিসম্প্রদায় অস্তিত্ব রাখে। বাহু জগতের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত প্রাণিসম্প্রদায় তাহার অঙ্গুলে চলিতে পারে নাই, তাহারাই ধ্বংস পাইয়াছে—আর বাহার। স্বকীয় সুযোগ-সুবিধার সাহায্যে নিজেরের বাঁচাইয়া রাখিতে পারিয়াছে, তাহারাই টিকিয়া দিয়াছে। এই যে অঙ্গুলে জগতের মুক্তা এবং উপজুক্তের স্থিতির একটি বাছাই (selection) চলিয়াছে, ইহাকে বলে প্রাকৃতিক নির্বাচন (natural selection)।

এই প্রাকৃতিক নির্বাচন একেবারে অসম্ভব হইত যদি, জীবিতেরা বাহাদের উৎপন্ন করে, তাহার। সকলেই মাতাপিতার সর্বদা অঙ্গুলে হইত। জীবিতেরা

সাধারণের উৎপন্ন করে, তাহারা লক্ষ্য সময়েই পিতা-মাতার কিঞ্চিৎ অগ্রহণ ও কিঞ্চিৎ বিচিন্ন। এই বৈষম্য উৎপাদনের নাম আকস্মিক বৈষম্য বা accidental variation। প্রতি বংশে নূতন নূতন বৈষম্য হয় বলিয়াই সেই বৈষম্যগুলির মধ্যে বেগুনি পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সংগ্রামের উপযোগী, তাহার একটা বাছাই হইতে পারে, এইরূপ একটু একটু বৈষম্যের মধ্যে বংশপরম্পরার বাছাই ও নূতন নূতন বৈষম্যের সৃষ্টি ও তাহাদের বাছাই চলিয়াছে এবং এই প্রক্রিয়ার দ্বারা এই জগতের এই বহু। বিভিন্ন জীববিশেষের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাই ডার-উইনের মত। কিন্তু যদিও ডারউইনের এই মত মোটা-মুটি ভাবে অনেক পরিমাণে সত্য, তথাপি কেবলমাত্র সামান্য সামান্য বৈষম্যের লক্ষ্য হইতেই যে এত বিভিন্ন জীবপার্থীর উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা স্বীকার করা যায় না। Weismann বলেন যে, প্রত্যেক জীবের জীবনী মধ্য দুইটা অংশ আছে। একটা দেহ-নির্মাণক অংশ, অপরটা মূল বীজাংশ (germplasm)। মূল বীজাংশটা বংশোদ্ভবের অবিকল্পিতভাবে সংক্রমিত হইতে থাকে। প্রত্যেক বংশের মধ্যবর্তী পুরুষাঙ্ককে প্রাপ্ত এই বীজাংশ পরবর্তীতে সংক্রমিত হইয়া তাহার জীবনের আরম্ভ করে। এই মূল বীজ হইতে আরম্ভ জীব পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া আপন দেহ আপনি নির্মাণ করিয়া লয়। কিন্তু এই ব্যাখ্যাতেও এই অসঙ্গতির বিচিত্র প্রাণ-পার্থীর উৎপত্তির কোনও সম্বন্ধের পাওয়া যায় না। অনেকে বলেন যে, প্রত্যেক কোষের অন্তর্ভুক্তী ক্রোমোসোমগুলি যেন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীব-শক্তি সমন্বিত। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিভিন্ন শক্তিগুলির দ্বারা বিভিন্ন ভাবে উত্তেজিত হইয়া কোষান্তর্ভুক্তী ক্রোমোসোমগুলির বিভিন্ন রকম ঘটন-বিঘটনের উৎপত্তি হয়। এই ঘটন-বিঘটনের ফলে সেই ক্রোমোসোমগুলির যে বিভিন্ন বিকাস-পরম্পরা হয়, তাহারই ফলে নানা জীবপার্থীর

উৎপত্তি হয়। কিন্তু বিভিন্ন বিভিন্ন জীবকোষের মধ্যে ক্রোমোসোমগুলির নানাবিধ সংখ্যাভেদিতা দেখা যায়। ক্রোমোসোমের এই সংখ্যাভেদিতা মানিতে গেলে আদিম জীবকোষের বৈষম্য মানিতে হয়। কেহ কেহ বলেন যে, বিভিন্ন জাতীয় জীববিশেষের সন্নিধানের দ্বারা নানা বিভিন্ন জীবপার্থীর উৎপত্তি হয়। কিন্তু এ মতেও পোড়া হইতেই জীববৈষম্য না মানিলে বিভিন্ন জাতীয় জীবকোষের সন্নিধান ব্যাখ্যা করা যায় না। কেহ কেহ বলেন যে, একটা অংশও প্রাণশক্তি নানাবিধ আবরণের দ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত করিতে পারে না। এই আবরণগুলির সহিত জীবশক্তির সঙ্গর্গেই একটা কণ্ঠ চলিয়াছে; সেই কণ্ঠের ফলে বিভিন্ন আবরণগুলি যেমন যেমন বিভিন্ন ভাবে অপসারিত হয়, এই সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রাণ-পার্থীর আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। কিন্তু ইহার কোনও মতকেই মূল্যবান বলিয়া মনে করা যায় না। জীবভাবকে জীবশক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে এই কথাই মনে আসে যে, জীবশক্তিও দ্বি-জড়শক্তির অল্পতম আর একটা মূঢ়শক্তি মাত্র। তাহাই যদি হইল, তবে সে শক্তি ও জড়শক্তিরই প্রকার বিশেষ হইল। কিন্তু জীবভাবের মধ্যে গ্রহণ, ধারণ, বর্জন, নিরসন প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যাপার-পরম্পরার সামঞ্জস্য ও ইচ্ছা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, কোনও জড়শক্তি তাহা সম্পাদন করিতে পারে না।

প্রত্যেক জীবভাবের মধ্যেই আমরা শক্তি দেখি, কিন্তু সেই শক্তি সেই জীবভাবের ফল, হেতু নহে। আগে জীবভাব মানিলে তবে শক্তি সিদ্ধ হয়, শক্তির দ্বারা জীবভাবের উৎপত্তি হয় না। জীবের মধ্যে যত কিছু শক্তির পরিচয় আমরা পাই, সে সমস্ত জীবসংঘের অন্তর্ভুক্তী সামান্যনিক ও বৈজ্ঞানিক শক্তি-বিশেষের ফল মাত্র। জড়শক্তি হাড়া জীবের কোনও স্বতন্ত্র শক্তি নাই। পারিপার্শ্বিক জড়বস্ত হইতে উদ্ভূত আপন আহার সংগ্রহ করে, আর অজ্ঞাত প্রাণীরা সেই উদ্ভূত হইতে কিংবা অজ্ঞ প্রাণীসহ হইতে আপন

আপন আহার সংগ্রহ করে। সেই জন্ত সাধ্য বা পরম্পরাক্রমে সমস্ত আহারই জড় হইতে লগ্নীত। এই আনন্দ জড়বস্তুর শক্তি জীবতাবের অস্বত্ব হইয়া জীবশক্তিরূপে প্রকাশ পায়। অথচ জড়শক্তিকে কোনও ক্রমেই জীবশক্তি বলা যায় না। যখন কতকগুলি বিভিন্ন ও বিভিন্ন শক্তি পরস্পরের মধ্যে ও বহির্গতের শক্তিক্রমের সঙ্গর্গে এমন একটি একার্থ-কারিত্ব সম্বন্ধে এমন ভাবে অধিত হয় যে, তাহাদের প্রত্যেকটি অপরটির সহায় হয় এবং এমন গুণ-প্রোতভাবে অণুগুণে আপনাদের পরিচয় দেয় যে, প্রত্যেকটি ছাড়িয়া ও সমগ্রকে ছাড়িয়া তাহাদের কোনটির কোন সত্তা নাই বা প্রকাশ নাই, তখন সেই সামগ্র্যে বিবিধ শক্তিক্রমের যে একটি ঐক্য সাধিত হয়, তাহাকেই জীবন বলা যায়। ইংরাজীতে purpose বা উদ্দেশ্য-প্রয়োজন বলিতে বা' বুঝা যায়, তাহার প্রথম পরিচয় আশ্রয় জীবনেই পাই। এই যে গ্রহণ, ধারণ, বর্জন, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ও তৎসংশ্লিষ্ট নানা শারীরী ক্রিয়া একটি অপরটির মধ্যে ও প্রত্যেকটি সমগ্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া একটি ঐক্যের (unity) সৃষ্টি করে, এই যে ঐক্যটি আনুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আপন সামগ্র্যকে রক্ষা করিবার জন্ত সর্বদা বহির্গতের সহিত সংগ্রাম করিতেছে, বহির্গতের ধাতুকে বহাতুতে পরিবর্তিত করিতেছে ও প্রয়োজনানুসারে আপন স্বভাবের পরিবর্তন করিয়া বহির্গতের সহিত অঙ্গুলতা করিতেছে এবং আপনার মধ্য হইতে স্বাহুগপ নূতন নূতন সামগ্র্যের কেন্দ্রকে বীজীভূত করিয়া অনন্তকাল ধরিয়া বহির্গতের মধ্যে আপনার মধ্যে আপনি পর্যাণ্ড থাকিয়া আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিতেছে, ইহাকেই বসে জীবন (Life is a self-existing unity of self-purposive and self-revolving relations begetting similar unities out of itself and carrying on itself in self-adaptation with its environment.)।

যেমন দিক-কাল সজ্জিত সমস্ত সত্ত্বের ব্যবহার

যে একাধিভাবসম্পন্ন ঐক্যের বিধান হয়, তাহাতেই জড়বস্তুর উৎপত্তি। তেমনি জড়শক্তিবর্গের সমস্ত সরচনক্রিয়ার (organisation of relations) এমন একটি সামগ্র্যের ঐক্য গঠিত হয় যেখানে প্রত্যেকটি ব্যাপার অপর প্রত্যেকটি ব্যাপারের জন্ত অপেক্ষার ও সহায়তার সম্বন্ধিত হয়, অথচ সমগ্র হইতে প্রত্যেক-পক্ষকে বিচ্ছিন্ন ভাবে পাওয়া যায় না। "The very nomenclature of biology embodies the conception that life in whatever form it may occur occurs as a specific whole, in which the parts and actions are essentially relative to one another and cannot be isolated without destroying their nature. The working hypothesis of biology is that wholeness exists, and this working hypothesis has carried biology forward just as successfully as the Newtonian conception has carried the physical sciences forward. Biologists are and always have been progressively tracing the specific co-ordination which shows itself in the structure, activities and environment of living organisms. This conception cannot be expressed in terms of ordinary physical and chemical conceptions. For this reason biology must be regarded as a distinct science or group of sciences."

এই যে জড়শক্তিকে উপায়ভূত করিয়া একটি অণু বাতুভূত স্বপ্রয়োজক সমগ্র জীবসত্তার আবির্ভাব হয়, ইহা উহার পারিপার্শ্বিক সমগ্র বস্তুকে কেবলমাত্র ইহার আপন প্রয়োজনের চক্ষেই দেখিয়া থাকে। উদ্ভিদেহা নতিশীল নহে। সেইজন্য একস্থানে থাকিয়া তাহারই চারিপার্শ্ব বাহা, তাহা নইয়াই তাহার। সন্নিবেশ থাকে। কিন্তু অতি নিয়ন্ত্রণের জঘন-প্রাণীর মধ্যেও এই ভৈব স্বপ্রয়োজক ব্যাপারের একটা নূতন পর্যাণ্ড দেখা যায়। সেবা দিয়াছে যে, যদি একটি বড় "এমিবা" কীট একটি অত্যন্ত নিরুপখ্যাতের এমিবা কীটকে আহার করিবার জন্ত তাহার পচাতে ধাবমান হয় এক বদি তাহার কবলগ্রহ

হইয়াও সেই কীট পশুদের করিতে সক্ষম হইয়া নানাদিকে ধাবিত হয়, তবে সেই বড় এমিবা কীটটীও তাহার পিছনে পিছনে ইতস্ততঃ ধাবিত হয় এবং এইরূপ নানা অঙ্গসন্ধান ও চেষ্টায় তাহাকে ধরিয়া আহার করে। অগোচরিত বৃহত্তর প্রাণীর মধ্যে জননঃ এই ঘটাবটী খুট হইয়া উঠে। নিজের আহার অঙ্গসন্ধান, প্রাণরক্ষণ, নিজের সম্বন্ধিক ভয়ের হাত হইতে বাচাইবার মত অর্থাৎ প্রায় সমস্ত বরক্ষণ (self-preservation) এবং বংশরক্ষণের (race-preservation) ব্যাপারে বহির্ভগতে সোভের বা ভয়ের বা কিছু ঘটনা ঘটে, তাহা প্রত্যক্ষ করিলে প্রাণিপরীয়ে তাহা অজ্ঞাত উপলব্ধিতে থাকিয়া যায় এবং ভবিষ্যতে তাঙ্গ পটনা খসিলে পূর্নলব্ধ উপলব্ধি লাভত হইয়া উঠিয়া বরক্ষণ বা বংশরক্ষণ ব্যাপারের অগ্রকূল কার্য্য তাহাদিগকে প্রোৎসাহিত ও প্রোৎসাহিত করে। এমন অনেক সময়ে সেবা যায় যে, একটা ইঁদুর যদি একবার কলে পড়িয়া কোনও ক্রমে ছাড়া পায়, তবে পুনরায় তাহাকে কলে ফেলা হুঃসাধ্য হয়। একটা বিভাগ যদি কোনও ক্রমে একটা খাবারের চাক্সা খুঁদিয়া কেলিতে পারে, তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারে তাহার পক্ষে সেই কার্য্য ক্রমশঃ সহজ হইয়া আসে। W. K. Clifford বলিয়াছেন, "It is the peculiarity of living things that they change under the influence of surrounding circumstances but that any change which takes place in them is not lost, but retained and as it were, built into the organism to serve as the foundation of future actions." Bergson এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "Its past in its entirety, is prolonged into its present and abides there actual and acting." এই সে নানা আত্মীয় ব্যাপারকে একীভূত করিয়া একটা অবিকলিত সামঞ্জস্যে সমস্ত বহির্ভগৎকে বহুপ্রয়োজনের উপায়ভূত রূপে ব্যবহার করিয়া নানা প্রতিরূপ অবহার দ্বারা আপনাকে অপ্রতিকূল করিয়া রাখে, এই অশব্দ জীবতাবকেই জীবপুরুষ (biological personality) বলা যায়। বিভিন্ন প্রাণীর বিভিন্ন প্রাণ-

প্রক্রিয়ার ব্যাপার পর্যালোচনা করিলে সেবা যায় যে, প্রত্যেকটা জীবপুরুষের প্রাণব্যাপারের একটা স্বতন্ত্রতা ও বিশিষ্টতা আছে। গ্রহণ, দারণ, বর্জন, বহির্ভগতের সহিত ব্যবহার, বহির্ভগৎকে সে প্রাণালীতে আপন প্রয়োজনের অন্তর্গত করে, বহির্ভাষার তাহার মধ্যে যেভাবে প্রতিফলিত হয়, এবং সেই প্রতিফলনের অঙ্গসন্ধান সে কি ভাবে আপনাকে চালিত বা নিয়ন্ত্রিত করে, সে সমস্তগুলিরই এক একটা বিশিষ্ট প্রণালী আছে। সেই প্রণালীটী সেই সেই জীবপুরুষের অন্তর্ভুক্ত আধান-পদ্ধতি (of structural scheme) হইয়া রহিয়া সেই জীবপুরুষের সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে আপনাকে সুব্যক্ত করিয়া তোলে। বহির্ভগতের সহিত ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে এই আধান-পদ্ধতিটীই স্বেচ্ছা চেষ্টা পরিবর্তিত হয় এবং ক্রমবিকাশের দ্বারা এই পরিবর্তিত আধান-পদ্ধতিটী জীব হইতে জীবান্তরে পরিণত হয়। আবার প্রত্যেক জীবের স্বকীয় ব্যবহারে সে সমস্ত নূতন নূতন উপলব্ধি ঘটে, সেগুলির দ্বারা তাহার প্রাক্কল আধান-পদ্ধতিটী ক্রমশঃ বিস্তৃত হয় এবং সেই সঙ্গে তাহাতে নূতন নূতন পরীক্ষা ও নূতন নূতন বদান্ধিরও স্থিতি হয়। মনে হয় যেন এই আধান-পদ্ধতিটী মূর্তভাবে মূলবীজের ক্রোমোজোম পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া সেগুলির মধ্যে নানা ঘটন-বিঘটন, নানা সম্মিলন-বৈচ্ছিন্নের স্থিতি করিয়া প্রাণিপরীরেয় সহায় ও স্বতাব পর্যন্ত পরিবর্তিত করিয়া দেয়। প্রত্যেক প্রাণীর সেহাতায় যে সমস্ত জৈব প্রক্রিয়া চলে, এক বহির্ভগতের সহিত সে যেভাবে ব্যবহার করে, তাহার সমস্ত প্রক্রিয়াই প্রায় তাহার জীবপুরুষের আধান-পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যখন কোনও জীব পারিপার্শ্বিক কোনও বহির্ভগৎকে আপন প্রয়োজনের অঙ্গরূপে করিতে চেষ্টা করে, তখন যদি সেই জীবের আধান-পদ্ধতি সমস্ত তাহাকে গ্রহণ করিতে না পারে, বা গ্রহণের পথে কোনও বাধা উপস্থিত হয়, বা কোনও কারণে গ্রহণ করিতে নিলম্ব বা বিলম্বতা ঘটে, তবে সেই আধান-পদ্ধতির সহিত বহির্ভগতের সম্মিলনের সংঘর্ষ ঘটে; সেই সংঘর্ষই জীবপুরুষের নিকট দুঃস্থত্রে

প্রতিভাত হই। আধান-পদ্ধতির ব্যাপারে সাধারণ উদ্বেগ স্বরক্ষণ ও বংশরক্ষণ; কিন্তু, তথাপি কোনও বিশেষ আধান-পদ্ধতির বিরুদ্ধে যদি কিছু ঘটে, তাহা হইলেই যে সেই বস্তুটা সেই বিশিষ্ট জীবের স্বরক্ষণ বা বংশরক্ষণের প্রতিফল, তাহা বলা যায় না। ক্রম-পরিবর্তনান বিচিত্র অবস্থা-সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়িয়া প্রত্যেক বিশিষ্ট আধান-পদ্ধতিকে একটু একটু বলাইতে চায়। এই বলাইবার ক্ষমতাই স্বরক্ষণ ও বংশরক্ষণে ক্রমশঃ পটুতা লভে।

সেই মত biological experience বা জৈবসম্ভার বলিয়া যদি কিছু থাকে, তবে তাহা এই আধান-পদ্ধতিতেই ক্রমবিকাশের ধারায় সঞ্চিত হইতে থাকে, এবং তাহার ফলে আধান-পদ্ধতির যে নূতন নূতন পর্যায়ে ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতি চলিতে থাকে, তাহার ধারা বহির্জগতের সহিত সামঞ্জস্য-বিধান ক্রমশঃ সহজ হইয়া উঠে। তবেই দেখা যাইতেছে যে, যেমন দীক্ষাকাল সঞ্চিত নানা সঞ্চয় সংরচনাক্রমে নানা বিশিষ্ট আধান-সংহতি হইয়া নানা জড়ত্বব্যবস্থায় আপনাকে পরিচিত করিতেছে, তেমনি সেই জড়ত্বব্যবস্থায় আধান-সংহতির উপর পক্ষপাত করিয়া একাধিকারিত্ব লক্ষ্যে নূতন নূতন আধান-পদ্ধতি আত্মপ্রকাশ করিয়া নানা জীবরূপে আপনাকে পরিচিত করিতেছে।

মহুত্বোত্তর প্রায় সমস্ত প্রাণীরই জীবনযাত্রা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, জৈবব্যাপারের অম্লরোম ছাড়া পারিপার্শ্বিক বহির্জগতের সহিত তাহাদের আর কোনও জাতীয় সূত্ব উপস্থিত হয় না। বননই বহির্জগতের সহিত কোনও জৈবসংঘর্ষ ঘটে, এবং নূতন নূতন আত্ম-বিপ্লব উপস্থিত হয়, তখনই আধান-পদ্ধতির অন্তর্নিহিত সঞ্চিত শক্তির ব্যবহারে জীবপুঙ্খসমূহ। সেই বিপ্লব হইতে জ্ঞান পাইবার চেষ্টা করে, এবং যে উপায়ে জ্ঞান পাইল, সেই উপায়ের সহিত বিশেষী একটি অবিস্ফোজ লক্ষ্যে তাহার আধান-পদ্ধতির মধ্যে সঞ্চিত হইয়া যায়। জ্ঞান বিপ্লব-আপদের বেলাই যে একখাটী ঘটে তাহা নয়, আহার-বিহার, স্বরক্ষণ-বংশরক্ষণ

প্রভৃতি সকল জৈবব্যাপারেরই অম্লরূপে প্রতিফলিত বাহু লগতে বাহা কিছু ঘটে, যে সমস্তগুলি জ্ঞান জৈব-ব্যাপারের সহিত অবিস্ফোজ লক্ষ্যে আধান-পদ্ধতির মধ্যে সঞ্চিত হইয়া যায়। তাহার ফলে বননই জৈব-ব্যাপারের কোনও সমস্যা উপস্থিত হয়, তখনই পূর্বাভাস অম্লরূপে ক্রিয়ার দিকে আধান-পদ্ধতি উৎসাহিত হইয়া উঠে এবং তাহার অম্লরূপে করিয়া সেই জীবপুঙ্খসমূহ বহির্জগতের আপনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে। অনেক সময়ে বংশগত পূর্বসঞ্চিত জৈব-সম্ভারের ফলে আধান-পদ্ধতি স্বভাবতই স্ব স্ব জীব-নোপযোগী উপায়-পন্থার মধ্যে প্রবর্তিত করে। এই জাতীয় সমস্ত ব্যবহারকেই আকৃতি বা instinct বলা যায়। কিন্তু এই সমস্ত আকৃতিক ব্যবহারের বিশিষ্টতা এই যে, সেই সমস্ত জ্ঞানোপায়, আহারোপায় বা তক্ষণোপায় প্রভৃতি বিবিধ ব্যাপার-পন্থার জৈব সমস্যাটী উপস্থিত হইলেই আধান-পদ্ধতিতে প্রতিফলিত হয়, অতঃপরে তাহাদের অস্তিত্বের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। উপায়গুলি সর্বদাই মূর্তরূপে জৈবসম্ভারের সহিত সঞ্চিত হইয়া থাকে, এবং কেবল-মাত্র জৈবসম্ভারের নির্বাহকরূপে আত্মপরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু এই সমস্ত ইত্যর প্রাণীদের মধ্যেও এই বহির্জগতের প্রতিফলন ও তক্ষণরূপে ক্রিয়ার অম্লরূপ-পদ্ধতিটী যে জৈবসম্ভার ছাড়াও উপস্থিত হইতে পারে, তাহার একটা হুতা অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়; নানাবিধ গৃহপালিত লক্ষ্যে যে মহুত্বোচিত নানারূপ কাজ নিখাইতে পারা যায়, ইহা তাহার একটা দৃষ্টান্ত; কিন্তু মহুত্বের মধ্যেই আমরা সর্ব-প্রথম বুদ্ধি ও জ্ঞানাত্মক একটা নূতন ভূমির বিকাশ দেখিতে পাই। এই বুদ্ধি-ভূমির বিচি ও সজ্ঞান-ভিত্তিকরূপে আমরা যে একটা বিশেষ আধান-পদ্ধতি দেখিতে পাই, তাহার বহুপ প্রকাশ করিয়া বলা সহজ নহে। ইহার চৈতিক বৃত্তিতে (psychological function) বহির্জগতের নানাজাতীয় শক্তি ইন্দ্রিয়বাহের ধারা নানাভাবে পরিবর্তিত হইয়া রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ,

স্পর্শ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিফলন চিত্র-রূপিত আগন্তিক হয়। সেইগুলি আবার চৈতন্য বৃত্তির গ্রহণ, সন্ধান, সংরক্ষণ প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তান্তরের দ্বারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে গৃহীত হইয়া ও পরস্পর একীভূত হইয়া বিভিন্ন নৃষ্ঠ বস্তু ও ব্যাপারের ছাপ রাখিয়া যায়। প্রাথমিক দশায় এই বস্তু ও ব্যাপারের ছাপ জীবপুরুষের উপযোগিতাতেই গৃহীত হয়, অর্থাৎ চৈতন্য আধান-পদ্ধতিতে বিভিন্ন বস্তুগুলির ও তাহার ব্যাপারগুলির যে বিভিন্ন বিভিন্ন সম্বন্ধ সম্বন্ধটিত হয়, তাহার তাৎপৰ্য্য থাকে জৈবপ্রয়োজনসাধনের মধ্যে। কিন্তু, মধুসূক্তের জীবের জগতের সহিত সমস্ত সম্পর্ক যেমন জৈবপ্রয়োজনকেই কেন্দ্রীভূত করিয়া হইয়া থাকে, মধুসূক্তের মধ্যে তাহা হয় না। ইঞ্জিরের দ্বার দিয়া অনবরত নানা বস্তু ও ব্যাপারের ছাপ আধান-পদ্ধতির ক্রিয়ায় সর্বদা চিত্তের মধ্যে সঞ্চিত হইতেছে, সেগুলি জৈব প্রয়োজনানুসারে অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। কাজেই, হঠাৎ বয়ল বাড়িতে থাকে ততই এই জাতীয় নতুন উপলব্ধিগুলি একদিকে যেমন জ্ঞানস্রোতে হ্রস্ব বা সৌণ্ড জৈবপ্রয়োজননির্দিষ্ট সহিত অধিত হইতে থাকে, হ্রস্ব বা উপলব্ধিগুলির কোনওটিকে মুখ্য করিয়া অপরগুলি তাহার সহিত সৌণ্ডভাবে জড়িত হইতে থাকে, তাহাদের কতকগুলি আবার সম্বন্ধ-স্বস্থানের মধ্যে স্থান না পাইয়া কিছুকালের জন্য ভাসিয়া থাকিয়া আবার চিত্তাত্যক্তের বিসৃঞ্জ্য হইয়া ঘাইতে থাকে। অপরদিকে তেমনি নানা রূপের, নানা শব্দের, নানা আকৃতির যে সমস্ত বিভিন্ন পরিবেশ-চাক্ষু্য পৃথিবীর চারিদিক পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে, সেইগুলি চিত্তের অজ্ঞাতসারে চৈতন্য আধান-পদ্ধতিতে তাহার গভীর স্ফূর্তির রাখিয়া যায়। তবেই দেখা গাইতেছে যে, নৃষ্ঠ বস্তুগুলি একদিকে জৈবপ্রয়োজনদের সহিত অধিত হইয়া চিত্তের আধান-পদ্ধতির মধ্যে সঞ্চিত হয়, আবার যেগুলি জৈবপ্রয়োজনদের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে অধিত হয় না সেগুলিও হ্রস্ব কোনও না কোনও রকমে সৌণ্ডভাবে অধিত হয়, কিংবা

চিত্তের আধান-পদ্ধতি নিজের স্বাভাবিক নিয়মে সেগুলির মধ্যে কোনওটিকে প্রধান করিয়া, অপর-গুলিকে দৌণ্ড করিয়া, তাহাদের পরস্পরের নিজের ভাবে একটা তাৎপৰ্য্য সৃষ্টি করিয়া, সেগুলিকে সঞ্চিত করিয়া রাখে। আবার আর একদিক দিয়া যেখানে সেখানে দেখা যায় যে, জগতে এই যে নানা প্রকারের রূপের খেলা চলিয়াছে, বৃক্ষ, পাতা, স্তম্ভ, নদী, খেল প্রভৃতির যে বিভিন্ন অবস্থাব-পরিবেশের কাককাণ্ড, যে বিবিধ রেখার বিভিন্ন বিজ্ঞান-পরম্পরা সর্বদা ইঞ্জিরের দ্বার দিয়া চিত্তের আধান-পদ্ধতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, সে বস্তুগুলি তুলিয়া সেখানে সেই বিজ্ঞান-বিবেকের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য আধান-পদ্ধতির মধ্যে তাহার গভীর স্ফূর্তির রাখিয়া যায়। আমরা কোনও একটা স্থানের দৃশ্য দেখিলে সে দৃশ্য আমাদের চিত্তপটে আঁকা থাকিতে পারে, এবং কল্পনার ছবিতে অল্প সময় স্টোটকে মনের সমুদ্রে আনিতে পারি। কিন্তু এমনও ঘটে যে, সেই দৃশ্যটির কথা আমাদের কিছুই মনে নাই, কিন্তু যে রেখা ও অবস্থাব-বিবেকের সম্যজ-বর্তিতায় (symmetry) বা বিভিন্ন রঙ্গের খেলার দৃশ্যটিকে স্থবর করিয়াছিল, তাহার একটা ঘোষ-সংঘার চিত্তের অজ্ঞাতে অধিত হইয়া থাকে। এমনি করিয়া প্রকৃতির সমস্ত বস্তুই সম্যজ-বর্তিতায় ও স্ফূর্তনস্বায়তন্য যে একটা সম্বন্ধরূপ চারিদিকে রচিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার স্ফূর্তির সর্বদাই আমাদের চিত্তের মধ্যে সঞ্চিত ও আহিত হইতেছে। ইহা কোনও abstraction বা বিচ্ছিন্নাত্মক বৃত্তি নহে, ইহা নৃষ্ঠ না হইয়াও একরূপ নৃষ্ঠ। অথচ কোনও বস্তু-বিবেচকে আশ্রয় করিয়া নাই বলিয়া ইহা ব্যাপক (universal) চিত্তের আধান-পদ্ধতির সৌন্দর্য্যিক ব্যাপার (aesthetic activities) বলিয়া একটা স্বতন্ত্র ব্যাপার বা বৃত্তি আছে, তাহার দ্বারা এই স্ফূর্তনগুলির সহিত বন্ধন তাহার অঙ্গশাণ্ডী অল্প উপলব্ধির মিলন ঘটে, তখন সেগুলিকে পূর্ণসঞ্চিতগুলির সহিত সম্পর্কীভূত করিয়া ইহা গ্রহণ করিতে পারে এবং তাহার ফলে আনন্দ উৎপন্ন হইয়া

উঠে। আবার এই কৃতির দ্বারাই অঙ্গনিগূঢ় এই সামাজ্যের সংস্কারগুলিকে আবার নতুন নতুন রূপে, শব্দে, রসে, রেখায়, কথায় প্রকাশ করিতে পারে। চিত্তহুমির আধান-পদ্ধতির আর একটা বিশেষ বৃত্তি এই যে, তাহার দ্বারা মৃত্ত বস্তুর বিবিধ ধর্মকে বিশ্লিষ্ট করিয়া, স্বতন্ত্র করিয়া শব্দের সাহায্যে মনের সমুখে বিবৃত করিতে পারে, এবং এই বিবৃত, বিচ্ছিন্ন ধর্ম ও ধর্মীর মধ্যে নানা প্রকারের সম্বন্ধস্থাপন সংঘটিত হইতে পারে। এই বৃত্তিকে বিকল্পাত্মক বৃত্তি বা logical function বলা যায়। চিত্তের অঙ্গনিহিত আধান-পদ্ধতি সর্বদা ধর্ম ও ধর্মীকে বিশ্লিষ্ট করিয়া নানা জাতীয় ধর্মের মধ্যে ও নানা জাতীয় ধর্মীর মধ্যে নানা রূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চেষ্টা করে। এই সম্বন্ধ সংরচনের একটা স্বতন্ত্র বিশিষ্টতা আছে, তাহারই অঙ্গস্বরূপ করিয়া মানুষের চিত্তাপন্থতি নানাদিকে প্রণাবিত হইতে সক্ষম হইয়াছে।

আবার এই সঙ্গে সঙ্গে চিত্তহুমির মধ্যে অর্থবোধ বা value sense নামে একটা নতুন পর্যায়ের প্রকাশ দেখা যায়। এই প্রকাশটা চৈতন্য আধান-পদ্ধতির যেন দ্বিবাচক স্বরূপ। চৈতন্য আধান-পদ্ধতি যে পরিমাণে জৈবপুরুষের প্রয়োজন সাধনে ব্যস্ত, তাহার দৃষ্টিতে অর্থবোধ কোন্ কার্যটী জৈববৃত্তির অঙ্গরূপ হইল বা হইল না, সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া সর্বদাই যেন মানুষের সকল জৈবকার্যকে শাসন করিয়া চলিয়াছে, এবং সেই অঙ্গসারে ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত এই বোধের সৃষ্টি করিতেছে। আবার মানুষের চিত্ত জৈবপ্রয়োজনকে ছাড়িয়া তাহার নিজের মধ্যে অভ্যর্থনা সাধাৎ, রাষ্ট্রীয় বা আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের সৃষ্টি করিয়া তোলে, কি পরিমাণে মানুষের কার্য তাহার অঙ্গরূপ বা প্রতিকূল হইল, এই অর্থবোধই তাহার নতুন নতুন শাসনবাণী প্রচার করিয়া থাকে।

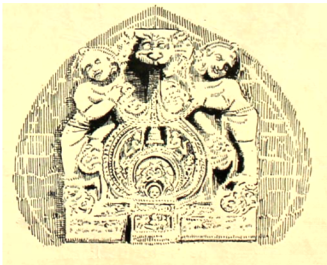
মানুষের চিত্তহুমির অঙ্গনিহিত আধান-পদ্ধতির যে সমস্ত বিবিধ প্রক্রিয়ার কথা বিবৃত করা গেল,

সেইগুলি সংহত করিলে মানবীয় চিত্তহুমির নানা বিশিষ্টতার কথা শুনাইয়া উঠে। মানুষের চিত্ত যে তাহার চিত্তা-পদ্ধতি, তাহার বিশেষ-শক্তি, তাহার অতীতপারী বৃত্তির দ্বারা জৈবসমতা উপবিষ্ট হইবার বহুপূর্বে হইতেই মানুষকে জৈবপ্রয়োজনের প্রতিকূল পথ হইতে নিবৃত্ত রাখিয়া অঙ্গরূপ পথে চালিত করিতে পারে। এই ক্ষমতা মানুষের প্রাণী অপেক্ষা মানুষের পক্ষে জৈবপ্রয়োজন সাধন করা অনেক সুগম। প্রথম দশার মানুষের চিত্তাশক্তি আর সমস্তটাই জীবপুরুষের বর্ণবৃত্তিতার নিম্নোক্তিত হইত, কিন্তু মানুষের চিত্তার সামগ্রী, শক্তি ও বিষয় বহুই ব্যক্তিগত থাকে, ততই সেই চিত্তা-রাজ্যের মধ্যে জীবপুরুষের প্রয়োজনানির্ভর নতুন সামঞ্জস্য ও ঐক্যের সংরচন-চক্র গঠিত হইয়া থাকে। সর্বমানবের চিত্তা-পদ্ধতির মধ্যে একটা সাম্য থাকিলেও প্রত্যেক মানুষের চিত্তার গতি ও প্রকারের সৌণ-মুখা বিচারের নানাবিধ তাৎপর্য নির্ণয়ের একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে, সর্বজীবের জীবন-পদ্ধতিতে একটা সাম্য থাকিলেও প্রত্যেক জীবের যেমন বহির্ভুক্তকে প্রয়োজনের অঙ্গবৃত্তী করিবার একটা বিশেষ ভঙ্গী বা আধান-পদ্ধতি আছে, প্রত্যেক মানুষেরও তেমনি বহির্ভুক্তকে ও তাহারের বিবিধ ধর্মনিচয়কে নিজের চিত্তহুমির অন্তরঙ্গ করিবার একটা বিশেষ আধান-পদ্ধতি আছে। এই আধান-পদ্ধতির বিভিন্নতাই বস্তু, চিত্তা, বাসনা প্রভৃতির এত বৈষম্য। জৈবপুরুষের বেলায় যেমন তাহার জৈব আধান-পদ্ধতির অঙ্গরূপতায় ও প্রতিকূলতায় স্বহৃৎস্বের উদ্ভব, বৌদ্ধ পুরুষেরও (intellectual personality) তেমনি তাহার চিত্তার আধান-পদ্ধতির অঙ্গরূপতায় ও প্রতিকূলতায় স্বহৃৎস্বের সৃষ্টি হয়। বৌদ্ধ পুরুষের এই আধান-পদ্ধতিক সেই ক্ষমতা তাহার ধাতুপুরুষ (structural personality) বলা যায়। এই ধাতুপুরুষকে আশ্রয় করিয়া এবং তাহারই নানা ব্যাপারের ফলে যে নানাবিধ জ্ঞান, চিত্তা, উপলব্ধি, স্মৃতি, দৃষ্টি, রূপ, রস, যেন প্রকৃতি বিভিন্ন চিত্তার পদার্থ (conscious state) প্রকৃতিগত বৃত্তি তাহার

ও হস্ত দণ্ডার সজ্জিত ও পিত্তীভূত হইয়া থাকে, সেই যৌথ ঐক্যটিকে অহুতীপুরুষ বলা হইতে পারে। তবেই দেখা যায় যে, বৈবপুরুষের উপর অবলম্বন করিয়া যে ধাতুপুরুষী গড়িয়া উঠে, তাহারই ভিত্তিতে অহুতীপুরুষ ও বৌদ্ধপুরুষ সমগ্র মাতৃস্বের চিত্তী গড়িয়া উঠে। বৈবপুরুষের আধান-পদ্ধতিটি যেমন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সংগ্রামে ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইতে থাকে, ধাতুপুরুষের আধান-পদ্ধতিটিও তেমনি অহুতীপুরুষ ও বৌদ্ধপুরুষের ব্যাপকতার সহিত ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইতে থাকে। এবং এই ক্ষত সে ধাতুপুরুষের হাত হইতে প্রায় সম্পূর্ণ বৃত্তিলাভ করিয়া আপন অর্বোরে অহুতীপুরুষের আধনাকে প্রবর্তিত করে। অর্বোরেও তেমনি প্রথম দশায় বৈবপুরুষের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আক্রান্ত থাকে, কিন্তু অহুতীপুরুষ ও বৌদ্ধপুরুষের ব্যাপ্তির ও বিকৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাত হইতে বৃত্তি লাভ করিয়া বৌদ্ধপুরুষের স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে আপনাকে প্রবর্তিত করে। বৈবপুরুষের মধ্যে যেমন একটা অথও ও অবিচ্ছেদ্য ঐক্য আছে, বৌদ্ধপুরুষের মধ্যে সেজন্য ঐক্য নাই কিন্তু ঐক্যের

প্রভেদ আছে। বৌদ্ধপুরুষের মধ্যে নানা বৃত্তির নানা দাবী এক সময়ে ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে প্রবল ও দুর্বল হইয়া উঠে। সেই প্রবল-দুর্বল বৃত্তিনিচয়ের পরস্পর যে পরিমাণ সামঞ্জস্য লক্ষ্যিত হইতে পারে, সেই পরিমাণেই বৌদ্ধপুরুষ বৈবপুরুষ হইতে বৃত্তিলাভ করে। বৌদ্ধপুরুষের প্রক্ৰিয়া যে পর্য্যন্ত না ধাতুপুরুষকে পরিবর্তিত করে, সে পর্য্যন্ত এই ঐক্য-সম্পাদনের চেষ্টা বুঝা। সেই ক্ষত দমত দাবন-পদ্ধতিরই চরম চেষ্টা এই বৌদ্ধপুরুষের ঐক্য সম্পাদনের অহুতীপুরুষে পরিবর্তিত করা। বৌদ্ধপুরুষের সমস্ত গুণ রহস্যই প্রায় এই ধাতুপুরুষের মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রকৃতির যে গতিতে জড় হইতে জীব হইয়াছে এবং জীব হইতে বৌদ্ধপুরুষ উপর হইয়াছে, তাহার চরম আদর্শ বৌদ্ধপুরুষের বিভিন্ন বৃত্তি ও প্রকৃতির মধ্যে ঐক্য সম্পাদন করা। সেইজন্য বৌদ্ধপুরুষের বিচারের দ্বারা ধাতুপুরুষকে স্পর্শ করাই আমাদের লক্ষ্য।

“ইহ চেদ্যাবেরীং অথ সত্যমতি ন চেদ্বিহাবেবরীং মহতী বিনষ্টা।”



সতাই, আর আর জাতির ভোগে দুঃখ নাই!



— এইবার! मेरे दाँत — !



এঃ.....! neck to neck.....!

বুদ্ধিদায়

মৌলানা জালাল মুখোপাধ্যায়

(পূর্বাভাস)

এক ঘরে বস করিতে গেলে এমন করিয়া বেশিদিন চল না। হয় তাহাদের অন্তর চলিয়া যাইতে হয়, কিংবা আবার যেমন ছিল, তেমনি করিয়াই থাকিতে হয়।

মাসি রাগ করিয়া থাকিলে কি হইবে, সে বুঝা হইবে কিছুতেই হাড়িবে না। হুঁসিন যাইতে না যাইতেই রাগ-অভিমান তাহার সে একরকম কোর করিয়াই তাকায় দিল। মাসিরও তাহারে যে বিশেষ-কিছু আপত্তি ছিল তাহা নয়, তবে সে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, 'সেখানে বোমা, কা'র দোষ সেখানে ত' ? বীরেন সে আমার সেদিন এমন ক'রে বললে, কিন্তু নিজের ছেলের দোষটি ত' কই একবারও ভেবে দেখলে না।'

নারায়ণী মুগ্ধ হাসিয়া চুপ করিয়া বহিল।

মাসি বলিল, 'না, হাসি নয় বোমা, আমি ত' বাছা একরকম কোর ক'রেই সেদিন ঘর থেকে গুকে বের ক'রে দিলাম, তুমিও রোপ-নেপে কোর ক'রেই গুকে নীচে নামিয়ে নিয়ে গেলে, কিন্তু আমার কি আর তারপর থেকে নীচে নামবার ষোঁ রইলো ! বড়বার নামতে যাই, সেখি না রক্তি ছেলে হাতে ঢিল নিয়ে সিঁড়ির কাছে গাড়িয়ে আছে।' বলে, 'অল্প করেছে, ঘরে ঘুমোওগে নাও, নেমেছ কি ঢিল মেঝে তোমার পা খোঁড়া ক'রে দেবে।' তারপর বেই একটু শক্ত হ'য়ে বলিল—'কেনরে, তুই আমার ঢিল মারবার কে ? বোঝা বলছি আমার হুঁহু থেকে, আমার সঙ্গে কথা বলিসনি।' বাস্, বেই বলা আর ঘর কোথা ! ঢিলটা ঘুরে ছুঁড়ে কেলে নিয়ে রইলো গাড়িয়ে সেইখানে

হুঁহু ভাঙ্গি ক'রে। তুলেও আর হুঁহু তুলে একবার তাকালে না। এমন ক'রে আর কতক্ষণ থাকি বল ! কিন্তু এই আমি বলে রাখলাম বোমা, শেষ পর্যায় দোষ হবে আমার। ওর বাবা শেষে আমাকেই দোষী করবে।'

নারায়ণী বলিল, 'তার কথা ছেড়ে দিন মা ! ওর বাবার কথা আপনি ধরেন কেন ?'

'জা ঘরতে হয় বই-কি বাছা ! ও ভেবেছে, বুঝি ভালবাসে বেলে ছেলের তার বাবা আমিই খেয়ে দিলাম, কিন্তু তা' যে নয়, সে কথা ত' গুকে বুঝিয়ে দিতে হবে।'

অর্থাৎ মাসি বলিতে চায় যে, সেখুঁকে সে ভালবাসে না বরং ঠিক তাহার উল্টা,—সেই তাহাকে হাড়িতে চায় না।

তা এই তাবিয়াই মাসি যদি সবটুকু থাকে ত' থাকে। নারায়ণী বলিল, 'সে কথা গুকে আমি বুঝিয়ে দেবো না, আপনি নিশ্চিত থাকুন।'

মাসি বলিল, 'কিন্তু আর-একটি কথা বাছা তোমার আমি বুঝিয়ে বলি। বীরেনকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'লো।'

কথাটা ওনিবার মত নারায়ণী ঐতত হইয়াই ছিল। বলিল, 'বলুন।'

মাসি বলিল, 'তোমাদের ভাড়া দিয়ে আমি ভেবেছিলাম শুই টাকা দিয়ে আমি আমার বরত চালাব। কিন্তু তা' ত' বাছা আমার হ'ল না। তিন মাসের ভাড়া তোমাদের বাকি প'ড়ে গেল।'

নারায়ণী বলিল, 'সেজন্তে আপনি ভাববেন না মা, এখানে সেই যে সেই খোকার নামে কি-সব কবুতে হ'ল কিনা...'

মাসি বলিল, 'কিন্তু তুমি জান না বাছা, সে টাকা জকে মাসে মাসেই দিতে হবে। তাহাড়া বীরেনের আরও অনেক খরচ—'

মাসি বোঝকরি তাহার মতপন ইত্যাদির কথাই বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। কথাটা পাল্টাইয়া লইয়া বলিল, 'কলারী মানুষ, একসঙ্গে অতগুলো টাকা দিতে ও পারবে না মা, তাই বসুহিলাম কি, আর-একখানা খর আমি ভাড়ার বসাই। তা'তে তোমাদের অগ্রুবিধে কিছুই হবে না মা, তেমন লোককে ভাড়া আমি দেবো না।'

নারায়ণী দেখিল, মাসির প্রস্তাবটা তেমন কিছু অঙ্গদত নয়। তিনমাসের বাকি ভাড়া একসঙ্গে নেওয়া হুরের কথা, কখন যে দিতে পারিবে তাই বা কে জানে। স্ত্রতয়া সে যদি তাহাদের কোনোরকম অগ্রুবিধা না করিয়া আর একখর ভাড়া বসায় ত' তাহাদের আপত্তি করিবার কিছুই নাই। অত্ৰ বাকীওয়ান্না হইলে এতদিন তাহাদের লাঞ্ছনার আর বাকি কিছু থাকিত না।

নারায়ণী ঞানিক ডাবিয়া বাড় নাড়িয়া বলিল, 'তা আপনি আহুন মা, জকে আমি বুঝিয়ে বলব।'

'বুঝিয়ে ব'লো বাছা, পেলে যেন বীরেন আমার দেবী না করে।'

নারায়ণী হাসিল। বলিল, 'না, তা' কবুবে না। কিন্তু এও আমি ব'লে রাখছি মা, আমরা আপনার এখান থেকে কিছুভেই উঠব না।'

মাসিও তাহা চায় না। আসল ব্যাপারটা সে বজই ঘোপন করুক, সেতুকে ছাড়িয়া সে থাকিবেই বা কেনম করিয়া! নারায়ণী যদি না বলিত, মাসিকে হরত নিজেই সেকথা বলিতে হইত এবং শুধু এই বজই বীরেনকে তাহার এত করিয়া কুটাইবার চেষ্টা।

নারায়ণীও যে সেকথা না বুঝিয়াছে, তাহা নয়। কিন্তু হুখ কুটীয়া তাহারও কিছু বলিবার উপায় নাই।

মাসি শেষ পর্যন্ত বলিয়াই বলিল। বলিল, 'অবে তোমাকে কুসেই বলি বাছা, বীরেন যদি মাসে মাসে নশটা ক'রে টাকাও আমাকে দিতে পান্ডত তাহ'লে ভাড়টে আমি কখনও আনুতাম না।'

সুযোগ বুঝিয়া নারায়ণীও বলিয়া বলিল, 'সেকথা আপনি ঠিকই বলেছেন মা, ওর মাইনের টাকা কোনোদিন আমি চোখেও দেখুতে পাই না।'

গত কয়েকদিন হইতে প্রস্তাহ বৈকালে আকাশ অন্ধকার করিয়া মেঘ উঠিতেছিল, খুব ঞানিকটা ঘনঘটা করিয়া কড় উঠিয়া দূলাবাগি উড়াইয়া ঞানিক পরেই আবার সব পরিষ্কার হইয়া বাইতেছিল। অখচ বৃষ্টির প্রয়োজন।

সারাদিন অসহ পরনের পর বৈকালে সেদিন মেঘ উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে মুহুম্ব শীতল বায়ু বহিতে লাগিল। রেবু প্রস্তাহ ঠিক এই সময়টার কাহারও নিষেধ-বারণ না শুনিয়া ছায়ে গিয়া ঠাড়ার। কড় উঠিলেই আবার ছুটিয়া নীচে চলিয়া আসে। সেদিনও সে অমনি ছুটিয়া উপরে উঠিয়া গেল। ঞাওয়া-নাওয়ার পর মাসি সেই ছুতুরে বাহির হইয়াছে। উপরের খর বজ। নারায়ণী বলিল, 'ছায়ে মাসুনি সেবু, কড় উঠবে।'

সেবু সেকথা শুনিভেই পাইল না। কাজেই হাতের সেলাই কেলিয়া নারায়ণীকেও তাহার গিছু-গিছু ছুটিতে হইল।

সহরের মাথার উপর পচ্চিমের আকাশ অন্ধকার করিয়া ওখন মেঘ উঠিয়াছে। ছায়ে ছায়ে মেঘেরের তুকনো কাপড় তুলিবার তাকু পড়িয়া গিয়াছে। কাঁকে কাঁকে পায়রা উড়িতেছে।

সেহুর পাশে নারায়ণীও গিয়া ঠাড়াইল। ওখনও খুণ্যাত হয় নাই, অখচ মনে হইতেছিল, সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দৃশ্টটা মখ লাগিতেছিল না।

এখন সময় নীচে সদর দরবার মনে হইল কে যেন

পূর্ব ঘোরে ঘোরে কড়া নাড়িতেছে। নারায়ণী বলিল,
'চল্ সেধি—হরত মা এসেছেন।'

মা'র নাম না করিলে সে পুণ্যেই হইতে নড়িত কি
না সন্দেহ।

নারায়ণী দরজা খুলিয়া দিতেই দেখা গেল, মাসি
এক। নর, তাহার সঙ্গে অপরিচিত একজন পুরুষ,
একজন নারী—সম্ভবতঃ স্বামী-স্ত্রী, আর একটি বহর-
তিন-চারের ছোটছোট ছোট মেয়ে এবং সকলের পশ্চাতে
দু'জন মুঠের মাথা বাস-বিছানা।

বড় মেয়েটিকে সঙ্গে লইয়া মাসি ঘরে ঢুকিল।
চুকিয়া সে একঘেঁসে নারায়ণীর সঙ্গে তাহার পরিচয়
করিয়া দিল।—'এই যে মা, এসে আশি নতুন ভাড়াটে
নিয়ে এলাম। বাঙালদের বাইরের সেই এতটুকু বর-
খানিতেই কোনরকমে গুয়া মাথা শুঁজে প'ড়ে ছিল।
নাও মা, বরদোর সব দেখে গুনে নাও। এ বেশ
হ'ল বাছা, তোমরাও দু'টি সন্ধ্যা হ'লে, আর আমার
সেহুও একটি সন্ধ্যা ভুলে।'

বসিতে বসিতে মাসি তাহাদের সঙ্গে লইয়া
নারায়ণীর ঘরের পাণের বরখানি তাহাদের থাকিবার
জন্ত নির্দিষ্ট করিয়া দিল। মুঠেরা ঘরের মেঝের উপর
অনিষ্ট-পত্র নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

মাসি বলিল, 'নাও বাছা, সব গোছনাছ ক'রে নাও।
কি নামটি বল্লে, ভুলে গেলাম, আশি কিন্তু নাম ধ'রেই
জান্বে, মা।'

সলজ্জ সজ্জাতে স্বামীর দিকে শিখন করিয়া মাথার
বোমটাটা একটুখানি তুলিয়া ঝেঁক হাসিয়া বলিল,
'বীণা।'

'আর তোমার মেয়ের নাম?'

মেয়েটি এতকাল কাছেই ঠাড়াইয়া ঠাড়াইয়া
নারায়ণীর হৃৎকের পানে একমুঠে তাকাইয়া ছিল। সেই
কথাটার জবাব দিল। বলিল, 'আমার নাম—পিটুণী,
আর আমার বাবার নাম—বল্লব বাবা।'

বাবা তাহার ঠেঁচুখে বিছানা-বাঁধা দড়িটা তখন
ধুটিতেছিল। বলিল, 'বল।'

কিন্তু বলিতে দিয়া মেয়েটি সেলিল নাম জিজ্ঞাসা
করিয়াই মাসি নারায়ণীর কাছে দিয়া চুপিচুপি তাহাকে
কি যেন বলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পিটুণী তাহার কাপড় ধরিয়া টানিয়া বলিল, 'কই
পো গুল্লে না বে? আমার বাবার নাম—সিরি
মুস্তা মাথব ভট্টাচার্। গুল্লে।'

মাথব হাসিয়া বলিল, 'তারি পাকা মেয়ে।'

মাসি বলিল, 'না বাবা, বেশ মেয়ে।' 'আহ! কেমন
টুক টুক ক'রে কথা বলে, গুনেছিল্ নারায়ণী, কি সুন্দর
চেহারা দেখেছিল্! এ বাবা বড় হ'লে তোমার বাসা
মেয়ে হবে।'

সেকথা শ্রুত। মেয়েটার যেমন গানের স্বর, তেমনি
হাত-পায়ের গড়ন, তেমনি মুখ, আর তেমনি চললে
দু'টি চোখ! হঠাৎ সেখানে দু'কণ্ড তাকাইয়া থাকিতে
ইচ্ছা করে।

মাথার তাহার ব্যব্রি করিয়া কাটা রেশমের মত
একমাথা ঝোঁকড়ানো নয়ন ছিল। সেই চুলগুলি একবার
হাত দিয়া নাড়িয়া নারায়ণী চুপিচুপি বলিল, 'এসো
আমরা গল্প করিবে, তোমার বা ততকাল জ্বিদি-
পত্র শুদ্ধিবে নিন্।'

বাড় নাড়িয়া পিটুণী বলিল, 'আমাকেও যে
জুছোতে হবে। গুয়া এক-একা পান্বে না ত'।'

বীণার হৃৎকের পানে তাকাইয়া নারায়ণী ঝেঁক
হাসিল।

বীণা বলিল, 'তোমার অত পাকামি কহতে হবে
না, উনি ডাকছেন, তুমি বাও।'

'চল।' বলিয়া পিটুণী নারায়ণীর কাছে আসিয়া
ধাড়াইল।

বীণা বলিল, 'ছি, 'চল' বলে না, 'চল্' বলতে
হয়।'

মাসি বলিল, 'তা হোক বাছা, যেলে বাছব
ত'! চল।' বলিয়া তাহাদের দুই স্বামী-স্ত্রীকে
ঘরের মধ্যে রাখিয়া সকলেই সেখান হইতে বাহির
হইয়া আসিল।

আপিস ছইতে বীরেন বাড়ী ভিড়িয়াই গুনিশ
বে, তাহাদের বাড়ীতে নুতন ভাড়াটে আসিয়াছে।
এবং আসিয়াছে বাহারা, তাহারাত্ত ঠিক তাহাদেরই
মত — স্বামী-স্ত্রী আর একটি ছোট মেয়ে। তাহার
বে আসিবে, মাসি তাহা পূজ্জিই বলিয়াছিল বটে,
কিন্তু বীরেন সেকথা বিশ্বাস করে নাই। ঘাই হোক।
ইহাতে তাহার বলিবার কিই-বা আছে! দশটি টাকা
মাত্র ভাড়া দিয়া কলিকাতা সহরে একখানা ঘরও
অনেক সময় পাওয়া যায় না, তাহার উপর ভাড়ার
টাকা পে আচ্ছ তিন-চার মাসের মধ্যে মাত্র একটি-
বার দিয়াছে। সবই সে জানে, অসহ্য বা অস্তায়
কিছুই নয়, তবু তাহার মনটা কেমন বেন এ সংবাদটা
গুনিয়া অবশি বিষয় হইয়াই রহিল।

হঠাৎ এক সময় নারায়ণীকে কাছে পাইয়া বীরেন
বলিল, 'কিন্তু দেখ, এতে অসুবিধা আমাদের একটু
হবে বই-কি !'

নারায়ণী বলিল, 'কিসের অসুবিধে? কল-পাখ-
খানার? তা গুয়ের বেশি লোক ত' নয়।'

বীরেন কি বেন ভাবিতেছিল, বলিল, 'না না, তা
নয়। তবে কিনা—দেখ পূর্বাত্ত ভাড়াটে ও আনুলে
আর-একটা; এঁরা ?'

নারায়ণী বলিল, 'তা'তে কি হয়েছে? আত্মক না!
এক-এক খাচ্ছাম, এখন থেকে আমার একটি সখী
হ'ল। বেশ মেরেট !'

বীরেন বলিল, 'এত ক'রে একটা কথা বেশ
পরিষ্কার হ'য়ে গেল।'

'কি কথা?'

'মাগীর টাকাকড়ি কিছু নেই। যা-কিছু ছিল,
ছুরিয়ে গেছে। এখন এই বাড়ী ভাড়া দিয়েই শুরু
পেতে হবে।'

নারায়ণী সেকথার কোনও জবাব দিল না, চুপ
করিয়া রহিল।

বীরেন বলিল, 'চুপ ক'রে রইলে যে? তোমার
কি মনে হয়?'

'আমার বেন জিজ্ঞাস্ করছ, আমি ও-নব কিছু
জানিনে বাপু !'

বীরেন বলিল, 'হ্যাঁ, তা' কেন জানবে? স্বামী
রয়েছে, খেটে খেটে মরছে, মল্ ক' না! — ওগো, তোমার
ছেলের জন্তেই বলছি। ছুট ক'রে এখনি যদি মরে
ঘাই ত' পাখে বসবে।'

'তা জানি।' বলিয়া এসকটাকে বোধকরি
এড়াইবার জন্যই নারায়ণী ঘর হইতে বাহির হইয়া
গেল।

বীণার স্বামীর বয়স বেশি নয়, বীরেনেরই সমবয়সী,
সেখিতে স্মৃষ্ণ স্মৃষ্ণ, চমৎকার চেহারা। বীণা কিন্তু
নারায়ণীর চেয়ে কিছু ছোটই হইবে, কিন্তু সৌন্দর্য্যে সে
শুধু নারায়ণীকে কেন, বাল্যে সেখের অনেক মেয়েকেই
হার মানাইতে পারে। যেমন অল্প-সোঁটব তাহার,
তেমনি গায়ের রং। ছুট একটি গোলাপ ফুলের সঙ্গে
তাহার সুখখানির তুলনা করা যায় বটে, কিন্তু স্বামীর
তিরকারে এমন স্মৃষ্ণ সুখও তাহার এক-একদিন রান
হইয়া বাইতে নারায়ণী স্বল্কে দেখিয়াছে। কেন বে
তিরকার করে, কি বে তাহার অপরাধ, কথা গুনিয়া
কিছুই বুঝিবার মো নাই, বুঝিবার চেষ্টাও নারায়ণী
কোনোদিন করে নাই। তবে সেদিক দিয়া বীণাও
বড় কম যায় না। সেও তাহার স্বামীকে এক-একদিন
মিষ্টি মিষ্টি করিয়া অনেক কথাই গুনাইয়া দেয়। বিড়
বিড় করিয়া কি বে শোনার কে জানে।

এক-একদিন ভাবে সে বীণাকে ভিজাশা করিবে,
কিন্তু ভিজাশা করিতে গিয়া হঠাৎ তাহার মনে হয়,
ইহা অস্তায়। তাই সে—হুপ চুপ করিয়া থাকে, নয়
অন্ত কথা পাড়িয়া বসে। স্বামী-স্ত্রীর কথা-কাঁটি এমন
সরুই হয়, এম করিবার কিছুই নাই, কিন্তু ইহাদের
এই ছোট স্বামী-স্ত্রীর বিশেষ এই বে, স্বামীটিও যেমন
রূপবান্, স্ত্রীটিও তেমনি রূপবতী, বিবৃদ্ধ বিন্দয়ে দু'খণ্ড

গাড়াইয়া বেনিবার মত চেহারা। ইহাদের মধ্যে কোথাও কোনও বিরোধ, কোনও অসামঞ্জস্য যে থাকিতে পারে, কাহারও মন লেখা সহজে বিশ্বাস করিতে চায় না। তাই তাহাদের মধ্যে এতটুকু মনোবাসিত্তও মনের মধ্যে একটা অহংকৃত্ত প্রের আগাইয়া তোলে। কোন দ্বিষ্টপথে বিরোধের বীজ যে তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে এবং কি সবলতন করিয়াই বা তাহা বাচিয়া আছে, জানিবার ইচ্ছা নাহকের স্বাভাবিক।—সুতরাং নারায়ণীর সোষ নাই।

সেদিন দুপুরে বীরেন আগিসে দিয়াছে, মাথবের আগিস না থাকিলেও রোজাই সে বাহির হয়। পিটলী সেতুকে খুঁমিয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ সে ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, 'দেবু!'

ঘরে নারায়ণী একা গুইয়া ছিল, ডাকিল, 'পিটলী, পোন!'

পিটলী তাহার কাছে আগাইয়া আসিল। বলিল, 'দেবুকে খুঁজছি।'

নারায়ণী হাত বাড়াইয়া পিটলীকে ধরিয়া তাহার খাটের উপর তুলিয়া গইল। চুপচুপি জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যারে পিটলী, জোর মার সঙ্গে জোর বাবা বিন-রাত কেন সগড়া করে বসু মেথি?'

পিটলী পাকা মেয়ে। সব কথাই অব্যব তাহার কাছে পাওয়া যায় বলিয়াই নারায়ণী তাহাকে এ প্রশ্ন করিয়া বলিল, নচেৎ ওইটুকু মেয়ের কাছে প্রশ্নটা যে শুধু অব্যবের নয়, জটিল, তাহা সে জানে।

পিটলী একটা চোক সিলিয়া খুব একটা ডারিভি মেয়ের মত গভীরভাবে কহিল, 'সগড়া? হ্যাঁ, করে। বাবা সেদিন মাকে এমন মার ঘেরেছিল যে, মা একেবারে কৈসে ফেলছিল, তা জানো?'

নারায়ণী বলিল, 'বল কি পিটলী! কৈসে ফেলছিল?'

ষাড় নাড়িয়া পিটলী বলিল, 'হ্যাঁ। কুনি মেথো—আবার মানুষে।'

মারের কথা নারায়ণী অনিত না। জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন মারে বসু মেথি?'

কেন যে মারে পিটলী তাহা জানে না, তবু ষাহোক্ একটা কিছু তাহাকে বলিতে হয় বলিয়াই বলিল, 'মা যে ভারি দুটী! বাবাকে যে ভাগিয়ে দেয়।' এই বলিয়া একটুখানি খামিয়া সে আবার বলে, 'বাবা ভারি মারফাট। কিনা, আমাকেও খুব মারে। তবে আমি কাঁদি না, আমি চুপ ক'রে থাকি।'

পিটলীর এসব ছেলেমানুষী নারায়ণী শুনিতে চায় নাই। তাই সে অল্পকথা পাতিয়া বলিল। বলিল, 'আমাদের সেতুকে তোমার ভাল লাগে, পিটলী?'

পিটলী আবার ষাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ। আমরা ত' ছ'জনে খেলা করি। আর সেখ—ওই যে ওই ওপরে দেবুর মা আছে না, দেবু খানি-খানি ওর মার কাছে বেতে চায়।'

নারায়ণী ঈষৎ হাসিল। বলিল, 'হ্যারে পিটলী, দেবুর মা সেতুকে ভালবাসে?'

পিটলী বলিল, 'হ্যাঁ—খুব ভালবাসে। একমণ্ড না সেখতে পেসে ছুটে ছুটে বেড়ায়।'

নারায়ণী কিয়ৎকণ চুপ করিয়া কি কেন ডাবিল, তাহার পর আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা আমি দেবুর কে হই বসু মেথি?'

পিটলী বলিল, 'বোমা হও।'

নারায়ণী তাহার সে জুপ আর ডাবিয়া দিল না। বলিল, 'হ্যাঁ।'

এই বলিয়া সময়ে পিটলীর চুলের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে নারায়ণী বলিতে লাগিল, 'বড় হ'লে খুব স্বকরী মেয়ে হবে পিটলী, আচ্ছা কেনন খুখখানি বেশ ত! নাঃ, পিটলীকে আমি আমাদের বো ক'ব, দেবুর সঙ্গে বিয়ে দেবো। সেতুকে আমাদের বিয়ে ক'বি ত' পিটলী?'

পিটলী বলিল, 'বাও!'

'বাও কেন, বেশ হবে, দেবুর সঙ্গে মানাবে চমৎকার।'

শিষ্টলী বলিল, 'বিষে যে আমি এখন কহবই না। অনেক—অনেক বড় হব এখন—তখন...'

নারায়ণী হাসিল। বলিল, 'হ্যাঁ, বড় হ'লেই বিয়ে সেবে। এখন নয়। সেব কোথায় সেলে ?'

শিষ্টলী বলিল, 'আমরা কাণামাছি খেলছিলাম, খেলতে খেলতে কোথায় চ'লে সেল। ওপরে মা'র কাছে গিয়েছে ঠিক। ডাকব ?'

'হ্যাঁ, ডাকো ত'মা !'

শিষ্টলী খাট হইতে নামিয়া বোধকরি দেখুকে ডাকিবার ক্ষতই পর হইতে বাহির হইয়া বাইতেছিল, এমন সময় বীণাপানি ঘরে ঢুকিল।—'দিদি, ওরে আছ ?'

নারায়ণী উঠিয়া বলিল। বলিল, 'এসো! তাই, এসো! তোমার মেয়ের সঙ্গেই পর করছিলাম। আমাদের কি ঠিক হ'ল জানো তাই, দেবুর সঙ্গে শিষ্টলীর বিয়ে সেবে।'

বীণা বলিল, 'বৌএর সঙ্গে বকু বকু ক'রে বন্ধুতে বন্ধুতেই জীবন তোমার অস্তিত্ব হ'য়ে যাবে, দিদি।'

নারায়ণী বলিল, 'বড় হ'লে অস্ত বকম হ'য়ে যাবে তাই, তা'হাড়া বর-ক'নে ওদের মানাবে চমৎকার। তোমাদের হ'সিতে যেমন মানিয়েছে, ঠিক তেমন।'

বীণা তাহার ট্রেট ছুটি ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া সলম্ব একটুখানি হাসিল এবং তাহার সে হাসির মধ্যে প্রচ্ছন্ন বেদনার একটি স্পর্শবিন্দু ইঙ্গিত বেন নারায়ণীর চোখের উপর স্পষ্ট দরা পড়িয়া গেল। শিষ্টলী বলিতেছিল, বাবা তাহার মাকে শুধু তিরস্কার করে না, প্রহার করে এবং প্রহার করিয়া কাদাইয়া দেয়। নারায়ণী প্রথমে সে কথা বিশ্বাস করে নাই, কিন্তু এখন তাহার মনে হইতে লাগিল, হইতেও পারে বা। কিন্তু কেন ? যেমন স্বামী, তেমন স্বী, তেমন মেয়ে, — ধরিতে সেলে একরকম সুখের সন্সার, শুধু তাহাদের এ পরমিল কেন, কে জানে।

নারায়ণী বলিল, 'কিন্তু তাই শিষ্টলীকে আমি আমার বৌ কহবই।'

বীণা বলিল, 'বেশ ও'। উনি কতাদার থেকে বাঁচবেন তাহ'লে। বর খুঁজে বেড়াতে হবে না।'

শিষ্টলী তখন দেখুকে ডাকিতে গিয়াছে। বীণা পাড়াইয়া ছিল, নারায়ণী বলিল, 'বোসো।'

বীণা ভাল করিয়া খাটের উপর চাপিয়া বসিলে নারায়ণী হাসিতে হাসিতে বলিল, 'শিষ্টলী কি বলছিল তাই জানো ? বলছিল, বাবার সঙ্গে মার খুব কপড়া হয়। হ্যাঁ তাই, সত্যি ?'

কথাটা সে তাহাকে এমন ভাবে মিজাগা করিল, মনে হইল যেন সে কিছুই জানে না।

বীণা বলিল, 'তারি বহুসানী মাহুং তাই ! এতটুই এমিক-ওমিক হবার আ নেই। 'চীংকার ক'রে বর কাটরে দেয়। এক-একদিন ত' মেয়েই বসে।'

নারায়ণীর স্বামীও তাহাকে কম তিরস্কার করে না, পারে যে তাহার একবারেই হাত জোলে নাই তাহাও নয়, কিন্তু কাহারও কাছে এমন করিয়া সেকথা সে বলিতে পারে না, গোপন করিতে পারিলেই বেন বাঁচে। বীণাও যে তাহার কাছে এমন করিয়া অলক্ষ্যে সেকথা স্বীকার করিবে, নারায়ণী তাহা ভাবে নাই। বলিল, 'কিন্তু তোমাদের দু'জনকে সেখে তাই সেকথা মনে হয় না।'

বীণা হাসিয়া মিজাগা করিল, 'কি মনে হয় ?' নারায়ণী বলিল, 'মনে হয় দু'জনের তারি ভাব। সেখে হিৎস হয়।'

বীণাও আবার হাসিল। হাসিয়া বলিল, 'ভাব নেই একথা তোমার কে বললে, দিদি ?'

নারায়ণী একটুখানি অপ্রস্তুত হইয়া গেল। ছোর করিয়া সুখে তাহার হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, 'না, তা বলিনি। কপড়ার্জাটি কার না হয় তাই ! এই যে আমার বরটি.....উনিই বা কিসে কম ? বকুনি ত' সেগেই আছে, তা' হাড়া ছেলে না হওয়া পর্যন্ত কি মারটাই না খেয়েছি। তাই ব'লে ভালবাসে না, একথা কি তাই কেউ বন্ধুতে পারে ছোর ক'রে ?' কেমন বেন একটা স্পষ্টিত ভদী করিয়া বীণা

বলিল, 'আফালে গাড়িরে একদিন দেখে। আমাদের কপড়া, তাহ'লেই বুঝতে পারবে, দিদি।'

এই বলিয়া সে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া নারায়ণীর হাতের চুড়ি কখনারি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। তাহার পর বলিল, 'আমাদের কি-রকম কপড়া হয় জানো, ভাই? ঠিক ছোট ছেলের মত! আমার মাথলেই আমিও দিই ওর হাতটা মুড়ুড়ে। শেষে ছ'জনেরই হাতাহাতি মুক হ'য়ে যায়। কোনোদিন আমি জিতি, কোনোদিন সে জেতে।'

নারায়ণী হাসিতে লাগিল।—'বাঃ, বেশ মজা ত'! তাহ'লে তোমাদের খুব ভাব, না ভাই?'

বীণা বলিল, 'তা আর এ গোড়ার মুখে কেমন ক'রে বলি বল। তবে ওর জন্তে আমিও আমার গাভাসের সঙ্গে কপড়া করেছি, আর উনিও ওর বাড়ী-ঘর-পোয়ের অংশ, টাকা-কড়ির ভাগ, সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে বাড়ী ছেড়ে পাগিরে এসেছেন, এইটুকু জানি। সেখুঁদ না—আমাদের ঘর-কলারের জিনিসপত্রের কিছু নেই। দেখে বুঝতে পারছ না?'

'ও'—বলিয়া নারায়ণী তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। বলিল, 'জিনিসপত্রের কথা মিজেস্ করব করব ভাবছিলাম ভাই, কিন্তু সত্যি বলতে কি, লজ্জার কিছু বলতে পারি নি।'

এই বলিয়া সে তাহার দুই অঙ্গলক দৃষ্টি বীণার মুখের উপর তেমনি স্থির নিবদ্ধ করিয়াই রাখিল। কলপূর্ণের বাহাকে সে তাহার নিখের চেয়েও দুর্ভাগা ভাবিয়া মনে-মনে অহঙ্কশ। করিতেছিল, একজন পরে তাহাকেই আবার পরম সোভাগ্যবতী ভাবিয়া মনে করিতে লাগিল, তাহার মত স্বামী-সোহাদিনী পৃথিবীতে বোধহয় খুব কমই আছে।

রৌদ্রের ঝাঁকু আঁধিতেছিল বলিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া উপরের ঘরে ঠাণ্ডা মেঝের উপর কাপড়

বিছাইয়া মালি শুইয়া আছে, আর সেখুঁ তাহার বাটের চলায় চুকিয়া আঁএ কটু কটু করিয়া ঘম ঘিরা উনের মোটর গাড়ী চালাইতেছে, এমন সময় দরজা ঠেলিয়া পিষ্টলী ঘরে ঢুকিল। সেখুঁ অহুধের আগে মালি একদিন তাহাকে লইয়া মোটর-বালে চড়িয়া কালীঘাট গিয়াছিল গঙ্গাবান করিতে; সেইদিন হইতে সেই সে বাসের সুখি শিখিয়া আসিয়াছে, আজও মোটর চালাইতে চালাইতে চীংকার করিয়া করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাহাই সে বলিতেছিল—'ভ্রামাঝার, বোঝাঝার, ধরমভাগা, কালীঘাট!' পিষ্টলীকে দেখিবারামাত্র বলিয়া উঠিল, 'বাঃকে!'

পিষ্টলী কিম্বদ আসিয়াছিল হুলিয়া গেল। ভাড়াভাড়ি সেখুঁ কাছে দিয়া বলিল, 'মালি ভাই কালীঘাট যাব। নিরে যাবি?'

সেখুঁ বলিল, 'তুই আবার এখানে কি জন্তে এলি?'

এখানে আসিলেই পিষ্টলীকে এই কথা সে প্রায়ই বলে। কিন্তু পিষ্টলী সেখুঁ প্রাছাই করে না। বলে, 'কালীঘাট আমাকে নিরে যাবি না সেখুঁ?'

সেখুঁ হাত পাতিয়া বলে, 'সে পরল।'

পিষ্টলী বলে, 'পরল কোথায় গাব ভাই? বাবা আহুক, তারপর সেবো?'

সেখুঁ তখন তাহার গাড়ীতে আবার ঘম দিতে দিতে বলে, 'বা তবে তুই ভইখানে বোসগে যা, গাড়ীটা ভই-খানে সেনেই আবার এই দিকে পাঠিয়ে দিবি।'

এমনি করিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া তাহাদের খেলা চলিল। তাহার পর খেলিতে খেলিতে হঠাৎ নারায়ণীর কথা মনে পড়িতেই পিষ্টলী বলিল, 'তোকে ভাই তোর বোমা একবার ডাকছিল।'

'ডাকুক্সে। আমি যাব না।'

পিষ্টলী বলিল, 'একটা ভাবি মজার কথা বলব তোকে। শুনি?'

'বল না।'

'এখানে বলব না। তোর মা রয়েছে যে।'

'মা ত' বুঝোছে।'

‘হ্যাঁ ঘুমোচ্ছে! ঘুমোলে মানুষের নাক ডাকে, তা’ জানিস?’

মাসি কিছু ঘুমাইবার ভাণ করিয়া পড়িয়া ছিল মাত্র। সেবুর সাজী চালাইবার পোশাক্যালে ঘুম তাহার সত্যই আসে নাই।

পিটলীর মন্ডার কথাটা কি তাহাই তিনবার মন্ত মাসি আরও কিছুকণ ভেমনি ভাবে পড়িয়া রহিল। কিন্তু পিটলী কিছুতেই তাহার সাক্ষাতে বসিল না।

মাসি তখন ইচ্ছা করিয়াই একবার পাশ কিরিয়া উঠা করিয়া বেন ঘুঘর বোরেই বসিয়া উঠিল, ‘হা বাবা, তোরা একটু বাইরে খেলা করবে, না। আমার ঘুমোতে দে।’

পিটলী উঠিয়া ধাঁড়াইল। বলিল, ‘বাবি?’

সেবুও বলিল, ‘চল!’

এই বলিয়া ছ’জনে তাহার ঘরের বাহিরে আসিয়া সিঁড়ি ধরিয়া নীচে নামিতেছিল। হঠাৎ একটা ধাপের উপর সেবুর হাতে ধরিয়া পিটলী বলিল, ‘বাবু! তাই এইখানে। সেই মন্ডার কথাটা বসি।’

সেবু বলিল, পিটলী বলিল এবং ছ’জনে তাহার পাশাপাশি বসিয়া ছ’জন ছ’জনের গলা ধাঁড়াইয়া ধরিল।

সেবু বলিল, ‘কি কথা রে?’

পিটলী অল্পকণ্টে কহিল, ‘আমাদের ছ’জনের বিয়ে হবে। তুই হবি আমার বড়, আর আমি সব ক’নে।’

সেবু বলিল, ‘হ্যাঁ, তুই ভারি কান্ডিল হয়েছিল।’

এই বলিয়া সে তাহার হাতখানা পিটলীর কাঁধ হইতে সরাইয়া লইল।

পিটলী বলিল, ‘বেশ, তাহ’লে চল তোমার বোমার কাছে, ওন্নে চল।’

বসিয়া পিটলী আসে উঠিয়া ধাঁড়াইল।

তাহার পর ছ’জনে যখন নারায়ণীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইল, কাহাকেও কোনও কথা আর জিজ্ঞাসা করিতে হইল না, বীণাই এখনে বসিয়া বাসিয়া

তাহাদের দেখাইয়া দিয়া বসিল, ‘ওই ত’ তোমার বর-ক’নে এসেছে সিঁহি!’

সেবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া পিটলী বলিল, ‘ওন্নি?’

কিন্তু এবিধে একটা ভারি মজা হইল। পিটলী তাহার কথা দিয়া ছুনিয়া বশ করিতে পারে। অথচ সেবু চার না যে, সে মাসির কাছে গিয়া যখন-তখন বসিয়া বসিয়া গল্প করে। তাই সে পিটলীকে সিঁড়ির উপর উঠিতে দেখিলেই বলে, ‘না ভাই, চল আমরা নীচে খেলা করি।’

অথচ সেবুর সঙ্গে দিবারাত্রি খেলা করিয়া বেড়াইলে পিটলীর মা তাকে লোকজনের সাক্ষাতে কিছু বলে না, আজকে পাইলে কান চুটা কসু কসু করিয়া মসিয়া দিয়া বলে, ‘এখন থেকে ব্যাটা ছেলের সঙ্গে চরিত্র বঁটা খেলা কি না?’

পিটলী তাই নীচে সহজে থাকিতেই চায় না, সেবুকে সঙ্গে লইয়া বাসিয়ার ঘরে গিয়া খেলা করিতে চায়। বলে, ‘না ভাই, নীচে খেলা করলে মা বক্বে।’

সেবু বলে, ‘হা তবে তোকে খেলা করতে হবে না, তুই ঘুর হ!’

পিটলী তাহার মুখখানি ভারি করিয়া সকলমুদ্রিতে সেবুর মুখের পানে চাহিয়া থাকে। বলে, ‘তুঁহি তাহ’লে আমার সঙ্গে আড়ি করতে চাও তাই?’

সেবু বলে, ‘ব-রে! আড়ি আবার কল্যাম কখন? ওপরে খেলা করলে মা বলে—মার খুঁ হর না। আর না—নীচেই খেলা করি।’

কিন্তু সকাল বেলা—কেহ কখনও ঘুমায় না। পিটলী বলে, ‘তোমার মা বুঁহি এই সকাল বেলা ঘুমায়! এখন ত’ রান্না করবার সময়।’

সেবু বলে, ‘হ্যাঁ, আড়িক করবে যে!’

শিষ্টলী বলে, 'আমি কিছুতেই সোলমাল ক'ব না। এই তোমার গা হুঁ'রে বলছি। তুমি দেখো।'

সেই তখন কিছুতেই তাহাকে আর পারিয়া উঠে না, তখন বাধা হইয়া বলে, 'চল, কিন্তু মাত সঙ্গে বেশি বড় বড় ক'রে বসিগুনি বেন।'

শিষ্টলী পুনী হইয়া হাসিয়া বলে, 'না ভাই, বড় না।'

তাহার পর বুড়ী যেহেতু মত আপন মনেই কতকি সব বলিতে বলিতে সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠিতে থাকে। বলে, — 'কেন যে মরতে এত কথা বলি আমি! বাবার বাবা! কথা না করে যে কিছুতেই থাকতে পারি নে! এইবার আমার মরণটা হ'লেই বাঁচি।'

কথাগুলো বোঝকরি মাসি গুনিতে পাইল। বলিল, 'কি সো যেহে, কি বলতে বলতে আসছে।'

শিষ্টলী বোঝকরি গম্ভীর হইয়া একটুখানি হাসিল। হাসিল তাহার সেই মৃত্যুর মত ছোট ছোট হৃদয়ন্তর গল্প করেকটি গাত মেধা যায়, লাগতে পাশে ছোট ছোট দুইটি চোখ পড়ে। হাসিল তাহাকে আরও স্বস্তির দেখায়। মাসি তাহার সেই স্বস্তির সুখখানির পানে তাকাইয়া বলিল, 'হাসলে যে।'

শিষ্টলী বলিল, 'ও মা! হাসবারও যে নেই! বেশ সো বেশ, হাসব না। তুমি রান্না ক'র, কর। আমরা তোমার সঙ্গে একটা কথাও বলব না। সেবু আমাকে আপসেই শিখিয়ে দিয়েছে।'

মাসি বলিল, 'সে কি রে সেবু, কি শিখিয়ে দিয়েছিল।'

সেই তখন ঘরের ভিতর গিয়া চুপিয়াছে। সেইখানে হইতেই তাহার সাড়া পাওয়া গেল। বলিল, 'যেং!'

বলিয়াই সে তাহার জিনের মোটর গাড়ী গইয়া 'ভ্রামবাঝার, ভ্রামবাঝার' বলিয়া চীৎকার শুরু করিয়া দিল। তাহার পর হঠাৎ একদমর ডাকিয়া বলিল, 'শিষ্টলী, আর না।'

শিষ্টলী তখন মাসির সঙ্গে গর শুরু করিয়াছে। গর করিতে করিতে সেবু ডাক ভনিয়া যে চকিতা হরিদ্বার মত তাহার সেই কালো চকুলে চোখ দুইটি

তুলিয়া একবার ঘরের দিকে, একবার মাসির দিকে তাকাইতে লাগিল। গর করিতে, না উঠিয়া বাইবে, কিছুই সে বুঝিতে পারিল না।

মাসি বলিল, 'তুইও এইখানে আর না বাবা, গবে বা, শিষ্টলী কেমন গল্প বলছে। আর।'

সেই বলিল, 'বলুক।'

গল্পটা শিষ্টলী বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, মাসি তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'তার পর কি হ'ল মা।'

শিষ্টলী বলিল, 'আমি বুঝি তোমার মা হই? বাবা যে তোমার ঠাকুমা বলতে বললে সো।'

মাসি বলিল, 'তা বসুক বাহা! আমার মা নেই, অনেক দিন ম'রে গেছে, তোমার মত একটি মা আমার চাই।'

শিষ্টলী বলিল, 'সেবুর মা, আমার আমারও মা? সেবুর বোমা — ওই যে নীচে থাকে গো — ও কি বলছিল জানো সেবুর মা।'

'কি বলছিল।'

শিষ্টলী হাসিয়া বলিল, 'বলছিল — সেবু আমার বর হবে।'

এমতটা যে মাসিরও মনে আপে নাই তাহা নয়, তবে সে মূখ ছুটিয়া সেকথা এখনও কাহাকেও বলে নাই। বলিল, 'হ্যাঁ মা, আমারও তাই ইচ্ছে।'

শিষ্টলী বলিল, 'এখন নয়। সে আমার অনেক বড় হ'লে।'

মাসি তাহার মুখের পানে তাকাইয়া হাসিতে লাগিল। বলিল, 'আচ্ছা, এইবার তুমি সেই কাহিনীটি বল মা, আমি গুনি।'

শিষ্টলী বলিল, 'কোনটা? সেই — এক যে ছিল পালিক পাখী, না এক যে ছিল রান্নার ছেলে।'

মাসি বলিল, 'রান্নার ছেলের কাহিনীটাই গুনি। পালিক পাখীরটা কাল শুণব।'

শিষ্টলী তখন রান্নার ছেলের কাহিনী বলিতে শুরু করিল। — 'এক যে ছিল রান্নার ছেলে, যেমন পাতের বা তার তেমনি ছোঁরা। মাখা সোনার

সুঁচু, তার ওপর হীরে বসানো। রাজার ছেলের
সভাব কিছুই নাই। হাজীশালে হাজী, খোড়াশালে
খোড়া, রাজভাঙারে হীরে-সহরৎ, মণি-মুক্তো, সোনা-
রূপোর হুড়াহুড়ি। তবু রাজার ছেলের মনে সুখ
নাই। দিনরাত শুণু পাশে হাত দিয়ে ডাবে। দবাই
বলে, হাঁসো, তোমার ভাবনা কিসের? ভাবছ
কেন? ভাবছ কেন? রাজার ছেলে কিছুতেই
আর বলে না। শেষে অনেক কষ্টে বলল। বললে—

পদ্মসীমির ঘাটে পো,

ব'লে সিঁড়ির পাটে পো

হুমুরী এক কড়ে

ভাবছি তারই মতে।

ছুট, ছুট, ধ'রে আন, ধ'রে আন! রাজকক্কে
ধ'রে আন! তবুনি পরসীমিতে পোক ছুটল।
খানিক বাদে চৌর্যে চড়ির ধরে আনা হ'ল রাজ-
কক্কে। — না বাপু, তোমার ও তরকারিটা উনান
থেকে নামাও আসে। হ্যাঁক হোঁক নব হচ্ছে,
তুমি ওনু না কিছুই।

মাসি বলিল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ ওনুছি, ওনুছি, খব ওনুছি,
তুমি বল।'

শিষ্টলী বলিল, 'ওনু ত' কই 'হ' দিচ্ছ না বে?'
ওনিতে ওনিতে শ্রোতাকে ঘন ঘন 'হ' 'হ'
বলিতে হু, তাহা না হইলে কাহিনী পোনা চলে
না। মাসি হাসিয়া বলিল:

'নাও, এইবার থেকে 'হ' বলছি, তুমি বল।'

শিষ্টলী আবার আরম্ভ করিল।—'রাজকক্কে
কেনন ঢোরা ছানো?—সাদা ধপ্ ধপ্ করছে
পায়ের হু, মাথার একমাথা এমন লম্বা লম্বা হুল।
সেখতে ভরি হুম্বর।'

মাসি বলিল, 'হ'। ঠিক তোমার মত।'

'খে, আমার মতন কেন হবে, আমার চেয়েও
হুম্বর। আমি বড় হ'লে যেমন হবে ঠিক তেমনি।'

মাসি বলিল, 'হ'। তারপর।'

'তারপর।' বলিয়া একটা ঢৌক দিলিয়া

শিষ্টলী কি বেন বলিতে ছাইতেছিল, এমন সময়
ঘরের দরজার কাছ হইতে একটা ঢিল আসিয়া
শিষ্টলীর পায়ের উপর চিপ্ করিয়া লাগিল।
ঢিলটা বড় ছিল না তাই রক্তা, শিষ্টলীর তেমন
লাগে নাই। 'তাকাইয়া সেবিল, সেবু তাহাকে ঢিল
ছুঁড়িয়াছে। ব্যাপারটা মাসিও সেবিতে পাইয়াছিল।
বলিল, 'ভকি রে সেবু, ছি, মারামারি করতে আছে!
ওই ঢিল যদি গুর চোখে লাগত!—ডালই হ'ত,
তোরাই বৌ কানা হ'ত আমাদের আর কি।'

সেকথার জবাবে কোনও কথা না বলিয়া,
সেবা বেশ, সেবু তাহার টিনের মোটর প্যাড়ীট হাতে
মইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া ধীরে
ধীরে নীচে নামিয়া বাইরেছে।

মাসি জিজ্ঞাসা করিল, 'চণে বাচ্ছিন্ বে? ওরে
ও সেবু!'

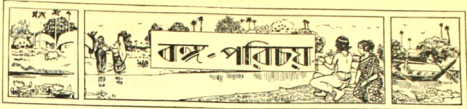
সেবু সাড়া দিল না।

মাসি তাহার হাতের কাছে আর কাহাকেও না
পাইয়া শিষ্টলীর দিকে তাকাইয়াই বলিল, 'বেগেছিন্
মা, বাপ হ'য়ে গেল। ওই বে বললাম, কেন ঢিল
ছুঁড়িলি, বাবু, তাইতোই অভিমান হ'য়ে গেল। পরের
ছেলে কিনা! ও মাছুর করা না করা হই-ই সমান।'

এই বলিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মাসি আবার
বলিল, 'সেই বে কথার আছে না, পরের সোনা দিও
না কানে, কেড়ে নেবে হ্যাঁকা চাবে। এও তাই।'

উনান হইতে তরকারির কড়াইটা নামাইয়া
সেইদিক পাশে একঘুটে তাকাইয়া মাসি হুপ করিয়া
বসিয়া রহিল।

ইহার পর শিষ্টলীর রাজার ছেলের গছটা আর
কিছুতেই ছিল না। বলিবার চেষ্টা সে বে করিল
না, তাহা নহ। কিন্তু মাসিবার 'হ' দিবার অবসর
ওখন আর নাই। রাজার জিনিসপত্রগুলো সরাইয়া
রাখিয়া সে উঠিয়া ধাড়াইল। বলিল, 'আজ থাক
বাছা, গপ্পটা তোমার কাল ওনু।'



বাঙ্গালার তিনটি প্রাচীন মন্দির

শ্রীলাইচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়

চলিশ পরগণার অত্যন্ত মহত্বা জয়নগরবারের অতীত মন্দিরবাড়ার নামক স্থান পরীক্ষণে শ্রীকেশবেশ্বরের মন্দির বর্তমান।

কলিকাতা হইতে তথায় বাইতে হইলে ই, বি, আর গা'দার্প সেক্সনের বাকুইপুর-লক্ষীকান্তপুর শাখার গাড়ীতে উঠিয়া মধুগাপুর রোড নামক ঠেগনে নামিতে হয়। এখান হইতে প্রথমে বিষ্ণুপুর নামক গ্রামে আসিয়া তথা হইতে বরাবর পশ্চিম দিকে বাধান কাঁচা রাজা ধরিয়া আশ্বাশ হয় মাইল সেলে শ্রীকেশবেশ্বরের মন্দিরে পৌছান যায়।

২৬এ আশ্বিন, ১২ই অক্টোবর, বুধবার (সন ১৩০৩ সাল) ভোর ৪১০টার সময়ে আমরা কয়েকজন সঙ্গী বিলিয়া। মধ্য নামক গ্রাম হইতে বাজা করিলাম। মধুগাপুর রোড হইতে দুইটি ঠেগন আসে (অর্থাৎ কলিকাতার দিকে) বহু বোধ হয় হয় মাইল দূর, আর বহু হইতে মধ্য আশ্বাশ দুই মাইল; স্তত্রাজ এই আট মাইল পথ সকালে কোনও ট্রেন না থাকার পদত্রেই বাওয়া স্থির হইয়াছিল।

আমরা বহন বহুতে আসিয়া পৌছিলাম তখন পাঁচটা বাজিতে কয়েক মিনিট বিলম্ব ছিল। ৪১০টার সময়ে জয়নগর-মন্দিরপুর ঠেগন ছাড়াইয়া সেলাম এক হরটার আসেই বিষ্ণুপুর শ্রমণের বড় বড় কট, অথবা দাহুগুলি দেখিতে পাইলাম। বিষ্ণুপুর আমরা আর একজন সঙ্গী পাইলাম।

আমরা ৬টা ৩৫ মিনিটের সময়ে মাল্লি বাধান

রাজা ধরিয়া পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইলাম। আমাদের পথের বাম দিক্ দিয়া একটা বাস বরাবর আমাদের দত্তবা দল শ্রীকেশবেশ্বরের মন্দির পর্গার দিয়াছে। প্রায় ৪ মাইল বাওয়ার পর দূর হইতে দুইটি মন্দিরের চূড়া অশ্লষ্ট ভাবে দেখা গেল। আমাদের মধ্যে কেবল একজন গুত বৎসর একবার মাত্র কয়েক জনের সঙ্গে লক্ষীকান্তপুর হইতে মাঠের রাজা ধরিয়া শ্রীকেশবেশ্বরের দিয়াছিল; কাজেই সে, মন্দিরের চূড়ার মত বাহা দেখা বাইতেছিল তাহাই শ্রীকেশবেশ্বরের মন্দির কি না, ঠিক করিয়া বলিতে পারিল না। তবে জানাইল যে, সেখানে সে একটীমাত্র মন্দির দেখিয়াছিল। এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে আমরা খালের অপর পারে অবস্থিত মন্দির দুইটির নিকটবর্তী হইলাম। একটা বাঁশের সাঁকোর সাহায্যে পার হইয়া মন্দিরের কাছে উপস্থিত হইলাম।



জগদীশপুরের মন্দির দুইটি

মদনদীপপুর হাউজীর হাটের একপার্শ্বে অবস্থিত এই দুইটা মন্দির। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে মদনদীপপুর নিবাসী বহুজন মন্দির পরিবারের হাউজী নারী জনৈক্য মহিলা কতক বিধা মন্দির প্রতিষ্ঠা এই মন্দির দুইটিকে দিব্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া কলিকাতা-হাট-খোলা নিবাসী মত-পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ আধিপত্যের লোভে ভাঙাচাখা দিককে দান করেন। এ পর্যন্ত ভাঙারাই এই মন্দিরের অধিকারী আছেন এবং পূজার ক্ষমতা দ্বারী কোন ব্রাহ্মণকে মাসিক কিছু রুতি দিয়া থাকেন।

বহুদিনের পুরাতন মন্দির। কোনটাই বরখাস্ত চিন্তায় নাই। হানে হানে ইট, চুন, মরকী ইত্যাদি খসিয়া পড়িয়াছে। খুব শক্ত গাধুনি। লম্বা লম্বা পাটলা টুকটুক লাল ইটে এমন মন্দির দেওয়াল, বাতাস, সিঁড়ী ইত্যাদি গাধা হইয়াছে যে, দুইটি ইটের মধ্যবর্তী চুন, মরকী প্রভৃতি মন্দির অস্তিত্ব জানিতে পারা যায় না। দুইটা মন্দিরেরই বরখাস্ত চৌকাঠের নীচের অংশটুকু কালো পাথরে তৈয়ারী বলিয়া আশঙ্কিত বর্তমান আছে, এবং তাহার উপরকার কার্কাবান্টুকুও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। পশ্চিম দিকের মন্দিরের মেঝে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বোধ হয় সাত্তিকালে শিবাবধনের সত্যত্বের অভাব ঘোচন করিতেছে। আরও বোধ হয় সভার কার্যকালে সভাপন ভূমি আঁচড়াইয়া বাহ্যাবচ্ছাদিত করিয়া থাকেন, কারণ তাহার নিদর্শন বর্তমান। মধ্যস্থলে প্রায় দুই হাত ব্যাসবিশিষ্ট গোলাকার পত্রকাটা কালো পাথরের আসনের উপর আশ্রয় প্রাপ্ত হাত উঠা কালো পাথরের শিবলিঙ্গ স্থাপিত। মেঝে না থাকায় আসনখানি পরিষ্কার ভাবে দেখা যেন। অপর মন্দিরের মেঝে বোধ হয় কিছু দিন পূর্বে সিমেন্ট করা হইয়াছে। তাহাতেও ঠিক অক্ষুণ্ণ একটা শিবলিঙ্গ স্থাপিত। মন্দির দুইটার পটন এবং শিবলিঙ্গ দেখিলে বুঝা যায় যে, উহা একই সময়ে নির্মিত। বাদ্যযন্ত্র প্রাচীন স্থাপত্য বিশেষত্বপূর্ণ মন্দির দুইটার সম্মুখ কোণস্থিত

হইলেও তাহা। একেবারে সমান ভাবে না উঠিয়া গুলে গুলে উঠিয়াছে। বিন্যাসের প্রত্যেক দিকের ইট বাহিরের দিকে একটু প্রকাশ করিয়া রাখা সম্মুখ দুইটা দেবিতে বেশ হইয়াছে। দুইটা মন্দির সম্মুখের এক তরফের হইলেও শিবী যে সম্মুখ দুইটা ঠিক এক আকারের করিতে পারে নাই, তাহা ছবি দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। বাহিরের মন্দিরের চূড়া হইতে মোটা শোহার বাগলা চারি-সংখ্যার মত কড়াবুল একটা করিয়া মুখল, যেখানে দেওয়াল হইতে বিলান উঠিয়াছে, সেই পর্যন্ত স্থিতিতেছে। এই এক-একটা কড়া এত বড় যে, তাহার দুইটা দ্বিগুণ দুইটা হাত বেশ ভালার মত প্রবেশ করাইতে পারা যায়। মন্দির দুইটার চূড়ার একটা করিয়া নিম্নগত এবং করেকটা করিয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

মন্দিরের মুখল দুইটা মাটি পর্যন্ত স্থান ছিল, প্রকাশ এই যে, বজ্রাঘাতে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। (এই কথা কতক বিস্ময়বোধ্য জানি না। বজ্র কি দুইটাকেই ঠিক সমানভাবে বিলানের মূলদেশ পর্যন্ত রাখিয়া থাকি-
তুক কাটা? কেনি?) সম্মুখ-কার্যের ক্ষমতা মুখল ধরিয়া মন্দিরের চূড়ার উঠিতে হয়। মন্দির দুইটা ঐকেশবের মন্দিরের বহুপূর্বে স্থাপিত, ইহাদের সম্মুখের মত দ্বারী কেহ কেহ অধিকারীদের নিকট ব্যতীত করিতেছেন, তদ্বিলায়। মন্দিরের পশ্চিম দিকে মদনদীপপুর হাউজীর লম্বা চালা-ঘর অবস্থিত, এবং তাহার পশ্চিমে কোঠা-ঘরের ক্ষমতা ভিত্তি খনন করা হইয়াছে ও উৎকর্ষের ক্ষমতা কিছু নতুন ইট মন্দিরের সম্মুখে একত্র করা হইয়াছে দেখিয়া আশ্চর্য। পুনরায় অগ্রসর হইলাম ও প্রায় ১০ মিনিটের মধ্যে ঐকেশবের মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম।

দেখিবার মত ভিড় বটে। পল্লী-মন্দিরে একদল ব্রহ্মণ মন্দির দেখিবার কল্যাণ করি নাই, কাজেই বিস্ময়বিধি হইয়া পড়িয়াছিল। পরে ৩-তারকের মন্দির দেখিবারি কিন্তু তাহাও ইহাশঙ্ক্য ক্ষমতার বশতাই মনে হইল। মন্দিরের ভিতরের প্রত্যেক সৈধ্য

ও প্রবেশ ঘাট হাত করিয়া হইবে ; তাহার তিনদিকে প্রায় পাঁচ হাত প্রশস্ত বারান্দা এবং তিনদিকেই চারি



ঈশেনবেশ্বরের মন্দির

হাত আশ্রয় প্রশস্ত রোয়াক। এই রোয়াক পার্শ্বই বন্দী হইতে আশ্রয় তিন হাত উচ্চ। সাধারণ মন্দির হইতে ইহার বিশেষ এই যে, প্রাধান্য গৃহ্যটী কেবল মন্দির-প্রকোষ্ঠটির উপর না হইয়া ইহার তিনদিকের বারান্দা সমেত গৃহটী আবৃত করিয়াছে, আর তিনদিকের রোয়াক উত্তল আছে। (ভারতবর্ষের মন্দিরও এইরূপ আছে, তবে তাহার সমুখই কেবল আশ্রয় তিন হাত প্রশস্ত বারান্দা আছে, আর দুই দিকে বারান্দা নাই।) মন্দিরের পিছন দিকে বারান্দা বা রোয়াক নাই। সম্বাদিত গৃহের মধ্যে বেতপ্রস্তর-মণ্ডিত, মধ্যস্থলে উচ্চাসনে আশ্রয় দুই হাত উচ্চ ককপ্রস্তরের নিবলি বর্তমান। বেতালে একটি বৃহদায়তন খড়ি সমর নির্দেশ করিতেছিল। উপরে চক্রাতল আকৃত থাকার সমুখের ভিতরের অঙ্গ সেবিতে পাই নাই।

বারান্দার ও রোয়াকের মধ্যে চূর্ণ প্রকীর

concrete বর্তা, তবে মন্দিরের ঘরের সমুখের অংশে চূর্ণ ভক্তপণ নিজেদের নাম, পিতার নাম, বাসস্থান প্রভৃতি উৎকীর্ণ করিয়া এক-একখানি বেত পাথরের টানি বসাইয়া দিয়াছে ; তাহাতে প্রায় সমস্তটা স্থান আবৃত হইয়া দিয়াছে। এখন অপর্যাপ্ত ভক্তপণ বারান্দার হানাভাব বশতঃ ঘরের পার্শ্ব অথবা রোয়াকে বসাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। বারান্দার মোটা মোটা খাম ও গৃহের বেতালের ব্যবস্থানে বৃক্ষকোণাঙ্কিত বিদ্যান আছে ; বিদ্যানগুলি বেশ নীচে অবস্থিত বলিয়া বোধ হইলেও লাকাইয়া হাত পাড়িয়া সেগ না। এইগুলির উপরে ঠিক মধ্যস্থলে একটি করিয়া নাতিস্থল দীর্ঘ তল উঠিয়া গৃহ ও বারান্দার মধ্যবর্তী গৃহের অংশটুকু ধারণ করিয়া আছে। চমৎকার পরিকল্পনা!

বারান্দার ভিতরে এবং বাহিরে চূর্ণকামের উপর নানা চিত্র কোদিত আছে, উহার বেশীর ভাগই নষ্ট হইয়া

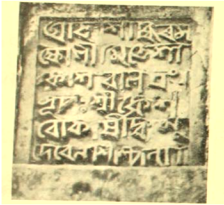


ঈশেনবেশ্বরের মন্দিরকে পূজ্যবিত ও উত্তর দিকে দেখাও

দিয়াছে। বাহিরের ইটগুলির কতক কোদিত কাক-কাণ্ডাবিশিষ্ট। বাহিরে, বেতালের দুই পার্শ্ব বেত

হইতে প্রায় পাচ হাত উচ্চে দুইটা চাপির উপরে এই একই স্লোক পলকডোলা অক্ষরে উৎকীর্ণ আছে :—

“আকাশাশক্তি বসঃ কৌণ্ডীমিতে থাকে শিবালয়
তৃণঃ ঐকেশবোকাবীহাস্বেনেন শিখিনা।”



ঐকেশবোকাবীর মন্দিরের পাথর উৎকীর্ণ লিপি

আকাশ অর্থে মৃত, অক্তি অর্থে লম্বা বা সাত, বস অর্থে

হর এবং কৌণ্ডী অর্থে গৃহিণী বা এক বুকাইলে “অকৃত
বানাগতি” হেতু ১৬৭০ হর, স্তত্রায় ১৬৭০ শকাব্দে

রাজা ঐকেশ্বর রায় চৌধুরী বাহুদেব নামক শিল্পীর
দ্বারা (বা পরিকল্পনায়) এই শিবালয় প্রতিষ্ঠা করেন।
উক্ত লিপির স্থানে স্থানে নষ্ট হইয়া বাগ্নরায় আমরা
প্রথমে পড়িতে পারি নাই কিন্তু পুরোহিত মহাশয়ের
মুখস্থ থাকায় তিনি আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন। তিনি
‘অক্তি’কে ‘অবতি’ পড়িয়া তাহার অর্থ চারি-সংখ্যা
নির্দেশ পূর্বক ১৬৪০ শকাব্দ বলেন। আমরা কিন্তু

হই পাথরের লিপিতেই ‘অক্তি’ দেখিয়াছি। বাহাই
হটক, প্রায় দুইশত বর্ষের পুরাতন মন্দির, এবিধের
নিসংকেহ হজ্ঞা সেল। প্রেক্ষালের শিল্পী বাহুদেব
এই মন্দির পত্তীমধ্যে যে চমৎকার পরিকল্পনা ও কৃতি-
বিচার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমরা
—ইশাত ও concrete-এর যুগের সোকেরা—বিস্ময়া-
বিত্ত না হইয়া পারি না।

মন্দিরের সম্মুখ দুই থাকে উঠিয়াছে, একটা বড়
মন্দিরের উপর বেন আর একটা ছোট মন্দির রাখা
হইয়াছে (অনেকটা ভারতবর্ষের মন্দিরেরই মত)
উপরে ভিন্টি গোচরশূন্য কলস বর্তমান। তাহাদের
চারিদিকে বৃক্ষাকার বট, অশ্বথ, নিম প্রভৃতি নানা
প্রকার বৃক্ষ ও বনশ্রুতি সমৃদ্ধিত হইয়া বেন একটা
‘নার্গারী’র আদর্শ স্থাপন করিয়াছে! হবিতে গাছগুলি
ছোট দেখাইলেও (কারণ অনেকদূর হইতে চিত্র
গ্রহণ করিতে হইয়াছে, আর মন্দিরও বেশ উচ্চ)
বাতবিক পক্ষে ত-গুলি ছোট নহে। অনেক স্থানে
ফাটলের মধ্য হইতে বৃক্ষাদির দিকভ্রম আশ্রয়প্রাপ্ত
করিয়াছে।

বেশিবার আরও অনেক কিছুই ছিল কিন্তু অনেক
বেলা হইয়াছিল, রোস্ত্রের তেজ এত প্রবল হইয়া উঠিল
বে, মান করিয়াও বিশেষ কষ্ট অস্বস্ত হইতে লাগিল।
মন্দিরের পশ্চিম দিকে (অবুঝ ভয়) সান-বীথান
বেল বড় পুষ্করিণী (ভারতবর্ষের বেলপুষ্করের সমান)
আছে।

সান ও প্রসার গ্রন্থের পর কোটোগুলি তোলা
হইল। মন্দিরের রোয়াকের পর হইতেই চারিদিক
খিরিয়া বাম্বারের ঢালাঘর এত বনসন্নিবিষ্ট বে,
মন্দিরের ভাল রকম ছবি তোলা সেল না।

বেলা ২টার সময়ে আমরা ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্তন
করিতে লাগিলাম। মন্দির গাছের আড়ালে অদৃশ্য
হইবার পূর্বে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া
লইলাম এবং ঐকেশবোকাবীর উচ্চশ্রেণী প্রাচীণ পূর্বক
অঙ্গুর হইলাম। পথে ভগদীপপুরের মন্দির দুইটাও
পুনরায় দেখিয়া লইলাম। কিরিবার সময়ে আকাশে
বেশ উঠিয়াছিল বলিয়া বিশেষ কষ্ট হয় নাই।

ঐকেশবোকাবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে একটা স্থল
কিবেদন্তী এমশে তলা বার, তাহা বোধ হয় এখানে
নির্ভাত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ভারত-ইয়া রাজা
ঐকেশ্বর রায় চৌধুরীকে তনানীজন নবাব সরকারে
কর দিতে হইত। এক বৎসর পরতানি হইলে

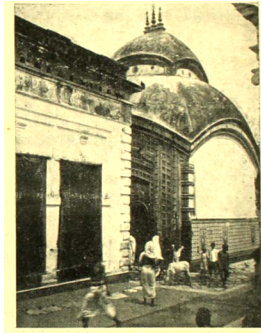
একাদশের নিকট থাকনা আসার করিতে না পারায় অনেক টাকা কর সরকারে বাকী পড়িল। সুতরাং তাঁহার জলব হইল এবং অবিলম্বে সমস্ত থাকনা সমেত না বাইতে পারিলে পাটনা নামক স্থানে তাঁহারের কুলবিগ্রহ ঐশ্বরিপাটেশ্বরী ও ঐশ্বরিপুত্রার মন্দির-প্রাঙ্গণে গোবৎস পূর্বক মন্দির কলুষিত করিয়া অবমানিত করা হইবে, এইরূপ আদেশ দেওয়া হইল। রাজা কেশব রায় অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন, সুতরাং এই সবাদ পাইয়া অনন্তো-পায় হইয়া একদিন রাত্রিযোগে একাকী গঙ্গা গর্ভে জীবন বিসর্জন করিবার জন্য ডায়মণ্ডহারবার অভিমুখে চলিলেন। পথে অনেক দ্রাক্ষণ তাঁহার সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিয়া গুহে ক্রিান্তে বসিলেন এবং কোন বনমধ্যে এক শিবলিঙ্গ আছে, তাহা মন্দির নির্মাণ পূর্বক প্রার্থনা করিতে আদেশ দিলেন। দ্রাক্ষণ তাঁহাকে আনয়ন করিলেন যে, নবাব সরকারে তাঁহার উক্ত সম্মান লাভ হইবে।

সুস্বাস্থ্যকরিত চিত্তে গুহে ক্রিয়া রাজা স্থির করিলেন যে, আসে এই ভবিষ্যৎ সফল হউক, তাহার পর শিবমন্দির প্রার্থনা করিবেন। বলা বাহুল্য, নবাব সরকার হইতে পানী ও পাইক আসিলে সত্বাক্ষরকালে রাজা সিদ্ধ জানিলেন যে, তাঁহার নামে বাকী কর

নির্দিষ্ট স্থানে অল্পসময় পূর্বক শিবলিঙ্গ প্রাপ্ত হইলেন এবং মন্দির নির্মাণ করাইয়া তাহা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার নামানুসারেই বিগ্রহের নাম ঐশ্বরিপুত্রের হইল।

মন্দির নির্মাণকালে রাজা বহু উপহিত ছিলেন। প্রত্যহ ডাকের পাড়ীতে বিষ্ণুপুর আসিয়া পদ্মানন্দ করিয়া বাইতেন। একদিন আনন্দিক করিয়া কিরীয়া গিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার নিবাসিত চারিজন মিত্রীর

পরিবর্তে উপরে পাঁচজন মিত্রী কাম করিতেছে। কর্ণাধ্যক্ষকে এবিষয়ে প্রশ্ন করিলে উপস্থিত সকলেই পক্ষম মিত্রীর অস্তিত্ব অস্বীকার করিল। তখন তিনি বিরক্ত হইয়া অল্পসময়ের জন্য বাশের ভাড়া বাহিয়া উপরে উঠিলেন এবং তথায় চারিজন ব্যতীত অপর কোনও মিত্রী না দেখিতে পাইয়া নানাবিধ অস্ত্র সজ্জা হইলেন, কিন্তু নীচের দিকে চাহিয়া কিছুতেই নাথিতে পারিলেন না। অনেক বেলা হইয়া



৩তমকালের মন্দির

গেল। মিত্রীপন, কর্ণচারিবর্গ সকলেই পুনঃ পুনঃ উঠিয়া এবং নানিহা নানিবার কোণল দেখাইয়া দিলেও রাজা কিছুতেই নাথিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন। কর্ণচারিগণ ব্যর্থব্যর্থ অকৃতকার্য হইয়া বহন ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করিতেছিলেন, তখন সেইখানে উপস্থিত অনেক রক্ষক বলিল যে, যদি কর্ণচারিগণ পেরেছা করিতে পারেন ও তাহাকে অভয় কেন তবে সে এই সমস্তার

মীমাংসা করিতে পারে। অতঃপর সকলের সম্মতি-
ক্রমে রত্নক একবার নীচে ঠাঁড়াইয়া প্রকাণ্ডে বেন
ব্যাগারটা কি অহুসজ্ঞান করিল, তারপর শব্দগুণে
শুনাইয়া তাহাকে সন্ধান করিয়া বলিল, “শালা
কাপড় কাড়িয়ে পরলা দেবার নাম নেই, আবার
উপরে উঠে চা ক’রছে দেখ! যদি না নামতে
পারবি ত উঠেছিস কেন?” বলিয়া একটা কুৎসিত
খালি দিল। একে ঘূর্ণা মাথার উঠিয়াছে, তাহার
উপর একজন নিষ্ঠুর রত্নক কর্তৃক এইরূপে অত্যাচারিত
হইয়া অপমানের শিরায় কায় শোণিত ছুটিয়া উঠিল।

তাছাড়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া দোহলামান একগাছি সামান্য
দড়ি ধরিয়া লাফাইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে সেই
অবস্থায় নামিতে দেখিয়া রত্নকপুত্র উদ্ভ্রাণে পলায়ন
করিল। কর্ণচারিগণকে তৎক্ষণাৎ তাহার শিরশ্ছেদ
করিবার আজ্ঞা দিলে তাঁহারা কৌশলে তাহাকে রক্ষা
করিয়া ছাপাখি পত্তর শোণিতে কুপাশ রজিত করিয়া
রাজসমক্ষে উপস্থিত হইলে তিনি মন-গ্রহণ করিলেন।
বহুদিন পরে “রাম-রোষ” শাস্ত্র হইলে কর্ণচারিগণের
নিকট আত্মপুণিক সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া তাছা
রত্নককে ১০০ বিঘা জমি দান করিয়া অতঃ পরিত্যাগ করিলেন।

তির্যাক পঞ্চক

কপিলজল

১

চড়াই বলে, ‘সব প্রগতির প্রতিই রাবি দৃষ্টি
আমরা।’ করি ‘আট’ের মাদি কেবল ‘মোট’ের সৃষ্টি।
চুড়িকে প্রেমের প্রসার মাজোরায় সেপটা,
উচিত মোদের আনন্দটা খাড়া করার চেষ্টা।
বৌবন হার ক্ষুদ্রাঙ্গী, ভাগ্যে পাশে মরণ
কাজেই সৃষ্টির আনন্দকে করি আমরা বরণ।’

২

হলুদ পানী ভাবছে বলে, ‘রূপ নিয়ে কি করবো,
কেবল ভাঙ্গা ভিটার বসে কড়ই বা আর চরবো।
জল্লা নাহি, বেতার নাহি, সিনেমা, ফি টকি—
বড়ের গুটী নিয়ে কত বেলবো বলা ‘হকি’।
কুখার আমার জীবন সেল, হয়ে রইলাম বস্ত
প্রাণ বে কীদে নাহে মাকে ‘হসিউত’ের জন্ত।’

৩

বক বলিছে, ‘কিলারীটা ব্যবসা নহে মল,
শিশু-শিতামহের পেণা ছাড়তেও হয় স’ল।
একঘেয়েমি নরকো ভাল, বেখছি মকল দিকে,
কাজেই এলাম বিশেষ থেকে ‘ডাইং ক্রিনিং’ নিখে।
তবু সেলে কাজ সেলে না, অথাক্ হলুম দালা,
কেবল নিজের কামিচ্চাকেই রাখছি করে সালা।’

৪

কাগজোঁটা বলে, ‘নহে এ সেপে মোর বাড়ী
এসেছিলাম উপকারটা করতে যদি পারি।
বীর্ষ দিবল কাগা শেঁটে এই ফুতছি শেখ,
এটা মোহাৎ অসভ্য ও কদাচারীর দেশ।
চলে যাব Air Mail-এ, পেলাব একটা Call
Miss Mayo-কে বলবো আমার অভিজ্ঞতার ফলা।’

৫

টাকসোণা কয়, ‘আছি নিয়ে টাকা এক সোণা
মেঘের সোফটা কাজেই করে নিতা আনোসোণা।
কেহ বলে, খোসো একটা নৃতন এরোফোন,
কেহ বলে, সববারে সোকসানিটা কম।
কিন্তু আমার পছন্দ ঠিক গুটী সামগ্রী
করপোরেশন ইলেকসন আর Film Industry।’

মারাতী ও বাংলা ভাষার সংস্কৃত হইতে শব্দ-গ্রহণ

শ্রীকানীনারায়ণ দীক্ষিত, এম-এ

মারাতী ও বাংলা, উত্তর ভারতের দুইটা প্রধান ভাষা হইলেও, বাংলা ও হিন্দী অথবা হিন্দী ও মারাতী ভাষার বেতন যনিত লব্ধ আছে, বাংলা ও মারাতী ভাষার সেতন নাই। হিন্দী ভাষার সহস্র ব্যবহার, মারাতী এবং হিন্দী ভাষার অল্পসংখ্য লিপি ও অল্পসংখ্য-লেখকের সাহায্য, বিশেষতঃ মধ্যপ্রদেশ ও মধ্যভারতে একই সঙ্গে এই দুইটা ভাষা পাশাপাশি ব্যবহৃত হয় বলিয়া, দুইটা ভাষার মধ্যে, তাব ও শব্দের আদান-প্রদানের সুবিধা হইয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও মুদ্রাবন্ধ-প্রচলনে যে সকল নূতন শব্দ ও কথা হিন্দী ভাষার দ্বান পাইয়াছে, তাহার ভিত্তি হিন্দী ভাষা বাংলার নিকট নাই। সংস্কৃত ভাষাই সকল জ্ঞানের আকর বলিয়া, বর্তমান জীবন সম্বন্ধে কোন ভাব বা বোধ ব্যক্ত করিবার অল্পসংখ্য শব্দের অভাব অল্পতব করিলেই লেখকগণ আদি-ভাষা সংস্কৃতের শরণাগত হইতেন। কিন্তু বেতন ভাব লইয়া বিভিন্ন ভাষার আদি-ভাষা হইতে শব্দ-আহরণের চেষ্টা চলিত, সেই শব্দের সেই বিশেষ ভাষার উদ্ভবগই অর্থ হইত, তা মূল অর্থ বেতনগই হউক না কেন। শব্দ-গ্রহণের বিশিষ্ট উপায় নির্ধারণ করিয়া বাংলা ও মারাতী দেশের লেখকগণ আবশ্যিক অস্থায়ী সংস্কৃত হইতে শব্দগুটি করিয়াছেন। এইরূপে, বহু গুরীত-শব্দ, বাংলা ও মারাতী ভাষার, মূল অর্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছে। হিন্দী ভাষার অতি অল্পদিন পূর্বে পর্যন্ত আমদানী-করা শব্দ, বাংলা ভাষার অল্পসংখ্য অর্থে চালাইবার চেষ্টা দেখা বাইত, কিন্তু হিন্দী-সাহিত্যের প্রচার ও শক্তি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আদান-প্রদানে শব্দগুটির প্রতি সহজেই নম্র পড়িয়াছে। বাংলা ভাষার শব্দ-গ্রহণের চেষ্টা কোন পথে চলিয়াছে, তাহা নির্দেশ করাই এই ক্ষুদ্র

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কোন একটা বাংলা লৈনিকের এক সংখ্যা হইতে কতকগুলি উদাহরণ লুগিয়া দেখাইতেছি।
কি বিলুল ধৈর্য সহকারে সংস্কৃত শব্দ-শাস্ত্র মনন করিয়া, অপরূপ মনোবীর সহিত আকৃত শব্দগুলিকে ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যেমন, ইংরাজী afternoon-এর প্রতিশব্দরূপে “বিকাল” বা “বৈকাল”, wounded-এর প্রতিশব্দরূপে “আহত” (কিন্তু killed = “হত”), illegal-এর প্রতিশব্দরূপে “অবৈধ”, selected-এর প্রতিশব্দরূপে “মনোনীত” প্রভৃতি শব্দগুলি অতি বিচক্ষণতার সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু আবার এমন কতকগুলি শব্দ আছে, যেগুলির সম্বন্ধে এ মন্তব্য খাটে না। যেমন, confused-এর সংস্কৃত পরিভাষা “সম্মত”, কিন্তু বাংলার “সম্মত” সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তেমনি without desire-এর পরিভাষারূপে ব্যবহার না করিয়া “innocent” অর্থে “নিরীহ”, tremor বা movement-এর পরিভাষারূপে ব্যবহার না করিয়া excitement অর্থে “চাকলা”, opposition-এর পরিভাষারূপে ব্যবহার না করিয়া competition অর্থে “প্রতিযোগিতা”, free from desire-এর পরিভাষারূপে ব্যবহার না করিয়া neutral অর্থে “নিরপেক্ষ” প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারে মূল সংস্কৃত শব্দের ভাব বা ছায়াপাত খুঁজিয়া পাই না। আবার কতকগুলি শব্দ, শব্দ-শাস্ত্রের তরফ হইতে (etymological sense) নিরর্থক মনে না হইলেও মারাতী ভাষার দূর্য্যার্থবোধক বলিয়া মনে হয়—যথা, abduction of woman বদলে “রমণী-হরণ”, labour বদলে “প্রমত্তা”, dismissed বদলে “পদচ্যুত”, European বদলে “যেডাক” প্রভৃতি। আবার কতকগুলি শব্দের—যেমন, “অভিভাবক” (guardian অর্থে), “যোগদান” (help অর্থে), “নির্বাচন” (election

অর্থে), "নির্ভীলন" (extinction অর্থে) প্রভৃতির মূল সংস্কৃতের সহিত মিল নাই বলিলেও চলে। সংস্কৃত ভাষা হইতে শব্দ-গ্রহণ এবং আবৃত্তকাহ্নায়া তাহা কাল্পনিক লাসাইবার, ইন্সকো-এরিয়ন্ ভাষাগুলির এই যে কোঁক, ইহার ফলে ভবিষ্যতে অধিকতর ধোলমালের সৃষ্টি হইবে, বিশেষতঃ 'টেক্‌নিক্যাল' শব্দের ক্ষেত্রে। যদি এখন বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার লেখকগণ মিলিত হইয়া

আলোচনার দ্বারা শব্দ-সৃষ্টির ক্ষমতা একটা 'কন্‌ভেনশন' খাড়া করিয়া তাহা মানিয়া চলিতে প্রীকৃত না হন, তাহা হইলে এবিধের কোন প্রকৃত উন্নতি হইবার আশা নাই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এ বিধের হস্তক্ষেপ করিয়া শব্দ-গ্রহণ সুপ্রণালীবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিকট আশ্রয় এটুকু আশা করিতে পারি না কি ?

কল্মীলতা

বন্দে আলী মিয়া

ভাতাস লাগিয়া ফুলে নিরবধি কল্মীলতা
ওরি কুক রয় মাটির কুকের সোপান কথা ।
বিছানোর রোসে টলমল করে কিলের পানি,
তারি কুক তাতে ঝপে ডগ্‌মগ্‌ কল্মীরাশি ;
খোকা খোকা লতা পাতা শুছিতছি কাকল কালো,
নাঁহার চুবানো ঝপে বেন বিল করেছে আলো ।
ভরি কাঁকে কাঁকে টোপাপানো তাতে ব্যাঙের ছাও,
এই ঠেলে আর উজাইতে নায়ে কলার নাও ।
কল্মীর মায়ে পানিকোড় চলে, ডাহকী হাঁকে,
সাবধানে চল হেঁথার হোঁথার 'কোরাক' ডাকে,—
কল্মীর বনে পথ খুঁজে কীসে বকের নেয়ে,
ওরি লাল। হং মেখে মেখে বেন দিয়েছে ছেয়ে ।

আঁকিয়া আঁকিয়া চলে সমুখেতে কল্মীডগা,
সেছে তারো 'পরে পোতা ছিলো হোঁথ। কিলের লগা ।
জলঝোড়া সাপ কিলবিলা করে পাতার আড়,
জিব্‌ বের করি মিট মিট চায় বিলের ধারে ।
কানাকুয়া পাখী পুত্‌ পুত্‌ করি দিচ্ছে ডুব,
মাছ ধরে খায় কতু সাঁড়রায় লাকার পূব ।
কল্মীরে ঘেরি কালো ঘন ছায়া পানি-কাকল,
তারি তলে কাঁপে নীল আব্দারান অবই ডল ।
বাভাসের সাথে জড়াঝড়ি করে সকল দিন,
পাতায় পাতায় উছলায় তার মাটির গুণ ।
লতা চলে দূরে এঁকে আর বেঁকে গুণীর পানে,
মাটির মেয়ের পানিতে দরদ কেন কে জানে ?

কল্মীর ফুল কুমারীরা বেন খুঁজিতে ডরা,
চোখে চোখে গর সোনালী স্বপন রূপ-পশরা ;
বেঙনী রঙের কুচকুচে মুখে হুঁখানি ঠোঁট,
সব মধু বেন জই ঠায়ে আসি বেঁধেছে জোঁট ।
ছোটো আর বড়ো কল্মীর হুঁড়ি খুঁধার আম,
রোসে বেন পরে আলো জল্লল্যা রূপালী নাম ।
গুকোয়ুরি-কটের ডাকে চণাচনী কল্মী বনে,
রাতের খাঁখার নাচে ছলে ছলে গুদের সনে ;
পাঁজরি-কটের গলাগলি করে কল্মীলতা
ইলসেওঁকিতে কুক হাসে গর চকলতা ।

স্বর্গদেবী

প্রীতমী অন্নুপমা দেবী

[পূর্বাহ্নস্মৃতি]

(৬)

বে-বিধাতা হৃদয়নের তাখালিপির লেখক, তাঁহাকে একটু 'ট্র্যাজেডি'র ভঙ্গ বলিয়াই বোধ হয়। নবীন-বোনেন—বে-সময়ে লোকে প্রিয়ার প্রেমে, প্রিয়ার মেহে আত্মনিমগ্ন করিয়া দিয়া পৃথিবীর মাটিতে সোনার বর্ষ গড়িয়া তোলে—টুক সেই সময়ে তাঁহার কপালে ঘটয়াছিল বারে বারেই বম-হৃৎের তাড়না। যখন সন্ধ্যারের স্বপক্ষে উৎসর্গপরি পরক্ষেপ সহ করিয়াও পৃষ্ঠভঙ্গ না দিয়া হৃদয়বী বীরের মতই বিদ্রমমালা স্বরূপ লাভ করিলেন এই সর্গদেবীকে, তখন তাঁহার সকল হৃৎ সার্থক মনে হইল! নিরাশ্রয় পৃথিবী সে-দিন তাঁহার চোখে আলোকোৎসবে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু অসূত্রে লিপিকার এইখানেই তাঁহাকে ছুটি দিল না। সর্গদেবী যখন শিশু, সে-সময় এমন একটা ঘটনা ঘটিল, বাহ্যতে তাঁহার জীবন-প্রবাহে বাহিয়া-বাহির-করা যেইটুকু যেন আবার কোথায় হারাইয়া গিয়া আর একবার সব বিফল করিয়া দিল।

কিন্তু স্বর্গাগ্রহণের মত এ-অন্ধকার আর হারিষ আনিতে পারিল না। হুজিমান করিয়া অপভ্র-মেধাকাজী পিতা তাঁহার সাধনা-সহ কলসরূপ কস্তাটিকে হুকে চাপিয়া সকল অশান্তির আলোকে প্রেমিত করিয়া তুলিলেন। মেয়ের নাম ছিল, মায়ের সাথে 'বিদ্যারবা', বসলাইয়া সর্গময়ী সর্গদেবনের নাম আপনি পছন্দ করিয়া রাখিয়া দিলেন 'সর্গদেবী'।

বড় হওয়ার পর ছোটবেলার একটা ছবির

খাতার লেখা দেখিয়াই মেয়ে একদিন বলিল, "বাবা, 'সর্গদেবী'র চাইতে 'বিদ্যা' নাম তো ভাল ছিল।"

বাবা শুধু উত্তর করিলেন, "না, এই ভাল।"

বাপের ও-নামে বিশেষ আগ্রহি বৃত্তি মেয়ে আর কিছু বলিল না। একটা দিন সর্গদেবী তার বাপকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মায়ের নাম ছিল নাকি 'তক্তি'?" 'তক্তি'লেশ্য' বেশ নাম, না বাবা?"

বাপ মেয়ের দিকে এক লম্বা দৃষ্টি হির রাখিয়া প্রতিপ্রত্ত করিলেন, "বাক পড়ার শব্দকে তোমার বেশ মনে হয়? তা' হ'লে এ-ও বেশ।"

মেয়ে একেবারে স্তব্ধ! সে দেখিয়াছে—মায়ের আলোচনা তার বাপের সঙ্গে চলে না। বাপ এমন একরকম আশ্চর্য্য উদাস হইয়া যান, যার পরে আর ত-কথা চালাইতে প্রবৃত্তিও থাকে না। সে বুদ্ধিমতী, মায়ের সম্বন্ধে নীরব হইয়া গেল।

হৃদয়ন ভাবিয়াছিলেন, আকাশে বৃত্তি আর বাক জমিয়া নাই, হৃৎগুলি পড়ার তা' পড়িয়া গিয়াছে। বিশ্বাস করিয়াছিলেন, অনেকটা নিশ্চিন্ততা আসিয়া দিয়াছিল। হঠাৎ সে-দিনের বর্ষপাত্র মেঘতরঙ্গের মিনাকপূর্ণ প্রাবণের যধানিশার তাঁহার মাথার উপর শব্দবর্ষা নিশ্চিন্ত হইল।

ভাঙ্গা-বিধাতা আর একবারের ভক্ত তাঁহার দিকে চাইয়া স্রোতপূর্ণ উপস্থানের অকরণ হাসি হাসিয়া গইলেন।

ক'নের আসনে ক'নে মিলিল না। যখন সারা বাড়ী উর উর করিয়া খুঁজিয়াও ক'নে পাওয়া গেল না, তখন যেহেতু-মহলে উঠিল কাঠা, আর পুঙ্খ-মহলে বহিল লীৰ্ঘ্যাস। হুরজন — সেই শামগ্রাম-সাক্ষাতে পরসের আড়-পর। সারা দিনের উপবাস এবং স্ত্রী শাস্ত্যাকাংক্ষি হৃদিতার স্ত্রী ও স্ত্রী হুরজন — সেই রকমই শুষ্ক আড়ট হইয়া বসিয়া থাকিলেন। ভাল-মন্দ কোন একটা শব্দই তাঁহার শ্রুতি-বাহির হইতে কেহ শুনিла না।

আর ডেমনি ভাবেই ছান্দা তলার শিগার উপর বর দাঁড়াইয়া রহিল। বরযাত্রীসকল বিমিত্ত; বরকর্তা বজ্রুর পারিষদে আসফাসনে সেই বর্ণধোমুখ মেঘমণ্ডিত, ক্রমে ক্রমে বস্ত্রনাশে কর্কশকারী পদনকে কণ্ঠিত করিয়া তুলিলেন, প্রজিবার করিবার মত এ-পক্ষের কাহারও মুখে ভাণ ছিল না। বরযাত্রীদের আহার শেষ হইয়াছিল, শেষ কিরিয়া আসিজেছে, বিহার লইয়া যে দার বাড়ী কিরিতে চায়, আবস্তরকণ্ড বটে; কিন্তু বিষয়ান্তিম্যে সে-কথা কাহারও মনে পড়িল না। বিবাহের পূর্ণ মুহূর্তে ক'নে-কুঁরি, এরকম অপূর্ণ রহস্ত তাহারা জিট্কেটিভের উপভ্রাসেও কখন পড়ে নাই!

ক'নকে খুঁজিয়া পাওয়ার সব আশাই যখন শেষ হইয়া গেল, তখন সকাল হইতেও বড় বেশি বাকি নাই। তখন পর্যন্তও টিক অবস্থাপন্ন হুরজনের কাছে আসিয়া, তাঁহার কক্ষের বঁটা মাত্র পূর্ণেকার ভারী বৈবাহিক প্রাণ-কলকরীক নিঃশব্দে সমবেত সকল ব্যক্তিকেই গুনিতে বাধ্য করিয়া বসিলেন,—

“জগদান্ধা করুন, মাদ্রবের ভালর জন্তেই করেন। আপনাদ্বার কড়া যে আপনার পথে আপনি স'রে ধাক্কিয়েছেন, এতে তাঁকে আমি ধস্তাবাদ দিচ্ছি; তা এখন আপনার কর্তব্য কি, সেটাও স্থির হ'য়ে থাক। সে-বেরে পাওয়া গেলেও আমি আর তাঁকে পূত্রবৎ হ'লে বর নিতে পারব না। কেন, তা' আপনি বোধ হয় বুঝতেই পারছেন? তবে আপনার বাড়ীতে আগ্রনার বুদ্ধভূতা ভারের

যে বিবাহযোগ্য মেয়েটা রয়েছে দেখলাম — খুব সুন্দরী না হ'লেও চলনসই বটে, আর রূপে এবং বিচার আবার অপ্রভা হ'লে গেছে — আপনার সম্মতি থাকলে তাঁনি খোঁজাচ্ছে ঐ কড়াটা দান করতে পারেন। উত্তর পক্ষের এতে কতকটা লজ্জার কথা হবে ব'লেই আমার তাঁদের অহুরোবে সম্মত হওয়া, নতুবা যে-বরে এসব ঘটনা ঘটে, সে-বরে আবার যে ছেলের বিয়ে দিই, সে-প্রসূতি আমার ছিল না।”

হুরজন কনের পুত্রদের মতই সম্মতি দান করিয়া সেম ভাই-এর আকর্ষণে তাঁহাকে আসন ছাড়িয়া গেলেন। সর্গাশীর গাবের গহনাগুলি তার শোবার খতের খাটের উপর পাওয়া গিয়াছিল, আর তার লাল রংয়ের বেনারসী শাড়ীখানা অবধি, — যে-শাড়ী পরিয়া তাকে লম্বীর মত সেখাইজেছে বলিয়া সেম কাকীমাই কত সোহাগ জানাইয়াছিলেন। হুলোচনাকে সে সবই পতান হইলে কেন সর্গাশীর পরিত্যক্ত সেই নিজীর উপর তাকে বসান হইল, চণ্ডীর পুঁতি কোলে লইয়া বুকের ভিতর সে একটা আত্ম স্থাপি পুঁরিল। কিছুক্ষণ আসে সে সন্ধ্যির ক্ষত কদিয়াকে, চোখের জল তখনও ওকার নাই, টোঁটের গোড়ার একটুখানি হাসিও কুটীরা উঠিল, ভাগ্যবিপর্ধ্য দেখিয়া।

বর-বরণ হইয়াই গিয়াছিল, ক'নকে সাতপাক ঘুরাইয়া শুভবৃষ্টিটা করাইসেই চুকিয়া যায়, তার পর গোটা দু'জার-ময় পড়া!

বর কই? বর কোথায়? এই তো কতক্ষণ সে তার বাপকে খিজায়া করিতেছিল, বাড়ী ফেরা হইতে আর সেরী কিসের? এই তো সে তার নূতন বিবাহের বর গুনিয়া অতবড় হুঁচকি বাপকেও ভরসা করিয়া বসিয়া বসিল, “না, বিয়ে আমি কব্ব না।” বাপ বলিলেন, “তোমার বতামত আমি তো মানুতে চাই নি।”

তারপর? সেল কোথায়? কেউ জানে না। আর ধরবার কাছে ভিক করা বাজে শোকেরা শুধু না, বাজনগাররা তো সেই ক'নে-হারানার পরই নিব্বন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পথের একপাশে ভাঁড়,

কলাপাতা ও উল্লিহের স্থূপ জমা হইয়া আছে, ৩' তিনটে কুতুর এই ভোরেই তার সোতে ছুটিয়া আসিয়াছে। তাহা জানে এখনি ময়লা-কেনা পাড়ী আসিয়া পৌঁছাবে। গন্ধামানের বাড়ী টিপি-টিপি ঘুঙীতেও পা টিপিয়া ছাড়া মাঝার দিয়া চলিতেছিল। এই বাড়ীর পরের একটা বাড়ী বাদ দিয়া তার পরের বাড়ীটাতেও বিবাহ ছিল। এতক্ষণে সেখানকার বৈবাহিক ব্যাপার সমস্ত চুকিয়া দিয়া কোলাহল পাত হইয়াছে; বর-ক'নেকে নইয়া বারা বাসর জানিতেছিল, তাদের মধ্যে একজনকার পান এ-বাড়ীর গতঙ্গালের মধ্যেও একটু একটু পোনা ঘাইতে লাগিল।

গায়িকাটা বোধ করি ভ্রান্তিকা না হন, চান্দবিধি; কারণ, তিনি একটি চিত্রপুস্তান সেকলে পান গাহিতে ছিলেন; সবটা বুঝিতে পারা যায় না; হু'একটা কলিই গুরিয়া ফিরিয়া কানে আসিতেছিল;—

“তোজ সখি! নিষ্ঠুর নটবর আপ;—

যামিনী শেব হ'লে সকলি নৈরাশ।

কুম্ভুম চন্দন, পক্ষ উপচার;

ভাসাবে লাও সখি! বন্ধে ধনুর—”

(৭)

উৎসবের বাড়ি সেই যে প্রাচ্যের অমানিশায় বাতাসের হুমকারে এবং বাতলের অশ্রুধারায় নিবিয়া গেল, বস্ত্রের মধুমাসিনীর পুনঃ পুনঃ বাতারাতেও আর তাহা হলিল না! ছোখার রূপালী আলো সারা ধরণীর বন্ধ প্রাণিত করিয়া সহস্র ধারার বহিয়া গেল, চামেলী, চম্পক, মালতী, মলিকা, ছুই, বেলী, শ্বেতালিকা তাদের গন্ধে ভরা ফুলের ডালি মেসিয়া দিল, পথে পথে কতই মিলনের বাণি বাজিয়া বাজিয়া শ্রান্ত হইয়া ফিরিয়া গেল; যে গুত অবসর সেদিনের মধ্যরাত্রে বার্ষ হইয়াছে, আর তাহা ফিরিয়া আসিল না। হা' সেল, হুত তা' চিরদিনের মতই সেল। হা' হা, তা' কি আর ফিরে আসে? অতীত, হারান অতীত,

হুতান অতীত চারিদিক দিগা ভাঙাধরে বলিয়া গুঠে, —না, না, না, না।

সর্গাণ্ডিকে ফিরিয়া পাওয়া কঠিন হয় নাই। কারণ সে হারায় নাই। তেজালার একটি চোরা কুৎসীতে একখানা ছেঁড়া পর্দার শিল্পনে সে হাত-পা বুজিয়া অনড় হইয়া পড়িয়া ছিল; একপ্রহর বেলা হইতেই ছেঁড়া পর্দার কৃলা মাঝিয়া অচুত মুষ্টিতে বাহির হইয়া আসিল। তখন পুণিসে খবর সেও হইবে কি হইবে না, তাই নইয়া বাড়ীতে বিলম্বল মল্যাদি উপস্থিত হইয়াছে। পাচ জনের পাচ কথাই গতঙ্গাল ভাল করিয়াই পাকিয়া উঠিয়াছে। সেহকাকা খুব কথিয়া কথিয়া চোখা চোখা ব্যাক্যাপণে বিরাট শোকের প্রকট মুষ্টি হুতজনকে প্রাণপণে ঝিঁঝিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। কিসের যে তাঁর এত পাত্রমাত্র, ভালরূপে বুঝা না গেলেও সে-বস্ত্রটির একটু একটু অস্তিত্ব কিছ্র তাঁর হাবভাবে প্রকাশ পাইতেছিল। আর সবার মনের মধ্যে গত সন্ধ্যার অচুতপূর্ণ ঘটনা-পরম্পরা হইতে আর যে রকমই তাব-বিপর্যয় ঘটতে থাকুক, এই চিরনির্দিষ্টরোহী এবং বলিতে গেলে একপ্রকার সুখে দুঃখে নির্ভিকার হুতজন বেচারার প্রতি প্রবল সহানুভূতি ব্যতীত বিবেকের দেশমাত্র ছিল না। বিশেষতঃ মেয়েমহলে; সেখানে সকলেই এই একটা কথা বলিয়াই খেদ করিতেছিল যে, “হুত বাপের কথাটা হতভাগী একবারের জন্যে তাহলে না? কি সম্ভাব্য মেয়ে শো!” এঁদের মধ্য হইতে কেহ কেহ মতব্য করিলেন, “পুঁতে কেলুতে হয় এমন মেয়েকে!” আর একজন তাঁর কথাই প্রোৎসাহিত হইয়া উঠিল। ইহার সঙ্কিত লাব মিলেন, “হুত যদি আমার মেয়ে, হেঁটে কাটা উপরে কাটা দিবে পুঁতে কেলুত না! এডবড় আশ্চর্য্য! মেয়েমাহুদের! ঠাঁড়িরে দুখ পোড়ালে গা!”

সর্গাণ্ডিকে আধিকার করিয়া আসিল হুতোয়দাই। কি জানি কি তাবিয়া, অথবা কিছু না তাবিয়াই সে দিয়াছিল ভেতালার হায়ে। হুত দিয়াও ধনন সেখিল নিভার নাই, পানের বাড়ীর স্নোকেবা তাদের হানের

আগিলার কঁাকে কঁাকে চোখ রাখিয়া উৎসুক দৃষ্টি দিয়া এ-বাড়ীর রহস্যময়তানে বিশেষ ভাবেই নিহুত রহিয়াছে, তখন সে তার অমর্য্য অশ্রুজলকে একবার প্রাণ তরিয়া উৎসারিত করিয়া দিতে ছুটিয়া দিয়া চোরা কুঠুরীর দোর খুলিল; সঙ্গে সঙ্গেই তার হৃৎচোখ দিয়া করা জল চোখের কোলেই আপনা হইতে ঝাঝিয়া দিয়া গভীর বিস্ময়ের চিত্তরঞ্জনগতে তার সমস্ত সুখধানাকে মিহ ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিল। একটী অপরিমেয় হর্ষাচ্ছাদনে উত্তম অবীর হইয়া উঠিয়া সে ছুটিয়া আসিয়া সর্গাণীকে হৃৎগতে জড়াইয়া ধরিল,

“দিদি! দিদি! সুদ্বিদি! তুমি এখানে!”

সর্গাণী তখন সাতা দিন-রাত্রির অনিরম ও উত্তেজনার পর গভীর একটা অবদানে বেন আচ্ছন্নের মতই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখিতেছিল, বেন সেই বরের সঙ্গেই তার বিবাহ হইয়া দিয়াছে, ফুলশয্যা—ঘুমন্ত সর্গাণীকে বেন সে কঠিন নির্ধর হস্তে নাড়া দিয়া কঠোরকণ্ঠে ডাকিয়া বলিতেছে, “এই ওঠ, নোয়ের মতন প’ড়ে প’ড়ে ঘুমোবার জন্তেই তোকে বিয়ে ক’রে এনেছি নাকি?” গুনিয়া সর্গাণীর বেন সর্জনরীয়ে জ্বলন্ত ধরিয়াছে, সেও ঠিক তেমনি কঠিন মুখে তার স্বাবীর দিকে মুখ ফিরাইয়া অত্যানিই কঠোর হৃদয়ে কোন কিছু কল্পিতই ভ্রম বেনম মুখ খুলিয়াছে এমনই জ্বর তরঙ্গের কাছের কাছে বাঝিয়া উঠিল, হতভাগ্য ঐচ্ছিকভাবে স্বাবীর জ্বলন্ত কঠোর পরিবর্তে একটা আত্মকৃত্যাকুল কোমল জল, “দিদি! দিদি। সুদ্বিদি! তুমি এখানে।”

সর্গাণী ধকমড় করিয়া উঠিয়া বলিল। এক মুহূর্তে তার সকল কথাই মনে পড়িয়া গেল। গত রাত্রে সেই উৎসব-সমারোহ, সকাল হইতে ছিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত কতই না ছোটবড় নানাবিধ নিম্ন অশ্রুতান, তারপর? সর্জনাম! সর্গাণী এ কি করিয়া বসিয়াছে? বিবাহ তো পণ্ডই হইল, হোক, কিন্তু তার বাপ? না আনি কি কড়ই তার উপর দিয়া বঁহিয়া গেল! আছেন ও?

উঃ — সর্গাণী! কি সামাজিক মেয়ে তুমি! যদি এক সঙ্গে এত বড় মনমান এক আশাত তাঁর সহ না হইয়া থাকে? বেড়াগতের মতই আত্মনাশ করিয়া উঠিয়া সর্গাণী হুলোচনাকে জড়াইয়া ধরিল, “হুদি! আমার বাবা?”

হুলোচনা ভক্তকণ্ঠে ঐহং সামলাইয়া গইয়াছিল। সর্গাণীর আলিঙ্গনে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া সে তার কোলের মধ্যে মুখ ভঁজিয়া পাচুরে বলিয়া উঠিল,— “বৈতে আছেন, কিন্তু তুমি এ কি করলে, দিদি!” গতরাতে তার বাপের মৃত্যুর মত তার বিবাহ বে সর্গাণীর ভাবী বরের সহিত হইতে পারে নাই, এই মনে করিয়া এখন সে বেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, তাহা হইলে আজ এই সর্গাণীর সামনে সে মুখ দেখাইত কেমন করিয়া?

বাপ যে প্রাণে বাঁচিয়া আছেন, এইটুকু খবরই এখনকার পক্ষে যথেষ্ট বোধ হইলেও “বৈতে আছেন” কথাটার মধ্য দিয়াই সর্গাণী বেন তাঁর বর্তমান অবস্থাতাকে নিবাচকে দেখিতে পাইল। “বৈতে আছেন!” ঠিক বসিয়াছে হুলোচনা, রাত্রে সেই ঘটনার পরে ঐ কসাই-প্রকৃতি লোকটার হাতে তার অমঙ্গলহার বাপকে একান্তভাবে ছাড়িয়া রাখিয়া সে বে নিত্যম তীরুর মতই লুকাইয়া থাকিয়া তাঁর ‘পরে মৃত বড় একটা অত্যাচার করিয়াছে, সে-কথা মনে করিয়া সর্গাণীর এখন সমস্ত অন্তরটাই তাকে বেন বিকার দিয়া দি-ছি করিয়া উঠিল। এতকণ তার বাপের ধর্ষণ হইতে আর কিছুমাত্রও যে থাকি নাই, সে-কথা এখানে বসিয়াও সে বুজিল। এর উপর গভীর দুশ্চিন্তা; আর সেটা যে কতখানি, সে-কথাই বা তার চাইতে কে বেশী জানে? সর্গাণী তাকাডাড়ি উঠিয়া পড়িয়া হুলোচনাকে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনবঙো বিয়ের হয়েছে?” অতুল উত্তর পাইয়া হুলোচনাকে টানিয়া বলিল, “লু হুদি! বাবার কাছে বাই!” সিঁড়িঙলা বাহিয়া সে বেন কড়ের বেগেই নামিয়া গেল। এই অসহায় আশাহীন অবস্থার মধ্যে স্রজনের যে সহায়হুতিকারী এ-বাড়ীতে একমনও

নাই, সে-কথাও সে জানিত, অথচ সব জানিয়া তিনিও সে উাকে কার কাছে রাখিয়া আসিয়াছে ?

“বাবা !” বলিয়া মেয়ে আসিয়া যখন সুরঙ্গনের গলাটা হুঁহাতে জড়াইয়া ধরিল, সুরঙ্গন তাকে একটা কথাও বলিতে পারিলেন না, শুধু নিষেধ প্রথ হুঁহাত দিয়া তার সেই শ্রুত বন্ধনগুলি বাহু দুটিকে পঠার বেধে জড়াইয়া ধরিলেন, আর তাঁর হৃৎচোষ দিয়া কঁপ হুঁটী মলের দ্বারা নামিয়া আসিল, তাহা তিনি গোপন পর্ধ্যন্ত করিলেন না ; করিতে পারিলেনও না।

কিন্তু সুরঙ্গন তাঁর হারানিখিকে দিগিয়া পাইয়াই না হয় কৃতার্থ হইয়া গিয়া তার কৃতকার্যের কোনই কৈফিয়ত চাহিলেন না, বাটার শোকেরাও তো আর সুরঙ্গনের মতন কেশিয়া যায় নাই। তাঁরা এতবড় মেয়ের এই এতবড় বেয়াসবি সহ করিবেন কোন্‌হিসাবে ? এই যে কাণ্ডটা কাল ঘটিল, এর ক্ষত শুধু কি সর্বস্বামী-সুরঙ্গনের কলর হইল ; তাঁদের বাড়ীরও কি এতে নাম ব্যাঘাত হইয়া গেল না ? এর পর এ-বাড়ীর মেয়ে কেহ বিবাহ করিতে বাসী হইবে ? গুটতর কি একটা নীমা থাকিবে না ? অত্যন্ত কঠিন দুখ করিয়া সেমকাকা কাছে আসিয়া গাড়াইলেন। তাঁর চাহনি হইতে চন্দন পর্ধ্যন্ত সমস্ত ভাবটা হইতেই তাঁর ভিন্নতার বেন তারবারে চীৎকার করিয়া তাহাকে শাসন করিতে করিতে আসিল। তাঁর দিকে একবার মাত্র চাহিয়া সেবিয়াই সুরঙ্গন বেন সম্মুখে মেয়েকে নিষেধ কোলের কাছে ঝেঁক টানিয়া লইলেন, তাকে সসারের সকল আশাত হইতে ঢাকিয়া রাখিতেই তো ডিরমিন চেষ্টা করিয়াছেন ; আশও তাঁর গুই ভাবনাই সকলের চেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছিল।

সেমকর্তা কোন প্রকার ভূমিকা না দিয়াই কথা আরম্ভ করিলেন ; বলিলেন, “তুমি বা’ করলে, এর পরে কি আমরা আর ভুলমায়ে মুখ দেখাতে পারব ?”

সর্বস্বামী এ-প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়াই, খেঁট হইয়া নিষেধ তলা ভুঝাইয়া আলতা পরা পা-পানির নখের কোণ খুঁটিতে লাগিল। তার ভাব সেবিয়া মনে হইল, কথাগুলো তার কানেও যায় নাই।

সেমকর্তা বলিয়া চলিলেন, “ভুলগোকেসর ঘরে ম’রে, সেখা-পড়া শিখে, যাহুব বে এমন হয়, এ তোমার এই কাণ্ড সেখ’বার আপে আমার শত্রুও ধারণা ছিল না, সর্বস্বামী ! সাধ ক’রে কি লোকে মেয়েসের সেখা-পড়া শেখায় না ! খামকা একটা ভুলগোকেকে এই বে ভূমি অপমানটা করালে, মনে করেছ কি এর পর আর কখন তোমার কেউ বিয়ে করতে চাইবে ? শাসনকেও আর তোমার বিয়ে হয় না। সে’পড়া মেয়েকে কে বউ করবে গুনি ? ছি ছি ছি ; কি কাজ ভূমি করলে ভেবে সেখ দিকি ?”

সুরঙ্গন একটু বেন ব্যস্ত হইয়া নড়িয়া চড়িয়া বলিলেন, একবারের ক্ষত কি বেন বলিবেন বলিয়াও মনে হইল, হাতখানা মেয়ের গায়ের উপর দুসসংকত হইল, সে-স্পর্শ বেন নীরব ভাবার অমুরোধ করিয়া বলিল, রাগ ক’রো না, লক্ষী আমার ! সে বা’ বলে বলুকগে, আমি তো কিছু বলছি নে ! সর্বস্বামী নীরব নজসুখে বখা-কাণ্ডেই নিরত রহিল। কুখা-কুখার তার শরীর তখন বেন ত্রিম্ ত্রিম্ করিতেছিল।

সেমকাকা তাহাকে বাক্যবিনুখ সেবিয়া উৎসাহের সহিত বলিয়া চলিলেন, আশে পাশে বাড়ীর বেশির ভাগ লোক আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন, তাঁদের গুনাইয়া গুনাইয়া বলিতে লাগিলেন, “আমাদের আশ্বই চলে যেতে হবে, এর পর এ-বাড়ীর সমস্ত আমরা আর কোন মতেই বাবুতে পারি নে, তা’ করলে মুলোচনার বিয়ে সেগরায় আমার পক্ষে দায় হ’য়ে উঠবে। এই যে গল্পটা রটনা করা হচ্ছে, এ কি কেউই বিশ্বাস করবে ? চোরা কুঠুরী নিশ্চয়ই খোঁজা হয়েছিল, পাশের বাড়ীর পানিল চড়ে অন্যায়সেই যে ওখানে ফিরে আসা যায়, কে না তা’ মানে ? বিশেষ, ঘরে যখন ওরকম একটা ব্যাপার হয়েছে তখন—”।

সুরঙ্গন অব্যক্ত কণ্ঠে আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন, “অম্বকুল !—”

“তুমি চূপ ক’রে থাক সুরঙ্গা ! তোমার যদি একটা প্রায় না থাকত, বউই হোক, এ-বাড়ীরও তো কিছু

রক্ত ওর গায়ে আছে, অতটা বেচ্ছাচারিণী হ'তে পারত না ! তোমার কর্পসনে বা' কর্তে হর কলক, আমরা বলুচ্ছাচ্ছিলাম কিন্তু সমাজের কুকের উপর ব'সে এই সব লজ্জা কাণ্ড আমরা কখনই কর্তে দিতে পারিনি, এতে আমাদের মাথা কাটা যায় না ? আমি জানতে চাই, এর অর্থ কি ? আমি জানতে চাই। আরে ছাড়'ব না—”

সর্দারী যেমন নতমুখে বলিয়া ছিল তেমনি নতমুখেই বলিয়া রহিল ; কিন্তু তার সর্বপত্রীতে একটা তীব্র চাকলা জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে কঠিন করিয়া তুলিয়াছে, তাহা জানা গেল। আর একটুকল সেইরূপ থাকিয়া বোধ করি অন্তর্বিগ্রহে জয়লাভ পূর্বক সে যখন মুখ তুলিয়া চাহিল তখন তার স্বভাবসুলভ মিষ্ট মুখকান্তি প্রতিজ্ঞাদৃঢ় ও মৃদু হইয়া উঠিয়াছে। বলিল,

“কৈকিৎ যদি আমার বাপ চাইতেন কিছুম, কিন্তু তিনি জানেন, আমি তাঁর অপমান কিছুতেই সহ করতে পারিবে; বারা তাঁকে অপমান ক'রে তাঁর মেয়েকে পুষার মত বাচাই কর্তে বিধা করে না, সে-থরকে আমি আমার জন্মের ঘর কর্তে পারি নি ক'লে তিনি যে আমার ক্ষমা করবেন না, এ-বিখাস আমার মোটেই নেই। আর আপনারা, আমার সব বলি অতবড় বিখ্যাতই হ'য়ে উঠে থাকে, বা' ভাল বোধ করেন করবেন ; আমার কিছু বলবার নেই।”

এই বলিয়া সে কোন দিকে না চাহিয়াই সেই বিশ্বাসার্জ্যে ঐতরীভূত বর্জিত জনতার মধ্যে দিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল, কাহারও প্রতি ভ্রক্ষেপ হাত না করিয়া শুধু বাপকে বলিয়া গেল, “কাপড় ছেড়ে আসুছি বাবা, তোমার নিয়ে একুশি কালীঘাটে পুজো দিতে বাব, শীগ'রি তৈরী হ'য়ে নাও।”

তাহাই হইল। বাপকে একজন হালদারের বাড়ী পঙ্কিত রাখিয়া পরের দিন সর্দারী তাদের বাবা-বাড়ী উঠাইয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত করিতে ফিরিয়া আসিল। সেখিল সেলকাক। সপরিবারে গতকল্যই নিজেদের ঘরে বসন। হইয়া গিয়াছেন, আরও অনেককেই

চলিয়া গিয়াছেন। আজও আবার অনেক লোককেই খাওয়া-দাওয়া সারিয়া বাড়ী ফেরার লজ্জা জন্মি বাঁধিতেছেন। সর্দারী আসিয়া সকলের পাশের ধূলা লইল, আলমারি-ভরা শাড়ী বাহির করিয়া বখাষোপা সন্মুখে বিলাইয়া দিল, পথ-থরচা মিষ্টির হাড়ি বা' কিছু পাওনা, তা' সে কাহারও থাকি রাখিল না। ধারা চলিয়া গিয়াছেন, কারও পার্শ্বলে কারও লোক মারকৎ গাঁহানের প্রাণ্য পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া রাখে সে সেই হালদার-বাড়ীতেই ফিরিয়া গেল। শিবের অকুল পাথারে ভাসিয়া এই বাড়ীতেই পড়িয়া আছে, মণিকা তার সঙ্গে বেধা পর্য্যন্ত না করিয়াই চলিয়া গিয়াছে ; সে শিবেরকেই বাড়ী আপনাইবার তার দিয়া বলিয়া গেল, বাড়ীটা খালি হইসেই সে যেন সর্দারীকে খবর দেয়, বতস্প একটা প্রাণীও এ-বাড়ীতে থাকিবে, তার বাপকে সে তাদের মধ্যে আসিতে দিতে পারিবে না। পরের বাড়ীতে বস কর্তেই তাঁর হোক, এদের সুরধার বসনার আঘাত তো সেখানে নাই।

এমন করিয়াই সুরজনের বড় আসরের মেরের জীবন-সাক্ষাৎ কালো মেঘের বনখটায় ঘোরাগো হইয়া রহিল, সে-মেঘ আজও কাটে নাই।

ছেলেটার খবর আমরা কিছুই জানি না ; শুধু করেকটা বিজ্ঞাপন সাপ্তাহিক ও দৈনিকে কিছুদিন খরিয়া বাহির হইতে দেখিয়াছি (অবশ্য সেটা উহারই উদ্দেশ্যে কি না তাও ঠিক জানি না)।

লেখনি এইরূপ :-

—থোক !

ফিরে এস, তোমার মা একান্ত কাতর। বিয়ের কথা আর বল'ব না। — তোমার বাবা।

পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর। সমাজের কত ভাষা-পড়া, কত উত্থান-পতনের ইতিহাস রচনা করিতে করিতে মহাকাশের বক্ষে নিত্যকালের চিরপ্রবাহিত স্রোত প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, এই পাঁচ বৎসরও তাহার মধ্যে মিশিয়া গেল। ভবিষ্যতের

মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এর দান কতখানি, তার
পরিমাপ আমরা করিতে হাইব না, আমরা আমাদের

জীবন-ইতিহাসের আলোচনাতেই প্রমাণ পাইয়া থাকি,
পাচটা বৎসর পূর্ব তুচ্ছ নয় !

(ক্রমশঃ)

“চোক গেল”

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল

সহাবোধ্যমে ভারতের প্রতি বোম্বুৎপে

ছোঁয়াছোঁয়া

ফুটে উঠে পুলক-কম্পন,

নিভ্রাতুয়া নিশীথিনী বেহারি স্বপন

বুম্বোয়ের উঠিছে চমকি ।—

সহসা ধমকি

ধাড়া হুস্কবশিত উঠে তুলি ফনা,

হইয়ে উদ্ভনা

উৎকর্ণ রহিহু চাহি আকাশের পানে ।

সোপানে সোপানে

নায়ে বধা পল্লভাত নুপূরের ধনি

নভ হ’তে নিয় পথে নাছিল তেমনি

চিত্তভ্রম করিয়া সুখর

দীর্ঘতর স্পষ্টতর এ কি হৃদয়র

“চোক—গেল !”

কে গো তুমি যুগে যুগে জনমে জনমে

কি সাধনা মরমে মরমে

নিভ্রাতুয়া ভাগরথে

সুযোগপানে

সাধিয়াছ কত কাল ধরি,

তাই কি সহসা আছি নেত্রপথ ভরি

দেখা দিল চিরায়তঃ সাধনার ধন

হরি প্রাণমন

দৃষ্টি তব বলদীপ্য দরশনমুখে

উদ্ভাবিয়া পলাকে পলাকে

রূপোন্মাদে চিত্ত তব তে রূপ-নিধাসী ?

অদ্বৈ সে রূপোন্মাদে বিদ্বান্-বিকাসী

স্বপ্নিতে নারি

সহসা কি চকু ছুটি পদ্মগুণ্ডে বাহি’

তীত কণ্ঠে তাই বার বার

তুলিলে চিত্তকার

“চোক—গেল !”

চিত্ত-পট হ’তে তুলি’ চিত্রপটে দিখা

হেরি রূপ অল অল—হোমানল দিখা—

কবে কোন্ কনক-বরণী

দলিত-নবনী

আপনা আভূতি দিতে তোমারি মণ্ডন

সহসা মুদিতা ছুটি রূপাঙ্ক নয়ন

এমনি কি উঠেছিল ডাকি

“চোক গেল” বলি ? শোন পাখী !

সৌন্দর্যের বস-বস সে চিরস্বন্দর

রূপের সমগ্র স্বধা অমৃতলহর

ন’য়ে যদি এ মুহূর্তে ভাসে এ নয়নে,

কি ছার অছতা ? পারি বরিতে মরণে

আনন্দের অসহ বেদনে

খণ্ড খণ্ড করি যোরে বিলহিয়া দিতে ।

ভই ভুবে গেল স্বর ! মিলার চকিতে

সে স্বভাব ! গুরে পাখী ! না মিলিতে রেখা

একবার প্রাণেশ্বরে দেখা যোরে দেখা !

জন্মসার গল্প

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

মিনতির সঙ্গে সিঙ্গেলের আলাপ অনেক দিনের। বিবাহও প্রায় ঠিক হ'য়েই ছিল। ছুটিং এমন সময় মিনতির বাশের খেয়ালে নব্বু ভেঙে পেল। আর তারপর এক সপ্তাহও পার হ'লো না, সিঙ্গেল কাদাপানি পেরুবার সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে ফেললে। 'পাসপোর্ট' নিলে, করে কোন্‌ জাহাজে যাবে তা ঠিক করলে, এমন কি 'রুক কোম্পানী'র মারকং টিকিট কেনাও তার হ'য়ে গেল।

বন্ধু-মহলে সিঙ্গেল চিরদিন খেয়ালী ব'লেই পরিচিত। তাই অকস্মৎ তার ইউরোপে পাড়ি জমাবার কারণ নিয়ে কেউ মাথা খামালে না। শুধু তার ঘন করেক বন্ধু ও বান্ধবী মিলে আয়োজন করলে তাকে যটা ক'রে বিদায় বেগুনার জন্ত একটা ছোট-বাটো রকনের জলসার। জলদা হরতো ভালো ভাবেই উঠে বেতো। কিন্তু সকলে এসে জমতে না-জমতেই বাইরে প্রকৃতির মুখে বনিয়ে এলো ছুর্বোপের কালো ছায়া। ব্যাভাস পেদা কুলোর মতো মেঘগুলোকে আকাশের দু'ড়ে' কেলতে হুক ক'রে নিলে, বড়ের তাপটায় কুটির ধারাগুলো সোজা নেমে আসতে আসতে গুপাক খেয়ে হুঁরে হুঁরে ছুটতে পড়তে লাগল। কড় কড় ক'রে ডাকল বাজ, ইম্পাতের ছুরিতে আকাশের বুক বিদীর্ণ ক'রে চম্‌কালো িবিদ্যৎ, তারপর একটা ঘন কুয়াশার আঁচলের আড়ালে ঢাকা প'ড়ে পৃথিবীর হুঁরে-কাছে সব একাকার হ'য়ে গেল।

জলদা জল না। তাই বে শুটপাতেক বন্ধু-বান্ধবী এসে প'ড়েছিলেন, তারা ধ'রে পড়'সেন সিঙ্গেলকে একটা গল্প বলবার জন্ত। বন্ধু-মহলে সিঙ্গেলের গল্প বলবার খ্যাতি ছিল। তাই অবশেষে বন্ধু-এমন গল্প বলা চাই সিঙ্গেল বে, এই আজকের দিনটে যেন

তোমার না-ফেরা পর্যন্ত আমাদের মনে থেকে যায়।

নমিতা বললে—তাই ব'লে কিন্তু করমারেসি গল্পও আমরা চাইনে।

সিঙ্গেল বললে—গল্প যদি গুন্তেই চাও তবে বলতে আমার আগ্রহি নেই। কিন্তু আজকের গল্প হ'বে আমার রূপক এবং তার ভাষা হ'বে কাব্যের। আকাশে যখন মেঘের মাসল বাততে থাকে, এবং অপরীসের পারে যখন নাচ'নার মাঝখানে তাল কেটে যায়, আর তার ফলে সৃষ্টি হয় বিগ্নাতের, তখন যারা শাধা গল্প বলতে চায়, তারা ভুল করে। কারণ, শাধা গল্পের বা' গুট এবং ভাষা, বর্বার আবহাওয়া ও আগ্রহ—কারো সঙ্গে তার এতটুকু মিল নেই। তাই তো বর্বার মিলে কাব্য লিখতে ব'লে কালিদাসকে সৃষ্টি করতে হ'য়েছিল মন্ডাকাত্য হনু—বার গর্জন মেঘের মতো এবং চলন লম্বেলের ঢেউয়ের মতো। তোমরা যদি রাঙি থাক তো বলো, আমি আরস্ত করি।

বন্ধু এবং বান্ধবীরা সমস্তের চীৎকার ক'রে উঠে' বললে—বেশ—বেশ তাই করো। তোমার রূপকের রূপটাই আজকের এই ছুর্বোপের রজনীতে না হয় আমাদের চোখের সামনে ফুটে' উঠুক।

সিঙ্গেল হুক করলে—

অপরীর মেয়ে—তাই সারা সেহে অড়িয়ে ছিল তার ষোৎসার মৃত্যু রূপের দীপ্তি। তার চলাফ, তার বশায়, তার হাপিত, তার ইমিততে এই আলোর দীপ্তি ক'রে পড়'ত। কিন্তু রূপের চেয়েও হৃদয় ছিল

তার কথা। সে এখন কথা বলত, মনে হ'তো—
বীণাস্যামির হাতের বীণাটাই বৃষ্টি কে বাশিরে চ'লেছে।
তপেও-সে হৃদয়, কথাও তার অপভ্রংশ, তাই সবাই
‘মিসেস’ নাম দিলে তার ‘রূপকথা’।

আকাশের কোলে বসে হাঁকে, বিজলী চম্কার।
বাতাসের পায়ে সেখানে বাজে কড়ের নুপুর।

মর্ত্যের কথা নানা ভাঙ্গ-পাঙ্গবে ছড়িয়ে কৌতুক
জাপালে এই রূপকথার মনে। তার ইচ্ছা হ'লো,



..... আজকের গল্প হ'বে আমার রূপক

স্বর্ণেও মর্ত্যের মানুষকে নিয়ে আলোচনা চলে।
বেবতারা বলছেন—মর্ত্যলোকের মানুষেরে মারা বড়
বেশী। তারা ভালোবাসার কীসে ভড়িয়ে পড়ে, আর
যেরিমে আশ্রুত পারে না, আর তারই ফলে তারা
হুখ পায়। তাদের ভিতরে সেবতার মতো বড়
মনও আছে, আবার দৈত্যের মতো বিস্ত্রী ধারণা
লোকেরও অভাব নেই। মর্ত্যে আলোর পরেই আসে
নিকম-কালো অন্ধকার, সে অন্ধকারে কেউ কাউকে
জিন্তে পারে না। কিন্তু তাদের বুদ্ধি খুব প্রখর। তাই
আগুন থেকে আলো বা'র ক'রে নিয়ে তারা তাদের
অন্ধকারের হুখ হুয় করতে চায়। সেবে সেখানে

একদিন মর্ত্যালোক বেড়িয়ে আসে। দেবতাদের ইচ্ছা
মানেই তা' পূর্ণ করা। তাই হাওয়ার ভর ক'রে
আকাশের দরিয়র পাড়ি অমাবার মত সে তার
পাখা মেলে দিলে।

সখীরা ভেবে জিজ্ঞাসা করলে—কোথার চ'লেছ ?
সে বললে—মর্ত্যালোকে।

বিব্রিত হ'য়ে তারা বললে—মর্ত্যালোকে! কিন্তু
সেখানে যে মায়ার কীম পাভা আছে। কাউকে
যদি ভালোবেসে ফেলো, তবে 'তো আর স্বর্ণে ফিরে'
আশ্রুত পান্ধবে না।

সে বললে—ভালো হয়তো বাস্কা না, কিন্তু যদি

বেসেই কেনি হারিয়ে-বাওয়া এই লবীটির কথা তোমরা। মাঝে মাঝে মনে ক'রো। আর যদি তাও বেশী নয় ১৮, মতো গিরে না-হয় এক আধ দিন আমার খোঁজ নিয়ে এসো।

তারা বললে—কিছু খুঁজে' গেলেও তো কিরিয়ে আনতে পারব না। মর্তের মায়া-আলে বাধা পড়লে কেহবার কেবল একটি মাত্র পথই আছে—বার ভালোবাসার পড়া বার সেই বনি কখনো বিরক্ত হ'য়ে বলে—তুমি যাও। কিছু লোভী মর্তের মাহুত অশ্রুতীকে একবার হাতে পেলে কখনো কি বলতে পারবে—যাও, তোমাকে আর চাই নে!

কিছু লবীদের মানা মেরেটির মনে পৌঁছানো না। আকাশের একটা খ'সে-পড়া তারার মতো বাতাসের পাখারের ভিতরে তার দেহটাকে সে এগিরে নিলে।

পাহাড়ের কোল খেঁলে করণার জল ক'রে চলেছে।

তার চলার গতিতে বাজছে নুপূরের ধ্বনির মতো মিঠে হুরের আলাপ। তাঁরে বন—পাতার কঁাকে কঁাকে তার ফুটে' আছে অল্প কুল—কোনোটার রং আকাশের নীলের মতো নীল, কোনোটা। বা আবার একেবারে টাটকা রক্তের ধারার মতো লাল। বাসের রূপ নেই, গন্ধের আমেলে তারা ভ'রে ফুলেছে বনের কুকের বাতাসটাকে। পাহাড়ের কুক আছড়ে-পড়া স্বর্ণার আলোর বিপ্লবগিতে ভোবের সূর্যোর আলো রামধনুকের রং-এর কুনি বুলিয়ে দিয়েছে।

হারপাটা সেখে স্বর্ণের সেরের মনও বুড় হ'য়ে গেল। ধীরে ধীরে পিঠের উপর-থেকে জানা হু'খানা খুলে' রেখে, একখানা পাখরের উপরে ব'সে তাকিয়ে তাকিয়ে সে দেখতে লাগল মর্ত্যলোকের এই অপরাধ সৌন্দর্য।

কতকাল যে সে এই ভাবে ব'সে ছিল তার ঠিক নেই, হঠাৎ পিঠের উপরে একটা নূর স্পর্শ পেয়ে

রূপকথা চমকে উঠে' পিছনের দিকে কিরে' তাকাতেই ছ'টো বড় বড় চোখের সঙ্গে তার চোখ' নিলে' গেল। অত হুন্সর চোখ' দেবতাদের ভিতরেও কখনো তার চোখে পড়ে নি। দীর্ঘ শুষ্ক একখানি সেহের প্রান্ত ঘিরে' খর বৌত্তের দীপ্তির মতো একটা দীপ্তি। আর সেই দীপ্তিকে মিত্রতাপ ও কোমলতার ভ'রে ভুলে' জেগে আছে ছ'টি চোখ' যেন ছুটি অপরাধ নীল পত্র।

রূপকথা মুগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি কে? এ চোখ' তুমি কোথার পেলে?—কোথার পেলে তার এই দীপ্তি, আর সে দীপ্তির এই কোমলতা?

আশঙ্ক উত্তর দিলে—আমি মর্ত্যলোকের রাজ-পুত্র। মর্তের হাঝরো ঘের আমার চোখে প'ড়েছে, কিছু কটিকে ভালোবাসি নি। হঠাৎ তোমার উপরে চোখ' পড়তেই কুক জেগেছে আমার ভালোবাসার আলো, আর সেই আলোই ক'রে পড়ছে আমার চোখের ভিতর দিয়ে। এ আলো তো আমার নয়—এ আলো আমার ভালোবাসার। তুমি আমার ঘরে চলে।

রাজপুত্রের কথা শুনে'ই স্বর্ণের মেয়ের কুটা গুলে' উঠল, সে ঘোলা সন্দের কুক তরঙ্গের আঘাতে যে ঘোলা জাগে, তারই মতো। মনের দিকে তাকিয়েই সে বুতে পাড়লে এই গোলায় ভরা কুখানা তার একটা আশ্রয় চাইছে। ভরে ভয়ে সে রাজপুত্রের হৃদয়ের দিকে চাইলে। তারপর আছে একটা সোখাতির নিঃশব্দ কেলো কুখানা তার বেমে এলো হুবারাজের দৃঢ় প্রবৃত্তি হুগঠিত কুকের উপরে।

স্বর্ণের মেয়ে বললে—মর্তের রাজপুত্র, ঘরে তো আমাকে নিয়ে যেতে চাইছ, কিন্তু সেখানে কি আমাকে ধ'রে রাখতে পারবে?

রাজপুত্র বললেন—কেন পারব না? কোথার আমার দীনতা আছে ব'লে তোমার মনে হয়?

রূপকথা বললে—আমরা স্বর্ণের মেয়ে, অবদেলার



তুমি কে ? এ চোখ, তুমি কোথায় গেলে ?...

আশাত সহিতে পারি নে। কিন্তু তোমরা মর্ত্যের লোক। শুনেছি—তোমাদের মোহ হুঁপুতই মিলিয়ে যায়। হয়তো একদিন আমার উপর থেকেও তোমার মোহ মিলিয়ে যাবে। সেদিন কি ক'রে আমাকে ধরে রাখবে ?

রামপুর বঙ্গলেন — মর্ত্যের মানুষকে না-হয় একবার পরীক্ষা ক'রেই দেখো। যা শোনো যায় তার সব কথা সভ্য হয় না। একথা তোমরা যদি না মানো, আমরা যারা মর্ত্যের লোক তাদের বেশ ভালো ক'রেই জানা আছে।

দিন আসে দিন চলে যায়। মর্ত্যপুরের রামপুর আর স্বর্গলোকের রূপকথা—চ'লনার মিলে পৃথিবীকে স্বর্ণ ক'রে তোলে। রামপুর রাম-কাছে যান, রূপকথা তাঁকে বাধ্য দেয় না। সে তখন ব'লে ব'লে ছবি আঁকে।—কত রকমের ছবি, অপবীদের নাচের ছবি, স্বর্গের দেবতাদের মুখের ছবি, যে কুল ইন্দ্রধনুর রংকণ্ড হার মানায় সেই পারিজাত ফুলের ছবি।

কাম শেষ ক'রে রামপুর ফিরে' আসেন—গরু ও পানে, হাফিত ও কৌতুক তাঁদের আসরে আবার ভিন্ন রকমের স্বর ভ'সে ওঠে। রামপুর দেখেন কবিতা, তাঁর কাছে ব'লে রূপকথা বাজায় বাঁশী। বাঁশীর সেই স্বরে রামপুরের মন নিজের ছন্দের কথা ভুলে' যায়। রূপকথার সেই স্বরটাকেই তিনি তখন হৃদয়ের তির্যক ধ্বজে ঠোঁট করেন। এমনি ক'রে রূপকথা ভুলে' পেল তার স্বর্গের স্মৃতি। মর্ত্যের মানুষের সম্পর্কে এসে সে একেবারে মর্ত্যের ঘেরে হ'য়ে পড়ল।

কিন্তু রূপকথা ভুলেও তার স্বর্গের সন্ধান-তার কথা ভুলতে পারলে না। মিষ্টি কথা শুনেই রূপকথার কথা তাদের মনে পড়ে, মিষ্টি স্বর শুনে

কানে বাজলেই তাদের মন আনন্দান ক'রে ওঠে রূপকথার ক্ষত। একদিন হুঁশিন ক'রে অনেকগুলি দিন কালের স্রোতে মিলিয়ে গেল। ক্রমে তার ফিরে' আসা সম্বন্ধে তারা হতাশ হ'য়ে পড়ল এবং সে যে মর্ত্যের মানবের প্রেমে গ'ড়েছে সে সম্বন্ধে কারো আর কোনো সন্দেহ রইল না।

এইবার তাদের সভা বঙ্গল কি ক'রে সমীচেষ্টা ফিরিয়ে আনা যায় তারি পরামর্শের ক্ষত। একজন বঙ্গলে—স্বপ্নের ঐশ্বর্যমালিককে জেঁক পাঠাও, সে দাব্ তার কাছে। ঘুমের ভিতর দিয়ে লিখে' রেখে আশ্রুক সে রূপকথার মনে এমন মূগুর ক'রে স্বর্গের ছবি যে, ঘুম ভাঙলেই স্বর্গে ফিরে' আসার ক্ষত তার মন ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে।

স্বপ্নের বাহুরককে ডাক হ'লো। রূপকথার কাছে বেয়ে লিখেও এলো সে তার মনের পাতার স্বর্গের ছবি। রূপকথার দ্বন্দ্বও ব্যাকুল হ'য়ে উঠল স্বর্গের ক্ষত। কিন্তু ঘুম ভাঙতেই সে দেখে—মোহন্যাস আর লোকের তার পাশেই রামপুরের মুখখানা বেন পশ্চের মতো হ'য়ে ফুটে' ব'য়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তার স্বপ্নও স্বপ্নের মাঝেই মিলিয়ে গেল।

এ উপায় বার্থ হ'তে দেখে আবার বঙ্গল সমীচেষ্টার সভা। এবার একজন বঙ্গলে—আকাশের গা থেকে খানিকটা নীল মেঘের কাগজ ভুলে' নাও, তারপর বিদ্যাতের আলো দিয়ে সেই কাগজের উপরে তার কাছে লিখে' পাঠাও চিঠি। সে চিঠির ভাষা হ'বে বৃষ্টির ধারার মতো করুণ। তাতে লেখা থাকবে—আমরা তোমার বিরহ আর সহ করতে পারছি নে। তুমি শীগ'সির ফিরে' এসো আমাদের কাছে।

চিঠি লেখা হ'লো। কালো মেঘের উপরে বিদ্যাতের হরণে লেখা সে চিঠি একদিন ম'লেও উঠল রূপকথার চোখের সামনে। সমীচেষ্টার ফুকের বাধা বৃষ্টি-ধারার ভিতর দিয়ে মল হ'য়ে ক'রেও পড়ল

করণ্য মতো। কিন্তু তখন রাজপুরে শুনাছিলেন
রূপকথাকে তাঁর কবিতা। তার হৃদে যেসব মতোই
গাছ, বিদ্যাতের মতোই জালাসর, অস্তর মতোই করণ।
সুতরাং তাঁর কবিতার হৃদে এবং সর্বাঙ্গের পথেই হৃদে
একসঙ্গে মিলে একাকার হ'য়ে গেল। রূপকথা
ভাবলে—রাজপুরের কবিতাই বৃষ্টি বিদ্যাতের লেখা

রাজপুরে রাজ-কাছে দেখেন। রূপকথা ব'লে তাঁর
উজ্জীরের পারে পরাঙ্কিল সোনা ও রূপার তারে
কাছে করা জরির আঁচলা। সর্বাঙ্গ এমনি সময়ে
এসে দাঁড়ালো তার সামনে। হঠাৎ মর্ত্যের মাঝে
সর্বাঙ্গের আবির্ভাব দেখে বুক তার আনন্দে ফুলে
উঠল, সেহ তার গভীর গুলকে কদম ফুলের বেশের



রূপকথা ব'লে রাজপুরের উজ্জীরের পারে পরাঙ্কিল জরির আঁচলা

হ'য়ে জেগে উঠেছে আকাশের মেঘে, বৃষ্টি-ধারা হ'য়ে
ক'রে পড়ছে ধরণীর বুকে। সুতরাং সর্বাঙ্গের এ চেষ্টাও
সফল হ'লো না।

আবার স্বর্গে সভা বসল রূপকথার সর্বাঙ্গের। এবার
তারা ঠিক করলে—তারা যিরোয়ারে যাবে সর্বাঙ্গের
রাজ্যের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে আনবার দল।

মতো শিউরে উঠল। রূপকথা তাদের মহাসমাদরে
বসিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা কর্তে লাগল
স্বর্গের সমস্ত কথা। কে কেমন আছে, করা মন্দারের
উপরে ব'লে এখনো তাদের জইলা চলে কি না,
হ'র-গভীরে উজ্জীরের নৃত্যে নতুন কি কি ধাঁচ
এসেছে হ'য়েছে—এমনি ধরনের সব প্রশ্ন।

একটি একটি ক'রে সব খবর তার কাছে পরিবেশন ক'রে তারা বললে — কিন্তু স্বর্ণের সব চেয়ে বড় খবর কি জানিন্? তোর বিরহে অকালে পারিষ্রাতের হল ক'রে পড়তে শুরু ক'রেছে। অতএব মর্ত্যের মায়া কাটরে কিরে' চল তুই আবার আমাদের মাক্ষণে।

রূপকথা বললে — কিন্তু রাজপুত্রকে কেনে' তো আমি বেতে পাব না। ও তাহ'লে তো বাচবে না।

সবীষের একজন বললে — না বাচুক তাতে তোর কি? কত তারার আলো অকস্মাৎ নিবে' যায়, পারিষ্রাতে কত কুড়ি ঘোড়ার আগেই ক'রে পড়ে। তাতে কি স্বর্ণে কাগো গোষে কেউ কখনো অত্র দেখেছে? রাজকুমার না বাচে তো না বাচুক। তুই আমাদের ভিতরে কিরে' চল।

জন-ভরা কালো হুঁটো গোষে তুলে' রূপকথা বললে — সবী, তোর কিরে' বা। মাহুয়ের ভালোবাসার স্বর্ণের সেব-কস্তারাত যদি একবার আপনাকে হারিয়ে ফেলে, স্বর্ণের উপরেও তাদের আর কোনো রকমের মোহ থাকে না।

রূপকথার অপসরী-সবীরা ব্যর্থকান হ'রে কিরে' সেল। মর্ত্যের মায়ায় পণ্ডির ভিতর থেকে তারা তাকে বাইরের মুক্তাক্ষণে টেনে আনতে পারলে না।

সেবতাসের রাধা ইন্দ্র ব'লে আহেন তাঁর নিহাঙ্গনের উপরে। মাথার উপরে মল্লছে ঘোয়া-লোকের চস্ত্রাতিপ। পারিষ্রাতের বন থেকে পড় এসে তাঁকে হাওয়া করছে স্বহা পবন। তারার মণিহার চলছে তাঁর গলায়। নিশ্চিত মনে তিনি উপভোগ করছিলেন বিজ্ঞানের আনন্দ। এমনি সময় রূপকথার সবীরা এসে প্রণাম ক'রে তাঁর সামনে গাডালো।

তারা বললে — সেবরাজ, মর্ত্যের মানব সেবতাসের শকার কারণ হ'রে ধাক্কিত্তেছে।

ইন্দ্রের হাখার চোখ দিয়ে বিশ্বর ট্রিকুরে গুজুতে

লাগল। তিনি বললেন — সে কি কথা! মাহুয কি ক'রে সেবতাসের শকার কারণ হ'বে? তারা তো চিরনিরীহ — চিরদুর্ভাগ। তারা তো সেবতাসেরই পুত্র। করে।

সবীরা বললে — এই মাহুয়ের ভালোবাসায় পড়তে শুরু ক'রেছেন স্বর্ণের সেবকস্তারা। সুতরাং স্বর্ণ ছেড়ে আশ্রয় নিচ্ছেন তাঁরা মর্ত্যালোকে। এ ব্যাপার যদি এই রকম ভাবে চলতে থাকে, স্বর্ণ নারী-শূত্র হওয়াও অসম্ভব নয়।

—কিন্তু এরকমের কোনো কথা তো আমি শুনি নি।

—তবু একখার ভিতরে এতটুকু অত্যাক্তি নেই, সেবরাজ। আপনি রূপকথাকে জানেন। স্বর্ণে তার চেয়ে রূপসী হুঁ-চা'রজন থাকলেও, কথার তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর একজনও নেই। মর্ত্যালোকে বেড়াতে যেতে এই রূপকথাই পড়ছে মর্ত্য-পুরের রাজপুত্রের ভালোবাসায়। সুতরাং মর্ত্যেই সে তার ডেরা বেঁধে ফেলেছে, স্বর্ণে তার আর কিরে' আসা হয় নি।

—তোমরা তাকে কিরিয়ে আনবার চেষ্টা করো নি কেন?

—ক'রেছিলুম, কিন্তু আমাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়েছে। মাহুয়ের প্রেমে যদি কোনো সেব-কস্তা পড়ে, তবে মাহুয বতকল বেছায় তাকে মুক্তি না দেয়, ততকল তো তার মুক্তি নেই।

ইন্দ্র হেসে বললেন — মাহুয়ের ইচ্ছা! কতটুকুই বা তার মোহ, আর কি-ই বা তার দাম! সঙ্গে সঙ্গেই একটা সেবপুত্রকে জেলে তিনি বললেন — এই মুহুর্তে তুমি মর্ত্যালোকে গমন করো। সেখানে মর্ত্যালোকের রাজপুত্রকে তুমি বিভ্রাঙ্গা করবে— রূপকথার বিনিময়ে কি সে চায়। সুবেয়ের ভাণ্ডারের মতো অক্ষুরত ঐশ্বর্য, সেবতাসের যৌবনের মতো অজান যৌবন, নদীর ধারার মতো ভোগের অক্ষয় উপাদান — বা' সে চায় তাই দিয়ে

হর্গের মেয়ে রূপকথাকে 'আবার এই হর্গের ভিতর কিরিয়ে নিরে এসো।

সেবৃত্ত মর্ত্যে এসে রাজপুত্রের সঙ্গে দেখা ক'রে বললেন—সেবরাজ তোমার প্রতি প্রণাম চ'য়েছেন, তুমি বর পাট্টা করে।

রাজপুত্র বললেন—সেবরাজের প্রণামতা আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু অকস্মাৎ এ অশুভের কারণ কি ?

সেবৃত্ত বললেন—হর্গের মেরেকে তুমি তোমার ঘরে বসী ক'রে রেখেছ, তাকে যুক্তি দাও। সুখ-স্বাস্থ্য, জীবন-মোহন, ধন-সম্পদ বা' তুমি চাইবে, বেবতার বরে কোনো জিনিষেরই তোমার অভাব থাকবে না।

রাজপুত্র চলে বললেন—আপনার রাজাকে বললেন—রূপকথার কাছে হর্গের রাজার সিংগাসনও মর্ত্যের রাজপুত্র ফুঁছে ব'লে মনে করে।

উত্তর শুনে সেবৃত্ত হতশ হ'য়ে কিরে' গেলেন।

মর্ত্যের রাজপুত্রের জবাব ইত্যাকে জানানো হ'লো। কোম্পে তাঁর হাজারটা চোখ বেন আঙনের শিবার মতো জ্বলতে লাগল। আর সেই কোম্পের হোয়ার চ লাগতেই হাতের রক্তটাও তাঁর ক্ষুর পর্জনে ছড়ার ক'রে উঠল। কিন্তু কোম্প সতরণ ক'রে তিনি নিজে চললেন এবার রূপকথাকে উদ্ধারের সমস্ত নিরে মর্ত্যলোকের রাজপুত্রের কাছে।

ইহু বললেন—রাজপুত্র, রূপকথা আমার হর্গের অলঙ্কার। তুমি তাকে আমার কাছে কিরিয়ে দাও, বিনিময়ে তুমি যা' চাইবে আমি তাই তোমাকে দান করব।

রাজপুত্র বললেন—সেবরাজ, হর্গ আপনাবার অকুরত ঈশ্বরের ভাঙার। একটি তারা যদি দেখান থেকে

ব'লে পড়ে, অভিজিতি তাতে বিশেষ কিছুই তার হ'বে না। কিন্তু আমার মাটি-মার দূকে খুব বেশি অলঙ্কার নেই। পথ কুলে' হর্গের একটা ঘোড়ামি এখানে ব'লে পড়েই থাকে, আমার এত সম্মান নেই যে, আমি তাকে আবার দেয়ায় গরিয়ে কেলব।

ইহু বললেন—আমার অশুভেরতা গনিয়ার দল-মত্রে স্থানরীকে পুঁথো' এনে তোমাকে দান করবে।—তাকে বিবাহ ক'রে তুমি সুখী হ'য়ো। রূপকথাকে তুমি পরিচাল্য করো।

রাজপুত্র বললেন—সেবরাজ, আপনাবার হর্গে গ্রেম ক্ষমিকের খোয়াল মাত্র। কিন্তু আমার এই মাটির পৃথিবীতে ভালোবাসা জীবনের চেয়েও বড় জিনিষ। ক্ষণে ক্ষণে আপনাদের সঙ্গিনী বনলায়, কিন্তু আমরা থাকে একবার সঙ্গিনী রূপে বরণ ক'রে নিই, সেই হ'রে শুভে আমাদের সাতা জীবনের সানী। হুত্তরাঃ আমাকে কমা করুন। তবে যদি রূপকথা আমাকে চ্যাপ ক'রে যেজ্ঞায় আপনাবার সঙ্গে বেতে চায়, আমি তাকেও বাধা দান করব না। কারণ, থাকে ভালো-বাসা হার তার উপরে ছোর চলে না। আর সেই ক্ষতই, তাকে যদি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে হয়, আমার অশুভের চাইতে আপনি বরং তারই মত জিজ্ঞাসা করুন।

রাজপুত্রের কথায় ইহুর মন খুলী হ'য়ে উঠল। হাজার চোখ কুলে' তিনি তাকালেন রূপকথার দিকে। হর্গের সুখের সোয়ান যে একবার শেষেছে, মর্ত্যের মাটির উপরে যে তার কোনো মোহ থাকতে পারে, এ ধারণাও আসে নি কখনো তাঁর মনে : তাই তিনি বললেন—রূপকথা, তোমার বিরহ হর্গের বুকেও বেদনার গঠি ক'রেছে, হর্গের রাজাকেও তা' টেনে এনেছে মর্ত্যলোকে। হুত্তরাঃ তুমি আর দেবী ক'রো না, দেখানে তোমার সত্যিকারের স্থান, সেই সেবতারের ভিতরে কিরে' চলো।

একই স্থান হেসে রূপকথা বললেন—সেবরাজ, আমাকে মার্জনা করুন।

বিদ্যে ইন্ডের মন ভ'রে উঠল। শুধুকে তিনি বললেন—‘তুমি স্বর্গে ফিরে’ বেতে অসীকার করছ, রূপকথা? স্বর্গের সুখ, স্বর্গের আনন্দ—তার কি কোনো দামই নেই তোমার কাছে?

— দাম আছে মহাত্মা, দাম আছে। স্বর্গের সুখের স্পন্দন এখনো আমার শিরার মাঝে ফিলোসফি হ'য়ে ওঠে, বিগত দিনের আনন্দের আবেশ এখনো মোহ জাগায় আমার মনে। তবু এই মর্ত্যালোক ছেড়ে আমার দাবার উপায় নেই।

ভিজাহু চোখুজলো তুলে ইঞ্জি আবার তার সুখের উপরে দৃষ্টি রাখলেন। রূপকথা বললে — স্বর্গের সুখ অম্ল, তা' তোপ করবার উপায়েরও অস্ত নেই। বস তোপ করা যায়, প্রাতিও কখনো আসে না। স্বর্গের তুলনায় মর্ত্যের সুখ অত্যন্ত পরিসীমিত। ইঞ্জি-খবুর মতো হাজারো বর্ষের বিলাস তার ভিতর খুঁজে পাওয়া যায় না। জোণের ভিতর দিয়ে প্রাতিও অতি সহজে এসে পড়ে। তবু আমার দাবার উপায় নেই।

— তবু তোমার দাবার উপায় নেই?

— না বেবরাম, তবু আমার দাবার উপায় নেই।

কারণ, আমার নিজের সুখের চেয়ে আমার কাছে আশ্রয় চের বড় হ'য়ে উঠেছে আমার দাবার সুখ—রাখপুত্রের সুখ। আমি গেলে জীবন তাঁর ভ'রে উঠবে সুখের কামো মেখে। কোথাও তার এতটুকু আনন্দ থাকবে না। আসো হ'য়ে উঠবে তাঁর কাছে বৃত্তার মতো কামো। তাঁর সে বাধা আমি কি ক'রে সহ করব?

— তুমি যা' বলছ সে তো বাস্তবের কথা, রূপকথা—বেবরামের কথা নয়। আশঙ্কি আর মোহ নেই ব'লেই তো বেবরামা বেবরাম। এ আশঙ্কি—এ মোহ কি ক'রে জাগল তোমার কুখ, এত বড় অধঃপতন কি ক'রে সম্ভব হ'লো তোমার মনের?

হেসে রূপকথা উত্তর দিলে — আপনায় বর্ষ শেখার বেবরাম, কেবল নিজেকেই ভালোবাসার কোঁদল। কিন্তু মর্ত্য শেখার পরের ভালোবাসার ভিতরে আপনাকে

বিলিয়ে দেওয়ার বিশ্বাস। তাই তো বাধা তার নিজস্ব। বাধা যে সুখের চেয়ে সুখের হৃৎ, মর্ত্যের মাটি আমাকে সে কথা শিখিয়ে দিয়েছে। বেবরাম, আপনি ফিরে' যান।

রোমে অপমানের ইন্ডের হাজারটা চোখ জ'লে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাতের বস্ত্রও জাগল অসহিষ্ণুতার পর্জ্বন। বস্ত্রের পর্জ্বনের মতোই গভীর করে তিনি বললেন — স্বর্গের রাজা তাঁর বিজ্ঞানী প্রজাকে কখনো কমা করেন না। রূপকথা, তুমি তোমার অপরাধের দণ্ড গ্রহণ করো।

তারপর তিনি তাঁর সন্দের অশুভরকে ডেকে বললেন — লাভ সমুদ্র ডের নদীর পারে, তেপাহরের মার্ভের পেয়ে, পাভাল-পূরীর ভিতর মরণদানব যে অন্ধকারের প্রোঙ্গন হ'য়ে তুলেছে, সেইখানে নির্কাসিত ক'রে এসো এই রূপকথাকে। রূপ আর বোধান ওর সেহের ডট জাগিয়ে এমনি ভাবেই কেঁপে রইবে — কেবল সে সেহের ভিতর থাকবে না প্রাণ। রূপোর মরণ-কাটি ছুঁইয়ে তুমি ওকে সেইখানেই বৃত্তার দোলায় চলিয়ে রেখে আসবে—অব তার পাশে সোনার একখানা জীবন-কাটিও রেখে এসো। একদিন ও স্বর্গের আনন্দ ছিল, সেই কথা মনে ক'রেই ওর মুক্তির পথ আমি চিন্মিনের ভ্রম রুদ্ধ ক'রে দিতে চাই নে। এই রাজপুত্র—যে ওকে স্বর্গ-ভ্রম ক'রেছে সে যদি কখনো সেই পাভালপূরীর সন্ধান পায়, আর ঐ সোনার কাটিও ওর সেহে ছুঁইয়ে দিতে পারে, তবেই ও ফিরে' পাবে ওর প্রাণ। যে মাহুনের প্রেমে ও স্বর্গ তুলেছে, সেই মাহুনের দিক দিয়ে এবার তার প্রেমের দুচ্চার পরীক্ষা হোক।

ব'লেই ইঞ্জি অসুস্থ হ'য়ে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে রূপকথার সেহটাও বাতাসের ভিতরে মিলিয়ে গেল।

বজ্রাতের মতো রাজপুত্র সেই নির্জন দরের ভিতর বহুদল গুহ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর

যখন তাঁর চেতনা ফিরে এসে, একটা বাপভর্য শীর্ষনিঃশ্বাস ফেলে তিনি নিজের মনেই বললেন— স্বর্গের রাজা, তোমার শাস্তি কঠোর, সে শাস্তির ভিত্তর শক্তির পরিচয় আছে, কিন্তু তারের নির্দেশ নেই। তবু তোমার দণ্ডই আমি মাথা পেতে গ্রহণ করুণ। কারণ, তোমার অজ্ঞাতসারেই তুমি মানুষকে দিয়ে গেল অমর হ'বার পথের সন্ধান। তোমরা দেবতারা সুখ পান ক'রে বৃহাকে নয় ক'রেছ, মানুষ অমরতা লাভ ক'বে চাঁদের বিধ নিঃশ্বাসে পান ক'রে। দেবতার চেয়ে বড় হ'বে মানুষের সৌরব।

রাতের অন্ধ, ভোগের আনন্দ, বিলাসের স্পৃহা সমস্তই শিহনে প'ড়ে রইল। সেই বৃহতেই রাজপুর তাঁর নিকম্বিত প্রিয়ার সন্ধান পথের প্রান্তে নেমে পড়লেন।

সিঁড়ির কঠোর এককল চম্ভিল তাঁর স্রোতের মতো কতকটা একটানা ভাবে। গলটা শেষ হ'য়ে আসতেই তার খরটাও একেবারে খালে নেমে গেল। কিন্তু সে শুধু হ'ল এক বৃহতের ক্ষত। তার পরেই নেত্রিয়ে-পড়া মনকে একটা কঁকুনি দিয়ে সচেতন ক'রে তুলে সে আবার বললে—

স্বাত সমুদ্র তের নদীর পারে, তেপান্তরের মাঠের শেষে, কোথায় কোন্ পাতাল-পুত্রী অন্ধকারে ইন্দ্রদেবের অমৃতরূপকথাকে বন্দী ক'রে রেখেছেন, মর্তী-মেঘের রাজপুরে আশো তার সন্ধান পান নি। তাঁর বোড়া তাই ছুটে চ'লেছে ঝড়ো বাজারের ভিতর দিয়ে, বন-পথের মাঝখানে দিয়ে, পাখাড় ডিঙিয়ে, মকতুমি পেরিয়ে। দিনের বর্ষা তাঁর মাথার উপরে অধি ছালে, রাতের অন্ধকার এসে পথ রোধ ক'রে ঝড়ার তাঁর সামনে। তবু তাঁর শ্রান্তি নেই, চলার তাঁর বিরাম নেই। কে জানে এতলা কখনো তাঁর শেষ হ'বে কি না!

অকস্মাৎ একটা গম্ভীরা হাওয়া লাগলে নীপশিখা প্রথমে বেহন পথ পথ ক'রে কৈশে ভুটে, তার পরেই নিবে' যায়, সিঁড়ির কঠোরও তেমনি একবার কৈশে উঠে' পর বৃহতেই থেমে গেল। কিন্তু কঠোর খামলেও তার গুরুর রেণ বেন ঘরের ভিতরে হাওয়ার বুক ছুর' ছুর' ফিঙতে লাগল। মনের তারের উপরে তার স্পর্শ বেন ছড়' টেনে টেনে খেলির বেড়াতে ছক ক'রে বিলে।……

সে গুরুর সমস্ত ঘরের ভিতর চারিদে গেল একটা বৃহতের ভাব—একটা গুরুর আবেশ। এই গুরুর গোর বন কাটল তখন মেঘের মসী-চিহ্ন মিলিয়ে গেছে। ভরষের পর তরল তুলে' সোঁতখার ছাত-খারা লুটিয়ে পড়ছে আকাশের নীলের উপরে, মলে-তেলা ধরিত্রীর বৃকের উপরে। সেই সোঁতখার দিকে বিজল চোখে তাকিয়ে বরুণা বললে—আকাশের কোণে ইন্দ্রের বেরোব-বহি মেলে গুটে, সে তো হ'লওই মিলিয়ে যায়। রূপকথার উপরে ইন্দ্রের যে রোষ তাও কি অবনি ক'রে মিলিয়ে যেতে পারে না, সিঁড়িবাবু।

পরের বললে—খাঁকার করছি সিঁড়ি, তোমার শক্তি আছে। নইলে এত বড় একটা পুরানো পড়া গল্প নিয়ে, আর কেউ এতগুলো শোককে এমন ভাবে এককল ময়দুদ ক'রে রাখতে পারত না। আশ যে তোমার গল্প শুনেছে, সেই বৃহতে পায়বে—ভাষাটা গুরুর কত বড় জিনিষ। এই ভাষার ইজ্জতাল দিয়ে ভিখারীর ঘেরেকও রাজস্বাণী লামানো অসম্ভব নয়।

অনিলা বললে—তা' নয় পরশ বাবু, তা' নয়। আপনায় আমায় মধ্যে যে চিরজন্মের রূপকথা ও রাজপুর লুকিয়ে আছে, সিঁড়িবাবু তাঁর গুরুর ভিতর দিয়ে রূপ দিয়েছেন সেই রাজপুর ও রূপকথাকেই। তাই তো তাদের কথা আশরা। কুলতে পারছি নে, তাদের মোহ হুড়িয়ে গেছে আমাদের রক্তের সঙ্গে একেবারে আমাদের মনের মাঝখানে।

সিঁড়ির পর নিয়ে এর পর তার বন্ধ-বান্ধবীদের ভিতর রীতিমত ভর্কের আল বোনা আরম্ভ হ'য়ে গেল।

কিন্তু সিন্ধেপ আর একটি কথাও বলল না। তার মুখের উপরে ছুটে উঠল শুধু রহস্যময় একটা হাসির দীপ্তি। আন্তে আন্তে খোলা দরজার ভিতর দিয়ে সে এসে বাইরে গাড়ালো। লম্বা একাঙা বারান্দা—বাড়ীটার এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চ'লে গেছে। সেখানে খামের আড়ালে অন্ধকারের ভিতর ছায়ার সঙ্গে মিশে গাড়িয়ে ছিল একটি নারী-মূর্তি। এগিয়ে এসে একেবারে তার মুকের কাছে বেসে গাড়িয়ে সিন্ধেপ ডাকলে—মিনতি!

অগ্নের মাকশানে হঠাৎ কেউ এসে থাকা দিলে মাছুষ যেমন হাঁৎ ক'রে ভেসে ওঠে, তেমনি ভাবে চমকে উঠে মিনতি চাইলে সিন্ধেপের মুখের দিকে। তারপর

তার মুকের উপরে আপনাকে এগিয়ে দিয়ে সে বললে—
আমি জানি সিন্ধেপ, তাই নিঃশব্দে তোমাকে বদলি—অপকথাও তোমার হৃদয়গুহের দরজা খোলার শেখনি পর্যন্ত প্রতীক্ষা করবে। কিন্তু তার বত ভীষণই হোক না কেন, স্বর্গের দেবতা তাকে বত বড় প্রলোভনই দেখান না কেন, সে কখনো তার প্রেমের স্বপ্ন হ'তে ভ্রষ্ট হ'বে না।

তার কণ্ঠস্বর অক্ষর ভায়ে ভিক্ষে' তারি হ'য়ে যেমে দেল।

অন্ধ-ভেড়া তার সেই চোখের পাতার উপরে উক বেশবান ঠোঁটের স্পর্শ বুদিয়ে দিয়ে সিন্ধেপ বললে—জানি, মিনতি, সেকথা আমিও জানি।

প্রিয়!

শ্রীদেবপ্রসন্ন সুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল

যে দিন তোমারে ভাল বাসিয়াছি প্রথম দুইপাতে,
সেই দিনই তব হৃদয় মিনেছে নিবিদ্য স্রষ্টা লাগে।
চেয়ে রই হবে শ্রাম প্রাপ্তরে অকল পড়ে মনে,
হৃদিনা মলয় ভগ্ন-পরিমল আনে ফুলবাস সনে।
পল্লবলাগে মনে প'ড়ে বায় আরত সে দ্বিষ্ট আঁখি,
ইশু আনন স্মরি অনিনেয়ে টানপানে চেয়ে থাকি।
সোলাপ দলের অকল মাধুরী হরায় বিদ্যাবর,
বিরহবধনে কুলে অকারণে ব্যাকুলিয়া অন্তর।

চামিনী রাতের লাবণ্যধারায় তোমার মাধুরী গলে,
কলজটিনীর চলতরঙ্গে বোবন উচ্ছলে।
বরষা দিনের নিকম্ব-নীলম হরায় সে কালো কেশ,
হেনার গন্ধে ভেসে আসে তব বেষীর স্বরভি রেণ।
কাঞ্চল মেঘের বুকে চিরে আই চপলা খেলায়ে যায়,
তাহাতে তোমার আঁখি-তারকার চকিত চমক তার।
ঝেঁঝেছে আবার বিশ্বের সনে তোমার মোহন কায়,
কমল-মুকের বরভঙ্ক তব কেনেছে মেঘর ছায়।

কথা-সাহিত্যের কথা

শ্রীমূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, এম্-এ, ডি-লিট্

বাঙলা দেশে বহুগুলি মাসিক ও সাময়িক সাহিত্য-পত্র আছে, তাহার রকম বারো আনা। যে শুধু উপজ্ঞান ও ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই বাজারে বিক্রয়—এ কথা বলিলে বোধ হয় অসুস্থি করা হইবে না। বহু উচ্চ ধরনের পত্র-পত্রিকাই হোক বা কেন, কেবলমাত্র আলোচনা-মূলক প্রবন্ধাবির দ্বারা উহাকে টিকাইয়া রাখা দস্ত। বহু, উপজ্ঞান ত চাই-ই, তাহা ছাড়া বহুদিন ছবিও চাই একখানা থাকে চাই, এবং ঐ ছবির বিষয়-বস্তুও একটু চিত্রগ্রাহী হওয়া প্রয়োজন। পত্রই হোক, আর চিত্রই হোক—উহাকে পাঠকের চিত্রগ্রাহী করিবার জন্য বেরগটীকে পূর্ব বেশী পরিমাণে পরিবেশন করিতে হয়—সেটী “মধুর” বা “কাউ”-রূপ; অর্থাৎ সাদা কথা, যে-মাসিকে প্রেমের গল্প ও নৃত্য নারীর বিভিন্ন অবস্থার রূপাল ছবি বহু বেশী থাকে, তার কাটুতি যে সেই অল্পপাচে কিছু বেশী হইবেই, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাজারে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার অবস্থা লক্ষ্য করিলে আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

বিষয়-বস্তুর নির্মাণে সম্পাদকগণ সাধারণতঃ গুরুত্বপূর্ণ বা পবেষণামূলক মতল প্রবন্ধকে, এবং কেহ কেহ বা কোনো খ্যাতিমান কবির কবিতাকে প্রথম স্থান প্রদান করেন; কিন্তু আমাদের মনে হয়, পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে অতি অল্প লোকেই প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া থাকেন। বহু, উপজ্ঞান পড়া শেষ হইয়া গেলে নিত্যরূপ গল্প কাটাইবার জন্যই চারিজন কোনো রূপে নাক মূখ ঝাঁটিয়া দুই একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন, অনেকে শুধু উহার উপর একবার চোখ ফুলাইয়া লইয়াই কাজ হন। কবিতার লক্ষণ প্রায় এইরূপ; তবে প্রবন্ধাবি অপেক্ষা ইহার পাঠক-সংখ্যা কিছু বেশী বলিয়াই মনে হয়। কারণ,

কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে মাত্রমাত্রেরই মনে কিঞ্চিৎ কাব্যরসের সঞ্চার হয় এবং তাহারই ফলে মৃগ-কলেজের তরুণ-তরুণী মনসে কবিতার কবলিৎ সমায়র সেবা বার। অবিকাণে মাসিকেই কবিতা-গুলি প্রকাশিত হয় পাল্পশ্রুণের ক্ষণ। বহু তারে বহু-কবিতাগুলির মূল্য বড়ই কম; মাসিকের পাঠক-পাঠিকারা কবিতাগুলিকে যেন কতকটা “কাউ” স্বরূপ লাভ করেন।

সকলের চেয়ে গল্প ও উপজ্ঞানের চাহিদাই বেশী, তাহা সাময়িক সাহিত্য-পত্রের সম্পাদক মাত্রেই বেশ ভাল ভাবে জানেন। তাই দেখিতে পাই, গল্প বা উপজ্ঞান লিখিয়া বাহারা কিছু দলবী হইয়াছেন, পুরাতন বা নূতন সকল মাসিক পত্রই তাহারা আদিত্য জিড় করিয়া গাড়ান। তাহারা যে বহুদূত এমন কথা বলিতেছি না,—অনেকেই সাধারণ নিমন্ত্রিত হইয়া নব পত্র-পত্রিকার বোদলান করেন এবং কেহ কেহ সাহিত্যিকের “কৌলীক মর্যাদাও” প্রাপ্ত হন।

ইহার ফলে কি হইত? নিত্য অমৃত-পানেও মাধুরের অকটি ক্ষয়। বাঙলা সাহিত্যে বাহারা গল্প বা উপজ্ঞান লিখিয়া খ্যাতিমান হইয়াছেন, তাহাদের লক্ষ্য নিত্যই নৃষ্টিমের। এই নৃষ্টিমের কথা-সাহিত্যিকগণ মাসিক পত্রের সম্পাদকগণের তাড়াদা মিটাইবার জন্য যে “করমারেসি সাহিত্য” পত্রি করিতেছেন তাহা নিত্যই একঘেয়ে হইয়া উঠিতেছে, এবং তাহা পাঠে রস-পিপাসা পাঠকের বৈরাগ্যুতি ও অকটি জমিবার উপক্রম হইয়াছে।

প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত-বশতঃ রস-পত্রি এক বস্তু, আর চাহিদা মিটাইবার জন্য সাহিত্য-পত্রি অপর বস্তু। এই দুই-এর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। তাহা

হাড়া এক এক জন লেখকের প্রতিভার বিকাশের এক একটা সময় আসে। সে সময়ে অল্পের প্রেরণায় তিনি ব্যাঙ লিখেন, তাহা হইয়া উঠে বখাওঁই অববদ্ধ — তাই বলিয়া “কাকন ম্লোর” বিমিত্রে তাঁহার প্রতিভাকে খাড়াইয়া লইলেই যে সৌন্দর্য্য-দৃষ্টি করিতে তিনি সক্ষম হইবেন, এ কথা সব সময়ে বাটে না।

উপভাস বা গল্পের ধাঙ্গরা অত্যন্ত পাঠক, তাঁহাদের মুখেও আচ্ছ একটা অসুযোগ ভুনা বাইতেছে যে, বাঙলার কথা-গাঠিত্য ক্রমেই বৈচিত্র্যহীন হইয়া নীলস ও অকৃত্তিকর হইয়া পড়িতেছে। একই মাসে একজন খ্যাতনামা লেখকের হস্ত তিনটী লেখা জিনবানি সাহিত্য-পত্রে প্রকাশিত হইল। কিন্তু পড়িয়া দেখা গেল যে, এই তিনটী গল্পের মধ্যে বিভিন্নতা বড় কম। রচনা-ভঙ্গীর কথা অব্যক্ত ধরা যায় না; কারণ, কেহই নিজের লেখার “স্টাইল” মিনিটে মিনিটে বসলাইতে পারে না। কিন্তু সকল গল্পেরই বিষয়-বস্তু যদি এক হইয়া পড়ে, আখ্যান-ভাসে যদি বৈচিত্র্য কিছুমাত্র না থাকে — তবে একটা গল্প না লিখিয়া তিনটী গল্প লেখার সার্থকতা কোথায়? ইহার উত্তরে আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, বাঙলার পাঠক-পাঠিকাগণের গল্প-পাঠের স্বাক্ষরী স্থা। মিটাইবার জন্যই লেখকের এই কল্প-প্রয়াস — সম্পাদকগণের তাগিদা মিটানো তথা লেখকের “পকেট পূরণ” ও নাম-প্রকাশের উৎসাহ প্রদেই এই আদ্যবক্তার প্রধান কারণ।

জু যে, কোনো লেখক-বিষয়ের লেখার মধ্যেই এই একঘেয়েমি প্রকাশ পাইতেছে, তাহা নহে; বাঙলার কথা-সাহিত্যে পল্লবপ্রাচীর সখ্যা অত্যন্ত ক্রমবিস্তৃত বাড়িয়া চলিয়াছে। যে গল্পই পড়ুন, সবাই ঐ এক ভ্রু—মৌলিকতার অভাব প্রায় সর্বত্র। এক সময় ছিল যখন বাঙলার কবিগণ গল্পলিখা প্রবাহের মত পরম্পরের পুষ্পপ্রাণী হইয়া উঠিয়াছিলেন—নূতন পথে পদার্পণ করিবার সাহস

তাঁহাদের ছিল না, নূতন বিশ্বের কল্পনা করাও তাঁহাদের পক্ষে যেন অসম্ভবীয় অশরীর ছিল। যে-কোনো প্রাচীন কাব্যের পাঠা খুন্স, দেখিবেন সেই একই ধাঁচ — সেই গবেষণ-বন্দনা, স্বর্গ-বন্দনা, সর্বদেব-সেবীর বন্দনা, সেই গীতরচনার মন্ত সেবতা কর্তৃক শ্রদ্ধাশ্রয় প্রদান ইত্যাদি, ইত্যাদি। “কাজ হাড়া গীত নাই”—ইহাই ছিল এক সময়ে বাঙলার প্রবাদ-বাক্য। আচ্ছ কিংবা শতাব্দীর সভ্যতার ছুপ—মাত্রের নব জাগরণের দিনে বাঙলার কথা-সাহিত্য যদি সেই প্রাচীন মূলের দ্বারা বৈচিত্র্যহীন ও সংকীর্ণ হইয়া উঠে—সে যদি মাত্রের বৃহত্তর জীবনের নব নব ভাবধারার সহিত একাত্ম না হইতে পারে, তবে কি করিয়া বলা যায় যে, এই সাহিত্য-দৃষ্টি সার্থক হইয়া উঠিতেছে?

আধুনিক কথা-সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের এই pessimism দেখিয়া অনেকে হয়ত বিস্মিত হইবেন। কিন্তু বিশ্বের কিছু ইহাতে নাই। বাঙলার সাময়িক সাহিত্য-পত্রগুলিতে প্রকাশিত যে-কোনো এক মাসের উপভাস ও গল্পগুলির একটী বিশ্লেষণাত্মক তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেখুন, উহাদের আখ্যানভাগ (Subject-matter) কী! দেখিবেন, অধিকাংশ গল্পই প্রেমের গল্প। “ভালবাসাবাসি” হাড়া বাঙালীর জীবনে আর যে কোনো কিছু আছে, তাহা এই সকল গল্প পড়িয়া মনেও করিতে পারিবেন না। এই তথ্য-কথিত প্রেমের গল্পের অধিকাংশই আবার বিকৃত-কটির পরিচায়ক। স্থনীতির বা moral teaching-এর কথা আমরা বলিতেছি না, বস-সাহিত্যের উদ্দেশ্য স্থনীতি-প্রচার না হইলেও কতি নাই, কিন্তু “ব্রহ্মচরিত” দাবী ভঙ্গমধ্যে সকলোই করিতে পারে। কেবল-মাত্র ভাবের বলিয়া নহে, ভাবার ভাবাতা পর্যন্ত আধুনিক (বিশেষতঃ অতি-আধুনিকতার সৌরব-প্রায়ী) সাহিত্যিকগণের লেখার মধ্যে সর্বত্র দৃষ্ট হয় না। বুদ্ধ-বুদ্ধীগণের মধ্যে এক স্থনিবার আসল-লিখা বা যৌন-আকর্ষণ হাড়া আর যে কোনো

সম্বন্ধ ও স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকিতে পারে, তাহা অতি-আধুনিকগণের সেবা পড়িয়া মনে করা সম্ভব। বাস্তবতার গোড়াই দিয়া এক প্রেমের গল্প-লেখক যে সকল মন-গড়া ও নোংরা ভিবিয়ের আদমাদী লোক করিয়া দিয়াছেন, উহার মধ্যে বাস্তবতা ও একত্বপনাই বলিলেই চলে, বলা যদি কিছু থাকে, তবে তাহা ভাড়ির সেক-বাগড়া আর বলা, তত-সমাজের অপেক্ষ। Continental Literature-এর সঙ্গে বীহাদের পরিচয় আছে, তাহার্য্য জানেন, এই অতি-আধুনিকগণের বাস্তবতার উৎস কোথায়। এসেণের মাহিতি যাহা জন্মায় না—এসেণের জল-বাহুর পক্ষে যাহা স্বাভাবিক,—সেই বিশেষী ঘটনার উপর কিছু রঙ, চর্চা করিয়া, তাহার সাক্ষ্য-পোষাক বদলাইয়া,—এক দল কথা-সাহিত্যিক উহাকে এসেণের বাস্তব চিত্র বলিয়া প্রচার করিতেছেন। প্রেমের গল্পের প্রধান কেন্দ্র হইয়াছে এখন হুইটী,—এক, বাগ্লিন্ডের নয়া উপনিবেশ, আর দলের ভিতর ও বাইরের নোংরা যতী। অথচ এই দুই-এরই সঙ্গে গল্প-লেখকের সাক্ষ্য পরিচয় কতটুকু থাকে, তাহা অতিশয় পাঠকের নিকট সহজেই ধরা পড়িয়া যায়।

“প্রেম করা” ছাড়া বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীর জীবনে আরও যে বহু ক্ষুদ্রতর সমস্তা আছে, সে পরিচয় অতি-আধুনিকগণের সেবার মধ্যে খুব জন্মই পাওয়া যায়। জাতির বহুদূরী কর্তৃপক্ষের পূর্ণ চিত্র যদি সাহিত্যের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ না করে, তবে সেই সাহিত্যকে জাতীয় সাহিত্য বলা চলে না,—উহা দুইয়ের ভাব-বিস্তারী খোয়ারের সামগ্রীমায়ে পরিণত হয়। পাকিস্তানের কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে কত বিবৃতি, তাহা পাকিস্তান সাহিত্যসাহায্যী ব্যক্তি মাঝেই অবগত আছেন। প্রেমই সেবারকার কথা-সাহিত্যের একমাত্র উপাদান নহে,—রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, আদর্শ-প্রবোধ, হৃৎ-হৃৎপা, বহির্জগতের সহিত পরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা, প্রকৃতি জাতির সর্বপ্রকার চিন্তা-ধারাই সেখানে কথা-সাহিত্যের মধ্য

দিয়া ছুটিয়া উঠিতেছে। আর বাংলাদেশের কথা-সাহিত্যে যেমন; ইলা সেন অল্প ভাবের সঙ্গে প্লট করিতেছেন, কিন্তু বিবাহ শেখটার হস্ত করিয়া বলিলেন এক ছরছাড়া, বাউলুণে বিমল গুপ্তকে; ফুলি কল-জমার জল আনিতে দিয়া হীরক সিকে চাহিয়া ঘুচকি হাসিল, তাই দিয়া ফুলির স্বামী বিহারী আর হীরকে দাক্ষণ মাথা-কাটাকাটি, পেটটার ফুলি হস্ত পানের দরের “ধরদী” মোটর-ভাইটার বহুর সঙ্গে একেবারে সেগড়াফুলি বা কাকিনাড়ার দিয়া উঠিল,—বাঁচী প্রেমের জ্ব-জ্বরকার বেগাইয়া তরুণ গল্প-লেখক আত্মপ্রসঙ্গে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন।

আধুনিকতার বিরোধী আমরা নহি। যাহা গত হইয়া গিয়াছে, তাহাকে ক্ষমািয়া আনিতে আমরাও বলি না। অতীতের পান্যপত্রপত্রের সঙ্গে পদদ্বয়কে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে আমরাও চাতি না—জানি তাহাতে চলার শক্তি ভিন্নদিনের মত বন্ধ হইয়া পাইবে। কিন্তু আধুনিকতা ও বাস্তবতার নামে এই “এক-যেজেনি” ও “ইভারামি”—সাহিত্যসাহায্যী বাঙালীর নিকট ক্রমেই অসহ হইয়া উঠিতেছে। কথা-সাহিত্যের মধ্য দিয়া রাষ্ট্রনীতি আলোচনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে, তাহা আমরা স্বীকার করি; আর, এসেণের জনসাধারণের নিকট রাষ্ট্রনীতিই সব চেয়ে বড় সমস্তা নহে। রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজই এসেণে চিরদিন প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিয়াছে। বাংলার সমাজে আমি যে অসংখ্য সমস্তা আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, তাহার পরিচয়, তাহার স্বরূপ ও তাহার সমাধানের ইন্দিব বাংলাদেশের কথা-সাহিত্যের মধ্যে কোথায়?

যে ও হোটেলবাসী দুইয়ের শিক্তি তরুণ ছাড়া বাঙলাদেশে আরও অল্পের তরুণ আছেন। তাহাদের সুখ, দুঃখ, আশা ও আনন্দের বাণী কথা-সাহিত্যের মধ্যে ছুটিয়া উঠে কই? নিত্যই দুই-একজন লোক-লোকিকি। ছাড়া, বাংলাদেশের গণীর পরিচয় আধুনিকগণের কথনবনের সেবার মধ্যে পাওয়া যায়? বাঁচী সহ

বলিত যে-সেই একমাত্র কলিকাতা, আর বড় কোর ঢাকা। পঞ্চাশ বছর—যে-সেইর অধিবাসিগণের মধ্যে শতকরা ৯২ জন লোক পরীক্ষার্দী—সেই দেশের কথা-সাহিত্যে পরীক্ষাবনের যদি পূর্ণ পরিচয় না পাওয়া যায়, তবে সেই সাহিত্যকে দেশের সঙ্গে একটা অস্বাভাবিক “বিকৃতি” (outgrowth) ভিন্ন আর কিছুই মনে করা হইতে পারে না।

কিন্তু এইরূপ হইবার কারণ কি? দেশের অন্তরের সহিত সাহিত্যের এই যোগ-স্বত্ব ছিল হয় কেন? ইহার উত্তরে বলা যায়—সাহিত্যিকগণের অন্তর্ভূতির অভাবে। রস-স্বস্তির আদি বহু স্থল দৃষ্ট। “প্রভা” হইতে হইলে আসে “প্রভা” হওয়ার প্রয়োজন। সৃষ্টি মাত্রেরই আদির রহস্যের মূল এইখানে। শাস্ত্রকার বলেন যে, জগৎ-স্বস্তির আসে ভগবান্ এখানে দৃষ্টিপাত (ষ্টেকশ) করিয়াছিলেন। দৃষ্টি হইতে স্বপ্ন-বাসনার উৎস হয়, এবং তার পরে হয় সৃষ্টি বা বিকাশ। কিন্তু সে সকল তথ্যলোচনার স্থান ইহা নহে।

মোটের উপর বলা যায়, আধুনিকগণের উপর নাস্ত্রিক সত্যতার প্রভাব এত বেশী যে, বাঙালীর পরীক্ষাবন সম্বন্ধে তাঁহাদের দৃষ্টি নিত্যস্থূল। তাই তাঁহাদের লেখার মধ্যে পরীক্ষার প্রকৃত রূপের সন্ধান আনবা পাই না—এবং বাহা পাই তাহা অবিকালে কেন্দ্রেই অস্পৃশ ও বিকৃত। বর্ষাব ররনী শিল্পী ব্যতীত বাঙালীর প্রাণের কথা আর কাহারও কুলির মুখে ফুটরা উঠা সম্ভব নহে।

কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের কসেবর বেতপ পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে,—নব নব ভাব ও আন্দোলনের ফলে কথা-সাহিত্যের উপাসানও সৌকর্য ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। অসহযোগ আন্দোলন ও অস্পৃক্ততা বর্জনকে আহ্বান করিয়া

বহু উপভাস ও পর রচিত হইয়াছে; — ইউরোপের কথা-সাহিত্যে বিগত মহাসময়ের বাহা অবদান তাঁহার মূল্য বড় অল্প নহে। এইরূপে নিত্য নব নব ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রও প্রসারিত হইয়া পড়িতেছে। পূর্বেই বলিয়াছি, বর্ধমান বাঙালীর সমস্ত বড় অল্প নহে,—বাঙালীর সমগ্রের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় আছে, উহার আনন আশ্রয় সেখানে কি বিপ্লবের চেষ্টা উঠিয়াছে। জাতি-উপজাতি মাত্রই আশ্রয় সামাজিক উন্নয়নের ক্ষমতা উন্নীত হইয়া উঠিয়াছে,—শিক্ষাশাভের ক্ষমতা এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা। আশ্রয় সর্বত্রই দৃষ্ট হইতেছে—সাবিকার প্রতিকার ক্ষমতা আশ্রয় সকলেই চতুঃপত্র। আর্থিক সমস্তাও সর্বত্র প্রবল ভাব ধারণ করিয়াছে,—পরীক্ষাকার, সমগ্রপ্রচার প্রবর্তন, কৃষক ও রায়তের অবহার উন্নয়ন, কুটীর-শিল্পের পুনঃ প্রতিকার, নারী-স্বস্তির প্রতিকার, বেকার-সমস্তার সমাধান, শারীরিক শক্তি অর্জন প্রভৃতি অসংখ্য কর্ম-তালিকা আশ্রয় বাঙালী জাতির সম্মুখে রহিয়াছে। বাঙালীর কথা-সাহিত্য যদি এই সকল সমস্তকে সমগ্র মূলে পরিহার করিয়া শুধু মান, অভিমান, অহংকার, প্রেম, বিরহ, মিলন এবং বৈদিক সমস্তাপের বিস্তৃত বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে,—তবে উহার জাতাবিক প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া বাইবে এবং উহাতে বিযুক্ত বাস্তবের উৎস হইয়া বাঙালীর তরুণ-তরুণীগণের প্রাণ-পদার্থকে ক্রমশঃ কম করিয়া ফেলিবে। কথা-সাহিত্যের এই একদেশবাদিতা, এই অস্বাভাবিকতা, এই সীর্ণতা,—জাতির সবল বাহা-মনের পরিচায়ক নহে। জাতি-আধুনিকতার অঙ্গার মোহে আবিষ্ট হইয়া কোন ফল নাই; আধুনিক মূলের চিন্তাধারা যদি কথা-সাহিত্যের মধ্যে স্থান না পায়, তবে উহার আধুনিকতার সর্ব নিত্য নিষ্ফল।

ক্ষমতার জয়

শ্রীশৈলবালা ঘোমড়ায়া

(১)

মাঘ মাস। কদিন আকাশ মেঘলা হইয়া আছে। দুই এক পশলা কুইও হইয়াছে। মানকুসের প্রচণ্ড পাহাড়ের শীত অধিকতর তীক্ষ্ণ হইয়া হাড়ের তিতর পর্যন্ত কাশাইয়া তুলিতেছে।

রাত্রি তখন একটা। বিছানায় বেশ ঘুড়ি দিয়া আরামে শুইয়া আছি। সমস্ত দিন পরকারী হাঁস-পাতালের হাড়কাটা খাটুনির পর, অবলাদল্লার সেহটা একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছে। পতীর আরাবলারক তরা বীরে বীরে ঘনিয়া আসিতেছে।

মহা! মদর চুয়ারের কড়া নড়িয়া উঠিল। হেড্-কম্পাউটার চক্রনাথের স্বভাব-কর্কশ কণ্ঠস্বনি পোনা সেল, "বাবু, ডাক্তার বাবু, শীগ্গির উঠুন।"

সুখময় তস্মাট একলাকে,—বোধকরি সাক্ষাত্যের বাহ্যক বলে স্বর্ণায়োজ, তাই করিলেন। ডাক্তারের কক্ষমারিকে মনে মনে থিকার দিয়া অতি দৃষ্ণে বিছান। ছাড়িয়া উঠিল। আনালা গুলিয়া বলিলাম "কিহে, কি ববর?"

রাভা হইতে চক্রনাথ উদ্বিগ্ন কর্তে বলিল, "হাঁস-পাতালে একটা সাংঘাতিক অশ্মি কেস্ এসেছে। চট্ ক'রে আহ্নন।"

অশ্মি কেসের অবস্থা বতই সাংঘাতিক হউক, নির্ভের অবস্থা ভাবিয়া বড় কম চ্যপ হইল না। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া মনকে প্রবোধ দিলাম, "ইহাই চিকিৎসক-জীবনের ত্রুটি।"

আমাদের কথার শব্দে ছোট ছেলোটের নিভ্রাজ হইল। সে সাহসানিক দ্বরে কয়া ছুঁল। হুতরাং বীরও ঘুম ভাঙিয়া গেল। আমি আনাদুতা পরিতোহি দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কি হ'য়েছে?"

উত্তর দিলাম, "হাঁসপাতাল যান্ধি। একটা অশ্মি কেস্ এসেছে।"

বী বিরক্ত হইয়া আমার গৃহীত ত্রুত শব্দে এমন একটা প্রতিকটু বিশেষণ প্রয়োগ করিলেন, বাহা! তনিত্তে পাওয়া কোন চিকিৎসকের শব্দে প্রতি-স্ববকর নয়। ইচ্ছা হইল, পূর্ব একটা কড়া অধাধ দিই! কিন্তু সেই হুপূর রাতে বাহিরে অশ্মি রোগী সেদিয়া ধরে বীর শব্দে বাজে কথার পাঁচ লড়িয়া কুরুক্ষেত্র বাধানো হুঁচিনানের কাজ নয়। সে চুসাহন প্রকাশ করিলে ছেনে-মেনে সব কসটির ঘুম ভাঙিবে, এবং তক্ষনিত চ্যা-ম্। চীৎকার উপহ্রবের আশঙ্কা যথেষ্ট।

পারে মোটা কোট চড়াইয়া, ছুতার ভিত্তা বাধিয়া টোবিল্‌কোপ্ লইয়া নীরবে গৃহত্যাগ করিলাম।

বাহিরে চক্রনাথ লটন হাতে লইয়া পেড়াইয়া ছিল। আমাকে দেখিয়া উত্তেজনা-রক্ত মুখে বলিল, "চীৎসাহোড় কোলিয়ারীর ছোট মানেবার অটলবাহুর পারে কে তীর মেয়েছে। ডান পারের ডিমটা একে-কোড় ও-কোড় হ'য়ে তীর বিধে র'য়েছে। এখনি অপারেশন করতে হবে।"

কোলিয়ারীর প্রমিকবের মধ্যে 'পারের কোর' নামক ঔজ্জ্বল্য বড়াই নিভ্রাজ ছোটখাট বাপার নয়। কাজেই সেখানে মারামারি, কাটাকাটি, নানাবিধ সুখসিত উত্তেজনা-মূলক কাজের নিভ্রাজেনিভ্রিক উৎসব লাগিয়া আছে। ইহা তাহাদের সমাজে এমন পর্কের বিষয় যে, শুধু পুরুষেরা নয়, উহাদের বী, কড়া, মা, ভদিনিরাও তাহাতে মহোৎসাহে যোগদান করে। কোন কারণে এই দ্বর্ধ 'মালকাটা' লক্ষ্যমারের বিরোধ-গুণ্ডিতে পড়িলে, শুধু কোলিয়ারী সম্পর্কিত বাহুরা নহেন, সাধে প্রবাসাও মধ্যে মধ্যে উত্তম-মধ্যম লাভ করেন। হুতরাং

ইহাদের সম্ভবতঃ একজন পদস্থ বাঙালী চত্ৰ-
সন্তানের পা বাণবিত্ত হইলে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

গোপীর অবস্থা সম্বন্ধে দুই একটা কথা নিম্নলিখিত
করিয়া বলিলাম, “বে তীর মেরেছে, সে কি ধরা
পড়েছে?”

সেই কক্ষা ঘানশী তিমির অন্ধকারমধ্যে এদিক
ওদিকে তাকাইয়া, চত্ৰনাথ সতর্পণে চুপি চুপি বলিল,
“না। কিন্তু এর মধ্যে কি যেন একটা রহস্যময়
ব্যাপার আছে। মনে হয়, অটলবাবু কি-একটা কথা
লেখেন নিজে।”

অকাল হস্তিভেদে একে মাথা ধরিয়া নিয়াছিল, তার
উপর চত্ৰনাথের আবিষ্কৃত ‘রহস্য’র গন্ধ মা মনসার
উদ্দেশে উৎসর্গ হবার বোঁহার মত ভুট্টাঘায়ক বোধ
হইল! রাগ করিয়া বলিলাম, “তোমার নবেল্লিানা
রাখ বাপু! এর মধ্যে রহস্য আবার কি থাকবে?
ভ্রমশোক চেপেই বা নেবেন কি? হয়ত সুনির্ভরানো,
নয়ত মধুরি-কাটা; — রাগের মাথায় তারাই কেউ
ছদ্মন কি’রে থাকবে। কোলিয়ারীতে এসব ত
প্রায়ই হচ্ছে।” কথা কহিতে কহিতে আমার
হৃদযাতনে পৌছিলাম।

(২)

অটলবাবু স্থবর মুগ্ধ পূর্ববর হুবা। অল্পদিন
হইল তিনি চাঁদখোড় কোলিয়ারীর দ্বিতীয় ম্যানেজার
হইয়াছেন। লোকটি বুদ্ধিমান এবং কার্যকুশল। কথা-
বার্তা, আচার-ব্যবহারে অতি চত্ৰ। কয়েক মাস পূর্বে
তাহাদের কোলিয়ারীতে একটা প্রকাণ্ড কয়লার চাপ
ধসিয়া জন কয়েক হুসি হতাহত হয়। সেই দুর্ঘটনা
ব্যাপসনে তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে।
লোকটির মধ্যে সত্যনিষ্ঠা এবং স্তম্ভপরাক্রান্ততার ছোর
ঘটনাক্ষেত্রে বিশেষরূপে দেখিয়াছিলাম বলিয়া, মনের
মধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে একটা প্রত্যাবৃত্তি জাঙ্গিয়া ছিল।
সেই . ভ্রমলগ্নানটির আশ শুষ্ঠ-শক্ৰহতে নির্বাস্তন
দেখিয়া প্রাণে বেগনা বোধ হইল।

অটলবাবুর মূখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সেই
স্থবর মূখ উৎকট ধমুধার নীল হইয়া গিয়াছে।
অসাধারণ মানসিক শক্তিবলে তিনি নিঃশব্দে তীব্র
ধমুধা স্রব করিতেছেন বটে, কিন্তু অবশ্যই কেলে
অস্বাভাবিক ভাবে সর্গাঙ্গের পেশী বার বার সঙ্কোচ-
বিস্কৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। চোখের প্রান্ত বাহিয়া
নিঃশব্দে অশ্রু পড়াইতেছে। রক্তে কাপড় তিমিরা
গিয়াছে।

কৃত পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, অনেকগুলি শিরা
ও পেশী ভেদ করিয়া তীরটা গায়ে বিদ্ধ হইয়া আছে।
সহকারীলের ইচ্ছিত করিলাম, “সকল অস্থাপচারের
আয়োজন কর।”

স্কোরোকরম করিয়া অনেকখানি মাংস কাটিয়া
তীরটা বাহির করিলাম।

বীরে বীরে স্কোরোকরমের নেপা কাটিয়া আসিতে
লাগিল। বাকুশক্তি সচেতন হইয়া আসিল। বিফল
ধৃষ্টিতে চারিদিক চাহিয়া অটলবাবু যন্ত্রণা-পীড়িত
মূহে নেশার কোঁকে অশ্রুত কণ্ঠে নিম্ন মনে বলিতে
লাগিলেন, “তিনি নি কি? চিনেছি। কিন্তু এ
দুর্লভিত তার চিরদিন! এ ইতরামির কথা
লোকের কাছে প্রকাশ কর্ব কি করে? ব্যপের
কলম বে! ও: অসদীযর, তকে দুর্দাগ্য খেবে
বাচাও!”

এ কি অসব্দ প্রলাপ? চিন্তিত হইলাম। তীরটা
বিবাক্ত ছিল কি না, সম্বন্ধ হইতে লাগিল।

সবর তাঁহার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম।
প্রাণপণ সতর্কতার সমরোপযোগী ঔষধপত্রের ব্যবস্থা
করিতে খন দিলাম।

পরে প্রথাগ হইল, বেশী না হইলেও তীরটা
বিবাক্ত ছিল। শক্তিশালী স্বাস্থ্যবান হবার মেহ, তাই
হল; চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্যে বিশ্বের কার্যকরী
শক্তি নষ্ট করিয়া বেওয়া হইল।

কয়েকদিন হৃদযাতনে রাখিয়া সফটময়ক
অবস্থাটা কাটাঁইয়া দিয়া তাঁহাকে নিদ্রায় পঠান

হইল। আমি ও চন্দ্রনাথ প্রথমে নিরমিত রূপে প্রতিদিন দিয়া ক্ষত-পরিচর্যা করিয়া আসিতাম। পরে চন্দ্রনাথ একা বাইত। প্রায় সেড় মাদ তুদিয়া তরলোক আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার আহত পা-বানি ডিম্বিনের জন্ত একটু থক হইয়া রহিল।

ইহার মধ্যে যথার্থিতি পুলিশ হাসান হইল; কিন্তু মূল অপরাধী থরা পড়িল না।

শোনা গেল, অটলবাহুর অবশেষপূর্ণ জীবন-বন্দিতে মোকদ্দমা পণ্ড হইয়াছে। তিনি না-কি বসিয়াছেন যে, ছোট সাহেবের লহিত লাঞ্ছা করিয়া তিনি রাগে একা বাড়ী ফিরিতেছিলেন। বাড়ীর কাছাকাছি বনন আসিয়া পৌছিয়াছেন, তখন অন্ধকারে কোথা হইতে হঠাৎ একটা তীর আসিয়া তাঁহার পায়ে বিদ্ধ হয়। তাঁহার আর্ডনাথ গুলিয়া কুতারা। আসো লইয়া ছুটয়া আসে। তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বাড়ীতে লইয়া যায়। কে কোথা হইতে তীর ছুড়িয়াছিল, তিনি বলিতে পারেন না। তাঁহার শত্রু কেহ আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। তিনি কাহাকেও সন্দেহ করিতে অনিচ্ছুক।

অটলবাহু হুহ হইবার পর কিলের জন্ত জানি না, পুলিশ সহসা লাভ হইল। আর কোন পোশমান শোনা গেল না। কিন্তু গুলিতাম, আমাদের চন্দ্রনাথ অন্তরালে তাহার লী-লাখীর কাছে ওই ব্যাপারের আলোচনা-প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে জ্ঞানক অলঙ্ঘি হইয়া উঠিত। চাপা পলায় জুহু বর্ধনে বলিত, “অটলবাহু কাপুরুষের মত ভয়ে ছেড়ে গিলেন, এটা নেহাৎ অজায় হ’ল। এ লোক প’ড়ে মার বাবে না ত খাবে কে? হ’ত আমাদের মরমনসি-বেলা, তা’ হ’লে—”

তাহা হইলে বীরদর্পে সে বে-কাণ্ড করিত, সেটা জায় ও সত্যনিষ্ঠার ওজন ঠিক রাখিয়া পাকা জঞ্জিরটি কাটা হইত কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। সরকারী শাসন-বিভাগের কর্তাদের কানে সে আত্মদনের সন্ধান পৌছিলে, হয়ত তাহার

কোষগারি কার্যবিধি আইনের কোন এক বিশেষ ধারা চন্দ্রনাথের উক্ত মন্তব্যের উপর জারি করিতেন। সরকারী হাসপাতালের ড্রেশার কম্পাউণ্ডারদের আইন-জ্ঞানের অভাব, কাজেই তাহারো বিনা বিধায় চন্দ্রনাথের অতিমত সমর্থন করিত। তাহারদের মধ্যে কে কবে কোথায় কিরূপে অনিষ্টকারী পত্র-নির্যাতনে সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহার বিবরণ গোপ্যসহে বর্ণনা করিত।

পাশের ঘরে নিরীহ চিকিৎসক আমি, সবকাল-কালে চুকট টানিতে টানিতে নীরবে তাহারের আলোচনা গুলিতাম। বুদ্ধিতাম, আহত অটলবাহুকে ফেল করিতে দিয়া, তাঁহার আততায়ী শত্রুকে চন্দ্রনাথ বেঞ্চন হউক অনেক কিছু গুপ্ত সন্ধান গুলিয়াছে। হয়ত সে সন্ধানগুলার কোন ভিত্তি নাই, হয়ত বা আছে। কিন্তু অটলবাহু বনন বেঞ্চায় আততায়ীকে নিভুতাসনে ইচ্ছুক, তখন চন্দ্রনাথের অনধিকার-চর্চা কেন?

কিন্তু অটলবাহু তরলোকটির উদ্বেগও ঠিক বুঝিতে পারি না। মনে লগ্নের জাপে। স্কোবাকরনের নেশায় তাঁহাকে যে প্রলাপ বকিতে গুলিয়াছি, তাহা মনে পড়ে, — আর মনে পড়ে বনন বাড়ীতে তাঁহাকে দেখিতে বাইতাম তখনকার কথা! গুপ্ত-খাতকের কথা উঠিলেই তিনি মূখ ফিরাইয়া বেগালের দিকে অন্তমনন ভাবে চাহিয়া থাকিতেন। সেবিতাম বেগালের পায়ে ক্রমে বীধানো কার্পেট বোনা ছোট একটি কবিতা টাঙানো রহিয়াছে :—

“বে পায়ে অপরে আছাড়ি কেনিতে
সে ও বলবানু নয়।

অপকারী মনে, সে পায়ে কসিতে
তারি কমতার জয়।”

ঐতিমধুর নীতি-কথা! কিন্তু প্রতিপোষ শইবার কমতা সবেও অপকারীকে ক্ষমা করিবার ক্ষমতা, ব্যতন ক্ষেত্রে করদনের বেধিয়াছি, মনে পড়ে না। জরলোক কি এতই সেটিমেটোল?

হুজুরা সন্দেহ জু সন্দেহ মাজই রহিয়া গেল।

(৩)

তারপর এক বৎসর কাট্টিয়া গিয়াছে। আবার ষ্টিক জেমনি মাথ মাগেহু এচও শীতের রাতি। সাতের আহার শারিরা সবমাত্র উঠিয়াছি, এমন সময় চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, “চাঁদঝোড় কোলিয়ারী থেকে ডাক এসেছে।”

বাহিরে আসিয়া বেখিলাম মোটর গইয়া স্বয়ং অটল বাবু উপস্থিত। তাহার হৃদয়গলে পতীর বিধাসের ছায়া।

প্রশ্ন করিলাম, “কার অস্থখ? আপনার বাড়ীতে না কি?”

তিনি উত্তর দিলেন, “আমার বাড়ীর কাছেই। আমার এক জ্যতি-ভাই কোলিয়ারীতে চাকরি করেন, তাঁরই অস্থখ।”

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, লোকটি কিছুদিন হইতে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাহার কে এক হাতুড়ে চিকিৎসক বহু সে-বাধি কিছুই নয় বলিয়া উড়াইয়া দিয়া অবহেলাভরে যথেষ্ট চিকিৎসা করিতেছিলেন। সম্ভ্রতি তার উপর নিউমোনিয়া আক্রমণ করিয়াছে। তাও চিকিৎসক-প্রবরের বিজ্ঞতার প্রথমটা অবহেলিত হইয়াছে। এখন রোগীর সম্ভ্রলোপ হইয়াছে, অবস্থা সন্ধান।

অন্ধিভেন গ্যাস প্রয়োগের জিনিসপত্র গুহাইয়া গইয়া আসিবার ক্ষমতা চন্দ্রনাথের নিকট চাকর পাঠাইলাম। জাভাঝোড়া পরিয়া নিজে অবিলম্বে প্রেরিত হইয়া আসিলাম। চন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি সমস্ত জিনিস বহিয়া আনিয়া গ্যেক্সের পাশে বসিল। নবেলিয়ারা এবং সৌয়াভূমির সোথ বতই থাক, কাজের সময় চন্দ্রনাথ অত্যন্ত চটপটে হইবার বলিয়া এলব ক্ষেত্রে আমি সকলের আসে তাহাকে সঙ্গী নির্কালে করিতাম।

সমস্ত ত্রিবিদগত ষ্টিক গওয়া হইয়াছে কি না, তার হিসাব পরীক্ষা শেষ হইলে চন্দ্রনাথ বলিল, “কার অস্থখ, মশাই?”

জান বুঝে অটলবাবু বলিলেন, “আমার এক ভাইয়ের।”

আর কথাবার্তা হইল না। মোটর লম্পে ধাবিত হইল। চুট ধরাইয়া রোগীর সম্বন্ধে অটলবাবুক আরও কয়েকটা প্রশ্ন করিলাম। তিনিলাম রোগী তাহার সম্বন্ধ, পূর্ব পড়িলাপী স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। কয়েক বৎসর হইতে এই কোলিয়ারীতে কুশী-গ-গ্রাহকের কাগা করিতেছিলেন, কাছটা অটলবাবুর অগ্রগৃহেই ছুটিয়াছিল। হৃৎকের বিবর, লোকটির বিভাবৃদ্ধি ছিল কম, এবং প্রেরুতি ছিল অতি দীন। কুসংসর্গে নিশিয়া কুপ্রভতির দাস্য করিয়া, কুসংসিত ব্যাধির বিবে দরীর অর্জয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। লোকটির সম্ভ্রান্যি কয়েকটি হইয়াছিল, কিন্তু পিতৃহৃত পাণব্যাধির ফলে তাহারা সকলে মারা গিয়াছে। এখন মলারে আছে তাহার শুধু তিরকরা স্ত্রী, এবং হতভাগিনী মাতা।

নীচবে চুট টেনিতে দাঙ্গিলাম। ভগবানের রাজ্যে পাণাশ্রয়ান করিয়া আর পথ্য কাহাকেও পরিচাণ পাইতে দেখিলাম না। কলমে পড়িবার সময় স্বাধীনচিত্ততা প্রমাণের ক্ষমতা নাস্তিক্যবাহ কণ্ঠাইতাম। কুতর্কের আফগানের তাল চুঁকিয়া কুত-তগবানু সব উড়াইয়া দিতাম। কিন্তু এখন সেখিয়া এবং চৈকিয়া দিনে দিনে জ্ঞানলাভ করিতেছি।

যথাস্থানে গিয়া গাড়ী থামিল। সকলে গাড়ী হইতে নামিলাম।

সামনে একটা বাড়ীর দ্বারের কাছে কতকগুলি কুশি-মধুর প্রেরীর লোক বসিয়া, রাত্তার পাশে থতকুটা জড় করিয়া আওন আসিয়া তাপ লইতেছিল। তাহারা লম্বাভাবে উঠিয়া অটলবাবুক নমস্কার করিল।

অটলবাবু তাহাদের বলিলেন, “বাড়ীর ভিতর খবর দাও। ডাক্তার এসেছেন। এখন অবস্থা কেমন?”

তাহারা বাহা উত্তর দিল তার তার স্বর্থ এই,— রোগীর অবস্থা এখন সেই রকমই। তবে চোখে আরও খোলা পড়িয়াছে। কিন্তু আরও এড়াইয়া দিয়াছে, প্রলোপের ঘোর আরও বাড়িয়াছে।

কুশিলাম,—অবহা সেই রকম নয়। রকম আরও
খারাপ।

চন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া লহা চমকিয়া উঠিলাম !
ইহার হইল কি ? উৎসব-বিবর্ণ মুখে, ঐশ্বর চকল
দৃষ্টিতে সে বার বার সেই বাঁকীর ছায়ারের দিকে এবং
অটলবাবুর মুখের দিকে চাহিতেছে কেন ?

জিজ্ঞাস্য দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম।
চন্দ্রনাথ ঢোক দিলিয়া বলিল, “এ বাঁকীতে কার অস্থখ ?”
অটলবাবু বলিলেন “আমার এক জাতি-ভাইয়ের।”
স্বচ্ছন্দে চন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিল, “বিনি কুশিদের
রিফ্টার বাবু ?” অটলবাবু বলিলেন, “হাঁ।”

চন্দ্রনাথ তত্ত্বিতভাবে গাড়াইল ! অর্ধকিতে তাহার
কণ্ঠ ভেদ করিয়া প্রচণ্ড দমকের সহিত নির্গত হইল, “ওঃ !”

ভিতর হইতে শোক আদিয়া ডাকিল, “আহুন।”
হতবুদ্ধি চন্দ্রনাথের পিঠে হাত দিয়া বলিলাম, “চল বে !”

(৪)

ভিতরে দিয়া শব্দাশ্রিত সজ্জাহীন রোষ্টিকে
দেখিয়া বিম্বিত হইলাম। চমৎকার পেশীশূঠ বন্দি
দীর্ঘায়ত বেহ ! আক্ষেপ হইল,—লম্বাচারে জীবন
ধাপন করিলে এই স্বব্বর স্বাধঃপূর্ণ বেহের অধিকারী
জিহ্বায়ে দীর্ঘজীবী হইতেন।

পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, বেহের সব বয় বিকল
হইয়া দিয়াছে। জীবনী শক্তি তখন নিশ্চয়প্রায়।
সময় থাকিতে চিকিৎসা ও স্তনিয়ম-পালন হইলে, হয়ত
কিছু করা বাইত, কিন্তু এখন আর কিছু করিবার
সময় নাই। রোষ্টির বৃদ্ধা জননী কঁদিয়া বলিলেন যে,
রোষ্টির বহু ডাক্তারটি অতিশয় বিজ্ঞ। তিনি চিরকাল
ইহাদের পারিবারিক চিকিৎসকরূপে স্বত রোগের
চিকিৎসা করিয়াছেন। রোষ্টির এবারের অস্থখেও
বরাবর বলিয়াছেন, “কোন ভয় নেই, এ রোগ কিছুই
না।” রোষ্টিও তাই বুকিয়া আর কোন চিকিৎসককে
ডাকিতে সেন নাই। যথেষ্টাচারে রোষ্টির কর্তব্যই
সকলে নিরোধাধ্য করিয়া চলিয়াছেন। আত্ম

অচৈতন্য রোষ্টির আর কোন কর্তব্য করিবার কমতা
নাই দেখিয়া, তিনি ও তাহার পুত্রবৎ কান্নাকাটি করিয়া
অটলবাবুক সংবাদ দিয়াছেন। অটলবাবু তৎক্ষণাৎ
আদিয়া রোষ্টিকে পরীক্ষা করিয়াই আমাদের আনিতে
দিয়াছিলেন। এখন আমেরা বসি—

নিঃশাস স্বেগিয়া বাহিরে আসিলাম। কোন আশা-
ভরসার কথা বলিয়া মিথ্যা সাধনা দিতে প্রবৃত্তি হইল না।

চন্দ্রনাথ অন্ত্রিভেদে গাঙ্গ প্ররোপের বহুপাতি
গুহাইতে গুহাইতে ক্ষুব্ধবরে বলিল, “রোষ্টির
যথেষ্টাচারের পূর্ণপোষক কোলিয়ারীর সেই কুপি-
হত্যাক বিজ্ঞ চিকিৎসকটি এ সময় সেলেন কোপার ?”

একজন উত্তর দিল — “বাহো কোপ দূরে একটা
কলারের নিমন্ত্রণ আছে, সেইখানে চুটছেন।”

কোলিয়ারীর একজন চাপরাশী বসিকতা করিয়া
আর একজন চাপরাশীর উৎক্ষেপে অদ্ভুতবরে বলিল—
“পুটির নিমন্ত্রণ থাকলে বাবুন অচাঠো কোপ চুট
দিতেন।”

চন্দ্রনাথ গভীরতর কোভের সহিত বলিল, “বেহ-
কিমে তত্ত্বি স্বাধঃব্যর প্রবল ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এই
সব ব্রাহ্মণদের রকম দকম দেখে হুস্তিতার গড়েছি,
মণাই। আমার কীলজীবী তত্ত্বির পরম্য্য বুদ্ধি আর
টেকে না।”

মনে মনে বলিলাম, — যোষাযোণ বৃথা। অকাল-
মৃত্যুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবার পক্ষে মাহুদের
নিজের হৃৎপিঠই যথেষ্ট। সে হৃৎপিঠ পূর্ণপোষকতা
করিবার লোক তাহার নিজেদেরাই খুঁদিয়া লয়। সে
চিকিৎসকটি নিমিত্তের ফেটু মায়।

বার্ষ আনিয়াও শেষ চেষ্টা বধাধাধা করিলাম।
কিন্তু সব বৃথা। গভীর রাতে রোষ্টির মৃত্যু হইল।

ওলিলাম সৎকার করিবার লোক পাওয়া বাইতেছে
না। হিলাব করিয়া দেখা সেল, অটলবাবুর জালক
ও অটলবাবু ছাড়া মৃতের স্বজাতি কাহন-সন্ধান
আবি ও চন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত আছি। চিকিৎ-
সকের দল্লা ছাড়াইয়া অগত্যা পববাধকের বেশ

ধরলাম। মুতের শোকাহতা মাতা ও শরীর কাছে অটলবাবুর স্ত্রী ও ভগিনীকে রাখিয়া আমরা পেরে গিয়ে পব লইয়া গলানে চলিলাম। সঙ্গে আসো ও প্রয়োজনীয় ব্রহ্মাণি লইয়া। জনককে কুলি ও চাপরাশি চলিল।

গলান অনেক দূরে। মুতের শোকাহতা স্ত্রীকে সেখানে লইয়া গাওয়া সম্ভব হইল না। অটলবাবুই গবের মুখাণি করিতে প্রস্তুত হইলেন।

চিতা সাঝাইয়া পব চিতার তুলিয়া নেওয়া হইল। ত্রাষণ ময় পড়াইতে লাগিলেন। অটলবাবু অধি লইয়া চিতা গ্রন্থিণি করিতে করিতে ময় আত্মি করিতে লাগিলেন।

গভীর মর্ষব্যথার ঠাণ্ডার কর্তব্যর তখন কাণিতেছিল। মনে হইল ঐকান্তিক নিষ্ঠাভরা সেই মন-প্রার্থনা, যেন মৃত সজীব হইয়া ক্রত চলি অসিধে উজ্জল হুগি বিকীর্ণ করিতেছে।

মনে মনে আমিও ঐতনবানের চরণে পদ্যলোক-পত আশ্বাস কল্যাণ কামনা করিলাম।

শিখন ক্রিয়য়া বেদি, — আশ্বাসের মননসিংহের হুর্ধ্ব-প্রতাপ, নির্ধর ত্রাষণগ্রাষণ চক্রাব, দীনহীন কাশ্মীরের মত মাথার হাত দিয়া বদিয়া পড়িয়াছে। বিকল দুষ্টিতে অধিকতার সুগলানে চাহিয়া, অবিরল-থারে অক্লম্বণ করিতেছে!

জানি সে ভাব-প্রবণ বুবা। তবু এতটা আপা কভি নাই। অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম।

অধিবান করা হইল। চিতা জগিয়া উঠিল; অটলবাবু খর চরণে খোড়াইতে খোড়াইতে আসিয়া প্রাণভায়ে চক্রাবের পাশে বসিলেন। বাধাহত কর্তে ভাকিলেন, “চক্রাবু!—”

চক্রাব শাক মল্লন ঠাণ্ডার হুঁহাত চাপিয়া ধরিল। আবেগভরে বলিল — “আপনার খোড়া পায়ে তাঁর শক্ততার চিহ্ন চিরদিনের মত রইল। আপনি যদি

সেদিন ভায়ের মর্ষাণা। রক্ষার ক্ষম অত্যাচারের উপস্থিত প্রতিশোধ নিতেন, তা’ হ’লে হয়ত তাঁর পায়ের ভায় লম্বু হ’য়ে যেত। হয়ত তাঁর এমন ভাবে ভরাডুবি হ’ত না। ঐধর জানেন! অত্যাচারীর হুধাণা আপনি সেদিন বেচ্ছার গোপন করেছিলেন হ’লে, আমি জেবেছিলাম আপনি ভীক, কাপুরুষ! হুড় আমি! সেদিন অত্যাচারের অত্যাচারে তরানক অসহিষ্ণু হ’য়ে উঠেছিলাম। কিন্তু আজ দেখছি, ক্ষমার অত্যাচার তার চেয়ে মতগুণ ভয়ানক! এ যেন লম্বু করা যায় না।”

নিঃশাস কেদিয়া অটলবাবু বেদনাক্রান্তি হয়ে বসিলেন, “মাথায় মাঝেই অনেক ভুল ক’রে থাকে! নির্দোষের কুলের ক্ষম ভগবানের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করাই আমাদের কর্তব্য!”

বাস, আর কিছু নয়! তবিত হইয়া একবার সেই মননের মলত চিতার দিকে — একবার অটলবাবুর খর চরণের দিকে চাহিলাম। এতদিনের পর চক্রাবের কবিত সেই ‘রহত’ আশ্বাস দিলের সালোর মত পরিষ্কার বোধ হইল! জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল না, কেন, কিসের ক্ষম এ অত্যাচার? স্পষ্ট হুজিলাম, বে-কুহুড়ি ওই হতভাস্যাকে আজ নিজের অকাল মৃত্যু নিয়ন্ত্রণে রাখা করিয়াছে, সেই কুহুড়িই একদিন পরশ্রিকাতর হইয়া, হিংস উদ্বাসনার নিরীহ জাতি-জাতার মৃত্যু ঘটাইতে উত্তত হইয়াছিল! মনরীধর নিরপরাধকে রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু অপরাধী, — মত যোগনেই অপরাধ করক, তাঁহার বিচারে পরিভাণ পাইল না! আশ্চর্য্য তাঁহার বিধান। অটলবাবুর ক্ষমাত্মক বেদনার্ত মুগের দিকে চাহিয়া বহুদিনের পর আজ সেই কার্পেটে বোন কবিতার শেষ ছন্দ হ’টা মনে পড়িল :—

‘অপকারী জনে, যে পায়ে কমিতে
তাঁর ক্ষমতার ক্ষম!’



['চরমে' সমালোচনার মত প্রকাশন অসম্ভব করিও। তাঁহার পুস্তক দুটখানি কথিবা পাঠাইবেন

ইতালিতে বারকয়েক—অধ্যাপক ঐগুরু বিনস্কুমার সরকার প্রণীত। প্রাণ্টিহান — দিল্লী লাইব্রেরী, ৪৪ কৈলাস বহু ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও ২৬ বামলাবাগার, ঢাকা। কলিকাতা 'কান্তিক প্রেস'-এ মুদ্রিত; ১৯৩২। পৃ: ২৮৪, কাগজের বীণাই, মূল্য ১৪.০।

এই পুস্তক ঐগুরু সরকার মহাশয়ের বিশেষ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা-প্রসূত "বর্তমান জগৎ" গ্রন্থমালার বাণশ খণ্ড—প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠার এই বই গইয়া ইহার চতুঃসহস্র পৃষ্ঠায় "বর্তমান জগৎ" সম্পূর্ণ হইল। শিক্তি বাঙ্গালী সরকার মহাশয়ের লেখার সহিত স্থগিত্তি। ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি, নৃত্ব ও সমাজত্ব, শিল্প-সাহিত্য ও অর্থনীতি—এককথার, সমগ্র "মানব-বর্ধক-ত্ব" সরকার মহাশয়ের আলোচ্য। এশিয়া, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও আফ্রিকা—এই চারি মহাদেশে অধিষ্ঠিত দীর্ঘ চতুর্দশবর্ষব্যাপী অভিজ্ঞতা লাভ করিবার কালে তিনি মাতৃভাষার সেবা করিতে কখনও বিরত হন নাই। সমগ্র বর্তমান জগৎ বিশেষে প্রশিধান সহকারে সেবিয়া আসিয়া তিনি নবীন ভারতকে উৎসাহিত করিতেছেন, "মাতৈঃ"-বাণী প্রচার করিতেছেন—বারিহের জগৎ দৃষ্টে নিম্ন জ্ঞান-পোচর ও কটি মত তিনি স্বমাত্তিক উৎসাহিত করিতে চেষ্টিত। তাঁহার এই চেষ্টার একটা ফল—এই বিশেষ-বর্ণন বিবরণ পুস্তকমালা। এই চেষ্টা ব্যাপশেষে সরকার মহাশয় নিজে কি কি করিয়াছেন বা করিতেছেন, সে কথা নিম্ন পুস্তকে তিনি অস্থিখিত রাখেন না—এ বিবরণে তাঁহার অনাবস্তক ও অস্থিচিত কৃষ্ণার অভাব তাঁহার

অস্থিখিত সারসংগ্রহই পরিচায়ক; সরকার মহাশয়ের আশা ও আশঙ্কা এবং উদ্দেশ ও উদ্দেশের সহিত পরিচয় লাভ করিয়া পাঠকবর্গ যে তাঁহার লেখার সমাক্রম-গ্রহণে সহায়তা প্রাপ্ত হন, একথা বলিতে পারা যায়। "লান চিবাইতে চিবাইতে এই বইয়ের মারফৎ" সাধারণ অজ্ঞ পাঠক ইটালি দেশ সম্বন্ধে অনেক কিছু খবর পাইবেন, একথা বলা বচলা। বহু ভাষায় বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন ও প্রবন্ধ-রচনা করা দূরেষ, সরকার মহাশয়ের লিখন-ভঙ্গীতে যে নিশ্চয় সারলা পাওয়া যায় এবং বাধ্যর্থের সম্বন্ধে অধিষ্ঠিত হইবার যে চেষ্টা সেবা যায়, তাহা তাঁহার রচনারীতির অস্ততম বৈশিষ্ট্য। তাহার প্রগতি সম্বন্ধে সরকার মহাশয় যে একটা গ্রন্থ সবল আদর্শ নিম্ন সম্বন্ধে স্থাপিত করিয়াছেন, তদনুসারে তাঁহার রচনা-শৈলীও তিনি গড়িয়া গইয়াছেন, এবং বিশেষ উৎসাহ সহকারে, তাঁহার নিম্নের কথা, "জোর সে" তিনি এই ভাষা প্রয়োগ করিতেছেন। বাঙ্গালী সাহিত্যের দরবারে, তাঁহার ভাষায়, এই রচনা-শৈলী একটা "নয়া চিহ্ন"। সকলে হয় তো এই চিহ্নটিকে পছন্দ করিবেন না, কিন্তু ইহা যে একটা সচেতন ও দা-পরজা মনের স্বষ্টি, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। "বর্তমান জগৎ"-এর অন্তত যে দৃষ্টান্ত ও তিনি লিখিয়াছেন, সেগুলির জায় এটীও বহুশোভিতে বসিয়া গর করিবার মত হাত্য। জগৎ সেবা। চক্কা হাত্য হইলেও ইহাতে ভাবী ও সাহাবান্ কথা অনেক আছে। মোটের উপরে, এই বইয়ের মারফৎ

বাহিরের হুনিয়ার হাওয়া দেশের ঘরো একটু বহাইবার চোঁটা করা হইয়াছে, এবং এই বই পড়িয়া মানসিক সাহিত্যিকারী বাঙালী পাঠক উপকৃত হইবেন। আধুনিক ভগ্নে ইটাদির স্থান কি, নানা দিক হইতে এ বিষয়ে পাঠকগণ আভাস পাইবেন। একটু খাপছাড়া তবে ইটাদি দেশ ও দেশের লোক-দের সম্বন্ধে নানা কথা বলা হইলেও বিশ্বের খুঁটানটী তথ্যে ভরপুর হওয়ার দরুন বইখানি ছুপাঠা ও উপভোগ্য। আশা করি বাঙালার প্রত্যেক পাঠান্বারে ও পুস্তকসংগ্রহে বইখানি স্থান পাইবে।

ঐত্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসের কথা—ঐত্বনী সেন প্রবীণ।

প্রকাশক—ঐপ্রমোদ সরকার। দাম একটাকা। চারি আনা; বাতায়ন পাবলিশিং হাউস, ১৪৪, ধর্মভাঙ্গা টাউন, কলিকাতা।

বিলাত-প্রত্যাপন অনেকই ইহার পূর্বে যে দেশ সম্বন্ধে ছোট-বড় অনেক বই লিখিয়া নানা বিভিন্ন সমাচার বৈশবাসীকে জানাইয়াছেন। শতীন সেন মহাশয় তাহার 'প্রবাসের কথা'র পূর্বে লেখকগণের মত তথাকার দর্শনীয় বস্তু বা অধিবাসীদের আমোদ-উৎসবের বিস্তৃত বর্ণনা সেন নাই। তাহার পুস্তক অল্প হিসাবে স্লাম্য। ইহা হইতে আমরা পাইব—ইউরোপীয় মহামুন্দের কল ঐ দেশে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অজ্ঞাত বিদ্যে যে বিপ্লব ও পরিবর্তন ঘটান্নাছে, তাহার আধুনিকতম পরিচয়। তদুপরি প্রত্যক্ষদর্শী বিচক্ষণ লেখক কর্তৃক 'গোল টেবিলের' দ্বিতীয় অধিবেশন উপলক্ষে সমাপিত মহাম্মা রাষ্ট্রী ও অজ্ঞাত ভারতীয় ঐতিহাসিক-গণের কার্যকলাপের নিরূপক সমালোচনা। তাহা যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনই শিক্ষাগ্রন্থ। একটা অধ্যায়ে প্রতীচ্য চিত্রশিল্পের ত্রুণিক পরিগণিত, আর রবীন্দ্রনাথের উপর তাহার প্রভাবের বিস্তৃত চিত্র-

কলাবিস্তারের পক্ষে বেশ উপভোগ্য হইবে। তাহার পর, অর্ধশতাব্দে পণ্ডিত ইংলণ্ডের বেকার-সমস্যা, 'দুসশীলান'-প্রবলন, সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিকল্পে দেশে-বিদেশে ব্যবসায়িকগণের বিশেষণূর্ণ প্রোপাগান্ডার কথা এই লক্ষণ ও অজ্ঞাত নানা বিষয় সম্বন্ধে গ্রন্থকারের সূক্ষ্মশূর্ণ আলোচনা হইতে সহজেই পাঠকের উপলব্ধি হইবে যে, এই বইখানি আকারে ক্ষুদ্র (পরিমিষ্ট সম্বন্ধে ২৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ) হইলেও তাহা ইহা নিতান্ত লঘু নয়। ইহার উপর আবার তাহার গুরু বাড়াইয়াছে তাহার প্রবান বিচার্য বিষয়। কারণ এই প্রবীর অজ্ঞাত গ্রন্থের মত এখানিও মুখ্যতঃ বিলাতের সহিত ভারতের তুলনামূলক সমালোচনা—উভয়ের জাতীয় চরিত্রগণিত সূক্ষ্মশূর্ণ লইয়া।

অবশ্যই বলিতে হইবে—সেই তুলনার লেখকের অভিন্নত অমূল্যের ভারত বড় কিছু সাধাবোধ করিতে পারিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার সমাজ-ঐতিহ্য সম্বন্ধে সমীক্ষান হইবার বিশেষ কারণ দেখা যায় না। বরং মনে হয়, পূর্বসূর্যের সূক্ষ্মশূর্ণ লইয়া অটল জাতো আক্ষর ভারত মুদুপ্রায়ে অবস্থায় 'সত্য' ভগ্নতের পদতলে পড়িয়া থাকে—এই লক্ষ্যের লেখক বাসিত। তাই সেই বাখার তাকুন তিনি চাহেন—ভারত বাঁচিয়া উঠুক, কিন্তু যদি তাহাকে বাঁচিতে হয়, তাহাকে বাঁচিতে হইবে মাদ্রবের মত—অর্থাৎ ইউরোপীয় মাদ্রবের মত। তাহাকে তাহার দ্বিতীশগতা বর্জন করিতে হইবে, দ্বিতীশগ হইতে হইবে অর্থাৎ কিনা ইউরোপীয়ের সহিত তালে তালে পা কেলিয়া চলিতে হইবে। কেননা দ্বিতীশগতা জীবন-স্তরের লক্ষণ। গতিই প্রাণের নিমর্শন।

ইহার উত্তরে প্রশ্ন উঠিতে পারে—বথার্থই তাই নাকি? দ্বিতীশগ পাশব লক্ষণ বান করিয়া জীব পোষণ করে। তাহার সেই সত্য কি সত্য সত্যই প্রাণহীন? অপর পক্ষে গতির দুর্গণ্ডিত পরিগণিত একেবারে কি করনাতীত? লক্ষণ প্রতীচ্যের প্রগতি এখনও

কালের পরীক্ষা-সাপেক্ষ; বিশেষতঃ তাহার গুণবা অমাপি অনিশ্চিত। এদিকে ঐক্যতির বিধানে অভিব্যক্তি ক্ষয়েরই ঘনিষ্ঠতা। এমন অবস্থায় পার্থক্য জীবন ব্যাপারে ঐক্যচোর যে নয় বীভৎস হৃদ লেখক নিজেই উন্মোচিত করিয়াছেন, তাহাও বহি তাহা সেবিয়া আতঙ্কিত চাইয়া ঐক্যচোর অহুসারী হইতে বিমূৰ্হ হয়, তাহাতে কি সোধ সেওয়া যায়? ছোর কল্পিতা তাহাকে সেই পথে ছাপিত করিবে তাহার সঙ্গতি হইবে নিকটই, কিন্তু লেখকের অর্থের বিপরীত ভাবে।

এইটুকু সঙ্কেত দ্বারা লেখকের সহিত মূল বিষয়ে আমাদের মতানৈক্য প্রকটিত হইলেও আমরা তাহার দার্শনিকোচিত পর্যবেক্ষণ ও বিচার-পদ্ধতি প্রশংসনীয় মনে করি এবং এই স্ফুটিত স্ফুটিত পুস্তক হইতে পাঠকগণ ঐক্যচা সমাজের বর্তমান ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন ও তাহাতে উপকৃত হইবেন বলিয়া বিশ্বাস করি।

হানে হানে দুই চারিটি ছাপার তুল চোখে পড়িলেও পুস্তকখানির সুগুণ ও তাহার বাহ্য সৌন্দর্য্য ঐতিকর।

বীকন

Butenschon (Andrea): The Life of a Moghul Princess, Jahanara Begam, daughter of Shah Jahan. With an introduction by Laurence Binyon. London: G. Routledge & Sons Ltd. 1931. 10s-6d.

সম্রাট-নশ্বিনী জাহান্-আরা বেগমের জাম্বুজিহব আকারে এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। সম্রাট শাহ-জাহানের রাজবংশের শ্রেণ্যে সমগ্র ভারতের উপর বিরাট বিরূপের যে প্রশংসা-কটিকা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছিল, ইতিহাস-রচনাগত পাঠকগণ তাহা এই পুস্তকপাঠের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ-সাম্রাজ্যের ভালে ভালে অল্পতব করিবেন। অসংখ্য জাহান্-আরা চকুর সম্মুখে প্রিয়তম শিশুকে বীরে বীরে মরণের কোষে ঢলিয়া পড়িতে দেখিয়াছে; প্রিয় ভ্রাতা দাদা সপরিবারে নিহত,

মুখ্য দূরদেশে পরাসিত এবং অতি অসহায় ও গণিত ভাবে মৃত্যু-কবলিত, ব্রাহ্মণ ও খোজের পদাচ্ছাদ্যারী—এ মর্ষকৃত দূত জাহান্-আরা দাঁড়াইয়া সেবিয়াছে কিন্তু কোন প্রতিকার করিতে পারে নাই। নশ্বিনী রাজনশ্বিনীর ক্ষমতার গোপন কথা, প্রশংসার বাণা, সহনশীলতার পূর্ণা নীতি—সমস্তই প্রকটী অতি নিশূণ ভাবে ফুটাইয়াছেন। শক্তিময়ী লেখিকার দিগন্তচরী অতি চমৎকার, তাহার ভাষা বেশ সুগঠিত; পুস্তকখানিতে যে কথখানি ছিন্ন আছে, তাহাতে পাঠক মোদগ হৃৎকের চিত্তাঙ্কন-পদ্ধতির নমুনা পাইবেন।

Turberville (A. S.) The Spanish Inquisition. London. Butterworth. 2s-6d. 1932.

বৃহদী পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে স্প্যানিশ ও ইম্পেরিয়াল প্রবর্তিত Spanish Inquisition-এর সূত্রপাত হইতে ১৮৯৯ পর্য্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষিত ইতিহাস। ক্যালিক মতের বিরুদ্ধবাদিনদের সহিত আঁটিয়া উঠিবার লড়াই মধ্যযুগে ইহার প্রজ্জ্বলিত হয়। মধ্যযুগের স্পেনবাসীদের অজ্ঞতা ও ক্রুরতা, নবগণ্যবোধের সত্যসূত্রের ক্ষয় তাহাদের প্রতি অমানবিক অত্যাচার, ধর্মান্ধতা—প্রভৃতি কাহিনী পাঠকের ফোঁফুল উত্তীর্ণ করিবে। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া যে পরধর্মবোধিতা স্পেনে বর্তমান ছিল, তাহারই লক্ষিত ইতিহাস এই পুস্তকখানিতে বিবৃত করা হইয়াছে।

Saintsbury (Ethel Bruce): A Calendar of the Court Minutes, etc. of the East India Company. 1671—1673. With an introduction and notes by W. T. Otterwill, etc. Oxford: Clarendon Press, 1932. 18s.

সাম্রাজ্য-প্রজ্জ্বলিত করণাও যখন ইংরাজ বণিক-দিগের মনে আসে নাই সেই সময় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কার্যাবলীর বিবরণ জানিতে হইলে এ পুস্তকখানি সে বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিবে। ঐতিহাসিকগণের পক্ষে পুস্তকখানি দৃশ্যবান বলিয়া বিবেচিত হইবে।

এস, কুমার

আলোকচিত্র - প্রতিযোগিতা

‘উদয়ন’ের কর্তৃপক্ষ আলোকচিত্র-প্রতিযোগিতার জন্য যে আটটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহাতে যোগদানের জন্য ভারতের নানা প্রদেশ হইতে বহু শিল্পী তাহাদের চিত্র পাঠাইয়াছিলেন। গত ১৮ই জুলাই তারিখে ‘উদয়ন’-কাৰ্যালয়ে ‘কোডাক-কোম্পানী’র মি: এন্স কটন, ক্যাপ্টেন এন্স কে বহু, এম-বি, আই-এম-এস ও উদয়ন-সম্পাদক — এই তিন জনকে লইয়া গঠিত একটি সমিতিতে উক্ত চিত্র-গুলি পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার সময় বিষয়-নির্বাচনের মৌলিকতা, চিত্র-গ্রহণের কৌশল, ‘প্রিন্ট’র উৎকর্ষ এবং সাধারণ সৌন্দর্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল। যে আটখানি চিত্র পুরস্কার লাভের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, আখিন-সংখ্যা ‘উদয়ন’ সেগুলি মুদ্রিত হইবে। নিম্নে সেগুলির পরিচয় দেওয়া হইল—

১। “কুহুম-চয়ন”

(প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত)

শিল্পী — শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বহু

২। “আলো ও ছায়া”

(দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত)

শিল্পী — শ্রীবিপ্রসাদ বহু

৩। “বিশ্রাম”

(তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত)

শিল্পী — শ্রীঅরবিন্দ বোব

নিম্নলিখিত পাঁচখানি চিত্রের জন্য consolation prize দেওয়া হইবে —

১। “বীশরী”*

শিল্পী — শ্রীমুচন্দ্রা মিত্র

২। “মুহু”

— শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

৩। “শিল্পী”

— শ্রীব্রজকিশোর সিংহ

৪। “অরুণোদয়ে”

— শ্রী এন্স. সেনগুপ্ত

৫। “ভারী-ধূসী”

— শ্রীহনীলকুমার বহু

* শিল্পী এই চিত্রখানি প্রতিযোগিতার ভিত্ত প্রথমে বু ব্রহ্মট আকারে পাঠাইয়াছিলেন, তাহার কল ইহার দৃষ্টে পরিমাণে সৌন্দর্য্যহানি হয় ও ইহা পরীক্ষার সময় উপযুক্ত সমাধার লাভ করিতে পারে নাই। পরে তিনি এখানির ব্রোমাইড এন্লার্জমেন্ট করিয়া বহন পাঠান, তাহা দেখিয়া মনে হয়, ইহা আরও উচ্চতর সমাধ লাভ করিতে পারিত। — উদয়ন-সম্পাদক

বাঙালীর বিনোদ

ঐরাপাকমল মুখোপাধ্যায়

বাংলার অবনতির কারণ অনুধাবন

‘উদয়ন’ের সম্পাদক মহাশয় আমাকে বাঙালী জাতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সুযোগ দিয়া অহুগ্রহীত করিয়াছেন। অনেক কারণে বাঙালী জাতির ও সমাজের অস্তিত্বের পরিবর্তন অবশ্যকরী। একদুগ পূর্বে দুর্গতিত কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ‘ঐক্যোদয় হিন্দুজাতি’ সম্বন্ধে আলোচনার সূচনা করিয়া দেশময় আন্দোলন আনিয়াছিলেন। ‘অনুভবদ্বার’, ‘পঞ্জীবনী’, ‘উদয়ন’, ‘গৃহস্থ’ প্রভৃতি পত্রিকা বহুবৎসর এই আন্দোলন সজীব রাখিয়াছিল। বাংলা দেশের নানা প্রকার সমাজ-সংস্কার ও অগ্রগতি জাতিগণের মধ্যে বিস্তার আন্দোলন তখন হইতে শুরু হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে নৈশ বিভাগের প্রতিষ্ঠা ও শোকশিকার বিতারকল্পে নানা উদ্ভোগ-অগ্রহান তখন হইতেই বাংলার দেখা গিয়াছে।

কিন্তু প্রাকৃতিক, আর্থিক ও সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলি মানুষের শক্তি ও সতর্ক বাণী শুনে নাই। এই দূশে বাংলাদেশ জুড়িয়া ব্যাধি, দৈত্য ও অবনতির জয়যোযা। অতি নির্ধনভাবে বাঙালীর রাজনৈতিক প্রচেষ্টাকে বিভ্রম করিতেছে। বাঙালী জাতির অধঃপতনের কারণ ম্যাসেজিয়া অথবা জল-প্রাচীন, বাংলাদেশের শিল্প-ব্যবসায়ে অ-বাঙালীর প্রভিষ্ঠা বা বাঙালীর প্রযুক্তিকর্তৃত্ব ও হস্তিকের অপব্যবহার, বাংলার রাজনীতিতে মুসলমানের প্রভাব অথবা বিপ্লববাদের আবির্ভাব, এই প্রকার নির্দেশে ঐ সমস্যাটিকে অবিচার করা হয়। কোন জাতির হর্ষণের কারণ এত সহজে নির্ণয় করা যায় না। কোন একটা কারণ এতদূর যের অবনতিরও সূচনা করে না। ব্যাপক ও সমগ্র দৃষ্টিতে বাংলার অধঃপতনের কারণ অনুধাবন করিতে হইবে।

কীর্তিনাশা গঙ্গা নদী ছয় শতাব্দী ধরিয়া পূর্বগামিনী

বাংলার সত্যতা নদী-মাতৃক। রোমীরগণ প্রাচীন বাংলাকে সম্রাজ্য্য বলিয়া বর্ণনা করিতেন। গঙ্গা নদী বাংলাদেশকে গড়িয়াছে ও তাকিয়াছে, আবার গড়িয়াছে ও নতুন করিয়া তাকিয়াছে। নদীর ‘ব’-প্রদেশের প্রাকৃতিক বিশেষত্বই এই উদ্যান-পতন। জল ও স্থলভূমির বিপ্লব বাংলার সত্যতার মানচিত্রকে বহুবার নতুন করিয়া অঙ্কিত করিয়াছে। দূশে দূশে এই বিপ্লব সম্রাজ্য্যতার প্রসার ও অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়।

একদা গঙ্গা নদীর মূল প্রবাহ মেঘিনীপুর অঞ্চলকে ঐ ও সম্পদ দান করিত। সে এক হাজার বৎসরেরও পূর্বের কথা। তখন তায়সিগি প্রাচ্য ভারতের প্রধান বন্দর ছিল। বৌদ্ধবুৎ হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীস্টের পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত, যখন ফা-হিয়েন ঐ বন্দর হইতে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন, তখন পর্যন্ত তায়সিগির পৌরব-অট্ট ছিল। খ্রীস্ট প্রথম শতাব্দী হইতে সপ্তদশাব্দে উদয় দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যযুগে সপ্তদশাব্দ বাংলার প্রেত বন্দর বলিয়া রোম ও পশ্চিম এশিয়ার ব্যাতি লাভ করে। কিন্তু বৌদ্ধ শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী নদীর পরিব্রাজ্য গম্বিত হয় এবং তাহার ফলেই সপ্তদশাব্দে কীর্তিনাশ। যে বন্দর যেরূপে ও প্রেমে ১১ বর্গ মাইল ছিল, ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে তাহাকে জ্বান ডেন ব্রুক (Van Den Broucke) একটি নগর্য গ্রাম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। ঐ সময়েই তায়সিগি নদীরও দূরবাহার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ত্যোনিয়া (Tavernier) লিখিয়াছিলেন যে, বার্নিয়া (Bernier) গঙ্গাপথে

আসিতে আসিতে রাজমহলের নিকট অবতরণ করিতে বাধা হইয়াছিলেন। ভাগীরথীর বুধে পথার চর নৌকার গতি রোধ করিয়াছিল। তিনি কাশিমবাগারে বাইতেছিলেন। কাশিমবাগার তখন একটা প্রধান নগর; অনেক ইরান, ফরাসী, ওলন্দাজ ও আরমেনিয়ান বণিক সেখানে বাসলা করিত।

বাংলার বন্ধরগুলির ইতিহাসের সুবিশেষ উল্লেখ অনাবশ্যক। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, হুগে বুধে ভাঙ্গলিগি, সপ্তগ্রাম, নবগ্রাম, বগোহর, চট্টগ্রাম, বাকলী প্রভৃতি বাংলার সামুদ্রিক সম্পদ ও প্রভাবের সাক্ষী। 'ব'-এরূপে নদী কত জনপদকে লোক-বহুল ও সম্পদশালী করিয়াছে, আবার জনহীন, শ্রীহীন, বিপর্যস্ত করিয়া ত্যাগ করিয়া দিয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে এখন পক্ষা নদী ভাগীরথীর প্রবাহ ত্যাগ করিয়া পূর্বগামিনী হইল, তখন হইতে পরস্পর জলাশয়, মাথাভাঙ্গা, কুমার, নবগঙ্গা ও গড়াই নদী পূর্বপশ্চিমী উপনদীরাগ ও ভাগীরথীর মত জন-বাহিনী হইল। কিন্তু তবুও সমস্ত পাখাকে নিষাকরণ ভাবে ত্যাগ করিতে করিতে, কত শত নগরীকে সম্পদহীন করিতে করিতে, পক্ষার অনিবার্য গতি ক্রমাপত্ত নিম্নলি উবার অল্পকালে পূর্বসুত্র-মোহনার অভিমুখে।

বাঙালীর কল্পনার ভাসালক্ষী ঢকলা, জি-প্রসতি। বাংলার ভাসালক্ষীর সিন্ধুরেখা প্রভাতসূর্যের নির্বল কিরণ। নবাবের ভাষার কপোলমেশ রঞ্জিত করে, যখন তিনি দ্বানাতে সিংহাসনে জালীবনোপ্তিত সন্ত-উপকূলে উঠিয়া পান। বেদিনীপুর হইতে নোয়াবাদি, সাগর হইতে পনবীপের অনেক ব্যবধান, তবুও যে-নদীগুলি বহু শতাব্দী পূর্বে ভাঙ্গলিগি ও সপ্তগ্রাম অঞ্চলের জীবিতের কারণ ছিল, তাহারাই নতন করিয়া চট্টগ্রাম উপকূলে বাংলার বাসার্কিরণ-মাতা ভাগা-নদীর চরণ বন্দী করিতেছে। বেখনার উপকূলে বাংলার লক্ষী ভাষার স্বর্ণসিঁহাসন

বশাইজেহন, পশ্চিমে অলক্ষী ও নূহর করাল হায়া নিপত্ত-প্রসারিত।

পক্ষার পূর্ববাহার কারণ

পক্ষার এই পূর্ব-অভিযানের কারণই বা কি? নদী-মাতৃক সেবে লোকসংখ্যা অতি নগর ও উজ্জ্বলতার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সমগ্র সমস্ত ভূমিতে লোক ও কৃষি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মাছের কুঠার ও লাঙ্গল নইয়া পক্ষতের সাহসে আক্রমণ করে। অরণ্য ভূমিমাং হইতে থাকে, মোক্ষাতি ও কৃষি নিরিলক্ষণ করে। নদীর শাখা-প্রশাখার উৎপত্তি-স্থলে এই যুগপতস্পর্শা ধরিয়া অরণ্যজেহন ও চর্যাসনের পাপ মাছবের আগামী-বৎসকে ভোগ করিতে হয়। সিরির সাহসে মাটির অবিরাম ক্ষয় হইতে থাকে। বনভূমি বৃষ্টি-বারা বক্ষা করিবার আর সুযোগ পায় না, সুতরাং মরুও বৃষ্টিপাতের পরেই আসে নদীর বিপুল বক্ষা। পক্ষতের সাহসে সমস্ত মাটি ধুইয়া পুছিয়া সেই বক্ষা ক্রমাপত্ত ঐ পলি ঢালে নদীর গর্ভে। তাহার ফলে হয় নদীগুলির গতিব্রাস, অবরোধ বা গতি-পরিবর্তন। নদী-তটের হুই দিকের মেশ নদীর জল ও পলি হইতে বক্ষিত হইয়া ক্রমশঃ অধুর্কর হইতে থাকে। নদীগুলিও বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বক্ষিয়া দিয়া ক্রমশঃ 'কছু ও আগাহার পরিপূর্ণ হইয়া বায়। নদী যখন নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তখন সেখের জল-সরবরাহের ব্যত্যয় ঘটে। ফলে—ম্যাসেরিয়ার প্রেকোপ, মাছবের স্বাস্থ্যহানি, লোক-সংখ্যার হ্রাস এবং জনপদের পুরাতন অবিকার জাপন।

বরেন্দ্রভূমি ও ব্রাহ্ম বক্ষণ পূর্বে জনপদ ও লোকবহুল হইয়াছিল। তাহার ফলে বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের সিরিপ্রদেশে অরণ্যবিনাশ-কাণ্ড বহুপূর্বেই হুচিত হইয়াছিল।

পক্ষতমানে ও পক্ষতের সাহসে অরণ্য-

বিনাশের ফল বহুবেশ ভোগ করিয়াছে। চীনদেশে হোয়াংহো নদী এই কারণে এত ভীষণ বড়া বৎসর বৎসর আসে যে, চীনারা ঐ নদীর নাম দিয়াছে 'চীনের অতিশাপ'। বহুগুণ্য বরিষা বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের অরণ্য-ক্ষেত্রের ফলে, সামোদর ও তিত্তা নদী তাহাঙ্গিদের গতি পরিবর্তন করিয়াছিল প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে। সে সময়কার কয়েকটি প্রাকৃতিক ঘটনা তদানীন্তন রাষ্ট্রিক ঘটনা অপেক্ষাও মরদীর্ঘ। ১১১০ খৃষ্টাব্দে যখন সামোদর নদ কাটোয়ার সমন্বয় ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবাহী হইল, তখন হইতে বাংলাদেশের একটি পুরাতন সভ্যতা ও সম্পদের কেন্দ্রের অধঃপতন সুনিশ্চিত নির্ধারিত হইল। ১১৬৫ হইতে ১১৭৫ সালের মধ্যে পদ্মা নদীও করিমপুর ও বাবরগঞ্জের ভিত্তর বিচা। বারীন প্রবাহ ত্যাগ করিয়া অতঃপ্রবাহ ধরিল এবং ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে তিত্তা নদীও 'ফুলচুরি' খাটে ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইল। এই নদী-পরিবর্তনের ফলাফল সমগ্র বাংলাদেশ এখন ভোগ করিতেছে। একদিকে সামোদরের বিশদগমন ও মধ্যবাংলার শাখানদীগুলির গতিরোধ যেমন সমগ্র পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে অস্বাভা, গোকহানি ও কৃষির অধনতির কারণ হইয়াছে, অপর দিকে নৃতন বহুনা নদীর অবাধ বিপুল প্রবাহ দিকে দিকে নৃতন লোকবহল জনপদ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে।

কিন্তু প্রকৃতি নদীর গতিপরিবর্তন করাইয়াই কাত হন নাই। প্রকৃতি মানুষকে অল্পভাবেও শাস্তি দিতেছেন। তিত্তা, আঙ্গুরী ও বহুনা, অজয় ও মদ্যাকী, সুবর্ণরেখা ও সামোদরের ভীষণ বড়া—বাঙালীর পূর্বজন-বংশের অপরিশ্রামশক্তিটাকে এখনও নিদাক্ষ বিহীন করিতেছে।

নদীর গতিহ্রাস ও পরিবর্তন হেতু মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গে কৃষি ও লোকসংখ্যার হ্রাস

গত চারি শতাব্দী ধরিয়া অরণ্য-ক্ষেত্র, নদীর

গতিহ্রাস ও সমস্ত কৃষির ধীরে অধিরোধ চলিয়া আসিতেছে। পশ্চিম ও মধ্য বাংলার সমস্ত কৃষি এখন নদীগুলির জলসেচা অপেক্ষা উঠে। উত্তর বঙ্গেও নদী-প্রকৃতির এই অনিবার্য বিপর্যয় ক্রম চলিয়াছে।

উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের সব অঞ্চলেই নদ-নদীর বিনাশের নানা ক্রম বা পর্যায় লক্ষিত হয়। কোথাও নদী আগাছার ভরা, মনে হয় বা সেখানে জল; কোথাও স্থানে স্থানে ঈষৎ স্রোত বা 'আবর্ত' পুরাতন প্রবাহের নির্দেশ করে। কোথাও বা নদীর তল গর্তে কয়েক পৃথক ধরিয়া চান্দ-বাল আরন্ত হইয়া দিয়াছে। শুধু গ্রামের নাম স্মৃত প্রাচীন নদী-পথের সন্ধান দেয়। নদী-পরিভ্রান্ত প্রত্যেক অঞ্চলেই শ্রীহই কবলে তরিয়া উঠে, এবং যেখানে জল গ্রামের ভিত্তিকে আক্রমণ করে, সেখানেই ম্যাসেরিয়া প্রবেশ করিয়া গ্রাম উদ্ধার করিয়া দেয়। 'ব'-প্রদেশের অনিবার্য বিপর্যয়ের ফলে মধ্যবঙ্গের অধিকাংশ নদীগুলি কীণজোয়া, কল্যাণদার, সমগ্র বঙ্গের জল-সরবরাহ বাধাপ্রাপ্ত, এবং অসংখ্য ম্যাসেরিয়া-কুই খাল, বিল, জলা, জলের উত্তর। পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গের বাঙালী বিতণ। প্রকৃতি ও শ্রীহীন কল্যাণিনী নদীর সহিত সংগ্রামে পরাও। এ সংগ্রামে ভবিষ্যতে তাহার জয়ের আশাও কম।

জলপ্লাবনের দ্বারা ম্যাসেরিয়া নিবারণ
ও কৃষির পুনরুদ্ধার

বিহার প্রদেশে গঙ্গা নদীতে বাধ বাধিয়া প্রকাণ্ড অপ্রাকৃতিক সরোবর তৈরী করিয়া, ফেলার ফেলায় খাল কাটিয়া বর্ষার নৃতন জল মরা গাওে বৎসর বৎসর না চান্দিল করিষ্ক 'ব'-প্রদেশের ধ্বংস অবগতাবী।

উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গে, যেখানে বড় মরা

নদীর কঙ্কালবশেষ বহু স্রোতহীন বিল ও খাল রূপে দেখা যায়, এবং গ্রামে গ্রামে বেখানে বহু পড়িল কলাশর আছে, সেখানে তরানদী হইতে নুতন জল আনিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রাণিত করিয়া নিতে হইবে। ইহাতে জমিও পলিমাটি পাইয়া উঠির হইবে। খাল, বিল, কলাশরের পঙ্কোচ্চার হইয়া মধ্যস্তর চাষ বাড়িবে, ও মশক-কুলও বিনষ্ট হইবে। চাষিদিগকে এখন কৃষির যে অবনতি ও দৈন্য দেখা দিয়াছে, তাহার এবং নদীর বন্ধারও প্রতিরোধ হইবে। যদি এই প্রকার ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে বাংলার পূর্গবিভাগ কমিটির (১৯০০) সপ্তম ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবে—মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গ অঙ্গিরে জল ও জলাভূমিতে পরিণত হইবে, নিঃসন্দেহ।

তদু জলপ্রাবনের দ্বারা একই সঙ্গে ইতালী ও পালেস্তাইনে কৃষির উন্নতি ও ম্যাসেরিয়া নিবারণ সাধিত হইয়াছে। বাংলাদেশেও এইরূপ ব্যবস্থা চাই। পল্লাবের পূর্গবিভাগ ঐ প্রদেশের জলপথ রক্ষা ও সংহারকল্পে বিপুল অর্থব্যয় করিতেছে। কিন্তু বাংলাদেশের মন্ত্রীদিগের অর্থবল নাই। জলপ্রাবনের সঙ্গে এক একটা কেলার ম্যাসেরিয়া-বিধ-বর্জিত অংশের সমস্ত লোককে কুইনাইন ও প্রাসমোচিন দ্বারা শোধন করিয়া লইতে হইবে। তখন মশককুলও বিধ গ্রহণ ও উৎসারণ করিয়া ম্যাসেরিয়া বহন ও বিস্তার করিতে পারিবে না। একই সঙ্গে কৃষির উপযোগী সাময়িক, নিয়ন্ত্রিত প্রাবন (bonification), জলাভূমির স্ফীত, মশককুলের বিকল্পে অভিযান ও বাহুরের সেহের বিধ নিষেধ না করিলে ম্যাসেরিয়া হইতে রক্ষা নাই। জল-সরবরাহের সুব্যবস্থা হইলে, এবং পিকা ও সাধারণ স্বাস্থ্যোন্নতির ফলে দৈনিক রক্ষণশীলতা বাড়িলে, মশকের বিকল্পে বৃদ্ধ অপেক্ষা অবিকল্পিত জল পাতরা দ্বারা,—ইহাই ইতালীর অভিজ্ঞতা।

রেলপথ ও সেতুর দ্বারা নদীর গতিরোধ হেতু কৃষি ও স্বাস্থ্যের অবনতি

আবদা মেসিলাম, মধ্য ও পশ্চিম বাংলার অধোগতির প্রধান কারণ নদনদীর গতিহীন ও গতি-পরিবর্তন। 'ব'-প্রদেশে সত্যতার উদান-পতনের সঙ্গে জলপ্রবাহের সম্বন্ধ অতি নিবিড়। মাহু ব্রি-প্রদেশের জল কাটা, পর্কতের সাগুসেপের সবুজ মাছদান কাড়িয়া লইয়া আপনাদের বাসস্থান গড়ে, কৃষিবিভার করে, অথবা খনি হইতে কয়লা সংগ্রহ করে। বিবর পূর্ণতগাত্র লক্ষ্যের বক্রিম হইয়া বঙ্গের বঙ্গের বর্গগণে বিপুল বক্রাতে দিক্ দিক্ ভাসাইয়া দিয়া প্রতিশোধ লয়। বহন সমস্তলূমি জলে জলময় হয়, তখনই নদী নিরুত্মিতে নুতন পথ খুঁজে। সীমাহীন প্রাবনের মধ্যে এইরূপেই দামোদর, তিত্তা, বহুনা ও গদা আপনাদিগের নুতন প্রবাহ অঙ্গলক্ষ্যন করিয়া লইয়াছিল। মাহুও নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া, বড় রাতা, রেলপথ ও রেলসেতু নির্মাণ করিয়া জলপ্রবাহ রোধ করিয়াছে। তখন নদীগুলি স্রোতহীন ও পড়িল হইয়া ম্যাসেরিয়া মহাবারী আনিয়া দেয়, অস্ত নদীগুলি বর্গগণে অস্বাভাবিক ক্ষীণ হয় এবং বহু আরও রোমে গর্জিয়া উঠে; মাহু প্রকৃতির শাস্তি-দানকে এইরূপে আরও নির্মম করিয়া তুলে।

বেখানে মরানদী সমস্তলূমিকে তাহার আত্মকীর্তি লাল জল দান করিতে পার না, সেখানে মাটি হয় অহুর্গর ও অভিশপ্ত এবং একই সঙ্গে কৃষির অবনতি, গোষ্ঠাতির ও মাহুদের স্বাস্থ্যের অধঃপতন ঘটে।

মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের অবনতি

জাতির কৃষ্টি-বিকাশের অন্তরায়

পূর্ব-কালে ঐ প্রদেশে সত্যতার কেন্দ্র ছিল পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর বঙ্গ। হুগে হুগে তাত্রলিপি, মহাদান, বর্ধমান, কোটবর্ধ, বিজয়নগর, ছুরিচ্রেষ্ঠ, কর্ণস্বর্ধ, সৌধ, ও নবদ্বীপ বাংলার নৌবাহুর উত্তরাধিকারী। উনবিংশ

পতাবীতে পাশ্চাত্য শিক্ষা-পীকার ফলে যে নূতন কৃষি বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে অশিক্ষিতের জীবনের ও সমাজের আদান-প্রদান নাই। আর এই উনবিংশ শতাব্দীতেই মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের অবনতি। ইহার ফলে আমাদের নূতন সভ্যতা হইয়াছে অনেকাংশে নব-নাগরিক। সাহিত্যে, চিত্রায় ও বাস্তবীকৃত আমরা মধ্যবিত্তশ্রেণীস্থলভ (bourgeois) কৃষিক্ষতার প্রভাব দেখিতে পাই; ইহাদিগের সঙ্গে জাতির সভ্যতার অন্তঃস্থ মূঢ় ও মুক্ বিরাট ক্রম-সমাজের তাব-বিনিময় ঘটে নাই।

ব্যাবহিক পক্ষে বঙ্গের ২৩ অংশে পরীক্ষাসভ্যতার মানি ও বিলোপ বাঙালী জাতির পক্ষে শুধু যে তাহার বর্তমান শোচনীয় বৈষয়িক অবস্থার দাক্ষ্য দেয় তাহা নহে, ইহা এখন তাহার কৃষ্টির পরম অন্তরায় হইয়াছে। পশ্চাত্তরে দশপ্রায় পরীক্ষাসভ্যের পুনরুদ্ধার ও বহু গ্রামের সম্পদ-ক্ষতির আশ্রয় ও সরিগল নাই হইলে, আমরা এক অসীম প্রজাতির মরীচিকার সিংহ ঘুরিব। জনসাধারণ আশ্রয়বিহীন স্বাভাবিক ও অধিকারের পূর্ণ সুযোগ লাভ করিবে না।

কলিকাতা নগরী এখন একটা বিরাটকার অট্টোপাসের মত অসংখ্য গুঁড় বিস্তার করিয়া চারিদিকে পরীক্ষাসভ্যকে শোষণ ও রিক্ত করিতেছে, ফলস্বরূপে তাহার মধ্যে তাহার সৌখ্যমালা উঠিতেছে আকাশকে স্পর্শ করিবার ক্ষমতা। পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গের কৃষি ও নিম্ন-সম্পদের ভারসাম্য বন্ধ করা অনন্তর হইত না যদি মানব অক্ষল, যেখানে খনিজ পদার্থ সমুদায় একটা নূতন বড়িফ নিরাক্তর সঞ্চিত করিয়াছে, তাহাকে কাড়িয়া লইয়া বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা না হইত। বহু-বিভাগ এখনও রথ হয় নাই। এই অক্ষলে অনেক বাগ্যভাষা-ভারী ও অনেক বাঙালী আছে,—তাহারা এখন বাংলার বাহিরে। এই প্রদেশ হইতে নানা আশ্রয় জাতি ও আদিম পশ্চিম বঙ্গে চা-আবাদ করিতেছে। অনেকগুলি বাঙালী জনগণ এই অক্ষলে প্রতিষ্ঠিত, অনেক কারখানার এবং বনিতেও বাঙালীর সুপ্রতিষ্ঠা।

এই অক্ষল বাংলাকে প্রান্তরপ করিলে পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গের অবনতি ও শিক্তিত ভ্রমলোকশ্রেণীর বেকার ও দারিদ্র্য সমস্যার কিছু প্রতিকার হইত। পরীক্ষাসভ্যের সম্পদ ও স্বাভাবিক ও শুধু যে ভ্রমলোক-শ্রেণীর দুঃস্থতার কারণ তাহা নহে, ইহা বাংলার সমাজ ও সাধারণ লৌকিক সভ্যতার মানিও প্রধান কারণ।

পূর্ববঙ্গের গ্রামগুলি কিন্তু শ্রীহীন, বিক্ষত নহ। সেখানকার সুস্থির পরিচয় আমরা কেবলমাত্র কয়েকটি বড় নগর ও জনপদেই পাই না। পশ্চিম বঙ্গের বহু পূর্ববঙ্গে নগর ও গ্রামের প্রতিস্থলতা দেখা যায় না। সেখানকার স্বাভাবিক ও সম্পদ, দশাধর ও লৌকিক সভ্যতা, দোকানদার স্তল জনগণগুলিই কম-বেশী ভাঙ্গা করিয়া লইয়াছে।

বাংলার লোক ও সম্পদ-ক্ষতির কেন্দ্র পূর্ব অক্ষলে অপসারিত

নবীর প্রবাসভোগ ও 'ব'-প্রদেশের স্বাভাবিক অযোগ্যতা হেতু বাংলার কৃষি, বাণিজ্য ও সম্পদের কেন্দ্র আদ পূর্ববঙ্গে অপসারিত। পূর্ববঙ্গের সভ্যতা অতি-আধুনিক ইসলামানী সভ্যতা। হাদক্ কিচ্ (বোড়শ শতাব্দী), মুলাদাউ-উল্-তারিখ্ প্রভৃতির বর্ণনায় আমরা জানিতে পারি যে, বোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতেও পূর্ববঙ্গের অনেক অংশ জনবিরল ছিল। মাদুদাবাদ ও বলিকাতাবাদে (দক্ষিণ বঙ্গোহর, করিমপুর, নোয়াখালী ও পশ্চিম বাঘবঙ্গ) শুধু বহু হাজার অভ্যচার হইত এবং প্রধান নগর (?) পোনারগাঁয়ে রায়ে বাঘের বিধম ভয় ছিল।

বাংলার প্রাচীন জনপদের ফলে ও অর্থোচীন ইসলামানী-সভ্যতার উপানের সহিত বাংলার ভবিষ্যৎ ওজ্জ্বলতা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। নিম্নলিখিত তালিকায় মধ্য ও পূর্ববঙ্গের কৃষি, স্বাভাবিক ও লোক-সংখ্যার বিপরীত পতি বুঝা হইবে।

কৃষিক্ষেত্র নং- প্রদেশের জেলা	১৯১১ সালের কৃষিত ভূমি (একর) বর্ষায়	১৯১১ সালের কৃষিত ভূমি (একর) বর্ষায়	কৃষিত ভূমির হ্রাস- বৃদ্ধি (শতকরা)	ম্যানেরিয়ায় পরিমাণ (শতকরা)	লোকসংখ্যার হ্রাস- বৃদ্ধি (শতকরা)
বর্ধমান	১,২৪৮,০০০	১৪২,১০০	-৪০	৫০.৪	+০.৭
নদিয়া	১১০,৪০০	১১৬,২০০	- ৭	৪৮.৭	-৮.১
হুগলিবাড়	১,১০৬,৬০০	১৪৬,৫০০	-১৪	৪১.৭	+২২.১
বনোহর	১,০০০,৬০০	৮৮৭,০০০	-০.১	৪৮.২	-৭.২
হুগলি	৫৪১,৪০০	২১০,১০০	-৪৫	৪৬.৬	+৬.২
বর্ধিষ্ণু 'ব'-প্রদেশের জেলা					
ঢাকা	১,৮৮৬,১৬১	১,৭১১,০০০	+৫.৭	১.৭	+২৮.১
মৈমনসিংহ	০,৭৭৬,৮০০	০,৬৭৪,৪০০	+১১	১১.১০	+২৮.৫
ফরিদপুর	১,২১৫,৮০০	১,৪৭০,০০০	+১০	২৬.৬	+২১.৬
বাগেরহাট	১,৬৬৭,০০০	২,০১৫,০০০	+২.১	৮.০	+২৭.১
মুন্সিগঞ্জ	১,০১৫,১০০	১,৪৭২,৮০০	+১১	৭.২	+০৭.৭
নোয়াখালী	৪২১,৮৭৭	১১২,২৮০	+১৫২	১০.৫	+৪২.১

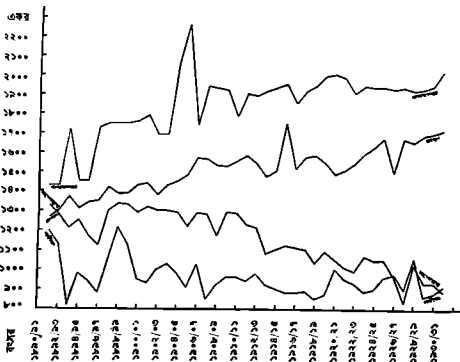
নিম্নে প্রদত্ত ১নং চিত্রে বাগেরহাট ও ঢাকার অব্যবহৃত প্রদেশ এবং বনোহর ও নদিয়ার কৃষির ক্রমশঃ বিশেষ ক্ষতি লক্ষিত হইবে। আর ২নং চিত্রে এই চারটি জেলার গত ৫২ বৎসরে লোকসংখ্যার (প্রতি বর্গ মাইল) বৃদ্ধি ও হ্রাস লক্ষিত হইবে। কৃষির ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে বনোহর ও নদিয়ার লোকসংখ্যা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। চতুর্থ মানচিত্রে বাংলার বিভিন্ন সাব-ডিস্ট্রিক্টে গত ৩০ বৎসরের লোকসংখ্যার প্রগতি ও অধোগতি (৩নং চিত্র) ও ম্যানেরিয়ার প্রকোণের পরিমাণ (৪নং চিত্র) নির্দেশিত হইয়াছে।

মরানদী ও কয়লু প্রদেশ বনাম

জীবন্ত নদী ও বর্ধিষ্ণু প্রদেশ

মধ্যবর্তী মরানদীর সংখ্যা সর্বাধিক।

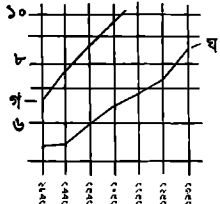
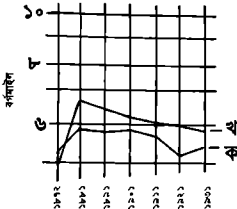
কৃষিত ভূমির পরিমাণ (০০০ একর) — (১নং চিত্র)



এই অঞ্চলে সর্গাপেক্ষা কৃষির অবনতি, লোকসংখ্যার হ্রাস ও ম্যালেরিয়ার প্রাচুর্য্যের ঘটনা হচ্ছে। পূর্ববঙ্গে নদীগুলি অবাধ ও খরপ্রোতা; সেখানে বীধ, বান্ধা ও রেলপথের সংখ্যা কম। পূর্বে অঞ্চলে বহু সুব্যবস্থা করে। আমন ধান ও জুয়ারি বাগানের সম্পদে বাধরগঞ্জের অনেক এলাকায় ১৫০০ হইতে ১৭০০ লোক প্রতি বর্গ মাইলে পালিত হয়। বাধর-গঞ্জের ফল ও শাক-সব্জীর বাগানের পরিমাণও

২নং চিত্র

১৮৭২ সাল হইতে ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত গত ৪২ বৎসরের (ক) নদীয়া, (খ) যশোহর, (গ) ঢাকা ও (ঘ) বাধরগঞ্জ জেলার লোকসংখ্যার (প্রতি বর্গ মাইল) হ্রাতি ও হ্রাসের পরিমাণ



উদ্য:—প্রতি বর্গ মাইল লোকসংখ্যার দান প্রতি বর্ষ ১০০। ঢাকা ১৯০১, ১৯২১ ও ১৯০১ সালে প্রতি বর্ষ ১০০০

তিনটি আমন-সুন্দারীতেই লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে। পূর্ববঙ্গের লক্ষ জেলাতেই কৃষির বিপুল প্রসার এবং অবিক্রাণে সাব-ভিভিসনই ম্যালেরিয়া-মুক্ত।

বাধরগঞ্জের এক অংশের জনগণের মানচিত্র (২নং চিত্র) হইতে কৃষির সঙ্গে জনপ্রবাহের লক্ষ্য নৃক্য ঘাইবে। জনপ্রবাসন হেতু আমন ধান এখানকার প্রধান ফসল। সমগ্র কর্তিত কৃষির শতকরা ৮৫ ভাগ বাধরগঞ্জে আমন ধানের পরিমাণ। নিরমিত বস্ত্র সমস্ত দেশকে প্রাণিত করিয়া দেয়, নিগুণিত প্রসারিত সর্ব্ব আমন ধান বস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠে। কৃষ্টিপাত অপেক্ষা বস্ত্রই কৃষির সহায়। যে জনগণ-গুলি কৃষির অবদান, তাহারাই আবার বস্ত্রের পর বস্ত্র জনপ্রবাহ বিপত্তী নিকে বসিতে থাকে, তখন সমগ্র অঞ্চলে জননিকাশ ও আবর্জনা-পরিষ্কারের

বালোপেয়ে সর্গাপেক্ষা অধিক,—১৫৫,০০০ একর; বর্ডমানের ১১,০০০, নদীয়ার ৫,২০০ ও যশোহরের ৩,২০০ একরের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। এখনও বাধরগঞ্জের সর্গি ও লোকসংখ্যা অনেক বাড়িবে।

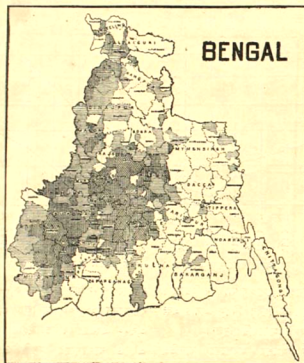
পূর্ব অঞ্চল বর্ডিমু, কিন্তু হিন্দু
এখানে ক্রিয়াকু

আমরা মেঘিলাম, পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে লোকসংখ্যার অবনতি ও পূর্ববঙ্গে কৃষি ও লোকসংখ্যার বিস্তার বাংলার আধুনিক ইতিহাসের সর্গাপেক্ষা প্রধান তথ্য। আর একটি প্রধান তথ্য এই যে, পূর্ববঙ্গের বেঙ্গল জেলায় কৃষি ও সম্পদ বাড়িতেছে, সেখানে হুলসমানের

সখ্যা বিশ্ব অশেখা উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। অপর দিকে কমপ্রাণ যথাবস্তুর অধিকায় বেলায় হিমু হঠিয়া বাইতেছে, কিন্তু মূলস্রোত সেই শূন্যস্থান দ্রুত অধিকার করিয়া লইতেছে।

	१९७१	१९७२	१९७३	१९७४	१९७५
वर्षाधान	१३२	१४४	१४३	१४४	१४४
बुद्धिमान	४३८	४४४	४२०	४०४	४०४
महीना	४१४	४१३	४३४	४०२	४१३
महाप्राप्त	४०३	४१३	४१३	४१४	४०४

বাংলার বিভিন্ন মাধ্যম-ডিস্ট্রিক্টে গত ৩০ বছরের লোকসংখ্যার প্রগতি ও আধোগতির পরিমাণ—(৩০৯ ছবি)



हिन्दु—प्रति हाजार

করদাতা ব-প্রকার	১৯১১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯০১
বর্ডমান	৮০০	৭১৭	৭১০	৭৮০	৭৮০
মুন্সিবাৰ	৪১৬	৪৮০	৪৬১	৪৮০	৪০০
সদীয়া	৪১৯	৪০৬	৪১৭	৪১১	৪১৫
কলোহাৰ	৫৯০	৫৮৭	৫৮০	৫৮১	৫৭১
মজিৰা ব-প্রকার					
কাঁচৰগাওঁ	০১৬	০১১	২১৬	২৮৭	২৭৬
কলিগুৰা	০৮৮	০৭১	০৮৫	০৮২	০৮১
চাৰা	০৮৬	০৭০	০৫৫	০৮২	০২৭
বৈদ্যপাৰ	০০১	২৭৮	২৫৭	২৪০	২২১
মোতাখালি	২৪৬	২৪০	২০০	২৪০	২১৫
শিৱসি	০১২	২১৪	২৭৭	২৫৮	২৪১

वर्षिक व-आयन

বাখরসজ	৩৭২	৩৮০	৩৯৭	৭০৬	৭১৬
করিকবুদ	৬১০	৬১৯	৬০২	৬০৪	৬০৮
ঢাকা	৬০৯	৬২০	৬১০	৬০৪	৬০৮
শৈবনগিহ	৬২০	৭১৪	৭০৪	৭১৯	৭০৮
বোয়ানগিহ	৭০০	৭০৯	৭০৮	৭১৬	৭০৮
বিদ্যুদ	৭০৭	৭০৪	৭২২	৭১৯	৭০৮

• দ্বিতীয় ৩০ বছরে সৌকর্য্য নির্দেশক জন্মের পরিমাণ

† গত ০৬ বৎসরের মধ্যে ২০ বৎসরে লোকসংখ্যা
নির্ভরশীল জমির পরিমাণ

১. গঠ ৩০ বৎসরের মধ্যে ১০ বৎসরে লোকসংখ্যা

निर्देशक सुनिश्चिन्त



মুসলমান বৃদ্ধির কারণ, পশ্চিম অঞ্চল ক্ষয়িষ্ণু
কিন্তু মুসলমান এখানেও বন্ধিষ্ণু

উল্লিখিত তালিকা হইতে বেশ বুঝা যাইবে যে, বাংলার যে অঞ্চল আজ অতীত সম্পদ ও সভ্যতার অহুসত হিন্দুশ্রেণীগুলিরই মত নদীর চর ও জলা-
বাংলার বিভিন্ন সাব-ডিভিসনে ম্যালেরিয়ার প্রকোপের পরিমাণ — (৪নং চিত্র)



উত্তরাধিকারী, সেখানে শুধু যে মুসলমানের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা নয়, হিন্দুর সংখ্যা-
হ্রাসও দেখা গিয়াছে। উপরন্তু ক্ষয়প্রাপ্ত 'ব'-প্রদেশে,
যেখানে লোকসংখ্যার সাধারণ অবনতি, সেখানেও
হিন্দুর সংখ্যা কমিতেছে, কিন্তু মুসলমানের সংখ্যা
বাড়িতেছে।

অধিকাংশ মুসলমান বাংলাদেশের নিম্নস্তরের
জাতি সমুদায় হইতে উদ্ভূত। নিম্নজাতি সমুদায়

ভূমি কৃষি ও বাসোপযোগী করিয়া লয়। নূতন
জনপদ অধিকতর স্বাস্থ্যকর। মুশিদাবাদ ও নদীয়া
জেলার বেঙ্গল অংশে মুসলমানের প্রাধান্য,
সেখানকার নূতন জনপদগুলি ম্যালেরিয়া-পীড়িত
নয়। হিন্দুর অধুষিত পুরাতন জনপদসমূহ এখন
বন-জঙ্গলাকীর্ণ। সেখানে না আছে স্বাস্থ্য, না
আছে জীবনের ক্ষুদ্রি, এবং দারিদ্র্য ও অলসতা
প্রজনন-শক্তির হানি করিতেছে।

বিবাহের বিধি-নিষেধ হিন্দু ভাতি কয়ের প্রধান কারণ

সামাজিক কুপ্রথাই হিন্দুভাতির কয়ের প্রধানতম কারণ। একে সংখ্যা-হিসাবে স্বীকারি কয়, তাহার উপর বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ। বিধবার বিবাহ দিলে ভাতি ব্রহ্মণ্য-সভ্যতার মাপকাঠিতে

বিধবা-বিবাহ ও বহুবিবাহ অস্বাভাবিক তাহার যেমন প্রতীকিত হয়, তেমনি তাহার মতন ও এমন কি মূর্খ নবীসকল ও বিশদলম্বল অস্বাভাবিকতা কবি ও বসবাস বিস্তারের অবলম্বন হইয়াছে। কি পুরুষ, কি স্ত্রী, যে কেহ লঙ্ঘন উৎপাদন করিতে পারে, তাহাতে সামাজিক নিষেধ নাই। সব প্রেয়ী মূল্যমানের মধ্যেই বহুবিবাহ পূর্ব প্রচলিত, বিশেষতঃ পূর্ব-অঞ্চলে।

বাংলাদেশের এক অংশের জলপথের মানচিত্র—(এক চিত্রে)



নিয়ন্ত্রণে নামিবা যায়। এই সকল নানা বিধি-নিষেধের জন্য উচ্চ ও অর্ধ-উচ্চ হিন্দু ভাতিগুলির প্রতীকিত আশ্রয় প্রাপ্ত।

অপর দিকে মুসলমান উচ্চ ও নীচ ভাতি হইতে অগ্রগ্রহণ করিয়াও ধর্ম ও সমাজে সমান অবিকার পায়। বিবাহের রীতিতে তাহার বিধি-নিষেধ কম।

আইন-মুতলায়ে মুসলমানের চারিটি বিবাহ হইতে পারে। নিজের কার্যে সহায়তা করিবার জন্য সে অনেক সময় অতগুলি বিবাহ করে এবং তাহার পরিবার-সৌদিও প্রকাণ্ড হয়।

সমগ্র বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমানের পত্ন অর্ধসত্যাবীতে বৃদ্ধির পরিমাণ নিয়ে দেখা হইল।

১৮৮১	১৯০১	মতকরা	গৃহির পরিমাণ
হিন্দু ১৮০ লক্ষ	২২২ লক্ষ	২৩	
মুসলমান ১৮১	২৭৮	৪১	
	এটি হাজার		
	১৮৮১		
হিন্দু	৫০০		
মুসলমান	৫০০		

গত অর্ধশতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমানের
হ্রাস-বৃদ্ধি ; অর্ধশতাব্দী পরে দুই
সম্প্রদায়ের সংখ্যা-নির্দেশ।

সমগ্র বাংলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা ১৮৮১ সালে
হাজারকরা ৫০০ হইতে বাড়িয়া ১৯০১ সালে হাজার-
করা ৪৪০ হইয়াছে, কিন্তু পূর্ববঙ্গে মুসলমানের
প্রবল প্রতিপত্তি। চাঁদারকরা ৬৪৪ হইতে সেখানে
মত ৫০ বৎসরে বাড়িয়া ১১০ জন হইয়াছে।
যে কোন মেঘে অবিবাদিগণের লোকসংখ্যার একপ
তারতম্য উপস্থিত হইলে একটা সামাজিক বিপ্লব
ও সভ্যতার ঘোর পরিবর্তন অবশ্যজারী।

একপ নির্দেশ করা দ্বারা যে, আরও পকাশ বৎসর
পরে পূর্ববঙ্গে এটি দশজন পোকের মধ্যে
৮ জন মুসলমান, ও বাকী ২ জন হিন্দুর মধ্যে
একজন নমঃশূদ্র দেখা দিবে। সমগ্র বঙ্গদেশে ৫০
বৎসর পরে এটি দশজনের মধ্যে একজন উচ্চশাসিত
হিন্দু, ৬ জন মুসলমান এবং আর তিন জনের মধ্যে
একজন যাহিদ্দ, একজন নমঃশূদ্র ও একজন রাজবংশী
অথবা একজন অপর কোন জাতি পাওয়া যাইবে।
এখনই ত নোয়াখালি, মৈমনসিংহ, জিপুরা, পাবনা,
বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও বাখরগঞ্জে
দশ জন লোকের মধ্যে ৭ জন মুসলমান, এবং
করিমপুর ও বাখরগঞ্জে আর অর্ধেক হিন্দু নমঃশূদ্র-
জাতীয়।

অমুমত হিন্দুজাতির বৃদ্ধি

বাংলাদেশের ছয়টি জেলায় অল্পমত প্রেমীর সংখ্যা
সমগ্র হিন্দুর অর্ধেক অপেক্ষা বেশী। সমগ্র বাংলায়
অল্পমত প্রেমীর সংখ্যা, সমগ্র হিন্দুর চাঁদারকরা
তিনশত। জমোরাতিবিল পূর্ববঙ্গের অনেক জেলায়
অবনত হিন্দুজাতিগুলির সংখ্যা খুব বেশী। এই
সকল জেলায় ইহারা তবিলগতে সংখ্যায় আরও বৃদ্ধি
পাইতে থাকিবে। হিন্দুসমাজ কর্তৃক অগম্যমিত
এই সকল প্রেমীর সংখ্যাবৃদ্ধি বাংলার সামাজিক
শান্তি ও সভ্যতার উপর কম প্রভাব বিস্তার করিবে
না। স্বতনিন তাহার। অনাদর ও অবহেলার গতি
পার হইতে পারিবে না, ততনিনই তাহাদিগের
কোত, হাং ও অবমাননা হিন্দুসমাজের লক্ষ্য, হাং ও
মৈত্রের কারণ থাকিবে।

সমগ্র হিন্দুর সংখ্যায়	সমগ্র হিন্দুর সংখ্যায়
প্রতি হাজারে অল্পমত	প্রতি হাজারে অল্পমত
প্রেমীর সংখ্যা।	প্রেমীর সংখ্যা।
• বর্ধমান	৫০৬
• পুন্না	৬৪৪
২৪ পরগণা	৪৭৭
• বশোহর	৪২৭
বাকুড়া	৪৪০
• বীরভূম	৪৭০
পূর্ববঙ্গ	
• বাখরগঞ্জ	৪২৪
ঢাকা	৪১৮
মৈমনসিংহ	৪০৮
• করিমপুর	৬০২
জিপুরা	৫২৩

তারকা-চিহ্নিত জেলাগুলিতে অল্পমত হিন্দুপ্রেমীর
সংখ্যা সমগ্র হিন্দুর অর্ধেক অপেক্ষাও বেশী।

অমুমত হিন্দু ও মুসলমানের শিকার অভাব
উল্লিখিত তালিকাগুলির আলস মন্ত বুঝা যাইবে

ধন আমরা হিন্দু-মুসলমান, উচ্চ ও অল্প হিন্দু মতের ব্যবসায় ও নানা প্রকার হস্তশিল্প খাজাইয়া
জাতির বৃদ্ধিও অল্পপাতের সঙ্গে তাহাদিগের শিক্ষার রাখিয়াছে।
পরিমাণের তুলনা করিব।

১৮৮১	১৯০১	পুষ্টির পরিমাণ	১ বৎসর ও জ্যেষ্ঠের পরিমাণ
			(শতকরা)
ব্রাহ্মণ	১০৮ লক্ষ	১৮৮ লক্ষ	০০
কায়	১০৮ -	১৮৮ -	৪৭
বৈজ্ঞ	১০ হাজার	১ লক্ষ ১০ হাজার	৫৭
মাহি	২০ লক্ষ	২০৮ লক্ষ	১৮
নামঃ	১০৭ -	২০	০১
রাষ্ট্র	১	১৮	১০০
			৫ বৎসর ও জ্যেষ্ঠের পরিমাণ
			(শতকরা)
হিন্দু	১০৭ লক্ষ	২০	১৬
মুসলমান	১৮৮ -	৫১	৭

পত্র ৪০ বৎসরে ব্রাহ্মণ ও কায় প্রভৃতির
সংখ্যা ১০ লক্ষ হইতে প্রায় ১৪ লক্ষ হইয়াছে।
বৈজ্ঞের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার হইতে বাড়িয়া এখন
১ লক্ষ ১০ হাজার হইয়াছে। এই তিনটি জাতি
সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত এবং সকল ক্ষেত্রে, সাহিত্য ও
বিজ্ঞান আন্দোলন, বিদ্যার ও চাকুরিতে, রাষ্ট্রিক
আন্দোলন ও ব্যবসারে ইহাদিগের প্রবল প্রতিপত্তি।
কিন্তু ইহাদিগের অপেক্ষা মাহি, নমঃ ও রাষ্ট্র-
কর্মীদের সংখ্যা অনেক অধিক এবং তাহাদের
সংখ্যাবৃদ্ধি অল্পপাতও কম নয়। ৪৪ লক্ষ হইতে
তাহারা এখন সংখ্যায় পঁচাত্তর কোটি ৬২ লক্ষ, — ব্রাহ্মণ,
বৈজ্ঞ ও কায়ের মোট সংখ্যার দ্বিগুণ। বলা বাহুল্য,
এই সকল অল্পজাতিদের মধ্যে শিক্ষা আন্দোলন
বিস্তৃত নয়।

ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেও বাংলার অনেক অল্পজাতি
জাতি আছে, তাহারা এখন শিক্ষার, দীক্ষার এবং
সমাধ-বিজ্ঞানে বহু পটভাটে। অস্থিত হয়, বাংলাদেশে
১৫০ লক্ষ বাঙালী, উচ্চজাতির অল্পাংশে অমাব্জি,
নীচজাতি ও অশুভ। তাহারাও বাংলার কবি,

সমাজের বিভিন্ন স্তরের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি ও ভ্রাস বিপ্লবের কারণ

সেখা দ্বারা যে, বাংলার মুসলমান ও যে নিম্নহিন্দু-
জাতির সংখ্যা অধিক, তাহারাও দ্রুত বাড়িতেছে এবং
তাহাদিগের মধ্যে অধিকাই সর্বাপেক্ষা প্রকটিত।
তথু বৈজ্ঞদের বংশবৃদ্ধির অল্পপাত অধিক, কিন্তু
সংখ্যায় তাহারা অত্যন্ত কম। মাহি ও নমঃপ্রেরা
প্রত্যেকে সংখ্যায় প্রায় বৈজ্ঞদের দ্বিগুণ। সকল হিন্দু
ধর্মের শিক্ষিতের সংখ্যা (৫ বৎসর বা জ্যেষ্ঠের বয়স
শিক্ষিতের সংখ্যা) পঁচাত্তর শতকরা ১৬, মুসলমানের
শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৭ মাত্র। ২০ বৎসর
বা জ্যেষ্ঠের বয়স শিক্ষিত হিন্দুর সংখ্যা হইতেছে
শতকরা ২২, মুসলমান শিক্ষিতের সংখ্যা মাত্র ১৪।
মাহি ও নমঃপ্রদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা
সাধারণ হিসাবে কম হইলেও মুসলমানের অপেক্ষা
অধিক।

এই তুলনামূলক আন্দোলন হইতে বুঝা যায় যে,
বাংলার আগামী দুই বাংলার অতীতের সঙ্গে সম্পূর্ণ
বিস্তারিতভাবে বাড়িয়া উঠিতেছে। বিভিন্ন জাতি ও
ধর্মাবলম্বী লোকের হঠাৎ সংখ্যাবৃদ্ধি বা ভ্রাস
ইতিহাসের দ্বারা যে একবারে বলাইয়া দেয়, তাহার
এসিদ্ধ উদাহরণ মিলর, সিরিয়ার সাম্রাজ্য ও উত্তরা-
পূর্বের পঞ্চ ও বর্ষের সমুদায়ের প্রাবল্যে রোমীয় সভ্যতার
অধঃপতন। বাংলার সামরিক সভ্যতার যে পরিপাটি
চাকচিক্য, যে শৈলতা, উন্নয়ন ও পোড়নতা আছে,
যে-অংশে নিম্নস্তরের হিন্দুজাতির প্রাবল্য, সেখানে
সে-সভ্যতা কি করিয়া পুষ্টিলাভ করিবে? মুসলমানের
সেখানে প্রাধান্য, সেখানে বাংলার চিন্তাধারা ও
সাহিত্যের পরিচিতি প্রাপ্তি অল্প থাকিবে কি?

এই সব প্রশ্নের সমাধানের সহিত ভারতবর্ষের মধ্যে
বাংলার প্রকৃতি অল্পে বহুদূর অগ্রসর থাকিবে।

পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের কৃষক

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমান ও ময়মূহ-প্রধান বেলাচলির অহুতি এবং মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সভ্যতা, মাদ্যার, নিধন ও আদর্শ যে রূপান্তরিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বাধিকার আন্দোলন, মালেরিয়া ও অসুস্থতার বিরুদ্ধে, প্রচুর আশ্রয়প্রাপ্ত, বনভ্রমণ ও জলাভূমিত সজ্জিত ও কৃষির বিস্তার, নূতন উপনিবেশিকের আগ্রহ ও পরিচয়, বাংলা দেশকে নূতন করিয়া গড়িতে থাকিবে পূর্ণ অক্ষরে, হুদুনার চরে, পশ্চাত্তরে, মেঘনার মোহনায়। সেখানকার মুসলমান বা ময়মূহ কৃষক যেমন পরিচরিত, তেমনি সাহসী। উন্নত কৃষিকার বা বানের ডাকে অস্ত না হইয়া সে হুদুনা বা মেঘনার চরে হিংস পণ্ডিত সঙ্গে বাসিয়াস করে তাহার কলস রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা। দক্ষিণাঞ্চলের প্রস্রবকনে ও পূর্ণ-অক্ষরে আসাদের উপত্যকায় সে হুদুনার স্তম্ভে নির্ভয়ে অগ্রসর হয়, নিবিড় জঙ্গল ভূমিগত করিয়া সে রাত্রে বাহির করে, চাক-আবাদ ও বসতি স্থাপন করে। জলে কুমীর ও হলে বাঘের সঙ্গে তাহার নিরন্তর সংগ্রাম। যেখানে নদীতীরে সে শত উৎপাদন করে, সেই জনবিরল বিগলসহুল স্থানে হস্ত শ্রীপুত্র-পরিবার লইয়া বাস করা অসম্ভব, তাই সে মিনের কাষ শেখ করিয়া নির্ভয়ে সীমাহীন পাখারে তরী তালার, নিশ্চলিত ভগবানের নাম লইয়া সে ডুকানকে অগ্রাহ করে। তাহার কুলনার পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের কৃষক অলস, বিলাসী, কীংগ্ৰাম।

কিন্তু উত্তর, সাহস ও শোকবৃদ্ধি যেমন জাতিতে সড়ম্ব রাখে, তেমনি তাহার চাই শিকা, দীকা ও ক্ষমার। পূর্ণ-অক্ষরে কৃষি সম্প্রদায়, পরিবার বৃদ্ধি, শোকবহুল জনগণ উন্নতিশীল।

কিন্তু সখ্যা বা সম্পদ বাড়িলেই কি কৃষির পরিপূর্ণি হয়? বরং সমগ্র প্রদেশে উচ্চ ও শিক্তিত তর অপেক্ষা নির ও অশিক্তিত তরের সংখ্যা বৃদ্ধি কৃষির অন্তরঙ্গ—ধর্ম,

জাতি ও বিভাজিতমান দুনিয়া বাঙালী এই নিছক সভ্যতা গ্রহণ করিতে পারিলে তবেই শেখরক্ষা হয়। হিন্দু উচ্চজাতি সন্মারের এই বিষয়ে সন্দেহাঙ্ক। গুরু দ্বিষ্ট।

উচ্চজাতির মধ্যে শ্রীলোকের সংখ্যাগুরুতা, নিম্নজাতি ও মুসলমান অর্কবর্চান বলিয়া অধিকত্তর শক্তিমান ও প্রজ্ঞানমণীল

উচ্চজাতিদের মধ্যে যে সকল কৃষক তাহাদের বংশধরিত্ব অন্তরায়, সেগুলিকে বিনা ক্ষিয়ার সত্তর বিশুদ্ধিত দিতে হইবে। ইহাদিগের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বিবাহের পতি সর্বাঙ্গ এবং বিধবারিগের লক্ষ্য অধিক বলিয়া জীববিজ্ঞান যে নিকট বৌন সত্তরের কৃষ্ণ জর করে, তাহা দেখা দিয়াছে।

হিন্দু সমাজ-বিজ্ঞানে বে-শ্রেণী ওক্ষা সভ্যতার মাপকাঠি অহুতার উচ্চ সোপানে বহিয়াছে, তাহার শ্রীজাতির সংখ্যা পূর্বজাতির অহুতাতে কম, এবং বে-শ্রেণী নির সোপান অধিকার করে, তাহাদিগের মধ্যে এই বৈলক্ষ্য দেখা যায় না। পুরাতন জাতি মাঝেই অধিকত্তর সংখ্যার পুরুষের জন্মদান করে। ইহা একমিকে যেমন তাহার হুদু-বিগ্রহের রক্ষাকবচ, অপর মিকে শান্তির সমর ইহাই আবার তাহার বংশধানি ও জন্মের হুদুনা করে। শক্ত্যবের আদিস জাতিরা প্রজ্ঞতির সহিত, সাহায্য ও মাটির সহিত বাহাদিগের শক্তির সহর আদান-প্রদান হয়, বাহাদিগের মধ্যে সভ্যতার কৃষ্ণিতা ও সমাজশাসনের নির্ধন দৃঢ়তা অধিক প্রবেশ করিতে পারে নাই, তাহাদিগের যেমন প্রজ্ঞন-শক্তি অধিক, তেমনি তাহাদিগের মধ্যে বিবাহযোগ্য শ্রীলোকের অস্তর ত দুইই হয় না, অধিক ক্ষেত্রে লক্ষ্যবিকার দেখা যায়। বাংলার মুসলমানেরা যেমনি ভাগই সমাজের নিম্নতর, সেই আদিস বীধবান্ কর্তৃত্ব জাতি সন্মার হইতে উচ্চ। একই কারণে তাহাদিগের মধ্যেও বাংলার অতিসভ্য উচ্চজাতি জ্ঞার বিবাহযোগ্য শ্রীজাতির সংখ্যাগুরুতা দেখা যায় না।

নিম্নে প্রথম তালিকাটিতে উক্ত ও অল্পক হিন্দু জাতির ও মুসলমানের মধ্যে স্ত্রীজাতির সংখ্যার বৈলক্ষ্য প্রদর্শিত হইল।

প্রতি হাজার পুরুষের	প্রতি হাজার স্ত্রীলোকের
অল্পপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা	অল্পপাতে বিধবার সংখ্যা
সীওতাল ১৮৪	১৩৬
কোট ১৪২	১৪২
বাউরি ১০১৭	১২৪
ডোম ১১৪	২০৩
মহাপুত্র ১৬৪	১১৭
মুসলমান ১৪৮	১৪০
মাহিষ ১৪২	২৪৩
সাতা ১৪০	১২৬
বৈষ্ণ ১২২	১৪৮
কাগড় ১০১	২০০
ব্রাহ্মণ ৮৪৭	২০০

হিন্দুর বিবাহবিধির সংস্কার, জাতিক্ষয় নিবারণের প্রধান উপায়

সমগ্র জাতি ও সমগ্রার মিলিতা বাংলাদেশে প্রতি হাজার পুরুষের অল্পপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১২৪। বাংলার উচ্চজাতি তিনটিতেই স্ত্রীলোকের সংখ্যা এই গড় সংখ্যা অপেক্ষা কম। সমস্ত হিন্দুজাতি ধরিলে স্ত্রীলোকের মধ্যে বিধবার সংখ্যা ২২৬, কিন্তু মুসলমান বিধবার সংখ্যা মোট ১৪০। উক্ত ও অর্ধোচ্চ হিন্দু জাতিগুলি বিধবাবিবাহ নিষেধ করিয়া স্ত্রীলোকের আবেক্ষিক সংখ্যাতার কুলস্রারও অধিক প্রকট করিয়াছে।

মুসলমানদিগের মধ্যে বহু বিধবা পুনরায় বিবাহ করে। হিন্দুজাতি সমুদায়ের মধ্যে বিধবাবিবাহ অনেক কম প্রচলিত। অনেক জাতির মধ্যে বিবাহের ক্ষয় কতকালে উচ্চপণে ক্রয় করিতে হয় বলিয়া বহু পুরুষ যৌবন-অভিবাহের পূর্বে বিবাহ করিতে পারে না।

বিবাহের অর্পণপ্রদেহের ক্ষয় বহু পুরুষ বার্ষিকো উপনীত হওয়া পর্যন্ত সময়ে উপার্জন করিতে বাধ্য হয়।

সেখানে চারিদিকেই নিঃসঙ্গ বুবার পাশপথের জ্বালায় রহিয়াছে, অথচ তাহার সামাজিকতার কোন বাধা ও নিষেধ নাই। বিবাহের ক্ষয় অসংখ্য বালিকাকেও সে গ্রহণ করে। তাহাও বংশবৃদ্ধির অন্তরায়। বিধবা-বিবাহ নিষেধ ও পণপ্রথা বাস্তবিক পক্ষে অল্পক হিন্দু জাতির মধ্যে পাশাচার, বঞ্চন্য ও ভ্রমহত্যাকে কম প্রস্রয় দেয় নাই। সব দিক হইতেই জাতিক্ষয়ের পথ উন্মুক্ত।

তাহা ছাড়া বিবাহের গতি সঙ্গীর্ণ হওয়াতে ও বহুবিবাহের প্রচলনে পুরুষের মধ্যেও অবিবাহিতের ও সংখ্যার অল্পপাত মুসলমান অপেক্ষা অধিক।

পুরুষ ও স্ত্রীলোক নির্বিশেষে মুসলমানদিগের মধ্যে প্রত্যেক বংশে বিবাহিতের সংখ্যা অধিক ও বিধবার সংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা কম।

বিবাহের গতির সঙ্গীর্ণতা যেহেতু অস্ত-বিবাহের দোষে লোকবৃদ্ধির ক্ষতি এবং কয়েক ব্রাহ্মণ ও কার্ঘ্যের বংশে ও শাখার শুণ্ডক্ষয়ও দেখা গিয়াছে।

উচ্চজাতির আত্মঘাত

উচ্চজাতির মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধীয় রাষ্ট্র, ব্যয়েজ, বৈদিক, ও অন্তর্য নানা প্রকার বিভাগ বর্জন অত্যাবশ্যক। বিধবাবিবাহ প্রচলনও অতি প্রয়োজনীয়। একশত ব্রাহ্মণ ও কার্ঘ্য স্ত্রীলোকের মধ্যে বিশজন বিধবা, কিন্তু মুসলমানের মধ্যে মাত্র ১৪ জন। উচ্চ হিন্দুজাতির মধ্যে বৈষ্ণব সংখ্যার সর্বাপেক্ষা কম। সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে বিবাহের পাত্যাপাত বিচারের সঙ্গীর্ণতা সর্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট-প্রদ।

প্রাচীন এথেনীয়গণ ও বাঙালীর ধ্বংসের

তুলনা

বেতাবে বাংলার উচ্চজাতিগুলি এই যুগে প্রতিকূল আবেষ্টনের সহিত সংগ্রামে হস্তা পিয়াছে, বেতাবে তাহাদিগের আদিম বাসভূমি অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, এবং তাহারা বেতাবে দারিদ্র্য ও ব্যাবির নিকট আশ্রয়-বিক্ষণ করিয়াছে, তাহাতে নির্দেশ করা যায় যে, সমাধ-সম্বারের একটা চরম স্তেী না করিলে তাহাদিগের ধ্বংস

অবতরণার্থী। পুরাতন ঐশ্বরীসিংগের সহিত তাহাদিগকে অনেক বিদেশী পণ্ডিত ভুলনা করিয়াছেন। ঐশ্বরীসিংগ তাহাদের দেশ দল্লত মালেকের দ্বারা অর্জিত হইয়াছিল এবং দামস্ট্রেট ও রোমক বর্ধকরণ দেশ ছাড়া কেহিলা তাহাদিগের আচার, নিয়ম ও সভ্যতার ব্যাঘাত ঘটাইয়াছিল। তাহাদিগেরই মত বাংলায় পুরাতন ভক্তলোকশ্রেণী মালেকের দ্বারা প্রণীত হইয়া, অসংখ্য বিধি-নিষেধের দ্বারা শতাব্দীতে ও বিকিষ্ট হইয়া, গারিভা ও অসংখ্যানের উপায় উদ্ভাবনে পরাস্ত হইয়া, দুঃস্থর পথে অগ্রসর হইবে, যখন চারিদিকে অসংখ্য হিন্দু ও অশিক্ষিত মুসলমান নৃতন দল্লত ও রাষ্ট্রবলে বলায়ান হইয়া তাহাদিগের পুরাতন অধিকার করায়ত করিতে থাকিবে। এই ভীষণ অসমান লগ্রাম ও প্রতিবাদিতার দ্বাধাদিগের বীর্ণা ও ভীষনী শক্তি কম, শিক্ষা ও শোভনতার ভ্রমি বর্ষ তাহাদিগকে আর রক্ষা করিতে পারিবে না।

মাধ্যম বাহারা অধিক, কার্যিক পরিভ্রম ও শিল্প-কৌশলে বাহারা পরীক্ষান, রাষ্ট্রবলে বাহারা বলীমান ও আশ্চর্য্য, তাহারা ইংলিসের মূহুর ভক্ত অঙ্গোচ্চনা করিবে না, হইলই বা তাহারা বংশপরম্পরা হিসাবে বাংলায় লম্বত প্রাচীন পৌরবের উত্তরাধিকারী। ইহারা তাহাদিগেরই বংশের বাহারা বাংলাদেশ হইতে লম্বত প্রাচীন এশিয়ার বৌদ্ধবর্ষ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন, বাহারা নব্য জায় ও বিভিন্ন মহামিমা সাধনের অগ্রদূত, বাহাদিগের বিশিষ্টাভেদবাদ বিখ্যাত্যার একটি সর্বপ্রকট পৌরব এবং বাহারা এই আধুনিক কালেও ভারতের নব্যচিত্তা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে গুরু ও নায়কের স্থান পাইয়াছিলেন।

শিক্ষাসংস্কার এবং ভক্তলোকের ভূমি-কর্ষণ
ও কার্যিক শ্রম স্বীকার

জাই বলিয়াছি, উচ্চজাতির লম্বক-লম্বক বাংলায় কুটির দ্বারা রক্ষার একটি প্রকট উপায়। নৃতন রাষ্ট্র-

বিস্তারে জমি-সংস্কার আইন-কাহন অচিরেই পরিণতি হইবার সম্ভাবনা। যে কোন রূপপ্রধান, লোকবহুল দেশে এক অসংখ্য কর্তৃকশ্রম শ্রেণী শুধু স্বাধিকারের অজ্ঞাতের টিকিয়া থাকিতে পারে না। ইতিপূর্বেই বাংলার বেশব জেলায় মুসলমান বা নমস্কারের প্রাধান্য, কৃষকশ্রেণী নিতীক ও শীতল-অসংখ্য, দেখানে জমিদার ও জমিদারের আমলাশ্রেণীর লগা। কম সেবা দিয়াছে।

শতকরা জমিদার ও আমলার লগহার
অল্পপাতে কৃষকের লগা।

বংপুর	৩২৬৫
বিনাকপুর	২২৬৮
ত্রিপুরা	২১৭৪
ঢাকা	১৭৪৬
নোয়াখালি	১৫৫৪
বঙ্গোহর	২২৪
বর্ধমান	২১৩
বাঁকুড়া	৪১২

বর্ধমান ও বাঁকুড়ার নিতীক প্রচার পোষ্য অনেক আমলা। জমিদার গ্রাম ভাগ করিয়া তাহাদিগেরই উপর রাখনা আদায়ের ভার দিয়া নিশ্চিত। এই সব জেলায় কৃষিকার্যেও আদমি হুণ্ডা, শীতল জাতির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ভবিষ্যতে বাংলার দক্ষিণ-পূর্বে অসংখ্য সেবাসীল দ্বাধাহানি কেহু আদমি জাতির বাহবল চাষবাসে একটা বড় ভগ্নাত্তর আনিবে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় ভগ্নাত্তর আসিবে হুমির স্বাধিকার বিঘের। ভাগ-বিলি, মোংস্কারের রেহান ও ভোগবহল এবং হুমির লেনবনে বিঘের সর্বপ্রাধেই লম্বার অতি প্রয়োজনীয়। বাংলাদেশের দ্বাধিজ্ঞেণী বিনা পরিভ্রমে, বিনা লম্বনে, বিনা তদ্বাবধানে, মোংস্কার ভোগ করিতেই ভাগচাষের আগ্রহ। তাহাদিগকে অসংখ্য করিয়া দখা ও পশ্চিম বঙ্গের মোংস্কার কৃষকও প্রমবিসুখ, ভক্তলোক সাধিয়াছেন। তিনিও জমি বিলি করেন, মছর লগান, ভাগে কল ভোগ করেন। পূর্বে অসংখ্য কৃষিকার্যের আশীকরণও

ছড়ির ব্যবহার কম অল্পবিধা আছে নাই। ভূমিকম্পের সঙ্গে ভূমিকর্ষের দায়িত্ব নির্ভর তাতে গড়িত। এ-দায়িত্ব বাংলায় ভুল্লোলকশ্রেণী গ্রহণ করে নাই। বাংলার ভবিষ্যৎ আইন-কানুনে এ-দায়িত্ব স্বীকার না করিলে যে-শ্রেণী এখন ভূমিকারী, তাহাদিগকে ধীরে ধীরে অথবা জনসম্মত-পন্থিত আইন-বলেদের এক কোণে বিনষ্ট হইতে হইবে। সমাজ-সংগঠিত না হইলে মাঠের কাছে, কাজখানায়, দোকানে, আকুতে ভুল্লোলকশ্রেণী হট্টা বাইবে। কলিকাতা প্রভৃতি নগরে বাড়োয়ারী ও ভাটিয়ার আধিপত্যের মূল ভুল্লোলকের পরিপ্রভাবাক্রমতা। তাই কলিকাতা নগরীর বিরাট সম্পদ বিদেশীর হস্তেই করায়ত্ত। নব্য-নাগরিক সভ্যতা বিদেশীর রোমনাই,—“পর দীপমালা নগরে নগরে, তুমি যে ভিমিরে তুমি সে ভিমিরে।” মূলকথা এই যে, যে কারিক পরিপ্রভ এতদিন বাঙালী ভুল্লোলক অজ্ঞপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞান করিয়া আসিয়াছে, বর্তমান বিশ্ব-বিজ্ঞানের শিক্ষার নিরর্থকতা ও বিকলতার দূশে তাহাকেই জীবনরক্ষার একমাত্র সহায় ও মূল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

স্বাভাবিকতা নহে, মানবিকতাই হরিজন- আন্দোলনের মূলশক্তি

জু নিজেদের ধরে, পরিবারে ও গোষ্ঠিতে সংগঠিত হইলে চক্ষিবে না। উচ্ছ্রান্তির সহিত প্রতিবেশী অহঙ্কারিত ও মূলমতানের সহিত সামাজিক আদান-প্রদান, আচার-নিয়মেরও আদম পরিবর্তন প্রয়োজনীয়। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত হরিজন-আন্দোলন, বাহার কত ভিনি জীবন পর্যন্ত পণ করিয়াছেন, রাষ্ট্রিক অধিব্য-অধিব্যায় প্রতি বিরোধে হইয়া যদি সভ্যসভাই উহারতর নীতি ও মানবিকতার ভিত্তিতে বাংলাদেশে রাজনীতির বতি অতিক্রম করিয়া প্রচার লাভ করে, তবেই রক্ষা। কেবল জাতি এখন অশুভ রহিয়াছে, যেমন জেব, হাতি, বেতকা, গলদগবী, বেঘর, ছুঁইয়ালা

চাষার প্রভৃতি, তাহাদিগকে বাসগৃহের মধ্যে এবং সমিতিভাষ্যের প্রবেশের অধিকার দান, তাহাদিগের মধ্যে বাংলাদেশে ছড়িয়া একটা পরিচ্ছন্নতার আন্দোলন, লবল অল্পত ও পতিত জাতির পাকার পাড়ায়, যেখানে ভুল্লোলক প্রবেশ করিলে আকুতির ভয়, সেখানে তাহারই পরিচালিত বৈদ-বিদ্যালয় স্থাপন, দেশে ছড়িয়া মতপান নিবারণ, সার্বজনীন পূজা, সার্বজনীন কলাচরণ, ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের যারকতে তাহাদিগের সৎকার, অথবা নিবারণ, পূজা ও স্বীকা-দান,—এই লবল উদ্দেশ্যে বাংলার উচ্ছ্রান্তীত্বকে লবল কণ্ঠিতা জ্ঞাপ করিয়া দত্তীর আন্তরিকতা ও বিশ্বাসের সহিত মুচ, মুচ, অশুভি নাগরিকের নামে কামে নামিতে হইবে।

বাংলাদেশে বহনতাত্ত্বী বহিরা পার্জতা, বাবাবর ও নীচ অনার্যভাষিণ শিকা ও সৎকারের তার গুইয়াছে। কত অনার্যশ্রেণী ত্রুণা সভ্যতাকে আনিক তাতে গ্রহণ করিয়াও হিন্দুসমাজের অলঙ্ঘ্য হইয়াছে। বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসও এই সৎকারের ইতিহাস। হিন্দু সামাজিক স্তর-বিভাষের উচ্চ-নীচতা এই ধীর সৎকার-পদ্ধতির বিভিন্ন ক্রম বা পর্ধ্য নির্দেশ করে। বেশ বহন বাবীনতা হারাইল, তখন হইতেই এই সহস্র শিকা ও সৎকার-কাৰ্য্য বাবা পাইল। তখন হইতেই বত প্রকার অস্বাভাবিক শূণ্যশূণ্য বিভাষের হুল্লা। নূতন শিকা ও প্রোচায়ের দিনে হিন্দু-সভ্যতার এই প্রোচর প্রোচরশক্তিকে পুনঃ প্রোচর করিয়া দেখায় যে এক কোটি পলাশ লব অল্পত বা পতিত জাতি আছে, তাহাদিগকে সমাজের কোড়ে টানিয়া লইতে হইবে। রাষ্ট্রিক নির্বাচন-প্রণালী যে নূতন ব্যবধান সৃষ্টি করিজেছে, তাহা উহারতর নীতি ও সমাজ-বিজ্ঞান কৃৎকারে উদ্ধারিত হিবে।

হিন্দু-বহ ও মূলমতানের বহ, উচ্চ-অল্পত ও পতিত জাতির সামাজিক বিচ্ছেদকে প্রোচর না দিয়া সহস্র বাংলাদেশে এখন একটা শিকা ও সমাজ-সৎকারের আন্দোলন আনিত হইবে বাহাতে মূলমতান, আনিক,

রাজবংশী ও নবঃপুত্র বাংলায় ক্রমিক নীচের দিকে মা টানিয়া বহু তাহা ধূপধরপরাধিষ্ঠিত প্রসঙ্গের পুষ্টি-সাধন করিতে পারে। হিন্দুধর্মের মধ্যে নিরন্তরীণ উন্নয়ন ও সামাজিক অধিকার প্রদান ও উচ্চ-নীচ ধর্মের মধ্যে বিবহাবিবাহের প্রবর্তন ও বিবাহের গতির বিস্তার, সর্বপ্রকার কার্যিক প্রসঙ্গ ও শিষ্টাঙ্গীকরণে অশুভতা বর্জন ও আত্মনিয়োগ দৃষ্টান্তে যেখানে ওই হিন্দু সমাজের আত্মরক্ষার উপায় নহ, সমগ্র বাঙ্গালী ধর্মের আত্মরক্ষার হুনিষ্ঠিত পথ।

হিন্দু-মুসলমানের একই মাটি ও জল

বাংলার নতুন রাষ্ট্রের মুসলমানের প্রাধিকারক ভর করিয়া হিন্দু ও মুসলমানের সামাজিক বৈষম্যকে বাড়াইতে দেওয়া বাঙালীর আত্মরক্ষার পথ। রাজ-নীতিকের দৃষ্টান্তের সেনাবহু চিত্তব্রজন ইহা স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন। ছয় শতাব্দীর নবীশব্দের গতি ও অযোগ্যতা বাঙালী রাষ্ট্রিক নিরন-কাম্বনের দ্বারা কি করিয়া লঙ্ঘন বা যোগ্য করিবে? বহু প্রাকৃতিক বিপদকে মানিয়া লইয়াই ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হওয়া বিবেচনার কাক। সাহিত্যের ভিতর দিয়া, সামাজিক জীব-বিনিময়ের দ্বারা, মহত্ব অথবা জ্ঞানাত্মী পার্শ্বের পরস্পরে যোগদান করিয়া, মুসলমানের সভ্যপীর ও হিন্দুর বৃত্তী মনসা ও শিষ্টতার পূর্বা পরস্পরে অগ্রসর করিয়া, এমন কি ন্যায়করণে হিন্দু-মুসলমান প্রমাণ একযোগে গ্রহণ করিয়া ছই সম্ভাব্যতার সম্বন্ধ, আত্মরিক বিলন আনিতে হইবে। হিন্দু ও মুসলমান ছই-ই এক মাটি ও জলে জন্মিয়াছে ও বাড়িয়াছে। বিধ-প্রকৃতি সমান মেয়ে তাহারদিকে রক্ষাবোধক করিয়াছে। ইতিহাস সমান ওদায়ীতে তাহারদিকে করে উৎসাহ ও পরাক্ষে ক্রমোন্নয়ন করিয়াছে। ভবিষ্যৎও নিরপেক্ষভাবে তাহারদিকে আশীর্বাদ ও অভিশাপ দিবে। মন ও পরীরের পটল দ্বিলাবে মুসলমান ও হিন্দুর কোন পার্থক্যই নাই, কারণ অল্প হিন্দুধর্মের সমুদায় ছইতেই বেশীর ভাগ মুসলমান বর্ষাক্তর গ্রহণ করিয়া সমাজ-বিভাজন হইতে

পৃথক হইয়াছে। এই কারণে দ্বাভারে রাষ্ট্রিক প্রতিক্রিয়াশীলক সাম্প্রদায়িকতা পরস্পরের বিরোধ না বাড়ায়, তাহার জন্য স্বাধীনতাবিধিৎ বোঝা বা পণ্ডিতের মধ্যে সমাজের শিক্ষা-বীকার তার না দিয়া বিভাজনের বিভাজনে একটা উদার পার্শ্বজনীন ধর্মবৃত্তির অঙ্গীকরণ করিতে হইবে। বিলম্বের সময় মুসলমান প্রবীণ হিন্দুর চরণধর্ম লইবে, উভয়ের সময় হিন্দু মুসলমানের পার্শ্বের যোগদান করিয়া সকলক প্রতিক্রিয়া-অঙ্গীকরণ করিবে। পরস্পরের আত্ম-কার্য, বিনি-নিম্নে পালন শুষ্ক শিষ্টাচার-সমস্ত নহ, ধর্মের আদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়া হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ না ঘুটাইতে পারিলে, পূর্ণকক এবং মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের যে প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবধান যিৎ শতাব্দীতে ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে, তাহাই বাঙালীর বৈশিষ্ট্য বন্ধার হোর অঙ্গরায় হইবে। অত্রিকের যে অঙ্গর মুসলমান ও অবনত হিন্দুপ্রবীণ সমুদায় বাংলায় চিত্তা ও সাধন, ক্রটি ও আচারকে মধ্যোদী করিয়া রাখিয়াছে, তাহারদিকের সন্ধার ও উচ্চাঙ্গানন শুষ্ক হিন্দু বা মুসলমান সমাজের নহে, সমগ্র বাংলায় শুষ্ক রাখিবে।

বাঙালী যুগনির্দেষ্ঠা, নতুন অবদানের অগ্রদূত

পশি-পড়া উর্কর, ভরল ভূমিতে বাঙালী জন্মিয়াছে ও বাড়িয়াছে। সমগ্র ভারতের মধ্যে বাঙালীর সভ্যতা সর্বাপেক্ষা পরিবর্তনশীল। বাংলার পূর্ণ-ইতিহাসের সাক্ষী ইষ্টক-নিষ্ঠিত মন্দির, প্রাসাদ কত উঠিয়াছে, কত ভাঙিয়াছে, পশি-পড়া ভূমিতে অথবা নবীপথে তাহার চিহ্নস্বরের নির্দেশ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেইজন্য বাংলার সভ্যতাও অল্প অল্প নহে, পল্লার ঢেউয়ের মত তাহা নিত্য নতুন সৃষ্টি করিয়াছে, ধ্বংস করিয়াছে। হুৎ হুৎ চিত্তার নতুন দ্বারা, ধর্মের নতুন আদর্শ, শিরকলার নতুন রীতি, সমাজের নতুন নিয়ম ও বিভাজন গ্রহণ করিয়া বাঙালী চিরকালই ভারতের সভ্যতার পথ নির্দেশ করিয়াছে। মহাসমোপাধায়

হুজুরগাদ শাহী মহাস্থানের বর্ণিত ভারতের ইতিহাসে বাঙালীর স্থান ও অবস্থানের কথা। কোন্ বাঙালীর অবস্থিত আছে? বাঙালীর কি উচ্চ, কি নীচ জাতির রক্তে যে বিভিন্ন অর্থা-অন্যথার রক্তসংশ্লিষ্ট ঘটিবাহে, তাহা ও বাঙালীর প্রগতি ও বিপ্লববাসের সহায়। এমন মিশ্রিত জাতি ভারতবর্ষে আর কোথায়? চুই হাজার বৎসর পূর্বে বাঙালী প্রাচীন বেদবিদ্যাবী বৌদ্ধভাব সর্বপ্রথম গ্রহণ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে নূতন পথে আমন্ত্রণ করিয়াছিল। পাচশত বৎসর পূর্বে বাঙালীর সার্বজনীন সহযোগিতা ও বৈষ্ণব ধর্ম উন্নীত হিন্দুজাতি এবং হিন্দু-মুসলমানকে একত্রে বাঁধিয়া নূতন সামাজিক সমাজ-বিভাগের হুচনা করিয়াছিল। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে রাজা রামমোহন রায় শাক্ত ও ব্রাহ্মী, ঔপনিষদিক ও ঐশ্বরী সাধন সন্নিহনে বিশ্বজনগণে এক নূতন সার্বজনীন ধর্মসাধনের ইচ্ছিত করিয়াছিলেন, যাহা জনগণের ইতিহাসে নিত্য বিরল। রামমোহনের ধর্ম ও জাতি মিলনের বিরাট কল্পনার ফুলনার বর্তমান ক্ষুদ্রতা ও সাম্প্রদায়িকতা কত হীন, কত ক্ষুদ্র, কত অ-বাঙালী! বাংলার বাহা লৌকিক ধর্মসাধন, যাহার শুক শত শত আউল-বাউল আম ও কুম্ভের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাও যে মানুষকে পরম পুঙ্খ বা সেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে — “সবার উপরে মায়ের বড়, তাহার উপরে নাই”। বিশ্বের কোন ধর্মে মরহীর অমন রক্তময় আত্মবিশ্বাসের সাহস সেখা যায় নাই। বাঙালীর ভবিষ্যতের সমস্তা এই একই প্রকার প্রাকৃত-নন্দন ও সমাজ-পন্থের সমস্তা। বর্তমান কালের রাষ্ট্রিক সুবিধা-অসুবিধার বিতর্ক না হইয়া, বরং সমস্তের ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে বিশদর্শন না হইয়া, বাঙালী যদি হিরন্মিত্র ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে আপনায় সুপরিপূর্ণতা লাভের শুক দায়িত্ব বরণ করিতে পারে, তবেই হিন্দু-মুসলমান নিমিত্ত, উচ্চ ও নীচ জাতি বিদিত্তা অগ্রগণ্য যথা ও পশ্চিম বঙ্গ ও

বঙ্গী পূর্ববঙ্গের সন্নিহনে এমন একটি সভ্যতা গড়িয়া উঠিতে পারে, যাহাতে হুজুরগাদ-মহাস্থানের ন্যায়গতিক সভ্যতার উজ্জ্বল ও চটকতা না থাকিতে পারে, কিন্তু বাহা প্রভ, সাহস ও হুজুরগাদের সাহায্যে অধিকতর সতেজ, লোকবৃদ্ধির সাহায্যে অধিকতর বলীয়ান এবং নূতন কৈরী স্থাপনের সাহায্যে অধিকতর বরীদান হইবে, সম্ভব নাই।

বাঙালীর মানবিকতা

বাঙালীর এই নূতন নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ দৃষ্টি চাই। নূতন বাংলাদেশ ও নূতন বাঙালী সভ্যতা গড়িবার ক্ষেত্রে বাঙালী যদি অল্পবর্ণী হইয়া সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক বিরোধকে বড় করিয়া দেখে, তাহা হইলে তাহার শতবৃষের সাধনা ব্যর্থ হইবে এবং এই শতাব্দীর অবস্থানের পক্ষেই হুজলা, হুজলা, শত-ভাঙ্গা বাঙ্গা ভূমিতে বাঙালীজাতি শিকার ও দীকার সব রকমে অ-বাঙালী হইবে। বাংলার আগামী যুগ সমাজ-সংস্কারের যুগ। জাতি, কুলী ও ধর্ম সম্বন্ধের হুচনা না হইলে, একটা ব্যাপকতার জাতীয়তার অভাবে বাংলার রাষ্ট্রিক আন্দোলন পথে পথে ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হইবে। এমন কি রাষ্ট্রই তখন সমাজের শক্তি ও সাধনার ঘোর পরিপন্থী হইবে। অল্পবর্ণের সংখ্যা ও কর্মপরিচয়তা এবং উন্নতির বৃদ্ধি ও সামাজিকতার একযোগ চাই। তাহা যদি সম্ভব বৃদ্ধি ও সাধারণ সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অভিজ্ঞতার ফলে না আসে, তবে আমাদিগকে কবীর, রামানন্দ ও চৈতন্যের আন্দোলনের মত কোন ভবিষ্যৎ অঙ্গীকারের মত প্রতীক্ষা করিতে হইবে। তবেই প্রকৃতির অভিশাপকে ভ্রমণ না করিয়া আমরা অস্তরের সম্পদে মহত্তর বাঙালী সমাজ ও সভ্যতা গড়িতে পারিব নূতন নবীতীরে, নূতন সমুদ্রের মোহনায়। বাংলা দেশ ও তাহার সেবতা, চুই-ই যে “নিজই নব”।

প্রাৰণ-সন্ধ্যায়

শ্রীৰামেন্দু দত্ত

দুবনে ভিছায়ে প্রাৰণের বারি অবিরল ধারে বরিষায়,
বধু, মুখ ভোলো, স্তৰ্জন খোলো, বুঝি কি আজি দহা যায় ?
প্রথম যেদিন সুখী-মালতীর সৌরভে
হৃদি-মালকে উঠিলে ছুটিয়া সৌরবে,
শে দিনো এমনি ধারার প্লাবন নামিল প্রাৰণ-মত্তপরে
আজি সে আবার কত দিন পরে দিবিয়া এল এ বহুধায় !

আজি কর কর করে বারি-ধারা। মাতারে ধরই, অধরে—
তড়িতালোকের চকিত চমকে কে ও কেশ-বেশ সধরে ?
বধু, বধু, হের মোদের কানন সুন্দর
জারি ভগ্নরাশি উথলে সুখীর পুঞ্জে,
রক্ত-বিবশ। এসেছে বরষা বিধুরা ধরার অন্তরে,
মেঘের মৃদঙে ঘোল মেঘে আজি আনারো। ছন্নয় সস্তরে !

দিয়াছে শরণ, হেমন্ত, শীত, এল বসন্ত ফাঙ্কনে,—
বৈশাখে এল রক্ত তপন রৌদ্র-রূপের আল কুনে !
কড়ি গুহু ধরি' নব নব পাশে স্মরি !
সেহ-মালকে নিভা উঠেছ মুগরি' !
আজিকে আবার এসো বরিষার মধু জীবন-সিঞ্চনে,
এসো কেতকীর কদম সুখীর মধু-মালতীর ফুলবনে ॥

ওই গুন আজি বাজিছে গগনে মেঘের দতীর শুক পান,
হের ওই আজি নয়ন নয়ন আবরি' অঁধার আগুয়ান !
কর কর বাত্যা কি কথা কহিছে অবিরল—
বরের দ্বারে ইন্দিও করে কালো জল !
এসো জিয়া হোর, এসো অনিন্দে প্রাৰণ-হৃদয়ে গাহো পান,
কানায় কানায় ভরিয়া উঠুক নিদাশ-ভূষিত মন-প্রাণ !



প্রশ্ন

(১)

ব্রহ্মদেশ, সিংহল, আফগানিস্তান, নেপাল ও ভূটান
ভারতবর্ষের অন্তর্গত কি না?

(২)

হিন্দুধর্মে অস্পৃশ্যতার উৎপত্তি হ'ল কিরূপে?
এর ঐতিহাসিক কারণ কি? জাতিভেদের সঙ্গে
অস্পৃশ্যতার কোনো সম্পর্ক নেই কি? অস্পৃশ্যতা
তিরোহিত হ'লে জাতিভেদও কি তিরোহিত হবে
না? জাতিভেদ বলতে কি বোঝায়?

শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন

(৩)

বাবা, কাকা, মামা, খুঁজী, গিসী প্রভৃতি যে সমস্ত
সম্বন্ধ-বাচক শব্দ আমাদের দেশে প্রচলিত আছে,
সেগুলি কিরূপে উৎপন্ন হইল? এই শব্দগুলি কোন্
ভাষার অন্তর্গত এবং কোন্ সময় হইতে এগুলি
প্রচলিত আছে?

শ্রী রুচিরা দেবী

(৪)

বাংলা দেশে কত সংখ্যক বাংলা, ইংরেজী ও
অন্য ভাষার পত্রিকা আছে? মাসিক, বাৎসরিক,
ত্রৈমাসিক, ষৈমাসিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, দৈনিক
কত কত সংখ্যক ক'রে আছে? এবং প্রত্যেক

পত্রিকার নাম, ঠিকানা ও সম্পাদকের নাম কি?
প্রত্যেক পত্রিকার বাৎসরিক মূল্যই বা কত?

স্বামী বিমলানন্দ

(৫)

শ্রামানন্দ ঠাকুর কে? তিনি কোন্ সময়ের লোক?
তাঁহার কোন জীবনচরিত আছে কি না? যদি
থাকে, কোথায় পাওয়া যায় এবং কত নাম?

শ্রী জিতেন্দ্রনাথ পাল

উত্তর

(১)

শ্রাবণ-সংখ্যা “উদয়নে”র প্রথম প্রশ্নের উত্তর—

“বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদে”র মুখপত্র “আর্থিক
উন্নতি” পত্রে বেক্রপ পরিভাষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে
তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল—

Value — মূল্য

Surplus — উৎকৃষ্ট

Surplus Value — উৎকৃষ্ট-মূল্য

Relative Surplus Value — আপেক্ষিক উৎকৃষ্ট-মূল্য

Absolute Surplus Value — নিরপেক্ষ উৎকৃষ্ট-মূল্য

শ্রী যতীন্দ্রনাথ ঘোষ

(২)

শ্রাবণ-সংখ্যা “উদয়নে”র দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর—

স্বর্গীয় রামশরণ পাল মহাশয়ই কর্তৃভজা সম্প্রদায়ের

স্বার্থক। এই সম্ভাব্য বিশ্বাস করেন যে, কর্তা এক, একা যিনি সেই কঠাকে উদ্ভাষা করেন, তিনিই কর্তা-ভবা। কথিত আছে, মহাবা আউলিয়ার নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি এই সম্ভাব্য পদন করেন।

ইহাদের শিঠিখান যোষণাকার। ইহারা পাল
উপাধিধারী এবং সন্ধান-বান্ধন। ইহাদের বহু
ব্রাহ্মণ-বিদ্যুৎ আছে। যোষণাকার ইহাদের দ্বারী
বান্ধন। হাটুরদালান-দখলিত জুহুৎ বিতল অষ্টালিকা।
এই বাড়ীকে পোকে ঠাকুর-বাড়ী বলে, এবং ইহাদিগকে
গুণ-সোদী বা গুণ-বংশ বলে। ইহাদের উপনয়ন-
সম্বার নাই, কিন্তু ইহারা শিখগণকে বহু দেন।
ইহাদের দিঘ, ব্রাহ্মণ হইতে গোলা, দলল বাড়ির
বহোই আছে। ইহারা মহাপ্রভু ঠাকুরদেবের প্রবর্তিত
বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

গুরু-বংশধররা সদাচারী এবং মন্ত, ভাল ও
মানব-স্বাধিনি সেবন করেন না। গুরুপণ ধর্মোপোচনা
করেন এবং গুটি তাহেই জীবন বাপন করেন।
ঠাকুর-বাড়ীর পল্লিকটর "হিমসাগর" নামক পুত্রবিশিষ্টে
স্নানান্তে তাঁহার শিষ্যবর্গকে গীতাহান করেন।
সেই সময়ে (১) ত্রিবিধ কায়িক পাণ, (২) চতুর্বিধ
বায়ু পাণ ও (৩) ত্রিবিধ মানসিক পাণ হইতে
নিজেকে অতি সাবধানে রক্ষা করিবার উপদেশ দিয়া
তাঁহার শিষ্যবর্গকে সদাচারী ও সৎধর্মী হইতে অজ্ঞা
করেন। কথিত আছে, "সৎধর্মী না হইলে কর্তৃত্ব
হয়। যাগ না।"

রায়শরণ পাল মহানগরের সম্মুখী অভয়
পতিততা, ধর্মশিলা ও বিটাবজী রমণী ছিলেন।
শিখগণ তাঁহাকে "সতীমা" বলিতেন, এবং তাঁহারই
নামানুসারে বোম্বাশাককে লোকে অতীব "সতীমার
স্থান" বলিয়া থাকে। রায়শরণের তিরোত্তাবের পর
সতীমা একা পতিত বসিতেন, এবং শিখগণকে
বোম্বাশাক উপদেশাদি প্রদান করিতেন।

ইহাদের লক্ষ্যবিন্দু ছিল। মোনসিগ্নোর

সমস্ত বোম্বাফার বিশেষ সমাবেশে হয়। শুধুমাত্র
৪০।৫০ হাজার ব্যক্তির সমাবেশ হয়।

জৈব শাসন — (১) নদীমার সন্ধানি, (২) কুলীজা (এই স্থানে বসিয়া নদীয়া জন করিলেন), (৩) ডালিহজা, (৪) তীর্থহান-বাড়ীর নিকট পুষ্করিণী। অতঃপর বিধান, শব্দের চক্ষে উহার জলের কানটো দিলে, সে নদী কিবিধা পায়।

শ্রী প্রভাতকুমার বোস

(୭)

শ্রাবণ-সংখ্যা “উদয়নে”র চতুর্থ অংশের উদয়—

नाय्य

চন্দ্রাবতী মহারাজ বসতির ঠেলে এবং অম্বর-
রাজ কৃষ্ণবীর কস্তা সমিষ্ঠাসেবীর সঙ্গে প্রভা, অম্বর
এবং পুরু নামে তিন পুত্র জন্মে। কনিষ্ঠ পুত্র পুরুই
শিতার সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার বান কোরব
পাকান এবং ভারত ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শাখার বিস্তার
করিয়া আর্ঘ্যাবর্তের “মধ্যদেশে” (প্রধানতঃ পশ্চিমে
সরস্বতীর তীর হইতে পূর্বদিকে বহুদূর তীর পর্যন্ত
বিস্তৃত ভূভাগে) রাজ্য করিতে থাকেন। পুত্র
আর্য্যাবৃত্ত ভ্রাতা অম্বর বংশধরগণ এতদ্দেশের পূর্বসিদ্ধবতী
স্থানের অধিরাজ হইয়াছিলেন। অম্বর বাসন পুরু
জন্মজন রাজ্য হস্তগার ‘বলি’ নামক এক সর্বধর্মজ
পুত্র জন্মে এবং তাঁহার রাজধানী সম্মানবীর তীরবতী
(আধুনিক ভাঙ্গলপুর নামে পরিচিত) কোনও
স্থানে ছিল। সেই বলি মহারাজের (প্রজ্ঞাবানের
পৌত্র অম্বররাজ বলির নহে) মহিষী সুমেকা দেবীর
সঙ্গে এবং অধিরা বতির পৌত্র বীর্যবতা গৌতম
বতির স্পর্শের প্রভাবে অম্বর, বহু, কলিঙ্গ, হুহু এবং
পুণ্ড নামক অতি ভেদ্যবী পাঁচ পুত্র জন্মে এবং
উত্তরকালে তাঁহাদের নামে বখাফ্রমে অম্বর, বহু,
কলিঙ্গ, হুহু এবং পুণ্ড পাঁচটি দেশের নামকরণ
হয়। ভারতবর্ষের আধুনিক মানচিত্রে অম্বরদেশের

অবস্থান ভাষ্যমূল্য বিকাশে, বঙ্গদেশের প্রেক্ষিতমণী এবং ঢাকা বিভাগে, কলিকতায় উত্তর সরকার এবং দক্ষিণ গভর্ণমেন্ট, স্বদেশের রাজ্যসেবে এবং পুণ্ড্র অবস্থান উত্তরবঙ্গে, (মতান্তরে দক্ষিণ-কোমল বা হিম্মপদ বিভাগে) নির্দেশ করা হইতে পারে। মহাভারত, অগ্নিপর্ব, ১০৪ তম অধ্যায় (বোম্বাই) বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থপর্বে, ১১-১২শ অধ্যায়, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ ২ম ভক্ত, ২৩শ অধ্যায় (বোম্বাই), মৎস্তপুরাণের ৪৮শ অধ্যায়, বাহুপুরাণ ২১ অধ্যায় (বঙ্গবাসী) এবং অস্তান্ত পুরাণেও উক্ত নামকরণ পাওয়া যাইবে। হরিবংশ (ভ্রমবশতঃ ?) এই কংককে পুত্রর কং বসিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং বলির অবস্থান পক্ষ পুত্রকে 'অক্সর' পুত্র বসিয়া পরিচিত করা হইয়াছে (হরিবংশ, হরিবংশ পর্ব, ৩১শ অধ্যায়)।

প্রাচীনত্ব

এই অঙ্গবঙ্গাদি দেশ যে কত প্রাচীন, তাহা ঠিক বলিবার উপায় নাই; কিন্তু, 'বহু প্রাচীন' বলা যাইতে পারে। দীর্ঘতম। গুহা স্থায় এবং তাহার কাফীবান প্রকৃতি পুর বেদের মন্তব্যটা ছিলেন। অঙ্গরাজের

অঙ্গরাজ পক্ষ পুত্র লোমশাদি দ্বন্দ্বয্য নামক অবস্থান অমোঘ্যর নাম (শ্রীমদ্ভাগবত পিতা) দ্বন্দ্বয্যের সমনামা মিত্র এবং সমসাময়িক ছিলেন। সেই লোমশাদির অঙ্গরাজ জয়োদ্যন বা চতুর্দশ পুত্রকে মহারাজ অধিরথের ভ্রাতৃ হই এবং তিনিই মহাভারত-যুদ্ধের মহাবীর কর্ণের পালক-পিতা ছিলেন। অঙ্গ-বঙ্গাদি হইতে কর্ণ প্রায় বিংশতি পুত্র অঙ্গরাজ। যিশুস্মৃতে ৩১০১ বৃষ্টপূর্ণাব্দে মহাভারতের যুদ্ধ ঘটনা-ছিল এবং অবিকালে ইউরোপীয় যতে উহা বৃষ্টপূর্ণ চতুর্দশ শতাব্দের ঘটনা,—কিন্তু কেহই ঐ যুদ্ধকে বৃষ্টপূর্ণ একসহস্রাব্দের অপেক্ষা নূতনতর বলিতে পারেন নাই।

রামায়ণ এবং মহাভারতে উল্লেখ

রামায়ণ, অমোঘ্যাকাণ্ডের ১০ম সর্গে (বঙ্গবাসী) এবং মহাভারতের আদিপর্বের ১০৪, ১৮৬ অধ্যায়। সভাপর্বের ৪, ১৪, ৩০, ৩৪ অধ্যায়, বনপর্বের ৫১ অধ্যায়, ভীষ্মপর্বের ২ম অধ্যায় এবং আরও নানা স্থানে, বহু মহাপুরাণগ্রন্থে বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ



চক্রনেমি

শ্রীসতীপতি বিজ্ঞানস্বপ্ন

(১)

আমি আমার সেই দিনের কথাই মনে পড়িতেছে—বেসিন ব্যবস্থা-বাগিচারে তাবনা হইতে নিজেকে নিমুক্ত করিয়া একটা বস্ত্রের নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিলাম। তারপর মাস দুই যে কি ভাবে কাটিয়াছিল, তাহা এতদিন পরে ঠিক বলিতে পারি না ; তবে বেসিন চাহিয়া সেবিবার মত মনের অবস্থা কিরিয়া পাইলাম, তখন সেবিলাম, আমার বলিতে কিছুই নাই—নাই ব্যাঙের ঢাকা, নাই ঘোড়ান, নাই স্ত্রীর গা-ভরা গহনা ; মাথা শুষ্কিয়া থাকিবার ব্যস্ততানিও নাই, এমন কি, এমন একটু লবীও নাই—যেখানে নিরুপগ্রহে বলিয়া লগ্নিবারে অন্যাহারে মরিতে পারি।

কিন্তু কিছুই না থাকিলেও এমন একটা জিনিষ আছে, বাহ্যকে ‘নাই’ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। সেটাকে ধরে করিতে হইলে নিজের অস্ত্রির গোপ করিতে হয় ; বিশেষ সেটা যদি মাত্র নিজেরই হয়, তাহা হইলেও না-হয় উপেক্ষা করা চলে ; কারণ, সে-উপেক্ষার দ্বারা অবজ্ঞাতাবী ফল, তাহাই ছিল তখন আমার একমাত্র কাম্য। কিন্তু ঐ—বিশেষ ছেলেদের সম্বন্ধে ত’ সে-ব্যবস্থা চলে না ; তাহাদের উত্তরে—কিছু দিতেই হইবে—তা সে চুরি করিয়াই হউক, আর চাকাতি করিয়াই হউক। তাই কাহাকেও দুখ দেখাইবার ইচ্ছা না থাকিলেও বাহির হইতে হইল।

যখন মৃদমর ছিল, তখন অনেককেই অনেক কিছু দিয়াছি ; সুতরাং তাহারাও যে আমার সহিত সেইরূপ ব্যবহারই করিবে, সে-বিষয় নিঃসন্দেহ। কিন্তু সে-প্রত্যাশকার গ্রহণ না করাই উচিত ; তাই যে-সকল বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ঢাকা-কঙ্কির স্পর্শ করি নাই, তাহাদেরই একজনদের বৈঠকখানায় বিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে যে আমার সব-বন্ধবের

বন্ধই উপস্থিত থাকিতে পারে, তাহা পূর্বে জানি নাই। বাহির হইতে আমার নাম-সমুক্ত একটা কথা কানে বাইতেই চাহিয়া দেখি, আমার সব-প্রবীর বন্ধই সেখানে উপস্থিত। তাহার। যে আমাকে দেখিয়া ফেলিয়াছে, তাহা তাহাদের হঠাৎ নীরবতাই আমাকে বুঝাইয়া দিল ; কিন্তু তখন আর করা চলে না, কাজেই ধীরে ধীরে চুপিয়া পড়িয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম।

বন্ধুর দল মগলমাগরে আমার সন্ধান করিল—ঠিক যেন আমি সেই পূর্বের বতীলই আছি ! আমারও মনে হইল, হয় ত’ বা আমি সেই বন্ধুই আছি। তা আসিল, সকলের সঙ্গে আমিও এক শেরালা পাইলাম। চা-পানের সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ মালোচনা চলিল ; কিন্তু আমার সম্বন্ধে একটি কথাও নয়—যেন আমার কিছুই হয় নাই।

এই বৈঠকখানার অধিকারী বন্ধুটির নাম ধীরেন ; তাহার কাছেই আমি আসিয়াছি, কিন্তু কোন কথা বলিবার সুযোগ বর্ত্তিচ্ছ না ; সবাই পরে মঙ্গল —উত্তিবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না ; তবে মহা-প্রদয়েরও যখন বিকিটে সীমা আছে, তখন এই প্রদয়েরও যে সীমা থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ কি ! কিন্তু সে-সীমা যখন আসিল, তখন শ্রিগহর অতীত—স্বাধা তাড়নায় ছেলে-মেয়েদের যে কি অবস্থা হইতেছে, তাহা কখন। করিয়া আমার অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিচ্ছে !

সকলে-উত্তিরা পড়িল। আমি উত্তিগার না দেখিয়া তাহারা বলিল, “এল বে, বাবে না ?”

“তোমরা এসোও, আমি ধীরেনের সঙ্গে একটা কথা বলিচ্ছি।” তাহারা “ও” বলিয়া চলিয়া গেল। তাহাদের “ও” কথাটা আমার কানে যেন বিচ্ছপের মত গুনাইল, কিন্তু সেটা বোধহয় আমার

অম! বীরেনও উঠিয়া পাড়াইয়াছিল; সে সেই 'না' বলতুম। আচ্ছা তাই, চললুম, বড় বেলা অবস্হাতেই হাই তুলিয়া দিষ্ট ভাষার দিকে চোক ফ্লাইয়া বসিল, "কি বলবে বল হে ঈশ্বর! বেলা হ'রে গেছে, পোলাওটা বোধহয় জুড়িয়ে গেল।"

এতক্ষণ জুড়ায় নাই, এখন জুড়াইল! তাহার ভবী দেখিয়া অতিবড় নিরাশ্চর্য বোধহয় কোনো কিছু বলিতে প্ররতি হয় না; কিন্তু আমি না-কি নিরুপায়, তাই কোনো মতে বলিয়া কেলিলাম, "তাই, মোটা কতক টাকা দিতে পার, — আমি ঈশ্বরই দিতে দেবো।"

"টাকা! বসে, টাকার জন্তে দলানুবোলা ঈমতীর সঙ্গে একটা বচসাই হ'রে গেল। কথটা কি জানো—"

জানিবার কিছুমাত্র প্ররতি বা কৌতূহল ছিল না; কিন্তু পরম বড় বাগাই, তাই জিজ্ঞাস্য নেড়ে তাহার দিকে চাহিলাম।

সে বলিয়া বাইতে লাগিল, "ব্যাপারটা হয়েছে এই, শ্রীবতীর নইয়ের মেয়ের বিয়ে পরত। তাঁর ইচ্ছে, একছড়া নেকশেন আর বেনারসী শাড়ী একখানা মেন—প্রায় তিনশো বানির খাড়া। প্রতিবাদ করাতেই নারীর বা' শ্রেষ্ঠ অম্ব—তাই বর্ণন। শেষে আড়াইশো টাকা ঋণ দিবে জববেই মিলন। নইলে দুটীর দিনটা মাটি হয়েছিল আর কি।"

"তা' কি করবে বল, কলারে থাকতে হ'লে ও সব ত' আছেই। আমি ত' শো-টো চাইনে, মাত্র মোটা পাচেক।"

"জবে আর তোকে বললুম কি, কাল বাম্বার করব, এমন একটি পরপাও নেই—তার ওপর শ্রীবতীর এখনো পলাশের দাবী। নইলে জুই এসেছিল,— এই সামান্য ব্যাপার — সে কি আর বলতে হয়। দেখ, জুই এক কাম কর।"

আশাবিহত মুখে বীরেনের দিকে চাহিলাম। সে বলিল, "দেখ, জুই একবার হরির কাছে যা, সে একুশি দেবে। আমার থাকলে কি আর

উপদেশ-সুখা বর্ণন করিয়া বীরেন অন্যরে প্রবেশ করিল।

(২)

সেই বীরেন! আমরা ছেলেকেলার একই কুলে একই ক্রাশে পড়িতাম; কাপড়-ছাদ। একই বকমের না হইলে কেহই পরিচায় না। বাহার খাওয়া আসে হইত, সে-ই আদিয়া অপরের বাটতে উপস্থিত হইত, তারপর একত্র মুল-বাড়া! সর্বকণ্ঠে একত্র অবস্থান, মাত্র রাত্রিতে আমরা গৃহস্থ হইতাম; জবে মধ্যে মধ্যে একত্র বাড়িবাগে যে না খটত, তাহাও নহে। একবার আমরা দুইজনে 'জু' দেখিতে গিয়াছিলাম; কয়জন বর্ষক নিষেদের মধ্যে তর্ক করিয়া আমাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তোমরা কি জুই তাই?" আমাদের বেশের সাদৃশ্যই যে এই তর্কের কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই বীরেন! সে আর অগ্নানবধনে শোলাও জুড়াইয়া বাইবে বলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল—একবার জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যকও বোঝ করিল না যে, পাচ টাকার এত কি দরকার!

এখন উপায়? উপায় আর কি, শিতল-কাসার বাসন এখনও বা' অবশিষ্ট আছে, তাহাই বিক্রয় করা। অহরহাণ হইল, কেন ভগবান এই বুদ্ধিহীন পূর্বে মেন নাই, তাহা হইলে এতবেলা পর্যন্ত ছেলেরা অনাহারে থাকিত না। আর এত বড় অত্যাচারনা ভোগ করিতে হইত না। এখন ত' তাহাতেই দ্ব'চার দিন চলিবে, না-হয় কলাপাতেই বাইবে, ত' ত' তাহারা বাইয়া বাঁচিবে। কিছু তারপর? তারপর ভগবান! আছেন।

এই সব ভাবিতে ভাবিতে বাইতেছি, রাত্তার সাফল্য পতপতির সঙ্গে। সে ভাবিতে হুসেন, ছেলেকেলার এক ক্রাশে পড়িয়াছি। জিজ্ঞাসা করিল,

“কোথায় যাওয়া হয়েছিল?” ছেলেবেলায় আমরা পরস্পর ‘তুই-তোকারি’ করিয়া কথা কহিতাম, কিশোর বয়সে আমরা সেই ‘তুই-ই’ বলিতাম, কিন্তু পতপতি বলিত ‘তুমি’; এখন ঘোবনে আমরা বলি ‘তুমি’, সে ধরিয়াছে প্রথম পুরুষ। না বলিতে পারে ‘তুমি’, আর না বলিতে পারে ‘আপনি’, কাজেই তাহাকে এই পথ ধরিতে হইয়াছে। পতপতি ছাপাখানায় চাকরি করে, রোজ নগদ পাথ পাঁচ পিকা, তাহাতেই কোনো রকমে চলে। আমি তাহার প্রায়ের উত্তরে একটু মগ্নি হাদি হাদিয়া বলিলাম, “একবার ধীরেনের বাড়ী।”

পতপতি বলিল, “সেখানকার খবর ভাল ত?”

সেখানকার অর্থে যে ধীরেনের বাড়ী — তাহা বৃত্তিতে কষ্ট হইল না, তাই বলিলাম, “হ্যাঁ, ভাল।”

“এরকম শুকনো দেখাচ্ছে যে, বাড়ীর খবর সব ভাল?”

“হ্যাঁ” বলিয়া পাণ কাটাইয়া চলিতে লাগিলাম; কেন না, আমার কণ্ঠস্থর আমার কানেই যেন বক করণ শুনাইতেছিল।

পতপতি কিন্তু লজ হাড়িল না, সে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে চলিতে কি একটা কথা যেন বলিতে চায়, তাহার ভাব দেখিয়া আমি বলিলাম, “তুমি কি আমাকে কিছু বলতে চাও?”

সে কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, “হ্যাঁ।”

তখন আমার মানসিক অবস্থা যে কি, তাহা বোধহয় না বলিলেও চলে, তার উপর রাত্তর এ আবার কি উৎপাত! একটু কক্ষস্থরে বলিলাম, “কি বলবে, চুপেই বস, আমি একটু ব্যস্ত আছি।”

সে লম্বুচিহ্ন হাতটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, “এই পাঁচটা টাকা—”

আমি তন্ত্রিত হইয়া পেলাম; কিন্তু পরক্ষণেই আমার দুই চোখ ছাপাইয়া যে চলটা বাহির হইতে লাগিল, তাহাতে ধীরেনের ব্যবহারের মানিত যেন নিশ্চিহ্ন হইয়া যুইয়া গেল। আমি সেই

বাদ্যাকলের মতই পতপতিকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলাম। প্রকৃতির হইয়া — আমার অভাবের কথা সে জানিল কি প্রকারে জিজ্ঞাসা করিলে, সে যাহা বলিল তাহার মর্ম এই — সে একটা শুভদিন সেখানেইবার জন্ত আমার বাড়ীতে যার, সেখানে সে আমার ক্ষুধিত পুত্রের ক্রন্দনের শাশ্বনায় আমার শ্রীর মুখে তনিত পাথ যে, আমি টাকার জন্ত ধীরেনের কাছে আসিয়াছি; সে টিক জানিত যে, ধীরেন টাকা দিবে না; কেন না, সে ধীরেনের কাছে দুই এক দিন পূর্বে যে সমালোচনা শুনিয়াছে, তাহাতে এছাড়া আর কিছু মনে হওয়া সম্ভব নয়। তাই সে পাঁচটা টাকা লইয়াই ধীরেনের বৈঠকখানায় গাশেই অপেক্ষা করিতেছিল, লক্ষ্য কথাবার্তাই সে শুনিয়াছে। সামনের দর পলিটা দিয়া আসিয়া আমার লক্ষ্যে বাড়াইয়াছে।

আমি ধরা-পলার বলিলাম, “তোর চোখে কিসে?” তার অবস্থা জানিতাম বলিয়াই এই প্রশ্ন।

সে বলিল, “কাল সাড়ে সাত টাকা পেয়েছি, সেড় টাকা খরচ হ’য়ে গেছে, হাতে আছে এক টাকা, তাতেই হুঁ এক দিন চ’লে যাবে। আমাদের নতুন মাসেকার দিন হয়েছেন, তিনি খুব ভাল লোক, দরকার হ’লে সপ্তাহের মধ্যেও কিছু সেন।”

বলিয়া আমাকে একটু কৃতজ্ঞতা জানাইবার অবসর না দিয়া পতপতি সরিয়া পড়িল। মনে হইল, কোথায় উক্ত শিক্ষিত ধীরেন, আর কোথায় অশিক্ষিত পতপতি! বিকার মাপ-কাঠি লম্বে লম্বে মগ্নিল।

(৩)

পরদিন এক রকমে কাটয়া গেল। তাবিয়াছিলাম, দুই টাকা রাখিয়া পতপতিকে তিন টাকা ক্রিয়াই দিব; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহা ঘটনা উঠিল না। কেন ঘটনা উঠিল না, তাহা আমার মত অবস্থার না পড়িলে কেহ বৃত্তিতে পারিবে না।

পূর্বে তাবিয়াছিলাম, যে-এক বহু-বাক্যের সঙ্গে

অর্থের লব্ধ ছিল, তাহাদের কাহারও কাছে কিছুই চাহিব না; কিন্তু সে-ভাষা বজায় রাখা সম্ভব হইল না। একে একে সকলের কাছেই চাহিলাম; এমন কি মলমলে তাহাদের যে সাহায্য করিয়াছিলাম, সে-কথাও স্বরণ করাইয়া দিতে কষ্ট করিলাম না। সকলেই সহানুভূতি জানাইল, গ্রন্থ প্রকাশ — অবাচিত উপদেশ দিতেও তুল করিল না; কিন্তু আসল কথা কেহই কান দিল না, অজুহাত সকলেরই প্রায় এক — সেই কাবুলী, “আহা-হা, হুই একদিন আসে বলতে হয় ভাই, তা’ হ’লে মুদ্রিক না মিরেও দিতাম।” কেহ বা বলিল, “বলতে ভাই, লজ্জার মাথা কাটা যাচ্ছে, হাতে একটি পরশাও নেই — নইলে তুমি এসেহ” ইত্যাদি। কেহ বলিল, “একটু আসে যদি আসতে তা’ হ’লে বে ক’রে হোক কিছু দিতাম, আমার অবস্থা জান ত’।” একটি বন্ধু আফগান ব্যাণ্ড অর্থাৎ কাবুলীওয়ালারও সেবায়ে। দিতে ইতস্তত করিল না। অথচ আশ্চর্য্য এই, যিনি এই উপদেশ-স্বা বন্টন করিলেন, একদিন তিনিই কাবুলীওয়ালার যে কি চীৎ তাহা হাতে হাতে মানুর করিয়াছিলেন; শেষ বেদিন বাজারের মধ্যে হাত হইতে বামহা ছিনাইয়া লইয়া কাবুলীওয়ালার তাঁহার কষ্টশোধ বন্টন করিয়াছিল, সে-দিন এই আমিই তাঁহাকে ই প্রীতি-সন্মান হইতে রক্ষা করি।

বন্ধুর প্রতি সে-দিন বিরক্ত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু কিছুকাল পরে একদিন তাঁহার সেই পরামর্শই গ্রহণ করিতে হইল — এক কাবুলীওয়ালার কাছে পঞ্চাশ টাকা ধার লইলাম, অর্থাৎ এক মাসের সুদ ৪ টাকা এবং ‘লিখাই বরচা’ ৩ টাকা, ওমুনে ৭ টাকা ব্যয় দিয়া ৪০ টাকা লইলাম। টাকা লইবার সময় ভাবিলাম, আমি ত’ ব্যবসায়ীর বাহুব, এই টাকাটা খাটাইয়া যে কোন রকমে হউক নিজেরই কিছু আয় করিতে পারিব—কোটাও বে করি নাই, তাহাও নয়। কিন্তু সব কোটাই ব্যর্থ হইয়া গেল। লাভের মধ্যে কিছুদিন নির্নি-বাসে লগার চলিল এবং কাবুলীওয়ালার সুদ বাড়িল।

সকলে কাবুলীওয়ালার নিষা করে; আমি সে তাদের প্রণয়া করি, তাহা নহে; কিন্তু সত্যের খাতিরে একথা অবজ্ঞাই স্বীকার করিব যে, যখন আশীশ-বছর, বহু-বাকব—কাহারও কাছে টাকা পাওয়া যায় না—বা কেহ কোমলগ্রন্থ সাহায্য করে না, অথচ টাকার ক্ষয় দিশাহারা হইতে হয়, তখন কাবুলীওয়ালার যত বন্ধু আর কেহ নাই। যে কেহ তুমিবে যে, এই লোকটা কাবুলীর কাছে সেনা করিয়াছে, সেই উপায় নাসিকা হুজিত করিবে; কিন্তু কেহই ভাবিয়া দেখিবে না যে, কত নিকপায় হইয়া সে এই লজ্জাকর কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যদি প্রতি মাসে নির্মমিত সময়ে একবার তাহাদের হাতে হাত দেওয়া যায় অর্থাৎ বধা সময়ে সুদ দিতে পারা যায়, তাহা হইলে সে যে তোমাকে চিনে, এমন ভাবও তাহার আত্মায়ে ইঙ্গিতে উপলব্ধি হইবে না।

আমার পূর্বাশ্রয় মাতুল মহাশয় মনবান্। তিনি মনবান্ হইবার পূর্বে আমাদের সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক ছিল, সে-কথা বলিবার আবশ্যক নাই—তুলিয়া লাভও নাই। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমি তাঁহার কাছে একশত টাকা চাই — মানস্বত্ব নহে, ধার চাই। আমার জীবনে তাঁহার কাছে কিছু চাওয়া এই প্রথম এবং তাঁহার পক্ষে এই সামান্য টাকাটা দেওয়াও কিছুমাত্র কষ্টকর নহে। তাঁহার নিকট হইতে যেদিন লাবাশ পাইলাম, তাঁহার টাকা দেওয়া সম্ভব হইবে না, সেই দিনই মলমলের উপর জুয়ার কাবুলীর পরশাপার হই।

এই কাবুলীর সেনা পরিপোষ করিয়া সেনা, এক উদারচরিত্র মহাপুরুষ। তাঁহার কথা মনে হইতেই মির আপনা হইতেই নত হইয়া যায়। ব্যবসায়-সুত্রেই ইহার সহিত পূর্বে পরিচয় ছিল; তিনি জানিতে পারিয়াই তাঁহার এক কর্মচারী দ্বারা কাবুলীকে ডাকাইয়া সুদ সমস্ত টাকাটা পরিপোষ করিয়া আমার—কেবল আমার কেন—আমার স্ত্রী-পুত্রের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। এখন আমি

সে-সব পরিশোধ করিতে পারি, কিন্তু ঐ 'ত' শুধু ঐ সামান্য টাকাটাই নয়, কতকতার স্তম্ভ শোধ করিব কি উপায়ে?

কাফীওয়ালার সেনা শোধ হইল বটে, কিন্তু আয়ের কোনো উপায় দেখিলাম না। এদিকে বাড়ীটি যিনি বীলানে কিনিয়াছিলেন, তিনি নোটীশ দিয়াছেন; সুতরাং এইবার প্রকৃত হাঙ্গামা ছাড়া থাকাইবার আর স্থান নাই।

(৪)

আত্মীয়, পরিচিত,—সকলের কাছেই আমি টাকা চেষ্টা করিয়াছি। কেবল একটি মাত্র আত্মীয় ছিল, যাহাকে টাকার কথা বলি নাই। এইখানটায় কেমন একটা দুর্গলভা দেখা দিত; মনে হইত, এ-ও যদি 'না' বলে 'ত' সমস্ত পৃথিবীর উপর বিস্তৃত হইয়া পড়িব, কেন না, তাহাকে ভালোবাসি—ছোট ভাইয়ের মতই ভালোবাসি। ভাবিতাম, তার কাছে 'ত' কিছুই পোপন নাই—সে 'ত' সবই জানে, যদি কর্তব্য মনে করে 'ত' উপযুক্ত হইয়াই সাহায্য করিবে। সাহায্য যে সে করে নাই তাহা নয়, তবে নগদ টাকার সাহায্য সে করে নাই বা কত আশ্রয়ক বোধ করে নাই—আমিও কখনো তাহার কাছে চাহি নাই।

ধনবানের সকলের চাইতে শত্রু তাহার।—বাহারা পরীব হইয়াও ধনবান আত্মীয়ের সমুখে সর্বদা চলা-ফেরা করে। প্রাণ বরিয়া তাহাদের না করিতে পারা যায় সাহায্য—না করিতে পারা যায় প্রসন্নমুখে লজ্জা। সকল মানুষের বিবেক বলিয়া একটা পদার্থ আছে, তাহাকে কৈকির না দিয়া উপায় নাই; না দিলে তাহার তাড়না অনিবার্য। চোর, ডাকাত, খুনীও বিবেকের কাছে লুকাই পড়ে। এই সব ধনীসের মনোভাব এই যে, পরীব আত্মীয়েরা দূর হইতেই আত্মীয়তা স্বীকার; কেন না, নিকটে আসিলেই বিবেকের তাড়নার অস্থির হইতে হয়। এই অবস্থা-বিপর্যয়ে আর একটা বিদ্য আনি লক্ষ্য করিয়াছি

যে, যে-সব পরীব বড়-বড়ের পূর্বে আমাকে দেখিলে আনন্দে উৎফুল্ল হইত, তাহাদের মধ্যে ভাষাবলে বাহারী ধনী হইয়াছে, তাহার। আমাকে দেখিলেই বিরক্ত হয়, অন্ততঃ স্ট্রিডলাভ যে বরে না, তাহা তাহাদের মুখ দেখিলেই বুঝা যায়।

আমার বেশ মনে আছে, এই সময় এক অতি নিকট আত্মীয়ের কস্তার বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া ট্যান্সি করিয়া সতীক তাহার বাড়িতে গাই; পরের পরসার ট্যান্সি চড়িবার লোভে ইচ্ছা করি নাই, করিয়াছিলাম—আমার স্ত্রীকে 'স্ট্রী-আচার' করিতে হইবে বলিয়া অস্বস্তি হইয়াছিলাম, অস্বস্তি নানা চেষ্টায় সৌকর্য্যতার টাকা লক্ষ্য করিতে বিরক্ত হইয়া নিকটবর্তী হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া। সেই আত্মীয়টি দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা করিতেছিলেন। অবস্থাপন্ন ব্যক্তির। ট্যান্সি হইতে নামিতে-না-নামিতেই প্রসন্নমুখে অভ্যর্থনার দ্বন্দ্ব কি! আর আমাকে সতীক ট্যান্সি হইতে নামিতে দেখিয়া তাহার মুখভাব যে-আকার দ্বারণ করিল, তাহাকে প্রায় 'ত' বলাই যায় না, অশূণ্য বলিলেও ভুল হয় না। তাহিণ্যে, কি বোকামিই করিয়াছি! যেখানে হাঁচিয়া—না হয় রিদ্ধা করিয়া আসা উচিত ছিল, সেইখানে ট্যান্সি! ইচ্ছা হইল, তাড়াতাড়ি নিজেই দিয়া ফেলি; কিন্তু সকলের সমুখে একটা অশ্রীভিকর ঘটনার আশঙ্কা করিয়া নিরস্ত হইলাম। তাড়া তিনি অবশ্য দিলেন, কিন্তু কি অপ্রসন্নমুখে!

সে-দিন পুরাতন কাগজ-পত্র খাটিতে খাটিতে একখানি হ্যাণ্ডনোট আমার চোখে পড়িল—উহা আমাকেই দেওয়া হইয়াছে। হ্যাণ্ডনোট আসিল কোথা হইতে! আমি 'ত' বাহাকে টাকা দিয়াছি, তখনই মনে মনে দান হিসাবেই দিয়াছি, কেহও পাইবার প্রত্যাশা কখনও করি নাই; অবশ্য যে দিয়াছে তাহা যে লই নাই, তাহাও নহে; তবে লক্ষ্য কখনও এক পরসার লই নাই। তাই এই হ্যাণ্ডনোট দেখিয়া মুগ্ধিত পারিলাম না, কি করিয়া এটা লভ্য

হইল। তারিখ দেখিয়া বুলিলাম, ইহা এখনও তামাদি হয় নাই—প্রায় এক মাস সময় আছে। লোকটাও পরিচিত। পার্শ্ববর্তী গ্রামের। ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল, ঠিক হইয়াছে, লোকটাকে এখন টাকা দিই, তখন সে ধোর করিয়া হ্যাণ্ডনোটখানা গছাইয়া দিয়াছিল। ভাবিলাম, ইহা ভগবানের দান।

তখনও না-কি আমার মাল্লব চিনিতে ব্যক্তি ছিল, অই ভাবিলাম, ধোর করিয়া যে হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দেয়, সে যে টাকা দিবে, তাহাতে সন্দেরের অবকাশ কোথায়? কাছেই বিরাট আশা লইয়াই তাহার লিখিত সাক্ষ্য করিলাম। প্রথমে হ্যাণ্ডনোটের কথা না বলিয়া শুধু টাকাই চাহিলাম। সে ত' আকাশ হইতে পড়িল। বলিল, “আনি! টাকা ধার করয়েছি তোমার কাছে!”

তৃত্ত্বিত হইলাম: বলিলাম, “হ্যাণ্ডনোট আছে।” লোকটা হাসিয়া বলিল, “ধাকতে পারে, কিন্তু তামাদি হ'বে সেহে।”

“না, এখনও এক মাস সময় আছে।”

বিক্রমের হাসি হাসিয়া সে বলিল, “ওসব রামাবাজী আমার কাছে চলবে না, স'রে পড়।”

রাগ হইল। যদি সে এসময়েও বলিত, ‘আমার সামর্থ্য নাই, নিতে পারিব না’, তাহা হইলে বোধ হয় এ-অবস্থাতেও আমি হ্যাণ্ডনোট ছিঁড়িয়া কেলিয়া চলিয়া আসিত্ত পারিতাম। কিন্তু তখন না-কি আত্মীয়ের ব্যবহারে আমার অন্তর বলিয়া পুড়িয়া থাক্ হইয়া গিয়াছিল, তাই তাহার এই নির্লজ্জ ব্যবহার সহ হইল না। বলিলাম, “দেখ কিম্বেন, যদি স-মানে টাকা না দাও, তা' হ'লে হির কেনো, নালিশ ক'রে টাকা আদায় করব।”

কিম্বেন দুই পাঠী দণ্ড বিকসিত করিয়া বলিল, “নালিশ ত' স্কুকের কথায় হয় না—এই চাই।” বলিয়া ছুট। আঙ্গুলের এক বকম ভঙ্গী দেখাইল।

↑ “নিম্নে না পারি কাবলীওজামাকে হ্যাণ্ডনোটখানা কেনে—স্বয়ে আসল প্রায় সত্তর টাকা দিয়েছে,

বেচলে অল্পত: মিশটে টাকাও ত' পাবে।। গোমাকে লক্ষ করবই, এটা তুমি যেনে রাখো।”

কিম্বেনের ঘুর বদলাইয়া গেল। মিনতির দ্বারে বলিল, “তা পাঠান বেটাকে ঐ টাকাটা না খাইয়ে আমাকে দাও না কেন। আমিই না-হয় ঐ টাকাটা ধারখোর ক'রে যেমন ক'রে পারি সেবো 'খন।”

“এ-কথা এখন আর বাটে না, আগে বললে চলত।”

দুই হাত কলসাইতে কলসাইতে সে বলিল, “তাই, ছা-পোবা মাল্লব, একটু দয়া কর। বেই ব'লেই না এসব কথা বলছিলুম।”

দয়া হইল। বলিলাম, “বেশ, তাই নিরে এস।”

“এবনি কোথায় পাবে। এক মাস সময় দাও।”

“ওসব চালাকি চলবে না। আজ না নিতে পার, কাল নিতেই হবে। না দাও—আমাকে বাধা হ'রেই অনুরকে বেচতে হবে।”

একটু ভাবিয়া কিম্বেন বলিল, “বেশ, তাই সেবো—তুমি এখন সময় দেবেই না।”

“কাল সকালে আসব” বলিয়া সে-স্থান ত্যাগ করিলাম।

সে-রাজিটা উপবাসে কাটিল, কেবল গৃহিণী ছেলেরে কি উপারে বাগড়াইয়াছিলেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। তিনদিন পরে বাড়ী ছাড়িত্ত হইবে, কোথায় যে আশ্রয় পাইব, তাহা অন্তর্ধ্যামীই জানেন। অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিছুতেই একটা চাকরী ছুটাইতে পারি নাই। ক্রমেই কীবনে খিড়ার লম্বাইতেছে। বত পরিচিত লোককে জানি—বেশ নিপুণ তবে ভাবিয়া দেখিলাম, আমার মত হুঁত্যা দেখিতে পাইলাম না। তাহাদের ভিতর যে ছন্দী নাই—তাহা নহে; কিন্তু আমার মত! নিজের অক্ষমতার নিজের উপর নিজেরই ভণা হইতেছিল, অপরের যে কিঞ্চপ হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। হির করিলাম, এ ছুঁহাঁ কীবনের ভার নাশাইব।

(৫)

পরদিন সকালেই বিজ্ঞানের বাজারে উপস্থিত হইলাম। অনেক ধনভাণ্ডারের পর যখন ত্রিণ টাকার পরিবর্তে পচিশ টাকা হার হাতে পাইলাম, তখন মার্তণ্ডের পশ্চিমাংশে সবেমাত্র হেলিক্স আরম্ভ করিয়াছেন। একতরফ টাকা আগায়ের ব্যাপারেই মন নিবিষ্ট ছিল, কাজেই বাজীর কথা আর সেখানে স্থান পায় নাই; টাকা হাতে পাইতেই মন বাজীর দিকে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি বাজারে ঢুকিলাম; তখন সূর্য্যের তীব্র দীপ্তির মনের যে কি অবস্থা হইয়াছিল, এই স্তম্ভের তাহার স্বরূপ প্রকাশ করা সম্ভব নয়, বৃত্তি বা ধারণা করাও কঠিন।

বাজার হইতে বাহির হইয়া রাস্তার পাশে নিতেই মাথাটা বেশ ঘুরিয়া উঠিল, সন্ধ্যের এক দ্ব্যস্তময় হাতের গুটিলিটা পাশে রাখিয়া বলিয়া পড়িলাম। তুমার কত গুণ! সন্ধ্যের ভাব-সরবতের বোঝান, একবার মনে হইল, একটা ভাব কিনিয়া খাই, কিন্তু তখনই অদ্ভুত পুষ্প-কন্ডার অনাহারপ্রাপ্তি মূখ মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। মনে মনে ভাব খাইবার প্রবৃত্তি কোথায় যে আশ্বপোষন করিল, তাহার আর সম্ভাবন হইল না। তারপরই মনে হইল, এভাবে ত' বেশী দিন চলিতে পারে না। ইহার পর কি হইবে? চকুর উপর কি ত্রী-পুষ্পকে অনাহারে দ্ব্যস্তময় মরিতে দেখিব! ভগবান! তখন আমার হঠাৎ মনে হইল, বোধহয় আমার পাশেই তাহার কষ্ট পাইতেছে। আমার অবর্তমানে অনাথা বলিয়া লোকে তাহাদের দয়া করিতে পারে। ঠিকই ত'। আমি হুহু সবল মাতৃ, আমাকে লোকে দয়া করিবে কেন! যুদ্ধ মতো কর্তব্য দ্বিগুণ হইয়া গেল। বাজারের বোঝান-বিনে হইতে একটা বস্ত্র কিনিয়া পকেটে কেয়িয়া গৃহে উপস্থিত হইলাম।

আমাকে আনিতে দেখিয়া গৃহিণী হাসিমুখে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, আমার হাত হইতে বাজারটা লইয়া পাশে রাখিয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতে

লাগিলেন। আমি বলিলাম, "তুমি আর ব'লো না। রাস্তা চাপাও—বাজার এনেছি, চলটাও এনেছি।"

"এ বন্ধুর তোমাকে আর সেতে হবে না। এ বেগার মত রাস্তা হ'লে পেছে।"

কি করিয়া যে রক্তন হইয়াছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তাই বলিলাম, ভগবান! এ-ও অদ্ভুত দেখিয়াছিলে! আমি জীবিত থাকিতেই ভিক্ষা! ও! আমাকে নীরব দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন, "এ অবশ্য আর স্থান ক'রো না, একটু মিষ্টি ভিক্ষা হেঁচকি, নিয়ে আসি।"

এই সুযোগ। তাই বলিলাম, "আর এখানে কেন, তুমি ভাত বাড় পে, সেখানে ব'লেই খাব'ন।"

"জবে তাই এল", বলিয়া গৃহিণী উঠিতে উঠত হইতেই আমি তাহার ঝাঁকুড়ানো চাপিয়া ধরিলাম। তাহার মুখের দিকে চাহিতেই আমার হৃদয় কোথায় ছাপাইয়া ক'রু করিয়া বল পড়িতে লাগিল।

গৃহিণী কণকণে বলিলেন, "ও কি, গুণ কিসের! মাতৃবীর সর্বদা সমান দায় না। এতদিন স্তম্ভের কর্তব্য; আজ না-হয় একটু কষ্টভোগ করছি। তা' ব'লে ত' চিরদিনই এমন হবে না। ছিঃ, তুমি এমন মন খারাপ ক'রো না।"

আমি হৃদয়কণ্ঠে বলিলাম, "আমার হাতে প'ড়ে তুমি কত কষ্টই পেলে—"

"ও আবার কি কথা। কষ্ট আর পেণ্ড কোথা! স্নানার্থে থাকতে হ'লে এ-রকম হয়। নাও ওঠো।"

বাজার-পরত বাসে মোটে টাকার বাগ ছিল, তাহা গৃহিণীর হাতে দিয়া বলিলাম, "ধূর স্নান পরত ক'রো।"

তিনি হাসিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা, এখন ত' তুমি এল।"

গৃহিণী টাকা কয়টা আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে চলিয়া গেলেন। পতিশীলা গৃহিণীর দিকে চাহিয়া আমার আমার হৃদয় চকু জ্বালা করিয়া উঠিল। মনে পড়িল—সদাশান্তমুখী, সবেমনার ভাষা, স্তম্ভের

কল্পনা — এই ব্রীকে ছুঁথের লাগরে ভাসাইয়া আমি পরমোক্তের ব্যতী হইতেছি, এ-বাখা তাহার কুক যে কত বাজিবে, সহ্য করিতে পারিবে কি না, এই ভাবনা আমাকে আমার সমগ্র হইতে টগাইয়া দিল। এই লুন্ডর পৃথিবী — এর মোহও আমাকে পাইয়া বসিল। কেন — মরিব কেন! ছুঁথ ত' অনেকই ভোগ করে, সেই ছুঁথের ভয়ে যে আত্মহত্যা করে, সে ত' কাপুরুষ! কাপুরুষ? হ্যাঁ, কাপুরুষ বই কি! এ যে মদ্যার-মুন্ডের ভয়ে পলায়ন! না, না, না, —এ-কাপুরুষতাকে আমি আশ্রয় করিতে পারিব না, তা অদৃষ্টে ঝাই যটুক। এ আমি কি ভাবিতেছি — এ যে তাবপ্রবণতা! বাস্তব জগৎ তাহার কতাল বদন ব্যাদান করিখা রহিয়াছে, তাহা চাইতে উদ্ধারের পথ নাই। দুইদিন পরে মহাজন বদন আমারই চকুর সন্মুখে ব্রী-পুন্ডের হাত ধরিয়া পাছতলার গাঁড় কড়াইয়া দিবে — হাপুত জায় চোখে দেখা ছাড়া আর কিছুই করিবার সামর্থ্য আমার নাই, তখন?

সমস্ত বিধা দুর্ভাগ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া পেল। আমি পকেট হইতে আকিঙের জেলাটি বাহির করিয়া সত্ক নরনে তাহার দিকে চাহিলাম। তারপর মনে মনে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া জেলাটি পালে দিবার পূর্বেই কে আমার উত্তর হাত চাপিয়া ধরিল। চাহিয়া দেখিতেই আমার ব্রী যে বিবর্ণ সুখ চোখে পড়িল, প্রভিন পরেও তাহা মনে হইলে আমার সমস্ত অন্তর ব্যাকুলতার একেবারে মূলকাইয়া পড়ে।

“আমার এ সর্বনাশ করছিলে—তুমি!”

বলিতে বলিতে গৃহিণী ছিন্নমূল কৃষ্ণের জায় মাটিতে পড়িয়া সেলেন। আকিঙের জেলাটি ছুঁড়িয়া কেলিয়া দিয়া ছই হাত দিয়া ঠাধাকে ধরিয়া তুলিলাম। কিন্তু সুখ দিয়া আমার একটা কথাও বাহির হইল না।

গৃহিণী অগ্র-বিমুক্তিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, “কেন তুমি এ সর্বনাশ করতে বসেছিলে? ছুঁথের মালা কি তুমি একলাই সহ্য করছ? আমি কি

অভাবের জন্তে কোনোদিন তোমাকে উদ্ধাক্ত করে তুলেছি—কোনো অভিযোগ করেছি? সমস্ত দিন অনাহারের পরও বদন রাস্তিরে হেলে-মেয়ে নিয়ে গুয়ে থাকি, তখনও যে তোমার দিকে চেয়ে আমার মনে হয়, বুঝি রাজরাস্তিও এত সুখী নয়।

বলিতে বলিতে গৃহিণীর কণ্ঠস্বর প্রবল অশ্রু-স্রোতে কচ্ছ হইয়া পেল। তাই ত'। এ আমি কি করিতে বলিয়াছিলাম। শুধু বিচ্ছেদের একটা কান্তনিক শাস্তির ক্ষত এই অদহ্য ব্রীলোক আর শিশুদের ছুঁথের লাগরে ভাসাইতে বলিয়াছিলাম। আমি মাথা নীচু করিয়া রহিলাম, গৃহিণীর দিকে সুখ তুলিয়া চাহিতে সাহসও হইল না। অপরূহ যে কত শুভ্র, তাহা বুঝিতে ত' থাকি ছিল না।

আমাকে নীরব দেখিয়া গৃহিণী আর্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “ওসো, তুমি কথা বলছ না যে! এখনও কি তোমার মনে ঐ শাপ খেদান রয়েছে?”

লজ্জানিগ্রিত হাত করিয়া বলিলাম, “না না, বড় তুল করেছিলাম, আমার মাথা ঝগিয়ে দিয়েছিল।”

আমার সুখে হাত দেখিয়া বোধহয় গৃহিণী একটু আশ্বস্ত হইলেন। তাহার পর আমার লামাটা টান মারিয়া কেলিয়া দিয়া মাথার তেল মাথাইতে মাথাইতে বলিলেন, “খড়াকতক ঠাণ্ডা জল মাথায় ঢেলে দি, নইলে মাথা ঠাণ্ডা হবে না দেখছি।”

হাসিয়া বলিলাম, “তুমি তেল মাখান্ন, আমি কিছু বী মাখবার চেষ্টার ছিলাম।”

“মাখবো বললেই মাখা হয় না পে। মাখাখ দি'র নিয়ে মরব, এ আমার কুঞ্জীর কল; সে ত' তুমি জান। নইলে ঠিক সময়েই বা আমি এসে পড়ব কেন।”

“আম্না, দেখা যাবে, কেমব—”

গৃহিণী তেল-মোবড়। হাতটা দিয়া আমার সুখ চাপিয়া ধরিলেন। “এ—কে-হে! সুখটা যে তেলে মূবড়ে সেল!”

“বেশ হয়েছে। এখন এস, খড়াকতক ঠাণ্ডা জল মাথায় ঢেলে দি।”

“তব নেই, আমি গন্ধা থেকে মান ক’রে আসি।”

গৃহিণী বলিলেন না, ঘোর করিয়া বাতীতেই বহুতর মান করাইয়া দিলেন।

(৬)

আমরাতে পয়ন করিয়া মধ্যাহ্নের ঘটনাটা একবার ভাল করিয়া তাবিত্তেছিলাম। কিন্তু তাবনার সকল পুথনা ভাঙ্গিয়া ছুরিয়া এক গৃহত্যাগেই কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িল। এই গৃহ ছাড়িতে হইবে—বে-গৃহে জন্মিয়াছি, বাসার অনাবিল মানসখারা, কৈশোরের সুখস্বপ্ন, যৌবনের উজ্জ্বলিত্য বে-গৃহের সহিত গুরুপ্রোক্তভাবে বিচ্ছিন্নিত, বে-গৃহে পূর্ণশুক্লবর্ণের শেখ নিঃশাপ প্রবাহিত হইয়াছে, বে-গৃহে মাতা-পিতামহীদম্পের পদরেখুতে পবিত্র, বে-গৃহে বংশের আশা পুষ্পের জন্মস্থান—সেই গৃহ ছাড়িয়া বাইতে হইবে, কিন্তু কোথায়, তাহার কিছুমান স্থিরতা নাই, অথচ বাইতেই হইবে। একটা প্রবল দীর্ঘশ্বাস বুকখানাকে মুচ্ছাইয়া ভাঙ্গিয়া ছুরিয়া বাহির হইয়া গেল।

গৃহিণী আসিয়া মধ্যাহ্ন বলিয়া বলিলেন, “হৃদয়েলো যে কাণ্ড করলে, একটা ভাল খবর যে তোমাকে বলব, তার অবলম্বও হইল না।”

“কি খবর?”

আমার মাথার চুলে হস্ত-চালনা করিতে করিতে গৃহিণী বলিলেন, “আমি শৈল এসেছিল।”

“শৈলটি কে?”

“বাও, তোমার কিছুই মনে থাকে না; তোমার কাছে কভার তার নাম করেছি—সেই যে সে। হেসেবেশার হার সঙ্গে আমার খুব ভাল ছিল—হার সঙ্গে সেই পাভাতে পারি নি ব’লে ছুঃখ করত।”

এখন মনে পড়িল। বিবাহিত জীবনের প্রথমে এই শৈলের কথাই ছিল গৃহিণীর বড় প্রিয়। বিজ্ঞান। কবিলাস, “এখানে কাদের বাড়ী এসেছে?”

“তার বিয়ে হয়েছে যে এখানে।”

“কৈ, এতদিন ত’ তনি নি।”

“মামিই কি জানতুম, আমিও বউ মাহুদ, সে-ও তাই; তার ওপর তারা হ’ল মদ্যপান, আমরা ভ্রাম্যণ, কোথাও নেমজ্ঞতেও যে দেখা হবে, তারও উপায় নেই।”

“কাদের বাড়ী বিয়ে হয়েছে?”

“হরেন ঘোষের সঙ্গে।”

নামটা কানে বাইতেই সর্বদা বিতৃষ্ণায় লুপ্তিত হইয়া উঠিল। এই হরেন ঘোষই বাড়ীটা কিনিয়াছে—বেচিয়া টাকা দিবারও অবদর দেয় নাই। আর সে-দিনও আর কিছুদিন সময় চাহিয়াছিলাম—সেই নাই। আশ্রয়ীকে পাঠাইয়াছে মোক্ষদা করিয়া।—আমাদের গৃহ-ত্যাগের উত্তাপ-আয়োজন সেবিত। রাগে সর্বদা জ্বলিয়া উঠিল। বলিলাম, “আমরা বাবার উত্তাপ করছি কি না, তাই দেখে গেল খোঁব হয়।”

কর্তব্যের অন্তরের ভাব চাপা ছিল না, তাই গৃহিণী বলিলেন, “তুমি রাগ করছ কেন? সবটা পোন আসে।”

“হরেন ঘোষের দুচ্ছা বয়সের স্ত্রী গোয়েন্দাধারি করতঃ এসেছিল, তার আর গুনব কি?”

“তুমি আগে থাকতে তাকে মোক্ষদা ঠাওরান্না কেন?”

গৃহিণীর কর্তব্যের ব্যথা ছুঁটা উঠিল। নিজের ব্যবহারে নিজেই লজ্জিত হইলাম, বলিলাম, “কেন এসেছিল?”

গৃহিণী বলিতে লাগিলেন, “সে শুনেছে, কোন্ ভ্রাম্যণের বাড়ী তার স্বামী বেচে-কিনে নিয়ে তাকে ফুলে মেবে। হরেন তাকে কোনো কথাই বলে নি। শুনে অবধি ভয়ে সে কাঁটা হ’রে ঘাঙিল। তার একটি ছেলে হয়েছে—সেই ছেলে-অন্ত প্রাণ। সে বাসুনের ভিত্তি বেচা শুনে অবধি তার স্বামীর সঙ্গে কলঙ্ক ক’রে হুকুখা গুলিয়ে দেয়। বিত্তীয় পক্ষের বাসুনের স্ত্রী—জন্মে হরেন কথটি কয় নি। তার পর সে নিজে এখানে এসেছিল।”

আমি উৎসুক দৃষ্টিতে গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বিজ্ঞান। কবিলাস, “তারপর?”

“তারপর সে এখানে এসে আমাদের বেধে অবাক। আমরাই বাড়ী তাইই আমি কিনে আমাদের উদ্দেশ্য করছে, সে ত’ লক্ষ্যের ম’রে গেল। আমার পা ধ’রে সে কি কাছা! তাকে অনেক মিষ্টি কথা ব’লে ঠাণ্ডা করলুম। ছেসেদের কাছা দেখে তার মুখতে বাকী রইল না যে, তারা বিশেষ দ্বন্দ্ব কামছে। সে তখন তার কিকে দ্বিত্ব সব আনিরে গিলে— আমি বারণ করেছিলাম, সে কোনো কথাই তনসে না—কাদতে লাগল। তাই বাধ্য হ’য়েই নিতে হ’ল। এটা কি অস্ত্রায় হয়েছে?”

আমি একটু ভাবিয়া বলিলাম, “অস্ত্রায় না হ’লেও উচিত হয়েছে কি না, বলা যায় না।”

“সেখ, তার মোখ কি? সে ত’ কিছু অস্ত্রায় করে নি।”

“তা’ অবস্ত করে নি। বাকু, তার পর?”

“তারপর সে বললে, কেমন ক’রে তোমাদের বাড়ী থেকে সে তাকার, তা’ দেখব। তুমি ভাই, নিশ্চিত থাক। — ব’লে সে চ’লে গেল। খবরটা কি ভাল নয়?”

“হয়ত ভাল” বলিয়া আমি হুশ করিলাম।

“তুমি অমন মন-মরা হ’য়ে থেক না। তুমি কখনো কারো অনিষ্ট কর নি। তলবানু কখনই আমাদের একবারে মারবেন না।”

(৭)

আমি গৃহভ্রম করিতে ছইবে, এই ব্রকমই কথা ছিল। কিন্তু গৃহস্থীর কবামত কোন উজোপই করি নাই। ঠাহার-দূত বিশ্বাস, শৈল সব ব্যবস্থাই ঠিক করিয়াছে। মাত টাকাটা বীরে ভ্রূহে মিলেই চলিব—না মিলেও কোন গোল ছইবে না; কিন্তু আমি ইহা নির্ভরযোগ্য মনে না করিলেও গৃহ-ভ্রমেরও কোন উজোপ করি নাই।

বেলা বারোটা। সকালে বাহির ছইয়াছিলাম। এইমাত্র আসিয়া সাহায়ে বসিয়াছি, এমন সময় বহি-বাটীতে দুপ্‌দুপ্‌ করিয়া ঢোল বাজিয়া উঠিল। এ

বাধনা যে কিসের, তাহা বুঝিতে বৃহৎমাত্র বিলম্ব হইল না। আমি তাড়াতাড়ি আহাৰ জাপ করিয়া উঠিতে ছাইতেছি, গৃহস্থী সবলে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, “তুমি যদি এই যুগের ভাত কেনে গুঠ, তা’ হ’লে আমি এখন তোমার পায়ে মাখা খুঁড়ে রক্তপাষা হব।”

তখন আমার পিঠায় পিঠায় রক্তব্রোত তীক-বেগে প্রবাহিত ছইতেছে; কিন্তু গৃহস্থীর কাতর মুখ আমাকে নিত্যক বাধিত করিয়া তুলিল। ঠাহার কতখানি আশা যে ঐ এক চোলের শেষ চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল, তাহা বুঝিয়া আমার গৃহভ্রমের ব্যতনও বুঝি অনেক লুপ্ত বলিয়া মনে হইল। আমি রান হাতে বলিলাম, “এমন যদি না উঠি ত’ ঐ শেয়াদা বেটাটা যখন হাত ধ’রে তুলবে, সেটা কি ভাল হবে?”

“তুলে অমনি মিলেই হ’ল। তুমি বাও।”

বাও বলিলেই ত’ বাওয়া যায় না, কোনো মতে ছই-চারি গ্রাস গলাধঃকরণ করিয়াই উঠিয়া পড়িতেই একটা কর্কশ কঠোর ক্ষনি কানে আসিল—“বাড়ী আছেন মশাই?” এই কর্কশ আগ্রহ্য ঐ জীববিশেষ ছাড়া বোধহয় আর কাহারও কৰ্ত্ত দিয়া বহির্ভিত হওয়া সম্ভব নয়।

আমাকে উত্তর দিতে হইল না—সবলবলে ছরেন আসিয়া প্রবেশ করিল। বলিল, “আপনি যদি নোটাশ মত কাছ করতেন, তা’ হ’লে আমাকে এ-হাদামা শোয়াতে হ’ত না।”

ইহা অবস্ত আমাকে স্বীকার করিতে হইল। বলিলাম, “একটা তুল হয়েছে, তার প্রায়শ্চিত্ত ত’ করতে হবে। বেশ, তুমি এক খণ্টা সময় লাও, আমি বাড়ী, বালি ক’রে দিছি।”

বীরস কঠে ছরেন বলিল, “সে হবে না, সময় আমি দ্ব’ মিনিটও দিতে পারব না।”

মিনতির খবর বলিলাম, “সেখ ছরেন, আমার দ্বী কাল থেকে খাম নি, তার বাওয়া হ’লেই আমরা চ’লে বাছি।”

বিকৃত স্বরে হরেন জবাব দিল “আনার স্ত্রী কাল থেকে বান নি! তবে ত’ সোফুলপুত্রী আঁধার হ’রে সেল। ও-রকম চঃ দেখে দেখে—”

তাহার মুখের কথা সুখেই রহিল — বাহির হইতে পারিল না। ভূত সেখানে মাহুনের মুখের অবস্থা যে রকম হয়, হরেনের মুখের অবস্থা তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। বাহ্যকে দেখিয়া তাহার এই ভাব, সে তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী শৈল — সর্বদাসদ্বারভূমিতা — কোলে একটি ছোটপুত্র লুন্ডর শিত। তাহাকে দেখিয়া স্ফা হইল।

“বলি, চূপ করলে যে? কি বলছিলে, বল না।”

জীর কণ্ঠের এই জ্বলি হরেনকে আরও অতিক্রান্ত করিয়া গেলিল। সে সদলবলে সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল।

মহারাপীর মত আদেশস্বচক স্বরে শৈল বলিল, “গাড়াও। এই এঁদের বলিল, এতে না-দাবী লিখে দাও।” হরেন নীরব।

“বাকি হ’রে সেল নাকি? দাও নই।”

এবার হরেনের বাক্যচুরি হইল। কোনো মতে বলিল, “এ তুমি—কি বলছ?”

“মিথোবানী! সেদিন আমাকে কি বলেছিলে, মনে নেই?”

হাসিবার চেষ্টার মুখানাকে বিকৃত করিয়া হরেন বলিল, “কি বলতে কি বলেছি, তা’ কি আমার মনে আছে হাই।”

“বেশ, মনে না থাকে, নেই থাক। এখন এটাতে নই কর দেখি। মনে করেছ, এখন পাগিয়ে দিবে এর পর বা’ করবার তাই করবে; তা’ হবে না, মনে রেখে, আমি সেই শৈল। কর নই।”

হরেনের পাগতবর্ণের মুখ দিয়া বাহির হইল, “তুমি কি পাগল হয়েছ—এত টাকা।”

“তুমি এই বলিলে সই নয়, আরো পাচ হাজার টাকা দিতে হবে। উনি পারেন দেখে সেবেন, না পারেন—কোন দাবী থাকবে না।”

হরেন তত্বিতের মত গাড়াইয়া রহিল, একটি কথাও আর সে উচ্চারণ করিতে পারিল না।

জীরকণ্ঠে শৈল বলিল, “তুমি সেবে না? বেশ, সর্বনাশ করো না—ব্রাহ্মণের ‘মতি’ কুড়িয়ে না। তোমার টাকা ভোগ করবে কে? এই ছেলে ত’? এ-পাশে এ-ছেলে একটি দিনও বাচবে না।” বলিতে বলিতে প্রবল অশ্রুর উজ্জ্বলে তাহার কর্ণরোধ হইয়া গেল।

হরেনের মুখে কথা নাই।

শৈল দুচবরে বলিল, “বেশ, এ-পাশের প্রায়শ্চিত্ত আমিই করব।” বলিয়াই সে তাহার হেলেকে আমার পারের কাছে কেলিয়া দিল। আমি সময়ে তাহাকে কোলে তুলিয়া নইলাম। তারপর সে আমার পারের কাছে হাই দাড়াইয়া বসিয়া তাহার সর্বদাসের অলঙ্কারগুলি তুলিয়া তৃপ্ত করিল। তারপর হাতছাড় করিয়া আমাকে বলিল, “দাদা, আমি তোমার ছোট বোন, আমার এই পরনাগুলো বেচে ওর সেনা শোধ কর। বাকি টাকার ব্যবসা কর’রে পরে আমার এই পরনা কিরিয়ে দিও, আর এই সঙ্গে তোমার এই ছোট বোনের ভারও তুমি নাও। আর আমি ওর বাড়ী বিবে দাব না।” উজ্জ্বলিত কণ্ঠে এই কথাগুলি বলিয়া সে আমার পারের উপর পুটাইয়া পড়িল।

আমার রক্তকণ্ঠ দিয়া মাত্র বাহির হইল, “বোন!” বেশতক দেখিয়া হরেন শৈলবাসীর কথামত বাড়ী ত’ কিরাইয়া দিলই, অবিকৃত পাচ হাজার টাকা দিতেও বিকলিত করিল না।

চক্রসেমির ক্রম-আবর্তনে নীচে পড়িয়াছিলাম, আমা আমার আমি উপরে। হরেনের টাকা শোধ করিয়াছি; কিন্তু শৈলবাসীর গুণ?



গান

দেশসিদ্ধ মিঙ্গ—তেতাল

আবারে ধারাকল ছন্দে

কে গো এলে—কে গো এলে

অবর তরিল আনন্দে

কে গো এলে—কে গো এলে।

বামল-নুপুর পরি' গারে

কেতকী হুবাগ বাধি' গারে

শন্ শন্ পুরবাই বারে

কে গো এলে—কে গো এলে।

তোমার কাঞ্চল দেখ-ফুলে

আমার পরাণ মন ভুলে।

কর্ণে কদম-ফুল ফুলায়ে

শাবী-শাখে ফুলনা ফুলায়ে

জাম অঞ্জন চোখে ফুলায়ে

কে গো এলে—কে গো এলে ॥

কথা, ছব ও স্বরসিদ্ধি—

ঐনির্ব্বাচন বড়াল, বি-এল, বাবীক

স্বারী

১

২

৩

II { [রা রা] সা সা সা সা | রা রা পা পা | পঁধা -রা পা -। -। -। -। -।
 আ বা কে ব বা রা ম ল হ মে }
 (পা ধপা পা -। মজা -। -। -। রা সা নুনা -রজা | রা -। -। -।)
 কে গো এ . সে কে গো এ সে }

না -ধা ধা ধা ধা না [রী] সী সী ধসী -গধা পা [-1 -1 -1 -1]
 অ র র ত তি ল, যা ন. . . রে -পা -মা -গা -1
 সা সা নুনা -রা রা -1 গা ধগা পা মজা -1
 কে গো এ. . . সে কে গো এ সে

অবর।

II { [রী রী]
 না না না না না -1 না সী ধনা স'রী স'না সী
 বা ধ ল ন পূ হ প তি' পা. . . রে
 পা সী সী সী সী -1 সী রী নসী -রী রী [-1 -1]
 কে ত কী হ বা নু মা তি' ধা. . . রে -1
 সী -1 সী -1 সী সী গা ধা প'ধা -1 পা -1
 ন ন প ন পূ র বা ই বা . . . রে .
 সা সা নুনা -রা রা -1 -1 -1 গা ধগা পা -1 মজা -1
 কে গো এ. . . সে . . . কে গো এ সে

সকালী

II { সা সা সা সা | সা সা সা রা নুনা -রা রা
 তো মা র কা জ ল মে য হু. . . সে
 (মা মা পা পা পা পা ধা ধপা মা -পা পা -1 গা
 আ মা র ল রা ব ম ন হু . . . সে .
 গা গা ধা ল পা পা জা পা জপা -গধা পা -1
 আ মা র ল রা ব ম ন হু. . . সে .

মাতোপ

II { [রী -1]
 না -1 না না না -1 না -সী সী রী সী
 ক র্ণে ক হ হ হ হ হ ল রে
 পা সী সী সী সী সী সী -রী না স'রী রী -1
 না বী না থে হু ল না . . . হু না . . . রে .
 সী -1 সী -1 সী স'ধা গা ধা পা ধা পা -1
 জা হু অ . . . জ ন . . . তো থে হু না থে .
 সা সা নুনা -রা রা -1 -1 -1 গা ধগা পা -1 মজা -1
 কে গো এ. . . সে . . . কে গো এ . . . সে .



সাহিত্য—

সাহিত্যের সাত্রা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(পরিচয়—প্রাবণ, ১০৪০)

সাহু ও চলিত ভাষা—শ্রীরাজেশ্বর বহু
করেকথানি পুরাতন বাংলা মাটক—

শ্রীকরকুমার দাশ-গুপ্ত

(প্রবাসী—প্রাবণ, ১০৪০)

উৎকলের প্রাচীন সাহিত্য-সম্পদ—

শ্রীকণ্ঠমোহন সেন

(ভারতবর্ষ—প্রাবণ, ১০৪০)

আধুনিক সাহিত্য—শ্রীমাদেব গুপ্ত

(বিজিতা—প্রাবণ, ১০৪০)

বাঙ্গালী সাহিত্যে গভ—বিতীয় বৃন্দ—

শ্রীকুমার সেন (বঙ্গশ্রী—প্রাবণ, ১০৪০)

নিত্য ও সাহিত্য—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দাস

(বঙ্গশ্রী—প্রাবণ, ১০৪০)

বাংলা সামাজিক উপন্যাসের উপক্রমণিকা—

—নজা ও ব্যঙ্গচিত্র—

শ্রীনীরদত্ত চৌধুরী ও শ্রীরজেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় (বঙ্গশ্রী—প্রাবণ, ১০৪০)

কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ড—

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

(বঙ্গশ্রী—প্রাবণ, ১০৪০)

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস—

শ্রীরাধেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানচন্দ্র

(মাসিক বঙ্গবতী—আষাঢ়, ১০৪০)

দরখতের নব-জন্ম—মুদ্রাবীর রহমান খাঁ

(মাসিক মোহাম্মদী—প্রাবণ, ১০৪০)

সাহিত্য সম্বন্ধে নানা কথা—

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

(মূলবুল—বৈশাখ-প্রাবণ, ১০৪০)

প্রাচীন মুসলিম সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও

বৈশিষ্ট্য—আবদুল করিম

(মূলবুল—বৈশাখ-প্রাবণ, ১০৪০)

ইতিহাস—

পালবংশের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়—

শ্রীনিরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

(ভারতবর্ষ—প্রাবণ, ১০৪০)

গোশোরা রাজবংশের অবসান—শ্রীপ্রভুচন্দ্র গুপ্ত

(বিজিতা—প্রাবণ, ১০৪০)

মাহুল খাঁ—মাদত আলী আবদুল

(মূলবুল—বৈশাখ-প্রাবণ, ১০৪০)

১২৯৩ ও ১৩০৩ খ্রীস্টাব্দে রাজবংশ এবং করিমপুর বেলা—

শ্রীকিশোর ভট্টাচার্য (বারমাণী—জৈষ্ঠ, ১০৩৯)

দর্শন—

নিগর্গের অল্পবর্তন—

শ্রীরাধেন্দ্রনাথ দত্ত

(পরিচয়—প্রাবণ, ১০৪০)

শ্রীমৎ শঙ্করাদর্শ ও পাশ্চাত্য দার্শনিকদর্শন—

শ্রীমদ্রতনুমতী দাস

(ভারতবর্ষ—প্রাবণ, ১০৪০)

আত্মপাকংকার—দ্বাবী অভ্যাসনন্দ

(অবুত—প্রাবণ, ১০৪০)

জীবন ও দর্শন—

আবুল মনসুর আবদুল

(মাসিক মোহাম্মদী—প্রাবণ, ১০৪০)



(১)

আমরা উকিলই হই, ডাক্তারই হই, বণিকই হই, সাহিত্যিকই হই,—আমরা কেউই পলিটিঙ্গ্ সঙ্ঘে উদাসীন নই। এর কারণ, এতুগে আমাদের মনকে বিষয়-বিশেষে গণ্ডিবদ্ধ করা অসম্ভব। আমরা যে-কোন বিষয়ের বাবসা কিংবা চর্চা করিনে কেন, একমাত্র সেই বিষয়ে মনকে আবদ্ধ রাখা অসাধ্য ; কারণ, মানুষের সমগ্র মনট তার ব্যবহারিক মনের চাইতে ঢের বড়। ধরুন, আমি যদি কবি হতুম, ত আমার সমগ্র মনট ফুল ও চন্দ্রালোক দিয়ে ভরিয়ে দিতে পারতুম না। মনের অনেক অংশ পতিত থাকত, যাঁতে চারপাশের ঘটনা, আর চারপাশের কথাবার্তা উড়ে এসে জুড়ে বসত। আমরা কল্পনার রাজ্যে সংসার পাততে পারিনে, আর পলিটিঙ্গের বিষয় হচ্ছে জাতীয় স্বরূপের বিষয় ; সুতরাং পলিটিঙ্গ্ সঙ্ঘে আমরা মুখে মৌন থাকলেও মনে আলগা থাকতে পারিনে।

(২)

শুধু একালে নয়, কোনকালেই সাহিত্যিকেরা পলিটিঙ্গ এড়িয়ে যেতে পারেননি। ভারতবর্ষের হিন্দুগণে কালিদাসের মত আর দ্বিতীয় কবি জন্মায় নি,—অবশ্য ব্যাস-বাণীকিকে বাদ দিয়ে। তবুও কালিদাস এতটা political-minded ছিলেন যে, তাঁর ‘রঘুবংশ’ থেকে একটা গোটা রাজধর্ম উদ্ধার করা যায়। অন্ততঃ নবীন পণ্ডিতের দল কালিদাসের কাব্য থেকে তাঁর পলিটিক্যাল আত্মা উদ্ধার করতে পারেন। বলা বাহুল্য, কালিদাসের সেকালে পলিটিঙ্গ্, আমাদের একালে পলিটিঙ্গ্ নয়, এবং তাঁর

অনেক মতামত শুনে আমরা অবাক হ’য়ে বাই ; কারণ, সেকালের সামাজিক অবস্থা একালের সামাজিক অবস্থা নয়। ফলে, সেকালের সামাজিক মন একালের সামাজিক মনও নয়।

(৩)

আমি কালিদাসের কতকগুলি কথা, তাঁর পলিটিক্যাল মতামতের নমুনা হিসেবে উদ্ধৃত ক’রে দিচ্ছি। তার থেকে সকলেই দেখতে পাবেন যে, আমাদের মন তাঁর কথায় পুরো দায় দিতে পারে না।

তিনি ইক্ষুকুবংশের রাজা দিলীপের গুণবর্ণনাস্থলে বলেছেন যে,—

“রেখামারমপি কুরাদামনোর্থধ্বনঃ পরম্।

ন ব্যাতীযুঃ প্রজাপ্তস্ত নিয়ন্তেমিবিস্তরঃ ॥

(রঘুবংশ, ১সর্গ—১৭ শ্লোক)

অন্ত বাঙলা,—

“সারথীচালিত রথের চক্র যেমন পূর্ববর্তী রথের বর্ষা অর্থাৎ দাগ হইতে একটুও এদিকে ওদিকে যায় না, সেইরূপ তাঁহার প্রজাগণও তদীয় শাসন-প্রভাবে মন্ত্রের সময় হইতে প্রচলিত চিরাচরিত আচারপদ্ধতি হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইত না”। (রাজেন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ কৃত অধ্ববাদ)।

মানুষকে রেলের গাড়ীর মত বাঁধাপথে চলতে রাজ্য বাধ্য করবেন, একথা শুনে আমরা চমক উঠি। এখন জিজ্ঞাসা করি, সে যুগে কি হরিজন-সমগ্রা উঠতে পারত ?

তিনি অতিথি নামক আর একটি রাজার বিষয় বলেছেন যে,

“কাতর্য্যঃ কেবল নীতিঃ শৌৰ্য্যঃ স্বাধৰ্মতঃ ইত্যম্ ।

অতঃ দিগ্ধিঃ সমেতাভ্যাহুতাত্ম্যমধিরেব সঃ ॥

(রঘুবংশ, ১৭ সর্গ—৪৭ শ্লোক)

অর্থাৎ “একমাত্র নীতি অঙ্গস্বরূপ করা কাপুরুষতা ; আর একমাত্র শৌৰ্য্যের দ্বারা শাসন করা পতন্য” । একমাত্র বলের উপর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যে পতন্য, একথা মহাত্মা গান্ধীও সর্গস্তঃকরূপে গ্রাহ্য করবেন ; কিন্তু কেবল নীতির উপর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যে “কাতর্য্য”, একথা এতদূরে কোন সঙ্গত হোক গ্রাহ্য করবে কি ?

তারপর কামণ্ডে নিমগ্ন লক্ষটুড়ামণি রাজা অদ্বিবার্ধের বিষয় তিনি বলেছেন যে, প্রেমার তাঁর সর্পন প্রাথনা করলে তিনি

“তদবাক্যবিবরারবলিমা কেবলেন চরপেন কল্পিতম্ ॥”

(রঘুবংশ, ১২ সর্গ—৭ শ্লোক)

অর্থাৎ তিনি পবাকের ভিতর দিয়ে পা ছুলিয়ে নিতেন, এবং প্রেমার তাঁর স্ত্রীরপাশে সর্পন করেই মৃত্যু হ’ত। রাজতন্ত্রের এমন গুরুতর ভ্রাত্যেতি কালিদাসের জায় মহানবীধীর চোখ এড়িয়ে যায়নি। একথা শুনে হাসিও পায়, কান্নাও পায়।

(৪)

এখানে কালিদাসের কথা তুলুদম, সঙ্কট-সাহিত্যে আমার বিত্তে বেধাবার ক্ষেত্র নয়, কিন্তু শুধু এই বিষয়ের পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ক্ষেত্র যে, কালিদাসের মত মহাকবিও পলিটিক্সের পাশ কাট্টিয়ে যেতে পারেন নি। রাজা-রাজত্বের ideal হবি স্বাক্ষরে হ’লে, সেকালের রাজত্বের ideal সম্বন্ধে নীরব থাকা অসম্ভব।

কালিদাসের কথা অবস্ত আমাদের ঘরের কথা, অর্থাৎ সেই ঘরের—যে ঘর আমাদের আর নেই, আর কখনো ফিরেও আসবে না। ইংরেজী ভাষায় বলে,—history repeats itself ; কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়, কারণ history শব্দের অর্থই হচ্ছে তাই,

বার আর পুনরাবৃত্তি নেই। ইতিহাস মাঝেই পরিবর্তনের ইতিহাস ; সে পরিবর্তনে মানবলম্বাঘের উন্নতিই হোক, আর অধোগতিই হোক।

হুতরাং কালিদাসের ideal এতদূরে গ্রাহ্য নয়। অপরপক্ষে আমি যদি কালিদাসের হুসে লম্বাকূম, তাহলে সম্ভবতঃ তাঁর রাজনীতি, আদর্শ রাজনীতি ব’লে গ্রাহ্য করতুম। রবীন্দ্রনাথ থাকে “কালান্তর” বলেন, তাঁর কলে নতুন সমতার স্বপ্ন হয়, এবং তাঁর সমাধানের ক্ষমতা নতুন ideal-এর মধ্য হয়। দেশের সঙ্গে দেশের অবস্ত স্পষ্ট প্রভেদ আছে, কিন্তু কালের সঙ্গে কালের প্রভেদে তাঁর চাইতেও বেশি স্পষ্ট। হুতরাং সঙ্কট-সাহিত্যের “রাজনীতির” অর্থ আর বাঙলা “রাজনীতি”র অর্থ যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সে কথা বলাই বাহুল্য। আমি যখন কয়েকি যে, কালিদাসও politics-এর বিষয় কবিত্ব করেছে, তখন একথাটাও বলা দরকার যে, তাঁর পলিটিক্স আর বর্তমানের পলিটিক্স সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এর থেকে এই অহুমান করা যায় যে, সঙ্কট হুসের পলিটিক্সের এতদূরে কোনও সার্থকতা নেই। চাপকা এতদূরে আমাদের পলিটিক্যাল জগৎ হতে পারেন না।

(৫)

এখন ঘরের কথায় ফিরে আসা যাক।

বর্তমানে বাঙলার হুগ্ধবর্তক সাহিত্যিক দুজ্জেন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। এঁদের মধ্যে কেউ যে পলিটিক্স সম্বন্ধে উদাসীন নন, সে কথা বলাই বাহুল্য। এই বিশেষ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বঙ্কিমের ‘আনন্দমঠ’ যে, দেশের হুকের মন উত্তেজিত ও চকল করে তুলেছিল, সে কথা কি আর বলবার প্রয়োজন আছে ? আজ অবস্ত আমরা ‘আনন্দমঠের’ মায়া কাট্টিয়েছি, কারণ আজকের দিনে বাঙলা নিরানন্দ-পূরী হ’তে উঠেছে। তারপর, বাঙলার পলিটিক্সে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ত স্পষ্ট। এঁদের দুজনের কেউ অবস্ত পলিটিগিয়ান নন, কারণ শাসনব্যয়ের বেয়াহুতের কাছে এঁরা কেউ হাত-লাগান নি। এঁরা বা’

বদলাতে চেয়েছেন, 'তা' হচ্ছে স্বাভাবিক নয়। সাহিত্যের কারবারই হচ্ছে মানুষের নয় নিয়ে।

অন্যপক্ষে আমাদের মত পুনঃসাহিত্যিকদের মন, চারপাশের প্রত্যক্ষ reality-র বহু পরিমাণে অধীন; কারণ, আমাদের কল্পনার সৌচ পূর্ণ নয়। আর এ-reality, লোকে বাক্য বলে পলিটিস্, তার সঙ্গে নিঃসন্দর্ভ নয়। বিশেষতঃ, বর্তমান যুগে political mind হচ্ছে সাধারণ লোকের mind-এর একটা অঙ্গ। কারণ, এই পলিটিস্‌য়ের ভিতর ঘর্ষের কথাও আছে, অর্ধের কথাও আছে। আমার বিশ্বাস, এন্সের পলিটিস্‌য়ের মোটা কথা হচ্ছে economics। আর অর্ধের সঙ্গে সাহিত্যের কোন সম্বন্ধ না থাকতে পারে, কিন্তু সাহিত্যিকের সঙ্গে অর্ধের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। সুতরাং আমরা সাহিত্যিকেরাও পলিটিস্‌য়ের সতিপতি লক্ষ্যে চুঁচুর কথা বলতে বাধ্য, — পলিটিস্‌য়ানরা আমাদের পক্ষে এ আলোচনা বড়ই অব্যবহার্য। মনে করুন না কেন।

(৬)

এখন সাহিত্যিকের কৈকিরং হেড়ে ত্যাকবিত চারপাশের reality-তে কিরে আসা থাকে। আমি অনুমান করেছিলাম যে, বিশেষতঃ ইকনমিক্স কনসারেন্স্ বার্ষিক হবে। ইতিমধ্যে হয়েছেও তাই। এতি-মেশের এতিনিবির্য নিম্ন নিম্ন আতীর বার্ষিক করতে চোঁটাই করেছেন; কারণ, পৃথিবীর বর্তমান ইকনমিক্স দুর্ভাগ্য হ'তে উদ্ধারের কোনও পথ আবিষ্কার করতে সক্ষম হন নি। অতঃপরের যুগে পরিণামে এক পক্ষের হার হয়, অন্য পক্ষের জিত হয়। কিন্তু ইকনমিক্স যুদ্ধের ধর্ম হচ্ছে এই যে, এর ফলে সকল পক্ষেরই একসঙ্গে হার হয়। আর এই হারের অন্ততম ফল হচ্ছে পৃথিবীর ইকনমিক্স অধঃপতন। ইকনমিক্স যুদ্ধ বড় হ'লেই যে কল-কারখানা সব আবার পুরো গমে চলবে, সুনিঃস্বত্বেরা সব বাটতে আরম্ভ করবে, আর পৃথিবী ভের বন্যাজে পূর্ণ হ'য়ে উঠবে, এমন কোনও কথা নেই।

এ experiment-এর ফল কি হবে, সে ভবিষ্যতে দেখা যাবে; অবশ্য যদি পৃথিবীর প্রবলশত্রুত্বের জাতিরা এ experiment করতে তালি চন। কিন্তু দেখানে মনের ও মতের মিল নেই, সেখানে সে experiment করার সম্ভাবনাও নেই।

আমরা দুই থেকে ত্রয়টারের যুগে যে খবর পাই, তাতে মনে হয়, ইকনমিক্স্ যুদ্ধের থাকে বলে stability of money, তারই ব্যবস্থা করার জন্য এক-কনসারেন্স্ বসেছিল। জটনক ইংরেজ ইকনমিষ্ট্ কিছুদিন পূর্বে লিখেছেন যে, — "Commercial crises are not due to prices going up and then down but on the contrary, the movement of prices is the result of the crises." এ শাস্ত্রবচন যদি সত্য হয়, তাহলে crises-এর চিকিৎসা না ক'রে, তার একটি উপ-সর্গের চিকিৎসার চোঁট সে বার্ষিক হবে, সে ত বরা কথা।

(৭)

এই সব মেখেতনে মনে হয়, আমরা আমার ব্যাপারী, মাহাজের পোঁজে আমাদের কি দরকার ? এর চেয়ে আমাদের ঘরের কথা নিয়েই নাকচাতা করা ভাল। কিন্তু হুঃপের বিধর আমাদের ঘরের কথাও তেমন শাষ্ট নয়।

সেবিনকার পুণা কনসারেন্সে কি হ'ল, তা' কি কেউ বলতে পারেন ? কংগ্রেসের বড় কঠোর civil disobedience ভাগ্য করলেন, না খিইরে রাখলেন ?

মহাত্মা গান্ধীর জটনক সংকল্পী ভক্ত্যার বলেছেন যে, মহাত্মা তাঁদের জন্য যে ব্যবস্থা করেছেন, তা' হচ্ছে "the same old prescription"—চমৎকার রসিকতা। কিন্তু এই রসিকতাই কি সত্য কথা ? মহাত্মা বলেন, না। আসল প্রস্তাব তিনি বড়লারের কাছে করতেন, বড়লার যদি তাঁকে দর্শন দিতেন। সে প্রস্তাব যে কি, সে কথা তিনি বলতে পারেন না, কারণ উত্তর পক্ষের কথাবার্তার ফলে সে প্রস্তাব স্তিম্যান হ'ত। তবে এই পর্যন্ত বোঝা যায় যে, প্রত্যেকটি শাস্তির প্রস্তাবই হ'ত।

যা' চমনি, তা' নিয়ে জ্বাৰ করা য়া। এখন কংগ্রেস কোন্ পথে চলবে, তা' কি কেউ বলতে পারে? কঠোরাই যখন মনস্থির করতে পারছেন না, তখন অস্ত্রের পক্ষে তা' অসম্মান করা অসম্ভব। হুতরাং সে য়া। চেষ্টা করব না। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর মতে যে কংগ্রেস চালিত হবে, এমন ত মনে হয় না। যদি না মহাত্মা আবার কোনও নতুন কথা উদ্ভাবন করেন, যাতে দেশের লোক চকল হ'য়ে ওঠে। মহাত্মা গান্ধী হচ্ছেন একজন mystery-man; হুতরাং তাঁর কার্য-কলাপের প্রতিবিম্ব নজিরের সাহায্যে অসম্মান করা যার না।

(৮)

মহাত্মা গান্ধী এতদিন ভারতবর্ষের পলিটিকাল কেন্দ্রে ছিলেন এক, এখন তিনি শূন্য হ'য়ে বাবার পথে গাড়িয়েছেন। অস্বস্তি: তিনি যে একেবারে সর্বস্বত্বা ধাবিয়ে না, তার নানা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

এখন মহাত্মা গান্ধী যদি স'রে গাড়ান, কিংবা আর পাচজনকে মিলে তাঁকে সরিয়ে দেয়, তাহলে তাঁর পরিত্যক্ত পদে যে অপর কেউ প্রতিষ্ঠিত হবে, তার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। তন্মতে পাই, কংগ্রেসের দলে ছোট ছোট বহু dictator আছেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে কেউ যে একমাত্র dictator হ'য়ে উঠবেন, তার কোনই সম্ভাবনা নেই। কারণ, এঁরা সকলে এতদিন মহাত্মা গান্ধীর হুকুমই চ'লে আসছেন।

পাচজনকে মিলে কাউকেও dictator বানাতে পারে না। লোকে dictator হয় নিজস্বপে। মহাত্মার আমি মহাপ্রিয় নই, এবং একদিনের ভক্তও যে ইহনি এর কারণ, তাঁর মস্তের অর্থ আমি কবিন্ধকালেও ছন্দবদ্ধ করতে পারিনি—না। ধর্ম সম্বন্ধে, না পলিটিক্স সম্বন্ধে। কিন্তু তা' সবেও একথা অস্বীকার করা অসম্ভব যে, তাঁর ভূলা চরিত্রবল আধিকালকার অল্প কোনও leader-এর নেই। এই চরিত্রবল যে কত বড় পজি, তা' মহাত্মা বাবাসের চোখে আতুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। এর থেকে বোকা যার যে,

অপরে কি বলে, তাতে বিশেষ কিছু আসে যার না; কিন্তু কে বলে, তার উপরই তার ভূলা নির্ভর করে।

(৯)

মার এক কথা; কংগ্রেস নামক প্রতিষ্ঠানও এর পর নবমুদ্রা ধারণ করবে। নামের সঙ্গে রূপের যে কোনও নিত্যসম্বন্ধ নেই, একথা বলাই বাহুল্য। হিন্দুধর্ম নামটা বহুকাল থেকে চ'লে আসছে, অথচ এই ধর্ম যে কালে কালে ও দেশে দেশে কত বিভিন্ন ও বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে, তা' ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতি পুষ্টি-পাত করলে, সকলেই প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। আর ইংরেজী democracy শব্দের প্রাচীন গ্রীসে যে অর্থ ছিল, বর্তমান ইউরোপে কি সেই অর্থ আছে? এর থেকে প্রমাণ হয় যে, বহু চ'লে গেলেও তার নাম থাকে। হুতরাং এ প্রতিষ্ঠান নব-কালের ধারণ করলেও, তার পুরোনো নাম সম্ভবত: বজায় থাকবে।

ভারতবর্ষের সনাতন সমাজ হচ্ছে, বহুকে এক করবার সমাজ। পুরাকালে এ সমাজ ধর্ম ও আচার-গতই ছিল। এগুনে পলিটিক্স সেই সমাজই আবার নতুন আকার ধারণ করেছে। কি ধর্ম, কি পলিটিক্সের সকল প্রতিষ্ঠানের মর্মকথা এই। হুগে হুগে লোকের অবস্থার পরিবর্তন হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে মনস্তত্ত্ব পরিবর্তন হয়। ফলে, হুগে হুগে সমাজের বীমাঙ্গার নতুন উপারও উদ্ভাবিত হয়। হুতরাং কংগ্রেসের যে নতুন চেহারা হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে টিক কিরূপ হবে, তা' বলা কঠিন। হুগে হুগে বাস্তবের মনে নতুন আশা ও ভয়ের সৃষ্টি হয়, এবং ওই আশা ও ভয়ই আমাদের কর্মবীচন নিয়ন্ত্রিত করে। উভয়ের মধ্যে ভর প্রবল হ'লে, সমাজ শিথিল হটে; আর আশা প্রবল হ'লে, সমাজ এগিয়ে যায়।

(১০)

এই নিবিল ভারতীয় কংগ্রেসের ভাঙ্গা-গড়ার সুখ যে বাঙলা তার বাস্তব লাভ করবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাঙলার নতুন পলিটিক্যাল-পার্টি যে কি রূপ

ধারণ করবে, তা' আমি নে; কিন্তু যে রূপই ধারণ করুক, বতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত যদি অদম্যে ইচ্ছাশক্তি ত্যাগ না করতেন, তা' সম্ভবতঃ তিনি এই নতুন পার্টির নারক হ'তে পারতেন।

সাহসে নতুন অবস্থার উপযোগী নতুন-প্রতিষ্ঠান গড়ে, কিন্তু সেই সঙ্গে পুরোনোর মের টান্ধে বাধ্য হয়। হুতরাং আদ্যাব্দী পলিটিকাল-পার্টিতে পুরোনো পলিটিকাল-পার্টির কর্তা-ব্যক্তিসমূহ স্থান থাকবে।

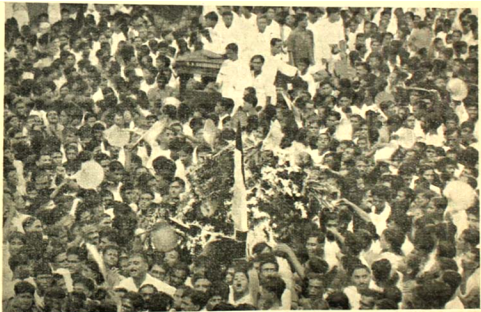
বতীন্দ্রমোহনের পলিটিকাল কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার অধিকার নেই। কারণ আমি তাঁর পলিটিকাল-পার্টির মলমূলক হিসাব না। তবে তিনি যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য হ'য়ে উঠেছিলেন, আজকের দৃষ্টিতে তা' মনে নে।

শেষবন্ধ চিত্তরঞ্জন দাস, তাঁর স্মৃতির চার-পাঁচদিন

বতীন্দ্রমোহন ছিলেন সব চাইতে উপযোগী; কারণ, তিনি উক্ত সভায় মনের কথা লম্বা ক'রে ব্যক্ত করতে পারতেন, অপর পক্ষের প্রেরণে হাত-হাত জবাব দিতে পারতেন, অপরকে বুদ্ধির খণ্ডন করতে পারতেন। এসেপের শাসনব্যবস্থা যে নতুন ক'রে গড়া হচ্ছে, তার কালে এসেপের নবজন্মের পলিটিকাল প্রবানতঃ কাউন্সিল-সভা পলিটিকাল হবে, এবং বতীন্দ্রমোহন যেতে থাকলে যে সে পলিটিকাল হবে সেখানে পারতেন, এই আমার বিশ্বাস।

(১১)

এই অবস্থার আমি বতীন্দ্রমোহনের প্রতি আমার প্রভা জ্ঞাপন করছি। তাঁর সঙ্গে আমি বহুকাল হ'তে সুপরিচিত। সম্ভবতঃ তিনি এখন ব্যারিষ্টার হ'য়ে বিসেত থেকে ফিরে আসেন, সেই সময়েই প্রথমে আমি তাঁর



শেষবন্ধ বতীন্দ্রমোহনের শব্দসংগ্রহ

পূর্বে রাজনৈতিক আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হই। এর একটি কারণ, তাঁর পরিবারের সহকর্মীদের মধ্যে কাউন্সিলের মেম্বর হিসেবে সঙ্গে আমাদের পরিবারের পূর্ণপরিচয় ছিল।

পলিটিক্সের বাইরেও মানুষের একটি সামাজিক দিক আছে। সেই সামাজিক দিক হিসেবে বতীগ্র-বোদ্ধন ছিলেন আমার নিকট সুপ্রতিষ্ঠিত। আর এই সামাজিক বতীগ্রবোদ্ধন ছিলেন অতিশয় ভগ্ন, মিষ্টভাবী, বীরপ্রতীতির লোক। সামাজিক হিসেবে তাঁর একটি মহাশূণ্য এই ছিল যে, তিনি তাঁর পলিটিক্যাল মহামত আমাদের গ্রহণ করতে বলেন নি। এমন কি, সে-বিষয়ে আমাদের সঙ্গে কখনও আলোচনাও করেন নি। তিনি আমাদের মাহুহ হিসেবেই দেখতেন, political animal হিসেবে নয়।

অবশ্য বতীগ্রবোদ্ধনের বঙ্গসাহিত্যের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ছিল না, সুতরাং তাঁর সঙ্গে আমার কখনো সাহিত্যিক আলোচনাও হয় নি। পলিটিক্স, ধর্ম ও সাহিত্য সত্ত্বেও আমাদের নানা মত আছে, তাই এইরূপ আলোচনার কলে পরস্পরের ভিতর মতভেদের সৃষ্টি হয়। বতীগ্রবোদ্ধনের সঙ্গে তাঁর এই মৌনতার কলে আমার কখনও কোনও মহামতের সূর্য ঘটে নি।

কলে, তাঁর সামাজিক ব্যবহার ও কথাবার্তা আমার কাছে চিত্তকান্ডই প্রিয় ছিল। বতীগ্রবোদ্ধনের মনের এই সহজ উল্লসতা সত্য মানবের একটি মহাশূণ্য।

(১২)

বাঙা বধন তার আশিক স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে, তখন কে বাঙালার রাষ্ট্রনায়ক হবে, তা' বলা অসম্ভব— এই হচ্ছে আমার মত।

কিন্তু এই শূন্যে আর একটি কথা বলতে চাই। কোন ব্যক্তি-বিশেষকে দেশের একমাত্র অধিনায়ক করা, এ দেশের লোকের পক্ষে বাস্তবিক নয়। Hero-worship-এর কুল চ'লে পিছেছে; কিনেবত: রাজনীতির ক্ষেত্রে। কারণ, মহামত সত্ত্বেও পরমুখাপেক্ষী হওয়া এ কুলে আমাদের মনের ধর্ম নয়; অপর পক্ষে কোন ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে hero হ'য়ে ওঁ'বার স্বযোগও এ কুলে কম।

এ বিশ্বের জনবিখ্যাত করালী দার্শনিক Bergson-এর মত নিয়ে উদ্ধত ক'রে দিচ্ছি। —

“আধুনিক ইউরোপের মহাভাতির ইতিহাস আলোচনা করলেই দেখা যায় যে, এ কুলে ইউরোপে মহা বৈজ্ঞানিক, মহা আর্টিষ্ট, মহা পোষা প্রভৃতি সমগ্র গ্রহণ করেছেন, কিন্তু ক'জন মহা রাষ্ট্রনায়ক জন্মেছেন।”

এর কারণ নাকি—

“মানুষের মতিগতি সূত্র সমাধিকৃত হবার পক্ষেই অসম্ভব। কিন্তু একটি মহাদেশের এমন কেউ মহামন্ত্রী

হ'তে পারেন না, যিনি বহুসংখ্যকের মনঃপুত ভাবে রাষ্ট্রের ব্যবস্থা করতে পারেন। উপরন্তু, একটি মহাদেশ শাসন করার উপযোগী কোনরূপ শিক্ষাও নেই, দীক্ষাও নেই। সুতরাং এ আট কোনরূপ শিক্ষার কলে আশ্রয় করা যায় না।”

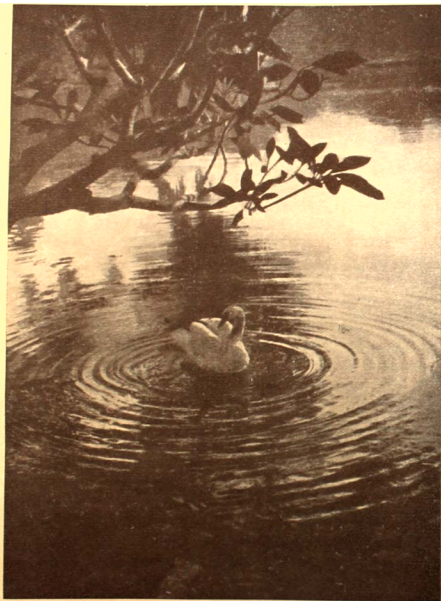
সম্ভবতঃ Bergson-এর মত সত্য।

হুজুরের বিষয় আমরা মোটামুটি মতো পড়েছি। এক্ষণিক আমরা ইউরোপের নব ডিমোক্র্যাটিক ভাবের অধীন, অপর পক্ষে আমাদের সনাতন মহাপুরুষ-পুণ্ডারও মাত্রা কাটাতে পারি নি।

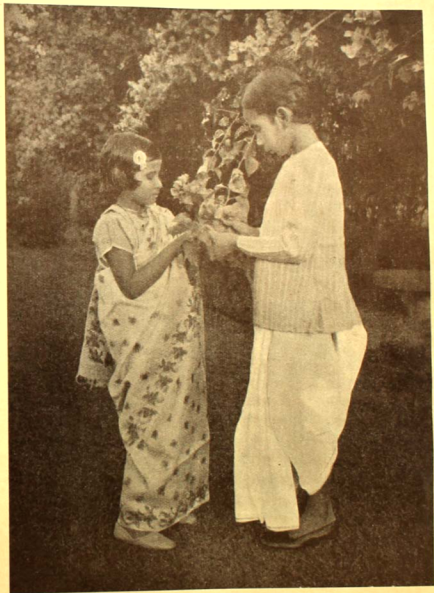
বাঙা যে পলিটিক্যাল ঈগরে তার স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে, এ সংবাদ আমার কাছে শুভ সংবাদ। কারণ, এ অবস্থার আমাদের দৃষ্টি বাঙালার মাটি, বাঙালার মলের উপর পড়তে বাধ্য। এবং এই নব-দৃষ্টির এসকে দেশের reality-র সত্ত্বেও আমাদের চোখ অনেকটা খুলে যাবে, ও তখন আমাদের অভাব অভিযোগ সত্ত্বেও আমরা বেশি সজ্ঞান হব।

বাঙালীর শিক্ষা, বাঙালীর স্বাস্থ্য, বাঙালীর ধন, বাঙালীর প্রাণ তখন আমাদের প্রধান ভাবনার বিষয় হবে। বাঙালীর বর্তমান শিক্ষা যে জাতির অত্যাচারের অইকূল নয়, — এমন কথা আচার্য্য এজুরুলজ্য রায় প্রভৃতি অনেকে বলছেন, এবং বাঙা ভাষার প্রতি অজ্ঞা নাকি এ শিক্ষার বার্থতার অন্ততম কারণ। বাঙা ভাষা যে কেন বাঙালীর মনোভাবের বাহন হ'য়ে উঠতে পারছে না, সে বিষয়ে আজ বাস্তবিকতার করব না, কেননা সে বিষয়ে অনেক বলবার কথা আছে। বাঙা কতক পরিমাণে তার পলিটিক্যাল স্বাতন্ত্র্য লাভ করলে, বাঙালীর দৃষ্টি দেশের ইকনমিক অবস্থার উপর পড়তে বাধ্য, তার ফলে কত ধানে কত চাল হয়, সে জানও আমরা লাভ করব। এবং এ জানের পিছু পিছু সঙ্গত কর্তব্য আসবে।

এইমাত্র সংবাদ পেলে যে, আমাদের ঘরের একটি ছেলের টাইফয়েড রোগে অকালমৃত্যু ঘটেছে। এ ঘটনার এক মুহূর্তে বাইরের সঙ্গে মনের সকল বোগস্কর ছিন্ন হ'য়ে পেল। এখন মনকে বা' অতিকৃত করছে, তা' হচ্ছে একমাত্র পারিবারিক দুর্ঘটনা। সুতরাং আশা এখানেই থামি। Bergson বা' বলেছেন, সে কথা ঠিক। প্রকৃতি আমাদের মন এমন ভাবে গুচ্ছয়ে যে, তা' পরিবার নামক অতি ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যেই মূলতঃ আবদ্ধ।



আলো ও ছায়া

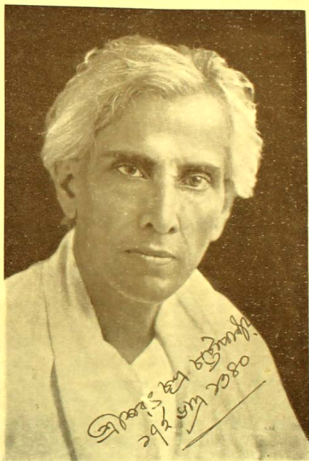


কসুম-চয়ন

মিতী — দ্বিবীষপ্রদায়ক

['উদয়ন'র আয়োজিত-প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত]

উদয়ন — আশ্বিন, ১৩৪০



ব্রজেন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



ঋগ্বেদের দেবতা

শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য, এম-এ, পি-এইচ-ডি

ঋগ্বেদের দেবতা সম্বন্ধে অনেককাল হইতে অনেক প্রকার মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। কেহ বলেন, বৈদিক ঋগ্বেদ পৌত্তলিক ছিলেন; কেহ বলেন, তাঁহারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপাসক ছিলেন, তাঁহারা স্বর্গ-চন্দ্রের উপাসনা করিতেন, কখনও মেঘ ও বৃষ্টি, কখনও নদ ও নদী এবং কখনও বা গাছপালারও উপাসনা করিতেন। আবার অনেকে বলেন, এইরূপ উপাসনা পুরাতনকালে সকল সভ্য বর্ষের জাতিদের মধ্যে বর্তমান ছিল, এবং এখনও কোল, ভীল, সাঁওতালদের মধ্যে এবং আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব পুরাতন বৈদিক ঋগ্বেদও অনেকটা সেই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। ঋগ্বেদের ধর্মকে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা “হিনোথিস্ম” (Henotheism) নাম দিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারা যখন ঐহাকে পূজা করিতেন, ঐহার উদ্দেশ্যে মন্ত্র লিখিতেন, তখন তাঁহাকেই সর্বাপেক্ষা বড় করিয়া তুলিতেন, এবং অল্প সমস্ত দেবতাকে একেবারে ছোট করিয়া দিতেন। আবার অল্প একটি দেবতাকে যখন ধরিতেন, তখন বাকী সকলগুলিকেই তাঁহার ছোট করিয়া দিতেন। অর্থাৎ বেদের ধর্ম একপ্রকার খোসামোদবাদে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা পরিণত করিয়া ফেলিয়াছেন। কাজেই

বেদের এই সনাতন খোসামোদবাদ হইতেই ভারত-বর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা খোসামোদপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহা হইবারই কথা!

এখন দেখা যাক, কথাটা কতদূর সত্য। ঋগ্বেদ কোন্ কালে লেখা হইয়াছিল, তাহারই ঠিক নাই। পশ্চিম ভারতের মহেনজো দড়ো হইতে প্রাপ্ত পুরাতন প্রত্নচিহ্ন হইতে অহমান করা যায় যে, ঋগ্বেদের সভ্যতা সিন্ধুদেশীর প্রাচীন সভ্যতা হইতেও কিঞ্চিৎ পুরাতন। তাহা হইলেই ঋগ্বেদকে খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ বৎসরের পরে আর আনা যায় না। তাহাই যদি হয়, এখন আমরা ঋগ্বেদের অর্থ বাহা করিতেছি, তাহাই ঠিক, না সায়নাচার্য্য চতুর্দশ শতাব্দীতে যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাই ঠিক? সায়নাচার্য্য যদি ঋগ্বেদের অর্থ স্পষ্ট বুঝিতেন, তাহা হইলে তিনি জায়গার জায়গায় পাঁচ ছয়টি অর্থ দেন কেন? একটি ঋকের অর্থ একটিই হইবে, সায়নাচার্য্য একেবারে পাঁচ ছয়টি অর্থ দিয়া, দোকান সাধাইয়া দেন কেন? তাহা হইলেই বেশ বুঝা গেল, ঋগ্বেদের এখনও অর্থই ঠিক হয় নাই, এবং বহু পণ্ডিত চেষ্টা করিয়াও প্রকৃত অর্থ ধরিতে পারেন নাই। তাই আজ আমাদের ধারণা, বেদে কিছুই নাই, ও কতকগুলো বাজে কবিতা আর গান।

তুলনামূলক ভাষাশাস্ত্রের সাহায্য লইয়া কণ্ঠসের কতকগুলি শব্দের অর্থ করা হইয়াছে, এবং এইরূপ তুলনামূলক পদ্ধতিতে শব্দের অর্থ করা খুবই বিজ্ঞান-সম্মত, সম্ভব নাই। কিন্তু অতি স্যামান্য শব্দের অর্থ জানিয়া কি করিয়া এই বৃহৎকালের কণ্ঠসের সম্পূর্ণ অর্থ করা সম্ভবপর হইতে পারে? তাহার উপর আবার যে গ্রীক, লাতিন, অবেরা ইত্যাদি ভাষা ও সাহিত্যের মারফৎ কণ্ঠসের শব্দের অর্থ করা হইতেছে, তাহাদের প্রাচীনতম সাহিত্য কি ঐতিহাসিক কালের সমসাময়িক? গ্রীক ও লাতিনের সর্গাপেক্ষা পুরাতন সাহিত্যও কণ্ঠসের কয়েক সহস্র বৎসর পরে রচিত হইয়াছে, সম্ভব নাই। সে ক্ষেত্রে গ্রীক, লাতিন, অবেরা ইত্যাদি সাহিত্য হইতে আশ্চর্য্যকর যে অর্থ করা হইতেছে, তাহাই যে কণ্ঠসের দরকার শব্দের অর্থ, তাহা কি করিয়া অনুমান করা যাইতে পারে? কারণ, তাহা স্বখনও এক থাকে না, ভাষা সময় হিসাবে এবং স্থান হিসাবে প্রতিনিরভাই পরিবর্তিত হইতেছে। সঙ্কুচ হইতে প্রাকৃত, প্রাকৃত হইতে অপভ্রংশ, অপভ্রংশ হইতে প্রাদেশিক বর্তমান ভাষা সকল এই পরিবর্তনবান্ধকেই সমর্থন করিয়া থাকে। কাজেই তুলনামূলক ভাষাশাস্ত্রের মারফৎ কণ্ঠসের মত প্রকাণ্ড সাহিত্যের কণামাত্রও বুঝা যায় না।

অতএব এইরূপ আংশিক ভাবে বিবেচিত হই চারিটা তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া পণ্ডিতেরা কণ্ঠসের সত্যতা সম্বন্ধে, স্বপ্নের অজ্ঞতা ও বর্ধরতা সম্বন্ধে যে সকল অস্বুত অস্বুত মত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার উপর সম্পূর্ণ আত্মস্থাপন করা কোন বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

আর একটা কথা। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের নিকট যে প্রাঐতিহাসিক যুগের অসত্যতা ও বর্ধরতারই একটা নিদর্শন। কারণ সে যুগ অসত্যতা ও বর্ধরতা ছাড়া আর কিছু থাকিতে পারে না, এবং বেদেই যে এই অসত্য জাতি আপনাদের

মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে, এই কথা উহারো মূলকর্ত্তে প্রচার করিয়া থাকেন; কিন্তু ভারতে বেদের সম্মান সকলের চেয়ে বড়, — জাতি, বৈশাঙ্কেরও অতীব সম্মান নাই। তাহা ছাড়া, 'বিশ্ব' বলিতে সেলেই বৃদ্ধিতে হু, বাহার্য্য বেলে বিশ্বাস করেন। বেদের মোহাই না দিলে ভারতে কোন শাস্ত্র সম্মান পাইত না, এবং সে শাস্ত্রকে কেহ মানিত না। বেদের ভিতর বাহ্যতে কোনরূপ তুলনাত্মি প্রবেশ করিতে না পারে, সেক্ষেত্র নানারূপ পার্শ্বের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহাতেই পদপাঠ, স্বরপাঠ, জটাপাঠ, ঘনপাঠ ইত্যাদির প্রকৃতি হইয়াছে। এখনও ভারতের নানাস্থানে জটাপাঠী ও ঘনপাঠী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদেরই বহু সহস্র বৎসরের প্রচেষ্টার ফলে ভারতের সর্গাপেক্ষা পুরাতন ও অতুলনীয় এই জাতীয় সম্পদ আদিও তাহার আদি স্বরূপ রক্ষা করিয়া আছে। যদি বেদ মাত্র বর্ধরতারই অভিযুক্তি হয়, তাহা হইলে তাহা রক্ষা করিবার ক্ষমতা এত বহুকালব্যাপী চেষ্টাই বা কেন, আর কোন নূতন শাস্ত্র লিপিতে সেলে বেদের মোহাই বেতাই বা কেন?

তাহার কারণ, ভারতে বেদের মান সর্গাপেক্ষা বেশী। বেদই সর্গাশ্রয়ের আকর, বেদই সর্গজ্ঞানের আধার, বেদই সকল রসের উৎস। বেদকে বলে অপৌরুষেয়; তাহার অর্থ ইহা নহে যে, পুরুষে উহা তৈয়ারী করে নাই। উহার অর্থ এই যে, উহা মানবের ক্ষমতার অতীত। যদি মানবেই করিয়া থাকেন ও তিনি অতিমানব, তিনি ঐশ্বরিক পণ্ডিতসম্পন্ন। বেদশব্দ বিন্দ্যাত্ম হইতে সিদ্ধ হইয়াছে। বিন্দ্যাত্ম অর্থ 'মান', তাহি বেদ বলিতে জ্ঞানের ভাণ্ডার বুঝায়। সব চাইতে বেশী মানার দরকার বজ্রক্রিয়া, যে বজ্রের দ্বারা বৈদীর দরকার হয় না, পুরোহিত স্বপ্নের প্রয়োজন হয় না, বি, দ্ব, চ, পুরোহিতের দরকার হয় না। সে বজ্র এই বিদ্যাই দৃষ্টবজ্র, বাহ্যতে এই অস্বুত স্বপ্ন, দ্বিতি ও প্রণয়ের লীলা অনাদি অনন্ত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই লীলার

একতরফেই জানবের ব্যক্তি জান, এই জানেরই অপর জান আত্মজ্ঞান, আর এই জানের উপর হইলেই একতরফে মোক্ষলাভ করা যায়। এই জানকেই আমাদের শাস্ত্রে স্রেষ্ঠ জ্ঞান বলিয়াছে। বর্তমান সৃষ্টি বর্তমান থাকিবে, ততদিন এই জ্ঞান মানুষের কাম্য থাকিবে, এবং অজ্ঞাত সকল প্রকার জ্ঞানের উপর আগুন পাতিয়া বসিয়া থাকিবে। বেদে এই বিরাট সৃষ্টি-রহস্যের দ্বার খুলিয়া দিয়াছে, আত্মজ্ঞান লাভ করিবার সত্য দেখাইয়া দিয়াছে, তাই আমাদের দেশে বেদের এত সম্মান।

এই বৈদিক সৃষ্টিজ্ঞানে সর্গশক্তিম্যান্ স্বর্গনাশায়ণ একমাত্র কর্তা; তিনি একটি সংবৎসরে উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়নের বীজ বপন করিয়া দাঁড়িয়েছেন। তিনিই ত্রাণ, তিনিই বিধ্ব, তিনিই মহেশ্বর। তিনি সর্বব্যাপী, তিনি সর্গশক্তিম্যান্ পরমেশ্বর ও ত্রাণ, সৃষ্টিজ্ঞানের বহুবিধ কার্য সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা-ইচ্ছার আপনাকে বহুবিধ বিস্তার করিয়াছেন, এক উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়নের বীজ প্রবর্তন করিয়াছেন। বেদের জ্ঞান, সর্গোচ্চ কর্তৃনের জ্ঞান, সর্গোচ্চ বিজ্ঞানের জ্ঞান, তাই বেদ হইতে সর্গশাস্ত্রের উদ্ভব, এবং বেদে সর্গজ্ঞানের উৎকর্ষপে পরিচালিত হইয়াছে। আমাদের কাছে বেদ বর্ষভরতার অভিব্যক্তি নহে, সর্গোচ্চ সভ্যতার অভিব্যক্তি, যে সভ্যতা আর কখনও আসিবে না, সেই সভ্যতার অভিব্যক্তি।

বস্তুতঃস্থিতি, বেদের অর্থ জানা সম্ভব নহে, সারসংক্ষেপে কর্তব্যবিধানক হিসেন, তিনিও বেদকে কর্তব্যবিধানের চমকায় ভিত্তর দ্বিধাই দেখিয়াছেন, কাজেই বেদে জ্ঞান বড় পান নাই, কেবল কর্তব্য দেখিয়াছেন। তুলনামূলক ভাষাশাস্ত্র প্রায় অন্ধ, তাহার সবে চক্ষু মুদ্রিতহে। ভাষাশাস্ত্রের ভিত্তর দ্বিধা বেদকে দেখিলে জান হইবে না, অজ্ঞানেই আত্মর থাকিতে হইবে। বেদের জ্ঞান বাহ্যতে সম্যক্ প্রচার এবং সম্যক্ বোধন্য হই, তাহা সকলেই কামনা করেন সত্য, কিন্তু এ প্রবন্ধ সে প্রচারের উদ্দেশ্য নহীয়া দিখিতেছি না। ইহাতে শুধু বৈদিক দেবতা সম্বন্ধেই চারিটা

কথা বলিব। বিদ্যাতী পণ্ডিতেরা বৈদিক দেবতা সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছেন, তাহা যে শেষ কথা নয়, তাহাই বুঝাইবার ক্ষমতা একতরফে তুমিক। দিতে এবং একতরফি অসত্যের কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছি।

বৈদিক দেবতা সম্বন্ধে সত্যের বিবেচনা করিতে গেলে একখানি বৃহৎকার প্রস্তর আবশ্যক হয়, কারণ, এই বিবরণও বেদেরই মত গহন এবং বেদেরই মত একটি সমুদ্রবিশেষ। কাজেই ছুই একটি সামান্য কথা বাহা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাই এখানে পাঠকবর্গকে উপহার দিব, মনঃ করিয়াছি। সকলেই জানেন, প্রত্যেক বেদের ছয়টি করিয়া ‘অর্থ’ আছে। এই ছয়টি অর্থকেই বেদোক্ত বলা হইয়া থাকে। বেদ বৃদ্ধিতে হইলে এই ছয় অর্থেরই সাহায্য লইতে হয়। ব্যাকরণ ও নিরুক্তের সাহায্যে বেদের মূল সম্বন্ধে জ্ঞান হয়, এবং ইহারই সাহায্যে সামান্যার্থো ও আধুনিক পণ্ডিতেরা বৈদিক করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ষোড়শশতাব্দীরও বেদের একটি অর্থ বলিয়া পরিচিত। বেদের অর্থ নির্ণয় করিবার ক্ষমতা ষোড়শশতাব্দীর সহায়তা অতি অল্পই আত্ম পর্যাট লগ্না হইয়াছে। বেদোক্তষোড়শতাব্দীর পুস্তকে ষোড়শতাব্দীর উপকারিতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় —

বধা শিবা মনুপ্রাণা নাসান্যঃ সৎগো বধা।

অম্বোদ্যাকশাস্ত্রাণাং ষোড়শিক মূর্ধনি স্থিতম্।

“মনুরের শিবা বেদন তাহার সাধারণ থাকে, নাসের মণি বেদন তাহার সাধারণ থাকে, সেইজন্য বেদোক্তষোড়শতাব্দীর মধ্যে ষোড়শতাব্দীর স্থান সকলের শ্রেষ্ঠে।”

আবার এক জায়গার বলে “ষোড়শতাব্দীর চক্ষুঃ” অর্থাৎ বেদের চক্ষুই ষোড়শতাব্দী, অথবা বেদ দেখিতে গেলে ষোড়শতাব্দী দ্বিধাই তাহা দেখিতে হয়; এবং এই সকল কথার সারমর্ম একটু চেষ্টা করিলেই বৃদ্ধিতে পাতা যায়। আর কোন কথা ধরা যাক্ বা না যাক্, বেদের দেবতা বৃদ্ধিতে হইলে ষোড়শতাব্দীর সহায়তা লইতেই হইবে।

বেদে নানা দেবতার উল্লেখ আছে, বধা প্রকাশ্য, ত

ঘটা, অধিব্রূ, অধৈকপাদ, ঘন, অধিনী ইত্যাদি। ইহার কারণ, তাহার সহিত ইহাদের সম্বন্ধ, ইহাদের কার্য কি ইত্যাদি কোন প্রস্তর ভাল উত্তর পাওয়া যায় না। কিন্তু বোদ্ধব্যোক্তিতে এ বিষয়ে একটি বেশ ভাল স্রোত আছে। এটি বড় দরকারী স্রোত, তাই উহা নীচে উদ্ধৃত হইল—

অগ্নিঃ প্রধাপতিঃ সোমো রুদ্রোহমিত্ত্বং হম্পতিঃ।

সর্পাশ্চ পিতরশ্চৈব ভবনৈকবার্হাষাণি চ ॥

সবিতা জ্ঞানং বায়ুশ্চৈত্র্যাদী নিত্র এব চ।

ইন্দ্রো নিম্বু তিরাপো বৈ বিক্রমেবাত্তথৈব চ ॥

বিভূঃ সর্বো বরুণোহৈকপাত্তথৈব চ।

অধিব্রূজ্ঞানং পূবা অধিনী ঘন এব চ ॥

উপরোক্ত স্রোতে কয়েকটি দেবতার নাম দেওয়া হইয়াছে। এই দেবতাসমূহকে বোদ্ধব্যোক্তিতে নক্ষত্রদেবতা বলা হইয়াছে। ইহাদের ভিত্তর সবিতা সূর্য্যের নাম, বিভূ সূর্য্যের নাম, অর্ঘ্যমা ও ভগ্ন সূর্য্যের নাম। কালেই এইগুলি সবই যে সূর্য্যের নাম, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন সুভিস্মৃত কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এইগুলিকে আবার যখন নক্ষত্র-দেবতা বলা হইয়াছে এবং যখন সাতাশটির বেশী নাম পাওয়া বাইতেছে না, তখন বুঝাই মনে হইবে যে, সূর্য্য যখন ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রে অবস্থান করেন, তখন তাহার এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়া থাকে। কালেই বুঝা যায়, এই সকল দেবতা সূর্য্য হইতে ভিন্ন নহেন, এবং সূর্য্য আপনাকে শুদ্ধকর্ম্মভরে এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেবতারূপে বিভক্ত করিয়া থাকেন। সাতাশ নক্ষত্রে এইরূপে আপনাকে ভাগ করা “একং সন্ধিগ্রা বহবা বদন্তি” এই স্নাতন বৈদিক মতেরই পোষকতা করিয়া থাকে।

কোন নক্ষত্রে অবস্থান করিলে সর্গগতিমান সূর্য্য-দেবের কি নাম হইয়া থাকে এবং তাহার জ্ঞ ও কর্ম্মে কিরূপ ভেদ হইয়া থাকে, তাহা পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণগুলির পুস্তক তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুস্তক হইতে প্রাপ্ত বিবরণ নিম্নলিখিত কোষ্ঠকে দেওয়া হইল।

সংখ্যা	দেবতা	নক্ষত্র
১	অগ্নি	কৃত্তিক
২	প্রধাপতি	মৌলি
৩	সোম	মূলশিরা
৪	রুদ্র	অর্ধা
৫	অমিত্তি	পুনর্জ্ব
৬	হম্পতি	পূবা (জিহা)
৭	সর্পসর্গ	অশ্বেষা (আশ্বেষা)
৮	পিতৃসর্গ	মঘা
৯	ভগ্ন	পূর্বা কন্তনী
১০	অর্ঘ্যমা	উত্তরা কন্তনী
১১	সবিতা	হস্তা
১২	জ্ঞান	চিহ্না
১৩	বায়ু	স্বাতী (নিট্যা)
১৪	ইন্দ্রাদী	বিশাখা
১৫	নিত্র	অহরাধা
১৬	ইন্দ্র	মোঘা
১৭	নিম্বু তি	হুলা
১৮	আপাঃ	পূর্বাষাঢ়া
১৯	বিক্রমেবাঃ	উত্তরাষাঢ়া
২০	বিভূ	শ্রবণা (শ্রোণা)
২১	বহুগ	ধনিষ্ঠা (প্রবিষ্ঠা)
২২	বরুণ	শতভিষা
২৩	অধৈকপাদ	পূর্বা ভাদ্রপদা (প্রোষ্টপদা)
২৪	অধিব্রূ	উত্তরা ভাদ্রপদা (প্রোষ্টপদা)
২৫	পূবা	রেবতী
২৬	অধিনীঘর	অধিনী
২৭	ঘন	ভরগী

যখনই প্রত্যয়ে ইহাদের মধ্যে কোন একটি দেবতার নাম করা হইবে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, যে দেবতার নাম করা হইয়াছে, তাহারই নক্ষত্রের কথা বলা হইতেছে। অর্থাৎ সেই নক্ষত্রে অবস্থানকালে সূর্য্য কি কি করিয়া থাকেন, এবং তাহার জ্ঞ ও কর্ম্মে কিরূপ ভেদ হইয়া থাকে, তাহারই বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

ঋগ্বেদের দেবতা বৃত্তিতে হইলে প্রথমে এই নক্ষত্রের সহিত হর্ষের কি লব্ধ তাহা সম্যক বোধগম্য হওয়া চাই। যথা, পুষ্য নামে অনেকগুলি নক্ষত্র আছে। পুষ্য বলিতে গেলোই ইহা জানা সরকার যে, উক্ত রেবতী নক্ষত্রবিধিত হর্ষের নাম। রেবতী নক্ষত্রে অবস্থান-কালে হর্ষা সকলের—পত, পক্ষী, মানব ও উদ্ভিদ-জগতের—পোষণ সম্পাদন করিয়া থাকেন, এবং সেইজন্য তাঁহার নাম পুষ্য অর্থাৎ পুষ্টিকর্তা দেওয়া হয়। পুষ্য 'পু' ধাতু হইতে নিশ্চয় হইয়াছে, এবং এই ধাতুর অর্থ পোষণ করা।

তাহার পর আবার সেবা সরকার, যে জ্ঞাতিবৃত্তে এই ২৭টি নক্ষত্র থাকে, তাহা আবার ১২টি রাশিতে বিভক্ত। হর্ষের এক একটি রাশিতোষণকালকে এক একটি সৌর মাস বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই সৌর মাস দ্বাবশটি, ইহাতেও হর্ষের নাম জিহ্ন জিহ্ন হয়, এবং তাঁহার শুণ ও কর্ণে প্রভু হইয়া থাকে। প্রত্যেক রাশিতে আবার সত্তা চুইটি নক্ষত্র অবস্থান করে। যথা—

রাশি	নক্ষত্র
১ মেঘ	অধিনী, তরঙ্গী, কৃত্তিকা
২ কুব	কৃত্তিকা, রোহিণী, বুধশিরা
৩ মিথুন	বুধশিরা, আশ্বিনী, পুনর্ভব
৪ কর্কট	পুনর্ভব, পুষ্য, অশ্বেষ
৫ সিংহ	যথা, পূর্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী
৬ কন্যা	উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা
৭ তুলা	চিত্রা, বাতী, শিখা
৮ কৃত্তিক	শিখা, অম্বরাষা, ধোতী
৯ মঘ	মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া
১০ মকর	উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা
১১ কুম্ভ	ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদা
১২ মীন	পূর্বভাদ্রপদা, উত্তরভাদ্রপদা, রেবতী

জ্ঞেয়সে যখনই কোন দেবতার নাম করে, তখনই হর্ষের একটি বিশেষ নক্ষত্রে অবস্থান নির্দেশ করে, এবং সেই নক্ষত্র যে রাশিতে অবস্থিত, সেই রাশিও

নির্দেশ করে। যখন, যদি যমদেবতার নাম ঋগ্বেদে করা হয়, তাহা হইলে বৃত্তিতে হইবে, তিনি ভক্তনী নক্ষত্রের দেবতা, এবং তরঙ্গী নক্ষত্র মেঘরাশিতে অবস্থান করার সময়ে উক্ত রাশিও নির্দিষ্ট হইবে। তাহা হইলোই সেবা যাত্র, ঋগ্বেদের প্রত্যেক দেবতার সহিত নক্ষত্র ও রাশির প্রত্যেক ও পরোক্ষভাবে অবিলম্বিত লব্ধ রহিয়াছে।

পরবর্তী ক্ষুদ্র অনেক আখ্যান ঋগ্বেদের ন্তর হইতে লব্ধ হইয়াছে। কিন্তু পুরাণোক্ত আখ্যানগুলি য্যোতিষ বাজিরকে এখন য্যোতিষশাস্ত্রে পর্যাবসিত হইয়াছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, যেমন মহাসেবের মাথার জটা হইতে গজার অবতরণ-কাহিনী। ইহা কি কবিতা হইতে পারে? এইজন্য অল্পত পদ্য বলিবার কারণ কি? যদি য্যোতিষের ভিতর দিয়া সেবা যাত্র, তাহা হইলে পাঠকবর্ণ সেবিবেন, এইজন্য বর্ণনার অভিরঞ্জন বা প্রেমালি কিছুই নাই। মহাসেব বা শিব ঋগ্বেদের দেবতা রুদ্রের নাম। রুদ্র বসিতে যে দেবতা অতিরিক্ত অলম্বণ করেন, অথবা অভিমান্যায় চিৎকার করেন। রুদ্র আত্মানক্ষত্রের দেবতা, আবার আত্মানক্ষত্র মিথুনরাশিতে অবস্থিত। হর্ষা যখন আত্মায় থাকেন, সেটা অযোচ্য মাস, সে সময় বৃত্তিও হয়, যেখণ্ডে প্রভুর গর্জন করিয়া থাকে, কামেই হর্ষা তখন রুদ্র হন, পুং কীসেন অর্থাৎ বর্ণন করেন কিংবা পুং চোচান বা গর্জন করিয়া থাকেন। ছাত্রাশ্রম বা আকাশপদা এই মিথুনরাশির ভিতর দিয়া দিয়াছে। এই জিনিষ্টে কুখাইবার মত আখ্যানটি রচিত হইয়াছে। এই আখ্যানটির মূল কথা এই যে, রুদ্রের মাথা হইতে গজা প্রবাহিত হইয়াছে। কোনকালেই মাথা রুদ্রের শিব নামক দেবতার জটা হইতে আশ্রাসের গজা বা ভাঙ্গিরবী অবতরণ করেন নাই। বাহাসের সে ধারণা আছে, সেটা তাঁহাদের একটা মত মূল।

হর্ষের আখ্যানটিও ঠিক এই প্রকৃতির। পুরাণে বলে হর্ষা জ্ঞতার কড়া লজ্জা, প্রভা বা সরস্বতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রভার গর্ভে মম্ব, যম ও যমী নামক

হুই পুত্র ও এক কস্তার জন্ম হয়। কিন্তু সরদা হুইয়ের তেজঃ সঞ্চারিত না পারিয়া উত্তরকূলে পলাইয়া যান এবং তথায় খোটকীর রূপ ধারণ করিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। হাইবার সময় পতির সেবার ক্ষত আপনায় পরীর হইতে নিষ্করই মত সেবিত্তে একটি হায়াতপ উৎপন্ন করিয়া হুইয়ের নিকট রাখিয়া যান। হায়াতপ গর্তে পনি, সার্বদি ময় ও তপতীর জন্ম হয়। এক সময়ে হায়া বনের উপর রাগ করিয়া তাহাকে ভাঙর শাপ দেন। ইহাতে বয় ও হুই হইলেনই, হায়া যে বনের মাতা নহে, তাহা জানিতে পারেন। হুইসেব অতঃপর ধ্যানস্থ হইয়া সেবিলেন, প্রভা উত্তরকূলে খোটকীর রূপ ধারণ করিয়া তপস্যা করিতেছেন, এবং সেইজন্য তিনিও অগ্নের রূপ ধরিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। এবং সেই খোটকীর গর্তে তিনি পুত্র উৎপাদন করিলেন। তাহার সাক্ষ্যেই অগ্নিরূপে জন্মগ্রহণ করিল, এবং তাহারাই অধিনীকুমারজয় এবং রেবত নামে পরিচিত হইল।

বসি ক্রমে এই বিবাহ অনুদান করা যায়, তাহা হইলে সেবা হাইবে যে, ভজনের হুইট বকের উপর নির্ভর করিয়া এই আখ্যানটি রচিত হইয়াছে। সেই হুইট বৎ নীচে সেওয়া হইল এবং তাহাদের তর্জমাও সেওয়া হইল।

১। বসি হুইয়ে বহুত্ব কলোজীতীয় বিবাহ ভুবন্য সম্ভবিত।

বসত মাতা পূর্বকল্যাণা মহোদয়া বিবস্তো ননাম।

“তাঁর তাঁহার কস্তাকে বিবাহ দিতেছেন, সেইজন্য সমস্ত জগতের জীব একত্র হইয়াছেন। বনের মাতা ও মহান হুইয়ের পরী পরিণয় করিবার সময় আপনাকে লুকাইয়া কেনিলেন।”

২। অপ্যাজ্জবুতাঃ মর্যোভাঃ কুবী সর্বপাশব্রবিক্ষতে।

উভাখিবভরভঙ্গসালীষকহাঃ বা মিথুনা সরদাঃ।

“সেবতার্য সর্বাসিপের নিকট হইতে অশ্রুত সোপন করিয়া তাহার (কীর হুইতার) ক্রিমি প্রতিষ্ঠিত (হুইসেবকে) দান করিলেন। আবার সরদা অধিনীকুমার গর্তে ধারণ করিয়া তাহাদের জন্মান

করিলেন, এবং আরও হুইজনের (বয় ও বসীর) জন্ম দিলেন।”

বৎ হুইটর দেবতা বসি, তিনি চিত্রা নক্ষত্রের দেবতা। তিনিই বিবক্ষা বলিয়া খ্যাত, তিনি স্বর্ষের স্থপতি, তাঁহার কাছ সঞ্জন জিনিষে রূপ দেওয়া। তিনি না থাকিলে কোন জিনিষ সেবিত্তে পাওয়া হাইত না। তাঁহার কস্তা প্রভা, অর্থাৎ যে প্রভা হুইকে রূপ দিয়া থাকে অর্থাৎ তাঁহার রমি। আবার প্রভারই আর এক নাম সরদা অর্থাৎ যিনি অশ্রুপন্ন করেন। হুই বোখানোই দান, প্রভা বা হুইয়ের রমি সেই সেই মূলেই বিরাটমান থাকে বলিয়া প্রভার আর এক নাম সরদা। হুইজনে হুইয়ের তেজঃ ক্রমশঃ কমিতে থাকে, এবং যখন হুই চিত্রা নক্ষত্রের নিকটবর্তী হন অর্থাৎ স্বতরাবাকী আসেন, তখন দিন অত্যন্ত ছোট হইয়া থাকে এবং রাত্রির অন্ধকার বাড়িতে থাকে। এই জিনিষটি লুকাইবার ক্ষমতা তাঁহার উত্তরকূলে পলায়ন-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। তারপর হুই হায়াতপ সহিত থাকিতে থাকিতে যখন মকররাক্ষিত আসেন, তখন তাঁহার তিনটি পুত্রকস্তা হায়াতপ গর্তে উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে পনি এক, এই পনি সেইজন্য মকররাক্ষির অধিপতি বলিয়া পরিচিত।

মকরলক্ষ্যোক্তি হইতেই উত্তরায়ণের আরম্ভ, অর্থাৎ এই সময় হইতেই দিন বীরে বীরে বড় হইতে থাকে এবং অন্ধকার কম হইতে থাকে। ক্রমে জ্ঞানকেই আলোক ও অন্ধকারকেই অজ্ঞানতা বলিয়া মানিয়াছে। এতদিন অন্ধকার ছিল বলিয়া হুই অজ্ঞান ছিলেন, এবং সেইজন্য হায়াতপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে অন্ধকার যখন কাটিয়া গেল, তখন হায়া যে প্রভা নহে, তাহা বুঝিতে পারিলেন, এবং তাঁহার খোঁজ লইতে লাগিলেন। পরে জানিলেন, প্রভা উত্তরকূলে অর্থাৎ হুইয়ের উত্তরায়ণের পথে খোটকীর রূপ ধারণ করিয়া তপস্যা করিতেছেন। কাজেই হুইও খোঁজার রূপ ধরিয়া তাঁহার সহিত বাস করিতে

লাগিলেন। দেবরাসিতে অধিনীনক্ষত্রে অধিনীনকুমার-

ইত্যাদির সঙ্কল্প কল্পনা করা হইয়াছে। যেমন চিত্রায়

ঘরের জন্ম হইল বলিয়া তাঁহাদের উক্ত নক্ষত্রের অধিপতি করিয়া দিলেন। তাহার পর প্রভা আপনার পূর্ণরূপ ধারণ করিয়া চলিতে লাগিলেন, এবং শীঘ্রই পরবর্তী নক্ষত্র ভরণীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময় প্রভার গর্ভে যম, যমী ও মমুর জন্ম হইল, এবং যমকে উক্ত ভরণীনক্ষত্রের অধিপতি করিয়া দিয়া তিনি আগাইয়া গেলেন।

পরে আবার সেইরূপ ঝট্টা, সংজ্ঞা ও ছায়ার লীলা বৎসর বৎসর এইভাবে চলিতে লাগিল।

সূর্য্যদেব ষোড়শরূপ লইলেন কেন, এ বিষয়ের একটা উত্তর দেওয়া দরকার। সকলেই জানেন, ষোড়শরূপ গর্ভ সম্পূর্ণ হইতে পূর্বা বারমাস লাগিয়া থাকে। এবং সূর্য্যেরও সমস্ত ক্রান্তিবৃত্ত একবার ঘুরিতে বারমাস লাগিয়া থাকে বলিয়া সূর্য্যকে ঋগ্বেদের অনেকস্থলে অষ্টরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। আর একটি কথা এইখানে বলিয়া রাখা দরকার যে, ঋগ্বেদে কার্ণা ও কারণভাব বুঝাইবার জন্ত পিতা-পুত্র, স্বত্বর-জামাই

সূর্য্যের নাম ঝট্টা, আবার সূর্য্যের আখ্যানে ঝট্টাই সূর্য্যের স্বত্বর হইতেছেন। একস্থলে সূর্য্য রূপ দিতেছেন, আর একস্থলে সূর্য্য পতির কার্ণা করিতেছেন। ঋগ্বেদে ইহার সম্পূর্ণ বিভিন্নভাবে পরিকল্পিত হইয়াছেন।

পরিশেষে বল্লেখ্য এই যে, ভবিষ্যতে ঋগ্বেদের দেবতা সম্বন্ধে কি ভাবে গবেষণা করিলে সত্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে, তাহারই একটা দিক্ এই প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এই বিষয় অতীত গহন, এবং এইভাবে প্রত্যেক ঋকের মর্ম্ম-গ্রহণ করা বিশেষ সময়সাপেক্ষ। ঐহাদের স্ববিধা হইবে, তাহারাই যদি এই বিষয়ে আরও গবেষণা করেন, তাহা হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। আর একটি কথা এই যে, বেদ আমাদের অতি মূল্যবান জাতীয় সম্পদ, এবং এ সম্বন্ধে বেদরূপ চর্চা হওয়া দরকার, দেশে সে রূপ চর্চা নাই। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।



সাপ ও বাজপাখী

(কবিতা রইতে)

লেখক—মাস্ট্রিম গর্কি

অনুবাদক—শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাপ পাহাড়ের উপরে বেয়ে উঠে গাথলেতে পাহাড়ের পথে কুণ্ডলী পাকিয়ে সমুদ্রের দিকে ডাকিয়ে শ'ড়ে ছিলো। উর্দ্ধে ঘূর্ণা অগ্নিছিলো, আর তারই উজালে বন নিশ্বাস ফেলছিলো পাহাড়। নীচে সমুদ্র পাথরের উপর আহুতে পড়ছিলো। আর পাহাড়ের সেই অন্ধকার পথে হুড়ির বাজনা বাজিয়ে, জল ছিটিয়ে একটি পাহাড়ে নদী সমুদ্রের সঙ্গেই নিলিত হ'তে পৌঁছছিলো। কেনার আবৃত্ত হ'য়ে গর্জন করতে করতে সে পাহাড়কে চির ফেলে সমুদ্রের উপর পড়ছিলো। হঠাৎ সেই পথে, যেখানে সাপ গুরে ছিলো, সেখানে আকাশ থেকে বাজপাখী নেমে এসো। তার মুখে আঘাত পেয়েছে, তার ডানা রক্তাক্ত। হঠাৎ একটা চীংকার ক'রে সে মাটির উপর এসে পড়লো, আর নিম্নলিখিত ক্রোধে সেই কঠিন পাহাড়কে তার বুক দিয়ে আঘাত করতে লাগলো। সাপ তার পেয়ে তড়াক্তাভি ন'রে সেলো কিন্তু সে নিঃশব্দেই বৃষ্টিতে পারলো যে, পানীর আব্র আর মাত কয়েক মুহূর্তের ভিত্তে। তখন সে আহত পানীর কাছে একটু একটু ক'রে এগিয়ে গিয়ে তার চোখের কাছে হিঃহিঃ পদ ক'রে বললো, "কি, তুমি মরতে বসেছো না কি?"

"হ্যাঁ, আমি মরছি"—বীর্ষ নিশ্বাস ফেলে বাজপাখী বললো, "আমার জীবন অসীম স্নেহের জীবন ছিল। আনন্দ কি তা' আমি জানি। আমি বর্ষাবর সাহসের সঙ্গে বৃষ্টি ক'রে এসেছি। আকাশ আমি কেঁপেছি, তুমি কখনো আকাশকে অত কাছ থেকে দেখতে পাবে না,—হায়, বেচারী তুমি।"

সাপ পানীর বোকামি দেখে মনে মনে হেসে উত্তর দিলো, "আকাশ? আকাশ তো শুধু ফাঁক।

আমরা, সেখানে আমি কেমন ক'রে বাবো? আমার পক্ষে এই আঘাতই সব চেয়ে স্নেহ, কেমন তপ্ত আর গাথলেতে।"

সে মনে মনে ভাবলো যে, আকাশে উড়ি আর মাটিতে গড়িয়ে চলি—শেষ একই। সব মাটিতে মিশবে, ধুলিতে পরিণত হবে। কিন্তু সেই সাহসী বাজপাখী হঠাৎ তার ডানা ঝপটে মাটি থেকে একটু উঠে পথের চারিদিকে চেয়ে দেখলো। দূর বর্ষের পাথরের মধ্য দিয়ে জল চলেছে। বায়ু-শূন্য সেই অন্ধকার পাহাড়ের পথ ভগ্ন-পাতার গন্ধে ভরপুর ছিলো। বাজপাখী তার সব শক্তি দিয়ে বাবার চীংকার ক'রে উঠলো, "হায়, যদি আমি আর একবার আকাশে উড়তে পারতুম, তাহ'লে আমি আমার শত্রুকে আমার কুকের ক্ষতের উপর চেপে ধরতুম, সে আমার রক্তে হাঁপিয়ে উঠতো। ওঃ! মুন্ডের আনন্দ।"

সাপ ভাবতে লাগলো, বহন পানী এমন ক'রে কাংরাচ্ছে হরতো বা তাহ'লে আকাশে বাস করা সত্যিই খুব আনন্দের। সে পানীর কাছে প্রণাম করলো, "পাহাড়ের কোণে গিয়ে নীচের দিকে ঝপিয়ে পড়। হরতো তোমার ডানা তোমাকে একটু উঁচুতে তুলবে। তার ফলে তুমি তোমার আকাশে আরো কিছুক্ষণ বাঁচতে পারবে।"

বাজপাখী কেঁপে উঠলো, আর চীংকার ক'রে আত্ম আত্ম পাহাড়ের ধারের দিকে এগিয়ে বেতে লাগলো। তার পা পিছল পাথরের উপর বার বার ন'রে বাজছিলো। সে তার ডানা বেলে ধ'রে তার ক্ষত কুকের সমস্ত শক্তি দিয়ে চীংকার



করলো। তার চোখ ছুঁত বলতে লাগলো, সে নীচের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। পাখরের মত বেগে সে নীচের দিকে পড়তে লাগলো। তার জানা গেলো ডেহে, তার গালক সেলো খঁসে। নদীর ঢেউ তাকে ধঁরে নিলো, তার হস্ত ধুয়ে দিলো। তার মত কেনা দিয়ে বেঁধে দিয়ে তাকে নিয়ে সমুদ্রের দিকে দৌড়ে চললো। সমুদ্রের ঢেউ বিরাট বিলাসের সুরে তীরের উপর বাছড়ে পড়ছিলো। সমুদ্রের উপর পানীর বুহুসে দেখা গেলো না।

সেই স্নাতকসে পাহাড়ের পাশে গুরে গুরে বহুশ শাপ পানীর বুহুর কথা, আকাশের প্রতি পানীর নদীর অহুরাসের কথা ভাবছিলো। সে সেই বুহুর দিকে তাকিয়ে দেখলো—বেহুর অনবকাল ধঁরে চোখকে আনলের স্বপ্ন নিয়ে আঘর করে। কি দেখেছিলো এই বাজপাখী অতল সীমাহীন এই মহ-ভূমিতে? কেন এই বাজপাখী, আর বাজপাখীর মত অস্ত্রো, তাদের এই আকাশের প্রতি ভালবাসা যারা আর বুহু যারা অস্ত্রের এত বিচলিত করে? তারা কি দেখে, কি পায় সেখানে? যদি আমি অস্ত্রকনের জন্তেও আকাশে উড়তে পারতুম তাহ'লে আমিও জানতে পারতুম। শাপ তার ভাবনা অহুয়ারী কাছ করলো। সে হুঙলী পাকিয়ে আকাশের দিকে লাক দিলো। শাপ হুঙলীকে সফ কিতের মত বলতে লাগলো।

যে মাটিতে গড়িয়ে চলবার জন্তে লয়েছে, সে আকাশে উড়তে পারে না। শাপ সেটা ভুলে দিয়েছিলো, তাই সে পাখরের উপর পড়ে গেলো। কিন্তু তার ফলে সে মরলো না, সে শুধু হাসলো। ও, তাহ'লে আকাশে ওড়ার সমস্ত আনন্দ এতই? আনন্দ হচ্ছে পড়ে বাজার! বোকা পানী ও এই পানীর মত বোকা অস্ত্রো, তারা পৃথিবীকে জানে না, তারা পৃথিবীকে চায় না। তারা বেগে আকাশে ধায়, আর আকাশের মহুভূমিতে প্রাণ

বোঝে। সেখানে শুধু পুত্ৰতা। সেখানে আলো আছে প্রভুর, কিন্তু সেখানে কোন বাত নেই প্রাণীর প্রাণবাসের জন্তে। কেন তবে এই পর্ক তাদের, যারা উড়তে পারে? কেন এই বিরাট তাদের প'রে, যারা উড়তে পারে না? এই পর্ক আর বিরাট হচ্ছে, শুধু তাদের ইচ্ছার শাপশামিক চাকবার জন্তে, তাদের অহীন অতিক্রমে গোপন করবার জন্তে। বোকা পানী, তাদের কথা আর আনাকে ঠকাতে পারবে না। আমি নিজেই জানি। আমি আকাশ দেখছি, আমি আকাশে উড়েছি, আমি আকাশকে বেগেছি। আমি জানি পড়ে বাজার কি। আমি মরিনি, শুধু আমি নিজের উপর আরো বেশী বিশ্বাস করতে শুরু করেছি। যারা পৃথিবীকে ভালবাসতে পারে না, তারা প্রবককদের সঙ্গে থাকুক। আমি তাদের আশ্রানে আর বিশ্বাস রাখবো না। আমি পৃথিবীর সৃষ্টি, আমি পৃথিবীর সঙ্গে থাকবো। শাপ হুঙলী পাকালো আশনার সঙ্গে আশনি পর্ক অহুতব করে।

সমুদ্র আলোতে কলরল করছিলো। ঢেউগুলি তীরের উপর সজোরে আঘাত করছিলো। সিন্ধের পর্কসে এই সাহসী বাজপাখীর গান জনিত হচ্ছিলো। পাহাড় আর আকাশ এই ভয়ভর পানের সুরে কাঁপছিলো।

সাহসীদের শাপশামির উচ্ছেদ আবরা গান গাই। সাহসীদের শাপশামির জীবনের জান। যে সাহসী বাজপাখী! শত্রুর সঙ্গে দুটে ভূমি রক্ত মত করে মরতো; কিন্তু সময় আসবে যখন জোবার তপ্ত রক্তের কোঁটা আগুনের শিখার মত জীবনের মহাকারে জলে উঠবে, আর অনেক সাহসী প্রাণকে প্রমলিত করবে আলো আর সুক্তি শাপশ কুয়ার।

ভূমি মরছে, হুখ নেই। সাহসীদের গানে ভূমি চিরকাল জীবন্ত উদাহরণ হ'য়ে থাকবে—আলো আর সুক্তির দিকে নির্ভর আশ্রানবহন।

বীরদের শাপশামির উচ্ছেদ আবরা গান গাই।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে ও অসহযোগ-সম্মতায় স্বাধীনতা-পন্থায়

আচার্য্য শ্রী প্রব্রুজেন্দ্র রায়

চৌধুরীর বসন্ত বসন্তে মাড়োয়ারী ছেলে
বাক্যের পাকা হইয়া উঠে এক বাজারের নাকী-নকশের
সন্ধান রাখে ; ব্যবসা-পিকার সঙ্গে সঙ্গে সে লোকচরিত্রও
বিস্ময়ভাবে অধ্যয়ন করে । তাই কাহারও সহিত ছুই
একদিন কারবার করিলেই সে বুঝিতে পারে যে,
তাহাকে বিশ্বাস করিয়া ধার দেওয়া সম্ভব কি না ।
কবে, সে সঙ্গে কাহারও নিকট প্রস্তাবিত হয় না ।
প্রথমতঃ ব্যবসায় উন্নতি করিতে হইলে প্রথমে
ধীরে ধীরে শিক্ষানবিশী করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা
প্রয়োজন । “There is no royal road to
learning.” ব্যবসা-ক্ষেত্রেও ইহা সত্য—এখানেও কীকি
চলে না ।

অনেক ক্ষেত্রে দেখিলাম যে, বাণিজ্যী হুব কোন
প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়াই ব্যবসা কাঁদিয়া
বলে এক প্রস্তাবিত হয় । প্রথম হইতেই বরিদ্ধার
আদিয়া প্রয়োজন সেবার, এক মনে—“মহাশয়,
“কিন্তু বাবু দিন, বাসকাবারে যাহিনা পাইলেই টাকা
পেম করিয়া দিব” । এমন কি বেশী দুলাকা দিয়াও
ক্রয় করিতে তাহার ক্রীড়া করে না । এই প্রকার
প্রয়োজন পড়িয়া হুবক মোকামদার ধার দিতে
থাকে । কাহ্নেই ক্রমবধ্বন অমরক টাকাও বাকি পড়িতে
থাকে এক পরিষেবে সে মোকাম ফুলিয়া দিতে বাধ্য
হয় । কিন্তু মাড়োয়ারীকে এ প্রকারে ঠকান যায় না ;
কারণ, সে পূর্ন হইতেই পাকা হইয়া ব্যবসা আরম্ভ
করে এক ধারে মাল হাড়িলেও পাণ্ডায়ারের ঘোর
চাপিয়া বলে—তাহার হাত একান সম্বন্ধ নয় ।

অনেক যাদাশী হুবক আবার নিকট আদিয়া
জিজ্ঞাসা করেন, “মহাশয়, ব্যবসা করিব, ফুলন
কোথায় ?” অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফুলনের প্রথম অর্থ—
অপেক্ষাকৃত বেশী প্রয়োজন বিশ্বাস-অর্থন । এক্ষণে
মাড়োয়ারীসহ আদর্শহানী । ইহারা ব্যবসা-উপলব্ধ

মহাশয়ের নিকট টাকা বা মাল ধার নাইলে তাহা
নিরূপিত কিত্তি-মত শোধ করিবেনই—কোন প্রকারেই
কিত্তি সেবার করিবেন না । পূর্বেই বলিয়াছি যে,
একজন মাড়োয়ারী সত্য সত্যই “লোটো কল” সম্বল
করিয়া ব্যবসায় দ্রুতগতি করে এবং পূর্নসে মাল
লইয়া ফেরী করিয়া বেড়ায় । মধ্যাহ্নকালে কোন
ফুলফুলে সন্নিবিষ্ট বিজ্ঞান করিয়া এবং ‘ছাত্ত’ ঘাটা
উদ্বলপুষ্টি করিয়া পুনরায় ফেরী করিতে বাহির হয় ।
কিন্তু আমাদের কোন হুবক ৫০০ পাচশ টাকা
ধার করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিলেও পেয়ে বেথা
যায় যে, সে আসল ভানিয়া কিছুদিন পরে পা-তাকা
দিয়াছে । তাহার যদি এক মোট কাপড় বড়বাড়ার
হইতে মকমলের কোন গ্রামে লইয়া বিক্রয় করিতে
হয়, তবে ইহাতে তাহার কি প্রকার ব্যয় হয়, তাহার
একটা আভাস দিতেছি । আমাদের হুবকপ পূর্নসে
একজন বোকা বহন করিতে অশারণ—পারিলেও
লজ্জায় তাহা করিতে কহাচ রাজী নন । প্রথমতঃ,
রিজা করিয়া বড়বাড়ার হইতে শিয়ালদহ ট্রেনে মাল
পৌছাইতে ন্যূন ১০ আনা লাগে, তাহার পর
সেখান হইতে মাল লগেৎ করিয়া নিম্নের টিকিট কিনিয়া
গরবা ট্রেনে অবতরণ করে । সেখান হইতে ইমারে
মাল লইতে হইলে গুনরায় ইমার ভাড়া, হুটে ভাড়া
ইত্যাদি, অবিকল ইমার-বাট হইতে গরবা হানে
পৌছাইতে আরও কিছু ব্যয় হইয়া থাকে । এই ভাবে
মাল আসে—কিন্তু শ্রীমান্বয়ের আবার মাড়োয়ারীকে
জায় ফেরী করিয়া বিক্রয় করিবার কথতা নাই ; স্বতন্ত্র
একখানি মোকামও ভাড়া করিতে হয় । মোকাম
হইলেই মোর, টেবিল প্রভৃতি সরঞ্জামও চাই—
এক একটা মোকাম চালান অসম্ভব ; কাহ্নেই একজন
সহকারী, অল্পতঃ একটা ভূত্যও প্রয়োজন হয় । এই
প্রকারে তাহার অনেক খরচ বেশী পড়িয়া যায় ।

স্বত্বাধীন পুঁজি বিক্রয় করিতে হইলে তাহার মোটা প্রতি আদান ৮০ হইল আদান বেশী না হইলে চল না। তাহার প্রতিশ্রুতি মাফোয়ারী অনায়াসে ৮০ চারি পয়সা বেশীতে মাল ছাড়িতে পারে, কাজেই সে প্রতিবাসিতার আঁটা উঠিতে পারে না। এই প্রকার সম্বন্ধে ব্যবসা বেশীদিন স্থায়ী হয় না। তাই আমাদের ব্যবসায় ধারে মাল লইয়া ব্যবসারে প্রবৃত্ত হইলেও দিন দিন মূলধন হোয়াইয়া কলেন এবং মহাজনের টাকা শোধ দিতে না পারিয়া ‘পুনর্বিবিক’ হইয়া আইন পড়িতে আসেন, অথবা কেরানীগিরি খোঁজে বাহির হন।

আমি অনেক ভ্রমলোক এবং ব্যবসায়ীদের নিকট শুনিয়াছি যে, আমাদের শিক্ষিত ব্যবসায়কে ধারে মাল সেওয়া বিপজ্জনক, দিলে টাকার মাত্রা ত্যাগ করিয়া দিতে হইবে। অনেক মুদ্রাসিদ্ধ ইংরাজ লোক বলিয়াছেন, “Don't treat money matters with levity, money is character.” একথা অত্যন্ত সত্য। আমার আশ্চর্য্যের বিষয়ে সবিতার আলোচনা করিয়াছি। বাহুর চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় তাহার সহিত অর্থের ব্যবহার করিলে। বাঙালী ব্যবসায়ের ব্যবসার পরাজয়ের কারণ তাহার সত্যতার অভাব। আমার অনেক চুক্তিপূর্ণ ছাত্র (M. Sc.) একটি কলেজের অধ্যাপক। তিনি কিছুদিন ছুটি গইয়া মাধ্যমী হইতে ব্যবহারিক রসায়ন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছেন এবং এখানে একটি ছোট্ট-খাটো Lannery এবং ভাস্কর্য্য ছুতার দোকান খুলিয়াছেন। কাজকর্ম এক রকম ভালই চলিতেছিল, কিন্তু তিনি সেদিন আমার নিকট কামিয়া বলিলেন, “আমার সর্জন্য হইয়াছে! সমস্ত দিন আমাকে কলেজে থাকিতে হয়, কাজেই সহকারীকরণ হইল তিন জন আত্মীয় ব্যবসায় প্রবৃত্ত করি এবং তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই। তাহারা আমার মাথায় হাত ফুটাইয়া অনেক টাকা আত্মসাৎ করিয়া পলাইয়াছে।” কয়েক মাস পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাপক আমাকে বলিয়াছিলেন

যে, তাহার এক পুত্র M. H. পাশ করিয়া কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি জাতীয়বান খুলিয়াছেন। একজন বেকার ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইয়া নিকট বিল চরবহার বিষয় জানাইত; একদিন তিনি বলিলেন, “আচ্ছা, আমি একটি সুবিধা করিয়া দিতেছি। আমার ছেলের জাতীয়বান্য অনেক প্রকার প্রসাধন-ত্রয়া সর্জন্যই থাকে; এ সকলে বড় ভ্রমলোকের বসতি হইলেও, অথচ এ সব জিনিসের দোকান বড় একটা নাই। আমি তোমাকে জাতীয়বান্য হইতে ১০১৫ মণ পনের টাকার জিনিস লইয়া দিতেছি — তুমি সেগুলি পুঙ্খ-মাকীতে ফেরী করিয়া টাকা কেন্দ্র দিলে পুনরায় মাল পাইবে। এই প্রকারে বাহা লাভ হইবে তাহাতে আপাততঃ তোমার চলিয়া যাইবে।” ব্যবসায়ী বলিল, “মহাশয়, আমি ভ্রমলোক, এই সকল মাল হুঁকিতে করিয়া হকিলে বড় খারাপ দেখায়।” হুঁকিলে তরিয়া গেল তত্ত্বতার উপর আঘাত হইবে না বুঝিয়া তাহাকে একটি ছোট্ট-খাটো হুঁকিলেও সেওয়া হইল; কিন্তু ব্যবসায়ী মাল সম্বন্ধে হুঁকিলে গইয়া সেই যে অন্তর্ধান করিল, আর কিরিল না। শিক্ষিত বাঙালী ব্যবসায়ের এইরূপ অসত্যতার প্রমাণ আরও অনেক দেখা দিতে পারে। জাপানাল টানারীর ম্যানেজার ঐশ্বর্য্য বি, এম, মাস আমাকে একটি বিবরণ দিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি বলেন যে, গত ক্র ২৫শে তাহাকে প্রায় এক কোটি টাকার লেন-দেন করিতে হইয়াছে। ইহার অবিকার্য্যই পশ্চিমা মূলধান ও আত্মের সহিত। সামান্য কিছু লেন-দেন বাঙালীর সহিতও হইয়াছে। চরবন্ধে বিষয়, বাঙালীদের নিকট হইতে টাকা আমায় করিবার সময় প্রায় প্রত্যেক বারই তাহাকে মামলা-মোকদ্দমা করিতে হইয়াছে, অথচ পশ্চিমাদের ক্ষেত্র একবারও তাহাকে আদালতে যাইতে হয় নাই।

উপরির্ণির্ণিত ঘটনাবলি হইতে বেশ বোকা ধার, বাঙালী কেন ব্যবসায় লাভ্য লাভ করিতে পারে না। প্রথমতঃ, তাহার উপযুক্ত শিক্ষাবিধি হয় না,

সেই ক্ষত সব দিকেই তার পলক থাকে ; বিতীহতঃ, একটু বাতাস খাইলেই সে অবসর হইয়া পড়ে এবং হাত-পা ছাড়িয়া দিয়া আবার কেতাপিপিরির বোঝে বাহির হয় । বাড়ারারী প্রকৃতি ব্যবসাদারগণ কি তাহা ব্যবসা আরম্ভ করে, তাহার সবিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । ইহারা দুই একবার ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও পশ্চাদপন্থ হয় না এবং সহজেই খাড়া সামান্যইয়া উঠিতে পারে ; কারণ, গোড়া হইতে ইহাদের চাল-চলন অভিনয় সাদাঙ্গিরা — দুই আনা হইতে চারি আনার মধ্যেই ইহারা দিন যাপন করিতে পারে । অবিকল, ইহাদের সত্ততা প্রশংসনীয় — ইহারা কখনও কিস্তি খেলাপ করে না, তাই ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও মহাজন ইহাদিগকে ঘারে ভাল ছাড়িয়া দেয় এবং উৎসাহও দিয়া থাকে । আমি জানি, অনেক ব্যবসায়ীর কিস্তি কাল-বৈশাখীর কড়ে মারা গিয়াছে । আমাদের দেশে এ সব কারবারে বীমাগ্রহণ না থাকায় মালিক চতুর্দর্শন হইয়া ছিরংগে কলিকাতায় মহাজনের নিকট উপস্থিত হইতেই তিনি “কুহ পরওয়া নেই” বলিয়া পুনরায় তাহাকে ভাল দিতে আরম্ভ করিলেন ।

এই সমস্ত কারণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কেন

আমি বাঙ্গালী দিন দিন ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছি । এ তাহে চলিলে ভবিষ্যতে যে কি গাঁড়াইবে, ধারণা করা যায় না । বেকার-সমস্তা দিন দিন জটিল হইতে জটিলতর হইয়া গাঁড়াইতেছে, এবং অনেকে অস্বাভাব্য—নিম্নাঙ্গ দারিদ্র্যের তাক্‌নাহ মান-সম্মত বজায় রাখিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়া বসিতেছে । এককল সেখিয়া গুলিয়াও আবার সেই একই জীবন-যাত্রায় বাঙ্গালী জাতি পা চলিয়া দিয়া চলিয়াছে । দেশ হইতে কোটা কোটা টাকা বিদেশীরা গুটিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহার দিকে দৃষ্টিপাতও নাই—ঐ কৃষা জিজ্ঞার মোহে দাবিত হইয়া ভবিষ্যৎ যে কিরূপ অন্ধকার, তাহা এখনও বুঝি না ।

আমি নিজে বাঙ্গালী—তাই বাঙ্গালী জাতিকে আমি অন্তরের সহিত ভালবাসি । যে সমস্ত কারণে বাঙ্গালী জাতি এই ভীষণ প্রতিষেপিতার দিনে অল্প-সমস্তার সমাধানে অপারগ হইয়া সকল ক্ষেত্র হইতে দিন মিন বিতাড়িত হইতেছে, তাহা জ্ঞাত করিয়া, চোখে আবুল দিয়া দেখাইতেছি । বাহাতে ‘মা-পত্নী’দের নিকট আমার বার্তা পৌছায়, তাহারই ক্ষত বাঙ্গালী মালিক পত্রিকাগুলিতে আমার প্রবন্ধ-গুলি নিয়মিত রূপে প্রকাশ করিতেছি ।



আকাশকবী

শ্রীকৃষ্ণদরশন মল্লিক, বি-এ

(১)

ওরে আমার শৈর্গদেহ

জীর্ণপাখা পাখি রে !

আজও দেখি নীলাকাশের

পানেই যে তোর আঁখি রে ।

সইবে কি তোর পরাণখানি,

বিদ্বাতের ওই চক্ৰকানি,

আঁবারকরা বঙ্গা বড়ে

কাপ্ছে শাখা শাখী রে,

তবু দেখি নীলাকাশের

পানেই যে তোর আঁখি রে ।

(২)

ভালো কি তোর লাগছে না রে

এমন শ্রামল বীথিকা,

এত ফুলের মধুর হাসি

গন্ধ আলো গীতিকা ।

ভালবাসার সোণার খাঁচা,

শান্তি এবং হৃথে বাঁচা, —

অন্তবিহীন অকূল আকাশ

করছে ডাকাডাকি রে ।

(৩)

বুঝেছি তোর কিসের লাগি

তথ্য হৃদয় মাভিছে,

হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষী তুই

গরুড় পাখীর জ্ঞাতি যে ।

পিয়ালী তুই অমৃতেরি,

আছে তোরে স্বর্গ ঘিরি,

ভুলিস্ না তুই যতই তোরে

বক্ষে চেপে রাখি রে ।

ওরে আমার শৈর্গদেহ

জীর্ণপাখা পাখি রে ।

হাকান-কুজা বাঙালী জাতি *

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

তালতলা বলিলে প্রথমেই মনে আসে একটা ভাল গাছ আর তার তলায় একটা পুতুল। সবে সবে বেন বেঁধিতে পাই, একটা তাল চিপ্ করিয়া ডাঙার অথবা ছপ্ করিয়া জলে পড়িতেছে। হরত কলিকাতার এই অঞ্চলে কোনো দিন গভা গভা পুতুল ছিল, আর তার পাড়ে ছিল ভজন ভজন তাল গাছ। হরত কেন, নিশ্চয়ই ছিল। আর অবশ্য সাতকে সাতকে গণা সময়ে তালও চিপ্ করিয়া পুতুলের কিনারায় বা ছপ্ করিয়া জলে পড়িত।

একালের তালতলা বলিলে পুলিশের লোকে হরত দেখাইবে অমূলক রাত্তা, অমূলক রাত্তা ইত্যাদি রাত্তার ভিতরকার নিষিদ্ধি করা একটা জনপদ। আবার পোষ্ট অফিসের লোককে যদি জিজ্ঞাসা করি তাহা হইলে হরত দেখিব আর-কোনো প্রকার চৌহদ্দি। তালতলার ঝাঁহার শাইত্রেরী কায়ের করিয়াছেন তাহারের মধ্যমে সীমানাভাষা হরত এই দুই প্রকারের কোনোটাই নয়। অতএব দেখা বাইতেছে যে, এক তালতলার রকমারি ব্যাখ্যা, রকমারি সীমানা, বিভিন্ন গভী, বিভিন্ন চৌহদ্দি হওয়া সম্ভব।

লোকসাহিত্য

কাজেই গণসাহিত্য কি এই সম্বন্ধেও হরেক রকম সীমানা-নির্দেশ চলিতে পারে। গণসাহিত্যের এক পোশা ব্যাখ্যা সুপ্রচলিত আছে। সেই ব্যাখ্যা বেঁধিতে পাই — বেশ পল্ট ভাবে — জাতিগত পার্থক্য হার্ডারের সাহিত্য-সাধনায়। জনসাধারণ কেবল কল্পা-কাহিনীতে আনন্দ পায়, সেই সবই হইল “লোকসাহিত্য”। এই লোকসাহিত্যের দিকে নজর

না কেসিলে জনগণের আস্থা, ‘জাতীয়’ চেতনা ইত্যাদি আবিষ্কার করা অসম্ভব। অতএব সাধারণের প্রচলিত গল্প-ভাষা, গান, আখ্যায়িকা ইত্যাদি লগ্নে করিবার দিকে আশ্রয় লানো কর্তব্য। এইরূপ মত প্রচার করিয়া হার্ডার সোটে-মুন্ডের জাতিগত-সমাবে “জাতীয়তাবাদ” ভিত্তি কায়ের করিয়া দিয়াছেন। জাতিগত প্রিয় ভাইয়েরা এই ধরণের লোকসাহিত্য সংগ্রহের কাছে প্রসিদ্ধ। বিলাতী ম্যাক্সমর্সন জালিয়াতি প্রচারে প্রাচীন লোকসাহিত্যের দিকে ইয়ের সাহিত্যসেবকদের মনোবোধ আকর্ষিত করিতে সমর্থ হন। তাহা ছাড়া হুইস-করাসী সাহিত্যবীর রুসো সেকালের ইরোরোপে লোকসাহিত্যের রস বাঁটরা দিয়াছেন। বেকসন লোকের নাম করা হইল তাহার। সকলেই “রোমান্টিক” অর্থাৎ ভাব-নিষ্ঠ সাহিত্যসেবী। সোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া যেখানে যেখানে রোমান্টিক ভাবুততার আন্দোলন বাধা ভুলিয়াছে, সেই সকল স্থানে লোকসাহিত্যের ইচ্ছা দেখা দিয়াছে।

আমাদের বাঙা দেশেও লোকসাহিত্য-সংগ্রহের খেলা লালবিহারী সে হইতে সীমেশচন্দ্র সেন পর্যন্ত বজায় আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্যে এই খেলা সম্বন্ধে গবেষণার সামগ্রীও বটে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেম্বারও এই দিকে খেলিতেছে। প্রাচীন ভারতেও এইরূপ সংগ্রহের খেলা ছিল। কেন না “কথা-সংগ্রহ” একখান। সংগ্রহেরই বিদ্যকাব্য।

নৃত্য

গণসাহিত্য বলিলে আর এক প্রকার সাহিত্যও বুঝা চলিতে পারে। দেশের আপামর জনসাধারণের রীতিনীতি ও আচারব্যবহার বিবরণ রচনা এই

* তালতলা পার্থক্য লাইত্রেরী কর্তৃক অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মেলনের গণসাহিত্য শাখার সভাপতির অভিভাষণ, ১০ই এপ্রিল ১৯৩৩, কলিকাতা।—শ্রীশ্রীমদেবী দে, অধ্যাপক, সর্বভারত কলাকলে।

সাহিত্যের অন্তর্গত। পরীতে পরীতে ভ্রমণ করিয়া উৎসব-আবোধের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। হিন্দী জাতির বরফা, সেবসেবী, পূজা-পার্বণ সম্বন্ধে তথা সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। এই সবকে আখিক বা কুটুবিষয়ক নৃত্যের (আহু-পল্লির) অন্তর্গত করা হয়। পাচাত্য পণ্ডিতদের ভিত্তর করানী প্রোক, ইথেরন প্রেমার, জার্গাণ কুটু, ইত্যাদি দেখকেরা এই সাহিত্যের নানা বিভাগে সুপ্রসিদ্ধ।

বাঙলা দেশেও কিছু কিছু কাম হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের নানা শাখা-প্রশাখার নাম আবার উল্লেখযোগ্য। ঐকুল শরণ-কুমার রায়, ঐকুল হরিহাস পালিত, ঐকুল বিশ্বকর্ষক মহম্মদার ইত্যাদি গবেষকেরা আখিক নৃত্যের এখরে-ওখরে চলাকেরা করিয়াছেন।

জীবনের সাজা ও রস-বৈচিত্র্য

আমার নিকট গণসাহিত্য একমাত্র লোক-সাহিত্যও নয়, আবার একমাত্র নৃত্যের অন্তর্গত জাত-পাত বিক্ষক বা লোকচাতার বিষয়ক সাহিত্যও নয়। গণসাহিত্য জিনিসটাকে আরও বেশী ব্যাপক ভাবে দক্ষিণে আমি ভ্যাক্ত। সাহিত্যের আসল কথা হইল জীবন। জীবনের সকল প্রকার স্পন্দনই সাহিত্যের নবরস বা নকুই কস বা নর লাখ রসের কেমনো না কোনোটা ভোগাইয়া থাকে। বেথানে-বেথানে জীবনের বেলা সেখিত্তেই, সেই থানেই কিছু-না-কিছু রস চুঁইয়াইয়া পড়িতেছে অর্থাৎ সেই থানেই কিছু-না-কিছু সাহিত্যের রস আসে।

জীবনের পরিচয় পাই কর্ণে। কর্ণযোগ হাজা জীবন থাকিতেই পারে না। চিত্তও একপ্রকার কন্কই বটে। বেথানে-বেথানে কিছু-না-কিছু কাম চলিতেছে সেইখানেই সেন্ধিত পাই জীবনের সাজা। মাহুৎক স্টাঙ্কশ বত কেনে সেন্ধিত পাই, তত কেনেই জীবনের স্পন্দন অজুতব করিতে পারি। আর গড় সঙ্গে কিছু-না-কিছু রসও চাপিতে পারি।

অর্থাৎ সৃষ্টিকার্যের সঙ্গে জীবন আর জীবনের সঙ্গে সাহিত্য চোপের দিনরাত জটল করিয়া গহিয়াছে। এই সৃষ্টি-জীবন-রসের চাকার চাত পড়িয়া মাত্রই সাহিত্যের কোম্বারাও দখল করা হইল।

সৃষ্টি-কাণ্ডের বিব্রকোণ

গণসাহিত্যের বেশারীকে তাই কেবল সৃষ্টিশক্তি আর সৃষ্টিকার্যের খজান করিতে হইবে। কিন্তু গণটা কি? কেহ বলে পরীব লোক, কেহ বলে নির্বাতিত নরনারী, কেহ বলে অশুভ জাতি। গণ বলিলে আমি বুঝি সব লোক, মোটা দেশ, সমগ্র বাঙালী জাতি। পণ্ডিতকে পণ্ডিত, নৃৎক নৃৎক, বড়লোককে বড়লোক, ছোটলোককে ছোট-লোক,—কেহই গণ-চৌহদ্দির বহির্ভূত নয়। দেশের সব লোক বাহা-কিছু সৃষ্টি করিতেছে তাহার সব-কিছুই গণসাহিত্যের রস ভোগাইতেছে। এই সৃষ্টি-কাণ্ডে আমি সেখিত্তেই বাঙালী জাতির বিব্রক। হাজার-ভুজা বাঙালী জাতির ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক সব-কিছুই বহীত গণসাহিত্যের দাতব ভিত্তি। কামেই মানুষি লোকসাহিত্য আর নৃত্যের রীতিনীতি-সাহিত্যও এই বিমূল সৃষ্টিকাণ্ড বিষয়ক বিব্রকোণের ভিতর আসিয়া পড়িতে বাধ্য।

লোকেরা সৃষ্টিকার্য হুঁড়ে নামজাম লোকের শাড়ী বা টিকির ভিতর। আমি সৃষ্টিকার্য হুঁড়ি মিলীর রামার আদার আর কুম্বোরে চাকার কাদার। তেঁকিতে থান কুটিলে হুঁড়িতে পলীনারী সৃষ্টির আনন্দ চাপিতেছে, আবার একদগের হুট-মিলী হাজের ধোরে ছোট বয়ের তাঁটা ঘুরাইতে ঘুরাইতেও থান-ভাঙার সৃষ্টি-মুখ উপভোগ করিতেছে। নৌকার মাঝি লোকে লোকে বোঝাঘোষ সৃষ্টি করিতেছে, আবার পাটের চাষও পল্লীস্থি পড়িয়া তুলিতেছে। রেলের মধু, বাসের কুলী, বহির্কানিষ্যের কোরাণী, বীমা-বাকসার হালাল—সকলের কামেই সৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে।

কখাটা স্টাঙ্কশ বৃদ্ধি রাখা ভাল। বিজ্ঞান-

সেবকের ল্যাম্পেরটরী ফুট করিবার হরকার নাই। আকাশচরীর বহুপ্রয়োগও উপেক্ষা করিবার কথা বলিতেছি না। দার্শনিকের তত্ত্ব-বিস্লেষণও স্তম্ভিকার্য্য সন্দেহ নাই। আর কবি, চিত্রকর ও সঙ্গীতের ওস্তাদ ইত্যাদিও স্তম্ভিকর্তা নিন্দ্য। কিন্তু স্তম্ভিকার্য্যের পরিধি আরও বিস্তৃত। কোনো প্রতিক্রিানে, গবেষণায়, মিউজিয়ামে, লাইব্রেরীতে, টোলে বা শায়রীতে স্তম্ভিকার্য্য আসিয়া পথ হুলিয়া যায় নাই। স্তম্ভিকার্য্যের প্রত্য বহির্ভেদে সেন হুড়িয়া অনন্ত পথে। পল্লী-কুটিরের হৌল-খরেও স্তম্ভিকার্য্য দেখিতেছি, আর যত্ন-সেবায়তের কারখানারও স্তম্ভিকার্য্য দেখিতেছি। পল্লীরার বোলবাহী গানেও স্তম্ভিকার্য্য মান্য হয়। আবার সার্ববৈতে নাচেও স্তম্ভিকার্য্য পরিচ্ছট।

শক্তিধরের আদমতুনারি

গণতন্ত্র শক্তির পুরুষ-নারী মাত্রই গণসাহিত্য-সেবীর “পূজ্যমান”। বাঙালী জাতির বাহারা গাহিতে পারে, নাচিতে পারে, গাহাইতে পারে, নাচাইতে পারে, তাহারা সকলেই গণসাহিত্যের “সেবাসে” ঠাঁই পাইবার যোগ্য। বাঙালার যে সকল নরনারী হাদিভেছে ও হাসাইতেছে, যত্ন দেখিতেছে ও সেবাইতেছে, — গণশক্তির উদ্বোধক হিসাবে তাহারা প্রত্যেকেই বহুবীর। যে সকল বাঙালী মাথার ছোরে “হা”কে “না”য়ে পরিণত করিতেছে, অথবা “না”কে “হা”য়ে ঠেলিয়া তুলিতেছে, যে সকল বাঙালী হাতের ছোরে গুরুত্বের “সোঁদ” উঠাইতেছে, নরনারী শাক করিতেছে, বনজল গোপাট করিয়া পল্লী কার্যে করিতেছে, চরের খোলা মাঠে চাব বসাইতেছে; যে সকল বাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্যের ছোরে পল্লীকে শহরে পরিণত করিতেছে, শহরের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ কার্যে করিতেছে; যে সকল বাঙালী কর্ণ-কৌশলের ছোরে অজ্ঞাতকুলঙ্গল নরনারীকে নামজালা নরনারীর আগনে বসাইতেছে;

যে সকল বাঙালী আত্মত্যাগের ছোরে, অশেষসেবার ছোরে, গলাবাখির ছোরে, লেখালেখির ছোরে অথবা পাণ্ডিত্য-পবেষণার ছোরে বুঝ-বাগ্মণ্যকে বড় বড় আত্মজাতিক ইচ্ছা পাইবার যোগ্য করিয়া তুলিতেছে, তাহারা সকলেই বাঙালী জাতির মহা-পুরুষ হিসাবে গণসাহিত্যের নায়ক-নাটিকা। গণ-সেবকের চোখে একমাত্র স্তম্ভ বা ব্যক্তি হইল স্তম্ভ, স্তম্ভিকর্তা, গঠনকর্মভাসম্পন্ন শক্তিবাহী চিত্তবীর ও কর্মবীর। গণসেবকের চোখে একমাত্র স্তম্ভ বা বস্তু হইল স্তম্ভশক্তি, প্রকৃতিকে উঠাইয়া পাঠাইয়া, ছলিছাকে ভাঙিয়া ছুঁয়া, স্তম্ভকে টানিয়া ছিঁড়িয়া নতুন করিয়া রূপ দিবার কর্মতা।

ডানপিটের বীরত্ব

এই ধরনের শক্তির ও স্তম্ভ নরনারী অজ্ঞাত সেবের মত বাঙালী সেনেও বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। চোখের ঠুলি পুঁজিয়া বাঙালার জেলায় জেলায়, পল্লীতে পল্লীতে, নৌকার ঘাটে, জল-মাঠে, পাহাড়ে উপত্যকার ঘুরা আবৃত্তক। দেখিতে পাইব যে, অনেক লোক অসংখ্য ক্ষুণ্ণকষ্ট সহিয়া দিনের পর দিন আবাহ করিতেছে, মাদ খরিতেছে, সন্দের ঢালাইতেছে। কে তাহাদিগকে সাহায্য করিল, কে তাহাদিগকে বাধা দিল, সে সব দিকে তাহাদের জ্ঞান নাই। সাহায্য পাইলে তাহারা তাহার সদ্যবহার করিতে পশ্চাদ্গম নহ। বাধা পাইলেও তাহারা বিচলিত হয় না। ধাক্কা খাইয়া, মার খাইয়া, কেল মারিয়াও তাহারা হাস ছাড়িতেছে না। পল্লী-মোড়লের কৌশল, পাড়াপড়ঙ্গীদের হিলো-পল্লনা তাহাদের নিত্যসহচর। তাহারা ছুঁলো ঝাঁটাইলে তাহাদের বহুবাহুবদের চোখ টাটাইতে থাকে। তাহা সত্ত্বেও তাহারা সটান হুক থাকে থাকে রাখিয়া নিঃশব্দ কর্তব্য পালন করিয়া চলিতেছে। রোষকে রোষ, ক্রোধকে ক্রোধ, রুদ্ধকে রুদ্ধ, কলকে কল, বিজয়কে বিজয়, পরাজয়কে পরাজয় তাহারা সবই সমানভাবে

বরদাস্ত করিতে অভ্যস্ত। তাহারা পাঁচ বা ষাইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ বা না হটক, তিন বা লাগাইতে তাহারা মূগটু।

এই ধরনের ডানপিটো লোক বাঙালী জাতির এখানে-ওখানে-সেখানে ছোট-বড়-মাকারি সকল প্রকার কর্ণক্ষেত্রেই নজরে পড়ে। ডানপিটোঙলা না থাকিলে হুনিয়া পঢ়িয়া হাইত। ডানপিটো না থাকিলে বাঙলা বেশও পঢ়িয়া হাইত। বকীর মনেই আন্দোলনের আলম বনিয়ায় হইল ডানপিটোর কর্ণ-কাণ্ড। ডানপিটোদের সঙ্গীতজ্ঞ জগতের সর্বত্র মানব জাতির দীবনগীতা বাড়াইয়া দিয়াছে। বাঙালী জাতির ডানপিটোঙলাকে হুঁড়িয়া বাহির করা, ডানপিটোদের বীরত্ব ও মহত্ব লম্বা সমাগ থাক, ডানপিটোদের ক্রতিত্ব সমূহের যথোচিত সন্মতি করা গণপুঙ্খার প্রধান সরঞ্জাম।

একজন ডানপিটোর বীরত্ব এইক্ষেত্রে উল্লেখ করিতেছি। সে সমবাহনগী, ব্যাঙ-প্রবর্তক ও বীমা-প্রবর্তক, বাবলা-ধুবড়র অধিকাচরণ উকিল। ধুবক-বাঙলা তাঁহার কর্ণকল্লার নিকট বেশকিছু কই। বসন্ত: ১৯০৫ সনের পরবর্তী ধুবক-বাঙলার ইতিহাস প্রকাশ্যাবধি বাঙালী ডানপিটোদেরই দীবন-কৃতান্ত।

তবখুয়োর দিগ্বিজয়

জনসংগৃহী আর জনসংগৃহিত কাষে আর-এক প্রকার নরনারী ডানপিটোদের মতনই পূজাযোগ্য। তাহারা চল্লিশ বটা টো টো করিয়া গুরিয়া বেড়ার, কোথাও আটক থাকে না। তাহারা পত্রীতে হুঁড়ি-তেছে তরীতরকারীর ক্ষেত, শহরে হুঁড়িতেছে ধ্বংসের জ্বালায়। তাহারা গাঁ হাড়িয়া আসিয়া বলিতেছে চরে, আবার চর ভাঙিতে না ভাঙিতেই ইন্ডের চালা মাথায় করিয়া ফের সিঁদা বলিতেছে ধাঁয়ে। তাহারা শহরে থাকিলে কখনো হুঁড়িতেছে আশ্রয়-বিস্তারের কর্ণক্ষেত্রে, কখনো হুঁড়িতেছে

রেলকর্ণচারীদের আকিসে, কখনো হুঁড়িতেছে শেয়ার-বাজারের হালাল-পাকার, আবার কখনো হুঁড়িতেছে চারের ক্যাবিনে। মারিতেছে তাহার। আত,তা, হুঁড়িতেছে তাহারা কিকির। শোকে বলে তাদেরকে 'জালাবও', আমি বলি 'তবখুয়া'। "তোমার কত তর শয়ন হইলখিরে।"

হুনিয়া বাড়িয়া চলিতেছে তবখুয়াদের টো টো করার ঘোরে। "গৃহে চ মধু বিবেত কিম্বৎ পর্তক ক্রক্ষেণ" ধরে মধু পাওয়া গেলে পর্তক হাইবার লরকার নাই। কিন্তু ধরে যে মধু মিলে না! চাই লেজত মধু-অভিমান। বনজঙ্গলে যে তবখুয়াদিগিরি করে নাই, সে হুনিয়ার কোথাও আর পর্বাত উদ্ভিবিভার জগতের জ্ঞান বাড়াইতে পারে নাই, দীবজন্তু-বিভারও উল্লেখযোগ্য কিছু করিতে পারে নাই। পাহাড়ে-পর্তুত যে মাঝার দার পায়ে কেলিয়া উংরাই-চড়াইয়ের সঙ্গে নিজ হাড়মাসের আত্মীয়তা কায়ের করে নাই, সে কখনো কোথাও হাড়-রহের বনি আবিষ্কার করিতে সক্ষম হয় নাই। এই যে বাঙলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে চাটা কোম্পানীর ইম্পাত-কারখানা দেশের স্বরং বদলাইয়া দিতেছে, তাহার পশ্চাতে আছে একজন দ্বন্দ্বদত তবখুয়োর পর্তক-পরিগ্রহ। তাঁহার নাম বাঙালী-নামে অজানা নয়। তিনি আশুও ইচ্ছা আছেন। নাম তাঁহার প্রশংসা বহু। থাকেন রাঙিতে। তিনি বোবনে বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-উপত্যকায় টো টো করিয়া না গুরিলে চাটার জন্ত শোহার বনি আবিষ্কৃত হইত না।

বনজঙ্গল বাড়াইতে চাও, অবচ গুইয়া থাকিবে সর্বদা নিজ কোটরে, তাহা সম্ভব নয়। তোমার দ্বারে আসিয়া দেশের লোক, হুনিয়ার লোক তোমাকে বাধা করিয়া দিয়া হাইবে, তাহা কল্পি কালে খটতে পারে না। বিজা বাড়াইতে চাও, "বাও সিঁদুরীয়ে কুদরশিখরে"। মত প্রচার করিতে চাও, "বাও সিঁদুরীয়ে কুদরশিখরে"। দেশের ইচ্ছা বাড়াইতে চাও, "বাও সিঁদুরীয়ে কুদরশিখরে।" চাই পর্দাটন,

চাই বোলাকাং, চাই ভর্কপ্রপ, চাই বাসাহাব, চাই হাডাহাতি, চাই পাভা-কমাকি,—বঙ্গপন্নীতে, ভারতে, এশিয়ায়, ইমোরামেরিকায়, আফ্রিকায়, ওশিয়ানিয়ায়। কতকগুলো “বাণ্ণা বোটা” বাঙালী ভবঘুরার নদী-পাতরানো, লাসর-ডিকানো, ছনিয়া-পরিভ্রমার সৌগতে বাঙালী জাতির বিড়া বাড়িয়াছে, অর্থ বাড়িয়াছে, আত্মা বাড়িয়াছে, রাষ্ট্রিক শক্তি বাড়িয়াছে। চাই আরও ভবঘুরা এবং ভবঘুরার দিগ্বিষয়, চাই ভবঘুরাদেরকে চুঁড়িয়া বাহির করিবার ব্যবস্থা, চাই ভবঘুরাদেরকে ইচ্ছা দিবার প্ররুতি। পশ্চাদ্ধিকারের আসরে আসন অস্থান ভবঘুরা-পুঙ্খ।

গ্যামড়ের ভবিষ্যনির্ভা

আর এক প্রকার শক্তির সরনারী জগতের চৌহদ্দি বাক্‌ইয়া বিজেছে। তাহার। মাসুলি সতে সার শেষ না। লোকজনের পছন্দ-সই কথা বলিয়া বাহবা পাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহাদের নাই। সার্বজনিক লোকপ্রিয় মতগুলিকে তাহার। অতিক্রোধান মত বিবেচনা করিতেই অভ্যস্ত। মন, বিন, পশ্চিম বঙ্গের বহিরা কোনো-একটা কথা অনবরত প্রচারিত হইতে থাকিলে, তাহা কালে গামা-সামা-ইসমাইল-আবদুলের বোলপমা হয়। অর্থায় মালটা পুরানো, অতি-বালি, একঘেরে আর জেতো না হইয়া গেলে বারইয়ারি-তলার আসরে তাহা বরদাও হয় না। কিন্তু, এই সব পতা ও বালি মতামতের প্রচারক বাহারা হয়, তাহার। ছনিয়ায় নতুন দাগ রাখিতে অসমর্থ। বারইয়ারিতলার সর্বজনপ্রিয় বর্ণন বা বিজ্ঞানভাষা জগৎকে বাক্‌ইয়া তুলিতে পারে না।

শক্তির সরনারী এই বারইয়ারিতলার হাততালি আর ববতের কাগজের লোকপ্রিয়তা অথবা নিজ পোড়ির ভিত্তিকার সাধুবাণ হখন করিবার দিকে প্রসূদ্ধ হয় না। মাথা তাহাদের সঙ্গ। সঙ্গারটা যে পথে চলিতেছে, লোকের। বাহা চাহিতেছে, জনসাধারণ বাহাকে সর্ববাদিসম্মতরূপে সেনের পক্ষে মঙ্গল

জনক বিবেচনা করিতেছে, হস্ত সেই সব জিনিষে বাস্তবিক পক্ষে উভতির বহুপাতি নাই। লোকের। আত্মও বাহা চাহিতে শিখে নাই, জনসাধারণ আত্মও যে সকল কর্ত্তপ্রাণী ও চিন্তাপ্রাণীকে বাহা বিজেছে, সেনের লোকের। আত্মও যে সব জিনিষ পদধলিত করিতে অগ্রসর, হস্ত সেই সকল অস্থান-প্রজ্ঞানেই ছনিয়ার কল্যাণ অবস্থানবী। এইরূপ চিন্তা করিতে বাহারা অভ্যস্ত, আর সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের নিম্ন-পন্ননা সহিতে ম্পষ্ট, এই ধরণের চিন্তা প্রচার আর তদুপযোগী কর্ত্তব্যবহার করে বাহারা বারইয়ারিতলার খোলা আসরে পাড়াইয়া সমবেত সরনারীর হুতা বাইতেও উঠায় না, তাহার।ই জনদুর্ভির বর্ণনবীর।

এই সকল হুতা-পেটাকরা, সার্বজনিক মতামতকে কলা দেখাইবার ক্ষমতাভাষা, বোয়াক্‌ হকমের তাহা তাহা চিন্তা ও কর্ত্তের প্রবর্তক লোকভাষাকে এক কথায় আমি বলি গ্যামড়। এই সকল গ্যামড় নিজ মাথায় সকল প্রকার কুৎসা-নিম্না বহিয়া সমাজ-বাইট-মন্দির-পরিবারের জন্ত নতুন নতুন পথ খুলিয়া ধরিতে পারদর্শী। তাহার। সোমা পথের পথিক নয়। গ্যামড়ের চিন্তাপ্রাণী পথে-বেগথে চলে, কাছের। সঙ্গে প্রেংগোপা নয়। কিন্তু এই সব অ-লোকপ্রিয় আর অ-সোমা চিন্তার ফলেই বঙ্গাসময়ে এক পল্লীমোড়লের ঠাঁইয়ে আগিয়া বাড়ি হইতেছে আর এক পল্লীমোড়ল, কোনো প্রজ্ঞান উপিয়া বাইতেছে, আর অস্ত-এক প্রজ্ঞানের দিগ্বিষয় চলিতেছে। গ্যামড়ের। ভবিষ্যপন্থী, বিপ্লবপ্রবর্তক সমাজ-বীর। এই সকল বীরদের সহায় পশ্চাদ্ধিকারের আসরে বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তি। সকল প্রকারে গ্যামড়-সর্বজনীয় আগুয়ান হওয়া বাঙালী পশ্চাদ্ধিকারের পক্ষে অস্ততঃ সেবাচ্ছান।

বাঙালী-সমায়ে গ্যামড় ম্পরিত্তি জীব। এই বঙ্গের এক জীবনের গ্যামড়-চুড়ামন্দির শতবার্ষিকী অগ্রসৃত হইতেছে। গ্যামড়-পুঙ্খ বাঙালী পশ্চাদ্ধিকার

নয়। তবিশ্বনিষ্ঠ, আর সমসাময়িক সমাজ কর্তৃক উপেক্ষিত, সেই বঙ্গবীর আশ্রমপ্রসিদ্ধ। "নবীন এশিয়ার জন্মভাটা জন্মেছিল বাকালার, চানিয়ার লোকে জানে তারে রামমোহন রায়।" আর এই পশ্চিম-মিশ্র বংশের ধরিয়া গুণমণ্ডলের নিপুণবিশ্বের বেধিতেছি এতোক পাঁচ-সাত বংশের পর-পর।

“আদিম” জীবীর

যে সকল শক্তির সৌলতে বাঙালী জাতি পড়িয়া উঠিছে, তাহার ভিতর “আদিম” নরনারীর শক্তি অন্ততম। হাজার-তুচ্ছা বাঙালী জাতির ইহারা একটা বড় ভুল। ডানশিটো-ভবঘুরো-গুণমণ্ডল হিসাবে ইহারা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাক-শুণ্ডিতে ইহারা আশ্রমও বেশী নয় বটে, কিন্তু ইহাদের শক্তি না পাইলে বাঙালার নরনারী আশ্রম অনেক বিধরেই বাটো ও দুর্বল থাকিতে বাধ্য। আদিমেরা কেহ বা চাক্ষুশ নামে পরিচিত, কেহ বা গারো নামে পরিচিত। পূর্ববঙ্গের লোকেরা এই সকল নাম-গুণালা নরনারীর কামের কথা বেশ কিছু জানেন। কুকী, কাছাকী ইত্যাদি আদিমদের কাককর্ণণ ঐ সকল শব্দে সুবিদিত। এই ধরনের সোটা জিন্দেব জাত আদিম নরনারীর অন্তর্গত। ইহাদের কেহ বা মুন্সী আর এতি রোঙ্গদের কাছে গুণ্ডাল, কেহ বা নৌকার হাতিসিঁরি করে। চাখ-আবাসে হাত অনেকেরই। পশ্চিম বঙ্গের বাঙালীরা মুণ্ডা, ওরাঁও আর শাঁওতালদের জীবন সম্বন্ধে আশ্রমকাল আর অনভিজ্ঞ নন। বিশেষ জায়ে শাঁওতালরা ত এক প্রকার নিপুণবিশ্বেরই চলাইতেছে। আঠার লাখ আদিমদের ভিতর শাঁওতালরা একাই প্রায় লাখ আটেক।

মুণ্ডা, ওরাঁও আর শাঁওতাল এই তিন জাতকে পশ্চিম বঙ্গের নয়া “জীবীর” বিবেচনা করা আমার দৃষ্টিতে। ইহারা শুণ্ডিতে প্রায় সাতক এগার লাখ। বছর চল্লিশেক আসেও এই জীবীরেরা প্রায় নশা ছিল। তখনকার দিনে নাক শুকিলে এই তিন জাত গাড়াইত

মার সাতক তিন লাখের কোঠায়। আর উত্তর-বঙ্গের জলপাইগুড়ি হইতে শুরু করিলে দিনাজপুর, মালদহ বীরভূম, বর্ডমান ও বাঁকুড়ার পথে মেদিনীপুর পর্যন্ত সোজা দক্ষিণে হাটরা আসিলে দেখিতে পাই সর্বত্রই মুণ্ডা, ওরাঁও, শাঁওতাল অথবা শাঁওতাল, ওরাঁও, মুণ্ডার ক্ষেত-পায়ার, আর ইহাদের সঙ্গে তথাকথিত বাঙালীদের হাটে-বাজারে লেন-দেন। মুণ্ডা, ওরাঁও, শাঁওতাল যেহেতু বাঙালীর করে চাকরাশী হয়, আর খটখটক মুণ্ডা গুণ্ডা বাঙালীর ছেলে এসবও করে। হানে হানে শাঁওতাল-শিঙা আর শাঁওতাল-বাঙালীর বো-আশালা শিঙা বাঙালীদের পাঠশালায় পড়িতেও যায়।

আর একটা মহার কথা, — একালের মুণ্ডাদের ভিতর শক্তকরা হাট জনই কিছু। ওরাঁওদের ভিতরও কিছু পরিমাণ ঐকল। আর শাঁওতালদের সমায়ে কিছু সংখ্যা আশ্রম-আদির কিছু বেশী। বছর দশেক আসেও অহুশাতগুলা ছিল অন্তরঙ্গ। তখনকার দিনে আদিম জাতির আদিম ধর্মই মুণ্ডা, ওরাঁও, শাঁওতালদের প্রধান ধর্ম ছিল। আদিমেরা এক হিসাবে বাঙালী হিন্দুধর্মায় মগন করিয়া বসিতেছে বটে, কিন্তু অপর দিকে বাঙালীর হিন্দুধর্মও আদিম সমায়ে নিপুণবিশ্বের চলাইতেছে। হিন্দুধর্মের নিপুণবিশ্বের ভারতীয় ইতিহাসের এক অতি সনাতন কথা। একালে “হিন্দুধর্ম” কর্তৃক অহুত প্রচার-কাথ্য সেই সনাতন নিপুণবিশ্বের দ্বারাই বানিকটা বাড়াইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। বস্তুতঃ কি চাখ-আবাস, কি বান-বাহন, কি কুটি-শিঙা, কি পংরে-পন্নীতে সঙ্গা-বিনিময়, কি গৃহস্থালীর কাককর্ণ, কি বীড়নীতির পুনর্গঠন—সকল ভরক হইতেই বাঙালী-আদিম অথবা আদিম-বাঙালীতে সম্মিশ্রণের কলে একটা ডাঙ্গা বাঙালার উন্নয়ন হইতেছে।

মুণ্ডা-ওরাঁও-শাঁওতালদের

“বাঙালী-করণ”

আদিমজাতকে বাঙালী বলিতে আশ্রম আশ্রম

অভাব নাই। ইহা আমাদের একটা অকৃত্রিম হাড়া আর কিছু নয়। চোখ খুলিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি যে, বর্তমান বিভাগে শতকরা দাত জনই আদিম, আর রাজস্বাধী বিভাগে হয় জন। কোনো কোনো জেলার অবস্থা অনুশাখ্যে আরও উন্নত। জলশাইগড় জেলার শতকরা পনের জনেরও বেশী এইরূপ। বাঁকুড়া জেলার অবস্থাও তেঁতবত। ইহার বাঙলা ভাষার কথা কহিতেছে। অপর দিকে ইহাদের জোতাল দরদ শব্দে বাঙলা ভাষাও ধানিকটা বাড়িয়া যাইতেছে। বাঙালী কারবার কাণ্ড পরাও ইহাদের দখল। বাজার-ঘাটে সেন-সেন, ঘাটে-মাটে সেন-সেন, বরকার সেন-সেন আর বর্ষকর্ণে সেন-সেন — এই সকল সেন-সেন বাহাদের সঙ্গে আমাদের অহরহ চলিতেছে, তাহাদিগকে অ-বাঙালী সম্বোধিয়া রাখা অভিমাত্র্য অ-বিবেচনা বা হুঁকিরচলনার কাহ। অধিকন্তু রক্ত-সমিশ্রণও আছে।

আর একটা কথা এইখানে তুলিলে চলিবে না। ১৮২১ সনে বাঙালী বামুন-কারেখ-বৈভের সংখ্যা ছিল লাফে বাইশ লাখের কিছু বেশী। ১৯০১ সনে এই সংখ্যা উঠিয়াছে একজিশ লাখের কিছু বেশী পর্য্যন্ত। অর্থাৎ তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর বাঙালী হিন্দু ১০০ হইতে ১০৭ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে যাত্র। কিন্তু এই চলি বৎসরে পশ্চিম-বঙ্গের আদিম জীবীর উঠিয়াছে ১০০ হইতে ৩১১ পর্য্যন্ত। যে হুগে বামুন-কারেখ-বৈভ বাড়িল সেফুলেরও কম, সে হুগে এই আদিমজা বাড়িল সওয়া তিন গুণের কাছাকাছি। বাড়তির হারটা দেখিলে হয়ত আশ্চর্য করা চলে যে, কালে আদিম জীবীরদের বৎসরই বাঙালী জাতির হাতলরহানীর হইয়া পড়িলে।

তাহাদিগকে “বর্ণপ্রভ” ব্যবস্থা বান্ধিক কোন কোন জাতের লোক বলা হইবে, তাহা এখনই কল্পনা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই। এখন হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর বাঙালী জাতিজন্মের আকার-প্রকার অনেক কিছু বদলাইবার কথা। কিন্তু

আদিমেরা ভবিষ্যতের বাঙালী সমাজের যে এক প্রধান বিনিয়ান হইতে বাধ্য, তাহা আশ্চর্য বেন লক্ষ্য। এইরূপ বুঝিয়া কাছে নারিলেই দুবক-বাঙলার গণ-সেবকগণ আর গণ-সাহিত্যসেবীরা পাকা গথে চলিতে পারিবেন। আদিমদের স্বত্বিকার্য্য অথবা বাঙালী-আদিম সমিশ্রণ-প্রযুক্ত নরনারীর স্বত্বিকার্য্য সবই খাটি বাঙালী “জাতি”র অন্তর্গত, — এই কথাটা আমাদের শিখিরে-পড়িরে শোকেরা আর রাষ্ট্রিক জননায়ক এবং সমাজ গবেষক ও অর্থশাস্ত্রী ইত্যাদি শ্রেণীর লোক বত শ্রুত রপ্ত করিতে পারেন, ততই আমরা গণ-স্বাধীনতায়, বদসেবকরূপে উঠাইয়া উঠিতে পারিব।

কারেখ-বামুন-বৈভের হাড়-মাস

দেখিতেছি যে, পরও বাহারা যোগ আনা আদিম ছিল, কাল তাহারা ছিল রক্ত-সমিশ্রণের ফলে মো-আলদা বাহোক-কিছু। আশ আবার তাহারা হিন্দুদের সনাতন প্রচার-নীতির প্রভাবে হিন্দু, হরত বা “অশুভ” হিন্দু। কিন্তু কাল তাহারা চাষের কাম করিতে করিতে, মাঝি-মিথীর কাম করিতে করিতে, গড়া গড়া নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-সমাজের কোনো-একটার অন্তর্গত। পরও আবার তাহাদেরই দাস, দায়, গুণ্ড, সিংহ ইত্যাদি উপাধির জোরে বৈভ, বৈভ, কারখ, ক্রিয়র এক এমন কি পতিত ব্রাহ্মণরূপে পরিচিত হইবার কথা। এই যদি বর্তমানে সমাজগঠনের দ্বারা হয়, আদিম হইতে কারেখ-বামুন-বৈভ পর্য্যন্ত, — তাহা হইলে কিছু পোদন হাটিয়া বৎসর ৭ সেফেক-হুয়েক-পাতক উন্মোচিত পারিলে কি দেখিতে পাতলা উচিত? আমকালকার দ্বারা কারেখ-বামুন-বৈভ, গুণ্ডকার মিনে গাহাদের অনেক “আদিম” — হুগা; গুণ্ডাও, গাঁওজানদের মাসফুলত ভাই যোগ হয় ছিলেন। অথবা হয়ত বা তাহাদের বৈধার্থেই বরকারজালা কোনো কোনো মো-আলদা নরনারী দ্বায়ে একালের উচ্চ-শ্রেণীর বাঙালী হিন্দুদের প্রণিতাময়ের প্রণিতাময়ে

জীবনলীলা চালাইতে অভ্যস্ত ছিলেন। এই সকল কথা হস্ত বা শ্রিতিকর নয়। কিন্তু বাঙালা দেশে গাহারা গণ-সাহিত্যের চর্চায় আশ্রয়ন হইতেছেন, তাহাদিগকে নির্ভয়ভাবে বাঙালী নরনারীর হৃদয়বাসের কোজিটা, আর তাহাদের কার্যাবলির গোড়ার কথাটা পাক্কাও করিবার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। সেকালের আদিমদের ভিতর যে-সকল ডানশিটো-ভবঘুরো-ভায়েফেরা দিব্বিবিদ্য চালাইয়াছে, তাহাদের রক্তমাংসের কিন্তু সেখিত্তেছি একালের কারেখ-বায়ুন-বৈদ্যের জীবন-লক্ষ্যে।

বাঙালী সমাজে আদিমদের প্রথম দান হাড়-দাস। দ্বিতীয় দান তাহাদের হাট-পার ঘোর। ক্ষেতের কাজ আর বনির কাজ, ধরিয়ার কাজ আর বন-জঙ্গলের কাজ ইত্যাদি বাওরা-পরা-সম্পর্কিত অনেক-কিছুই তাহাদের নিকট হইতে বাঙালীরা পাইয়াছে ও পাইতেছে। আদিমদের বোল-চালও চুচুরটা বা মণ-বিশ গুণা বস্তুভাষার চুকিয়াছে ও চুকিতেছে। আর হিন্দু-সেবসেবীর গৃহস্থালীতে আদিমদের সেব-সেবী, সন্তান, পোকাচার ইত্যাদিও নিঃশেষে ঘর করিয়া বসিয়াছে আর বলিতেছে। মাছাতার আমলে আর তাহার পরবর্তী যুগের কোনো কালেই আদিম-বাঙালীতে সাহচর্য ও পারস্পরিক আশ্রয়-প্রদান লুপ্ত হয় নাই। সহবাস আর সহযোগিতা ভ্রিকালই ছিল; আশ্রয় আছে। বিসত চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বর্তমান যুগের বঙ্গমাঝেও এই কমিশ্রণের মোড়ই দ্রুত ও প্রবল বেগে বহিতেছে।

বাঙালার নরনারীর রক্তমাংস মজবুৎ হইতেছে। বাঙালী জাতি বাড়িয়া চলিতেছে। নয়া বাঙালার গণ-সেবকেরা আশ্রয় হউন। আপাদী পাচ-সাত-মণ বস্ত্রের ভিতরই যদি ঘাট্টিক পাণ-করা হুণ্ডা, ওরাও বা শীওতাল কলিকাতার রেইল্যাটে বসিয়া চা বাইতে শুরু করে, অথবা রাইটার্ বিজিভের কোনো কোনো ঘরে বলিয়া কেরানিসিরিতে পক্ষা রোজদার করিতে থাকে, তাহা হইলে স্বক-বাঙালার অঙ্গসমসবকসনের

পক্ষে বিচলিত হইবার কারণ নাই। তাহার বাঙালী জাতিরই “ভুজি” বাড়াইবার নতুন বহুব্রহ্মণ কাশ করিবে। “বাঙালী-করণ” যে-যে প্রণালীতে মূদ-মুগ্ধের ধরিয়া চলিয়াছে, সেই সকল প্রণালীতেই আশ্রয় চোখের সামনেই চলিতেছে। “বাঙালী-ভুজ” আদিম নরনারীর সংখ্যা বাড়িলে বাঙালী সমাজের সীমানাই বাড়িবে।

পতিত্ জাতির বঙ্গ-দেশ

বাঙালী জাতিকে যে সকল নরনারী গড়িয়া তুলিতেছে, তাহাদের ভিতর “পতিত্” জাতিগুলি অন্ততম। পতিত্ জাতি মলে পূব পূব। তপ্তিতে ইহার চূরানী লাখ, অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান-সম্বন্ধিত মোটা বাঙালী জাতির ছয় ভাগের এক ভাগ। আর যদি একমাত্র হিন্দু-বাঙালীর নাক শুদিত্তে ব্রুক করি, তাহা হইলে শতকরা প্রায় আটত্রিশ জনই পতিত্ শ্রেণীর লোক।

এই পতিত্ জাতির স্রষ্টাশক্তি জ্বর। ইহাদের ভিতরকার ডানশিটো-ভবঘুরো-ভায়েফেরা বেশ করিত্-কর্মা। আদিমকে বহুকট করিলে বাঙালীর যেমন চলে না, পতিত্ জাতির সঙ্গে অঙ্গসমসব কারণে হইলেও সেইরূপ বাঙালীর চলিতে পারে না। পতিত্ জাতি কেলিবার লোক নয়। নাম করিলেই যে-কোনো মাতঙ্গরহানীর লোক বুঝিবেন যে, পতিত্ বাদ মিলে বাঙালীর একটা বড় মোড়াই কাটা ইয়া যায়। জেল-কৈবর্ত, কণু, জেলি, ঝালো-মালো ইত্যাদি শ্রেণীর লোক প্রায় বার লাখ। বাঙালার সম্ভূ গড়িয়া তুলিবার কারণে এই সকল পতিত্ জাতি কতিপয় হ্রবিসিত। মাড়ে এগার লাখ আদিমের ভিতর মণ লাখ হইতেছে হিন্দু। ইহার দকমেই পতিত্। আদেই বুঝিয়াছি যে, আদিমজা বাঙালী জাতির আদ্য পতি বিবেক। নমঃসূত্রের কর্তৃকমতা ও কতিপয় লগে অঙ্গ বাঙালী পূর্ববদে অন্তত এক-জনও আছে কিনা লগেহ। নমঃসূত্রেরা শুপ্তিতে

বিশ লামেরও বেশী। এই জাতি “অশুভ্র”। এইরূপই অশুভ্র বাঙ্গালী, পোম, মুচি, বাউরি, ধোবি ইত্যাদি। অশুভ্রতার আকার-প্রকার রকমারি বলা বাহুল্য। কিন্তু নরশূন্য সমেত ইহারা প্রায় সাতার লাখ নরনারী। বাঙালী জাতির চাষ-আবাদ, বাঙালী জাতির বাহুবল, বাঙালী জাতির ধর-দ্রব্য, বাঙালী জাতির মল-বাসিষ্য সবই অনেকাংশে এই সাতার লামের হাত-পা’র জোরে আর মাথার জোরে পড়া। অপর দিকে ডোম, হাঁড়ী, মেঘর, ধাড়, কাড়ুয়ার ইত্যাদি শ্রেণীর লাখ পাঁচেক নরনারীকে হাজার-কুছা বাঙালী জাতির অস্ত্রতন বিপুল ভূমরূপে সঞ্চন। না করিলে গোঁরা-গুনি আর নরশূন্যতার পরিচয় সেওয়া হয় মাত্র।

আমল কথা, পুরা-অশুভ্র, আধা-অশুভ্র, সিকি-অশুভ্র, নিম্ন-অশুভ্র, মনির-প্রবেশে অনবিকারী, মল-চপের বর্ধিত ইত্যাদি পতিত শ্রেণীর সকল হিন্দুই আর্থিক বাঙলার নিরেট বনিয়াদ। বাঙালীর জীবন-বস্তু, বাঙালীর কৃষ্টি, বাঙলার নরনারীর আর্থিক বিকাশ, বাঙলার সভ্যতা-ভাব্যতা — লব-কিছুর সঙ্গেই এই পতিত জাতির হাত, পা, মাথা আর কষয় লুপ্তকৃত। অশুভ্রজ্ঞানার স্পর্শহীন হইবামাত্র বাঙালী জাতি পক্ষ প্রাপ্ত হইতে বাধ্য। গণসাহিত্যের গবেষক ভিলাবে বাহারা বাঙালী জীবনের স্পন্দন চুঁইয়েছেন, তাঁহাদিগকে এই সকল পতিত জাতির ক্রুতিক ও বৃষ্টিপত্তির ইচ্ছা সঘর্ষে সম্মান হইতে হইবে। বাঙালী-সভ্যতার পতিত জাতিজ্ঞানার দান অসীম।

আইনের ফলে পতিতের উদ্ধৃদ্ধাজ্ঞা

পতিত জাতিজ্ঞানার এক অংশ অবশ্য পূর্বে বিবৃত আদিম জাতিসমূহ। হিন্দুধর্মে বীজিত আদিমেরা সমগ্র পতিত সমাজের প্রায় আট ভাগের এক ভাগ। অবশিষ্ট অংশ নরশূন্য ইত্যাদির মত নানা জাতি ও উপজাতিতে বিভক্ত। এই সব জাতি ও উপজাতির কেহ বা আত্মকাল বৈতরণ্য দাবী করিতেছে, কেহ বা কক্ষিরের ইচ্ছা চাহিতেছে, আর কেহ বা বেদামূল

কারাই বনিয়া ঘাইতেছে। কিন্তু আশুনি হিন্দু সমাজের বিধানে ইহারা সকলেই অতি-নিম্ন শ্রেণীর লোক—এক কথায় পতিত। আত্মকালকার মিঠা নাম “হরিজন”।

ইহাদের পতিত নাম আর কতদিন থাকিবে, বলা কঠিন। তবে পতিত-পাবন সরকারী আইন-কানূনের বিধান, — ইহারা “বামুন-কারেখ-বৈত” অথবা “বৈত-কত্রি” ইত্যাদির পূর্ব না পাইয়াও তাহাদের সাম্প্রদায়িক ইচ্ছা পাইতে চলিল। এমন কি পতিতদের শেহন শেহন না ছুটিলে কারেখ-বামুন-বৈতেরা হাত রাষ্ট্রীয় জীবননীলা সম্বরণ করিতে বাধ্য হইবে। অর্থাৎ বাঙালী জাতিতে আপাদী ভবিষ্যতে বাহারা গড়িয়া তুলিবে তাহাদের তিত্তর পতিততা। অবরমত পতিত। এই পতিতকে অস্বীকার করা অথবা এই পতিত সঘর্ষে অস্ত্র বা নিরপেক্ষ থাক। চরম আহাম্মুকির পরিচয় হইবে। কারেই গণস্বীকৃতির পূজারিতা পতিত-পূজার উদ্ভিষ্টা-পক্ষিয়া লাগুন। পতিত-পত্তির যথোচিত সঞ্চনার সময় আসিয়াছে। সরকারী আইন-কানূনের পাল্লায় পড়িয়া এইবার হিন্দু-সমাজ সভ্য সভ্যই সমস্ত-মুখো হইতে চলিল।

পতিততা সাম্প্রদায়িক পক্ষে কাহারো ? বাঙালী সমাজের সোড়ার কথা আদিম জাতি। এই আদিম নরনারীরা ধাপে ধাপে উদ্ভিষ্টাছে। অসংখ্য রীতি-সমিগ্রণের ফলে, অসংখ্য রক্ত-সমিগ্রণের ফলে আদিমজ্ঞানার “বাঙালী-করণ” সঞ্চিত হইয়াছে। অবাঙালীকে বাঙালীতে রূপান্তরিত করিবার বর্তমানে প্রাণালী ও কর্মকৌশল আছে, তাহার ভিত্তর আদিম-জ্ঞানার পক্ষে পতিত জাতির অবস্থা পর্য্যন্ত উঠা অস্ত্রতম। হিন্দু-সমাজের সর্গনিম্ন জুবে আসিয়া দাঁড়াইতে আদিম নরনারীর অনেক দিন লাগিয়াছে। নরশূন্যের ভিত্তর, পোমের ভিত্তর, ডোমের ভিত্তর, হাঁড়ীর ভিত্তর এই ক্রমিক উত্থানেই কোনো কোনো ধাপ দেখিতে পাইতেছি। বাঙালী জাতির “কৃষ্টি” নইবা বাহারা সৌরব করেন, তাঁহাদের পক্ষে আদিম জাতির

উন্নতি ও বাক্তি সেবিয়া বাঙালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবিত্ত হওয়া উচিত। এই উন্নতি ও বাক্তিরই অস্তিত্ব প্রতিদ্বন্দ্বি হইতেছে পতিত্বের উৎসাহ। মায়াশি হিন্দু-সমাজের ব্যবস্থা এই উৎসাহে ঘটে শতাব্দীতে বোধ হয় আর ইকি! কিন্তু পতিত-পাবন আইনকানূনের দ্বারা এই উৎসাহে হাতেরাতি পতিত পাকিয়া বাইতে বাধ্য। পতিত নরনারীর জীবন-রুজিতে বাঙালীর কষ্ট দারপনবাই পতিত্যাভ করিবে, আর দিকে দিকে বাড়িতে থাকিবে। বাঙালীর গণ-সেবকের পক্ষে আর এক নতুন জের বৃহত্তর বন্ধের অভ্যুত্থান সেবিয়া জরুরি করা কর্তব্য। পতিত্বের ডাবশিটো-ভবদুরা-ভ্যাগফেরাও আশত হউন।

নিরক্ষরের ছনিয়া

বাঙালী জাতির তৃতীয় শতা হইতেছে নিরক্ষর নরনারী। নিরক্ষরদের পতিত্ববোধ, কর্তব্যমতা আর কৃতিত্ব গণধর্মী মাত্রের পক্ষে দ্বিগুণে প্রাধান্যবোধ্য। প্রথমেই জানিয়া রাখা ভাল যে, বাঙালী জাতির পাঁচ কোটি মণ লাখের ভিতর চুরাত্তর লাখ মাত্র লিখিতে ও পড়িতে পারে। অর্থাৎ একশ' নরনারীর ভিতর ৮২ জনই নিরক্ষর। অনেক সময় আমরা মনে করি যে, উঁচু জাতের হিন্দুরা বুকি সবাই লিখিতে পড়িতে পারে। এই ধারণা ঠিক নয়। এই হিসাবে বৈষ্ণবরা সব-সে সেবা। কিন্তু বৈষ্ণব-সমাজেও হেগে-বুড়া আর খ্রী-পুন্স একসঙ্গে শুনিবে দেখা যায়, শতকরা ৬৩.৫ জন লিখিতে পড়িতে পারে। অর্থাৎ বৈষ্ণবের ভিতর তাদের একভাগ নিরক্ষর। তাহার পর ঠাই বাসুদেবের। এই সমাজে অর্ধেকের বেশী নিরক্ষর। নীচ কবিয়া বাহির করিলে দেখি যে, শতকরা ৫৫.৫ জন বাসুদেব লিখিতে পড়িতে পারে না। আর কাম্বো-বের অবস্থা বাসুদেবের চেয়েও নীচে — অবশ্য আর নীচে। এই সমাজে শতকরা ৬০ জন নিরক্ষর। অজ্ঞাত সখ্যাত-বড় হিন্দু জাতগুলার ভিতর বাহ্যিক সমাজে

শতকরা ৭১.৬ জন, আর নমঃপুত্র সমাজে শতকরা ২১.৮ জন নিরক্ষর।

মুসলমানদের ভিতর বাহ্যিক সৈয়দ “জাভের” লোক তাহাদের অবস্থা নমঃপুত্র আর মাফিয়াদের চেয়ে উন্নত। সৈয়দের ভিতর শতকরা ২৭.০ জন লিখিতে পড়িতে পারে অর্থাৎ ৭২.৭ জন নিরক্ষর। আর “মুসলিম” (জোলাহা) মুসলমানদের অবস্থা নমঃপুত্রের সমান। এই সমাজে শতকরা ২১.১ জন নিরক্ষর।

ছনিয়ার অজ্ঞাত বেশেও নিরক্ষর আছে। ভারতের অজ্ঞাত আছেই, এমন কি ইয়োরোপেরিকারও আছে। নিরক্ষর ভারতের অবস্থা নিরূপ —

১। বিহার ও উড়িষ্যার নিরক্ষর শতকরা	২৪.৮ জন
২। মূলপ্রদেশে	২৪.৬ ”
৩। পাঞ্জাবে	২৪.১ ”
৪। মধ্যপ্রদেশে	২৪.০ ”
৫। আসামে	১২.২ ”
৬। মাদ্রাজে	১২.২ ”
৭। বাঙালার	১২.০ ”
৮। ব্রহ্মদেশে	৬.২ ”

সোটা-ভারত একত্র করিলে শতকরা ২০.৬ জন নিরক্ষর দাঁড়ায়। ভারতবাসীর ভিতর অধিকাংশে জাতই বাঙালীর চেয়ে জাত-হিসাবে বেশী নিরক্ষর। তবে জমজের অত কোথাও,—গীন ইত্যাদি এশিয়ার অজ্ঞাত বেশ এবং আফ্রিকার মুহু-কৃত্য বাসে—বাঙালীর চেয়ে বেশী নিরক্ষর জাত নাই। ভারতের বহির্ভূত নিরক্ষর ছনিয়ার মাপ নিরূপ —

১। ইজিপ্টে নিরক্ষর শতকরা	৮৫.৭ জন (আফ্রিকা)
২। পর্তুগালে	৬৫.২ ” (ইয়োরোপ)
৩। মেক্সিকোয়	৬৪.২ ” (আমেরিকা)
৪। সোল্ডিয়ারে কপিয়ার	৪৮.৭ ” (ইয়োরোপিয়া)
৫। গ্রীসে	৪৩.০ ” (ইয়োরোপ)
৬। স্পেনে	৪০.০ ”
৭। ফ্রান্সেরিয়ায়	৩২.৭ ”

৮। পোল্যান্ডে	শতকরা ৩২.৭ জন (ইয়োরোপ)
৯। সিঙ্গাপুর	৩২.৭ „
১০। ইতালিতে	২৬.৮
১১। লাক্সেমবার্গ	„ ১৮.৮
১২। হাঙ্গারিতে	„ ১৩.০
১৩। এস্তোনিয়ায়	
১৪। বেলজিয়ামে	„
১৫। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে	৬.০ „ (আমেরিকা)
১৬। ফ্রান্সে	৫.২ „ (ইয়োরোপ)
১৭। কানাডায়	৫.১ „ (আমেরিকা)
১৮। অস্ট্রেলিয়ায়	„ ১.৭ „ (অস্ট্রেলিয়া)

যেথা বাইতেছে যে, নিরক্ষরতা ভারতবাসীরই একচেটিয়া নয়। বাঙালীরা এই সম্বন্ধে গ্রন্থিয়ার একমাত্র পানী জাত নয়।

কর্মক্ষমতার নিরক্ষরের গৌরব

যাহা চটক, নিরক্ষরগুলোকে ব্রট্টা বলিলে লোকের মনে ঝটকা লাগা স্বাভাবিক। কিন্তু ঝটকা লাগাটা লিখিত-পড়িত নর-নারীর অস্ত্রতম সুখ-সুখি বিষয়ে। একই চোখ বুলিয়া দেখিলেই নিরক্ষর নর-নারীর দৃষ্টিপতি সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ থাকে না। আবহমান কাল ধরিয়া নিরক্ষরেরা গ্রন্থিয়ার পড়িয়া আসিতেছে। আজও জনজন্মের সর্বত্র বেথানে-বেথানে নিরক্ষর নরনারী বৈশিষ্ট্য অথবা অল্প-বিস্তার দেখা যায়, সেই সকল জনপথেও নিরক্ষরের হাত, পা, মাথা, কদম্ব দেশকে দেশ, জাতিকে জাতি পড়িয়া তুলিতেছে। জনশিতা-ভবন-শ্রম-শ্রম-শ্রম শ্রেণীর নরনারী নিরক্ষর গ্রন্থিয়ার বিস্তার।

বাঙালী জাতির শতকরা ৮০ জনের ভিতর ঢাবী আছে, নহুঁ আছে। তাহাদের কেহ বা মিস্ত্রী, কেহ বা মাঝি, কেহ বা তাঁতী, কেহ বা জোলাহা। গড়বণিক, সুবর্ণবণিক, সাহা, ডিলি ইত্যাদি বেশারীর জাতও নিরক্ষরের দলে আছে। এই দলে কিছু আছে, ফুলমান আছে। আদিবাসের অনেকে ও

নিরক্ষর বটেই, পড়িতদের অবস্থা আদিবাসেরই কাছাকাছি। অস্ত্রে পরে কা কথা, যার বৈত, বাহন আর কারেখরাও নিরক্ষর সমাজের বেশ-কিছু হিঙ্গা দখল করিয়া আছে। অর্থাৎ বাঙালী জাতির আর্থিক, সামাজিক, আর্থিক বা রাষ্ট্রিক সকল কাজেই নিরক্ষরেরা কিছু-না-কিছু ইচ্ছন ঘোঁসাইতেছে। পাঁচ-কোটি মণ লাখ লোকের পড়িত-সামর্থ্য বা অশক্তি-অসামর্থ্য, তাহাদের কীষ্টি-অকীষ্টি, জর-পরাজয় সবই নিরক্ষরের হাড়-মাংস, মাথার ঘোর আর হিয়ার ঘোরের উপর নির্ভর করে। একমাত্র লিখিত-পড়িতের চুরাতর লাখ নরনারীর সৈলতে বাঙালী জাতির জনসম্পদ পড়িয়া উঠিতেছে না, শিল্প-শিল্প-সাহিত্য পড়িয়া উঠিতেছে না, স্বরাষ্ট্র-স্বাধীনতার আন্দোলন পড়িয়া উঠিতেছে না।

লিখিত-পড়িত না জানিলে অনেক বিষয়ে মাহুনের অল্পবিধা হয়, একখাটা ঠিক। কিন্তু লিখিত-পড়িত না জানিলে নরনারী যে একদম আনাড়ি, আহাম্মুক বা মূখ-খাকে একখাটা পুরা-পুরি অটিক। নিরক্ষর নরনারীকে অশিক্ষিত সম্ভিয়া রাখা লিখিত-পড়িতের লোকজ্ঞানার একটা জ্বর আহাম্মুক। আর ইহা দান্তিকতা ও বটেই।

কর্ম-কাণ্ডের শিক্ষালয়

লিখিত-পড়িতেরা চালায় কলম, নিরক্ষরেরা চালায় লাঠল, কুলো, হাপর, লাঁতা। লিখিত-পড়িতেরা আদালতে উকিলী করে, নিরক্ষরেরা হাটে-বাজারে গুণ্ডা কেনা-বেচা করে। লিখিত-পড়িতেরা নাকী টিপিয়া গুণ্ডা সেহ, নিরক্ষরেরা কাদামাটি দিয়া মাগুয় গড়ে, কাদোয়ার গড়ে, ঘর-বাড়ী গড়ে। কলম চালাইতে, আদালতে দল-বান্ধি করিতে, নাকী টিপিতে যদের বী খরচ হয়, বুদ্ধি আবতক হয়। ইহা অধীকার করিবার দরকার নাই। কিন্তু লাঠল চালাইতে, বাজার-হাটে কেনা-বেচা করিতে, ঘরবাড়ী তৈয়ারী

বা বেহাষিত করিতে, যাহা ধরিতে আর নৌকা বাহিতেও মন্থনের নী লাগে যখন নদ, বৃষ্টির দরকার হয় বেশ। লিথিয়ে-পড়িয়েরাই কোনো যেনে কোনো সমাধে একমাত্র শিক্ষিত নয়। নিরক্ষরেরাও শিক্ষিত বটে। হাতে পায়ে কাম করিতে করিতে যে সব চাষী, মিস্ত্রী, মাঝি, ঘরানি, জেলে, বেশারী গড়িয়া উঠে তাহারা এই সকল কর্মকাণ্ডের বিভাগেরই চূড়ান্ত নিকার অধিকারী হয়। অবশ্য লিথিতে পড়িতে পারে না,—এই একটা অসুবিধা থাকিয়া বায় সম্বন্ধ নাই।

ঘাসের কাছে দাণিয়া থাকিতে থাকিতে আমিন, পতিহ ও অজ্ঞাত নিরক্ষরেরা কর্মস্বক ওত্থাদ্রোণ নতুন সমাধ গড়িয়া তুলিতেছে। আর রেলের কুলী, পাটকলের কুলী, চা-বাগানের মজুর, ইম্পাত-লোহার কারখানার মজুর ইত্যাদি নরনারী নিরক্ষরতা সত্ত্বেও বেশ শিক্ষিত হইয়া উঠিতেছে। তাহাদের হাতপায় ছোর ও বাড়িতেছেই, মাথার ছোরও বাড়িতেছে। সম্বন্ধ ভাবে কাম করিবার শক্তি বাড়িতেছে, লমচ-নিষ্ঠা বাড়িতেছে। এই সকল নতুন দৃশ্য বা সুনীতি নিরক্ষরদের চরিত্রে দেখা য়িতেছে। তাহার উপর আছে নিরক্ষরদের নাচ, গান, আমোদ, আলাদা হাসি-চাঁটা-বদিকতার উৎসব। আমিনদের, পতিভূদের এবং অজ্ঞাত নিরক্ষরদের সামাজিক উৎসবগুলো তাহাদের চরিত্র-বিকাশের পক্ষে, তাহাদের মাথা পাকোইয়া তুলিবার পক্ষে, তাহাদিগকে শিক্ষিত করিবার পক্ষে ব্যর্থপরনাই স্ফারান্। অধিকতর এই সকল মাচ-পানের পিন্ন-কলা বিবরক ইচ্ছা ও আছেই। বদিক হিসাবে নিরক্ষরেরা লিথিয়ে-পড়িয়েদের চেয়ে খাটো নয়।

নিরক্ষরদের জীবন-যাত্রা-প্রণালীকে ধাহারা অবজ্ঞা করিয়া চলেন, তাহারা গণপঞ্জির বিশাল কর্মক্ষেত্রটাকে ভুলিয়া রহিয়াছেন। হাজার-ভুজা বাঙালী জাতির সঠিকভাবে নিরক্ষরেরা সর্বদা গণসংস্করণের “পুখ-দান” দেশের লোককে সেবাশুভা শিখাইবার

প্রয়োজন নাই, এরূপ বলা উচিত নয়। বলা উচিত যে, সেবাশুভা না জানা সত্ত্বেও বাঙালী জাতির ভিতর যে সকল লোক লোক কর্মবীর, পুষ্টিগতিসম্পন্ন, চরিত্রবান্ নরনারী আছে, তাহাদের জীবনকে উপেক্ষা করিয়া চলিলে আমরা বীরকে পশু ও ঐহিকো যৌন থাকিতে বাধ্য। বৃহৎ-বাঙালার গণসংস্করণ নিরক্ষরকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। নিরক্ষর-ভানপিটো-তব্ধুরো-ভ্যানকুরের সঙ্গে লিথিয়ে-পড়িয়েরা হস্তম-মহরম চালাইবার ব্যবস্থা করুন।

বেনামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আকার-প্রকার

বস্তুতঃ পুষ্টিগতি, কর্মপটু, গঠন-মূলক কার্য ইত্যাদি সম্বন্ধে সাধারণতঃ লোকের ধারণা কিছু অস্পষ্ট। ইফুল-কলেজগুলার বাহিরে মানুষের মাথা যে বিকাশ লাভ করিতেছে, সেই দিকে চোখ অনেক সময়েই পড়ে না। এমন কি যে সকল ছাত্রছাত্রী পাঠশালায় সেবাশুভা করিতে যায়, তাহাদের অনেকেরই অধিকাংশ জীবন পাঠশালায় বহিষ্ঠৃত প্রতিষ্ঠানগুলার সাহায্যে গড়িয়া উঠে। বয়রের কাগজ হইতে, সভাসমিতি হইতে, সার্বজনিক একশালা হইতে তরুণ-তরুণীরা যে সকল তাজা খবর বা তাজা উৎপ্রেণা লাভ করে ঠিক সেই ধরনের খবর বা উৎপ্রেণা তাহারা ইফুল-কলেজের পণ্ডিত মহাশয়দের নিকট হইতে প্রায়ই বোধ হয় পায় না। বিদ্যুত পটিন-মিশ্র বংসরের ভিতর বৃহৎ-বাঙালার মহলে মহলে যে সকল কবি, মিস্ত্রী, গায়ক, লেখক, গবেষক ইত্যাদি জীবীর উত্তর হইয়াছে তাহাদের পেটের কথা বাহির হইয়া পড়িলে হস্ত কোনো দিন বেধা ঘাইবে যে, তাহারা বি-এ, এম-এ পাশের ছোটে অথবা মাষ্টারদের নিকট হইতে কেই কিছু পাইয়াছেন কি না সম্বন্ধ। অর্থাৎ ইফুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরেও একটা বেশ বড় মোহের বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদাই কাম করিতেছে। হাজার-ভুজা বাঙালী জাতির সঠিকভাবে জ্ঞান করিবার সময় সেই বেনামী

বিষয়বিভাগের ছাত্রছাত্রীগুলার আদমশুমারী করা আবশ্যিক। খবরের কাগজ, সাময়িক পত্রিকা, সভা-সমিতি, লাইব্রেরী, মিউজিয়াম ইত্যাদিতে যে সকল লোক মনুশ্য তাহারা বাঙালী জাতিকে বাড়াইয়া তুলিতেছে। এই ক্ষেত্রে ইঙ্গুল-কলেজের কেম-হওয়া লোকেরাও বাঙালা দেশের নানান কর্ণক্ষেত্রে বেশ স্থান্য করিতে পারিয়াছে। জানপিটো-ভবদুরো-গ্যামড়ো বেনারী বিষয়বিভাগেরই ডিগ্রী-পাণ্ডা লোক।

বাঙালা দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানে গবেষণার দ্বারা বাহ্যিক নতুন কিছু গড় করাইতে পারিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই বিষয়বিভাগের বেগম। বিজ্ঞান উপর নির্ভর করেন নাই। ঐহুস্ত বিজ্ঞান মনুশ্যের মৃত্যু, সমাধি ইত্যাদি বিজ্ঞান বাঙালী জাতির অস্তিত্ব পথ-প্রদর্শক। কিন্তু তিনি দেশ-বিশেষের কোনো ইহুস্তে লেখাণ্ডার ফলে এই সকল বিজ্ঞান দিকে মেজাজ খেলাইতে অগ্রগত হন নাই। তিনি কোনো-না-কোনো বেনারী বিষয়বিভাগের গড়ো লোক। আমাদের রাসেন্দ্রসুন্দর দ্বিবৌ বাঙালা দেশে যে সকল বিজ্ঞান ক্ষেত্র অমরতা লাভ করিয়াছেন সেই সকল বিজ্ঞান তিনি ইঙ্গুল-কলেজে গড়েন নাই। অধিকন্তু তাহাকে ইঙ্গুল-কলেজে অজ্ঞান বিজ্ঞান তেজস্বিত্য করিয়াই ভাঙ-কাপড়ের ব্যবস্থা করিতে হইত।

বাঙালা দেশে আত্মকাল হাজার-বারশ লাইব্রেরী আছে। ইহাদের অনেকগুলোই হুত নামমাত্র প্রদান্য। বোধ হয় প্রত্যেকটা গোটা শ' সেক হুতের পুঁথির সঙ্গ্রহালার ছাড়া বেশী কিছু নয়। কিন্তু তাহা সবেও জানিয়া রাখা উচিত যে, লাইব্রেরীগুলার আবহাওয়া না থাকিলে এই পচিশ-ছাত্তিশ বছর-বাপী হুস্তে আশোশন চলিতে পারিত না, বাঙালী সমাজে নতুন নতুন কর্ণের প্রতিক্রিয়া ও চিন্তার স্রোত হইত না। বেকার-সমতার সমাধানের ক্ষেত্র আদমশুমারী লাইব্রেরীর বই আর খবরের কাগজ অনেক অগ্রগত। এই সময়ে সর্বব্যপন আর সাময়িক

সাহিত্যের মুকলণ হাতে হাতে বরা পড়িতেছে। খবরের কাগজগুলো না থাকিলে বুক-বাঙালার মাথাও বাড়িত না, হুস্তও বাড়িত না।

রেডিও ও সিনেমা

এই ধরনের বেনারী বিষয়বিভাগের তিত্ত আত্মকালকার দিনে রেডিও আর সিনেমা দুইটা বড় প্রতিক্রিয়া। রেডিওর খবর, বক্তৃতা, মনসা, গানবাংলা ইত্যাদি গুলিয়া পৃথিবীর সর্বত্র অগ্রগত লোক মনুশ্য হইতেছে। আমাদের বাঙালা দেশেও রেডিও প্রধানতঃ কলিকাতার, আর কিছু-কিছু মনুশ্যে অনেক হোসে-বুড়ো ব্রী-পুলককে মনুশ্য করিয়া তুলিতেছে। রেডিওর কাটুটি বাঙালা দেশে ঐহুস্তে মেজাজ মেজাজ বাড়িতে থাকিবে। তাহাতে বাঙালী জাতির মাথা আর্থিক ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে, আর্থিক ক্ষেত্রে, এক কথায় জীবনের সকল বিভাগেই বাড়িয়া চলিবে। বেতার-প্রতিক্রিয়ার আওতার যে সকল নরনারী আদিয়া পড়িয়াছে তাহাদের অনেকেই নতুন নতুন জানপিটো, নতুন নতুন ভবদুরো, আর নতুন নতুন গ্যামড়ো ভাবে বাঙালী জাতির স্তম্ভ দল বাড়াইয়া তুলিতেছে। বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ তাহারা ও রেডিওর সৌন্দর্য অনেক-কিছু শিখিতেছে। বাহ্যিক শিখিয়ে-পড়িয়ে তাহারাও "পুনঃশিক্ষিত" হইতেছে। চাই দেশের সর্বত্র রেডিওর ব্যবস্থা। জ্ঞানবিজ্ঞানকে সার্বজনিক করিয়া তুলিবার এক প্রধান বড়ই একালে রেডিও। এই ব্যকলার বুক-বাঙালার লাপিয়া বাঙালা আবশ্যিক।

সিনেমাওলা ফিয়েটারের মাসকৃত তাই বিশেষ। তবে সিনেমার দেশবিশেষের নরনারীকে অগ্রগতভাবে চোখে দেখা যায় বলিয়া অনেক জিনিষ বোধ হয় বেশী চিত্তাকর্ষক হয়। আর কথা ও আসেই টকী বা রূপবাহিনীর মারকম। অজ্ঞান দেশের মত বাঙালা-দেশেও সিনেমার প্রভাবে বাঙালীর চিন্তা ও কর্ণশক্তি

বাড়িয়া দিয়াছে। গণপঞ্জির খতিয়ান করিতে বসিলে সিনেমার শিক্ষিত বাঙালী নরনারীর নাক শুঁটিয়া দেখা আবশ্যক হইবে।

অজ্ঞাত দেশের মত আমাদের দেশেও সিনেমার হবিচে-পথে হস্ত হেলেয়েদের মেজাজ কিছু-কিছু বিগড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু হু-চার-পন পণ্ডা লোকের ক্ষতিতে দেশও লোকের ক্ষতি হয় নাই। মধ্য বাঙলার কবিরা, নাট্যকারেরা, ঔপন্যাসিকেরা, গল্পলেখকরা সিনেমার রূপবাহীতে অনেক নতুন নতুন কল্পনার হালি পাইয়াছে। দেশোন্নতির অনেক তাহা তাহা কর্ণ-কৌশলও সিনেমা হইতে বুক-বাঙলার মগজে প্রবেশ করিয়াছে। অজ্ঞাত দেশের মত সিনেমার বাহা কিছু দোষ বা কু আছে তাহাও “নিমজ্জতীষোঃ কিরণেদিব্যকঃ”। কালেই ধীরামিগ্ধাকে লইয়া অভিবৈশী বাঁচা-বাঁচি না করাই ভাল। অধিকতর সিনেমারও সম্ভার সাধন করা খুবই সম্ভব। শিল্পবাদিকা বিদ্যক আর শিক্ষা-লীক্ষাক্রোড় ফিল্মের কাছে বাঙালীর মাথা বেলায়ে আবশ্যক।

প্রৌঢ়দের পুনঃশিক্ষা

নিরক্ষরদের নাচগানের কথা বলিয়াছি। বসন্ত: মিথিবে-পড়িয়েদের বেলায়ও এই ধরণের উৎসব জীবন-বুদ্ধির সহায়ক। বাজা, কথকতা, কীর্তন, মেলা ইত্যাদি ব্যবহার বেনামী বিশ্ববিদ্যালয়ের রুতিবই সেবিত হইবে। মালোবিত্ত-বসন্ত-কলারার বিরুদ্ধে লড়াই বিক্ষক বজ্জতা, বাজা-প্রদর্শনী, শিত-প্রদর্শনী, ব্যায়াম-প্রতিযোগিতা, সম্ভরণ-প্রতিযোগিতা, ত্রমণ-প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অল্পটানগুণাও বাঙালী জাতিকে মানাসিকে কুড়ী করিয়া তুলিতেছে। ইয়োরাবেরিকার সোল্ডিয়ারেট কুশিরা হইতে মার্কিন নৃত্যনাট্য পর্থা সর্বত্রই বেনামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গপত এই সব প্রতিষ্ঠান আত্মকাল হারপননাই সৌরব-শিল্প। বুজাঙলাকে পুনরায় পড়িয়া শিষ্টা বাহ্য

করিবার ক্ষমতা ও সবল দেশে “আচাট এলুকশন” বা প্রৌঢ়-শিক্ষার ব্যবস্থা খোরের সহিত চলিতেছে। এই সব ব্যবহার খালি বইই হইতেছে বেতার, সিনেমা, সবেলন, প্যাটন, গ্রামাণা, বজ্জতা ইত্যাদি।

জমিদার-মহলে প্রৌঢ়-শিক্ষা

এইরপ বুকমারি বেনামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে বাঙালী জমিদারদের সম্মুখে “প্রৌঢ়-শিক্ষা” কার্যে করিবার দিন আসিয়াছে। জমিদার-সম্প্রদায়ের ভিতর একটা পড়ীর নৈরাত্ত দেখা যাইতেছে। তাঁহাদের সাহায্যে বাঙলার নরনারী যে অসংখ্য নিকে লাভবান হইয়াছে এই কথা জনসাধারণ আর মনে আনে না। এমন কি জমিদারেরাও সে কথা ভুলিয়া গিয়াছে। এই যে বৎসর ত্রিশেক ধরিয়া বুক-বাঙলা বসন্তী আন্দোলনের ক্ষমতা বিশেষে যাইতেছে, শহরে-পল্লীতে কারখানা কার্যে করিতেছে, শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে, ব্যাক ঢালাইতেছে, বীমাব্যবসায় ত্রুটি হইতেছে তাহার প্রত্যেক অল্পটান-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই জমিদারদের “কবির” সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে হুজড়িত। জমিদারেরা বাঙালী জাতিকে শিল্প-নিষ্ঠ, বসন্ত-নিষ্ঠ ও বিজ্ঞান-নিষ্ঠ রূপে পড়িয়া তুলিতে বেশ-কিছু সাহায্য করিয়াছে। এই কথাটার ইচ্ছা মিতে না শিখিলে বুক-বাঙলার আগামী ভবিষ্যৎ হুশে চলিতে পারে না। এই কথাটার মর্ম বৃত্তিতে পারিলেই জমিদারেরাও বরসমাতে নিজেদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা লম্বে আত্মবান হইতে পারিবে।

বৎসরখানেকের ভিতর নতুন শালন-প্রণালী কার্যে হইতে চলিল। তাহার আওতার যে ধরণের হিন্দু-মুসলমান, কর্মজাতা-কর্মপ্রহীতা, হিন্দু-পতিত, জমিদার-প্রজা, “পুঁজিপতি”-চাষী ইত্যাদি সমস্ত উপহিত হইবার কথা, সেই সবল সমস্ত সমাধানের সময় জমিদারদের অতীত ও বর্তমান কৃতিত্বের কথা অনেক কাছে লগিবে। মুসলমানেরা, পতিতরা, প্রজারা,

চাষীরা, বর্জ্য-প্রাচুর্য। সকলেই জমিদারের আধুনিক শির-নিষ্ঠা, বাণিজ্য-নিষ্ঠা আর পুঁজি-নিষ্ঠার কিছু কিছু লাভভান্ হইয়াছে ও হইতেছে,—এই জানি। সাধারণো প্রচলিত হওয়া আবশ্যিক। জমিদার-মন্ডলেও এই জান প্রচারের ক্ষমতা পুনঃশিক্ষা প্রবর্তন করা কর্তব্য। বাঙালী দেশের কোশা কোশা বেসব জমিদার-গণ্ডা কারেন হইয়াছে, তাহার উদ্ধাসে জমিদারগণকে নতুন গাধন-ব্যবস্থা শাস্ত্রিক, নতুন রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক কল্পকৌশলে পাকাইয়া তোলা দরকার।

চাষী-সমাজের লোকমত গঠন

অজ্ঞাত সমাজাবস্থার তিতরও পুনঃশিক্ষার অবশ্য প্রয়োজনের ব্যবস্থা করা দরকার। ইচ্ছাসের মারফৎ শিক্ষা প্রচলনের ক্ষমতা বসিয়া থাকিলে চাষী-মন্ডলে বিজ্ঞ প্রচলিত হইতে এক শতাব্দী লাগিবে। আগেই বলিয়াছি চাষীরা নিরক্ষর হইতে কিছু তাহারা অনশিত নহে। চাষী-সমাজে মাথার ঘোর, চরিত্রের ঘোর, কর্মক্ষমতার ঘোর বেশ হুগুটে। তবে অর্থভাবে তাহাদের তিতর লেখাপড়ার ব্যবস্থা হুজুজলিত করা হু-চার-বশ বক্ষরের কাম নহে। একত্ব ইচ্ছা-পাটশালা চুপ্ চারপ্ বস কারেন হু ততই ভাল। কিন্তু একবার তাহার ভরসাও বসিয়া থাকা বুদ্ধিবাদের কাণ্ড নহে। চাষীদের ক্ষমতা চাই রেডিও-সিনেমা, বক্তৃতা-প্রদর্শনী, মেলা ইত্যাদির সাহায্যে স্বাভা-প্রচার, শিল্প-প্রচার, "লোকমত"-পঠন। বহুতঃ জমিদারদের ক্ষমতা যে বহুরূপে প্রয়োজিকা বা পুনঃশিক্ষা আবশ্যিক, চাষীদের ক্ষমতা ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থাই আবশ্যিক। প্রয়োজকের ক্ষমতা চাই হুত্বক রকম বেনারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাব্যতা।

প্রশাসনিক, কিংবা-সমিতি ইত্যাদি সমাজের মারফৎ পরীক্ষার জান বাড়িতেছে। ভবিষ্যতে আরও বাড়িবে। রপ্তানি-বিক্রয়ের দিকে চাষীদের বেলাল বাড়িলে ভাল। গহর-পরীতে শিল্প গড়িয়া উঠিলেও

চাষীদের উপকার। এই সব সম্ভবতঃ কিংবা-সমিতি নিম্ন আর্থিক উন্নতির নতুন হুদিশ পাইতেছে। তাহাদের জীবনের সঙ্গে বাঙালী শিখিয়ে-পড়িয়ে আর্থিক বোণা-বোণ কারেন হওয়া দরকার। তাহার এক বড় উপায় বেনারী বিশ্ববিদ্যালয়। গণসাহিত্যের সেবকেরা কিংবা-সমিতির দিকে নজর ফেলুন।

মজুর ও কারিগরদের যন্ত্র-নিষ্ঠা

মজুর-সমাজেও বেনারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নান্দা অহুতান আবশ্যিক। যন্ত্রনিষ্ঠা মজুরেরাই বাঙালী জাতির আদল প্রতিশিখি। নতুন নতুন কলকলার কথা, নতুন নতুন আবিষ্কারের কথা, নতুন নতুন মজুরি-ব্যবস্থার কথা, নতুন নতুন মজুর-সমাজের কথা মজুরদেরকে জানাইবার ক্ষমতা চাই রেডিও আর সিনেমা। যন্ত্রপাতির গাধা বিতরণের ক্ষমতা এই সবের বহল সম্ভাব্যতা আবশ্যিক।

তাহা ছাড়া বক্ষমন্ডলের পরীতে পরীতে যে সকল কাগজি, ভাটী, মিস্ত্রী ইত্যাদি কারিগর কুটির-শিল্পে মোতায়েন আছে তাহাদিগকে "শাসনিক-নতুন" ধরণের যন্ত্রের কামে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার ক্ষমতা চাই বেনারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা। শাসনিক-বিলাতী-মার্কিন সমাজের অহুতান এজিনিয়ারিং-প্রশস্তি জটিল ও দামী যন্ত্রপাতি আমাদের মাহুলি কুটির-শিল্পীদের কামে আসিবে না। এই সব কারিগর বহুগুণের ধরিয়া অতি-আর্থিক চরম কলকলার ব্যবস্থার অভ্যাস — এই সকল কলকলার "ঠিক পরবর্তী" অবস্থা বেঙ্গল হওয়া উচিত তাহার চেয়ে বেশী-কিছু করিতে সেলেই মাহাশুকি করিয়া বসাইবে। যন্ত্রপাতির এই সকল "পরবর্তী গাধা" সমাজে কারিগরদিগকে সম্ভাষ করিয়া তুলিবার ক্ষমতা চাই মেলা, সঙ্গ্রহালয়, বক্তৃতা, রেডিও ও সিনেমা ইত্যাদির সম্ভাব্যতা। অবশ্যক তাহে বলিয়া রাখিতেছি যে, যন্ত্রপাতির উত্থান, তার চেয়ে উত্থান আর সব চেয়ে উত্থান গাধা-গাধার সঙ্গে বোলাকাৎ

চালানে। বাঙালী এজিনিয়ার আর বড় বড় কারখানার কর্তৃকর্তাদের পক্ষে অস্বচিত নয়।

পুনর্গঠনের অ, আ, ক, খ

আগল কথা, অমিদার-মহলে, চানী-মহলে, মদ্র-মহলে, কুটির-শিল্পীমহলে, ডানপিটো, ভবঘুরো আর ডাম্ফ ট্রেনের কর্তাবীর ও চিত্তাবীর হুঁচার জন এখনই কালে বাহাল আছে। সর্বত্রই পুনর্গঠনের অ, আ, ক, খ, মূল হইয়াছে। তাহার্য পঞ্চপ্রবর্তক মত এই সকল সমাধে নতুন নতুন লবল ষাটিয়া চলিয়াছে। তাহার্য না থাকিলে বাঙালী জাতির ধ্বংস আরও বেশী হইত সম্ভব নাই। এক্ষণে এই সকল ডানপিটো-ভবঘুরো-ডাম্ফের কৃতিত্ব আরও বাড়াইবার ব্যবস্থা করা সরকার। গণসাহিত্যের প্রবেদক ও প্রচারকেরা বাঙালী জাতির বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর ভিতরকার নতুন নতুন কর্তৃপ্রবর্তক ও চিত্তপ্রবর্তকদের জীবন আলোচনা করিতে আগ্রহ হইল।

গণশক্তি ও গণসাহিত্যের বিবরণ

এই যে এত অসংখ্য পথে অসংখ্য রূপে ডানপিটো-ভবঘুরো-ডাম্ফেরা বাঙালী-জীবনকে চাষা করিয়া তুলিতেছে তাহার কাষা চাই, নাট্য চাই, গল্প চাই,

উপজাস চাই। হাজার-ভূজা বাঙালী জাতির শঠি-বিজ্ঞান আকারে-প্রকারে বাড়িয়া চলিয়াছে। এই বিজ্ঞান সময়ে ভিন্নকরেরা কৃষির সমাধহার করন, হুণতিয়া হাতুড়ি-বাটাগি ধরন। নুতক-সেবকেরা, অর্থশাস্ত্রীরা, সমাজ-তত্ত্বসেবীরাও এই বিশাল জীবনপ্রত্যয়ের সঙ্গে মঙ্গলের সম্মেলন চালাইতে বিশেষ রূপে ব্রতবদ্ধ হইল। আর সুবক-বাঙলার মনোমোহক-গণ আধিব-পতিত-নিরক্ষর বাঙালীর মহব ও বীরদের যথোচিত কদর করিতে অভ্যস্ত হইল। অপর দিকে রাষ্ট্রকেরাও এই সকল কোটি কোটি লোকের জীবন-বুড়ি জরীপ করাইবার উদ্দেশ্যে সরকারী শাসন-বিভাগের তলবিরে একটা দ্বারী "পাত-পাত" বিদ্যক গণের কার্যম করিবার ভ্রম আশোজন কল্প করন।

বাঙালী জাতি সকল ভদ্র হইতে গণপূজার উদ্ভূত হইল। গণসাহিত্যের চর্চা বহুনিষ্ঠভাবে ও ব্যাপকরূপে বাঙলার মাটিতে শিকড় বাড়িতে থাকুক। গণশক্তি ও গণসাহিত্যের বিবরণ দেখিয়া সুবক-বাঙলার মরনারী নবজীবন লাভ করিতে সমর্থ হইবে। হাজার-ভূজা বাঙালী জাতিতে আধিব-পতিত-হিন্দু-মুসলমান বা বলিয়া ডাকিতে দেখিবে। তাহার পর বাঙলার দেখা দিবে ব্রহ্মের বশে মাতঙ্গ মন্ত্রের উঠা, মহা-বলের বিরাট ধবি।



“হিমালয়ের স্বর্গভূমি” পত্রিকা

ত্রিভাষিনীকান্ত সেন

প্রাচ্য ভূখণ্ডে যে মহামানবের আদর্শে দীক্ষিত—
তার জন্মভূমি এশিয়ার প্রিয়তম রাষ্ট্র। শুধু ভগবান
সৌতম বৃদ্ধের মাতৃভূমি বলে নয়—সেবস্যাকের প্রিয়
বিহারস্থল বলে হিমালয়ের বক্ষে পদচিহ্নের মত
শোভিত নেপালকে স্বর্গরাষ্ট্রের পথ বণা হ’য়ে থাকে।
বিখ্যাত পণ্ডিত সিলভা লেভির মতে ‘নেপাল’
শব্দের মানে হচ্ছে — “The land leading to
Paradise”। বাংলার এই দিবা উপভাষা পত্রিকার
অঙ্গণে হয়েছে তাঁর। অল্পভব করেছেন — এই জায়গাটি

যকের যদি নির্মাচনের অবসর হ’ত তবে এই দেশ-
লোকের কাছেই জন্মালা পড়ত।

পরিভ্রামকের পক্ষে এতুপে নেপাল তীর্থভূমি।
সৈরিক-পর্যটনসানীরা নেপালের শৈব মন্দিরের আশে-
পাশে রুদ্রের অঙ্গুষ্ঠের মত খোঁচা-কোঁচা করেন। সারা-
দিন হস্তলিখিত পুঁথি পড়ে পুণ্যকোষা স্নাত হন না।
শৈব, শাক্ত-তান্ত্রিক এক বৈষ্ণব ভক্তগণের জগদ্বাসিনীতে
অদ্যা মন্দির দিনের পর দিন সুখরিত হ’য়ে উঠে।
সেবমন্দিরের লগ্না প্রায় হ’লোজাতের উপর — কারও



“হিমালয়ের স্বর্গভূমি”—নেপাল-উপভাষা

ভুলোক ও ছালোকের মিশন-ধর্ম। কবি-বদিত মতে তিন হাজার। বাস্তবিক এ উপভাষা সেবভূমি—
অলকাত্রে ইহা সৌন্দর্যে পরামিত করে এক বিরহী ভাব-বিশ্বাস ও সৌন্দর্য-স্বপ্নে এসে জন্মগ্রহণ।

নেপাল ভারতের অংশীভূত দেশের রাজ্য। সম্প্রতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের ফলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট নেপালের স্বাধীনতা স্বীকার করেছেন। বিগত মহাযুদ্ধে নেপাল ইংরাজ-রাজকে হুঁ লক্ষ লোকের সাহায্য দান করেছিল—সে মহাহতভবতা ইংরাজ তোলে নি। নেপাল-রাজ্য ইংরাজ-রাজের পরম মিত্রহানীর। British Legation এখানে একটা সেত্বার ভিবিথ। হিমালয় এ উপত্যকার সমস্ত বাবাহু ও বিধান অভিনবত্বে পরিপূর্ণ। আধুনিক সভ্যতার বহু উপকরণে এসে ভারতাক্রান্ত নহ—এসে যেতে বাপীর শকটের সাহায্য পাওয়া যায় না; নিমলা, দাঙ্খিলিও বা ‘চট্টাট’ নকল আবহাওয়ার স্পর্শ এখানে মনকে ধীর ক’রে তোলে না। প্রকৃতির অবগুপ্তিত সৌন্দর্য এখানে অটুট আছে; অজ্ঞেয়ী হিমশৃঙ্গের গজবেতনী নির্বিড় অরণ্যানীর অসীম আশ্রয়, ধ্বনিমুখর। আকাশ-গগার অশ্রান্ত প্রপাত — গিরিনদীর উচ্ছ্বাস লাভ বিগড়ের কোড়ে যে অপূর্ণ চিত্রকল্প রচনা করে, অজ্ঞাত বৈচিত্র্য তার কাছে কত সামান্য! ইংরাজ-রাজ্য ও নেপাল-রাজ্যের সমন্বয়ে একটি নীমানা সেওয়া আছে। সেখান থেকে নেপাল গভর্নমেন্টের ট্রেস শুরু হয়েছে। বীরগঞ্জে গিয়ে ‘pass port’-এর জন্ম চেষ্টা করতে হয়। উপত্যকার সঙ্গে এ জায়গাটি ‘টেলিকোনে’ যুক্ত — কাঠমাণ্ডু হ’তে হুকুম না এলে pass port পাওয়া যায় না। আমলেসঙ্গ পৌঁছে ট্রেনের রাস্তা শেষ হ’ল। এখান থেকে নেপালের বিখ্যাত ‘Terai’ শুরু হয়। মোটর বাস গভীর জলভেদ ক’রে অগ্রসর হয় — চারিদিকে মৃত্ত অতি চমৎকার — কোথাও চড়াই, কোথাও উৎরাই — এমনি ক’রে যত্নের মত ছুরিয়ে সেল ভ্রমণকার রাস্তা! সন্ধ্যা এসে পৌঁছলুম ভীমফেদী। একটা bungalow-তে আশ্রয় নেওয়া সেল। জায়গাটি সার্বজনীন, চারিদিকে ভীমকাং পাহাড়ের বেষ্টিত। এখান থেকেই ‘হিমালয় স্বর্গভূমি’ কাজার পথ শুরু হয়! পার্বত্য জাতিদের সাহায্য ছাড়া আর অগ্রসর

হওয়া যায় না। হিমালয়ের অস্ব-প্রত্যঙ্গ এবার যেন চারিদিকে সাওয়ার পথ বন্ধ ক’রে নেপালের উপত্যকাকে রক্ষা করছে। স্বয়ং শব্দর যেন এই চিম্ব-শিবিরের সামনে ত্রিশূল হতে দণ্ডায়মান! মাথা নত ক’রে বাহকদের সাহায্যে ‘চুনি’ চ’ড়ে অগ্রসর হ’তে হ’ল শিতর মত; — একবারে গামার সিঁট উঠে চারিদিক সেত্বের বাগ্গ হ’লুন। সেত্বদূর কুয়াসার ঢাকা — জুর্জের বনিকা। দৃষ্টি বন্ধ করছে! চারিদিকের বিশালত্বের কোড়ে যেন একটা আশ্রয় আকর্ষণ আরম্ভ করলে। সে অবস্থায় বোতান দুখিল — কলকাতার ট্রান-বাসপূর্ণ কুর কলরব বা স্বর্গকরোজ্ঞল হৃদয়াদি স্বর্গকালের মত একটা তুচ্ছ পরিহাস ব’লে মনে হ’ল! হুঁ-একটা ধামস্বার জায়গা আছে। সেখানে ছাড়পত্রের পরীক্ষা হয়। পরিণেবে একটা ট্রেসে সমস্ত ‘লগোজ’ ফুল সেবা হয়। গুণ-বিতাসের লোকে ট্যাঙ্ক-যোগ্য ভিনিষের মাড়ল সাবাত ও মাদার করে। নেপাল গভর্নমেন্টের এ’তে বেশ কিছু লাভ হয়। এমনি ক’রে নানা জায়গা ঘুরে ফিরে অবশেষে চম্পিরির ছড়ার উপস্থিত হ’লুম। অনির্জনচৌরী সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ এ জায়গাটি — বহুদূর সেবা যায় হিমালয়ের নৃশ ডেউয়ের মত চ’লে গেছে। মনে হয়, হঠাৎ পাহাড়গুলি যেন তরল হ’য়ে প্রকাণ্ড তরঙ্গশ্রেণী সৃজন ক’রে দুখিলগড়ে ছুটে চলছে। শিথতাওবের হৃদ যেন নরীরা হ’য়ে কুমাকে পরিব্যাণ্ড করছে। চারিদিকে কোন বিগড়তা নেই — প্রচুর কুমাররীতে পাহাড় ঢাকা — এই নিম্নভরাঘো কানে পৌঁছছিল অজ্ঞতভাবে আগণ্য পানীর কাকলি। এমন নিষ্ঠি আগণ্য কখন ও গুনি নি! — কত বিচ্ছিন্নবে রহিত পানী সেত্বতে পেশুম বলা হুসাধ্য। অগ্রণ নির্জন রাঘো এমন চমৎকার ধ্বনি-গালিতা সমন্বয়ের অভাবে বার্থ হ’য়ে থাকিল! বলা বাহুল্য পার্বত্য পানীর হৃদনে একটা বিশিষ্ট মাধুর্য আছে বা’ সমস্ত ভূমির পানীর থাকে না। আজ্ঞাজ যখন দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল তখন পানীগুলির বর্ন-মৌরবও যেন সে নির্বিড় পর্বত-শৃঙ্গ একটা মাদার

খেলা খেলছিল। লাগ-নীলের সমস্যা, সবুজ-হলুকের মিলন, বেগুনী, ধূসর ও নেবু হঠের সহজিতে বেন পাখীগুলি মন হরণ করতে ব্যস্ত হয়েছিল।

কার্মাভূ সত্বরে পৌছনুম রাজিরে। বৈজ্ঞানিক আলোকমণ্ডিত রাস্তাঘাট দেখে অবাক হ'য়ে পেশুর। বেশ প্রকাণ্ড সমতল রাস্তা — দুটিকে প্রচুর বিপণি ও গৃহসমূহের — হিমালয়ের পূর্বে কেউ আশা করতে পারে না। সকাল হ'লে এই পরীচাষ্য সম্পূর্ণভাবে উদ্ভূত হ'ল।

কবিতা আছে, ত্রিমাসির বকে নিহিত এই উপভাষ্যকাটি এক সময় একটা বিরাট ব্রহ্ম ছিল। বয়স্কদের এই উপভাষ্যকাটি স্মৃতি করেন। তাঁকে একটা অমিথিয়ার আকারে হলের উপর ভাসতে দেখা যায়। বহুশ্রী একথা শুনে তাঁকে সেখ'তে আসেন। কিছুকাল পরে বয়স্ক একটা ভাষণায় থাকলেন — সেটা বহুশ্রীর নিকট একটা ইঙ্গিত ব'লে মনে হয়। তৎকালে বহুশ্রী ভরবারি ঘাটা সেখানকার পাহাড় ছিন্ন ক'রে জন নির্গমের পথ ক'রে দিলেন। ক্রমশঃ সমস্ত জনই বেরিয়ে সেল—এবার ইন্ডা বালোপায়েই হ'ল। নেপালের এই অলৌকিক স্মৃতি-কথা সর্বত্র প্রচলিত আছে।

নেপাল-উপভাষ্য পনের মাইল দীর্ঘ। উপভাষ্য চারিদিক পর্যন্ত বেষ্টিত। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতগুলি যেন সাক্ষীরূপে এই সেবতুমির চারিদিকে দণ্ডায়মান। এগুলির উচ্চতা প্রায় ২৬,০০০ ফাটার ফিট হ'তে ২২,০০২ ফিট পর্যন্ত। নন্দাসেবী (উচ্চতা ২৫,৩৪৫ ফিট) নেপালের পশ্চিমে, ধবদগিরি (উচ্চতা ২৬, ১২৫ ফিট) চ'ল মাইল পূর্বে, গৌসাইহান (উচ্চতা ২৬,০১০ ফিট) ধবদগিরির ১৮০ মাইল পূর্বে, কাকদবাল্যা (২৮,১৪৬ ফিট) গৌসাইহানের ১০০ মাইল পূর্বে প্রবহীর সত ওত্র ভ্রমারমণ্ডিত হ'য়ে গড়ির আছে। তা' ছাড়া গৌরীশঙ্কর পূর্ব ত আছেই! নেপালের উপভাষ্য হ'তে চারিদিক ঘেঁষে মনে হয় এখানে বেন বিশ্বের একটা প্রকাণ্ড ঘরবার জুড়ে। চারিদিক হ'তে বেন ওত্রবেশ

কবিতা নিরীক্ষণ করছেন — আকাশে ও ভূতলে যেন একটা। সামাজিকতা — একটা। বিরাট আদর্শজন জুড়ে। দিনের পর দিন মানবের অন্তর এই ভ্রমার সম্পর্ক দেখে ভ্রমার্থ হচ্ছে। একটা বিরাট স্পর্শ পাওয়া যায় এখানে, বৃহৎ হ'তে ভ্রমার।

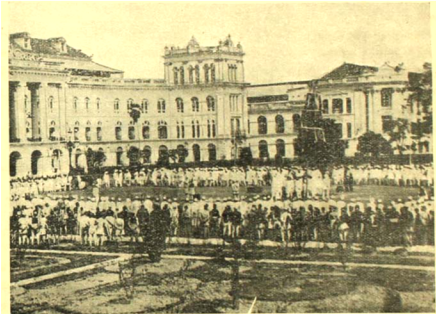
এই স্পর্শ যে সার্থক হয়েছে তা' উপভাষ্য পরিভ্রম্য হ'তে উপলব্ধি হয়। চ'এক দিনে এই তীর্থ-পরিভ্রম্য শেষ হয় না। তা'ও বিশিষ্ট অম্মমতি ও স্মরণ না হ'লে সম্ভব হয় না। এসেছে বিশেষী লোকের চলাফেরা সহজসাধ্য নয়। ইউরোপীয়দের পক্ষে মন্দিরাসিতে প্রবেশ সম্ভব নয়—ভারতীয়দের পক্ষেও স্বচ্ছ পতি সম্ভব নয়। কিন্তু তীর্থস্থান ব'লে ক্রমশঃ এসেছে স্থপরি-চিত হ'তে পড়ছে। আগন্তুকদের পক্ষে বাধা কাটান হুসাখা—এবং বা-কিছু আছে তার সন্ধান পাওয়া সুস্থি।

এ সময় ভ্রমারী পণ্ডিত সিলভ'। লেভি নেপালে উপস্থিত হন। তাঁরই আত্মকৃত্য নেপালের মহারাষ্ট্রের সহিত পরিচয়ের স্মরণ হ'ল এবং সেখানকার বিখ্যাত লাইব্রেরীর সন্ধান প্রবেশাধিকার পেশুন। এই প্রয়াসের প্রায় ৬০,০০০ হস্তলিখিত পুঁথি আছে এবং তারতর্ক্যে এমন কি এগিয়ার এটি অধিতীর গ্রন্থ-সংগ্রহ।

উপভাষ্যকাজিতে বিশিষ্টভাবে ব্রহ্ম হচ্ছে তিনটি নদর — গলিতপতন, কাঠমাণ্ডু ও ভাটগাঁও। তা' ছাড়াও চারিদিকে বহু মন্দির ও স্তূপ সন্ধান আছে। পাহাড়ের উপর দিয়ে সর্বত্র বাগরার রাস্তা আছে—এসব রাস্তা ইউরোপের সহ্য ভুলনা করতে দিয়ে কোন ইউরোপীয় পর্যটক বলেছেন — "Her lowest pass is higher than the highest mountain of Europe." নেপালের অধিকাংশ প্রাকৃতিক সম্পদই এরকম ভুলনা-হীন। ১০,০০০ ফিট উর্ধ্বে ত্রিশূল নদী প্রবাহিত — গৌসাইহান পর্বতই এ নদীর উৎপত্তিস্থান। ১৪০০০ ফিট উর্ধ্বে গৌসাইহানের ব্রহ্ম আছে, সেখ'তে পাওয়া যায়। সবচেয়ে বড় ব্রহ্মটির নাম হচ্ছে দীলকণ্ঠ স্তূপ। কথিত আছে মহামেঘ বিধ পান ক'রে ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য বরফের পাহাড়ে ত্রিশূল দিয়ে আঘাত করেন।

তাতে ক’রে কল নির্গত হ’য়ে উন্মেষের স্রষ্টা হয় — তিনি সে কল পান করেন এবং সে উন্মেষে শান্তি অবতারণা করেন।
কাঠিমাড় অতি মনোহর কারাগার। বাগবতী ও বিজুবতী নদী সঙ্কটস্থিত বেটন ক’রে আছে। একটা সৌন্দর্য্যে ভরা। বাগবতী নদী পার হওয়া

সরুপ অনেক সন্দিগ্ধ ও অস্ট্রালিক। সেখানে পাওয়া যায়।
ভাটনাগের প্রাচীন নৃপতি ভূপতিমন্দের প্রাঙ্গণ একটা মনোহর বস্তু। আধুনিককালে কঠিন বিশেষ্য হ’য়ে গেছে — নতুন অস্ট্রালিকান্ডি ইউরোপীয় ক্যান্সনে তৈরী হচ্ছে।



স্বাধীনতা-বিপ্লবের প্রাঙ্গণ (আধুনিক)

যায়। সন্ধ্যাবেলা প্রায় সন্ধ্যা সন্ধ্যার বাল।
একটা বাগার আছে — প্রায় সন্ধ্যা সন্ধ্যার বাল—
কিন্তু সে সব যে খুব উন্মেষের তা’ মনে হয় না।
এখানে খুব উন্মেষে চান, বি ইত্যাদি পাওয়া যায়—
শালসর, বীট, কড়াইভুটি প্রভৃতি বেশ সস্তা। নেপালের
কারিগরদের তৈরীকৃত অনেক শিল্পকলাবিশিষ্ট বাগার পূর্ণ
থাকে। নেপালের “বুড়ী” খুব বিখ্যাত — এক
রকমের কাগজ নেপালে তৈরী হয় — যা’ নেপাল
গভর্নমেন্ট ব্যবহার করেন। আর যত চকচক থাকলেও
কালের কাগজ খুব চমকে। প্রাচীন হাশপত্যকার নির্মাণ

একই আঙুর ইতিহাস না থাকলে এই উপভাষার
বিশিষ্টতা কখনোই হবে না। পর্যটকদের নিকট এই
ইতিহাসের ছবি বারবার চোখে পড়ে। নেপালের
ব্যক্তিগত শাসনব্যবস্থা King বা “বিরাহ নহেন—
নেপাল শাসন করেন প্রধান মন্ত্রী মহারাজ বা
Maharaja Prime Minister : King-এর কোন
কমতাই নেই—তিনি একটা শেখান মাত্র ভোগ
করেন। অন্যত কমতা প্রধান মন্ত্রীর হাতে কেন্দ্রীভূত ;
তার অধিকারী ছাড়া কোন কাম হয়। সত্য নয়।
এখন মন্ত্রী-বিশেষের আধিপত্য ছিলেন মহারাজ

অথ বাহাদুর রাণা। তিনি সপ্তম প্রত্যাচারকে নেপালে বিকার উপলক্ষ্যে নিরস্ত করেন। সপ্তম প্রত্যাচারী তাঁর আত্মা গ্রহণ করে ইংরাজসাম্রাজ্য ও নেপালের মধ্যে দৃঢ় করেন। মহারাজ অথ বাহাদুর সমান্য পুরুষ ছিলেন—তিনি তাঁর সমসাময়িক রাণা, মন্ত্রী, রাজকল প্রভৃতি সকলের কর্মজ্ঞান নিয়ে কবলে আনয়ন করেন। তাঁর বংশধরেরা সেই অধিকার এখনও ভোগ করছেন। নেপালের পর্বতক স্বভাবতই মহারাজের আত্মিক শ্রেষ্ঠে প্রথম আকৃষ্ট হয়। রাজপ্রাসাদকে ‘দরবার’ বলা হয়। বসিও রাজবিরাজ ‘King’ নামে পরিচিত ভূঁও তাঁর দরবারে বিশেষ কোন আড়ম্বর বা বাতায়নের ব্যবস্থা নেই। এখান মন্ত্রী মহারাজের দরবারেই অল্পই অবস্থান সমারোহে জাগ্রত। রাণা-বংশের প্রত্যেককেই প্রতিদিন তাঁর দরবারে যেতে হয় — দরবার হ’লে প্রত্যেককে আদেশ দিরাধার্য করে অঙ্গুর হ’তে হয়। অসম্মান উপলক্ষ্যে বিশেষ সমারোহ হয়। কাঠমাণ্ডুয় এক অসম্মান প্রাপ্য সমগ্র বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মহারাজের হস্তের টিকা গ্রহণ করতে হয়। সে দৃষ্ট অতি চমৎকার। শত শত লোক সারিবদ্ধ হ’য়ে বীর গমে অঙ্গুর হয়; মহারাজের সম্মুখে একটা রৌপ্য মুদ্রা অভিবাদন স্বরূপ নিবেদন করতে হয়। মহারাজ সম্মতে অভিবাদন গ্রহণ করেন।

নেপালের উপত্যকা অত্যন্ত উষ্ণ। প্রচুর খাদ্য রোপণ করে কৃষকেরা লাভবান হয়। উপত্যকার মাঝে মাঝে বাসক্স দেখতে পাওয়া যায়—কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসারে নানা রকমের ফলস্ব সঞ্চিত থাকে। সেখান থেকে খাবারই স্বল্প এক বস্তুর মধ্যে বেতে জীত হয় না। গাহাড়ে খাঁটা-নাবা প্রকার পক্ষী একটা কষ্টকর ব্যাপারই নয়। হুন্স মন্দিরে যেতে হ’লে প্রায়ই কৃষকের চোখে পড়ে এক ভাববাহী প্রসিককে পশা সঙ্গ করে অঙ্গুর হ’তে দেখতে পাওয়া যায়।

নেপালে নানা বিভিন্ন বিহুসেবতা প্রাপ্ত পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সেবতার ভিতর পঞ্চমুদ্র সকলের পরিচিত। হিন্দু ও বৌদ্ধ সেবতা সকল পর্বটিককে

সুস্থ করে দেয়। এসময় সেবতার মূর্তি ও মন্দিরনিখ অতি বিভিন্ন ঐক্যপূর্ণ — কোনটি বা অগতে অস্বীকার। চন্দ্রনারায়ণের মন্দির আশানের Horyoji-র মন্দির হ’তেও অধিক ব্যাতি লাভ করেছে।

হিন্দু মন্দিরের ভিতর পশুপতিনাথের মন্দিরই বেশী প্রসিদ্ধ। যেদিন এ মন্দিরটি দেখতে যাই—



পশুপতিনাথের মন্দিরে গমন

সেদিন একটা বিশিষ্ট উত্থান ছিল। একটা প্রাঙ্গণের মাঝখানে এই মন্দিরটি অবস্থিত—সামনে একটা প্রকাণ্ড বুদ্ধের মূর্তি বর্ণপরে আচ্ছাদিত — মহাসেবের মন্দিরের রৌপ্যম্বর নানাসুত্রিত। প্রাঙ্গণে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমূর্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে। পূজারী ব্রাহ্মণেরা লোহিত ও ধূসর বসনে ভূষিত ছিল। মনে হচ্ছিল, শুধু যেন নাটকের অভিনেতা—আর আমরা দর্শক। এ মন্দিরের অনতিদূরেই শুভেশ্বরীর সুবিখ্যাত মন্দির। যাওয়ার পথে বাদরের উৎপাত আছে—হঠাৎ উত্তর-পশ্চিমের তীর্থ-পরিভ্রমণের কথা মনে পড়ে। মন্দিরের সামনে অসংখ্য সোকেবের ভিড় দেখতে পাওয়া যায়। এ মন্দিরে মূর্তি নেই, অঙ্গসঙ্গি। একটা করণা হ’তে অবিরল যে অঙ্গসঙ্গি নির্গত হয় তাই নবত হ’য়ে থাকে। কিছু দূরেই বাসমতী নদী। বাতায়

নগর একটা কচ্ছলের নক্সা। অঁকা ঘাস সেবে বিস্তৃত হ'লুম। সেদিন বিশিষ্টভাবে গুত ব'লে বেঞ্চে পেদুম বাসমতী নদীর বাটে অধিরাজের (H. M. The King) পরিবারের ভক্ত তাঁবু পাটান হয়েছে। অনেক রাজকীয় ভক্তা চারদিকে ছুটোছুটি করছে। বলা বাহুল্য শৈব মন্দির ছাড়া নারায়ণের অনেক মন্দিরও নেপালে বিখ্যাত।

কাঠমান্ডু শহরের মাঝখানটাতে মহাকালের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। রাধাধিরাজ বা মহারাধনন্দী এ মন্দিরের সামনে দিগে বাগ্গার সময় মটরগাড়ী বা খোড়ার গাড়ী থাকিয়ে মন্দিরে প্রবেশ ক'রে প্রণত হন। মহাকালের মন্দির বিশেষভাবে ভক্তদের আকর্ষণ করে। সন্ধ্যার সময় অনেক পুজককে বেবতা প্রদক্ষিণ করতে দেখতে পাওয়া যায়। মহাকাল মন্দিরে ঘরপালের মূর্তি অপরূপ ঐশ্বর্য—ভারতীয় মূর্তিশিল্পে তা' অতি উচ্চ পরিকল্পনার বস্তু। অগ্নিস্কট, মৃত্যুশালা, স্বচ্ছন্দ-বণ্ড প্রভৃতি ভূষণ অতি চমকিত এবং সমস্ত নির্মাণকৌশল শিল্পকীর্তির শ্রেষ্ঠ নমুনা।

কাঠমান্ডু বাজারের অনতিদূরে বসন্তপুরে কালভৈরবের মূর্তি সকল মর্শকের মূর্তি আকর্ষণ করে। এ মূর্তিটি সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী শোনা যায়। এক বিরাট কলনাকে এ মূর্তি আগ্রস্ত ক'রে তোলে। কিছুমূরে দরপার্বর্তীর মন্দির। পূর্ব নিকটেই একটা নারায়ণ-মন্দিরের সামনে চমৎকার গরুদমূর্তি উৎকীর্ণ করা আছে। এ মূর্তিতে একটা আশ্চর্য্য মূর্তি।

কাঠমান্ডু অপেক্ষা প্রাচীন নগর 'পাটন' বা ললিতপত্তনে নানা মন্দির ও মূর্তিশিল্পের উৎকৃষ্ট নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। একদিন যখন পাটন দেখতে বেরিয়েছি, সামনে এক অদ্ভুত দৃশ্য আমাকে চমকিত ক'রে তুলল; দেখলুম এক দীর্ঘ গোভাবত্যা চলছে; তার মাথামানে মুষ্টিহস্তেরে সুখাসপরা একটি মৃগশ্চিত্ত লোককে ধরে যেয়ে গোমাক পরা দ্রুতি হেলে অঙ্গুর হস্তে।

পাটনের মহাবুদ্ধমন্দির এক আশ্চর্য্য মূর্তি।

প্রায় শতাধিক বৎসরে এ মন্দিরটি তৈরী হয়। নয় হাজার বুদ্ধমূর্তি এ মন্দিরে আছে—সমস্তি মন্দিরটি মীর্ষ হ'লে বাজে মনে হয়। Oldfield এ মন্দিরটি সম্বন্ধে বলেন — “The most elaborately carved



‘বসন্তঃ যাত্রা’

temple to be found in the valley of Nepal.”

কবিতা আছে রাজা অতর ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এ মন্দিরটি তৈরী করেন। উচ্চতার ইহা ৭৫ ফিট — আশরা অতি কষ্টে ভিতরে বাই, কারণ চারদিকে প্রাচীর নেই বসুন্ধেই চলে। এ মন্দির চারতলা—প্রথম তলে শাক্য-সিংহের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় তলে অবিতাত মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। বসন্ত: শাক্যসিংহকে কেন্দ্রীভূত ক'রে নেপালের প্রধান দেবতারা এ মন্দিরে স্থান পেয়েছেন।

পাটনের হিন্দু-মন্দিরের শ্রেষ্ঠ নির্মাণ বুদ্ধমন্দির। অতি মৃদু ও মৃগশ্চিত্ত এই মন্দিরটি পাটনের দরবার চকে প্রতিষ্ঠিত—সামনে অতি নিম্ন ভাবে তৈরী একটি গরুদমূর্তি আছে। একটা বুদ্ধের মূর্তি এই অঞ্চলে

সর্গাশেকা অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমন দুর্ভাগ্যিত
দীর্ঘতম দৃষ্টি হ্রাসিত। এই চক্রে ভীষ্মমন্দির সেখেন
তাক সেখেন সেখ। গুরুপাতনবনের অনেকেই
সেখতার স্বর্গ হতে নাম কাটা সেখে। কিছু
ভীষ্ম

শৈলশিখরে
এককম ভাবে
আমর
করতে পার
বেন জ
কখনও মনে
হয়নি। আমি
গৌ কি ক
চিত্রকলা
ভীষ্ম
এমনি চমক
কার চিত্র
পেয়েছি বা
বামনার দিক
থেকে Her
cules বা
Laocoon
দৃষ্টিকে পরা
জিত করত
পারে। অজ
নিদ্রী প্রাণের
টানে এক
অলৌকিক
ভীষ্মের দৃষ্টি
করেছে বা
মহাজাগত
কার সেখেন

শৈল পুনরিত হতেন। পাটনের মন্দিরনাথের মন্দিরও
অতি দুর্ভাগ্যিত। কাঠের এরূপ চমককার খোদাই

কাজ ভারতের কোথাও কেবলে পাওয়া যায় না।
ভাটগাঁও কাঠবাড় হতে প্রায় আট মাইল দূরে।
এ নগরটি না দেখলে উপত্যকা ভ্রমণ ব্যর্থ হয়।
বাগদা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য — ভগবানের কৃপার উপস্থিত হইলে
বা' সেখেন



মহাবুদ্ধমন্দির — পাটন

পেলুম তার
তুলনা পাওয়া
সুখিল। ভাট-
গাঁওয়ের দর-
বার, প্রাচীন
রাজ-অট্টা-
লিকা ও
মন্দির শ্রেণী
এক আশ্চর্য্য
দৃষ্টি। মধ্য-
ভাগে নৃপতি
তৃপতিমন্দির
স্বর্ণপত্রমণ্ডিত
দৃষ্টি দেখে
বিস্মিত হ'তে
হয়। অতি
উচ্চ পদ্ম-
স্তম্ভের উপরে
দৃষ্টি টি
আসীন।
এখনও মনে
হয় যেন রাজা
তৃপতিমন্দির
নিজের অট্টা-
লিকা ও
মন্দির প্রভৃ-
তির দিকে

চোরে আছেন। এখানকার স্বর্ণদ্বার বা Golden gate
দরজার এক আশ্চর্য্য দৃষ্টি। বহু ইউরোপীয় সেখ

বিষয় প্রকাশ করেছেন। অতি সামান্য পরিসরের ভিতর নানা বিভিন্ন সেবাব্যবস্থার দৃষ্টি ফোবিত করা হয়েছে।

ভাটনাও দরবারের সম্বন্ধে বিবরণ বৈচিত্র্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। প্যাংগোতা রীতির সহিত আরও অত্যন্ত রীতির একটা পরিপাটী মিল করা হয়েছে। এখানকার অষ্টাদশিকার কালের যে খোদাই করা আছে তা’ নেপাল-শিল্পের অতি উৎকৃষ্ট নমুন। ভাটনাও দরবার অতিক্রম করে আরও বহু সম্বন্ধে প্রশংসার লক্ষ্য অগ্রসর হওয়া গেল। দক্ষায়েশ-সম্বন্ধে, গণেশসম্বন্ধে, দুর্গাসম্বন্ধে, বিষ্ণুসম্বন্ধে প্রভৃতি বহু সেবতার দৃষ্টান্ত দেখে মন উৎকর্ষ হয়ে উঠল। এখানে

মটর ছাফতে ছাফতে আঁধার হয়ে এসে—হিমালয়ের নিবিড় ছায়ায় উপত্যকার ছবি মুছে গেল। আর দ্বন্দ্বীত পুরে বন্য বাতী পৌছান গেল, তখন দেখা গেল চান উঠেছে—চানের আলোতে চারিদিক ব্যাণ্ড হয়েছে—স্বপ্নের হিমালয়ের বরফ-ঢাকা চূড়াগুলি ভয়ঙ্কর মত জলছে। এমনি করে পৃথিবীর সমস্ত স্থান হয়ে আকাশের পৌরব উদ্ভাসিত হ’ল। গভর্নমেন্টের দরবারে তখন বেন মহবত বাজনা শুরু হ’ল এবং সৌরীশঙ্কর শূন্যই একমাত্র সত্যবাক্য বলে প্রতীতি হ’ল।

প্রত্যেক দিনই সকাল বেগার এখান দৃষ্ট হতে উদ্ভিগলে সৈন্যের চূড়াকান্ডাণ। উদ্ভিগলে নেপালের ঐতিহাসিক মহাবান ; অনেক নাটকীয় ব্যাপার



উদ্ভিগলে মহাবান চূড়াকান্ডাণ

সহর বলে এবং ফ্রেনের সুবিধিত বসোবত নেই বলে সর্বত্রই একটা বিভীষিকার ছায়া আবারের বেটন করে ছিল—কিন্তু হঠাৎ মাকদানটা জ্বল পুড়িপাত হওয়াতে পথঘাট অনেকটা সৈন্যদিক বিধানে সাজিত হয়ে গেল। ভাটনাও থেকে বন্য প্রথম দিন ফিরে এসে তখন সম্মত হয়েছে। কিছুকাল এসে মটরখানা বন্ধ হয়ে যায়—তাকে Start করা দূর হ’য়ে পড়েছিল। অনেক কষ্টে মটর দাড়ী সজীবিত করা গেল। নতুন পথের মাঝে কি বশা হ’ত কলা যায় না—হ’দাত মাইদের ভিতর আর কোন আগ্রহ ছিল না।

উদ্ভিগলের সূর্য উপর হয়ে গেছে। মহাবান জল বাহাজুর রাণা এই প্রাক্ষে বহবার সৈন্য সমবেত করে বীর কবচা অটুট রেখেছিলেন। নেপাল-রাজার সবচেয়ে গরিব খেয়াল হচ্ছে সৈন্য তৈরী করা। প্রজাধ অক্ষা নতুন সৈন্যকে শিক্ষাদান করা হয়—পুর্নান regimenaগনিকের উপস্থিত হ’তে হয়। একজন আর্মারের হাতে explosive department। গোলা দার নেপালের প্রজাধবীর বশজ্ঞার নেপালেই প্রেরিত করা হয়। এখানকার সব চেয়ে সেরা মহাবান হচ্ছে Military বা সূর্যকোষ। যারা কোন

Officer নয় তাবের স্থান নেই। তবু বনী হ'লে এখানে সমান পাওয়া যায় না। মহা-মহারাজের ছেক্সের অনেকেই 'General' বা সেনাপতি—'বিরাজের (King) ছেলেরা রাজকীয় অধিকারে (royal blood বলে) সকলেই General বা সেনাপতি। এমন Lt. General, Major General, Commanding Colonel প্রভৃতি রাধোপাধিতে সকলেই নিজেরের স্বাধা স্বচিহ্ন করেন। মহারাজের দশদিন কিংবা কোন বিশিষ্ট দিনে সকলেই ভয়কাল পোষাক পরে নানা রকমের বুকটে পিরোশোতা বুদ্ধি করে দরবারে উপস্থিত হন।

উপত্যকার একটা বিজয়-মহোৎসবের দিন আছে। সেদিন একটা বিস্তৃত পোতাভার। বের হয়। এই দিনই পুণ্যস্থ পোতা ভাঙির পক্ষে উপত্যকা বিজয় করেন। প্রতিবৎসর এ ব্যাপারের সামর্থ্যকে বিশেষ আড়ম্বর ও উৎসব হয়ে থাকে।

নেপালের অস্ত্র উৎসবও প্রচুর। রথযাত্রার একটা বিশেষ আড়ম্বর এসেছে দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরনাথের রথযাত্রা একটা বিরাট ব্যাপার—এই উৎসবের স্থান ও কেন্দ্র হচ্ছে পাতন নদী। কাঠমাণ্ডুতেও রথযাত্রা আছে।

সেবাসেবী হাড় এখানে ভূতপ্রভুদের পূজার ব্যবস্থাও সামান্য নয়। ভিক্টোরের সুলার ব'লে এখানে প্রভুদের কল্পনা একটা আশ্রিত ব্যাপার। প্রভুকে বাকীর সামনেই প্রভুদের উপাস্ত হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্য একটা সোফাখানান বীণায় থাকে।

বলা প্রয়োজন নেপালে তান্ত্রিক আচার্যদের একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠা আছে। বজ্রযান প্রভৃতি তান্ত্রিক বতসারের একটা বিরাট প্রসাধনের নতুন সব আনন্দ দেখতে পাওয়া যায়। বজ্রযানের বস্ত্রের এধানকার আর একটি বিশেষ দর্শনীয় বস্তু। এই বস্ত্রটির বর্ণনা উপত্যকার বহুস্থ হ'তে দেখতে পাওয়া যায়। একটা নতুন পাহাড়ের উপর অবস্থিত ব'লে ইহার একটা অসুন্দর আকর্ষণ আছে।

এই বস্ত্রের পূজা তিনতীর সমাধের দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই বস্ত্রেরই আদিবৃত্ত কল্পনার একটা পট-স্থান। বলা প্রয়োজন আদিবৃত্ত কল্পনা মহাবান বৌদ্ধমতের প্রাণবরণ। বস্ত্রের স্বর্ভাঙ্গে দুটি



কাঠমাণ্ডুতে রথযাত্রা—কাঠমাণ্ডুর ভজন

প্রকাণ্ড চোখ আঁকা আছে—মনে হয় যেন সে চোখের অস্ত্রত দুটি অসীম দিশেতে প্রসারিত হ'য়ে আছে।

আদিবৃত্ত কল্পনার বৃত্তকে অনেকটা ভগবান হানীর (theistic) করা হয়েছে। তাঁর ধানের দ্বারা তিনি পাঁচটি ধানী বৃত্ত বসী করেন—বৈরাচন, অমোভা, রতনভব, অমোবসিদ্ধি ও অনিত্যত। কেউ কেউ বজ্র-সম্বন্ধে আর একটি বৃত্তও কল্পনা করেন। এই পঞ্চভূতের প্রত্যেকটি বস্ত্র রূপ ও চিত্রান্বিত ভূষিত। বৈরাচনকে বেতবর্গে আঁকা হয়—তিনি সিংহের উপর উপবিষ্ট। তাঁর চূড়ায় চক্রচিহ্ন—তাঁর লম্বল হচ্ছে বর্ণচক্রমূর্ত্তা। তিনি ক্ষিত্রের স্যোতক। অমোভা 'অপ'র স্যোতক—তাঁর বর্ণ হচ্ছে নীল—তিনি পূর্ণ-বিক্রে চেয়ে উপবিষ্ট—তাঁর মূর্ত্তা হচ্ছে ভূমি-পর্ণমূর্ত্তা, বাহন হস্তী এবং চূড়ায় বজ্রচিহ্ন আছে। রতনভব

শ্রীতবর্ণ—বরদাহুতাপুল, অথোপরি আদীন, চুফার
তিনটি ময়ূপুল। তিনি অধির যোতক। অমিতাভ
পশ্চিমদিকে দৃষ্টি ক’রে উপবিষ্ট—তার বর্ণ রক্ত,
মুত্রা চন্দ্রে ধ্যানমুদ্রা — তিনি ব্যোমের যোতক।
অমোঘশিখি উত্তরদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক’রে উপবিষ্ট
—অতরুদ্রায় অলঙ্কৃত—তার বর্ণ হচ্ছে সবুজ—বাহন
গরুড় এবং তাঁর চূড়া বিখবজ্জিকুল। তাঁর পদ্মাত্যে
সাতটি সাগরের ফণা ছত্ররূপে বিস্তারিত। বহুসংখ্য
নেপালে বিশেষ আদৃত—তিনিই তান্ত্রিকদের নিরীকৃতি
দেবতা। তাঁর সঙ্গে শক্তিশিশি দেবীও সমাদীন
থাকেন। তিনি প্রজ্ঞার যোতক — তাঁর হাতে বহু।

এই সমস্ত ধ্যানী বুকের অতি সুগঠিত বিভিন্ন স্তূপি
মেখে অব্যাক হ’রে বেতে হয়। বুদ্ধ নানা বৈচিত্র্যে
নৃতন নৃতন রূপ পরিগ্রহ ক’রে শিল্পীদের শিল্প
বিকাশের যেন নৃতন পথ আবিষ্কার ক’রে দিয়েছেন।

এঁদের প্রত্যেকের এক একটা শক্তি কল্পিত
হয়েছে — এই শক্তিশিশিই হচ্ছে পঞ্চভায়া। লামিডো
ও ঐশ্বর্যে এই তারাসুর্ভিজি একটা সৌন্দর্যের
কড় উপবিষ্ট করেছে — হিমালয়ের এই সুগুণ
উপত্যকায়। সৌন্দর্যসেবীরা এসব বিচিত্র স্তূপি
মেখে ধন হ’রে যায়। পঞ্চভায়া নাম স্বাক্ষরে —
বজ্রাধেবতী, শোচনী, মাদুখী, পাণ্ডব, তারা এবং
বহুসংখ্যের তারাহানীরা হচ্ছেন বহুসংখ্যিক।

পাখির বুকের নামও উল্লেখ করতে হয়। বিপাত,
শিবী, বিশ্বতা, কক্যসঙ্গ, কনকমুনি, কাশ্রপ ও
শাকাসিহ। এঁদের শক্তি আছে এবং ব্যোমিদও আছে।
তাঁতে ক’রে এক চমৎকার বেবলোক সৃষ্ট হয়েছে।
এমনি ক’রে পূর্ণ-এসিয়ায় তাবের একটা নৃতন উৎস
সঞ্চারিত হয়েছে।

যহু মন্দিরেই এ সমস্ত সেবতার প্রত্যক্ষ ছায়া
পাওয়া যায়। এ মন্দিরের চারিদিকে বহু ধর্মচক্র
(prayer wheel) আছে! এগুলি আবর্তন করলে
জন্মমহাকরনের কর্তব্যকন ছিন্ন হ’লে যায়।

মন্দিরটিন সামনেই একটা প্রকাণ্ড বজ্রস্তূপি আছে।

ইহার নীচেই একটা ধর্ম্যভূষণ আছে সেখ’তে পাওয়া
সেল। ইহা মন্ট্রী ব্যোমিদেবের সহিত মূল। রাক্ষা
প্রতাপময়ের একটা স্তম্ভ আচ্ছাদন সেখ’তে পাওয়া
যায়—তাতে ২২২টি সেবসেবীর স্তূপি স্ফোদিত আছে।
চক্রাকারে স্ফাণিস্থ নির্ধর ক’রে এসব স্ফুটিত হয়েছে।
বেদিকের বার ভাগে বিভক্ত ক’রে স্তম্ভটীর বার মাসের
ভোক্তক বারটি স্তূপি আছে—তাতে বোড়া, ভেড়া, বাঘ,
হাঁস, কুকুর, বাঘ, খরগোস, সাপ ইত্যাদির চোতরা
আছে। এরকম একটা উপলক্ষ্য ক’রে প্রাণিকলংকে
স্বাভূতে বা স্ফোদিত করতে বহুটা প্রকার ভাব লেগে—
ওম্বু মুলের চিত্র-বিজ্ঞান তা’ কিছুতেই হয় না।

এ সমস্ত প্রাণিকলং এবং বেবলগুপ্তের বিরাট
স্বস্তিসমুদ্রের মেখে মন আননে পূর্ণ হ’লে সেল!
বাহীসের অশ্রুত ভজন-পূজন, নিরা ও মন্ত্রপাঠ প্রভৃতি
যেন একটা দিব্যজগতের মাদ্রিক ব্যবস্থা ব’লে মনে
হ’ল। ধর্মপ্রাণ ভারত সব জগৎসার সাধনাবলে
অপরাধের শক্তি সংগ্রহ করেছে, তাই এখনও হিমাদ্রি-
বক্ষে মধ্যাখ্য জিজ্ঞাসার প্রবল ঘ্রোত প্রবাহিত হচ্ছে।

পরিগ্রাহকের পক্ষে নানা জগৎসার সৌন্দর্যাবস্থা
ও সমাধিবর্ধ যেনম মূল্যবান তেমনি সু-পরিচরও
শোভনীয় ব্যাপার। এই উপত্যকার ‘এসিয়া’র একটা
সার্বভৌমিক মিলন সম্পাদিত হয়েছে। একদিকে
চীন ও তিব্বত—অন্যদিকে ভারতবর্ষের ভাবাহুশিল্পের
এই বৈভবপ্রভাব এখানে সুস্পষ্ট। কোন ইউরোপীয়
পর্বাটক এ অঞ্চল মেখে যেনম যে, এদেশে ভারতীয়
চোহরাই সেখ’তে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ তা’
টিক নয় — পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা মহোদীয় জাতির
সহিত অন্বিনিমিত্ত সন্মত নেই; কিন্তু পশ্চিমে মহোদীয়
প্রভাবের কথামাত্রও সেখ’তে পাওয়া যায় না।
নেপালের রাজবংশ আর্ধ্যাজিতি (Indo-Aryan)
হ’তে উদ্ভূত — বস্তুতঃ রাজপুত জাতির একটা শাখা
এখানে ক্রমশঃ আধিপত্য লাভ করে। তিমতি কংই
প্রধান — ব্রাহ্মণ, ঠাকুর ও ক্ষেত্রী বংশ — উচ্চস্তরীয়
সকলেই এই বংশের লোক। সর্লসাধারণের ভিতর এই

তাপট প্রচলিত—(১) জ্বলন, (২) বায়ু (টাকুরি বায়ু ও বিভাসের অন্তর্গত), (৩) মদর ও (৪) শুষ্কতা। বায়ু, মদর ও শুষ্কতাই বোঝে। বায়ুই হচ্ছে সত্যিকার অগ্নির বায়ু।

এই উপত্যকার প্রাচীন অধিবাসীদেরকে নেওয়ার (Newar) বলা হয়। নেওয়ারেরা অতি সুনিপুণ শিল্পী, হাতের কাজে তাঁদের দক্ষতা অপরোক্ষ। তাঁরা ও স্থাপত্য-শিল্পের সমস্ত নমুনাই তাদের তৈরী। আর্বাণের বায়বীয় (abstract) ভাবসম্পদ এবং ত্বারেশ্বর হস্তশিল্পের দৃষ্টান্ত রয়েছে 'নেওয়ার'-শিল্পে।

উপত্যকার অধিকাংশ গৃহের বহির্ভাগ সুনিপুণ চিত্রকলায় বিচূড়িত। এসব চিত্র অনেকটা Fresco স্থানীয় এবং অতি দক্ষতার সহিত আঁকা। অতি কঠিন পদ্ধতিতেই ও বহুদৈর্ঘ্য অবলোকিতব্যয়ের সৃষ্টি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। একটা নির্বিড় ভক্তি ও ধর্মসাধন এমনভাবে লোকান্তরে আত্মপ্রকাশ করে যত হয়েছে।

এ উপত্যকার এখনও প্রাচীন চিত্রকলায় সাধকদের পাওয়া যায়। তাদের কাককর্ম আর কিছুই নেই। কলকাতার আউটলু-ফরেং ইউরোপীয় চিত্রখণ্ডের প্রতিই সম্মতি সকলের আগ্রহী বোধ। এক চিত্রকরের ব্যক্তিগত উপস্থিতি হ'লে ভারী আদার পাওয়া গেল। লোকটা প্রাচীন হয়েছে—এখনও সেকেন্দ্রে আবদুলের স্থিতি প্রতি তার প্রভা আছে। একটা ক্ষুদ্র ব্যক্তির স্মরণ সে উপস্থিতি ছিল। চারিদিকে কবুর কয়েকটা অল্প আদর—কয়েকটা রঙের আধার চারিদিকে ছড়ান ছিল। আশি শ্রেণীর একটা পুঁথির পাঠ্যগুলির নাক-খানটার যে সব গালি ছাড়া আছে তাই সে হাবিতে পূরণ করে দিয়েছে। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম একটা ছোঁতাঁর রচিত কোম্পি। পুঁথির আকারে লিখিত, ভিতরে গ্রন্থির জিহ্বা দিয়ে তাঁকে সম্পূর্ণ করা হচ্ছে। ভারী আদার বোধ হ'ল। এ বেন প্রাচীন ভারতের সঙ্গে একটা জীবন্ত সম্পর্ক।

এ উপত্যকার নব্য ঐতিহাসিকগুলির নাম উল্লেখ করাও প্রয়োজন। মহারাষ্ট্রের প্রাশাদ হাট্টা বিরাটের

(King) প্রাশাদও উল্লেখযোগ্য। মহারাষ্ট্র-মন্ত্রীরা নিজেদের ঐতিহাসিকভাবে বহুবার ক'রে থাকেন। মহারাষ্ট্র চতুর্থমাসের সিংহদরবারে নিজের কাককর্ম নির্বাহ করতেন—বর্তমান মহারাষ্ট্র সার মুগ্ধমাসের দ্বন্দ্ববাহাদুর রাণা মুগ্ধটাকে তাঁর নিজের ঐতিহাসিকার রাজকর্মে পরিচালনা করতেন। টাংগেবের সাম্রাজ্য Military Hospital একটা প্রকাণ্ড প্রাশাদ; তারই উপর এক আকর্ষণ Bronze-এর স্থিতি আছে একটি শুধা সৈনিকের। মহাভূত যে সব সৈনিক প্রেরিত হয়েছিল তাদেরই দৃষ্টান্তরূপে আধুনিক সৈনিকের পরিচ্ছদে এই মুক্তিট পত্রিকল্পিত হয়েছে। বলা প্রয়োজন, এ মুক্তিট নেপালের ভাস্করের তৈরী এবং এটা তৈরী করা হয়েছে প্রাচীন প্রাশাদটো—ইউরোপীয় নয়। একমিকে এই ভারতীয় ভাস্কর্যের নমুনা, অত্রমিকে টাংগেবের চারিদিকে বিলাত হ'তে আদারী প্রভু-নির্মিত অতীত মহারাষ্ট্রের মুক্তিগ্রন্থ—এই বিশরীত প্রবাহ প্রাচীন-চিত্রের একটা আন্তর সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি হয়েছে।

এ উপত্যকার কুলের ভারী আদর—বেথানে-সেখানে মোশাপ কুলের গাছ দেখতে পাওয়া যায়। বড় বড় মোশাপ পাওয়া যায় লম্বাচ কুলে। রথবাজার সদর জুড়ে কুল পাওয়া যায়—সেপালের অধিবাসীরা কুলের ভক্ত। বিশিষ্ট পুন্ডার দিন হাড়াও প্রতিদিন সকাল বেলা কুলের হুড়ি হাতে নিয়ে মেয়েদের ঘনিয়ে গিয়ে অগ্রসর হ'তে দেখা যায়। সকালবেলাই সুমিষ্ট বাত ও ভক্তদগানে বহিরগলি ঘনিত হয় এবং অল্প লোক সমাগমে জীবন্ত হ'লে উঠে।

কোন ইউরোপীয় দর্শক তাই বলেছেন, উপত্যকার জীবনযাত্রার ভারতের অষ্টম শতাব্দীর একটা নির্মূল হাবি পাওয়া যায়। বাস্তবিকই তাই; এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ ভক্তদের যে পরম প্রীতি লক্ষ্য করা যায় তা' কর্তব্যবাহিত। হিন্দুরা বৌদ্ধ ধর্মের অর্থা অর্পণ করছে—বৌদ্ধেরা হিন্দুধর্মের সমবেত হচ্ছে। এ দৃষ্টান্তের একটা পরম উদাহরণ হওয়া করে।

দ্বিজেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ ছন্দ

শ্রীদীনেশকুমার রায়

ঐতিহাসিক

হৃদ-বিচারের শেষ আলোচ্য হচ্ছে কান, অর্থাৎ trained কান। আমার কানে মনে হয় স্বরবৃত্তের শেষ সীমা চতুঃস্বরগণেরই। কিন্তু কানের রায় গুণ্ঠিত নহে। লক্ষ্য করলে ওই রায়ের মধ্যেও গুণ্ঠিত বৃত্তে পাওয়া যায়। তাই হৃদ-বিচারের উদ্ভব। যদি তা' না হ'তো, অর্থাৎ যদি কানের সোহাই দিলেই তার উপর কথা না চ্যুত, তাহ'লে হৃদ-বিচারের বালাই থাকত না এবং কাব্য-জগতে বীতিমত একটি Tower of Babel গড়া হ'য়ে উঠত। কাজেই আমার কানের রায়কেও আমি গুণ্ঠিত সাহায্যে explain করতে বাধ্য। আমি যথাসাধ্য তা' বোঝাতে চেষ্টা করছি।

আপনি যাকে বলতে চান ষট্‌স্বরগণিক, আমি টেক্‌নিক্যাল আলোচনার তাকে ভেঙে ৪+২ করতে চাই। তার দুটি কারণ—একটি সাধারণ ও একটি বিশেষ। আসে সাধারণ কারণটির কথাই বলছি। মাত্রাত্ব, স্বরবৃত্ত ও বৈশিষ্ট্য—এই তিন প্রকার ছন্দেই কবি অনেক সময়ই 'ঐক্য-বতি'-কে গুণ্ঠ করতে পারেন; ঐক্য-বতি গুণ্ঠ হ'লে দুটি পর্বের মধ্যে কোনো ছন্দ থাকে না ব'লে পূর্ণ দুটি ছোঁড়া দেখে দিলে একটি মূলপর্বের সৃষ্টি হয়। সাধারণত' অর্ধবতি শোণ করা হয় না। এ তথ্যটি বাংলা হৃদ-বিচারের একটি বড় তথ্য। এই ঐক্যবতি-শোণের ধারা ছন্দে বেশ একটু বৈচিত্র্যও দেখা দেয়। দৃষ্টান্ত বিধি—

কলিকাতা শোনে নাকো চন্দ্র খেয়ালে;

বুজোর বেশা তার তুয়ে খেয়ালে।

আমি মনে মনে ভাবি, চিত্ত তো নাই,

কলিকাতা থাক্‌ নাকো সোশা বোছাই।

দিলি লাহোরে থাক্‌, থাক্‌ না আগ'রা,)
মাথার পাগড়ি মেঝো, পায়েতে নান্দ'রা।)
কিংবা সে যদি আশ বিলাতেই ছোটে,
ইয়েক হবে মরে নুট-চ্যাট-কোটে।

কিসের শব্দে দুখ ভেঙে দেয় সেই

মেঘি, কলিকাতা আছে কলিকাতা-চেই।

—রবীন্দ্রনাথ, সংস্কৃতি (দ্বিতীয় ভাগ)।

এই হচ্ছে মাত্রাত্ব পদ্যের অর্থাৎ চাক্ষুরিক চৌপদিক (অপূর্ণ)। প্রতিপর্বে চার মাত্রা। কিন্তু সর্বত্র পর্বের পরবর্তী ঐক্য-বতি নেই, অনেক বসেই গুণ্ঠ হয়েছে। “চন্দ্রা খেয়ালে”, “তুয়ে খেয়ালে”—এখানে একটি পূর্ণপর্ব ও একটি অর্ধপর্বের মধ্যবর্তী ঐক্য-বতিটি গুণ্ঠ হ'য়ে একেবারে মূলপর্ব ভেঙেই হয়েছে। “কিসের শব্দে দুখ” এখানে দুটি পূর্ণপর্বের মধ্যবর্তী ঐক্য-বতি গুণ্ঠ হ'য়ে একটি মূলপর্ব উৎপন্ন হয়েছে। প্রথম-দ্বিতীয় এবং তৃতীয়-চতুর্থ পর্বের মধ্যবর্তী ঐক্য-বতিকে এভাবে বিলুপ্ত করার অধিকার কবির আছে। শুধু তাই নয়; লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ওই ঐক্য-বতি-বিলোপের ধারা ধ্বনি-তরঙ্গ একটু বিভিন্ন হ'য়ে উঠেছে। কবি যদি ইচ্ছে করেন, তবে সমগ্র কবিতাতেই এভাবে ঐক্য-বতি বিলুপ্ত ক'রে ছন্দের ধ্বনিকে অভিনব ক'রে তুলতে পারেন। উক্ত দৃষ্টান্তটিকেই গুণ্ঠিত পংক্তি আছে বাতে ঐক্য-বতিকে সর্বত্রই বিলুপ্ত করা হয়েছে। যথা—

দিলি লাহোরে থাক্‌, থাক্‌ না আগ'রা

মাথার পাগড়ি মেঝো, পায়েতে নান্দ'রা।

এই দুটি পংক্তির ধ্বনি কি অত পংক্তিজগো থেকে একটু বিভিন্ন বসবের নয়? আরেকটি দৃষ্টান্ত—

অল্লাহ নবীতীরে চন্দনী গাঁয়ে

শোড়ো বখিরখানা গয়ের বীরে

দীর্ঘ কাতল-ধরা,—এক কোণে তারি
অন্ধ নিরেড়ে বাসা কুণ্ডবিহারী।

—রবীন্দ্রনাথ, ঐ।

এখানেও প্রতিপক্ষে চার মাত্রা। প্রথম ও তৃতীয় পর্বের পর ঐক্য-বতি। কিন্তু তৃতীয় পংক্তির প্রথম ঐক্য-বতিটি এবং চতুর্থ পংক্তির দুটি ঐক্য-বতিই বিলুপ্ত হয়েছে। “এক কোণে তারি” না লিখে যদি লেখা যায় “কোণেতে তাহারি” তাহলে শেষ পংক্তি-দুটি সম্পূর্ণ রূপেই ঐক্যবতিহীন হ’বে যাবে। এভাবে ঐক্যবতি লুপ্ত ক’রে অনায়াসেই আট মাত্রার বিশ্লিষ্ট পদ বা ছয় মাত্রার সার্ব-পক্ষিক পদ রচনা করা যায়। কিন্তু সাধারণত’ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের মধ্যবর্তী অর্ধবর্তিকে লোপ ক’রে দিয়ে ওই দুটি পর্বকে একটি মূলপক্ষিক পদে পরিণত করা হয় না। বাহোবু, আশরা দেখুন যে, প্রথম ও তৃতীয় পর্বের পরবর্তী ঐক্য-বর্তিক বিলুপ্ত ক’রে দিয়ে অনায়াসেই প্রতি পংক্তিতে আট ও ছয় মাত্রার দুটি মূলপক্ষিক পদ রচনা করা যায় এক তাতে ছন্দের ক্ষণিতে বেশ একটু অভিনবতা আনা যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যদি একটি সমগ্র কবিতার সর্বত্রই কিংবা অধিকাংশ স্থলেই এভাবে ঐক্যবতি লুপ্ত ক’রে মূলপক্ষ রচনা করা যায়, তাহলে ঐ ছন্দকে একটি নোতুন ছন্দ ব’লে অভিহিত করা সমত হ’বে কি না। অর্থাৎ ঐ ছন্দকে আটবাগ্নিক ছন্দ বলব, না চাতুর্মাসিক ছন্দই বলব? অর্থাৎ

অন্ননা। নদীতীরে। চন্দ্রী। গাঁয়ে
এটিকে চার মাত্রার ছন্দ ব’লে অভিহিত ক’রে
অন্ধ নিরেড়ে বাসা। কুণ্ডবিহারী।

কিংবা “সাধারণ পাণ্ডুি দেবো। পার্যেতে নান্দ্রা”,
এটিকে আট মাত্রার ছন্দ বলা সমত কি? আমি
বলি এই দুটো দৃষ্টান্তের হুবই চাতুর্মাসিক। দ্বিতীয়-
দ্বিভুক্ত ঐক্যবতি উঠিয়ে দিয়ে একটু অভিনবতা আনা
হচ্ছে। কিন্তু আসলে জটিল চাতুর্মাসিকই বটে এবং

সেক্ষত্রই চার মাত্রার ছন্দে অনায়াসেই আট মাত্রার
মূলপক্ষ চাটিয়ে দেওয়া যায়। আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

(১) আমি কি তোমার মধুর বৃত্তি।
হেরিহ শারদ। প্রভাতে,
হে মাত বন। ভ্রামল অদ
কলিছে অমল। শোভাতে।
(২) ঐ আসে ঐ। অতি ভৈরব। হরবে
ধনসিক্ত। ক্ষিতিসৌরভ। রতসে
ধন সৌরবে নবমোবনা। বরষা
ভ্রামপতীর। সরসা।

এই দুটি দৃষ্টান্তই বাগ্ম্যিক ছন্দে রচিত। কিন্তু তাদের
ক্ষণিক মধ্যে একটু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই
পার্থক্যের একটি প্রধান কারণ এই যে, প্রথম
দৃষ্টান্তটিতে প্রতি পর্বক্ষে অর্থাৎ প্রতি তিনমাত্রার পর
একটি ছন্দের অতির অস্থল করা যায়। কিন্তু
দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে পর্বক্ষে অর্থাৎ তিনমাত্রার পর
ছন্দ নেই এবং অনেক স্থলে ওই রকম কোনো
ছন্দ স্থাপন করা সম্ভবই নয়। বাগ্ম্যিক ছন্দে এই
ভাবে পর্বান্ত্রিত ছন্দের অতির বা অভাবের দ্বারা
ক্ষণিক বৈচিত্র্য সৃষ্ট হ’বে থাকে। কিন্তু তথাপি
উভয়ই ছন্দ বাগ্ম্যিক। কখনও একটিকে
ত্রৈমাসিক ও অপরটিকে বাগ্ম্যিক বদ্ব না।

এবার বৈদিক ছন্দের বিচার করা যাক। বৈদিক
ছন্দেই ঐক্যবতিবিলোপ এবং তন্মাত্র মূলপক্ষিক
পদের প্রয়োগের দ্বারা ক্ষণিবৈচিত্র্য বহনভাবে
সৃষ্টি করা হ’বে থাকে। দৃষ্টান্ত—

তরসিত। মহাসিদ্ধ। বরষা। ভূমসের। মত
পড়েছিল। পদপ্রান্তে। উজ্জ্বলিত। কণা লক্ষ। শত
করি’ অব-। নত।

এট ছন্দে চার ব্যস্তির বৈদিক ছন্দ। প্রতিপক্ষে
চার ব্যস্তি এবং প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বের পরে
ঐক্যবতি। দ্বিতীয় পর্বের পরে অর্ধবতি। কিন্তু,

নুপুর গঙ্গরি’ বাও। আবুল-অকলা

বিদ্যাস-চকলা।

এখানে প্রথম ও তৃতীয় পর্বের পরবর্তী ঐক্যবিত্তি পুষ্ট হ'য়ে দুটি দৃষ্টপূর্ণের দৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম দৃষ্টপূর্ণটিতে ছন্দের চাপ হচ্ছে চার বাটির; কিন্তু দ্বিতীয়টিতে ছন্দের চাপ আট বাটির। কিন্তু তা' সবেও উভয়টিকেই আমি চাতুর্ঘাটিক বৌদ্ধিক ছন্দই বলব; শুধু দ্বিতীয়টিতে যতিগত বৈচিত্র্য আনা হয়েছে। দ্বিতীয় দৃষ্টপূর্ণটিকে আট বাটির বৌদ্ধিক ছন্দ বলতে চাইনে। আপনিও আশা করি এ বিকরে আমার সঙ্গে একমত।

এবার স্বরস্বতের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। কিন্তু স্বরস্বতে এই রকম ঐক্যবিত্তিশোণ এবং দৃষ্টপূর্ণের দৃষ্টান্ত বিরল। কারণ স্বরস্বতছন্দে সর্বদাই বতিগুণো অতি স্পষ্ট থাকে। ঐক্য-বতির ছন্দগুলোও কীণ নয়। তাই ঐক্য-বতিগুণোকেও সহজে বিলুপ্ত করা যায় না। তথাপি এমন দৃষ্টান্ত বে একেবারেই নেই তা' নয়। বলা—

(১) মাসের বাধা মেসের বাধা চন্দ্রে খেতে গুতে
যরের আকাশ প্রতিফল্যে হৃদয়ে মেন বেদনা-
বিদ্বাতে।

—রবীন্দ্রনাথ, নিষ্কৃতি, পলাতক।

(২) ঠাকুর। ঠাকুর।...চাঁচায় পাচা! স্ক্রুত
ভিতর যুড়ে অস্ত্র,
দায় কাটা ডায়, ভীমকে আমি পাঠিয়েছি
রাঙ্কসের কোটে।

বালাই, বালাই, কি হাই জাবি, ডেকেছে
কর্তব্য তাকে,
নিত্য ভয়ে ছায় বে অন্ধর বিপদে তার দেবতা
রাখে।

ভীম গিয়েছে তার কাছে আশ আপনি দিতে
গ্রামের সেত;
আবার ছেলে, বীর সে, হুঁতে পারবে না
কোশাধ কেহ।

—সত্যজ্ঞাননাথ, ভীম-অননী, বেলা শেষের গান।

(৩) হেমন্তে, নিস্তব্ধ মিশ্র শব্দ হ্রস্বের বেলা,
বহুল তলার বাসের উপর, একান্ত একেলা,
ইত্যাदि।

—বিজেত্রালাল, দুর্ভাগিনী, আলোনা।

এরূপ বহু দৃষ্টান্ত বেওয়া যেতে পারে। কিন্তু অলমতিবিতরণে। উক্ত দৃষ্টপূর্ণ-তিনটিতে নিয়মের মানগুলিতে ঐক্য-বতি পুষ্ট হ'য়ে দুই দুই পর্বের মোড়া সেসে পেছে অর্থাৎ দৃষ্টপূর্ণের দৃষ্টি হয়েছে। এবং তাতে যে খনিগত একটু বৈচিত্র্য এসেছে সে-বিষয়ে সকলের কানই লাগা মেবে। তাই ব'লে ওই দ্বান-গুলিতে নোতুন ছন্দ হয়েছে, একথা বলা চলে না। এমন কি, কোনো কবিতার সর্বত্রই কিংবা প্রায় সর্বত্রও যদি এভাবে ঐক্য-বতি গোপ ক'রে দৃষ্ট পূর্ণের কন্ডম বা চাপ আনা যায় তাহ'লেও বলব ছন্দ চতুঃস্বর-পদিকই আছে, শুধু ঐক্যবিত্তিশোণের দ্বারা। একটু বৈচিত্র্য আনা হয়েছে। আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

নদীর ঘাটের। কাছে
নৌকো বাধা। আছে,
নাইতে যখন। বাই, বেশি সে.
ছলের ডেউরে। নাচে।
আম গিরে সেই। যানে
বেশি দূরের। পানে
মাক-নদীতে। নৌকো, কোথাও
চলে ভাঁটার। চানে।

—রবীন্দ্রনাথ, সহজ পাঠ, প্রথম ভাগ।

এখানে দুটি সোকবচ্ছেই (stanza-তেই) প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে হুঁটি ক'রে সিলেব্‌ল আছে এবং চার সিলেব্‌ল-এর পর ঐক্য-বতি। যদি ওই ঐক্যবতিগুলোকে বিলুপ্ত ক'রে দিবে ওই পংক্তিগুলোকে পূর্ণের দৃষ্টপূর্ণগুলোর মতো একেকটি দৃষ্টপূর্ণে পরিণত করা যায় তাহ'লে বতিশোণকেই একটু নূন্যত্ব দেখা মেবে বটে; কিন্তু তখন কি এই ছন্দটিকে একটি নূন্য ছন্দ বলব? অর্থাৎ ওই ঐক্য-বতি গোপের দ্বারা কি এই চতুঃস্বরপদিক ছন্দটি

ঘট্বরপণিক হ'য়ে যাবে? পূর্বে যাত্রাবৃত্ত ও বৈদিক ছন্দের দৃষ্টপক্ষিকতার যে দৃষ্টান্ত দিয়েছি তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বলতে হবে, উপরের দৃষ্টান্তটিতে ঐক্য-বতি লুপ্ত হ'য়ে সেলেও ছন্দ চতুঃস্বর-পণিকই থাকবে, ঘট্বরপণিক হবে না। আর সেই জন্যই,

পোলাও তোমার কাছে

নয়ক তেমন স্বাদ,

যেমন এই শাকার

আবার কাছে মুখ।

—কিশোরলাল, রাধা, আসেখা।

এই দৃষ্টান্তিক ও চতুঃস্বরপণিকই বলব, ঘট্বরপণিক বলব না। এর প্রতিপত্তিতেই চার স্রের পর ঐক্য-বতি থাকার কথা, কিন্তু তৃতীয় পংক্তিতে ওই ঐক্য-বতি স্পষ্টতই লুপ্ত হয়েছে। যেমন 'ছ'তে। পারবে না কে। শাস্ত্র কেহ', এইখানে 'কে'-র পরে ঐক্য-বতি নিলে একটু অস্বাভাবিক লাগে, তেমনি 'যেমন এই শা'। কার' এখানেও 'শা'-রের পর ঐক্য-বতিটি তেমনি অস্বাভাবিক লাগে। কিন্তু তা' সঙ্গেও উল্লঙ্ঘনই হলে চতুঃস্বরপণিকই বলতে হবে। আরও একটু লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, উপরের দৃষ্টান্তটিতে তৃতীয় পংক্তির ঐক্য-বতিটি স্পষ্টই লুপ্ত বটে, কিন্তু অন্য পংক্তিগুলির ঐক্য-বতি শুভায়ে স্পষ্ট বিলুপ্ত নয়। অথচ ইচ্ছা করলে সব পংক্তির ঐক্য-বতিগুলিকেই প্রায় বিলুপ্ত ক'রেও আবৃত্তি করা যায় এবং সেভাবে আবৃত্তি করাই কিশোরলালের অভিপ্রায়। 'প্রায়' বলনুম এই জন্য যে, ঐক্য-বতির প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না রেখে আবৃত্তি করলেও হয়তো চার স্রের পরে অলক্ষ্যে একটু ছেদ থেকে যায়। বাহ্যিক, এই দৃষ্টান্তটির ঐক্য-বতিগুলিকে অগ্রাহ্য ক'রে আবৃত্তি করলে হুমটা হ'য়ে উঠবে দৃষ্টপক্ষিক এবং তাতে একপ্রকার ক্ষয়িত অস্তিত্ববোধ অনুভব করা যাবে। কিন্তু তথাপি পূর্বোক্ত যাত্রাবৃত্ত ও বৈদিক ছন্দের নজিরে এটিকে ঘট্বরপণিক না ব'লে চতুঃস্বর

পণিকেরই প্রকারভেদমাত্র বলাই অধিকতর সমত যেন করি। সব ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু variation আনতে পারা যায়। কিন্তু variation-এর দ্বারা বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়, নতুন সৃষ্টি হয় না। নতুন ছন্দ সৃষ্টি করতে হ'লে নতুন principle চাই। পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তটিতে ঐক্য-বতি-লোপের দ্বারা বৈচিত্র্য হয়েছে, আমি এইটুকু বলতে চাই। কিন্তু ঘট্বরপণিক ছন্দ হয়েছে, আমি একথা বলতে চাইনে। মননেবের "ললিতলবঙ্গলতা" ইত্যাদি রচনায়টিতে অনেক স্থলেই ঐক্য-বতি (এবং অর্ধবতিও) বিলুপ্ত হয়েছে। তাতে ছন্দের একধরনের দৃশ হ'য়ে বৈচিত্র্য এসেছে; নতুন ছন্দ হয়নি। রবীন্দ্রনাথের "মরি মরি অনল মেঘতা" প্রভৃতিতেও ঠিক ঐক্য বতি-লোপের দৃষ্টান্ত পাই।

পূর্বেই বলেছি, আশনার কবিতা ঘট্বরপণিক হলে কে ভেবে আমি যে ৪+২ করতে চাই তার পক্ষে সাধারণ ও বিশেষ দুইরকম যুক্তিই আছে। সাধারণ যুক্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করলুম। এবার বিশেষ যুক্তি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ব'লেই আমার বক্তব্য শেষ করব। কিশোরলালের "আসেখা" (এবং অজ্ঞাত কাব্যোত্তরও) ছন্দ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তিনি অনেক স্থলেই আমরা যাকে ব্রহ্মত বলি ঠিক সেই ছন্দই রচনা করতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন প্রচলিত বৈদিক ছন্দকেই একটি syllabic রূপ দিতে। আবার যেন হয়, এটি তথাপি ভালো। ক'রে উপলব্ধি না করলে তাঁর "আসেখা" গ্রন্থের ছন্দের আসল রূপটিই ধরা পড়বে না। বাহ্যিক, এই জন্যই দেখতে পাই তাঁর এই syllabic ছন্দে আমাদের পরিচিত ব্রহ্মত ছন্দের ব্যতিক্রম ও পর্কসমাবেশ-বিধি রক্ষিত হয়নি। এমন কি, তাঁর এই syllabic ছন্দে ব্রহ্মত ছন্দের সুপরিচিত তাল এবং ছরটিও ধরা পড়ে না। তার স্বেতু এই যে, তিনি লোক-সাধারণের অর্থাৎ প্রাচ্য ছন্দ প্রকৃতির ব্রহ্মত তালটিকেই অভিজাত দার্শনিক্য স্থান দিতে চাননি। তিনি কাব্যদার্শনিক্যে প্রচলিত বৈদিক ছন্দকেই syllabic রূপ দিতে চেয়েছিলেন। আর

সেখানেই তার এই অভিনব syllabic ছন্দে যৌগিক ছন্দেরই প্রতিস্থাপন ও পূর্ণসমাবেশ-বিধি দেখা যায় এবং এই syllabic ছন্দেও যৌগিক ছন্দেই সূত্র, তাল ও ধ্বনি-পাঠ্যীকী ফুটে উঠেছে। অথচ ছন্দটা syllabic বলে তাতে যৌগিক ছন্দে দুস্তাপ্য একটা অভিনব ধ্বনি-বৈচ্ছিন্নতাও দেখা যায়। এখানে ওবিধের বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব নয়। সংক্ষেপে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, তার এই অভিনব ছন্দে স্বরূপ ও যৌগিক ছন্দের ধ্বনি-বৈচ্ছিন্নতার সমাবেশ ঘটেছে। তাই তাতে যৌগিক ছন্দের প্রধ-বিস্তৃত অঙ্গ শৈথিল্য নেই; কারণ, এই ছন্দের প্রায় সর্বত্রই (এমন কি শেষের অন্তঃ) দুয়ধ্বনির বিশিষ্ট উচ্চারণকে পরিচায় করা হয়েছে। অথচ তাতে স্বরূপ ছন্দের নৃত্য-পরায়ণতাও নেই; কারণ, তাতে যখন যখন প্রতিস্থাপনের প্রথাকে বর্জন করে বহুলেই মূলপঙ্ক্তির ব্যবহার করা হয়েছে। এ ভাবে শিঙ্গেজলালের এই অভিনব syllabic ছন্দে স্বরূপের চটুপতা ও যৌগিকের অঙ্গ একতানা সূত্র বর্জিত হ'য়ে একটি অভিনব গৌরবশক্তি জেগে উঠেছে, যার সন্ধান আমরা পাই ইংরেজি Iambic ছন্দের কবিতায়। আর, শিঙ্গেজলালের এই syllabic ছন্দেই প্রবহমানতা অর্থাৎ enjambement আনা সম্ভবপর ইংরেজির মতো। আমাদের পরিচিত স্বরূপে enjambement আনা সম্ভবপর বলে মনে হয় না। বাংলার syllabic ছন্দে প্রবহমান কবিতা রচনা পঙ্ক্তিসমূহ কবির আবির্ভাবের ঐতীক্ষ্যর আছে। বাহোৎ, এবার ছয়কটি পৃষ্ঠায় নিয়ে আমরা বক্তব্যটিকে বিশদ করছি।—

- (১) নিম্নার প্রদর্শিত উর্ধ্ব অসীম স্থানীয় নভতলের মানচিত্রে, একা,
পঙ্ক্তেছিন্নাম প্রহ-তার-নীহারিক-মুকুতর
লীলাসরী দেখা।

—বিপণীক (২), আলোচ্য।

- (২) নির্দেশ অমাবতা রাজি; ওরে আছি উর্ধ্ব
হাতে মাথা রাখি;

বাড়ীর সবাই সুনিয়ে গেছে; ঘেঁষে আছি বাড়ীর মধ্যে
আমিই একাকী।

পৃষ্ঠ রাজির মতকারে মগন নক্ষত্রপুঞ্জ

চেয়ে দেখি ঘুরে;

ভাবি এত মতামোহিত কি মত উৎসবে উর্ধ্ব
মতামুখে ঘুরে।

—সত্যসুন্দ, আলোচ্য।

বলা বাহুল্য এই পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠি syllabic ছন্দে রচিত। অথচ আমাদের বহু-পরিচিত স্বরূপের তালে বা তালীতে পঙ্ক্তে গেলে মনে হবে এই পঙ্ক্তি-কটি একে-বারেই অগাধ। কিন্তু ৮+৮+৮ ব্যতির যৌগিক ছন্দের তালীতে পঙ্ক্তেই এ ছন্দের পঙ্ক্তি ও সৌন্দর্য্য অতি আশ্চর্য্যরূপে ফুটে উঠবে। এটা syllabic ছন্দ, অথচ তাতে যখন যখন ঐক্য-বলি নেই। এখানে সর্বত্রই মূলপঙ্ক্তির চাল যৌগিকের মতো। তাই এখানে স্বরূপের চটুপ নৃত্য-পরায়ণতার অভাব। এখানে ধ্বনির পাঠ্যীকী যৌগিকের মতো; তার কারণ মূল-পঙ্ক্তির ব্যবহার। অথচ এখানে যৌগিকের একতানা অঙ্গ সূত্র নেই; তার কারণ দুয়ধ্বনির বিশিষ্ট উচ্চারণের অভাব। যদি দেখা হ'তো "নির্দেশ আঁধার রাজি" তার'লেই 'দেখ' এবং 'রাজ'-কে টেনে প'ড়ে বিশিষ্ট উচ্চারণ করতে হ'তো এবং তাতে ধ্বনিও একটু বিশিষ্ট হ'তো। এই পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠির বর্ধা ধ্বনি-পাঠ্য চক্ষে রবীন্দ্রনাথের "নিদ্র-তরঙ্গ" (মানসী) এবং "বর্ধশব" (কবিতা) কবিতার সঙ্গে। এই দুটি কবিতার সঙ্গে এই পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠির ধ্বনিমিত সাধু ও পার্থক্য কোথায় তা' এই কবিতাভঙ্গি পর পর আকৃষ্টি করলেই অনায়াসে ধরা পড়বে। এখানে আর বেশি বিশ্লেষণ অনাবশ্যক। শিঙ্গেজলাল যে টুকু প্রচলিত স্বরূপ রচনা না করে যৌগিককেই syllabic রূপ দিতে চেয়েছিলেন তার নিদর্শন রয়েছে "মানচিত্র" এবং "মুকুত" এই দুটি কথায়। কারণ ছন্দ syllabic হ'লেও এখানে "মান্" এবং "মুকু"-কে যৌগিকের কাছাকাছি টেনে পঙ্ক্তে হচ্ছে। অবশ্য "মুকু"-এর ম-কে অকারান্ত উচ্চারণও করা যায়।

আমি এক প্রবন্ধে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, রবীন্দ্রনাথও এক সময়ে বৈশিকের ছন্দোবদ্ধকেই syllabic রূপ দিতে চেয়েছিলেন। তার নিদর্শন আছে “হবি ও গান”-এ। এখানে সেকথার পুনরুক্তি করতে চাইলে (শব্দগুণ, ১৩৩৮, মাঘ প্রহরা)। এখানে শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, রবীন্দ্রনাথ কখনও স্বরবৃত্ত ছন্দে রীতিমত বৃত্তপূর্ণ চালাতে চেষ্টা করেননি। সত্যেন্দ্রনাথ কিছু কিছু ব্যবহার করেছেন, খুব বেশি নয়। কিন্তু ক্রিয়েন্দ্রনাথই পুরোপুরি বৈশিকের ভঙ্গীতে বৃত্তপূর্ণের ব্যবহার করেছেন syllabic ছন্দে। অবশ্য তিনি যে বিবৃত্তপূর্ণিক স্বরবৃত্ত রচনা করেননি, তা’ নয়। তাঁর রচনার স্বরবৃত্তের বৃত্তপূর্ণিক ও বিবৃত্তপূর্ণিক এই দুই রূপেরই প্রচুর নিদর্শন আছে। আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

গভীরা তামলী রাত্রি; বিষমপং ঘুমিয়ে গেছে;

আকাশ হুকে চতুর্দিকে ঘিরে আছে মেঘে; ইত্যাদি।

—সিরাগড়কোলা, আলোখা।

এটো চতুঃস্বরপূর্ণিক স্বরবৃত্তের ভঙ্গীতে রচিত নয়; ৮+৮+৮+৮ unit-এর বৈশিক ছন্দের ভঙ্গীতেই রচিত। তিনি প্রতিপদে আট “অক্ষরের” পরিবর্তে আট সিলেবল ব্যবহার করেছেন—বৈশিকের সঙ্গে এ ছন্দের এই মাত্র পার্থক্য। এই ভ্রমই তিনি এই syllabic ছন্দেও অস্বত্বাচ্ছেই “গভীরা তামলী-রাত্রি”-র মতো বৃত্তপূর্ণের ব্যবহার করতে পেরেছেন। আট unit-এর দীর্ঘ ত্রিশদী বা দীর্ঘ ত্রৈশদীকে যেমন তিনি syllabic রূপ দিয়েছেন, ৬ unit-এর লঘু ত্রিশদী, ত্রিশদী ইত্যাদিকেও তেমনি তিনি syllabic আকার দিয়েছেন। যথা—

(১) চান্দটি বোসে হাসে

শান্ত নীল্যাকাশে;

জানি না কোন্‌ প্রাণে

রহেছে সেখানে,

এ ডাক শুনেও বসি’

কটিন পরং-শব্দ।

—স্তন মাত্র, আলোখা।

(২) বাজে মুখ ধাঁধা ৬ ভাইনের ভাল কাণ্ডিল
সারসে ছুপালী। রানিগৈ;
সঙ্গে বুড়াগৈতে, ৬ কটাচ্ছে, হাসিতে,
কে তুমি সো হত-। ভাদিনী।

—নর্দকী, ঐ।

(৩) নাইক তাত্তে ছন্দ, ৥ অহুপ্রাণের গদ,
তোমার এ কর্তব্য। নিষ্ঠাতে;
নাইক তাত্তে হয় ত ৬ না মা বুলি বেনী,
ভাই ভাই শব্দ প্রতি। পূর্বাতে।

—ভক্ত, ঐ।

(৪) খাচ্ছ পোলাও তুমি? ৬ খাও না; পোলাও খেয়ে
আমার চেয়ে তোমার ৬ বাড়েনিক দুখা;
পোলাও তোমার কাছে ৬ নরক তেমন খাচ্ছ,
যেমন এই শাকার ৬ আমার কাছে দুখা।

—রাধা, ঐ।

অতি অল্পেই বোকা যায় যে, এগুলি প্রচলিত চতুঃস্বরপূর্ণিক স্বরবৃত্তের কাণ্ডিলার রচিত নয় এবং প্রায় সর্বত্রই চার বরের পরবর্তী ঐক্য-বর্তিত লুপ্ত হ’য়ে বৈশিকের কাণ্ডিলার বৃত্তপূর্ণের উৎপত্তি হয়েছে। তাই আমি এগুলিকে বৃত্তপূর্ণিক স্বরবৃত্তই বলতে চাই। আপনি এগুলিকে চতুঃস্বরপূর্ণিক ব’লে অভিহিত করতে চান এবং আপনাদের মতে হয় স্বরই স্বরবৃত্তপূর্ণের দীর্ঘতম সীমা। কিন্তু “শান্ত নীল্যাকাশে”, “কটাচ্ছে হাসিতে”, “তোমার এ কর্তব্য”, “যেমন এই শাকার” প্রভৃতিকে যদি হয় বরের একেকটি পদ ব’লে ধরতে হয়, তাহ’লে “(ছ’তে) পারবে না কেশাঙ্গ কেহ”, “জলন্ত নক্ষত্রপুঞ্জে”, “গভীরা তামলী রাত্রি” প্রভৃতিকেও একেকটি আট বরের পদ ব’লে স্বীকার করতে হবে এবং হয় স্বর নয়, আট স্বরই স্বরবৃত্তের পূর্ণের দীর্ঘতম রূপ ব’লে মানতে হবে। কিন্তু যেহেতু “বৈরাগ্য পাখনে বুজি”, “বৌদ-বেদনা-রসে” প্রভৃতিকে আট ব্যতির বৈশিক পদ না ব’লে চার ব্যতির বৃত্তপূর্ণ ব’লেই অভিহিত করা সম্ভব মনে করি এবং যেহেতু “নীল কসেবর”, “বাখার পাগুড়ি দেব”, “অন্ধ নিরেছে বাসা”

ঐতিহাসিক আট মাত্রার মাত্রিক পদ্য না বলে চৌমুদ্রমাত্রিক পদ্যেরই মূলরূপ বলাই উচিত মনে করি, সেজন্যই “ক্লদ্য নক্ষত্রপুঞ্জ”, “কি মহৎ উদ্দেশ্যে উৎস” ঐতিহাসিকও আটমাত্রের পদ্য না বলে চতুঃমাত্রেরই মূলরূপ বলা দরকার মনে হয়। তত্পন “(হেবেছ বাচালী ক’রে) মাহুদ করনি” কিংবা “(কালের কপোতজল) গুণগুণজল”-কে ছয় বাতির পদ্য না বলে ৪+২ বাতির মূলপদ্যই বলা; “(নিরে বহুনা বহে) বহু দীপ্ত” কিংবা “(অদ নিরেছে বাধা) কৃষ্ণ বিহারী”-কেও ছয় মাত্রার পদ্য না বলে ৪+২ মাত্রার মূলপদ্যই বলা এবং ঐ এক কারণেই “তোমার এ কর্তব্য” কিংবা “বেদন এই শাকার”-কে ছয় মাত্রের পদ্য না বলে ৪+২ মাত্রের মূলপদ্য বলাই অধিকতর সঙ্গত নয় কি?

আশা করি আমার কথা আপনাকে বোঝাতে পেরেছি।

ভবানী

প্রবোধচন্দ্র সেন

পূনঃ

প্রিয়মত্রে

বিজেত্রালালের স্বরূপ ছন্দ সম্বন্ধে আমার রচনাটির উপর আপনি যে মন্তব্য করেছেন তা’ পড়ে আমার করেকটি কথা মনে হ’লো। এই স্থানে তা’ আপনাকে জানানি। প্রথমতঃ বলা দরকার যে, আলোখ্যর ছন্দের নম্বরে আপনি ছয় মাত্রেরই স্বরূপের ছন্দ-পদ্যের উচ্চতম সীমা বলে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, আপনার পদ্ধতিতে বিচার করলে সেখা বাবে, আলোখ্যর ছন্দের নম্বরেই আট মাত্রকে স্বরূপ পদ্যের শেষ সীমা বলে মানতে হয়— ছয় মাত্রকে নয়। অর্থাৎ ঐতিহাসিক স্বরূপের অতিরিক্ত বীকার করলে ঐতিহাসিক ছন্দও বীকার করতে হয়। মূলপদ্যেই ঐতিহাসিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি।

“ঐতিহাসিক” স্বরূপ সম্বন্ধে আপনি যা’ লিখেছেন তা’ থেকে আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি “বাহু গোলাও তুমি” ইত্যাদি রচনাটিকে আপনি অধিকতর আমার মতোই ব্যাখ্যা করেন; আমাদের উভয়ের ব্যাখ্যাত্মকতার মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু বিশেষণ ও নামকরণের মধ্যে। তাও পূর্ব বেশি নয়। বিশেষণও অনেক বিধেরই আমি যা’ লিখতে চাই তার সঙ্গে আপনার বক্তব্যের পূর্ব পার্থক্য দেখুও না। তবু বেন কোথাও একটু ঘটনা ধরে গেছে। তা’ ঠিক স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারিনি। তাই আপনার করেকটি উক্তি উল্লেখ করে সে-সম্বন্ধে আমার মতামত জানিয়ে দাও।

“বিজেত্রালালের এ ধরনের ছন্দ চার ও দুইয়ের ক্রমে আদৌ রচিত নয়”—এ কথাই তো আমি বলেছি মূলপদ্যে। তিনি সত্যক আমলের বক্তব্য-পদ্যিক “স্বরূপ” অর্থাৎ বৌদ্ধিকের হাতেই এই নোতুন ধরনের syllabic বা স্বরূপ ছন্দকে চালানি করেছেন। কখনো এ ছন্দের বিভাগগুলির মধ্যে কোথাও কোনো ঐক্য-বতির অতিরিক্ত না মনে একেই টানে একেক বিভাগ আত্মিক করে বাগ্ম্যই বিজেত্রালালের অতিপ্রায়। এ বিষয়ে আমার সঙ্গে আপনার মতভেদ আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু বিশেষণের বোঝা আমি প্রতি বিভাগে চার মাত্রের পরে একটি করে বিলুপ্ত বা উচ্চ ঐক্যবতির অতিরিক্ত বীকার করি। আর আপনি প্রতি বিভাগে তিন মাত্রের পরেই একেকটি উচ্চ ঐক্যবতি বীকার করতে চান। “এদের ক্রম তিনেরই”, “এ ক্ষেত্রে আমার কানে তো ঐক্য বতিটা পড়ে তৃতীয় মাত্রেরই পরে—চতুর্থ মাত্রের পরে না”, আপনার এই উক্তি সম্বন্ধে আমি আপনার সঙ্গে একমত হ’তে পারছি। আমার কান কিছুতেই তৃতীয় মাত্রের পরে কোনো বতি বা ছন্দের অতিরিক্ত মানতে সক্ষম হচ্ছে না। এখানে তর্ক চলে না। তর্কের সর্বমুখই অব্যবহৃত; কিন্তু ব্যক্তিগত অস্বস্তির ক্ষেত্রে তার প্রবেশ নিষেধ। আর এক্ষেত্রে

ঐক্য-বর্তি বিষয়ে আপনাদের ও আমাদের মধ্যে কতি-
অসহজিসত পার্থক্যই দেখতে পাচ্ছি।

আপনি লিখেছেন, “স্বরভুক্তের পার্শ্ব হ্রস্ব স্বর যে
একটানা পড়া যায়, এটা বীকার করতে আপনার
প্রকৃতিসত্তা বা কৃতিসত্তা কোনো অনিচ্ছা আছে”।
এরকম সন্দেহ আপনার হচ্ছে। এ বিষয়ে আমার
শুধু উত্তর এই যে, আমার ভেতন কোনো অনিচ্ছাই
নেই এবং একখাটা বোঝাবার জটাই মূল পদ্ধতিনি
অবগারণা করেছিলেন। শুধু হ্রস্ব স্বর কেন, স্বরভুক্তের
পার্শ্ব আট স্বরও একটানা পড়া যায়—একথাও
আমি বলেছি। মূলপার্শ্বের মানেই হচ্ছে এই যে, ছোট
পার্শ্বকে বিচ্ছিন্ন ভাবে আত্মত্ব না করে একটানা আত্মত্ব
করতে হবে। চার-ছয় বা চার-চার স্বরের মূলপার্শ্বের
কথা বহন বলি, তখন আমি এই বোঝাতে চাই যে,
তখন কেবল হ্রস্ব স্বর বা আট স্বর একটানা আত্মত্ব
করতে হবে; এই হ্রস্ব বা আট স্বরের আত্মত্বকে
কোনো ছেদ থাকবে না। “যেমন এই শাকার”, এই
লাইনটিকে আমি একটি মূলপার্শ্ব বলেছি। তার
মানে হচ্ছে এই যে, এই ছয়টি স্বরকে একটানা
পড়তে হবে; এর মধ্যে কোথাও কোনো কাঁক
থাকবে না। কারণ “শা”-এর পরে যে ঐক্য-বর্তিটি
প্রকাশিত, সেটি এখানে বিলুপ্ত বা উচ্চ হয়েছে। অর্থাৎ
আত্মত্বের সময় “শা”-এর পরে কোনো কাঁক বা ছেদ
অস্বীকৃত হবে না। তেমনি “হেমন্তে নিম্নত্ব দ্বিত্ব”,
“কি মন্ব উচ্চত্রে উচ্চত্রে”, “নিশার প্রসারিত উচ্চত্রে”
প্রভৃতিতেও চার-চার বা আট স্বরের মূলপার্শ্ব বন্ধুত্ব
চাই। তার মানে এই যে, এখানে আটটি স্বরকেই
একটানা পড়তে হবে; চার স্বরের পরে যে ঐক্য-
বর্তিটি থাকতে পারত তা’ এখানে লুপ্ত বা উচ্চ হয়েছে
এবং আত্মত্বের সময়ে ওই ঐক্য-বর্তিটি অস্বীকৃত হবে
না। বৌদ্ধিক ছন্দের মূলপার্শ্ব হ্রস্ব বা আট ব্যঞ্জন,
মাত্রাকৃতের মূলপার্শ্ব হ্রস্ব বা আট মাত্রা এক স্বর-
ভুক্তের মূলপার্শ্ব হ্রস্ব বা আট স্বর একটানা পড়া যায়
অন্যায়সেই। কিন্তু তা’ বলে ওই মূলপার্শ্বটিকে

মৌলিক পর্শ্ব হিসেবে গণ্য করে ছন্দ বিশ্লেষণ করা
চলে না। এই আমার বক্তব্য। তাই “যেমন এই
শাকার”-কে আমি মৌলিকপার্শ্বিক না বলে মৌলিক-
পার্শ্বিকেরই মূলরূপ বন্ধুত্ব চাই। তেমনি “নিশার
প্রসারিত উচ্চত্রে” এইটেও আমার মতে মৌলিক-
পার্শ্বিকই মূলরূপ, অষ্টস্বরপার্শ্বিক নয়।

“খান্ন গোলাও তুনি” প্রভৃতির আপনি একাধিক
ছন্দে বঙ্গভাষাপার্শ্বিক মাত্রাকৃতের স্বরভুক্ত প্রতিরূপ
বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু একখাটা দুই বধ্যাধ
হচ্ছে বলে মনে হয় না। ক্রিয়াক্রিয়ালগ্ন্যপার্শ্বিক
ছন্দে বহু কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু “খান্ন
গোলাও” ইত্যাদিকে তিনি বঙ্গভাষাপার্শ্বিক মাত্রাকৃতের
ছন্দে চালাই করেননি। শুভ্রতির হিসেবে বঙ্গভা-
ষাপার্শ্বিকের সঙ্গে এর সাদৃশ্য দেখানো যেতে পারে।
কিন্তু সেটি হচ্ছে বাহ্যিক। কবিতার শিল্প থেকে বঙ্গভা-
ষাপার্শ্বিকের সঙ্গে কোনো সাদৃশ্য নেই। আলোচনার
স্বরভুক্ত মাত্রাকৃতের ধ্বনি মোটেই মিলবে না, মিলবে
বৌদ্ধিক ছন্দেই ধ্বনি। ক্রিয়াক্রিয়ালগ্ন্য নিম্নেও তুমিকার
বলেছেন, আলোচনার ছন্দ তিনি “অক্ষর হিসাবে”
রচনা করেননি, করেছেন সিলেবল হিসাবে। তার
মানে এই যে, তিনি তারতম্যের প্রবর্তিত অর্থাৎ
সাবেক আমলের “অক্ষরভুক্ত” ছন্দকেই syllabic রূপ
দিয়েছেন; মাত্রাকৃতকে syllabic রূপ করেননি। তাই
তার এই নোতুন ধরনের syllabic বা স্বরভুক্ত ছন্দে
অক্ষরভুক্ত অর্থাৎ বৌদ্ধিকেরই ধ্বনিসাঙ্গীর্ষ্য ও শক্তির
পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং “খান্ন গোলাও”
প্রভৃতির ছন্দকে “বঙ্গভাষাপার্শ্বিক মাত্রাকৃতের স্বরভুক্ত
প্রতিরূপ বা counter-part” না বলে সাবেক কালের
মৌলিকপার্শ্বিক “অক্ষরভুক্তের” স্বরভুক্ত প্রতিরূপ বলাই
অধিকতর দাবীতান মনে করি। আপনিও একথা
বীকার করেছেন সেখান হুঁহী হলুহ। আপনি পত্রের
পেছ দিকে লিখেছেন, ক্রিয়াক্রিয়ালগ্ন্যের syllabic ছন্দে
“অক্ষরভুক্তের আবেশ এসে গেছে”, ও ছন্দ হচ্ছে
“সাবেক আমলের অক্ষরভুক্ত ছন্দেই স্বরভুক্ত তর্কমা”।

আপনার এই উক্তি মথো আমার মতের সম্পূর্ণ সমর্থন পেতে সক্ষম হই সন্তোষে। আসল কথা এই যে, আদ্যকার যুগের বহুস্বরপণিক 'অক্ষর-বৃত্তকেই' রবীন্দ্রনাথ বিয়েছেন মাত্রিক রূপ, আর বিজ্ঞানশাল দিয়েছেন syllabic রূপ। তাতে একজন সঠি করেছেন বহুস্বরপণিক মাত্রাবৃত্ত হ্রস্ব, আরেক জন সঠি করেছেন মূলস্বরপণিক স্বরবৃত্ত হ্রস্ব।

এখানে প্রশ্নক্রমে মারেকটি বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটি মাত্র কথা বলতে চাই। আপনি ছয় unit-ভাষা পর্কের বেকোন হ্রস্বের কয়মকে "তিনের কয়ম" বলে ধরে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও তাই করেন (সম্ভবত সঙ্গীতের নজিরে), তাই তিনি ছয় unit-ভাষা সব হ্রস্বকেই "কয়ম" হ্রস্ব বলে অভিহিত করেন। কিন্তু আপেকার যুগের বহুস্বরপণিক 'অক্ষরবৃত্ত' (যথা "প্রভু বৃন্দ লামি আমি তিলক মাপি" ইত্যাদি) কিংবা আধুনিক যুগের বহুস্বরপণিক মাত্রাবৃত্ত হ্রস্বের আসল তালটা তিনের কয়মেই চল কি না, সে-বিষয়ে আমার কিছু সন্দেহ আছে। কিন্তু এক্ষেপে সে-বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করা সম্ভব নয়। শুধিরে বখাষোপা আলোচনা করতে সেপে একটি ন্যতিকুল প্রবন্ধ লিখতে হয়। এক্ষেপে শুধু এইটুকু বলেই দ্বাং হব যে, বহুস্বরপণিক 'অক্ষরবৃত্ত' কিংবা আধুনিক কালের বহুস্বরপণিক মাত্রাবৃত্ত হ্রস্বের তালের বা কয়মের আসল রূপটি আবিষ্কার করতে হলে বাংলা হ্রস্বের সমগ্র ইতিহাসটিকে নিগুণভাবে আলোচনা করতে হবে।

এবার আপনার রচিত দ্বীত-দ্বীত সম্বন্ধে দুয়েকটি কথা বলেই বক্তব্য শেষ করছি। "হ্রস্ব-বিলম্বাদে সাক্ষ্য মাথা সেন্ কবি" ইত্যাদিকে দুই ভাবে আত্মিত করা যায়, তাই বিয়েষণও করা যায় দুই রকমে। যথা —

(১) হ্রস্ব-বিলম্ব। যাবে

সাক্ষ্য মাথা সেন্। কবি!

এই ভাবে কেউ। ধরে

সেন্ কিছু চাই। ক'রে?

এ হ'লো বহুস্বরপণিক মাত্রাবৃত্ত হিসেবে বিয়েষণ। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের "হ্রস্ব" (সমুদ্রপত্র, ১০২৪, চৈত্র), "স্বনের মাহু" (বনবাণী, পৃ: ১২১, পাঠটীকা) এবং "সহস্র পাঠ" (প্রথম ভাগ, পৃ: ৪০) দ্রষ্টব্য। আর উদ্ধৃত পাক্তিগুণিক নিয়োরূপেও আত্মিত এবং বিয়েষণ করা যায়। যথা —

(২) হ্রস্ব বি। সম্বাদে। সাক্ষ্য মাথা। সেন্ কবি।

এই ভাবে। কেউ ধ'রে। সেন্ কিছু। চাই ক'রে?

এ হ'লো মূলস্বরপণিক মাত্রাবৃত্ত হিসেবে বিয়েষণ। প্রতিপক্ষে আট মাত্রা না ধরে চার মাত্রা ধরেছি। এ বিক্রে কিছু নজিরও আছে আমার। যথা —

হিসা কি সম্বাদে চার কালই থাকবে রে

থাকবে কি সম্বাদে!

স্বনের বীন্ড ভবে জান্ ক'রে কোন্ সোমে

নাও তাতে ধর্ম্য?

—সভাপ্রনাথ, হ্রস্ব-সহস্রী, ভারতী,

১০২৪, বৈশাখ, পৃ: ২০।

এই দুইটি দ্বীতের ধ্বনি অবিকল এক। প্রতিপক্ষে চার মাত্রা, তিন স্বর এবং প্রথম স্বরটি গুণ অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক। তক্য শুধু এই যে, একটিকে আট পর্ক, মজ্জিত হর পর্ক এবং শেষ পর্কের শেষ ধ্বনিটি গুণ। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, সভাপ্রনাথ দ্বিতীয় দ্বীতটির হ্রস্বকে বলেছেন "মূলপর্কিকা", ত্রিপরিকা বলেননি। এই নজিরে আমিও আপনার রচিত দ্বীতটির প্রতিপাক্তিত চার পর্ক ধরতে চাই, দুই পর্ক নয়। সুতরাং প্রতিপক্ষে হর স্বর থাকার প্রমাণ হ'লো না। আপনিও সে-কথা বীকার করেছেন।

এবার আপনার "হ্রস্ব-বিজ্ঞান হাই" ইত্যাদি দ্বিতীয় দ্বীতটি সম্বন্ধে বলছি। আপনি নিজেই বলেছেন এটি হ্রস্বাধি ধ্বনি। কিন্তু কেন? কারণ, প্রথমত এখানে আপনি "সম্বাদ ভাবে" স্বরমাত্রিকভাবে বর্জন করতে চেষ্টা করেছেন, দ্বিতীয়ত আপনি এটিতে বিজ্ঞানশালার ভায়ে মৌসিকের ধ্বনি আদ্যের চেষ্টা করেননি, তৃতীয়ত এখানে প্রতিবিজ্ঞানে চতুর্থ স্বরের পরে

ঐক্য-বন্ডি মতে কোন ক'ক না রাখার চেষ্টা করেছেন। বাহোঙ্ক, আমি কিং এটিকে চতুর্-পর্নিক বস্তুতই বস্তু, যদি কিছু বস্তুতই হয়। অর্থাৎ এটি ৪+২ বরেরই হয়, তবে চতুর্ বরের পরবর্তী ঐক্য-বন্ডি পুণ্ড বা উচ্চ হ'বে ব্যক্ত্যতে একটানা আয়ত্তি করতে হবে; একেকটি বিভাসের মধ্যে কোথাও কপিকের জড়ও থাকতে হবে না। কিন্তু তা হ'লেও তাসো সোনাতে না। কারণ, আপনি সমাগ তাতে সর্বত্রই জিন বরের পরে একটি ক'রে ঐক্য-বন্ডি স্থান করতে চেষ্টা করেছেন। তাতে ঐক্য-বন্ডি দ্বারা বিচ্ছিন্ন অংশগুলির মাত্রিক ওজন অসমান হ'বে পক্ষে; কোথাও হয়েছে তিন মাত্রা (যথা—‘ও কবি’ ‘কি ধ'রে’), আবার অল্প হয়েছে পাঁচ মাত্রা (যথা—‘বাহুল্যে বার’, ‘ক'ব হার’); ভই মাত্রিক ওজনের অসমানতাকেই এটন মূল্যবাতার অভাবের প্রধান কারণ বস্তুত হবে। এই অসমানতাকে দূর করলেই কবিতাটি মূল্যবাহ হবে। একম করা বার দুই উপায়ে। প্রথমত' আপনার প্রথম দুটাভটির মতো এটিকে দ্বিবর-চতুর্মাত্রিক বস্তু-মাত্রিকে পরিণত ক'রে। দ্বিতীয়ত' নির্যোক্তরূপে এটিকে বিভক্ত চতুর্মাত্রিক মাত্র্যরূপে পরিণত ক'রে। যথা—

হৃদ-বিচারে ছাই লাফ, মাথা জগা কবি!
এই ভাবে ধ'রে কিল্লা বার কিছু নেওড়া যে?
তোমার নিফুল স্ট্রী কান হায় নয় নবী,
মন কুলে রেখে বার কান কুলে সেজা যে।

আপনার দৃষ্টান্তে সো-ব স্থানে ঐক্য-বন্ডি আছে,
এখানেও অবিকল সেই স্থানেই ঐক্য-বন্ডি রাখা হয়েছে;

কিন্তু তিন বরের পরে স্ট্রী বা অস্পষ্ট ভাবে অস্পষ্ট করার মতো ঐক্য-বন্ডি রেখে বিভক্ত (অর্থাৎ বস্তুমাত্রিক না ক'রে) এবং মূল্যবাহ বটুবরপনিক বস্তুত হুল রচনা করা সম্ভব নয় ব'লেই আমার মনে হয়। কবিতা আমার কথা অগ্রমাপিত করলে আমিও স্ত্রী হব, বাংলায় হৃদস্পন্দও বাড়বে। সত্যপ্রনাথ দ্বিবরপনিক হুল রচনা করেছেন, বটুবরপনিক হুল রচনা করেননি।

পরিশেষে একথা বলা বরকার যে, দ্বিভাষ্যলাপের ‘আলেখ্য’ ভাবের বস্তুত বা syllabic হলের ধ্বনি বস্তুগতি সম্বন্ধে আমার মজ্জা আপনার মনে পেয়েছে মনে আনখিত হয়েছি। আলেখ্যের হুল যে পূর্ণ-বিভাস, আয়ত্তিতরী, কনিসাতীর্ঘ্য ইত্যাদি বিক্রে বৌদিক হলের সমধর্মী, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ‘বৌদিকী পরবৃত্ত’ নামটা পছন্দ হয় না। কারণ ‘বৌদিক’ বস্তুত কবির সংগীত ও বিশিষ্ট রূপের সম্বোধ বোঝার আমার মজ্জা মতে। কিন্তু বস্তুতে তো ওরকম সম্বোধনাধন ওহলের প্রকৃতিগত বিধানের বিরোধী। তাই ‘বৌদিকী’ এবং ‘বস্তুত’ এই পরস্পর বিরুদ্ধধর্মী পদ-জুটির যোগে ‘বৌদিকী বস্তুত’ নামকরণ করতে খট্কা লাগে। বাহোঙ্ক, লগতে নামের মূল্য মতই হোঙ্ক, নামের চেয়ে বস্তুগত মূল্য তেনে বেশি এক আলেখ্যের হলের বস্তু সম্বন্ধে আবারে মধ্যে সম্পূর্ণ মতামা হয়েছে। অতএব আপনাকে আমার আয়ত্তিক আনন্দ জাপন ক'রে পরমখানি শেষ করছি।

ভবদীয়

প্রবোধচন্দ্র সেন

স্বাভাবিক দর্শন ও বিজ্ঞানশাস্ত্র

ইংরেজের

ঐতিহাসিক

আপনার প্রথমটি আমাকে আসে পাঠ্যপুস্তক ব'লে বিশেষ দৃষ্টিতে। কারণ, এতে ক'রে উক্তের আবার আর বা-কিছু বদলার আছে, ঐ সঙ্গে একটাই "উপস্থাপনা" হাশ'বার সুযোগ পাওয়া গেল। এরকম আলোচনার গতিই লাভ আছে। বিশেষ এই ক্ষেত্রে যে, বরফের গলে উঠত বরফ। সে ছাড়া হ'তে পারে, এ-আলোচনা ঐতিহাসিকের কাছেই চিত্তাকর্ষক হবে।

এখানেই ব'লে রাখি, বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনার বৈশিষ্ট্য-বস্তু হ'লে সত্যে আপনার কথাতত্ত্ব প'ড়ে আমি অত্যন্ত পুলকিত হ'য়েছি। আপনার এ-বিজ্ঞান ঐতিহাসিকেরই পড়া কর্তব্য — শুধু পৌরবর্ষী কবি বিজ্ঞানশাস্ত্রের অসামান্য হৃদয়গ্রতি। সত্যে নোহুন আলো বিলুপ্ত ব'লে নয়, এ-থেকে বাংলা বস্তুত ও বৈশিষ্ট্য হৃদয়ের মূল বস্তু সত্যে অনেক নোহুন জান বিলুপ্ত ব'লেও বটে। আমি নিম্নের সত্যে একথা অন্তর্ভুক্ত করণেই বস্তুত পারি যে, বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনার বৈশিষ্ট্য-বস্তু হৃদয়ের অসামান্য দৃষ্টি — austerly — ও পৌরব আদর্শের বরাবর চমকিত করলেও তাঁর এ-হৃদয়ের শক্তিমত্তার সোচ্চার কারণটি আমি আপনার মতন ধরতে পারিনি। এক্ষেত্রে আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সময়ে শুধু আর এইটুকু বলব যে, হাস্যনিক হিসেবে আপনার গভীর অন্তর্ভুক্তি আছে ব'লে আমার প্রথম থেকেই যে দৃঢ় ধারণা হয়েছিল, 'আমি তা' বহুল হ'য়ে গেল। যারা বলেন, আপনি শুধুই জানেন শুধু নয়, তাঁদের কথার আর কোন সেবার প্রয়োজন দেখিনি। এবিষয়ে পণ্ডিত ভাষ্যের সঙ্গে আপনার তুলনা ক'রে আমি একটুও বাস্তবায়িত করিনি। রূপ শুধুই তাঁর বিশেষ মনে তাঁর অন্তর্ভুক্তি যেমন রূপ-বিশেষের

হক কাটতে শুরু করে, কবিতা পড়লেই আপনার অন্তর্ভুক্তি তেমনই আপনার মনের তরীতে তাঁর গুহময় হৃদয়পটীকায় পরিণত হয়। এ-বস্তু প্রাতি (intuitive) দৃষ্টি, গাণিতিক (mathematical) বৈশিষ্ট্য নয়। বাস্তব, আমার শুধু প্রত্যেকটি মাত্র কথা বদলার আছে, সেগুলি মূলত 'আমি মৌল মনে করি, তা' হ'লেও পূর্বে বলা ভালো, — যেহেতু এখানে একটু মন্তব্য হ'লেই বই কি।

আপনার প্রধান নীতি এই যে, বিজ্ঞানশাস্ত্রের "আলোচনা"

বাহ্য শোনাও তুমি
আমার চেয়ে তোমার
শোনাও তোমার কাছে
যেমন এই শাকার

বাও না শোনাও খেয়ে
বাহ্যনিক কথা
নয় তেমন বাহ্য
আমার কাছে কথা

ধরনের গাণিতিকের চার ও দুই বস্তু মতর "বাহ্য শোনাও। তুমি : বাও না শোনাও। খেয়ে" তাহে ঐক্যব্রতি বিশেষ পূর্ণতা কর্তব্য। ঐক্যব্রতি বিলুপ্ত ক'রে দিবে যে হৃদয়ের বৈচিত্র্য আনা যায় মাত্র, নোহুন হৃদয় সৃষ্টি করা যায় না — আপনার এ মূল নীতিটি আমি মানি। কিন্তু আমার অন্তর্ভুক্তি বলে, বিজ্ঞানশাস্ত্রের এ-ধরনের হৃদয় চার ও দুইয়ের কমনে আলো রচিত নয় — এদের কমন তিনেরই। এ হৃদয় ঠিক দ্ব্যর্থকগণিত মাত্রাত্মক বস্তুত প্রতিক্রিয়া বা counter-part অর্থাৎ দ্ব্যর্থকগণিত মাত্রাত্মক মাত্রার কারণের বস্তুত বলেই এই হৃদয় প'ড়ে গঠে। বলা, যদি লিখি :

বাহ্য শোনাও
আমার চেয়ে তব
তব হৃদয়ে
বলা শাকার

বাও না তা খেয়ে
বাহ্যনিক কথা
নয় তব বাহ্য
আমার কাছে কথা

তাহ'লে একটা আর একটার তেমনই ঐতিহাসিক হবে

যেমন মাত্রাত্তর পদ্যের যৌগিক পদ্যেরের প্রতিরূপ।
 দৃষ্টান্ত : যেমন মাত্রাত্তর পদ্যেরের লাইন
 নৃপং স্তম্ভরিয়া | আলো-চক্ষা | হচ্ছে
 নৃপং স্তম্ভরি'বাও | বিদ্যা-চক্ষা | এই
 যৌগিক পদ্যেরের লাইনের প্রতিরূপ।

আপনি ঠিকই লিখেছেন—এক বিচারে শেষ
 আদ্যাত্তর কান বা অক্ষপ্রতি। কিন্তু সুদৃষ্টি এই যে,
 আমার একমাত্র বস্তুকেও আমার শেষ নমির বা
 রেকারী হচ্ছে আমার ঐ অক্ষপ্রতিই। সে আমাকে
 বলে যে, “যেমন এই শা। কাঃ। আমার
 কাছে। দ্ব্যর্থঃ” এভাবে বিশেষণ বিশেষ্যসমূহের ঐ
 ধরনের লাইনগুলির দ্ব্যর্থ হ্রস্বোত্তর বা কসম ধরা
 পড়ে না। কেন পড়ে না, বোঝাতে এছকের দুই
 একটি লাইন উদ্ধৃত করতে চাই তাঁর “আলোচ্য”
 থেকে—কেন না তাতে বোঝা যাবে যে, এছক
 জিনের কসমেই তিনি রচনা করেছিলেন ও জিনের
 স্পষ্ট বা উচ্চ বোঝেই আদ্যাত্তর পঠনীয়। অত্যাধিক
 বলতে গেলে বলা যায় যে, বিশেষ্যসমূহের এ
 ছক হচ্ছে অবিকল প্রাকৃতিক মাত্রাত্তরেরই মতন,
 কেবল মাত্রাত্তরে ব্যক্তি (unit) হচ্ছে মাত্রা (mora),
 এছক (বিশেষ্যসমূহের “নর্তকী”, “রাধা” ও “নেতা”
 কবিতায়) ব্যক্তি হচ্ছে স্বর (syllable) ;—ছটি মাত্র
 দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হবে তাঁর “নর্তকী” কবিতাটি
 থেকে—

- (১) নৃদ্ব্যোতি ব্যক্তি | কাড়ে কাড়ে জলে
 প্রবৃত্ত সে নাট্য | মনিয়ে
 (২) ভালোবাসা চাহে | ভালোবাসা আর |
 কানী চাহে শুধু | কানী

(১)-এখো যায় যে, দ্বিতীয় লাইনটি যাব দিলে
 প্রথমটিকে বিভক্ত মাত্রাত্তর ক’রে পড়া যায়—“নৃদ্ব্য”
 ও ‘ব্যোতি’-কে আগাবা করে পড়লে। (২)-এ
 একথা আরও স্পষ্ট। ও দ্ব্যর্থ মাত্রাত্তর। অত্যাধিক
 স্বরভুক্ত এরকম গোটা লাইনও তিনি দিয়েছেন।
 কিন্তু কেন দিলেন অত্যাধিক ছক হ’লে? এই ক্ষেত্রে

যে, এটা কানে একটুও খারাপ লাগে না। লাগবার
 কথাও নয় যে। কারণ, জন্মের কসম অবিকল
 এক। তবু যে আপনি কেন এছককে ভেঙে
 গার-স্বরের কসমে ভাগ করতে চান, তার কোনো
 সমর্থনই আমি খুঁজে পাইনে—এই ছাড়া যে স্বরভুক্তের
 পরে ছয় স্বরকে একটানা পড়া যায়, এটা স্বীকার
 করতে আপনার প্রকৃতিগত বা প্রতিগত কোনো অনিচ্ছা
 আছে। এ-অনিচ্ছার কথা আমি সন্দেহ করছি
 আপনি এই কথা লিখেছেন ব’লে যে, “শা”-য়ের
 পর ঐক্য-বহিষ্টি আপনার “অস্বাভাবিক” লাগে—
 “যেমন এই শাক্য” লাইনটি পড়বার সময়ে। কিন্তু
 একথা আপনার চেয়ে কেউ বেশি জানে না যে, কানের
 অনেক অনিচ্ছাই প্রথমটায় জোর ক’রে অস্বীকার
 করতে হয়—কসম বিভিন্ন কানেরই নোতুন ছন্দো-
 বৈচিত্র্যজ্ঞান জন্মায় ব’লে। অত্যাধিক স্বরভুক্তের বেলায়
 একথা বিশেষ ক’রেই খাটে, যেমন বরীজনাথের
 “মরি মরি অ | নম সেব | তা” ও “পথিক ম |
 চরণে প্রণ | তা” ধরনের লাইনে। কান একটু
 শিথিল হ’লেই এগেবে রস পায় কিন্তু এ-থিকা না
 নিলে পড়তেই পারে না। * এর কথা আপনাকে
 বলা মানে নিউকাসলে কল্যা নিয়ে যাওয়া—অথবা
 গ্রামা ভাষার : কামার-বাড়ী ছুঁচ বেড়তে যাওয়া।
 তবু যে একথা বললাম, সে শুধু এই ক্ষেত্রে যে আপনি
 “শা”-য়ের পরে ঐক্য-বহিষ্টি দিতেই হবে একথা ইঙ্গিত
 করেছেন। কারণ, আপনি বলেছেন : “পোলাও
 তোমার কাছে……” ধরনের পংক্তিগুলির “ঐক্য-
 বহিষ্টি” প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না রেখে আয়ত্তি করলেও

* এ-ই অস্বাভাবিক দৃষ্টান্ত দেই, অত্যাধিক স্বরভুক্ত। ছটি
 লাইনের অর্থ এই কানে এল দেখুন

লোহা কি	গর প্রাণ	সেই মো ঘির	মম যে মল	সে
মুগ মল	দিয়ে না মরি	ফিলসে মল	লগে যে ধীর	সে

এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় পদের সঙ্গে অত্যাধিক স্বরভুক্ত প্রথমটার
 একটু অস্বাভাবিক লাগে, কিন্তু এ-রপরে (সাঙ্গীতিক পরিভাষায়)
 “আর্চি”-এর ক্ষুদ্র স্বর হল আসে বাকি ? দ্ব্যর্থ : অস্বাভাবিকতার
 দৃষ্ট প্রমাণ নয়।

হয়ত চার ঘরের পরে আসলো একটি ছের থেকে যায়।" অনেক ঈশ্ব-বতি সবচেই একথা যাতে লেখক নেই, কিন্তু এক্ষেত্রে আমার কানে তো ঈশ্ব-বতিটা পড়ে তৃতীয় ঘরেরই পরে—চতুর্থ ঘরের পরে নয়। কাজেই চারের পরে ঈশ্ব-বতির আভাস পেতেই হবে, এমন কোনো বাধাবাধকতা মানি কী ক'রে বলুন দেখি?

শেষত আপনাদের একটি কথার লামান: প্রতিবাদ করার চেষ্টা ক'রে এ-চিঠির সমাপ্তি টানি।

আপনি লিখেছেন, "গোলাও তোমার কাছে..." লাইনগুলির "তৃতীয় পাঞ্জির ঈশ্ব-বতিটি স্পষ্টই লুপ বটে, কিন্তু অত্র পাঞ্জিগুলির ঈশ্ব-বতি ওভাবে স্পষ্ট বিলুপ্ত নহে। অতঃ ইচ্ছা করলে সব পাঞ্জির ঈশ্ব-বতিগুলিকেই প্রায় বিলুপ্ত ক'রেও আয়ত্তি করা যায়।" শুধুকে আপনি সিদ্ধান্ত করছেন যে, এ-পাঞ্জি-গুলির প্রত্যেকটিতেই চার ঘরের পরে একটি ক'রে ঈশ্ব-বতির প্রত্যাশা। কানের পক্ষে স্বাভাবিক। আমার কিন্তু মনে হয়, এ-প্রত্যাশা সোড়াল থেকে না রাখলে—সর্ব্বাঙ্গ বরষতের পরে উচ্চতন বরষাধার লীমা সবচেই কোনো নিশ্চিৎ ধারণা না প'ড়ে মনটাকে খোলা রাখলে এমন কথা মনেই আসে না। হয়েছে কি, সম্ভবত আপনাদের মনে বরষতের পরে উচ্চতন বরষাধা চার এই ধারণা 'আ প্রায়রি' বৃহৎ—তাই এই প্রত্যাশা আপনার কানে ধোঁপেছে, এবং যদি কোনো ভালো হৃদয় আসে থেকে মনে ধোঁপে না রাখেন যে, বরষতের পরে ছয় ঘরে একটানা হৃদয় রচনা অসম্ভব, তাহ'লে তাঁর কানে এ প্রত্যাশা জাগ'বেই না। কাজেই তখন তিনি এছন্দকে চার-ছয়ের কয়দে না প'ড়ে অতি সহজে জিনের (তিন সিলেক্টের) কয়দেই প'ড়ে যাবেন—যেমন বঙ্গা-পবিক স্বাভাবিক পাঞ্জিকে প'ড়ে যাবেন তিন মাত্রার কয়দে। একথাটা পুরোপুরি প্রমাণ করা কঠিন—কারণ তর্ক যখন হ'ল ছন্দে দুইয়ের বোঁটার দিবে পৌছয় তখন কোনো বিলম্বসেই চরম নিশ্চিতি

সহজলতা হয় না। তবু চেষ্টা করব আমার বঙ্গবাসিক প্রতিশ্রুতির কয়দে—দৃষ্টান্ত দিবে। প্রথমে বরষাধিক হৃদয় দৃষ্টান্ত দিই, কারণ এর বোঁক বেশি প্রকট—

হৃদয় বিলম্বসে
এই ভাবে কেউ ধ'রে
মন খোলা বড়শি
তুলবে কি হৃদয়ে?

সাক্ষ্য মাথা সেন্ কবি!
নেব কিছু চুট ক'রে?
নাই রাখা হার, তবী
পর্কেতে ছয় ঘরে?

এখানে আমি প্রতিপক্ষের আট মাত্রা ও ছয় ঘর গুণি। তবে আপনি হয়ত বলবেন, এক আধা-আধি ভাগ ক'রে চার-মাত্রা ও তিন ঘর যোগাই উচিত এই ভাবে "হৃদয় বি। সম্বাসে। সাক্ষ্য মাথা। সেন্ কবি" ইত্যাদি। কারণ আট মাত্রার পূর্ণ মানতেও আপনার আপত্তি আছে যে। কাজেই ঠিক প্রমাণ হ'ল না। তবু যে এ দৃষ্টান্ত বিস্ময় সে শুধু দেখাতে যে, কোনো পক্ষে ছয় ঘর ঠেসেও হৃদয় চরমকার পাবলীল থাকে। আম্মা একে এখন নির্ভল্য বরষতে ঢালাই করা থাক—

হৃদয় বিতর্কে ছাই
এই ভাবে কি ধ'রে
তোমার নিতুল গুটি
মন্ খুলে রাখ'লে যায়

সাক্ষ্য মাথা ও কবি!
যায় কিছু নেওয়া যে?
ক'ল হার নয় নবী,
কান খুলে সেওয়া যে।

এক্সে আপনাদের পূর্ণতাপ মান্য হ'লে এই ভাবে ছেদ টানতে হবে:

হৃদয় বিতর্কে ছাই। তোমার নিতুল। গুটি।
মন্ খুলে রাখ'লে যায়। যায় কিছু নেওয়া যে।
কান খুলে সেওয়া। রাখে।

কাজেই কেবল চারটে লাইনের মধ্যেই পাচটি হৃদয় বেথাম্মা অস্থানে বণ্ডন করতে হ'ল। কিন্তু শুধু অস্থানে বণ্ডন ব'লেই আমার আপত্তি নয়। আমার প্রধান আপত্তি এই দ্বন্দে যে, এভাবে — চার-ছয়ের কয়দে — এছন্দকে পড়লে এর বরষণ ও বরষি বোকাই যায় না। — বরষা-বতির দিক দিয়ে এ-ও বরষাধিকারি স্বতন জিন ঘরেরই কয়দে রচিত ব'লে।

আমি আমি আমার খেবের দুটাভট্টের হৃদয় পূর্ব সূত্রাবা
নয়; তার কারণ, এতে আমি অত্যন্ত সন্ধ্যা তাই
অধ্যাত্মিককে ও বাস্তবতাকে একিয়ে চম্বার ডেটা
পেরেছি—অনেকটা extreme point-এ বাবার ক্ষেত্রেই।

কিন্তু এছাড়াও ফিলোজফাল সঙ্কেই সাবলীল করেছেন
জিনের নৃত্যশক্তি দিয়ে। ঐটো এই যে, তাতে
অনেক ক্ষেত্রেই আদ্যকার সুগর জিনের কথনে
অক্ষরভুক্তের আদ্যে এসে গেছে যথা: (ভক্ত কবিতা)

কিন্তু কবিতা আর | বিনা অঙ্গাঙ্গ্যে | বিনা হৃদয়ের কোমো | বারিবে
যে কান্ড করে | হলা বাহিষ্ঠা | সহব-এ বন | গাথিতো
হেমচন্দ্রের “কহিল কৃতান্ত। তাকি অচ্যুতের”.....

“হিকল্পে যোগ্যিত। বার” বরণের প্যক্তির সঙ্গে
এর ডিউয় লাইনের সূচনা করলেই একথা
প্রতীক্ষান হলে। হেমচন্দ্রের এ জিনের হৃদয়ের সঙ্গে
ফিলোজফালের জিনের হৃদয়ের তফাৎ এই যে,
হেমচন্দ্রের বাটী (unit) ছিল হৃদয় (বীজনাথ

হৃদয়ের কোনো) পর্তু ছুটির দিকে তাকালেই একথা
বোকা বাবে। হুতরাং আমার প্রতিপাত এই যে,
এছাড়াও সাবেক আদ্যের জিনের কথনে রচিত
অক্ষরভুক্ত হৃদয়েরই বরভুক্ত তর্জনা অথবা এ-আদ্যের
বহুভাগ্যিক সাবলীলতার বরভুক্ত প্রতিরূপ। এক কথায়
জিনের কথনই এর চাল, ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতির বিচার
এতে প্রাসঙ্গিকই নয়—অবান্তর।

তবে বলেছি এ মৌল বিচার। তবু এ-তর্ক জুগেছেন
ব’লেই বাহ্যিক ছোটো কথা শুধিরে বলায় ডেটা পেলাম।
হৃদয় মতে মিলবে না। না মিলুক। তবু আপনি
হাস্যনিক হিসেবে আমাদের কাছে টিরবিনই নবত
থাকবেন বিশেষ তাই বৌদ্ধিক হৃদয়ের গণনা-পদ্ধতি,
সত্যেন্দ্রনাথের বরভাগ্যিক হৃদয়ের তর্জনা ও ফিলোজফালের
বৌদ্ধিক-বরভুক্ত হৃদয়ের বহুভুক্ত বৃত্তিরে দেবার ক্ষেত্রে।
একটি এক আপনিই করতে পারতেন। নেপোলিয়ন
কলতেন না — Generals are born, not made?

Generals কথাটির জায়গায় prosodists কথাটি
বসিয়ে দিতে চাই আমি।

ইতি—

গুণমুদ্র

শ্রীদিলীপকুমার রায়



৩ ফুটেন মুখোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত রচনা

শিষ্টাচার*

বিভিন্ন বস্তুবর্গঃ কর্তৃক বিভক্ত ভবতি শক্যম্।

এতানি মাত্ত্বানানি পরীক্ষ্যেৎ স্বয়ংকৃতম্।

মহু ২য় অধ্যায়—১৩৬ শ্লোক।

বিভা, কর্তৃ, বস্তু, বস্তু, ধন অহ্মন্যে নন্দন ও সমাসের ন্যূনাদিকা হইয়া থাকে, বখাযোগ্য সমাসের সহিত অত্যাধিকারি শিষ্টাচারের প্রধান অঙ্গ।

শিষ্টাচার গ্রীষ্মকালে বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। গ্রীষ্মক, উত্তীর্ণান্নই হউন, সমানার্নই হউন, আর যোগ্যাদি হউন তাঁহার বৃহতা ও অসহায়ের কথা মনে থাকার সমাবস্থ পূর্ণ হইতে তাঁহার প্রতি আচারের প্রত্যেক ঘটনা উঠে।

শিষ্টাচার প্রদর্শনের বিশিষ্ট পাত্র

(১) সেবক পূজনীয় বা পরম পূজনীয়বর্ণ—

(২) সমান্তর পূজনীয়বর্ণ—

(৩) মাত্ত্ববর্ণ—

(৪) সমকক্ষবর্ণ—

(৫) যোগ্যাদিবর্ণ—

(৬) অল্পপ্রহাঙ্ক্যবর্ণ—(দ্বার পাত্র)

(৭) অজ্ঞাতকুলবর্ণ অতিথি ও বাচকবর্ণ

(উদাসীনের পাত্র)

(৮) প্রজিবর্ণ—(উপেক্ষার পাত্র)

সামান্তর

* পারিবারিক, আচার ও সামাজিক এক প্রকৃতির জ্ঞান একখানি শিষ্টাচার এক লেখার ইচ্ছা। ৩ ফুটেন বাবু যিনি উক্ত হইয়াছিল; ঐ পাঠ্য বস্তুগুলি 'মোট' মাত্র তাঁহার কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহারই কয়েকটি অসমাপ্ত প্রকল্প থাকা আবার উত্তরে লক্ষ্য পাইয়াছি। উক্তের পাঠ্যবর্ণ সেই সর্বদিক্‌শী মহাশয়ের বস্তু হইত। ঐ সমান্তর 'মোট' উক্তির ভিতর বিধিও দেখিত পাইলে, তাহার হইত। অর্জন, গতিপত্রী ও পিতৃপুত্রের সম্বন্ধে কথোপকথন রহিত।

সম্পাদক—উৎকল

১। পরম পূজনীয়বর্ণ—

পূজন্য — পিতা, পিতামহ, মাতামহ, আচার্য্য, দীক্ষাগুরু প্রভৃতি।

গ্রীষ্ম — মাতা, পিতামহী, মাতামহী, আচার্য্যা ও গুরুপত্নী প্রভৃতি।

২। পূজনীয়বর্ণ—

পূজন্য — পিতৃব্য, মাতুল, ছোট ভাতা, বড় ভাতা ইত্যাদি স্বজন, বসন্তের বিশেষ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, বিশেষ বিশেষ জ্ঞানী শোক, যোগী, সন্ন্যাসী, পিতৃদিত্তের মতা প্রভৃতি।

গ্রীষ্ম — পিতৃব্যপত্নী, মাতৃব্যপত্নী, পিতৃব্য, অগ্র-পত্নী, ছোট ভনী প্রভৃতি।

৩। মাত্ত্ববর্ণ—

পূজন্য — রাজা, রাজপুত্র, কৃষাদিকারী, বসন্তের ও বিশেষের বস্তু..... (শোকের ভাতা)

গ্রীষ্ম — রাজমহিলা প্রভৃতি.....

৪। সমকক্ষবর্ণ—

পূজন্য — সমবয়স্ক ভাতা, সমবয়স্কী, সমকক্ষী, সমবয়স্কী, সমবয়স্ক ভ্রাতৃ ও ভ্রাতৃপত্নী ইত্যাদি—

গ্রীষ্ম — একই ব্রাহ্মণের দ্বারা বাইতে পারে না, কারণ তাঁহার প্রতি আচার নির্দেশ করা অসম্ভব। তিনি সমকক্ষ, যোগ্যাদি, আচার্য্য এবং অগ্রপ্রাণী। কলম: সামান্তর: সমস্ত ও বসন্ত সমাবস্থ গ্রীষ্মই ইহার অন্তর্ভুক্ত।

৫। যোগ্যাদিবর্ণ—

পূজন্য — পুত্র, ভ্রাতৃপুত্র, ছাত্র, শিষ্য প্রভৃতি এবং সমস্ত, বিভা ও ধনাদিতে বিশেষ ভ্রাতৃ বা হইলে বসন্তকর্তৃক সমস্তই ইহার অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীশয় — কক্সা, কনিষ্ঠা ভবিনী, কনিষ্ঠা ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মপুত্রী, ভাবিনী, পুত্রবৎ, প্রতিবেশী-
বিশেষ কক্সা—

৬। অমৃতপ্রাকাসী ও আশ্রিতবর্ণ—

পুত্রবৎ — প্রজা, ভূতা, রক্ত, নাপিত, গোপ,
তৈলিক, মালিক প্রভৃতি বাহ্যাত্ম গৃহবৎ
নিজা ব্যবহার্য্য ব্রহ্মাদি নিয়মিত রূপে দান
করে।

শ্রীশয় — দ্বাদশ প্রভৃতি —

৭। অতিথি ও বাচকবর্ণ —

যদেশীয় বিদেশীয়ভেদে পূর্বাধিকারভেদে বাচক-
বিশেষ প্রতি আচার বিধিঃ। শ্রীপুত্রবৎভেদেও
যে বিভিন্ন তাহা বলা বাহুল্য।

প্রতিবেশীবর্ণ —

ঘন, বিজা, বহুপ, বংশ, নৈকট্য প্রভৃতি
বিবেচনায় আচারও বিভিন্ন হয়।

রাজাকে মানবর্ণের অন্তর্গত বিবেচনা করা হইল,
কিন্তু পূর্বকালে এদেশে রাজা দেববৎ পুত্রবৎ ছিলেন।

পিতা পুত্র প্রভৃতির শিষ্টাচার বিষয় বিবেচনা
কেবল বাহ্য গৃহীতে মাত্র। গৃহের অভ্যন্তরে ইহার
পরম্পরের আশ্রিত আশ্রয়ণীয় নিয়ম এবং সৎ-
পরামর্শদাতা—

(অনুশাসন)

মূলতঃ শিষ্টাচার শব্দের অর্থ অতি দুরদারী ; শিষ্ট-
শব্দে বস্তুি প্রভৃতি যে সপ্তর্ষি এবং তথ্যাবি-বাউল্লগ
গৃহবীর প্রেরণকালেও অবশিষ্ট থাকিবেন বলিয়া উক্ত
হইয়াছেন, ঐহাদিসকে দ্ব্যর্থ ; স্তম্ভর্য্য প্রকৃত প্রত্যবে
তদুৎপন্ন বহুভবনবিশেষ আচারকে শিষ্টাচার বলিতে হয়।
তাহা হইলেও প্রতি বৃত্তি বিধিত সন্যাস শাস্ত্রাচারও

ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া যায়। এই লক্ষ্যই শিষ্টাচার
শব্দের শাস্ত্রীয় দ্ব্যর্থ্য তাৎপ কথিয়া ইহার উল্লিখিত
লোকপ্রসিদ্ধ সৌভাগ্যই লক্ষ্য হইয়াছে। মূলবিশেষে
শাস্ত্রাসিদ্ধেও শিষ্টাচার শব্দের এই সৌভাগ্যই গৃহীত
হইয়াছে। নিম্নোক্ত মহাতারতীয়া লোকে শিষ্টের লক্ষণ
বলা হইয়াছে—

ন পাণিপাসচপলো নাত্তচপলো মুনিঃ—

নবাসচপলঃ ইতি শিষ্টের লক্ষণম্ ॥

(ভূদেববাবুর একখানি পত্র)

২৬শে ফেব্.

নাহুয়া

মোবিন্দু! — *

কলা বৈকালে এমন একটি কাজ করিয়াছিলাম
বাহা ইচ্ছাশ্রের মধ্যে কখন করা হয় নাই।—(বোকা)
চড়িয়াছিলাম—পড়িয়া বাই নাই।—এখনে শরীর এবং
মাথা একবার কেমন কেমন করিয়াছিল, ছাপাখানার
গাফাইয়াছিলাম। হঠাৎ ভূমিকম্প উপস্থিত হইলে ঠিক
ঐক্স হয়! কিন্তু ঐ ভাব ঈর্ষাই সারিয়া গেল এবং যদিও
আদর্শে ছোঁয় পাইলাম না, তথাপি বোধ হইল যেন
বোকা বোড়িসেও পড়িয়া গাটব না। কিন্তু লাসামটা
এক হাতে ধরিতে পারি নাই—যে পর্য্যন্ত তাহা না
নিষিদ্ধেই সে পর্য্যন্ত শান্ত তাহেই থাকিব।—বলিও
শরীর ভাল না থাকিলে বুড়া বয়সে বোকা চড়িবার ইচ্ছা
হইতে পারে না।

ততাব্দী

শ্রীভূদেব সুখোপাধ্যায়।

* বিজয় পুত্র মোবিন্দু এবং সুখোপাধ্যায়



বিশ্রাম

শিল্পী — শ্রী অরবিন্দ ঘোষ

['উদয়নে'র আলোকচিত্র-প্রতিযোগিতায় তৃতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত]

সাদে জাক্স আনা

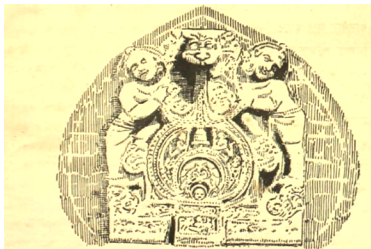
শ্রীকালিদাস রায়

চলে কাল্মলিনী নারী শিরে বহি পশরার ভার
ছোটখাট পণ্যে ভরা, ঘোমটায় ঢাকা মুখ তার ;
আগে আগে চলিয়াছে—হাতে ক'টি কাচের গেলাস—
দশ বছরের মেয়ে শুক মুখ ছিন্ন তার বাস,—
চাঁৎকারিয়া চলিয়াছে—সাদে চার আনা, সাদে চার—
প্রতি বাড়ীটির পানে ফুকরিয়া উঠে একবার ।
ভিকারে থিকার দিয়া মগোরবে উঠে অই বাণী
দুধারের গৃহে গৃহে লজ্জা পায় দাসহের মানি ।

একি স্বর ! একি স্বর ! আছে ধ্বনি নাই তায় মন
বারবার যন্ত্র হ'তে নির্গলিত গীতের মন্তন,
চকিত শব্দিত তবু । সারা পল্লী কাঁপারে তা ছুটে,
কণ্ঠ পেয়ে সারা পথ ব্যাধার ফুকরি বেন উঠে
তার বহুদিনকার ভুলে-যাওয়া ফিরে-পাওয়া স্বরে,
সারাহের রাস্তা বায়ে কোঁপে কোঁপে সে স্বর বিহরে ।
খুলে যায় দুই পাশে গৃহে গৃহে ঘর বাতায়ন,
নয়নে উৎসুক করে, স্তব্ধ বিস্মিত শ্রবণ
শুনি সে অপূর্ব গীতি । মোর চিত্তে চিন্তা করে ভিড়
অজানা অস্বস্তি ঘোর প্রাণ মোর করিল অস্থির ।
বাঁধা বুলি পেয়ে যায় শূন্যদৃষ্টি অন্তর্যম্না মেয়ে
প্রাণের নিহৃত ব্যাধা কণ্ঠপথে কাঁকটুকু পেয়ে
উজ্জ্বলে উদ্বেল হয়—পরিণত করে হাহাকারে
পথ-বেলাতির সেই সাধারণ অজান্ত চীৎকারে ।

পিতৃহীনতার বাধা,—অশরণা মায়ের বেদনা,
 দারুণ কঠরকালো, রোগশোক, লাঞ্ছনা, গল্পনা,
 প্রবলের উৎপীড়ন,—মনে হলো আরও কত বাধা
 দিয়াছে ও কঠকথের তীক্ষ্ণ হ্র, কারুণ্যঘনতা ।
 একটু মমতা যেন তিষ্ঠা মাসে ও হ্র করুণ ।
 অল্প ভিখারীর গান এর চেয়ে নয় নিদারুণ ।
 ভাবিলাম কিনি কিছু,—বুঝিলাম অধীতর হ্র
 পথে নাথি,—দুইজনে চলে গেছে দূরে—বহু দূরে ।

এমনি করিয়া কত করুণার্থী হৃদয়-দুহারা
 করাঘাত করি যায় নিরাশায় ফিরে বারে বারে ।
 আমরা ভয়ঙ্কর থাকি, ব্যাধিভের কাতর ক্রন্দনে
 মাধুর্যের আবিষ্কারে, সূক্ষ্ম দুঃখতত্ত্ব বিশ্লেষণে ।



শ্রীমদ্রীস্মমোহন সুখোপাধ্যায়

জীবনটাকে বৃহৎ জানিয়া তুমি লড়িয়াই চলিয়াছি !
হারিত্রা, ভীষণ হারিত্রা—অভাব আর অভাবোপ !
এ সর্বের সঙ্গে বাহুবল এক লড়াই লড়িতে হয় ! পদে-পদে
পরাজয়, তবু জীবন করিয়া পড়ে না—ইহার চেয়ে
বিশ্বের ব্যাপার ছনিয়ার আর কি আছে ?

হেসেন্দেবা হইতে মনে কেবলি উচ্চ-আশা-ভর
রোপণ করিয়া আসিতেছি ! দিকে দিকে যে আনন্দ,
ঐশ্বর্যের যে প্রাচুর্য ... তার একটি কথা আশ্রয়
আদৃত করিতে পারিলাম না ! তবু এ-লোকের যেমন
বিরাগ নাই, আমার বিদ্वाংও তেমনি সে-অভাবের
কালো মেঘ চিরিয়া আশ্রয় চমক দিতে ছাড়ে না !

শিখি, তুমি শিখি — গরু আর উপভাস। লোকে
বলে, লেখাটা আমার আসে ভালো ! কলনার তুলিতে
যে-সব নর-নারীর হৃদি আঁকি, বাস্তবের সঙ্গে তাদের
মিল তেমন না থাকুক, সে-হৃদি লোকের ভালো লাগে !
কিন্তু ঐ পরিত্রষ্টক ... এ ভালো লাগাইবার জন্য
খাটিয়া যে মারা হইতেছে, কি করিয়া তার দিন
চলে, সেদিকে কেহ ফিরিয়া চায় না — এমনি সকলে
উদাসীন !

ভাড়া শ্যাওলিতে মেন। সেই স্রোতের একটা ঘরে
পড়িয়া আছি। ভাড়া কখনো দিই, কখনো দিতে
পারি না। যখন দিতে পারি না, তখন ভাড়া বাই !
ভাড়া বাইয়া কাসেমের বাড়িল গুলিয়া বসি, — বসিয়া
আট-বশ-বারো-বোল পুঁজা ভরিয়া কথিয়া গল্প শিখি,
শিখিয়া মালিক পত্রের ঘরস্থ হই। আমার লেখার
প্রতি তাদের দয়া আছে, বিরাগ নাই — জানি।
বেকেতু পাচজন পাঠক আমার লেখা চায় ! কিন্তু
কাসেমওয়াল পতীর মুখে বলে, — আবার গল্প !
কাসেম আমার কৈ ?

আমার বুক ধক্ ধক্ করিয়া উঠে ! কাসেম একটু
শাস্তি করিয়া না দিলে আমার মাথা ভাঙিয়া

আশ্রয়টুকু যে বসিয়া যায় ! মিনতিতে কণ্ঠ ভরিয়া
বুহুধরে বলি—বা হয়, যেবেন। একটা শিখিহিস্ত ...

কাসেমওয়াল অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকে !
দীর্ঘ-বাসের বোকার আমার বুক ভরিয়া উঠে।
নিকপার আঁঠের কণ্ঠে বলি — বেহাং কিরে বাবো ?
আমার বড় অভাব !

কাসেমওয়ালার মুখের গানে তাকাই। বুখ তার
যারো গভীর ! টেকিলের ভ্রমার টানিয়া গণিয়া গণিয়া
গাভটা না আটটা টাকা তুলিয়া আরো গভীর মুখে
সে বলে — গভটা রেখে তবে এই নিরে যান !

হায়রে, পুঁজা দশটা টাকাও নয় ! কিন্তু উপায় কি ?
সেই সাত-আট টাকাই লক্ষ টাকার মত যত্নে কামালে
বাঁধিয়া যেয়ে ফিরি। টাকা তিনেক কাছে রাখিয়া
পাঁচটা টাকা বাড়ীওয়ালাকে তুলিয়া দিই, বাড়ির
স্বরে বলি — এই পাঁচ টাকা রাখো, ভাই ! তারপর
এবার যে উপভাসখানা কেঁদেছি ... ন'খানেক টাকা
কপি-বাইটের জন্য পাবেই, আশা আছে !

সেই আশা ! ছরানার পাহাড়ে চড়িয়া আমার
শ্রমে নিরাশার গল্পের গড়াইয়া পড়ি !

জৈর মাসের দিকে আর পুজার সবওয়ে হুঁচার
টাকা হাতে আসিয়া দ্রুত। কাসেম-কাসেম তখন
বেন বাচ-খেণার বাঁধি ! দিকে-দিকে নহবৎ বাড়িতে
থাকে ! বাঁধা রোপ-নাইয়ের ব্যবস্থা ! 'শীতলা ভূমিতা'
কব ! উহারই মধ্যে পাঁচ-সাতখানা কাসেম তখন
একটু চড়া-ঘরে গল্প বিচার !

সম্মতি হুঁএকজন নূরন প্রকাশক উপভাসের জন্য
আসিয়া তাহা দেখে। এ-পথে তারা নূরন পথিক,
একবারে আমায়ের হারিবার চোঁতা করে না ; কাসেমই
হাহাতে বাঁচি, বাঁচিয়া নতুন হায়ে তাদের হুঁচকিখানা
নভেল সোপাইতে পারি, সেদিকে লক্ষ আছে।

বিনয়-বচন ও পল্লা তারা নেয়! কে-সব কাসক বা বইজালা বাড়ী-ঘর বানাইয়াছে, বুকে তারা পাথরফুটি মত হত পাথর গইয়া বলিয়া আছে—বলে না, টলে না! বাঘের রক্ত-মাংস বেচিয়া পল্লা করিতেছে, তারা বাঁচিবে কি বাইয়া, সেমিকে লক্ষ্য নাই—বেব পাখা-গেউলের খেবতা! পায়ে মাথা কুটীয়া মরিলেও এক ভিল বিচলিত হয় না! তাদের চোখের সামনে নিত্য রক্ত নক-নব পেশক আসিতেছে, বাইতেছে... সেমিকে নম্র দিতে সেলে তাদের বাবসা চলে না!

এক-একবার মনে হয়, বাঙলার পাঠক-পাঠিকাদের ডাকিয়া বলি, — যদি কেহ তোমাদের আনন্দ দিয়া থাকে, বা আনন্দ দিবার ঐত লইয়া থাকে তো সে এই আমরা, আমরা!... তোমরা জানো না, ভালো বাবাই, ভালো ছাপা ঐ বইগুলির পাঠক-পাঠার আমাদের প্রাণের রক্তবানি আমরা ঢালিয়া দিই! না বাইয়া, না পরিয়া, পাণ্ডুরাঘারদের লাফনা, প্রেক্ষাক্ষকের হাফল অবলো গহিয়া কে-প্রাণ প্রতিফলে ছিঁড়িয়া বাইতেছে, সেই প্রাণকেই কোনোমতে শুধাইয়া তুলিয়া বইয়ের পাঠার ধরিয়া দিই! আমাদের প্রাণ বেচিয়া মোড়লার উপর উহার তেজা বাড়ী ফুটিতেছে, আর আমাদের বাড়ীজালা গ্যাংসেতে ঘেঁষের ভাঙ্গা অন্ধকার ঘর হইতে বাড় ধরিয়া দিনে তেজিবার আমাদের গথে বাফির করিয়া দিবার লজ্জা হজ্বার ছাফিরেছে!—ইহার প্রতিকার তোমরা করিবে না? বাহাতে এই সব 'শাইলকে'র হাত ছইতে আমরা নিত্যর পাই!

কিন্তু বুঝা ক্রমশ! বুঝা এ আত্মনাশ! পাঠক-পাঠিকারা বইয়ের লজ্জা রাখে! সে-বই যে দেখে, তার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক? এত লজ্জা রাখিতে সেলে চলে না—জীবন বড় কুহ, কণিক, অবদর বড় অম।...

থাকিয়া থাকিয়া যন যেন আক্রোশে জলিতে থাকে! যদি সে-উপায় থাকিত! হুতো বিরোট অধি-রাখে অপরি। 'বিস্ময়বিরাসে'র মত ছনিহাকে দহ করিয়া ছাইয়ের নীচে ঢাপা দিতাম! তার এ কে-বরদ অমের মত ঢাকা পড়িয়া বাইত!

আবার সেই পূজার মরওম! হুঁচাটিটা দহ লিখিতে পারিলে হাতে কিছু পল্লা আসিবে— সে পল্লার জৈল হাল পথ্য মোটা অভাবওলা...

যবে আশ-কাঠের ছোট তক্তাপোনে বসিয়া দহ লিখিতেছি। কামরার অপর সাথী বামিনী ইনসিজের অ অফিসের কেতাপি। সন্ধ্যার একটা টিউবনির হোপাফ করিয়াছে—সেই টিউবনি-চাকরি রাখিতে দিরাছে! এমন সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এক জ্যোতি জল্লোক। তার পায়ে পরদের কোট, হাতে মোটা লাঠি। মাথার চুল সাধা। চেহারাখানি বেশ বনিরাগি শোছের।

তখন সন্ধ্যা হু-হুয়। আবার তক্তাপোনের পায়ে ছোট জানলা। সেই জানলা দিয়া আলোর বে বস্তিটুকু তখনো ভাসিয়া আসিতেছিল, সেই আলোয় লেখা চলিতেছিল। অভ্যাস! অ'ধারের জীব—অ'ধারেও কলম চলে! আলোর লজ্জা পল্লা লাখে। সে-পল্লা কে দিবে? কাসক হইতে চোখ তুলিয়া সঞ্জর দৃষ্টিতে তার পানে চাহিলাম। নুতন কোনো পারিয়ার না কি? প্রাণে আশার কলক...

জল্লোক কহিলেন—এই বাড়ীই তো 'আরাম-নিবাস' বেশ—এত নম্র বাড়ী?

কহিলাম—হ্যাঁ। বহন।

জল্লোক চাচিবারে চাহিলেন,—এইটেই না মোড়লার পশিম-মিকের ঘর?

কহিলাম—হ্যাঁ।

জল্লোক কহিলেন—এই ঘরেই আমাদের অনাদি থাকে?

অনাদি! কি জানি, কি মনে হইল, বালি তক্তাপোনের পানে তাকাইয়া কহিলাম—হ্যাঁ।

জল্লোক কহিলেন—আমি তার গুত্তর।

কহিলাম—ও!

জল্লোক কহিলেন—অনাদি তো বই লিখেই চলাচ্ছে। অজ কোন চাকরি-বাকরি করে না?

চুই করিয়া পরিচিত হাফাইলুর উপর চোখ ফুলাইয়া

দইলায়! অন্যদি? বেশক অন্যদি! ও! বুঝিলায়, ইনি অন্যদি চাইবোর কথা বলিতেছেন!

টিক — এই বেশের এই কাশ্মারতেই তিনি থাকিলেন। হঠাৎ তাঁর উপভাসগুলার কাটুটি বাড়িয়া যাত্ণায় অবস্থা কিরিয়াছে... তাই কোথায় আলাদা এক-তলা একটা বাসা গুইয়াছেন!

ভক্তলোক অনেক চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, পরে একটা নিশ্বাস কেলিয়া কহিলেন—সে-শ্রীলোকটা এখনো সবে আছে?

ভক্ত নিশ্বাসে বসিয়া রহিলার শ্রীলোক? ভক্তলোক আবার একটা নিশ্বাস কেলিলেন, কহিলেন—হ্যাংল! অথচ কি তার অতাব ছিল? কিছু না! স্বত্তর-বাড়ীতে বাবুর পোষালো না! গুনেটি, শ্রীলোকটা তাইই কোন্ আদীরে বিধবা স্ত্রী! আর বসে বিধবা নয় — তারপর স্বত্তর-বাড়ীতে নানা অত্যাচার—বাবাছীর সমতা হ'লো—তাকে আশ্রয় দিলেন। তারপর থেকেই...

ভক্তলোক খামিলেন; পরে নিশ্বাস কেলিয়া কহিলেন,—যেহেটা আমার ভারী দুখ পাছে! হ্যাংল এত বই লেখে,—আমি পড়িনি — তব গুনেটি, মন লেখে না! সে-সব লেখার নারীর বাখায় ভারী দরম জানায়! অথচ নিষেধ স্ত্রীর বাখার পানে চাইতে জানে না! হ্যাংল! তা, যেহে আমার খুব ভালো, সেই হামীর ধানে তরর! গর দেখা বইগুলো পরলা দিয়ে কেনে! একখানা নয় — ত্রিশ-চল্লিশখানা ক'রে! কিলে জানাওনা যে যেখানে আছে, তাদের বিলোয়। হামীর খ্যাতি হটাবার ভক্ত! হুঁ, বাবী তো ঐ হ্যাংল!

আমি কহিলাম,—বুঝিবে-সুঝিবে তাই তাকে বাড়ী নিয়ে যাবেন বুঝি?

ভক্তলোক কহিলেন—না। সে-শ্রীলোকটাকে সে ছাড়তে পারবে না—শুভ বয়েতে! একটু মজা হ'লো না! সিংখিল—তার স্ত্রীর চেয়ে সে কোন অংশে বীচু নয়। এখন তাকে আশ্রয় দিয়েছে, গুনে ছাড়তে

পারবে না! সে তার জীবনের আশা, উৎসাহ, কল্পনার উৎস... এমন নানা কথা... রাফেল!

আবার বুক কাঁপিতেছিল। পাশের তক্তাপোমে থাকে বামিনী—অন্যদি বাবু নয়... যদি আসে? বলা পড়িয়া বাইব!

তবু লেখক অন্যদিক জীবনের এই স্বতন্ত্রত্ব অনুভব। ইহা হইতে বেশ একটা গল্প বানানো যায়! সে-গল্প লিখিলে পকেটে ছুঁপুলা আসিলে। অন্যদি, সেই নাম-না-জানা বিধবা নারী এবং এই স্বত্তর, আর গৃহকোণ-বাদিনী অন্যদিক যেমনাত্তা পত্নী! তুনিবার কোঁহুল বাড়িয়া চলিয়াছিল। কহিলাম—তা, হঠাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা...?

বাখা দিয়া ভক্তলোক কহিলেন—ঐ যেহের ভক্ত! আমার ঐ এক যেহে! চার-পাচটি গিরে ঐ একটিতে ঠেকেছে! তা মোরেক দেখলে কে বলবে, তার বুক এত বাখা! যা আমার হাসি-মুখেই আছে!... পুতো আসচে, কহিন ধ'রে যেহে বাখনা নিচ্ছে—তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রো বাবা, তিনি বড় দুখে আছেন! তার উপর আমার হৃদ্যো এই, সে-শ্রীলোকটার একটা ছেলে হয়েছে। তারা এখানে নিশ্চয় থাকে না! তোমরা থাকতে নিতে রাজি হবে কেন?

আমি কহিলাম—না, তারা আলাদা থাকে। এখানে তাদের আনোও না কখনো!

ভক্তলোক কহিলেন,—হুঁ! কাণ্ডজ্ঞানটুকু একদম লোপ পায়নি! তা কি করবো, যেহের কথার আসতে হ'লো! এখানে আমার আশা পোষায় না বাবু! তার সঙ্গে দেখা হ'লো না, ভাগই হ'লো! হুঁবিন আপে আসতে-আসতে পিছিতে পেছি! তাকে কথা করা আমার পক্ষে কতখানি দুঃসাধ্য, বোঝো তো!

কহিলাম—বুঝি বৈ কি।

—তা...বামিনী ভক্তলোক পকেট হইতে বড় একটা “পান” বাহির করিয়া তাহার মখা হইতে একতাক্কা নোট তুলিয়া কহিলেন—একমো টাকা আছে। যেহের ইচ্ছা... তাই দিবে বাড়ি! তুনিই রাখে।

সে এলে তাকে দিয়ে। যদি জিজ্ঞাসা করে, ব'লো, তার এক ভক্ত পাঠক প্রাণী দিয়ে গেছে!... যেহেতু এই কথাই বলতে বলতে... আর যদি অত্যাশঙ্কিত, তুমি বুঝতে পারো, আমাকে জানিয়ে— আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসবে। যেহেতু বলে, সে রাজ-ঐশ্বর্য ভোগ করতে, আর তার স্বামী ...

জঙ্গলোকে বর বাধ হইয়া আসিল! কাশিয়া নদীটা দাক করিয়া গইয়া তিনি কহিলেন—এমন দীর্ঘ বাস বুঝলো না! নেহাৎ রাফেল! ... হ্যাঁ, আমার নামটা লিখে রাখো বাপু। চক্রবর্ত্ত বন্দোপাধ্যায়, ৩৭ নম্বর বনভূত রোড, বাদিকতলা। ট্রিক ঐ বাদিকতলার পোলের কাছে ... ছুপি ছুপি যেতো।

টাকাটা টাঁকে শুঁকিয়া তাকাতাড়ি টিকানা লিখিয়া গইলাম। কহিলাম,—টিকানা ট্রিক বুঁজে ধার করবো'ধন!

ভর হইতেছিল—টিউশনি সারিয়া বামিনী যদি আসিয়া পড়ে!

জঙ্গলোক কহিলেন—অবদির কাছে আমার নাম ক'রো না...! বাবুর আশ-স্বানে আঘাত লাগতে পারে... মহাপুরুষ কি না! মহৎ কর্তব্য সাধন করছেন! ঐ, খণ্ড — সে-কর্তব্যের পথে তারা মহা বাধা!...তা হ'লে চলুন। সে বাসায় নেই, ভালোই হয়েছে! আমার ভাবনা ছিল...ব'লো—একজন পাঠক দিয়ে গেছে! না, না, ব'লো,—পাঠিকা! নারীর উপর তাঁর ভারী সম্মান, ভারী দরজা—টাকাটা তা হ'লে দ্বিগুণার্থ্য করতে তাঁর বাগবে না! খণ্ড দিয়ে গেছে তখনো হয়তো স্পর্শ করতে কুণা হবে! রাফেল!

জঙ্গলোক কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বিদায় গইলেন। নীচের সমর অবধি তাঁর সঙ্গে দিয়া সম্মান-প্রদর্শনে ক্রটি রাখিলাম না। পথে মোটর ছিল। তিনি মোটর গড়িয়ে মোটর ছাড়িয়া দিল। আমিও নিখাস কেলিয়া নিষেধ ঘরে আসিলাম।

অত্যাশঙ্কিত বেশ বনাইয়া আসিয়াছে! মোটর

তাক্তা বাহির করিয়া গলিলাম... একশো টাকা... নবম একশো!

একসঙ্গে একগুলা টাকা চুকে কখনো দেখি নাই! ইহ-কক্ষে হয়তো দেখিব না! যুকের মধ্যে বা' হইতেছিল—অবদির চাটুযো, সেই নাম-না-বানা বিষবা নারী, অবদির পত্নী!

সাক্ষীকে মনে মনে নতি জানাইলাম!—ক'রো, এমনি করিয়াই নিষেধ কর্তব্য তুমি সাধন ক'রো! আর তুমি ঐযুক্ত চক্রবর্ত্ত বন্দোপাধ্যায়, বাঁচিয়া থাকো, কৃষ্ণ, দীর্ঘ-দীর্ঘ কাল! তোমার মেয়ের আবার রাখিতে এমনি করিয়া অভাবগ্রস্ত ভাষাতাকে অর্থ-দানে...

বাহিরে হুতার দম! মোটগুলা কাগজের তলায় চাপিয়া রাখিলাম! বামিনী ঘরে প্রবেশ করিল।... কহিল—অত্যাশঙ্কিত ব'লে লিখতো?

কহিলাম—হ্যাঁ!...

—সে কি যে?

কহিলাম,—অত্যাশঙ্কিত লেখকদের চোখ ফলে!—না! জঙ্গলে কৃত-তবিস্তং-বর্তমানের এত গভীর ভাব তারা কি ক'রে পেতো?

বামিনী হাসিল!...

রাত্রি প্রায় সাতকে আটটা। পর সেখা হর নাই, হইবে না! বেজ্ঞ সেখা—টাকা...তাহা তো পকেটে! বামিনী কটন মানিয়া চলে; আহোরামি চুকাইয়া অফিসের একতাক্ত কাগজ প্যাড়িয়া বসিল। আমার মনের সাধনে আলো-করা এক বিজি পুরীর ছবি বাসিতেছিল—উদয়ন-আনন্দের সে পূর্ণী জলমল করিতেছে!

অকিলাম—বামিনী...

—কেন?

—চলো, বারোঘোশে বাই—বহুতো খিয়েচোরে। চাটুয়ার বাগানবাধে

বিশ্ব-ভরা ধূর্তিতে বামিনী আমার পানে চাহিল।

আমি মোটর তাক্তা দেখাইলাম,—কহিলাম—

দেখচো, একশো টাকা! লেখা প'ড়ে এক ভক্ত
পাঠিকা পাঠিয়েচেন — প্রণামী!

যামিনীর ছই চোখ বিস্তারিত! সে কহিল — ঐ
'দিবাহ্যতি গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতি'র লোক দিয়ে গেল
বুঝি?

—না, না! আমার স্বরে তীব্র স্বাভা! আনন্দের
দাক্ষণ মত্ততা! কহিলাম — ভক্ত পাঠিকার প্রণামী!

—প্রণামী!

—হ্যাঁ। আমার জন্ম নয়! অনাদি চাটুয্যের জন্ম।
অনাদি চাটুয্যে ... সে রাষ্ট্রের স্বীকে তাগ ক'রে এক
বিধবাকে নিয়ে অবৈধ প্রণয়-মত্ত হ'য়ে আছে ... আর
তার সাক্ষী স্বামীর হৃৎ-অভাব গুচোবার জন্ম
এ-টাকা পাঠিয়ে দিয়েচে অর্থাৎ তার অসংঘমে ইচ্ছন! ...
হায়রে, আমরা ...? বাড়ীতে বিধবা মা ... ছোট
অসহায় ভাই-বোন! তাদের অন্ন দেবার চেষ্টায়
পাগল হ'য়ে বেড়াচ্ছি! এ-টাকা অনাদি চাটুয্যেকে
আমি দেবো না। কেন দেবো? সে তো কোনো

জুখে জানাইনি! এই অনাদি চাটুয্যে কেনমন লোক,
জানি না — তবে তার স্বী? দেবী! এই দেবীর
প্রসাদ আমিই গ্রহণ করবো। আমার বিপন্ন সংসার —
নারিকাদের কথা শুধু কল্পনায় জাগে — জীবনে কোনো
নারিকা পেলুম না — পাবার নয়! — শুধু এ-টাকা
কেন? অভাব হ'লে চন্দ্রকান্ত বাবুর কাছে যাবো।
অন্ডায়? কিসের অন্ডায়? এই চন্দ্রকান্ত তার রাষ্ট্রকে
জামাইয়ের অভাব না থাকলেও এত টাকা তাকে দিতে
আসে, সে না চাইতে ...! আর আমি? শুধু ঐ
নিষ্ঠুর প্রকাশক আর কাগজওয়ালাদের জুতোর
ঠোঁকোর খাবো? তারা ঠকাচ্ছে — তা জেনেও
অভাবে জর্জরিত থাকবো? না ...

যামিনী কহিল — কিন্তু ...

—কিসের কিন্তু! কিন্তু নয়! এসো তুমি আমার
সঙ্গে — চাটুয্যায়। তার পর এম্পায়ার। আমোদ
করতে চাই আমি ... জয়ের আনন্দ! না, কোনো
কথা শুনবো না। এসো, এসো তুমি!



শ্রীমদভিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বছর তিনেক পূর্বে দক্ষিণেশে ভ্রমণ করিয়া আসিবার সৌভাগ্য আমার ঘটয়াছিল। ৮শতাব্দীতে হুইজেন বন্ধুর সহিত কসিকাতা হইতে মাদ্রাস অভিমুখে রওনা হই। পথে কোকনাদা (কাকনাদ) হইয়া মাদ্রাসে পহঁছাই। মাদ্রাসে এক গুজরাতি পণ্ডিতের প্রেরিত বর্ণনামালায় আমরা কয় দিন কাটাই, মাদ্রাসের ঐহা স্থানগুলি বেশ ভাল করিয়াই দেখিয়া লই। তার পরে আমরা আরও দক্ষিণে ড্রাবিড় বা তামিল দেশের বড় বড় তীর্থ যে করতী রেলের লাইনে পড়ে সেই করতী দেখিতে বাহির হই। কতক পথ মোটর-বাসে করিয়া বাই, কিন্তু আমাদের ভ্রমণ বেশীর ভাগই রেলের হয়। তৃতীয় শ্রেণীতেই সর্বত্র গিয়াছি—মানা কারণে কোনও অসুবিধা অসুভব করি নাই, তৃতীয় শ্রেণীতেও যাত্রীর অভাব ছিল; যাত্রা খুসাইয়া বাইবার ব্যাখ্যাতও হয় নাই। এইরূপে প্রায় মাস ধানেক ধরিয়া কাকীপুর, পাক্কাঠীর্থ, মহাবলিপুর, পণ্ডিতেরী, চিদম্বরম, তাম্বোর, কুম্বকোণম, ত্রিচিনোপলি, মহরা, সেতুবন্ধ-নামেশ্বর, ত্রিবন্দ্রম, কল্লাকুনারী, ওরুঙ্গুম, ত্রিচুড় ও উটাকামণ্ড—এই স্থানগুলি দেখিয়া আসিতে সন্ধ্যা হইয়াছিল।

বাঙ্গালাদেশ হইতে আমরা যাত্রারপক্ষে উত্তর-পশ্চিমেরই চান অল্প করিয়া থাকি, উত্তর-ভারত তাহার সমগ্র প্রাচীন ঐতিহ্যের বৃত্তি লইয়া চিরকাল ধরিয়া আমাদের আকর্ষণ করিয়া থাকে। উত্তর-ভারতের বড় তীর্থ, বড় প্রাচীন নগরী, রাজপুত ও মুসলমান মুসল বড় কীর্তিকলাপ—এগুলির সঙ্গে আমরা বেন এক অদ্ভুত যোগ অল্প করি। কান্দী, গয়া, অযোধ্যা, বিজয়পুর, প্রয়াগ, নূরা, কুবাবন; লখনৌ, আগরা, দিল্লী, অরুণ; আবার হিমালয়ের পাদদেশে ও কোকনাদে হরিদ্বার, লহরীকাল,

কেশার-বরী, পতগতিমাথ। পাঞ্জাব ও রাজপুতানা, বেলাল ও কান্দীর, গুজরাট ও মহারাষ্ট্র—এগুলি তো উত্তর-পশ্চিম ভারতেরই অঙ্গুরি। বাঙ্গালী বেন ঐ সব দেশে বাইবার লজ খুসাইয়া থাকে; পিকিত বা অশিকিত, বনো বা নিধম, সব শ্রেণীর বাঙ্গালীর কাছে তীর্থ বা ভ্রমণ এই দুই উপলক্ষ লইয়া পশ্চিমের আদ্যমান সর্বদা আসিজেছে, বাঙ্গালীও যথার্থকি তাহার সাদা দিতেছে। কিন্তু দক্ষিণেশে তাহার বিপুল ঐতিহাসিক সম্পৎ, তাহার বিরাট মন্দিরালী এবং দেশের লোকদের মধ্যে বিস্তারিত মূল্যবৎ ভক্তি ও ভাবগতি লইয়া বিরাজমান। আমরা বেন সেমিকে নাকীর চান অল্প করি না। আমরা সান্দরদর্শন ও মেঘদর্শন উভয় উদ্দেশ্য লইয়া পুরীথাম পর্যন্ত বাই বটে, কিন্তু তাহার দক্ষিণ বড় একটা হাইতে চাই না। কোনও রকমে কতিপয় সেতুবন্ধ-নামেশ্বরের দিয়া, একটা বড় তীর্থ দেখিয়া বা হুইয়া আসিয়াছি বলিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্তাদ লাভ করি। কিন্তু পুঁটিনাটির সঙ্গে, অন্তরের আনন্দের সঙ্গে সবটা উপভোগ করিতে করিতে দক্ষিণেশ-দর্শন বেন আমাদের হাতে সবে না।

আমরা ভিন্নজন কিন্তু দক্ষিণেশে অনেক কিছু পাইবার লজ গিয়াছিল।—দক্ষিণের ইতিহাস ও কীর্তিকাহিনী, সাহিত্য ও শিল্প—এগুলির সহিত আংশিক পরিচয় স্থাপন করিয়াই গিয়াছিল। দক্ষিণেশে বেননটী আছে তেমনটাই গ্রহণ করিবার লজ প্রেরিত হইয়া গিয়াছিল। সেই লজ আমাদের ভ্রমণ বড়ই সার্থক হওয়া সত্ত্বেও ততটুকু সার্থক হইয়াছিল। আমরা আমাদের ভ্রমণটী সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিয়াছিলাম। দক্ষিণের বিরাট প্রাণের সাদা আমরা বেন পাইয়াছিলাম—কেবল দেশের

বিষাট মন্দিরগুলির মধ্যে নব্বৈ, সাত্তার তীর্থের মধ্যে, নতালবিত্তে ও গানের জলাশয়, হোটেল, ট্রেন, গিয়ারে, সোকায়ে হাটে সর্গর আশ্রয়। প্রাচীন ও আধুনিক ব্রাহ্মণ জীবনের স্পন্দন যেন কতকটা স্ফুটন করিয়াছিল। আমাদের জীবনের সমীক্ষা ও রসোপভোগ অনেকখানি অপূর্ণ থাকিত, যদি এইভাবে ব্রাহ্মণসম্পর্ক আমাদের না থাকিত। এই ক্ষুদ্র ভ্রমণটুকু সমাধা করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আমাদের মনে হইল, ভারতের সনাতন আশ্রয় এক অতি মনোহর ও বিশিষ্ট প্রকাশ আমাদের চক্ষুর সামনে উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। আমাদের মনে হইল, দক্ষিণভারত না দেখিয়া আসিলে আমাদের এই বিষাট দেশের সঙ্গে পরিচয় নিতাতাই অপূর্ণ থাকে। ব্রাহ্মণসম্পর্ক এই ভ্রমণের দ্বিতীয়া চিরকাল আমাদের চিত্তে উজ্জল হইয়া থাকিবে, এই দ্বিতীয়া আমাদের মনকে অপূর্ণ ভাবিত্তির দ্বারা সরল ও উন্নত করিয়া রাখিবে, — এক মাঝে মাঝে দক্ষিণ-দেশের ক্ষুদ্র মনকে মোহাবিষ্ট ও আকুল করিবে।

সবুজ ভ্রমণকাহিনী এখন দীর্ঘ করিয়া বর্ণনা করিতে বলিব না। কি তাহা আমরা চলিয়াছি ফিরিয়াছি, ভ্রমণের সুবিধা অসুবিধা কি ছিল, কি কি দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি, কোথায় বা দক্ষিণের চিত্রকল প্রাণের পরিচয় পাইয়াছি — এ সব কথা লইয়া বারাবারিক রূপে বলা চলে। কিন্তু সে কাহা এখন হাত দিব না। আমি আজ কেবল দক্ষিণভ্রমণ-কালে আমাদের চোখের সামনে দেশের জীবনপ্রবাহের মধ্যে উপলব্ধিত একটি ক্ষুদ্র ঘটনার কথা বলিব। তাহা হইতে একদিক্ দিয়া দক্ষিণের প্রাণের একটু পরিচয় দিগ্গিবে।

ট্রেনে করিয়া চিৎতরম্ হইতে তাম্বোর বাইতেছি। তৃতীয় শ্রেণীর কামরা, আসাম-বেঙ্গল লাইনের মত ছোট লাইন। তখন বেলা প্রায় পাঁচ এগারটা হইবে। গাড়ীতে ভীড় ঘন নহে। সাধারণ লোকের ভীড়, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, ব্যবসায়ী, কৃষক শ্রেণীর লোকই

কেই। মাঝে মাঝে ছোট ছোট ট্রেন আসিতেছে, গাড়ী দুই চারি মিনিট থামিতেছে, লোক নামিতেছে উঠিতেছে। আমরা তিনজনই ছোট। জানালার ধারে বসিয়া। গল্প করিতে করিতে চলিয়াছি। সম্ভাব্যীত্ব মাঝে মাঝে কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া আমাদের বাসালী চেয়ারের প্রতি তাকায়, কেহ কেহ তাকা। তাকা ইতরেজীতে দুই একটা কথা কহিয়া আসাম সম্মাইবার চেষ্টা করে। দ্বিধা-ভালা লোক নিত্যকই বিরল। ছপুনের পরনে আমাদের বাজা কড়ই একঘেয়ে ঠেকিতেছিল, আমরা আমাদের লক্ষ্যহলের আশ্রয় টাইম-টেবল মিলাইয়া কেবল ট্রেনে গুপিতেছি, কখন তাহাদের পদাঙ্ক হইবে। এমন সময়ে মাঝে কি একটা ট্রেনে আমাদের কাছাকাছি হইতে লোক নামিল, ও কতকগুলি নতুন লোক উঠিল। যে বাহার স্থান করিয়া লইয়া বসিল — সেই লাল ও হালধী রঙের সাজ-পরা, মাথা-খোলা, গায়ে হলুদ-বাধা, নাকে নাকহাতি তামিল ব্রাহ্মণনারী। সেই লুপ্তী আকারে কাপড় পরা, মুখোতে সোনার বালা, মাথায় উচ্চ-খোঁপা, কানে হীরার কানকুল, কলকল, খালি গায়ে স্ত্রীর পাড় চাদর কুলানো চোঁটী, সেই হাঁটু পর্যন্ত কাপড়, খালি পা, মাথায় লাল কাপড়ের পালকী, হাতে চুন্ট, তামিল পরীবাসী। গাড়ী ছাড়িয়া গিল। তখন দেখিলাম একটা লোক জাহাঙ্গীর বা লইয়া বা বসিবার চেষ্টা না করিয়া, কামরার দরজার সামনে যেখানে উঠিয়া পাড়াইয়াছিল সেইখানে ঝাঁড়াইয়াই একটা বস্তুত ছুটিয়া গিল। লোকটির চেহারার হঠাৎ দৃষ্টিতে লক্ষীর কিছু ছিল না। বেঁটেখোটে, স্নায়ুশীর্ণ, পদনের মাফা দৃষ্টি লুপ্তী বর্ণে কাছাকাছি না দিয়া কোমরে জড়ানো, কীধে একখানা স্ত্রীপাড় চাদর, মাথার অর্ধেক অংশ কামানো, গাড়ীখোঁপা ফিনচার দিন কামানো হয় নাই, কপালে কিছুটি, দুই কানে দুইটা বড় হীরার কানকুল জ্বলজ্বল করিতেছে, দলীয় একদ্বাহি সোনার হাল, দুই হাতে সোনার নিকটে বালা ছুটিয়া, খালি পা, গায়ে রঙ, বেশ কাশ্মীর। বড় বড় সজ্জ

অথ তস্মৈ নমঃ বিদ্বৎপতীং ধরমের তামিলে বেশ টানিয়া টানিয়া তাহার বলব্য বলিয়া হাইয়েছে, বেন স্তর করিয়া কিছু পাঠ করিতেছে। হুই চারিটা সঙ্কট কথা কানে লাগিল—“দানব—পুণ্যকর্ম (২ মিঃ) শকটকে তামিল করিয়া লওয়া হইয়াছে”—ঐশ্বর-কৃপা—সেবপুত্রন—বর্ধার্বকামমোটন—ইত্যাদি কথা বেন কানে লাগিল। ইহার বল্ভতা গুলিয়া ভাল করিয়া ইহার দিকে তাকাইয়া লক্ষ্য করিলাম। লোকটার হাতে একটি জারমান-সিলতারের ভৈরবী খট হইয়াছে; খটটার দ্বারা প্রচুর লিপুং কুচুম ও চন্দন লেপা, গলায় ফুলের মালা জড়ানো, এবং খটের একটি চাকনী আছে, সেটা খটের দ্বারের সঙ্গে তালো দিয়া খাঁটা। বল্ভতা গুলিয়া মনে হইল, লোকটা ভিক্ষা চাহিতেছে, সেবসেবার মত ভিক্ষা বা চাঁদা চাহিতে বাহির হইয়াছে। লোকটার বঙ্কালো ও কাঁখে পইরা নাই, তাই বুঝা গেল যে, সে ভ্রাম্যন মতে; কিন্তু প্রকৃতই সে কেন ট্রেনের কামরার কামরার ভিক্ষার মত ঘুরিতেছে, তাহা বুঝা গেল না। বানিকসঙ্গ বল্ভতা দিবার পরে, আমাদের অসুমানকে সত্য প্রমাণিত করিয়া সে বাহুনির্মিত খটটা ট্রেনের বাড়ীদের সামনে ধরিতে ধরিতে দাড়ীর এক প্রান্ত হইতে অস্ত প্রান্ত পর্যন্ত হাইবার জন্ত অগ্রসর হইল। করিডর-দাড়ী ছিল বলিয়া ইহা সম্ভবপর হইল। বতকন সে বল্ভতা দিতেছিল, লক্ষ্য করিলাম, ততকন বাড়ীরা একটু স্ফাভিসিক্তভাবে চুপ করিয়া বলিয়া তাহার কথা গুলিতেছিল। বল্ভতা সমাপনান্তে পাত লইয়া একে একে উপবিষ্ট বাড়ীদের সম্মুখে আসিয়া দিতে লাগিল। বাহার সামনে আসিল, পুত্র বা স্ত্রী নির্ভিক্ষেপে সে একটি কি দুইটা পক্ষা কিংবা একটি আনী লইয়া চাকনীর মাথায় একটি ছোঁয়া ছিল, তাহার ভিতর দিয়া খটে কেনিয়া দিতে লাগিল। আমরা এই ব্যাপার দেখিতেছিলাম, এবং ভিনজনে বাঙালী-জগত অপ্রভার ভাবে বলাবলি করিতেছিলাম—“এই বিশ্বের সেনে বেখানে ক্ষতর বিরাট বিরাট বিশ্বের আর

মন্দিরের সেবার জন্ত তার উপদ্রুত বদীদারী আর অস্ত বন্দোবস্তের দ্ব্যর্থকি, দেখানে ঠাকুরপুত্রের খরচের জন্ত সস্ত্রী বাড়ীদের উপর এই ট্যাংক বদানো কেন বাবা?”—ইত্যাদি। ইতিমধ্যে ট্রেনের কতকগুলি বাড়ীর দান লইয়া খটহস্তে সে আমাদের সামনে উপস্থিত। পরমা গড়িলে সে একটি আশীর্বাদবের মত তামিল বাঙা দ্বয় করিয়া বলিতেছে, কেহ কিছু না দিলেও সেরূপ অস্ত বাঙা বলিয়া প্রশান্তমুখে অস্তর হাইতেছে। আমাদের সামনে আসিতেই আমরা ইম্মিতে জানাইয়া দিলাম, কিছু হইবে না—আমাদের মুখে বেন লেশা ছিল—“মাক করো বাবা!” বিকল্পি না করিয়া পাত লইয়া অস্ত বাড়ীদের সামনে দিয়া বাঙা হইল।

ট্রেনে আমাদের পিছনকার বোকে একটি তামিল সহবাত্রী ছিল। লোকটার সঙ্গে হুই একটি কথা হইয়াছিল, হিন্দীতে। অতি সাধারণ মাহুৎ সে। আমরা কি করি সে দেখিতেছিল। আমাদের মধ্যে বোধ হয় অপ্রভার ভাবটা একটু ফুটিয়াই উঠিয়াছিল। সে আমাদের আলোচনা করিয়া বলিল—“মহারাজ, ইয়ে আমরী ক্যা বোলা আপ সম্ভা নেই?” আমি বলিলাম,—“নেহি। উ কোন্ হৈ? পুত্রাকে জ্ঞাত্তে জীং মাহতা হৈ? তাম্হণ তো বেহি?” লোকটা বলিল—“নেহি মহারাজ, নেহি। উও এক বদ্ভা চেট হৈ। তীন চার কপহ্ বে’ উন্কা তীন চার গাবী হৈ। বক্হ কপেয়া হৈ। কই লাখ কপেয়া বরচ করকে এক মন্দিল্ বনায়েগা। সব কপেয়া আপ হী আপ সেনা। পর ভিটুপা (ভিক্ষা) কে জ্ঞাত্তে নিক্শা হৈ। সব আমরীসে এক পরমা সো গল্লা সেনা, কল ভরতী হো জাহা, তব কপেয়া পুত্রা কয়কে মন্দিল্ বনায়েগা। সব সোমকে দান ঔর মদ্য সে মন্দিল্কা কাম পুত্রা করেগা। পুত্রা কামবে সব্হ সস্ত্রী বনায়েগা। ইয়া কদ্দা বহৎ আচ্ছা হৈ, ইয়াসে সব কোই যেতা হৈ।”

ব্যাপারটা বুক্লাম, চোখের সামনেকার পরমা
 যেন কেহ ভুলিয়া দিল। বহুলকটাকার মালিক
 শ্রেষ্ঠ, তিন চারিটি বড় বড় গদীর মালিক, — তামিল
 দেশের চেষ্টা বা শ্রেষ্ঠদের চিরাচরিত রীতি অনুসারে
 তাঁহার ইষ্টদেবের একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প
 করিয়াছেন। তিন চার লক্ষ টাকা খরচ করিবেন।
 কিন্তু এই পুণ্যকাজ তাঁহার একার নহে। সমস্ত
 সমাজের অনুকম্পা ও সহায়তা তিনি চাহেন, সকলেই
 তাঁহার পুণ্যকর্মে অংশগ্রহণ করুক, ইহা তাঁহার প্রার্থিত।
 তাই, তাঁহার যে ব্যয় হইবে তাহা সম্পূর্ণ করিবেন
 ভিক্ষালব্ধ অর্থদ্বারা। কলসটা পূর্ণ করিয়া যে টাকাপয়সা
 হইবে, তাহা যেন তাঁহার নিজের আদৃত অর্থের উপরে
 রাখিয়া তিনি তাহার পূরণ করিবেন। এই জন্ত তিনি
 ঋতুময় ষট লইয়া ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। প্রস্তাবিত
 পুণ্যকর্মের কথা সকলকে বলিয়া ভিক্ষা চাহিতেছেন।
 গোকেও নামমাত্র দান দিতে পাইয়া কৃতার্থ হইতেছে।

এই ব্যাপারটির শ্রবণে যে কতখানি বিনয়
 ও নীলতাযোষ আছে, দেশের ও দেশের প্রতি
 কতটা সন্মাননা ইহার দ্বারা প্রকাশ পাইল, এবং
 সর্বোপরি ইহাতে নিজ উপাভ্যেদের প্রতি কতটা
 তত্ত্বিভাব আছে, তাহা ভাবিয়া আমাদের চোখে
 জল আসিল। আমরা উঠিয়া গিয়া আমাদের যত-
 কিঞ্চিৎ হই এক আনা দান সসন্মানে পাত্রের মধ্যে
 দিয়া আসিলাম, নিজেদের ধন মনে করিলাম।
 দ্বন্দ্বের অজ্ঞাতসারে এই কাজের সার্থকতার জন্ত
 এক প্রার্থনা আমার মনের গভীর অন্তরল হইতে
 আগিয়া উঠিল, এবং এক অবাক আকুলতা আসিয়া
 আমার প্রাণকে পূর্ণ করিল। মনে মনে আমি
 শঙ্কর-নারায়ণকে প্রণাম করিলাম, তাঁহার পতাকা-
 বাহী ভূতা চেঁচিটাকেও প্রণাম করিলাম।
 ইতিমধ্যে পরের ষ্টেশন আসিয়া গেল। আমাদের
 চেষ্টা পাত্তী হইতে নামিয়া গেলেন।



শ্রীরাধারাম দেবী

সোণালী রোদের চিকণ বাঁশিটি নদীর কিনারে বাজে ।
 ওগো হৃন্দর ! কিশোর দেবতা ! এলে এ কি রাজগাজে ।
 কান্ত বরষা সরসা ধরার নবীন সবুজ বাস—
 ঝলকি' তুলেছে রঙীন আলোকে নির্মল নীলাকাশ !
 কালো জলদের আর্দ্র বেদনা ধূমায়িত শোকতার
 ঝরিয়া পড়েনা স্নেহে স্নেহে আজ অঝোর ধারায় আর ।
 গগনে গগনে স্তম্ভশিখরে উৎসব সারাকোলা,
 কুম্ভধবল মেঘশিশুদল দিগন্তে করে খেলা ।
 পুলকে উলসি' উঠেছে সরসী কমলের রূপরাগে,—
 হংসমিথুন-ডানাবিধুনে আগমনী কার জাগে !
 উখলিত তম্বু উতলা নদীর শ্যামতীরে শ্যামাঘাস,
 ঢুলায় চামর চপল পুলকে লীলাচকল কাশ ।
 কুবেরপুরীর কে গো! হৃন্দরী কনক আঁচল পেতে
 সোণার অঙ্গ দিয়েছে এলায়ে! সোণালী ধানের ক্ষেতে !
 শিউলি এঁকেছে খেত আলিপনা সবুজ আঙিনাতলে,
 মল্লিকা দেছে মুকুতার হার কিশোর অভিধিগলে ।
 শেষ কেতকীর স্মরণবিধুর নুতন শিশির মাথা
 বিমল উষসি উত্তরী তার অরুণ কিরণ আঁকা ।
 দিয়াছে গুণানিশিখিনী তারে চন্দ্রতিলক ভালে ;
 রঙীন সৌধুলি ভাঙার খুলি অমৃত বর্ণজালে
 রচিয়া দিয়াছে তরুণ ছুপের রতন-সিংহাসন ।
 সহসা গভীর পরজনে নভ ঘোষে রাজ-আগমন ॥



ঐশ্বরীকূর্গামূর্তি পন্নিচক

কুমারী ছায়া দেবী

দুর্গাপূজা বাঙালির বিশেষ। ভারতবর্ষে আর কোথাও এভাবে শরৎকালে মূর্তিপূজা নাই। অল্প সেবতার মূর্তি সেবাস্থে বা মন্দিরে আছে। এভাবে মূর্তি গঠন করিয়া এত জাঁকজমক করিয়া প্রতিমাপূজা করা অল্প কোন দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্তমান দুর্গা প্রতিমা বাঙালীর নিম্ন। ইহার আদি উৎপত্তি কথায় হউক না কেন, বাঙালী নিম্ন ভক্তি ও রসজ্ঞান দ্বারা ইহার মাহাত্ম্য, মধুর ও শিল্পজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ দেখাইয়াছে। তাবের ও রসের রাজ্যে দুর্গা প্রতিমার একটা বিশেষ জুলা আছে। ইহা বাঙালীর বৈশিষ্ট্য। কুটাইয়াছে।

দুর্গাপূজা হইল নবপঞ্জিকার পূজা। দুর্গা প্রতিমা হইল রূপক; আসল পূজা হইল নবপঞ্জিকার পূজা। এই শরৎকালে ভারতবর্ষের সকল লক্ষ্যদায় নবরাত্রের উৎসব করিয়া থাকে। প্রত্যেক দেশের লক্ষ্যদায়িত্ব দিগ্ মাঝেরই গৃহে আচ্ছিন্নের গুহা। প্রতিপদ হইতে নববী পর্বাৎ এই নয় রাত্রির অল্প চতুর্কার বট স্থাপিত হয়; যেরূপে নববীর পূজা হয়, এবং মার্গশ্রেয়-চতীর পাঠ হইয়া থাকে। বৎসরে নবরাত্রের উৎসব দুই বার হয়; বসন্তকালে ও শরৎকালে অর্থাৎ বাসন্তী পূজা ও শারদীয়া পূজার সময়। হিন্দু-পুণ্ড্রের বিশ্বাস যে, নবরাত্রের সময় গৃহে চতীপাঠ দ্বা হইলে অমরত্ব ঘটিবে। চতীমূর্তি বহু স্থানে আছে কিন্তু কুম্বেনবরে বেঙ্গল চতীমূর্তি আছে সেঙ্গল চতী-মূর্তি ভারতবর্ষে অল্প কোন স্থানে নাই। ইহা সেবিবার ও শিবিবার মূর্তি। একাধারে রক্তমূর্তি ও অস্ত্রা-মূর্তি কেমন করিয়া পাখের মূর্তি করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হিন্দুভাষিত মন্ত্র ও প্রবন্ধ তাহে কুম্বেনবরের চতীমূর্তিতে দেখাইয়া বিদ্যাহে। চতীমূর্তির সহিত বর্তমান দুর্গামূর্তির তারতম্যে বর্ণনা পার্থক্য আছে।

নবরাত্রি পালন ও নবপঞ্জিকা পূজা অনেক দেশে হইয়া থাকে। শরৎকালে নবপঞ্জিকা পূজা করা সহজ। কারণ, এসময় নবপঞ্জিকার সময় গাহ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। নয়টি গাহের নাম হইল নবপঞ্জিকা। কলা গাহ, শুড়ি ক্ষুর গাহ, হুদু গাহ, জয়ন্তীর ভাল, বেঙ্গের ভাল, দাড়িম গাহ, আশোকের ভাল, মানকচুর গাহ ও ধানের গাহ— ইহাই হইল নবপঞ্জিকার গাহ। ইহাকেই চলিত কথায় ‘কলা বৌ’ বলে। অনেকের ধারণা ‘কলা বৌ’ মৎস্যের স্ত্রী; কিন্তু তাহা নহে। স্ত্রী হইলে বামে বসিত; ইহা দক্ষিণে থাকে। ‘কলা বৌ’ই হইল নবপঞ্জিকা। ইহার বস্ত্র পূজা-পদ্ধতি আছে। প্রথমে নবপঞ্জিকার স্থান ও পূজা হইবে; তৎপরে প্রতিমা পূজা। প্রত্যেক দিন নবপঞ্জিকার বস্ত্র পূজা হইবে; নিশ্চয়ও বস্ত্র তাহে হইবে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ সাধনবলে অমৃত্যু করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক গাহের ভিতর সেবতা বা প্রাপ-পত্তি বর্তমান আছে, তাই ঐহার। গাহকে ভক্তি সঙ্কারে পূজা করিতেন। অল্প দ্ব্যস্তির লোকের ধারণা, হিন্দুগাহ গাহ পূজা করে, কিন্তু আসলে তাহা নয়; গাহের ভিতর যে সেবতা বা প্রাপের বর্ণন পাইয়াছে, তাহাকেই তাহার। পূজা করে। সেঙ্গল নবপঞ্জিকার অমিত্যজী নয়টি দেবীর উল্লেখ দেখা যায়। এই নয়টি দেবীর নাম হইল, কথা, — ব্রহ্মাণী, কালিকা, দুর্গা, কার্যিকী, শিবা, রক্তমঞ্জিকা, শোকরহিতা, চানুতা ও লক্ষী। কুম্বের রক্তের সহিত দেবীর রক্তের সাদৃশ্য মতন লক্ষ্য-ধ্বংসকর্তা হইয়া থাকে। এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। সঙ্গপূজা হইল মানকচুর সেবতা চানুতার পূজা; এ পূজার অল্প কোন সেবতার স্থান নাই। বসন্তকালে নবপঞ্জিকা পূজা-হওয়া কঠিন।

কারণ, এ সময় নবশ্রমিকার অনেক গাছই পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে অভাবে অল্প ব্যবস্থা আছে। বিহার। বাসন্তী পূজা করেন তাঁহারা। জানেন, নবশ্রমিকা সংগ্রহ করিতে কত কষ্ট পাইতে হয়।

ভাবের দিক্, রসের দিক্ ছুটাইয়া তুলিবার জন্য প্রতিমার প্রতিষ্ঠা। সমাজের সকলকে লইয়া সম্মিলিত ভাবে উৎসব করিবার উদ্দেশ্যেই প্রতিমার দৃষ্টি। ভাবের ও রসের দিক্ দিয়া এবং উৎসবে ঐতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়া বর্তমান দুর্গা প্রতিমা লক্ষণ করিয়া মনোমধ্যে রাখা উচিত হইয়াছে তাহাই এই প্রবন্ধে বিবৃত করিতেছি।

বাল্যকাল হইতে গুনিয়া আসিতেছি, শরৎকালে যে দুর্গোৎসব হয়, তাহা আসল দুর্গোৎসব নয়; এ পূজা অকালে ঐতিহাসিক করিয়াছিলেন। আসল দুর্গোৎসব হইল বাসন্তী পূজা। কিন্তু বাসন্তী পূজার তেমন স্বাক্ষরকর্ম হয় না; সেখানহে একটা গভীর সত্য পড়ে না; সাধারণের মনোমধ্যে তেমন কিছু একটা ভাবের উদয় হয় না। পক্ষান্তরে শরৎকালের দুর্গা পূজার বাঙালী জাতি মাত্ৰা উঠে। শরৎকালের দুর্গোৎসব হইল বাঙালী জাতির আনন্দবিকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য। এমন ভাবে অল্প কোন পূজার বাঙালী জাতি আনন্দে বিভোর হয় না। এই দুর্গা প্রতিমার পশ্চাতে বাঙালী জাতির অনেক কিছু লুকানো বাহান আছে। এতবড় স্বাক্ষর কাণ্ড ভারতবর্ষের ভিতর আর কোন প্রদেশে আছে কি না বলিতে পারি না। এত অর্থব্যয়, এমন প্রাণে প্রাণে “সীমন্তা কুম্ভাভ্যাং” রব, এমন ধনী-গরিব-নির্মিল্পে সকলের নববস্ত্র প্রদানের ব্যবস্থা বাঙালী জাতির আর কোন উৎসবে নাই। হানে হানে কুম্ভকরা এই সময় হইতে ফুলী বৎসর গণনা করে।

পারসীরা আশ্বিনীর সপ্তমী বাঙালী জাতির অপূর্ণ মান। ইহা ভাবের ও রসের দিক্ দিয়া যত্নে রক্ষণ করিয়াছে। শরৎকালের প্রত্যেককালে বাঙালী জাতি যখন কোন পাতিয়া আশ্বিনীর গান গোয়ে তখন সে সমস্ত ভুলিয়া যায়; তাহার স্বরভিত্তিক

স্বৈর-হিংসা কে যেন অজ্ঞাতে কাড়িয়া লইয়া যায়। এ সপ্তমী গুনিতে গুনিতে বাঙালীর প্রাণ আশ্বিন হইয়া উঠে; গান গুনিতে গুনিতে সে যেন মৃত্যু ভয়তে ভাসিয়া যায়—আগনাতে আগনি ছুটিয়া যায়। পূর্ণ শরৎকালের আশ্বিনীর কভার কানের ভিতর দিয়া যখন প্রবেশ করিয়া সমস্ত সমাজকে, সমস্ত দেশকে দুই-মাস এক ভাবে ভাবুক, এক রসে তরিক করিয়া রাখিত। সেদিন আশ্বিন আর নাই। সে প্রাণ-মাতান, মন-মাতান আশ্বিনীর গায়ক আর নাই। আশ্বিনীর সপ্তমীর মধ্যে বাঙালী জাতির পার্শ্ব-জীবনের একটি অতি সুন্দর যত্নে ছবি ছুটান আছে; কি-জামাইয়ের আসন, কভার বাগের বাড়ীর প্রতি সমস্তাবোধ, মায়ের কভার প্রতি প্রবল মেধ—বাঙালীর বাঙালীত্বের ইহাই বিশিষ্টতা। বাঙালীর দুর্গোৎসব হইল বাঙালী জাতির পার্শ্ব-জীবনের প্রতিমূর্তি। অল্প প্রদেশে এ ভাব ছুটাইবার শক্তি ও সাধনা দেখিতে পাওয়া যায় না। আশ্বিনীর সপ্তমী যেমন ভাবে লিখিত হইয়াছে, বিজয়ী সপ্তমীও তেমনি ভাবে সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তুলনার অতি অভাব। ইহার কারণ মানবজীবন মিলনের পক্ষপাতী, বিচ্ছেদের নহে। মিলনই মানবকে শক্তি, সম্পদ ও আনন্দ দান করে।

ঐতিহাসিক রাবণবধের সময় শরৎকালে দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু বাস্তবিক রাবানরণ রাবণবধের পূর্বে দুর্গাপূজার কোন উল্লেখ নাই; তুলসীদাসে নাই, রামরায়দাসে নাই—আছে কেবল একমাত্র কৃত্তিবাসে। কৃত্তিবাসের রামায়ণের ঐতিহাসিক মূল্য বৎসামাত্র।

রঘুনন্দন দুর্গোৎসবের অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে যে ধরনের দুর্গোৎসব চলিতেছে, তাহা বোধ হয় রঘুনন্দনের সময় হইতে যুঁজি পাইয়াছে। মূর্তিপূজার প্রচলন

• মূল দাবীকি রাবানরণ না থাকিলেও কয়েকখানি প্রাচীন পুরাণে শাক্তী দুর্গাপূজার উল্লেখ আছে।—উঃ দঃ

বন সর্বসঙ্গে নাই, তখন এর উঠিতে পারে, এই মূর্তিপূজার প্রচলন প্রথম কিরূপে দেখা গিল ?

ঐতিহাসিকের চরিতে পাই, যেসব বনিক কথ্য তনিয়া হ্রদে বা মাটির দৃষ্টি পড়িয়া পূজা করিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে আছে হ্রদ বা মাটির ঠাঁহুর পড়িয়া নদীর চড়াই তিন বৎসর পূজা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। হ্রদ বা মাটির তিন দিন পূজা করিয়া চতুর্থ দিনে বিশুদ্ধি দিয়াছিলেন; এবং সেই নিয়ম আজও বাংলাদেশে চলিতেছে। কিন্তু হ্রদ বা মাটির দৃষ্টি পূজা করিয়াছিলেন, তাহা গ্রন্থপাঠে জানা যায় না। সে মূর্তি বিহীন, কি চতুর্ভুজ, কি ঐকভুজ, কি মণ্ডিত তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না। সে মূর্তির সহিত লম্বী, সরস্বতী, কান্তিক, গণেশ প্রভৃতি কি না, তাহাও আমরা জানি না। তবে পুণ্যে এই স্থানে প্রথম মূর্তিপূজার কথা পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে আজ নানান্যানে বনন কার্য চলিতেছে। এই সমস্ত বনন কার্যের দ্বারা ভারতের তথাকথিত প্রাচীন ইতিহাস অনেক অদল-বদল হইয়া গেল। শুধু ভারতবর্ষ কেন, বনন কার্যদ্বারা পৃথিবীর ইতিহাসের দ্বারা বদলাইয়া গেল। বনন কার্য অনেক মূর্তি উদ্ধার করিয়াছে। এই সমস্ত মূর্তি পূজা-বেশন করিলে মূর্তিসমূহ সমস্ত নতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। অন্যতম প্রাচীনকাল হইতে দেবীমূর্তি পূজা চলিয়া আসিতেছে। সর্বসঙ্গে ইহার প্রচলন ছিল। অজ্ঞাত সেনেও মূর্তিসমূহ বহু মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে প্রথম বিহীন মূর্তিসমূহ এলাহাবাদের সম্রাট 'ভিক্টর' গ্রামে মাটির তলা হইতে পাওয়া যায়। তাহার পর আর একটি চতুর্ভুজ মূর্তি পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকেরা বলেন, গুপ্তসাম্রাজ্যের সময় মহিষমর্দিনী মূর্তি পূজার প্রথম প্রচলন হয় এবং উক্ত মূর্তি মূর্তিও গুপ্তসাম্রাজ্যের সময় গঠিত হয়।

মূর্তি প্রতিমা

মূর্তি প্রতিমার বহু পরিবর্তন হইয়াছে এবং বর্তমানের হইতেছে। এক সিংহবাহিনী মূর্তিরই কত পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। প্রথম করে আমরা দেখিতে পাই দেবী ও মহিষাসুর। দেবী বিহীন এবং কোন পার্শ্বের বা বাহন নাই। দ্বিতীয় করে দেখিতে পাই দেবী চতুর্ভুজা এবং সঙ্গে কোন বাহন বা পার্শ্বের নাই। তাহার পর সিংহ বাহন আসিল এবং সে বাহনেরও রূপ বদলাইয়া গেল। প্রথমে সে সিংহের দাঁড় ছিল খুব লম্বা, দুখানার কতকটা ঘোড়ার মত, কতকটা মকরের মত, শালা, যোগা ও লম্বা। বর্তমানে সেই স্থান আফ্রিকার সিংহ অধিকার করিয়াছে। মূর্তি প্রতিমার পার্শ্বের কেমন করিয়া বীরে বীরে আসিল, তাহার ইতিহাস আজও অজ্ঞাত। বাংলাদেশে মূর্তি প্রতিমা বহু প্রকারের হয় এবং দেবীর পায়ে রক্তেরও পার্শ্ব দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ শিবচর্যার নাম উল্লেখ করা যাউতে পারে। সিংহবাহিনী মূর্তি অষ্টাদশশতাব্দী পর্যন্ত আছে। বাংলাদেশে দশভুজার প্রতিমা পড়িয়া পূজা করা হয়। সুচবিহার রাজ্যেও পরংকালে দেবীপূজা হয়। ইহা বীর্ষভক্তি মহিষমর্দিনী দেবী; পার্শ্বের কেহ নাই। পায়ে রক্ত ঘোর লালবর্ণ। এই প্রতিমা প্রত্যেক দিন বহু গৃহে পূজিতা হয় এবং ইহার বিশুদ্ধ পুরোহিত ব্যক্তির অস্ত্র কেহ দেখিতে পান না। ইহার নিকট মহিষ, মূর, পালাব ও ছাগ প্রভৃতি বলিদান হয়। পূর্বে কলিকাতা সহরের ভিতর এক পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে বীর্ষভক্তি দেবীপূজার প্রচলন ছিল। এক্ষণে সেই সমস্ত পূজা লোপ পাইতেছে। চলিত কথায় ইহাদের "রাক্ষসী পূজা" বলে। সর্বত্র ভিতর বীর্ষভক্তি মূর্তি আজও মেলায় দেখাওয়া থাকে। আমার মনে হয়, নানা সম্রাজ্যের প্রতিমাদ্বারা হইতে ইহার উদ্ভূত হইয়া পাইয়াছে। সাধারণত ইহাতে বিশেষ আনন্দ অন্বেষণ করে।

দুর্গা প্রতিমার বক্স-কটি পদ্ধতি

বর্তমান দুর্গা প্রতিমার ভিতর যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। কোন পিঠী ইহার প্রথম স্তম্ভিকা, তাহা আকণ্ড অজ্ঞাত। বাঙলা দেশের দুর্গা প্রতিমার যে করেকটি বৈশিষ্ট্য আমি লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাই নিয়ে এখানে করিলাম। যে সময় প্রাচীন দুর্গাস্থিতি বা মহিষমর্দিনী স্তূতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের ভিতর কাহারও “বক্স-কটি” (ইংরেজীতে বাহ্যকে Three-block-system বলে তাহা) ছিল না। বাঙলা দেশের দুর্গাস্থিতির ভিতর “বক্স-কটি” পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। “বক্স-কটি” বা Three-block-system হইল পাথরের নিম্ন হইতে কতিপয় পর্য্যন্ত, কতিপয় হইতে ষাট বা সাতাশ পর্য্যন্ত এবং সাতাশ হইতে মস্তক বাকাইয়া স্তূতির সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা। বাঙলা দেশের দেবমূর্তিসমূহের ভিতর কেবলমাত্র ঐক্লব ও প্রাণমূর্তিতে এই পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। অস্ত্রাঙ্গ স্তূতির ভিতর এ পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রাম, সীতা, লস্করী, কালী, লক্ষী, সরস্বতী, কান্তিক, গণেশ প্রকৃতি স্তূতির ভিতর এ পদ্ধতি নাই। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, এই বক্স-কটি পদ্ধতি আসিল কোথা হইতে? সাধারণের ভিতর রসের দ্বারা বর্নন্যায় ভাসিত করিবার উদ্দেশ্যে “বাক্স”র সৃষ্টি হয়। আমার মনে হয় বৌদ্ধ সম্রাটের বহন “বাক্স”র ভিতর দিয়া তাহাদের মতবায় জনসাধারণের ভিতর প্রচারপ্রচারী হইয়াছিল, তখন এই পদ্ধতির উৎস হয়। “বাক্স” করিতে হইলে সূত্যের প্রয়োজন হয়। নৃত্য করিতে হইলে পায় নানাভাবে বক্র করিতে হয়। এখন, যুদ্ধ বা যশোভার্য্যকে সূত্যের দ্বারা দেখাইতে হইলে বক্স-কটি হইতে হইবে। যুদ্ধ-মূর্তিতে দেখিতে পাই, যুদ্ধসেব বাম পার্শ্বে ও যশোভার্য্য দক্ষিণ পার্শ্বে বক্স-কটি পদ্ধতিতে রহিয়াছেন। এই সম্বন্ধকার স্তূতিগুলি দেখিলে মনে হয় যেমনমতো সেই সময় বক্স-কটির চেউ উঠিয়াছিল কিন্তু বেশ বর্নকীর ল

সেবকাহিনের ভিতর গঠন না। ইহা অসম্ভব চলিয়াছিল বাক্স; উত্তর ভারতবর্ষে চলিল না। অক্ষরীণের স্তূতি করিতে হইলে বক্স-কটি করিতে হয়। বাঙলা দেশে দুর্গা দক্ষিণ দিকে ও ঐক্লব বাম দিকে বক্রভাবে রহিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ইহা ঐ-কারের স্তূতি। যদি ঐ-কারের স্তূতি হয়, তাহা হইলে জানিতে ইচ্ছা করে, ইহা কোন অক্ষরের ঐ?

১

নেত্র

দুর্গাস্থিতির “সেবনেত্র” হইবে। দুর্গাসেবী হইলেন ত্রিনয়ন। নেত্র ত্রিন প্রকার—সেবনেত্র, শিবনেত্র ও নরনেত্র। সেবনেত্রের ভাব হইবে—প্রাণের যে কোন স্থান হইতে কর্ণক প্রতিমার প্রতি স্তূতিপাত করিলে দেখিতে পাইবে প্রতিমা বা দেবীস্তুতি তাহার প্রতি স্প্রশসর বদনে স্তূতিপাত করিতেছেন। ইহা স্তূতিতে কোটান কই কইকর। সাধারণ পিঠী অপারগ হইয়া থাকেন। পটে বা কাগজের উপরে করা সম্ভব। শিবনেত্র হইবে সেবনেত্রের বিপরীত। সেবনেত্রের ভাব হইল সাধককে হুল হইতে হুলে গঠিয়া বাওয়া। শিবনেত্রের ভাব হইল হুল হইতে হুলজর আনা, — বেন স্থান হইতে সমাধিতে আনিতেছে। নরনেত্রের স্তূতি হইবে এক দিকে। বাঙলা দেশে সাধারণতঃ “পদ্মপদ্ম-নেত্র” প্রচলিত। দক্ষিণ দেশে “বীনাঙ্গী”। ইহা হইল হইট মন্ত পদ্মপরে চই দ্বার হইতে সন্ধিকট হইতেছে।

কিরীট

শায়ে দেখিতে পাই, দেবমূর্তি বা দেবীস্তুতির মস্তকে কিরীট হইবে। পূর্বে আর্ঘ্যোদা কিরীট ব্যবহার করিতেন। পূর্বের কিরীটই বর্তমানে বিবাহের চৌপরে পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন চিত্রকলাতে কিরীটশোভিত স্তূতি দেখিতে পাওয়া যায়। কিরীট-পরিহিতা স্তূতি দেখিতে অতীব হৃদয় হয়। ইতি-বাস্তব সন্ধিত চিত্রকলার বর্ণিত সম্বন্ধ। ঐতিহাসিক চিত্র বা স্তূতি অঙ্কিত করিতে হইলে পিঠীর

ইতিহাস-জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন, নচেৎ তৎকালীন শোব্যাক-পত্রিকাদে অনেক ক্রটি আসিয়া গাইবে। সৃষ্টি সেখিয়া তৎকালীন জাতির কৃষ্টির পরিচয় অনেক কিছু পাওয়া যায়। ইহার একটি বস্তুর দিকাপ্রাপ্তি আছে। দুর্গাপূজা হইল সন্ধ্যার পূজা। দুর্গা প্রতিমা হইল Cosmic Energy বা বিশ্ব-ব্যাপ্তি শক্তির প্রতীক। প্রাচীন দুর্গা প্রতিমা কিরীটপরিবিহিত। বাঙলা দেশের দুর্গা প্রতিমায় কিরীটের পরিবর্তে "শ্রবণাহারী-তাছ" ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ দেব-সেবীর ভিতর বিজাতীয় চণ্ড-এর এই প্রথম প্রচলন। দুর্গাসৃষ্টি হইতে "শ্রবণাহারী-তাছ" বস শিয় বিমূর্তিত হয় ততই জাতির গণকে মগন। উত্তর ভারতবর্ষে সমস্ত প্রতিমা পূর্বমুখী অর্থাৎ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন উভয় দিক্‌লক্ষ্যে রাখিয়া মধ্য হইতে রেখা টানিলে যে স্থান হয় তথায় বিগ্রেহের বেগীর স্থান হইবে। উচ্চৈশ্বর্য পূর্বদিক হইতে তখন অরুণ উদিত হইলে প্রত্যহ বেদী স্পর্শ করিবে। কিন্তু বাঙলাদেশে দক্ষিণ বা পশ্চিম-মুখী করিয়া বিগ্রহ স্থাপন করিতে হয়। ইহার কারণ কি? পৃথীর বিমলা পূর্ব-মুখী, কান্দীর অরুণোদয় মন্দির পশ্চিম-মুখী কিন্তু বাঙালীর কড়া রাণী তবানীর প্রতিষ্ঠিত কান্দীর দুর্গা-বাড়ীর দুর্গা দক্ষিণ-মুখী।

मरुदती ७ लक्ष्मी मूर्ति

সরস্বতী প্রাচীন দেবী। হাঁহর উৎপত্তি সংক্ষেপে নানা হুনির নানা শ্রুত আছে। ম্যাগজিস্টার বলেন, বৈদিক যুগে সরস্বতী নদীর তীরে নানা বাসবস্তু হইত এবং সেই নদীর নাম হইতেই দেবীর নাম সরস্বতী হইয়াছে। মহাভারতে বনপর্বে দেখিতে পাই, সরস্বতী দেবী সম্বন্ধি তর্ককে বলিতেছেন, “আমি পরামর-বিদ্যাক্ষপা দেবী, বিপ্রক্লিপনের ক্ষমতানিবারণার্থ অগ্নিহোত্রাদি সংকল্প হইতে আবির্ভূতা হইয়া তোমার সন্নিধানে আসমন পূর্বক ব্রহ্মা সহকারে স্বর্ষ্য অর্ধ সূর্য্যর প্রকাশ করিলাম।” বৈদিক দেবদেবীর আবির্ভাবস্থল হইল বজ্র। হোমের

অধির নাম হইল "ভাতবেদশ" অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তুমানেরই জ্ঞানমূলক। ইহুদ্যোদীর পণ্ডিতগণ আর্ধ্য দেবদেবীকে হই তাগে বিতর্ক করিয়া থাকেন। কতকগুলি প্রাচীন, এবং ভারতবর্ষীয় প্রাকৃতিক মূল হইতে তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে; ইংলান্ড সংখ্যায় অল্প ছিল। কতকগুলি বৈদেশিক বাহাদসের আকৃতি এবং প্রকৃতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কাশ্মীরে বৈদিক দেবদেবীর মূর্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কতকগুলির নামও স্মৃতিস্থাপিত হইয়া পিয়াছে। সরস্বতীর বহু মূর্তি আছে। সরস্বতীর বাহন হইল হংস। কেন সরস্বতীর বাহন হংস হইল এবং বাহন পছন্দি কবে হইতে বিশেষ ভাবে এমনে প্রচলিত হইল, তাহার ঐতিহাসিক গবেষণা বিশেষ প্রয়োজন। এই স্থানে একটি বিবরণ বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। হর্ষাপুত্রার মন্ত্রে হর্ষা ও লক্ষ্মীকে "সর্গালঙ্কারভূমিতাং" মন্ত্র উচ্চারণ করি কিন্তু সরস্বতীকে "সর্গালঙ্কারভূমিতাং" বলি না। অথচ মূর্তি আপাদ-মস্তক অলঙ্কার দ্বারা শোভিতা হয়। আমার মনে হয়, বর্তমানে যে পদ্ধতিতে মূর্তি কল্পনা করা হয় তাহার পরিবর্তন অব্যবহৃত প্রয়োজন। কারণ মন্ত্রের সহিত মূর্তির সামঞ্জস্য রাখা বিশেষ কর্তব্য। সরস্বতী মূর্তির কল্পনাই হইল সর্ব যেত। লক্ষীও প্রাচীন বৈদিক দেবী বলিয়া আর্ধ্য শাস্ত্রকারগণ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এ মন্ত বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, প্রাচীনকালে লক্ষী নব সৌভাগ্য, সৌখ্য প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হইত। বর্তমানে লক্ষী হইলেন আত্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সোমত থান পাকিলে যেমন রক্ত হয় সেইরূপ লক্ষীর গায়ের রক্ত হইবে। ইংলান্ড বাহন শেচক। গ্রীক ও রোমানদের ভিতরও ইংলান্ড পুন্না প্রচলিত ছিল। কেহ কেহ একই মূর্তির ভিতর লক্ষী-সরস্বতীর রূপ কল্পনা করিয়াছেন।

कार्यविधि

কার্তিক হইলেন সেবেলনাপতি। কিন্তু বর্তমান
দুর্গা প্রতিমার ইহার সৃষ্টি দেখিলে মনে হয় শাক্ত,

শিল্পী, নব্র, ময়ূর, টেরিকোটা, তাম্রপরা সোপালটী। ইহা আধ্যাত্মিকতার সেবাসেনাপতি নহে; ইহা হইল অশুভাতিত পরাবাসী জাতির দেহকণ্ঠস্বর। সুবকরের প্রতিকৃতি। কান্তিকের বাহন হইল ময়ূর। রত্নমুক্তির ভিতর এ ভাববিপণ্যর বটল কেনন করিয়া, আমি ভাবিয়া পাই না। তাব অনুযায়ী জাতিগঠন হয়; বীরজাতি সৃষ্টি করিতে হইলে বীরতাবের প্রয়োজন। শক্তিম্যান জাতি সৃষ্টি করিতে হইলে বীর্যবান্ নব-নারীর প্রয়োজন। শাস্ত্রে এক্ষণ কান্তিক-সৃষ্টির কল্পনা কোথাও খুঁজিয়া পাই না। মহাত্মারতে বনশর্কে সার্বভৌম জ্বলি কান্তিকের জন্মভূমি বলিয়াছেন। জ্বাল সেখিতে পাই, দম্ভহিতা স্বাধীনতা অধিকার সম্বন্ধিত্বের সৃষ্টি পরিগ্রহ করিয়া অতিরিক্ত বাইরা বলেন, “আমার নাম শিবা, আমি কামরূপে সাতিশর কান্ডর হইয়া তোমার নিকট আদমন করিয়াছি। আমার কামনা পরিপূর্ণ কর; নতুবা আমি প্রাণ পরিচাপ করিব।” তখন হতভান হর্গাভিনা সহকারে প্রীতি-প্রভুসৃষ্টি স্বাহার পানিশ্রবণ করিলেন। স্বাহার পর্তে ও অমির ঔরসে কান্তিকের জন্ম হয়;† সেক্ষণ কান্তিকের গায়ের রঙ হইবে অমিরবর্ণ, বর্তমান হলুর বর্ণ নয়। এইখানে সেখিতে পাই, প্রকাশ্যতির কল্প সেবসেনাকে কান্তিক বিবাহ করিলেন এক বয়সেই বৃহস্পতি জল ও যোজ-ক্রিয়া নির্বাহ করিলেন। কান্তিক হইলেন মহাবীর, সেবসেনাপতি; ইহা স্বরূপ জাহার ভর জীত। বন লিহেবাহিনী হরিয়াস্বর-সর্ধিনী সৃষ্টির সহিত “বান্ কান্তিক” সেখি, তখন সৃষ্টিতে পারি না, কেনন করিয়া এ ভাববিপণ্যর বটল। হর্গাসৃষ্টি হইল রত্নমুক্তি; নক্সান করিবার ক্ষমতা ইহার ক্ষম। হর্গাসংসব লামরিক পূজা,—রত্নগতীর পূজা। এ পূজার তৃতী, তেরী,

শম্ভানসহ কাড়া, নাসরা, চাক, জোল থাকিবে; সমরসমরোপযোগী বায়জাও থাকিবে; কিন্তু কখনই পূজাপূরে কনীরব হইবে না; কারণ, তাহা হইলে রত্ন-বিপণ্যর জাতিবে। রত্নগতীর সহিত সেবসেনাপতির পূজা করাই প্রণত। সৃষ্টির সহিত জাতির বিনিষ্ট সম্বন্ধ। সৃষ্টির ভিতর জাতির তৃতী (culture) পরিচয় পাওয়া যায়। সৃষ্টিক বরণ করিয়া জাতি গঠিত হয়, সবল ও সন্তোষ হয়। বর্তমান কান্তিকের রত্নকল্পনার পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। কান্তিকের সৃষ্টি হওয়া উচিত সেবসেনাপতির উপস্থিত। সুখের ভাব হইবে মহাত্মাবী অশচ অশ্রিতের প্রতি মহাদান। সর্ববিষয়ী বীরভাবে গাড়াইমা থাকিবে—সেন সমস্ত নক্সক তৃষ্ণাজান করিতেছে। গায়ের রঙ হইবে অমিরবর্ণ; বক্তকে স্বর্ণ করি। কশাট-বকে বর্ণ আমাহলসিত; বীরপট বাম বক্ত হইতে দক্ষিণ কটি পর্যন্ত; ত্রি-গ্রহি ছই ডাপ। হুতে গোমা অমুদিত; অমুদির অগ্রভাগ খোলা থাকিবে। কটিদেশে—কটবন্ধন। হুতে—সারক ও শরাসন। পূষ্ঠে—সরপূর্ণ তৃতী। গায়ে অলঙ্কার থাকিবে। ইহাতে প্রতিমার সৌন্দর্য্য সৃষ্টি পাইবে ও ভাবের সহিত পারস্পর্য্য থাকিবে।

গণেশ

গণেশসৃষ্টি বর্তমান হিন্দুজাতির নিকট পরম পবিত্র। সর্বকর্মের পূর্বে সিদ্ধিলাভা গণেশের নাম উচ্চারণ করিবে। গণেশের নামে সকল সুখস্বাস্থ্য। সর্বাঙ্গে গণেশবন্দনা চাই। গণেশের বহু নাম প্রচলিত আছে। তারতবর্ষের ভিতর গণেশসৃষ্টিও বহু প্রকৃতির। পূজা ও ভজাই নামক স্থানে গণেশ-মন্দির খুব বড়। এইখানে গণেশের একাও সৃষ্টি আছে। বৌদ্ধ শাস্ত্রে গণেশকে বিষয়াক্রমণ চিত্রিত করা হইয়াছে; কোথাও বা ইহার নাম বিনায়ক। বৌদ্ধ জ্ঞে গণপতি রত্নবর্ণ, ইহার ১২ হাত ও সৃষ্টিক বাহন। গণেশ ত্রি-নেত্রবিশিষ্ট। তারতবর্ষের বাহিরেও

† পূরণে উল্লেখ আছে, কান্তিক শিবের অমোদিত পূর। ইহার জন্মকাল অমি উপলব্ধি হইলেন বাজ। কালিদাসও এই কথাই কুলাসভাসে বিদ্যায়ন।—উঃ দঃ

গণেশপূজা আছে। বতঙদি গণেশমূর্তি আছে
তমগো উচ্ছিন্নগণেশের আছে দেবীমূর্তি সেখানে
পাওয়া যায়। দেবীমূর্তির নাম বিয়েধরী।
বিয়েধরী সর্বাভরণবৃত্তিকা, নহা, কিছুচা। গণেশ
চতুর্ভুজ।

আর্য্যসেবতানিগের ভিতর গণেশমূর্তি বতঙ
হান অধিকার করিয়াছে। গণেশ আর্য্যসেবতা কি
না অনেক সম্বন্ধ করেন। তাঁহাদের ধারণা, বৈদিক
গণপতি ও পরবর্তী কালের গণেশ একই দেবতা নহে।
ইহা লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। আমাদের
বক্তব্য এই, ‘গণেশ’ নামটি মহাত্মারতের আদিপর্ষের
প্রথম অধ্যায়ে ও বহু প্রাচীন পুরাণে উল্লিখিত
হওয়ায় গণেশকে আধুনিক বা অনার্য্য সেবতা বলা
অসম্ভব। সত্যিহোতে হরিমুণ্ডারী গণেশের কথা প্রথম
‘কামধরী’তে পাওয়া যায় এবং ‘মালতীমাধবে’
গণেশের পূজাপদ্ধতীলাভ দেখিতে পাই।

অম্বর

চতীতে বেক্ষণ অম্বরের বর্ণনা আছে আমরা
প্রতিমার সেক্ষণ অম্বরমূর্তি গঠন করি না। আমরা
অম্বরকে একটা villain বা পাগড়রূপে চৈয়ারী
করি। প্রকৃত পক্ষে ইহা দুর্গীর। অম্বর বীর ছিল,
মহাবাহ্য্য ছিল, সহজে কেহ তাহাকে রণে জয় করিতে
পারিত না। সেবতার তাহার জুয়ে কাঁপিতেন।
সেবীও তাহাকে সহজে হত্যা করিতে পারেন নাই।
সে ক্ষত অম্বরের মূর্তি বীরের মত হওয়া উচিত। অম্বর
যে দেখিতে সুন্দর ছিল, এ কথা কোন্ শাস্ত্রে দেখিতে
পাওয়া যায়? আগ্রস্ত ভাতির শিল্প সল হওয়া উচিত।
শাস্ত্রসম্বত ধ্যানের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া,
ইতিহাসের ভাব অম্বর রাখিয়া, রস-সৌন্দর্যের দিক্
দিয়া উচ্চতরের দুর্গাপ্রতিমা গঠি করা বাইতে পারে;
তাহাতে ধর্মের শ্রীদ্ধি হইবে। বর্তমান শিক্ষিত
বাহ্যলী নিরীদিশের ইহা বিশেষভাবে অধ্যয়ন বা ধ্যান
করা উচিত।

চালচিত্র

চালচিত্র বা হৃদ্যমুখজটার উদ্দেশ্য অনেকেরই জানেন
না। শাস্ত্রে দেখিতে পাই, প্রত্যেক দেবী বা দেবতার
পশ্চাতে একটি করিয়া হৃদ্যমুখজটা দিবার নিয়ম আছে।
ইহার কারণ কি? সাধারণ শিল্পীর ধারণা, ইহা
back-ground। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। সাধক-
জীবন বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, তাঁহাদের সেই
হৃদেতে মাঝে মাঝে এক প্রকার জ্যোতিঃ নির্গত হয়।
উচ্চতরের সাধক যখন খুব উত্তেজিত হইয়া বিচরণ করেন,
অর্থাৎ যখন তিনি প্রায় সমাধিগ্ন হন, তখন তাঁহার
সেই হৃদেতে এক প্রকার জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া তাঁহার
চতুর্দিক সোলা হইয়া আবরণভাবে থাকে। সাধারণ
ভাবে বিচরণ করিলে এ জ্যোতিঃ নির্গত হয় না; কেবল
উচ্চতরে থাকিলে ইহা সম্ভবপর হয়। ইংরাজীতে
ইহাকে halo বলে। সর্বদেবে সর্বজ্যোতিঃ ইহা নিরীকণ
করিয়াছে। সেইজন্য সেবতা বা মহাপুঙ্খদের প্রতি-
মূর্তি বা চিত্র অঙ্কন করিতে হইলে এই halo পশ্চাৎ-
ভাগে দেখাইতে হয়; নচেৎ মূর্তি বা চিত্র দুর্বল
হইবে। সাধারণ ব্যক্তির পশ্চাৎভাগে ইহা দিবার নিয়ম
নাই, কারণ তাহাদের সেই হৃদেতে halo বাহির হয় না।
সর্বদেবের শিল্পী এই নিয়ম মানিয়া গলে। এই জ্যোতিঃটি
দেখাইবার উদ্দেশ্যে প্রতিমার পশ্চাৎভাগে হৃদ্যমুখজটা
দেওয়া হয়। সমস্ত দেবতার জ্যোতিঃ একপক্ষে দেখাইতে
হয় বলিয়া চালচিত্রটি মাণ-সই বড় করিতে হয় এবং
ইহার ভিতর শিবদুর্গার লীলা সজ্জাচর দেখান হয়।

বর্তমান দুর্গা প্রতিমা দর্শন ও বিশ্লেষণ করিয়া
আমার মনোমতো সেক্ষণ ধারণা হইয়াছে তাহাই আমি
এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। সাধারণ মানুষ বা
হিম্মুখ্যাক বড়ই রকণদীল, সেজন্য তাহাদের চক্ষে প্রথম
প্রথম একটু কটকট ঠিকিবে, কিন্তু ২৪ বৎসর
প্রকণভাবে প্রতিমা পূজা হইলে জনসাধারণ অত্যন্ত
হইয়া বাইবে—আনন্দ পাইবে। দুর্গা প্রতিমা হইল
বিস্তৃত হৃদয়ের বাতাসীমাতিক কলাজ্ঞানের স্রেষ্ঠ পরিচয়।

রূপ ও সৌন্দর্যের নিক দিয়া, তাব, রূপ ও কল্পনার
নিক দিয়া অশূর্ল মূর্তি স্জন করিয়াছে। যে সমস্ত
শক্তির সাহায্যে সংসার-জীবন, এই পার্থিব জীবন
স্বপ্নময়, কশ্যময় ও আনন্দময় হয় সেই সমস্ত শক্তিকে
একত্র করিয়া বাঙালীজাতি শরৎকালে দুর্গা প্রতিমা

অর্জনা করে। পাঁচটি শক্তির সমাবেশে একটি বুদ্ধে
জয়ী হওয়া যায়। বুদ্ধে জয়ী হইবার জন্তই মহিষ-
মর্দিনীর সৃষ্টি। ইহা হইল বিজ্ঞা, অন্ন, ঐথরিক শক্তি,
উপযুক্ত সেনাপতি ও সিদ্ধির জন্ত দেবতাদিগের নিকট
আশীর্বাদ প্রার্থনা। ঐথরিক শক্তি বা আত্মা শক্তির
রূপক হইল—দুর্গা; বিজ্ঞা ও বুদ্ধির হইল—সরস্বতী;
অন্নের হইল—লক্ষ্মী; উপযুক্ত সেনাপতির হইল—
কার্তিক, এবং সিদ্ধির হইল—গণেশ। বুদ্ধে গমনের পূর্বে
প্রাচীন বাঙালীজাতি এই পঞ্চশক্তির মূর্তি গড়িয়া
শরৎকালে উপাসনা করিতেন। পূর্বেই বলিয়াছি,
এ প্রকার মূর্তিপূজা বাঙালার বাহিরে দেখিতে পাওয়া
নায় না।

বর্তমান বাঙালার প্রচলিত দুর্গোৎসব গার্হস্থ্য-
জীবনের সকাম পূজা—সাধকের পূজা নয়। সাধক
পূজা-অর্জনা করিবেন ব্রহ্মজ্ঞানের জন্ত; সংসার-জীবন
স্বপ্নময়, কশ্যময় করিবার জন্ত নয়। সাধকের পূজা
স্বতন্ত্র। রাজাদের পার্থিব মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্ত
বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞ হইত। সে যাগযজ্ঞের এ দেশে
আর প্রচলন নাই; সে যাগযজ্ঞ করিতে হইলে বিস্তর
অর্থব্যয় প্রয়োজন। প্রকৃত বৈদিক যাগযজ্ঞ বর্তমান
বাঙালার বহুদিন লোপ পাইয়াছে। প্রবাদ আছে,

কলিযুগে দুর্গোৎসবই হইল একমাত্র যজ্ঞ। সাধারণ
গৃহস্থ দুর্গোৎসব করিতে পারে না; কারণ, বিপুল অর্থের
এবং সাধ্যার্থের প্রয়োজন। ব্যতীক বর্ষা দুর্গোৎসব
একটি বিরাট যজ্ঞ। এত খিনিষের প্রয়োজন হয় যে,
সাধারণ ব্যক্তি তাহা দ্বন্দ্ব করিতে পারে না। ধনী

ব্যক্তি ব্যতীত এ পূজা করা বড়ই কষ্টকর।
গৃহী নিজ মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্ত শরৎকালে
প্রতিবৎসর দুর্গোৎসব করে। সেই জন্ত ভক্ত প্রতিমার
সমুখে নতজাহ্নু হইয়া প্রার্থনা জানায়—

মধুকৈটভবিধংসি বিধাতৃবরদে নমঃ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥

ভার্গ্যাং মনোরমাং দেহি মনোবত্তাহুসারিণীম্।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ইত্যাদি।

ইহাই হইল গৃহীর দেবীর সমুখে সকাম প্রার্থনা।

সাধকের “ভার্গ্যাং মনোরমাং” প্রয়োজন হয় না।

সাধক সম্পূর্ণরূপে নিজকে আত্মা শক্তির হস্তে অর্পণ
করেন, নিজের বলিয়া কিছু রাখেন না। আহুত,
আজ এই শারদীয়া পূজার প্রাক্কালে গৃহী ও সাধক
সকলে মিলিয়া জগন্নাথার ত্রীচরণকমলে প্রণাম
করি—

সর্বমঙ্গলমুখ্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।

শরণ্যে ত্রাধকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ততে ॥

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।

গুণাশ্রেয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোহস্ততে ॥

শরণাগতদীনান্তুপরিজ্ঞাপরায়াহে।

সর্বজ্ঞাত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোহস্ততে ॥



প্রাচীন কলিকাতা

(বাগবাজারের ইতিহাস)

কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, কাব্যরত্ন, উদ্ভটসাগর, বি-এ

(পূর্বাঙ্গহরি)

১০। বাগবাজার খাল

ইহাকে পূর্বে Circular Canal বলা হইত। পরে ইহার নাম হয় The Circular and Eastern Canal। সোকে সাধারণতঃ ইহাকে 'বাগবাজার খাল' বলে। বাগবাজার খাল হুগলী নদী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। জল বাহির ও প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত নদীর দিকে দুইটা Lock-gate ছিল। এই খাল বারাকপুর-রোড ও দমদমা-রোড অভিক্রম করিয়া Circular Road-এর পাশ দিয়া গিয়াছে। যখন খাল কাটা হইয়াছিল, তখন এইরূপ স্থির হইয়াছিল যে, এই খাল বরাবর ৮০ ফুট চওড়া ও অন্ততঃ ৬ ফুট গভীর থাকিবে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে এই খাল কাটিতে আরম্ভ করা হয় এবং ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কাটা শেষ হয়। খাল কালিতে ১০,৪০,৪১০ টাকা খরচ হইয়াছিল।

বাগবাজার খালের উপর ৭টা পোল আছে। ইহাদের বিবরণ নিচে লিখিত হইল—

(১) Chitpore Bridge।—সাধারণতঃ সোকে ইহাকে "বাগবাজার পোল" বলে। Captain John Thomson এই খালের কর্তা ছিলেন। তিনি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে Chitpore Bridge নির্মাণ করেন। ইহার নির্মাণে ৩১,০৪৫ টাকা খরচ হইয়াছিল। ইহার Span ২২ ফুট এবং Road-way ২২ ফুট চওড়া। এই ব্রিজের নিচে একটি Lock-gate আছে। ইহা দ্বারা নৌকা সকল যাতায়াত করিবার সুবিধা পায়। এই Lock-gate ৬০ ফুট দীর্ঘ এবং ২৪ ফুট প্রস্থ।

James Prinsep সন ১৮২৯ হইতে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৪ বৎসরে এই Lock-gate নির্মাণ করেন। ইহার নির্মাণে ৩১,৫০০ টাকা খরচ হইয়াছিল।

(২) Barrackpore Bridge।—ইহাকে সোকে সাধারণতঃ Shambazar Bridge বুলিয়া থাকে। James Prinsep সন ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে নির্মাণ করেন। ইহা নির্মাণ করিতে ২০,৫২২ টাকা খরচ হয়। ইহার Span ১০০ ফুট এবং পরিসর ৩০ ফুট।

(৩) Dum Dum Bridge।—ইহাকে সোকে Belgachia Bridge বলে। James Prinsep ও Captain Thomson ২০,৫০৮ টাকা খরচ করিয়া ইহা নির্মাণ করেন। ইহার Span ১০০ ফুট ও Road-way ২০ ফুট।

(৪) Ultadingi Bridge।—Captain Prinsep ১২,০০০ টাকা খরচ করিয়া এই ব্রিজ নির্মাণ করেন। ইহার Span ১০১০ ফুট ও Road-way ১৮ ফুট।

(৫) Manicktala Bridge।—Captain Thomas Prinsep ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ১৫,৫৭৬ টাকা ব্যয়ে এই ব্রিজ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার Span ১০০ ফুট ও Road-way ১৮ ফুট।

(৬) Narikeldanga Bridge।—১৮৩০ খৃষ্টাব্দে Captain Thomas Prinsep ১৭,১২৫ টাকা ব্যয়ে এই ব্রিজ নির্মাণ করেন। ইহার Span ১০০ ফুট ও Road-way ১৮ ফুট।

(৭) Baitakkhana or Beliaghata

Bridge • I—১৮৩০ খৃষ্টাব্দে James Prinsep সাহেব ১৫,৭০২ টাকা ব্যয়ে এই ড্রিজ নির্মাণ করেন, ইহার Span ১০০ ফুট ও Road-way ১৮ ফুট।

সাবর্ণ্য-বেড়ে

বাগবাছার-নিবাসী অনেককেই জানেন না যে, বাগবাছারের অন্তর্গত কোন্ স্থানকে “সাবর্ণ্য-বেড়ে” বলে। বর্তমান কর্প-বাগানের উত্তর-পূর্ব দিকে গোশাল-মন্দিরের সন্মুখে একটা বিগ্রহ আছে। সেখানে ইনি প্রতিষ্ঠিত, সেই স্থানের নাম “বাবা ঠাকুরের জলা”। এই বিগ্রহ অতি প্রাচীন। ইংরাজদিগের আগমনের পূর্বে কলিকাতা, বেঙ্গাল-বড়িয়ার স্বেপ্সিড সাবর্ণ্য-চৌমুদ্রী মহাশয়দিগের জমীদারী ছিল। উত্তর-দিকে এই স্থান পর্যন্ত তাঁহাদিগের জমীদারীর সীমা ছিল বলিয়া এই স্থানটুকুর নাম “সাবর্ণ্য-বেড়ে” হইয়াছে।

১২। বাগবাছারে নবাব আলীবর্দি খাঁ ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র †

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহ রাধা রামস্বামী এবং পিতামহের অগ্রজ রাধা রামচন্দ্র ও পিতামহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাধা রামকৃষ্ণ এই তিনজন নির্ধারিত রাজস্ব নবাব-সরকারে জমা দিতে না পারায় তাঁহাদের ২০ লক্ষ টাকা সেনা হয়। ইহার মধ্যে তায়ী পিতামহ রামস্বামী ও পিতা রত্নরাম ১০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট ১০ লক্ষ টাকা নবাব-সরকারে সেনা থাকে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াই এই ১০ লক্ষ টাকার দায়ী হন। এতদ্ব্যতীত নবাব আলীবর্দি খাঁ, নবরাজা

বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে ১২ লক্ষ টাকার দায়ী করেন। এই নবরাজার টাকা দিতে না পারায় আলীবর্দি খাঁ তাঁহাকে মুরশিদাবাদে নজরবন্দী করিয়া রাখেন। মহারাজের জমীদারী বর্ষাঙ্গ-কর্তৃক পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হওয়াতে প্রজাপণের এত দ্রুপ্তি হইয়াছিল যে, তাহার মহারাজকে এই বিপদ হইতে মুক্ত করিতে পারে নাই। মহারাজ নজর-বন্দী অবস্থায় বীর প্রদান প্রদান কর্তৃকচরিত্রকে ডাকাইয়া সেনা-পরিশোধের পরা মর্শ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই কোন সন্তোষজনক পরামর্শ প্রদান করিতে পারিলেন না। রত্ননন্দন মিত্র (সর্দারিকারী) মহারাজের একজন সামান্ত কর্তৃত্বী হইয়াও তাঁহাকে কহিলেন, “মহারাজ! যদি কিছুদিনের জন্য আপনার অধিকার ও ক্ষমতা আমাকে প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি মহারাজকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারি।” ইহা বলিয়া তিনি যে উপায়ে তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারেন, তাহা সবিত্তর বর্ণনা করিলেন। বিচক্ষণ মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া রত্ননন্দনকে বেওয়ানী-পদ প্রদান ও বীর ক্ষমতা অর্পণ করিয়া মুরশিদাবাদ হইতে ককনগরে পাঠাইয়া দিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে তাঁহার পুত্র, ভ্রাতা ও ভাগিনেরগণ জমীদারীর অনেকাংশ ইজারা লইয়া বেছ্যমত কর প্রদান করিতেন। বেওয়ানেরা তাঁহাদের উপরি বিশেষ ক্ষমতা ও আধিপত্য প্রকাশ করিতে না পারায় তাঁহাদের নিকটে অনেক টাকা বাছনা বাকী পড়িয়াছিল। রত্ননন্দন মিত্র, অনেক কৌশলে তাঁহাদের উপরি মহারাজ-প্রসূত ক্ষমতা প্রকাশ-পূর্বক অগ্রহিনের মধ্যেই অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়া ও তাহা নবাব-সরকারে জমা দিয়া এবং অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া ককনগর-রাজবাগীতে প্রত্যাপ্ত হইলেন। রত্ননন্দনের দর ও মুক্তি-কৌশলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নজর-বন্দী অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। এই রত্ননন্দনই কিছুদিন পরে আলীবর্দি খাঁর বেওয়ান রাধা

• W. H. Carey's The Good Old Days of John Company, vol. II.

† ককনগর-রাজবাগীর বেওয়ান বর্ণিত দ্রুপ্তিও কাঙ্ক্ষিত হইয়া যায়। “কিটান-বাগানী-ওঁরিত” নামক একখানি উপায়ে এই দ্রুপ্তি নিবৃত্তি করা যাইবে। বাগবাছারে “আলীবর্দি খাঁ ও কৃষ্ণচন্দ্র” নামক অনেক কথা ইহাতে লিখিত আছে। — লেখক

মানিকটানের • বিধব বিয়াপ-ভাঙ্গন হন, একে তাঁহারই আসনে কামানের গোলায় নসূৎ পাড়াইয়া বৃদ্ধাশ্রমে পতিত হইয়াছিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নব্বাণার টাকা দিয়া নবাবের নজর-বন্দী হইতে মুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পিতামহ ও পিতার সের রাজস্ব ২০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা মাত্র পরিণামে করা হইয়াছিল। অবশিষ্ট ১০ লক্ষ টাকার ক্ষত কৃষ্ণচন্দ্রই দাবী ছিলেন। এই টাকা দিতে না পারায় আরও একবার আলীবর্দি খাঁ তাঁহাকে বুরশিয়ারাষে নজর-বন্দী করিয়া রাখিয়া-ছিলেন। নবাব, মহাত্মজের শুধু প্রীত হইয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ সদর ব্যবহার করিতেন। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে নবাব তাঁহার সহিত শায়ালাপ করিতেন। কৃষ্ণচন্দ্রও রানারণ, মহাত্মার প্রতি প্রতি জেহের উৎকর্ষ অশ্রু লগ্ন উর্দু-ভাষায় অস্বাভাব করিয়া ও তাঁহাকে প্রবণ করাইয়া তাঁহার মনোরঞ্জন করিতেন। কিছুদিন পরে কয়েক লক্ষ টাকা মাহ্ পাইবার ক্ষত কৃষ্ণচন্দ্র, নবাবের নিকটে আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

এই সময়ে নবাব জনপথে কলিকাতার দিকে গমন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। মহাত্মাও তাঁহার অস্বাভাবী হইবার প্রার্থনা করায় নবাব আলমার-সহকারে তাঁহাকে সঙ্গে বাইতে অস্বমতি প্রদান করিলেন। যদিও ৩ সৈন্ত-সামন্ত লইয়া নবাব

মহা-নমারোহে কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইতে পারিলেন। সুবিখ্যাত পলাশীক্ষেত্র কৃষ্ণচন্দ্রের জমীদারীর অন্তর্গত ছিল। নবাবের বহুতা ও নৌকা-গুলি পলাশীর নিকটে আসিলে মহাত্মা কহিলেন, “ধর্ম্মবতার! আমার পলাশী পরগণার অবস্থা একবার লম্বা করিয়া দেখুন। কোন স্থান জনপুত্র, কোন স্থান জনপুত্র এবং কোন স্থান অশ্রুগর। ইহা হইতে স্বাক্ষরের উপস্থিত অর্থ সংগ্রহ করা হু-সাধ্য।” ক্রমে ক্রমে নবাবের বহুতা ও নৌকাগুলি নব্বীণের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে মহাত্মা কহিলেন, “ধর্ম্মাণনা! আমার জমীদারীর মধ্যে নব্বীণ সর্ব-প্রধান। ইহার ভিতরে একখানিও পাকা বাড়ী নাই। কয়েকখানি মাত্র ভূগা-আসিত গৃহ। আমি কিরূপ দুর্ভাগ্য, এই গ্রামখানিই তাহার পরিচয় দিতেছে।” নবাব ইহা শুনিয়া কোন কথাই বলিলেন না। অবশেষে নবাবের বহুতা ও নৌকাগুলি কলিকাতার আসিয়া উপস্থিত হইল। তৎকালে কলিকাতা একখানি সামান্ত গ্রাম ছিল। ইহার কেবল উত্তর দিকে গঙ্গার ধারে বাগবাচারে কয়েকটা পোকের বসতি ছিল, এবং পূর্ণ ও দক্ষিণ দিক্ সম্পূর্ণরূপে বাঘা-বনে সমাচ্ছন্ন থাকিত। গঙ্গার ধারে বাঘ-বাচারের অবস্থা দেখাইয়া ইহার পূর্ণ দিকের অবস্থা কিরূপ, তাহা দেখাইবার ক্ষত মহাত্মা নবাবকে বিনীত-ভাবে পুনঃ পুনঃ অস্বরোধ করিতে পারিলেন। নবাব তাঁহার প্রার্থনা উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া কিরূপে দিয়া দেখিলেন চতুর্দিকে অরণ্য! এই সময়ে নবাবের অস্বচরণ তাঁহাকে কহিতে পারিলেন, “এখানে ব্যাঘ্রাধি-জগতপের বিধব ভর আছে।” ইহা শুনিয়া নবাব কিরূপা বাইবার অস্বমতি দিতেছেন, এমন সময় মহাত্মা কহিলেন, “ধর্ম্মাণনা! যদি অস্বগ্রহ করিয়া এজ্বর আসিলেন, তবে রূপা করিয়া আরও একটু সুনাম।” তখন মহাত্মা ও সঙ্গের আলীবর্দি খাঁ কহিলেন, “কৃষ্ণচন্দ্র! আর অধিক হু বাইবার প্রয়োজন নাই। অত তোমাকে শৈকু নার হইতে

• এই রাজা মানিকটান কে, তাহাও ঘটা উচিত। অস্বেকে মনে করিয়া থাকেন। যদি হিন্দুধর্ম্মী, কিন্তু তাহা নয়। ইহার পূর্ণ নাম, — মানিকটান বহু। তখনীপুর্বে “কল্যান” বোসের ঘাটে ঘোড়” ও “কল্যান বোসের কাঠি সের” এই দুইটি বাড়ী এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজা মানিকটান এই কল্যান বহু পিতা। তিনি প্রথমতঃ সর্বদাম-মহারাজের সেৱাদান ছিলেন। তৎপরে তিনি আলীবর্দি খাঁর সহকারে “রাজা” উপাধি প্রাপ্ত ও মিয়া-ক-উল্লাহর সময়ে সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনিই অস্বপু-হত্যার অভিযাত্র। তখন বাণিকটান টাকার পানস-কর্তা ছিলেন, তৎকাল তিনি বোসে আলাত হন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বৃত্ত হইয়াছিল। তখন বঙ্গদেশ জবর অস্বগ্রহ ও বঙ্গের মাত্র। কল্যান বহু পলাশীর যুদ্ধের এক বঙ্গের পরে অর্থাৎ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে লক্ষগ্রহণ করিয়াছিলেন।

হুক্ত করিয়া দিল্যাম।^১ মহাবাহুও তাঁহাকে অশ্রু-
ধন্যবাদ প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত প্রত্যাবর্তন
হইলেন। নবীয়া কোলায় উক্ত টাকার দ্বারা স্বাস্থ্যের
‘বিশ লাবী হয়ে’ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

১৩। বাগবাজারে ওয়ারেন হেস্টিংসের শ্মশুর-বাড়ী

প্রাচীন পুস্তক ও সরকারী কাগজ-পত্রে দেখিতে
পাওয়া যায় যে, বাগবাজার-বুদ্ধের পূর্বেরই আট ঘর
সাহেব বাগবাজারে বাড়ী নির্মাণ করিয়া বাস
করিতেন। ইহাদের মধ্যে দুই জনের নাম পাওয়া
যায়,—একজন ক্যাপ্টেন চার্লস্ পেরিন্ (Captain
Charles Perrin) ও আর এক জন কর্ণেল
সি-এফ্ স্কট্ (Colonel Caroline Frederick
Scott)। অবশিষ্ট ৬ জনের নাম পাওয়া যায় না।
উক্ত ষট্ সাহেব ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর এজিনিয়ার
ছিলেন। ইহার একটি কন্যা ছিলেন। ইহার নাম মেরী
(Mary)। এই মেরীর সহিত ক্যাপ্টেন ডুগাল্ড্
ক্যাম্বেলের (Captain Dugald Campbell-এর)
বিবাহ হইয়াছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ২২শে ডিসেম্বর
ক্যাপ্টেন ক্যাম্বেলের মৃত্যু হয়। সিরাজ-উদৌল্লা
দ্বিতীয় বার কলিকাতা আক্রমণ করিলে কলিকাতার
সাহেব ও বিবিগণ কলতায় একতানি জাহাজে গিয়া
আশ্রয় লন। ওয়ারেন হেস্টিংস তৎকালে মুরশিদাবাদ
হইতে চুনারে প্রস্থান করেন; কিন্তু সে স্থান হইতে
গঙ্গার উপর দিয়া নৌকা-যোগে কলতায় আসিয়া
উক্ত জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

জাহাজেই তিনি ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথমে মেরীকে
দর্শন করেন। দর্শন করিয়ামাত্র মেরীর স্ত্রীত্বানি
হেষ্টিংসেই দৃশ্য পড়িকার করিয়া লইল। তৎকালে
হেষ্টিংসের দৈনিক বেতন ৩০০ টাকার অধিক ছিল
না, বরং অল্প হইবারই সম্ভাবনা *। হেষ্টিংস্
ষট্ সাহেবকে সম্মত করাইয়া ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে
বিবাহ করেন। তখন ষট্ সাহেব বাগবাজারে বাস
করিতেন। হেষ্টিংস্ও মেরীকে লইয়া মধ্যে মধ্যে
তাঁহার বাটীতে আসিতেন।

১৪। বাগবাজারে ৬ বুড়ো শিব ঠাকুর

স্বপ্রসিদ্ধ দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীর
উত্তর-পূর্ব-কোণে একটা মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।
ইহার গঠন-প্রণালী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটগুলি দেখিলে
স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা অতি প্রাচীন।
ইহার মধ্যে একটা শিবলিঙ্গ আছেন। ইহা জগদ্রাম
হালদার কর্তৃক স্থাপিত। (ক্রমশঃ)

* তৎকালে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারিগণ অতি
অল্পই বেতন পাইতেন। তবে মানাবিশ্ব ব্যবসায় করিয়া তাঁহারা
অনেক টাকা উপার্জন করিতেন। জং সাহেব লিখিয়াছেন,—
“The salaries appear very small. We find in
1764 Warren Hastings, as Member of Council,
had not more than Rs. 300/- per month, and yet
lived well in a luxurious state of society, but
money was then five times the value of what it
is now, and Members of Government, up to the
President himself, were allowed to trade; even
chaplains and doctors had a share in the salt
trade.” Long’s Selections from Unpublished Records
of Government.” Introduction, P. XXVII



অদ্ভুত

শ্রী ব্রজনাথ চক্রবর্তী

বান্দ্যার মুখখানা গুরুতর গম্ভীর

মহিয়ার হাসি নাহি বুচে,

কহিলা বান্দ্য-বীর যতগুলো দস্তার

দস্ত মুছিব চোঁচে পুঁচে ।

উঁচু মাথা হোলো হেঁট, খালি হোলো ভরা পেট

শপালপ্ পিঠে পড়ে বেত ।

কতু ফাঁসি কতু জেল, কতু শূল কতু শেল,

কতু ক্রোক দেয় ভরা ক্ষেত ।

মহিষী বলেন তবে দস্ত যদি না রবে

কী দেখে হাসিব তবে প্রভু,

বান্দ্য শুনিয়া কহে, কিছুই যদি না রহে

হাসিবার আমি রব তবু ।

কুঁজে তিনকড়ি ঘোরে

পাড়া চারিদিককার,

সন্ধ্যায় ঘরে ফেরে

নিয়ে স্কলি ভিক্ষার ।

বলে সিধু গড়গড়ি

রাগে দাঁত কড়মড়ি

ভিখ্ মেগে ফেরো, মনে

হয় না কি ভিক্ষার ?

স্কলি নিজে নিয়ে বলে

“এ বেতন ভিক্ষার ।”

কনে দেখা হ'য়ে গেছে নাম তার চন্দনা ;
 তোমারে মানাবে ভায়া, অতিশয় মন্দ না ।
 লোকে বলে খিটখিটে মেজাজটা নয় মিটে,
 দেবী ভেবে বেই তারে করিলে বা বন্দনা ।
 কুজো হোক, কালো হোক, কালাও না অন্ধ না ॥

বাংলা দেশের মানুষ হ'য়ে ছুটিতে বাও চিতোরে,
 কাঁচড়াপাড়ার জল-হাওয়াটা লাগল এতই তিতোরে ।
 মরিস্ ভয়ে ঘরের প্রিয়ার, পালাস্ ভয়ে মালেরিয়ার,
 হায়রে ভীক্স রাজপুতানার কুত পেয়েছে কী তোরে ?
 লড়াই ভালো বাসিস্, সে তো আছেই ঘরের ভিতরে ॥

বেদনার সারা মন কর্তেছে টুন্টন,
 শ্রালী কথা বলল না, সেই বৈরাগ্যে ।
 ম'রে গেলে ট্রাস্টিরা ক'রে দিক্ বটন,
 বিষয় আশয় যত, সব কিছু যাক্ পে ॥
 উন্মদারী পথে আহা ছিল যাহা সঙ্গী—
 কোথা সে শ্রামবাজার কোথা চৌরঙ্গী—
 সেই হেঁড়া ছাতা, চোরে নেয় নাই ভাগ্যে—
 আর আছে ভাড়া ঐ হারিকেন লঠন
 বিশ্বের কাছে তারা লাগে যদি লাগে ॥

মন উড়ু উড়ু, চোখ হুগু হুগু,
 ম্লান মুখখানি কীটনিক,
 আনুখ্যাসু ভাষা ভাব এলোমেলো
 ছন্দটো নির্বাহনিক ।
 পাঠকেরা বলে এ তো নয় সোজা,
 বুঝি কি বুঝিনে যায় না সে বোঝা,
 কবি বলে “তার কারণ আমার
 কবিতার ছাঁদ আধুনিক ॥”

বউ নিয়ে লেগে গেল বকাবকি
 রোগা কণী আর মোটা পক্ষিতে,
 মণিকর্ণিকা ঘাটে ঠকাঠকি
 যেন বাঁশে আর সরু কক্ষিতে ।
 ছ’জনেই জানে না এ বউ কার,
 মিছেমিছি ভাড়া বাড়ে নৌকার,
 পক্ষি চোঁচায় শুধু হাউ হাউ
 “ওরে কণী পারুবিনে বক্ষিতে ।”
 বউ বলে “বুঝে নিই দাঁউ দাঁউ
 মোর ভরে বলে ঐ কোন্ চিতে ॥”

পেনসিল টেনেছিমু হুগুয় সাতদিন,
 রবার ঘষেছি শেষে তিনমাস রাতদিন ।
 কাগজ হয়েছে সাদা,
 সংশোধনের বাধা
 ঘুচে গেছে, এইবার শিক্ষক হাত দিন ;
 কিন্তু ছবির কোণে স্বাক্ষর বাদ দিন ॥

সন্দিগ্ধে সোজা হুজি সন্দিগ্ধে ব'লেই বুঝি
 মেডিকেল বিজ্ঞান না শিখে ।
 ডাক্তার দেয় শিখ টাকা নিয়ে পইত্রিশ
 ইন্সপেক্টর বলে কাশিকে ।
 ভাবনায় সেল ঘুর ওষুধের লাগে ধূম
 শব্দ নাগাল পারিত্যগিক ।
 আমি পুরাতন পানী, hanging শুনেই কাপি,
 ডরিনাকো সাধাসিধে ফাঁসিকে ।
 শূন্য তবিল যবে বলে "পাঁচনেই হবে"
 চেতাইল এ ভারতবাসীকে ।
 নাস'কে চৈকিয়ে দূরে যাই বিক্রমপুরে
 সহায় মিলিল খাঁছ মাসিকে ॥

নিজের হাতে উপার্জনে
 সাধনা নেই সহিষ্ণুতার ।
 পরের কাছে হাত পেতে খাই
 বাহাদুরি তারি গুঁতার ।
 কৃপণ দাতার অন্ন-পাণ্ডে
 ভাল যদি বা কব্জি থাকে
 গাল-মিশোনো গিলি ভো ভাত
 না হয় তাতে বেইকো হু-তার ।
 নিজের জুতার পাতা না পাই
 স্বাধ পাওয়া যায় পরের জুতার ॥

নৈজ্ঞানিক অশীশ স্মৃতিস্মরণ

শ্রীভুলসীদাস মুখোপাধ্যায়

অতীতকালের স্মৃতির মনোভাব বিস্তারিত হলে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মণ্ডল বিস্তারিত বড় ভুলো বলাব। মন বড় বিধান বটে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তার ব্যুৎপত্তিও প্রচুর — কিন্তু, তার কথা শুনে মনে হয়, তার আশ-পাশে সন্ধ্যারে কি ঘটছে না ঘটছে, সে তার কোন খবর রাখে না। হাতদিন সে তার ল্যাবরেটরীতে টেবুটিব, বাত, বই, নানারকম জানোয়ারের ঝাড়, নানারকম গাছপালা নিয়েই পড়ে থাকে।

তাই মনোভাব বিস্তারিত বলা মাত্র। সেদিন, তার বৈজ্ঞানিক মনোভাব বিস্তারিত—তার সবটুকু বলাবাতার ধূসর আভ্যন্তরীণ দৃষ্টি বহুর পত্রাশ্রমে মনোভাব বিস্তারিত তাল তাল কতকগুলো তালুকের দাবী ক'রে এক মামলা জুড়ে দিলেন। দৃষ্টি ধর তার বলাবাতার মনোভাব বিস্তারিত বলাবাতার মনোভাব বিস্তারিত, "একদম লক্ষ্য, একদম হাবার হাতে থাকা একটা 'ক্রাইম'।" কিন্তু মনোভাব বাবু এটোই প্রবল মামলা হাইকোর্টের বাস্তব-প্রবু। তিনি কোমরে চাষের এ'টে, কপালে চাষের পেটে, চীনের প্রাচীরের মত মনোভাব বিস্তারিত আড়াল ক'রে গাফিলত। কালেই চলল মামলা, এবং চলেও আসছে নির্বিবাদে আশ মন বহর। মনোভাব বিস্তারিত চেক টেকা মাত্র। হাড়া আর বড় বিশেষ কিছু দেখতে হয় না।

সেদিনও নিত্যকার মত মণ্ডল তার ল্যাবরেটরীতে চুকেছে, এবং নিত্যকার মত মনোভাব বিস্তারিত 'সিন্ধুসিদ্ধি', 'একোয়াকাইল্যাইট' প্রবৃত্তি হুজুগা গাছ-গাছড়ার হুজুগা মাম ক'রে হুজুগা হাফুছে। এমন সময় নিত্যকার মত তার ভূত বোলা ভিন্টার সময় তার খাবার দিতে ঘরে ঢুকল। মনোভাব বিস্তারিত তখন টেবুলের উপর মাথা ঝুঁকে কি একটা

দিখছিল, মাথা তুলে হঠাৎ চাকরকে খিজাল করল, "তুমি কে?"

"আজ্ঞে, আমি রাম।"

"ও, আচ্ছা গাফিলত।" তারপর আপন মনে বকতে লাগল, "রাম — রেতা মূল — সেটা কি 'ম্যানিফেস্টেশন'ের মূল? না, তার পরের?" তারপর ফুৎ ক'রে চাকরকে খিজাল করল, "আচ্ছা — সহসেব! তখন জলসে 'ম্যানোনা কোয়ামোনা' পাওয়া যেত?"

চাকর বেচারী আজ বার বহর চাকরী করছে, কিন্তু এমন বিপদে কখন পড়েনি। মনোভাব বিস্তারিত হুজুগা বার বহরের মতো কোন দিন তুলেও তার মনে কথা বসেছে কিনা, তাই তার মনেই। সে বিমম ভরকে দিয়ে বলল, "আজ্ঞে, আমার নাম রাম।"

মনোভাব বিস্তারিত আর লাড়া নেই, মাথা খাতার উপর হুঁকে পড়েছে, 'শার্কার' ছুটেছে যেন পাঠ্য-বেল। চাকর নিঃশব্দে খাবার নামিয়ে রেখে পা টিপে টিপে এগিয়ে দরজা পর্যন্ত যেই এসেছে, অবনি মনোভাব বিস্তারিত মাথা আবার উঠল, "ও-বাড়ীর কাকীমাকে ডেকে পাও ত।"

ও-বাড়ীর কাকীমা! বাবু বলে কি! রামের মাথা আবার ঘুরিয়ে বেল।

আজ মন বহর মামলা চলছে, আর এই দীর্ঘ মন বহর—কথা ও প্রবল বাস্তব—প্রবল মনোভাব বিস্তারিত সেবিও বহর। রাম তাবল—গুস্তে সে তুল করেছে। একটু ম'রে এসে খিজালার মতো বলল, "আজ্ঞে?"

মনোভাব বিস্তারিত তখন বিড় বিড় করছিল, 'সেপিয়েন্ডোনা' 'সেপিয়েন্ডোনা'। রাম লম্বা এসে গাফিলত। মনোভাব বিস্তারিত তখন চমকে উঠে আফামোফা জেবে বলল, "এ —

সমর্থ — ও-বাড়ীর কাকীমা। — ব'লে আবার মাথা নীচু করল।

চাকর পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল, এবং বাইরে এসেই হতা-বহলে লগ্নর্জে জানিতে দিল যে, বাবু জব্ব সন্ধ্যা আশ্রম অনেক গল্প করেছেন। বাবু একটু প্যারিশী পোছের বটে, তবে ছা, লোক মন নয়। এখন তার অনেক কাল, ও-বাড়ীর পিরীকে ডেকে দিতে হবে। জক্তরী সরকার — বাবুর হৃদয়।

সরবু বখন শুনলেন, মণীষ তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়, মহাশয়ের বাবুকে ডেকে তিনি বললেন, “ওনু পা — তোমাদের মৌনী মূনির আশ্রম হঠাৎ টনক নড়ে উঠেছে।”

মহাশয়ের বাবু বললেন, “কার?”

“ঐ তোমাদের পাখলার গো — কি খেয়াল মেপেছে, আমাকে ডাকছে।”

মণীষকে এঁরা অপ্রত্যাশিত ক'রেই নাম দিয়েছেন ‘পাখল’, আশ্রমের ক'রে নয়। মহাশয়ের বাবু ক্র ক্রুদ্ধে বললেন, “কেন?” গিন্নী বললেন, “কি জানি — রাম বেটা ত এই ব'লে গেল। ওর সঙ্গে নাকি —”

মহাশয়ের বাবু বিরক্ত হ'য়ে বললেন, “নিশ্চয় ত আসক্ত পারত; ও! আবার চাকর পাটিয়ে নবাবী করা হয়েছে।”

সরবুর কিন্তু অত্যন্ত কৌতূহল হয়েছিল। বললেন, “হাই না — সেখেনই আসি না। এতদিন পরে ডাকছে বখন। আর দেখ, ওর বোধ হয় ইচ্ছে নয় — তুমি জানতে পার যে, ও আমার ডাকছে। তাই ছুপি ছুপি চাকর পাটিয়েছে। কি বল, বাবু?”

মহাশয়ের বাবু দাবা খেলতে বাঙ্ছিলেন, বেতে বেতে বললেন, “বাবো বাঙ, তবে একটু সাবধান হ'য়ে থেকো। কিছু শুকতে বললে শুক না। কিছু যদি চাপুতে বলে, যেন চেন না। ওর ঘরের ককালগুলো দেখে আবার যেন ‘হাট’র রোগ ক'রে ব'সে না।

ভালর ভালর ঈশপির কিংরে এল। — ব'লে তিনি বৈঠকখানার দিকে পা বাড়ালেন।

সরবু বখন মণীষের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, তখন সে কতকগুলো হরিণ-জাতীর ধীরের মাথা নিয়ে কি যেন দেখছিল, আর পেন্সিল দিয়ে নোট লিখছিল।

“এঃ মাগো! যেন গো-ভাগাড়; মরণ আর কি! বলি কি বলছিল?” — ব'লে তিনি মণীষের দিকে এগিয়ে এলেন।

মণীষ হুপ তুলে বলল, “আউ — কে?”

সরবু ভাবলেন, লগ্ন বছর দেখিনি, হরত বা চিনতে পারছে না। বললেন, “আমি — আমি — তোর কাকীমা।”

মণীষ তখন খাতায় কি একটা আঁকছিল — বলল, “হ্যা — কতদিনের?”

সরবু বিস্মিতকণ্ঠে বললেন, “কি কতদিনের?”

মণীষ ব'লে উঠল, “এই — ই অফ!” আর একটু হ'লেই একটা হরিণের মাথা — বা! হরত মণীষের কাছে অতি মূল্যবান — টেবল থেকে প'ড়ে যেত। সে সেটা বর ক'রে বখাওয়ানে রেখে গিয়ে বলল, “একি মারীমা — বহন!”

“মারীমা! মারীমা কে তোর? আমি, আমি তোর ছোটকাকী!”

“আই নী। কাকীমা। আম্মা কাকীমা। কাকাবাবু আম্ম ক' বছর হ'ল আপনাকে বিয়ে করেছেন?”

“এই জিজ্ঞাসা করতে ডাব্বলি নাকি লগ্ন বছর পরে?” সরবু গরম হ'য়ে উঠছিলেন — অশ্রুত স্বরে বললেন, “পোড়ার বাঁধর।”

মণীষ আপন মনে তখন গবেষণা করছে, “আমার বয়স হ'ল এই বয়স, আমার আগের কাকীমাটি মারা যান আমার জন্মবার ন' বছর আগে — আর কাকাবাবু — যা বলতেন — বউ মারা যাবার এক মাস বামুই আর একটা বিয়ে ক'রে আনেন।” তারপর সরবুর দিকে তাকিয়ে বলল, “ঐ! আপনি আমার

অনেক দিনের কাকীনা বেবডি। চলি বহুরেও
ডগর—বহু আচ্ছা কাকীনা।”

সরু এবার শটই বেশে সেলেন, বললেন, “তোর
এই পানলাদী পোনাতে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলি
নাকি? এই অবোলায় আমার ব’লে ব’লে পানলাদী
পোনবার সময় নেই। কি দরকার, বলবি ত শৈশুদির
বল।”

সরু এবার ঠোঁটের ঝাঁপ ডেকে সেল। বললেন,
“আমি চলে আসি।—হতভাসা।”

মণীশ বলল, “উইং’হ’, বাবেন না, বাবেন না।
আমি আপনাকে একটা পুরস্কার দিতে চাই—
চলি বহুর একটানা কাকীমাসিরী করা — এ একটা
বেকর্ড—।”

সরু চ’লে বাড়িলেন, ফিরে ঝাড়াগেল, “কী।



‘এ কি মাসো—বহু?’

বহু হাসিতে মণীশের মুখ উজ্জ্বল হ’য়ে উঠল; বলল,
“আমিও জাই ভাবি। সময় নেই—মিনজলা এত হোট।
আচ্ছা, ঐতিহাসিক ফুগর দিনজলা এর চেয়ে
বিস্তর বক ছিল, না? নরত যে ফুগ ‘মাসোজেনে’র মত
জানোয়ার — সেই ফুগ চলি বহুর দিবরাত — এ
আমি—”

কাকীমাসিরী। এ তোরা মাসুমিসিরী না
চাকরামিসিরী — ”

মণীশ হাসিতে দিগে বলল, “ওহো! আচ্ছা, আচ্ছা
‘পার্জন’।” তারপর ভ্রমর থেকে হ’টো কাগজ বের
ক’রে বলল, “বহুদিন আমরা নামলা করছি, না?—
কি বা হচ্ছে এই নামলা-বকদ্বা ক’রে? কি বা ছবি

এসব বিষয়-আশয়? কি বলেন—হ্যাঁ। ব'লে সরব্বর দিকে চাইল। সরব্ব চূপ ক'রে লাড়িয়ে বইলেন, ডাঙতে লাগলেন, আবার না-জানি কিছু একটা ব'লে বলেন, তারি বুদ্ধি পায়তারা ভাঙছে। মণীশ বলল, “এই ছুঁটো হলি। এই—এইটোতে আমি মণীশ মিত্তির—আমার ব্যবসায়ী স্বাবর-অস্বাবর সম্পত্তি, টাকাকড়ি ইত্যাদি সব—এই এক ল্যাবরেটরীর জিনিসপত্র বারো”—ব'লে হাত দিয়ে ঘরের চারিদিক দেখাল—“এই আপনি সরব্ব মিত্তির—এই আপনাকে দান করলাম। এই—এই আমার সই, আর আজকের তারিখ; আর এই হলিগটার”—ব'লে আর একটা কাগজ নিয়ে বলল, “এতে আপনি সরব্ব মিত্তির এই আমাকে—এই মণীশ মিত্তিরকে—আপনার স্বাবর-অস্বাবর আর টাকাকড়ি সমস্ত সব দান করলেন। এই—এই খানটোতে সই করুন।”

সরব্ব মনে মনে ভীত হ'য়ে উঠলেন। এ নিশ্চয় এই মানলার এক প্যাচ।

বললেন—“তার মানে?”

মণীশ হেসে বলল, “তার মানে এই যে, আমার বিচ্ছিন্ন-সম্পত্তি, আর জন্মে আপনারা—আপনি আর কাকারাবাবু—আমার সঙ্গে লড়াই করছেন, তা' আমি আপনাকে দিয়ে যেতে চাই, আর তার পরিবর্তে আপনার নিম্ন নামে বা'সামাত্র কিছু আছে, বন্ধন না যেমন কলকাতার ঐ বাড়ীখানা, আমি নিতে চাই। আমি বুঝতে পারছি, আমার আর এসব বিষয় রাখার হ্যাঁকাম পুড়িয়ে উঠবে না। আমি তাই বেশ ছেড়ে কলকাতার যেতে চাই। কি, আপনার বিবাস হ'ল না? এ হলি কিছু পাকা। আমি নিজে কলকাতার শ্রমেনবাবু কাছ থেকে করিয়ে এনেছি, সম্ভব করবেন না। পক্ষে করবার কোন কারণই নেই এতে। এই নিম্ন কলস, হ্যাঁ এই—এই খানটোতে একটা সই—”

সরব্ব কচি খুঁকী মন। ব'সেছিলেন, উঠে গাড়লেন, বললেন, “এত বড় একটা কাছ। আজ্ঞা দেখি ঠিক

জিভালা ক'রে?” কিন্তু বাড়ী গেলেন কড়ের মত। যদি বলিলন্তো ঠিক হয়। উঃ, লাখ টাকার সম্পত্তি।

মণীশ তখন তার ঘরে শীত দিতে দিতে পায়েচাতী করছিল। বাড়ী দিয়েই সরব্ব মহাসেব বাবুকে তলব করলেন। মহাসেব বাবু আসতেই সরব্ব মণীশের বিষয় বদলাবন্দীর কথা বললেন। মহাসেব বাবু লাড়িয়ে উঠলেন, “বল কী! এ যদি সত্যি হয়, তবে যে রাজা হ'য়ে যাব। তোমার নিজের বলতে আছে কি? ঐ কলকাতার বাড়ীখানা, আর খান কতক পয়সা। না, আমি এখনই মোক্তার বিষয় বাবুকে নিয়ে আসছি, আজই সই ক'রে কেল, গুর মনকে বদলাবার সময় সেওয়া হবে না। বড় পাগল কিনা।”

মোক্তার মথোই মহাসেব বাবু সেখানকার সবচেয়ে বড় মোক্তার বিষয় বাবুকে নিয়ে দিল্লীগমন্তে মণীশের বাড়ী হানা দিলেন। বিষয় বাবু বহুক্ষণ হলি হুটি পরীক্ষা ক'রে হার দিলেন, “না, ঠিকই আছে, সই করতে পারেন।”

মণীশের নিকুঁজিতার ছত তাঁর ঘুম হ'ল। সুবিধা পেলে ছরত উপদেশও দিতেন—কিন্তু মহাসেব বাবু, হলি যদি সত্যি হয়, পাচল' টাকা কি কতল করেছেন। সই হ'য়ে গেল; বিষয় বাবু সাক্ষী হিসেবে সই করলেন। সরব্ব আনন্দে কি করবেন, ঠিক করতে না পেরে বাড়ী গিয়েই ডাই খুঁজিট ঘরকে চিটি লিখতে বসলেন। মাংসা-মকছার শাব্দি—লাখটাকার সম্পত্তি লাভ! কম আনন্দের কথা!

সে-রাত্রে কর্তা-দিল্লীর ভাল ক'রে ঘুম হ'ল না। সকাল হ'তেই মণীশের সেওয়া দিল্লীখানা নিয়ে হুঁজনে সুখায়ুনি হ'য়ে ব'সে আছেন। দিল্লী দিল্লীখানাতে একবার হাত বুড়িয়ে বললেন, “এবার কিন্তু আমার একসেট জড়োয়া পয়সা ক'রে সেওয়া চাই—হঁ।” জড়োয়া পয়সা পরার সাথ তাঁর বদল পলাশোর্ড হ'য়েও যেটেনি।

কর্তা একবার দিল্লীখানা বেড়ে সেড বসলেন,

"হাতাও পো—আসে একখানা মোটর কিন্তি।"
কেটে কেটে মাইন-মাসিনট ক'রে তার হাঁটুত
পেটোবাত ধ'রে গেছে।

বকরী 'তার' করেছি—আর আখ রবিবার হ'য়ে গেল—
পাওনি তোমরা।"
চ'লনেই এবারবেগে মাথা নেচে বললেন, "না"।



এবার কিন্তু আমার এক সেই সন্তোষা প্যনা সেওটা-চাই'

এমন সময় দুর্জ্জট বাবু এসে হাজির। কস্তা চমকে
উঠে বললেন, "কি ব্যাপার! হঠাৎ বে?"
গিন্নী হেসে বললেন, "তুমি—এরি মধ্যে?" রাহের
চিঠি যে সকালেই কলকাতায় পৌছয় না, তা' তিনি
জানতেন।

দুর্জ্জট বাবু একখানা চেয়ারে বসে গুললেন।
বললেন, "আমার 'তার' গাওনি তোমরা।"
দুর্জ্জট বাবু সমঝে ব'লে উঠলেন, "কিসের
জ্ঞান?"
দুর্জ্জট বাবু ভয়ানক আতঙ্কিত হ'য়ে বললেন, "লে
কি? অগ্নি ত্রৈলোক্যজিয়ার সকাল বেলায় জেগেছেন।

দুর্জ্জট বাবু বললেন, "কবে? 'তার' খানা কি
হারিয়ে গেল?"

কস্তা বললেন, "চুলোয় থাক তোমার 'তার'। তুমি
যখন সশরীরে ভালয় ভালয় এসে পড়েছ—তখন আর
'তার' 'তার' ক'রে মাথা ঘামাতে হবে না। এরিকে

কাল কি কাণ্ড হ'য়ে গেল কার? বকরী, আর
বকরী করবে না! আমার বোধ হয়, জরেন-বাবুর
সঙ্গে জেগে উঠে বসে কলকাতায় এসেছে। আর তা'
হাফা—তুমি যে ঐ বকুন ব্যাটেরটা—কি যে মাথা
হাই—ঐ চাক চাকি বাকি মাসিমে দিয়েছে, তাই
বোধ হয়, বাকরীকে নিয়ে এই খাঁজটা ক'রে বেগলেন।"

ধুঁটি বাবু চক্ষু হ'য়ে বললেন, “কি কাশ ?”

মহাসেব বাবু বললেন, “মহীশ তার স্তম্ভ বিধর
সরস্বত দান ক’রে দিয়েছে, এবং বিম্বোৎসব-কণ্ঠে
বললেন, “এই বৈশ তার দলিল !”

ধুঁটি বাবু দলিলটি দেখলেন—ভুল ক’রেই
সেখলেন—তারপর বললেন, “হোকবার শুণ্ডু ও
বেলা হ’ল কেন ?”

সরস্বত বললেন, “মাথার ওর বরাবর কেন একটু
খেন আছে বাবু। আমার বললে, ‘কাকীমা,
কুমার বা’ কিছু আছে আমার দাও, আর আমারটা
ভুলি দাও।’ আমার কিন্তু মোটে ইচ্ছে ছিল না,
তা ওরা খরলেন—কাজেই—”

ধুঁটি বাবু মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললেন,
“আর দিলে একটা দলিলে সই ক’রে তোমার বখা-
সরস্বত তাকে ?” তার মুখ এক নিমেষেই কাশি মেয়ে
সেল; বললেন, “এ করছে কি তোমরা ?” আরি একটা
শক্ত মামলা নিয়ে বিব্রত হ’য়ে পড়েছিলাম ব’লে
আসতে পারলাম না, আর ইতিমধ্যে তোমরা ঐত
ক’রে ব’লে আছে !”

মহাসেব বাবু মনে করলেন, ধুঁটি বাবু তাঁকে
তারার সামনে খেলো ক’রে দিচ্ছেন। সরস্বত
বললেন, “কেন ? অস্তরটা কিছেরা হুঁয়ছে ? দলিলটা
দত্তর মত পাকা !”

ধুঁটি বাবু বললেন, “কিন্তু যে পাকা, সে-বিষয়ে
কিছেরা সত্যই । আর তাই আশ্বাস। কিন্তু
তোমরা আমার কপটি পেয়ে হারালে। সরস্বত
নামে ডাবীর যে টিকিটানা কেনা হয়েছিল—সেখানা
পটিন স্তম্ভ টাকার বাতী কিসেই—আর তাই
বৃহস্পতিবার দিনে খবর পেয়ে আমি তোমাদের
‘তার’ করেছিলাম। এখন ব্যাপার দেখে বুঝি—সে
‘তার’ শুধু হোজার-কাত দিয়ে গড়েছে। হোজারটাকে
হারা মনে করেছিলাম—এখন, বেগদি—একটি
মিঠিনিটে পরজান !”

তার কথা শুনে, হবার আসে—বড়সেব বাবু

হাউ-হাউ ক’রে কেনে উল্লসন—সরস্বত সজাহার !

ধুঁটি বাবু বললেন, “এখন এমন ভড়কে সেলে
চলব না। আসে চল, পোট অফিসে,—‘তার’টা
এসেছিল কিনা, খোঁজ করা যাক। আর যদি এসে
ওর কবলে প’ড়েই থাকে, তা’ হ’লে যে দলিলটা
ওর কাছে আছে, সেটা উদ্ধারের একটু চেষ্টা ক’রে
সেবা যাক।”

মহাসেব বাবু তাঁরতে কীদতে ধরা-পধার বললেন,
“তা’ যদি পার হাদা—”। তারপর চোখ মুছতে
মুছতে ধুঁটি বাবুর সঙ্গে চললেন পোট অফিস। সরস্বত
ব’লে ব’লে হাঁক পাড়তে লাগলেন, “কতখান নিদি—
নিপাত বা ! নিপাত বা !”

পোট অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সেখানে
‘তার’ আসে না, সেটা একটা ‘ড্রাক-অফিস’; ‘তার’
আসে বড় পোট অফিসে—সেখান থেকে দশ মাইল
দূর। তবে বৃহস্পতিবার দিন একজন প্রিয়ন একটা
‘তার’ নিয়ে এসেছিল বটে, এবং পোটমন্টার খার্মের
ওপর মিঃ এন্স, নিয় লেখা থাকার মত সেক্টা
মইশকই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—কারণ, এ অফিসে
খার্মের নানা বেশ থেকে বত ‘তার’ বা চিঠি আসে,
অন্য-কিছু তত আসে না।

হতানু হুঁহে খার্মা-ভরপতি সেখান থেকে ফিরে
এলেন। বাড়ী এসে ধুঁটি বাবুর পরামর্শে বৈত
সরস্বত আর ধুঁটি বাবু চললেন মইশের বাড়ী—মইশ
মইশকে ভোগা দিয়ে দলিলটা হাতে নিয়ে নেজা।
কাছটা বে খোঁজ হবে না, সেটা সেটাই
কুচলেন। তবু—বড়সেব বাবু মইশের বাড়ী গিয়ে

সরস্বত ধুঁটি বাবুর রেখে নিজে এখনে
চললেন মইশের খার্মেরেটোরীতে—কি খার্মে যদি তার
খার্মী তাইকে কিছু অপমান ক’রে বেশে মইশ-তখন
একটা একটা মাপের কতাল নিয়ে পরীক্ষা করছিল।
সরস্বত চুকে সেখাই ব’লে খার্মা—খার্মা—না—
‘খার্মাকোতা’। ‘খার্মা’ হার্মাকোতা, সে-বিষয়ে, হার্মাকোতা
সরস্বত নেই—এই যে খার্মা—খার্মাকোতা

সবু চৌট উঠে অশ্রুতে বনলেন, “সবু
আর কি!” শব্দে বনলেন, “বাবা মহা! আমার
দাদা তোমার সঙ্গে একবার দেখা করছে এসেছেন।”
তাহাঙ্গের ‘বাবা’ ‘বাবা’ বলে মনটা ভিজিয়ে রাখতে
সোফটা। কি। মণ্ডল তখন গভীর মনোবোধ দিয়ে
শাপের ধাতু শুদ্ধ—বলল, “আজ্ঞা—সেতে পারেন।”
সবুও বেন ওনতে পাননি—বললেন, “ডেকে নেব।”
মণ্ডল মাথা তুলল, “কে? কি চান এখানে?”

সবু—একটু বেন ধরে গেলেন—বললেন, “আমার
দাদা এসেছেন।”

মণ্ডল বলল, “কই—সেখতে পাচ্ছিলে আমি।”

সবু তাকাতাড়ি ডাকতে গেলেন। মণ্ডল আবার
নিম্নের কাজে লুপে গেল।

ধুঁকটি বাবু এখন এসে ল্যাবরেটরীতে ঢুকলেন,
মণ্ডল তখন একটা মত হাড়ের ইকরো নিয়ে নাড়াচাড়া
করছিল। ধুঁকটি বাবু ঢুকতেই—“এই যে ধুঁকোখননা
—টিক সমস্ত এসে পড়েছেন—” বলে হাকটা হাতে করে
সোফা হ’য়ে উঠে গাফল। তারপর বেন কোন
বিজ্ঞানতত্ত্বের বিজ্ঞান-সালে বস্তু তা হিলে, এমনি জ্বলিতে
বলতে লাগল, “এই যে লগা মোটা গাটির মত হাড়ের
ইকরোটা আপনার দিকে বনছেন, এটাকে বলে—**সুবিহা**।
এটা কোন লব্ধির পায়ের হাড়।” এই হাড়ের ইকরোটি
সেখের হাড়ের সমস্ত—তবুও মহা ল্যাবরী বস। এটা
এখন পাওয়া যায় ব্রেজিলের একটা পর্বতগুহার।
কুড়িয়ার সোফারের কীট এটা একটা। ‘বেগাখেরিয়া’র
টিবিয়া। কিন্তু আমার—”

ধুঁকটি বাবু এদিকে এসে বললেন, “মণ্ডল! তোমার
সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে।”

মণ্ডল ঘের ঘরে উঠে বাজিল, ধী ক’রে পুথিবীতে
প’কে গেল। চমকে উঠে সবুকে দেখিয়ে বলল, “জবে
কেসারীয়া বসিলেন, আপনি লগন হু থেকে আগছেন!
আপনি কোমতে হ’য়ে—”

ধুঁকটি বাবু ধাত দিয়ে চৌট কামড়ে ধরে
বললেন, “হা; হা সে টিক।” সে পরে হবে ব’ধ।

এখন, জ্বাল হাতে যে দলিলাটা (সবুকে দেখিয়ে)
ইনি নই করেছেন না, সেটা আমি একবার দেখতে
চাই।”

মণ্ডল বিস্মিত কণ্ঠে বলল, “হাতে—দলিল—
আপনার ইনি দেখেছেন—কই সে রকম কোন প্ল্যানেট
ত—”

ধুঁকটি বাবু একটু রেসে উঠেছিলেন, “ক’ল্যো
গলায় বললেন, “প্ল্যানেট নয়—প্ল্যানেট নয়—
কামরা।”

মণ্ডল বলল, “ও! কামরা। তা’ কামর সবচে’ আমি;
বিশেষ কিছু জানিনে—অবস্ত যে সব বাস থেকে ক’র
তৈরী হয় তা’ কতক কতক আমি হাতী করেছি। তবে
ঐ যে বললেন, দলিল-কামরা—ও যে কি বস্তু—তা’
আমার এই এত বই রয়েছে, আপনার বিশ্বাস না
হয়, বুঝে দেখতে পারেন, কোথাও এক লাইনও
লেখা নেই। ‘আজ্ঞা তা’ হ’লে—” সে হাত হুটি ছোড়
ক’রে কপালে ঠেকাল।

ধুঁকটি বাবু বৈধা-চ্যুতি ঘটল—বললেন, “দলিল কি,
জান না? নেকারি শেরে? হাউজেন।”

মণ্ডল বিশেষ লজ্জিত হ’য়ে ব’লে উঠল, “হি
আপনি কি করলেন, এই হাজার হাজার বছর
‘দলিল’ের মুখে গাড়ি—আপনি আমার ল্যাবরে-
টরীর ডিসিগ্নি নই করলেন যে। আপনার দেখছি
একটুজ্জি মাথা লগন হু—ওঠে। এক কাজ
করবেন, যোগ মাথার ‘অ্যাকুইড প্যাক্সিফিকো’
ব্যবহার করবেন। দেখবেন ফিল্ম—”

ধুঁকটি বাবু আর ওনলেন না—রেসে বের হ’য়ে
গেলেন।

সবু দেখলেন, আর কোন আশা নেই; তাই
বাবার সময় কী-কীসে লুয়ে চীৎকার করে ব’লে
উঠলেন, ধবে ভগবান! হে মা কালী! এই
হতভাপার হাড়গুলো বেন ওর ঐ আডা-প্যাডা-ভাডার
মত নরনস্তর হ’য়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।”

মণ্ডল গভীর হ’য়ে ডাকল, “কাকীমা!”

সরযু চ'লে যাচ্ছিলেন, থমকে দাঁড়ালেন। হয়ত গিয়েছিল। আমারও কাজের কথাটে মনে ছিল না।
আবার একটু আশা হ'ল—যদি দলিলটা ফিরিয়ে দেয়। এটা কাকাবাবুকে দেবেন।”



‘.....এই ‘তার’খানা পিয়ন ভুলে আমায় দিয়ে গিয়েছিল.....’

—বললেন, “কি?”

সরযু সেই পচিশ লাখ টাকা পাওয়ার খবর-আনা

মণীশ পকেট হাতড়ে একখানা কাগজ বের ‘তার’খানা পাবে দ’লে খব থেকে বের হ’য়ে
ক’রে বলল, “এই ‘তার’খানা পিয়ন ভুলে আমায় দিয়ে গেলেন।



রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

শ্রীহর্যোদয় সেনগুপ্ত; এম-এ, পি-আর-এস

(১)

ছোটগল্প আরও ছোট। কাজেই তাহাতে হৃদয় মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ বা বহু ঘটনার সমাবেশের স্থান নাই। অথচ গল্প-উপকাসের প্রাণ হইতেছে তাহার উপাখ্যান, তাহাতে ছুই একটি ঘটনা থাকে চাই-ই। গভীর ও ব্যাপক মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণের স্থান নাই বলিয়া যে ক্ষুদ্র ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া ছোটগল্প গড়িয়া উঠে, তাহাকে দুই বেশী বুঝা করিতে হয়। 'সিরিক' কবিতা যেমন একটি ভাবকে আশ্রয় করে, ছোটগল্প তেমন একটি উপাখ্যানকে কেন্দ্র করে। তাহার মধ্যেই সে যেন সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। সে সব গল্পের 'মুখা' উদ্দেশ্য কোন বিশেষ ঘটনার বর্ণনা নহে, সেই সব গল্পেও একটি ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করা হইয়া থাকে। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'মুখা'। মুখ প্রকৃতির সঙ্গে মুখ বালিকার আত্মবিক সংযোগ এই গল্পের উপলব্ধি; কিন্তু তবুও এমনভাবে গল্পটি লিখিত হইয়াছে যেন হাজার বিবাহ ও তাহার ব্যর্থতার বর্ণনা কতাই কবির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

একটি ঘটনাকে প্রাধান্য দেওয়া বই বলিয়া ছোট-গল্পের উপসংহারে একটা climax ও anti-climax থাকে। পূর্ববর্তী সমস্ত ঘটনাকে এইরূপভাবে সাজান হয় যেন তাহারা একটি বিশেষ সিদ্ধান্তের উপকরণ যাত্র; অথচ উপসংহারটি যদি সেই পূর্ববর্তী ঘটনার শেষ সিদ্ধান্তমাত্র হয়, তবে তাহা ব্যামিতির প্রতিজ্ঞার মত সহজ ও সরল হইয়া পড়ার। তাহার মধ্যে বিষয়-কল্প কিছুই থাকে না। তাই ছোটগল্পের উপসংহারে পাত্তিকটা অপ্রত্যাশিত অংশও থাকে। আমাদের মনে হয় প্যাট্রিস্টার্কি আবেষ্টনের পরিণতি অজ্ঞাতভাবে হইতে পারিত, 'হিউ কৌন' চল্লিশ চক্রে বড়ির কাটা পুত্ৰদিকে ঘুরিয়া দিয়াছে। ইহার জন্য আমরা প্রস্তুত হইতে পারিতাম, কিন্তু বই নাই। উদাহরণস্বরূপ

রবীন্দ্রনাথের 'গিরত' পূর্ণ গল্পটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অহিমমি ও তাহার মাতার প্রতি ভবিষ্যৎ কল্পনোপাল যে রূপা দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাহাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কল্পনোপাল স্বভাবতঃ সত্যপরবশ ও বাস্তবিক; কাজেই এই অল্পগ্রহবর্ষণ অতিরিক্ত হইলেও অস্বাভাবিক মনে হয় নাই। তাহার পর ভবিষ্যৎপূজের সঙ্গে তাহাদের যে বিরোধ চলিতে লাগিল, তাহার ফলে অহিমের সর্বনাশ সাধনই সম্ভব বলিয়া মনে করিতেছিলাম। হঠাৎ কল্পনোপাল আসিয়া কি কথা বলিলেন, তাহাতে শুধু রামশোচনের সম্ভারই সমাধান হইল না, অহিম ও বিশিনকিশোরের পরজাত্যও শেষ হইল। বাহার সঙ্গে বিপিনকিশোর এতদিন পরজাত্য করিয়া আসিয়াছে, সে হইল তাহার ভাই! এই পরিণতিপ্তির জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না; অথচ এই কথাটা জানিয়া লইলে পূর্ণাঙ্গের সমস্ত ঘটনার মধ্যে একটি ব্রহ্মক সংযোগ দেখা যাইবে।

এই প্রকারের গল্পের একটি সোবও আছে—ইহা অনেকটা চিত্তচকিত গল্পের মত। সমস্ত পূর্বের মধ্যেই ইহার কোণল নিহিত থাকে; কোন একটি অজ্ঞাত সত্যের উচ্চারণ অথবা হেঁদে একটি অদ্ভুত ঘটনার অপ্রত্যাশিতা—ইহাতেই ঔপন্যাসিকের গুটি নিবদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। ইহার মধ্যে চরিত্রচিত্রণের, মানবমনের নিপুণ ব্রহ্মের সন্ধানের সম্ভাবনাকল্প। পান্ডিত্য রূপের শ্রেষ্ঠ মঙ্গলমুখক দেশোদার এই ত্রুটিকে অতিক্রম করিয়াছেন তাহার Irony-র সাহায্যে। তিনি দেখাইয়াছেন, আমরা বড়ি দিয়া যে সত্যতা গড়িয়া তুলিয়াছি, অথবা নীতি ও বিচারশক্তির সাহায্যে বাহা দ্বিরকরি, আমাদের অজনিহিত প্রকৃতি সর্বমাই তাহারই অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। আমাদের

বাহিরে যে শক্তি আছে, তাহার রশ্মিও আমরা সংরক্ষণ করিতে পারি না। আমরা যেমনটি চাই, ঠিক তেমনটি পাই না। পণ্ডিত্যের মধ্যে মহনীর বৃত্তি দেখিতে পাই, আবার সত্যসাক্ষীর মধ্যেও পণ্ডিত্যের প্রকৃতি লুপ্তাশ্রিত থাকে। বুদ্ধিগতির সঙ্গে প্রবৃত্তির, ব্যক্তির সঙ্গে বহিঃশক্তির লুকাচুরি খেলা যোগাযোগের গল্পের প্রধান গুণ।

বিদ্রূপ ও স্বেচ্ছার মধ্যে বিরূপ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার চরম স্থিতি হয়না। তাহার রচনার হস্তরসের অবতারণা করা না হইয়াছে এমন নয়, এবং শেষ বয়সের ছোটগল্পে অনেক ভিনিসের উপর তিনি ব্যঙ্গ ভূরিয়াছেন, কিন্তু বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ তাহার রচনার প্রধান উপাদান নহে। তাহার ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য ঘটনার পরিণতি সাধনে বা স্বেচ্ছাধিপত্যে নহে। তিনি কবি। তাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যে তিনি মানবহৃদয়ের গভীরতম অহুতী আশাইয়াছেন, তাহার অতিনিহিত সৌন্দর্য্য উন্মোচিত করিয়াছেন। তিনি সেবাইয়াছেন যে, বিষয় সামান্য হইলেও তাহার মধ্যে অন্তিমন্ত হইয়াছে মানবহৃদয়ের সোণনতম কাহিনী, তাহার চিরন্তন সমতা। অবিকাল গল্পে তিনি একটি ক্ষুদ্র ঘটনাকে উপলব্ধি করিয়াছেন; কিন্তু তাহার প্রেক্ষাগে ঘটনাকে দোষ করিয়া ঘটনার অন্তরালবর্তী রক্তের অন্তিমন্তিকে মুখ্য করা হইয়াছে। ‘সুখিত পূরণ’ প্রকৃতি গল্পে কোন বিশেষ চূড়ান্ত পরিণতি নাই; উপক্রমণিকা ও উপসংহারে তেমন কোন পার্থক্য নাই। আবার কেখানে ব্যঙ্গবিদ্রূপের অবলম্বন করিয়াছেন, সেখানেও ব্যঙ্গবিদ্রূপের অতীত মানব-হৃদয়ের স্বপ্নরূপময়ীবাধেই মুখ্য হইয়াছে। ‘তাপ’ গল্পে প্যারীশর্মার হৃদয়ের চূড়ান্ত লইয়া কৌতুক করিয়াছেন, কিন্তু এই ব্যঙ্গবিদ্রূপকে অতিক্রম করিয়াছে কুহব ও হেমন্তের সৈবাহত প্রশ্ন, তাহার মন হৃদয় তাহার জীবন-বিসর্জন দিতে চাহিয়াছে। ‘দালিয়া’ গল্পে ‘মুন্সিবার’ প্রতিহিংসা বেজনে বার্ষ হইল তাহা অশ্রুতের নিষ্ঠুর

পরিণাম বসিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু সেই ব্যঙ্গ ঐ গল্পের পূর্ণতা কথা নহে। কবির কল্পনা চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে প্রেম ও প্রতিহিংসার মধুর সম্মিলনে। ‘বিচারক’ গল্পে জঘন্য মোহিতমোহনের ওচিভার উপরে স্নেহ জ্বলি হইয়াছে। কিন্তু ঐ যে কল্পনা জীবনের অপরাধের শেষ শাস্তি জঘন্য মোহিতমোহন বিদ্যান করিলেন তাহার একটি মহনীর-দিকও আছে, এবং কবির কাছে উহাই সর্বাংশে উল্লেখযোগ্য মিশ্রণ। বারবনিতা কীভাবে অস্ত্রাসনে হেমন্তের তাহার প্রথম প্রণয়ের দেবতার বৃত্তি লইয়া সন্ধাননে আত্মরক্ষা করিতেছিল, রবীন্দ্রনাথের কাছে তাহাই মুখ্য মিশ্রণ। তাই কল্পনা বর্তমানের অন্তরালে লুপ্ত অতীতের বৃত্তিকে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিশেষ এই যে, তিনি মানবজীবনের ক্ষুদ্র স্বপ্নরূপ, আশা-আশঙ্কার মধুর প্রশ্ন করিয়াছেন। আবার তিনি অনন্তের সন্ধানী ও বিপুল স্বপ্নের পুরাসী, তিনি যেমনবাধাধীন স্বপ্ন হইতে সহস্র অপূর্ণতার তরু পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছেন, পৃথিবীর সমস্ত ক্ষুদ্রতা, জুলুমতাকে অতিক্রম করিয়া তিনি অজানা অতের আরাধনা করিয়াছেন। এই কারণে ‘নিরিকের’ মত ছোটগল্পের আটের সঙ্গে তীব্রতার প্রতিভার একটা ব্যাভাবিক সঙ্গতি আছে। ছোটগল্পের বিষয় সামান্য, তাহা সাধারণতঃ কাহারও চোখেই পড়ে না। ‘প্রাণের’, ‘পোষ্টমাস্টার’ কি করিয়া ‘রাখিয়া’ খাইল, ইত্যুনের ছোট হেলেনকে অত্যাচারী পণ্ডিত মুখার্জি কি নাম ধরিয়া ডাকিতেন, ইহা লইয়া কাহারও সাধাবাধা নাই। অথচ এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার চরুত্বকে হৃদয়ের যে স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহার উপলব্ধিহীন আমাদের অজ্ঞাত। তাহার বেগ অপ্রতিরূপ, তাহার সর্বোপ বিরাট বিপুলের সঙ্গে। ‘একরাতি’ গল্পটির সঙ্গে জর্জ এলিসট রচিত *The Mill on the Floss* নামক উপন্যাসের সৌন্দর্য্য পরিচ্ছেদের সাদৃশ্য আছে। Tom Tulliver ও তাহার ভগিনী Maggie-র কল্পনার বিশেষ হইয়া গিয়াছে; প্রাত-

তিনি লজ্জার ছই প্রান্তে চলিয়া যিয়াছে। এক রাত্রিতে প্রবল ঝড় ও বজ্র তাহার একত্র হইল; পরদিন প্রাতঃকালে সেবা সেল, জাতভগিনীর দৃষ্টিতে নিবিড় বাহুপাশে আবদ্ধ। তিনি বিবাহ ও প্রণয় লইয়া যে বিরোধ হুক হইয়াছিল, দুজনের কোলে তাহার অবসান হইল। কর্ণ এলিফেণ্টের উপরাসে আর কিছুই নাই; তিনি সবার উপলক্ষ্য করিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন; তাহা মুচল্লভে সম্পন্ন করিলেন। জাতভগিনী একত্র পরম মেহে শান্তি পানিত হইয়াছিল, আবার একসঙ্গে দুজনের আদান প্রণয় করিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গল্পের সুর অত রকমের। সুরবালার সঙ্গে ইচ্ছার সেক ও মাঠারের প্রণয়নিবেদন হইল না, তাহার পরম্পরের সঙ্গে কথা বাত বহিল না। কিন্তু সেই স্বচ্ছল হৃদয়গের রাত্রিতে রাত্রির সীমাহীন অভকার ও বজ্রের অপ্রান্ত উদ্ভটতার মধ্যে সেক ও মাঠার মহাশয় তাহার জীবনের সমস্ত ব্যর্থতা ও দুঃখতাকে অভিক্রম করিয়া জীবনের প্রেত রহস্য দুজনের মধ্যে গাঁড়াইল। ধীরবৃত্তার সেই সমস্তকে গাঁড়াইয়া সে সেবিল তাহার চিরপরিচিত অখট চিরকালের ঘর অপ্রাপ্তিগ্ন সুরবালাকে। যেনবিন জীবনের ক্ষুদ্রতা ও দুঃখতার মধ্যে সুরবালা অবশিষ্টা ছিল, সেই দিন বিশ্বপ্রকৃতির অশাস্ত, বিপুলতার অংশ হইয়া সুরবালা তাহার কাছে উপস্থিত হইল। সে তাহার সঙ্গে কথা বলিল না, বিশ্বপ্রকৃতির মতই বহুতমরী হইয়া রহিল কিন্তু মাঠারের জীবনে কলকালের মধ্যে অনন্ত রাত্রির উদয় হইল।

মানবের সীমাবদ্ধ জীবনে বিপুলের আশা, পাওয়া যায় প্রকৃতির সম্পর্কে আসিয়া। প্রকৃতিকে আমরা সেবি, তাহাকে আমরা স্পর্শ করি, তাহার গন্ধ আমরা পাই, কিন্তু তাহার বস্তুগত আমরা ঠিক বুঝি না, তাহার রহস্য আমরা ঠিক উদ্ঘাটিত করিতে পারি না, তাহার অসীমতার আমরা অভিজ্ঞ হই। বুদ্ধির কান্না বাহ্যকে আমরা সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় করিতে পারি না, কবি কখনো জিয়া ~~মানব~~ আত্মীয়তা

হাপন করিতে চেষ্টা করে। প্রকৃতি আমাদের জীবন-নাট্যের পিছনের দিকের বনিকা; আমাদের অভিনয়ের বীরব সাকী। সে যে শুধু সাকী থাকিয়াই নিরস্ত থাকে, তাহা নহে, তাহার সঙ্গে আমাদের জন্মের সংযোগ আছে, তাহার ও আমাদের কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে। দিগ্বিদ্যা ও শক্তিমানের মধ্যে মেহের যে আদান-প্রদান হইয়াছে, তাহার লুকোচুরি খেলার সাকী রহিয়াছে মেঘ ও মেঘের কৌতুকক্রীড়া। ইহাদের জন্মের আদানোদানের সঙ্গে মেঘ ও মেঘের হায়াসোকেস যে শুধু সাক্ষ্য রহিয়াছে, তাহা নহে; চুইটা সৈবাহত মানবজন্মের মেহের আদান-প্রদান অপূর্ণ স্রীতে রচিত হইয়াছে। আমি। দৃষ্টিগ্ন সম্পর্কে আসিয়া যে বিপুল সুর ও শান্তি আমার পাইয়াছিল তাহার প্রধান উপকরণ আলাঁকানের প্রাকৃতিক পুত্রের শোভা, উহা তাহাদের মধ্যে মর্মে মর্মে মিশিয়া দিয়াছিল। "পতিত যদানিকার উপরে জন্মে" যেমন অরণ্য জন্মে, এখানে কিছুদিন থাকিলে সেইরূপ প্রকৃতির গোপন আক্রমণ দৌকিকতার মানব-নির্মিত দৃঢ় ভিত্তি ক্রমে অশক্তিতাবে তাড়িয়া যায় এবং চতুর্দিকে প্রাকৃতিক জগতের সহিত সমস্ত একাকার হইয়া আসে। জীবনের দুর্ভবনীয় শিখাসাক্ষিত এখানে প্রণমিত হইয়াছে। আর দাশিয়া — সে ও প্রকৃতিসম্রাজীর উচ্ছ্বল হলে। আত্মকাননপ্রাণে প্রকৃতির শোভার সঙ্গে মানবজীবনের এই অন্তরঙ্গ সংযোগ আছে বলিয়া এখানে প্রতিহিংসা প্রেমমিলনে বিনীন হইয়া যিয়াছে।

'হৈমন্তী' গল্পেও সেবিতে পাই হৈমন্তী ক্ষুদ্রপরিমল পলায়ের মধ্যে আবদ্ধ হইলেও তাহার সংযোগ ছিল উদ্ভল উদার প্রকৃতির সঙ্গে। হিমালয়ের বিরাট উচ্ছ্বলতা, দিগ্বিদ্যার চরিত্রে মিশিয়া দিয়াছিল; সর্বোচ্চ উচ্ছ্বলতা ও শক্তিমান হইতে সে বহুতর পরিণা রহিয়াছিল। 'সেনাপাণ্ডব'র বিপুলতার সঙ্গে হৈমন্তীর অবস্থান সাক্ষ্য আছে; উভয় গল্পের আশ্রয়ভাসে

একই কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু আটের দিক দিয়া পার্থক্যের সীমা নাই; আর এই পার্থক্যের দুল রহিয়াছে হৈমবীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। পিরিনথিনীর চরিত্রে একুতির উদার উদ্ভূততা আছে। সঙ্গারের অত্যাচারে ও অবহেলায় তাহার বৃত্তা হইয়াছে; কিন্তু ঐ অত্যাচারই তাহার জীবনের শ্রেয় কথা নহে। সে যে লোকে বাস করিত, আমাদের জীবনের ক্ষুদ্রতা ও সীর্ণতা দেখানোপ্রবেশ করিতেই পারে না। কি নির্বিল সত্যে এবং উদার আলোকে তাহার একুতি এমন বড়, শুভ ও সরল হইয়া উঠিয়াছে! তাহার চরিত্রে আকাশের বিস্তার ছিল, পূর্ণরূপে আকাশের সমুদ্রই ত ছিল তাহার অন্তরঙ্গ সৌন্দর্য।

একুতির সঙ্গে মানবমনের নিগূঢ় সম্বন্ধ লইয়া বসন্ত-নির্ভিত হইয়াছে তখনো 'অতিথি' গল্পটি লক্ষ্যপ্রস্তুত। একুতির সঙ্গে মানবের সংসর্গ আছে কিন্তু সম্পর্ক নাই। যে শক্তির প্রকাশে গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য পাই সেই শক্তির প্রকাশেই তুর্কিশের দৃষ্টি। বাহুব আকাশ-আলোর সৌন্দর্যে হৃদ হৃদ, কিন্তু তাহার উপর আশ্রা রাখিতে পারে না। কারণ, মানুষকে সংহার করিবার তুর্কবনীর শক্তিও তো উদার মহোই নির্ভিত আছে। একুতি যদি আমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্কে আবদ্ধ হইত, তাহা হইলে তাহার অনন্ত উদ্ভূততার শেষ হইত। একুতি এই চিরচক্লু নিমিষপ্রত্যেকে রবীন্দ্রনাথ রূপ দিয়াছেন তারাপুত্র চরিত্রে। তারাপুত্র বহু জায়গায় বহু আবেষ্টনের মধ্য দিয়া দিয়াছে, সকলের প্রেম সে আকর্ষণ করিয়াছে, এই সঙ্গারের পঙ্কিল কলের উপর দিয়া সে গুণশক্তি স্বাক্ষরস্বরূপ বসন্তপাত, দিয়া বেড়াইত; নিত্য সচলা একুতির বস সে সর্বদাই নির্ভিত উদারীন, অথচ সর্বদাই ক্রিয়াসল। একুতির সীমাহীন শক্তি তাহার ছিল, তাহাকে না ভালবাসিত এমন লোক নাই, অথচ একুতির বসই সে ছিল নিমিষ ও বহুতরুণ। তাহার সঙ্গে যতিবাবুর বক্তা চারুপদী এবং 'আপদ' গল্পের নীলকান্তর তুলনা হইতে পারে। চারুপদী এইট-

পালিতা; কিন্তু সঙ্গারের কীর্ণ পতি সে অতিক্রম করিতে পারে নাই। তাহার খেদালের কোন দ্বিগতা ছিল না; কিন্তু সেই দুর্ভাগ্যের অধিরতার মধ্যে তারাপুত্র নির্নিপুণতা নাই। তাহার মন ক্রোধ ও ঈর্ষা পরিপূর্ণ; সে বয়সে বালিকা হইলেও তারাপুত্র প্রতি তাহার আগতির শেষ নাই। নীলকান্তর সহিত তারাপুত্র অবস্থাপন্ন সাদৃশ্য আছে: উভয়েই বাজার কলের ছেলে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে একুতিপতি বৈধব্যের সীমা নাই। নীলকান্তর চরিত্রে আকাশের বিস্তার নাই, একুতির রহস্য ও অনাসক্ত ঈর্ষা নাই। তারাপুত্র সবাইকে ছাড়িয়া দিয়াছে তাহার বিরাট নিমিষপ্রতা লইয়া। নীলকান্ত একান্তভাবে ক্রিশের মেহের দ্বারা; সে রূপায় পাড়। সে তখনই ক্রিশের আগ্রহ ত্যাগ করিয়াছে যখন সে দেখিয়াছে ক্রিশ তাহাকে ত্যাগ করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছে, তাহার মনের কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, বহুত তাহাকে চোর বলিয়া সঙ্গে ফুরিয়াছে। এই ছোট্ট বালকের চরিত্রের বিবৃত তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া ডক্টর জিহুজ জিহুজার বন্যোপাখ্যায় বলিয়াছেন,—

“তারাপুত্রের উদার ক্ষমতা ঈর্ষা, অভিমান একুতির লেশমাত্র নাই— একুতিমাতার গুরুত্বপূর্ণ লালিত, তাহার অন্তঃকরণে সীর্ণতার ছায়া পড়ে নাই। নীলকান্ত ক্রিশের মেহের ভাষা লইয়া সত্যের প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়াছে, ও চৌধুরীপন হের কণ্ঠে পণ্ডিত বাসিয়াছে।”

একুতি-রহস্তময়ী; কিন্তু একুতি আমাদের ঐতি পরিচিত। তাই তাহার সবটুকু রূপ আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। একুতিহৃদে তাহার রূপ আমরা যেতিহেছি, তাহার শব্দ আমরা তুনিতেছি, তাহার গন্ধ আমরা আভাণ করিতেছি; লোকের সঙ্গে কথা বলিয়া তাহার রহস্যের নিরসন করিতেছি। তাই মনে হয়, সে বুদ্ধি আমাদের একান্ত নিষ্কর। একুতির যে অপসঙ্গ মাধুরী, তাহার যে অপসিমান রহস্য আমাদের কাছে অজ্ঞাত বহিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে

একাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহার স্তম্ভাবস্থিতে একটা সমস্ত স্বাভাবিকতা আছে। 'মৃত্যু' ও 'দুঃখিনী' গল্পে তিনি দুইটি চরিত্রের বৃত্তি করিয়াছেন, বাহ্যিকের অস্বস্তির সন্ধি আছে, কিন্তু একটি অঙ্গ বিকৃত হইয়া দিয়াছে। প্রকৃতির অনেক রূপই তাহাদের পক্ষে অস্বস্তির সাদৃশ্য, কিন্তু সর্বতোভাবে ইহঁদের নহে। তাই বাহ্যিক কিছু তাহারা জানে, তাহাদের মধ্যে আনন্দিতা অজানা, আনন্দিতা অজেন। হৃদয় আনন্দিতা যায়। কাজেই প্রকৃতির পরিপূর্ণ মায়াবীর সন্ধান শুধু তাহারা পাইতে পারে। ক্রুর চোখের দৃষ্টি বহু হইয়া গেল, তাহার বোধনের প্রথম আনন্দ। সে অজানত নহে; একদিন ছিল বহন প্রকৃতির বৃত্তসৌন্দর্যের সঙ্গে তাহার পরিচয় ছিল। নবযৌবনের স্বাশুভ্যায় পান করিতে করিতে সে তাহার চকুর হারায়ে; আর ইহার মত দারী হইল স্বয়ং তাহার আনন্দ। তাহার চকুরীনতা শুধু ট্রান্সিডিন্ট নহে, ইহার মধ্যে রহিল রোমাণ্টিকের অপভ্রংশ মায়াবী। তাই অঙ্গ হইয়া সে তাহার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিল, আর তাহার চারিদিকের বিরাট পৃথিবীকে আরও বেশী করিয়া অস্বস্তি করিতে চেষ্টা করিল। আর স্বামী বহন তাহার নিকট হইতে দূরে সরিতে লাগিল, তখন তো তাঁহার একমাত্র সহচরী রহিল পরীপ্রকৃতি, বাহার রূপ সে দেখিতে পাইত না, কিন্তু বাহার ঐ সে অস্বস্তি করিত। আর একটা ভিনিসও লক্ষ্য করিতে হইবে। সলোমনের নানা কুসিত্যের আশ্রয়ের কৈশোরের সমস্ত আনন্দিতা প্রকৃতি নষ্ট হইয়া যায়, ব্যক্তির সম্পর্ক আশ্রয় আশ্রয়ের সকল আশ্রয় নষ্ট হইয়া যায়—ইহা প্রত্যেকের জীবনে প্রতিদিন লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু সে অঙ্গ হইয়া সলোমন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া। অঙ্গ প্রকৃতির দৃষ্টে ক্ষতি হইয়াছে তাহার জীবনে এই বর্ধিততা আসে নাই। সুখ ও তাহার স্বামী একই সঙ্গে একই আশ্রয়ে জীবন আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হইল। সুখ নিজেই বলিয়াছে,

"স্বামীর সঙ্গে আমার চোখে দেখার যে বিচ্ছেদ হইয়াছে, সে কিছুই নয়; কিন্তু প্রাণের ভিতরটা যে হীরাইয়া উঠে বহন মনে করি আমি দেখানে, তিনি দেখানে নাই;—আমি অঙ্গ; সলোমনের আলোকবর্ধিত অঙ্গ-প্রসঙ্গে আমার সেই প্রথম বহনের নবীন প্রেম, অঙ্গুর ভক্তি, অঙ্গুর বিশ্বাস লইয়া বসিয়া আছি, আমার সেবামন্ত্রের জীবনের মারের আমি বালিকার করণ্ডে যে শৈলিকার অর্ধাঙ্গন করিয়াছিলাম তাহার শিশির এখনও শুকাই নাই,—আর আমার স্বামী এই হারা-শৈল্য চিরনবীনতার বেশ ছাড়িয়া টাকা উপার্জনের পক্ষেতে সলোমন-বন্ধুত্বের মধ্যে কোথায় অঙ্গ হইয়া চলিয়া গিয়াছে! আমি বাহ্যিক বিশ্বাস করি, বাহ্যিক বর্ণ বলি, বাহ্যিক সকল প্রদর্শনের অধিক করিয়া জানি, তিনি অভিন্ন হইতে হাসিয়া তাহার প্রকৃতি কটাক্ষপাত করেন। কিন্তু একদিন এ বিচ্ছেদ ছিল না, প্রথম বহনে আমরা একই পথে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম—তাঁহার পর কখন যে পথের ভেদ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা তিনিও জানিতে পারেন নাই, আমিও জানিতে পারি নাই।"

স্বামীবর্ধিত বোবা মেয়ে মৃত্যুর সঙ্গে প্রকৃতি যে অস্বস্তি সম্বন্ধ ছিল তাহারও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। মৃত্যুর ভাবের সঙ্গে তাহার সংঘর্ষ নাই, কাজেই প্রকৃতির ভাষা তাহার কাছে খুব স্পষ্ট হইয়াছিল; সে কথা বলিতে পারিত না, হৃদয় কথা বুঝিতেও পারিত না, কিন্তু পানীর পান, নবীর কলসার্নি, তরুর মর্ম—ইহাদের ভাষা তাহার জানা ছিল, আর তাহার প্রাণ-অঙ্গের সঙ্গে তাহার অস্বস্তি সংযোগ ছিল। তাহার প্রধান সহচরী ছিল তাহার দুইটি গাভী। তাহাদের নিঃশব্দ বৈদ্য সে বুঝিত, তাহার কদাচীন স্নায়ুত্ব তাহার। অঙ্গের এতৎ করিত। ইহা ছাড়া হাসল, বিভ্রাটস্বয় প্রকৃতির সঙ্গেও তাহার আনন্দিক সম্পর্ক ছিল। ভাষা পাইয়া স্বাস্থ্য যে অঙ্গ হইতে চিরকালের মত বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, ভাষা হারাওয়া মৃত্যু সে অঙ্গকে আশ্রয়

করিয়া গেল। যে রক্ত আমরা জানি না, তাহার খনিষটা তাহাকে কাছে আনুপ্রকাশ করিয়া থাকিবে। এই ভাষাটীন্দ্র জনতে বাহাদের বাস তাহাদের বেধনা-বোধ কাহারও অপেক্ষা কম নহে, এবং যে মানবজাতি তাহারিগকে ভোনের সামগ্রীমাত্র মনে করে, তাহাদের সমস্ত কঠোরতা বিদীর্ণ করিয়া এই বেধনাবোধ আপনাকে চিহ্নিত করিয়া দেয়। ‘অনধিকার প্রবেশ’ গমে দেখিতে পাই ভয়কানী নিষ্ঠা ও পুরুষাচিত কাটিকের প্রতিমূর্তি। ‘রক্ষীজনোচিত কমনীভবতির কোন পরিচয় তাহার মধ্যে দেখা যায় নাই; তাহার নিম্নের পালিত চাইশো তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া লামাত্র অপরাধ করার ভয়কানী তাহার উপর কঠিন কুপ্তিধান করিলেন। কিন্তু তাঁত মুকরশিত বধন কেই মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অতচি করিল, তখন তাহার সমস্ত কঠোরতা বধিত করিয়া নারীর স্বাভাবিক করুণা জাতিয়া উঠিল। তিনি আশ্রয়-প্রদানী মুকরশাবকের ধীমতিজন গনিলেন। নিষ্ঠার দ্বারা, বর্ষের দ্বারা আমরা যে কঠিন সত্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি নূক প্রকৃতির কাছাকাছ আছানোই ত তাহাকে ধীর্ণ করিয়া দেহ ও দ্বার করুণা উথিত হইবে।

প্রকৃষ্টকে দেখিতে নূক বসিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহারও কথা কহিবার ক্ষমতা আছে। এই পর্যন্ত যে মস্তিষ্ক দ্বয়ের কথা বলা হইয়াছে তাহাতে প্রকৃষ্টের নিষ্কিয় বসিয়া মনে হইবে। কিন্তু প্রকৃতি অনেক সময় আমাদের সুখদুঃখের কথাতে মূগ হইয়া উঠিতে পারে। যে কথা, আমরা ‘কুসিয়া দিয়াছি, সে কথা সে নিঃশব্দে বহন করিতেছে এবং কোন কোন সময়ে তাহার তত্বতা ভাঙিয়া সেই বিস্তৃত কাছিনী উল্লীত হইতে থাকে। ষাট ও বাতশম্রক আমরা নিলীব বসিয়া মনে করি, তাহারা মানব-ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহার গল্পশবকের ধীরে আরম্ভ করিয়াছেন ইহাদের নূক মূগে ভাষা দিয়া। কুহকের যে বেধনা কেহ বুঝিতে পারে নাই, দ্বার

ঘাট তাহা অল্পতব করিয়াছে, তাহার যে আশ্বাসমূর্ণ লোকচকুর অস্তরালে সঙ্গাধিত হইয়াছিল, সে তাহা সেবিয়াছে, তাহার বিস্তৃত কাছিনী সে প্রকাশ করিয়াছে। অবশ্য এই সব গমে মানবজীবনের সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগ অনেকটা মায়া রক্তমের। প্রকৃতি ভাষা পাইয়াছে, কিন্তু মানবজীবনের অস্তরালে সে প্রবেশ করিতে পার নাই। তাহার ভাষা তাহার নিম্নের ভাষা, মাহুদের সুখদুঃখের প্রতিফলিকে সে স্বাক্ষর করিতে পারে নাই, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মাহুদের ধীরে এই অস্তরতম সংযোগ দেখিতে পাই ‘নিবীধে’, ‘সুখিত পাখ্য’ প্রকৃতি গমে। ‘নিবীধে’ গম্মিতে দেখিতে পাই যে, দক্ষিণাচরণ বাবু প্রথম দ্বী বেচ্ছার মৃত্যুকে বরণ করিয়া তাহার স্বামীর বিতীরবার বিবাহের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার মূগ হইতে যে ‘ও কে, ও কে, ও কে সো’ এই শব্দ উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা আকাশে বাতাসে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিল এবং অন্ধকার রাত্রির নিস্তব্ধতা বর্ধিত করিয়া ‘ও কে, ও কে, ও কে সো’ — এই ধ্বনি মূগিত হইয়া উঠিত। দ্বার পারে কুশলকের শীতবর্ষ ভাঙাচাদের নীচে তাঁক ‘পাখীর পাখার সঙ্গে, সোআশ্রাধিত নির্জন বাসুজের মলতর পক্ষীর ডাকে এই বর্ণি জনিত হইতে থাকিত — ‘ও কে, ও কে সো! ও কে, ও কে, ও কে সো!’ অতিপ্রাকৃত লইয়া বহু গল্প-উপভাস-কাব্য রচিত হইয়া থাকে। ‘কুসিকীর্ণ’শেষক এইরূপভাবে অতিপ্রাকৃতের বর্ণনা করেনই, তাহাতে মনে হয় উহা যেন প্রাকৃত সত্য। কিন্তু ইহাতে অতিপ্রাকৃতের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া যায়। Macbeth-এর ডুইনীকুড়ী, বা হ্যামলেটের পিতার প্রেতাচ্ছা, কোলট্রিওঁর প্রাচীন নাবিক — ইহারা স্বপ্নশিশি ধীব; ইহাদের অনলৌকিকতা সঙ্গেও ইহাদিগকে আকস্মিক প্রাণী বসিয়াই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত গম ‘নিবীধে’, ‘সুখিত পাখ্য’ প্রকৃষ্টকে অতিপ্রাকৃতের সেহীন অনলৌকিকতা বহিত হইয়াছে। ‘ও কে, ও কে সো’ এই ধ্বনিটি একটি

অলঙ্কৃত রূপহীন প্রসিদ্ধা। তখনাজ্ঞর বা কোণজ্ঞা-
লোকিত নিঃশব্দতার মধ্যে ইহা মিশিয়া গিয়াছে ;
ইহার প্রাণ নাই, ইহার কোন বিশিষ্ট রূপ নাই।
মনে হইয়া পাবীর সঙ্করণে, বড়ির টিক টিক শব্দে ইহা
বিলীন হইয়া রহিয়াছে। দিনের আলোকে এই মোহ
কোণার উড়িয়া যায়, তাহার ঠিকানা থাকে না।
রাতিতে যে মহামুগ্ধ হইয়া থাকিত, দিনের আলোকে
সে নিজেই লঙ্ঘিত বোধ করিত, সমস্ত ভিনিস্ত
তাহার কাছে অলীক বলিয়া মনে হইত।

আমাদের জীবনের কথা শুধু যে প্রকৃতির মতোই
পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে ভ্রান্ত্য নহে, বাহ্যের নিজের
গড়া আবেষ্টনে, পাখ্যপ-গৃহেও তাহা কোষিত হইয়া
থাকে। পরীক্ষামূলক মনোবৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে,
সচেতন অবস্থায় যে সমস্ত মনোবৃত্তি অচরিতার্থ থাকে,
তাহারা স্ফূর্তাহীন কর্ণে অথবা গর্ভে আত্মপ্রকাশ
করে। কবি দেখাইয়াছেন যে অচরিতার্থ প্রবৃত্তি
প্রকৃতিতে ও পাখ্যপ-গৃহে প্রকৃতি হইয়া আত্মরক্ষা
করে, তাহার অদৃষ্ট সমোহিনী নক্তি চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত
হইয়া থাকে, এবং রাত্রির শুভ্রতা ইহা রূপধারণ
করে। সেই রূপ সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, কিন্তু
তাহা সজল, নিত্যক্রিয়াসক্ত। জু যে ব্যক্তিগত বাদনাই
বৃষ্ট হইয়া উঠে তাহা নহে, শুভ্র অতীতের তন্ত্রিত
কাহিনীও সচেতন হইয়া উঠে। 'স্মৃতি পাখ্য'
গল্পে রবীন্দ্রনাথ অতীতের বিস্তৃত স্মৃতি, যে 'চিত্র
আঁকিয়াছেন, তাহার একটি অংশই 'স্মৃতি'।
মিলে, অবশ্যে তাহার এক অংশই 'স্মৃতি'।
নক্তি সঙ্করণ করিতে থাকে। তাহার প্রভাবও ঠিক
সেই অমূল্য করে রাত্রির মর্মকথা যে জানে, যে
তখনকার অভিনয়ের নটী। রাত্রিতে তাহারা তাহার
কাছে আসে তাহাদের আগমন ও ব্যবহারে একটা
নিজস্ব বিশিষ্টতা দেখা যায়। তাহারা সঙ্করণশীল অথচ
তাহাদের কোন বিশেষ রূপ নাই। তাহারা রলে
ক্রমপনে, কিন্তু তাহারা স্নেহহীন ; তাহারা উচ্চ-
কলহাতে ছুটাছুটি করিয়া রলে, অথচ সেই গতি

শব্দহীন। তাহাদের রাত্রে সব কিছুই অমূল্য করা
যায়, কিন্তু কিছুই স্মৃতি করিয়া দেখা যায় না, বা
ধরা-ধোঁয়া হয় না। রবীন্দ্রনাথের 'বর্ম'কাব্যে
প্রাচীন ভারতের পুর্নজন্মের বে প্রথমা প্রিয়াকে
সেঁধিতে পাই তাহার সঙ্গে এই মায়াময়ীনের সান্নিধ্য
থাকে। ইহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারি, কিন্তু
আমরা। "সে তাহা হুনিয়া গেছি"। যখন তাহাদের
সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়া উঠে, তখন হুঁতী হুঁতুপথে আসে,
তাহাদের সঙ্গে কথা বলিবার, তাহাদিগকে স্পর্শ
করিবার সময় আসে তখনই প্রভাতের আলোকে
মোহ ভাঙিয়া যায়, জোর হইয়া আসে। প্রভাতের
আলোকে সেই মোহ কোণার উড়িয়া যায়। তাহারা
মায়ারী, শুধু স্মৃতির এক তাহাদের ছায়া পড়ে,
সেই ছায়াও অমূল্য করা যায়, ভাল করিয়া দেখা
যায় না।

'বিশিষ্ট' ও 'স্মৃতি পাখ্য' গল্পে অতিপ্রাকৃতের
যে চিত্র দেওয়া আছে, তাহাতে অতিপ্রাকৃতের
অলৌকিকতা বজায় রাখা হইয়াছে, অথচ স্মৃতি-
জীবনের নিগূঢ়তম বেদনাও তাহার মধ্যে সুব হইয়া
রহিয়াছে। উভয় স্মৃতি স্মৃতির বন্যোপাখ্যায়
কোলরিয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা করিয়া
দেখাইয়াছেন যে, 'রবীন্দ্রনাথ অতিপ্রাকৃতের সঙ্গে
স্বভাবের সমন্বয় করিতে হইয়া অবাঞ্ছিত প্রেতের রাত্রে
যান নাই ; আশ্চর্য্য কৃষ্ণকলে অতিগরিষ্ঠিত গৃহস্থানের
মতোই অতিপ্রাকৃতকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন
এবং নৈসর্গিকের শীঘ্র ছাড়িয়া এক পদও অগ্রসর
হয়েন নাই।' দিনের আলোকে এই স্মৃতিহীন থাকে
না, তখন পরিবারের মধ্যে এই সব গল্প বলা হয়।
যে ব্যক্তি রাত্রিতে এই মোহিনীর মায়াবনে আবদ্ধ
হয় সে দিবালোকে লঙ্ঘিত হয়। আর যে সকল কথা
অতিপ্রাকৃতের 'হাতের দিয়াছে, তাহাও নিত্য বরের
কথা। বাদ্যের অঙ্গুরের অশ্রুত আশা, অঙ্গুর
কামনা—ইহাতে অলৌকিক কিছুই নাই ; স্মৃতি
বস্তুর প্রথমা স্ত্রী যে মনোরমাকে দেখিয়া "ও কে,

ও কে গো' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল তাহা নিশ্চয় নহে, তাহাতে অশঙ্কও কিছু নাই। যে ভাবে এই অশৃঙ্গ বাসনা ও বেদনারিধুর ক্ষুধি আবেষ্টনের মধ্যে তন্ত্রিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাই অশঙ্ক বলিয়া মনে হইতে পারে। 'কতাদ' গম্ভীর দেখিতে পাই বাহ্যকে লইয়া ডাক্তাররা অস্থিবিজ্ঞা পিণ্ডিতের তাহার চারিদিকে একটি প্রাণবান আত্মা স্মৃতিয়া বেড়ায়; তাহার অস্থিরতার স্বভাব আছে, সে বাহ্যের মত গর করিতে ভালবাসে। সে প্রাণের মধ্যে জ্বলন্ত করিয়া বেড়ায়; কিন্তু মানবস্বভাবের স্তম্ভস্বরের কথা তাহার মনে আছে। পত্রিণি প্রদায় পূর্বে দাদার যে উদ্দেশ্য সে চকল হইয়াছিল, তাহার সেই কতালে পরিণত হইয়া গেলেও সেই উদ্দেশ্য নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। ক্রান্তির স্রোত নাই; কিন্তু সেইর মত অস্থিরতার অস্তিত্ব।

'কবিতা' গল্পেও অতিপ্রাকৃতের অবতারণা করা হইয়াছে। বসিও গল্প হিসাবে ইহা 'কুখিত পাখান' গল্পের মতো অপেক্ষা নিকট, শুধু ইহার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের গল্পে বৈশিষ্ট্য বর্তমান রহিয়াছে। এই গল্পের মধ্যে অনেকটা অংশ যে অবিচ্ছিন্ন তাহা গল্পের শেষ ভাগে ঘটিত হইয়াছে। তারপর কবিত্বের অস্তিত্বও ব্যক্তিত্বই হইয়াছে, মনে নহে। যে স্বপ্ন প্রাণিয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়াছিল, তাহা তাহার ব্যক্তিগত জীবনের একটি শোকাবহ রহস্যময় ঘটনার প্রতিফলন মাত্র। এই ঘটনার সঙ্গে অতিপ্রাকৃতের একটি দৈত্যবিক সন্নিবিষ্ট আছে, কারণ মনিমানিক্যার যে কি গতি হইয়াছিল, তাহা রহস্য আবৃত রহিয়া গিয়াছে, এবং সেই রহস্যের সন্ধানে পাই কবিত্বের স্বপ্নের অস্তিত্বের মতোই। তাহা দেখিয়া মনে হয়, রহস্য মনিমানিক্যাকে জলে ডুবাইয়া হত্যা করা হইয়াছিল, অথবা মনুষ্যের ও ক্ষুধি বৈশিষ্ট্য করিয়া গেলিয়া গিয়াছিল কবিত্বের অস্তিত্বের বোধ হয় তাহার প্রতিফলন হইয়াছিল। অবশ্য এই রহস্যের সন্ধান এই গল্পে পাওয়া যায় না; এই প্রকারের রচনার

এরূপ লক্ষ্য এই যে, ইহাতে স্বেচ্ছ পাওয়া যায়; কিন্তু স্পষ্ট কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। কবিত্বের শুধু অলৌকিক অস্তিত্ব মনে গনিত হইতে; তা'র পর একদিন এক দাদার কতাদৃষ্টি দেখিতে পাইল যে তাহাকে অতলম্পর্ষ স্থির মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে এই গল্প 'নিশ্চিন্দ' ও 'কুখিত পাখান' অপেক্ষা নিকট। প্রথমতঃ, বাহ্যের অলৌকিক অস্তিত্ব হইয়াছিল, সে গল্পের বক্তা নহে। তাহার নিজস্ব অস্থিরতার তীব্রতা ইহাতে নাই; গম্ভীর সেকেন্ডারও। তাহার মনের দৃষ্টি ও বাহ্যের অস্থিরতার মধ্যে যে কত বড় প্রভেদ থাকিত, তাহা আমরা তাহার নিজের মুখ হইতে গনিত পাইলাম না। দ্বিতীয়তঃ, 'কুখিত পাখান' ও 'নিশ্চিন্দ' গল্পে বাহ্যের অলৌকিকের সম্পর্কে আসিয়াছে, তাহারা চেষ্টা করায় নাই; অল্প দল বিচ্ছিন্ন সম্পর্কে তাহাদের কবিত্বের অষ্ট রহিয়াছে; শুধু একটি বিষয়ে তাহাদের অলৌকিক অস্তিত্ব হইয়াছে। কিন্তু কবিত্বের অস্তিত্ব শুধু স্বপ্ন মাত্র। কবিত্বের স্বপ্নাচলিতব্য নবীর মধ্যে গিয়া আত্মসমর্পণ করিল, শুধু বৃহৎ মাত্রের জন্য সে জাগরণের প্রান্তে আসিয়াছিল। ইহা কবিত্বের একটি ব্যাখ্যা হইতে পারে; ইহার সঙ্গে অলৌকিকের কোন সঙ্গের না-ও থাকিতে পারে। তাহা, গল্পে দেখিতে পাই 'কবিত্বের বৃহৎ মাত্র' জাগরণের প্রান্তে আসিয়া পরকণে অতলম্পর্ষ স্থির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল।' কিন্তু তাহার পটভূমি গল্পের শোভা বহু কবিত্বের মাত্র। ইহাতে গম্ভীর, অস্তিত্ব গল্পের শেষের দিকের সত্যতা সবেই উপস্থিত হয়। রবীন্দ্রনাথের রচনা বাস্তব ও অবাস্তব, নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, স্বপ্ন ও জাগরণের ছায়ালাকের লীলাভূমি। কিন্তু এই গল্পে বাস্তব বুদ্ধির আলোকে অবাস্তবের ছায়া অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গল্পের মধ্যে আরও একটি অসঙ্গতি আছে। গম্ভীর বসিমানিক্য, তিনি এই গল্পে কতটা বিষাদ

করেন, ঠিক বলা যায় না। তাঁহাকে কোণবিশেষ
প্রাচীন নাবিকের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু
তাঁহার সম্মুখে বিশ্বাসের সেই গভীরতা নাই, তাঁহার
বর্ণনায় সেই তীব্রতা, সেই অনিবার্ধ্য গতি নাই।
তিনি অনেক সময় স্বেপন করিয়াছেন ঘনিষ্ঠত্বের

তথ্য নব্যকালের প্রেমের সমালোচনা করিতে যাইয়া,
অথচ তাঁহার কোন আবশ্যক ছিল না। কবি এই সব
সমালোচনা তাঁহার মুখ দিয়া করা হইয়াছেন পরস্পর
প্রতিটি বাস্তব আবেগের মধ্যে আনিবার জন্য কিন্তু
ইহাতে গভীর মহিমা সুর হইয়া দিয়াছে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

পাশ

শ্রীশান্তি পাল

কেমনে যাব সই

কদম তলে ?

“ও পথে মেও নাক”

নন্দী বলে।

বঁধুর বীণাখানি

পরাণ নিল টানি,

দেহেরে ঘরে রাখি

কিসের ছলে

কেমনে যাব সই

কদম তলে ?

বাকুল বেণু বাজে

প্রভাতী হরে;

আমারে মিলে যায়

সুদূর পুরে।

কাটিয়া সব বাধা

বাহিরে যাবে রাখা

চাকিয়া যত কীদা

আঁচল তলে।

কেমনে যাব সই,

কদম তলে ?



স্বর্গদেবী

প্রীতমী অমুকুমা দেবী

(পূর্ণাহুতি)

(৮)

রেল-গাইনটী ছাত্রাঙ্কর পথের একটা সরল রেখার মত বহুদূর হইতে দূরান্তরাবধি চলিয়া গিয়াছে; অস্তিত্বজ্ঞানে স্থলরিপুষ্ট একটা অতিকার অঙ্গরের মতই সে বেন হৃৎকরেছিল ঈত-মধ্যস্থলে নিঃশব্দে পড়িয়া পড়িয়া তৌঃ স্বেদন করিতেছে। স্থলর স্বেচ্ছায়া রাজ্যেও তাহাকে বাড়ীর ছাঁদ হইতে দেখিতে দেখিতে কতদিন সর্গাণীর মনে হইয়াছে যে, সাক্ষ্যাইন্টের ঐ সহসা সহপ্রজ্ঞতার বিচ্ছুরিত আলো যেন ঐ বিশ্রামশীল অঙ্গুরটার মাথার মণি-বীণ, আর ঐ যে ট্রেনের তীব্র তীক্ষ্ণ অসহ আর্দ্রনাদ, উহা যেন ঐ বিরাট অঙ্গুরেরই হোম-কর্জন! তবু প্রকৃতির স্রষ্টা তত্ত্বজ্ঞাকে সে বেন কাটিয়া চিরিয়া বিঁচিয়া দিল! দূর হইতে বেশ, প্যাসেজার, নানা আকারের এবং প্রকারের ট্রেনগুলিকে বেন স্পষ্ট দেখা যায়; এক-একটা কামরার এক-আঙঠী বাহুব থাকে; বেষ্ট্রর ভাগ কামরায় যে আগা-গোড়া ঠাসা থাকে, সে সজ্জাই দেখিতে পাওয়া যায়। স্বেচ্ছ-বাড়ীতে ঘেরোঁ কি কি রত্নের শাকী পরিয়া বসিয়া আছে, ক'জন মেয়ে, তা-ও তাহাদের খণ্ডিত ধারের লব বাহ্যাম্বায় দাঁড়াইলে স্পৃতি করা চলে; কিন্তু সর্গাণীর চেনা-পেনা আর কে-ই বা এ-পথ দিয়া কোথায় বাইবে; তবে যদিই বা যায়, তাহাদের চেনা বাইত না। তথাপি

সর্গাণীর মনের ভিতর বেন হিসের একটা পূব অংশই ছায়া ভাসা-ভাসা হইয়া উঠে; হিসের বেন একটুখানি ক্ষীণ আগা, বেন ঠেং একটু অকারণ আকাম্মা, অহেতুকী প্রতীক্ষা, না জানি ঠিক কি,— তবু কি-ই বেন একটা মনের কোণে জাপিয়া থাকে। ট্রেন যখন-তখনই যায়, যখন-তখনই আসে, দিনে রাজ্যে ক'বার তার হিসাব নাই, তবু যথেষ্ট বার; সকল সময়ই পিত্তর মত কোঁকুল লইয়া যে সর্গাণী ট্রেন দেখিতে সোঁড়ার, তা' নিশ্চয়ই না। কিন্তু দূর হইতে দূর-তেজ, তীক্ষ্ণদূরে ট্রেনের বাণী বাজিয়া উঠিলেই তার যুক্ত-ভিত্তিরে স্পষ্ট করিয়া একটা ধাক্কা পড়ে। সেই পথচলার সাক্ষেতিক বাণী বেন কেনে কয়েকের গোপন বাণী উচ্চারণ করিতে করিতে দূর হইতে কাছে আসে, আবার কতটুকু হইতে দূরে ক্রমশই দূরত্বেরে বিলাইয়া যায়। সর্গাণী হস্ত তাহার হাতের কাছ লইয়া তাহাতেই ব্যাপ্ত থাকে, কিন্তু মন বেন তার তখনকই হইয়া ঐ দূরের এবং অদূরের বাণী শোনে। চলন্ত ট্রেনের কামরার ভিত্তি করা যুক্তগুলির মাঝখানে বেন কোন একখানি তার পরিচিত মুখ, এইক্ষেণে তার অ-স্বাভাবিক হইয়া অপকৃত হইয়া সেল, এমনি ধরণের, একটা-স্বল্প অস্বভাবিত তার সেই কণ্ঠতৎপরতার মধ্য দিয়াও মনের ভিতর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে

থাকে। অথচ তাহার আছেই বা কে! আর তাহারে
এই লাইন বহিরা গলিক পানে ছাইবেই বা কে? মুক্তি
নিষেই' লেখণ্য বর্ণে, কিন্তু মন মানে না, আনিয়া
ওনিয়াও যদি সে নিজের সঙ্গে জ্ঞাননা করে, কতক;
কে তার কি করিবে?

মদিকার সঙ্গে সেই দেব দেখা! শিবেরকেও
আর দেখে নাই। আর সেই ছোট্ট ছোট্টো? কি
তামাই না তাহাকে সর্বাঙ্গী বাসিত! সে না আনি কত
বড়ী হইয়াছে? নিষ্ঠুর মাথার বেশ লম্বা, পড়াওনাও
কিছু কিছু করিতেছে। কে পড়ায়? শিবের অথবা
মদিকা। মাঝে মাঝে চিঠি আসে, মদিকা লেখে,
সেও উত্তর দেয়, পূর্ব সংকল্প উত্তর, তাহাও তেমনি
স্বভাব। মদিকার দেখানোই আছে। সেই ছোট্ট
বাড়ীটায়। সর্বাঙ্গীর সেয়া সেই বিমোহিতা লতাটা
তাদের সামনের বারান্দার খণ্ডের চালের উপর
সেই বকম লতাইয়া আছে তো? চৈত্র মাসের
উল্ল হাস্য গায়ে লাগিয়া তাদের মুখু শরীরের
পরতে পরতে নুতন পাতার তবকগুলি তেমনি
ম্যাজিক-শক্তির বিকাশ দেখাইয়া কি নবীন ক্রান্তিময়
চিত্র হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে? বৈশাখের
প্রারম্ভিক তাহাদের ফুলের তবকগুলি সুবিস্তৃত
তোড়ার মতই প্রসারিত থাকে। আর ঈতের
সোকা পর্দায় এই ফুলের তোড়াবীথার তো দেখা
হয় না।

শিবের কি আর কোন ঘরে কিংবা ছেলেকে
প্রাইভেট টিউশনীতে গুই মত দেহ করিয়া সঙ্কট
কাব্য ব্যাকরণ পড়ান? মদিকা কি তাহাকে দুইয়া
দিয়াছে? এই সব কথা। সর্বাঙ্গীর নিজের কথা
একটিও না।

চুপ করিয়া বসিয়া হরত কোলের উপর একটা
সেলাম হইয়া রেশমী হতার কোঁড়ের পর কোঁড়
তুলিতে তুলিতে এই সব কথাই সে ভাবিতে থাকে। সব
সময় তা-ও হয় না। অবসরকালে, স্বপ্নে কল্পিত
জাল লাসে না, তখন বারান্দায় একটা বেতের

ঝোড়ায় বসিয়া অথবা ছাদের একটা আঁশের
ধারে পাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করত পুরুষের মত নিশ্চল চোখ
মেলিয়া রাখিয়া সে এই সকল এবং আরও অনেক
কথাই মনে মনে ভাবে। শিবের দিক্কার বীশবন
হাওয়া বড়িয়া চড়িয়া পাতার পাতার লম্বা বড় বড়
শব্দ তোলে, কলভারগোরবে শৌর্যবাহিত লম্বাচর্চ
নারিকেল কুকাবলী মৌন হইয়া তাহার দিকে প্রসার
দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। অনিবিড়শাখ চমকে কুচলি
গুণায় দিয়া হুত বা কোন্ সময় আচমকা-ওটা
তরু সজ্জার নির্গল টান তাঁর মুহুর্ত মুখের পরিহাস-
প্রসার উজ্জল দৃষ্টি মেলিয়া উহার ধান-ভিত্তিত মুখের
দিকে চাহিয়া দেখেন, অকস্মাত আনিয়া ওটা কোন্
একটা গৃহ-প্রত্যাহার শব্দচিলের কর্ণশ শব্দে চকিত
হইয়া সর্বাঙ্গীর ঘেন বম্বল হইয়া প্রাণ-সজ্জার
রিম্ রিম্ কিম্বিকিম্বিকের ধারা করিয়া পড়ে, শুক
শুক মেঘের ডাকে পুষ্পাতন অট্টালিকার ধর-ধার,
জানালা, সাদি, সেওয়ালা গাড় করান বড় বড়
জৈলচিত্র, বৃহদারতন-স্মারনা, আসনারী সমস্ত কন্
কন্ পূবে কাগিয়া কাগিয়া ওঠে, গিল্গিল্ বিছাতের
গেলিহান রসনা আকাশের গায়ে সাপ খেলোয়ার
চেতে থাকিয়া থাকিয়া খেলা করিতে থাকে।

সর্বাঙ্গীর এমনই আর এক সজ্জার কথা মনে
আসে। সেদিনও এই বকম প্রাণ-ধারার মধ্যে অগভীর
সমুদ্র মলমলহী বিলসপ্রাণ হইয়া দিয়াছিল; বিছাতের
দীপ শিখার সর্বাঙ্গীর মনের মধ্যে কিন্তু একটা আলো-
অঁধারের খেলা চলিয়াছিল। আধিকার মত এমন
নিষ্কিন্ধাকার নীরব ধূসরতাক'তা' ভরা থাকে নাই।

প্রত্যাহারটা সে সেদিন করিয়া বসিয়াছে, তার
মত তার মনে কি কিছুমাত্র অস্থিতাপ আসে
নাই? জুই? মনে-হয় না। তার কাব্যক্ষে তার
কাব্যের, কাব্যের, আত্মীয়-বন্ধন সবসেই তো
তাদের বিরোধী। তার সব বাড়ীর অত মেঘের
পক্ষে অগভীর হইবে, এই অস্থিতাই তার সে
কাব্য অত তাড়াতাড়ি তাদের মনে কোয়ার আসেই

এখনকার বাস উঠাইয়া দিয়াছেন। বেনীর ভাণ্ডার
আবীর এবাড়ীর সন্মুখ ছাড়িয়াছেন। ওখু নিত্য
পর্যব যাত্রা, তার। পরে আবেদন জানাইয়া যনি-
অর্ডারে টাকাটা পর; বাড়ীতে আগিতে তরসা
করে না। সর্দারীর এতেও মনে পূর্ব বেশী ক্ষোভ হয়
না, কিন্তু সে বেশ ক্ষুধিত পারে, তার বাবার হয়।
আপনার জনসের তিনি অস্তর হইতেই বেশ একটু ঘেঁ
জরিতেন। সবার চাইতেই তিনি বয়সে বড়; তাই
সবার সম্বন্ধেই তিনি নিজেই সেন একটা দায়িত্বের পক্ষে
আকর্ষিত হইয়াছেন। আর এত সৎসা সেটাকে হিঁড়িয়া
কেলিতে হইল বলিয়া বুক একটু বাধা বাকিল। আর
তার চাইতেও শতগুণ অধিক আহত হইয়াছিলেন,
সর্দারীর প্রতি এই বিশ্বাস অপবাদে! জানিয়া ওনিয়া
তার অনতিদূর দীর্ঘনের সত্যমান হইয়াটাকে আপনার
লোক হইয়াও যাত্রা করা করিতে পারে না, উপরন্তু তপা
প্রকাশ, পক্ষা-করে, তাদের সর্বস্বত্ব বায় হুনা, না
করা বার করা! নিছক হেলেনদ্রিবা বলিয়া তিরস্কার
বত ক্রী করিতে পার, কিন্তু জন্ম করিতে চাও কিসের
অহঙ্কারে! সত্যই তো কোন-পাপ সে করে নাই।

স্বরজন একেবারে বেন তিনের বাহিরে আহত
হইয়াছিলেন। সেই নির্দ্বন্দ্ব আঘাত তার চেহারা বেন
একেবারে অকল্প চিত্র আঁকিয়া দিয়াছে। কথা
তিনি কোন দিনই বেশী কহিতে পারেন না, এখন প্রায়
সৌনী হইয়া পড়িয়াছেন। কোরাত্যন্ত দুখ তর দীর্ঘ
সময়কালে সনাক্তর—সর্দারী হইতে প্রথম আশক্তি
করিলে স্বরজন বলিয়াছিলেন, “বয়সকালে সাদা
হুড়ীতে বেশ সেখার রে!” স্যাকশ্যাক সাদা সাদা
সাদাসিধা, তাও সর্দারী সর্দারীর অস্বাভাবিক
সে সবও বোধ করি এমন পরিচ্ছন্ন থাকিত না!

মধ্যে মধ্যে ইচ্ছাচারে পড়িয়া পড়িয়া কি বেন
সম্বন্ধ না-কি করেন। কেহ আগিতেই দেখিলেই
উবেদিত দীর্ঘবাস চিত্তরূপে গোপন করিয়া যান, আর
বিলম্ব একটু সচকিত হইয়া থাকেন। তার শতগুণময়ের
বত কিছু বিশ্বাস, সমস্তই এই একটা প্রাণীর কাছেই

সবের চাপা দিয়া রাখিতে চান, “অথচ সব চাইতে
এর বিশিষ্ট রূপে প্রকাশ যে তারই কাছে হইয়া
বলিয়া আছে লেখা তার হ’ল থাকে না।”

সর্দারী তার কষ্টকর্মের জন্য অস্বস্তি হয় নাই;
কিন্তু তার বাপের জন্য সে সন্তুষ্ট হইয়াছিল। অত
তাকাতাকি এ বিবাহে সম্মতি দান করাই তাহার
তুল হইয়াছিল, সেই কথাটা তাবিতাই তাহাকে অস্বস্ত্য
করিতে হইত। কোথায় সে তাবিল, ও-কামটা তাকাতাকি
চুকাইয়া হইলে তার বাপ অনেকখানি নিশ্চিন্ত
হইতে পারিবেন, আশ্রম পাইবেন, তাই না সে এমন
করিয়া এক কথায় তবের বাড়ী বিবাহ করিতে
সম্মত হইয়াছিল। তুল! তুল! নিত্য নির্দোষের মতই
একটা মত বড় তুল করা হইয়া গিয়াছে! কিন্তু কি
ভাষা যে তার, সেই মূর্ত্তার চরম ফল ফলিতে
পার নাই! বিবাহটা যদি হুইয়াই হইত? তাবিতো
পাবে কাটা দেয়। ঐ বকম হীন বাসের আচার,
তাদের হাতের মুঠায় দিয়া পড়িলে কত নির্দোষনই
হয়ত তাদের সহিতে হইত! না! বাবা অনর্থক
হুং পাইতেছেন, হুং পাইবার মত কিছুই ঘটে
নাই!

একদিন সে কথাটা প্রকাশ করিয়াই বলিল।
সন্ধ্যার আবেদন চান উঠিয়াছে, সর্দারী বীল মখনসের
চোষার মতই তাহা কোবল ও উজ্জল সেখাইতেছে।
নক্ষত্রশলা বেন এক-একটা জ্বরির হুপি
গ্রীবা বা নুকে হৃদয়ঙ্গমী হুপ। দক্ষিণ বায়ের
বায়াম্বার চোষার পাতিয়া বাপের আশ্রম-চৌকির
কাছেই সর্দারী বসিয়াছিল। স্বরজনের দৈব একটা
দীর্ঘ নিঃশ্বাস অকস্মাৎ পতিত হইতেই সে হঠাৎ দৈব
অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিল,—

“বাবা, তুমি সব সময় অত হুং কর কেন বসত?
একটু কি হুং করে ছাড় দিতে দিনরাত ধরে তোমার
মুখে দুখ নেই?”

উপাধা বসিয়াই সে উৎসাহ-বিত্ত মুখে বাপের
মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। এ প্রশ্ন সে আশ

আকস্মিক করে নাই, কবিরে বলিয়া। তৈরী হইয়াই করিয়াছে।

কিন্তু হুরজনের দিক দিয়া তাহার বিপরীত। এপন্যস্ত তাদের প্রধান চিত্রনীচ ব্যাপারটা লইয়া তাদের ভিতর স্পষ্ট ভাবায় আলোচনা খুব কমই হইয়াছে। তাই আধিকার এই কটিন প্রব্রের আকস্মিকতার সংলাই তাঁহাকে ঐক্য বিপর্য করিয়া তুলিল। উত্তর এর সেওয়া চলে কি না, জানি না, অথচঃ হুরজনের পক্ষে তা' সেওয়া কটিন। এর ষ্ণার্থ উত্তর সর্দারীর পক্ষেও হয়ত একটু কঠোর হইয়া পড়িবে, হুরজনের পক্ষে তাহা হুস্যাধ্য। ঐক্য আহত, ঐক্য বিরত, ঐক্য অপ্রতিভ তাবে একটু বানি জান হাসি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বসিলেন, "না, ক্ষম আর করি কই! ক্ষম তো করি না।" বলিতে বঙ্কিতই হৃদয়োন্মত্তিত বিদ্যাবাসে কুণ্ডলর একটু বানি পরাধরা হইয়া আসিল, উপলভ্যায় দীর্ঘশ্বাসটাকে সত্তর্পণে বুকের ভিতর ঢাঙ্গিয়া দিয়া ঠোঁটের একটা কোণায় এতটুকু হাসিকে বেন কাঁপাইয়া বড় করিয়া তুলিতে চাহিলেন, কিন্তু অস্ত্রসারসুত্বে বৃন্দের মতই তাহা বেন দুহুর্ভেদী শক্ততার দ্বারা মিলাইয়া গেল।

"কর না! ক্ষমতা ক'রে জব কি-ই বা এত ব'লে ব'লে ভাব বল তো? চেহারাটা কি রকম হয়েছে হৃদয়বের আননা নিয়ে একবার ঠাঙিয়ে দেখ তো।"

আর একবার সেই রকম অর্ধবাক্য অফুট হাসি হাসিয়া পিতা সম্মুখে যেহে উৎকর্ষা-পঙ্কিত বুকের পানে চাহিয়া লইয়া সবক-নিরুদ্ধ দৃষ্টাবরণকে সত্তর্পণে ঠেলিয়া রাখিয়াই উত্তর করিলেন,—

"জান তো না, আমাদের শায়েই বসেছে, 'বুদ্ধভাবভিত্ত্যাময়', আর কটিন গভর্ণমেণ্ট এই যে পেনসনের ব্যবস্থা করেছে, এ-ও কি বুঝা।"

সর্দারী কড়ার দিয়া উঠিল, "না বাবা! তা' ব'লে তুমি এত কিছু বুঝা হওনি! পঞ্চদশ বছর বয়েসে, তবু পেনসন নিয়ে চুকিয়ে দেব ব'লেই ত্রি ভটা বুঝাবিয়ে

কিন্তু হবে? আমাদের দেশের নিয়মে ছেড়িয়ে দিয়া-জীবন, তারপর থেকে বুঝা।"

হুরজন এবার সভা-সভাই হাসিয়া কেলিয়া কহিলেন, "তা'লে না, এসেছে আর কাউকে বুঝা হ'তে হবে না, ছেড়িয়ে পর আর ক'জন এমুসে বেঁচে থাকে? যে ছাতির গড়-গড়তার তেইশ বৎসর পরমা—"

সর্দারী ঐক্য চিত্রিত হইয়া কি তাবিল, একটা নিঃশ্বাস কেলিয়া কহিল, "সে কথা টিকই, বুঝা এসেছে আর বুঝা ক'বে হ'তে হয় না,—অবশরও হয় না; আবশরও নেই;—এসেছে হেলে যেহে বুঝা হ'বেই জন্মায়।"

তারপর লম্বা সচকিত হইয়া উঠিয়া সাগ্রহণিত মুখে বলিয়া উঠিল, "না বাবা! তা' ব'লে তুমি এইটুকুই বড় রকম একটা নবীর ব'লে ধ'রে নিও না বেন, মোহাই তোমার।"

হুরজন একটা ক্ষীণ নিঃশ্বাস মোচন করিয়া ঐক্য হাতমুখে যেহেহে মাথাটা বুকের কাছে টানিয়া ঝুঁকিলেন। মুখে কথা বোকাইল না।

সর্দারী বলিতে লাগিল, "শায়েবরা বাগানবার নিয়ম খুব নিয়মিত ভাবে পালন করে, গভের ভাতের লোকেরা তোমার বরিসেও রীতিমত খোড়ায় ঢকে, সাইকেল চালায়। আবার আমাদের দেশেই সেকলে লোকেরাও খুব জ্বা আর দীর্ঘকালী হ'তেন। এখনও দেখতে পাই, ত্রাঙ্ক-পণ্ডিত শ্রেণীর আর খুব নিয়ম-চাষী বিধবাসের ভেতর অনেকই সত্তর পেরিয়েও বিনা-চন্দ্রায় লেখা-পড়া করেন, নিজের গায়ে আর ট্রিক্সে-মার্স। তবু এই মাঝের বকী থেকে কমবরলী থেকেই হ'লে 'ইকোনট জুডোজ' হ'তে বসেছে। না বাবা, তোমার আঁচি তাঁদের দলে পড়তে দেব না, তোমার মুক্তির জাল রাখতে হবে, অনেকদিন বাঁচতে হবে।"

হুরজনের ঠোঁটের কোম্পে-ঐক্য একটু বানি হাসি উজকিত হইয়া উঠিল। তিনি এশাঙ্ক কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি তো আমার পরীরের দ্বারা কম চেষ্টা

করচো না মা। এত যত্নও যদি শরীর ভাল না থাকে, তাহ'লে নিতাই তার বেইমানী। তারপর চকিতের মধ্যেই তার হাসি মিলাইয়া গেল, অকস্মাত তাড়িয়া আসা এক টুকরা কালো ঘেঘের মতই একটা ছুসে ছুসে-গাভীরা তার মুখের উপর দিয়া এক মুহূর্তে খেলা করিয়া চলিয়া গেল। তাহারই ভিতরকার সজ্জিত ঈষৎ একটু অঙ্গ-আর্দ্রতা বেন বাধা মানিল না। সচেষ্ট ঘেঘোর ঝাঁপ তাড়িয়াও প্রকট হইয়া পড়িল। কহিলেন—

“বাঁচতেই হবে, মরণ যদি নেহাৎ না যানে, কে মানাবে? আপনা হ'তে মরণের কথা আমি তো ভাবতেই পারিনে, বত অশঙ্কই হোক, জানি আমার বাঁচতেই হবে।”

ইহার পর আর এ আলোচনা করা চলে না, করিতে গেলে বেখানে গিয়া পৌছিতে হইবে, সন্ধ্যায় সন্ধ্যায়:করাগেই সেখানেকে পুর্জিবার করিয়া চলিতে চায়। তার বাশকে যে কেন তার অত্যন্ত অনিচ্ছুক ব্যবহৃত চিত্ত লইয়াও দীর্ঘ দিন জীবিত থাকার অভিযান বহন করিতে হইবে, সে কথাটা তো আর তার কাছে

উৎ নয়; আর সেটা তাকে আর কেহ তৈরী করিয়াও দেয় নাই, নিজের ইচ্ছায় এ সমস্তার সৃষ্টি সে তো নিজেই করিয়াছে; ইহার ক্ষত সারী যদি কেহ ক্ষপতে থাকে, তবে সে নিজেই। অতএব এ আলোচনা খামাইয়া দেওয়াই মঙ্গল। অগ্রহুত তন্মিম হাসি হাসিয়া বলে,—“হবেই তো। একশো বছরের কম নয়। সেখো, তার আগে আমি কখনই তোমার বেতে দেব না।”

এই বলিতে বলিতেই সে নিত্যের ব্যস্ততার সহিত কি বেন কি একটা মত বড় দরকারী কাজের খাতিরেই সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। চলিয়া গেল বলিয়াই জানিতে পারিল না, তার ঐ কথাটিতেই তার বাপের বিশাল চুটী চোখ এক মুহূর্তে অশ্রুধারা ভরিয়া উঠিল। ভাল করিয়া সেখিলে দেখা গাইত, সেই অঙ্গ-উৎস হইতে দুইটি ক্ষীণ ধারাও ক্ষত বা আচবিত্তে নামিয়া পড়িল। পুরুষ হইলেও স্রব্ধন মাহু। পুরুষ মাহু বলিয়াই কি ভগবান তাঁহাকে পায়ণ দিয়া তৈরী করিয়াছেন?

(ক্রমশঃ)





লাজলালান্ন দেশের অশ্লিলতা

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম্-এ

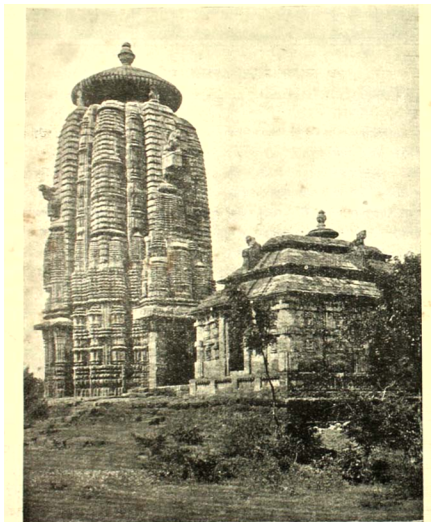
বর্তমান রাজশাহী সহরের সাত মাইল উত্তর-পশ্চিমে দেওপাড়া নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামের সংলগ্ন বিরাট একটি দীঘিকে এখনও লোকে বলে 'পছমসরের দীঘি'। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে বেটকাফ নামে একজন ইংরেজ রেভিলেন, দীঘির পাড়ে অসংখ্য ইউপাটেকল ছড়াইয়া পড়িয়া আছে; তাহাদের মধ্যে একখানা পাথরও আছে, তাহার গায়ে অনেক লেখা। বেটকাফ সাহেব অনেক বর করিয়া পাথরের গারের লেখাগুলি পড়িলেন। ঐ লেখা পড়িয়া জানা গেল, সেন বংশের আদি রাজা বিজয় সেন এই দীঘি কাটাওয়া তাহার পাড়ে একাও এক শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শিবের নাম ছিল 'প্রহ্লাদেশ্বর শিব'। তাই লোকে আজিও দীঘিটিকে পছমসরের দীঘি বলে। ঐ পাথরখানার গায়ে হুরচিত সন্তত স্নোকে বিজয় সেন পর্যায় সেন শ্রীযুগের রাজ্যগণের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। মন্দির-প্রতিষ্ঠার বিবরণ আছে, দীঘি কাটাওয়ার কথা আছে। যেই দেবতার গ্রী-ভাগা এমনি যে, মাত্র অর্ধেকখানি গ্রী তাহার কপালে জুটিয়াছিল (অর্ধনারায়ণ শিব) সেই দেবতার দত্ত রাজা একশত দেবদাসীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন— এই কথাও এই লিপিতে আছে। বিখ্যাত কবি উদ্বাপতিধর এই স্নোকগুলির রচয়িতা। ঐশ্বর্যসেব পিতৃসাবিধের ভূমিকায় বলিয়া নিয়াছেন, লতার মত বাক্যমালা বিস্তার করিতে উদ্বাপতিধরের ছুড়ি ছিল

না। কাজেই কবির রচনা কেমন ছাঁকাল, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

কবি পূর্ব ঘট। করিয়াই প্রহ্লাদেশ্বর শিবের মন্দিরটির বর্ণনা করিয়াছেন। মন্দিরটি প্রকাণ্ডকায়। ইহার শাখাসকল মিক্সব্লুয়েক অবিকার করিয়াছে। ইহার ভিত্তিকুমি এবং কাগ্ন মহাবোমাকে অবিকার করিয়াছে। দূরবা এতদিন উদ্বাপতি-শিবের হইতে ভোরে রওনা হইয়া সার্বদর্শিনের পরিশ্রমের পর অতঃপরি-শিবের বিগ্রহ স্থাপনের স্থান পাইত। কিন্তু এই মন্দিরের শিবর এত উচ্চ হইয়াছিল যে, অর্ধশত-মহাবলকালেও ইহার উপর দূর্য্যের বিগ্রহ স্থাপনের একটা স্থান মিলিল। তথাও এতদিন নিরাশর হইয়া আকাশে স্থগিতছিল। কখন ভাঙিয়া পড়ে, তাহার কিছুই ঠিক ছিল না। বিজয় সেন এই মন্দির তুলিয়া এমন একটি দত্ত পড়িলেন, বাহাতে ভর করিয়া হিলোক বন্ধা পাইল!

কিন্তু জিলাকের অবলম্বন-দত্ত এই বিশাল মন্দিরটির আজ দুই চারিখান ইউপাটেকল ভিন্ন আর কিছুই নাই। বাহালা দেশে এই ব্রহ্ম শত শত মন্দির ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু বাহালা দেশের অলবাগুর এমনি প্রভাব যে, সারা বাহালা দেশে এমন একটি মন্দির বা সৌধও খুঁজিয়া পাওয়া যায়ই না, বাহা প্রাচ্য-মূলগতান হুগের বলিয়া নির্দেশ করা যায়। ঐ হুগের মন্দিরগুলি এখন নিঃশব্দেই বিনষ্ট হইয়াছে। অথচ আমাদের

প্রতিবেশী প্রদেশ উড়িষ্যার প্রাক-মুসলমান যুগের ভাগই প্রকৃতির ধ্বংসীতার ফলে লুপ্ত হইয়াছে।
 মন্দিরের হ্রদাহকি। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও এই বাদালা বেশ পাথরের বেশ নহে, কাগায়াটির বেশ।
 যুগের মন্দিরের অভাব নাই। পাক। গাঁদুনীর প্রধান অবলম্বন, এখানে মাটি পুড়িয়া যে



ভুবনেশ্বরের মন্দির

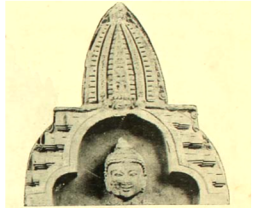
বাদালায় মন্দিরগুলি কি, সবই বিলম্বিত। ইট ছা, তাহাই। ইট-চুন-সরকীতে যে দালান-বা মন্দির
 উদ্ভিয়াছে? কিছু-কিছু বাক্য ভাদিয়াছে, কিন্তু বেশির প্রকৃত হয় তাঁহার পাক্য অক্ষয়ের চারা লক্ষ্যন অনিবার্য।

মন্দির-প্রতিষ্ঠাকারীর বংশ পরিচয় হইয়া পড়িলে মন্দিরের আর ভেদন বর থাকে না। কল সেবিতে সেবিতে মন্দিরের গায়ে অথবা গাছ অথবা বাড়িয়া উঠে এবং একদিন ভরফর ফড় গাছ উপড়াইয়া ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে সর্বোপর ভিত্তিরোধকারী মন্দিরও ধ্বংস হইয়া যায়।

তবে কি প্রাক-মুসলমান যুগে বাঙ্গালা দেশের মন্দিরের কি আকৃতি ছিল, জানিবার কোন উপায় নাই? সৌভাগ্যক্রমে একটি স্ত্রী আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছি, এবং অতি ক্ষীণ স্ত্রী ধরিয়া প্রাক-মুসলমান যুগের বকীর মন্দির-স্থাপত্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিয়াছি বলিয়া আমি মনে করি। কোম্বুলী পাঠক বকীর "Iconography of Buddhist and Brahmanical sculptures in the Dacca museum" নামক পুস্তকের মূখব্বের ৮ম অধ্যায়—"An idea of the temples that were erected over these images" পড়িয়া সেবিতে পারেন। ১০০৯ সনের শ্রাবণ-সংখ্যা "পঞ্চপুণ" পত্রিকায় এই সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বিরাহিলাম। এই স্থানে অতি সঙ্ক্ষেপে প্রাক-মুসলমান যুগের বকীর মন্দির-স্থাপত্যের স্বরূপ এবং কিরূপে তাহা নির্ণীত হইল, তাহা কিরিয়া ক্যা আবত্ৰক।

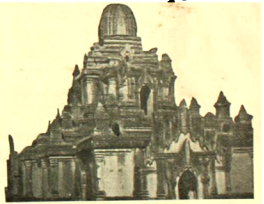
পূর্ণ ভারতীয় মন্দির-স্থাপত্য, মুসলমান এই দেশে আনিবার পূর্বে কি রকম ছিল, জানিতে ইচ্ছা হইলে, উড়িষ্যার মন্দিরগুলি পর্যবেক্ষণ করা জিহ্ন পত্যন্তর নাই। তথায় দেখা যায় যে, প্রবাদভূ হইছে মন্দিরগুলি নির্মিত হইত। সেবজা সেই মন্দিরে থাকিতেন, তাহা হইত বীর্বাঙ্কতি। উহাদের মাথার থাকিত প্রকাণ্ড একটি আমলক বিলা। উহা বেন মন্দিরের স্তম্ভ। বাহ্যের মাথার নীচে বেমন ফল, আমলক বিলা নীচে মন্দিরেরও ভেদনি, আমলক বিলা অশোকাকৃত সার, ফলক বা বাচ্চকত্ব। এক সোহা হকিকে মাথা বাঁধিয়া, ছাড়িয়া দিলে বেমন

তাহা ইচ্ছা পীত হইয়া তত্কাকারে লগা হইয়া কুলিয়া পড়ে—এই সেউলের আকৃতিও তাহাই। আমলক ও



মহাকালী গ্রামে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তিতে অঙ্কিত মন্দিরের প্রতিরূতি

বাড়ের নীচেই তাহার গতি বা শরীর। এই শরীরের নীচে পীঠ বা বেদী। এই বীর্বাঙ্কতি ভরফবই পতরময় সেউলগুলির নাম রেখ সেউল। রেখ সেউলের সম্মুখে বেক-বর্ণনার্বিগণের আশ্রয়ের স্তম্ভ



পেগাসের বিলম্বাধা মন্দির

বে সেউল নির্মিত হইত তাহাকে বলিত স্তম্ভ সেউল, পীঠ সেউল বা শিলা সেউল। মাথারপড় ইহাকে

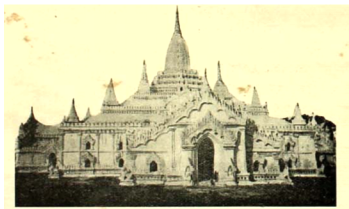
কনকোহন বলা হয়। থাকে। এই সেউলের দ্বারা
কনকোহন কয়েকটি খাপ, পিঠ বা পিঠা দ্বারা
সম্বলিত হয়। ১১৬ পূর্বের উচ্চতার রেখা ও পিঠা
সেউলের ছবি দেখা যেন।

উপর মন্দিরের যে প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাওয়া যায়,
তাহাতে এক নুতন ধরণের মন্দিরের পরিচয় পাওয়া
যায়। দুইটি বরুণ চাকা কোণার ক্রিস্চিয়ান পরম্পরা
মহাকালী গ্রামে প্রাপ্ত থানী নুতন বানা (১১৭ পূর্ব)



সেউলের কনকোহন-মন্দির

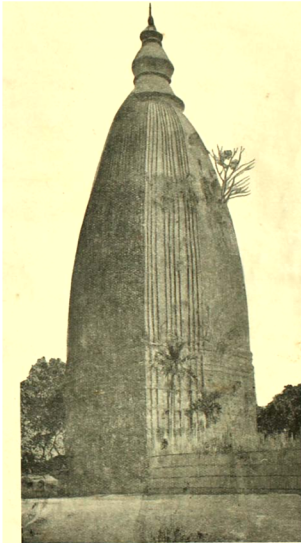
উচ্চতার মন্দিরগুলি প্রধানতঃ এই দুই স্টাইলেই দেখাইতেছি। দেখা যাইবে যে, নুতনের মাথার
(কন, — Style) তৈয়ারী হইত। বাঙ্গালী দেশে উপর একটি মন্দিরের প্রতিচ্ছবি আছে। উহার



সেউলের কনকোহন মন্দির

ইউর স্টাইলী রেখা সেউলের অনেক নতুন দেখিতে হাউস-স্টাইলী গাউস কনকোহন খাপ, উপরের
পাওয়া যায়, জয় সেউলের উদাহরণ কম। বাঙ্গালী দেশের মধ্য হইতে গ্রিক রেখা সেউলের প্রতিচ্ছবি
সেই প্রাপ্ত কয়েকখানা পাথরের মূর্তিতে, মূল মূর্তির একটি শিবর উঠিয়া দিয়াছে। মন্দির দিগাংশে এই

কৈলীর ব্যবহারের উদাহরণ উদ্ভিদ্ধায় কোথাও নাই। সেখানে পাওয়া যায় না সত্তা, কিন্তু ব্রহ্মবিশেষের পেশাদারি
এ বেন তরু ও বেব বেউলের এক অশুর্ক সমিগ্রণ। এই ছন্দের মন্দিরের অস্তাব নাই। পেশাদারের বিখ্যাত



রাজাবাড়ীর মঠ

এই ছন্দের কোন মন্দির আজ বাঙ্গালা দেশে 'আনন্দ মন্দির' এই ছন্দে তৈয়ারী। পেশাদার আরও

বহু মন্দির আছে বাহা এই ছন্দে তৈয়ারী, উহাদের
কয়েকখানার ছবিও দেওয়া হইল। (১১৭-১৮ পৃঃ)
মূর্তির উপরের মন্দিরের নক্সার সহিত পেগানের

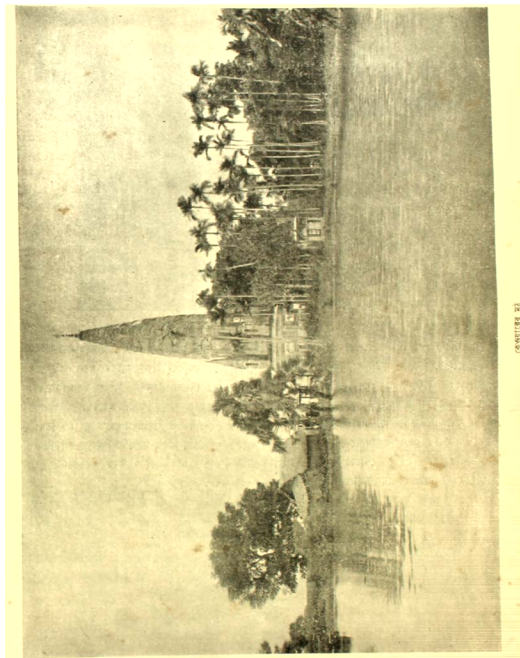
বাইতেছিল না। বহু পড়িত এই বিস্তরে বহুবিধ করনার
অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। বাহালা দেশের মূর্তিতে এই
নবুনার মন্দিরের নক্সা পাইয়া এখন মৌর করিয়াই



সোনারঙ্গের মন্দির

মন্দিরগুলির এই আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিয়া একটি বহু
সম্ভার সমাধান বিস্মিত। পেগানের এই মন্দিরগুলির
শৈলীর উপরিত কোথায়, তাহা এ বাবৎ-মূর্তির সাক্ষ্য

বলা যায়, ইহা বাবৎমন্দির নিম্ন হ্রাস-২৭শী, ক্রমশঃ
উপনিবেশগুলিতে ছড়িয়া গিয়াছিল। লক্ষ্য করিলে
সেবা বাইবে, বহুসংখ্যক বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দির এক



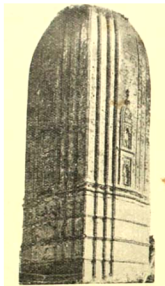
এবার ডাটের বিখ্যাত বিষ্ণু মন্দিরও এই একই স্থানে তৈয়ারী। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, বাঙ্গালার নিম্ন এই স্থাপত্য স্থল প্রক্ষেপে এবং বীশম্বর ভারতে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

মাত্র কয়েকখানা পাথরের মূর্তির মাথার অভিত মন্দিরের নক্সা এত বড় একটা আবিষ্কারের ভিত্তি হওয়ার অনেকেই হতভম্ব এতদিন ইহাকে সম্বন্ধের চক্রে দেখিয়া থাকিবেন। এই স্থানে রচিত একটা মন্দিরও যে বাঙ্গালা দেশে এতদিন পাওয়া যায় নাই, তাহাতেও সম্বন্ধ বর্দ্ধিত করিয়া থাকিবে। কিন্তু পাহাড়পুরের স্মার্টাটীন মন্দির আবিষ্কৃত হইয়া সেই সম্বন্ধের ভিত্তি তাগিয়া দিয়াছে। পেশানের মন্দিরগুলি যেই স্থানে রচিত, উহাদের ভিত্তির নক্সা যেই প্রকারের, পাহাড়পুরের মন্দিরের স্থল ও ভিত্তি-নক্সাও অবিকল সেই প্রকারের। এক পেশানের মন্দিরগুলি খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর, পাহাড়পুরের মন্দির উহাদের অপেক্ষা অল্পটুকু চারিশত বৎসরের পুরাতন।

বাঙ্গালার এই নিম্ন স্থাপত্য শৈলীই ক্রমশঃ একরকম, পঞ্চরকম, নবরকম ইত্যাদি মন্দিরের ক্ষয়বান করিয়াছিল। বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের মন্দির, হুগলী 'প্রতাপাদিত্য' রামচন্দ্রের মন্দির ইত্যাদি এই পরবর্তী কালের একরকম মন্দিরের উদাহরণ।

যেখ মন্দিরের প্রথা বাঙ্গালা দেশে খুবই প্রচলিত ছিল—বীরভূমির ইছাই ঘোষের সেউল, ঢাকা বিষ্ণুপুরের দ্বিত্যন্ত রামাবাড়ীর মঠ (১১২ পৃষ্ঠা)—

(কয়েক বৎসর পূর্বে পদ্মানদীর পাড়ে পতিত), ২৪ পরগণার জটাধ সেউল ইত্যাদি বাঙ্গালার উৎকর্ষের



ইছাই ঘোষের সেউল

সেউলের উৎকর্ষ উদাহরণ। ইন্দ্রজয় অধিকারের সঙ্গে পাক্কাটা সৌখিক শৈলীর আক্রমণের ফলে এই যেখ সেউলের রচনা হচ্ছে পরিবর্তন আরম্ভ হয়। সম্ভবতঃ রাজা রাজবরত কর্তৃক নির্মিত বিখ্যাত একুশের মঠেই এই সৌখিক শৈলী প্রথম প্রযুক্ত হয়। পরবর্তী কালের পুরুষদের সমস্ত মঠগুলি এই স্থানে নির্মিত। দুই খানার হাবি এই সঙ্গে বেড়া দেল (৭২০—৭২১ পৃষ্ঠা)





ভৈরবী—তেস্তানা:

কহা কহা ঢোঁড়ছি ভাই
 ঢোঁড়ছ সব দিশি শেখন ন আই।
 ছনর তিরাসল শিরাস ন মিটল
 বিগাকুল চিত্ত ভেল নরশন চাই।
 সোজন বিন সহি চিত্ত বৈরজ নহি
 আখি বরষত রহি।
 কহা তাকো পাই, পুন হেরব তাতে
 নহি পতিয়াই

—শ্রীমতী অক্ষরূপা দেবী

তুর—শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি.এ

অঙ্কন

১ ২
 সা জা মা পা দা গা সী পদা বা জা
 ক হা ক হা টো ড ত টি তা

২ ৩
 সা জা মা পা দা গা সী পদা বা জা অ সা
 • ড হ ল ব দি নি পে • তা ই ॥

অঙ্কন

১ ২ ৩
 জা মা দা গা সী -১ সী সী সী সখী জা কী সী গা
 { ক ব র তি ষা • ম ল পি হা • • ম ন মি

১ ২ ৩
 জা পা পা দা গা দা পা জা মা জা মা জরা জা অ সা
 বা ক ল টি ত তে ল ম ব ল ন চা • • ই ॥

গকাতী

১ ২ ৩ ৪
 { গা -১ সা কা জা জা মা মা জা মা জমা জমা জা কা সা সা }
 { সো . হ ন বি ন স হি চি ত থৈ . . . হ হ ন হি } I

১ ২ ৩ ৪
 সা দা দা পা দা পা পা জা পা দা দা জমা জমা -১ সা
 কা . বি ব র খ ত র হি . . . তা . . . ই } I

আভোগ

১ ২ ৩ ৪
 { গা মা দা দা সা -১ -১ সা গা সা দসা কা সা দা দা পা } I
 { ক হা তা কো গা . . . ই পু . . . রে . . . র ব তা হে } I

১ ২ ৩ ৪
 মজা রজা পা -১, দা পা মজা রজা মপা দপা মপা মজা মপা দপা মজা দসা
 ন . . . হি . . . প তি রা ই II



নবকিশোরের পশ্চিমাভ্যুত্থান

শ্রীকৃষ্ণের বহু

(১)

নবকিশোর হঠাৎ আবিষ্কার করলো, এবং আবিষ্কার করে' ব্যথিত হ'লো, যে তাঁর কোনো পরিচয় নেই। এটা এমন-কোনো অজান নম্র, বা নিম্নে আমরা সাধারণত মন-খারাপ করে' থাকি কিছু নবকিশোরের আর সবই ছিলো, এবং কোনো-একটা অজান নাকি মানুষের দরকার — বাঁচবার পক্ষে। আমরা চাই, তাই আমরা বাঁচি।

নবকিশোরকে আমি সেদিনও লেখছি, হাব-প্যাণ্টের উপর গলা-বন্ধ কোট চড়িয়ে বই-পাতা বগলে করে' ইচ্ছা করে' দৌড়ে গেলো। সে-সময় ও যদি এক-বেলা দিনেমা দেখতে পেতো—আর ইন্টারেস্টে যেতে পেতো এক পাতার আইন-ক্রীম—তা হ'লে ও মনে-মনে বলতো : হেহু! মানে, এর বেশি আর জীবনে কী থাকতে পারে। এবং নানা ছলছলতা করে' মনে কাছ থেকে দিনেমা আর আইন-ক্রীমের পরমা আদায় করা হিলো তাঁর জীবনের সাধনা। ছুতোগুলো একটু বন্ধ হ'লে গড়তো, তা'তেও এসে কেঁতী না, কেননা তাদের পরমার অজান ছিলো না, আর বিধবা মা তাঁর একমাত্র ছেলেকে অন্ধের মত ভালোবাসতেন। তাঁর বাবার দুকু বয়, বখন সে খুব ছোট। এই ঘটনা নিয়ে আশাভরস করণ-রল কোটাতে পারলুম না : কেননা, বাপ বখন রেখে যান ব্যাঙ্কের খাতায় লগা অর্থ, কল্‌কাতার বাড়ি, আর বেশে ভদ্রিয়ারি ... মানে, এমন অবস্থা সংঘর্ষে কল্পনা করা যায়, বখন পিতৃহীন-ভগ্নাটো দরদরত ভাগ্যের ব্যাপার। বিধাতা যাকে নেন্ তাকে সবই নেন্ : নবকিশোর 'স্বাধীন না হ'লে তাঁকে আমরা এমন কলুষ করে' পেতুম না।

যদি বৃদ্ধিমান, দিনেমা আর আইন-ক্রীম আর

চকোলেটের ভর নবকিশোরকে কখনো ভাবতে হয় নি। ছেলেকেবোলা থেকেই পৃথিবীকে সে বর্ণ বলে' ভাবতে শিখেছিলো। বাড়িতে তাঁর রান্না; তাঁকে নিয়েই, বলতে গেলে, তাঁদের বাড়ি। তাঁর শুধু এক ছোট বোন ছিলো, চম্পা তাঁর নাম। এখনো বৃদ্ধে পাহুছি নে, এ গল্পে সে কোনো কালে লাগবে কিনা, শুধু এখানেই উল্লেখ করে' রাখলুম।

সম্প্রতি নবকিশোরের বয়স উনিশ হয়েছে, সে বি-এ গড়তে উঠিলে। আমার চোখের উপর সে ধাঁধা করে' বেরকম বেড়ে উঠেছে—সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। মাইয়ের পাংসা, লম্বা ডগা বোম একটু একটু করে' লম্বনের দিকে এগোচ্ছ—বেড়া পার হ'লে ওঠে দিয়ে ঘরের চালে, বেশে আত্ম-বাড়িতে জ্বলছে বহুত চায়। সেই অদ্ভুত পল্লি, সেই হুনিয়ার গ্রাণ নবকিশোরকে ঠেলা দিচ্ছে ভিতর থেকে সে বাড়বেই, সে ফুটে উঠবেই, সে ফুটেই — কী হবে, তা'তে এসে যায় না, সে যে হ'লে উঠেছে, এটাই মস্ত কথা। কল্লের মত সে ফুটে উঠেছে, বর্গাকৃতি সে গবে নিরেছে সমস্ত পৃথিবী দিয়ে। তাঁর উচ্চ হাসিতে, তাঁর ক্রম চলার, এলোবোলা কথা বলার, তাঁর সব পাশ্চাত্যমিতি, ছেলোহানুসারে উপচে গড়ছে গ্রাণ, নতুন যৌবন। আশ্চর্য্য! — সেই নবকিশোর, ছোট ছেলে, এই সেদিনও একা কোনো চারের সোফানে চুপে বোকাগি আসে জিজ্ঞেস করে' মিতো, কবে পরমা আছে কিনা—সে আশ্চর্য্য একটা পল্লি, একটা গাণ্ডি, সে আশ্চর্য্য একজন। সে যে একজন, এই চেতনা তাঁর মনে নেবার মত। বাড়তে-বাড়তে সে পাচ ফুট মন ইচ্ছিতে ঠেকেছে; এখনোই যে বাড়বে, তা' হোর করে' বলা যায় না। মনো-মান-

সইরকম চওড়া, তাকে দেখতে বেশ একটা শোভা।
রাশি-রাশি আঙুর আর বাতাবিলে আর অল্প
নানের সব ক্যালিকনিয়ার ফল খেয়ে-খেয়ে তাঁর গাল
বেন সব সময় রক্তে ফেটে পড়ছে; তাঁর চামড়ার
রঙ হ'লে উঠছিলো দুধা-স্নান ভলপাইয়ের খোসার
হাত রঙ আর মঞ্চ। ভলপাইয়ের হাত উজ্জল তাঁর
চোখ—উশমাটা তাঁর নিম্নের। নবকিশোর তাঁর
স্বাধার বহু-নিতো। আরনার মাদনে ঝড়েরে রোজ
সে হস্ততবে নিজকে পরীক্ষা করতো: যদি
মনে হ'তো হুৎ একটু গ্লান কি চোখ একটু ঘোলাটে,
তা হ'লে বকরের কাসকের বিজ্ঞাপন দেখে-দেখে পেটের
অধু-রাঁজার নবক, আশ্চর্য্যমত আবিষ্কার গলায়-কর
করতে বলতো। গায়ের রঙ ভালো করবার জন্য
হলিউডের অভিনেত্রীরা কী-এক জুই নাকি খাব,
সমস্ত কলকাতা ছুঁড়ে সরতো টাকা দাম দিয়ে তাঁর
কেনা চাই তাঁর এক নিশি। পেটের-জুইয়ে তাঁর
জীভ বিখ্যাত ছিলো, সে নতুন মাদনে শেরেছে যে
তাঁর চেহারা সুন্দর; সেই মন্ত চেহারার উপর
তাঁর অত মায়া।

নবকিশোরের মনে ছিলো অমন্ত্র হুঁজি—না-
খাবার কোনো কারণ ছিলো না। কাঁচা পরমা এসে
পড়েছিলো তাঁর হাতে আর সেই পরমা সে হুঁহাত
ভরে গুড়াতো—হিসেব করতো: না, কখন হুঁহাত
পকেটের ফুটে দিয়ে করেকটা খুঁড়ো টাকা পকেট
পিয়েছিলো, তবে এক কার্পিভায়ের ঠেল জিনিস
কিনতে গিয়ে কিরিলি মেয়েটা তাকে নোটের খুঁড়ো
আর কেরত দেয় নি—ভুল করে' যে দেয় নি, তা'
নয়; একরকম চেয়ে, বিনতি করেই রেখে দিয়েছিলো,
'চেষ্টা কি তুমি দেবত চাও? চাও?' আর নব-
কিশোর অবিরতি কেরত চায় নি। বন্ধুক পচিল টাকা
খার দিয়ে সে ক্রমে যেতো, বন্ধুর বোনের অন্তরিনে নিয়ে
যেতো অসম্ভব দামী উপহার। বন্ধুসর নিয়ে দল বেঁধে
ফ্রেন্সে গিয়ে, রেজোর'র, বেড়াতে চান্ধিতো—
বেয়লা কর্ত্তো না, কত টাকা ব্যয়ে বরচ হ'য়ে,

করুতি পড়লে অন্যায়সে চেয়ে নিতো বন্ধুসর কারো
কাছ থেকে। মোট কথা, টাকা জিনিসটাকে সে
আমলের মতোই আনতো না—ছেলেবেলা থেকে
সম্প্রদায়ের আবহাওয়ার কাটালে তাই হয়। আবার
বাকে বলি টাকার মূল্য, তা তো তাঁর বোম্বার
কথাই নয়; টাকা তাঁর পক্ষে একটা রূপকমাত্র,
আদল জিনিস হচ্ছে—বা-কিছু তাঁর ভালো লাগে।
বা-কিছু তাঁর ভালো লাগে, তাঁর চাই-ই; না-কখনো
একটুখানি টাকার বোচড়। তাঁর মন পড়ে থাকতো
সেই আদল জিনিসের উপর, আনন্দের উপর: টাকা-
ভালো তাঁর পকেটের মধ্যে ধানিকটা আনন্দনাও
হ'তে পারতো। কোন্ সময়ে কত টাকা বরচ করা
উচিত, কোন্ নীমা পেরোলে তাকে বলে বাড়াবাড়ি,
এ-সব ভাববার সময় কোথায় তাঁর? ইচ্ছে দিয়েই যে
সে ভরে' রেখেছে তাঁর সমস্ত সময়।

আমাদের ভবানীপুরে বেশ একটা স্বক্কে দল
আছে—বে-মলের ছেলেমেয়েদের দলোর করা, টাকা
রোমপার করা প্রভৃতি বিশিষ্ট দার নেই, হুতরাং অল্প
সব ভালো-ভালো জিনিসের ত্যাগ-মনের মুখে চটা করতে
পারে। কথাই তা'রা ভুর্জি-বাগি কোটার, ঘেরেরা
মাঝে মূবর করে', ছেলেদেরা বিলত থেকে কেউ বা
'বার্ট' নিখে এসেছে, কেউ বা ব্রিড খেলা। কখনো তা'রা
নোকার বেড়াতে যায় গম্বার, কখনো বা গাড়ি নিয়ে
বেরিয়ে পড়ে কলকাতার বাইরে যে কোনো জায়গায়,
কি নীতের সময়ে আমতলায় যায় পিকনিক করতে।
মাঝে মাঝে তা'রা রবিবারের নাটক করে এশায়ায়ে,
ছোঁয়েদের মধ্যে কেউ-কেউ নাচে। নিম্নেরের মধ্যেই
তা'রা আবছা, সম্পূর্ণ বাইরের কারো সঙ্গে তা'রা বড়
একটা মেয়ে না; বা-কিছু করে, স্বরে সবাই বলে।
তা'রা ভয়ানক-উদ্বোধন, ভয়ানক চান্দক, আর
কক্কক করে বেন আরনার উপর বোম পড়ছে।
যশেরী হুঁজু আর ট্রেড-জিএশন এ-হ'য়ে ছিলে
সেপটাকে উজ্জর দিতে বসেছে; এরাই ত' বা হোঁক
কলকাতার হুং রেখেছে।

এই দলের সঙ্গে ছুটলো নবকিশোর এর চেয়ে ভালো সে করতে পারতো না। সে আনন্দকে ভয়ানক ব্যস্ত, তা'র এক দুর্ভাগ্য সময় নেই। তা'র ছেলেরালাকার আইস-ক্রীম আর চকোলেটের যা যৌবন কালের সান্নিধ্য, তা' সে পাচ্ছে এত প্রচুর পরিমাণে যে সে চোখে-নুখে পথ দেখছে না। সেদিন রাত্তার তা'র সঙ্গে দেখা হয়েছিলো, ছিলেন কল্পনাময়, 'কেমন আছো?' সে হেসে বললে, 'Oh, life is heaven'। তার মুখে-চোখে হাসির আভা দেখে সেকথা বিবাস করবার প্ররুতি হ'লো।

নবকিশোরের আত্মীয়-বন্ধনরা — কারণ অগ্রিয়, মন্থরা করবার সময় কখনো আত্মীয়-বন্ধনের অভাব হয় না—অবিস্ত্রি এটি মতো বলতে আরম্ভ করেছেন 'মার কি, এইবার পাখা গভিরেছে, কোন্ না একটু উড়বে।' 'মাখার উপর কেউ নেই, পরমা পড়ছে হাতে, উজ্জ্বল হাতে ফেলোটা।' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

নবকিশোর যদি আমার ছোট ভাই হ'তো তা হ'লে আমি কিছুর ওর ক্ষেত্রে একটুও আনন্দ করতুম না। আমি জানি, জন্মের কোনো কারণ নেই। বাইরে বেরো বোঝা থাকে ওর হঠাৎ কল্পনাময় আর কল্পনাময়, সেটা — কী? সেটা যে আসলে ওর নতুন যৌবন, যা ভিতর থেকে ওকে ছাড়া দিচ্ছে এবং আবেশে—বিভিন্ন নম্র, চট করে ও যদি সেটা মাগে উঠতে না পারে। অনেকেরই পারে না; এবং সেটাই, আমি বলবো, প্রাণের ব্যাকুল হৃদয়, যা ফুটে উঠতে চায়, কেটে পড়তে চায় ফল হ'য়ে, রঙের ঐক্যে, তারই মধ্যে নিহিত স্বর্গের অমরতায়। যৌবন — জন্মের বস্তুর মত, তা হ'ল হাসির খাঁচা, কেনিবে ওঠে উজ্জ্বল, নিজেকে হৃদয়ে দেয় চেঁচিয়ে পর চেঁচিয়ে—কে তাহলে আটকাবে, কোন্ তীরে ফুঁবে, কোন্ মুহূর্তে ভর। এই যৌবনই তো নবকিশোরের গানের লালি রঙ, জলোয়ারের মত ধারালো তা'র চোখের দীপ্তি—তা'র চকলতা, প্রসঙ্গতা, তার উজ্জ্বল হাসি। এ সেই বয়েস, মানুষ কল্পনাময়ের মনে বলে 'এ লোকটার গায়ে

আমি ছাড়া দিয়ে যাবো; আর আমি এক দেহ সন্ধান যাবো; আর সবই সিন ট্রাসে চড়ে বেড়াবো।' যখন হঠাৎ এক লক্ষ্যবলী ঘুম থেকে জেগে মানুষ বলে ওঠে 'আমি সুখী! আমি সুখী!' যৌবন একটা শক্তি, যার প্রকাশ চাই, প্রাণ নিজেকে গোপনিত করে' না দিয়ে সার্থক হ'তে পারে না। আমরা যেন একতাকে সেন্সার মনে করে' দেখি, যখন আমাদের ও-কলে ছিলো। হার রে 'ছিলো'; সব চেয়ে হারের 'ছিলো'।

আর নবকিশোর যদি একটু উজ্জ্বল-দিয়েই থাকে, তা'তেই বা কী? একটু উজ্জ্বল হাবার ঐ তো অমর। যৌবনের হৃদয় অসীম হৃদয় ঠিক তাহবার জড়ই যে মাকে-মাকে তা'র ভাল কাটা বরকার। বাধা-মরা, অনড় কোনো জ্বরের মধ্যে তা'কে বাধতে গেলে চলে? যৌবনের উপর হৃদয় করবে, এত লালন কা'র? তুমি কে বলবার, 'এই কোরো, আর এই কোরো না; যিনি চ' পেয়াগার বেশি চা খেতো না, হিসেব করে' পরমা খরচ কোরো।' উপদেশ দিয়ে কে করে কা'র ভালো করতে পেরেছে, শাসন করে' কে পেরেছে যৌবনকে নষ্ট হাড়া আর কিছু করতে!

সুচতা! আর সুচতার সঙ্গে ভর—যৌবনের উচ্চ আনন্দকে ভর, যৌবনের অসীম শক্তিকে ভর। এই আনন্দকে বহন কর না আমরা হতা করতে পারি, নিবিঘ্নে ক্ষেত্রে পারি প্রাণের উজ্জ্বলী মাগনকে, ততক্ষণ আমাদের মনে শান্তি হয় না।

নবকিশোর যখন আমার এখানে আসে, আমার খুব ভালো লাগে। আমি সুখী লোক ভালোবাসি, আমি হাসি ভালোবাসি, নবকিশোরের হাসিকা নিভানো দৃষ্টি উজ্জ্বল মোকন মত বলে' চলছে আর আমি যেন তীরে থাকিয়ে নীরবে তা' উপভোগ করছি। ওর মত নিবিঘ্ন, পরিপূর্ণভাবে সুখী কাউকে সেরে আমার ভালো লাগে। ভালো লাগে ও-কথা তাহলে যে এমন অমর একজনকে আমি চিনি, পৃথিবী যার

কাছে বর্ণ। কিন্তু আমাদের সেনের কটি অস্ত্র রক্তম।
হৃৎ চিনিসটাকে আমরা ঠিক প্রহার চোখে দেখতে
পারিনে; হৃৎই হওয়া, আমাদের মনে কোনো-না-
কোনো ভাবে সোঁদী হওয়া। হৃৎকে আমরা পূজা
করি: হৃৎই হওয়া, দরিদ্র হওয়া, ক্রম হওয়া, এ
সবই হচ্ছে পূজা, এই আমাদের মনের ভাব। আমরা
হৃৎকে কাতাল; তাই বোধ হয় বিধাতা এত হৃৎ
আমাদের কপালে মিশেছিলেন। কাতার প্যাংগেতে
আবহাওয়াতেই আমরা সব চেয়ে ভালো থাকি;
মনের ম্যাসেজিয়া থেকে কেঁদেছি মৃত হ'লেই বোধ
হয় আনন্দ: মরে' বাবো।

নবকিশোরের, দেখা থাকে, কোনো অতাব নেই—
এক, সে নিজেই বা আধিকার করেছে, একটা
পরিচয়ের সভাব ছাড়া। একটা পরিচয়; এমন-
কোনো চিনিস বা তাঁকে প্রকাশ করবে, বা'র ভিতর
দিয়ে নিজেকে সে দিতে পারবে, সেখান থেকে পারবে, বা'র
আলোর লোকে তাঁকে চিনবে। বেশ তো ছিলো সে
এতদিন; বা-কিছু তাঁর ভাবনা শরতের মেঘের
ছায়ার মত লম্বা আর কলহাটী; কখনো মনে হয়নি
লুপ্ত বা, তাঁ থেকে অস্তরকম কিছু হ'লে ভালো হ'তো।
কিন্তু আজ যে সে হঠাৎ টের পেলো তাঁর এই
অতাব,—তা'র কারণ মজরী নামের এক মেয়ে।

মনের মেয়েরের মধ্যে মজরী বললে সব চেয়ে
ছোট—তা'র মানে নবকিশোরের সে সমবয়সী, কি
যেটুকু ছোট, তা বহুবার মধ্যে নয়। তাঁর চোখের
জারা নিমিড় কালো, আরো বেশি কালো তাঁর চুল।
সে কেমন দেখতে, তাঁ'র আঁখি ঠিক কালোতে পারবে
না, মেয়েরের তপ ব্যাপারটা আমি ঠিক
বুঝি নে।

প্রথম যেদিন তাঁদের দেখা হয়, এই মেয়েটির
মৃত উচ্চাঙ্গি ওনে নবকিশোরের কবর মনে মনে
বেজে উঠলো সোনার খঁটা। মনে সৈন্যসিঁতে
মিকেলের সোনাগি আলো কাচের খেলনার মত
ভেঙে পড়লো টুকরো-টুকরো হ'য়ে। পরিচয় হ'লো।

নবকিশোর বললে, 'চমৎকার বিকেল।' মজরী বললে,
'কালকের বেলা আর ঠান্ডা।'

আরওটা আশাভরপ নয়। কিন্তু ভালোবাসার
মত যে-সব লোক ইতিহাসে বিখ্যাত হয়েছে, তারাও
পরস্পরকে প্রথম যে-কথা বলেছিলো, তাঁ — তানিয়া
তা আমরা জানিনে।

আন্তে-আন্তে মনে' উঠলো অলোপ। তারপর
যা হ'তে পারে, তা-ই হ'লো।

এমন সময় একদিন, মজরীর ভালোবাসার পতীর
চোখ বন্ধন পড়েছে এসে তাঁর মুখে, হঠাৎ সে মনে
লাভ দিয়ে বেগে উঠলো। হঠাৎ সে নিজের মনে
বললে তাইতো! আমি কী? আমি যে কিছুই নই!
কিছুই নই। কিন্তু কী আমি না-হ'তে পারি? সঙ্গে-
সঙ্গে তার' মনে হ'লো, 'মজরীর মত, মজরীর
ভালোবাসার কী না আমি হ'তে পারি!'

পুরাণে দেখতে পাই, পূর্ব প্রকৃত সভ্য পশ্চিম
কোনো পরীক্ষার উত্তীর্ণ হ'য়ে তবে লাভ করে স্ত্রীকে।
তার মানে এই, পূর্ব বন্ধন কোনো নারীকে ভালোবাসে
তা'র মধ্যে সজ্ঞিত হর প্রানিকটা বাড়তি উত্থাপ,
ধানিকটা তেজ, যেটাকে কোনো-এক ভাব্য-নির্গত
করে' দিতে না-পারলে সে বাঁচে না। পরীক্ষাত
পশ্চিম নয়, প্রেমের। কারণ, প্রেমই হচ্ছে স্ত্রীলাভ
কব্জার একমাত্র যোগ্যতা।

পূর্ব বন্ধন ভালোবাসে, সে বলে তাঁর প্রিয়াকে:
'তোমার মত চান কেউ আদর্শে আকাশ থেকে,
তোমার মত পরিচয় মেবো তারার আলো।' খেলো
লোকেরা এসব কথা উড়িয়ে দেই কবিতা বলে,
কিন্তু সেটাই যে তাঁর মনের সত্য। কিছু এসে
যায় না, চান আর তারারা যে তাঁর' নাসাদের
বাইরে; সে যে চায়, আকাশের চান মনে তার
জীব প্রিয়াকে খুঁজি কব্জার মত, এটাই হচ্ছে আসল
কথা। তাঁর মন যে ছুটেছে অদৃশ্যের পিছনে,
এটাই তার প্রেমের বাড়তি কব্জার পরিচয়। সে
ওনে নিজের মনে কেবলি বলে: 'কী করতে পারি

‘আমি এর ক্ষেত্রে, কী করে’ বোকাতে পারি, কত আমি ভালোবাসি একে, কোন্ ভীষণ চুপ নিতে পারি বুক ভরে’, গাভাতে পারি কোন্ জলর নৃত্যর সুধামুখি।’

মাতার ভালোবাসা গুরুত্বের মনে একটা পরিপূর্ণতা—তা’তো বেশি, একটা উপভাবন তা’কে ধরে রাখা যায় না; তা’ উদ্ভিত হ’লে গুঁঠে ধসেহসে, ভীষণ, হুত্ব সত্ত্বে নবকিশোরের মনের মধ্যে হঠাৎ জোশ-পাড় করে’ জেগে উঠে। কথা ‘মজরী, আমাকে গু’ বলে’ দাও, কী করতে হবে; বাঘের নব হিনিয়ে আনবে তোমার ক্ষেত্রে, লাগ দিয়ে পড়বে পাঁহাক থেকে, ক’ণ সেবা লস্বে; তোমার ক্ষেত্রে আমি হবো এমন যে, আমি পথ দিয়ে বেঁটে গেলে লোকে মাড়ুল তুলে বেধিয়ে দিয়ে বলবে “ঐ যে” তুমি গু’ একবার বলো।’ তাদের ক্রমে পড়ানো হ’তো ব্রাউনিং, একটা লাইন আটকে দিয়েছিলো নবকিশোরের মনে : ‘Merely an earth’s to cleave, a sea’s to part !’ তুমি কী চাও বলো, গু’ একটা পুঁথিবীই তো ছিঁড়তে হবে, একটা সমুদ্রই তো হুঁকাক করতে হবে। কিন্তু এমনি তা’র কপাল মজরী কিছুই চায় না, কোনো দরকারই তা’র নেই। সে মজরীর ক্ষত কিছুই করতে পারে না; মজরী তা’কে কোনো সুযোগই দেবে না তা’র পারের নীচে তা’র গ্রাণ বিধিই সেবার। কী অজ্ঞান! মজরী কোনো বিশেষ পদ্ধতি নেই যে সে উদ্ধার করবে; তা’র প্রতি কেউ কোনো অভয় করবে না যে সে দেবে প্রতিশোধ। কিছু দাও, তোমার ক্ষেত্রে কিছু করতে দাও আমাকে, তা’ না হ’লে—কার বে-বাতি বে।

একদিন নবকিশোর জিজ্ঞেস করল মজরীকে : ‘আম্মা, আমি কী হ’লে তুমি খুশি হও?’

‘কী হ’লে—বানো!’ মজরী প্রথমটার হুঁত্ব পেলে না।

‘বানো—লোকে তো কত ব্রকবের কাছ করে—এমন কোনো কাছ, ধরা, বা গুব মত—তুমি কি চাও

না আমি সে-রকম কিছু—’ মনের আঁধা প্রকাশ করতে নবকিশোরের বিস্তর বেগ পেতে হ’লো।

মজরীর চোখে হাসির কলসাদি খেলো’ পেলো। ‘কিশোর’, সমুদ্রের সে বদলে, ‘তুমি যা, তা-ই যে সব চেয়ে ভালো। তুমি তুমি ব’লেই তো তোমাকে ভালোবাসি।’

নবকিশোর অবিরতভাবে তার চুলের তিতর মাড়ুল ঢালিয়ে আরম্ভ করলে, ‘আম্মা, ধরা আমি যদি—’

‘কিন্তু, কিশোর’ মজরী বাধা দিয়ে বললে, ‘তোমার কিছু হওয়াই যে আমি চাইনে। কিছু হওয়া মানেই অস্ত-কিছু হওয়া। আমি চাই তুমি ~~কিছুই~~ থাকো।’

‘আমি যদি’, নবকিশোর প্রাণপণে তার চুলগুলো টানতে লাগলো, ‘আমি যদি উঠতে পারি হিমালয়ের চূড়ায়, তুমি খুশি হও না?’

মজরী সন্তীরভাবে বললে ‘সে সেবা হবে পরে ভেবে, সম্মতি তোমার চুলগুলো, এসো, ঠিক ক’রে দিই। ইস, কী ছিরি করেছো চুলের।’

নবকিশোর তবনকার মত চূপ ক’রে গেলো, কিন্তু তা’র মনের ছটফটানি শান্ত হ’লো না। কিছু তাকে করতেই হবে, কিছু তাকে হ’তেই হবে। এখন মজরীকে আর কিছু বলবে না: হঠাৎ একদিন সেবে তাক লাগিয়ে। হিমালয়ের চূড়ায় চক্ষা নিয়ে সে খানিকক্ষণ গভীর, জটনা করলে। সেবা সেলো, তাতে প্রায়কটিকাল্য অস্বস্থিবে অনেক। তার চেয়ে বরং...বরং—হঠাৎ যেন আকাশ থেকে মৈববায়ী হ’লো—তা’র চেয়ে সে বরং দেখে না কেন? কী লিখবে? যা তা’র খুশি, যা মজ্জা আসে, সে-সব ছাপাবে মাসিকপত্রে। সেই মুহুর্তে সেখাটা তার কাছে হিমালয়। নয় মজরী কি বাঘের নব উপড়ে আনবার চাইতে কোনোরকমেই ছোট কাছ মনে হ’লো না। বরং অনেক-বুড় কাছ, সত্যি বলতে মাল্লবের সব চেয়ে বড় কাছ। সে তা’র দলের মধ্যে একথা অনেকবার উচ্চারিত হ’তে শুনেছে যে মাল্লবের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে তা’র আট। আর সেখাটা অবিশিষ্ট একটা

আট। সে একজন আর্টিস্ট হ'তে যাচ্ছে, একথা ভাবতে তাঁর শরীর বোঝাফিত হ'তে উঠলো।

মৃত্যুর দ্বিধা হ'লো, নবকিশোর সাহিত্যিক হবে : আর বাংলাদেশে সাহিত্যিক হবার মত সোজা কিছুই নয়, যদি ওই বখেটে ডাকটিকিট খরচ কব্বার মত পরসা থাকে। আপনি একটা কবিতা লিখলেন— সেটা জানুবেন কোন্না-না-কোনো মাসিক পরে ছাপা হবেই, যদি প্যারিসে ছাপার আদায় ছোট হ'তে থাকে। সব ছাপানো তাঁর চেয়েও সোজা (কারণ বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত কম লোক পর লেখে), যদি তাঁর মস্ত প্রমাণ না নেবু। আর প্রবন্ধ তো পাঠালেই ছাপা হবে—ইংরিজি আর সংস্কৃত থেকে লম্বা-লম্বা কোটেশন থাকলেই হ'লে, আর ভ্রমণ-কাহিনী তো বেকোনো সম্পাদক লুকে নেবেন, যদি সবে থাকে ছবি। নবকিশোর প্রথমে কয়েকটি কবিতা লিখলে, বেঙ্গলো ছাপা হ'লো দশ হাজারের উপরে কাঁচিতি, এমন সব মাসিক পরে। তাঁর পরে পর : পর লেখার আধুনিক ধরনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিলো—এক ভীষণরকম আধুনিক, হলো মলাটের কীপাধ কাগজে বেকলো তাঁর পত্র তারপর অতুল গুপ্তর কাব্য-মিডাসা, ম্যাথু বার্নল্ড আর ল্যান্সেল অ্যাবারক্রবি বেঁটে সে মাঝালে 'কাব্য ও কীবন' সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ : সেটা বেশবিখ্যাত এক সাপ্তাহিকের সম্পাদক (প্রবাস, তিনি ভবানক কল্লু সমালোচক, তাঁকে 'বা' বারেন কল্লু, তা হচ্ছে অ্যাভারক্রবি নাম, যা তিনি আগে কখনো পোনেন নি) সাদরে গ্রহণ করলেন। ভ্রমণ-কাহিনী লেখার কথা নবকিশোরের মনে হ'লো না ; কারণ সে জানতো না যে, ভ্রমণ না করেও ভ্রমণ-কাহিনী লেখা যায়। মোট কথা, বেঙেনা-বেঙেনে তাঁর নাম পড়লো ছড়িয়ে, হ'লো আদায় তাঁকে নিয়ে কথা উঠতে লাগলো ; বোকা

সেলো, অন্নদিনের মধ্যেই সে হ'য়ে উঠবে দম্বরমত একজন 'খ্যাতনামা লেখক', নতুন-কোনো কাগজ বেরোলো লেখকবর্গের মধ্যে বিজ্ঞাপিত হবে তাঁর নাম। দলের মধ্যে সে ছোটখাটো একটি সিংহ হ'য়ে উঠলো—একটু শোবা, একটু বেশিরকম আদায়-চেতন সিংহ, বসিও। এতদিনে তাঁর ছুটলো একটা পরিচয়।

কিন্তু এতেই তৃপ্ত হ'য়ে সে চূপ করে' সেলো না। কারণ লেখা এমন একটা ব্যাপার, যা ভালো করে' আরও করতাই যা-একটু সময় বেশ, কিন্তু একবার আরও করে' কললে আর সহজে ধামানো যায় না। বাংলাদেশ মাসিকপত্রের সে স্রীতি করেই চললো, অস্বস্ত। যেমন আশা করা গিয়েছিলো, মজরী অতিকৃত হ'লো এতটা নবকিশোর নিজেও আশা করে নি। যা কিছু সে লিখতো, তাই পড়ে মজরী উঠতো উজ্জ্বল হ'য়ে : 'বা, কী চমৎকার লিখেছো—গাভলি, গাভলি।' এমন বুদ্ধির মিলি করে' বসতো ও-কথাটা, এমন দম্বর ভরীতে তাঁর ঠোঁট দাঁটি দুহুঁতের মত পরস্পরের সঙ্গে আদায় হ'য়ে যেন অনিচ্ছাসহে ঠেং খুলে যেতো যে নবকিশোর দুইচোখে তাকিয়ে থাকতো সেদিকে, কুলে যেতো কি নিয়ে হচ্ছিলো কথা।

একদিন ছু-তো এক পর বেরিয়েছে, মজরী ছ' হাতের দুতোর উঠর তাঁর হাত টেনে নিয়ে বললে, 'হুই, এত ভালো তুমি লিখতে পারো, আমাকেও কিছু-কথা আসে বলতে হয় না।'।

নবকিশোরের মূখ একটু লাল হ'য়ে উঠলো। তাঁর একবার মনে হ'লো, বলে, 'তা কি আমি নিজেই কিছুদিন আগে জানতুম।' কিন্তু ও-কথা যা ঠিক মানানসই হবে কি না, বুঝতে না পেরে চূপ করে' রইলো। মনে-মনে বললে : 'যেন বলতে চাইলেই তুমি দিওঁ।'।

'বলো', মজরী তার হাতের উপর একটু চাপ দিলে, 'কী করে' পারো তুমি এমন ভিতাইন সব জিনিস লিখতে।'।

এইবার নবকিশোর নূর হুসে' মজরীর দিকে তাকিয়ে মুচ্চকি হাসলো, 'বেন বলতে চায়, 'কেমন! তখন জে আমার কথা গারেই মাথা নি।' নূর বললে, 'তুমি যে পুসি হও পড়ে', তারই জন্তে আমি পুসি।'

'ও-কথা বোলো না। তুমি যেখানে লেখক, সেখানে আমি তোমার অনেক পাঠকের একজনমাত্র—তা ছাড়া আর কী? আমার একলার পুসি হওয়া নিয়ে তুমি কী করবে—তোমার লেখা সকলের।''

'কিন্তু আমি তোমার, তোমার। তোমারই জন্তে আমার সব লেখা।'

মজরী তা'র হৃ'হাতের মধ্যে নবকিশোরের একহাত টেনে নিয়ে একটু চাপ দিলে। 'এইবার একটা কবিতা পড়ে' শোনাত না।'

'কোনটা?'

'বেটা তোমার পুসি। বেটা তোমার ভালো লাগে।'

'আমার একটাও ভালো লাগে না।'

'কোনো মিনিস দিখে কে করে সম্পূর্ণ পুসি হ'তে পেরেছে?'

'আচ্ছা, গিটাই কি শুকলো এমন-কিছু ভালো?'

মজরী অভিমানের হুরে বলে, 'আচ্ছা, থাক্ তা হ'লে—না পড়লে।'

'কবে না পড়েছি, যহু?'

'আমি বলবান্নাও পড়বে না কেন?'

'—কী-এক মেয়ে!—আচ্ছা', নবকিশোর হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপর ছড়ো করা কাগজের খুণ থেকে একটা বেছে নিলে, 'শোনো জবে।'

'তীব্রভাবে ওনছি।'

হু'একবার গলা-খাঁকারি দিয়ে নবকিশোর একটু কাপা গলায় পড়তে আরম্ভ করলো। মাকে মাকে বদন চোখ তোলো, তাকায় লামনের মেঘালের দিকে। সৈবাং হু' একবার মজরীর সঙ্গে সঙ্গে চোখোচোখি হ'য়ে বাব, মজরী উজ্জল হেসে তা'কে উল্লাহ নেয়। বোঝেই প্রায় এইরকমের কথাবার্তা হয় হু'মনে।

ক্রমে এমন হ'লো যে, লেখাটাই হ'য়ে উঠলো আসল; যা'র উপলক্ষে, যা'র জন্তে লেখা, সেটা এলো জান হ'য়ে, সরে' যেতে লাগলো হুরে। নবকিশোরের লেখা তাদের হু'মনের মাঝখানে একটা আকর্ষক তীত আলোর মত—জা'তে পরস্পরের নূর আর ভালো করে' দেখা যাচ্ছে না। নবকিশোর অবিশ্রিত তা লক্ষ্য করলে না; আর মজরী যোগানে দীর্ঘবাস ফেললে।

৩

নবকিশোর বললে, 'মজরী, তুমি সাহিত্য বোঝো আকর্ষারকম ভালো।' আত্মবিক বিশ্বাস থেকেই বললে কথাটা; মজরীর নূরের কথা শুনে এক-এক সময় তা'র গিটা মর্মেই হ'তো যে পড়াছলো যদিও সে খুব বেশি করে নি, তা'র সম্বন্ধ রসজ্ঞান অত্যন্ত প্রবর। (কিন্তু-কিন্তু স্পষ্ট সিনক্রয়ার ক্ষর আইতম বুনিন পড়'বার পর মনের শোকসেরকে তা'র মনে হ'তে আরম্ভ হয়েছিলো অর্ধ-শিক্ষিত গোছের।)

মজরী বললে, 'বেশ কথা! ভালো মিনিস যদি ভালোবাসতেই না পারি, তা'কেই তো বলে পোড়াকপাল।'

'চাইলেই কি আর ভালোবাসা যায়! তা'র জন্তেও যে বিশেষ-একটা ক্ষমতার দরকার।'

'মানি বে। আমার তো মনে হয়, সেটাই সব চেয়ে সম্বন্ধ।'

'তোমার পক্ষে, মজরী, তোমার পক্ষে! তুমি অসাধারণ।' নবকিশোরের আঙুলগুলো আদিত্রভাবে সজরিত হ'তে লাগলো তা'র চুলের মধ্যে। 'আচ্ছা', একটু চুপ করে' থেকে সে বললে, 'তুমি মাকে-মাকে একটু-আধটু লেখ'বার চেষ্টা করলেই তো পারো।'

'পাশল!' মজরী হেসে উঠলো।

'কেন? পাশল কেন? আমার তো মনে হয়, তুমি বেশ ভালোই শিখতে পারবে।'

'তোমার লেখাই তো আমাদের হু'মনের।'

‘এইবার তুমি ঠিক বাঙালী মেয়ের মত কথা বললে।’

‘কিন্তু আমি যে বাঙালী মেয়েই, কিনোয়।’

‘না, শোনো’, নবকিশোরের এককল স্বরময় হৃদে বেড়াচ্ছিলো, এইবার রূপ করে’ বসে’ পড়লো আসন-শিঁড়ি হ’লে কার্পটের উপর, মজরীর পায়ের কাছে, ‘শোনো, একটা পর কি-কিছু তুমি দিখেই ভাবো না — একটা। আমার কথা। ছাপাবার ক্ষেত্রে তোমার ভাবতে হবে না — আমি পাঠিয়ে দেবো কোনো কাগজে।’

‘সত্যি?’ নরম দৃষ্টিতে নবকিশোরের মুখের উপর হুঁকে’ পড়ে’ মজরী বললে, ‘বলো কী! আমার লেখা ছাপবে কেউ!’

কথার বাঁক, হাঁদ লক্ষ্যে একবার অবস্থা তখন নবকিশোরের নয়। ‘ছাপবে না কেন?’ প্রচণ্ড উৎসাহে সে বলতে লাগলো, ‘সামান্য সম্মান জন্মের জানাশোনা আছে, আমি বললেই ছাপবে। তা ছাড়া’, নবকিশোর তাড়াহুড়ি নিম্নে গিয়ে নিলে, ‘তোমার লেখাও অবিস্তি ছাপবার মতই হবে। আমি একটু দেখে-টেকে দেবো — কেমনা ভাবনা নেই তোমার।’

মজরী তুচ্ছ ঠাকুরে বললে, ‘তা হ’লে তো কিছু লিখতেই হয়, দেখছি। এমন সুযোগ কি ছাড়া যায়।’

নবকিশোর একবারে ভেসে গেলো উৎসাহে। ‘হ্যাঁ, লেখো’, ঠাঁ করে’ সে স্বাবার ঠাকুরে পড়লো, ‘আমি ঠিক জানি, তোমার লেখা অনেকের চাইতেই ভালো হবে। ভাবো একবার, তোমার নাম ছড়িয়ে পড়ছে সবখানে — কী ভীষণ মহা —’

‘আন্তে, আন্তে’, মজরী চোখ দিয়ে স্রাম্যাময় নবকিশোরকে অঙ্গসরণ করে’ বললে, ‘সে-সব ভাববার চেয়ে সব পড়ে’ আছে এখনো।’

এর পর থেকে নবকিশোর কেড়ে নিলে মজরীর মনের খাঁটি : দেখা হ’লেই, ‘আন্ত করেছো?’ ‘বা :

কবে আর লিখবে?’ ‘বলো, আরই বসবে লিখতে!’ বেচারি মজরী — তার মনে কখনো হ’লে রয়েছে কত কথা, যা শুধু অস্তরককেই বলা যায় — কুরলংই পায় না সে-সব বলবার। না:, এ আর বেশিদিন চলতে দেয়া যায় না — মনে-মনে সে বললে।

নারী বাক্যে ভালোবেসেছে, তাকে খুশি করবার ক্ষমতা করেছে নানারকম কঠিন কাজ — আর এ তো সামান্য পর লেখা।

শেষের মজরী একদিন বললে, ‘দিখেছি।’ নবকিশোর লক্ষিত্রে উঠলো। ‘কই, বেশি। কী দিখেছো? কবে লিখবে?’ প্রশ্নগুলো টাল সাফাতে না পেরে একটার ছাড়ে আর-একটা বেহিয়ে এলো।

‘পর দিখেছি একটা। এই নাও।’ বলে’ মজরী একটা হাবির বইয়ের ভিতর থেকে বার করে’ দিলে একতাল্ডা কাগজ।

সেটা নিয়ে নবকিশোর বললে একটা চেয়ারে, পড়ে’ বসে লাগলো রুখাসে, তবু হ’লে। মজরী ততক্ষণ একটু দূরে বসে’ শাড়ীর আঁচলটা বার-বার জড়তে লাগলো আর খুঁতে লাগলো।

এক নিমিষে পড়া শেষ করে’ নবকিশোর গকেট থেকে কলম বার করে’ মুখ মুছলো। তারপর মজরীর দিকে তাকিয়ে বললে, ‘বেশ হয়েছে! দেখলে — আমি তো আগেই বলেছিলাম! বেশ হয়েছে। তবে ভাবটা হ’ এক লক্ষ্যময় একটু ঠাঁজ — তা ঠিক হ’লে বাবে আপনাই।’ তারপর একটু থেমে বললে, ‘লিখতে-লিখতেই ভাষা আসে।’

বেশ, অবিস্তি নবকিশোরের নিম্নের বেলায় এসেছিলো। আমকাল অনেক ছাপগাতেই সে প্রশ্নলো ওমুছে তার ভাবার। একথা বিশ্বাস করবার তার মখেই কারণ আছে যে ভাবটা তার আসে। সে এখন বলে, ‘লিখতে-লিখতে ভাষা আসে’ তখন সে কী বলছে, তা ভালো করে’ মনে-মনেই বলে।

মজরী কোনো কথা বললে না; চূপ করে’ তাকিয়ে রইলো মেঝের দিকে।

নবকিশোর দেখাটার এক মাছপায় আবার চোখ বুলিয়ে বললে, 'হুম্বর! মজরী, এবার আমার পালা অবাক হবার।'

মজরী বললে, 'মিদি কাস এক হুড়ি আওর পাঠিয়েছেন। তোমার অন্তে নিজে আসছি করেকটা।' বলে উঠে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

পরদিনই নবকিশোর 'জিন্নোতা' কাগজে পাঠিয়ে দিলে মজরীর পত্র: লস্কে তাঁর নিম্নেরও একটা পত্র দিয়ে দিলে—মজরীরই ভালোর জন্তে। আর-কিছুর জন্তে না। হোব্—তাঁর পেবার সম্বন্ধে হুম্বর-তো মজরীরটাও চলে' যেতে পারে।

খাসমহরে জবাব এলো সম্পাদকের:

'সবির নিবেশন,

আপনার প্রেরিত দু'টি পত্রই আমরা পেয়েছি।

ঐশুভা মজরী ঘেরীর পত্রটির জন্ত আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। দেখাট আমাদের খুব ভালো দেখেছে—সামনের কথাতেই সিদ্ধি। আপনার হাতে যদি তাঁর অন্ত-কোনো পত্র থাকে, দয়া করে' পাঠালে বাধিত হবো।

নমস্কার ইতি।'

৪

ভূরিকম্পের সোফার অনেকক্ষণ ধরে' খামকা ওয়ে ওয়ে মজরী ভাবছিলো যে দিনগুলো হঠাৎ এতই লম্বা হয়ে গেলো যে বিকেলের চারের সময় আর আসতেই চার না? ভাব-ভাব-ভাব-ভাব তার চোখ জড়িয়ে আসছিলো, এমন সময় দরজার—খুটখুট।

ধড়মড় করে' মজরী উঠে বসলো। বললে 'এলো।'

নবকিশোর ঘরে ঢুকে কোনো জুনিবা না করে' পকেট থেকে একটা চিঠি বা'র করে হুঁড়ে ফেললে মজরীর কোলের উপর; বললে, 'পড়ো।'

মজরী পড়লো। পড়ে' খুব ভুলে জাকালো নবকিশোরের দিকে।

নবকিশোর হেসে বললে, 'আর কী! হ'য়ে গেলো

তোমার।' অথচ তখন তো আমাকে চেপেই উড়িয়ে নিয়েছিলো।'

নবকিশোরের কণ্ঠস্বরেই কিছু ছিলো, মজরীর বা'তে চমক লাগলো। সে ভালো করে' জাকালে তাঁর মুখে; আর-কিছুর পড়ে' ফেন্সে চিঠিটা। তারপর জিজ্ঞাসা করলো, 'জুটো পত্রের কথা মিথ'ই—দার-একটা তোমার দুকি?'

নবকিশোর ঢোক দিলে বললে, 'হ্যাঁ, আমিও একটা পাঠিয়েছিলাম সবে।'

মজরীর চোখ-মুখ হেসে উঠলো, 'ও, জাই। তাই আমার এত ব্যস্তির।'

সে-কথা বিবাস করবার জন্তে নবকিশোর প্রাণপণ চেষ্টা করছিলো। কিন্তু আমরা যা বিবাস করতে ভালোবাসি, মুখে তা'ইই-প্রতিবাদ করতে ভালোবাসি। জাই সে বললে, 'তা কেন? এমনিও তো তোমারটা বেশ ভালোই হ'য়েছিলো।'

'হাই হ'য়েছিলো। যে-লেখা সত্যি ভালো, তা'র সম্বন্ধে কি কোনো সম্পাদক অমন করে' বলে? সেটাকে এমনিতেই যেনে নেহ—যেমন, জাখো, তোমার পত্র সম্বন্ধে সম্পাদক চুপ। তোমার পত্রের খুব জুটে প্রকাশ্য করলেই যে তাকে খাটো করা হ'তো। আর আমার লেখা কিনা কাঁচা, বোকাই দার যে আনাজি হাত—জাই আমাকে উল্লাহ দিয়ে লিখেছে হ'লাইন।'

'ভারি তো সে বোঝে লেখার ভালোমন্দ। সবলেই জানে যে 'জিন্নোতা'র সম্পাদক একটা ইজিরটা।'

'আমিও,' মজরী জাকাজাকি বললে, 'আমিও তা'ই অবাক হছিলাম ভেবে, আমার লেখা কী করে' এ'রা পছন্দ করলেন।'

'কী করে' আবার! মেখেছে ঘেঁরের নাহ, আর কি কোনো কথা আছে।' এক অসাবধান মুহূর্তে নবকিশোর ভুলে' গেলো, এর আগে বা-কিছু সে বলেছিলো।

একই সময়, মজরী ভীতমুণ্ডিতে দেখে নিলে

নবকিশোরের মূখ; তারপর হঠাৎ হেসে উঠে বললে,
'বাস্তবিক, তোমরা পুরুষরা। যে সব ব্যাপারেই মেয়েদের
সঙ্গে এমন ব্যবহার করো, যেন তাঁরা শিশু—এটা
দৃষ্টবশত অ্যাগ্যালায়ান।'

চাঁচা অনেকটা চুপচাপ সোজা হ'লো; বড়ী অনেকবার চোঁকা করলে কথাই শব্দ ধরিয়ে দিতে, কিন্তু একটু দূর এগিয়েই তা' কী-বকম বেন হারিয়ে গেলো; স্নোও বইলো না।

চালের পরে সম্রাটী বল্লে, 'আজ বুড়ি
ডব্-শো হচ্ছে বল্‌স্টোন পার্কে। যাবে, কিনো,
সেখতে ?'

নবকিশোর ছাড় নেড়ে বললে, 'কী হবে ওখানে
সিঁরে ?'

‘কুমি কুমি ভালোবাসো না’
‘কুমি আমি চ’চকে দেখতে পারি নে’

মজরা দীর্ঘকাল টেনে বললে, 'খাচ্ তা' হ'লে।' একটু পরে আবার বললে, 'জবে চলো মাননীয়ে' একবার বেধে আসি। কানকে ও টেনেফান করে' বলছিলেন—'

‘মানসী কে ?’
‘মানসী—আমাদের মন ন মনী—’

‘ও, ইং’ সবকিছোর অন্তর নজির হ’বে পড়লো,
‘অনেকদিন মানসীকে দেখি নে। কেমন আছে ও?’

‘জলো না ওর বাড়ি থেকে একটু দূরে আমি।’
‘আম-একদিন। আম থাক। আম ইচ্ছে’ করছে

নৱী

হ'লে বললে, 'তুমিই বলো, তা হ'লে, কী করবো।
সেই পর্যায়ে কি সিনেমাতোই থাকবে।'

একটু উল্লেখ 'করে' নবকিশোর বসুজ, 'আমার
মদীমটো খাওয়া ফালো লাগছে না।'

‘କୌ ହସତେ ?’ ସହସୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ ଆମକ
ପ୍ରତି କୌଣସି ।

‘মাথাটা জ্ঞানক ধরেছে বলে’ মনে হচ্ছে।’

‘ও-ডি-কলোঁ! এনে দেবো? না, গাড়ি নিয়ে
খানিকটা বেড়াবে মন্থনানে? কী বলে?’

‘আমার মনে হচ্ছে,’ কীকরের নবকিশোর বললে,
‘বাড়ি দিয়ে চুপচাপ একটু গুরে থাকলেই ছেড়ে
দাবে।’

তা'-ই করো, তা হ'লে, তা'-ই করো। এখুনি বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ো। মাথা-বরা থেকে সাম্প্রতিক সব অল্প হ'তে পারে — একে অবহেলা করা কোনোরকমেই উচিত নয়।'

নবকিশোর টলু-টলু বেরিয়ে সেলো খর থেকে। আর মজরীর মনের উপর নামলো একটা ছায়া।

④

ক্রিঃ-ক্রিঃ — টেলিফোন বেজে উঠলো।

চল্লা—এতকবে বা-হোক, আদরা তা'কে কাজে
লাগাতে পাক্‌নর—চল্লা ঘরের মেয়ের বাজর বিছিয়ে
সেতার নিরে টুটায় বসেছিলো, বলে' উঠলো, 'ইস,
কামালো !'

টেনিসকোন বল্লে, 'ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং।'

‘আসুছি রে বাপু, আসুছি।’ সেতার বেধে দিয়ে
চল্যা উঠে গাড়ালো। দাদাকে সত্যের আসুই বাড়ি
কিনতে দেখে — আর তাও শুধু কয় মূখের ছিঁচ
করে’—সে টেলিফোন বাজবার একরকম অপেক্ষা
করেই ছিলো। ‘এ যদি সম্ভবী না হয়, তা হ’লে
পাঁচ মিনিট পরেই সম্ভবী ভাববে’, নিজের মনে সে
বলতো। চল্যা এবার বোলোয় পড়েছে, এক সে
বুড়িহুঁড়ি রাখে

‘की शब्द, शब्दी ?’
‘की कत्त’ सुनि ?’

‘এই তো বন্ধা । কী খবর, বলো ।’
‘কেমন আছিস তুই ।’

‘जैसे बज रहे हैं’

‘জাখ্, চম্পা, আর বয়েসে তুই বড় বেশি কাকিল হ’রে উঠেছিলি।’

‘খাখ্ তবে কাকিলেনি। তুমি যা ওলুত চাও, বলছি। দাদা বাড়ি ফিরেই তার ঘরে চুকে চিংগাং হ’রে গয়ে পড়েছেন।’

‘ওয়ে পড়েছে—মতিয়া?’

‘অম্মমানে বলছি। বলো তো বেখে আসতে পারি।’

‘লম্বী, তুই একবার ওকে ডেকে যে না।’

‘তা মিছি; কিন্তু কী হয়েছে, তা আগে বলো।’

‘ওকে বল্ যে, ভয়ানক দরকারী একটা কথা আছে।’

‘তা তো বুঝতেই পারছি। কগড়াটা কী নিয়ে, আনতে পারি নে।’

‘নাঃ, বড় বড় বেড়েছিল তুই।’

‘তানা—না—’ চম্পা টেলিফোনের চোঙের তিতির একটুখানি শুকনু করে উঠলো।

‘শোন্ কথা। ওকে একটু বল্ না—’

‘এই বাছি। আমাকে একটা কমিশন দেয়া উচিত তোমাদের। এখন তো বল্বেই, হ্যাঁ, দেবো, কিন্তু সত্যি-মতিয়া এখন—’

তারের ওপার থেকে একটা অমোঘ হচক শব্দ এলো।

‘বাছি, বাছি, বাছি। জালা হয়েছে তোমাদের নিয়ে। ধরে’ খেঁচো একটুখানি।’ নবকিশোরের ঘরের মোরগোস্তায় ঝড়িয়ে চম্পা বললে, ‘টেলিফোনে মজরী।’ নবকিশোর একটা চেয়ারে বসে’ ছিলো; বসে’ই রইলো নিশ্চল।

চম্পা আবার বললে, ‘দাদা, টেলিফোনে মজরী তোমাকে ডাকছে।’

নবকিশোর আতে আতে উঠে পাড়ালো; বললে, ‘বাছি, তুই বা।’

চম্পা চল’ সেলো ছাতে; পড়ে’ রইলো তার সেতার। আসেই বসেছি, চম্পার বৃত্তিহুঁচি ছিলো।

‘হঠাৎ।’

‘তোমার মাথা-বগা কেমন আছে?’

‘বদ্ব্ বারাপ হ’তে হয়।’

‘ভগবীর হুঁপিত তোমাকে-বিরক্ত করছি বলে।’

কিন্তু, একটা কথা তোমাকে বলা নিজাত দরকার; বলি-বলি করে’ও তখন বলে’ উঠতে পারি নি।’

‘কী কথা, বলো।’

‘জাখো, তোমার কাছে আমার একটা কন্সকেশন করবার আছে।’

‘কন্সকেশন?’

‘আমি ভয়ানক একটা অস্ত্রার করে’ ফেলছি, তোমাকে বল্বে তা।’ কিন্তু আগে তুমি বলো, আমার উপর রাস করবে না, কমা করবে আমাকে?’

‘তুমি কী বল্ছো, কিছুই বুঝতে পারছি নে।’

‘আমি তোমার সঙ্গে একটা বিনী প্রস্তারনা করেছি।’

‘আরো বেশি শুদির দাচ্ছে।’

‘বলছি: কিন্তু—তুমি রাস করবে না তো? তোমাকে পুলি করবার দ্বয়েই আমি ও-কাজ করেছিলাম।’

‘বলোই না কী।’

‘শোনো আমি তোমাকে বে-গজটা দিয়েছিলাম, সেটা আমার লেখা নয়।’

‘তার মানে? ওটা কা’র লেখা তা হলে?’

‘জায়েন্তরদ্বন্দ্বর চট্টোপাধ্যায়ের।’

‘সে আবার কে?’

‘জানি নে। অনেক পুরোনো সব মাসিকপত্র জুটে তা’কে পেয়েছিলাম।’

‘তা হলে তুমি—’

‘হ্যাঁ, পচিশ বছর আসেকারু’জকখও ‘নব্যভারত’

থেকে—আমি শুধু নিধের হাতে ইচ্ছা নিয়েছিলাম, তুমি অত করে’ বসেছিলে বলেই, তোমাকে পুলি করবার দ্বয়েই—কী করবো বলো, গল্প লেখা কী আমার কাজ! ভেবেছিলাম কী আর হবে, কেউ

তো আর গতি-গতি ছাপতে থাকে না—হ'নি
পরে ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেল দেবো। মাঝখান থেকে
তোমার যদি একটু ভালো লাগে—মজা কী? কিন্তু
এখন ভালো বিশেষভাবেই পড়েছে। তুমি তোমার
সম্পাদককে একটু বলি দিও, ওপর বেন না ছাপে।
কালই—বুঝলে?—এককম হবে জানলে কি আমি
কখনো—'

নবকিশোর এতক্ষণ তরু হ'য়ে গুঁহিলো; হঠাৎ
প্রায় চীৎকার করে' বলে উঠলো 'আমি আসছি,
এখন আসছি।'

বলেই খটা: করে' টেলিফোন রেখে দিলে চুপচাপ
করে' দাঁড়িয়ে সেমে মুহূর্তের মধ্যে বেরিয়ে এলো
হাতের কারিশি ভর দিল চম্পা বেঞ্চে,
তা'র দাদা 'হাই-হাই করে' পা কেসে চলে' থাকে।
মনে-মনে সে হাসলো; গুণ্ডন কলসে একটুখানি—
চম্পার সুরে এই-ই আমাদের শব্দ দেবা।

৩

পরিচয় আকাশে মত একটা রূপের ডিমের
মত একাদশীর চাঁদ মজরীর বাগানে আলো আর
ছায়ার খেলা। নবকিশোরকে আসতে দেখে মজরী
বাসের উপর দিলে কয়েক পা এগিয়ে এলো।

'কী, তোমার মজা-বজা ছাড়লো।

'অর ছেড়ে গেছে, বলতে পারো।'

হ'লেন হ'লনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো;
কোনো কথা বললে না। মজরীর হাতের কাছে
ছিলো একটা বেগুনলের গাছ; নীচু হ'য়ে তা'র
একটা পাতা তুলে এনে সে লোকে ছিঁড়তে লাগলো
কুচি-কুচি করে'।

খানিক পরে নবকিশোরের বললে, 'মজরী, কেন
তুমি আমাকে ওমিখোটা বলতে দেখে।'

'কেননা আমি জানতুম যে, তুমি বুঝতে পারবে ওটা
খিখো। আর কী উপায় ছিলো তোমাকে জানাবার।'
তারপর আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। আকাশ
কেটে পড়ছে চাদের রূপালি আভাষ। হ'লেন
পায়চারি করতে লাগলো বাগান ভরে', এলোমেলো।
তারপর হঠাৎ নবকিশোর থেকে খেলো।

'কী?'

'মজরী, আমি মনে-মনে একটা গল্প করছি,
তোমাকে বলি।'

মজরীর কালো চোখে প্রশ্ন খসে' উঠলো।

'লোখা আমি ছেড়ে দেবো।'

একটু চুপ করে' থেকে মজরী বললে, 'ভালোই
করবে। ও-সব ব্যাপারে আমাদের কী কাজ?'

'আমি যা কিছু করতে চেয়েছিলাম তা' তো
তোমারই মজা, তোমারই মজা। কিন্তু সেই কালের
নীচে তুমি থাকিলে চাপা পড়ে'। আর এমন
কোনো মিনিদ যদি থাকে, যাতে গতি-গতি কিছু
এসে যায়—সে তো তুমি, তুমি।'

মুহূর্তের মত মজরীর চোখ উঠলো হুলু
করে'; সে অতদিকে হুঁ ফিরিয়ে নিলে।

'একটা কথা বলি, কিছু মনে কোরো না।
তুমি যদি দেখো, তা হ'লেই ভালো হয় সব চেয়ে।
তুমি যে গতি—লিখতে পারো।'

মজরী নবকিশোরের দিকে তুললো তা'র গভীর
কালো চোখ, এইমাত্র হুলুদিয়ে উঠে যা' আতো
বেশি উজ্জল হয়েছে। বললে, 'খান, কাজ নেই
আমাদের ও-সবে। আমরা কেন চাইবো কোন চিহ্ন,
যা দিয়ে লোকে আমাদের চিনবে? তুমি যে তুমি,
আর আমি যে আমি, এই চের। তুমি আর আমি
যে আছি, এই সব চেয়ে বড় কথা। তুমি আর
আমি আছি—অন্ত-কেউ লিখুক আমাদের গল্প।'

জিহ্মপিন্ধেন্ন সাধী

শ্রীহেমেন্দ্র লাল রায়

নদীর বুকে তারি আমার ধ্বল যখন পাড়ি,
আকাশ তখন নীল ছিল গো রৌদ্র ছিল ভারি।
বাতাস লেগে বুক-ফুলিয়ে দাড়িয়েছিল পাল,
স্রোতের ধারা বুনতেছিল ফাঁকা স্ফোর জাল।
শঙ্কাবিহীন মাঝি ব'লে ছিলাম নায়ের মাথে,
হৃদয়-ভরা গর্ব ছিল শক্তি ছিল হাতে।

হঠাৎ ঝড়ো কোণের দিকে একটু হ'লো মেঘ,
নদীর বুকে হাওয়ায় একটু বেড়ে উঠল বেগ।
বাদামখানি সেই বাতাসে উঠল আরো ফুলি',
উচ্চ হ'য়ে উঠল আরো তুচ্ছ লহরগুলি।
অপ্ধে ছিলাম ময় হ'য়ে—পারের দিকে রোখ',
কাল ব'শেষীর ঝড়ের পানে তাই পড়িনি চোখ'।

কাল ব'শেষীর রুদ্ধ দোলা—হঠাৎ দেখি চেয়ে
নটরাজের প্রলয় নাচে আকাশ গেছে ছেয়ে।
ধূমকেতুরি পুচ্ছ নেড়ে আসছে নেমে ঝড়,
মেঘের মাদল বাজিয়ে হাঁকে ছরস্র অশ্বর।
পাহাড় গ'ড়ে ঢেউয়ের পাথার উঠছে ফিকে ফিকে,
ধূ ধূ ধূ অথই বারি গর্জে চতুর্দিকে।

ছিন্ন আমার পালের দড়ি, হুর্ণ আমার হাল,
 তরি আমার ঘুরছে যেন অশান্ত মাতাল।
 কানের কাছে কে যার গেয়ে ঘুম-পাড়ানোর গান,
 মূর্ছা-ঘেরা তন্দ্রা তলে এলিয়ে পড়ে প্রাণ।
 চেউয়ের কোলে দেখছি আমার শয্যা আছে পাতা,
 মাথার পরে হাসছে হাসি নিশ্চয় বিধাতা।

ওরে আমার ভাস্কর্য্য তরি, চির দিনের সাথী,
 হৃদয়ের দিনে আমার সাথেই গোঙালি দিন-রাতি।
 দুর্ভেদ্য দিনে চোখে কেন জাগাষ্ট ভরের রেখা,
 এক বুকেতেই তোমার আমার স্থান যে আছে লেখা।
 হৃদয় ভরা ধন-ধরানি থামা রে তোমার থামা,
 আমার বোঝা নামবে যেখার, তোমারও বোঝা নামা।



বুদ্ধিদোদর মৌলোজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ণাহুতি)

কিছু কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা পিট্টলীর যত্নে নহ। হুগুরে খাওয়া-দাওয়ার পরেই সে উপরে উঠিয়া গেল। তাবিয়াছিল, সেবু হরত উপরেই আছে, কিন্তু দিয়া সেবিল, সেবু নাই, মেঝের উপর অস্ত্রবিন যেমন শুইয়া থাকে সেদিনও মাসি ঠিক তেমনি করিয়াই একা শুইয়া আছে।

পিট্টলী ঘরে ঢুকিতেই মাসি জিজ্ঞাসা করিল, 'সেবু কোথায়?'

ষাড় নাড়িয়া পিট্টলী বলিল, 'জানি না ত!'

আর-কিছু না বলিয়া মাসি চুপ করিয়া রহিল।

পিট্টলী ঘরে ঘরে তাহার কাছে দিয়া বলিল। তাবিয়াছিল, দকালের অর্ধদমাণ কাহিনীটা সে তাহাকে শেষ করিতে বলিবে, কিন্তু অনেকক্ষণ বলিয়া থাকিয়াও সেবিল বধন মাসি তাহাকে কোনও কথাই বলে না, তখন সে তাহার পায়ে হাত দিয়া ডাকিল, 'সুন্দোলে নাকি?'

মাসি বলিল, 'না।'

পিট্টলী বলিল, 'সেই যে সেই রাজ্যের ছেলে তারপরে কি করলে বল সেবি?'

মাসি বলিল, 'কি করলে তা'ত জানিনে, মা!'

'আজ্ঞেহান। কাহিনী শুনে নেই। সবটা না শুনে কি হয় জানো ত?'

'কি হয়?'

পিট্টলী বলিল, 'একটা জোখ কানা হ'বে ষাড়, আর একটা পায়ে সোদ হয়।'

মাসি হাসিয়া বলিল, 'এতও ভুই জানিন্ মা! এত কথা ভুই শিখনি কোথায়, পিট্টলী?'

পিট্টলী বলিল, 'আমাদের গুপাহার—সেই যেহান থেকে আমরা উঠে এলাম সে,—সেইহানকার সেই পাকলকে জানো ত?'

কে তাহার পাকল কে জানে। মাসি তবু হাসিয়া বলিল, 'খুব জানি।'

হাত নাড়িয়া জোখ বুয়াইয়া পিট্টলী বলিল, 'সেই পাকলের কাছে শিখেছি। তুমি শিখবে?'

মাসি আবার হাসিল। বলিল, 'না মা, আমার আর এ-বয়েসে কিছু শিখে কাজ নেই। তুমি শিখলেই চলবে।'

এই বলিয়া একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া মাসি বলিল, 'সেতুক জেক আমো ত মা।'

পিট্টলী উঠিয়া ঠাড়াইল। বলিল, 'কিন্তু তুমি বেন ঘুমিয়ে পড়া না। এসে আমি কাহিনীটা বলব, তোমায় শুনেত হবে।'

বলিয়া পিট্টলী নীচে নামিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরেই কিরিয়্য আসিয়া বলিল, 'ও সে ও সেহর মা, সেবু তোমার এলো না বাপু।'

মাসি জিজ্ঞাসা করিল, 'কি বললে?'

'তার বোমার কাছে শুয়ে রইলো।' বললে, 'আমি যাব না।'

মাসি মাত্র 'হ' বলিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস কেদিয়া চুপ করিয়া রহিল।

পিটলী আবার বীরে-বীরে তাহার কাছে গিয়া বসিল। বসিল, 'না আহুক সে।'

মাসি তবু কোনও কথা বসিল না। মুখ ভারি করিয়া সে চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। রাক্ষস হেদের গরটাও বোধ হয় তাহার গুনিবার ইচ্ছা নাই।

পিটলী বসিল, 'তুমি কুমাবে, না দেবু মা? পারে তোমার হাত বুদিয়ে দেবো?'

মাসি বসিল, 'না মা, তুমি এখন যাও। আবার সেই বিকেলে এসো।'

পিটলী কিন্তু তখন তাহার পারে হাত ক্লাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

এক ক্যাসামে পড়েছিলাম, আবার তোমার নিয়ে গিয়ে আবার বিনশ কেন? তোমার মাকে বাবাকে একবার কিসোসু কোরো।'

'বেশ।' বলিয়া ষাড় নাড়িয়া পিটলী চলিয়া গেল।

বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছে। মাসি এই সময় একবার ঘরে কাঁটা দিয়া ঘর-সোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া লয়, তাহার পর বেড়াইতে বাহির হয়। কিন্তু সেদিন তাহার কি যে হইল কে জানে, কাঁটা শইয়া ঘর পরিষ্কার করিতে তাহার আর মন সরিল না, ঘর-সোর তেমন অপরিস্রব হইয়াই রহিল, বারান্দার রেসিং-এর পারে ভর দিয়া পাড়াইয়া পাড়াইয়া গুলিতে লাগিল—নীচের ঘরে সেবু বোধ হয় তাহার মা'র সঙ্গে গর করিতেছে। হেলোটাকে অনেকক্ষণ দেখে নাই, একবার ইচ্ছা করিল তাহাকে ডাকে, কিন্তু না ডাকিতে আপন। হইতেই যে আসিয়া পাঁড়ার, বারংবার ডাকা সঙ্গেও আশ সে একটিনারের দরও আসিল না—ইয়ারাই হরত অভিমানে হ' চোখ ভরিয়া তাহার দল আসিল।

যে-যে কেন এ রকম করিল, কেন যে সে মাসির কাছে গেল-না, মাসি তাহার হেডুটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া তাহার মা-বাপের উপরেই ঘোষটা চাপাইয়া দিল। তাবিল বুঝি আর-একটা ভাড়াটে আনার দর রাখ করিয়া তাহার বাবা হরত তাহাকে নিবেশ করিয়াছে। কিন্তু আসলে তাহা সত্য নয়। বীরেনও নিবেশ করে নাই, নারায়ণীও নিবেশ করে নাই। সেবুর ধারণা—তাহার একাধিপত্যে বাবা পড়িয়াছে। প্রথম প্রথম পিটলীকে সে সহজে উপরে উঠিতে দিত না, মাসির সঙ্গে গর করিলেই টানিয়া সে তাহাকে অস্ত্র লইয়া বাইত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন সেবিল পিটলীই দরী হইয়াছে, মাসি তাহাকে অনেক সময়

মাসি কখন বুঝাইয়া পড়িয়াছিল জানিতে পারে নাই। বুদ্ধ ভাবিতেই যেণি, তাহার পারে হাত ক্লাইতে ক্লাইতে পারের উপর তাহার সেই কটি আঁড়খানি রহিয়া পিটলীও বুঝাইয়া পড়িয়াছে।

হা ভগবান! তাহার বুকু বকিত মাতৃদয় ইয়ারের ভালবাসিয়া একটুখানি শক্তিলাত করে, অথচ বুঝাই ভালবাসা। পর কখনও আপন হয় না। তবু সে ভ্রাসবাসিতে চায়। পিটলীর হাতখানি তাহার পু হইতে বীরে-বীরে সরাইয়া দিয়া মাসি উঠিয়া বসিয়া, কিন্তু খাটের উপর হইতে সেবুর ছোট বাসিন্দা আনিয়া পিটলীর মাথার নীচে ধরিয়া দিতেই সে মাসিগা উঠিল। ঝড়ঝড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বসিল, 'মাসিও বুদিয়ে পড়েছিলাম।'

মাসি বসিল, 'বেশ ত। কুমাবও তুমি। উঠছে কেন হ'।

পিটলী কহিল, 'না, আর চললাম। কাল সকালে তোমার সঙ্গে গুলি গলাচান করতে যাব। নিয়ে যাবে ত?'

মাসি বসিল, 'না মা, ভই একজনকে নিয়ে গিয়ে

নিম্নে তাঁকিয়া কাছে বসায়, বসাইয়া পর বসিতে বসে, বসন-তবন হার তার কাছে তার প্রকাশ্য করিতে থাকে তখন আর সে বাণ ন। করিয়া পারে নাই, অভিমান করিয়া নিজেই সরিয়া গাড়াইয়াছে।

পরদিন সকালে গম্বায় বাইবার জন্ত মাসি নীচে নামিয়া আসিতেই শিষ্টলী বহিয়া বসিল—সে তাহার সঙ্গে বাইবে।

মাসি বলিল, 'না মা, চন্দ্র তোর বাপ-মাকে আসে মিসেস্ ক'রে আসি।'

মাধব তখন বসিয়া বসিয়া চা খাইতেছে, আর বীণা ধোষ করি ঘরের কাছকর্ষ লইয়া ব্যস্ত। মাসি দরজার কাছে গিয়া গাড়াইতেই হাসিতে হাসিতে বীণা তাহার মাথার কাপড়টা একটুখানি টানিয়া দিয়া বলিল, 'আহ্নন মা, আহ্নন—তেতরে আহ্নন।'

মাসি বলিল, 'না মা, তেতরে বাব না। আমি গলা নাইতে যাহ্মি, যেহে তোমার ধ'রে বধেহে, আমার সঙ্গে বাবে। নিরে দাব কিনা, তাই মিসেস্ করতে এসাম।'

মাধব বলিল, 'বাক্ না। তার আবার মিসেস্ করবেন কি!'

বীণা বলিল, 'আগনি ছেলেগুলো বড় ভালবাসেন, না মা?'

মাসি তাহার ঠোঁটের ঝাঁকে রান একটুখানি হাসিল মাত।

চা খাইতে খাইতে দুখ তুলিয়া মাধব একবার চুঁ করিয়া তাহার ব্রীর দিকে আর একবার মাসির দিকে তাকাইয়া লইয়া বলিল, 'কিন্তু ব'কে ব'কে ধীনে ও আপনার অর্জিত ক'রে যেনে মা।'

মাসি বলিল, 'না বাবা, ও তোমার বেশ ভাল মেয়ে। আমার ত' বাবা বড় ভাল লাসে।'

মাধব আর-একবার তাহার ব্রীর দিকে তাকাইল। চোখে চোখে রেখা হইতেই বীণা হাসিয়া বলিল, 'তা' বেশ ও, প্রব আপনি রাখুন তা হ'লে আপনার কাছে।'

মাধব বলিল, 'আগনার কাছকর্ষ ক'রে সেহে, শেধায় করবে, ভালট ত।'

মাসি হাসিয়া বলিল, 'মেয়ে ব'লেই তাই দিতে চাচ্ছ বাবা, কস্তাদার থেকে বাচবে তা হ'লে, কিন্তু ছেলে হ'লে দিতে চাইতে না।'

এই বলিয়া মাধব গাড়াইয়া মাসি একবার ওদিকে নারায়ণীর ঘরটার দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, 'ওই জাণো না বাবা! ছেলেটা আমার কাছে থাকতে ভালবাসে, তাও দিনে দশবার ক'রে বারণ ক'রে বেগুয়া হয়।'

মাধব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বীণা বলিল, 'না মা, বারণ আমরা করব না।'

মাসির এদিকে দেবী হইয়া বাইতেছিল। বতই বেলা বাড়ি রৌদ্রের তেজ ততই বেশি হয়, আঙ্গুর উপর ছোট ওই বেলেটাকে সঙ্গে লইয়া বাইতে হইল। আসিবার সময় হস্ত একটা রিক্সা তাড়া করিতে হইবে।

মাসি বলিল, 'আমার আর গাড়াবার অবসর নেই। না, আমি চললাম।'

বহিয়া সে শিষ্টলীর হাতে বহিয়া বর হইতে বাহির হইয়া পেল।

বাহির হইয়া সেবিল, নারায়ণীর ঘরের দরজার গাড়াইয়া সেহু তাহারের দিকে একমুঠে তাকাইয়া আছে। মাসি বেশ ঘোরে ঘোরেই বোঝকরি তাহাড়া বাবা-মাকে ওনাইয়া ওনাইয়াই বলিল, 'তোমাকে ও আর নিরে বাবার জো নেই বাবা, নইলে কেনুন হ'ত, হ'লেনে একটা রিক্সা গাড়ী ক'রে বেজ্ঞ আর আসতে। তা' অমন ক'রে চোখ হুল-হুল ক'রে থাকিরে দেখলে আর কি হবে বল।'

বলিতে বলিতে শিষ্টলীকে লইয়া মাসি বেই পিছন ফিরিয়াছে, সেহু একবারে হাসিয়া আসুন হইয়া গিয়া কি করিবে বুজিতে না পারিল—এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল। সেবিল বাবা তাহার চা খাইয়া খানি পেয়ালাটা দরজার চৌকাঠের কাছে

নামাইয়া রাখিয়াছে। সেই পেয়ালাটা সে তুলিয়া লইয়া পিষ্টলীর দিকে ছুঁড়িয়া মারিল। কিন্তু মক্কা হইল এই যে, পেয়ালাটা পিষ্টলীর গারে না লাগিয়া লাগিল দিয়া মাসির মাথা। পেয়ালাটা মাটিতে পড়িয়া ভাঙিয়া গেল এবং বরণার অধির হইয়া মাসি তৎক্ষণাৎ কিরিয়া আসিয়া দেখুক টপ করিয়া ধরিয়া ফেলিল। হাতটা ছাড়াইবার জন্য সেবু প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাে অভিমানে দুই মাসির পা হইতে মাথা পর্যন্ত তখন থু থু করিয়া কাঁপিতেছে। সন্ধ্যারে সেবুর কান হগিয়া দিয়া মাথার ঠান্ ঠান্ করিয়া হই চক্ মারিয়া মাসি চীৎকার করিয়া উঠিল, 'কে তোকে এসব দেখালে বল বলছি, নইলে তোর মা বাবা অগ্নি কারও কথা গুনব না, ঘেরে তোকে আমি ধরু' ক'রে ফেলব।'

সেবুও চীৎকার করিয়া কানিতে শুরু করিল, মাসিও চীৎকার করিতে লাগিল, এবং ইহাদের এই কোলাহল শুনিয়া নারায়ণী ছুটিয়া আসিল, বীরেন আসিল, শুধিক হইতে খীণা ও মাথব দরবার আসিয়া ধাঁড়াইল, এবং এই সবের মাঝখানে পিষ্টলী একবারে অগ্নি হইয়া দিয়া ধাঁ করিয়া ধাঁড়াইয়া বহিল।

সন্ধ্যাই জানিল যে, সেবু মাসির মাথার চারের পেয়ালা ছুঁড়িয়া মারিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া—

বীরেন বলিল, 'আপনার বগল হ'চ্ছে, আপনার কি জ্বক অননি ক'রে মারা উচিত?'

কথাটা শুনিয়া মাসি লজ্জায় যেন একবারে মাসির স্রোত মিসিয়া গেল। যে ছেলেটুক সে নিজের হাতে মারিয়া করিয়াছে, যে তাহার প্রাণাশ্রয়ও বেশি, কি দুঃখে সে যে আজ তাহার গারে হাত তুলিয়াছে, সে কথা লগেনে একমাত্র তাহার অন্তর্যামী। এই লইয়া আজ যে তাহাকে এমন কথা শুনিতে হইবে, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। কথাটার লবায় দিতে দিয়া মাসির ঠোঁট দুইটা থু থু করিয়া কাঁপিয়া

উঠিল, তোম দিয়া থু থু করিয়া মল দড়াইয়া পড়িল। জবাব তাহার আর নেওয়া হইল না, তৎক্ষণাৎ শিখন কিরিয়া পিষ্টলীর হাতে ধরিয়া সে যেমন বাইতেছিল আবার তেমনি নিঃশব্দেই বাহির হইয়া গেল। পক্ষান্তে শুনি, বীরেন তখনও বসিতেছে,—'তোমার ভালবাসা আমি জানিনে বাবা? পূর্ব জানি। সেবু সে—সেবু আমার প্রাণ, সেবু আমার সব—কিন্তু ওই বুঝেই বা। তারপর বেই আর একজনকে পাওয়া আর বালু, বসন্ত। বাড়ীটা সেবুর নামে লিখে দেবার বেশা বাবা—হঁ-হঁ'।

এই বলিয়াই সে থু থুলািয়া হাসিতে দিয়া দেখিল, শুধিকে পিষ্টলীর বাবা ও মা ধাঁড়াইয়া আছে। বুকিল, আর একজনের কথাটা উহাদের মূহুর্থে উল্লেখ করা উচিত হয় নাই। তৎক্ষণাৎ তাহাদের ওনাইয়া ওনাইয়া সে আবার বসিতে লাগিল, 'ঘেরে ছেড়ে দিচ্ছ বটে ওর হাতে, দাও, আমিও অনেক ঘিরেছি, কিন্তু এখন বুঝে না বাবা, বুঝে এর পর।—আর, যে আশায় দিচ্ছ, সে-ওড়ে বাগি! বাড়ী ও লীবন থাকতে কাজকে সেবে না, এই আমি ব'লে রাখলাম।' বলিয়া সে এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে মাথব ভট্টাচারের বুকের পানে তাকাইয়া হাসিতে লাগিল।

বাহিরে দরবার কাছে একটুখানি আড়ালে ধাঁড়াইয়া ধাঁড়াইয়া মাসি সবই শুনি। বড় দুঃখে অত্যন্ত লগেনে মাসি হাসিয়া আবার পিষ্টলীকে চলিবার ইঙ্গিত করিয়া বলিল 'চলু'

গলিটা পায় হইয়া দিয়া বড় রাস্তার এক পাশে বসিয়া গাড়ী ঘোড়া বাঁচাইয়া দু'জনেই চলিতে লাগিল। কাহারও বুঝে কোন কথা নাই! যে পিষ্টলী এত কথা বলে, সে-ও আজ কথা বলিতে লগল করিতেছিল না। মাসি আপন মনেই ভাবিতে ভাবিতে চলিতেছিল—কিন্তু সে লগ করিয়া কেনই-বা সে এ আপন ঘরে ভাবিয়া আনিয়াছে। বড় স্রোত পাত্রে ইহাদের সে বিহার করিয়া যাবে। (ক্রমশঃ)

প্রথম বৌদ্ধক

ত্ৰিলাবিত্তীপ্ৰসন্ন চন্দ্ৰোপাধ্যায়

প্ৰিয়ৱৰ্ত্ত অধিভিত্ত নহি হুম, হুম নাই আমাৰও অধিভিত্ত,
অভিস্ৰিত পৌৰ্ণমাসী—ভাগিত্তেছে তাত্তকামণ্ডল,
হুহেৰ অক্ষট বাধা পাৰি না বে হুহেৰে বাধিত্তে
এমন বাত্ৰিৰ মাত্তে জোহুতত্ত জোয়াৰে অক্ষজল !

অক্ষজল ওৱ চোখে,—বিহুল কে কৰিয়াছে ওকে ?
কুঠায় কুটে না মুখ, হেনাপকে বাস্ উত্তৰোল,
হুমেৰ চুল্লি আসে, হুম বে আসে না তত্ত চোখে
বাহুৰ শিথানে তাত্ত ক্লান্ত দেহে লাগিত্তেছে দোল ।

শিথিল কবৰী হ'তে ধসি' গেছে কবৰীকুম্ভ,
অক্ষতে ধুইয়া গেছে কখন বে অধিৰ কাকুল,
হুছে গেছে অক্ষৰাগ অক্ষৰাগ-অবীৰ-কুম্ভ
কখন নামিয়া এল জানি না ত এমন বাহুল !

বাহুল নামিয়া এল নয়নেৰ পাত্তাত্ত পাত্তাত্ত,
মুখে হাসি চোখে জল—প্ৰিয়ৱৰ্ত্ত এ বিধম কৌতুক,—
হুহাতে টানিয়া কুকে অধিক্ৰ গভীৰ মমতাত্ত
আৱতত্ত আননে তাত্ত প্ৰশ্নেৰ প্ৰথম বৌদ্ধক !



অশ্রুভাষিত আশ্রয় শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১)

মধুসূদন দাস নবীনের বাড়ীর সন্মুখে পাড়াইয়া
চীৎকার করিতেছিল—যদি আজ হইতে সাত দিনের
মধ্যে টাকা সব না ফিটাইয়া দেওয়া হয়, সে নিশ্চই
নাশিণ করিবে। এবার আর সুখের কথা নয়, মধুসূদন
দাস এবার দেখাইয়া দিবে তাহার ক্ষমতা আছে কি না।

নবীন কিন্তু একটা উত্তরও দিল না, চুপচাপ
ঘরের মধ্যে বসিয়া তামাক টানিতেছিল, আর
ভেজানো দরজার এতটুকু ফাঁক দিয়া উঠানের বেড়ার
বাড়িরে মধুসূদন দাসের লাফালাফি দেখিতেছিল।
কে যেন কাহাকে কি বলিতেছে, মধুসূদন যেন নবীনকে
কিছুই বলিতেছে না, এমনই নিশ্চিত তাহার ভাবটা।

অনেকক্ষণ চীৎকার করিয়া, অনেকটা লাফালাফি
করিয়া হঠাৎ মধুসূদনের ঘরে হইয়া পেল হরত
নবীন বাড়ীতে নাই, মিথ্যাই সে এত চীৎকার
করিয়া লাফাইয়া মরিজেছে।

ঘরের পানে ভালো করিয়া তাকাইয়া দেখিল
দরজাটা ভেজানো মাত্র, ভিতরে কিছু না দেখা গেলেও
মাত্রটুকু যে কাছাকাছিই কোথাও আছে, সে বিষয়ে
সন্দেহ রহিল না।

মধুসূদন দরজা টেলিয়া একেবারে উঠানে দিয়া
পাড়াইল, সামনাসামনি কথাগুলি না বলিলে যেন
শাস্তি পাওয়া যায় না।

বতকল ঘুরে ছিল নবীন নিশ্চিত ছিল এবং
তাহার তামাক খাওয়ারও বিরাম ছিল না; একেবারে
উঠানে আসিয়া পাড়ানোতে বাধা হইয়াই নবীনকে
তামাক টানা বন্ধ করিতে হইল। মধুসূদন তাহাকে
সন্মুখে চাহ, অগত তাহার সন্মুখে বাইতে নবীনকে
মোটাই ইচ্ছা ছিল না। মধুসূদন ডাকিতে লাগিল—
“নবীনদা, বাড়ী আছে, একবার এদিকে এসো—কথা
আছে।”

নবীন নীরব—যেন বাড়ীতেই নাই।

মধুসূদন আর সন্ত করিতে পারিল না।

অগ্রহা ভাষার পালাপালি করিয়া বলিল, “টাকা
বেওয়ার বেওয়ার মনে ছিল না যে, টাকা দিতে
হবে? আজ তিনটা বছর হ’য়ে গেছে, আসল টাকা
বেওয়ার নাম নেই, ছদ্ম বেওয়ার কথা ছিল মাসে মাসে,
তাও নেই। বিয়ে করা কেন এসব গোকেতর, পলায়
দড়ি দিতে মরাই উচিত। দেখি—সাত দিনের মধ্যে
যদি ছদ্ম সম্মত টাকা না মিটিয়ে পাই, তোমার
বউকে হ’রে রাস্তার বের করব, তবে আমার নাম
মধুসূদন দাস। এ আর কাউকে পাগনি যে, কাহুতি-
মিনতি করলেই যেড়ে দেবে।”

দ্রী টানিয়া বাহির করার কথা—ও ঘর হইতে
অভয়াও নিশ্চয় এ সব শুনিজেছে; আর তাহার
স্বামীকে কত ছোটগোক মনে করিয়া বিচার বিজেছে।

পুরুষের এইবারই আশাত দাঙ্গিল, তাই পুরুষ-
সিংহ গজিয়া উঠিয়া হঁকা কেলিয়া ভেজানো দরজা
সন্মুখে পুগিয়া হুকার ছাড়িয়া বাহির হইল—

“বলি কি হয়েছে দাসের পো, এত গজরানি—
এত চীৎকার কেন? একশ’টা টাকা ধার নিয়েছি,
হুদ না হুদ তার পোটা জিশেক—না হুদ পোটা
পকাশেকই হোক। কেলে দেব তোমার হুদ হুদ
টাকা—একেবারেই মিটিয়ে দেব। এই সামান্য টাকার
মত্রে নিতি নিতি বাড়ী হ’য়ে বগড়া করতে এসো—
আমার পরিবারকে রাস্তার টেনে বার করতে চাও,
একটু লজ্জা করে না এসব কথা বলতে?”

মধুসূদন তাহার গ্লানও বৃষ্টি দেখিয়া সত্যই গভমত
পাইয়া পেল, একটু ধামিয়া বলিল, “বলছে তো টাকা
দেবে—দিলে কই?”

নবীন তাহাকে নয়ম হইতে দেখিয়া খুলী হইল,

কিন্তু মুখে তর্জন গর্জন করিতে ছাড়িল না, বলিল, "আমার টাকার মধ্যেই সে নিষ্ঠা তাপান। দেখতে পাই দাসের পো, এই যে গী-সুদ লোককে টাকা দিয়েছে, কই, আর কারও বেলায় তো এমন তাগদা দেখতে পাই না।"

মধুসূদন বলিল, "তোমার তাগদা মিই, কেননা তুমি নকলের চেয়ে হুড়া হয়েছ, কবে কি হবে তার ঠিক নেই, শেবে কি আমার টাকাগুলো মাঠে মারা যাবে?"

নবীন যেন বোমার হত কাটয়া পড়িল—

"আমি মরব আর তুমি বুঁদ আকস্মের জাল চাপা দিয়ে ছেঁটে থাকবে, মধুসূদন? না হয় বাগধি বছর বয়সই হয়েছে, তোমার চেয়ে তের ঘোমান আহি—তা' জানো? বেতোও তুমি আমার বাড়ী থেকে—সাতদিনের মধ্যে যদি টাকা তোমার স্নেহ-সুখ না দিতে পারি — তুমি আমার কেসে পাঠিয়ে, আমি কেসের কটও নইব—তোমার অপমান নইব না। বেতোও বয়সি—এখনই বেতোও।"

মধুসূদন বাঙালিশক্তি না করিয়া আত্ম আত্মে বাহির হইয়া হাইতে হাইতে বলিয়া শেল, "বেথা যাবে, — সাতদিনের মধ্যে যদি টাকা না পাই, তোমার এক চোট দেখে বেব। মধুসূদন দাসের যে কথা সেই কাজ, মনে রেখো।"

(২)

যেথ যে কাহার, তাহা ঠিক বলা কঠিন। নবীন দাস বিতীরা পক্ষ গত হইলে আর বিবাহ করিলে না বলিয়াই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল,—তাহার পর হঠাৎ প্রায় উনবাট বৎসর বয়সে সে বধন তরুণী পরী অভয়কে সঙ্গে লইয়া ন'পাড়া হইতে বাসবপুরে ফিরিল, তখন নকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল বড় কম নয়।

তামাক টানিতে টানিতে নবীন দাস লোকের কথার উত্তরে বলিল, "কি আর করি বল, দেখলুম

বিবহার জাত-মান-কুল সব দার, বাবা গ'রে বিবে করতাই চ'ল।"

আসল কথাটা জানিত মধুসূদন। তাহার আমার বাড়ী ছিল ন'পাড়ায়, এবং সে বাগকান সেখানেই কাটাইয়াছে। তাহার পর এখানে আসিয়া বাস করিলেও মাঝে মাঝে আসছে সেখানে গিয়া থাকে।

অভয়ার মায়েরই ধোণ; বেশী টাকা লইয়া সে জামাতার বয়সের পানে তাকায় নাই। মধুসূদনের সঙ্গে একদিন অভয়ার বিবাহের কথা চাইয়াছিল; নবীন হুড়া যদি না হাইত, এবং মধুসূদন বাগা দিবে বলিয়াছিল তাহার চেয়ে আরও পঞ্চাশ টাকা বেশী না দিত, তাহা হইলে মধুসূদনের সহিতই অভয়ার বিবাহ হইত। হাইত

মধুসূদন এসব ব্যাপার কিছুই জানিতে পারে নাই। সে অভয়ার মায়ের সতিত কথাবার্তা ঠিক করিয়া বিবাহের আয়োজন ঠিক করিতে বাড়ী আসিয়াছিল, সেই কাকে নবীন দাস যে এত কাণ্ড করিয়া বলিবে, তাহা যে অন্তরে তাবে নাই।

আজ যদি মধুসূদন কেবল সেই ক্রোধের বশেই নবীনের উপর ছোর জ্বলম করিয়া তিন বৎসর পূর্বে যার রেঙা একশত টাকা স্নেহে আঙ্গল সাতদিনের মধ্যে আমার করিতে চায়, তাহার জন্য তাহাকে মোহ দেখুতা চলে না।

নবীনেরই বা কি আঙ্গল! আজ যাকে কাল সে চিত্তার গুইবে, সন্দেহের হিসাব-নিকাশ করিয়া সবত চুকাইয়া দিবার সময় আসিয়াছে, — এখন কি আর তাহার বিবাহ করিবার সময়? এই যে মেয়েটাকে সে বিবাহ করিয়া আসিয়াছে, ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে কি এতটুকু ভাবিয়াছে?

অভয়ার মায়েরই বা কি বুঁদ! কতকগুলো টাকা পাইয়াই সে তুলিয়া শেল, — মেয়ের ভবিষ্যতে কি হইবে, সে কোথায় গাঁড়াইবে, কে তাহাকে আশ্রয় দিবে—তাহাও সে একবার ভাবিল না? এই সে নবীন দাস, উহার আছে কি? জমিদারের কাছারীতে

পেয়ারার কাজ করে, তাও এতদিন কাজ বাঙারার কথা, অনেক করিয়া কানিয়া কাটিয়া নায়েবের হাতে পারে বহিয়া সে আশুও কাজে লাগিয়া আছে।

আজ মধুসূদনই তাহাকে বরজাড়া করিতে পারে, উহারে বাবী-বীকে পথে বাহির করিয়া দিতে পারে। মধুসূদনের নিকট হইতেই টাকা ধার করিয়া সে যে মধুসূদনেরই বাণ্দ্ৰতা বন্ধে বিবাহ করিয়া আনিবে, তাহা তো সে জানে নাই। আশুও সেদিনের কথা ভাবিয়া মধুসূদনের সর্বাঙ্গ কষ্টকিত হইয়া উঠে।

মধুসূদন ক্রোধে ফুটিতে থাকে — এক এক সময় মনে গুর, এই যুদ্ধেই সে নবীন দাস ও তাহার স্ত্রীকে সেনার গুপ্ত টানিয়া বাহির করিয়া দেয়।

গোকে মধুসূদনের বিবাহের গুপ্ত অনেক চোটা করিয়াছে, মধুসূদনের দিদি অনেক অশ্রুর বিনয় করিয়াছে, হাসিমুখে মধুসূদন বলিয়াছে, “তোম না, বিয়ে তো আর পালিয়ে থাকে না, কখন বুদি তখনই বিয়ে ক’রে কেলব — তাতে আর কি?”

(৩)

টাকার চোটার ওই এক জায়গায় নবীন দাস বুলিল, কিন্তু অত টাকা সে পাইবে কোথায়, কে অত টাকা দিবে?

বাড়ী কিরিয়া বাবাণ্ডার বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে সে বলিল, “হুলায় বাব্ সব, সেখি না সতি সে কি করতে পারে? সতিই কি আর বাড়ী থেকে বের ক’রে দিতে পারবে? আসল কথা, বত পৰ্জায় তত বর্ষায় না। ওর একটাই ওই রকম — জকে আমি বেশ চিনি। সোকেটা মুখে ওই রকম করে, লাকার কাঁপায়, আসলে ওর মনটা কিন্তু তারি নরম।”

অত্যা ভিজালা করিল, “কিন্তু সতিই যদি সাত দিনের মধ্যে টাকা না দিলে আমায়ের বের ক’রে দেয়।”

নবীন হাসিমুখে বলিল, “না না,—ও ওই রকম

বলে, কাজে কিছুই করতে পারে না। আমার প্রায়ই শাসিয়ে ধার — এবার টাকা দিতেই হবে, না দিলে সে একটা কাণ্ড ক’রে বলবেই। কিন্তু সে শালানো ওই পৰ্জায়। আমি একে বেশ জানি, এতটুকু বেলা থেকে একে মেখে আসছি তো।”

অত্যা বলিল, “অত টাকা নিবেছিলে কেন?”

নবীন বলিল, “তোমার সাকে দিতে গো, নইলে কি তোমার পেতুম? আগে মধুর সঙ্গেই তো তোমার বিয়ের সব ঠিক হ’রে নিয়েছিল, সেই সময়ই আমি দিবে পড়লুম, নইলে—”

অতয়ার মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল, সে হাঁপাইয়া উঠিয়া বলিল, “বাব্ পে, ও সব কথা বাব্।”

নবীন হাসিয়া বলিল, “বাব্বে কেন? ওর তাপই হয়েছে সেই জন্তে — তা’ আমি বুঝি। সতি যেহেতু, আমি কিন্তু এক একবার ভাবি — যদি আমি তোমার বিয়ে না করতুম, মধুর সঙ্গেই তোমার বিয়ে হ’ত, তুমিও মুখে থাকতে পারতে। ওর চার-পাঁচটা ধানের সোলা, বাগান, পুকুর, জমাজমি,—ও একটা মত্ত গেরোজ, আর আমার কিছুই নেই, মাথার ঘাব পায়ে কেলব বা’ নিয়ে আসি — তাতে পেট ত’রে হুবেলা খাওয়া পর্যন্ত চলে না। সতিই আজ যদি আমার কিছু হয়, কাল যে তোমার কি হবে, যেহেতু —”

অত্যা বাবীর মুখ চাপিয়া ধরিল — “বলছি ও সব কথা মনে ভেবে না, তা নয়, ওই সব কথাই জু বলবে।”

মুখ হাড়াইয়া লইয়া নবীন একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “সতিকে কেউ কোনদিন জেশ তাপতে পেরেছে, যেহেতু? আজ বলছি বটে, মধু আমার কিছুই করতে পারবে না, জু সতি যদি সে কিছু করে, আমার তো তাতে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নেই, বাধা হ’য়েই সত্যার সিয়ে ঠাড়াতে হবে।”

অত্যা চুপ করিয়া রহিল।

মহুয়া' কি সত্যিই এমন নিতর হইতে পারিবে, তাহারে ঘরছাড়া করিতে পারিবে ?

একদিনের কথা মনে পড়ে।

মধু তাহারে বাড়ী বাওয়া-খালা করিত। মা মধু'র সঙ্গেই কতর বিবাহ দিবে ঠিক করিয়াছিল। বেচার! মধু তাহাকে কত খিনিসই না দিয়াছিল! কাপড়, খাদ্য, শাঁখার চুড়ি, এমন কি তাহার কানে আঁধও যে পাখর-বসানো ফুল হ'লানা তহিয়াছে — এ হ'লানাও মধু'র দেওয়া।

একদিন মধু বলিয়াছিল — যদি অন্তর্যাকে সে বিবাহ করিতে না পার — আর কাহাকেও সে বিবাহ করিবে না। অন্তরা অন্তরা লম্বা কথা বলিতে পারে নাই, তবে মনে মনে ঠিক করিয়াছিল, সেও মধুকে ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না। মধু তাহার প্রতিজ্ঞা ব্রহ্মা করিয়াছে, কিন্তু অন্তরা? অন্তরা অন্তরনয় হইয়া কোন্ দিকে ডাকাইয়া থাকে কে জানে? হৃদ নবীন তামাক টানিতে টানিতে অন্তরল কত কথা বলিয়া যায়, মুখের তাহার বিদ্যার নাই।

মাঝে মাঝে অন্তরা বিরক্ত হইয়া উঠে — তখনই মনে হয়, আচ্ছা বেচারী, লগতে উহার আর কেহই নাই। অন্তরার লগই আচ্ছা তাহাকে প্রাণপণে পরিভ্রম করিতে হইত। দিন নাই, রাত্রি নাই, নবীনের কর্ণে আলত নাই। আচ্ছা যদি তাহার পৈতৃক ভিটাখানি ভূঁটিয়া যায়, সেও কি অন্তরার লগই নয় ?

অন্তরার নারীচিত্ত অকস্মাৎ সমভায় ভরিয়া উঠে, সে মন হইতে সমস্ত কথা মুছিয়া ফেলিয়া বাবীর প্রতি অত্যন্ত মনোবোধ দেয়।

(৪)

বিবৰ্ণ মুখে সেদিন বাড়ী করিয়া নবীন বলিল, “ওনছা অন্তরা, কালই আমাদের বাড়ী ছাড়তে হবে।” অন্তরা তাহের কেনে কহাইতেছিল, দ্বিজাঙ্গ কবিল, “কালই—মানে?”

নবীন তামাক লাঞ্জেত বসিয়াছিল, বলিল, “মধু কিছুতেই ছাড়বে না, সে নাশিল করেছে, কাল পর্যন্ত বাড়ী ছাড়ার মিন, যদি কাল বাড়ী না ছেড়ে দিই,—পরন্ত ওরা জোর ক'রে এসে বাড়ী লবল করবে।”

অন্তরা পাখরের স্তম্ভির মত বসিয়া রছিল,— নবীন পরক্ষণেই হাসিল, বলিল, “বাবু সে, বাড়ী যদি যায় বাবেই, তাতে আর কি? না হয় গাছ-তলাতেই থাকব — তাকে ক'রে খাব, সেরকম ক'রেও তো কত লোকের মিন কাটে, অন্তরা।” বাখাতরা কর্তে অন্তরা বলিল, “কাটেব না কেন, দিন সবারই কাটে, সবারই কাটবে। আমাদের কতের লগে আমি তো এতটুকু ভাবিনে, তাবছি তোমার লগে।”

নবীন বেন আকাশ হইতে পড়িল, “আমার লগে —? কেন, আমার লগে তাববার মত কি হ'ল?”

অন্তরা খানিক নির্বিষয়ে তাহার পানে ডাকাইয়া রছিল। তাহার চোখে অকস্মাৎ খানিকটা লল আসিয়া পড়িল, সে অকণিকে মুখ কিরাইল।

আচ্ছা তিন বৎসর সে এই লোকটিকে দেখিয়া আসিতেছে, কোন দিন ইহার মুখে হাসি ছাড়া দেখিতে পার নাই। বত প্রুণ, বেদনা, কষ্টই অসুখ না, সে হাসিমুখে সব বরণ করিয়া লইয়াছে, কোন দিন এতটুকু অসন্তোষ দেখার নাই। আচ্ছা যে ভিটা ছাড়িয়া বাইতে হইবে, গাছতলার ঠাঁড়াইতে হইবে, তাহাতেও এ মুখের হাসি তো কই নিগাইল না।

সমস্ত অন্তরটা সেই লোকটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, যে এই জিনিসের লোকটিকে উদ্ধাত্ত করিয়া ফুলিতে চায়, একবারে বাড়ীছাড়া করিতে চায়।

আচ্ছা এই প্রথম সে অল্পতব করিল—সে তাহার

কৃত্ত্ব স্বামীকেই ভালবাসে, এতদিন একথা তাহার মনে হই নাই।

নবীন দাস তাহাকে নীরব দেখিয়া ভারি দুঃখ মনে বলিল, “আমার জন্তে কিছু ভাবতে হবে না, মেসবউ! নবীন দাস অনেক কিছুই সইতে পারে, কোন কষ্টই তার পথে গাশে না।”

অভয়া চক্ৰকণ্ঠে বলিল, “তোমার না লাগুক, আমার লাগে।”

নবীন দাস খানিক ভাবিল, তাহার পর বলিল, “এক কাজ করি না, মেসবউ : তোমার তোমার মাড়ের কাছে পাঠিয়ে দিই, আর আমি—”

অভয়া তাহার কথা শেষ করিতে ছিল না, তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “আমি তোমার ছেড়ে কোথাও যাব না—কিছুতেই যাব না। মার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কিসের,—মা তো আমার বিক্রী ক’রে দিয়েছে টাকা নিয়ে।”

নবীন দাস একটা নিঃশ্বাস তেলিয়া বলিল, “জব থাকো, কিন্তু অনেক কষ্টই সইতে হবে, অভয়া।”

অভয়া উত্তর দিল, “তা হোক—আমি সইব।”

তাহার মনে হইতেছিল—একবার মধুসূদনের সহিত সেবা হইলে সে বেশ ছুই কথা ওনাইয়া দিবে।

(৫)

সেদিন সকাল বেলা—

মধুসূদন একবারে উঠানে ঢুকিয়া পড়িয়া ধাক দিল, “নবীনদা বাড়ী আহ ?”

“না, সে বাড়ী নেই, আমি আছি—” বলিয়া ঘরের ভিতর হইতে যে বাহির হইয়া আসিল, তাহাকে মধুসূদন বহুকাল দেখে নাই, তিন বছর পূর্বে তাহাকে সে দেখিয়াছিল—সে তখন ছিল কুমারী, আর সে বিবাহিতা।

হাতে ছুইগাছি কেবল কলি, পরনে একখানা লালপেড়ে শাড়ী, তাহাও পর খানে তালি দেওয়া। জু তাহার পানে তাকাইয়া মধুসূদন বসন্ত খাইয়া

সেল, প্র’বার ঢোক দিলিয়া, মাথা চুলকাইয়া সে বলিল, “সরকার তোমার কাছে নয়, সরকার তার কাছে।”

অভয়া বলিল, “আমি তার দী মধুদা’, কেবল তার হৃদয়েরই অপেক্ষাসিনী নই। হৃদয়ের অপেক্ষে সমান নিছি। তার যে কথা তা’ আমাকেও বলতে পারো, কারণ শোনবার অধিকার আমারও আছে।”

এই সেই অভয়া !

সে একদিন মধুসূদনের সহিত বিবাহ হইবার অপেক্ষার ছিল, নবীন দাস যদি না ঘাইত—সে মধুসূদনের গৃহলক্ষী হইত।

আজ সেদিন চলিয়া গিয়াছে, অভয়াও লোকটা ভুলিয়া গিয়াছে কি ? এত বীজ মাজে পূর্ণব্রতী ভুলিয়া ঘাইতে পারে ?

একটু ঘামিয়া মধুসূদন বলিল, “কথাটা তো তুমি জানোই, কাজেই গোপন করবার কোন সরকারও দেখছিনে। আসল কথা—তোমাদের কালই এ বাড়ী ছেড়ে বাড়্যার কথা ছিল—বাও নি কেন, তাই ভিজাসা করতে এসেছি।”

পর্মিতভাবে অভয়া বলিল, “না, আমরা ঘাই নি, আমরা যদি আকণ্ড না ঘাই—তুমি পেয়াসা এনে আমাদের টেনে বের ক’রে দেবে তো ?”

মধুসূদন শুধু হাসিয়া বলিল, “যদিই করি, তাও তো অস্তায় হবে না, অভয়া। এই তো তিন বছর পার হ’য়ে গেছে—তোমার বিয়ে করার সময় নবীনদা’ মাঝার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল। বলেছিল, এক বছরের মধ্যেই আমার টাকা দিয়ে দেবে—সে কথাটা তাকে একবার মনে করিয়ে দিও তো।”

অভয়া বলিল, “তুমিই এখন তাকে অনবরত মনে করিয়ে দিচ্ছো, আমার আর সে কথা বলতে হবে না।”

হৃদয় মাত্র চূপ করিয়া থাকিতা সে বলিল, “সত্যিই আমি ভাবতে পারি নি যে, তুমি এমন হ’তে পারো। একদিন বাকি আমার তুমি দুবই ঘের করতে, তাই বৃষ্টি আমার সর্জনশ করতে লাগে।”

মধুসূদন যেন আকাশ হইতে পড়িল, বলিল,
“তোমার আমি কি সন্দেহ করছি, মন্ডা?”

পুষ্পভাবে অত্যা! বলিল, “এই যে ভিটেছাড়া করছ!”

অকৃত্রিম মনে তাহার পানে তাকাইয়া মধুসূদন
বলিল, “এ ভিটে থাকতে তোমার কোনদিন নিজের
বাড়ীতে নিজে যেতে পারব না, অত্যা! আমি
তোমার নিজের বাড়ীতে আগ্রহ দেখ, আর—”

অত্যা হৃৎখানা অচকার হইয়া উঠিল, সে ভিত্তাসা
করিল,—“কেন!”

হৃৎখণ্ডিত মধুসূদন ধানিক নির্মাকে তাহার
পানে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর সকল ক্ষণ
দূর করিয়া বলিয়া উঠিল, “কারণ আমার আমি
তোমার ভালোবাসি, অত্যা!”

অত্যা বিস্ময়পূর্ণ হাসি হাসিল, বলিল, “দাদা,
তাই আমার একথা তাহা! তুমি জানো না, আমি
আমার ওই স্বামীকেই ভালোবাসি, হাজার কষ্ট মরেও
ওরই দর করতে চাই, তুমি আমার রাজবাড়ীতে
রাখতে চাইলেও আমি সেখানে থাকতে চাইনে।”

তাহার উজ্জল হৃৎখানার পানে তাকাইয়া মধুসূদন
অনেকক্ষণ নির্মাক হইয়া গড়াইয়া রহিল।

অত্যা বলিল, “বাড়ী যাও মধুনা, আমার কথা
জেনে অনর্থক মাথা খারাপ করো না। তোমার
টাকার জন্যে এ ভিটে নেবে—সে ভালো কথা, আমিও
আগা ঠিক করেছি যাওয়ার। এ বাড়ী ছেড়ে
আমরা কালই চলে যাব, তুমি নিশ্চিত মনে বাড়ী
দল ক’রো। এখন দ্যা ক’রে যাও, —আজকের
দিনটা আমাদের নিশ্চিত থাকতে যাও।”

মধুসূদন আর গড়াইতে পারিল না, যাতে যাতে
ফিরিল।

(৬)

কি আশ্চর্য পরিবর্তন ঘাটবে!

মধুসূদন ভাবিয়া পার না—এই কি সেই অত্যা?
সেই অত্যা আর এতটা পরিবর্তন ঘটিল কি করিয়া?

বৃহ নবীন দাসের পরিস্থিতি গী সে,—নবীন দাস
কোনক্রমে পোটের তাত ছুটাইতে পারে না, গীকে এ
পর্যন্ত কিছুই দিতে পারে নাই। তথাপি দাস-তাত
খাইয়াও সে সুখী, বৃহ স্বামীর সেবা করিয়াও সে
সুখী।

যাতে সে আবার বাহির হইল।

অচকারে গুকাইয়া সে আসিয়া গাড়াইল নবীনের
কনু দরজার পাশটোতে।

ভিতরে স্বামী-স্ত্রীতে কথা হইতেছিল, নবীনের
ওঁ কাটানার দলও ওন। হাইতেছিল।

নবীন দাস বলিতেছিল,—“হ্যাঁ দে, কাল না হয়
চ’লে যাওয়া যাবে, তাহেই বা ওখ কি? তুমি নিজে
কেসে মরছ, মেজবউ, কই ভিটে ছেড়ে যাওয়ার নামে
আবার তো কাটা পাচ্ছে না। হুখ একটু ওর বেটে—
হাজার ধোক, বাপ-শিতার ভিটে — এতটুকু বেলা
থেকে এখানে রয়েছি, বাবট বহুত বয়সে আম কোথায়
এই ভিটে — ওই উঠানে ওয়ে মরব, তা’ নব যেতে
হবে কোথায় কে জানে।”

গী উচ্ছ্বসিত কর্তে বলিল, “কেবল আমার ভয়েই
তুমি আম ভিটেছাড়া হচ্ছে—এ কষ্ট আমার যে
কিছুতেই হচ্ছে না।”

নবীন দাস হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, “তোমার
জন্তে কে বলল? মধু আসে অবিভি এরকম
খিটখিটে ছিল না, আমি তবু বেশ জানি, তবে
আজকাল একটু খিটখিটে হয়েছে—তবেই ওর নাকি
শরীরটাও খারাপ হচ্ছে।”

গী আর্তকর্তে বলিয়া উঠিল, “ওগো, না গো না,
সে তোমার এখন দর করতে চায়, কেননা তুমি
তার মুখের দাঁত কেঁড়ে নিয়েছ, তুমি আমার বিয়ে
করেছ। আর যদি আমি যদি, তোমাদের আবার
মিল হবে, কিন্তু আমি স্বতন্ত্র থাকব, ততদিন সে
তোমার দরজা করবেই।”

নবীন দাস অনেকক্ষণ নিবৃত্ত হইয়া রহিল, তারপর
যাতে যাতে বলিল, “আমি সব বুকেছি মেজবউ,

আমি অবশ্য বুঝি নি। আমি যে কতখানি অস্ত্র
কাম করেছি, তা' বুঝে সত্যিই আমার মন ব্যাথা
হ'য়ে গেছে। আচ্ছ যদি এ নিয়ে কিরিয়ে দেওয়া
যেত, আমি নিশ্চয়ই বিতুষ।"

আবার খানিক সে চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,
"এজিপ্তের সে নিতে চায় আমারই উপর দিয়ে, আমি
তাই বলছি মেজবউ, আমি কাল চ'লে যাই, তুমি
একা এখানে থাকলে সে কখনই তোমার বের ক'রে
দিতে পারবে না। আমার সঙ্গে কোথায় যাবে—
কোথায় ঘুরবে—কেবল কষ্টই পাবে।"

অত্যা হুগিয়া হুগিয়া কাদিতেছিল,—আর্ন্তকণ্ঠে
বলিল, "আমি তোমার ছেড়ে কোথাও যাব না,
কোথাও থাকব না। তুমি যেখানে যাবে, বত কষ্টই
হোক, আমি সেখানে যাব।"

মুহুম্বন যেমন চোরের মত আসিয়াছিল, তেমনই
চোরের মত আঙে আঙে বারান্দা হইতে নামিয়া
সেল।

(৭)

পরদিন দুপুরের পরে—

একখানা গরুর গাড়ী বাহিরে সরু পথটার উপর
আসিয়া থাড়াইয়াছে।

নবীন হাস উঠানে পোয়ায়া গাছটার তলায় হ'কা
টানিতেছে, তানাকের সরঞ্জামগুলি তাহার সামনে
পুঁচিলি বাঁধা পড়িয়া আছে।

অত্যা দরের ভিতর হইতে ঢাল, ঢাল ঐরুতি
যায়া কিছু ছিল সব ব্যাংগার বাহির করিয়া
দিতোছে, গাফোয়ান সেগুলি বহিয়া গাড়ীতে গইয়া
বাইতেছে।

বীরে বীরে মধু আসিয়া থাড়াইল।

"চলো নাকি, নবীনবা'—"

নবীন হাসিমুখেই উত্তর দিল, "না গিয়ে আর
করছি কি বল, থাকতে তো আর দিলে না।"

অত্যা কি একটা কথা বলিতে আসিতেছিল,

মুহুম্বনকে সেবিয়াই তাহার মূখ বিকৃত হইয়া উঠিল।
সে কিরিয়া বাইতেছিল।

মুহুম্বন ডাকিল, "এদিকে এসো, অত্যা! কথাটা
কেবল নবীনবা'র সামনে বললেই তো চলবে না;
তুমি যখন ও'র দ্বন্দ্বভ্রমের সমানাপত্তাদিনী, তখন
তোমারও সে কথা গোন। দরকার।"

অত্যা কিরিল না, কিন্তু গাড়াইল।

পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া
নবীন হাসের হাতে দিয়া মুহুম্বন বলিল, "আমি আজই
হায়ে আমার গিলিকে নিয়ে কাশী যাচ্ছি কিনা, সেই
জন্তে সকালেই হায়ে গিয়ে এসব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে ফেলে
এইমাত্র ফিরে আসছি। তোমরা এখনি যান্ন শুনে
মানাহার পর্য্যন্ত করিনি, তাকাতাড়ি ছুটে এসেছি।
এখানা একবার প'ড়ে দেখ, তারপর যা' হয় ক'রো।
তুমিও এদিকে এসো, অত্যা, শুনে যাও সবগুলো।"

চমৎকৃত হইয়া নবীন বলিল "এ কিসের কাগজ?"

মুহুম্বন বলিল, "প'ড়েই দেখ না কেন?"

যড়িবাধা ধীরে চন্দ্রাখানা চোখে আঁচিতে
আঁচিতে নবীন হাস বলিল, "কিসের যে এ কাগজ,
তা' তো বুঝতে পারছিনে মধু, বাই হোক — বেয়ো
না, একটু গাড়াও।"

ততক্ষণে মধু ঘরখা পার হইয়াছে, সেখান হইতেই
বলিয়া সেল, "আমার থাকার আর দরকার নেই,
নবীনবা', এখনকার যা' তোমরাই ঠিক করবে।
মোট এই কথা ব'লে যাচ্ছি — আমি এই রাতেই চ'লে
যাব, তোমরা নিশ্চিত হ'য়ে বাস কর।"

অত্যা কিরিয়া সেবিল — মুহুম্বন পথের বাঁকে
দিশাইয়া সেল।

উত্তেজিত নবীন হাস ডাকিল, "সেখা যাও গো,
মধু'র কীড়ি গোন। সে সব মান ক'রে দিতে সেল,
আমাদের আর এযাকী ছাড়তে হবে না।"

মহানন্দে বৃদ্ধ নবীন হাস বৃত্তি নাচিয়াই ফেলে।

অত্যা বিষয়ে বলিল, "বুঝতে পারলুম না।"

নবীন হাস হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল,

“কথাটা বুঝতে পারলে না ? মধু জানিয়েছে, সে তামসা করেছিল, সেখতে তেরেছিল জিটে ছাড়বার নামে আমরা কি করি। সে আমায় সহরে দিয়ে এই বেয়েটা ক’রে এনেছে—এই বাড়ী, এর চারদিককার বানিকটা জমি-ওরা, সব সে আমাদের দান ক’রে দিলে, তা’ ছাড়া বশোবস্ত করেছে, তার আর থেকে তুমি মাসে মাসে দশটাকা ক’রে পাবে।”

অত্যা হঠাৎ কিরিয়া গাড়াইল,—

“ভালো কথা, আমাদের হুংর তা’ হ’লে খুশো—”

সে গাড়োয়ানকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “তবে ও সব নাথিয়ে রেখে বা বাবা, তুই যে এতটা কষ্ট করেছিলু তার জন্যে বরং হুঁচার আন খ’রে নিলু।”

নবীন হুঁকাটা তামিয়া উঠিয়া গাড়াইল, বলিল, “তুমি গুজলো নামিয়ে খেয়ে তোল, আমি বরং মধুর সঙ্গে একবার বেথা ক’রে আসি। আজ রাতেই সে চ’লে যাবে বসলে, এই বেলা ভির আর হুত সেখাই হবে না। এতটা যে করলে, তার জন্যে একটু বলা কত্তা—”

বাবা দিয়া কঠিন হুতই অত্যা বলিল, “কিছু দরকার নেই। যে লোক এমন নির্ভর ব্যবহার করতে পারে, তার এটুকু দরকার কত দরকার জানাতে যেতে হবে না।”

নবীন বেন আকাশ হুতে গড়িল—

“তুমি বলছ কি অত্যা ? সে বেচার। কতকালের মধ্যে যাচ্ছে—হুত এখন কিরবে—”

অত্যা কঠিন মুখে বলিল, “খাচ্, অতটা বাড়-বাড়ির দরকার সেখি নে।”

ইহার পর আনন্দের আভিসবো নবীন দাস বড়ার কথা বলিতে দেখ, ততবারই অত্যার কাছে বসক খাইল।

দুটি তাহার কীণ হুয়া আসিয়াছে, সাগোরিক বুড়িটাও নাকি তাহার বড় কম—সেই জুই সে অত্যার গভীর অথচ বিমর্ষ হুখানা খেখিতে পাইল না, তাহার আর্ষ কঁধর তনিরাও কিছু বুঝিতে পারিল না।

মধুহন যে তাগকে তাহার ভিটা কিরাইয়া দিয়া গেল—এ আনন্দ তাহার বাখবার দান ছিল না।

(৮)

রাজি বারটার মেল—

মধুহন ঠেগনে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

কাষ্টে তাহারের একথানা বাড়ী ছিল, এ পর্য্যন্ত সে বাড়ী তাকা দেখা ছিল। গত মাস হইতে তাকানিয়া উঠিয়া দিয়াছে।

হঠাৎ কাল রাতেই সে প্রত্যাব করিয়াছিল, আজই সে কাষ্ট বাইবে, এবং কিছুদিন সেখানে থাকিবে।

আকাশ সেদিন পরিভার, অলখো নক্ষত্র কিছুমিক করিয়া জগিতছিল। সেই পরিভার নীলাকাশের পানে তাকাইয়া মধুহন ভাবিতেছিল—নিহনে যে-সেন কেলিয়া চলিল তাহারই কথা।

দিনি জিজ্ঞাসা করিল, “আবার হুইবাস পরেই তো কিরব, মধু?”

মধুহন একটু হাসিয়া বলিল, “কি দরকার আর কিরে আসবার, দিনি ? বাবা বিশ্বনাথের পায়ে কত লোকই আগ্র পাম্বে, আমরাও হুই তাই-বোনে সেখানে আগ্র পাব, আর এ সমসার কিরবার কি দরকার ?”

দিনি এ মতলবের কথা আসে জানে নাই, জানিলে হুত কাষ্ট-আহার আয়োজন হুইত না। তাই আশ্চর্য হুইয়া দিয়া বলিল, “ওরা, তুই বলছিলু কিরে, দেশে আর কিরবিনে না কি ?”

মধুহন বলিল, “দেশে আমাদের তো কেউই নেই দিনি।”

দিনি আর্ষকটে বলিল, “কেউ নেই গতি—দেশ তো আছে।”

মধুহন গভীর মুখে বলিল, “দেশের চান আমার কেটে গেছে দিনি, সেই জুইই আমি থাকি।

এখানকার সব বন্দোবস্ত ঠিক ক'রে রেখে সেলুম,—যদি প্রাণী জাগিয়া ছিল। সে কান পাতিয়া শুনিব, যেহে
নেতাই দরকার পড়ে, নাহয় একবার আসা যাবে।” আসিল এবং ছাড়িয়াও গেল।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস কেহিয়া দিবি মুখ ফিরাইল।

বালিসের মধ্যে মুখখানা লুকাইয়া অতি ঘোপনে

সেদিন রাতি বারটার বেশ যখন ছাড়িয়া গেল,

সে কতখানি চোখের জল কেহিল, তাহা জানেন

তখন গ্রামবাসী নিশ্রাময়। কেবল একটা গৃহে একটা

একমাত্র অতর্ক্যবানী !

অতীত *

শ্রীকেশরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাগ্যে অতীত কয় না কথা তাই না আছি বেঁচে,

নইলে টিকি চাপাড়া দেবে পুরোদমে কৈচে।

হাঁচুর ওপর হাক্-প্যাণ্ট প'রে পুরুতের ছেলে—

উল্লভের রং দেখাবে না ঘন্টা নাড়া ফেল।

দাঁতনেতেই সাড়ে দশটা—চাকরির দপা রপা,

হরি-মটর মেয়ে চলবে কোসে মালা জপা।

খাঁকের কলম ধ'রে কবি লিখবে মনসার ভাসান,

বাহবা দেবে পণ্ডিতেরা,—গ'লে যাবে পাষণ !

অশ্লেষ আর মঘার ঠেকিয়ে দেশ-ভ্রমণ ছেড়ে

পা গুটিয়ে আরামেতে ব'সে থাকবেন বেড়ে !

টিকি রেখে কষ্টী নিয়ে খোল বাজাবে তরুণ,

হরিনামে ভক্তের চোখে ভর করবেন বরুণ।

‘চয়নিকা’র সোহাগ যাবে, অটল হবে পঞ্জিকা,

শিব-ভাগবত হুঁকু হবে সস্তা পেয়ে গঞ্জিকা !

অতীতকে আর এত্তো ক'রে কেন সাদাসাদি ?

চারের দফা গয়া হ'লে—মরবে আলা-আদি।

গত জন্মের প্রিয়র পন্টন কয়ে উঠবে কথা,

কারুর হাতে ঝাড়ু কারু বুকফাটা ব্যথা !

বেঁচে আছি পাণ্ডনার সব ম'রে গেছে শুনে,—
 হেঁকে বলবে—নাওতো বাবু হুম শুদ্ধ গুণে !
 চপ্প, ডিম্ব নবীর কুঞ্জে চলছে যখন প্রেমের,
 ছি ছি ক'রে উঠবে বিমান,—উঠতে হবে ঘেমের !
 জিত উপড়ে ভুমানল আর শুলের হবে ব্যবস্থা,—
 কে জানে ভাই পক্ষগণ্য খেতে বলবেন ক'বস্তা !

রান্নাঘরে খোড়ের ঘণ্ট রাঁধবেন হলে গিন্নি,
 'রিচ-ডায়েটে'র মধ্যে কেবল হবে 'কাঁচা-শিমী' ।
 রবিবাবু রক্ষা করুন, থাকুন নীরব অতীত,
 ডেকে আর আনবেন না unwelcome অতিথি ।
 নামাবলি উঠবে অঙ্গে ; 'টেলার-শপ্প' বন্ধ,
 Rare হবে এত সাধের পলাতুর গন্ধ ।

উকোর শব্দে গুলজার হবে হুকোপটি,
 তাল চুকে আসর নেবে তালতলার চটি ।
 ষাটি অবিমিশ্র আবার হ'রে উঠবে জাতটি,
 গঙ্গালাভের ভরে রবেন নিম্নতলার ঘাটটি ।
 ছত্রিশ জাত তুলবে প্রবল ছত্রিশ রাগিণী,
 সামবেদকার সামলাতে না পারবে নাগিনী ।

বাতাসা বানাবে তখন নবীনাদি যোদ্ধক,
 করাত নিয়ে হাজির হবেন আবার 'শিশুবোধক' ।
 রক্ষা করুন—কাজ নেই আর অতীতেরে ডাকি,
 যখন যেমন রাখেন কর্তা ভাই মেনেই থাকি ।

* জন-সাহিত্যিক ইন্দু কেশরীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের এই কবিতাটি
 গাইয়ছি। 'উদয়ন'র পাঠকবর্গকে ইহা উপহার দিলাম—ইঃ পঃ।



['ইফসনে' সংস্করণের ৩য় সংস্করণ অসম্ভব করিয়া তাহারে পুস্তক ছুটানি করিয়া পাঠাইবেন]

শ্রী চন্দ্রমাধব ঘোষ—জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার
সম্পাদিত — বৃন্দা এক টাকা।

এই পুস্তকখানি মাননীয় বিচারপতি শ্রী চন্দ্রমাধব ঘোষের জীবনচরিত। লেখক পুস্তকখানি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি মাত্রের রাজ্যে শ্রী মন্ত্রনাথ রায় চৌধুরী মহোদয়ের উৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রী চন্দ্রমাধব ও শ্রী মন্ত্রনাথের কটো ছুইটো বেশ মনোহর হইয়াছে। গ্রন্থকার চন্দ্রমাধবের সম্পূর্ণ জীবন-কৃত্যের অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছেন; এতৎপ্রসঙ্গে অনেক পুরাতন ঘটনার ইহাতে পরিবেশ হইয়াছে। সেই দিক্ দিয়া পুস্তকখানির ঐতিহাসিক বৃন্দা বড় কম নয়। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহের প্রভাব যে বাঙলা দেশে বিশেষভাবে লক্ষিত হয় নাই, ভারতীয়দের সহিত তৎকালীন হিন্দী-ভাষী লোকেরদের আচার-ব্যবহার, বিভিন্নত্ব যে হিন্দু-কলেজে চন্দ্রমাধবের সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং বিভিন্নত্ব ও বহুনাথ বহু মহাপ্রসাদ যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি-এ উপাধিধারী, শ্রীমতমহাশয় রায়বাহারী ঘোষ, গুরুদ্বার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি বি-কে মল্লিক মহাশয় যে হিন্দু-কলেজে আইন-প্রশিক্ষণে চন্দ্রমাধবের ছাত্র ছিলেন, ১৮৮২ খৃঃ অব্দে ১লা জুলাই যে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা হয় এবং শ্রীমতনাথ পণ্ডিত মহাশয় যে ইহা প্রথম ন্যেয়ী বিচারপতি নিযুক্ত হইলেন প্রভৃতি ঘটনার উপর ইহা আলোকপাত করিতেছে। এই গ্রন্থে তৎকালীন প্রতিভা, পুঙ্খবশের মধ্যে ঐতিহাসিক বিশিষ্ট, অমর-প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ

দাস, রমেশচন্দ্র মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিরও পরিচয় উল্লিখিত আছে। স্মৃতিবক্তা চন্দ্রমাধবের নীতীক উক্তি ও চরিত্র-বিশ্লেষণও বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে।

শ্রীবিমলেন্দু কয়াল

গল্পের মাস্তুলপুরী—জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস রায় প্রণীত,
“দেব-সাহিত্য কুঠার” কর্তৃক প্রকাশিত। গল্পের
সংগ্রহ—দাম মাত্র এক টাকা।

“মাস্তুলপুরী”তে মোট আটটি গল্প আছে। এই আটটি গল্পের সাহায্যে হেমেন্দ্রনাথ এক “মাস্তুলপুরী” গল্প করিয়াছেন। শ্রী-সাহিত্যও হেমেন্দ্রনাথের একটি স্থানান্তরিত গল্প আছে। হেমেন্দ্রনাথের সবল কল্পনা, স্থানান্তরিত রচনাশক্তি ও সহায়ত্বপূর্ণ গল্প নিজস্বই তাঁহার নিদর্শন। হেমেন্দ্রনাথের গল্প বলিবার ভঙ্গি অপূর্ণ। ছেলে-মেয়েদের মনও তিনি আকর্ষণ করিতে পারেন, কারণ তাঁহার মত গল্প নিরাপত্তা আর কেহ শ্রী-সাহিত্যে ব্রতী হইয়াছেন বলিয়া জানি না। লেখকের স্বভাবের দরদর স্পর্শেই গল্পগুলি প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। তাঁহার “মাস্তুলপুরী” রূপে ও মাস্তুল উদ্ভিদ হইয়া উঠিয়াছে। এ গল্পটিতে বেশিও প্রবেশ করিলে সেই শ্রী-গল্পই সেখানে আটক পড়িয়া থাকিবে—জাহাজই আসে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকিবে, একাইয়া চলিবে। আসিতে পারিবে না। স্বকবি হেমেন্দ্রনাথ এই

"মাছাপুতী" রচনার হেলেমেয়েদের কাছে গল্পের বাস্তব রূপে দেখা দিয়াছেন।

দ্বিতী পুঁচের চরবস্তীর বহু চিত্রে বইখান। পোড়িত হইয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর, নিপুণ, অপূর্ণ। পৃষ্ঠা ১৭৫। এত বড়—এত সুন্দর এবং এমন সচিব সত্তরপের নাম যে মাত্র এক টাকা, সেজন্য প্রকাশকে ধন্যবাদ

শ্রীশর্চান সেন

বড়-অবতারণ—শ্রীমৎসনাথ বসু প্রণীত, "গুহ্যমাল চট্টোপাধ্যায় এও সন্দ" কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা।

একখানি নাতিদীর্ঘ নব্বা—হুয় কর্ণার মধ্যে ছয়টা চিত্র সন্নিবিষ্ট, হুয় অক্ষরের পিরোনামাসূত্র, ছয়টা হাতরস-বহুল গল্পের সমষ্টি। সর্গসিক দিয়া বড়-অবতার সর্বস্বামী হুয়র হইয়া উঠিয়াছে। নিহক হাতরসের অবতারণা করাই যদি এককালের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে নিঃসন্দেহে বলা বাইতে পারে। "বিষয় বন্দেই" আর "সোড়ার গলদ" নামক দুইটা গল্প হাতরসের অন্তরালে চিত্রায়ন প্রদর্শন করিয়া রাখিয়াছে।

পুস্তকের ঐয়ক্তি করিয়াছেন বনামখ্যাত দ্বিতী শ্রীমুক্ত বতীজকুমার সেন মহাশয়। কামে কাজেই

বিশদ-বহু ও চিত্র-শোভা উভয়ই সমানভাবে উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীবিমলেন্দু কয়াল

Savarkar (V. D.) Hindu-Pad-Pad-shahi, or a Review of the Hindu Empire of Maharashtra. Madras : B. G. Paul & Co., 1923. Rs. 3

মহারাত্র-সাম্রাজ্যের উপান, সঙ্ঘি ও পতনের ইতিহাস। ঘটনাবলী অতি প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখিত। এই প্রেমের ঐতিহাসিক বিবরণ লাম্বরণ পাঠকেরও মনোরঞ্জন করিতে পারে।

Underwood (Eric G.) A Short History of French Painting. London, Oxford University Press. 1931. 4s-6d.

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান যুগ পর্য্যন্ত ফরাসী চিত্র-শিল্পের সঙ্ক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানিকে সহজবোধ্য করিবার ক্ষমতা ইহাতে বখাসাধ্য technical word বাদ দেওয়া হইয়াছে। ফরাসী চিত্র-শিল্প কিসের প্রতীক, প্রেত শিল্পীদের বৈশিষ্ট্য কি, এবং বিভিন্ন অতন-পদ্ধতির লক্ষ্যই বা কি—এ সকল বিষয়ের আলোচনা আছে।

এস, কুমার



শিক্ষানুষ্ঠানে

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী, বি-এ

তোমার ধর্ম তোমার কর্ম—তুমিই তা' ভালো বোঝ',
আমার চিত্ত জানিতেও নাহি চায় ;
আমি ভাবি—শুধু কি করিয়া তুমি মুক্তির পথ ধোঁজ',
প্রাণের সত্য কীদে যবে বেদনায় ।

ভগবান বল', পরকাল বল', যা বল'—রীতি বা নীতি,
শিপিয়াছ যাহা এই মানুষের ঘরে ;
কোন ভগবান দিবে সম্মান, মনে যার নাই অীতি,
কোথায় ধর্ম প্রেমছাড়া নাম ধরে ?

ভাবিতেছ মনে, কথার বঁধনে বুকি-বা ফিরা'তে চাই,—
এ কেবল তারি মুক্তির কৌশল !
যে প্রেম মরেছে, বাক্যের কুঁয়ে উড়াইয়া তারি ছাই,
দেখিবারে চাই—কোথায় চোখের জল ।

নহে গো বন্ধু, বিদ্যারের ক্ষণে লজ্জা দিও না আর,
আমার নহেক, তোমারই সে অপমান,
ধিকৃত বলি' যে প্রেমের তুমি ঋজিতেছ প্রতীকার—
লাঞ্ছিত তাহে তোমারই সে ভগবান ।

দেখেছ তাহারে—চিনেছ তাহারে—শুনেছ কি তার বাণী,—
মনের নয়নে অকুটি দেখেছ তা'র ?
পঙ্কের মাঝে কুটেছে পদ্ম, তাই বুকি তা'র মানি,
মিথ্যা তাহার সৌরভে অধিকার ।

মানুষের মনে দেখনি তাহারে, দেখেছ নয়ন ভরি'
 মন্দিরমাঝে দুয়ারের অবকাশে,
 শাখে তাহার শুনেছ শব্দ দু'টি হাত জোড় করি',
 অঙ্গগন্ধ পেয়েছ কি ধূপবাসে ?

সত্য স্থানে দেখিয়াছ শিব ভৈরবী-পদতলে,
 মিথ্যা স্থানে দেখেছ কি জীবদল—
 মুখ মায়ায় স্কুর পরাণ বুঝি বিনামের ছলে
 চীৎকার করি' কাটায় আকাশতল ।

জানীর ধর্ম জানীতেই বুঝে, আমি অভ্যাস অতি,
 চোখে দেখি যাহা, অন্তরে যাহা বুঝি,
 তারেই বুকের সত্য জানিয়া মিলাই মনের গতি,
 জীবন ভরিয়া বুঝি আর তাই বুঝি !

তোমার শাস্ত্রে মিথ্যা সে সব, মানুষের নাই টাই,
 মানব-অভীত মন যাহা, তারই পূজা !
 দুটি বাছ কেঁসে দুটি পায়ে ধরে, তার বেশে সেথা নাই,
 কোথায় সেথায় ত্রিনয়নী দশভুজা ?

সেই ভালো প্রিয়, তোমার ধর্ম থাকুক তোমার মনে,
 আমার মর্ম আমার বুকেই থাক্,
 মিথ্যা বাক্য মিথ্যা সে শুধু আজি এ বিদায়-সঙ্গে,
 মুখ প্রণয় থাক্ শোক-নির্বাক ।

ফিরে' লও তব পত্রের রাশি,—ঈতের শিশির মাথা—
 শীর্ণ শাখার স্থলিত আবর্জনা ;
 প্রেম-লেখা যত, অর্থবিহীন কীটের চিহ্ন আকা ;—
 এ বিদায়-বাণী ক'রো শুধু মার্জনা ।



(১)

আমি ইতিপূর্বে "উল্লেখ" যে-সব ধরে-বাইরের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, সে-সব প্রধানতঃ দেশী পলিটিস্ট ও বিশেষিত ইকনমিস্টের কথা; যদিও আমি পলিটিসিয়ানও নই, ইকনমিষ্টও নই। আমি যদি কিছু হই ত — সাহিত্যিক : অর্থাৎ সেই জাতের লেখক, যাকে অল্প কোন শ্রেণীতে ফেলা যায় না। দেশ-বিশেষের পলিটিস্ট ও ইকনমিস্ট সত্যে এ দুইয়ের লোক সম্পূর্ণ উদাসীন হতে পারেন না'; কেননা, এক জাতির মনের সঙ্গে অপর সব জাতির মনের যোগ আছে ঘটেছে। এর ফল ভাল হয়েছ কি মন্দ হয়েছ, তা' বলা কঠিন। অবশ্য পৃথিবীর কোন কোন জাতি অপর দেশ থেকে নতুন idea-র আমদানী বন্ধ করতে চান। কেবল যে বিদেশী মালের আমদানীর পথে সে-সব জাতি প্রাচীর তুলে দিচ্ছেন, তাই নয়; নতুন মতও বরফট করছেন।

জেরিন Julian Huxley-র একথানা বইয়ে পড়লুম যে, হুজিয়াতে এখন Wells-এর Outlines of History নামক বিখ্যাত পুস্তকের প্রবেশ নিবেদ। Julian Huxley বিলাতের একজন প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক, কিন্তু তিনিও idea-র এইরূপ অবাধ ব্যক্তিগত পক্ষপাতী নন। তাঁর কথা এই —

"One wonders sometimes just what would happen if young Communism were suddenly subjected to all the blasts of doctrines current in other countries. Perhaps freedom of ideas is confusing after all."

তা' হতে পারে; কিন্তু আমরা পলিটিস্ট ও ইকনমিস্ট সত্যে ইউরোপীয় মতামত, "কুই, নেহি ত থোড়া থোড়া" ভনতে বাধা।

(২)

এখন এই দেশ-বিশেষের কথা, আমাদের এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায় নীর হাঙ্গেবে কথা কয়, অপরের মনকে শূণ্য করার ক্ষমতা। সেই ক্ষমতাই অপরের কথা আমাদের মনকে শুধু ছোঁয় না, নাড়াও দেয়; আর সে মনকে অপ্রবৃত্তর ব্যতও করে। এই কারণে আমি পলিটিস্ট ও ইকনমিস্ট শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ না হলেও, ও-সব বিষয়ে টীকাটিকিনি কাটবার অধিকার আমার আছে। সুতরাং দেশ-বিশেষের পলিটিক্যাল ও ইকনমিক্যাল হাল-চাল সত্যে ঠ'চারটি উপর-চাল দিতেও কুণ্ঠিত হইনি।

আমি বা' পূর্বে বলেছি, তার একটিও আশার কথা নয়; প্রায় সবই আশঙ্কার কথা। তাই এই পৃথার সমস্ত সে বিষয়ে নীরব থাকব মনে করেছি। এ সমস্তা ঘেলে আনন্দের সময়, সুতরাং যে কথা শুনে লোক নিরানন্দ হতে পারে, সে কথা এখন না বলাই শ্রেয়। শুধু তাই নয়, এ কটা দিন হাঙ্কের মন বর্তমানের বন্ধন কাটিয়ে আমাদের অতীতে হাঙ্কা বদলাতে যার—যে অতীতে হাঙ্কের জীবন একটা গুরুতর ছিলনা বলে আমাদের বিশ্বাস। বিজয়র পরেই আমরা আবার সকলেই মনে ও প্রাণে বর্তমানে ফিরে আসব, আর অল্পসমতা, বঙ্গসমতা, অরাজ-সমতা, হরিজন-সমতা নিয়ে যাব।

স্বাধীন ও স্বাধীনিক করব। ইতিমধ্যে আমাদের মাতৃভাষা সম্বন্ধে চুঁচোর কথা বলা বাহুল্য। এ কথাটা যে ঘরের কথা। তা' বলাই বাহুল্য; আর আমাদের মত সাহিত্যিকদের পক্ষে মতো মতো ভাষার কথাটা বরণ করাটাও স্বাভাবিক।

(৩)

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রাও কিছুদিন থেকে, আমাদের মামুলি শিক্ষা যে লোকের জানও বেশি কিছু বৃদ্ধি করছে না, আর শিক্ষিত সম্ভ্রমাব্যের অন্তরে চিত্তা-শক্তিও জাগ্রত করছে না, এই মত প্রচার করছেন। বার মাসের বাঙালার একজন শিক্ষাগুরু এবং তাঁর এ মত শিক্ষাপ্রেক্ষিতানের অভিজ্ঞতার উপরেই গড়ে উঠেছে। তাঁর মতে আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির বার্ষিকতার মূল কারণ এই যে, আমাদের মাতৃভাষা আমাদের শিক্ষার বাহন নয়।

এ মতটা অবশ্য নূতন নয়। বহুদিনের যখন “বঙ্গবর্নন” প্রথম প্রকাশ করেন, তখন এবিধর কিঞ্চিৎ আলোচনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেকালে লোকে নাকি এই প্রশ্ন তুলেছিল যে, বাঙালার “গড়নার মত বই নেই; অন্তএব গড়ব কি?”

তারপর রবীন্দ্রনাথও বহুকালাবধি এই কথাই বলে আসছেন। এবং হুগে হুগে শিক্ষিতাভিমাত্রী লোকেরা তাঁর কথা কবির কথা বলে উল্লেখ করে এসেছেন।

তারপরে আমিও এঁদের পন্থাহরণ করে এই কথাটারই পুনরুক্তি করি। যে সভার এ বিদ্যুৎ আমি আলোচনা করি, সে সভার সভাপতি ছিলেন সার আওজোব মুখোপাধ্যায়; এবং তিনি আমার মতামত গ্রাহ্য করেন। তা'হলেও, আমাদের কথার সমাজের মোহনিত্রা ভাঙেনি।

এখন খ্যাতনামা অধ্যাপকরা যখন সেই পুরোনো কথা আবার নূতন করে বলছেন, তখন আপা করি এ বিষয়ে সমাজ নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে না। সাহিত্যিকদের কথা হলে উল্লিখিত যেহেতু বার —

কিছু ধারা শিক্ষিত সম্ভ্রমাব্যকে নিজহাতে গড়ে তুলছেন, শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁদের কথা উপেক্ষা করা দুরূহ।

(৪)

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রাও একমাত্র অধ্যাপক নন, তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে এ বিশ্রোহের স্বর তুলেছেন। সম্ভ্রান্তি শ্রীমুক্ত বিনয়কুমার সরকার ‘প্রবর্তক’ পরে ইংরাজি ভাষার একটি মাতিত্বের প্রবন্ধ লিখেছেন, বার শেষকথা এই যে, — বাঙলা শিক্ষার বাহন নয় বলেই, আমাদের পলিটিকাল মন এখন আকাশে তুলছে; সে মনকে আবার বাঙলার মাটিতে নামাতে না পারলে আমাদের পলিটিকাল বলা-কওয়া অনেকটা নিষ্ফল হবে, যেমন আচ্ছন্ন হচ্ছে। তাঁর আসল বক্তব্য এই যে, আমাদের idealism হচ্ছে ইংরাজীতে ল্পনের ভাষায় বাক্য বলে একটা abstract মনোভাবের মোহ; সেই মনোভাবকে concrete করার দিন আজ এসেছে। আর মাতৃভাষা আমাদের শিক্ষার বাহন হ'লে, মাতৃভূমির প্রতি আমাদের মনের চান বাড়বে।

আমি সোচ্চারেই বলেছি যে, আচ্ছন্ন আমি কোনরূপ পলিটিকাল অথবা ইকনমিক সমস্যাকে ল্পণ করব না। কিন্তু এ কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, বাকি ভারতবর্ষকে বাহ দিয়ে একমাত্র বাঙালী nationalism-এর চর্চ্চা এ হুগে কর্তব্যও নয়, লভ্যও নয়। অধ্যাপক সরকার ইংরেজের বেস-ব দেশের উল্লেখ করেছেন, কথা মার্কানি, ফ্রান্স ইত্যাদি, সে-সব দেশের লোকের মনোভাব আমরা আচ্ছন্ন করতে পারব না। কারণ এ-সব বেশ পরম্পরবিরোধী, এবং এই বিরোধই সে-সব দেশের জ্ঞানানালিষদের প্রাণ।

ভারতবর্ষে এক প্রদেশের সঙ্গে অপর প্রদেশের এইরূপ মনোবাগিষ্ঠের সৃষ্টি কি কামা? অবশ্যই নয়। বহুকে এক করার প্রযুক্তি ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম; নিবিল ভারতকে পলিটিকালি এককোষে করার

প্রতি এই সনাতন মনোভাবের নূতন বিকাশ
হয়। আমার অন্তঃ বাহ্যাদী পেট্টুটিজন্ম বধেই
আছে ; কিন্তু বাস্তবায়ন বসন্তে আমি বিরোধ ক্রিয়নে ।

(৫)

বাঙাল্য ভাষা আমাদের শিক্ষার বাহন না হওয়ার
নকশা আমাদের শিক্ষার কি বিভ্রাট ঘটেছে, সে
কথা ও অনেকে বলেছেন ও বলছেন । কিন্তু
বিশিষ্টভাবে এ ভাষার অগ্রগণ্য স্থান নেই বলে
বে আমাদের স্বাভাবিক সর্বাঙ্গিকতার হয়ে উঠছে
না, এ সত্যটা অনেকের চোখে এড়িয়ে গেছে ।

আমি কেনের শিক্ষা সঙ্কে বোটেই উদাসীন
নই ; হৃদিত অধ্যাপনা আমার বাসনা নয় । এহলে
আমি বস্তুভাষার সর্বাঙ্গীন সৃষ্টির প্রধান অন্তরায়
কি, সেই সঙ্কে ছুঁচার কথা বলব ।

ভাষা শুধু তাবের ভাষা নয়, জ্ঞানেরও ভাষা ।
এমন কি কবিরের ভাষা যে জ্ঞানের উপর কতটা
নির্ভর করে, তা' পাঠকমাজেই জানেন । জানক্য-
চীন কবিরের ভাষা "হা হুচান" মাত্র ।

এমন আমাদের ভাষা যে নানাকল্প জ্ঞান-
প্রকাশের ভাষা হয়ে ওঠেনি, তার প্রধান কারণ
এ ভাষা আশে ও আমাদের বিজ্ঞানিকতার ভাষা নয় ।

মাজেই থাকে মনোভাব বলে, তা' বহুল পরিমাণে
মাজেই জ্ঞানের উপর নির্ভর করে । অল্প
আমরা অনেক নূতন জ্ঞান ইংরাজী ভাষার মারফৎ
লাভ করেছি । আর তার প্রত্যয় ও আমাদের
সাহিত্যে শ্রুতি । কিন্তু সে-সব জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা
বে শিক্ষিত সশ্রদ্ধারের মনে বসেনি, তার প্রমাণও
নিজ পাঞ্জা যায় । এই বিদেশী ভাষার শিক্ষিত
আমাদের মনে এ-সব জ্ঞানবিজ্ঞানও 'বিশেষ' থেকে
হয় ; অর্থাৎ সে-সব আমাদের অন্তরঙ্গ হয় না ।

(৬)

বাঙাল্য ভাষার উন্নতির বাস্তব পদ্ধতি নাই, না হয়,
সে বিধে আমরা সকলেই আগ্রহবান । কিন্তু

এই হলে আমরা সাহিত্যিক অসাহিত্যিক মিলে
যে বলা করেছি, সে সবই অনর্থক । অর্থাৎ এ
মুখে বাঙাল্য ভাষার বহিঃরূপ বদলে দিয়ে থাকে
ও, সে রূপান্তর ঘটেছে আমাদের ভুক্তের প্রমাণ
নয়, লেখকদের মূল্যোপযোগী লেখার ভূমি ।

একটা উদাহরণ দিই । "সবুজ পত্রের" আবির্ভাবের
সঙ্গে সঙ্গেই একটা মহা তর্ক ওঠে ; সে তর্কে আমিও
যোগ দিই, অথচ সে তর্কটা যে নেহাৎ প্রয়োজনীয়
হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । "সবুজ পত্রের"
ভাষাকে অনেকে বীরবলী ভাষা বলে অপাঙক্তের
কববার চেষ্টা করেন । অথচ বীরবলী ভাষা বলে
কোন নূতন ভাষার সৃষ্টি হয়নি । বীরবলের লেখাতে
একটা নূতন ভাষা ছিল, কিন্তু এ ভাষা ভাষার ভাষা
নয়, —বীরবলের কলমের ভাষা অর্থাৎ মনের ভাষা ।
সে ভাষা কেউ পছন্দ করেছেন, কেউ অপছন্দ
করেছেন । কিন্তু বীরবলের লেখা গড়ে কারণ
ওর পাবার প্রয়োজন ছিল না । কারণ লেখক
মাজেই যে উচ্চ ভাষা অবলম্বন করবেন, তার বিষ্ণু-
মাত্রও সম্ভাবনা ছিল না । এর কারণ, প্রতি
লেখকেরই একটি নিজস্ব ভাষা আছে, এবং পরের
ভাষার অগ্রগণ্য করলে, শুধু পরের লেখার জেটানি
হয় ; লেখকের বীষ শক্তি ফোটবার অবকাশ পায়
না । টাইল একজনের ভাল কথা পাতা পাতা হতে
পারে ; কিন্তু অপরের টাইল নকল করলে, সে নকল
জেতে যেতে বাধ্য ।

(৭)

এই সঙ্গে আর একটি তর্ক উঠল ; —বাঙাল্য সাহিত্যে
"চলতি ভাষা" চলবে কি না, এই হল বিচার্য । "চলতি
ভাষার" অর্থ বোধহয় সেই ভাষা, যে ভাষা লেখার
চলে না, কিন্তু বাঙালীর মুখে মুখে নিত্য চলে । অর্থাৎ
মুখের ভাষা ও লেখার ভাষার ভিতর একটি অলঙ্কার
বাবধান আছে, যে প্রাচীর "সবুজ পত্রের" কল দিন
হুগুণে টপ্‌কতে চাচ্ছেন । কিন্তু মাধু ভাষার সঙ্গে

চলতি ভাষার প্রভেদ কোথায় এবং কতখানি, সে কথা কেউ বলেন নি; বরং বা' বলেছেন তা' -হাস্যকর। বহুকাল পূর্বে চরমপন্থি জায়গার বলেছিলেন যে, বহুমূল্যের 'দুখানিনী'র ভাষা আর 'হুতোম পাঁচার নজার' ভাষা একই ভাষা। এর বহুকাল পরে আবার একমুগ ক্রিটিক বলেছেন যে, সুদূর পূর্বের ভাষা হুতোমি ভাষা। এই দুই উক্তিই লম্বা দূর, অর্থাৎ সমান মিথ্যা। ভায়রর মহাপন্থের ভাষাজ্ঞান ছিল না, আর হাস ক্রিটিকের হুতোম পাঁচার নজার সঙ্গে পরিচয় নেই। নইলে এমন কথা তাঁরা মুখ ফুটে বলতে পারতেন না। কিন্তু এ-সব মতামত যে কত বাস্তব তার প্রমাণ এই যে, যে ভাষাকে তাঁরা অচল বলেছিলেন, বর্তমান সাহিত্যে সেই ভাষাই বেশি করে চলছে। উল্লু সাহিত্যিকেরা প্রায় সকলেই এই চলতি পথে চলছেন। আর এই ভাষা জীবন হাতে পড়লে যে কতদূর স্বন্দর ও সবল হয়ে উঠতে পারে, তা' কেউই বহীষ্করণের এ হুসের পন্থ পড়বেন তিনিই দেখতে পাবেন।

(৮)

আমি যে "চলতিভাষা বনাম সাধুভাষা"র কথা ফুসেছি, তার উদ্দেশ্য উল্লু বানি ভরুক আবার চাটকা করা নয়। হুধু এই দূর সেবকদের কাছে নিবেদন করতে চাই যে, আমি যে চলতি ভাষায় লিখতে হুক করি, তার কারণ নিম্নের মনেও এ বিষয়ে কোন ভরুক করে লিখতে বসিনি। আসে লিখেছি, তারপরে ভরুক করেছি।

আমি যখন প্রথম বাঙলা লিখতে আরম্ভ করি, তখন অবস্ত সাধুভাষাতেই লিখি। মহাশয়রা যে পথে দিয়েছেন, স এম পথঃ—এই বিশ্বাসবশতঃ। কিন্তু ঐ ক্রমিক ভাষায় লিখতে পথে পথে বাধা অধস্তন করতুম। তার ফলে বাঙলা সাহিত্যিক ভাষার হুক্তি কোনও পথে, এ প্রায় আবার মনে হুইই উষ হুয়, এবং আবার প্রকৃতি আমাকে বেধিয়ে দেয় যে, হুক্তির পথ এই

চলতি পথ। এ পথ অবলম্বন করে আমি আবিষ্কার করলাম যে, আমি বা' বলতে চাই তা' অবাধে বলতে পারি। এইই নামে ভাষার হুক্তি।

অবস্ত রচনার এ রীতির বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে। অনেকে বলেন যে, "সুদূর পূর্বের" ভাষার প্রধান দোষ এই যে, সে ভাষা সংকটবহুল। চরমপন্থি চরম সমাজপন্থি আমাকে মুখে বলেছিলেন যে, আমাদের ভাষা তাঁর মাতামহের ভাষার অপেক্ষাও সঙ্কট দখে জারাজার। এ কথা শুনে আমি বিচলিত হই নি, কারণ যে সাহিত্যিক হুক্তিলাভ করেছে, গমনির্জাচনে তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।

(৯)

পথটা যে শুধু আমার পক্ষে নয়, অনেক লেখকের পক্ষেই হুক্তির পথ, তার প্রমাণ উল্লু লেখকেরা অনেকেই এই চলতি ভাষার সাধ্যবোই আত্মপ্রকাশ করছেন। উল্লু লেখার হুক্তি অনেক দোষ আছে। কিন্তু তাঁদের কলমের মুখে বাঙলা গল্প যে অসুখী ঐ ও শক্তি লাভ করেছে, এ কথা কোন সাহিত্যিকই অস্বীকার করতে পারবেন না।

আমাকে আমার প্রধান বক্তব্য কথা হচ্ছে এই যে, বাঙলা ভাষা জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাষা না হয়ে উঠলে, স্বার্থ সাবালক হয়ে উঠবে না।

আমি পূর্বে বলেছি যে, ধারা ইকনমিক পারের চর্চা করেন, তাঁদের মধ্যে হু-একজন, যথা অধ্যাপক বোধিশিচর সিং এবং ঐশ্বর্য অনাথ গোপাল সেন, অতি সহজ ও পরিষ্কার ভাষায় আমাদের ইকনমিক্সের কথা গুনিয়েছেন। ঐশ্বর্য বোধিশিচর সিং আমাকে মুখে বলেছেন যে, তিনি প্রথমে সাধু ভাষায় লিখতে চেষ্টা করেন, কিন্তু হু'পাতা লিখেই তিনি আবিষ্কার করেন যে, উল্লু ক্রমিক ভাষায় তাঁর বক্তব্য কথা প্রকাশ করতে পারছেন না। তখন তিনি এই চলতি ভাষায় আসার গ্রহণ করেন। ফলে তাঁর

আয়ত্ত বিজ্ঞান ভাগ আমাদের মত সাধারণ পাঠকদের দিতে পারছেন। আর খারা New Physics-এর নতুন কথা বাঙালী পাঠককে শোনাচ্ছেন, তাঁরাও রচনার এই রীতিই অবলম্বন করেছেন। এর থেকে আশা করা যায় যে, আমাদের মাতৃভাষা শুধু ভাবের নয়, অচিরে জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাষাও হয়ে উঠবে। মাতৃভাষার প্রজ্জ্বল শক্তির উপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে, যদিও আমার শিক্ষাদীক্ষা সবই হয়েছে বিদেশী ভাষায়।

(১০)

বাঙলা ভাষা আমাদের শিক্ষার বাহন না হলে আমাদের শিক্ষাভার চেষ্টা যে অনেকাংশে ব্যর্থ হবে, এবিষয়ে আজকের দিনে সাহিত্যিক ও শিক্ষকেরা একমত।

এ দেশে শিক্ষাপ্রচারের বর্তমান যত্ন হচ্ছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় — আর বিশ্ববিদ্যালয়ও বাঙলা ভাষায় প্রবেশের জন্য একটি শিড়িকির ছুরের খুলে দিয়েছেন। ঐ সংকীর্ণ দ্বার দিয়ে আমাদের মাতৃভাষা যে উজ্জ্বল বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে অধিকার করে নেবে, — এ আশা ছরাশা। কারণ

বিশ্ববিদ্যালয়েরও একটা বাবহারিক মন আছে, সে মন সাহিত্যিক মনের অতুগমন করে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্যাক্তিরা আমাদের পাঁচ বিঘর শেখাতে চান, কিন্তু নিজেরা কিছু শিখতে চান না। যদার্থ শিক্ষা যে কাকে বলে, সে সম্বন্ধে তাঁরা মাথা ঘামান না; কিন্তু শিক্ষার পদ্ধতি যে কি, তা' তাঁরা জানেন। সুতরাং উক্ত পদ্ধতির সঙ্গে ঘা' খাপ না যায়, এমন কোন জিনিষের তাঁরা তোয়াক্কা রাখেন না। এই কারণে মনে হয় যে, বাঙলাকে শিক্ষার বাহন করবার পূর্বে, তাঁরা একটি নতুন “ন তৃত ন ভবিষ্যতি” পারিভাষিক ভাষার সৃষ্টি করতে ব্রতী হবেন; — যে ভাষা বাঙালী বিজ্ঞানীদের কাছে একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত ভাষা হবে।

তাঁরা ভুলে যান যে, পারিভাষিক ভাষা আমাদের ঐ মৌখিক ভাষা থেকেই ক্রমবিকশিত হয়, যেমন অপর সকল দেশেই হয়েছে; এবং তার অল্পপুষ্টি করবার জন্য ইংরাজী ভাষা থেকে বহু শব্দ টেনে নিতে হবে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা কারণ private property নয়। অতএব এ আহরণ হরণ হবে না।

শ্রী প্রমথ চৌধুরী



সাম্মিলিকী

৬খারিদীয়া

কালের প্রবাহ আপেকারই মতো ব'য়ে চলেছে, তার মাঝে চিরপ্রাচীনারী জেলে এসেছে সেই চিরদিনকার জননীর বোধন-ময়। যে আনন্দের লাড়া বেশে মেলে প'ড়ে গেছে, নিরানন্দের নয় তপ যে তার মাঝে ফুটে ওঠে না, এমন কথা বলা যায় না। ভবুও অনাদি কালের শাশ্বত সেবতাকে আবার বরণ করে নেবার ক্ষমতা বাক্য হতে হয় : তৃষ্ণিতের আর্জনা, বৃহক্ষিতের করুণ ক্রন্দন, গৃহহীনের বেদনা, নিশ্চেষ্টিতের জীবন-মালা আবহমান কাল ধরে ফুটে চলেছে—অনেক দূরে, অনেক উচ্চের সেই অসীম সেবতার চরণে—বৃষ্টির মোহে! ভবুও সমস্ত কুঠী, সমস্ত মানি, জীবনের সমস্ত বেদনা দূরে কেলে রেখে দিতে হয়, চিরজনীর আগমন-দিনে।

শরৎচন্দ্রের জন্ম-বার্ষিকী

বকের অপরাহ্নের কথামিষ্টী শরৎচন্দ্রের অষ্ট-পঞ্চাশৎ জন্মতিথি উপলক্ষে গত ৩১-এ ভাত্র, শনিবার, 'উদয়ন'-কার্যালয়ে এক উৎসব-বাসরের আয়োজন হয়েছিল। বহু গণ্যমান্য জ্ঞানহোমর ও সেন্স-নাট্যকর উপস্থিতিতে সতানগুণ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। শ্রীমুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শরৎ-সাহিত্য-সম্বন্ধে এক সারগঠ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে শরৎচন্দ্রকে 'উদয়ন'-র পক্ষ থেকে

তার দীর্ঘজীবন কামনা করে অভিনন্দন পর ও একটি 'কাউন্টেন্স পেন' উপহার দেওয়া হয়। পরিশেষে মেঘর শ্রীমুক্ত সন্তোষকুমার বহু মহাশয় সভাপতিক ধন্যবাদ প্রদান করেন। আমরা শরৎচন্দ্রের পৌরবসর দীর্ঘজীবন কামনা করছি।

নারী-হরণ

হীনতির যে মানি আঁক দেখা দিয়েছে বাংলাদেশে, সে শুধু হিন্দুদের একান্ত মানির কথা নয়, তা বাংলাদেশ সমস্ত সভ্য-সমাজের মানি। তার মাঝে শুধু হিন্দু নেই, মুসলমান আছে, খিষ্ণ আছে, খ্রীষ্টানও আছে। মাতৃজাতি যখন বিপন্ন, সে দোষ তখন শুধু হিন্দুর নয়, সে দোষ সমস্ত দেশের। বাংলাদেশে সম্মিলিত জাতি-সমাজ কাছে কি এই মানবতার দাবী ওঠান কেতে পারে না। এ ত আর বর্তমান ভারতীয় স্বাধীনতার সাম্প্রদায়িকতার গতির মাঝে এসে পড়ে না। ভবুও নিত্যন্ত জুগের সহ্য বলতে হল, সেদিন (১লা সেপ্টেম্বর, চক্রবর্তী) নারী-স্বর্ঘ্যাদা বন্ধার ক্ষমতা যখন অনেক সমবেত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে 'বর্ণ'-বৈচিত্র্যের নিজস্ব অভাব ছিল। ভবুও অধ্যাপক আচার্য রত্নিম অম্বপতিভগবতের উদ্দেশ্যে যে সতর্ক-বাণী পাঠিয়েছেন তা বোধহয় অনেকেই শুনে থাকবেন। তার এ নিতীক উজ্জ্বল শুধু আশ্বত্ব হলে চলেবে না, প্রাচীন ভারতের নারীর বীর্য-কাহিনী দিকে দিকে প্রচার করতে হবে।

নারীর গুপ্ত সৌর্যকে ফিরিয়ে আনতে হবে। একথা বাঙালার মহীয়সী মহিলা মনুস্বরের রামমাতা। পুন্ডরীক। হুচি মেবী দেশবাসীকে স্বরণ করিয়ে দিয়েছেন। সেদিনের সেই সভাগৃহে তিনি হৃদয়কণ্ঠে বলেছেন,—“যারা জননী-ভগিনীর মর্যাদা রক্ষা করতে সক্ষম নয়, তাদের জীবন ধারণ করাই বুঝ। যে দেশে নারীর অবমাননা সম্ভব হয়, সে দেশের কোন উন্নতির আশা করা যেতে পারে না।” সমাজের ধারা ভিত্তি, মনুস্বরের ধারা মেকবও, সত্যনের ধারা। সত্যনিষ্ঠী তাঁদের পদে পদে লাহিত হতে দেখা ব্যাবিকই অস্বাভাবিক নয়। পুন্ড সত্যনেরই পোতা পাথ। বাঙালার পুন্ডরীক দেশনারকগণের সম্মিলিত আত্মনা-ময়ে দেশমানি দুরীকরণার্থে অব্র ভবিষ্যতে যে প্রেক্ষিতা বরগ্রপে আবিস্কৃত হবে, আমরা তার সর্গাঙ্ককরণে সাক্ষ্য কামনা করছি। দিকে দিকে নারীরক্ষী দল ও নারীকল্যাণমিতির বহুল প্রচার আমরাও ইচ্ছা করি, কিন্তু তা বেন সুপরিচালিত হয়।

আমরা পূর্বে একবার বলেছি, হিন্দু সমাজের লোকে পরম্পরের প্রতি সহ্যহুত্বহীন হওয়ার নারী-করণ ব্যাপারে দুর্জয়তার সুযোগ হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে হিন্দুসমাজেরই সম্ভবতঃ হওয়া উচিত।

ধর্মিতা হিন্দু-নারী

আমি হিন্দু-নারী আত্ম-বিস্মৃত হয়ে পড়েছি। পূর্বে পরিহার কথা আমি শুধু ইতিহাসের পৃষ্ঠা আলোকিত করছি। বিবাহিতা ও অবিবাহিতার কথা বাদ দিলে, দেখা যায় অনেক বিধবাও ধর্মিতা হচ্ছে। হুহু বিধবা একাকিনী নিঃশব্দ জীবনযাত্রার সঙ্গনে কিরহে—এমন সময় তার হৃদয়ের কবলে পড়া মোটেই অসম্ভব নয়, অথচ একত্রে সে মোটেই দারী নয়। একপে ধর্মিতা বিধবা, বিবাহিতা বা অবিবাহিতার সংখ্যা মোটেই কম নয়। সমাজ যদি তাদের আগ্রহ না দেখে, তবে অচিরে সমাজের আরো অন্ধহানি হবে। তাদের

অবহেলা করা অর্থ তাদের মনুস্বরের দাবীকে অবহেলা করা, তাই এখন সারা দেশের ঐচ্ছিত দেখা যে ধর্মিতা নারী সমাজে স্থান পায়। যদি ধর্মিতা বিবাহিতা হয়, ও সে স্থানী গৃহে স্থান পাক, যদি বিধবা বা অবিবাহিতা হয়, তবে তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হোক এবং সমাজ তাদের সর্গমানি ধুয়ে ধুয়ে দিক।

হিন্দু অবালা আশ্রম

হিন্দু অবালা আশ্রমসমূহ যে মহান কর্তব্যভার বহন করে চলেছে, তাদের সেই ব্যাক্যের পঞ্চ হুসন হোক। সমাজগতের মারক্য কুক্ষিমন বরহা বিবাহেচ্ছু আশ্রমবাসিনীর ক্ষত্র উপহৃত পাত্রে-আবেশন করা হয়েছে বাঙালার হৃদয়কণ্ঠের নিকট। মরশোখুণ্ড আত্মিক রক্ষা করার তার তাঁদের উপার। বাঙালার হিন্দুর জীবন-মরণের সন্ধিক্ষেপে হিন্দু-নারীর মর্যাদা। রক্ষার যদি হিন্দু-পুরুষ বরহান না হয়, তবে এই মরশোখুণ্ড আত্মিক কে রক্ষা করবে? যাদের মাতা-ভগ্নী বিপত্তা তাদেরই আত্মলগ্নান রক্ষার ক্ষত্র সাধ্যাহুত্বপে চেষ্টা করতে হবে। এ সাধু-প্রচেষ্টা মনুস্বর হোক, চারিদিকে সুপরিচালিত সহস্র আগ্রহ প্রকৃষ্টি হোক! একপে প্রকৃষ্টিানের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার একমাত্র উপায় ইহাদের পরিচালনায় উপযুক্ত পরিমাণে সাধারণের প্রতিনিধি রাখা।

বিধবা-বিবাহ

বিধবা-বিবাহ প্রচারকরে বাঙালার দেশে যে সমস্ত প্রকৃষ্টিানের উদ্বব হয়েছে, নবধীপের “বিধবা বিবাহ সহায়ক সভা” তন্মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। বিপত্ত আশ্রম ও জ্ঞান সাধনের মতো এই সভা ও ইহার শাখা-সভার অস্তিত্ব হয়ে ২৮টা বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমরা এই সভা ও ইহার মত অস্তিত্ব সভার সর্গাঙ্কীয় সাক্ষ্য কামনা করি। হিন্দুধর্মের, হিন্দুসমাজের সম্মান সাধন করার যদি কোন প্রয়োজনীয়তা

থাকে, তবে সে লঙ্ঘন-কার্যের প্রশংসা আরম্ভ হওয়া উচিত এইখানে। চিরপুরাতন সনাতন এলাই যদি মূর্খ জাতির আরও মরণোন্মুখ করে তোলে, তবে সে এখার বড় শীঘ্র উদ্বেগ হয় জাতির পক্ষে ওইই মঙ্গল। আমরা পরবর্তী সংখ্যার বিবাসের ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠিত "বিভাদাপত্র বাণীতবনে"র লক্ষ্যই ইতিহাস প্রকাশ করব। এই প্রসঙ্গে আমরা এক বিশিষ্ট নারীকল্যাণকামীর কথা উল্লেখ না করে থাকতে পারলাম না।

মহেশচন্দ্র আতর্ষী

বঙ্গ ১৩ই তার মঙ্গলবার বেলা তিন ঘটিকার সময় শ্রীকৃষ্ণ মহেশচন্দ্র আতর্ষী মহাশয় পরগণাকে গমন করিয়াছেন। এই নারীকল্যাণরত্নীর মহাপ্রয়াণে বাঙালার হিন্দুসমাজের যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়। নারীর কল্যাণকে যিনি জীবনের ব্রত বলে মনে করেছিলেন, নারীর মর্যাদা রক্ষা করা যার জীবনের প্রো কাম্য হয়েছিল, বর্তমানে বাঙালী জাতি যখন নারীনিগ্রহের বাধ্য কাঁড়ের মধ্যে লস্কর হবার চেষ্টা করছে, তাঁরই প্রাকালে অস্বাভাবিক মহেশচন্দ্রের জিরোস্তাব নিত্য বিধাৎমতক। আমরা এই বর্গগত কর্তার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সহবেদন প্রকাশ করছি।

নারী-শিক্ষা

যেহা শ্রীকৃষ্ণ সন্তোষকুমার বহু মহাশয় নারী-শিক্ষা সমিতির উদ্যোগে সাহুত এক সভার নারী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেন। প্রাচীন ভারতের সম্মতি, উত্তরভারতী, খনা, নীলাবতী প্রভৃতি বিদ্যুদী মহিলায় কথা অনেকই জানেন। নারী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সন্দেহ কাহারও কোন মতবেশ নাই; থাকতেও পারে না একথা

আচার্য্যদেবও বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন— "দী-শিক্ষা জাতির জীবনে একটি স্বভাবমিথ বস্তু, জ্ঞান, নব্যকৃতি প্রভৃতি যেনে দী-শিক্ষার বহন প্রদত্তে তৎক্ষণে জাতিসংস্কৃতির পক্ষে যেরূপ ক্রান্ত বাবিত হয়েছে, তাহা কাহারও অবিশিষ্ট নাই। কিন্তু হুৎথের বিষয়, বাঙালী দেশে দী-শিক্ষা অধিক বিস্তার লাভ করে নাই। ১৯০১ সালের আদম-শুমারী রিপোর্টে দেখা যায় বাঙালী দেশে তিনবছর মধ্যে পঠকরা ২২ জন পুরুষ ও ৪ জন স্ত্রী এবং দুশ্লমানদের মধ্যে পঠকরা ২ জন পুরুষ ও ১৪ জন স্ত্রীলোক মাত্র শিক্ষিত।" অজ্ঞাত সভ্য দেশের কুলনার এই অপ্রীতিকর সভ্য তথ্যটি আমাদের বর্তমান জাতির জীবনের পক্ষে নিত্য লঙ্ঘন কথা। পূনর্বার আচার্য্যদেব বলেছেন— "দী-শিক্ষা বিস্তার আমাদের প্রধান সভাব শিক্ষারত্ন"। আমাদের মনে চপ, এছাড়া আরও অনেক কারণ আছে। জাতির কুলনারও এই কাছ আমাদের অনেক বাধা আছে। অবরোধ-প্রথাও এর ক্ষত যথেষ্ট দারী। তার উপর জাতির অর্থহীনতার কথা বলাই বাহুল্য। নানা কারণে একটি বাগিকার শিক্ষাদানের ক্ষত যে অর্থব্যয় হয়, তার পরিমাণ একটি বাগিকার শিক্ষা-ব্যয়ের চেয়ে অনেক বেশী। এইরূপ বিভিন্ন কারণ-বশতঃ উপযুক্ত শিক্ষা-প্রজ্ঞানের যে অভাব হয়েছে তা শ্রীকৃষ্ণ হানানন্দ চৌধুরাচার্য্য মহাশয়ের উক্তি থেকে বেশ বোঝা যায়। তিনি দেখিয়েছেন— "বাঙালীদেশে হেলসের শিক্ষার ক্ষত ম্যাট্রিক বিভাগের ১১০০টি; কিন্তু মেয়েদের ক্ষত মাত্র ৫৩টি; মহা-ইংরাজী বিভাগের হেলসের ক্ষত ১৮১৫টি; কিন্তু মেয়েদের ক্ষত মাত্র ৫১টি; হাইকৃতি বালক বিভাগের ৫৫টি; বালিকাশ্রমের ১২টি; বালক প্রাথমিক বিভাগের ৪২,১২২টি; কিন্তু মেয়েদের ক্ষত ১৬,০০০টি; শিক্ষকতা কার্যে শিক্ষা দিবার ক্ষত পুরুষবিভাগের ৫২টি কিন্তু মেয়েদের ক্ষত মাত্র ১০টি।" এই থেকে সহজেই অসম্ভব করা যায় উপযুক্ত নারী-

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আমাদের এখনও কত অভাব রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে এখন অধিকাংশ স্থানেই একটা ছোটর বিপণ্য দেখা দিয়েছে; তাই চারিদিকে বায়স্কোপের বেশ একটা আন্দোলন পড়ে গেছে। এখন একটা জাতির হিতকর কার্যে অর্থব্যয় হলে, তা সংকোচে এবং পঠন-শুণক জাতীয় উন্নতির উত্তরোত্তর বাধা করা হবে, তাতে কারও মতঃস্থ থাকতে পারে না। তবে নারীর শিক্ষা-প্রণালী কিরূপ হবে সে বিষয়ে অনেক-কিছু বলা যেতে পারে। আমরা এ বিষয়ে সচল সরকারের শিক্ষা-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত নরী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

স্বদেশী প্রদর্শনী

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর “ওয়েলিংটন পার্কে” স্বদেশী প্রদর্শনীর উদ্বোধন-কার্য শেষ হয়ে গেছে। ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারকল্পে এই প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা আছে। স্বদেশজাত জব্বার ভারতীয়দের মধ্যে যাতে বহুল প্রচার হয় তার চেষ্টা ভারতবাসীমাত্রেইই করা উচিত। প্রদর্শনীর হারোমন্টন কালে কলিকাতার মেয়র ঈশ্বরকৃষ্ণ সঙ্গোপহুয়ার বহু মহাশয় বসেছেন, “আজ বাঙাল্য তথা ভারতবাসী স্বদেশী ব্রত গ্রহণ করিবার যে সাধন। চলিয়াছে, তাহার মূল-মন্ত্র এই বাঙাল্য সেবের অপব্যব হইতে প্রথম উদ্ধারিত হইয়াছিল…… সুতরাং এই স্বদেশী প্রদর্শনী বাঙাল্য সম্পূর্ণ বিজয়” ৷ পূজার আসমনে বহন পণ্যবীথিকার ধারে ধারে জনসমাগমের বিপুল স্রোত বয়ে যাক্, তখন বোধ হয় এখন একটা বিরাট-বিপণীর আয়োজন বাধ্য হয়ে যাবে না। নীতিশিক্ষার দিক দিয়াও আমরা আবার ইহার বিরাট প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারি। মেয়ের শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসা ও শিক্ষা বিষয়ে আমাদের কত অভাব আছে, তা অনায়াসে এখানে বোঝাবার যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতের নারী-প্রগতির ইতিহাস বলত অন্ধরে প্রবেশ-

পথের অন্ধরে বন্ধিত হয়েছে। স্বাভাবিকের অতি পুন্নাতন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিপদভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। অজ্ঞাত মেয়ের সহিত প্রতিযোগিতায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা-ক্ষেত্রে যে আমরা কত হীন হয়ে পড়ছি, তারও আভাস যথেষ্ট পাওয়া যাবে। এই অতি সত্যতঃ প্রচার করে চলছেন স্বাভাব্য প্রকৃষ্টতঃ রায়। তাঁর এ নীতি উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়ে আত্মবিশ্বস্ত জাতিকে আত্ম-প্রতিষ্ঠার পথে টেনে নিয়ে আসুক। বাঙাল্য তথা ভারতের দুখ-কষ্টের-শিরকে সম্বোধিত করবার এই অভিনব উদ্ভব সার্থক হয়ে উঠুক।

বঙ্গীয় সংস্কৃত পরিষদ

গত ২২-এ আগষ্ট মঙ্গলবার কলিকাতার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিনেট হাউসে বঙ্গীয় সংস্কৃত পরিষদের উপাধি বিতরণী সভার অধিবেশন হয়। বাঙাল্য মহোদয় লাট বাহাদুর সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রাচীন-হিন্দু-পদ্ধতিত উদ্বোধন কার্য শেষ হবার পর, পরিষদের সভাপতি মাননীয় বিচারপতি ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর অভিভাষণে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের শিক্ষা-প্রণালী ও বিদ্যাবী-ভবনের প্রসঙ্গে বলেছেন—“হিন্দু-শিক্ষা-প্রণা এবং বৌদ্ধ-শিক্ষা প্রথার ভিত্তর পার্থক্য এই যে, বৌদ্ধদের সময় শিক্ষা কেন্দ্রগত হয়। এইভাবে নাদকা, তক্ষশীলা ও বিক্রমশীলা প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠে। এই সব শিক্ষাকেন্দ্রে বহু অধ্যাপক, ছাত্র একত্র অবস্থান করিতেন। বিবকবি রবীন্দ্রনাথের শাস্তি-নিকেতন প্রাচীন যুগের সেই জীবকীর্তি বহন করে চলেছে। ভারতীয় প্রাচীন যুগে যে বৃহৎ মহা-ভাবধারার সন্নিগমে এক অপূর্ণ শিক্ষা-প্রণালী পড়ে উঠছিল, তার উপর ভিত্তি করে যে অনন্তর সভ্যতার কাহিনী চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল তার আভাস বিচারপতি ব্রজনাথ তাঁর অভিভাষণে দিয়েছেন—“সবত্র জগৎ বহন অজ্ঞানতার গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন উপনিষদ এবং বৌদ্ধ জাতক,

সাধা প্রভৃতির তিতর দিরা আৰ্হা সভাতার জান-
বিজ্ঞান-জ্ঞতি সেপ হইতে সেশাণ্ডের বিজ্ঞুরিত হইয়া-
ছিল। এইভাবে ভারতের সভাতার বাণী পশ্চিমে
আলোকলাগিয়া, উত্তরে মঙ্গোলিয়া, উত্তর-পশ্চিমে
কাম্পিয়ান সাগরের তটস্থি, পূর্বে জাপান, দক্ষিণ-
পূর্বে বং, বালী এবং সুমাত্রা প্রভৃতি দীপে, দক্ষিণে
সিঙ্গেল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে ম্যাডাগাস্কার দীপ পর্য্যন্ত
বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।" আমাদের প্রাচীন
সভাতার এই বিরাট কাহিনী আর শুধু আমাদের
অন্তরে এক মৰ্ম্মহীন বেদনা বহন করে যানে।

স্বর নৃপেন্দ্রনাথ ও শ্রীমুক্ত বি, সি, চট্টোপাধ্যায়

সাম্প্রদায়িক সভ্যতার সমাধানের ক্ষম গোদ-টেবিল
বৈঠকে গিয়েছিলেন এডভোকেট সেনারেল স্বর
নৃপেন্দ্রনাথ সরকার আর শ্রীমুক্ত বি, সি, চট্টোপাধ্যায়
মহাশয়। মহাশয় পাকী বধন অনশনব্রত ধারণ করে
সমগ্র জাতি এবং সমগ্র দেশকে বিশেষভাবে আলো-
চিত করেছিলেন তখন তাঁকে বাঁচানোই ছিল
জাতির একমাত্র চিন্তা। তাই সাম্প্রদায়িকতার তখন
যে সমাধান হয়, তা সকলে সেনে নিজে বাধ্য
হয়েছিলেন। সেই নিদারুণ দিনে সাম্প্রদায়িক ভাণ-
বাটোয়ারা পুখাঃপুখাঃরূপে দেখবার অবসর বোটেই
ছিল না। থানা তাকে সম্বন্ধি নিয়েছিলেন সেই দলে
বিদ্যকবি রবীন্দ্রনাথও ছিলেন। পরে বাঙলা লসছে
এই সাম্প্রদায়িক বীমালা যখন অলসহিংস্র দৃষ্টি
দিয়ে দেখা গেল তখন বোকা সেল যে অস্ততঃ
বাঙালী হিন্দুর পক্ষে এ বীমারের দান যথেষ্ট
ক্ষতিকর হবে। স্বর নৃপেন্দ্রনাথ কয়েকটি গিলেট
কমিটিতে যোগ দাগভাবে বুদ্ধিরে গিয়েছেন
যে, পুণঃ-চুক্তি অসম্ভাবী সাম্প্রদায়িক ভাণ-বাটোয়ারা
বাঙলার মনঃপূত হয় নাই। নবশাসনতন্ত্রের প্রবর্তনের
সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্তঃপার যে দান
নির্দিষ্ট থাকবে তাহা বাঙালী হিন্দুর ক্ষম যথেষ্ট নয়।

বিদ্যাতে বুদ্ধিজীবী সভ্যতায় দ্বারা স্বর নৃপেন্দ্রনাথ
অনেকের দৃষ্টি বাঙালী হিন্দুর উপর আকর্ষণ করেছেন।
বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভার প্রতিনিধিরূপে ঐক্য
বি, সি, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও হিন্দুদের এই দাবীর
সমীচীনতার কথা এই সভায় প্রতিপন্ন করার
চেষ্টা করেছিলেন। মহাশয়বাবীও বর্তমানে এক
বিত্তিতে দীকার করেছেন যে, পরিবর্তনের
বসি প্রয়োজন হয় ত তার এখনও সময় আছে।

পরলোকে স্বর বিপিনকৃষ্ণ বসু

একজন প্রবাসী বাঙালীর দুঃসংবাদে সমগ্র
বঙ্গদেশ শোকনিমগ্ন হয়ে পড়েছে। তিনি স্বর
বিপিনকৃষ্ণ বসু। প্রবাসে যে সকল বাঙালী খ্যাতি
লাভ করেছেন, স্বর বিপিনকৃষ্ণ তাঁদের মধ্যে
অন্ততম। দাদপুর বিবিসিভালায় তাঁর অপরূপ কীর্তি,
তিনি ইহার এখন তাই চাওলেয়ার ছিলেন।
বুড়াকালে তাঁর বয়স ৮২ বৎসরের উপর হয়েছিল।
আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি
সমবেদনা প্রকাশ করছি।

বাঙলার বিভিন্ন স্থানে বস্তু

আজ বাঙলার নানা স্থানে তীব্র বজ্র
সেধা গিয়েছে। দাবী-নির্ব্যাহন, সামাজিক কুসংস্কার,
স্বাধীনতা আন্দোলন আর সাম্প্রদায়িক সভ্যতা
বধন সারাদেশকে দুঃখান করে তুলেছে সেই দারুণ
জ্বিনে প্রকৃতিও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। বাঙলার চিরতন
দারিদ্র্যের হাহাকারের সঙ্গে সঙ্গেই অসহীন, বস-
হীন, আগ্রহহীন মৰ্ম্মহীন কলম আত্মনাদ সমগ্র
দেশকে স্থব্রিত করে তুলেছে। বঙ্গাধিকারের
সাধাবাক্যে যে সমগ্র প্রজ্ঞান ধারে ধারে ভিকা
করে বৈদীর্ঘ্য, আমরা তাদের সাফল্য কামনা
করি। কিন্তু এই ভিকালত সাম্রাজ্য অর্থে পৃথিবী
নিরন্তরের কড়কুড় সাহায্য হবে তাহা আমরা জানি
না। চারিদিকে বধন ব্যঙ্গভাষার বিপুল আয়োজন

হকে, গৃহী যখন স্বয়ং জুবার্জ তখন এই পর বছর মৃত্যুর এই অবাধ লীলা নির্ধিবাদে চলতে
মহাকুখা নিবারণের কি উপায় আছে তা-ও থাকবে। স্বেসোমুখ জাতির আরও ফলস্ব অনিবার্য
বলতে পারি না। প্রকৃতির এ চণ্ডরূপ বাঙলা দেশের হয়ে উঠবে। আমাদের মনে হয় বিস্তৃত ভাবে
ভাগ্য-গণনে ত প্রায়ই দেখা দেয় এবং ভবিষ্যতেও জলনিকাশের বাবদ্য। হলে প্রকৃতির এ রুদ্ররূপ
দেবে। স্থায়ী ভাবে ইহা যত্নের নিবারণ করতে অনেকটা প্রশমিত হবে। আমরা এ বিষয়ে সজ্জদয়
পারা যায়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। নতুবা বছরের সরকারের সেহ-বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রনাসে নাকালী ছাত্র

ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্ক বালক
শ্রীমান্ মিহির কুমার চৌধুরী
গত মে মাসে স্বপ্রসিদ্ধ
জুতা প্রস্তুতকারক "বাটা
কোম্পানী"র দ্বারা নির্ধাচিত
হইয়া তাহাদের মূল কণ্ঠ-
কেন্দ্রে জেকোপ্লোতাকিয়াহ
জিন সহরে শিক্ষানবিশিতে
নিযুক্ত আছে। ভারতীয়
বালকগণ তথায় তাহাদের



কার্য্যাহুলাগ ও দক্ষতা
প্রদর্শন করিয়া বিশেষ প্রশংসা
অর্জন করিয়াছে। শ্রীমান্
মিহির কুমার এরোপ্লেন
চালনাও শিক্ষা করিতেছে
এবং অল্পদিনের মধ্যে এ
বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষতা
লাভ করিয়াছে। আমরা
তাহার মঙ্গল কামনা
করি।

